কিশোর পুরাণ সমগ্র

(আঠারোটি মহাপুরাণ ও একটি উপপুরাণ সহ)

উপদেশনা
ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়



রচনা
চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

গ্রন্থিক
১এ কলেজ রো ▪ কলকাতা ৭০০ ০০৯

।। শিশু সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রফুল্ল-স্মৃতি-পদক প্রাপ্ত।।

কিশোর পুরাণ সমগ্র

KISHORE PURAN SAMAGRA

This is a Granthik Publication

Stories retold by : **Chittaranjan Ghosal**

একটি গ্রন্থিক প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ● মহালয়া, ১৩৯৩

তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ● মাঘ, ১৩৯৭

পুনর্মুদ্রণ ● ১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪০৬, ১৪০৭,
১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১০

পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রাজ সংস্করণ ● জানুয়ারি, ২০০৬

রচনা ● চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

প্রচ্ছদ ● বিশ্বনাথ সাহা

অঙ্গসজ্জা ● অরুণাংশু চৌধুরী

কর্মসচিব ● দেবাশিস সেন

কাহিনীগুলির মুদ্রণ রূপদান ● সুবিমল লাহিড়ী

প্রকাশক ● অঞ্জন ভৌমিক

ফোটো-কম্পোজিং ● গ্রন্থিক, ১৫ কলেজ রো, কলকাতা - ৯

মুদ্রণ ● গ্রন্থিক, ১৫ কলেজ রো, কলকাতা - ৯

দাম ■ ২০০ টাকা মাত্র।

যাঁদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণায় এই সংকলন

তাঁদের উদ্দেশে

গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হল

সূচীপত্র

ব্রহ্ম পুরাণ ১ - ৪৪

বিষ্ণু পুরাণ ৪৫ - ৮৪

ভাগবত পুরাণ ৮৫ - ১৫০

গরুড় পুরাণ ১৫১ - ১৭০

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৭১ - ২২০

লেখকের কথা ॥

ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে, পুরাণগ্রন্থ নিঃসন্দেহে সেগুলির মধ্যে অমূল্য রত্ন-বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডে এমন-কিছু নেই, যা পুরাণগ্রন্থে নেই। মহাভারত সম্বন্ধে যেমন প্রচলিত একটি কথা আছে 'যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে', আমাদের পুরাণগ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই একই কথা— 'যা নেই পুরাণে, তা নেই মননে'। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত এমন-কিছু কেউই সৃষ্টি বা আবিষ্কার করতে পারেননি, রূপাকারে যার বীজ পুরাণগ্রন্থে নেই। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা বিশেষ করে আমদানি—করা ঔপনিবেশিক শিক্ষার মোহে আমাদের এই সম্পদকে নানা অজুহাতে উপেক্ষা এবং অবজ্ঞাই করতে শিখেছি এ-যাবৎকাল ধরে। পুরাণ অর্থে পুরাতন। পুরাতন হলেও আমাদের এই গ্রন্থ শাশ্বত, সনাতন শুধু নয় চির-নতুন, বোধহয় একটু রহস্যজনকভাবেই আবার তা উপলব্ধি করতে শুরু করছি।

ভারতীয় জ্ঞানের বিকাশ এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রসারের প্রয়োজনে এমন-একটা সময় এসেছিল যখন শ্রুতি-স্মৃতি-সংহিতার তত্ত্বগুলিকে সাবলীল করার জন্য কাহিনীকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। মানুষমাত্রেই কাহিনী বা গল্পপ্রিয়। এর ওপর একটা সহজাত আকর্ষণ সকলেই অনুভব করে। জনশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে পুরাণকার তাই পুরাণ-গ্রন্থকে কাহিনী-প্রধান করেছেন। এইসব কাহিনীর মধ্যে পুরাণকার কখনো ঐতিহাসিকের ভূমিকায় রাজা-রাজড়ার জীবন নিয়ে, কখনো গল্পকারের ভূমিকায় চণ্ডাল-ব্যাধ প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির জীবন নিয়ে, কখনো বা মুনি-ঋষিদের মতো জ্ঞানী-গুণীদের জীবন এবং সাধনা নিয়ে এমন-সব কাহিনী রচনা করেছেন যেগুলি নিছক কাহিনী বা গল্প হয়েই থাকেনি, সাহিত্যের কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে। প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর এবং মধুময় করে তোলার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ সূত্রাকারে যা রেখে গিয়েছিলেন, পুরাণকার সেগুলিকে কাহিনীর আকারে পরিবেশন করে গণচেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এমন অনেক কাহিনী আছে, যা প্রথমেই আজগুবি বা নিছক গাল- গল্প বলে মনে হতে পারে। তবুও তা উপেক্ষার নয়। রূপকের অন্তরালে আসল কথাটির সন্ধান পেলে, সেগুলিকে আর আজগুবি বলে মনে হবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে যে-কটি গ্রন্থ মহাপুরাণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে, আমাদের এই সংকলনে সেগুলি থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করে, যথাসম্ভব সাবলীল ভঙ্গিতে তা পরিবেশন করার চেষ্টা নিয়েছি। এমন অনেক কাহিনী আছে, যা প্রায় প্রতিটি পুরাণগ্রন্থেই অল্পবিস্তর বিভিন্ন ভাবে আছে। পুনরুক্তির কারণে সেগুলির মধ্যে একটিকে নিয়ে বাক্যগুলি বর্জন করেছি। আবার ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য সমাবিষ্টও করেছি। মহাপুরাণ ছাড়া সাধারণভাবে আঠারোটি উপ-পুরাণ আছে। তার মধ্যে 'কল্কি পুরাণ' থেকে কিছু কাহিনী এখানে আমরা সন্নিবিষ্ট করেছি। কারণ, মর্যাদার দিক থেকে এই উপ-পুরাণটি স্বতন্ত্র এবং দেশ-বিদেশে এই গ্রন্থটিকে নিয়ে বর্তমানে নানা গবেষণাও চলছে।

নামমাত্র কয়েকখানি পুরাণগ্রন্থ ছাড়া কোনো পুরাণ সুলভ তো নয়ই, রীতিমতো দুর্লভ। এমন কোন গ্রন্থাগার নেই, যেখানে সবকটি পুরাণগ্রন্থ একসঙ্গে মিলতে পারে। শ্রদ্ধেয় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদনায় একসময় বেশকিছু পুরাণগ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল। বর্তমানে তাও দুষ্প্রাপ্যের তালিকায়। তাই এই সংকলনের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন আমাদের হতে হয়েছিল। আবার ব্যক্তিগতভাবে শ্রীচম্পালাল অগ্রালিয়া, রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রমুখ বেশ-কিছু হিতৈষী গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। এই সব কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। প্রকাশনায় বিলম্ব যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে তার দায়িত্ব তাই একা প্রকাশকের নয়।

আমাদের এই সুবৃহৎ কর্মযজ্ঞে অনেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। গ্রাহকরা অবশ্যই তার সিংহভাগে আছেন। তবুও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, রামানন্দ মঠাধীশ পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ জীয়র এবং তারকেশ্বর মঠের মোহন্ত মহারাজ পরম পূজ্যপাদ দণ্ডিস্বামী হৃষীকেশাশ্রম। তাঁদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদই ছিল আমাদের মূল পাথেয়। তাঁদের শ্রীচরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ড. রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিরাম-বিশ্রামহীন অবিশ্বাস্য কর্মব্যস্ততার মধ্যেও যেভাবে আমাদের নানাবিধ সমস্যা সদুপদেশের দ্বারা মুহূর্তে সমাধান করে দিয়েছেন, তা অচিন্তনীয়। তাঁর সহানুভূতি ও ঔদার্যের কাছে আমরা অশেষ ঋণে ঋণী।

অন্য হিতৈষী বন্ধুবর রণেন গুপ্ত। কেবলমাত্র মুদ্রণ-প্রমাদ সংশোধন নয়, একনিষ্ঠ পাঠকের ভূমিকায় থেকে পরিবেশনার আঙ্গিকের দিকেও বহু সময় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সামঞ্জস্য রক্ষা তথা গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সততার পরিচয় রেখেছেন, তা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরও ঊর্ধ্বে।

গ্রন্থিক-স্বত্বাধিকারী নবীন প্রকাশক শ্রীঅঞ্জন ভৌমিক এই সুবিপুল গ্রন্থ প্রকাশে যে আত্মপ্রত্যয় এবং বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন, প্রকাশনা-জগতে তা শুধু বিরল নয়, সুদুর্লভও।

পরিশেষে, পরিবেশিত কাহিনীগুলি যদি পাঠকমনকে তৃপ্তি দেয়, উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত এবং অনুসন্ধিৎসু করে তোলে, তবেই আমাদের এই শ্রমকে আমরা সার্থক জ্ঞান করব।

অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

শুভ মহালয়া, ১৩৯৩ — চিত্তরঞ্জন ঘোষাল



ব্রহ্ম পুরাণ

সুপ্রাচীনকালে কোন এক সময় প্রজাপতি দক্ষ প্রভৃতি মহামুনিরা পৃথিবীর রহস্য জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মাই হলেন এই জগতের স্রষ্টা, বিধাতা। পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হল, কিভাবে পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টি হল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় পৃথিবীর মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান উন্নত হয়ে উঠল এবং পরিণত হয়ে গেল তীর্থক্ষেত্রে, এসব তিনি যেমন জানতেন, তেমনি জানতেন কোন্ কোন্ বংশের কোন্ কোন্ রাজা কিভাবে প্রজাপালন করে গেছেন। এছাড়াও জানতেন, কিভাবে পৃথিবী থেকে অত্যাচারীরা নির্মূল হয়েছে। ব্রহ্মা নিজ মুখে এসব কাহিনী বলেছিলেন বলেই এই পুরাণ-কাহিনীর নাম হয়েছে 'ব্রহ্ম পুরাণ'। মহামুনি পরাশরের মহাগুনী ছেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবও এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছে। তিনি সেই কাহিনীকে অমর করে রাখার জন্য তাঁর প্রিয় শিষ্য লোমহর্ষণ (রোমহর্ষণ)-সূতকে তা এমনভাবে শুনিয়ে রেখেছিলেন যে, তা সূতের মনে গেঁথে ছিল। সূত আবার নৈমিষারণ্যে এসে যেসব মহামুনি যজ্ঞ করার জন্য সেখানে জড় হয়েছিলেন, তাঁদের আবার এই ব্রহ্মপুরাণের কাহিনী বলেছিলেন।



ধুন্ধুমার কাহিনী

সুবিশাল সূর্যবংশ। যেমন ছিল তাঁদের মহিমা, তেমনি প্রতাপ। এই বংশেরই ইক্ষ্বাকু ছিলেন অযোধ্যার প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা। কত না বীরের জন্ম হয়েছিল এই বংশে। দশরথের মত রাজা, রামচন্দ্রের মত অবতার পুরুষ এই বংশকে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করে গেছেন।

শ্রাবস্তীপুরীর নির্মাণকর্তা শ্রাবস্ত ছিলেন এই বংশেরই একজন প্রভাবশালী রাজা। বীর কুবলাশ্ব ছিলেন তাঁরই নাতি।

বহুকাল সম্মানের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন বৃহদশ্ব। তাঁর সুশাসনে সমৃদ্ধ হয়েছে দেশ। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এখন। রাজকার্য আর ভাল লাগে না। সময় এসেছে অবসর নেবার। ইতিমধ্যেই গুণে-জ্ঞানে শৌর্যে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছেন তাঁর পুত্র কুবলাশ্ব।

বৃহদশ্ব স্থির করলেন আর নয়। যোগ্য পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে অবসর নেবেন এবার। চলে যাবেন বনে। প্রথা-অনুযায়ী বাকি জীবনটা এবার নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবেন বানপ্রস্থ আশ্রমে।

সব ঠিকঠাক করে পুত্র কুবলাশ্বকে সিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থে যেতে তিনি উদ্যত এমন সময় ঋষিবর উত্তঙ্ক এসে দাঁড়ালেন সভামধ্যে।

মহারাজের মঙ্গল হোক।

যোগবলে বলীয়ান, প্রভূত শক্তিশালী ঋষিবরকে সভামধ্যে দেখে সসম্ভ্রমে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে আপ্যায়ন জানালেন বৃহদশ্ব। তারপর জানতে চাইলেন তাঁর আগমনের কারণ।

শুনলাম আপনি নাকি বানপ্রস্থে চলেছেন মহারাজ ?

আপনি ঠিকই শুনেছেন।

কিন্তু দেশকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব না করে বানপ্রস্থে যাওয়া কি আপনার সমীচীন হবে মহারাজ ?

এখনও কি কোথাও কোন উপদ্রব আছে, ঋষিবর ? আপনার তপস্যায় কেউ কি কোন বিঘ্ন উৎপাদন করছে ? শশব্যস্তে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন বৃহদশ্ব।

আপনার অনুমান সত্য। সমুদ্রতটের যে বিস্তৃত প্রান্তর, তারই এক প্রান্তে আমার আশ্রম। বিস্তীর্ণ বালুকাময় ঐ সমুদ্রতট ছিল বড়ই মনোরম এবং জপ-তপের অনুকূল। দীর্ঘকাল ধরে ওখানে নিশ্চিন্তে একাগ্রমনে জপ-তপ করে আসছি, কোন অসুবিধেই বোধ করি নি। কিন্তু ইদানীং আমার সাধনায় বড় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে আমার যোগশক্তি, মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠছে।

কারণ ঋষিবর ?

কারণ এক অসুর। নাম তার ধুন্ধু, মধু রাক্ষসের ছেলে। তার উৎপাতে আমাদের তপস্যা, সাধনা বুঝি বা লোপ পেয়ে যায়।

মন দিয়ে ঋষি উত্তঙ্কের কথাগুলি শুনতে থাকেন বৃহদশ্ব।

যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর, এমন কি দেবতাদেরও অবধ্য এই রাক্ষস ধুন্ধু। থাকে সমুদ্রতটে বালির নিচে। দেববরে বলীয়ান হয়ে সে এমনই মদমত্ত হয়ে উঠেছে, যে কাউকেই গ্রাহ্য করে না। সব সময়ই তার একটাই মাত্র চিন্তা, কি করে পৃথিবীর ক্ষতি করব, সকলের অনিষ্ট করব। বালির নিচে তার প্রাসাদ থেকে বছরে সে একবার করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। এমনই প্রবল সে নিঃশ্বাস বায়ু যে সমুদ্রতটের সমুদয় বালুরাশি ঘূর্ণিঝড়ের মত পাক খেতে খেতে উঠতে থাকে ওপরে। ঢেকে ফেলে সূর্যের আলো। সূর্য এমনই ম্লান হয়ে যায় যে মনে হয়, অসময়ে বুঝি অস্ত গেল। তার ওপর ভূমিকম্পের মত কেঁপে ওঠে ধরিত্রী। এইভাবে একটানা চলে সাত দিন, সাত রাত। মহারাজ, এর ফলে সকলের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, আমার তপস্যাও যে কি পরিমাণ বিঘ্নিত হচ্ছে, তা আর আপনাকে কি বলব ? ধর্মের রক্ষক আপনি, রাজা। এত বড় এক অত্যাচার নিবৃত্ত না করে বানপ্রস্থে যাওয়া কি আপনার পক্ষে সমীচীন হচ্ছে ?



সব মন দিয়ে শুনলেন বৃহদশ্ব। তারপর বললেন, এখন তো আর প্রত্যাবর্তনের অবকাশ নেই, ঋষিবর। আমি সঙ্কল্পে স্থির এবং প্রস্তুত। তবে আপনার তপস্যায় যাতে আর বিঘ্ন না ঘটে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করে যাব। আমার পুত্র কুবলাশ্ব এখন সিংহাসনে বসেছে। সে বীর। আমি ঐ ধুন্ধুকে সমুচিত শাস্তি দেবার এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার যাবতীয় দায়িত্ব আমার পুত্রকেই দিয়ে যাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মহারাজ, যোগবলে আমি জেনেছি যে ঐ রাক্ষস কেবল রাজশক্তির বধ্য নয়। দেববরে বলীয়ান ঐ রাক্ষসকে বধ করতে গেলে আমার তপঃ-শক্তি দিয়ে রাজশক্তিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি তার জন্যে প্রস্তুত। তাই বলছিলাম মহারাজ, ধার্মিক আপনি, আপনিই পারবেন এই দুরূহ কাজ সমাধা করতে, বললেন ঋষি উত্তঙ্ক।

আপনি নির্ভাবনায় থাকুন, ঋষিবর। আপনার সাহায্য আমার সুযোগ্য পুত্রও গ্রহণে যথেষ্ট সক্ষম, বললেন বৃহদশ্ব।

তারপর পুত্র কুবলাশ্বকে ডেকে রাজা বললেন, পুত্র, এই ঋষিবর যাতে নির্বিঘ্নে তপশ্চারণ করতে পারেন, জনপদের আতঙ্ক যাতে দূর

হয়, তার জন্য তুমিই যাও। বধ কর সেই পাপাচারী রাক্ষস ধুন্ধুকে। বানপ্রস্থে যাবার জন্যে আমি সঙ্কল্পে স্থির। আমার পক্ষে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। এই বলে তিনি পুত্রের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন বনে, তপশ্চারণ করতে।

পিতার আদেশ, তার ওপর রাজ-কর্তব্য জনপদের কল্যাণ আর ঋষির বিঘ্নাশ। রাজা ডেকে পাঠালেন তাঁর একশো ছেলেকে। প্রত্যেকেই এক একজন মহাবীর। কুবলাশ্ব চললেন তাঁর শতপুত্র সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতটে, সেই বালুকাময় জনপদে ধুন্ধুবধের জন্যে।

পৌঁছেই পুত্রদের আদেশ করলেন, সরিয়ে ফেল এই বালির স্তূপ। খুঁড়ে ফেল সমুদ্রের খাত। খুঁজে বের কর কোথায় সেই পাপাচারী রাক্ষস আত্মগোপন করে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল খননকার্য। দুশো সবল বাহু। দ্রুত অপসারিত হতে থাকল বালি, বেরিয়ে আসতে লাগল গহ্বর।



ওদিকে আশ্রম প্রাঙ্গণে লোক-পালক বিষ্ণুর ধ্যানে তন্ময় ঋষি উত্তঙ্ক। মন-প্রাণ এক করে তিনি আহ্বান করে চলেছেন বিষ্ণুকে—হে সর্বশক্তিমান এসো। তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। কুবলাশ্বকে দাও তোমার সেই অমিত শক্তি যাতে সে ধুন্ধুকে বধ করতে পারে। নিশ্চিন্ত করতে পারে তোমার সৃষ্টিকে অশান্তির হাত থেকে। উত্তঙ্কের সেই আকুল আহ্বানে নড়ে উঠল বিষ্ণুলোক, দুলে উঠল বিষ্ণুর আসন। বিষ্ণুর মনে পড়ে গেল প্রতিশ্রুতির কথা। অলাক্ষতে কুবলাশ্বের শক্তিকে তিনি করে তুললেন প্রখর তেজসম্পন্ন।

এদিকে খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে এসেছে ধুন্ধুর আবাস-স্থল। আত্মগোপন করে থাকার আর কোন সুযোগ নেই। আক্রোশে ফুলে উঠল ধুন্ধু। দুরন্ত ক্রোধে ছাড়ল হুঙ্কার। তারপর প্রচণ্ড বেগে এসে আক্রমণ করল কুবলাশ্বের পুত্রদের। একা ধুন্ধু, অপরদিকে কুবলাশ্বের বলবান শত পুত্র। চাঁদের উদয়ে সমুদ্র যেমন উথাল-পাথাল হয়ে ওঠে, তর্জনে ফুঁসে উঠে প্রকাশ করে তার ভয়ঙ্কর আনন্দ, ধুন্ধুও তেমনি এতগুলি বধ্যকে পেয়ে যেন উত্তাল হয়ে উঠল। তাকে প্রতিহত করে কার সাধ্য। সেই ভীষণ আক্রমণে একের পর এক কুবলাশ্ব-পুত্রেরা নিষ্প্রাণ দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর যখন রয়েছে মাত্র তিনজন, সেই সময় তার নজর পড়ল কুবলাশ্বের দিকে। আর দেখে কে? মুহূর্তের মধ্যে যেন ধুন্ধুমার-কাণ্ড বাধিয়ে বসল সে। মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের তীব্র ঝলক, আর জলময় বেগ নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে, এগিয়ে আসতে শুরু করল কুবলাশ্বের দিকে।

কিন্তু বিষ্ণুশক্তিতে অমিত শক্তির অধীশ্বর হয়ে উঠেছেন তখন কুবলাশ্ব। চোখের পলকে ধুন্ধুর সেই জলময় বেগ পান করে, যোগময় জল দিয়ে একেবারে নিভিয়ে দিলেন তার মুখের সেই আগুন। ফলে ধুন্ধু এমনই হীনবল হয়ে পড়ল যে লড়াই করা তো দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না।

নিশ্চিন্ত হলেন ঋষি উত্তঙ্ক। নিঃশঙ্ক হল জনপদ। আবার ফিরে এল নির্ভয় শান্তি। সন্তুষ্ট ঋষি প্রাণভরে অজস্র আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন রাজা কুবলাশ্বের মাথায়। আর যুদ্ধে নিহত কুবলাশ্বের পুত্রেরা তাঁর তপস্যাবলে লাভ করল সদ্গতি।

এরপর সুদীর্ঘকাল সুশৃঙ্খলে রাজত্ব করেছিলেন রাজা কুবলাশ্ব। কিন্তু অবধ্য ধুন্ধুকে বধ করার ফলে সেদিন থেকে তিনি যে 'ধুন্ধুমার' নামে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই পরিচয়েই তিনি লোকসমাজে অমর থেকে গেলেন।



সত্যব্রতের কাহিনী

সূর্য বংশেরই অপর এক রাজা, নাম ত্রয্যারুণ। যেমন সুশাসক, তেমনি ধার্মিক। কোথাও কোন অত্যাচার নেই, অনাচার নেই। অশান্তিও নেই। যে যার বৃত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট। নির্ভাবনায় দিন কাটে প্রজাবৃন্দের। খাল-বিল-পুকুর-নদীতে কোথাও নেই জলের অভাব, মাঠে মাঠে সবুজ ফসলের মেলা। গোচারণে দুগ্ধবতী গাভীদের জৌলুস।

সর্বত্রই শান্তি। কিন্তু শান্তি নেই স্বয়ং রাজার মনে।

একমাত্র পুত্র সত্যব্রতকে ঘিরে রাজা ত্রয্যারুণের মনে একটু একটু করে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল স্বপ্নসৌধ। উজ্জ্বল বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল করবে তাঁর পুত্র। রাজা হয়ে প্রজাদের রাখবে

তাঁরই মত সুশাসনে। নির্বিঘ্নে যাগ-যজ্ঞ নিয়ে ব্রাহ্মণরা সমাজে থাকবেন সসম্মানে। অপরাপর যারা, তারাও তাদের বৃত্তি নিয়ে দিন কাটাবে মনের আনন্দে। তা না হয়ে এ কি হল ? তাঁর বংশে কোথা থেকে এল এমন এক কুলাঙ্গার ? রাজার সুন্দর স্বপ্নসৌধ দিন দিন ভরে যেতে লাগল দুঃস্বপ্নে। আর মন মরা হয়ে উঠতে লাগলেন রাজা ত্রয্যারুণ।

যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল সত্যব্রত। অমন এক ধার্মিক রাজার ছেলে সে, তা কে বলবে ? যত রকমের অনাচার আছে নিঃসঙ্কোচে তা সে করে বেড়াতে লাগল।

রাজা ভাবলেন, বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কেকয় রাজার মেয়ে সত্যবতী যেমন রূপে, তেমনি শীলে। তার ওপর যেন একটি প্রতিমা। সব দিক থেকেই ত্রয্যারুণের বংশে বধূ হয়ে আসার যোগ্যা। নির্দ্বিধায় পুত্র সত্যব্রতের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সাদরে ঘরে তুলে আনলেন মেয়েটিকে। নিশ্চিন্ত এবার রাজা। নিশ্চয়ই পুত্রের মতি গতি এবার ফিরবে। যদিও বিয়ের রাতেই গণ্ডগোল করেছিল সত্যব্রত, পিতার সমান মর্যাদাসম্পন্ন কুলগুরু বশিষ্ঠ-র সামনেই ঠিক ঠিকমত উচ্চারণ করে নি বিয়ের মন্ত্র, ভেংচি কেটেছে সমগ্র অনুষ্ঠানকে, তবুও তখনকার মত মনে মনে কষ্ট পেলেও, রাজা সব কিছু উপেক্ষা করে গেলেন ভবিষ্যতের আশায়।

কিন্তু দুর্ভাগা রাজা ত্রয্যারুণের। পুত্র তো তাঁর ঘরমুখো হলই না, বরং বাইরের অনাচার তার গেল আরো বেড়ে। সব সময় শশব্যস্ত, সব সময় শঙ্কিত হয়ে থাকত জনপদবাসী, কখন এসে পড়ে



সত্যব্রত, আর করে বসে কোন অনিষ্ট। মেয়েরাও দুরু দুরু বুকে কাটাত দিনরাত।

সবই কানে আসে রাজার। আর প্রায় মরে যান লজ্জায়। ধিক্কার দেন নিজেই নিজেকে। লোকে বলে, তিনি ধার্মিক রাজা। এই কি তাঁর ধর্ম রক্ষার নমুনা ? তাঁরই পুত্র একের পর এক করে চলেছে অধর্ম, তিনি রাজা হয়ে তাকেই যখন বাগে আনতে পারছেন না, তখন আর কি তাঁর রাজা হয়ে থাকার অধিকার আছে ? দু পাশে বাঁধ আছে, তাই স্বাভাবিক নদী আপন গতিপথে স্বচ্ছন্দে বয়ে যায়। কিন্তু যখন বান আসে, ভেঙ্গে যায় বাঁধ, জল ছোটে এদিক-ওদিক। ধৈর্যেরও তেমনি একটা সীমা আছে, যতই তাকে কেউ আগলে রাখুক না কেন। রাজা ত্রয্যারুণ নিজে অত বড় সংযমী হয়েও আর ধৈর্যকে বেঁধে রাখতে পারলেন না। মন থেকে মুছে ফেললেন সব মায়ামমতা, সব দুর্বলতা। পুত্র সত্যব্রতকে গুরুদেব বশিষ্ঠর সামনেই ডেকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি আমার বংশের কুলাঙ্গার—চণ্ডাল। আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম। যাও, তুমি চণ্ডালদের সঙ্গে গিয়ে বসবাস কর।

অগত্যা চণ্ডাল-পল্লীতে এসে চণ্ডালদের সঙ্গেই থেকে গেল সত্যব্রত।

আর রাজা ত্রয্যারুণ ? ক্ষোভে-দুঃখে রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে গেলেন বনে, বাকি জীবন তপশ্চারণে থেকে মনকে শান্ত করতে।

রাজ্য থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হলেন রাজা। অরাজক দেশ। চরম সীমায় উঠল অত্যাচার, অনাচার। ধর্ম বলতে আর কিছুই রইল না দেশে। অধর্মে ছেয়ে গেল চতুর্দিক। সুযোগ বুঝে আকাশও হয়ে উঠল কঠিন। প্রখর হয়ে উঠল সূর্যের তেজ। যেন আকাশ থেকে শুরু হয়ে গেল অগ্নিবৃষ্টি। শুকিয়ে যেতে লাগল খাল-বিল-পুকুরের জল। আকুল আশা নিয়ে তাকায় সবাই আকাশের দিকে। বৃষ্টি, একটু বৃষ্টি। ছিটেফোঁটা মেঘেরও দেখা মেলে না, শুধু গনগনে আগুনের আভা ছাড়া। জ্বলে-পুড়ে গেল ক্ষেতের ফসল। অনাবৃষ্টির ফলে চাষ-আবাদও হল না। সারা দেশ জুড়ে দেখা দিল দারুণ খাদ্যাভাব। করাল দুর্ভিক্ষ।

ঋষি বিশ্বামিত্র থাকতেন এই রাজ্যেই। কেমন করে যেন তাঁকে খুবই ভাল লেগে গিয়েছিল সত্যব্রতর। যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করত সে। ঠিক এমনি এক বিপর্যয়ের সময়ে সেখানে স্ত্রী-পুত্র রেখে গিয়েছিলেন সাগরতীরে তপস্যা করতে। অনটনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাঁর স্ত্রী একদিন মেজ ছেলেটিকে গলায় দড়ি বেঁধে একশোটি গরুর বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছেলেটিকে যখন নিয়ে যেতে উদ্যত বিক্রেতারা,ঠিক সেই সময়ই সত্যব্রত সেখানে এসে ঐ অবস্থা দেখে আর থাকতে পারল না। অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে তাঁর গলা থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে তাকে মুক্ত করল। সেই থেকে এই ছেলেটির নাম হয়ে গেল গালব—যিনি পরে হয়েছিলেন এক ঋষি। তারপর থেকে কোন অবস্থাতেই আর সত্যব্রত বিশ্বামিত্র-পরিজনদের কাছ ছাড়া হয় নি। নিজে অনাচার এবং অধর্মাচারে মেতে থাকলেও যেভাবেই হোক প্রতিপালন করে আসত বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গকে।

সর্বত্র অভাব দেখা গেলেও অভাব ছিল না একমাত্র বশিষ্ঠের। কারণ তাঁর কামধেনু।

সত্যব্রত একেবারেই সহ্য করতে পারত না বশিষ্ঠকে। তার ধারণা, পিতা ত্রয্যারুণ যে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন, এর পিছনে নিশ্চয়ই বশিষ্ঠের উস্কানি ছিল। তা যদি না থাকত, তাহলে বাবাকে তো বাধা দিতেন, নিষেধ করতেন। তিনি চুপ করে রইলেন কেন তখন ? বিয়ের সময় ভুল মন্ত্র বলায় যদি পাপ হয়ে থাকে তাহলে একবার ডেকেও তো তাকে দিয়ে পাপ-স্খালন করাতে পারতেন। তা-ও করলেন না। এই সব কারণে বশিষ্ঠ হয়ে উঠলেন সত্যব্রতর চক্ষুশূল।

সুযোগ বুঝে এবার সত্যব্রত নিল দারুণ প্রতিশোধ।

দুদিন ধরে কোথাও কোন খাদ্য জোটে নি। ক্ষুধার জ্বালায় নিজে

যেমন হয়েছে কাতর, তার চেয়ে বেশি কাতর হয়ে পড়েছে সেদিন সত্যব্রত বিশ্বামিত্র পরিজনদের মুখে কোন খাদ্য যোগাতে না পেরে। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে সে এবার চুরি করে বসল বশিষ্ঠের কামধেনুটি। সেটি কেটে তার মাংস খেল নিজে, খাওয়াল বিশ্বামিত্রের পরিজনদের।



কানে গেল বশিষ্ঠের। ব্যস, আর যায় কোথা? অত বড় যে সংযমী অক্রোধ ঋষি, তিনিও ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন। শাপ দিয়ে বসলেন সত্যব্রতকে—আজ থেকে তোমার ঐ সত্যব্রত নাম চিরকালের জন্যে মুছে যাবে। যেহেতু তুমি সত্যপরায়ণ না হয়ে তিনটি ঘোরতর শঙ্কু অর্থাৎ অপরাধ করেছ, তাই এবার থেকে তোমাকে সকলে জানবে 'ত্রিশঙ্কু' নামে। সেই তিনটি অপরাধ হল, পিতার মনে অসন্তোষ, কুলগুরুর গোহত্যা, আর যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়, তাই খাওয়া।

কেমন করে যেন সত্যব্রতের মনে এবার ধাক্কা লাগল। একদিকে বশিষ্ঠের এই অভিসম্পাত—পাপ কর্মের ফলভোগ করতে হবে সারা জীবন। এমন কি মরার পরেও। তার ওপর দেশ জুড়ে এই নিদারুণ হাহাকার। এর কি কোন প্রতিকারই নেই? চলে গেল সত্যব্রত জনপদ ছেড়ে গভীর অরণ্যে। আত্মসংযম করে শুরু করল ধ্যান-ধারণা। নিষ্ঠার সঙ্গে অবলম্বন করে শুরু করল মৌনব্রত। এমনিভাবে কেটে গেল তার বারোটা বছর। এখন আর কে বলবে, এই ত্রিশঙ্কু সেই সত্যব্রত?

তপস্যা-শেষে একদিন ফিরে এলেন বিশ্বামিত্র। সেই ঘোর দুর্দিনে তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতিপালন করার জন্যে তিনি খুবই খুশি। তিনি বললেন ত্রিশঙ্কুকে, বল, তোমার কি চাই? ত্রিশঙ্কু রাখল শুধু একটাই আবেদন: যেন সশরীরে স্বর্গে যেতে পারি। বিশ্বামিত্র বললেন, তাই হবে।

পিতৃ-সিংহাসনে আবার অভিষিক্ত হল ত্রিশঙ্কু। বিশ্বামিত্র হলেন তাঁর পুরোহিত। দেশে আবার ধর্ম স্থাপিত হল। প্রজাবৃন্দের মন থেকে দূর হয়ে গেল ভয়। কেটে গেল অনাবৃষ্টির আতঙ্ক। পৃথিবী আবার হল শস্যশালিনী। দীর্ঘকাল সুশৃঙ্খলে রাজত্ব করল ত্রিশঙ্কু। তারপর ইচ্ছা প্রকাশ করল সশরীরে স্বর্গে যাবার।

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল স্বর্গের দ্বার। অমন ঘোরতর সব অপরাধে অপরাধী ত্রিশঙ্কুর স্থান তো স্বর্গে হতে পারে না। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিশ্বামিত্র। তাঁকে অবজ্ঞা? সঙ্গে সঙ্গে নিজের তপোবলে মাঝ পথে তৈরি করে ফেললেন আর এক স্বর্গ যার সঙ্গে আসল স্বর্গের পার্থক্য বোঝাই দায়। আর সেই স্বর্গে প্রতিষ্ঠা করলেন ত্রিশঙ্কুকে।



সগর রাজার কাহিনী ও ভগীরথের তপস্যা

সূর্যবংশেরই অন্যতম প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন বাহু। সসাগরা সপ্তদ্বীপ নিয়ে পৃথিবীর অধীশ্বর তিনি। সূর্য কখনো অস্ত যেত না তাঁর রাজ্যে। সেই রাজাকেও একদিন চক্রান্তের শিকার হতে হল, রাজ্যচ্যুত হয়ে হতে হল আশ্রমবাসী।

টের পাবার আগেই হৈহয় আর তালজঙ্ঘের রাজারা শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ আর পল্হব রাজবীরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতার লোভে হঠাৎ একদিন আক্রমণ করে বসল রাজা বাহুকে। সামর্থ্য থাকলেও ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না বাহু রাজা। হেরে গিয়ে আত্মগোপন করলেন বনে ঔর্ব ঋষির আশ্রমে রাজমহিষীদের সঙ্গে নিয়ে। লজ্জায়, অপমানে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলেন রাজা। তার ওপর মর্মান্তিক গ্লানি। যদিও সমাদরেই ছিলেন তিনি, তবুও মানসিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন একদিন। অন্যতমা মহিষী যাদবী এতই শোকাতুরা হয়ে পড়লেন যে, মনস্থই করে ফেললেন স্বামীর চিতায় তিনিও যাবেন সহমরণে।

কথাটা ঔর্ব ঋষির কানে যেতেই বাধা দিলেন তিনি মহিষীকে। বললেন—না মা, তোমার সহমরণে যাওয়া হবে না। তোমার গর্ভে রয়েছে রাজার বংশধর।

ঠিকই বলেছেন ঋষি। কিন্তু মহিষীর ধারণা, গর্ভেই বিনষ্ট হয়ে গেছে তাঁর সন্তান। সতীন বিষ প্রয়োগ করেছিল খাবারের সঙ্গে। তাই সন্তান প্রসবের সময় উত্তীর্ণ হয়ে পেরিয়ে গেছে সাত-আট বছর। এখনো কি সে আছে তাঁর জঠরে?

অভয় দিলেন ঔর্ব ঋষি। সুদীর্ঘকাল পরে ভূমিষ্ঠ হল সেই আশ্রমে যাদবীর সন্তান। ঔর্ব ঋষি তার নাম রাখলেন সগর। গর মানে গরল বা বিষ। সেই গরল আত্মসাৎ করে যিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর সগর নামই তো ঠিক নাম।

সেই আশ্রমেই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন সগর। পিতার মত যেমন স্নেহ করতেন ঋষি, তেমনি তাঁর শিক্ষাদীক্ষার দিকেও রাখলেন সজাগ দৃষ্টি। অসাধারণ প্রতিভা নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সগর। অল্প দিনের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে হয়ে উঠলেন সুপণ্ডিত। শুধু শাস্ত্র নয়, অস্ত্র চালনা, যুদ্ধবিদ্যাতেও হলেন

দক্ষ। সেই সঙ্গে নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারেও হলেন সুনিপুণ। ক্ষত্রিয়ের বংশধর তিনি, ক্ষত্রিয়। তাই কিছুমাত্র কার্পণ্য না করে ঋষি তাঁকে অচিরকাল মধ্যেই ক্ষাত্রধর্মে বীর্যবান করে তুললেন।

মাঝে মাঝেই সগরের মনে জাগত একটা প্রশ্ন—কে তাঁর বাবা? তিনি কার সন্তান? কোথায় ছিল তাঁর দেশ? কেনই বা আছেন তিনি মায়ের সঙ্গে আশ্রমে?



চুপ করে ছেলের এইসব প্রশ্ন শুনতেন মা। ভেতরটা তাঁর কেঁদে উঠত। কিন্তু মুখ তিনি খুলতেন না। জানার আগ্রহ নিয়ে যখন ছেলের জিদ চেপে যেত মাথায়, শুধু বলতেন—সময়ে সবই জানতে পারবে, বাবা।

ঠিক সময় যখন এল, ঋষির মুখ থেকে সবই শুনলেন সগর। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল ভেতরের ক্ষাত্রতেজ। বিশ্বাসঘাতকদের এমন শাস্তি দিতে হবে, শুধু এ জন্মে নয়, জন্মান্তরেও তারা ভুলতে পারবে না।

করলেনও তাই। সগরের সুনিপুণ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে নির্মূল হয়ে গেল তালজঙ্ঘ আর হৈহয় বংশ। ভীত শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পলহবেরা প্রাণ ভয়ে ছুটল সগর রাজার কুলগুরু দেব বশিষ্ঠের কাছে। লুটিয়ে পড়ল তারা তাঁর পায়ের তলায়—দেব, আমাদের রক্ষা করুন। আশ্বাস দিলেন বশিষ্ঠ। ঠেলতে পারলেন না গুরুর আদেশ। প্রাণে তাদের মারলেন না বটে, কিন্তু তাদের আকার দিলেন বিকৃত করে, যা বংশ পরম্পরায় তাদের স্বাভাবিক আকৃতি হিসেবেই দাঁড়িয়ে গেল। শকদের অর্ধেক মাথা, কাম্বোজ, যবন আর পারদদের পুরো মাথা কামিয়ে, দাড়ি রাখার ঘোর বিরোধী পলহবদের দাড়ি রাখতে বাধ্য করে শুধু তাড়িয়েই দিলেন না, ধর্মচ্যুতও করে ছাড়লেন। আর কোণসর্প, মাহিষক, দর্ব, চোল, কেরল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের দল, যারা ভেতরে ভেতরে ইন্ধন যোগাচ্ছিল বশিষ্ঠের নির্দেশে, তাদের ওপর সগর এমন চাপ সৃষ্টি করলেন যে তারা বাধ্য হল সগরের বশ্যতা স্বীকার করতে।

নির্মূল শত্রুকুল। পিতৃ-সিংহাসন হয়েছে পুনরুদ্ধার। সেই সিংহাসনে বসেছেন এবার রাজা সগর। পিতা বাহুর মতই সসাগরা সপ্তদ্বীপের অধিপতি এখন তিনি। সকলেই এখন তাঁর বশ্য। তাঁর সুশাসনে সকলেই তৃপ্ত। দৃষ্টিতে সজাগ, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, ন্যায়-নীতিতে অসাধারণ, ধর্মানুশীলনে অনন্য রাজা সগরের শাসনে দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকল পৃথিবী।

কিন্তু নিজের ঘরের দিকে যখনই তাকান, খারাপ হয়ে যায় তাঁর মন। দুই মহিষী তাঁর। একজন কশ্যপ-কন্যা সুমতি, আর একজন বিদর্ভরাজ কন্যা কৈশিনী। [কূর্মপুরাণের মতে কিন্তু এই দুই মহিষীর নাম প্রভা আর ভানুমতী। দুজনেই ছিলেন অগ্নি-উপাসিকা এবং অগ্নিই তাঁদের যাবতীয় প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।] কুলে-শীলে-ধর্মাচরণে দুই রানীই ছিলেন সগর রাজার যোগ্য সহধর্মিণী। কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁদের কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় সকলেই ছিলেন মনোকষ্টের মধ্যে। যখনই এই নিয়ে আক্ষেপ করেন কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে, শুধু একটাই পরামর্শ তাঁর—প্রাণঢালা ভক্তি দিয়ে ঋষিদের সেবা করে যাও। তাহলেই তোমরা অভীষ্ট লাভ করবে। দূরদর্শী ঋষি বশিষ্ঠের নির্দেশ। অকুণ্ঠচিত্তে তাঁরা তাই করে যেতেন।

একদিন রাজপ্রাসাদে এলেন জটাজুটধারী এক মুনি। যেখানে যত আশ্রম ও তপোবন আছে, আছেন মুনি-ঋষি, তাঁদের প্রায় সকলকেই দেখেছেন, চিনতেন রাজা। কিন্তু এঁকে কোথাও দেখেছেন বলে মনেও আনতে পারলেন না। তবুও অকুণ্ঠচিত্তে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। সমাদরে সৎকার করলেন তাঁর। পরিতৃপ্ত মুনি। বললেন সগর রাজাকে—রাজন্! যদি তোমার কোন অভিলাষ থাকে, আমায় বল। আমি তা পূরণ করব।

রাজার এখন শুধুমাত্র একটাই অভিলাষ। সেই নিবেদনই রাখলেন অজ্ঞাতপরিচয় সেই মুনির কাছে।

শুনে মুনি বললেন—রাজন্! তোমার অভিলাষ আমি পূরণ করব। তোমার এক মহিষীর গর্ভে হবে একটি সন্তান, আর অপর মহিষীর গর্ভে হবে ষাট হাজার পুত্র।

অনেক ভেবে-চিন্তে প্রভা নিবেদন রাখলেন একটি সন্তানের। সুতরাং ষাট হাজার পুত্রের জননী হতে হয় ভানুমতীকে।

মুনি ঋষিদের বাক্য লঙ্ঘন হবার নয়। যথা সময়ে প্রভার হল একটি সন্তান। নাম রাখা হল তার অসমঞ্জ। আর ভানুমতি প্রসব করলেন একটি লাউ। মন খারাপ হয়ে গেল ভানুমতীর। মন খারাপ হল রাজা সগরের। কোথায় রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে ষাট হাজার পুত্র, আর কোথায় একটা লাউ! সঙ্গে সঙ্গে হল আকাশবাণী: অবহেলা করো না লাউটিকে। যত্ন নিয়ে গরম জলে তার পরিচর্যা করো। ওর প্রতিটি দানা থেকে জন্ম নেবে তোমার এক একটি পুত্র।

অগত্যা তাই করতে লাগলেন রাজা আর রাজমহিষী। কালক্রমে সেই লাউ-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক এক করে ষাট হাজার পুত্র। [বিষ্ণুপুরাণ মতে ঔর্ব ঋষিই দূর করেছিলেন রাজার মনোকষ্ট। তাঁর আশীর্বাদে সুমতি হয়েছিলেন অসমঞ্জের জননী, আর কৈশিনী ষাট হাজার পুত্রের।]

শিশু সন্তানদের কলকাকলিতে ভরে উঠল রাজপ্রাসাদ। দূর হয়ে গেল রাজা আর রাজমহিষীর যাবতীয় অবসাদ। অপরিসীম স্নেহ-যত্নে বড় হয়ে উঠতে লাগল পুত্রেরা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজা সগরের। এত কষ্ট করে যে পুত্র তিনি লাভ করলেন, যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি তৃপ্তি পেতে চান, মনকে হাল্কা করতে চান শাসনের গুরুভার থেকে, শেষে এ কি হল তাঁর

পুত্রেরা ! বড় ছেলে অসমঞ্জ, কত ভরসাই না ছিল তার ওপর। যথাসময়ে বিবাহও দিয়েছেন তার। অংশুমান নামে এক সন্তানের পিতাও সে হয়েছে। তবু কেমন করে স্বভাবে হল এমন খল, এমন নির্মম ! দেখে দেখে বিশেষ করে রাজ্যের যত শিশু সন্তান, তাদের হত্যা করতে পারে নির্বিচারে। হতে পারে, এমন অত্যাচারী, নির্দয় ! শান্তিপ্রিয় প্রজাদের মনে এমন করে তুলতে পারে হাহাকার ! আর কি আশ্চর্য ! বাকি ষাট হাজার ছেলেও কি করে চলেছে দাদার অনুকরণ !

একের পর এক অভিযোগ আসতে থাকে রাজা সগরের কাছে। খুবই বিব্রত, সেই সঙ্গে বিরক্তও হয়ে উঠতে থাকেন তিনি। ইতিমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ করার সঙ্কল্প নিয়েছেন। প্রস্তুতি চলেছে তার। আর এই সময়েই ছেলেরা তাঁর এ কি কাণ্ড বাধিয়ে চলেছে চারদিকে ? তাছাড়া পুত্রতুল্য প্রজাদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার যে দায়িত্ব নিয়ে তিনি রাজা, তা থেকে কি তিনি কর্তব্যচ্যুত হবেন ? ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রজাদের ওপর এই অত্যাচারের অভিযোগে যদি তিনি কান না দেন তাহলে কি রাজার যোগ্য মর্যাদায় তিনি থাকতে পারেন ? না, পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে প্রজাদের দিক থেকে কোনমতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। কই, তাঁর নাতি অংশুমান তো এমন নয়। কত করুণা আর কত দয়ার শরীর তার। আর তার বাবা, তারই বড় ছেলে অসমঞ্জ ! স্তব্ধ হয়ে যায় পিতৃস্নেহ। অংশুমানকে রাজা নেন কাছে টেনে, আর দূর করে দেন জ্যেষ্ঠ অসমঞ্জকে। অমন পুত্রের মুখ তিনি আর দেখতে চান না। বাকি ছেলেদের ? এইসব দেখে আশা করেন রাজা, ঔদ্ধত্য তাদের কমে আসবেই।

সুবিপুল অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ। সুসজ্জিত অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবী পরিক্রমায়। আর রাজা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করেছেন তাঁর সেই ষাট হাজার পুত্রকে।

এর আগে অনেকবারই রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন সগর। কিন্তু এবারের যজ্ঞের আয়োজন দেখে ভীত হয়ে উঠলেন দেবরাজ ইন্দ্র। যদি নির্বিবাদে রাজা সগর এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারেন তাহলে তাঁকে হারাতে হবে ইন্দ্রত্বের পদ; পরিবর্তে সগর রাজা হবেন ইন্দ্র। এত বড় সম্মানের আসন থেকে সরে যেতে হবে। এ কথা ভাবতে পারেন না ইন্দ্র। যেভাবেই হোক সগরের এই যজ্ঞ কিছুতেই তিনি নির্বিঘ্নে হতে দেবেন না।

জনপদের পর জনপদ রাজা সগরের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সসম্মানে চলেছে যজ্ঞীয় অশ্ব। পিছনে ষাট হাজার পুত্র। তারই ফাঁকে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র ঘোড়াটিকে চুরি করে রেখে এলেন রসাতলে। এত সজাগ দৃষ্টি সত্ত্বেও ঘোড়া চুরি গেছে। মহা চিন্তায় পড়ল সগর সন্তানেরা। দেবলোক থেকে পৃথিবীর প্রতিটি আনাচে-কানাচে তারা খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও মিলল না অশ্ব। এমনি সময় হল আকাশবাণী : তোমাদের 'যজ্ঞের ঘোড়া বাঁধা আছে পাতালে। সেখানে গেলে দেখতে পাবে।'

ঘোড়া না নিয়ে তো আর ফেরা যায় না। সগর সন্তানেরা তাই স্নান-খাওয়া ভুলে খুঁড়তে শুরু করে দিল পৃথিবীর মাটি। বের করতে লাগল পাতালে যাবার পথ। খুব যখন খিদে পেত, শুকনো মাটিই মুঠো মুঠো খেয়ে পেটের জ্বালা মেটাত। এইভাবে যখন নেমেছে তারা বেশ কিছু নিচে, টনক নড়ল পাতাল-বাসিন্দা রাক্ষসদের। সর্বনাশ ! ওরা সবাই মিলে এসে পড়লে ওদের আর রক্ষে থাকবে না। অথচ দেবরাজ ইন্দ্র তাদেরই জিম্মায় রেখে গেছেন ঘোড়া। এখন উপায় ?

বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তারা দেখতে পেল মহাজ্ঞানী কপিল মুনিকে। এক সময় দেবতাদের এক বিশেষ কাজ শেষ করার পর তিনি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কিছুকাল তাঁর নিশ্চিন্তে ঘুমোবার প্রয়োজন হয়েছিল। সে রকম নিভৃত স্থান না ছিল দেবলোকে, না ছিল মর্ত্যে। তাই দেবতাদের নির্দেশে পাতালেই এসে তিনি শয্যা পেতেছিলেন। শর্ত ছিল, কোন কারণে যদি তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, আর যদি চোখের পাতা খোলেন, তাহলে প্রথমেই যার দিকে চোখ পড়বে সেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। রাক্ষসেরা জানত এই শর্ত। তাই, তারা করল কি—নিজেদের বাঁচাবার জন্যে ঘোড়াটিকে এনে চুপি চুপি বেঁধে রেখে গেল কপিল মুনির মাথার কাছে।

ইতিমধ্যে সগর পুত্রেরা পাতালে পৌঁছে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পেল তাদের ঘোড়াটিকে। মাথার কাছে বেঁধে রেখে শুয়ে আছে এক আধাউলঙ্গ মানুষ। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠল তারা। প্রথমেই বাঁধন খুলে নিল ঘোড়াটিকে। তারপর সেই



মানুষটিকে চোর মনে করে তাঁকে মারতে লাগল লাথির পর লাথি। একে তো ছেলেগুলো ছিল স্বভাবে উদ্ধত, তাছাড়া এই মানুষটি যে কে, কতখানি শক্তিমান, তার কোন ধারণাই ছিল না তাদের। নিদ্রার ব্যাঘাত কপিল মুনির ? চোখ খুলতেই সামনে সগরের ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এদিকে কিছুই জানতে পারলেন না রাজা সগর। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস। বছরের পর বছরও কেটে গেল। বাড়তে থাকে রাজার বয়স। বাড়তে থাকে উৎকণ্ঠা। অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। কোথায় গেল তারা ? এমন সময় স্বয়ং নারদ এসে হাজির হলেন সগরের কাছে। যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন সগর দেবর্ষিকে। তারপর শুনলেন তাঁর ছেলেদের পরিণতির কথা। কিন্তু কোন শোক প্রকাশ করলেন না। মনে মনে ভাবলেন, ঔদ্ধত্যের সমুচিত সাজাই তারা পেয়েছে। কিন্তু অশ্ব ফিরে না এলে যে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না, হবেন ব্রতচ্যুত।

ডাকলেন সগর, রাজ্যের উত্তরাধিকারী নাতি অংশুমানকে। বললেন—বৎস ! তুমি সৎ, ধার্মিক। যাও মুনিবরের কাছে। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিও তাঁকে। আর সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এস যজ্ঞের ঘোড়া।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কপিল মুনি বালক অংশুমানের ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। ফিরিয়ে দিলেন ঘোড়া। আশীর্বাদ জানালেন বালককে।

কাকাদের এই পরিণতি কিন্তু শেল হয়ে বিঁধেছিল অংশুমানের বুকে। থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল অংশুমান—মুনিবর ! কিভাবে আমার পিতৃব্যরা এই মহাপাতক থেকে উদ্ধার পাবে ?

দিব্যদর্শী কপিল বললেন—তাদের উদ্ধার করবে তোমারই বংশধর, তোমারই নাতি ভগীরথ।

ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলেন অংশুমান। তুলে দিলেন পিতামহের হাতে। সমাধা হল রাজসূয় যজ্ঞ। সগর রাজার ব্রত শেষ হল।

এরপর কেটে গেছে আরো অনেক বছর। দীর্ঘজীবী রাজা সগরের বয়সও হয়েছে অনেক। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ এসেছে প্রাসাদ আলো করে।

সবেমাত্র বালক তখন ভগীরথ। শুনল পিতামহদের অপমৃত্যুর কাহিনী। দুলে উঠল তার মন। পিতৃ-পিতামহের যদি মঙ্গলই করা না গেল, তাহলে পুত্র হয়ে জন্মে লাভ কি ?

ভগীরথ গেল রাজা সগরের কাছে। তুলে ধরল প্রশ্ন—পিতামহদের উদ্ধার করার কোন উপায় নেই ?

—আমি তো বলতে পারব না ভাই। বলতে পারেন একমাত্র মুনিবর কপিল। তুমি তাঁর কাছে যাও। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। সস্নেহে জবাব দেন রাজা সগর।

কালবিলম্ব না করে বালক ভগীরথ এল পাতালে কপিল মুনির কাছে। রাখল সবিনয়ে সেই একই প্রশ্ন—মুনিবর ! পিতামহদের উদ্ধার করার কি কোন উপায় নেই ?

বালকের দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকান কপিল মুনি। বলেন—আছে। উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র পতিতপাবনী গঙ্গা। তুমি যদি তাঁকে এখানে আনতে পার তাহলে তোমার পিতামহদের মুক্তি তো হবেই ; তুমিও হবে কীর্তিমান।

—কোথায় তিনি ? কোথায় গেলে তাঁকে পাব ? আকুল প্রশ্ন ভগীরথের।

—তিনি থাকেন কৈলাসে শিবের জটামধ্যে। দেবাদিদেবকে যদি তপস্যায় তুষ্ট করতে পার, তবেই তুমি তাঁকে আনতে পারবে।

শোনামাত্রই ভগীরথ চলে গেল হিমালয়ে। বসল মহাদেবের ধ্যানে। মনে মুখে তার শুধু একটাই কথা—হে শম্ভু ! হে শঙ্কর ! আমি বালক মাত্র। কিভাবে তোমার স্তব করতে হয়, তা তো জানি না। আমার পিতৃপুরুষেরা অপমৃত্যুর কবলে। তাঁরা তো আমারই পূর্বপুরুষ। আমি তো তাঁদেরই বংশধর। হে মহাদেব ! আমি যে তাদের উদ্ধার করতে চাই। পুত্রের কর্তব্যকর্ম করতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমাকে কৃপা কর।

নির্মলচিত্ত বালকের এই আকুল আহ্বানে স্থির থাকতে পারলেন না মহাদেব। আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। বললেন—বালক ! তোমার সরলতায় প্রীত আমি। বল, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

—মাতৃস্বরূপা দেবী গঙ্গাকে আমায় দিন। এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

—বেশ, আমি দিলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যেতে গেলে কঠোর তপস্যা করতে হবে, বালক।

মহাদেবের কথামত আবার সুকঠোর তপস্যা শুরু করল ভগীরথ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—নিশ্চল। প্রীত হলেন গঙ্গা তার একাগ্রতায়। আবির্ভূত হয়ে বললেন—পুত্র ! তোমার নিষ্ঠায় আমি সন্তুষ্ট। তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমি তোমায় অনুসরণ করে যাব তোমার গন্তব্যস্থলে।

মহা উল্লসিত হয়ে উঠল ভগীরথ। আগে আগে শঙ্খধ্বনি করতে করতে পথ দেখিয়ে ছোটে ভগীরথ আর পিছনে উচ্ছল তরঙ্গে হিমালয় থেকে নেমে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গঙ্গা এলেন পাতালে যেখানে কপিল মুনির দৃষ্টিতে ভস্মীভূত হয়েছিলেন তাঁর পিতৃপুরুষেরা। ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গা সেই স্থান। উদ্ধার পেলেন রাজা সগরের সেই ষাট হাজার পুত্র। সেই থেকে গঙ্গার আর এক নাম হল ভাগীরথী।

[ব্রহ্মপুরাণে আছে, ভগীরথের অনুরোধে গঙ্গা পাতালে এসে তার পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করে সুমেরু পর্বতকে প্লাবিত করে ফিরে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। সেখান থেকে আবার আর এক ধারায় বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরভাগ সমেত ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে ভাগীরথী নামে প্রবাহিত হয়ে পূর্বসাগরে মিশে গেছেন।]



গৌতমের সাধনা

বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিয়ে ভারতবর্ষকে শস্য-শ্যামল করে গঙ্গার যে ধারা প্রবাহিত হয়ে মিশে গেছে পূর্বসমুদ্রে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, তার

নাম হল ভাগীরথী। কেননা, অনেক তপস্যায় ভগীরথ তাঁকে এনেছিলেন এদিকে। তেমনি গঙ্গার আর এক ধারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে হিমালয় থেকে নেমে বয়ে গেছে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে। নাম তার গৌতমী গঙ্গা বা গোদাবরী। কেননা গৌতমই গঙ্গাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ঐদিকে সুকঠোর তপস্যাবলে। এদিকে এক ক্ষত্রিয় বীর, আর ওদিকে এক সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

অনেক তপস্যা করে হিমালয়-কন্যা উমা স্বামীরূপে পেয়েছেন মহাদেবকে। তাই নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন তিনি তাঁকে। মহাদেবও যে তাঁকে কিছু কম ভালবাসেন তা নয়। যখন যেখানেই যান না কেন, সঙ্গে তাঁর উমা। তবুও গঙ্গা দেবীর আকর্ষণ যেন তাঁর কাছে ছিল আরো বেশি। এক মুহূর্তও তিনি থাকতে পারতেন না গঙ্গাকে ছেড়ে। এতে দারুণ ক্ষুণ্ণ হতেন উমা, ক্ষুব্ধ হতেন ক্ষোভ জাগত মহাদেবের ওপর। কি এমন আছে গঙ্গার যে মহাদেব তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারেন না ? মনে মনে রাগে গরগর করতেন উমা, আর ফিকির খুঁজতেন কিভাবে সতীনকে মহাদেবের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। সর্বজ্ঞ মহাদেব। কেউ মুখে কিছু না বললেও সকলের মনের কথাই তিনি শুনতে পেতেন। কে কি ভাবছেন, মুখ দেখে অনায়াসেই তিনি তা বুঝতে পারতেন। কিন্তু কাউকে চট করে কিছু বলতেন না। গঙ্গার ওপর উমার রাগ, সেই সঙ্গে তাঁর ওপর উমার অভিমান তাই অবিদিত ছিল না তাঁর। চোখের সামনে থাকলে পাছে উমার রাগ যায় আরো বেড়ে, তাই মহাদেব করলেন কি, গঙ্গাকে লুকিয়ে রাখলেন নিজের সুবিশাল জটার মধ্যে। কিন্তু, উমাও কিছু কম যান না। দিন কয়েকের মধ্যেই মহাদেবের চালাকি তিনি ধরে ফেললেন, আর ক্ষোভে দুঃখে-হতাশায় এমনি অস্থির হয়ে উঠলেন যে, থাকতে না পেরে সরাসরি তিনি তিরস্কার করলেন মহাদেবকে। কিন্তু যাঁর ভেতর মান-অপমান বোধই নেই, কি হবে তাঁর কাছে উমার এই তিরস্কার ! হাসি হাসি মুখে শুনলেন এক কান দিয়ে, আবার বের করে দিলেন আর এক কান দিয়ে। তারপর উমার সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্তা বললেন যে, উমার মন জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কতক্ষণ ? কিছুকাল পরে আবার যে-কে সে-ই। সতীন গঙ্গার ওপর বিদ্বেষ, স্বামী মহাদেবের ওপর ক্ষোভ আবার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারতে শুরু করল উমাকে। প্রধানা সহচরী জয়া। তাঁর কাছে নিরালায় বসে কাঁদেন উমা। কিন্তু চোখের জলে কি আর সমস্যা মেটে ?

অনেক ভাবলেন উমা। শেষে ঠিক করলেন, দুই ছেলে তাঁর কার্তিক আর গণেশ—যথেষ্ট সাবালক। তাদের কাছে মনের কথা বলতে আপত্তি কি ? ভেবে, দুজনকেই ডেকে বললেন সব কিছু।

কার্তিক ছেলেটি বড় একরোখা আর মারকুটে। লড়াই করা ছাড়া আর কিছুই সে বড় একটা বোঝে না। সেদিক থেকে, লোকে যে যাই বলুক, গণেশ ফন্দি আঁটতে আর কৌশলে ফাঁদে ফেলতে খুব ওস্তাদ। এমনিতে গণেশ খুবই নিরীহ, গোবেচারা। কিন্তু মাথায় কোন কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপি চুপি কাজ করে যায় সে।

পাছে কার্তিক কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসে, তাই শেষে গণেশকেই ডেকে বললেন, গঙ্গাকে এখান থেকে বিদেয় করার ভার তোমাকেই নিতে হবে। যদি তুমি না পার, তাহলে আমি সকলকে ফেলে আবার হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় বসব।

মা বাবার ওপর অভিমান করে চলে যাবে, আর সাবালক ছেলে হয়ে তারা তাই চেয়ে চেয়ে দেখবে শুধু, তা কি কখনো হতে পারে ?

গণেশ বলল, না মা। তা হবে না। তুমিই বল, আমায় কি করতে হবে। কি করলে সৎমা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে।

উমা বললেন— একটা উপায় আমি জানি। তপস্যায় তুষ্ট শঙ্কর। কোন সৎ ব্রাহ্মণ যদি কঠোর তপস্যায় মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে ভিক্ষে চায় পৃথিবীতে নিয়ে যাবার জন্যে, তাহলে মহাদেব তার প্রার্থনা মঞ্জুর না করে থাকতে পারবেন না। তবে বাবা, সেই ব্রাহ্মণকে অবশ্যই সত্যনিষ্ঠ হতে হবে আর তাঁকে সুকঠিন তপস্যা করতে হবে।

—ওঃ, এই কথা? বললেন গণেশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। তবে তার আগে আমরা দুভাই একবার বাবার কাছে গিয়ে যদি বুঝিয়ে বলি…।

—না, বাবা। বললেন উমা, তাতে কোন লাভ হবে না। আমি নিজেও তো কিছু বলতে কসুর করি নি। কোন ফল হয়েছে কি ?

এই সময় পৃথিবীতে শুরু হল অনাবৃষ্টি। একটানা চোদ্দটা বছর। বৃষ্টির ফোঁটা তো দূরের কথা, আকাশের বুকে কেউ ছিটে-ফোঁটা মেঘও দেখতে পেল না। জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে গেল চারদিক। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। খাদ্যাভাব। যা-তা খেয়ে মানুষজন পড়তে



লাগল রোগের কবলে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মহামারী। জনশূন্য হয়ে যেতে লাগল জনপদের পর জনপদ। স্রষ্টার সৃষ্টি প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

সৃষ্টিই যদি লোপ পেয়ে যায়, তাহলে স্রষ্টার মনের অবস্থা কি হয় ? তিনি আবার উদ্যত হন সৃষ্টির কাজে। দেবগিরিতে আয়োজন করলেন বিশাল যজ্ঞের। এখানেই ছিল ঋষি গৌতমের আশ্রম। ব্রহ্মা দেখলেন, চতুর্দিকে যখন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধিতে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে, তখন এই ব্রাহ্মণের আশ্রমে তার কোন ছায়াই পড়ে নি। ফুলে-ফলে সুশোভিত আশ্রম, নেই কোন জলের অভাব। অবিরত নিশ্চিন্ত মনে যজ্ঞ করে চলেছেন গৌতম। আর এমন সুনিপুণ সে যজ্ঞ যে কারো সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। সেই দেবগিরিতেই ব্রহ্মা করলেন যজ্ঞ। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ব্রহ্মগিরি। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল গৌতমের নাম। দলে দলে আশ্রমবাসী মানুষজন আসতে লাগল তাঁর কাছে। সকলকেই

সমাদর করতেন তিনি। যে যা চাইত, তিনি তাকে তা-ই দিতেন। দেবলোকেও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল নিষ্ঠাবান তপস্বী গৌতমের।

গণেশের কানে পৌঁছতেই মাতৃ-আদেশের উপায় স্থির করে ফেলল গণেশ। ছুটে এল মা উমার কাছে। বললে, মা পেয়েছি। বাবার সঙ্গে আর বাদ-বিসম্বাদ না করে এই ব্রাহ্মণ গৌতমকে দিয়েই আমাদের কাজ হাসিল করাতে হবে। আমি চললাম। দেখি, কোন্ ফিকিরে তাঁকে এই কাজের ফাঁদে ফেলা যায়।

এই বলে গণেশ একজন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে হাজির হল গৌতমের আশ্রমে। সঙ্গে এল জয়া। সে-ও ছদ্মবেশে। এসে দেখল সত্যিই তুলনা নেই এই আশ্রমের। অতিথি মুনিদের সমাগমে গমগম করছে আশ্রম। কোন কিছুর অভাব নেই সেখানে। যাগযজ্ঞের বিরাম তো নেই-ই। গৌতম সেখানে সদানিষ্ঠ। তা ছাড়াও এত যে অতিথি, তাঁদের সকলের দিকেও কি সজাগ দৃষ্টি গৌতমের। কারো ঠিকমত সেবা হচ্ছে কিনা, কারো কোথাও কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা—সব কিছুর মধ্যে এটাও যেন তাঁর এক মুখ্য কর্ম।



আশ্রম প্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণবেশী গণেশ যখন এইসব নিরীক্ষণ করছে আর ভেবে অবাক হচ্ছে, একজন মানুষের পক্ষে এক সঙ্গে এতগুলো কাজ কি ভাবে করা সম্ভব, সেই সময়ে তাদের দিকে দৃষ্টি পড়ল গৌতমের। সঙ্গে সঙ্গে গৌতম তাদের সাদর আপ্যায়ন জানালেন আশ্রমে।

গণেশ এরই অপেক্ষায় ছিল। ঠিকই করে রেখেছিল আপ্যায়ন পাওয়ামাত্রই ঢুকবে আশ্রমে। খুঁজবে গৌতমের ছিদ্রপথ, তারপর করতে হবে কাজ হাসিল। তাই করল গণেশ। গৌতমের অতিথি হয়ে আশ্রমে প্রবেশ করল সে, আর দিন-রাত খুঁজে চলল, গৌতম হঠাৎ কোন অপকর্ম করে বসেন কিনা। অপকর্ম করলেই পাপ হবে। পাপ থেকেই তৈরি হয়ে যাবে কাজ হাসিলের হাতিয়ার।

দিনের পর দিন গেল। ইতিমধ্যে আশ্রমের অতিথি মুনিদের সঙ্গে বেশ ভাব-সাব জমিয়ে নিয়েছে গণেশ। সকলেই তাকে বেশ ভালবাসতে শুরু করেছে। মাস গেল। তার পরেও গেল আরো কয়েকটা মাস। অনেক চেষ্টা করেও গৌতমের কোন ছিদ্রপথই বের করতে পারল না সে। তবে কি কাজ হাসিল করা যাবে না ? মায়ের আদেশ লঙ্ঘন হবে ?

ভেবে ভেবে একটা উপায় স্থির করল গণেশ। বিঘ্ন সৃষ্টি করতে তার জুড়ি নাকি আর দ্বিতীয় নেই। সকলেই তাই তাকে 'বিঘ্নরাজ' বলে। সমীহ করে চলে, ঘাঁটায় না। আশ্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে গৌতমকে ফাঁদে ফেলতে হবে।

কোন কিছু ভণ্ডুল করার বুদ্ধি ভেবে বের করতে হয় না গণেশকে। চট করে এসে যায় মাথায়। এসেও গেল। অতিথি মুনিরা সকলেই তাকে ভালবাসে, তার কথা শোনে। এক সময় তাঁদের কাছে গিয়ে বসল গণেশ। একথা-সেকথার পর বলল তাঁদের—দেখ, আমরা অনেকদিন হল এখানে এসে আছি আর গৌতমের অন্ন ধ্বংস করছি। বসে বসে গৌতমকে এভাবে ব্যতিব্যস্ত করা কি ঠিক হচ্ছে ? চল, এবার এখান থেকে আমরা চলে যাই।

মুনিরা গণেশের কথায় না করতে পারল না। সত্যিই তো, কতদিন হয়ে গেল, এখানে এসে আছে তারা। আর গৌতম ! এতটুকু বিরক্তি নেই। হাসিমুখে সদা-সর্বদা তাঁদের পরিচর্যা করে চলেছেন। সত্যিই গৌতম কিছু না বললেও তাঁদের তো একটা বিবেক-বোধ থাকা উচিত। এতদিন ধরে একটা মানুষকে এইভাবে ব্যতিব্যস্ত করা ঠিক হচ্ছে না। গণেশ ঠিকই বলেছে।

সবাই মিলে এবার গিয়ে বলল গৌতমকে, এতদিন তো তোমার সঙ্গ করলাম গৌতম। এবার আমরা যাই।

শুনে যেন মনে খুবই কষ্ট পেলেন গৌতম। বললেন, কেন ? সেবায় কি কোন ত্রুটি হয়েছে ?

—না-না, সে কথা নয় গৌতম। তোমার কত কাজ। তার মাঝে আমরা মিছামিছি এখানে থেকে তোমাকে শুধু বিব্রতই করে চলেছি।

—ছিঃ ছিঃ ! ও কথা বলবেন না। আপনাদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। দয়া করে, আপনারা আমাকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

এরপর আর কি কোন কথা চলে ? থেকেই গেলেন মুনিরা। গণেশের প্রথম কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভাবল মনে মনে গণেশ—আশ্চর্য তো এই ব্রাহ্মণ ! এত অতিথিপ্রিয় ! কিন্তু আমিও বিঘ্নরাজ। ফাঁদে তোমাকে আমায় ফেলতেই হবে। তোমার মত ব্রাহ্মণকেই আমার দরকার। নইলে মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা হবে।

গণেশের মাথায় এবার খেলে গেল আর এক বুদ্ধি। কৌশলে গৌতমকে মহাপাতকের ভাগী করতে হবে। যাতে মুনিরা বিরূপ হয়ে ওঠে তাঁর ওপর।

নিভৃতে জয়াকে ডেকে বললে গণেশ, তুমিই পারবে আমার ফিকিরকে কাজে লাগাতে।

এবারে কি ফন্দী এঁটেছ ? জানতে চাইল জয়া।

—তোমাকে গাই গরুর বেশ ধরে গৌতমের ফসলের ক্ষেতে গিয়ে যেন ফসল নষ্ট করছ, এমন ভান করতে হবে। ফসল নষ্ট করছ দেখলেই গৌতম অবশ্যই ছুটে এসে তোমাকে লাঠি দিয়ে প্রহার করবে। তুমি সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে ঘুরে পড়বে, যেন মরে গেছ। তারপর, দেখ না কি কাণ্ডটা বাধাই। কিন্তু খুব সাবধান ! আমাদের এই ফিকির যেন কাক পাখিতেও টের না পায়। বুঝিয়ে বলল জয়াকে গণেশ।

আশ্রমের সীমানা পেরিয়েই বহুদূর বিস্তৃত গৌতমের শালিধানের ক্ষেত। হাওয়া ঢেউ খেলে যায় সেই সবুজ ফসলের ওপর দিয়ে। গৌতম নিজেই তারও দেখাশোনা করেন।

একদিন ফসলের ক্ষেতে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন বেশ সুন্দর একটি গাভী অনিষ্ট করে চলেছে ফসল। প্রায়ই গরু আসে, ক্ষেতে পড়ে। কিন্তু হাঁক-ডাক দিয়ে শুধু তাড়িয়েই দেন, গায়ে বড় একটা হাত তোলেন না কারো। গরুকে প্রহার করা যে মহাপাপ। সে দিনও গাভীটিকে দেখে প্রথমে অনেক তাড়াহুড়ি দিলেন কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ করল না দেখে বড় বড় কয়েকটা ঘাস তুলে যেই ছুঁড়ে মারলেন অমনি কাতর আর্তনাদ করে ক্ষেতের ওপরই লুটিয়ে পড়ল গাভী।

সেই আর্তনাদ কানে যেতেই আশ্রমে যে যেখানে ছিল ছুটে এল সবাই। এল গণেশও, কি হল ? কি হল ? সকলেই এসে দেখল, ক্ষেতে একটা মৃত নধর গাভী। সামনে বিহুল গৌতম। হাতে তাঁর তখনো কয়েকটা লম্বা ঘাস।

বুঝতে কারো বাকি রইল না যে গৌতমের প্রহারেই গাভীর ঐ দশা হয়েছে। গাভীহত্যা মহাপাপ ! এরপর কি আর গৌতমের অতিথি হয়ে থাকা চলে, না, তাঁর দেওয়া অন্ন গ্রহণ করা চলে ?

একযোগে মুনিরা গৌতমকে যাচ্ছেতাই করে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই তাদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন গৌতম, যেন বাজ পড়া গাছ। কাতর অনুরোধ জানালেন, দোহাই আপনাদের। দয়া করে আমাকে এই মহাপাপের মধ্যে একা ফেলে রেখে চলে যাবেন না আপনারা। কিভাবে আমি এই মহাপাতক থেকে উদ্ধার পাব আমায় বলুন। আমি তাই করব। আপনাদের সেবা করার সুযোগ থেকে আমাকে দয়া করে বঞ্চিত করবেন না।

চতুর্দিকে বেধে গেল হৈ-হট্টগোল।

এরই মাঝে এগিয়ে এল ব্রাহ্মণবেশী গণেশ। ভেতরে খুশির আমেজ। মুখে কিন্তু সহানুভূতি।

মুনিদের উদ্দেশ করে বলল সে—আপনারা এত চেঁচামেচি করছেন কেন ? গাভীটা সত্যিই মরে গেছে, না বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছে, আপনারা কি সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন ? তাছাড়া, এ আপনাদের কেমনতর আচরণ ? এতদিন ধরে যাঁর সেবা খেলেন, অন্নগ্রহণ করলেন, যেভাবেই হোক, তিনি আজ একটু বিপদে পড়েছেন, তাঁর জন্য আপনাদের মনে কি একটু সহানুভূতিও জাগছে না ?

যেন মোক্ষম ওষুধ। মুনিদের চেঁচামেচি গেল থেমে। উঠে দাঁড়ালেন গৌতম।

বেশ গম্ভীর ব্রাহ্মণবেশী গণেশ। বললেন—গৌতম গাভীকে মেরে পাপ করেছেন ঠিকই। আর তার জন্যে প্রায়শ্চিত্তও করতে তিনি রাজি। এখন আপনারা যদি আমার ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন, যদি মনে করেন, আমি এই পাপের ঠিক ঠিক প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে পারব, আর গৌতম যদি তা করতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি বলি।

সকলেই একবাক্যে সম্মতি জানাল।

তখন গণেশ বললেন—আমরা শুনেছি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে যে জল ছিল তা অতীব পবিত্র। তারই একটি ধারা গঙ্গারই অংশ আছেন মহাদেবের জটার মধ্যে। গৌতম যদি সেই জলধারা সেখান থেকে এখানে নিয়ে এসে এই স্থান ধুইয়ে দিতে পারেন তাহলে তাঁর সব পাপ দূর হয়ে যাবে। আর আমাদেরও এখানে থাকার কোন অসুবিধে হবে না।

মুনিরা সকলেই একবাক্যে সমর্থন জানালেন গণেশকে। গৌতমও রাজি হলেন। কাজটা খুবই দুরূহ। কিন্তু মহাপাতক থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তা তাঁকে করতেই হবে।

প্রথমটায় এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন গৌতম যে ভাববার অবকাশ পান নি, সামান্য ঐ প্রহারে কি ভাবে গাভীর মৃত্যু হতে পারে। সব হৈ-হট্টগোল থেমে যেতে মহামুনি গৌতম বসলেন ধ্যানে। ধ্যানযোগে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। মনটা হাল্কা হল। তাহলে গোহত্যা হয় নি, আর তার জন্যে কোন পাপও হয় নি তাঁর। তবুও এই গুরু দায়িত্বের বোঝা নিলেন স্বেচ্ছায়। আর কিছু না হোক, ঐ পবিত্র জলধারায় পৃথিবীর মঙ্গল হবে। তাছাড়া সতীনকে সরিয়ে আনতে পারলে গৌরীও সন্তুষ্ট হবেন।

এরপর ব্রহ্মগিরি থেকে গৌতম এলেন কৈলাসে। শুরু করলেন একমনে হর-গৌরীর স্তুতি। সন্তুষ্ট ভগবান শঙ্কর সপরিবারে আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। বললেন—গৌতম, তোমার স্তবে আমি তুষ্ট। বল, তুমি কি চাও।

সপরিবার আশুতোষকে দেখে পুলকিত গৌতম বললেন—আমার স্তবে যদি আপনি তুষ্টই হয়ে থাকেন, তবে আপনার জটার মধ্যে যে গঙ্গা আছেন, তাঁকে আমায় দিন।

একটু ভেবে নিলেন সদাশিব। তারপর মৃদু হেসে বললেন—পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যই যখন তোমার এই প্রার্থনা, তখন গঙ্গাকে তোমায় দিলাম। তুমি নিয়ে যাও।

গৌতমও মহা উৎসাহে কৈলাস থেকে সুদীর্ঘ নানা পথ অতিক্রম করে গঙ্গাকে নিয়ে এলেন প্রথমে ব্রহ্মগিরিতে। আকাশ থেকে হল পুষ্পবৃষ্টি। দেব-ঋষি ব্রাহ্মণেরা গৌতমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। সতীনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন উমা।

এদিকে ব্রহ্মগিরিকে ধুইয়ে দিয়ে গঙ্গা বললেন গৌতমকে—গৌতম, তোমার মহাপাতকের ক্ষেত্রকে তো আমি পবিত্র করেছি। এবার আমি ফিরে যাব কৈলাসে। তা না পারলে হয় ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, নয়তো রসাতলে।

সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসলেন গৌতম—সে কি কথা মা ! ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্যই আমি ভগবান শঙ্করের কাছে আপনাকে প্রার্থনা করেছিলাম। তিনিও সেই উদ্দেশ্যেই আপনাকে আমায় দান করেছেন। আপনি ফিরে গেলে আমার যে মিথ্যাচার হবে।

গৌতমের এই বিনয়সুলভ কথায় খুবই প্রীত হলেন গঙ্গা। ফিরে আর যাওয়া হল না তাঁর। বিন্ধ্যের দক্ষিণ ভাগ প্লাবিত তো করলেনই, তার ওপর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে ছড়িয়ে পড়লেন বিভিন্ন ধারায়।

[ব্রহ্মপুরাণে আছে, সৃষ্টি-পালক বিষ্ণু বলির দর্প চূর্ণ করার পর ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুর জল দিয়ে বিষ্ণুর চরণ ধুইয়ে দিয়েছিলেন। ভগবান শঙ্কর সেই জল সুপবিত্র করে দিয়েছিলেন। সেই চরণধোয়া জল পর্বত-চূড়ায় পড়ে দক্ষিণ-উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক দিয়ে চার ভাগে এসে পড়েছিল পৃথিবীতে। এর মধ্যে দক্ষিণ দিকের ধারা মহাদেব ধারণ করেছিলেন জটায়। পশ্চিম দিকের ধারা ফিরে গিয়েছিলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, আর উত্তর দিকের ধারা বিষ্ণু এবং

পূর্বদিকের ধারা দেবতা ও ঋষিরা গ্রহণ করেছিলেন। গৌতম মহাদেবের জটা থেকে এই দক্ষিণ ধারাটিকে যখন নিয়ে এলেন, গঙ্গা তখন নিজেকে তিন ভাগে ভাগ করলেন: এক ভাগ স্বর্গে—আকাশগঙ্গা, এক ভাগ পৃথিবীতে, আর একভাগ রসাতলে। গঙ্গা নিজেকে মূল তিন ভাগে ভাগ করে প্রবাহিত হলেন পনেরটি ধারায়: স্বর্গে চারটি ধারা। পৃথিবীতে সাতটি ধারা, আর রসাতলে চারটি ধারা, এইভাবে ত্রিভুবনকে গঙ্গা করলেন সমৃদ্ধ।]



কপোত কপোতী ও ব্যাধ সংবাদ

সেই দেবগিরি, যেখানে ব্রহ্মা নতুন পৃথিবী সৃষ্টির জন্য যজ্ঞ করেছিলেন, এক সময় সেখানে থাকত এক ব্যাধ। দেবগিরির আরেক নাম ছিল ব্রহ্মগিরি। আবলুস কাঠের মত ছিল তার গায়ের রঙ। গাট্টা-গোট্টা। চোখ দুটো দারুণ কুটিল, আর স্বভাবেও ছিল অসাধারণ নিষ্ঠুর। যেমন নিষ্ঠুর ছিল ব্যাধ নিজে, তেমনি তার ছেলে-মেয়েরা। পশুপাখি তো শিকার করতই। সাধারণ মানুষজন, এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীদেরও রেহাই ছিল না তাদের হাত থেকে।

একদিন সেই ব্যাধ গেল শিকারে। ভাগ্যও সেদিন তার খুবই ভাল। শিকার মিলল অনেক। জাল ভর্তি হয়ে গেল পাখি আর পাখিতে। পশুও হত্যা করল বেশ কয়েকটা।

শিকার করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল অনেকখানি। যেমন পেয়ে গেছে খিদে, জলের জন্যও তেমনি প্রাণ ছটফট করতে শুরু করেছে। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ফেরা যাক—এই ভেবে সে ফিরল নিজের আস্তানার পথে। কিন্তু বনের মধ্যে এমনি গোলকধাঁধায় পড়ল যে পথ গেল হারিয়ে। খিদে তেষ্টায় প্রাণ তার যত ছটফট করে ওঠে, ততই সে যেন আরো পড়ে যায় ধাঁধার মধ্যে। পরিচিত বন, তবু বেরিয়ে আসার পথ আর খুঁজে পায় না।

বোশেখ মাস। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। আকাশ ঢেকে গেল সিঁদুরে মেঘে। সোঁ-সোঁ করে এল কালবৈশাখী। কি ঝড়! কি ঝড়! গাছপালাগুলো বুঝি ভেঙেই পড়ে তার ঘাড়ে। গাছ থেকে পাতাগুলো খসে যেন তীরের মত এসে বিঁধতে লাগল তার গায়ে। নামল বৃষ্টি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে যেন এক একটা বর্শার ফলা। পথ গেল আরো গোলমাল হয়ে। খিদে, তেষ্টা, ঝড়ের দাপট, তার ওপর আবার এই জলের ঝাপটা! খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল ব্যাধ। আপাতত মাথা গোঁজার মত একটা জায়গা না পেলে, এত শিকার বৃথাই যাবে—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভোগ আর করা যাবে না। তাই ব্যাধ এবার খুঁজতে শুরু করল মাথা বাঁচাবার মত একটু আড়াল।

খুঁজতে খুঁজতে ব্যাধের চোখে পড়ল একটা গাছ। কি বিশাল তার গুঁড়ি! সব গাছ ছাড়িয়ে তার মাথা কোথায় যেন উঠে গেছে কোন ওপরে! পাতায় পাতায় ভরা ঘন ডালপালা যেন থাকে থাকে সাজানো। এই ঝড়-ঝাপটায় যেখানে সব গাছপালা নুয়ে পড়ছে, ব্যাধ দেখল, এই গাছটার গায়ে যেন কোন আঁচড়ই লাগে নি। বেশ নিরাপদ আশ্রয়। ব্যাধ সেই গাছের তলাতে আশ্রয় নিল। এক কাঁধ থেকে মরা পশু, অপর কাঁধ থেকে পাখির জাল নামিয়ে রেখে হেলান দিয়ে বসল গাছের গুঁড়িতে। এদিকে সন্ধেও হয়ে গেছে। ক্লান্ত ব্যাধ বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই গাছে আরো সব পাখিদের সঙ্গে থাকত এক কপোত (পায়রা)। দুপুরের একটু পরেই তার স্ত্রী কপোতী বাসা ছেড়ে বেরিয়েছিল বাইরে। বাসায় ছিল কপোত একা। সন্ধে গেল, রাত এল। কপোতী ফিরল না দেখে খুব চিন্তা হল কপোতের মনে। তাই তো, এই ঝড় জল, তার ওপর রাত হয়ে গেল, না জানি কোথায় সে। ভেবে আকুল হল কপোত—তার কোন বিপদ হয় নি তো? সময়মত ফিরে এল না কেন? এমন তো কখনো ঘটে নি। আজ কেন এমন হল! যদি তার কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমারও আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই!



বাসায় বসে বসে যখন এইভাবে আকুলি-বিকুলি করছে কপোত তখন হঠাৎ যেন তার কানে গেল কপোতীর গলা—আমি জানি, ঠিক সময়ে না ফিরলে তুমি উতলা হয়ে পড়বে। কিন্তু কি করব বল? ব্যাধ যে আমায় ধরে জালে পুরেছে।

শুনে চমকে উঠল কপোত—কোথায়? কোথায় তুমি?

—এই গাছের নিচে। জানাল কপোতী।

চট করে কপোত তখন নেমে এল গাছের নিচে। দেখল ঠিকই তো। তার কপোতী জালের মধ্যে, আর ব্যাধ গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে।

কপোতীর জন্য ছটফট করে উঠল কপোতের প্রাণ। বললে—দেখ, ব্যাধটা মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। আমি এই ফাঁকে জালের মুখটা খুলে দিচ্ছি। তুমি বেরিয়ে এস!

—না, না। অমন কাজ কোরো না। বাধা দিল কপোতী—দেখ, আমরা ব্যাধের খাদ্য। আমাদের খেয়েই না ওরা বেঁচে আছে। কত কষ্টে ও আমাকে ধরেছে। তুমি যদি এখন জালের মুখ খুলে দাও আর আমরা বেরিয়ে যাই, ব্যাধ যখন উঠে তা দেখবে, তখন কি হা-হুতাশটাই না করবে! এটা উচিত কাজ হবে না।

—তাই বলে আমার কাছ থেকে ব্যাধ তোমায় নিয়ে চলে যাবে? আমার সামর্থ্য থাকতেও স্ত্রীকে আমি রক্ষা করবো না—এ তুমি কি বলছ কপোতী?

—তুমি আমায় খুবই ভালবাস। তাই আর কিছু ভাবতে পারছ না। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ তো, আমাকে যদি তুমি মুক্ত করে নিয়ে যাও, তাহলে ব্যাধের সংসার চলবে কেমন করে? ওদের ধর্ম শিকার করে সংসার চালানো। আমারও ভাগ্যে ছিল আজ শিকার হবার। আমাকে পেয়ে ওদের যদি একটা দিনও চলে, সেটাই তো জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। এ সংসারে আমরা কদিন। জন্মেছি ব্যাধের খাদ্য হয়ে। তার মুখ থেকে খোরাক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া কি উচিত?

এবার থমকে দাঁড়াল কপোত। ঠিকই তো। শোকে-দুঃখে এই সত্য কথাটাই সে ভুলে গিয়েছিল। কারো মুখ থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নেওয়ার মত পাপ আর নেই। তাছাড়া সবই ভাগ্য।

—তাহলে কপোতী, আমাকে এখুনি কি করতে বল?

—তোমার দ্বারে ব্যাধ এখন অতিথি। অতিথির সেবা করাই তো সেরা ধর্ম। খিদে, তেষ্টা, ঝড়, জল—আহা বেচারা কত কষ্টই না পেয়েছে।

—তুমিও তো জানো কপোতী, ঘরে আমাদের এমন কিছুই নেই যা দিয়ে অতিথির সেবা করি।

—তা ঠিক। আপাতত তুমি একটু আগুনের ব্যবস্থা কর। বেচারার সারাটা দিন গেছে ঘুরতে ঘুরতে। পেটে কিছু নেই। তার ওপর জলে ভিজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেমন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে দেখ।

কপোত সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধের সামনে একটা একটা করে জড়ো করল খড়-কুটো, শুকনো পাতা। কিন্তু আগুন? ডানা মেলে একটু ওপরে উঠতেই দেখল, কাছেই কারা যেন আগুন জ্বেলেছে। সেখান থেকে ঠোঁটে করে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ এনে জ্বেলে দিল সেই খড়-কুটো। জ্বলে উঠল আগুন।

ব্যাধ কিন্তু ঘুমে এতই অচেতন যে এসব কিছু জানতেও পারল না। শীতের কাঁপুনি নেই। বরং আরো আরামে ঘুমিয়েছে সে। ঘুম যখন ভাঙ্গল, তখন রাত শেষ হয়ে গেছে, থেমে গেছে ঝড়-জল, আকাশ পরিষ্কার। ঘুম থেকে উঠেই দেখে সামনে আগুন জ্বলছে। দেখে অবাক হল ব্যাধ। কোথা থেকে এই আগুন এল, কে জ্বালালো? চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে কাউকে দেখতেও পেল না। সামনে পড়ে আছে শিকার। ফাঁদে পাখিগুলোও আছে সেই রকমই। তাহলে?

এমন সময় কপোতী কপোতকে ডেকে বলল—এবার তুমি ফাঁদের মুখ খুলে দাও। ঐ আগুনে আমার প্রাণ-বিসর্জন দিয়ে অতিথির খিদে মেটাই।

বাধা দিয়ে উঠল কপোত—আমি থাকতে তুমি কেন? আমিই ঐ আগুনে প্রাণ দিয়ে অতিথি সৎকার করব।

এই বলে সে সঙ্গে সঙ্গে ডানা মেলে আগুনের চার পাশে তিনবার ঘুরে ঝুপ করে পড়ে গেল আগুনে।

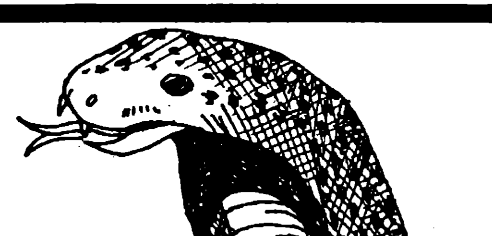
ব্যাধ তো দেখে-শুনে অবাক।

কপোতী থাকতে না পেরে ব্যাধকে বলল—তুমি আমায় মুক্ত করে দাও। স্বামী যখন প্রাণ দিয়েছে, আমি স্ত্রী হয়ে কি প্রাণ নিয়ে থাকতে পারি! অধর্ম হবে যে।

ব্যাধ যেন কেমন হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত জালের মুখ খুলে দিতেই বেরিয়ে এল কপোতী। এগিয়ে গেল আগুনের দিকে। তারপর প্রাণ বিসর্জন দেবার আগে শুধু একটা অনুরোধ জানাল ব্যাধকে। সে যেন তাদের ছেলেপুলেদের রেহাই দেয়।

দেখে-শুনে অমন নিষ্ঠুর যে ব্যাধ, তারও বুক যেন দুমড়ে-মুচড়ে উঠল। চোখ ভরে গেল জলে। হাহাকার করে উঠল মন। মনে মনে ধিক্কার দিয়ে উঠল নিজেকে। একটা কপোত-কপোতীর প্রাণে যে উদারতা, মানুষ হয়ে তার এতটুকুও নেই তার মধ্যে?

আকুল হয়ে উঠল তার মন। ঘরে আর তার ফেরা হল না।



নাগেশ্বরের কাহিনী

বহু...বহুকাল আগে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠানপুর নামে একটা নগর ছিল। বেশ সমৃদ্ধশালী সে নগর। রাজা ছিলেন সে সময়কার একজন সুবিখ্যাত বীর—শূরসেন।

রাজার মনে সব সুখই ছিল, কেবল একটা ছাড়া। তাঁর কোন ছেলেপুলে ছিল না। তাই দুশ্চিন্তা ছিল সব সময়—কার হাতে তুলে দিয়ে যাবেন এই বিশাল সাম্রাজ্য। বয়স বাড়ছে। আর কত দিনই বা তিনি বাঁচবেন?

এমনি ভাবে দুশ্চিন্তায় যখন দিন কাটে রাজার, হঠাৎ অন্দরমহল থেকে খবর এল একদিন—রানীমার একটি সন্তান হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা ছুটলেন সন্তানের মুখ দেখতে। দেখেই তো রাজার চক্ষু স্থির। এ কি! এ যে একটা সাপ!

রানী মুহ্যমান। দাস-দাসী সবাই মুখ বুজে চুপ।

মানুষের পেটে সাপের জন্ম! কেমন করে সম্ভব? কিন্তু উড়িয়ে তো দিতে পারবে না কেউ।

সন্তান হয়েছে রাজার। কোথায় রাজপ্রাসাদে পড়ে যাবে ধুম, তা না হয়ে সব চুপচাপ। যেন কোথাও কিছু হয় নি। কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতেও পারল না ব্যাপারটা।

কি আর করেন রাজা-রানী। সন্তান হয়ে জন্মেছে সাপ, তাকে তো আর ফেলে দিতে পারেন না। সাধ্যমত পরিচর্যা করে চলেন তার।

দিন যায়, বড় হয়ে ওঠে সর্পশিশু। অন্দরমহলের একখানি অন্ধকার ঘর, সেখানেই থাকে, খেলে বেড়ায় আপন মনে। মা যান, বাবা যান, যেটুকু দেখা-শোনা আদর-যত্ন করার করেন। আর দোষ মানেন নিজেদের ভাগ্যকে।

কেটে গেল কয়েকটা বছর। ধীরে ধীরে নধর হয়ে উঠল সর্পশিশু।

একদিন সর্পপুত্রকে দেখে রাজা ফিরে আসছেন তাঁর শোবার ঘরে। হঠাৎ শুনলেন এক মানুষের কণ্ঠ—বাবা, আমার পৈতে দেবার, নামকরণ করার তো বয়স হয়ে গেছে। তুমি তার ব্যবস্থা করছ না কেন?

রাজা অবাক। ঘরে তো ঐ সাপ ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে তাঁকে বাবা বলে ডেকে এসব কথা বলবে? ফিরে তাকালেন তিনি সাপের দিকে। দেখলেন সর্পশিশুও তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে।

আরও অবাক হলেন রাজা। ভেবে পেলেন না, সাপের মুখে মানুষের কথা!

যাই হোক, কথা যখন উঠেছে তখন সাপ হলেও তার ক্ষত্রিয়ের সংস্কার করতেই হয়।

ভাল দিন দেখে ডেকে পাঠালেন রাজ-পুরোহিতকে। পৈতে দেয়ালেন, নামকরণও করলেন। নাম হল নাগেশ্বর।

আবার নাগেশ্বর থেকে গেল রাজপ্রাসাদের সেই অন্ধকার ঘরে। পাছে নাগেশ্বরের কোন কষ্ট হয়, তাই সুন্দর খাট-বিছানা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন রাজা তার ঘর। রানীমা-র সজাগ দৃষ্টি ফেরে নাগেশ্বরের দিকে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরো কয়েকটা বছর। নাগেশ্বর এখন যুবক।

প্রতিদিনের মত সেদিনও রাজা শূরসেন গেছেন পুত্র নাগেশ্বরকে দেখতে। দেখলেন, আপনমনে নাগেশ্বর বসে আছে পালঙ্কে। দেখে ফিরে আসতে যাবেন, শুনলেন আবার সেই মানুষের কণ্ঠ।

—বাবা, আমার তো বিয়ে করার বয়স হয়েছে। তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছ না কেন?

রাজা তো শুনে বিস্ময়ে হতবাক। একমাত্র পুত্র তাঁর। ঘটা করে বিয়ে দিয়ে বৌ আনতে সাধ জাগে না তাঁর? মনে মনে যদিও বুঝতে পারছেন রাজা তাঁর নাগেশ্বর নিছক কোন সাপ নয়, তবুও কোন্ ভাগ্যদোষে তাঁর পুত্র নিল সাপের আকার, কে জানে?

মুখ ঘুরিয়ে দেখেন, পালঙ্কে কুণ্ডলীর ওপর শরীর দোলাচ্ছে নাগেশ্বর।

রাজা বললেন—ইচ্ছে তো জাগে বাবা, কিন্তু কোথায় পাব তেমন মেয়ে, যে তোমাকে বিয়ে করবে।

—অত-শত বুঝি না বাবা। হয় আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর, নইলে আমি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেব।

মহা চিন্তায় পড়লেন শূরসেন। সাপের আকার হলেও স্নেহ, যত্ন দিয়ে এতবড় করার পর এই অভিমানে যদি সে আত্মঘাতী হয়, তার চেয়ে দুঃখের আর কি আছে।

অগত্যা একদিন ডাকলেন মন্ত্রীদের। যা নিয়ে কোন আলোচনাই এতদিন তিনি করেন নি তাঁদের সঙ্গে, আজ বাধ্য হয়ে তা নিয়েই করলেন আলোচনা।

—দেখুন, রাজকার্য থেকে আমার অবসর নেবার দিন এবার ঘনিয়ে আসছে। তাই আমার পুত্র নাগেশ্বরকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছি। ইতিমধ্যেই সব শাস্ত্রে সে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি তার বিয়ে দিতে চাই। আপনারা আমাকে একটি সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান দিন।

যদিও রাজপুত্র নাগেশ্বরকে কখনো দেখেন নি মন্ত্রীরা, তবুও রাজার আদেশ পালন করতেই হয়। ভাবতে বসলেন মন্ত্রীরা। ভাবতে ভাবতে একজন মন্ত্রী বললেন—মহারাজ! পূর্বদেশে এক রাজা আছেন। নাম তাঁর বিজয়। ওদেশে সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর আট ছেলে, আর একমাত্র মেয়ে। মেয়েটির নাম ভোগবতী। যেমন রূপে, তেমনি গুণে। আমাদের মনে হয়, ঐ মেয়েটিই আমাদের রাজপুত্রবধূ হবার যোগ্য।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা প্রচুর অলঙ্কার আর উপঢৌকন দিয়ে সেই বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সসৈন্যে পাঠিয়ে দিলেন বিজয়রাজের কাছে।

সপার্ষদ রাজসভায় বিজয়রাজ। মন্ত্রী গিয়ে রাজা শূরসেনের দেওয়া উপঢৌকনগুলি তাঁকে দিয়ে রাজার স্তুতি করে নিজের পরিচয় রাখলেন। বিজয়রাজও খুশিমনে সমাদরে গ্রহণ করলেন মন্ত্রীবরকে। কুশল বিনিময়ের পর বিজয়রাজ মন্ত্রীবরের আগমনের কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী বললেন—আমাদের রাজা শূরসেনের জ্ঞানে-গুণে অসাধারণ একমাত্র পুত্র নাগেশ্বর। আপনার কন্যা ভোগবতীর সঙ্গে যদি তাঁর বিয়ে দেন, এই আবেদন নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম।

—রাজা শূরসেনের সঙ্গে আত্মীয়তা, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানান বিজয়রাজ।

সুসংবাদ নিয়ে মন্ত্রী ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে। জানালেন রাজাকে।

এইবার! কিভাবে হবে বিয়ে! মহা চিন্তায় পড়লেন রাজা শূরসেন। গেলেন পুত্র নাগেশ্বরের কাছে। শোনালেন তাকে। পিতা-পুত্রে হল গোপন পরামর্শ।

মন্ত্রীবর আবার গেলেন বিজয় রাজ্যে। রাজাকে সসম্মানে বললেন—রাজন্! আমাদের রাজকুমার নিজে এসে বিয়ে করতে পারছেন না। বিশেষ এক অসুবিধেয় পড়েছেন।

—তাহলে? জমজমাট। রাজসভা যেন মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়।

—কুমার বলছেন, মন্ত্রীবর, ক্ষত্রিয় আমরা! পাত্রী যখন স্থির, তখন কোন কারণে পাত্র না গেলেও অস্ত্র কিংবা শাস্ত্র অথবা অলঙ্কার যাকে হোক পাত্র মনে করে মালা বদল করালেও চলে। আপনি কোন অস্ত্রের সঙ্গে লগ্নে কন্যার মালাবদল করুন, আমরা

সাদরে বধূমাতাকে নিয়ে যাই।

কি আর করেন বিজয়রাজ। অগত্যা অস্ত্রের সঙ্গে মালা বদল হল ভোগবতীর। প্রচুর অলঙ্কারে কন্যাকে সাজিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা করে শূরসেনের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল ভোগবতীকে। সাজানো-গোছানো মনোরম এক ঘরে রাখা হল তাঁকে, পরিচর্যা করার জন্যে রাখা হল অনেক দাসী। ভোগবতী কিন্তু স্বামীর মুখ দেখতে পেল না।

বেশ কিছুদিন চলে গেল। নিজের ঘরে নাগেশ্বর থাকে নিজের মনে, আর ভোগবতী অপর এক ঘরে।

রানীমাকে একদিন নিজের ঘরে দেখে বললে নাগেশ্বর—মা, আমার বিয়ে দিলে, তা বউ কেন আমার কাছে আসে না?

কি আর জবাব দেবেন রানীমা। পাছে ভোগবতীর মনে কষ্ট হয়, তাকে সবাই মিলে ঠকিয়েছে ভেবে যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে এই ভেবেই তারা ভোগবতীকে স্বামীর মুখ দেখান নি এতদিন। নানা কথায় আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন। এখন আর উপায় নেই।

রানীমা এবার তাঁর খাস দাসীকে পাঠালেন ভোগবতীর ঘরে। পুত্র নাগেশ্বরের পরিচয় এমনভাবে পুত্রবধূর কাছে রাখতে যাতে সে স্বামীকে দেখা মাত্র উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে না পড়ে।

খাস দাসী ভোগবতীর কাছে গিয়ে বললে—এতদিন বিয়ে হয়েছে, এই প্রাসাদে আছো, কিন্তু স্বামীর দেখা না পেয়ে মন যে তোমার ছটফট করছে তা বুঝি মা। তাই বলতে এলাম, তুমি খুবই ভাগ্যবতী মা, তোমার স্বামীর তুলনা হয় না। তিনি শাপভ্রষ্ট দেবতা ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু কেন যেন মা, আমাদেরও দুর্ভাগ্য, তিনি মানুষের আকার না ধরে, ধরে আছেন সাপের আকার।

শুনে ভোগবতী বলল—খুব সৌভাগ্য না থাকলে মানুষের ভাগ্যে কি দেবতা স্বামী জোটে?

ভোগবতীর কথা এল রানীমার কানে। দু চোখ তাঁর ভরে গেল জলে। পুত্রবধূকে নিয়ে আসা হল পুত্র নাগেশ্বরের ঘরে।

মনে কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই ভোগবতীর। সে মন-প্রাণ ঢেলে দিল স্বামীর পরিচর্যায়।

একদিন····

নিঝুম রাজপ্রাসাদ। কেউ আর জেগে নেই কোথাও। নাগেশ্বর হঠাৎ বলে ভোগবতীকে—এতদিন আমি তোমারই অপেক্ষায় এই শরীর ধারণ করে আছি, ভোগবতী। এখন তুমিই আমাকে মুক্ত করবে।

শুনে ভোগবতীও প্রথমে অবাক—কি রকম?

নাগেশ্বর বললে—তোমার মনে পড়েছে না ভোগবতী? আমি কিন্তু পূর্বজন্মের কথা ভুলি নি। তোমারও তো ভোলা উচিত নয়। মনে করে দেখ না তুমিই তো পূর্বজন্মে আমার স্ত্রী ছিলে। থাকতাম মহাদেবের খুবই কাছে কাছে। একদিন পার্বতীর সঙ্গে কি একটা কথা নিয়ে দুজনকেই হেসে উঠতে দেখে আমিও হাসি চেপে রাখতে পারি নি। আমাকে হেসে উঠতে দেখে মহাদেব গেলেন রেগে। অভিশাপ দিয়ে বসলেন, যা! তুই মানুষের বংশে সাপ হয়ে জন্মাগে। তখন হাসি আমার উবে গেছে। বুঝলাম, গুরুজনদের গোপন কথা কান পেতে শুনে কি অপরাধটাই না করে বসেছি। তখন পায়ের ওপর উপুড় হয়ে জানতে চাইলাম, কিভাবে আমার শাপমুক্তি হবে। তখন তিনিই স্নেহের বশে এই উপায় বলে দিয়েছিলেন। তুমি এসেছ। এবার আমার মুক্তির সময় এসেছে।

ভোগবতীরও এবার মনে পড়ে গেল সেই স্মৃতি।

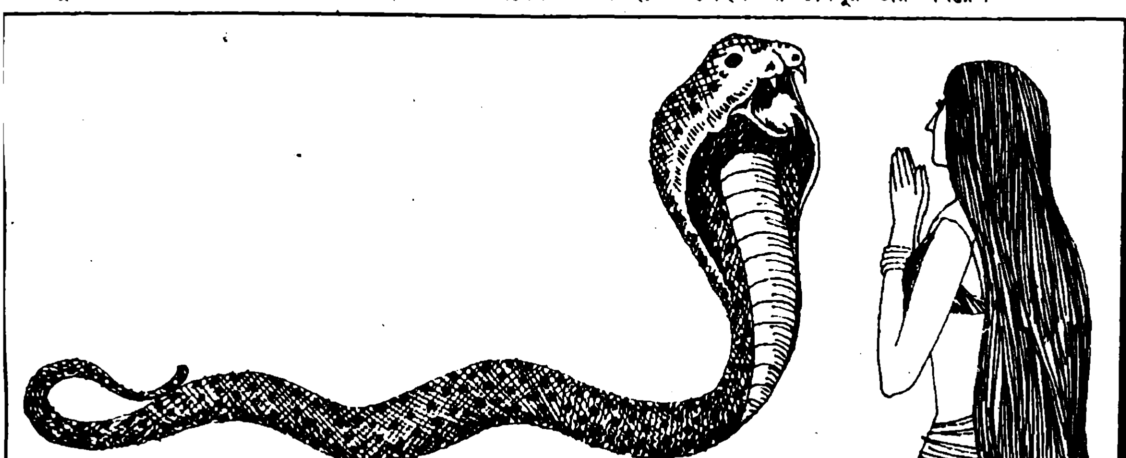
দুজনে তখন গোপনে চলে গেলে দণ্ডকারণ্যে। পবিত্র গোদাবরীর জলে স্নান করে উঠতেই কোথায় সেই সাপের আকার। সুদীর্ঘ সুপুরুষ এক যুবক। সেখানেই মহাদেবের পূজা করে ফিরে এলেন সেইভাবেই আবার প্রাসাদে।

সকালে ভোগবতীকে নিয়ে নাগেশ্বর রাজা শূরসেন আর রানীমা-র কাছে যেতেই পুত্রকে দেখে তাঁদেরও আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

নাগেশ্বর প্রণাম জানিয়ে বলল—বাবা, এবার আপনি আমাদের বিদায় দিন। আমরা আমাদের শিবলোকে ফিরে যাই।

—না বাবা, তা হয় না। এখন আমি তোমাদের কোন মতেই যেতে দিতে পারি না। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর যে কদিন আছি বনে গিয়েই কাটাব। তুমি সিংহাসনে বসে এই রাজ্য পরিচালনা কর। সময় হলে তখন যেও।

পিতার আদেশ উপেক্ষা করতে পারল না নাগেশ্বর। কি সমৃদ্ধই না হয়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠানপুর তার সময়ে।





গরুড়ের উচিত শিক্ষা

অনন্তনাগের ছেলে মণিনাগ। যদিও খুবই বলশালী, কিন্তু গরুড়কে তার বড় ভয়। গরুড় সম্পর্কে ভাই, বিনতা কাকীর ছেলে, তবুও বিশ্বাস নেই গরুড়কে। মা আর কাকীমার পারিবারিক বিবাদ এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে যে নাগদের বাইরে বেরোনো দায়। ওদের তুলনায় গরুড় যেমন বিশালকায়, তেমনি শক্তিধর। আর ওদের ওপর তার এমনি রাগ যে দেখতে পেলেই ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেবে।

কিন্তু সব সময় লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা, তা কি সম্ভব?

অনেক ভেবে-চিন্তে মণিনাগ করল কি—কোনরকমে শিবকে সন্তুষ্ট করে বলল—প্রভু, গরুড়ের ভয়ে বাইরে বেরোতে পারছি না, আপনি আমাদের অভয় দিন।

শিব বললেন—তথাস্তু। আমি তোমাদের অভয় দিচ্ছি। নন্দীকে ডেকে বললেন—নন্দী, লক্ষ্য রেখো তো।

চোখে চোখেই রেখেছিলেন নন্দী মণিনাগকে। তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল সে। কোথাও খুঁজে না পেয়ে নন্দী গেলেন শিবের কাছে। বললেন—প্রভু, মণিনাগকে তো খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কি? বলেই চোখ বুজলেন শঙ্কর। ধ্যাননেত্রে দেখতে পেলেন, বিষ্ণুলোকে গরুড়ের ঘরে আটকে আছে মণিনাগ। গরুড় রেখেছে তাকে কড়া পাহারায়।

ব্যাপার কি?

শিবের কাছ থেকে অভয় পেয়েছিল মণিনাগ। আর তার ভয় থাকে? তাই সে আর লুকিয়ে লুকিয়ে না থেকে নির্ভয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাইরে। গরুড়ের চোখে পড়তেই তো গরুড় অবাক। মণিনাগের এত সাহস কোথা থেকে এল যে বুক ফুলিয়ে তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়? সেটা দেখার জন্যেই সে জোর করে মণিনাগকে হঠাৎ ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে আটকে রেখেছিল।

শঙ্কর সব দেখে নন্দীকে বললেন—শোন নন্দী, তুমি সরাসরি গরুড়ের কাছে না গিয়ে আগে যাবে ভগবান বিষ্ণুর কাছে। তাঁকে সব কথা জানিয়ে আগে সন্তুষ্ট করবে। তারপর গরুড়ের কাছ থেকে মণিনাগকে নিয়ে ফিরে আসবে।

প্রভুর নির্দেশ। নন্দী ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে। তাঁকে সব জানাতেই বিষ্ণু ডেকে পাঠালেন গরুড়কে।

বললেন—গরুড়, কাজটা ঠিক কর নি। আমি বলছি, মণিনাগকে নন্দীর হাতে ছেড়ে দাও।

গরুড় বিষ্ণুর আদেশ শুনেই নন্দীর সামনেই লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিল।

—ঠাকুর, এ তো অত্যন্ত অন্যায় আদেশ! আম চাকর-বাকর। কোন ভাল জিনিস-টিনিস হলে মনিবে চাকর-বাকরদের আদর করে একটু আধটু দেয়, খোঁজখবর নে এযাবৎ আপনি কি সেভাবে আমাকে কিছু দিয়েছেন? না, আম কোন খোঁজ খবর রেখেছেন? কিছুই তো দেন নি কখনো, ৎ পিঠে চেপেই বেড়িয়েছেন। আমি আমার মনের মত একটা খোর যোগাড় করে আনলাম। আর আপনি হুকুম দিচ্ছেন তাকে ছে দিতে! আমি যদি আপনার বাহন না হতাম, তাহলে পারতেন ঐ দারুণ দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? আমার জন্যই চারদি আপনার জয়জয়কার। যেহেতু আপনাকে মনিব বলে মানি, তাই ইচ্ছা হুকুম করে বসবেন আর আমাকে তা মানতে হবে— আপনার ভারি অন্যায়। দেখুন তো, সামান্য একজন ভক্তের জ শিব কত ভাবেন। মণিনাগকে নিয়ে যাবার জন্য নন্দীকে পাঠি দিয়েছেন, আর আপনি?

লক্ষ্মীদেবী তো গরুড়ের তর্জন গর্জনে অবাক। মনে মনে ভাবে হঠাৎ গরুড়ের এত দম্ভ, এত অহঙ্কার এল কোথা থেকে।



বিষ্ণু কিন্তু শুনছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। গরুড় থামে তেমনি হাসিমুখেই বললেন—সত্যিই গরুড়, তুমি ঠিকই বলেছ তোমার মত বলশালী বাহন না থাকলে অসুরদের হাতে আমায় বি নাকালই না হতে হত! খুব খাঁটি কথা বলেছ গরুড়; খুব খাঁ কথা! এ আমার ভারি অন্যায়! তোমার ওপর অবিচার! সত্যিই আমার অন্যায়।

বিষ্ণুর কথা শুনতে শুনতে গরুড়ের মুখে-চোখে ফুটে ও আত্মশ্লাঘা।

—অন্যায়ই তো? একশোবার অন্যায়। ঝাঁঝিয়ে ওঠে গরুড়

—বলছি তো অন্যায়। তেমনি হাসতে হাসতেই বললে বিষ্ণু—তা রাগ করে অত দূরে দূরে থাকছ কেন? কাছে এস

উত্তেজিত গরুড়, উত্তেজনা নিয়েই কাছে এল। কাছে আসতেই বিষ্ণু তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বললেন—গরুড়, আমার এই কড়ে আঙুলটা তোমার মাথায় রাখছি। দেখ তো, কেমন লাগে ?

বলে যেই বিষ্ণু কড়ে আঙুলটা রাখলেন তার মাথায়, অমনি যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে উঠল গরুড়—উঃ, গেলাম গেলাম। ঠাকুর, বাঁচান।

একটু ঠেকিয়েই আঙুলটি তুলে নিলেন বিষ্ণু। ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গরুড়ের মুখখানাই বিকৃত হয়ে গেছে।

মুহূর্তে থেমে গেল গরুড়ের সব লম্ফঝম্ফ, দম্ভ, অহঙ্কার। একবার আছড়ে পড়ে লক্ষ্মীদেবীর পায়ে, একবার বিষ্ণুর পায়ে, আর জানায় কাতর আবেদন—ঠাকুর ! আমি মূর্খ, আমি অপরাধী, আমি আপনাদের চাকর দাস। আমায় ক্ষমা করুন।

গরুড়ের কাতরানিতে লক্ষ্মীর মনে দয়া হল। বিষ্ণুকে বললেন—প্রভু, না বুঝে পুত্র গরুড় অপরাধ করে ফেলেছে। আপনি ওকে ক্ষমা করুন।

বিষ্ণু তখন গরুড়কে বললেন—এখন তোমাকে ভাল করে তোলার ক্ষমতা একমাত্র শিব ছাড়া আর কারো নেই তো, গরুড়। তুমি বরং মণিনাগকে নিয়ে নন্দীর সঙ্গে তাঁর কাছে যাও। দেখ তাঁকে যদি সন্তুষ্ট করতে পার, তাহলে তুমি আগে যেমন ছিলে তেমনি হয়ে যেতে পারবে।

অগত্যা তাই করল গরুড়। অনেক কষ্টে শিবকে তুষ্ট করে তাঁর আশীর্বাদে আবার স্বাভাবিক হয়ে ফিরে এল।

তারপর থেকে গরুড়ের গলা থেকে আর কোন দিন কেউ কোন শব্দ বের হতে শোনে নি।



দিতি-অদিতি সংবাদ

কশ্যপ-এর ছিল তিন পত্নী—দিতি, অদিতি আর দনু।

দিতির পুত্ররা হল দৈত্য, অদিতির পুত্রার দেবতা, আর দনুর পুত্ররা হল দানব।

একই পিতার সন্তান হলে কি হবে, দৈত্য আর দানবেরা স্বভাবে হয়ে উঠল খল, কুটিল আর অনাচারী আর দেবতারা ঠিক তার উল্টো নম্র, শান্ত, ধীর, পরোপকারী ও বিনয়ী। তাই সৎ-ভাইদের ঔদ্ধত্য, গর্ব, অহঙ্কার, কোনমতেই তারা সহ্য করতে পারত না। তাই নিয়ে ছোটবেলায় খুনসুটি, বড় হয়ে মারামারি তাদের লেগেই থাকত। আর মারামারির ফল বেশির ভাগ সময়েই খারাপ দাঁড়াত দৈত্য আর দানবদের দিকে। চুপ করে পিতা কশ্যপ দেখতেন। এ নিয়ে কোন কথাই বলতেন না।

দিন যত যেতে লাগল ওদের মধ্যে ততই বেড়ে চলতে লাগল শত্রুভাব। পায়ে পায়ে দেবতাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাত দৈত্য আর দানবেরা। ফলে লড়াই বেধে যেত দারুণ। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে যথেষ্ট উন্নত দেবতাদের কাছে দৈত্য-দানবরা প্রচণ্ডভাবে মার খেত, প্রাণ হারাতো।

এই সব দেখতে দেখতে দিতি আর দনুর মন হল খুবই খারাপ। ভাবল, অদিতির ছেলেদের যখন এতই সুখ্যাতি, সকলেই যখন তার ছেলেদের শ্রদ্ধা করে চলে, সমীহ করে, তখন না-জানি অদিতির মনে কতই না অহঙ্কার।

ছেলেরা ভাল হলে মায়ের বুক আনন্দে ভরে ওঠে, এটা স্বাভাবিক। পুত্রদের জন্যে অদিতির মনে ছিল সেই আনন্দ। দিতি আর দনু তাকেই অহঙ্কার ভেবে ভেতরে ভেতরে জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল।

অদিতির সুখ-সমৃদ্ধি আর পুত্রগর্ব কিভাবে চূর্ণ করে দেওয়া যায়, সতীনের মাথা লুটিয়ে দেওয়া যায় মাটিতে, যখন এসব নিয়েই একদিন দিতি আর দনু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল তখন দেবর্ষি নারদ তা শুনতে পেয়ে টুক করে সেখানে এসে হাজির। শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন—মায়েরা ! কেন এসব নিয়ে নিজেদের মনের কষ্ট বাড়াচ্ছ ? পুণ্যকর্ম না করলে কি মনের মত ফল পাওয়া যায় ? আমার কথা যদি তোমরা ঠিক বুঝতে না পার, তাহলে প্রজাপতি কশ্যপকে জিজ্ঞেস করবে, বুঝতে পারবে।

নারদ চলে যেতে ভাবতে বসল দুই সতীন দিতি আর দনু—ব্যাপারটা কি রকম হল ? পুণ্যকর্ম না করলে মনের মত ফল পাওয়া যায় না। তাদের স্বামী প্রজাপতি কশ্যপ—জগৎস্রস্টা ব্রহ্মার যিনি মানসপুত্র, যাবতীয় পুণ্য যাঁর মধ্যে রয়েছে, অদিতির মত তারাও তো তাঁরই স্ত্রী। তাহলে আবার পুণ্যকর্ম কি ?



অনেকক্ষণ দুজনে এসব নিয়ে আলোচনা করেও যখন কোন কূল-কিনারা পেল না তখন দনু একটা পরামর্শ দিল দিতিকে। বলল—দেখ দিদি, একটা কথা বলি শোন।

উদগ্রীব হয়ে ওঠে দিতি—বল বোন, কি কথা ?

—অদিতিকে কোনমতেই আর প্রজাপতির কাছে ঘেঁষতে দিও না। সব সময়েই তাঁর কাছে কাছে থাক আর সেবা-শুশ্রূষা কর। দেখ তো তাতে প্রজাপতির মন ভেজে কিনা ?

কে বলে দনুর মাথায় বুদ্ধি নেই ? ঝলমল করে ওঠে দিতির

মুখ। ঠিক বলেছে দনু। কশ্যপকে ঐভাবেই পুরোপুরি নিজের আয়ত্তে এনে মনের ইচ্ছে মেটাতে হবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। দিন নেই, রাত নেই দিতি সব সময়ই থাকতে শুরু করল কশ্যপের খুব কাছাকাছি। অক্লান্তভাবে করে চলল তাঁর সেবা-পরিচর্যা। সব সময়ই তার সজাগ দৃষ্টি যেন কশ্যপের পান থেকে চুন না খসে।

এক সময় কশ্যপ দিতির পরিচর্যায় খুবই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—দিতি, কি চাই তোমার ? কি পেলে তুমি খুশি হবে, বল।

এই সুযোগ। সবিনয়ে দিতি প্রার্থনা জানাল— আমি এমন একটি পুত্র চাই, যে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। কেউ তাকে কোনদিন পরাজিত করতে পারবে না, সে হবে ত্রিভুবনজয়ী।

—ওঃ, এই প্রার্থনা! বললেন কশ্যপ—তার জন্যে তোমাকে যে একটা ব্রত পালন করতে হবে, দিতি।

—আজ্ঞা করুন। নিশ্চয়ই করব।

—মন থেকে সব রকমের কূট চিন্তা, পাপ চিন্তা দূর করে বারো বছর নিজেকে কঠোর সংযমের মধ্যে রাখতে হবে। তা যদি পার, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার বাসনা পূরণ করব।

—বেশ, আমি তাই করব।

দিতি করলও তাই।

বারোটা বছর এইভাবে কাটাবার পর সন্তুষ্ট হলেন কশ্যপ। দিতির গর্ভে তার আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের বীজ দিয়ে বললেন—যতদিন এই সন্তান ভূমিষ্ঠ না হচ্ছে, ততদিন কিন্তু তোমাকে এই সব নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে হবে। সন্ধ্যার সময় মিথ্যে কথা বলা, শোওয়া, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া, হাই তোলা চলবে না। এই সময় কোন কারণে যদি হাসিও পায়, হাসতে হবে মুখ ঢেকে। এলোচুলে অর্থাৎ মাথার খোঁপা খুলে চুল এলিয়ে দিয়ে বসে থাকা চলবে না। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের চিন্তামাত্র যেন মনে না আসে। আর ভুল করেও কখনো উত্তর দিকে মাথা করে শোবে না। এই নিয়মকটি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে পার, তাহলে নিশ্চয়ই সুফল পাবে। বলে বেশ কিছুকালের জন্যে কশ্যপ চলে গেলেন অন্যত্র, অন্য কাজে। দিতিও অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে এসে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলল নিয়ম।

এইভাবে কেটে যায় দিন। দিতির গর্ভে শিশুটিও বাড়তে থাকে দিন দিন।

এদিকে মায়াবিদ্যাবলে একদিন ময়দানব জেনে ফেলল ব্যাপারটা। ইন্দ্রের সঙ্গে তার ছিল খুব ভাব, দারুণ বন্ধুত্ব। সে দেখল, এই সন্তান যদি নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে তার বন্ধুর সমূহ বিপদ। সুতরাং, আগেভাগেই বন্ধু ইন্দ্রকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।

ময় যদিও দনুর ছেলে দানব আর দেবতাদের চোখে বিষ, তবুও দেবরাজ ইন্দ্র সুকৌশলে বুদ্ধিমান এবং বলশালী ময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছিলেন। তারও একটা কারণ ছিল।

ময়ের দাদা নমুচি তখন দানব-অধিপতি। একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করলে ইন্দ্রের সঙ্গে বেধেছিল তার দারুণ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র হেরে গিয়ে প্রাণভয়ে পালিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। নমুচিও দুরন্ত বেগে তাঁর পিছু ধাওয়া করেছিল, তাকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্যে। সমূহ বিপদ দেখে ইন্দ্র নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ঢুকে পড়েছিলেন সমুদ্রের ফেনার মধ্যে। তারপর নমুচি কাছে এসে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনি সেই ফেনার আঘাতেই তাকে খতম করে দিয়েছিলেন। দাদাকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল দেখে ময় প্রতিজ্ঞা করল, ইন্দ্রের ওপর এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। সে শুরু করে দিল দারুণ তপস্যা। সব সময় আরাধনা করে চলেছিল অগ্নি আর বিষ্ণুর। সেই সঙ্গে প্রার্থী হয়ে কোন ব্রাহ্মণ এলে তাকেও ফেরাত না। সন্তুষ্ট অগ্নিদেব আর বিষ্ণু তাকে দিয়েছিল নানারকমের সাঙ্ঘাতিক সব অস্ত্র, যার নাম শুনলে দেবতাদেরও বুক কেঁপে উঠত। বিষ্ণু আরও দিলেন ময়কে মায়াবিদ্যা। খবর পেয়ে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রের।



ভাবতে শুরু করেছিলেন, কিভাবে ময়কে মুঠোর মধ্যে আনা যায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন এক ফিকির খেলে গেল তাঁর মাথায়। ব্রাহ্মণের বেশে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন ময়ের সামনে প্রার্থী হয়ে। ময় সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল কি পেলে সন্তুষ্ট হবেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ চেয়ে বসেছিল তার বন্ধুত্ব। আজব এই প্রার্থনা শুনে ময় চমকে উঠে জানতে চেয়েছিল ব্রাহ্মণের আসল পরিচয়। আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ইন্দ্র। আশ্চর্য হয়েছিল ময়। যার বিরুদ্ধে তার এত আয়োজন, সেই ইন্দ্রই কিনা ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাকে ছলনা করে চেয়ে নিল তার বন্ধুত্ব ? এটা কি উচিত হল ইন্দ্রের ? উত্তরে ইন্দ্র বলেছিলেন, বিপদকাল উপস্থিত হলে সুকৌশলে তার মোকাবিলা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। সেই থেকে ময় হয়েছিল ইন্দ্রের বন্ধু, আর দিন দিন সেই বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় হয়েছিল যে ইন্দ্রের জন্যে যে কোন কাজ করতে সে প্রস্তুত।

যাই হোক, ময়ের কাছ থেকে খবর শুনে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন ইন্দ্র।

—বন্ধু, এখন উপায় ?

—একটাই মাত্র উপায়। তুমি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তোমার সৎমা দিতিকে ঠিক নিজের মায়ের মতই সেবা-যত্ন করবে। তারপর সুযোগ বুঝে তার গর্ভের ছেলেকে কেটে টুকরো করে ফেলবে। খুব সাবধান। যেন তোমার উদ্দেশ্য কোনরকমে ফাঁস না হয়ে যায়।

সুন্দর যুক্তি। খুব মনে ধরে গেল ইন্দ্রের। অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে ইন্দ্র মন-প্রাণ দিয়ে দিতির সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। আর

খুঁজতে থাকল সুযোগ। দিতি ইন্দ্রকে তার পরিচর্যা করতে দেখে একটু বিস্মিত হলেও কোন অমঙ্গল ঘটতে পারে এমন কোন আশঙ্কাই জাগল না।

যথারীতি কশ্যপের নিয়ম মেনে সেই ত্রিভুবনজয়ী পুত্রের আশায় দিন কাটাতে লাগল দিতি। আর ইন্দ্রও ফিরতে লাগল সুযোগের সন্ধানে। এদিকে সময়ও হয়ে আসছে খুব কাছাকাছি।

একদিন সন্ধেবেলা।

খুব ক্লান্তি এসেছে দিতির। ঘুমও এসেছে যেন চোখ ভেঙ্গে। অনেক চেষ্টা করেও আর বসে থাকতে না পেরে নিয়মের কথা ভুলে শুয়ে পড়ল দিতি। উত্তর দিকেই মাথা রেখে শুল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল।

সব সময়ই ইন্দ্র ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। এসেও গেল সুযোগ হাতের মুঠোয়। কালবিলম্ব না করে উদ্যত বজ্র হাতে ঢুকে পড়ল সে দিতির গর্ভে। ছুটে গেল গর্ভের সেই বালককে হত্যা করতে।

আর্তনাদ করে উঠল বালক—আমি এখনও মাটি স্পর্শ করি নি। এটা যুদ্ধক্ষেত্রও নয়। তাছাড়া আমি তোমারই ভাই। আমাকে এইভাবে অসহায় অবস্থায় বধ করে তোমার কি সম্মান বাড়বে? তুমি দেবরাজ ইন্দ্র। এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?

তখন আর উচিত-অনুচিত। বালকের আর্তনাদ যেন কানেই ঢুকল না ইন্দ্রের। বজ্র দিয়ে তাকে সাত টুকরো করে ফেললেন ইন্দ্র।

সেই টুকরোগুলো তখনো অনুরোধ করে চলল ইন্দ্রকে—এমনভাবে মেরো না আমাদের। আমরা তোমারই ভাই।

বজ্রাঘাতেও তারা মরল না দেখে ইন্দ্র উঠলেন দারুণ রেগে। কিড়মিড় করে উঠল তার দাঁত—ভাই! আমাদের শত্রু তোরা। আবার ভাই। এই বলে প্রতি টুকরোকে আবার বজ্র দিয়ে সাত-সাত টুকরোয় খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেললেন। এক থেকে হয়ে গেল ঊনপঞ্চাশ টুকরো। ইন্দ্র ভাবলেন যাক, শত্রু নিধন হল।

কিন্তু আশ্চর্য। তারা তো মরলই না, বরং প্রত্যেকটা খণ্ডেরই আলাদা আলাদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজিয়ে উঠল, আর কাঁদতে শুরু করে দিল।

ইন্দ্র তাদের থামাতে চেষ্টা করলেন এই বলে 'মা রুত' অর্থাৎ কেঁদো না, কেঁদো না।

গর্ভের আর্তনাদে ঘুম ভেঙ্গে গেল দিতির। বুঝতে পারল, ছেলের মত এসে ইন্দ্র তার কাছে থেকে কি সর্বনাশটাই না তার করল। তার সব স্বপ্ন বিফল করে দিল। রেগে শাপ দিয়ে বসল দিতি ইন্দ্রকে। ইতিমধ্যে অগস্ত্যের কানে গেছে ইন্দ্রের এই অপকর্ম। দারুণ রেগে তিনিও ইন্দ্রকে দিয়ে বসলেন দারুণ অভিসম্পাত। খবর গেল কশ্যপের কাছে। শুনেই তো তিনি অবাক। তার পুত্র ইন্দ্র এমন কুকাজ কিভাবে করল। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন অগস্ত্যের আশ্রমে। কোথায় ইন্দ্র? বাইরে এত কাণ্ড-কারখানা দেখে ভয়ে ইন্দ্র আর দিতির গর্ভ থেকে বেরিয়ে না এসে সেখানেই চুপ করে বসেছিলেন। কশ্যপ বুঝতে পেরে তাঁকে বেরিয়ে আসতে বললেন। খুব তিরস্কার করলেন কশ্যপ তাঁকে। মহা অপরাধে অপরাধী ইন্দ্র আর কি করেন, মাথা হেঁট করে রইলেন।

আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা হলে এবার সকলেই ভাবতে বসলেন—যা হবার তা তো হয়ে গেছে। অনেক পাপ, অনেক শাপ-অভিশাপে সবাই কলুষিত হয়ে পড়েছে। এখন এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

শুনে ব্রহ্মা বললেন—এসব ব্যাপার একমাত্র মহাদেবই ঠিক করে দিতে পারেন। তোমরা বরং তাঁর কাছে যাও।

সবাই মিলে স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট করলেন মহাদেবকে। মহাদেবও সব কিছুর সু-সমাধান করে দিলেন। শাপমুক্ত হলেন ইন্দ্র, আর মহাদেবের আদেশে অবয়ব বিশিষ্ট ঊনপঞ্চাশটি টুকরো 'মরুৎ' নামে অভিহিত হয়ে (ইন্দ্রের 'মা রুত' থেকে মরুৎ অর্থাৎ বায়ু) অমরত্ব লাভ করে থেকে গেল ইন্দ্রের সঙ্গে সানন্দে।

সবই ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু দিতির মন পুরোপুরি ভরল না। সে চেয়েছিল ত্রিভুবনজয়ী বিক্রমশালী এক সন্তান যাকে সবাই সমীহ করে চলবে, আর যার গর্ভধারিণী জননী হয়ে দেবমাতা ও তার সতীন অদিতির ওপর টেক্কা দিয়ে চলবে, তা আর হল না। ওরই মধ্যে একটু সান্ত্বনা যে তারই গর্ভজাত এই মরুৎ অমর হওয়ায় সকলে তাকে অন্তত একটু মনে রাখবে।



দধীচির আত্মত্যাগ ও পিপ্পলাদের সাধনা

সুপ্রাচীন এই পৃথিবীতে কত ঘটনা, কত নামই না হারিয়ে গেছে, কিন্তু হারিয়ে যায় নি একটা নাম—দধীচি। আজ পর্যন্ত কেউ ভোলে নি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তাঁর নিঃসঙ্কোচে আত্মত্যাগের কাহিনী।

বহুকাল আগে এই ভাগীরথীরই তীরে ছিল এক শান্ত আশ্রম। যেমন শান্ত, তেমনি সুরক্ষিত। বাইরে যেখানে যত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাই হয়ে যাক না কেন, তার এতটুকু রেশ পৌঁছত না সেই আশ্রমে। অত্যাচারী দানব-দত্যিদের অত্যাচার যখন আশপাশকে অশান্ত করে তুলত, কোন রকমেই সাহস পেত না তারা সেই আশ্রমে ঢুকতে।

আশ্রমটি ছিল মুনি দধীচির। অসাধারণ জ্ঞানী গুণী আর তপস্বী এই মুনির মনটি ছিল শিশুর মত সরল। দেবতা, অতিথি যিনিই আসুন না কেন আশ্রমে, কি সমাদরেই না তিনি তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তৃপ্ত না হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুনিবরেরও যেন তৃপ্তি নেই। যজ্ঞের আগুন নিভত না সেই আশ্রমে। আর বিরাম ছিল না অতিথি-সেবারও। দেবলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত সকলেই চেয়ে থাকত সেই আশ্রমের দিকে, আর শ্রদ্ধায় মনে মনে মাথা নোয়াত দধীচির উদ্দেশ্যে।

লোপামুদ্রা ছিলেন দধীচির সহধর্মিণী। তিনিও ছিলেন যেমন বিদুষী, স্বামীর মত তেমনি সেবা-পরায়ণা। আবার স্বামী-সেবাতেও

তাঁর সমান নজর। স্বামীর সঙ্গে সেই আশ্রমে দিবারাত্র কাজ করে যেতেন লোপামুদ্রা আর লক্ষ্য রাখতেন সদা-সর্বদা স্বামীর দিকে—যাতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে কোথাও না হয়।

ফলে, নির্ঝঞ্ঝাট দধীচির সেই আশ্রম তো শুধু নামেমাত্র আশ্রম ছিল না—ছিল একটি শান্তির নীড়।

একদিন সেই আশ্রমে এলেন সূর্য, রুদ্র, দুই অশ্বিনীকুমার, বিষ্ণু, যম, ইন্দ্র আর অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা।

তাঁদের দেখে দধীচির আনন্দ আর ধরে না। কি সৌভাগ্য। আজ এতগুলি দেবতা এসেছেন তাঁর আশ্রমে অতিথি হয়ে। কি ভাবে যে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবেন, কোথায় বসতে দেবেন, কি দিয়ে তাঁদের সেবা করবেন, ভেবে শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন দধীচি।

দেবতারাও দধীচিকে যোগ্য সমাদর জানিয়ে বললেন—মুনিবর! আমাদের সেবার জন্যে তোমাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমরা তোমার কাছে এসেছি। সেটুকু মিটিয়ে আমরা এখুনি চলে যাব।

তবুও দেবতারা অতিথি। সসম্ভ্রমে তাঁদের অর্চনা করে দধীচি বললেন—বলুন, কি প্রয়োজন। কি করতে পারি আমি আপনাদের জন্যে?

—তুমি তো জান দধীচি, সবেমাত্র দৈত্যকুলের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হল। ওদের কোনরকমে নিধন করা গেল।

—জানি। বললেন দধীচি।

—যুদ্ধের পর আমাদের বেশ কিছু শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র বেঁচে গেছে। এমন কোন নিরাপদ জায়গা আমাদের নেই যেখানে ওগুলো আমরা নিশ্চিন্তে রেখে দিতে পারি। এখনো ওগুলোর প্রয়োজন কিন্তু ফুরিয়ে যায় নি। কখন যে ওরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, কে জানে। তাই তোমার কাছে আমাদের আসা। তোমার এই আশ্রম, আমরা জানি, খুব নিরাপদ স্থান। এখানে দৈত্য-দানবেরা ঢুকতে মোটেই সাহস পায় না। তুমি যদি আমাদের এই অস্ত্রগুলো আপাতত তোমার জিম্মায় রেখে দাও, তাহলে নিশ্চিন্ত হই। আমরা অবশ্য যত তাড়াতাড়ি পারব, আবার সব নিয়ে যাব।

দেবতাদের অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন দধীচি। দেবতারাও খুশিমনে সেগুলো রেখে ফিরে গেলেন স্বর্গে।

দধীচি তো রাজি হলেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না লোপামুদ্রা।

দেবতারা চলে যেতে তিনি বললেন দধীচিকে—হঠাৎ এভাবে রাজি হয়ে যাওয়াটা আমার মনে হয় ঠিক হয় নি।

—কেন বল তো?

—আমরা আশ্রমবাসী। আশ্রমে এইসব অস্ত্রশস্ত্র রাখা কি উচিত কাজ হবে? তাছাড়া আমাদের সঙ্গে কারোর কোন শত্রুতাও নেই। দৈত্যরা যখন জানতে পারবে তখন তারা কি আপনার ওপর রুষ্ট হয়ে উঠবে না?

—হুঁ..., কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ লোপামুদ্রা। ওসব তো আমি ভাবি নি। আর ভাবলেও দেবতাদের অনুরোধ ঠেলব কেমন করে?

—এ ছাড়াও আরো একটা কথা ভাববার আছে। যে ধরনের সব অস্ত্রশস্ত্র ওঁরা রেখে গেলেন, যদি ওগুলোর মধ্যে কোনটা নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে যায়, তখন ফেরত দেবেন কোথা থেকে।

হুঁ.... এটাও ঠিক বলেছ লোপামুদ্রা। কিন্তু উপায় কি বল? ওঁরা এলেন, অনুরোধ রাখলেন। আমি কি না বলতে পারি? মুখের ও[...] তো না বলা যায় না। তাছাড়া ওঁরা তো বলেই গেলেন, বেশি[...] এখানে রাখবেন না। যত তাড়াতাড়ি পারেন নিয়ে যাবেন।

অগত্যা কি আর করেন লোপামুদ্রা। উদার স্বামীর মু[...] দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন।

দেখতে দেখতে দেবতাদের হিসেবে এক হাজার বছর কে[...] গেল। (আমাদের ৩৬০ বছর হয় দেবতাদের ১ বছর। সেই হিসা[...] আমাদের হিসেবে কেটে গিয়েছে ৩,৬০,০০০ বছর।) দেবতারা [...] মধ্যে কেউ একবার উঁকিও দিলেন না আশ্রমে—অস্ত্রশস্ত্র নি[...] যাওয়া তো দূরের কথা। আরো চিন্তায় পড়লেন অস্ত্রশস্ত্রগু[...] ক্রমশ ক্ষয় পেতে শুরু করেছে দেখে।

ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে একদিন পরামর্শ করার জ[...] নিরালায় ডাকলেন তাঁর বোন বড়বাকে। ভাল নাম গভস্তিনী। [...] বোনও ছিলেন মহীয়সী, থাকতেন আশ্রমে দধীচির সঙ্গেই।

কি আর পরামর্শ দেবেন তিনি। চুপ করে শুধু দধীচির উদ্বে[...] দেখে গেলেন, আর মনে মনে নিজেও খুব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

এদিকে দিন দিন অস্ত্রগুলো দুর্বল আর হীনপ্রভ হয়ে যা[...] দেখে মুনি সেগুলো ঠিকমত রাখার একটা উপায় বের করলে[...] নিজে নিজেই। যাতে দেবতারা যখন চাইবেন, অবিকল অস্ত্রগু[...]



দিতে পারেন। মন্ত্রপূত পবিত্র জল নিয়ে সেই অস্ত্রগুলো ধুলেন। ধুতেই সেগুলো থেকে জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল তীব্র তেজ। আর নিঃসঙ্কোচে তিনি তা পান করে ফেললেন। অস্ত্রগুলো সব বীর্যহীন হয়ে পড়ল। আর তাদের যাবতীয় শক্তি দধীচি জমা করে রাখলেন নিজের মধ্যে। যাক, এবার দধীচি নিশ্চিন্ত।

সবেমাত্র এই কাজ শেষ করেছেন দধীচি, দেবতারা এসে হাজির। বললেন—মুনিবর, অসুররা আবার বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অস্ত্রগুলোর যে এবার দরকার, দাও।

শুনে দধীচি বিনীতভাবে বললেন—এতদিন পরে আপনারা এলেন!

—এতদিন আমরা একটুও সময় পাই নি। কেন, কি হয়েছে মুনিবর?

—আপনারা আসছেন না দেখে আমার খুব ভয় হল, দৈত্যরা কোনরকমে জানতে পেরে যদি হঠাৎ আশ্রম চড়াও করে সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। তাই অস্ত্রগুলোকে আমি সব অকেজো করে রেখেছি। ওগুলোর সব শক্তি যে আমি পান করে বসে আছি। এখন উপায়?

শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন দেবতারা। সর্বনাশ! বললেন—আপনাকে আর কি বলব মুনিবর। আপনি বিচক্ষণ। আমাদের সামনে ঘোর দুর্দিন। ঐ অস্ত্রগুলোই ছিল আমাদের সম্বল।

দধীচি একটু ভেবে নিয়ে দেবতাদের বললেন—এখন একটাই মাত্র উপায়। আমি যোগবলে আমার দেহ ত্যাগ করব। তখন আপনারা আমার প্রাণহীন দেহ নিয়ে গিয়ে আপনাদের মনোমত অস্ত্র তৈরি করে নিন।

দধীচির কথা শুনে দেবতারা যেমন হতবাক, তেমনি বিব্রত। শেষে তাঁদের জন্যে প্রাণ দেবেন দধীচি?

দেবতাদের মুখের ভাব দেখে দধীচি বললেন, এতে ইতস্তত করার কিছু নেই। আমার দেহ দিয়ে তৈরি হবে অস্ত্র, নির্মূল হবে অত্যাচারীর দল। দেবরাজ্য হবে নিষ্কণ্টক, সর্বত্র শান্তি ফিরে আসবে। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। আত্মদানের এত বড় সুযোগ কজনের ভাগ্যে ঘটে?

আর কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে যোগাসনে বসলেন দধীচি। মুহূর্তমধ্যেই তাঁর দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

কি আর করেন দেবতারা। নিজেদের প্রাণের দায়ে স্বর্গরাজ্য রক্ষার খাতিরে দধীচির সেই নিষ্প্রাণ দেহটাই নিয়ে এসে দিলেন বিশ্বকর্মাকে। বললেন—বিশ্বকর্মা, মুনিবরের এই দেহ দিয়ে এমন এক অস্ত্র তুমি তৈরি করে দাও, যার প্রহার অসুররা আদৌ সহ্য করতে পারবে না।

বিশ্বকর্মা শুনে বলেন—ওরে বাবা! ও আমার দ্বারা হবে না। অমন এক শক্তিশালী ব্রাহ্মণের দেহ আমি বিদীর্ণ করব? আপনারা বরং দধীচির দেহ থেকে অস্থিগুলো বের করে আমায় দিন, আমি দেবরাজের জন্যে তা দিয়ে অমোঘ বজ্র তৈরি করতে পারব।

অগত্যা দেবতারা গাভীদের ডেকে তাদের দিয়ে দধীচির দেহের চামড়া-মাংস সরিয়ে অস্থি বের করে দিলেন বিশ্বকর্মাকে। আর সুনিপুণ কারিগর তা দিয়ে দুর্দান্ত বজ্র তৈরি করে দিলেন ইন্দ্রকে। [দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে দেববরে বলীয়ান দুরন্ত অসুরাধিপতি বৃত্রকে বধ করে পৃথিবীকে চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।]

॥ ২ ॥

এদিকে যখন এত কাণ্ড ঘটছে, লোপামুদ্রা তখন আশ্রমেরই অপর প্রান্তে উমা দেবীর মন্দিরে একমনে উমার পূজা করে চলেছিলেন। পূজা সেরে ফিরেই দেখলেন, স্বামী নেই। তারপর শুনলেন সব বৃত্তান্ত। শুনে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

প্রথমদিন—যেদিন দেবতারা এসেছিলেন অস্ত্রশস্ত্র রাখতে, সেদিনই লোপামুদ্রার মনে এমনি একটা আশঙ্কা জেগেছিল। তিনি তো জানতেন তাঁর স্বামীকে। পরোপকারের জন্য নিজের জীবনটাও তিনি স্বচ্ছন্দে দিয়ে দিতে পারেন। তাই প্রথমদিনেই দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র গচ্ছিত রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি। এখন সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়ে গেল। ভাবলেন, যা হবার তা হবেই। তাকে আটকাবার সাধ্য নেই কারো। ঠিক করলেন, অমন স্বামী যখন চলে গেলেন, তখন তিনিও আর এই দেহ নিয়ে থাকবেন না। আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। সেই সময় লোপামুদ্রা ছিলেন সন্তান-সম্ভবা।

মন স্থির। দিন-ক্ষণও স্থির। গর্ভাশয় থেকে সন্তানটিকে বের করে পিপ্পল (পিপুল বা অশ্বত্থ) গাছের কাছে রেখে গঙ্গা, ধরিত্রী আর আশ্রমের বনস্পতিদের আহ্বান করে বললেন, এই নিরপরাধ অনাথ রইল তোমাদেরই কাছে। তোমরাই একে দেখো। সকলের কাছে কাতর আবেদন রেখে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিলেন লোপামুদ্রা। সারা আশ্রম হাহাকার করে উঠল। মৃদু মর্মর ধ্বনি তুলে কাঁদল আশ্রমের গাছপালা, নীরবে চোখের জল ফেলল আশ্রমের জীবজন্তুরা। কেননা সকলেই মা-বাবার মত শ্রদ্ধা করত লোপামুদ্রা আর দধীচিকে।

সদ্যোজাত শিশু। মায়ের স্তন-দুধটুকুও পেল না। বাঁচবে কি খেয়ে? তাই সবাই মিলে গেল সোমদেবের কাছে। সোমদেব হলেন পৃথিবীতে যত ওষধি লতা, গাছ আছে তার অধিপতি। তার ওপর আবার অমৃতসুধার অধিকারী। সকলের প্রার্থনায় সোমদেব শিশুটির জীবনধারণের জন্য তাই বিনা সঙ্কোচে দিলেন অমৃত-সুধা। সেই সুধা পান করে দিনে দিনে সেই জনমানবশূন্য স্থানে বড় হয়ে উঠতে লাগল শিশুটি। আর, সদাসর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে লাগল



পিপুল—যেন তাদেরই সন্তান। যেহেতু, এই পিপ্পলই তাকে মা-বাবার মত পরিচর্যা করত, তাই শিশুটি পিপ্পলাদ নামেই পরিচিত হয়ে গেল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গেল। বড় হয়ে উঠল পিপ্পলাদ।

একদিন হঠাৎ প্রশ্ন জাগল পিপ্পলাদের মনে—আচ্ছা, মানুষ থেকে মানুষ, গাছ থেকে গাছের জন্ম। সে নিজে মানুষ, অথচ এই পিপ্পল গাছ কিভাবে তার জনক হল?

পিপ্পলকে জিজ্ঞেস করতে সব কথাই সে খুলে বলল পিপ্পলাদকে। শুনতে শুনতে চোখে জল এসে গেল পিপ্পলাদের। সেই সঙ্গে আবার পিপ্পলাদের চোখ রাগে আগুন হয়ে উঠল।

শুনে পিপ্পলাদ বলল—এত বড় অন্যায়! চক্রান্ত করে দেবতারা আমার বাবাকে মারল। আর তার ফলেই মা প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। এর প্রতিশোধ আমি নেবই।

পিপ্পল অনেক ভেবে-চিন্তে তাকে নিয়ে এল সোমদেবের কাছে। সোমদেবের কাছেও পিপ্পলাদের সেই একই কথা।

সোমদেব বললেন—তুমি এখনও বালক। জান না, দেবতারা কত শক্তিশালী। যুদ্ধ-বিদ্যা শেখ, শক্তি সঞ্চয় কর, তবে তো।

কথাটা ঠিকই বলেছেন সোমদেব।

পিপ্পলাদ বলল—হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। আপনিই বলুন, কোথায় কার কাছে গেলে আমি এসব শিখতে পারব। যতদিন এর প্রতিশোধ নিতে আমি না পারছি কিছুতেই শান্তি পাব না।

সোমদেব বললেন—এসব বিদ্যা তোমাকে শেখাতে পারেন একমাত্র মহাদেব। তুমি দণ্ডকারণ্যে যাও। দেখবে সেখান দিয়ে বয়ে গেছে গোদাবরী নদী। তুমি তারই তীরে বসে শিবের ধ্যান কর। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই তোমার আশা সফল হবে।

পিপ্পলাদ চলে গেল দণ্ডকারণ্যে। এক মন, এক প্রাণ নিয়ে বসল শিবের ধ্যানে। তার আহ্বানে চুপ করে থাকতে পারলেন না শিব। আর্বিভূত হয়ে বললেন—বৎস, বল, তুমি কি চাও।

পিপ্পলাদের মুখে ঐ এক কথা—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, দেবতাদের নিধন।

মহাদেব বললেন—আমার তৃতীয় নয়ন কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?

—না।

—আমার ঐ নয়ন আগে দেখার চেষ্টা কর। পিপ্পলাদ আবার শুরু করল তপস্যা। কেটে গেল আরো কিছুকাল। আস্তে আস্তে তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল শিবের সেই তৃতীয় নয়ন, যা দিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বকে ধ্বংস করে থাকেন।

আনন্দিত হয়ে উঠল পিপ্পলাদের মন—এবার পেয়েছি।

এমন সময় তার পিসী গভস্তিনী এসে তাকে বলল—মন থেকে সব ঈর্ষা পরিত্যাগ কর। এটা তোমার মায়েরই কথা যে, মনে ঈর্ষা পুষলে তার গতি হয় নরকে। দেবতাদের ওপর মিছামিছি এমন ঈর্ষা পোষণ কোরো না।

পিপ্পলাদের কানে কিন্তু তখন যেন এসব কথা ঢুকলই না। সঙ্কল্পে সে তখন অটল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, দেবতা নিধন। আর বারবার সেই প্রার্থনাই সে জানাতে থাকল শিবকে।

দেখতে দেখতে শিবের সেই তৃতীয় নয়ন থেকে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর এক মূর্তি। দেখতে ঠিক ঘোড়ার মত। জ্বলজ্বল করছে চোখ, লকলক করছে জিভ—যেন সামনে যাকে পাবে তাকেই শেষ করে দেবে। তার নাম কৃত্যা।

কৃত্যা আর্বিভূত হয়েই এল পিপ্পলাদের সামনে—বল, কি করতে হবে?

পিপ্পলাদ বললেন—যেখানে যত দেবতা আছে, তাদের সকলকে তুমি খেয়ে ফেল।

শোনামাত্রই কৃত্যা বিকট হাঁ করে প্রথমেই গিলতে গেল পিপ্পলাদকে। পিপ্পলাদ তো অবাক—এ কি, আমাকে কেন? আমি তো দেবতা নই।

—ঠিক দেবতা হতে না পার, কিন্তু তোমার শরীরটা তো দেব শরীর। তুমি যে বড় হয়েছে তা তো সোমদেবের দেওয়া অমৃতসুধা পান করে।

সর্বনাশ! প্রাণভয়ে পিপ্পলাদ তখন ছুটল শিবের কাছে, পেছনে কৃত্যা।

শিব তখন তাকে বাধা দিয়ে বললেন—না, পিপ্পলাদের তুমি কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তুমি এখান থেকে এক যোজন দূরে থাকবে।

অগত্যা কৃত্যা বাধ্য হল পিপ্পলাদকে ছেড়ে সেখান থেকে এক যোজন দূরে গিয়ে বাস করতে। সেখানে যেতেই চারদিকে শুরু হয়ে গেল দারুণ অগ্নিকাণ্ড। কি ভীষণ সে আগুন। খুব ভয় পেয়ে গেলেন দেবতারা। সবাই মিলে ছুটে এলেন শিবের কাছে। বললেন—প্রভু! আমাদের রক্ষা করুন। বসবাসের জন্য আপনিই তো আমাদের স্বর্গ দিয়েছিলেন। এখন কৃত্যা যে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। আর পিপ্পলাদকে অনুগ্রহ করে একটু সামলান।

শিব বললেন—এখন কোন উপায় নেই। তোমরা বরং আপাতত এই এক যোজন নিরাপদ স্থানের মধ্যে গিয়ে থাক। আর দেখি পিপ্পলাদকে সামলানো যায় কিনা।

দেবতারা আর কি করেন। বাধ্য হয়ে স্বর্গলোক ছেড়ে সেখানেই এসে বসবাস শুরু করলেন।

শিবও একান্তে প্পিলাদকে ডেকে বললেন—শোন পিপ্পলাদ, ভেবে দেখ তো তুমি কত বড় মহান পিতার পুত্র। পৃথিবীর উপকারের জন্যে যিনি হাসিমুখে তাঁর জীবন দান করলেন, তাঁর ছেলে হয়ে এমন আক্রোশ কি তোমার সাজে? তাছাড়া দেবতাদের নিধন করলেই কি তুমি তোমার বাবাকে ফিরে পাবে?

মহাদেবের কথা শুনে মনে মনে খানিকক্ষণ চিন্তা করল পিপ্পলাদ। সত্যিই তো, দেবতাদের নিধন করলে হয়ত প্রতিশোধ নেওয়া গেল, কিন্তু মা-বাবাকে তো ফিরে পাওয়া যাবে না।

এবার ঝিমিয়ে পড়ল পিপ্পলাদ। মন থেকে দূর হয়ে গেল তার যত রাগ। সেই সঙ্গে ভেতর থেকে ডুকরে উঠল তার মন। তার পিতা-মাতাকে সকলে কি শ্রদ্ধাই না করে। কিন্তু কেমন দেখতে ছিলেন তাঁরা, তার এই হতভাগ্য চোখ তা দেখতে পেল না। পশুরাও পিতা-মাতার স্নেহ পায়, আশীর্বাদ পায়। কিন্তু সে নিজে এমনি হতভাগ্য—তাঁদের একটু স্নেহ, একটু আশীর্বাদও পেল না। হাহাকার করে উঠল পিপ্পলাদের মন।

চুপ করে রইল পিপ্পলাদ। সামনে মহাদেব, পাশে দেবতারা।

—পিপ্পলাদ, তুমি কিছু বলবে? সস্নেহে প্রশ্ন করেন মহাদেব।

—না। শুধু আমার পিতা-মাতাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না।

—দেখার বড় ইচ্ছে, তাই না ? পিপ্পলাদ, পৃথিবীতে যারা পরের জন্যে জীবন দান করে, তারা কখনো মরে না। তারা অমর। তোমাদের মত শরীর নিয়ে তারা থাকে না ঠিকই, তবু থাকে। তাদের দেখতে গেলে চাই সেই চোখ, সেই দৃষ্টি।

—আমাকে দয়া করে সেই দৃষ্টি দিন, যাতে অন্তত একবারের জন্যেও তাঁদের আমি দেখতে পাই। আকুল প্রার্থনায় যেন ভেঙ্গে পড়ে পিপ্পলাদ।

মৃদু হাসলেন মহাদেব।

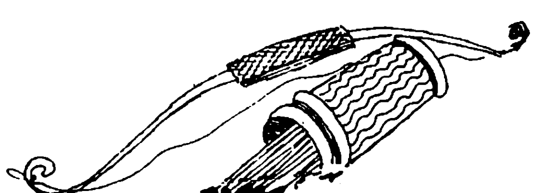
চমকে উঠল পিপ্পলাদ। দিব্য বিমানে স্বর্গ থেকে যেন নেমে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন তারই পিতা-মাতা। মা-বাবাকে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল সে।

তা দেখে দেবতারাও স্তম্ভিত। বলে উঠলেন—ধন্য তুমি পিপ্পলাদ। ধন্য তোমার সাধনা।

আভূমি নত হয়ে পিতা-মাতাকে প্রণাম জানাল পিপ্পলাদ। আর স্নেহাশীষে দধীচি এবং লোপামুদ্রা ভরিয়ে দিলেন পুত্রের মন। তারপর সস্নেহে বললেন—পুত্র, তোমাকে কয়েকটি কথা বলে যাই, শোন। এই বিশ্ব সংসারে চিরকাল কোন কিছুই থাকে না। আজ যে আছে, কাল সে নেই, থাকতে পারে না। এটাই নিয়ম। যতদিন থাকবে এই সংসারে, নিজের স্বার্থ ভুলে সকলের জন্য ভাববে। মনে করবে, এই জীবনটা একা তোমার জন্য নয়, সকলের জন্য। সেই কাজই করবে, যাতে পরের মঙ্গল হয়। এখন ফিরে যাও। বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করো।

এখন আর পিপ্পলাদের মনে কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ নেই। আর কোন হতাশাও থাকল না।

চলে গেছেন পিতা-মাতা আবার স্বর্গীয় বিমানে। পিপ্পলাদও ফিরে এল আশ্রমে। অক্ষরে অক্ষরে পিতার আদেশ পালন করে একদিন সে-ও হয়ে উঠল ভারতের অন্যতম মহান ঋষি।



শুনঃশেফ কাহিনী

ঈক্ষ্বাকু বংশের সেই সুবিখ্যাত রাজা সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে অমর হয়ে আছেন। বিশ্বামিত্রের আশীর্বাদে সশরীরে স্বর্গে যাবার আগে সিংহাসন দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরই ধার্মিক ছেলে হরিশ্চন্দ্রকে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র। রাজ্যে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি। কারো কোন অভাব-অভিযোগ নেই। কিন্তু রাজার নিজের ছিল এক দারুণ অভাব। বহুদিন হয়ে গেল, তাঁর কোন ছেলেপুলে হল না। রাজকার্যে কোথাও কোন অবহেলা নেই বটে, কিন্তু মনে তেমন শান্তি নেই। এক এক সময় ভাবেন, দুত্তোর ছাই, ছেলেপুলে যদি না-ই হয়, তাই বলে মিছামিছি এক অশান্তি বোধ করি কেন ? কিছুদিন ঠিক থাকেন, আবার মন খারাপ হয়ে যায়। এত বড় প্রাসাদ। দাস-দাসীতে সব সময়ই গমগম করছে, তবু যেন ফাঁকা লাগে।

একবার নারদ মুনি আর পর্বত এলেন হরিশ্চন্দ্রের সুখ্যাতি শুনে রাজাকে দেখতে। রাজা তাঁদের যথোচিত আপ্যায়ন করলেন। তাঁরাও খুশি হলেন রাজার আপ্যায়নে। যাবার সময় তাঁরা বললেন—রাজা, সবই ঠিক। কিন্তু পুত্র না থাকলে তোমার মুক্তি হবে কেমন করে ? বংশধর না থাকলে কে-ই বা তোমাকে স্মরণ করে অমর করে রাখবে ?

কথাটা খুবই মনে ধরে রাজার। সবিনয়ে বললেন, কিভাবে পুত্র লাভ হবে, তা তো জানি না। যদি বলে দেন।

মুনিবর বললেন, তার জন্যে তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে রাজা। তুমি একবার যাবে গোদাবরীতে। সেখানে স্নান সেরে বরুণদেবকে যদি স্তবে তুষ্ট করতে পার, তাহলে তোমার পুত্র লাভ হতে পারে।

শুনে হরিশ্চন্দ্র চলে গেলেন গোদাবরীতে। স্তবে তুষ্ট করলেন বরুণদেবকে।

বললেন বরুণদেব—তোমার পুত্রসন্তান হবে। তবে একটা শর্তে।

—কি শর্ত বলুন !

—তোমাকে এখন আমি একটি পুত্র দেব। সেটি পাবার পর তাকে দিয়েই তোমাকে পুত্রের জন্যে যজ্ঞ করতে হবে। তাতে যদি রাজি থাক, তাহলে আমি ব্যবস্থা করতে পারি।

রাজা হরিশ্চন্দ্র তাতেই রাজি হয়ে গেলেন।

যথাসময়ে রানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ফুটফুটে—যেন গোটা একটি চাঁদ। কোথাও কোন কলঙ্ক নেই। রাজা তার নাম রাখলেন রোহিত।

সবেমাত্র আপন মনে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করতে শুরু করেছে শিশুটি, বরুণদেব এসে হাজির—কই গো রাজা, যজ্ঞের কথা ভুলে গেলে নাকি ?

—না বরুণদেব। এই তো সবে হয়েছে। দশ দিন যাক।

দশ দিন পেরিয়ে যেতে এলেন বরুণদেব। বললেন—কই গো রাজা ?

—যজ্ঞে বলি হিসেবেই যখন ছেলেকে দিতে হবে তখন দাঁত না ওঠা পর্যন্ত তো দেওয়া যায় না। বরুণদেব, দাঁতটা উঠুক, অবশ্যই পুত্র-মাংসে দিয়ে যজ্ঞ করব। আরও দশটা দিন যাক।

কথাটা ঠিক। আবার দশ দিন পর এলেন বরুণদেব।

হরিশ্চন্দ্র বললেন—দুধের দাঁত। ওগুলো পড়ে আবার দাঁত উঠুক। তখন নিশ্চয়ই যজ্ঞ করব।

দাঁত পড়ল। আবার নতুন দাঁত উঠল। বরুণদেব এলেন। কই রাজা, এবার যজ্ঞ কর।

হরিশ্চন্দ্র বললেন—ক্ষত্রিয়বংশে জন্মেছে শিশু। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অস্ত্রবিদ্যা শেখা। সেটুকু শিখিয়ে না দিয়ে যজ্ঞ করলে যে যজ্ঞের হানি হবে। আপনিই বলুন, বরুণদেব, ঠিক বলেছি কিনা ?

একেবারে মিথ্যা নয়। চুপ করে গেলে বরুণদেব।



অস্ত্রবিদ্যা শিখতে শুরু করল রোহিত।

তখনকার দিনে তীর-ধনুকই ছিল প্রধান হাতিয়ার। সেটা যে ভালভাবে শিখতে পারত, সে-ই হতো বড় বীর।

অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল রোহিত। দেখতে দেখতে বয়সও হয়ে গেল ষোল বছর। সুঠাম দেহ। যুবক রোহিত। তখন তার দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয় এমন সাধ্য কার? নিয়মমত হরিশ্চন্দ্র তখন রোহিতকে যৌবরাজ্যে বসালেন। প্রজাদের জানালেন তাদের ভবিষ্যৎ রাজা রোহিত।

রোহিতকে যখন যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হয়ে গেল সেই সময় আবার এলেন বরুণদেব।

—রাজা, এখন তো আর তোমার যজ্ঞ করতে কোন বাধা নেই।

সত্যিই তো। আর কি ওজর-আপত্তি তুলবেন হরিশ্চন্দ্র! এদিকে ছেলের ওপর মায়া পড়ে গেছে, মুখ ফুটে কিছু বরুণদেবকে বলতেও পারছে না।

—কই গো রাজা। চুপ করে কেন? বল, তাহলে কখন যজ্ঞ করছ?

রাজ্যের ভাবী রাজা রোহিত। তেজীয়ান যুবক। এখন তো আর ইচ্ছে করলেই তাকে নিয়ে কিছু করতে পারেন না। রোহিতকে ডেকে আদ্যোপান্ত খুলে বললেন রাজা।

শুনে রোহিত বসল বেঁকে। পুত্রস্নেহে রাজাও এমনি হয়ে গিয়েছিলেন যে রোহিতকে কিছু বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। তাই দেখে বরুণদেব গেলেন ভীষণ রেগে। অভিসম্পাত দিয়ে বসলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রকে—তোমার উদরী রোগ হোক।

অভিসম্পাত দিয়ে বরুণদেব তো রেগেমেগে চলে গেলেন।

ধনুক-বাণ হাতে অযোধ্যার ভাবী রাজা হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রোহিত বেরিয়েছে শিকারে। শিকারও হবে, আবার ঘুরে ঘুরে সব দেখাও হবে।

রোহিত দেখল অনেক কিছু। দেখল গঙ্গার ধারে অনেক তপোবন, অনেক আশ্রম। দেখল অনেক মুনি ঋষিকে। তাঁদের মধ্যে অজীগর্ত নামে এক জন বৃদ্ধ ঋষি আর ঋষিপত্নীকে দেখে খুবই মায়া হল রোহিতের। একে বৃদ্ধ, তায় জীর্ণ। দেখলেই মনে হয় ভাবনা-চিন্তায় ঋষি-দম্পতির অবস্থা বুঝি বা দারুণ কাহিল হয়ে পড়েছে। খবর নিয়ে জানল রোহিত, ঋষির তিন ছেলে। তাদের নাম শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ আর শুনঃলাঙ্গুল। পাঁচজন নিয়ে ঋষির পরিবার। কিন্তু এমন সামর্থ্য নেই যে, সকলের মুখে অন্ন দিতে পারেন, কাপড়-চোপড় তো দূরের কথা। তার ওপর এমন কোন মহানুভবও নেই, যিনি ওদের মধ্যে একজনকে কিনে নিয়ে বাকি কয়েকজনের একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেন।

এমন সময় অযোধ্যা থেকে খবর এল, হরিশ্চন্দ্রের দারুণ বাড়াবাড়ি, উদরী রোগে বুঝি বা তাঁর প্রাণ যায়। কুলগুরু বশিষ্ঠ বলেছেন, রাজাকে প্রাণে বাঁচানো যেতে পারে যদি সেই যজ্ঞ করা যায়। বরুণদেবের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া নরমেধ যজ্ঞ।

খবর পেয়ে রোহিত চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল বাবার কথা, বরুণদেবের অভিশাপ। কিন্তু নিজের জীবনের ওপর তখন তার এতই মায়া হয়ে গেছে যে, এই বয়সে বাবার জন্যে সে নিজে মরতে রাজি নয়। অথচ যজ্ঞও করতে হবে, প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গার অপরাধ থেকে বাবাকে মুক্তও করতে হবে।

এই সব ভেবে রোহিত হাজির হল সেই ঋষি অজীগর্তের কাছে। বলল—ঋষি, আমি তোমার একটি ছেলেকে কিনতে চাই।

ঋষি জানতে চাইলেন—কারণ?

রোহিত বলল—কারণ, বাবা নরমেধ যজ্ঞ করবেন। তার জন্যে বলির দরকার।

শুনে অজীগর্ত বললে—উত্তম প্রস্তাব। আমার বড় ছেলে শুনঃপুচ্ছকে আমি দিতে পারব না। ছোট ছেলে শুনঃলাঙ্গুলকে ওর মা ছাড়বে না। তুমি বরং আমাদের মেজ ছেলে শুনঃশেফকে নিয়ে যেতে পার।

—বেশ। কি মূল্য নেবেন বলুন।

—এক হাজার গরু, এক হাজার সোনার মুদ্রা, এক হাজার টুকরো বস্ত্র আর সুপ্রচুর ধান। যদি দিতে পার ছেলেকে আমার নিয়ে যাও।

খুব চড়া দামই চেয়ে বসলেন অজীগর্ত। রোহিত তা বুঝতে পেরেও কোন দর কষাকষি করল না। যা চেয়েছিলেন অজীগর্ত তাই দিয়েই রোহিত কিনে নিয়ে গেল শুনঃশেফকে।

হরিশ্চন্দ্র সব শুনে বললেন—না, তা হয় না। শুনঃশেফ ব্রাহ্মণ সন্তান। আমাদের সকলের পূজনীয়। তাকে বধ করে, তার মাংস দিয়ে যজ্ঞ করে আমি নিজে বাঁচতে চাই না।

এখন আর না বললে উপায় কি। যজ্ঞবেদী সাজানো হয়ে গেছে। বশিষ্ঠ, বামনদেব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিঋষিদের সঙ্গে পুরোহিতরাও এসে গেছেন। যজ্ঞ তো করতেই হয়। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে রাজি করালেন রাজাকে।

এবার বিশ্বামিত্র সকলকে ডেকে বললেন—আপনারা তাহলে শুনঃশেফকে যজ্ঞের বলি হিসেবে অনুমোদন করছেন তো?

সকলেই সম্মতি জানালেন।

বিশ্বামিত্র আবার বললেন—তাহলে ব্রাহ্মণ পুত্র শুনঃশেফকেই আপনার এই যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেবার অনুমোদন দিচ্ছেন তো?

আবার সকলেই সম্মতি জানালেন।

বিহ্বল শুনঃশেফ। বাঁচার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। বুকের ভেতরটা তার মুচড়ে উঠতে লাগল।

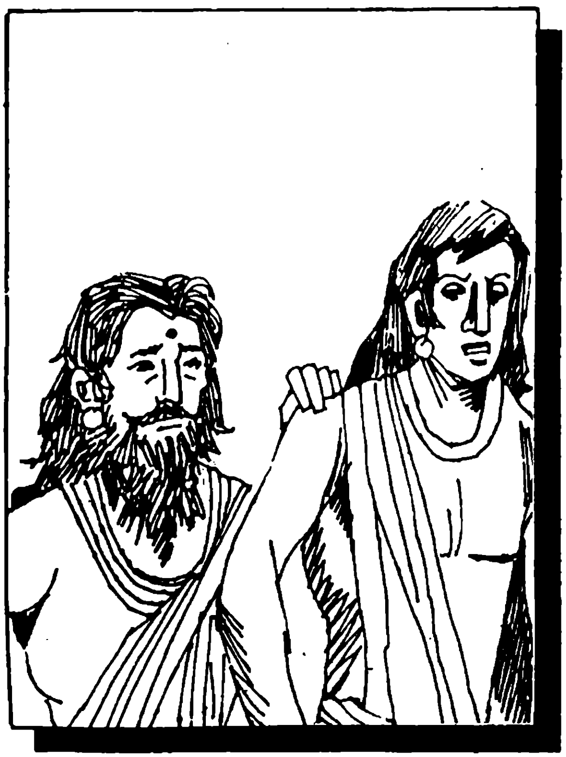
শুনঃশেফ যে কতখানি আকুল হয়ে পড়েছে, তা কিন্তু ভালভাবে বুঝতে পারলেন বিশ্বামিত্র। বললেন তাকে—যাও, গোদাবরীতে স্নান করে দেবতাদের উদ্দেশে স্তব কর।

শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের কথামত গোদাবরীতে স্নান সেরে একমনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্তব-স্তুতি করল দেবতাদের।

দেবতারাও তার স্তবে এতই সন্তুষ্ট হলেন যে, বিশ্বামিত্রের সামনেই তাঁরা আর্বিভূত হয়ে বললেন—আমরা বলছি, শুনঃশেফকে আহুতি না দিলেও রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ পূর্ণ হবে। আর যজ্ঞের ফল সে পুরোপুরি পাবে।

সেখানে বশিষ্ঠ থেকে শুরু করে যে ঋষি আর পুরোহিতরা ছিলেন সকলেই শুনলেন ওই কথা।

মুক্তি পেল শুনঃশেফ। নির্বিঘ্নে যজ্ঞও হয়ে গেল, রাজাও নিরাময় হয়ে উঠলেন।



সব যখন শেষ হয়ে গেল, সকলকে ডেকে বিশ্বামিত্র বললেন—দেবতাদের নির্দেশে আমি এই শুনঃশেফকে আমার বড় ছেলে হিসেবে গ্রহণ করছি।

কে আর কথা বলবেন বিশ্বামিত্রের ওপর? তিনি স-স্নেহে শুনঃশেফকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন নিজের আশ্রমে। ছেলেদের ডেকে বললেন—আজ থেকে এল তোমাদের বড় দাদা। দেবতার অনুগ্রহে আমি একে পেয়েছি। যদিও এর নাম শুনঃশেফ, তবুও আজ থেকে ও আমার বড় ছেলে দেবরাত। তোমরা সেইমত সম্মান দেবে একে।

বিশ্বামিত্রের দাপট

বহুকাল আগের কোন এক সময়।

ঋষি বিশ্বামিত্রের তখন দুর্দান্ত দাপট। শিষ্যও তাঁর অনেক। তাঁদের নিয়ে প্রায়ই তিনি তখন ঘুরে বেড়াতেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। ঘুরতে ঘুরতে মনের মত কোন এক জায়গায় কিছুদিনের জন্যে আশ্রম করে বসতেন। আর যাগযজ্ঞ করতেন।

একবার এমনিভাবেই ঘুরতে ঘুরতে ঋষি এসে আশ্রম তৈরি করে বসেছেন গোদাবরীর তীরে। করে চলেছেন যাগযজ্ঞ। উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য অগ্নিতে দিয়ে, পিতৃগণ ও দেবগণকে তা ভক্তিভরে নিবেদন করে তারপর নিজে খেতেন। এদিক থেকে তাঁর নিষ্ঠার তুলনা ছিল না।

সেই সময় হঠাৎ কয়েক দিন ধরে হল অনাবৃষ্টি। আকাশে চড়া রোদ। শুকিয়ে যেতে লাগল ক্ষেতের ফসল। জলের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে লাগল গাছের ফল। ক্রমশ কমে যেতে লাগল খালবিলের জল।

সকলেই চেয়ে আছে আকাশের দিকে। কতদিন আর? এবার বৃষ্টি নামল বলে!

কিন্তু মানুষের আশায় পড়ল ছাই। যত দিন যেতে লাগল, আকাশ ততই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠতে লাগল। কার সাধ্য তাকায় আকাশের দিকে? কাঠ-ফাটা রোদ এসে মাটিতে পড়তে শুরু করল—যেন আগুনের হলকা। পৃথিবীতে যেটুকুও শস্য ছিল, ছিল ফল-পাকড়-জল, সব গেল শুকিয়ে। প্রজাদের মধ্যে উঠল হাহাকার।

বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তখনও ঠিকঠিক মত চলেছে যাগযজ্ঞ। টের পান নি ঋষি তখনো, আশ্রমের বাইরে তখন কি বীভৎস কাণ্ড ঘটে চলেছে। জমানো শস্য ফলমূল ফুরিয়ে গেল, শিষ্যদের নিয়ে ঋষি বেরোলেন বাইরে ফলমূল সংগ্রহ করতে। যজ্ঞের জন্য যে আগুন একবার জ্বালা হয়েছে, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আর আগুন নেভানো যায় না।

বাইরে বেরিয়েই বিশ্বামিত্রের চক্ষু স্থির।

এ কি! চারদিকে যে দাবানল। ধূ-ধূ করছে মাঠ-ঘাট। ফেটে-ফুটে চৌচির সব। কোথাও এতটুকু শস্যদানা নেই। জল নেই। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন, পেটে খিদে নিয়ে কত মানুষ অসহায়ের মত বসে বসে ধুঁকছে। সহ্য করতে না পেরে মরে পড়ে আছে কত বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কিশোর। যতই দেখেন তিনি, ততই দেবতাদের ওপর আক্রোশে ফুঁসে ওঠেন। তাঁদের সেবা-পরিচর্যার কোথাও ত্রুটি তো নেই, তবুও নিরীহ প্রজাদের ওপর এ কি অবিচার।

খিদে তাদেরও পেয়েছে। ওদিকে যজ্ঞের আগুন জ্বালা আশ্রমে। প্রাণধারণের জন্যে তাঁদের তো কিছু খেতেই হবে।

আশ্রমে ফেরার পথে ঋষির চোখে পড়ল এক মরা কুকুর। শিষ্যদের বললেন—এটাকেই তুলে নিয়ে চল। অগ্নিদেবকে দিয়ে, দেবতা ও পিতৃপুরুষদের নিবেদন করে যেটুকু থাকবে, সেটুকু দিয়েই আজকের দিনটা চালিয়ে দিই।

গুরুর আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যরা সেই মরা কুকুরটা তুলে নিয়ে চলে এল আশ্রমে। তারপর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে, কেটে-কুটে, জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে রাখল একটা পাত্রে।

দেখে তো অগ্নিদেব গেলেন কুঁকড়ে। বিশ্বামিত্রের হাতে শেষে এই অখাদ্য খেতে হবে?

গোপনে অগ্নিদেব একজন দূতকে পাঠালেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে, সব খবর দিয়ে—শেষে কি বিশ্বামিত্রের হাতে জাত-ধর্ম খোয়াতে হবে?

—না-না। তা কি করে হয়। তুমি যাও। অগ্নিদেবকে গিয়ে বল, যা ব্যবস্থা করার আমি করছি।

ফিরে এল দূত। জানাল অগ্নিদেবকে। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

এদিকে ইন্দ্র করলেন কি, শ্যেন (বাজ) পাখির রূপ ধরে ছোঁ দিয়ে শিষ্যদের সামনে থেকেই সেই মাংসভর্তি পাত্রটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত বিশ্বামিত্র বসে আছেন আসনে। শিষ্যরা এসে তাঁকে এই খবর জানাতেই বিশ্বামিত্র বুঝলেন এ কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। নিশ্চয়ই কারও কোন দুরভিসন্ধি আছে।

বসলেন ধ্যানে। বিশ্বামিত্রের মত তেজস্বী ঋষি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন, ঐ বাজপাখি আর কেউ নয়, স্বয়ং ইন্দ্র। এই দুরভিসন্ধি দেবরাজেরই। রেগে আগুন বিশ্বামিত্র। তিনি দেবরাজকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠলেন ইন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রেখে দিয়ে গেলেন এক পাত্র মধু।

কোথায় ছিল কুকুরের মাংস, আর তার জায়গায় মধু! বিশ্বামিত্র গেলেন আরো রেগে। ইন্দ্রকে ডেকে বললেন—দেবরাজ, ভাল চাও তো তোমার এই মধু ফিরিয়ে নিয়ে নাও। আমি যা সংগ্রহ করে এনেছিলাম সেই মাংসই রেখে যাও।

ইন্দ্র বললেন—ও যে কুকুরের মাংস! মানুষ থেকে শুরু করে কি পিতৃপুরুষ, কি দেবগণ সকলেরই যে অভক্ষ্য! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি, আপনার তো তা অজানা নয়।

—আমাকে তোমায় নতুন করে জ্ঞান দিতে হবে না ইন্দ্র। বরং আমি যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দাও তো।

—বলুন।

—যেগুলো মানুষের খাদ্য, যা খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে, পিতৃপুরুষ আর দেবতাদের তো সে তা-ই নিবেদন করে, তাই না? নিবেদন না করে তো খাওয়া যায় না।

—ঠিকই বলেছেন, ঋষিবর। সেই কারণেই আপনাকে আর আপনার শিষ্যদের জন্যে মধুর ভাণ্ড দিয়েছি। শিষ্যদের সঙ্গে আপনি তা নিবেদন করে পান করুন।

আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন বিশ্বামিত্র—কি বললে ইন্দ্র? আমি আর



আমার শিষ্যরা খাব মধু! যেখানে রাজ্যের মানুষ খিদের জ্বালায় না খেতে পেয়ে মরছে, সেখানে আমরা খাব মধু, আর তাই নিবেদন করব! না, ঐ কুকুরের মাংসই আজ আমি দেবতা, পিতা-পিতামহদের খাওয়াব, নিজেরাও খাব। এতে কোন পাপ নেই, কোন অধর্ম এতে হবে না। তুমি না দেবরাজ? পৃথিবীকে শস্য-শ্যামল করে মানুষকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা তোমার দায়িত্ব নয়?

ইন্দ্র এবার পড়লেন মহা ফাঁপরে। কোনরকমে বিশ্বামিত্রকে নিবৃত্ত করে সঙ্গে সঙ্গে মেঘদের ডেকে বললেন বারি বর্ষণ করতে।

দূর হয়ে গেল সেই আগুনঝরা রোদ। আকাশ ঢেকে গেল মেঘে। উঠল গুরু গুরু গর্জন। নামল বৃষ্টি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মানুষ। ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছিল পৃথিবীর, অল্পদিনের মধ্যেই তা পূরণ হয়ে গেল। হাসি ফুটল পৃথিবীর মানুষের মুখে।

বিষ্ণুমূর্তির ভ্রমণ কাহিনী

বহু, বহু যুগ আগের কথা। কত যুগ আগে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, অঙ্ক কষে তা বের করা গেলেও একের গায়ে যত শূন্য বসবে, তত সংখ্যা বলতে গেলে জিভ যাবে আটকে, দম যাবে ফুরিয়ে। তাই বলছি বহু, বহু যুগ আগে।

ব্রহ্মার একবার ইচ্ছে হল পৃথিবীর জন্য ভগবান বিষ্ণুর একটা পাথরের মূর্তি তৈরি করতে। কেননা ভগবান বিষ্ণুই যে এই সৃষ্টি পালক। কিন্তু কে করবে সেই বিষ্ণুমূর্তি?

অনেক ভেবে-চিন্তে ব্রহ্মা ডাকলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে।

বললেন—দেখ বিশ্বকর্মা, দেবতা থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেই দেখে মোহিত হয়ে যাবে, এমন এক অসাধারণ বিষ্ণুমূর্তি তুমি তৈরি কর পাথর দিয়ে।

ব্রহ্মার কথামত বিশ্বকর্মা লেগে পড়লেন কাজে। দিন নেই, রাত নেই, অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্যি সত্যিই কয়দিনের মধ্যেই এমন এক মূর্তি তৈরি করলেন, যার দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। মূর্তির চোখ টানা-টানা, ঝরে পড়ছে যেন অজস্র করুণা, গলায় বনমালা, পরনে পীত বসন। চার হাতে তার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম। যেন জীবন্ত প্রতিমা।

ভরে গেল ব্রহ্মার মন। শুভদিন দেখে, বেশ ঘটা করে ব্রহ্মা সুমেরু পর্বতের শিখরে প্রতিষ্ঠা করলেন সেই মূর্তি।

দেবরাজ ইন্দ্র একবার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে সেই মূর্তি দেখে ভাবে বিভোর হয়ে তাঁর পূজা তো করলেনই, আবার ফিরে যাবার সময় মূর্তিটি নিয়ে গিয়ে দেবলোকে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিনিয়ত তাঁর পূজা করে এমন শক্তি সঞ্চয়



করেছিলেন যে নমুচি আর বৃত্রের মত প্রবল পরাক্রান্ত অসুরদেরও অবহেলায় তিনি নিধন করতে পেরেছিলেন।

এল ত্রেতা যুগ। একদিকে অযোধ্যায় দশরথের ঘরে রামচন্দ্র, অপরদিকে লঙ্কার অসুররাজ রাবণ। রাবণ ছিল খুবই নিষ্ঠাবান। দশ হাজার বছর জল স্পর্শ পর্যন্ত না করে, নিদারুণ সংযমের মধ্যে থেকে সে ব্রহ্মাকে এমনভাবে ডাকতে লাগল যে সে ডাকে সাড়া না দিয়ে ব্রহ্মার কোন উপায় ছিল না। ব্রহ্মার বরে রাবণ হল সকলের অজেয়। ধনপতি কুবেরকে হারিয়ে সে কেড়ে নিল তার পুষ্পক রথ। তারপর স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করল। তার ছেলে মেঘনাদের হাতে ইন্দ্র হেরে গিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পালালেন। রাবণ তাঁর প্রাসাদ অমরাবতীতে ঢুকে সেই বিষ্ণুমূর্তি দেখে এমন মুগ্ধ হল যে সেটিকে নিয়ে সে পাঠিয়ে দিল লঙ্কায়, বিভীষণের কাছে। কেননা রাবণের অবর্তমানে বিভীষণই তখন রাজ্য চালাচ্ছিল। মূর্তিটি দেখে বিভীষণের এত ভাল লাগল যে সব কিছু ভুলে সে প্রায় সময় তারই দিকে তাকিয়ে থাকত, তার পুজো করত।

যেখানে যত যুদ্ধ-টুদ্ধ ছিল সব সেরে রাবণ লঙ্কায় ফিরে আসতেই বিভীষণ আবদার ধরল—দাদা, ঐ মূর্তিটা আমায় দাও। আমি রোজ ওর আরাধনা করব।

শুনে রাবণ বললেন—আপত্তি কি? নে। আমি শিবের আরাধনা করি। ঐ মূর্তিতে আমার আর কি দরকার?

বিভীষণ মনের আনন্দে ভাল একটা জায়গায় মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করে একশো আট বছর ধরে নিত্য তার পূজা করে অমরত্ব লাভ করেছিল।

ইতিমধ্যে রাবণ মদগর্বে সব দিক দেশ জয় করে এমন অত্যাচারী হয়ে উঠল যে স্ত্রীলোকদের সম্মান পর্যন্ত সে রাখল না। এমন কি, রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকেও ছদ্মবেশে হরণ করে এনে তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাল। রামচন্দ্র তাঁর হনুমান বাহিনী নিয়ে সাগরের ওপর সেতু বেঁধে লঙ্কায় এসে রাবণকে স-বংশে ধ্বংস করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। বিভীষণ রাবণের দলে ছিল না, তাই সে শুধু রক্ষাই পেল না, রামচন্দ্র তাকেই লঙ্কার রাজা করে ফিরে এলেন। রামচন্দ্র যখন সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন বিভীষণের দেওয়া পুষ্পক রথে, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই বিষ্ণুমূর্তি। যতদিন তিনি রাজত্ব করেছিলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে সেই মূর্তি পূজা করেছিলেন।

ত্রেতা পেরিয়ে এল দ্বাপর যুগ। পৃথিবীতে নেমে এল অনাচার। প্রবল হয়ে উঠল অধর্ম। কংস, শিশুপাল প্রভৃতি দুষ্ট রাজাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল মানুষ। তখন পৃথিবীকে এই অশান্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ভগবান বিষ্ণু বসুদেবের ঘরে 'বাসুদেব' নামে জন্মগ্রহণ করলেন।

তখন সমুদ্র নিজেই সেই বিষ্ণুমূর্তিকে জল থেকে উদ্ধার করে রাখল পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (উড়িষ্যার জগন্নাথধাম)।

সেই হল বিষ্ণুমূর্তির শেষ ভ্রমণ। সেখানেই রয়ে গেলেন তিনি। আর আজও আছেন সেখানেই।



তিন শ্বেতের কাহিনী

॥ ১ ॥

আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে তখন চলেছে সত্যযুগ। সে সময় মানুষের পরমায়ু ছিল দশ হাজার বছর। শিশুমৃত্যু কি জিনিস তা কেউ জানত না। কোথাও কোন অশান্তি ছিল না, শোক-দুঃখ ছিল না।

সেই সময় শ্বেত নামে একজন রাজা ছিলেন। যেমন বীর, তেমনি বুদ্ধিমান। তিনি রাজত্ব করেছিলেন হাজার বছর। বেশ

সুন্দরভাবে চলেছে তাঁর রাজত্ব, কোথাও কোন বিপর্যয় নেই।

এক বার তাঁর রাজত্বে ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা।

কপালগৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। পরম ধার্মিক। সব সময় ধর্ম-কর্ম নিয়েই থাকতেন।

এক সময় তাঁর একটি ছেলে হল। ভারি সুন্দর ছেলে। ছেলের মুখ দেখে ঋষি আর ঋষিপত্নীর আনন্দের সীমা নেই।

মাত্র কয়েক মাস কেটেছে। দাঁত ওঠে নি তখনো। পা টেনে টেনে হামাগুড়ি দিয়ে ইতিমধ্যেই ঘুরে বেড়ায় শিশু আশ্রম প্রাঙ্গণে। ঋষি আর ঋষিপত্নী চেয়ে চেয়ে দেখেন, আর তাঁদের মন ভরে ওঠে আনন্দে।

হঠাৎ একদিন হল বিনা মেঘে বজ্রপাত। সুস্থ-সবল ছেলে, কোন রোগ-বালাই নেই, হঠাৎ মারা গেল। কেঁদে-কেটে বুক ভাসালেন ঋষিপত্নী। ঋষির মনেও খুব কষ্ট। এমন তো হবার কথা নয়। তবে কেন এমন হল?

এখনও কত কি তাঁর ভোগ করার রয়েছে। অথচ শুক্রাচার্যের শাপে অকালে তাঁকে জরা বরণ করতে হবে। এ যে বেঁচে থেকেও এক রকম মরার সামিল।

কপালগৌতম গেলেন রাজা শ্বেতের কাছে। মৃত শিশুটিকে নিয়ে শোনালেন তাঁর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা। শুনে রাজাও হলেন খুব মর্মাহত। তাঁর রাজত্বে এমন ব্যতিক্রম হল কেন? আহা, কেমন সুন্দর শিশু! অকালে প্রাণ গেল এই যুগে, আর তিনি থাকতে? রাজা হয়ে এমন কোন অধর্ম তো তিনি কখনও করেন নি, যাতে তাঁর রাজত্বে কাউকে অকালে প্রাণ দিতে হবে?

ঋষিকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা বললেন—ঋষিবর! আমি আপনার কাছে এই মৃত শিশুর সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, সাত রাতের মধ্যে যদি এর প্রাণ আমি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তাহলে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেব।

এই বলে রাজা শ্বেত বসলেন শিবের ধ্যানে।

দিন নেই, রাত নেই। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। রাজা শ্বেত একাগ্রমনে ডেকে চলেছেন শিবকে। তাঁর সেই ডাকে শিব আর স্থির থাকতে না পেরে সশরীরে এলেন শ্বেতের কাছে। বললেন রাজা, তোমার নিষ্ঠা আমায় মুগ্ধ করেছে। বল, কি তোমার চাই।

শ্বেত বললেন—মহাদেব! একটাই মাত্র প্রার্থনা, আমার রাজ্যে যে ব্রাহ্মণ শিশুটি মারা গেছে, আপনি তার প্রাণ ফিরিয়ে দিন। শুধু তাই নয়, স্বাভাবিক যে আয়ু, আপনি তাকে তাও দিন।

মহাদেব সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন যমরাজকে। বললেন—যমরাজ, কাজটা তোমার ঠিক হয় নি। আমি বলছি তুমি ঐ ঋষিপুত্রটির জীবন ফিরিয়ে দাও।

যমরাজ আর কি করেন। বাধ্য হলেন শিশুটির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল রাজার। রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল।

॥ ২ ॥

মহামুনি গৌতমের এক পরম ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম শ্বেত।

শ্বেত ছিলেন দারুণ শিবভক্ত। শিবপূজা না করে, জপ-তপ শেষ না করে তিনি জলস্পর্শ করতেন না।,

এই ভাবে সারাটা জীবন কাটিয়ে একদিন এল শেষ সময়। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ফুরিয়ে এসেছে আয়ু। আর কতক্ষণই বা। শিবভক্ত শ্বেত এই সময়টুকুতেও করে চলেছেন শিবের জপ।

পৃথিবীতে কোথায় কার কখন আয়ু ফুরোচ্ছে, কাকে নিয়ে আসতে হবে, তা তো আর অজানা নেই যমরাজের। তাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে অনুচরদের পাঠিয়ে দিলেন শ্বেতের কাছে। বলে দিলেন— পাশে বেঁধে শ্বেতকে নিয়ে এসো। বেশি দেরি কোরো না যেন।

তক্ষুণি চলে এল অনুচররা। এ তো আর তাদের নতুন কোন কাজ নয়। কিন্তু শ্বেতের বাড়ি এসেই ঘটল বিপত্তি। এ কি, দোরগোড়ায় এসে সেই যে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—ব্যস।

এদিকে অনেকখানি সময় চলে গেল, যমরাজের আর খেয়ালই নেই। অনুচর চিত্রকের হঠাৎ টনক নড়ে উঠল। যমরাজের কাছে গিয়ে বলল—প্রভু! ওদের যে শ্বেতকে আনতে পাঠালেন, সে তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। না ফিরল ওরা, না এল শ্বেত। এমন তো বড় একটা হয় না।

সজাগ হয়ে উঠলেন যমরাজ—ঠিক, ঠিক বলেছ চিত্রক। এমন তো হয় না। কেন এই বে-নিয়ম হবে। বলেই হাঁক দিলেন মৃত্যুকে।

ডাক শুনেই হাত জোড় করে এসে দাঁড়াল মৃত্যু। যেমন বিকটাকার, তেমনি ভয়ঙ্কর।

—প্রভু, আজ্ঞা করুন।

পাশ নিয়ে তুমি এখনই যাও। কোন কথা নয়, শ্বেতকে বেঁধে নিয়ে এসো।

লম্ফঝম্ফ করে পাশ নিয়ে মৃত্যু তো তখুনি ছুটল শ্বেতের বাড়ির দিকে। গিয়ে দেখে, অনুচররা সব শ্বেতের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। দেখে তো মৃত্যু অবাক।

—কি ব্যাপার? তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ধমক দিয়ে ওঠে মৃত্যু।

—কি করব, ঢুকতে না পারলে? ভেতরের দিকে একবার চেয়ে দেখ না। স্বয়ং শিব ব্রাহ্মণ শ্বেতকে আগলে রেখেছেন। আমরা ভালভাবে তাকাতেই পারছি না, তো কাছে যাওয়া।

মৃত্যু দেখল, দণ্ডধারী শিবের সব অনুচররা দাঁড়িয়ে শ্বেতের কাছে। তাতে কি এল গেল? সে-ও কিছু কম যায় নাকি? পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা স্বয়ং যমরাজের বিশেষ দূত সে। বুক ফুলিয়ে মৃত্যু এসে দাঁড়াল শ্বেতের কাছে। শিবজপে মগ্ন। শ্বেতের এসব দিকে কোন খেয়ালই নেই।

হঠাৎ পাশধারী মৃত্যুকে সেখানে দেখে শিবের এক অনুচর জিজ্ঞেস করল—কি হে, তুমি এখানে কি মনে করে?

—কি আবার? শ্বেতের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। নিয়ে যেতে এসেছি প্রভুর আদেশে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বেতকে লক্ষ্য করে মৃত্যু ছুঁড়ল পাশ।

শিবের অনুচররাও তক্ষুণি দণ্ড দিয়ে পাশ টুকরো টুকরো করে সেই দণ্ড মৃত্যুর মাথার ওপর তুলে গর্জন করে উঠল—জানিস না, শিবের যারা ভক্ত, তাদের গায়ে হাত দেওয়ার কোন অধিকার তোর প্রভুর নেই?

বলতে বলতেই সেই উদ্যত দণ্ড এমন জোরে নেমে এল মৃত্যুর মাথায় যে মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়ে সে নিজেই মারা গেল। তাই দেখে যমদূতেরা দে ছুট যমপুরীর দিকে।

কোনরকমে প্রাণ নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে তারা সব কথা শোনাল যমরাজকে। শুনে তো যমরাজ রেগে আগুন। হাঁক দিলেন তাঁর প্রধান অনুচর চিত্রগুপ্ত থেকে মহিষ, ভূত, বেতাল, আধি, ব্যাধি ইত্যাদি যত তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল সবাইকে।

সব্বাই জড়ো হতেই যমরাজ বললেন—চল, আমার সঙ্গে শ্বেতের বাড়ি। আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে শিবের অনুচররা? এ আমি কোনমতেই বরদাস্ত করব না।

এদিকে শ্বেতের বাড়িতে তখন কার্তিক, গণেশ, নন্দী এসে হাজির হয়ে গেছেন। দাঁড়িয়ে পড়েছেন সবাই শিব আর শিবানুচরদের পাশে।

হঠাৎ সদলবলে যমরাজকে আসতে দেখে সবাই সজাগ হয়ে উঠলেন। উদ্দেশ্য বুঝতে বাকি থাকল না এঁদের। সঙ্গে সঙ্গে সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

দূর থেকেই এঁদের দেখে লম্ফঝম্ফ, আস্ফালন করতে করতে যমরাজ যেই কাছাকাছি এগিয়ে এলেন, ঝাঁপিয়ে পড়লেন এঁরা।

বেধে গেল দু পক্ষের তুমুল লড়াই। কার্তিক তো একাই একশো। তাঁর প্রহারে যমদূতেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মারা গেল বেশ কিছু অনুচর। এমন কি, স্বয়ং যমরাজও রেহাই পেলেন না। প্রাণহীন দেহ নিয়ে তিনিও লুটিয়ে পড়লেন। তারই মধ্যে যারা বেঁচে রইল তারা ছুটল যমরাজের বাবা সূর্যের কাছে। সূর্য শুনে পুত্রশোকে কাতর হয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। এদিকে সূর্য আর ব্রহ্মার কাছে একে একে এসে জড়ো হতে লাগলেন ভগবান বিষ্ণু থেকে শুরু করে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, মরুদগণ—সব এক এক দিকের লোকপালরা। আর ওদিকে মৃত যমরাজকে দেখার জন্যে জড়ো হতে লাগল পৃথিবীর যে যেখানে ছিল, সব্বাই।

ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তাবৎ লোকপালরা যুক্তি পরামর্শ করে একটাই মাত্র উপায় বের করলেন। তা হল শিবকে যে ভাবেই হোক সন্তুষ্ট করতে হবে। তুষ্ট করে যমরাজের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে হবে। রাগিয়ে দিলে আরো সর্বনাশ।

সবাই মিলে তখন তাঁরা গেলেন শিবের কাছে। যে যেভাবে পারলেন, শিবের প্রশংসা করলেন, স্তব-স্তুতি করলেন।

শুনতে শুনতে শিবের রাগও এল কমে। তাঁদের সামনে এসে বললেন—বল, তোমরা কেন এসেছ। কি চাও?

দেবতারা বললেন—দেবাদিদেব, অনুগ্রহ করে যমরাজকে বাঁচিয়ে দিন।

—যম আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। তা হয় না, তোমরা অন্য বর চাও।

—আপনি দেবাদিদেব, আমাদের সকলের পূজনীয়। আমরা সবাই আপনাকে সম্মান করি। আপনার আদেশ মেনে চলি। এই পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন—এসব এক-একটা দায়িত্ব তো আপনিই আমাদের দিয়েছেন। আমরা সকলেই সেই নিয়ম মেনে চলেছি। এই যমকেও যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেবাদিদেব, সে তো সেইটুকুই নিয়মমত পালন করতে এসেছিল। এতে তো তার কোন অপরাধও দেখছি না, পাপও দেখছি না। বললেন দেবতারা।

শিব বললেন—আমার যারা ভক্ত, তাদের ওপর যমের কোন অধিকার নেই। শ্বেত আমার একজন পরম ভক্ত। যম কোন্ সাহসে আসে তাকে যমালয়ে নিয়ে যেতে? এটা তার কাজ নয় তবু তোমরা যখন এসেছ, যমের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারি একটা শর্তে। সেই শর্তে তোমরা যদি রাজি থাক।

—বলুন, আপনার শর্ত।

—শিবভক্তদের যম কখনই যমালয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—এই শর্তে তোমরা যদি রাজি থাক, তাহলে ওর প্রাণ আমি ফিরিয়ে দিতে রাজি আছি।

শুনে দেবতারা একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আপনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, বিচক্ষণ। আপনাকে আমরা আর কি বলব? তাই যদি হয়, তাহলে কি পৃথিবীর নিয়ম কি রক্ষা করা যাবে? কেউ তো আর মরবে না। মরলেও শিবলোকে গিয়ে অমর হয়ে থাকবে। স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর তো আর কোন পার্থক্যই থাকে না দেবাদিদেব।

শিব কিন্তু সব শোনার পরও আপন শর্ত থেকে একচুলও নড়লেন না। বললেন—এই শর্তে যদি রাজি থাক, তবেই তোমরা যমকে ফিরে পাবে। শুধু তাই নয়, যারা আমার ভক্ত হবে, তারা যমের পাঠানো কোন রোগ-বালাইতেও ভুগবে না। মেনে যদি নিতে পার, নাও। নচেৎ ফিরে যাও।

অগত্যা দেবতারা আর কি করেন। দেবাদিদেবের শর্তই মেনে নিলেন।

শিব তখন নন্দীকে ডেকে বললেন—গোদাবরীর জল এনে ওদের গায়ে ছিটিয়ে দাও।

জল গায়ে পড়তেই যমরাজ আর তার অনুচররা বেঁচে উঠে চলে গেল দক্ষিণ দিকে। দেবতারাও মহাদেবের পূজা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

॥ ৩ ॥

[যদিও এই কাহিনী ব্রহ্মপুরাণে নেই, আছে অন্যত্র, তবুও কাহিনীটি এখানেই বলছি। কারণ আগের দুটি কাহিনী যখন শ্বেতকে নিয়েই, আর এই কাহিনীও যখন আর এক শ্বেত-এর।]

সূর্যবংশের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ইক্ষ্বাকুর এক বংশধর ছিলেন শ্বেত। তিনি রাজত্ব করতেন বিদর্ভে। সন্দেহ নেই তিনি ছিলেন বেশ পরাক্রান্ত নরপতি। যতদিন রাজত্ব করেছেন, করেছেন নির্বিবাদে। শত্রুদের সাহস হয় নি তাঁকে ঘাঁটানোর।

বেশ কিছুকাল রাজত্ব করার পর হঠাৎ শ্বেত রাজার মনে এল বৈরাগ্য। রাজ্যপাট ছেড়ে তিনি চলে গেলেন জনস্থানে তপস্যা করতে।

তখন জনস্থান বলতে বোঝাত এখনকার দণ্ডকারণ্যকে।

সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় রাজা শ্বেত তুষ্ট করলেন ব্রহ্মাকে। আর ব্রহ্মার বরে পৃথিবীতে নিজের দেহ ত্যাগ করে চলে এলেন ব্রহ্মলোকে।

ব্রহ্মলোক অসীম এক আনন্দের জগৎ। এখানে খিদে নেই, তেষ্টা নেই। রোগ-শোক নেই। জরাব্যাধি নেই। কি আনন্দেই না ঘুরে বেড়ান সকলে।

শ্বেতের কিন্তু ঠিক উল্টো। সব সময়ই কেবল খাই খাই। ফলে ব্রহ্মলোকে এসেও মনে তেমন আনন্দ নেই শ্বেতের। কেন এমন হয়, কিছুতেই ভেবে পান না।

একদিন সুযোগ বুঝে শ্বেত ব্রহ্মাকে ধরলেন—দেব! আপনার এত কাছে থেকেও কেন আমার এমন হচ্ছে? কেন অহরহ আমি

এই জ্বালা বোধ করছি ?

শুনে ব্রহ্মা বললেন—শ্বেত, মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে যেসব কাজ করে, পরলোকে এসে তার ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। দেখ তো ভেবে, পৃথিবীতে তুমি যখন রাজা ছিলে, তখন তোমার সব কাজ ঠিক ঠিকমত করেছিলে কিনা। তপস্যার বলে তুমি ব্রহ্মলোকে এসেছ ঠিকই, কিন্তু তোমার কাজের ফল তুমি এড়াতে পারছ না।

ব্রহ্মার কথা শুনে শ্বেত অনেক ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক করুণ দৃশ্য।

অনাবৃষ্টির কবলে পড়ে সারা রাজ্যে একবার একটাও ফসল হয় নি। অনাহারে খিদের জ্বালা নিয়ে প্রজারা দলে দলে তাঁর কাছে এসেছিল দু মুঠো অন্নের আশায়। কিন্তু পাছে তাঁর গোলা ফুরিয়ে যায়, নিজেকে কষ্টভোগ করতে হয়, তাই একটা দানা দিয়েও কাউকে সাহায্য করেন নি। শুধু তাই নয়, তারই মাঝে যেখানে যা পেয়েছিলেন, রাজকোষে এনে ঢুকিয়েছিলেন। সব সময়ই দেখেছেন নিজের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য। ফিরেও তাকান নি কারো দিকে। খিদের জ্বালায় পেটে হাত চেপে ফিরে গেছে হাহাকার করতে করতে প্রজার দল।

দৃশ্যটা ভেসে উঠতেই শিউরে উঠলেন শ্বেত। ছি ছি, কি পিশাচের কাজ না তিনি করেছেন! এখন উপায়?

আবার শরণাপন্ন হলেন তিনি ব্রহ্মার। সব কিছু বললেন।

ব্রহ্মার তো আর কিছু অজানা ছিল না। তবুও শুনে বললেন—আমার এই আনন্দময় লোকে এসেও সেজন্যেই তোমার এই অবস্থা, শ্বেত।



—এখন এর থেকে মুক্তির উপায় কি, দেব?

—খুবই কঠিন। পারবে?

—পারতেই হবে। এ জ্বালার হাত থেকে আমি মুক্তি চাই।

—তাহলে শোন। বললেন ব্রহ্মা—জনস্থানে যেখানে বসে তুমি তপস্যা করেছিলে, সেখানকার সরোবরে এখনও তোমার শবদেহ ভাসছে। তোমার এই খিদের জ্বালা মিটবে তখনই, যখন তুমি গিয়ে তোমারই ঐ শবদেহের মাংস খাবে। তবে তুমি ঐ সময়েই মহামুনি অগস্ত্যের চোখে পড়ে যাবে। আর তিনিই তোমাকে মুক্ত করে দেবেন।

মুক্তিলাভের বাসনা নিয়ে শ্বেত এরপর ব্রহ্মলোক থেকে নেমে এলেন পৃথিবীতে। দেখলেন, দণ্ডকারণ্যে সেই সরোবরে সত্যিই ভাসছে তাঁর মৃতদেহ। তিনি আর দ্বিধা না করে শবদেহটি তীরে এনে খেতে শুরু করলেন।

এই ভাবে যখন নিজের মাংস নিজেই খাচ্ছেন শ্বেত, মহামুনি অগস্ত্য ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। জানতে চাইলেন—এ কি ব্যাপার।

নিঃসঙ্কোচে শ্বেত আদ্যোপান্ত সব কিছু অগস্ত্যকে বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গেল জ্বালা। অনুভব করলেন মনের ভেতর আনন্দের জোয়ার।

প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে মুনিবরকে প্রণাম জানিয়ে রাজা শ্বেত আবার ফিরে এলেন ব্রহ্মলোকে।



মহাশনি নিধন কাহিনী

মহা বলবান দৈত্য হিরণ্য, দেববরে অজেয়।

মহাশনি তারই ছেলে। আর তারই মত বলবান, যুদ্ধে ভীষণ।

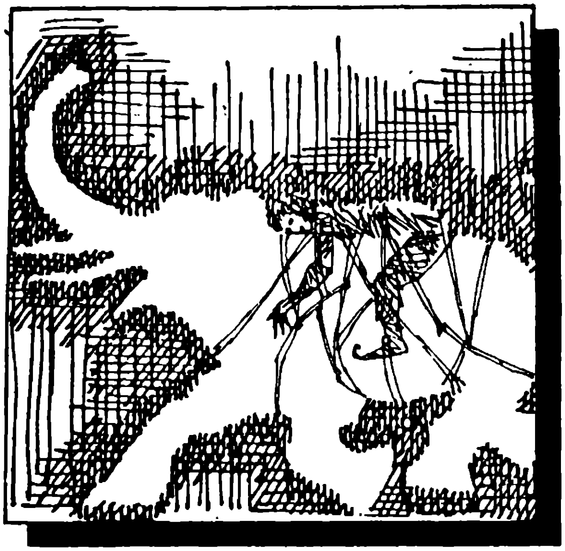
দেবকুলের সঙ্গে দৈত্যকুলের সংগ্রাম তখন মাঝে মধ্যেই ভীষণ আকার ধারণ করত। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্যপুত্র মহাশনির একবার শুরু হল এমনি এক ভীষণ সংগ্রাম। একবার দৈত্যকুল পিছু হটে তো দেবরাজ্যে ওঠে জয়োল্লাস। আবার দেবকুল পিছু হটে তো দৈত্যকুলে ওঠে মহা-উল্লাস। এভাবে যুদ্ধ চলল বহু দিন ধরে।

চলতে চলতে দেবরাজ্যে ঘটে গেল বিপর্যয়। হঠাৎ মহাশনি সুকৌশলে মদমত্ত ঐরাবতের সঙ্গে ইন্দ্রকে ধরে ফেলল। পালিয়ে বাঁচল দেবসেনারা। মহাশনি ঐরাবতের সঙ্গে ইন্দ্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে এল পাতালে তার বাবার কাছে। হিরণ্য মহা খুশি। চারদিকে কড়া পাহারার মধ্যে একটা ঘরে দৈত্যরাজ এমনভাবে ইন্দ্রকে আটকে রেখে দিল যে সাধ্য কি সেখান থেকে উদ্ধার পাবার।

দেবরাজ্য হল রাজাহীন। আর রাজা না থাকায় দেবতারা পড়লেন মহা চিন্তায়। ইন্দ্রকে উদ্ধার করে আনতে না পারলে স্বর্গরাজ্য যে অচল হয়ে যায়।

কিন্তু কিভাবে উদ্ধার করা যায়? লড়াই করে যে আর সম্ভব নয়, তা বেশ ভালই বুঝে নিয়েছেন দেবতারা।

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, শেষে তাঁরা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু সব শুনে বললেন—দেখ, বুঝতে পারছি তোমরা কতখানি অসুবিধেয় পড়েছ। কিন্তু মহাশনিকে কিছু করা আমার ক্ষমতার বাইরে। তবু দেখি, আপাতত ইন্দ্রকে উদ্ধার করে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।



এই বলে বিষ্ণু গেলেন বরুণদেবের কাছে। বললেন—বরুণ, দেবতাদের তুমিই একমাত্র ভরসা। তুমি চেষ্টা করলে মহাশনি ইন্দ্রকে ছেড়ে দিতে পারে।

কথাটা যে একেবারে অযৌক্তিক তা নয়। ইন্দ্রকে বন্দী করে মহাশনি যখন বরুণের পিছু ধাওয়া করেছিল, তখন বরুণ পাছে দৈত্যের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়, এই ভয়ে মহাশনিকে সাদর আহ্বান জানিয়ে তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। ফলে মহাশনি বরুণের কোন ক্ষতি না করেই বারুণীর সঙ্গে সমুদ্রকে যৌতুক নিয়ে চলে গিয়েছিল।

অনেক ভেবে তাই বিষ্ণু নিজেই এসেছিলেন বরুণের কাছে।

বিষ্ণুর অনুরোধ তো আর তাঁদের মত লোকপালদের কাছে নিছক অনুরোধ নয়, আদেশের সামিল। তাই বরুণ দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন মহাশনির কাছে। গিয়ে বললেন—দেখ, তোমাকে একটা কথা বলতে এলুম।

শ্বশুর বরুণদেবকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে মহাশনি বলল—কি বলুন।

—তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে ছেড়ে দাও।

—আপনি বলছেন?

—হ্যাঁ। এতে তো তোমার সম্মানের বা মর্যাদার কোন হানি হবে না। বরং পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে মর্যাদা আরো বাড়ে। বললেন বরুণদেব।

—বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন ছেড়েই দিচ্ছি। এই বলে পাহারা সরিয়ে বন্ধ ঘর থেকে মহাশনি বের করে আনল ইন্দ্রকে। তারপর ছেড়ে দেবার আগে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলল—তুমি কি দেবরাজ হবার যোগ্য? কে তোমাকে রাজা করেছে? যুদ্ধ করতে গিয়ে যে হেরে যায়, বন্দী হলে যে মুক্তি পাবার জন্যে সুপারিশ করে, তার মত একজন কাপুরুষ, নির্লজ্জ কিনা দেবরাজ! ছি···ছি···! বেরিয়ে গিয়ে আবার তো রাজপদেই বসবে। তোমার লজ্জা লাগছে না? খালি সুখভোগের ধান্ধায় থাকলে কি আর লজ্জা-শরম থাকে? তোমাকে আর কি বলব? শুধু একটা কথা বলে রাখি, যাঁর জন্যে তুমি আজ ছাড়া পেলে তিনি আমার সম্মানিত, আমার গুরুজন। যদি কখনো কানে আসে তুমি তাঁর ওপর কোন ঔদ্ধত্য দেখিয়েছ, তাহলে কিন্তু বেঁধে আবার পাতালে নিয়ে আসব। যাও।

মহাশনির এক একটা কথা তো নয়, যেন এক এক ঘা চাবুক। শুনতে শুনতে অপমানে লজ্জায় ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল ইন্দ্রের মুখ চোখ।

অমরাবতীতে ফিরে শচীর কাছে ইন্দ্র কিন্তু কিছুই গোপন করলেন না।

শুনে সমবেদনা জানিয়ে শচী বললেন—এখন বলছ, কিন্তু মহাশনির সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার আগে যদি আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে, তাহলে আজ তোমাকে এই দুরবস্থায় পড়তে হতো না! না জেনে কাজ করলে বড় জোর এক গুণ ফল পাওয়া যায়। আর জেনে কাজ করলে পুরো ফলই পাওয়া যায়। তুমি তো আগেভাগে কিছু জানার চেষ্টা কর নি। তাই ভাগ্যে যা ছিল, তাই ভোগ করেছ।

—সবই তো বুঝলাম শচী, কিভাবে মহাশনিকে বধ করে আমার এই অপমানের জ্বালা মেটাই বলতে পার? অমন দানবীর নমুচি গেল, বৃত্র গেল, আর শেষে কিনা মহাশনির হাতে এই লাঞ্ছনা।

—নিজেকে একটু শান্ত কর। বলেন শচী—আমি যা বলি শোন। তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, মহাশনি সম্পর্কে আমার ভাই। দানব হিরণ্য সম্পর্কে আমার কাকা। আমি দানবকুলের অনেক রহস্যই জানি। মহাশনি তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অবধ্য নয়। আর ওকে বধ করতে গেলে তোমাকেও তপস্যা করতে হবে। তুমি দণ্ডকারণ্যে যাও, সেখানে গোদাবরী তীরে বসে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে দেখ, মহাশনিকে নিধনের কোন হাতিয়ার পাও কিনা।

শচীর কথা শুনে ইন্দ্র তক্ষুণি অমরাবতী ছেড়ে চলে এলেন দণ্ডকারণ্যে। এক মনে মহাদেবের পূজা-স্তব-স্তুতি করে একদিন দেখা পেলেন তাঁর।

জিজ্ঞেস করলেন তিনি—ইন্দ্র, কিসের জন্য তোমার এই তপস্যা?

ইন্দ্র বললেন—দেবেশ! আমি মহাশনির নিধন চাই। আমাকে ঐ দানব যারপরনাই অপমানিত আর লাঞ্ছিত করেছে।

শিব বললেন—দেখ ইন্দ্র মহাশনি-নিধন আমার একার কর্ম নয়। আর একা আমি তোমাকে শক্তি দিলেও মহাশনিকে তুমি বধ করতে পারবে না।

—তাহলে, আপনার কি আদেশ বলুন।

মহাশনিকে বধ করতে গেলে আমার সঙ্গে তোমাকে বিষ্ণু শক্তিও নিতে হবে। তুমি বরং শচীমাকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুকে আরাধনা কর, তাঁকে তুষ্ট কর।

এবার শচীকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র বসলেন বিষ্ণুপূজা আর বিষ্ণুর ধ্যানে।

দিন কয়েকের মধ্যেই আবির্ভূত হলেন বিষ্ণু। জিজ্ঞেস করলেন—ইন্দ্র, কেন তোমার এই আহ্বান?

—ভগবান! আপনার তো অগোচর কিছু নেই। আমাকে সেই শক্তি দিন, যাতে আমি মহাশনিকে বধ করে আমার অপমান আর লাঞ্ছনার জ্বালা জুড়োতে পারি।

ইন্দ্রের প্রার্থনা শেষ হতেই সামনে গঙ্গার ভেতর থেকে অদ্ভুত এক ভীষণাকার মূর্তি উঠে এল। দেখতে না-শিব, না-বিষ্ণু অথচ তার এক হাতে চক্র আর এক হাতে ত্রিশূল।

ভীমগর্জনে সেই মূর্তি উঠে এসেই ছুটে গেল পাতালে। দানবদের অমন সুরক্ষিত প্রাসাদ। তবু সেই ভীমকায়কে রোখে কে?

নিহত হল মহাশনি। আশা মিটল ইন্দ্রের। নিশ্চিন্ত হলেন দেবকুল।



রাজার পরীক্ষা ও ব্রহ্মর্ষির সাধনা

শর্যাতি নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা নিজে ছিলেন যেমন সুপুরুষ আর বীর, তাঁর রানী স্থবিষ্টাও ছিলেন তেমনি রূপে গুণে অতুলনীয়া।

বিশ্বামিত্রের পুত্র যুবক মধুচ্ছন্দা। সেই বয়সেই তিনি ব্রহ্মর্ষি। তিনি ছিলেন একদিকে রাজপুরোহিত, আবার রাজা শর্যাতির বিশেষ বন্ধুও বটে। রাজ্যের সবাই সেই রাজপুরোহিতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর সমীহ করত।

একদিন রাজা শর্যাতি মনস্থ করলেন দিগ্বিজয়ে বের হবেন, সেই সঙ্গে দেশভ্রমণ করাও হবে।

ভাল দিন দেখে তিনি বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। সঙ্গে নিলেন মধুচ্ছন্দাকে।

বীর শর্যাতি। এক একটা দেশ জয় যেন কিছুই নয় তাঁর কাছে। বেশ কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জয় করা হয়ে গেল। রাজা খুব খুশি। কিন্তু মধুচ্ছন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তার মুখে সে রকম কোন খুশির আমেজই নেই।

সুযোগ বুঝে রাজা একদিন জিজ্ঞেস করলেন মধুচ্ছন্দাকে—এত দেশ জয় করলাম, তার জন্যে আপনার মধ্যে তো কোন আনন্দ দেখছি না। বরং আপনাকে যেন কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কেন?

মধুচ্ছন্দা বললেন—কিছু মনে করবেন না রাজা। বহুদিন হল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাড়িতে স্ত্রী একা। তাঁর জন্যে মনটা আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—সে কি কথা। আপনি না ব্রহ্মর্ষি? স্ত্রীর জন্যে আপনার মন চঞ্চল হবে, এটা কি শোভা পায়? মৃদু তিরস্কার করলে রাজা।

—স্ত্রী যদি আমার সতী সাধ্বী, পতিব্রতা না হতো তাহলে কি আমি ব্রহ্মর্ষি হতে পারতাম? বললেন মধুচ্ছন্দা—পতিসেবা না করে সে জলস্পর্শ করে না, না জানি তার কত কষ্ট হচ্ছে।

মৃদু হাসলেন রাজা। বললেন—ঠিক আছে। আপাতত দেশভ্রমণ থাক। চলুন, রাজ্যেই ফিরে যাই। আপনার মন যেখানে অশান্ত, সেখানে আর ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়।

নিজের রাজ্যে ফেরার পথেই রাজা গোপনে একটা কাজ করে বসলেন। বিশেষ এক দূতকে ডেকে বললেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যে ফিরে যাও। গিয়ে রাজ্যময় রটিয়ে দাও, দিগ্বিজয়ে বের হওয়ার পরে পরেই এক রাক্ষস অতর্কিতে এসে তাদের আক্রমণ করে রাজা আর রাজপুরোহিতকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে। পাতালে সে যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে অনেক খোঁজ করেও তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এ কথা বলার ফলাফল কি হয় আমাকে এসে জানাবে।

রাজার নির্দেশ মতই দূত আগেভাগেই এসে রটিয়ে দিল সেই খবর। শুনে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন পুরোহিত-পত্নী। আর রাজরানী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরা-খবর নিতে শুরু করলেন, খবরটা কতখানি সত্যি।

ইতিমধ্যে প্রায় রাজ্যের প্রান্তে যখন রাজা শর্যাতি, দূত এসে সংবাদ জানাল—মহারাজ, সংবাদ শোনামাত্র পুরোহিত-পত্নী প্রাণত্যাগ করেছেন, আর মহারানী চারদিকে লোকজন পাঠাচ্ছেন খোঁজখবর নেবার জন্যে।

এত যে কাণ্ড ঘটে গেল তার বিন্দুবিসর্গও কিন্তু জানতে পারলেন না মধুচ্ছন্দা।

এদিকে রাজার মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি করতে গিয়ে কি করে বসলেন। কে কার স্বামী, কে কাকে কতখানি



ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সেটুকু বাজিয়ে দেখার জন্যেই অমন একটা মিথ্যে খবর তিনি পাঠিয়েছিলেন। ভাবতেও পারেন নি, তা শোনামাত্র কেউ মারা যেতে পারেন। দেশের রাজা হয়ে শেষে তিনি হলেন খুনী? আর সবসময় তাঁর যিনি মঙ্গল কামনা করছেন, সেই রাজপুরোহিতের স্ত্রীকেই তিনি শেষে এভাবে খুন করে বসলেন? এখন কোন্ মুখ নিয়ে তিনি রাজ্যে ফিরবেন?

তখন রাজা করলেন কি, সৈন্যসামন্ত যে যেখানে তাঁর সঙ্গে ছিল, সকলকে ডেকে বললেন, তোমরা সবাই রাজ্যে ফিরে যাও। আমি একটু অন্য জায়গায় যাব, কাজ আছে। সেই কাজ সেরে আমি রাজ্যে ফিরব। রাজ্যে যদি কোথাও কোন অনর্থ ঘটে তবে আমি না ফেরা পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখবে।

তারপর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুচরকে ডেকে বললেন—শোন, আমি সাতদিনের মধ্যে রাজ্যে ফিরে আসছি। ইতিমধ্যে যেভাবেই হোক, পুরোহিত-পত্নীর মৃতদেহ আগলে রাখবে। যেন তাঁর সৎকার করা না হয়।

এই বলে রাজা রাজপুরোহিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সোজা গোদাবরীর তীরে। সেখানে গিয়ে শুরু করে দিলেন স্নান আর দান।

এদিকে রাজ-পুরোহিত মধুচ্ছন্দা বাড়ি ফিরেই দেখেন, পতিশোকে তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। খুবই কাতর হলেন তিনি। রাজা নেই, না ফেরা পর্যন্ত কিছু করারও নেই। তাই মৃতা স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে রইলেন।

ওদিকে রাজা শর্যাতি সাতদিন ধরে অবিরাম গোদাবরী স্নান, আর দান করে শেষে সেই নদীর কাছেই কাঠকুটো এনে চিতা সাজালেন, তাতে আগুন জ্বাললেন। তারপর সাতবার সেই চিতা প্রদক্ষিণ করে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে বললেন—মা গো! আমি যদি নিষ্ঠা নিয়ে স্নান-দান করে থাকি, যদি সততার সঙ্গে রাজ্য পালন করে থাকি, তাহলে আমার যে আয়ু আছে, সেই আয়ু নিয়ে পুরোহিত-পত্নী বেঁচে উঠুন। আমার অপরাধ দূর কর মা।

এই বলে এদিকে যেই রাজা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, ওদিকে মধুচ্ছন্দা দেখেন, তাঁর স্ত্রী চোখ মেলে তাকালেন। যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, এইমাত্র ঘুম ভাঙল তাঁর। তারপর স্বামীকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন, নিচু করে নিলেন মুখ, যেন কত অপরাধ করেছেন।

মধুচ্ছন্দা তো দেখে অবাক। বিব্রতা স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে ব্রহ্মর্ষি বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। খবর নিয়ে জানলেন, রাজা এখনও ফেরেন নি। তারপর নির্জন স্থানে গিয়ে বসলেন ধ্যানে।

এবার সব রহস্য তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি তখন স্থির করলেন, দেশের রাজা হয়েও যিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য এভাবে প্রাণ বিসর্জন দেন, আগে সেই রাজাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তারপর সব কথা।

মধুচ্ছন্দা সোজা চলে গেলেন যেখানে রাজা দিয়েছিলেন আত্মাহুতি সেখানে। সেই গৌতমী গঙ্গার তীরে গিয়ে তিনি এক মনে শুরু করলেন সূর্যের স্তব : হে সূর্য, হে আদিত্য! তুমিই তো এই বিশ্বচরাচরের প্রাণ। তুমিই তো মানুষের সব প্রার্থনা পূরণ করে থাক। অনুগ্রহ করে তুমি আমার প্রার্থনা শোন, তা পূরণ কর।

মধুচ্ছন্দার সেই আকুল আহ্বানে আবির্ভূত হলেন সূর্য। বললেন—বল, তোমার কি প্রার্থনা।

ব্রহ্মর্ষি বললেন—তুমি রাজা শর্যাতির জীবন দান কর।

—বেশ দিলাম। আর কি চাই বল।

—রাজার যেন কখনো কোন অমঙ্গল না হয়।

—বেশ, আর কি চাই?

—আমার যেন সুপুত্র হয়।

—তাই হবে, মধুচ্ছন্দা।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা শর্যাতি যেন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন চিতার ভেতর থেকে। দুজনে আবার ফিরে এলেন রাজ্যে।

রাজা আর রাজ-পুরোহিতকে একত্রে দেখে সারা রাজ্য মেতে উঠল আনন্দ উৎসবে।



মণিকুন্তল ও গৌতম কাহিনী

দাক্ষিণাত্যে গোদাববী-তীরে ভৌবন নামে এক নগর। সেখানে বাস করতেন বৃদ্ধকৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ। খুবই সরল আর সাদাসিধে মানুষ। কিন্তু ব্রাহ্মণী ছিলেন বড় প্যাঁচালো। মনটা তাঁর ছিল কুটিলতায় ভরা। তাঁদের ছিল এক ছেলে। নাম গৌতম। মায়ের কাছে থেকে সেও হয়ে উঠেছিল দারুণ খল। সব সময়ই ফিকির খুঁজে বেড়াত কার কি অনিষ্ট করব, কাকে ঠকাবো।

সেই নগরেই ছিল এক ধনী বণিক। মণিকুন্তল তার একমাত্র ছেলে। ছেলেটি যেমন সরল, তেমনি ধর্মভীরু। কারো কোন কষ্ট দেখলে সে কোনমতেই স্থির থাকতে পারত না।

যেভাবেই হোক গৌতমের সঙ্গে মণিকুন্তলের হল দারুণ ভাব। দুজনের মধ্যে হল খুব বন্ধুত্ব।

একবার গৌতম করল কি, মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে এল বন্ধুর কাছে। মণিকুন্তল বলল, চল আমরা দুই বন্ধুতে বাণিজ্য করতে যাই। বাড়িতে বসে থেকে এই বয়সে কি হবে। বেশ দেশ-বিদেশ ঘোরা হবে। কত কি ভোগ করা যাবে।

মণিকুন্তল বলল—তার কি দরকার, বন্ধু। বাবা যা রোজগার করে গেছেন তা দু হাতে খরচ করলেও ফুরোবে না। এর ওপর আর টাকা কি হবে? বেশ আছি। ঐসব ধন-সম্পদ নিয়ে মানুষজনের সেবা করতে পারছি। ধর্মকর্ম করতে পারছি, আর কি চাই।

শুনে গৌতম তিরস্কার করল মণিকুন্তলকে। বলল—বাবা করল রোজগার, আর তা দিয়ে তুমি করবে ধর্মকর্ম? লজ্জা লাগছে না? এটা কি পুরুষের মত কথা? তুমি নিজে রোজগার করে ধর্মকর্ম কর তো। দেখি, কত বাহাদুর তুমি। ছেলের কাজ রোজগার করে মা-বাবাকে এনে দেওয়া, আর তুমি করছ তার উল্টো। এটা ঠিক হচ্ছে না বন্ধু।

কথাটা তো একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। তখনকার মত চুপ করে গেল মণিকুন্তল। তারপর একদিন বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে দুই বন্ধুতে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল দেশভ্রমণে। অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌতমের সঙ্গতি কোথায়? তাই মণিকুন্তল যা সঙ্গে পারল ধনরত্ন নিয়ে নিল।

দেশ ছেড়ে চলে এসেছে দুজনে অনেক দূরে।

একদিন কথায় কথায় গৌতম বলল—আচ্ছা বন্ধু, তুমি যে এত ধর্ম-কর্ম কর, সত্যিই কি ধর্ম বলে কিছু আছে? যদি ধর্মই থাকবে,

তবে যারা ধর্ম মেনে চলে তারা এত দুঃখ ভোগ করবে কেন ? দেখ, জগতে যারা বড় হয়ে উঠেছে, সুখ ভোগ করছে, আনন্দে আছে, তারা কি কেউ তোমার ঐ ধর্ম মেনে নিয়েছে ? না, ধর্ম মেনে চলেছে ?

শুনে মণিকুন্তল বলল—ও কথা বোলো না বন্ধু। যারা ঐভাবে এখন সুখভোগ করছে, দেখবে তাদের শেষে কি দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

গৌতম আপত্তি জানিয়ে বলল—ও তোমার মনগড়া কথা রাখ, বন্ধু। চোখের সামনে যা দেখছ, তাকে তো উড়িয়ে দিতে পার না।

—না বন্ধু ! বলল মণিকুন্তল—আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারছি না। চোখের সামনে যা দেখছি, সেটাই যে সব সময় খাঁটি, এ আমি মানতে রাজি নই।

এই রকম ফিকিরের সন্ধানেই ছিল গৌতম। সুযোগও এসে গেল।

বলল—দেখ বন্ধু আমাদের এই তর্কাতর্কির শেষ হবে না। তার



চেয়ে বরং আমাদের আশেপাশে যাঁরা জ্ঞানী-গুণী আছেন, তাঁদেরই জিজ্ঞেস করা যাক, তুমি যাকে ধর্ম বলছ, তা আছে কি নেই। আর মানুষজন এই যে সুখ ভোগ করছে এটা অধর্ম কিনা ?

—আপত্তি কি ? বলল মণিকুন্তল।

—এটা তো একটা বাজি। হাসতে হাসতে বলল গৌতম—বাজি তো আর শুধু হাতে হয় না বন্ধু। যদি রাজি থাক, হেরে গেলে তোমার সব ধন-সম্পদ আমায় দিয়ে দেবে, তবেই এ বাজি লড়া যায়।

ধর্মভীরু মণিকুন্তলের ধর্মের ওপর স্থির বিশ্বাস। গৌতমের শর্তেই সে রাজি হল।

দুজনে তখন আশপাশের প্রবীণ অবস্থাপন্ন কিছু মানুষজনের কাছে গেল, তাঁদের মতামত জানতে।

তাঁরা বললেন—ধর্ম-টর্ম বুঝি না। সেটা আবার কি ? আমরা বুঝি পৃথিবীতে এসেছি সুখ ভোগ করব, ব্যস।

ফিরে এল দুই বন্ধু নিজেদের ডেরায়। প্রবীণদের কথা শুনে মণিকুন্তলের মন খুব খারাপ। মনে মনে গৌতম খুব খুশি। প্রথম প্যাঁচেই বাজিমাৎ।

—কি বন্ধু ? বাজিতে তো হারলে। এখনও কি বলবে, ধর্ম আছে ?

মৃদু হেসে মণিকুন্তল বললে—হ্যাঁ বন্ধু, এখনও বলব, আছে। যারা তা মানে না, ধান থেকে যেমন তুষ হয়, যা অপ্রয়োজনীয় বলে মানুষ ফেলে দেয়, আমিও তাঁদের সেই রকমই অগ্রাহ্য করি।

—এখনও তুমি এ কথা বলবে বন্ধু ? সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েও এখনও বলবে ধর্ম আছে। তেমনি হাসি মুখেই বলে গৌতম।

—হ্যাঁ বন্ধু, বলব।

—বেশ, বাজি ধর। এখন তো আমরা অন্য দেশে এসেছি। সে মানুষজন নেই। এখানে যাঁরা প্রবীণ, তাঁদেরই জিজ্ঞেস করা যাক। রাজি ?

—হ্যাঁ রাজি। বলে মণিকুন্তল।

—এবার কিন্তু বাজি তোমার দুটো হাত।

—বেশ।

প্রবীণ মানুষরা সব শুনে কিন্তু মণিকুন্তলের কথা উড়িয়েই দিলেন।

গৌতমও ডেরায় ফিরে বাজির পণমত মণিকুন্তলের দুটো হাত নির্বিবাদে কেটে দিয়ে বিদ্রূপ করে বলল—কি বন্ধু, এখনও কি বলবে ধর্ম বলে কিছু আছে ?

মণিকুন্তলের কিন্তু তখনো সেই এক কথা। মনে মনে গৌতম এবার আর এক নতুন প্যাঁচ ভাঁজতে লাগল।

কিন্তু আশ্চর্য। বন্ধু গৌতম এত নিষ্ঠুর আচরণ করল, অথচ মণিকুন্তল তার সঙ্গ ছাড়ল না।

ঘুরতে ঘুরতে তারা একদিন এল গঙ্গার তীরে যোগেশ্বর হরির মন্দিরের কাছে। এসেই মণিকুন্তল হরি আর গঙ্গার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

শুনে মুখ ফিরিয়ে গৌতম এবার কটমট করে তাকাল মণিকুন্তলের দিকে। বলল—ধন-সম্পদ গেছে, হাত গেছে, এখনও বলবে ধর্মের জয় ? আবার যদি উচ্চারণ কর, তরবারি দিয়ে তোমার মাথাই কেটে ফেলব।

মণিকুন্তল তখনো হাসতে হাসতে বলল—বন্ধু, যতক্ষণ এই প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি ঐ একই কথা বলব।

শুনে গৌতমের মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। বলল—বেশ, এবারে তোমার প্রাণই পণ।

গৌতম এই চরম সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল, তা কখনই টের পায় নি মণিকুন্তল।

এবারেও গৌতমেরই জিত। যোগেশ্বর বিষ্ণুর সামনেই গৌতম ঝাঁপিয়ে পড়ল মণিকুন্তলের ওপর। পিশাচের মত তার দুটো চোখ উপড়ে নিল। তারপর তাকে সেখানে একা ফেলে রেখে চলে গেল।

মণিকুন্তল সেই অবস্থাতেও গৌতমকে ডেকে ডেকে যখন সাড়া পেল না, তখন বুঝল বন্ধু তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। নিজের জ্বালা ভুলে বন্ধুবিচ্ছেদে মণিকুন্তলের মনটা হু-হু করে উঠল।

দিন ফুরিয়ে কখন রাত এসেছে জানতেও পারে নি মণিকুন্তল। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ। ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে। আকাশে একফালি চাঁদ। শুক্লপক্ষের একাদশী।

প্রতি সপ্তাহের এই রাতটায় লঙ্কা থেকে বিভীষণ পুত্র আর অন্যান্য অনুচরদের নিয়ে আসতেন এই মন্দিরে। গোদাবরীতে স্নান করে, বিষ্ণুর পূজা সেরে আবার চলে যেতেন।

সেদিন সবাইকে নিয়ে এসেছেন বিভীষণ। হঠাৎ ঐ অবস্থায় মণিকুন্তলকে পড়ে থাকতে দেখল বিভীষণের ছেলে। তার দুরবস্থা

দেখে মনটা দুলে উঠল তার। আহা বেচারা! বিভীষণকে গিয়ে বলতেই তিনি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঐ মন্দিরের কাছেই যে বিশল্যকরণী গাছ ছিল, তা চিনিয়ে দিয়ে বললেন—এর ডাল নিয়ে ওর গায়ে ঠেকাও, তাহলেই ও ঠিক হয়ে যাবে।

বিভীষণের ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাল এনে মণিকুন্তলের বুকের ওপর রাখতেই মণিকুন্তল আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ফিরে পেল চোখ, ফিরে পেল হাত।

চমকে উঠে ভাবল, বুঝি গৌতমই আবার তাকে সুস্থ করে তুলল। শুরু করে দিল ডাকাডাকি—গৌতম, বন্ধু গৌতম!

কিন্তু কোথায় কে? ইতিমধ্যে বিভীষণ থেকে শুরু করে সবাই আড়াল থেকে তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে লঙ্কায় ফিরে গেল।

মণিকুন্তলও গঙ্গায় স্নান করে বিষ্ণুর পূজা সেরে সেখান থেকে রওনা দিল।

অজানা পথ, বন্ধু নেই। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একদিন মণিকুন্তল এসে পৌঁছল মহাপুর নামে এক নগরীতে। সেই নগরীতে ছিল বলবান নামে এক রাজার রাজত্ব। একটি মেয়ে ছাড়া রাজার আর কোন ছেলেপুলেই ছিল না। গুণে শীলে সব দিক দিয়েই মেয়েটি ছিল সুন্দরী, কিন্তু একটা চোখ ছিল কানা। তার জন্যে রাজার মনে কষ্টের শেষ নেই। সাধ্যমত বহুরকম চিকিৎসা তিনি করিয়েছেন, কোন কিছুরই কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু মেয়ের চোখ তিনি ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত, এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে তার মেয়ের স্বাভাবিক দৃষ্টি দান করতে পারবে, তারই সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে দেবেন রাজ্যও। শুনে অপরিচিত সেই দেশে মণিকুন্তল গিয়ে হাজির হল রাজদরবারে।

জীর্ণ বেশ, শীর্ণ দেহ মণিকুন্তলকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন রাজা বলবান—কি চাই? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

মণিকুন্তল বলল—আসছি বহু দূর থেকে। যদি অনুমতি করেন, তাহলে আমি আপনার কন্যাকে দৃষ্টিদান করতে পারি।

—তুমি? শুনে বিস্মিত হলেন রাজা। বললেন—কত এল, কত গেল, তুমি—

—যদি অনুমতি করেন। সবিনয়ে জানাল মণিকুন্তল।

—বেশ, দেখ, বলে মণিকুন্তলকে রাজা পাঠিয়ে দিলেন অন্দরমহলে।

পরমুহূর্তেই খবর পেলেন রাজা, সুন্দর দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে রাজকন্যা।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন রাজা। যথাযোগ্য সমাদরে মণিকুন্তলকে আপ্যায়ন জানিয়ে জানতে চাইলেন তার প্রকৃত পরিচয়, আর কিভাবেই বা সে এই অসাধ্য সাধন করল।

কোন কিছু গোপন না করে মণিকুন্তল এবার সব খুলে বলল। শেষে বলল—ধর্মই আমার সহায়।

খুব খুশি হলেন রাজা। ঘটা করে মণিকুন্তলের সঙ্গে মেয়ের বিয়েও দিয়ে দিলেন।

মহাপুরের রাজবাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে কেটে গেল মণিকুন্তলের বেশ কয়েক বছর। মাঝে মধ্যেই মনটা তার খারাপ হয়ে উঠত বন্ধুর



জন্য। না জানি বন্ধু গৌতম এখন কোথায়? কেমন আছে? কি করছে? কতদিন দেখা হয় নি। মনের মধ্যে গৌতমের ওপর এতটুকু বিরূপতা নেই।

ইতিমধ্যে রাজকার্য থেকে অবসর নিলেন রাজা। মণিকুন্তলকে সিংহাসনে বসিয়ে চলে গেলেন বনে তপস্যা করতে।

একদিন সিংহাসনে বসে মণিকুন্তল। পুরোদমে চলেছে রাজকার্য। হঠাৎ প্রহরীরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এক দুষ্কৃতকারীকে এনে দাঁড় করাল রাজার সামনে।

তাকে দেখেই চমকে উঠল মণিকুন্তল। এ কি! এ যে গৌতম! তার সেই বন্ধু!

সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তার বাঁধন খুলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল মণিকুন্তল—কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল বন্ধু। এ কি দশা হয়েছে তোমার?

গৌতমের এখন আর কিছু নেই, নিঃস্ব ভিখারী! দু চোখে তার জল।

মণিকুন্তল গৌতমকে শান্ত করে তার পিতা বৃদ্ধ কৌশিককে আনিয়ে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে ফিরিয়ে দিল তাকে। বলল—যাবার আগে গোদাবরীতে স্নান করে যোগেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করে যেও বন্ধু।



ব্যাধের পূজা

কুল কুল করে বয়ে চলেছে গৌতমী গঙ্গা সহ্যাদ্রি পাহাড়ের (পশ্চিমঘাট পর্বতমালা) পাদদেশ থেকে সমুদ্রের দিকে। তারই এক স্থানে একটি পাহাড়। নাম, শ্রীপর্বত। সেই পাহাড়ের উত্তরে আদিকেশ নামে মহাদেবের সুবিশাল এক লিঙ্গ।

সিন্ধুদ্বীপ মুনির ভাই বেদ। পরম ধার্মিক, সেই সঙ্গে সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। শাস্ত্রের নিয়ম মেনে, যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণ করে নৈবেদ্য সাজিয়ে খুব শ্রদ্ধা নিয়ে প্রত্যহ সেই শিবলিঙ্গের পূজো করতেন, তারপর জনপদে যেতেন ভিক্ষের জন্যে।

এদিকে ভিল্ল নামে এক ব্যাধ—সেও প্রতিদিন শিকারে বেরিয়ে পশুপাখি যা পেত, বাড়ি ফেরার পথে সেখানে এসে তারই মাংস সাদামাটা কথায় শিবকে নিবেদন করে তারপর চলে যেত।

ঘুরে এসে বেদমুনি প্রতিদিনই দেখতেন, যেসব নৈবেদ্য সাজিয়ে তিনি মহাদেবের পূজো করে গিয়েছিলেন, সেগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো, তার জায়গায় মাংসের টুকরো পড়ে। দেখে অবাক হতেন বেদ-মুনি। ব্যাপারটা কি? কে এমন পাপাচার এখানে করে যায়? নিশ্চয়ই তিনি যখন থাকেন না, তখন কোন দুরাত্মা এসে এই জায়গাটাকে এমনভাবে অ-পবিত্র করে, দেবতার অপমান করে। শাস্ত্রেই আছে, দেবতা বা গুরুকে যদি কেউ অসম্মান করে, সে যেই হোক না কেন, তাকে বধ করায় কোন পাপ নেই।

এই সব ভেবে ঠিক করলেন আজ আর জনপদে যাবেন না। এখানেই আত্মগোপন করে থাকবেন। দেখবেন, কে সেই পাষণ্ড। তারপর তাকে ধরে উচিত শিক্ষা দেবেন।

মনস্থ করে বেদমুনি সেদিন আর কোথাও না বেরিয়ে তাঁর নিত্য পূজা সেরে তক্কে-তক্কে রইলেন দুরাত্মাকে ধরার জন্যে।

সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বেলা অনেকখানি হয়ে গেল। কেউ আর আসে না। বেদমুনির খিদেও পেয়েছে যথেষ্ট। তবু গোপন স্থান থেকে বের হলেন না। আজ এর একটা নিষ্পত্তি করবেন, তবে ছাড়বেন। কিন্তু এত বেলা হয়ে গেল, কেউ আসে না কেন? ব্যাটা কি টের পেয়ে গেছে? তবুও দেখবেন সন্ধে পর্যন্ত।

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল ভিল্ল ব্যাধকে। দুই কাঁধে বধ করা ঝাক ঝাক পাখি, আর মাথা থেকে মুখের ওপর ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে সেই শিবলিঙ্গের সামনে এসে দুই কাঁধ থেকে নামাল শিকারের বোঝা। হাতের চেটো দিয়ে মুছল কপালের ঘাম। তারপর যেসব নৈবেদ্য দিয়ে বেদ-মুনি শিবের পুজো করেছিলেন, লাথি দিয়ে সেগুলো সব দূরে সরিয়ে দিল। বেদ-মুনির মাথায় ক্রমশ জ্বলে উঠছে আগুন। তাহলে এই সেই পাষণ্ড, যে এভাবে সব লণ্ডভণ্ড করে প্রতিদিন তাঁর দেবতাকে অপবিত্র করে যায়? বেরিয়ে এসে এবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন নাকি?

এমন সময় বেদমুনির চোখের সামনে ঘটল এমন এক ঘটনা, যা তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। দু হাতে চোখ রগড়ে আবার ভালভাবে তাকালেন। না, তিনি যা দেখছেন, তা তো ভুল নয়। লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন হাতে ত্রিশূল, গায়ে ছাইভস্ম মাখা, জটাজুটধারী সেই শিব, প্রতিদিন মন্ত্র উচ্চারণ করে তিনি যাঁর ধ্যান করেন। বেরিয়ে এসে সস্নেহে তিনি ভিল্লকে বলছেন—হ্যাঁরে, আজ তোর এত দেরি হল কেন? কতক্ষণ থেকে তোর অপেক্ষায় রয়েছি, আমার খিদে পায় না?

ভিল্ল বলল—ঠাকুর, কি করব? আজ দেখ না, ফাঁদে চারদিক থেকে এত শিকার এসে পড়ল। তাদের ছেড়ে তাড়াতাড়ি আসি কেমন করে? আর একটু অপেক্ষা কর।



এই বলে ভিল্ল সঙ্গে সঙ্গে একটা পশুর ছাল ছাড়িয়ে তৈরি করে ফেলল মাংস। দৌড়ে গঙ্গায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মুখে করেই নিয়ে এল একমুখ গঙ্গাজল। তারপর সেই জল মুখ থেকে পিচকারির মত বের করে শিবলিঙ্গের মাথা দিল ভিজিয়ে, স্নান করিয়ে। মাংস নিবেদন করে খুশি মনে বাড়ি চলে গেল।

এসব দেখেশুনে বেদমুনি একদিকে যেমন অবাক হলেন, তেমনি আর একদিকে মহাদেবের ওপর হল তাঁর প্রচণ্ড রাগ।

এতদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্র আচার মেনে তিনি তাঁর পূজা করে আসছেন। শিবেরই তৈরি শাস্ত্র নির্দেশ এতটুকু অমান্য তিনি করেন নি, তবুও শিব তাঁকে দর্শন না দিয়ে দেখা দিলেন কিনা ঐ অনাচারী ব্যাধকে! আবার আমার দেওয়া নৈবেদ্য নিবেদন করা সত্ত্বেও ব্যাধকে বললেন কিনা তিনি ক্ষুধার্ত। আর নির্বিচারে গ্রহণ করলেন ঐ কুলকুচি করা জল আর মাংস।

ব্যাধ চলে যেতে রাগে গরগর করতে করতে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে বেদমুনি ফেটে পড়লেন—তুমি দেবতা হয়ে অনাচারকে প্রশ্রয় দিলে। পক্ষপাত করলে! পাথর দিয়ে আজ তোমার মাথাই আমি ভেঙ্গে দেব।

এই বলে পাথর নিয়ে এগিয়ে যেতেই আবার আবির্ভূত হলেন শিব। বললেন—তোমার যখন এতই রাগ হয়েছে পাথর দিয়ে আমার মাথা ভেঙ্গে দেবে, দিও, তবে আজ নয়। তোমার যা কিছু

করার কাল কোরো।

বেদমুনি আর কি করেন, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলেন।

রাত এল। ঘুম নেই বেদমুনির চোখে। এমনটা কেন হল ভেবে ভেবেই কেটে গেল রাত। তার ওপর অত রেগে ওঠার জন্যে মনে মনে অনুশোচনাও ভোগ করলেন।

পরদিন সকাল হতেই যথারীতি গঙ্গায় স্নান করলেন মুনি। শুদ্ধবস্ত্রে, শুদ্ধাচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রতিদিনের মত বসলেন শিবের পূজা করতে। শিবলিঙ্গের মাথায় ফুল দিতে গিয়েই মুনি দেখলেন, মাথার এক জায়গায় চাপ চাপ রক্তের দাগ। মনে মনে খুবই ভয় পেয়ে গেলেন মুনি। সঙ্গে সঙ্গে গোবর, মাটি, কুশ আর গঙ্গাজল দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে ফুল চাপালেন তাঁর মাথায়। মনে মনে বললেন— দেব, কোন অপরাধ নিও না।

পূজা শেষ করে সেদিনও বেদমুনি সেখান থেকে আর কোথাও না গিয়ে আগের দিন মতই লুকিয়ে রইলেন। ইচ্ছে, আজও ভিল্ল আর শিব কি করে দেখবেন।

কিছুক্ষণ পরেই ব্যাধ এল সামান্য শিকার নিয়ে। সোজা চলে গেল গঙ্গায়। হাত মুখ ধুয়ে, এক এক মুখ জল নিয়ে উঠে এসে, নৈবেদ্যগুলো দু পায়ে সরিয়ে দিয়ে যেই শিবের মাথায় মুখের জল দিতে যাবে অমনি চমকে পিছিয়ে এল দু পা। মুখের জল গড়িয়ে পড়ল নিজেরই গা বেয়ে। দু হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে



আক্ষেপ করতে লাগল—এ কি! ঠাকুরের এমন দশা কে ঘটালো? কে সে পাষণ্ড যে আমার ঠাকুরের মাথা এভাবে ভেঙ্গে রক্তপাত ঘটালো? আমি থাকতে আমার ঠাকুরের এমন হল? ছিঃ! ছিঃ!—বলতে বলতে পিঠের তূণ থেকে বাণ বের করে নিজেকেই নিজের হাতে বিঁধে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই লিঙ্গ থেকে আবার আর্বিভূত হলেন মহাদেব। বেদমুনিও আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না।

মহাদেব কোনরকমে ভিল্ল ব্যাধকে নিবৃত্ত করে মুনির দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হেসে বললেন—মুনি, কি দেখলে? তুমি রক্ত দেখে আমার মাথা গোবর গঙ্গাজলে ধুয়ে ফুল দিলে, আর এই ব্যাধ তা সহ্য করতে না পেরে নিজের জীবনটাই আর একটু হলে দিয়ে দিত।

দিব্যচক্ষু খুলে গেল মুনিবরের। সত্যিই তো, এতদিন তিনি শুধু শাস্ত্রাচার মেনে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে এসেছেন, কিন্তু নিরক্ষর মূর্খ এই ব্যাধের মত ভক্তি কোথায় তাঁর? বেদমুনির দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দু হাত বাড়িয়ে নিজের বুকে তিনি টেনে নিলেন ভিল্ল ব্যাধকে।



পাশা খেলার পরিণাম

দেবরাজ ইন্দ্রের যে কজন বন্ধুস্থানীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা প্রমতি একজন। কিন্তু এই বন্ধুত্বের আগে কি নিদারুণ ঘটনাই না ঘটেছিল!

এক যুদ্ধে শত্রু সেনাদের হারিয়ে দিয়ে প্রমতি গেলেন অমরাবতীতে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলেন, দেবরাজকে ঘিরে বসে দেবতারা খেলা করছেন।

তাই দেখে প্রমতি বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। বললেন—যাঁরা আপনার অনুগত, তাঁদের সঙ্গে পাশা খেলে কি আর বড়াই বাড়বে আপনার? আমার সঙ্গে খেলবেন?

ইন্দ্র বললেন—হ্যাঁ খেলব।

—পণ?

ইন্দ্র বললেন—দেবলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ রমণী রত্ন অপ্সরা উর্বশী আমার পণ। আর আপনার?

—আমার? আমার এই ডান হাত। পণ রাখলেন প্রমতি।

শুরু হল পাশাখেলা। অসাধারণ খেলোয়াড় প্রমতি। কয়েকটা দানের পরই ইন্দ্র গেলেন হেরে। প্রমতি লাভ করলেন উর্বশীকে।

—কি দেবরাজ! এরপর? জিজ্ঞেস করেন প্রমতি।

—এবার আপনার ঐ ডান হাতের জন্য আমার পণ আমার সুবিখ্যাত রথ আর বজ্র।

শুরু হল আবার খেলা। ইন্দ্র আবার হারলেন। গেল রথ আর বজ্র। এবার ইন্দ্রের জেদ চেপে গেল। আবার আহ্বান জানালেন খেলতে। কিন্তু কোনমতেই হারাতে পারলেন না প্রমতিকে, বিনিময়ে আরও কিছু গেল।

ঠিক সেই সময় গন্ধর্ব বিশ্বাবসু সেখানে এসে হাজির।

নাচ, গান থেকে শুরু করে সবরকমের খেলাতেই গন্ধর্বেরা সেরা। বলতে গেলে তারাই হল এসবের জনক।

ইন্দ্রকে পাশাখেলায় সর্বস্বান্ত আর প্রমতিকে গর্বোদ্ধত দেখে বিশ্বাবসু আর থাকতে না পেরে এগিয়ে এল ইন্দ্রের সাহায্যে।

প্রমতি জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বাবসুকে—তোমার পণ?

—গন্ধর্বরাজ আমি। আমার গন্ধর্ববিদ্যা রইল পণ।

—বেশ।

একদিকে ইন্দ্র-বিশ্বাবসু, আর একদিকে প্রমতি একা।

আবার শুরু হল খেলা। কিন্তু দুর্ভাগ্য। ওঁরা দুজনেই গেলেন হেরে।

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠলেন প্রমতি। ব্যঙ্গ করে ইন্দ্রকে বললেন—তুমি একেবারেই অকর্মা। দেবরাজ হবার কোন যোগ্যতাই তোমার নেই। না পার যুদ্ধে জিততে, না পার খেলায়। তুমি আমার সেবক হও, আমার সেবা কর।

তারপর উর্বশীকে বললেন—তোমাকে দেবতারা খাতির করে, আমি করি না। তুমি আমার দাসী হও।

বাধা দিলেন উর্বশী—রাজা, অমন নীচ কাজ আমায় দেবেন না। ও কাজ করা আমার শোভা পায় না।

প্রমতির সেই এক জেদ। উর্বশীকে তাঁর দাসীর কাজই করতে হবে।

ঠিক সেই সময়ই আর এক গন্ধর্ব চিত্রসেন আর থাকতে না পেরে



এগিয়ে এসে বাধা দিল প্রমতিকে। বলল—দাঁড়াও রাজা, আমি একবার তোমার সঙ্গে পাশা খেলতে চাই।

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে প্রমতি একবার তাকালেন চিত্রসেনের দিকে। ভাবলেন, এ আবার কোথা থেকে এক ফড়িং এল?

চিত্রসেন হল বিশ্বাবসুর ভাই।

কিন্তু খেলায় যখন আহ্বান জানিয়েছে, খেলতেই হয়।

—পণ?

—আমার জীবন। বলল চিত্রসেন—তোমার পণ কি রাজা?

—আমার গোটা রাজ্য আর সম্পদ। ব্যঙ্গ করলেন প্রমতি।

শুরু হল খেলা। গোটা কয় দান দিয়ে বুঝলেন এ বড় কঠিন ঠাঁই। এবার খুব মনোযোগ দিলেন।

কিন্তু না, চিত্রসেনের কাছে হার স্বীকার করতেই হল রাজা প্রমতিকে। ফলে পাশা খেলে যা কিছু জিতেছিলেন সব দিয়ে দিতে হল।

চিত্রসেন কিন্তু তাতেও নিস্তার দিল না প্রমতিকে। গন্ধর্বপাশে বেঁধে রেখে দিল দেবলোকেই।

এদিকে প্রমতির ছেলে সুমতি পড়ল মহা চিন্তায়। বহুদিন হয়ে গেল, বাবা ফিরলেন না দেখে বিশ্বামিত্র-পুত্র ব্রহ্মর্ষি মধুচ্ছন্দার কাছে গিয়ে কেঁদে-কেটে পড়ল।

ব্রহ্মর্ষি বসলেন ধ্যানে। ধ্যাননেত্রে তিনি সব কিছুই দেখতে পেলেন।

তারপর সুমতিকে বললেন—তোমার বাবা পাশা খেলায় হেরে গিয়ে দেবলোকে বাঁধা পড়ে আছেন। তোমার বাবার বড় আসক্তি এই খেলার ওপর। খেলতে বসে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পণ রেখে পাশা খেলে তিনি বাঁধা তো পড়েছেনই, তার ওপর সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সুমতি, এ বড় সাংঘাতিক খেলা। এই খেলায় মানুষ আর মানুষ থাকে না, অমানুষ হয়ে যায়। তোমার বাবাও এখন তাই হয়েছেন।

শুনে সুমতির মনে খুব কষ্ট হল। জিজ্ঞেস করল—এখন বাবাকে কিভাবে উদ্ধার করে আনা যাবে, অনুগ্রহ করে তাই বলুন।

মধুচ্ছন্দা বললেন—ঠিক উপযুক্ত ছেলের মতই কথা বলেছ। কিন্তু সে যে বড় কঠিন কাজ।

—যত কঠিনই হোক, আপনি বলুন। আমি করব।

—বেশ, এক হাজার বছর তোমায় তপস্যা করতে হবে। তবে তোমার বাবার মুক্তি হবে।

সুমতি নিষ্ঠার সঙ্গে তাই করে প্রমতিকে মুক্ত করে এনেছিল। তারপর থেকে রাজা আর কখনো পাশা খেলেন নি।



চণ্ডাল ও ব্রহ্মরাক্ষস

সুপ্রসিদ্ধ অবন্তী নগর। সেই নগরের একপ্রান্তে বাস করত এক চণ্ডাল। জাতে চণ্ডাল হলে কি হবে, স্বভাব তার মোটেই নিষ্ঠুর ছিল না। পশুদের ছাল-চামড়া নিয়ে কাজ-কারবার করত বটে, কিন্তু মনে কোন লোভ ছিল না। কোন রকমে সংসার চালানো, ব্যস। এর ওপর একটা মহৎ গুণ ছিল সেই চণ্ডালের, খুব ভাল গান গাইতে পারত, বিশেষ করে, দেবদেবীর গান। প্রতি একাদশীতে উপবাস করত। আর শহরের বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে ঐদিন বিষ্ণুর পুজো দিয়ে সারা রাত সেই দেবতাকে গান শুনিয়ে সকালে ফিরে আসত। তারপর বাড়ির সকলকে আগে খাইয়ে শেষে নিজে খেত।

এভাবে মহা আনন্দে চণ্ডালের দিন চলে।

একদিন চৈত্র মাস। বিষ্ণুপুজোর দিন। চণ্ডাল পাশেই ক্ষিপ্রা নদীর ধারে গেছে পুজোর ফুল-ফল যোগাড় করতে। সেখানে ছিল একটা বহেড়া গাছ। সেই গাছের কাছে যেতেই এক ব্রহ্মরাক্ষস এল তাকে খেতে।

চণ্ডাল দেখেই হাত জোড় করে তাকে বলল—আজ তুমি আমায় খেয়ো না। তুমি আজ আমায় ছেড়ে দাও। কাল সকালে খেয়ো।

রাক্ষস বলল—দশদিন আছি না খেয়ে। এদিকে কেউ পা মাড়ায় নি। এখন মরছি আমি খিদের জ্বালায়। আর খাব কিনা কাল

সকালে ! কেন ?

—দেখ, আজ আমার বিষ্ণুপূজার দিন। বেরিয়েছি তারই সামগ্রী যোগাড় করতে। তাই বলছি আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দাও।

শুনে একটু কিন্তু বোধ করল ব্রহ্মরাক্ষস। বলল—তুমি যে কাল আসেব, তার প্রমাণ ?

—আমার কথাই আমার প্রমাণ। এছাড়া তো প্রমাণ দেবার আমার আর কিছু নেই।

—বিশ্বাস করতে পারি ? জিজ্ঞেস করে রাক্ষস।

—তিন সত্যি করে বলছি আসব, আসব, আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

পথ ছেড়ে দিল ব্রহ্মরাক্ষস।

ফুল-ফল নিয়ে চণ্ডাল চলে এল বিষ্ণুমন্দিরে। ব্রাহ্মণ সবেমাত্র বসেছেন পুজোয়। সেগুলি এগিয়ে দিয়ে মন্দিরের এক প্রান্তে দাঁড়াল সে।

পূজা শেষ করে চলে গেল ব্রাহ্মণ। চণ্ডাল গান ধরল। নানা ভাবের গান শোনাল বিষ্ণু বিগ্রহকে।

সকাল হল। চণ্ডাল বাড়ির পথে না গিয়ে চলল নদীর ধারে সেই বহেড়া গাছের দিকে।

এ ব্যাপারটা শহরের অনেকেই জানে। সেদিন সকালে বাড়ির পথে না গিয়ে ওকে উল্টো পথে যেতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করল—এদিকে কোথায় ?

চণ্ডাল তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা শোনাল। শুনে পথিক বলল—দেখছি তুমি নীরেট বোকা। কথা দিয়েছ বলেই যেতে হবে ?

তার বাধা কাটিয়ে কিছুদূর যেতে আবার বাধা। আর এক পরিচিত পথিক।

শুনে বলল—আজব মানুষ তো তুমি। ঘরে তোমার সব রইল পড়ে, ভুলে গেলে তাদের ওপর তোমার কর্তব্য।

—আমি যে কথা দিয়েছি।

—ও রকম কথা অনেকেই দেয়।

—কিন্তু আমি যে তিন সত্যি করেছি। না গেলে অন্যায় হবে।

কি আর বলবে পথিক। চলে গেল।

চণ্ডাল এসে হাজির হল সেই বহেড়া গাছের নিচে।

ব্রহ্মরাক্ষস তো তাকে দেখে অবাক। সত্যি-সত্যিই এল প্রাণ দিতে। খাওয়ার চিন্তা গেল তার মাথায় উঠে। বদ্ধ ধারণা হল, এ মানুষটা যে-সে মানুষ নয়। নইলে এভাবে আসতে পারে ?

জিজ্ঞেস করল ব্রহ্মরাক্ষস—মন্দিরে গিয়ে সারা রাত কি করলে।

চণ্ডাল বলল—পুজো দিলুম। তারপর সারারাত ঠাকুরকে গান শোনালুম।

—তুমি কতদিন ধরে এভাবে যাচ্ছ ?

—তা কুড়ি বছর। প্রতি মাসের এই একাদশীতে।

শুনে তো ব্রহ্মরাক্ষসের চক্ষুস্থির। এ কাকে সে খেতে গিয়েছিল ? এত বড় পুণ্যবান, এর যদি একটু পুণ্যভাগ পাই, তাহলে আমার মুক্তি হয়ে যায়—এই ভেবে সে তখন চণ্ডালকে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল তার পুণ্য থেকে একটু পুণ্য দিতে।

চণ্ডাল বলল—না, ওর একটা কণাও আমি দিতে পারব না। তুমি তো আমাকেই খাচ্ছ। তাহলেই তো সব নেওয়া হচ্ছে।

—না, তা হয় না। বলল ব্রহ্মরাক্ষস—দেখ আমি মহাপাপী, তাই এই জন্মে এই যন্ত্রণা ভোগ করছি। দয়া করে তুমি আমায় উদ্ধার কর।

শুনে চণ্ডাল বলল—কে তুমি ? কি মহাপাপ তুমি করেছ ?

ব্রহ্মরাক্ষস তখন তার পূর্বজন্মের কথা বলতে শুরু করল।

—জানো, আমার নাম ছিল দেবশর্মা। আমার বাবা সোমশর্মা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, যাগ-যজ্ঞে নিপুণ। বাবার কাজকর্ম দেখে দেখে আমিও অল্প বয়সেই কিছু শিখে ফেলেছিলাম। একদিন তখনো আমার পৈতে হয় নি, রাজবাড়িতে যজ্ঞ হচ্ছে। লোভ সামলাতে পারলাম না। আমিও সেখানে ভিড়ে গিয়ে আগুনে আহুতি দিতে শুরু করলাম। দশদিন এই ভাবে কাজ করার পর যখন রাতে শেষ আহুতি দিতে যাব, আমার মৃত্যু হল। সেই থেকে আমি এই অবস্থায় আছি। আমার ভাগ্য যে আমি তোমার দেখা পেয়েছি। তুমিই পারবে দয়া করে আমাকে উদ্ধার করতে।



মন দিয়ে সব শুনল চণ্ডাল। তারপর বলল—বেশ, আমার সঞ্চিত পুণ্য থেকে একটুখানি তোমায় দিতে পারি, তবে একটা শর্তে।

—বল কি শর্তে। যা বলবে আমি তাতেই রাজি। এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না।

—তুমি আর কোন প্রাণীকে খেতে পাবে না।

—বেশ, তাই হবে।

চণ্ডাল তখন এক রাতের একটু পুণ্য তাকে দান করল। ব্রহ্মরাক্ষস সেটুকু নিয়ে চণ্ডালকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেল পৃথুদক নামে এক তীর্থস্থানে। সেখানে সম্পূর্ণ অনাহারে থেকে প্রাণত্যাগ করে মুক্ত হল।

বাড়ি ফিরে এল চণ্ডাল। কিন্তু সংসার আর তার ভাল লাগল না। ছেলেপুলেদের হাতে দায়দায়িত্ব দিয়ে সে-ও বেরিয়ে পড়ল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন বিন্ধ্যাচলে এসে তার মনে হল, আচ্ছা, আমি কেন চণ্ডাল হয়ে জন্মালাম। পূর্বজন্মে আমি কে ছিলাম।

মনে প্রশ্ন জাগা মাত্রই পূর্বজন্মের কথা তার মনে পড়ে গেল।

পূর্বজন্মে সে ছিল এক সন্ন্যাসী। ভিক্ষা করে দিন কাটাত। থাকত সংযমের মধ্যে। একদিন ভিক্ষা শেষে যখন নিজের আশ্রমে ফিরছিল, তখন কতকগুলো চোর শহর থেকে বেশ কিছু গরু চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। সেই গরুগুলোর ক্ষুরের ধুলো উড়ে এসে তার অন্নকে নোংরা করে দিয়েছিল বলে রেগে সে ফেলে দিয়েছিল ভিক্ষার সামগ্রী। সন্ন্যাসী হয়েও সেদিন সে রাগ দমন করতে পারে নি। তাই এ জন্মে হয়েছে চণ্ডাল।

মুক্তির সময় এসে গেছে চণ্ডালের। চলে গেল সে নর্মদার তীরে। সেখানেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মুক্তি পেল চণ্ডাল জীবন থেকে।



যযাতির বোধোদয়

চন্দ্রবংশের ত্রিভুবনজয়ী বলদর্পী রাজা নহুষের ছিল ছয় ছেলে। তার মধ্যে বড় ছেলে যতি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মেজ ছেলে যযাতি ছিলেন বাকি পাঁচ ভাই-এর সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন বুদ্ধিমান, তেমন বিচক্ষণ আর যুদ্ধবিদ্যায় তেমনি কুশলী।

তাই নহুষের পর তিনিই বসলেন পিতার সিংহাসনে। সুদর্শন সুপুরুষ যযাতি। যিনিই দেখেন তিনিই মুগ্ধ হন। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। সেও ছিল অপরূপা। শুক্রাচার্য নিজেই এ মেয়ের বিয়ে দিলেন যযাতির সঙ্গে। অসুররাজ বৃষপর্বও তার রূপলাবণ্যবতী মেয়ে শর্মিষ্ঠাকে তুলে দিলেন যযাতির হাতে। যৌতুক হিসেবে শুক্রাচার্য যযাতিকে দিয়ে দিলেন এমন এক সোনার রথ, যার দিকে চোখ মেলে তাকানো যেত না। সেই রথের ঘোড়াগুলো ছিল এমন বেগবান যে, দ্রুতগামী মনের গতিবেগও হার মেনে যেত তার কাছে। সেই রথে চেপে যযাতি মাত্র দুরাতের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী জয় করে পৃথিবীর অধিপতি হয়েছিলেন।

দেবযানীর গর্ভে যযাতির হয়েছিল দুই ছেলে—যদু আর তুর্বসু। এই যদু থেকেই বিখ্যাত যদুবংশ, যে বংশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে হয়েছিল তিনটি ছেলে—দ্রুহ্য, অনু আর পুরু। এই কনিষ্ঠ পুরুর বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিল কৌরব আর পাণ্ডবেরা।

পৃথিবীর অধিপতি যযাতি। পূর্বদিকের রাজা বড় ছেলে যদু, মধ্যভাগ পুরু, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকের রাজ্য তুর্বসু আর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকের রাজ্য পরিচালনার ভার দ্রুহ্য আর অনুকে দিয়ে নিশ্চিন্তে রাজসুখ ভোগ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এমন বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিলেন তিনি আর শর্মিষ্ঠার ওপর এমনভাবে ক্রমশ আসক্ত হয়ে পড়তে লাগলেন যে প্রায় ভুলেই যেতে বসলেন মহাপণ্ডিত শুক্রাচার্যের প্রিয় কন্যা দেবযানী তাঁর পাটরানী, যাকে শুক্রাচার্য কচের মত বীর আর সুপুরুষের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে, বিয়ে দিয়েছেন তার সঙ্গে, সেই সঙ্গে দিয়েছেন অমন অমূল্য এক রথ।

মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল দেবযানী রাজা যযাতির একপেশে ভাব আর নির্লজ্জ রকম সকম দেখে। অভিযোগ জানাল পিতার কাছে। কন্যার চোখে জল দেখে পিতা কি আর ঠিক থাকতে পারেন? ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন পিতা শুক্রাচার্য। আগু-পিছু না ভেবেই যযাতিকে দিলেন অভিসম্পাত—অকালবার্ধক্য গ্রাস করুক যযাতিকে। যেন পৃথিবীর আর কোন কিছু সে ভোগ করতে না পারে।

যযাতির কানে এই অভিসম্পাতের কথা আসতেই মাথায় তাঁর যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। সর্বনাশ! স্বাভাবিক বার্ধক্য আসতে তো জীবনের এখনো অনেক—অনেক বাকি। কিন্তু এখনই তাঁর বার্ধক্য আসবে।

যযাতি গেলেন শুক্রাচার্যের কাছে। বললেন—আমায় ক্ষমা করুন। বাঁচান ঐ সর্বনাশা অভিসম্পাতের হাত থেকে।

অনেক ভেবে-চিন্তে শুক্রাচার্য বললেন—বাক্য তো আমার বৃথা যাবে না। তবে একটা উপায় আছে। তোমার পুত্রদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় তোমার জরা গ্রহণ করে, তাহলে তুমি যেমন আছ, তেমনি থাকতে পারবে।

মনে মনে অনেক আশা নিয়ে যযাতি আবার ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। তাঁর দুই রানীর পাঁচ ছেলে। সকলেই পিতৃভক্ত, নিষ্ঠাবান। সকলকেই তিনি স্বাবলম্বী করে দিয়েছেন। তারা যদি তাদের বাবাকে অকালে জরাগ্রস্ত হতে দেখে, তাহলে তারা কি তা দেখেও চুপ করে বসে থাকতে পারবে? এগিয়ে কি আসবে না কোন প্রতিকার করতে? না, তাঁর ছেলেরা তেমন নয়। পিতৃ-আদেশ তারা কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না।

নিশ্চিন্ত মনে আরো কিছুকাল কেটে গেল। ইতিমধ্যে একটু একটু করে জরা এসে গ্রাস করল তাঁকে। অকাল-বার্ধক্যে যযাতি হয়ে পড়লেন একেবারে জবুথবু। চোখের সামনে কত ভোগের সামগ্রী। অথচ, কিছুই আর ভোগ করতে পারছেন না।

অসহায় হয়ে এবার ডাকলেন বড় ছেলে যদুকে। বললেন—তুমি আমার বড় ছেলে, আমার প্রধান অবলম্বন। অসময়ে বার্ধক্য এসে আমার চলাফেরার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ পূর্ণ যৌবন নিয়ে আমাকে বিশেষ কাজে একবার পৃথিবী ভ্রমণে বের হতেই হবে। ইচ্ছে করলে তুমি পার আমার এই বাসনা পূর্ণ করতে।

—কিভাবে আমি তা পারব, বলুন। জানতে চায় যদু।

—আমার এই বার্ধক্য তুমি নাও। আর তোমার যৌবন আমাকে দাও। তাহলেই আমার বাসনা পূর্ণ হবে।

শুনেই যেন আঁতকে উঠল যদু। নিজেকে সংযত রেখে বলল—তা কি করে সম্ভব পিতা। আমি এক ব্রাহ্মণকে কিছু দান করতে প্রতিশ্রুত। তা পালন না করে আপনার বার্ধক্য আমি কিভাবে গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া, আমার এই যৌবন বয়স।



আমার মনে কত শখ, কত সাধ। সব কিছু পরিত্যাগ করে আপনার জরা নিয়ে অকালে বুড়ো হয়ে আমি বসে থাকতে চাই না। আপনার তো আরও ছেলেরা রয়েছে। খুবই প্রিয়পাত্র আপনার। তাদের বলুন। কেউ হয়ত রাজি হতে পারে। আমায় ক্ষমা করুন।

যদুর কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন যযাতি—এত দম্ভ ! ঠিক আছে, যাও। যাবার আগে জেনে যাও, তোমার বংশে কেউ কোনদিন রাজা হতে পারবে না।

চলে গেল যদু। প্রথমেই চরম আঘাত পেলেন যযাতি। অন্যান্য ছেলেদের প্রতিও সন্দেহে দুলে উঠল তাঁর মন। তবুও একে একে ডাকলেন সকলকে। রাখলেন একই আবেদন। কিন্তু সকলেরই সেই একই জবাব। একটা-না-একটা অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ল সবাই। খুবই মর্মাহত হলেন যযাতি। তবে কি তাঁকে এই অকাল-বার্ধক্য নিয়েই থাকতে হবে ? আর একটি মাত্র পুত্র বাকি কনিষ্ঠ পুরু, শর্মিষ্ঠার ছেলে। ডাকলেন তাকে। রাখলেন একই আবেদন।

শুনে পুরু সবিনয়ে বলল—আপনি আমার জন্মদাতা পিতা। আপনার অনুরোধ আমার কাছে আদেশ। পিতৃ-আদেশ অমান্য করার মত পাপ আর নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হন পিতা। আপনার জরা আমায় দিয়ে, আমার যৌবন আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে আপনার কর্তব্যকর্ম সমাধা করুন।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল যযাতির চোখ। পুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মন।

অকাল-বার্ধক্য থেকে মুক্তি পেয়ে আবার যুবক যযাতি বেরিয়ে পড়লেন অসীম ভোগ-লালসা নিয়ে পৃথিবী পর্যটনে। উপভোগ করার বিচিত্র সামগ্রী নিয়ে কি বিশাল এই পৃথিবী ! বিলাস-ব্যসনে উন্মত্ত হয়ে ভোগলিপ্সা মেটাবার জন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন যযাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। যেখানে যত সৌন্দর্য আছে, একের পর এক উপভোগ করে চললেন তিনি অপরিসীম আনন্দে। চৈত্ররথ বনে সুন্দরী রমণী বিশ্বাচির সঙ্গে কাটালেন সুদীর্ঘকাল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল এক হাজার বছর। পিতার জরা নিয়ে পুরু রইল বসে, আর ভোগবাসনায় অধীর হয়ে পুরুর যৌবন নিয়ে যযাতি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সর্বত্র।



এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন চৈতন্যোদয় হল তাঁর। এ কি করছেন তিনি ? এত ভোগ করলেন, তবু কামনা মেটে না কেন ? বাসনা দিন দিন এত প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে কেন ? তবে কি বিষয়ভোগের কোন শেষ নেই ? নিশ্চয় তাই। তা নাহলে এত উপভোগের পরেও ভোগ-তৃষ্ণা জাগছে কেন ? বুঝতে পারলেন, ভোগ করতে থাকলে কখনো ভোগের বাসনা মেটে না। শান্তি পেতে গেলে, তৃপ্তি পেতে গেলে, কামনার লাগামে আলগা দিলে চলবে না। জোরে তার রশি টেনে ধরতে হবে।

যখনই বুঝতে পারলেন এই নির্মম সত্য, তখনি ফিরে এলেন যযাতি পুত্র পুরুর কাছে।

বললেন—পুত্র, তোমার যৌবন তুমি ফিরিয়ে নাও। হও এই পৃথিবীর অধীশ্বর। আমার বার্ধক্য আমায় ফিরিয়ে দাও।

শুনে পুরু বললে—তা হয় না, বাবা। সমস্ত প্রাণীর জীবনেই এক সময় জরা এসে আক্রমণ করে। প্রাণীকে মুখ বুজে সে আক্রমণ সহ্য করতে হয়। কারণ এটাই জীবনের পরিণতি। আমি যখন আপনার আশীর্বাদে সেই পরিণামের মর্ম একবার উপলব্ধি করেছি, জানতে পেরেছি জীবনের চরম সত্যকে, তখন আমাকে আর যৌবনের মাদকতায় প্রলুব্ধ করবেন না পিতা। বরং গুরুজনদের মঙ্গলের জন্য আমি এই জরাকেই গ্রহণ করে থাকব। নচেৎ তপস্যাবলে আমি এই জরাকে বিনষ্ট করব।

এই বলে পুরু চলে গেল গৌতমী নদীর তীরে। সেখানে একমনে রত হল ভগবান শঙ্করের তপস্যায়।

এদিকে যযাতি চলে গেলেন বনে মহিষীদের সঙ্গে নিয়ে কামনার রাশ টেনে ধরে। চিত্তশুদ্ধির জন্য অভিনিবিষ্ট হলেন ধ্যানে।

পুরুর সুদীর্ঘ সুকঠোর তপস্যায় আবির্ভূত হলেন মহাদেব তাঁর সামনে। বললেন—বর চাও।

পুরু বললেন—শুক্রাচার্যের অভিশাপগ্রস্ত এই জরাভার আপনি বিনষ্ট করুন। আর আমার পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে আমার ভাইদের যে অভিশাপ দিয়েছেন, আপনি তাদেরও সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন।

ভগবান শঙ্কর পুরুর প্রার্থনা মঞ্জুর করে যাবার আগে বলে গেলেন—তথাস্তু।



কর্তব্যে অবহেলা

বিশ্বধর নামে একটি বালক বাস করত কোন এক দেশে। দেশ-বিদেশে বাণিজ্যের খুবই সুখ্যাতি বিশ্বধরের। অভাব নেই কোন কিছুর। শুধু একটিমাত্র অভাব—'বাবা' বলে ডাকবার তার কেউ ছিল না। বিশাল বাড়ি একটি ছেলের জন্যে যেন মরুভূমি। অত ধনসম্পদ। দিন দিন তার ওপরও যেন বিতৃষ্ণা জন্মে

যাচ্ছে। বয়স যত বাড়ছে, ততই তীব্র হয়ে উঠছে বিতৃষ্ণা। সে-ও মরে যাবে, তার বংশেও লোপ পেয়ে যাবে।

প্রায় বৃদ্ধ এখন বিশ্বধর। কিন্তু, এমনি আশ্চর্য যে ঠিক সেই সময়েই ঈশ্বরের করুণার মত একটি পুত্রসন্তান হল তার। বৃদ্ধের আনন্দ দেখে কে? কোলাহলমুখর হয়ে উঠল তার প্রাসাদ। বালকের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার যেন ভরে উঠল বৃদ্ধের মন। আর একটা যেন নতুন জীবন পেলেন তিনি। শিশুর সেবাশুশ্রূষা, পরিচর্যার দিকে সে কি সজাগ দৃষ্টি। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই।

দিনে দিনে যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, শিশু ততই এমনি সুগঠিত, রূপবান হয়ে উঠতে লাগল যে, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া বা তাচ্ছিল্য করা দায় হয়ে দাঁড়াল। মায়ার বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বালক বেঁধে ফেলল তার বাবা, মা, আত্মীয়-পরিজনকে।

একদিন হঠাৎ কি যে হল, অমন সুস্থ ছেলে, কিছুক্ষণ আগেও যে বাপ-মায়ের সামনে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ মারা গেল। এতই আকস্মিক যে রীতিমত হকচকিয়ে গেল বণিক পত্নী। বৃদ্ধ বয়সের একটিমাত্র সন্তান—শোক তো হবারই কথা। একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ল তারা। এ কি হল। আকুল স্বরে কাঁদতে লাগল ছেলের মৃতদেহ আগলে, আর বিলাপ করতে লাগল—কি এমন অপরাধ করেছি ঠাকুর যে দয়া করে অসময়ে পুত্র দিয়ে আবার তাকে কেড়ে নিলে?

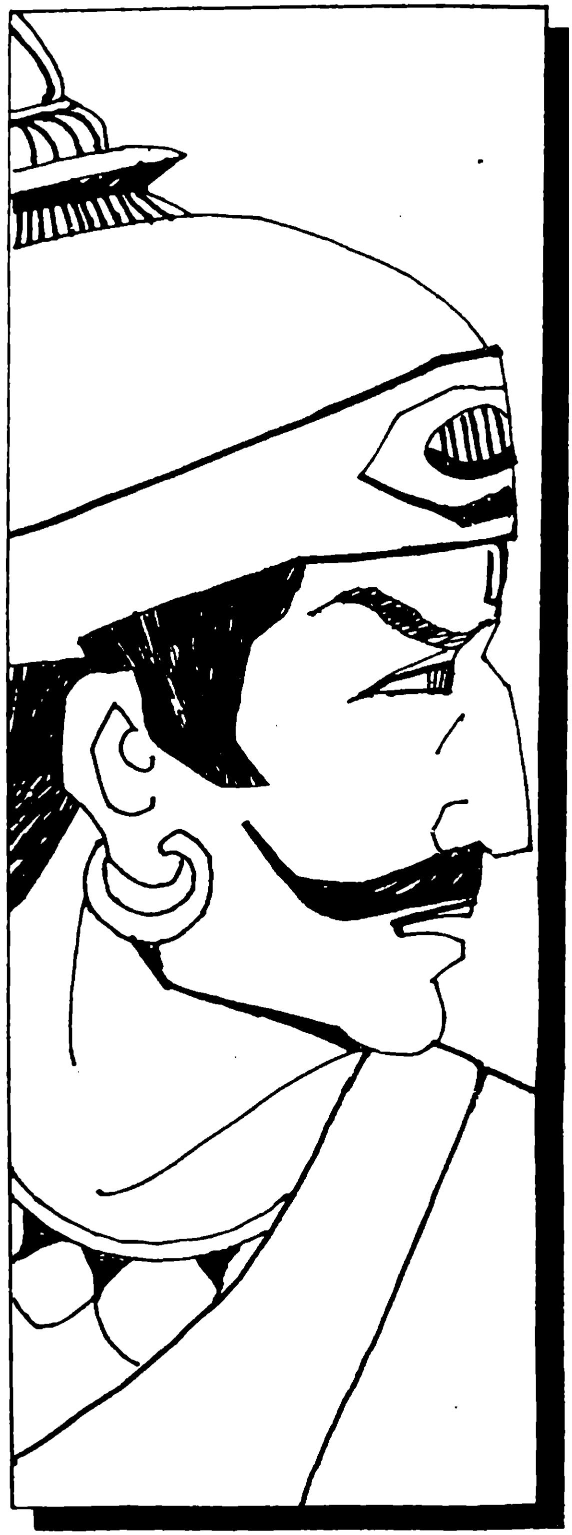
পৃথিবীতে একটা প্রাণীর জীবনাবসান হয়েছে। সজাগ হয়ে উঠলেন যমরাজ। এখন তাঁর কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হবে। যমকিঙ্করদের নিয়ে হাজির হলেন বিশ্বধর বণিকের বাড়ি। মৃত ছেলেকে তুলে আনবেন কি, মা-বাবার আকুলি-বিকুলি দেখে যমরাজের অমন যে কঠিন প্রাণ তা-ও বিকল হয়ে গেল। কোনমতেই তিনি পারলেন না তাঁদের কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে।

বুকচাপা একটা ব্যথা নিয়ে যমরাজ ফিরে গেলেন। কিন্তু যমপুরীতে না ফিরে, সোজা চলে গেলেন গোদাবরীর তীরে। সেখানে বসলেন তপস্যায়। তপস্যায় শান্তি আছে। এতই অশান্ত হয়ে উঠেছিল যমরাজের মন যে, তিনি তাঁর সব কর্তব্য ফেলে রেখে নির্বিষ্ট মনে শুরু করে দিলেন বিষ্ণুর ধ্যান।

যমরাজ্যে অনুপস্থিত যমরাজ। অচল হয়ে গেল যমরাজ্য। প্রভু নেই। কার আদেশে কি কাজ করবে যমকিঙ্করেরা? পৃথিবীতে মৃত্যুও আর হয় না মানুষের। এদিকে যেমন কেউ মরছে না, ওদিকে দিন দিন বেড়ে চলেছে মানুষ। দেখতে দেখতে মানুষের সংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে, মাটিতে আর কোথাও এতটুকু ফাঁকা রইলই না, পৃথিবীর ভাঁড়ারে যা খাদ্যশস্য ছিল তাতেও টান পড়ে গেল।

পৃথিবী দেখে শুনে খুবই ভীত হয়ে পড়লেন। সর্বনাশ! এভাবে যদি বাড়তেই থাকে, আর কেউ না মরে, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি অবস্থা হবে তাঁর?

কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে পৃথিবী ছুটলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। পড়লেন দেবরাজের পায়ের কাছে—এ কি সর্বনাশ হল দেবরাজ! আমি যে আর মানুষের ভার সইতে পারছি না। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন যমরাজ। তিনি আর এদিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। এদিকে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে বসেছে। একটা কিছু



উপায় করুন।

চমকে উঠলেন দেবরাজ—সে কি পৃথিবী ? মানুষ মরা কি তাহলে বন্ধ হয়ে গেছে ? নিজের দায়িত্বটুকুও তিনি আর পালন করছেন না ? কি করছেন তাহলে ?

—তা আর আমি কিভাবে বলব ? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পৃথিবী।

দেবরাজ ডাকলেন সিদ্ধ আর কিন্নরদের। বললেন—দেখ তো একবার যমালয়ে গিয়ে, কি করছেন যমরাজ। তাঁকে একবার এখানে আসতে বল।

সিদ্ধ আর কিঙ্করেরা আদেশমত গেল বটে, কিন্তু ফিরে এল। যমভবনে যমরাজ নেই। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

—সে কি ? বিস্মিত হলেন দেবরাজ—তাহলে তো ওঁর বাবা সূর্যদেবের কাছে একবার খবর নিতে হয়। এই বলে সবাই মিলে গেলেন সূর্যদেবের কাছে।

সূর্যদেব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—পুত্র আমার গোদাবরী তীরে তপস্যা করছে, ইন্দ্র।

—তপস্যা ? শুনে বিস্মিত হলেন দেবরাজ—কিসের তপস্যা ?

—তা তো বলতে পারব না। বললেন সূর্যদেব।

সূর্যদেবের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে বেশ চিন্তা নিয়েই ফিরে এলেন দেবরাজ। হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যমরাজ তপস্যায় বসলেন কিসের জন্য ? তবে কি যমপুরীর রাজা হয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না ? অমরাবতী চান নাকি ? তাঁকে সরিয়ে সমস্ত দেবসমাজের রাজা হতে চান ? বিষ্ণুর তপস্যায় বসেছেন আবার। তিনি তো একটুতেই খুশি। দিয়ে বসতে পারেন। তখন ?

সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন—যমরাজকে আর এগোতে দিলে চলবে না। পাঠালেন সিদ্ধ আর কিন্নরদের। বললেন—তোমারই আমার একমাত্র ভরসা। জানি তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। যাও, যেমন করে পার যমরাজের তপস্যা ভণ্ডুল করে তাঁকে ফিরিয়ে আন।

মিথ্যা নয় দেবরাজের কথা। সত্যিই অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে এরা। কিন্তু অবাক কাণ্ড। তারা ফিরে এল খালি হাতেই। এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল দেবরাজের কাছে।

—পারলাম না দেবরাজ। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু একটুও টলাতে পারলাম না।

দেবরাজ ইন্দ্রকে এবার দেখে কে ? চাঁই চাঁই বরফের জল যেন কে তাঁর মাথার ওপর ঢেলে দিতে লাগল। আর সেই দুরন্ত ঠাণ্ডায় তাঁর শরীরের সব যেন ক্রমশ জমে যেতে লাগল।

আর একটাই ভরসা। এটাই শেষ।

তাকালেন একে একে করুণ মুখে অপ্সরাদের দিকে। উর্বশী-মেনকা-রম্ভা। কিন্তু কেউই মুখ খুলছে না কেন ? এমন এক সঙ্গীন অবস্থায় কেউ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না কেন ?

কিছুক্ষণ কেটে গেল দেবরাজের মলিন মুখে। এমন সময়



এগিয়ে এল মেনকা। বলল—দেবরাজ, অপরাধ নেবেন না। আমাদের সাধ্য নেই ওখানে যাবার। তবে আমার পরিচিত একটি মেয়ে আছে, সে যেতে পারে।

—সত্যি বলছ মেনকা! তাকে এখুনি পাঠাও।

—একটা দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে, দেবরাজ।

—বল। নিশ্চয়ই নেব।

—যমরাজ হঠাৎ খেপে গিয়ে তার যেন কোন ক্ষতি না করে বসে।

—না। সেদিকের ভার আমার। যদি সে সফল হয়, তাহলে এই অমরাবতীতে তাকে তার যথাযোগ্য সম্মান আমি দেব।

আশ্বস্ত হয়ে মেনকা পাঠিয়ে দিল সেই মেয়েটিকে গোদাবরীর তীরে, যেখানে নিবিষ্ট মনে তপস্যা করছিলেন যমরাজ।

মেয়েটি সেখানে আসা মাত্রই যেন মুহূর্তে সেখানকার সব কিছু বদলে গেল। ফুরফুর করে বইতে শুরু করল বাতাস। গাছে গাছে ফুটে উঠল অজস্র ফুল—তারই সুবাসে ভরে গেল চারদিক। কেমন মিষ্টি মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল পাখির দল। চঞ্চল হয়ে উঠল যমের মন। চোখ খুলে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখলেন ফুলভরা একটা গাছের নিচে অপরূপ দেখতে একটি মেয়ে। কি সুন্দর তার দুটি চোখ! কি সুন্দর তার মুখের হাসি! চেয়ে আছে তারই দিকে এক দৃষ্টে।

সেই যে চঞ্চল হয়ে চোখ খুললেন যমরাজ সে চোখ আর বন্ধ হল না। মন আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। উঠে পড়লেন আসন থেকে। ব্যস, দেবরাজের কাজ হাসিল। মেয়েটিও উধাও।

এমনি যখন অবস্থা পিতা সূর্যদেব এলেন যমরাজের কাছে। সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন—পুত্র, এ তুমি কি করছ? দেখ তো, যাঁর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া আছে সকলেই তা নির্বিবাদে পালন করে চলেছে। আর তুমি···সবাই যদি নিজেদের কাজ ঠিক মত না করে পৃথিবীতে কি শান্তি থাকবে? পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখ তো কি অশান্তি তুমি বাধিয়ে তুলেছ সেখানে?

—পিতা। যমরাজ বললেন—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। আমার কাজটা যে দারুণ কঠিন, নোংরা। কত প্রাণীর কান্না যে মেশানো!

—নোংরা! সূর্যদেব বললেন—হ্যাঁ, সেভাবে দেখলে তাই মনে হবে বটে। কিন্তু পুত্র, এটাই তো আসল কাজ। সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য রাখা। সামঞ্জস্য না থাকলে শান্তিও থাকবে না। তুমিই এ কাজের উপযুক্ত। তাই তো তোমার ওপর এই দায়িত্ব।

আর কোন প্রতিবাদ জানাতে পারলেন না যমরাজ।

গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।



বিষ্ণু পুরাণ

ভগবান বিষ্ণু হলেন এই সৃষ্টির পালক। শিবকে যেমন যজ্ঞেশ্বর বলা হয়, বিষ্ণুও হলেন সেই সর্বযজ্ঞের ঈশ্বর শ্রীহরি। তাঁর ঐশ্বর্য যে কি বিশাল, ক্ষমতা যে কি বিপুল, পরাশর-আদি মহামুনিরা তা বিশেষভাবে জানতেন। তাঁর ছেলে বেদব্যাস বাবার কাছ থেকে জেনে, অনুশীলন করে তা এমন সুন্দরভাবে রচনা করেছেন যে, তার তুলনা হয় না। ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা যার অবিচল, কোন দুর্বিপাকে পড়লেও যে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে ভোলে না, তাকে কখনই কোন কষ্টভোগ করতে হয় না। তিনি তাদের সব পাপ ক্ষয় করে দেন, মৃত্যুর পর যমরাজেরও সাধ্য থাকে না তাদের ছোঁয়। যদিও সৃষ্টির কথা, সনাতন ধর্মের কথা, অনেক রাজ-রাজড়ার কথা এতে আছে, এমন কি ভবিষ্যতে কি হবে তাও আছে, তবুও বিষ্ণুর মহিমাই এই পুরাণ-কাহিনীর মূল বিষয় বলে, এর নাম হয়েছে 'বিষ্ণু পুরাণ'। দ্বাপরযুগে এই পৃথিবী যখন অনাচারে ভরে গিয়েছিল, প্রায় প্রতিটি মানুষই দারুণ স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল, রাজারা, সামন্ত রাজারা নিজের নিজের মনের মত দলে জোট বেঁধে যা খুশি তাই করছিল, ধর্ম লোপ পেতে বসেছিল, তখন শান্তিপ্রিয় সাধু মহাত্মাদের আকুল প্রার্থনায় ইনি বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণরূপে আর্বিভূত হয়ে ভক্তদের রক্ষা করেছিলেন।



বেণের কাহিনী ও পৃথিবীর প্রথম রাজা

বৈরাজ মনুর বংশ। জ্ঞানে-গুণে-শীলে যে বংশের সঙ্গে কারো কোন তুলনাই চলে না, সেই বংশে জন্ম অঙ্গের। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মৃত্যুর মেয়ে সুনীথার। এই বংশের সকলেই ভগবান বিষ্ণুকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন।

বহুদিন অঙ্গের কোন ছেলেপুলে হয় নি। শেষে মুনি-ঋষিদের পরামর্শে অঙ্গ করলেন এক বিশাল যজ্ঞ। নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাঁর বাসনা পূরণ করলেন। একটি পুত্র হল, পুত্রের নাম বেণ।

পুত্রকে ঘিরে পিতা অঙ্গের কত আশা-ভরসা। কিন্তু পুত্র যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, তার আচরণ দেখে রীতিমত চিন্তায় পড়লেন অঙ্গ। ঈশ্বরের স্তব-স্তুতির ধার কাছ দিয়েও যায় না ছেলে। খালি শিকার, শিকার আর শিকার। ইতিমধ্যে বনের কত নিরীহ পশুপাখি যে মারা পড়ল তার হাতে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রতিবেশী ছেলেপুলে থেকে গৃহস্থেরা পর্যন্ত সব সময় সবাই শঙ্কিত। কখন এসে পড়বে বেণ, আর কি অনিষ্ট করে বসবে কে জানে।

পুত্রের দিকে তাকান অঙ্গ আর ভাবেন, তাঁদের বংশে এমন কুলাঙ্গার কোথা থেকে এল? একেবারে পেল কিনা দাদু মৃত্যুর ধাত! মৃত্যুর মনে যেমন মায়া-দয়া নেই, শেষে তাঁর এই একমাত্র ছেলেও কিনা হল তাই। অনেক চেষ্টা করলেন পিতা অঙ্গ ছেলের মতি-গতি ফেরাবার, সৎ পথে আনবার যাতে তার অন্তত দেব-দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মায়। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল। আত্মগ্লানি আর ধিক্কারে ভরে গেল অঙ্গের মন। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে থাকতে কিছুতেই আর মন চাইল না তাঁর। একদিন গভীর রাতে কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে চলে গেলেন অঙ্গ, কেউ আর খুঁজে পেল না তাঁকে।

অঙ্গ নেই—খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোর-ডাকাতদের হল পোয়া বারো। এতদিন অঙ্গের ভয়ে প্রকাশ্যে তারা কিছু করতে সাহস পেত না, এবার তাদের দেখে কে? ভয়ে পথে বের হওয়াই দায় হয়ে দাঁড়াল। ঘরের গরু-বাছুর সামলানোও বেশ মুশকিল হয়ে পড়ল।

এ রকম ভাবে তো আর থাকা যায় না। তাই মুনি-ঋষিরা সবাই মিলে বেণকে করলেন রাজা। শাসক একজন চাই, নইলে দেশ যাবে গোল্লায়। ভেবেছিলেন সবাই, মনুর বংশে যখন জন্ম, তখন রাজা হয়ে বেণ নিশ্চয়ই অনিষ্ট কিছু করবে না।

সত্যিই চোর-ডাকাতেরা যেই শুনল, সবাই মিলে বেণকে রাজা করেছে, মুহূর্তে তারা সব কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। দেশবাসী একটা আপদ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু আর একদিকে দেখা দিল এক বিপর্যয়। মারাত্মক বিপর্যয়।

রাজা হয়েই বেণ ঘোষণা করে দিল, তার রাজ্যে যাগ-যজ্ঞি চলবে না। আগুনে এন্তার ঘি পুড়িয়ে হোম-টোম করাও চলবে না। ওসব আমি মানি না, ভালও বাসি না।

শুনে তো মুনি ঋষিরা অবাক। এ কি কথা বেণের মুখে! সত্যিই কি এটা বেণের আদেশ? যাকে তাঁরা রাজা করেছেন। এ যে বিশ্বাস করা দায়।

সবাই গেলেন রাজা বেণের কাছে—যাগ-যজ্ঞ, হোম-টোম, ধর্ম-কর্ম হবে না, এ কি তোমার আদেশ?

—কেন? সন্দেহ জাগছে? আমারই আদেশ। সদম্ভে বলে বেণ।

—ভগবান শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ আছে বলেই এত অশান্তির মধ্যেও রাজ্যে শান্তি আছে। ধর্ম-কর্ম আছে, তাই প্রজার সঙ্গে রাজারও মঙ্গল হচ্ছে। রাজা কোথায় এই সব কাজকে উৎসাহ দেবে, তা না করে তুমি এ কি করতে যাচ্ছ? তোমার পূর্বপুরুষেরা যাঁর সেবা ও আরাধনা করে অমর হয়ে আছেন, তুমি সেই বংশের ছেলে হয়ে তাঁদের অপমান করছ কোন্ সাহসে? ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ঋষিরা।

রাজা বেণ আরও রেগে ওঠে।

অত বাক্যব্যয় কিসের? যেন ঋষিদের ধমকে ওঠে বেণ—আমি যা বলেছি, তাই হবে। ভগবান শ্রীহরি, সে আবার কে? যদি কেউ থেকে থাকে, তা হলে শুনে রাখ, সে আমি নিজে। ধর্ম-কর্ম—সে আবার কি জিনিস? আমি তো জানি রাজার সেবা, তাঁকে সন্তুষ্ট রাখাই প্রজার প্রকৃত এবং একমাত্র ধর্ম। পূর্বপুরুষেরা যদি বোকামি করে থাকে তাই বলে কি আমাকেও বোকামি করতে হবে? যাও তোমরা। আমি যা বলেছি এবার থেকে তাই হবে। একটুও এদিক ওদিক আমি মোটেই বরদাস্ত করব না।

ঋষিরা এসব কথা শুনে অবাকের ওপর আরো অবাক। শেষে তাঁদেরই দুধ-কলা খেয়ে হল কিনা কালসাপ। আবার তাঁদেরই মাথায় আসে ছোবল মারতে! ঋষিরা ভাবলেন, একে বেঁচে থাকতে দিলে তো দেখছি আরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। আরো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে পৃথিবীর। নিজেদের রাগ তাঁরা আর সামলে রাখতে পারলেন না। এক সঙ্গে সবাই মিলে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন।

—কি! বরদাস্ত করবে না? এত ঔদ্ধত্য তোমার? পূর্বপুরুষেদের অপমান। ঋষিদের অসম্মান। তুমি নিজে ভগবান। দেখ তাহলে। বাঁচাও নিজেকে। দেখি তুমি কত বড় সর্বশক্তিমান।

এই বলে ঋষিরা তুলে নিলেন একগাছা কুশ। তাতে মন্ত্র পড়ে সজোরে ছুঁড়ে দিলেন বেণের দিকে। কুশটা নিয়ে ঋষিদের বিড়বিড় করতে দেখে মনে মনে খুব হাসছিল বেণ। ভাবছিল মিটে যাক ওঁদের এই ছেলেখেলাটা, তারপর উচিত শিক্ষা কাকে বলে এক বার দেখিয়ে দেবে। কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না বেণ। দেখল তার দিকে কুশ ছুঁড়লেন ঋষিরা, কিন্তু আগুনের ফলা নিয়ে একটা বর্শা

যেন ছুটে এসে বুকটা তার এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল বেণ।

সুনীথার চোখের সামনেই মারা গেল তার একমাত্র পুত্র বেণ। পাষাণের মত দাঁড়িয়ে শুধু দেখলেন জননী। তারপর ঋষিরা সেখান থেকে চলে যেতে পুত্রের মৃতদেহ আগলে বসে রইলেন তিনি।

একটা পাপের হাত থেকে মানুষজনকে পরিত্রাণ দিতে পেরে খুশিই হয়েছেন ঋষিরা। তাঁদের যা করা উচিত, তাঁরা তাই করেছেন। মনে তাই কোন সঙ্কোচ নেই তাঁদের। এরপর মাত্র কয়েকটা দিন গেছে। সরস্বতীর জলে স্নান করে সবে যাগযজ্ঞ করতে বসবেন হঠাৎ দেখলেন, যতদূর দেখা যায়, সব যেন ধুলোয় ঢেকে গেল। মনে হল কোথা থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি, আর্তনাদ ভেসে আসছে। চমকে উঠে ঋষিরা তাকালেন জনপদের দিকে। না, জনপদের একটা গাছও চোখে পড়ছে না। সব যেন ঢেকে গেছে ধুলোর আড়ালে।

বেণ নিহত হয়েছে, খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা হবার তাই হয়েছে। দেশ অরাজক। চোর ডাকাতের দল, যারা এতদিন প্রায় লুকিয়ে ছিল, কাজ করত খুব সাবধানে, আড়ালে-আবডালে, এবার তারা হয়ে উঠল বেপরোয়া। প্রকাশ্যে শুরু করে দিল লুটতরাজ। প্রথম প্রথম জনসাধারণ বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু হয় তাদের হাতে হেনস্থা হল, নয় প্রাণ দিল। ফলে ভয়ে আর কেউ কিছু বলতেও পারে না। সব জনপদেই কিছু কিছু মানুষজন থাকে যারা একজোটে রুখে দাঁড়ালে যে কোন অত্যাচার থেমে যেতে বাধ্য। কিন্তু তারাও চুপ করে রইল। শুধু তাই নয়, গোপনে আবার ডাকাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাখল। তাই তাদের গায়ে আঁচড় পড়ল না একটুও। সর্বস্বান্ত হতে লাগল সাধারণ মানুষেরা।

ঋষিরা সব কিছু খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন—সর্বনাশ ! একজন অত্যাচারীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে চারদিকে অত্যাচার অনাচার যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। মানুষজন এমনি অসহায় হয়ে পড়ল যে, অত্যাচারী অনাচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসল। এরকম ভাবে চলতে থাকলে পৃথিবী যে লোপ পেয়ে যাবে।

তপোবনে বসে ঋষিরা হলেন চিন্তায় আকুল। এখন কি করা যায় ? সবাই মিলে মন-প্রাণ দিয়ে ডাকতে লাগলেন ভগবান শ্রীহরিকে—প্রভু বিষ্ণু তুমিই তো সব। এখন বলে দাও, কি করলে তোমার এই সৃষ্টি রক্ষা পাবে।

ভাবতে ভাবতে ঋষিরা হঠাৎ যেন একটা পথ দেখতে পেলেন। তাঁরা তপোবনবাসী। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ তো আর তাঁদের কাজ নয়, এর জন্য চাই একজন শাসক। আর এই রকম অরাজকতা দূর করতে দরকার একজন কড়া রাজার। কিন্তু কে হবেন তেমন রাজা ? ঋষিরা ভাবলেন যে বংশে বেণের জন্ম, সে বংশ তো মহান। একমাত্র কলঙ্ক ছিল ঐ বেণ। তাই বলে বংশটাকে লোপ করে দেওয়া ঠিক হবে না।

মন স্থির করে ঋষিরা আবার গেলেন সেখানে, যেখানে সুনীথা বেণের মৃতদেহ আগলে বসে ছিলেন। সেখানে গিয়েই তাঁরা শুরু করে দিলেন বেণের উরু মন্থন করতে। নিঃসন্তান বেণের শরীরের সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে এল বেঁটেখাটো, দেখতে কালো, কদাকার এক পুরুষ। বেরিয়েই ঋষিদের জিজ্ঞেস করল—বলুন, আমায় কি করতে হবে।

অমন কদাকার মিশকালো পুরুষটাকে দেখে ঋষিরা ভাবলেন—এ কি করবে ? তাই তাকে বললেন, 'নিষীদ'। মানে, বস। সেই থেকে তারা হল নিষাদ, তাদের জীবিকা হল শিকার। তারা বসবাস করতে শুরু করল বিন্ধ্যপর্বতে।

এরপর ঋষিরা বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করতে শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন সুন্দর এক পুরুষ। অপরূপ তাঁর দেহের গড়ন। তাঁকে দেখে ঋষিরাও মুগ্ধ হলেন। স্বর্গলোকেও সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল দুন্দুভি। চার দিক থেকে শুরু হল পুষ্পবৃষ্টি। ছুটে এলেন জগৎ বিধাতা ব্রহ্মা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তাঁকে। দেখলেন, নবজাতকের ডান হাতে চক্রচিহ্ন। একমাত্র ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহ ছাড়া ওই চিহ্ন নিয়ে কেউ জন্মাতে পারে না। যে জন্মায়, সে হয় রাজচক্রবর্তী। আর তার গতি হবে অপ্রতিহত।

আর কোন সংশয় নেই, দ্বিধা নেই। তাঁর নাম হল পৃথু। সবাই মিলে তাঁকেই করলেন রাজা।

রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবেন পৃথু, কিন্তু দ্রব্যসামগ্রী কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে সাগর পর্বত আকাশ নদী নাগ গরুড় পাখি হরিণ—যার যা ছিল সবাই এনে উজাড় করে দিল পৃথুর পায়ে। কুবের থেকে স্বর্গের যত লোকপাল দেবতারা ছিলেন, সকলেই এক একটা সম্পদ দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুললেন পৃথুকে।

মহা সমারোহে রাজসিংহাসনে সকলের সমর্থন নিয়ে পৃথুর হল রাজ্যাভিষেক।

এ ভাবে রাজা হয়েছিলেন বলেই পৃথুকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম রাজা।

সিংহাসনে বসে রাজা পৃথু। সুন্দর পোশাক, সর্বাঙ্গে তাঁর নানা অলঙ্কার। পাশে থরে থরে সাজানো তাঁর সব দিব্য অস্ত্র। সূত আর মাগধেরা এল রাজার মহিমা কীর্তন করতে।

সবেমাত্র স্তুতি শুরু করেছে তারা, তাদের থামিয়ে দিলেন রাজা পৃথু।

এ আপনারা কি শুরু করলেন ? সবেমাত্র সিংহাসনে বসেছি। প্রজাদের জন্যে এখনও আমি কিছুই করি নি। আপনারা আমার কি মহিমা গান করবেন ? এ সময়ে কে আপনাদের পাঠাল ?

সবিনয়ে জানাল সূত আর মাগধেরা—রাজন্ ! ঋষিরাই পাঠিয়েছেন আপনার মহিমা কীর্তন করতে। এখন কিছু না করলেও ভবিষ্যতে যা করবেন, ঋষিদের আদেশে আজকের এই সভায় আমরা তারই কীর্তন করে যাব।

ঋষিদের আদেশ পালন করতে এসেছেন ওঁরা। সুতরাং আর কিছু বলার নেই। চুপ করে গেলেন পৃথু। সূত আর মাগধেরা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর অনেক গুণাবলী কীর্তন করে গেল। মন দিয়ে সব শুনলেন পৃথু। মনে মনে ভাবলেন পৃথু, সূত আর মাগধেরা যা বলে গেল, তিনি যদি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে না পারেন, তাহলে কলঙ্কের শেষ থাকবে না।

এবার শুরু হল পৃথুর রাজ-কাজ। সঙ্কল্পে অটল তিনি।

আগুনের মত তেজ নিয়ে সিংহাসন ঝলমল করে একদিন বসে আছেন পৃথু। হাজির হল এসে প্রজার দল। হাড় জিরজিরে সব চেহারা, লট-পট করছে সব হাত পা, চোখগুলো সব ঢুকে গেছে



কোটরে। পেটগুলো এমন ভেতরে ঢুকে গেছে যে বুকের হাড় পাঁজরগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তাদের দেখেই বড় মায়া জাগল পৃথুর মনে।

—মহারাজ! আপনি আমাদের রাজা, অন্নদাতা। খিদের জ্বালায় আমরা যে মারা যেতে বসেছি। আমাদের খাদ্য দিন, আমাদের বাঁচান।

প্রজাদের কাতর আবেদন এসে বুকে বাজল পৃথুর। সত্যিই তো, রাজা হয়ে প্রজাদের মুখে যদি অন্নই দিতে না পারলাম, তাহলে আমি কেমনতর রাজা! মনে পড়ে গেল সূতদের সেই কীর্তন। আমার রাজত্বে পৃথিবী হবে শস্যশালিনী, প্রজাদের কোথাও কোন অভাব থাকবে না।

তাই যদি হয়, তাহলে এখন তো তিনি রাজা। তবুও পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ কেন? গাছপালা, ফলমূল, ক্ষেতের ফসল, সব গেল কোথায়?

একটুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে চেষ্টা করলেন পৃথু—কি হতে পারে? কেন পৃথিবী থেকে খাদ্যদ্রব্য, গাছ-পালা সব লোপ পেয়ে গেল? পৃথিবীর এত দুঃসাহস কোথা থেকে এল যে, তিনি রাজা হবার পরেও প্রজাদের এমন হাহাকার থাকে।

ভাবনা শেষ। নিজের কর্তব্যও স্থির। প্রজাদের অভয় দিয়ে হাতে তুলে নিলেন সেই দিব্য অজগর ধনু। দেখতে সামান্য একটা ধনুক হলে কি হবে, যেখানেই আত্মগোপন করুক তার শরের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই কারো।

পৃথিবীর ওপর দারুণ রাগে পৃথুকে সেই ধনুক হাতে তুলে নিতে দেখেই ভয়ে পৃথিবী কাঁপতে শুরু করল। তারপর প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গাভীর রূপ ধরে পালাতে লাগল সে মর্ত্যলোক ছেড়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? যেখানেই যায়, দেখে পেছনে সেই ধনুক হাতে ছুটে আসছে পৃথু। আবার সেখান থেকে প্রাণভয়ে দৌড় দেয় পৃথিবী। শেষে দৌড়তে দৌড়তে পৃথিবী এল বৈকুণ্ঠে, যেখানে থাকেন স্বয়ং বিষ্ণু। এসেই দেখে, পথ আগলে ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে পৃথু। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর বুঝি পরিত্রাণ নেই।

পৃথিবী তখন থমকে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলল পৃথুকে—আপনি মহারাজা, আর আমি একজন অবলা নারী। আমাকে এভাবে হত্যা করলে যে আপনার পাপ হবে।

—পাপ! হেসে ওঠেন পৃথু। আর ঠাঁই-কূল না পেয়ে আমাকে ধর্মজ্ঞান দিতে এসেছ। ভেবেছ, এতেই চিঁড়ে ভিজে যাবে? যেখানে একজনের জন্যে হাজার হাজার মানুষ মরতে বসে, সেখানে সেই একজন যদি নারীও হয়, তাকে হত্যায় কোন পাপ নেই।

—বেশ, আপনার যুক্তি আমি মেনে নিলাম। তেমনি বিনীতভাবেই বলল পৃথিবী—কিন্তু আমার অপরাধ? আর আমাকে মেরে ফেললেই কি আপনার প্রজাকুলের খিদে মিটবে?

—আবার জানতে চাইছ তোমার অপরাধ কি? তীক্ষ্ণ কণ্ঠ পৃথুর—প্রজাকুলের যথাসর্বস্ব গ্রাস করে রেখেছ তুমি। জান না এটা কত বড় অপরাধ।

—আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাজ। বলল গাভীর রূপধারী পৃথিবী—কিন্তু কেন এমন তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? আপনি যখন রাজা হন নি, তখন কি চলছিল এখানে? অরাজকতা। দুর্বৃত্তরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। যেখানে যা কিছু ছিল তারা লুটে-পুটে নিচ্ছিল। তারা যেভাবে সব গ্রাস করতে শুরু করেছিল আমি যদি সে সময় সজাগ না হতাম, নিজেকে গুটিয়ে না নিতাম, তাহলে এখন কিছুই আর থাকত না। দাবি জানালেও আমার কাছ থেকে কিছুই পেতেন না। ওরা আমাকে নিঃস্ব করে দিত। তাই আমি সব কিছু আত্মসাৎ করেছিলাম। আর এখন সেগুলো সব আমার মধ্যে হজম হয়ে ক্ষীর হয়ে জমে আছে।

মন দিয়ে পৃথিবীর কথাগুলো শুনলেন পৃথু। সত্যিই এ দিকটা এমনভাবে তো ভাবেন নি। কমে গেল রাগ। নামিয়ে নিলেন উদ্যত ধনুক। বললেন—এখন তাহলে তুমি আমায় কি করতে বল।

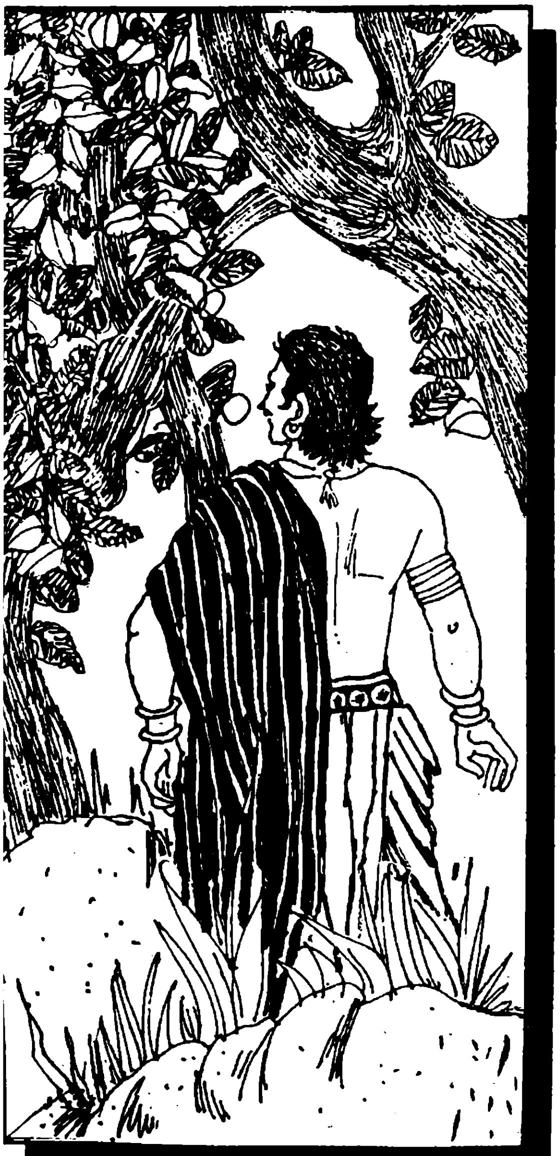
—মহারাজ। একবার মাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ক্ষুব্ধ হয়ে ও কেমন নিজেকে বেখাপ্পা করে ফেলেছে। নিজেকে কোথাও করে ফেলেছে দারুণ উঁচু, কোথাও দারুণ নিচু। আপনি আগে ওকে সমান করুন। তারপর আমাকে দোহন করুন। আমার ক্ষীরের ধারা তাহলে সব দিকে সমানভাবে গড়িয়ে গিয়ে মাটিকে উর্বরা করে তুলবে। গাছ-গাছালি, ওষধিলতা, ফল-পাকড়, শস্যে আবার সবদিক ভরে যাবে। আপনার প্রজাদের অভাবও মিটবে।

ধনুক ফেলে তাই করলেন পৃথু। শস্যশ্যামল হয়ে উঠল পৃথিবী। দূর হয়ে গেল মানুষের সব দুঃখকষ্ট। মিটল মানুষের খিদের জ্বালা। দূর হয়ে গেল দেশ থেকে অরাজকতা। যেখানে যত অনাচার, অধর্ম গজিয়ে উঠেছিল তা বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রাণভরে ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞ করতে পারলেন, তপোবনে আবার হোমাগ্নি জ্বলে উঠল। তার ধোঁয়া আকাশে উঠে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। মর্ত্য থেকে স্বর্গ সর্বত্রই ঘোষিত হতে থাকল পৃথুর জয়। আর পৃথিবী পালিতা হতে থাকল পৃথুর ঠিক নিজের মেয়ের মত। হয়ত ধরণী পৃথুর কাছে মেয়ের মত হয়েছিল বলেই তার নাম 'পৃথিবী' হয়েছিল।

স্বর্গে যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, মর্ত্যে তেমনি পৃথু। ইন্দ্রের যদিও-বা কিছু দোষত্রুটি ছিল, বিষ্ণুভক্ত পৃথুর মধ্যে তার কিছুই ছিল না। তাঁর

শুচি-সাধ্বী স্ত্রী অর্চি। চারটি ছেলের জননী। পৃথিবী যখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, প্রতিটি গ্রাম-নগর যখন সুন্দর হয়ে উঠল, ছেলেদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পৃথু চলে গেলেন বনে তপস্যায়। অর্চিও চলে গেলেন তাঁর সঙ্গে, ঠিক যেন রামের সঙ্গে সীতা। বনের ফল-মূল, ঝরনার জল খেয়ে একদিন তপস্যা করতে করতে পৃথুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। স্ত্রী অর্চিই চিতা সাজিয়ে স্বামীর দেহে লাগাল আগুন। লক্‌লক্ করে জ্বলে উঠল আগুন। দেবতাদের প্রণাম জানিয়ে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে অর্চিও হলেন স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা।

পৃথিবীর আদি রাজা পৃথু রানী অর্চির সঙ্গে অমর হয়ে রইলেন। ঢাকা পড়ে গেল তাঁর পিতা বেণের কলঙ্ককাহিনী।





হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু। সুরলোক থেকে শুরু করে মর্ত্যলোকের প্রতিটি অধিবাসীর কাছেই ঐ নামটাই ছিল এক মূর্তিমান ত্রাস। মুখোমুখি হলে তো কথাই নেই।

বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কাকুলাম জেলা, এরই প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে সিংহাচলম্। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল এখানেই। তখন তো আর এসব নাম ছিল না, নাম ছিল পাতালপুরী। সেই পুরীই ছিল দৈত্যদের রাজধানী। আর হিরণ্যকশিপু ছিল এই পুরীরই মহাপরাক্রমশালী রাজা। দিতির ছেলে হিরণ্যকশিপুর আর এক ভাই হিরণ্যাক্ষ। দুজনেই সে সময় স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু এত শক্তি পেল কিভাবে হিরণ্যকশিপু, যে দেবতারা তো দূরের কথা, এমন কি ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও কালঘাম সে ছুটিয়ে দিয়েছিল?

সেই কাহিনীটিই আগে বলে নিই।

এই যে বিশাল জগৎ, মানুষ থেকে শুরু করে গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ—জগতের এত যে বৈচিত্র্য, সবই যাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে, যাঁর ইচ্ছায় সব কিছু চলছে, তিনি হলেন ভগবান বিষ্ণু। তাঁরই ইচ্ছা—সূর্যের আলো, চাঁদের কিরণ, রাতের অন্ধকার। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে, যে ভাবেই তা থাকুক না কেন, তাঁর কাছে সবাই সমান। সকলের প্রতি তাঁর সমান ভালবাসা, সমান করুণা। থাকেন তিনি বৈকুণ্ঠে পত্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, ঝামেলা নেই। উপরন্তু অত শান্তি আর কোথাও নেই। বৈকুণ্ঠে থাকেন তিনি ঠিকই, সকলেই তা জানে, কিন্তু ইচ্ছে হলেই তাঁর দেখা পাওয়া মোটেই সহজ নয়। সে যত বড় জ্ঞানী-গুণী মুনি-ঋষিই তিনি হন না কেন। অনেক সাধ্য সাধনা তপস্যা করলে, যদি তাঁর আবার ইচ্ছে হয়, তবে ক্ষণিকের জন্যে তাঁর দেখা মিলতে পারে। এর মধ্যে সনক প্রভৃতি নামমাত্র কয়েকজন মুনি-ঋষি ছিলেন, যাঁদের জন্য তাঁর ঘরের দরজা সব সময়ই খোলা থাকত। এঁদের বয়সের কোন গাছপাথর ছিল না। অথচ যখনই কেউ দেখুক না কেন, মনে করবে, কত আর বয়স? ষোল কিংবা সতের।

হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠে সেই যে ভগবান বিষ্ণুর প্রাসাদ, তাতে ছিল দুজন দ্বারী। নাম—জয় আর বিজয়। সব সময়ই তারা থাকত দ্বারে, পাছে হঠাৎ কেউ এসে এখানে ভগবানকে বিরক্ত না করে। বাইরে দেখতে রুক্ষ রুক্ষ হলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে তারা কিন্তু ছিল ভগবানের ভীষণ অনুগত। আর বিষ্ণুও তাদের খুবই স্নেহ করতেন। কেউ এলে, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বিনয়ের সঙ্গে বলে ওরা

তাদের ফিরিয়ে দিত। কিন্তু মাঝে মাঝে মেজাজ ঠিক রাখতে পারত না। চোখমুখ পাকিয়ে কটু কথাও বলে ফেলত। ভগবান বিষ্ণুর তা কানে গেলে শাসন করা তো দূরের কথা, মনে মনে হাসতেন শুধু।

একবার সনক প্রভৃতি জনকয়েক মুনি-ঋষি গেলেন বৈকুণ্ঠধামে ভগবান বিষ্ণুর চরণ দর্শন করতে। প্রাসাদে ঢুকতে গেলে সাতটা দ্বার পেরোতে হবে। ঋষিরা ছটা দ্বার পেরিয়ে এলেন নির্বিবাদে। যতই দেখতে দেখতে এগিয়ে আসেন, ততই ভরে ওঠে মন। চারদিকে গন্ধর্বরা মধুর সুরে গান করছে, নীল নীল সরোবরে হাঁসেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। কত না মিষ্টি ফুল। তার সুবাসে বৈকুণ্ঠের বাতাস যেন ভরপুর। ঋষিরা এবার এলেন সপ্তম দ্বারে। দেখলেন, দ্বারের দু পাশে দাঁড়িয়ে দুজন। এতগুলো দ্বার পেরিয়ে এলেন তাঁরা—কেউ তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞেসও করে নি, আর তাঁদেরও কাউকে কোন কথা বলতে হয় নি। এখানেও সেভাবেই তাঁরা যেই ঢুকতে গেলেন, বাধা দিল দুই রক্ষী, জয় আর বিজয়। কেমন করে চিনবে তাঁদের জয়-বিজয়? তারা দেখল, ওদের পরনে নেই কোন পোশাক, অল্প বয়স। তাঁরা দাঁড়িয়ে দ্বারে, অথচ কোন জিজ্ঞাসাবাদ নেই। এত ঔদ্ধত্য যে তাদের উপেক্ষা করে সোজা কিনা ঢুকে যাচ্ছে ভগবানের ঘরে!

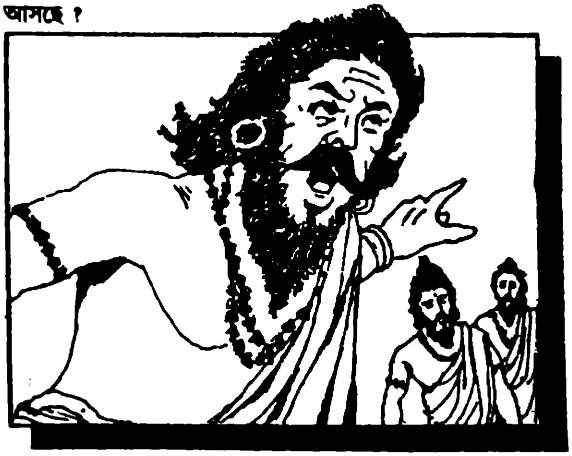
—কে হে তোমরা? এখানে কি মনে করে?

থমকে দাঁড়ালেন ঋষিরা। বললেন—আমরা এসেছি ভগবানের চরণ দর্শন করতে।

লাল লাল চোখ ভাঁটার মত ঘুরিয়ে যেন ভেংচি কেটে উঠল দ্বারীরা—এসেছি ভগবানের চরণ দর্শন করতে। বলি, ডেঁপো ছোকরার দল, এ কি গাছের ফল যে, টুপ করে গাছ থেকে পড়ল, আর হাতের মুঠোয় ভরে ফেললে?

দ্বাররক্ষীর মুখ থেকে, বিশেষ করে বৈকুণ্ঠধামের মত এমন পবিত্র জায়গায় স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারীর মুখে এমন অশোভন, অপবিত্র কথা যে বেরোতে পারে, ঋষিরা তা ভাবতেও পারেন নি। যেমন অবাক হলেন, তেমনি ক্ষুণ্ণও হলেন। তবুও ঐ তাচ্ছিল্য হজম করে শান্ত কণ্ঠেই বললেন—এসব তোমরা কি কথা বলছ, দ্বারী! এ কথা কি কোন বিষ্ণুভক্তর মুখে মানায়?

জয় আর বিজয় হেসে দুজনে দুজনকে চোখ ঠেরে বলে উঠল—আরে, কাল কা যোগী, আমাদের আবার জ্ঞান দিতে আসছে?



যেন শুনেও শুনতে পেলেন না ঋষিরা, এমন ভান করে বললেন—আচ্ছা দ্বারী, তোমরা তো এখানে অনেকদিন ধরেই আছ, তোমরাই বল না, চট করে কি এই বৈকুণ্ঠধামে কেউ আসতে পারে? কাউকে কি কখনো সেইভাবে আসতে দেখেছ?

—ওসব পাকা পাকা কথা রাখ তো। বিরক্ত কোরো না। এখান থেকে সরে পড়। খিঁচিয়ে ওঠে দ্বারীরা।

চরণ দর্শন না করে তো আর সনকরা চলে যাবার জন্য আসে নি। তাই তাঁরা আবার শান্ত কণ্ঠে বললেন—তোমরা কি ভাবছ, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত এখানে এসে ঢুকেছি? তা কি কেউ কখনো আসতে পারে? তোমরা কি জান না, কত সাধন ভজন করলে, তবে এখানে আসা যায়? তোমরা আমাদের অন্যরকম ভাবছ কেন দ্বারী? পথ ছেড়ে আমাদের যেতে দাও।

জয়-বিজয়ের সেই এক গোঁ।

সনক বললেন—যারা প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত তাদের মধ্যে যেমন দুই দুই ভাব থাকা ঠিক নয়, তেমনি এরকম গোয়ার্তুমি থাকাও তো উচিত নয়। এইরকম মনোভাব নিয়ে স্বয়ং ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের অনুচর হবার যোগ্যতা তোমাদেরই নেই। মর্ত্যে যারা কাম-ক্রোধ-দম্ভ-অহঙ্কার নিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে তাহলে তোমাদের পার্থক্য কোথায়?

এবার জয়-বিজয়ের আত্মসম্মানে কথাগুলো খুব লাগল। রেগে দণ্ড উঁচিয়ে তেড়ে এল তারা ঋষিদের দিকে—আবার পাকা পাকা কথা! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

সনক ঋষিরাও আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেন না। অভিশাপ দিয়ে বসলেন—তোমাদের স্থান বৈকুণ্ঠে নয়। পাতালে যাও। সেখানে তোমরা তোমাদের এই দম্ভের বাসনা মিটিয়ে এসো।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে যেন জোঁকের মুখে চুন পড়ার মত অবস্থা হল জয় আর বিজয়ের। বুঝল, দারুণ ভুল করে ফেলেছে তারা। বলল—বুঝতে পারি নি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

ঠিক সেই সময়েই সেখানে এসে হাজির হলেন স্বয়ং লক্ষ্মীনাথ ভগবান, খালি পায়ে হেঁটে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে।

অবাক চোখ মেলে ঋষিরা দেখলেন—পরনে পীতবসন, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, বুকে বনমালা, আর কৌস্তুভ মণি। দু পাশে হাঁসের মত ঝুলছে দুটো সাদা চামর, মাথায় সাদা ছাতা। ছাতার চারপাশ দিয়ে ঝুলছে মুক্তার হার। মুখে অমল-ধবল হাসি। একবার তাকাচ্ছেন জয়-বিজয়ের দিকে, আর একবার তাঁদের দিকে। করুণা যেন ঝরে পড়ছে। আত্মারাম সে রূপ দেখলে যেমন চোখ জুড়োয়, তেমন মন জুড়োয়।

তিনি জানতেন, ব্রাহ্মণরা এসেছেন তাঁর চরণ দর্শন করতে। তাই নিজে থেকেই এসেছিলেন তিনি খালি পায়ে, যাতে তাঁর চরণ দেখার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানাতে না হয়, আর অভিলাষ পূরণ হলেই শান্তি পান। সঙ্গে আবার লক্ষ্মীকেও এনেছেন। অহঙ্কার যাদের নেই, যাদের মন প্রাণ জুড়ে শুধু শ্রদ্ধা আর বিনয়, লক্ষ্মীর তো বাস সেখানেই।

সামনে লক্ষ্মীনাথকে দেখে মুনিরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা একবার দেখেন বৈকুণ্ঠনাথের সেই মুখ, আর একবার পদ্মরঙ চরণ। বার বার প্রণাম জানান। সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে

অনুশোচনা। এঁর অনুচরদের অভিশাপ দিয়ে কাজটা বোধ হয় ভাল করলেন না।

শ্রীহরির কাছে তো লুকোনো কিছু নেই। আর সাধ্যও নেই কারো, যে মনে কিছু লুকিয়ে রাখে। তিনি যে বিকুণ্ঠ—সর্বত্র অপ্রতিহত গতি তাঁর।

জয়-বিজয়ও মাথা হেঁট করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হাসলেন ভগবান বিষ্ণু। কি মধুর সে হাসি। আবার তাকালেন মুনিদের দিকে। সেই মধুর হাসি। যেন কোথাও কোন অভিযোগ নেই।

ব্রাহ্মণদের বললেন—আপনাদের সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আপনারা নতুন কিছু করেন নি, আর অন্যায়ও কিছু করেন নি। আমার ইচ্ছাই পূরণ করেছেন।

তারপর জয়-বিজয়ের দিকে তাকিয়ে তেমনি মধুর হেসেই বললেন—ভালই হয়েছে। এক জায়গায় চিরকাল থাকলে মনটা একটু অন্য রকমের হয়ে যায়। বেশ হয়েছে, কিছুকাল মর্ত্য-পাতাল ঘুরে এসো, তাতে মনটা আর বেচাল করবে না। যাওয়া অবশ্য তোমাদের অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল, আমার যোগনিদ্রায় থাকার সময় লক্ষ্মীকেই প্রাসাদে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলে। এখন, এই ব্রাহ্মণদের অভিশাপ, আমার যত ক্ষমতাই থাক, কাটাতে আমি পারব না। ফল ভোগ তোমাদের করতেই হবে।

—প্রভু, আমাদের কি উদ্ধার হবে না? নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে জয়-বিজয় অনুরোধ জানাল ভগবানের কাছে।

—যেদিন তোমরা দারুণ স্বার্থপর আর ঘোর অনাচারী হয়ে উঠবে, যখন তোমাদের দৌরাত্ম্য চরমে উঠবে, তখন আমিই তোমাদের উদ্ধার করে আনব। ভৃত্যকে কষ্ট পেতে দেখলে কি মনিব চুপ করে থাকতে পারে?

তারপর মুনিদের বললেন—ভৃত্য যে অন্যায় করেছে, সে অন্যায় তো আমারই। ভৃত্য দোষ করলে দোষটা মনিবেরই হয়, অপবাদ তারই হয়। আপনারা সত্যিই মহৎ। তা নইলে আমাকে এই অপবাদ থেকে এমন ভাবে মুক্ত হবার জন্য কি সাহায্য করতেন? শুধু একটা অনুরোধ, ওদের ফলভোগের পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিন, যাতে ওরা আবার এখানে ফিরে আসতে পারে।

তাই করে দিলেন মুনিরা, জয়-বিজয়ের করুণ মুখ দেখে। এই ঔদ্ধত্যের ফল ওদের তিনটে জন্ম ভোগ করতে হবে। তারপর ওরা বরাবরের জন্য এখানে ফিরে আসতে পারবে। প্রথম জন্মে তাই ওরা হয়েছিল কশ্যপ-তনয়। দিতির ছেলে হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ। দ্বিতীয় জন্মে হয়েছিল, সুকেশিনীর ছেলে রাবণ আর কুম্ভকর্ণ। আর তৃতীয় অর্থাৎ শেষ জন্মে হয়েছিল শিশুপাল আর দন্তবক্র। আর প্রতিবারেই স্বয়ং ভগবানকে বিভিন্ন মূর্তি ধরে আসতে হয়েছিল তাঁর প্রিয় অনুচরদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে।

বাকি কজনের কথা আপাতত থাক। এখন আসি হিরণ্যকশিপুর কোথায়।

দক্ষ প্রজাপতির অনেকগুলি মেয়ে। বিয়ে দিয়েছিলেন বেছে বেছে সব মহা মহা সুরের সঙ্গে। তার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু এই রকম ছটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন কশ্যপের। অদিতির ছেলেপুলে হয়ে গেছে। দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তারা সবাই আছে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। তখনো দিতি একটি সন্তানেরও জননী হতে পারে নি। এবার তার হল দুটি ছেলে। কশ্যপ তাদের নাম রাখলেন—হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ। এরাই হল দৈত্যকুলের আদি পিতা।

জন্মগ্রহণ করার কিছুকাল পরেই হিরণ্যকশিপু বনে চলে গেল তপস্যা করতে। তার ইচ্ছা, সে-ও হবে ব্রহ্মার সমান। একান্ত যদি তা না হওয়া যায়, তবুও কাছাকাছি একটা কিছু তাকে হতেই হবে।

নির্জন বনে গিয়ে শুরু হল হিরণ্যকশিপুর তপস্যা। মাথার ওপর দুটো হাত তুলে, পায়ের মাত্র বুড়ো আঙুলদুটোর ওপর সারা শরীরে ভর রেখে হিরণ্যকশিপু শুরু করল এক কঠিন তপস্যা। মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল রোদের প্রখর তেজ, মুষলধার বৃষ্টি, রাতের শিশির। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হিরণ্যকশিপুর। একভাবে চলল তার তপস্যা, নিরম্বু উপবাস করে। এরকম তপস্যা একমাত্র জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা ছাড়া আর কেউ করেন নি। কোন দেবতার সামর্থ্যেও কুলোয় নি। মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে তার চুল জটাজুট হয়ে, চারদিকে গজিয়ে উঠেছে গাছ। পিঁপড়েরা কুরে কুরে শেষ করে ফেলেছে তার দেহের মাংস-রক্ত। তা-ও আবার ঢাকা পড়ে গেছে ওই মাটিতে। শুধু অক্ষত আছে চোখদুটো। দেখলেই মনে হবে যেন বিশালকায় একটা উইয়ের ঢিপি। হিরণ্যকশিপুর এইরকম তপস্যা দেখে দেবরাজ্যের দেবতারা তো ভয়েই অস্থির হয়ে পড়লেন। সবাই মিলে গেলেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। অনুরোধ জানালেন—বিধাতা, দৈত্যের এই তপস্যা বন্ধ করুন, নইলে সব যে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে। শুনে ব্রহ্মা এবার একটু নড়েচড়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে একশ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। ব্রহ্মা এসে নিরস্ত করলেন হিরণ্যকশিপুকে। বললেন—দৈত্যপতি, আর তোমার তপস্যার প্রয়োজন নেই। তুমি বর চাও।

হিরণ্যকশিপু বলল—যদি বরই দিতে চাও ঠাকুর, তাহলে আমি যা চাইব, তোমাকে তাই দিতে হবে।

—অবশ্যই। বললেন ব্রহ্মা।

—তাহলে এই বর আমাকে দাও, এই পৃথিবীতে তুমি যাদের সৃষ্টি করেছ তেমন কোন প্রাণীর হাতে আমার যেন না মৃত্যু হয়।

—বেশ তাই হবে। বললেন ব্রহ্মা।

—আরো প্রার্থনা আছে ঠাকুর, বলল হিরণ্যকশিপু।

—বল।

—এ ব্রহ্মাণ্ডে তো এমন অনেক কিছুই আছে যা তোমার সৃষ্টি নয়। তাদের হাতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। কারো কোন অস্ত্র, সে মানুষেরই হোক, আর দেবতাদেরই হোক, যেন আমার গায়ে আঁচড় না কাটতে পারে। ঘরের ভেতরে বা বাইরে, দিনে বা রাতে কেউ যেন আমাকে মারতে না পারে।

—বেশ তাই হবে। অকপটে বললেন ব্রহ্মা।

—আর একটা প্রার্থনা ঠাকুর। বলল দৈত্যপতি।

—জগতে যত জীব আছে, দেবলোকে যত লোকপাল আছে, সকলের ওপর একা তোমারই আধিপত্য। এখন থেকে ঐ আধিপত্য থাকবে আমার। আর এতদিন তপস্যা করে যে শক্তি আমি অর্জন করেছি, তা যেন কখনো ক্ষয় না হয়।

ব্রহ্মা হাসিমুখে হিরণ্যকশিপুর এই প্রার্থনাতেও সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। আবার যাবার আগে নিজের কমণ্ডলুর জলে

হিরণ্যকশিপুকে স্নানও করিয়ে দিয়ে গেলেন। এই স্নানের ফলে কোথায় গেল সেই মাটির ঢিপি, লুটিয়ে পড়া জটাজুট, আর সেই হাড়-জিরজিরে চেহারা। সুন্দর দেহ, সবল বাহু, শক্তিশালী পেশী—যেন এক বলিষ্ঠ পুরুষ হয়ে উঠল হিরণ্যকশিপু। আর শরীর থেকে বেরোতে লাগল যেন জ্বলন্ত কাঠের আগুন।

ব্রহ্মা ফিরে যেতেই দেবতারা অভিযোগ তুললেন—এ আপনি কি করে এলেন? ঘুরিয়ে দৈত্য শুধু অমরত্ব বরই নিল না, দেবরাজ্যও নিয়ে নিল! আর আপনি হাসিমুখে তাকে সব ছেড়ে দিয়ে এলেন? এবার আমাদের কি অবস্থায় দিন কাটাতে হবে?

শুনে আবার মৃদু হাসলেন ব্রহ্মা। তারপর যা বললেন, তার মানে হল—নিমগাছে কি সিম হয়? যদিও বা হয়, তাকে আর খাওয়া যায় না। তাকে কেটে ফেলতেই হয়। সময়ে সবাই ঠিক হবে।

আর শুধু পাতাল নয়—পাতাল, মর্ত্য, স্বর্গ, এই তিন লোকেরই অধীশ্বর হলেন হিরণ্যকশিপু। যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র সবাই হল তার আজ্ঞাবহ। ইন্দ্র বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতি যত লোকপাল দেবতা ছিলেন, তার প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তাকে উপঢৌকন পাঠাতে লাগলেন। ইন্দ্রের অমরাবতী এখন হিরণ্যকশিপুর। সেখানকার যাবতীয় ঐশ্বর্য এখন তার। যত উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী, যা একমাত্র দেবতারাই খেতেন, এখন সেগুলি সব হল হিরণ্যকশিপুর খাদ্য। রাজ্য হারিয়ে, অধিকার হারিয়ে, ভোগ সুখ হারিয়ে তারা ক্রমশই নির্জীব হয়ে পড়তে লাগলেন। তার ওপর আবার হিরণ্যকশিপুর আদেশ পালন। একজন দৈত্য করবে দেবতাদের হুকুম, আর তা মুখ বুজে তাঁদের তামিল করতে হবে। নাই বা করল লাঞ্ছনা, এর চেয়ে আর অপমান কি থাকতে পারে? একমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছাড়া আর কাউকেই গ্রাহ্য করে না হিরণ্যকশিপু।

সবাই মিলে আবার গেলেন ব্রহ্মার কাছে—ভগবন্। নিষ্কৃতি কি আমরা আর কোনদিনই পাব না?

শুনে ব্রহ্মা একটু ভেবে নিয়ে বললেন—একমাত্র ভগবান বিষ্ণু ছাড়া আর এখানে কারো কিছু করার নেই। অগত্যা দেবতারা বসলেন বিষ্ণুর স্তবে।

এদিকে পাতালপুরীতে ঘটে গেল আর এক ঘটনা। হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ নিহত হলেন বিষ্ণুর হাতে। খবরটা কানে যেতেই হিরণ্যকশিপু যেন রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

ছোট ভাই হিরণ্যাক্ষ অপরাজেয় বীর। হিরণ্যকশিপু তাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসত। এখন বিষ্ণু তাকে হত্যা করেছেন শুনে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না দৈত্যপতি। আদেশ দিল, যেখানে যা কিছু আছে, সব লণ্ডভণ্ড, তছনছ করতে। পৃথিবীতে শুরু হয়ে গেল আর এক কাণ্ড। গ্রামে গঞ্জে, হাটে বাজারে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঢুকে দৈত্যরা শুরু করে দিল লুটপাট আর হত্যা। এমন কি ব্রাহ্মণদের যাগ-যজ্ঞও গেল নষ্ট হয়ে। কোনরকমে যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে সবাই বাঁচেন। বিষ্ণুর পুজো তো দূরের কথা, বিষ্ণুর নাম কেউ মুখে এনেছ তো, ব্যস।

ইতিমধ্যে হিরণ্যকশিপুর হয়েছে একটি ছেলে। ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটি। বেশ টানাটানা চোখ, ঢলঢলে মুখ, হাসি যেন লেগেই আছে মুখে। অত বড় যে কঠিন হৃদয় রুক্ষ মাতাল দৈত্যাধিপ হিরণ্যকশিপু, ছেলের মুখের দিকে তাকালে তারও মন আনন্দে ভরে যেত। তাই তার নাম রাখা হল প্রহ্লাদ।

দৈত্যকুলের ভাবী রাজা হবে প্রহ্লাদ--মনে মনে ঠিকই করে ফেলল সে। বড় ছেলে অনুহ্লাদ, মেজ ছেলে আহ্লাদ বা ছোট ছেলে সংহ্লাদ —কেউ-ই যেন ঠিক মনের মত নয়। তাই হিরণ্যকশিপু বেশি করে যত্ন নিতে শুরু করে প্রহ্লাদের ওপর।



একটু বড় হতেই প্রহ্লাদের পাঠ শুরু হল।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ছেলে যণ্ড আর অমর্ক। দুজনেই অসাধারণ পণ্ডিত। থাকতেন খুব কাছাকাছি। ছেলে প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু পাঠাল তাঁদের কাছে। কেননা, গুরু শুক্রাচার্য তখন সেখানে ছিলেন না।

যণ্ড আর অমর্কের হাতে ছেলেকে দিয়ে খুব সাবধান করে দিল তাঁদের হিরণ্যকশিপু—দেখো, কোনরকমে যেন ফাঁকি-টাকি দিও না। দৈত্যকুলের যা ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, কলাকৌশল, যুদ্ধবিদ্যা শুক্রাচার্য যেভাবে ঠিক করে দিয়েছেন, তা যেন সব ঠিক ঠিক শেখে। দেখো, যেন কোনরকমে কোন বেচাল না হয়।

হিরণ্যকশিপুর ছেলে, তার ওপর আবার এমন নির্দেশ। সুতরাং সেই রকম যত্ন নিতেই হয়। রাজবাড়ি থেকে গুরুবাড়ি। সামান্যই পথ। রোজ আসে প্রহ্লাদ, আর পাঠ নিয়ে চলে যায়। দেখতে দেখতে অনেক সঙ্গীসাথীও হয়ে গেল। তারা আবার খেলাধুলা, হৈ-হল্লা ভালবাসত খুব বেশি। প্রহ্লাদকে ডাকত তাদের সঙ্গী হতে। কিন্তু ওসব মোটে ভাল লাগত না প্রহ্লাদের। তাই এড়িয়েই যেত। দৈত্যদের ছেলেপুলেরা কিন্তু প্রহ্লাদকে এড়িয়ে কিছুতেই থাকতে পারত না।

পাঠাভ্যাসে কিছুকাল কেটেছে। হিরণ্যকশিপু জানে, তার ছেলে যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ইতিমধ্যে নিশ্চয় অনেক কিছুই শিখেছে। মদ খেয়ে হিরণ্যকশিপুর চোখ মুখ সব সময়ই লাল থাকত। এটা তার অভ্যাস। সেদিনও সেই রকম। ডেকে পাঠাল ছেলেকে। এল প্রহ্লাদ, সঙ্গে গুরুরাও। প্রণাম করতেই পিতা হিরণ্যকশিপু তাকে

কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—বাবা প্রহ্লাদ, এতদিন কি শিখলে একটু বল তো শুনি।

প্রহ্লাদ বলল—

'অনাদি-মধ্যান্তম্-অজম্-অবৃদ্ধি-ক্ষয়ম অচ্যুতম্।
প্রণতোহস্মি মহাত্মানং সর্বকারণ-কারণম্ ॥'

যার অর্থ হল—

আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই যাঁর।
জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই তাঁর।
সবাকার মূলে তিনি কারণ-উপায়,
আমার প্রণাম সেই অচ্যুতের পায়।

শুনে হিরণ্যকশিপুর লাল চোখ যেন আরো লাল হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যারা শুনল, তারাও রীতিমত চমকে উঠল।

কটমট করে দৈত্যাধিপ তাকাল গুরুদের দিকে। তারপর যেন বাজ ফেটে পড়ল—যে আমার ভাইকে মেরেছে, আমাদের চরম শত্রু, তার গুণগান শেখাবার জন্যে আমার ছেলেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি ?

প্রহ্লাদের মুখ থেকে অমন কথা শুনে তারাও তো রীতিমত অবাক। নিজেরাও এসব নিয়ে কোনদিনই আলোচনা করে নি যে, প্রহ্লাদ তা কখনো শুনে থাকতে পারে। তাই তারা মনোবল নিয়েই বলল— আমাদের ওপর রাগ দেখিও না রাজা। ও কথা আমরা শেখাই নি, শেখাতেও পারি নি। আমরা যা শিখিয়েছি তোমার ছেলে তা বলছে না।

খুব আদর করে এবার হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলল—বাবা, এসব কথা তোমায় কে শেখাল ? তোমার গুরুদেবরা বলছেন, আমরা শেখাই নি।

প্রহ্লাদ বলল—বাবা, ভগবান বিষ্ণু ছাড়া কে কার গুরু ? কে-ই বা কাকে কি শেখায় ?

আবার ঐ নামটা শুনেই রাগ চড়ে গেল হিরণ্যকশিপুর। বলল—ঐ যে ভগবান বিষ্ণু...বিষ্ণু করছিস—কে সে ?

তেমনি ধীর শান্ত প্রহ্লাদ বলল—তিনি যে কে আর কি, তা তো আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, বাবা। সে রকম কোন শব্দই নেই, যা দিয়ে তাঁকে বোঝানো যায়। শুধু বলা যায় 'যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বর।' যিনি স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টি, অনন্ত অপার, তিনিই বিষ্ণু। এছাড়া কি বলতে পারি আর ? তিনিই তো পরম ঈশ্বর।

দৈত্যাধিপ বলল—আমি তোর বাবা। আমিই তোর পরম ঈশ্বর। আমি ছাড়া তোর আবার কে পরম ঈশ্বর আছে যে এইসব কথা বলছিস ?

—বাবা, রাগ করবেন না, ধীরভাবে বলল প্রহ্লাদ —এই বিশ্ব সংসারে যা কিছু, তিনি সে সব কিছুর পিতা। এমন কি আপনারও।

দৈত্যাধিপ আক্ষেপ করে উঠল—নিশ্চয়ই কোন শয়তান এর মাথায় এই সব ঢুকিয়েছে। এখনো দুধের বালক। যাও, গুরুগৃহে কড়া নজরে রেখে সব ভালভাবে শেখাও। এছাড়া এখন আর কি বলব ?

ষণ্ড আর অমর্ক আবার নিয়ে গেল প্রহ্লাদকে।

বেশ কিছুকাল পর আবার একদিন দৈত্যপতি গুরুগৃহ থেকে ডেকে আনাল প্রহ্লাদকে। যতদূর সম্ভব নিজেও খবর রেখেছে, কোনরকম অবাধ্য আচরণ সে করে নি, পাঠও নিয়েছে মন দিয়ে। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তাদের বিদ্যে অনেকখানিই আয়ত্ত করেছে ছেলে।

প্রহ্লাদ আসতেই হিরণ্যকশিপু বলল—কি শিখলে বাবা, একটু গান করে শোনাও তো ?

সঙ্গে সঙ্গে কিশোর প্রহ্লাদ যেন ভাবে বিভোর হয়ে সুমধুর সুরে গেয়ে উঠল—

যিনি সৃষ্টি, যিনি স্রষ্টা বিশ্ব চরাচর,
প্রধান পুরুষ যিনি অজর অমর,
বিষ্ণু, তুমি কৃপা করি দাও গো অভয়,
সবাকার প্রতি তুমি হও গো সদয়।

বিষধর কোন সাপ যেন নিমেষে ছোবল বসিয়ে দিল হিরণ্যকশিপুকে। জ্বলে উঠল তার সর্বাঙ্গ। গর্জন করে উঠল—এ আমার ছেলে হলেও বংশের কুলাঙ্গার। আমি চাই না এ বেঁচে থাকুক। যাও, একে নিয়ে গিয়ে বধ কর।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার দৈত্যের মারাত্মক সব অস্ত্র এসে পড়তে শুরু করল প্রহ্লাদের ওপর। প্রহ্লাদ মন প্রাণ ঢেলে চোখ বুজে ডেকে চলল বিষ্ণুকে, আর আশ্চর্য হয়ে সকলে দেখল, অস্ত্র চালাতে চালাতে অত বড় বড় বীরদের ঘাম ছুটে গেল, কিন্তু প্রহ্লাদের কিছুই হল না। একটা কাতর শব্দও বের হল না তার মুখ থেকে।

হিরণ্যকশিপু এবার সকলকে থামিয়ে দিয়ে ছেলেকে বলল—কেন মিছিমিছি ঐ শত্রুটার নাম করে আমার মাথা গরম করে দিচ্ছিস ? আমি রাজা, আমি তোর বাবা। আমি তোকে অভয় দিচ্ছি, তুই সুখে শান্তিতে থাকবি। মন থেকে ওসব পাপ চিন্তা দূর করে দে।

উত্তরে প্রহ্লাদ বলল—

স্মরণে যাঁর দূর হয়ে যায়
জন্ম-জরা, মরণ ভয়,
আর কে আছেন তিনিই ছাড়া
পারেন দিতে অমন অভয় ?

এরপর কি আর ধৈর্য রাখা যায় ? না হিরণ্যকশিপুর পক্ষে রাখা সম্ভব ? সঙ্গে সঙ্গে ডাকল নাগদের। ছুটে এল তক্ষক, কুলক, অন্ধক নামে বিষধর সর্প। আদেশ দিল দৈত্যাধিপ—তোমাদের সব বিষ ঢেলে ওকে মার।

ছোবলের পর ছোবল বসিয়ে শেষে ওরা নিজেরাই নেতিয়ে পড়ল, আর প্রহ্লাদকে সেভাবেই অক্ষত বসে থাকতে দেখে, আরো জ্বলে উঠে হিরণ্যকশিপু। বিশালকায় সব মত্ত হাতিকে ছেড়ে দিল তাকে হত্যা করার জন্য।

উন্মত্ত হাতিরা এসে থামের মত পা দিয়ে প্রহ্লাদকে মাটিতে চেপে ধরে বেঁধাতে শুরু করল তাদের বড় বড় দাঁত। আগের মতই তন্ময় প্রহ্লাদ। দাঁত ভেঙ্গে হীনবল হয়ে মাথা নিচু করে ফিরে গেল হাতিরা।

এবার হিরণ্যকশিপু অসুরদের ডেকে বলল—আগুন জ্বালো। রীতিমত আগুন, যেন দাউ দাউ করে জ্বলে। সেই আগুনে ওকে পুড়িয়ে মার। আমার ছেলে হয়ে আমারই সর্বনাশ করতে এসেছে ও।

জ্বলে উঠল আগুন। ফেলেও দেওয়া হল প্রহ্লাদকে। সকলে দেখল সেই আগুনের ভেতর পদ্মাসনে বসে প্রহ্লাদ। তারই ভেতর থেকে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল—বাবা, আমাকে বসার জন্য কি সুন্দর জায়গাই না দিয়েছেন! যেন ঠাণ্ডা পদ্মবনে বসে আছি।

এরপর প্রহ্লাদকে নিয়ে আর কি করবে ভেবে পাচ্ছে না হিরণ্যকশিপু। তখন ষণ্ড আর অমর্ক বলল—রাজন! যাঁর রাগে এই জগৎ ধ্বংসে হয়ে যায় ঐ একরত্তি ছেলের ওপর অত রাগ করবেন না। ওকে বরং আমরা আবার নিয়ে যাই। পিতৃদেব না আসা পর্যন্ত আমরা বরং আবার চেষ্টা করে দেখি, ওকে নীতিশাস্ত্র শেখাতে পারি কিনা। ছেলেরা অমন একটু দুষ্টু হয়েই থাকে। ও আমরা শাসন করে ঠিক করে দেব।

আবার গুরুগৃহেই ফিরে গেল প্রহ্লাদ দৈত্যাধিপের আদেশে। বেশ খানিকটা শাসনও করল গুরুরা। বারবার রাজার কাছে গিয়ে শিষ্যের জন্য অপমানিত হতে হচ্ছে। রাগ তো একটু হবেই। কড়া শাসনের মধ্যে এবার নতুন করে আবার শুরু হল প্রহ্লাদের পাঠ। প্রহ্লাদও যেন নিতান্ত সুবোধ বালক।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু অসুর বালক জমায়েত হল প্রহ্লাদকে ঘিরে। আর প্রহ্লাদও সুযোগ বুঝে তাদের বারবার শোনাতে লাগল—দেখ, কারো ওপর রাগ, হিংসা করা ঠিক নয়। কারো কোনো অনিষ্ট চিন্তা করাও উচিত নয়। আমরা কি চিরকাল পৃথিবীতে এমনিভাবে থাকব? আজ শিশু আছি, কাল যুবক হব, পরশু বুড়ো হব। শরীরে রোগ ব্যাধি ধরবে, মরে যাব। বেশি ভোগ করাও ঠিক নয়। তাতে ক্ষতি হয় আরো বেশি। আর দুই দুই ভাব বড় মারাত্মক। আমরা সকলেই সেই এক ভগবানের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি, তা সে দেখতে যেমনই হোক না, প্রত্যেকের ভেতরই তিনি আছেন। আমাদের এই দেহটা একদিন থাকবে না, কিন্তু তিনি থাকবেন। তিনি যে অচ্যুত জনার্দন হৃষীকেশ। তাই যদি মঙ্গল চাও তাহলে সকলকে সমান চোখে দেখ। 'সমত্বম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য'—সকলকে সমভাবে দেখাই হল বিষ্ণুর আরাধনা।

ছেলেরাও এই সব শুনে বাড়ি ফিরে জল্পনা-কল্পনা করত। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। সকলেই ছুটল দৈত্যাধিপের কাছে। রাখল অভিযোগ—রাজা, তোমার ছেলে প্রহ্লাদ যে আমাদের ছেলেদেরও মাথা খেতে শুরু করল।

সে কি! তারপর সব শুনে বলল—ওর খাবারে বিষ খাইয়ে ওকে মার।

পাচকরা তাই করল। কিন্তু কিছুই হল না প্রহ্লাদের। পুরোহিতরা তখন দৈত্যাধিপের আদেশে যজ্ঞ করে রুদ্রমূর্তি এক মারণ তৈরি করল। বিকটাকার। হাতে ত্রিশূল। পুরোহিতদের আদেশে ছুটে এল কৃত্যা ত্রিশূল উচিয়ে প্রহ্লাদকে মারতে। কিন্তু না পেরে পুরোহিতদেরই প্রাণ সংহার করে অদৃশ্য হল সে। তাই দেখে কেঁদে উঠল প্রহ্লাদের প্রাণ। আহা! ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এভাবে প্রাণ দিলেন। হে জনার্দন। আমি তো কারো কখনও অনিষ্ট চিন্তা করি নি। সর্বত্রই তুমি। ওঁদের প্রাণ তুমি ফিরিয়ে দাও।

প্রহ্লাদের আকুল আহ্বান শুনলেন বিষ্ণু। পুরোহিতরা আবার বেঁচে উঠলেন। দৈত্যরা দেখা করল দৈত্যাধিপের সঙ্গে। শুধু জানাল, তাদের সব চেষ্টা বিফল হল।

সুউচ্চ প্রাসাদ হিরণ্যকশিপুর। তার চারদিক ঘিরে পাহাড়শ্রেণী। একদিন প্রাসাদ-চূড়ায় দাঁড়িয়ে সেখানে ডেকে পাঠাল প্রহ্লাদকে। জানতে চাইল তাকে মারার এত চেষ্টা বিফল হচ্ছে কেন?

উত্তরে প্রহ্লাদ বলল—বাবা। আমার কাছে সকলেই যে সেই এক বিষ্ণু।

সঙ্গে সঙ্গে রেগে অনুচরদের হাঁক দিল হিরণ্যকশিপু। হুকুম করল—এখান থেকে ওকে পাহাড়ের নীচে ফেলে দাও। হাড় চুরচুর হয়ে কুলাঙ্গারটা থেঁতলে মারা যাক।

অনুচরাও আদেশ পালন করল। তারপর নীচে গিয়ে দেখল যেন নরম মাটির ওপর আরামে শুয়ে আছে।

এর কিছুকাল পর ষণ্ড আর অমর্ক প্রহ্লাদকে নিয়ে এসে হাজির হল রাজসভায়। জানাল—রাজা, এবার তোমার ছেলে সুবোধ বালকের মত সব কিছুই শিখেছে। আমাদের রহস্য-বিদ্যে আর নতুন করে ওকে শেখাবার কিছু নেই।

কই শুনি—বলল হিরণ্যকশিপু।

প্রহ্লাদও যথারীতি দৈত্য-নীতিশাস্ত্র সব শুনিয়ে গেল রাজাকে। তারপর বলল—বাবা, এ আমার ভাল লাগল না। গাছপালা-পশু-পাখি-কীটপতঙ্গ যে যেভাবেই থাকুক না কেন, সকলকে যদি সমান চোখে দেখার শিক্ষাই না থাকল, তাহলে সে কেমন শিক্ষা? এই শিক্ষা তো দেখছি সকলকে পরপর ভাবা। নিজের ভোগ ঐশ্বর্য বাড়ানো আর ঝগড়া মারামারি করা।

প্রহ্লাদের কথা শেষ হতে না হতেই রাগে হিরণ্যকশিপু মারল তার বুকে সজোরে এক লাথি—কি এতদূর স্পর্ধা, গুরুদেবের শিক্ষার সমালোচনা করিস? কে আছিস? একে এখুনি নিয়ে গিয়ে নাগপাশে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দে।

তারপর পাহারাদারদের ডেকে বলল—তোমরা এমনভাবে জায়গাটা ঘিরে রাখ যেন কোন রকমে ও প্রাণ নিয়ে উঠে আসতে না পারে।

দৈত্যরাজের আদেশ। নাগপাশে বেঁধে নিষ্পাপ কিশোর প্রহ্লাদকে ফেলে দেওয়া হল সমুদ্রের জলে। সেখানে প্রহ্লাদ এক মনে করে চলল ভগবান বিষ্ণুর স্তব।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

—গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী প্রভু, দেব ব্রাহ্মণ্য তোমায় প্রণাম। কৃষ্ণ গোবিন্দ, জগত-পাবন! প্রণমি তোমায়, শত প্রণাম।

এভাবে সেই সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর যে কতক্ষণ স্তব করেছিল প্রহ্লাদ সেখানে সেভাবে তা নিজেই জানে না। এক সময় তার মনে হল, সে যেন নিজেই সেই বিষ্ণু, সেই জনার্দন হয়ে গেছে। আর যে মুহূর্তে তার সে রকম মনে হল, নাগের বাঁধন তার খুলে গেল দেহ থেকে। সরে গেল পর্বতশ্রেণী। ভাসতে ভাসতে প্রহ্লাদ উঠে এল সমুদ্রের তলা থেকে।

শ্রীহরির কৃপাকণায় মুগ্ধ প্রহ্লাদ আবার বসল বিষ্ণুর ধ্যানে। এবার বিষ্ণু আর থাকতে পারলেন না। এসে দেখা দিলেন প্রহ্লাদকে। বললেন—প্রহ্লাদ, বর চাও। প্রহ্লাদ বলল—তোমার ওপর আমার যেন সব সময় ভক্তি থাকে। বিষ্ণু বললেন—থাকবে প্রহ্লাদ। তুমি যে আমার বড় ভক্ত, আরও কিছু চাও। প্রহ্লাদ বললেন—যদি আরো কিছু দিতে চাও প্রভু, তাহলে

একটা অনুরোধ, তোমার নাম করার ফলে, বাবা আমার ওপর অত্যাচার করে যে পাপ করেছেন তা থেকে তুমি তাঁকে মুক্তি দাও। ভগবান বললেন—বেশ, তাই হবে। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। প্রহ্লাদও প্রাসাদে ফিরে পিতার চরণ বন্দনা করল।

কোন কিছুতেই প্রহ্লাদকে বধ করতে না পেরে এবার একটু চিন্তাতেই পড়েছিল দৈত্যাধিপ। আরও চিন্তা, দৈত্য বালকরাও ইতিমধ্যে অনেকেই যণ্ড আর অমর্কের কাছে পাঠ নিতে না গিয়ে প্রহ্লাদকেই গুরু করে বসল। রাজা হয়ে এর যদি কোন নিষ্পত্তি করতে না পারে, তাহলে যে দুর্নাম।

ওদিকে ব্রহ্মার নির্দেশে হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে দেবতারা যে বিষ্ণুর স্তব করছিলেন, তাঁরাও ভগবানের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

ছেলে ফিরে এসেছে দেখে হিরণ্যকশিপু আবার ভালো কথায় তাকে বোঝাতে গেল। কিন্তু যে একবার ভগবান বিষ্ণুকে জেনেছে, তাকে আর নতুন করে কে কি জানাবে?

রেগেমেগে সিংহাসন থেকে উঠে হাতে তরবারি নিয়ে খুব খানিকটা আস্ফালন দেখিয়ে বলল হিরণ্যকশিপু—তুই যে বলছিস, সব জায়গাতেই তোর বিষ্ণু আছে, দেখা তো এই থামটার ভেতর আছে কিনা? এই বলে সজোরে থামে মারল এক লাথি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ কাঁপিয়ে উঠল এক ভীষণ গর্জন। হিরণ্যকশিপু দেখল সেই নীরেট পাথরের থাম ভেদ করে বেরিয়ে এল অদ্ভুত এক প্রাণী। না মানুষ, না সিংহ। দুয়ে মিলে যেন কিম্ভূতকিমাকার। গলানো সোনার মত চোখ, সারা মুখ চুলে ঢাকা, তরবারির মত তীক্ষ্ণ দাঁত, গাল দুটো যেন ছোট ছোট পাহাড়, বিশাল দেহ, বিশাল বুক, তার তুলনায় গলা পেট কত ছোট। এ আবার কি প্রাণী? অনেক ভেবে ঠিক করল, এটা নৃসিংহ। এছাড়া এমন অদ্ভুত প্রাণীকে আর কি নামই বা দেওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যকশিপুও বুঝল তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। ব্রহ্মার বরে যাদের কাছে সে অজেয়, এ প্রাণী তো তা নয়। তবুও মরতে যখন হবেই বিনা যুদ্ধে নিশ্চয়ই নয়।

শুরু হল দুজনের ঘোরতরযুদ্ধ। নৃসিংহরূপী ভগবান বিষ্ণু শুধু

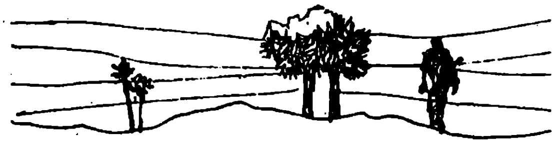


একটু খেলছিলেন মাত্র। হিরণ্যকশিপুর অনেক লম্ফঝম্ফ যখন শেষ হল তখন সিংহ যেমন নিতান্ত হেলায় তার শিকার নিয়ে যায় তেমন ভাবে ব্রহ্মার দেওয়া বরের কথা মনে রেখে দৈত্যাধিপকে নিয়ে এলেন দ্বারদেশে, তারপর নিজের উরুর ওপর তাকে শুইয়ে গরুড় যেমন সাপকে ছিঁড়ে ফেলে তেমনিভাবে নিজের সেই নখ দিয়ে তার বুক চিরে ফেলে দিয়ে বাকি হাজার হাজার অনুচরকেও সংহার করলেন।

কারোরই আর বুঝতে বাকি রইল না ভক্তদের রক্ষা করার জন্য আর অন্যায়কারীদের দমন করার জন্য ভগবান নিয়েছিলেন নৃসিংহরূপ।

আর তার ভেতরেও একটা গোপন কথা রয়ে গেল—বৈকুণ্ঠনাথ তাঁর প্রিয় অনুচরকে এভাবেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের কাছে।

[বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের কাহিনী যেভাবে দেওয়া আছে তার পিতা হিরণ্যকশিপুর কাহিনী সে ভাবে নেই। প্রহ্লাদ-কাহিনীর সঙ্গে হিরণ্যকশিপু এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তা না জানলে প্রহ্লাদ-কাহিনী পুরোপুরি জানা যায় না। তাই এখানে ভাগবত পুরাণের সাহায্যও নিতে হয়েছে।]



ঋভু ও নিদাঘের কাহিনী

নগরের নাম বীরনগর। সুসমৃদ্ধ নগর।

তারই প্রান্ত ছুঁয়ে কুল কুল করে বয়ে চলেছে দেবিকা নদী। নদীর ধারে ধারে এক এক উপবন, ফুলে-ফুলে সাজানো। এমন শান্ত যে একটু বসলেই মন যে কোথায় উধাও হয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারবে না।

বহু-বহু কাল আগে ঋষি পুলস্ত্য ঘুরতে ঘুরতে এক সময় এই নদীর তীরে এলেন। জায়গাটা তাঁর খুব মনে ধরে গেল। তিনি এখানেই গড়ে তুললেন এক জনবসতি। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল এই বীরনগর। এখানেই এক উপবনে বাস করতেন নিদাঘ মুনি।

জগৎ-বিধাতা ব্রহ্মার অন্যতম পুত্র ঋভুর কাছে নিদাঘ ধৈর্য নিয়ে পাঠাভ্যাস করে জ্ঞানে-গুণে-শীলে যথেষ্ট সমুন্নত হলেন। গুরুদেবের অনুমতি নিয়েই এখানে এসে বসবাস করছিলেন বিয়ে-থা করে। আর গুরুর কাছ থেকে যেটুকু বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন, তারই অনুশীলন করতেন দিন-রাত। ভোরে উঠে স্নান, সূর্য প্রণাম, বনে-বনে ঘুরে সমিধ যোগাড় করে আনা, হোম-যাগ করা, অতিথি-সেবা করে তারপর নিজে আহার করা—সব কিছু নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতেন নিদাঘ। গুরুদেবের তিনি ছিলেন খুবই প্রিয়।

বহুদিন গুরু-শিষ্যে আর সাক্ষাৎ নেই। কত বছর যে কেটে গেছে তারও কোন হিসেব নেই। ঋভু কিন্তু তাঁর শিষ্য নিদাঘকে ভুলতে পারেন নি। নিদাঘও যে ভুলে গেছেন, তা নয়। তবে চট করে গুরুদেবকে দেখলে এখন চিনতে পারবেন কিনা, মনে মনে একটা সন্দেহ তাঁর প্রায়ই উঁকি দিত। না জানি কত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন গুরুদেব, হয়ত বা অথর্বই হয়ে পড়েছেন।

নিদাঘ সুপণ্ডিত এবং বিনয়ী হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তাঁর লাভ হয়েছে কিনা, মনে মনে তা নিয়ে একটু সন্দেহ ছিল ঋভুর। গুরুর দায়িত্ব শিষ্যকে প্রকৃত জ্ঞানী করে তোলা। যথার্থ গুরু হয়ে সে দায়িত্ব কি এড়াতে পারেন ঋভু?

একদিন সকালের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে দ্বারপ্রান্তে বসে আছেন নিদাঘ। প্রায় মাথার ওপর সূর্য। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন আশ্রমের ভেতরে নিদাঘ পত্নী। সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কখন আসবেন অতিথি। অতিথি-নারায়ণের সেবা না করে তো আর অন্ন গ্রহণ করা যায় না।

দেখতে দেখতে মাথার ওপর থেকে সূর্য ক্রমশ সরতে লাগল পশ্চিম দিকে। অপরাহ্ন। ক্ষুধাতুর হয়ে উঠেছেন দুজনেই। কিন্তু যতক্ষণ অতিথি-সৎকার না হচ্ছে, ততক্ষণ তো কোনমতেই অন্ন গ্রহণ করা যাবে না।

মনে মনে ভাবেন নিদাঘ—আশ্চর্য! এমন তো হয় না! আজ ব্যতিক্রম কেন? এখনও পর্যন্ত কোন অতিথি তো এলেন না?

ঠিক সেই সময়েই বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণকে ঐ পথে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন নিদাঘ। কাছাকাছি আসতেই সবিনয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—দয়া করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। এখনও আমরা অতিথিসেবা করতে না পেরে নিজেরাও অভুক্ত আছি।

অভ্যর্থনা ঠেলে চলে যেতে পারলেন না ব্রাহ্মণ। দাঁড়ালেন। বললেন—তাই নাকি? এখনও তোমরা অভুক্ত রয়েছ? তাহলে তো আতিথ্য গ্রহণ করতেই হয়। এই বলে আশ্রমে ঢুকলেন ব্রাহ্মণ।

জল দিয়ে ভাল করে পা ধুইয়ে সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে সযত্নে বসিয়ে নিদাঘ যেই তাঁর সেবার আয়োজন করতে যাবেন, সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন শোন, শোন। অতিথিসেবা তো করাবে, তা ঘরে তোমার কি কি আছে শুনি? কি রান্না-বান্না করেছ? আমার বাপু এই খাওয়ার ব্যাপারে একটু পিট-পিটিনি আছে। যা-তা আমি খেতে পারি না।

—ভাত আছে, যবের খাদ্যও আছে, আবার ফল-মূল-পিঠেও আছে। এর মধ্যে আপনার যা খেতে ভাল লাগে বলুন, আমি তারই যোগাড় করে দিচ্ছি। সবিনয়ে জানালেন নিদাঘ।

দূর দূর। ওগুলো আবার খাবার নাকি? যত সব কদন্ন। আমি কদন্ন গ্রহণ করি না। এই বলে ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়ালেন।

নিদাঘ সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে উঠলেন—না না, আপনি চলে যাবেন না। আজ আমার অতিথি আপনি। বলুন, কি দিয়ে আপনার সেবার করতে পারি।

—দেখ বাপু, ক্ষীর ক্ষীর পায়েস, ঘন চাপ দই, ফুরফুরে ফেনী (বড় বাতাসা)—এই সব যদি করে দিতে পার, তাহলে তোমার আতিথ্য আমি নিতে পারি, নচেৎ বাপু আমাকে চলে যেতে হয়। আজেবাজে খেয়ে মুখ নষ্ট করতে আমি রাজি নই।

—বেশ। আপনি যা যা বলেছেন, তাই দিয়েই অতিথি সৎকার করব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এই বলে স্ত্রীকে ডেকে অতিথির মনোমত খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে দিতে বললেন নিদাঘ। আর নিদাঘ-পত্নীও কোন রকম বিরক্তি বোধ না করে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে পড়লেন খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করতে।

তৈরি হয়ে গেল খাবার অল্প সময়ের মধ্যেই। নিদাঘ সাদরে অতিথিকে ডেকে আসনে বসিয়ে সেবা করালেন। প্রতিটি খাবার থেকেই একটু একটু করে খেয়ে উঠে পড়লেন অতিথি। নিদাঘ দেখলেন, এত কিছু তৈরি করালেন, কিন্তু খেলেন কতটুকু।

আহার শেষে সমাদরে অতিথিকে বিশ্রাম করার জায়গায় বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন নিদাঘ—আপনার ক্ষুধা মিটেছে তো? অন্নগ্রহণ করে তৃপ্তি পেয়েছেন? আপনার পরিচয় কি? কোথায় থাকেন? এ পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন?

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন। মৃদু হাসলেন অতিথি। তারপর শুরু করলেন একটার পর একটা প্রশ্নের জবাব দিতে।

—শোন ব্রাহ্মণ, তুমি প্রথমে জিজ্ঞেস করেছ, আমার খিদে মিটেছে কিনা। তার উত্তরে বলি, যার কোন খিদেই নেই, তার আবার খিদে মেটামেটি বলে কিছু আছে?

এ আবার কি রকম কথা! রীতিমত ধাঁধায় ফেললেন যে অতিথি!

—কি গো ব্রাহ্মণ, শুনে অবাক হচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। তুমি তো যথেষ্ট জ্ঞানী গুণী। তুমিই বল না, যে মনে করে আমার দেহ আছে, শরীর আছে, খিদে তো তারই পায়—তাই না? শরীরটার দিকে মন না রাখলে কি খিদে পায়? আমার কোন খিদেই নেই।

অতিথির কথা শুনে চমকে ওঠেন নিদাঘ। চুপ করে শুনতে থাকেন তাঁর বাকি প্রশ্নের জবাবগুলো।

এর পর জিজ্ঞেস করলে, তৃপ্তি পেয়েছি কিনা। তোমার দেওয়া অন্ন না নিয়ে আমার মনোমত অন্ন চেয়েছিলম বলেই নিশ্চয়ই তোমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। দেখ ব্রাহ্মণ, ভাল খাবার, খারাপ খাবার বলে কি সত্যিই কিছু আছে? খিদে যখন তোমার বোধ হবে, তুমি কি ভাল-মন্দের বিচার করতে পারবে? যদি বল, আমি কেন বিচার করে ভাল ভাল খাবার চাইলাম, সেটা তোমাকে বাজিয়ে দেখার জন্যে। তাই আমার যখন খিদেই নেই, তখন অন্ন আমায় তৃপ্তি দিল কিনা সে প্রশ্নই আসে না।

অতিথির কথা শুনতে শুনতে ইতিমধ্যেই নিদাঘের মন তোলপাড় হতে শুরু করেছে।



—ব্রাহ্মণ, এরপর তুমি জিজ্ঞেস করেছ, কে আমি, কোথায় যাচ্ছি। মাথার ওপর ঐ যে আকাশ, ওকে যদি এই প্রশ্ন কর, তাহলে কোন জবাব পাবে কি? তুমি আমাকে দেখছ একরকম। আমি তোমাকে দেখছি আর একরকম। আমরা আবার অপর একজনকে দেখছি অন্যরকম। এটা দেখেছ কি, আমাদের চোখ কখনো সকলকে এক দেখে না, সব সময় দুই-দুই দেখে। যার ফলে যত বিভ্রান্তি আর অশান্তি। ভাল করে একবার ভেতরটা দেখ তো। দেখবে, আমরা সবাই সেই এক—ভগবান বাসুদেব।

আর স্থির থাকতে পারলেন না নিদাঘ। লুটিয়ে পড়লেন অতিথির পায়ে। ইনি তো সামান্য ব্রাহ্মণ নন। কে ইনি, এমন ভাবে খেলেন নিদাঘের চোখ ফুটিয়ে দিতে?

সস্নেহে নিদাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে তুলে ধরলেন তাঁকে অতিথি। বললেন—আমি তোমার গুরু ঋভু। তোমার জন্যে মন আমার বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, শিষ্য। তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। বাসুদেব তোমার মঙ্গল করুন।

এই বলে চলে গেলেন ঋভু।

এরপর কেটে গেছে এক হাজার বছর। ইতিমধ্যে আরও সমুন্নত হয়ে উঠেছে বীরনগর। নগরের জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে রাজা-রাজড়াদের আধিপত্য।

কিন্তু একই রকম আছে সেই দেবিকা নদী। নদীর দুই তীরে সেই সব মনোরম উপবন। একই আছে নিদাঘের আশ্রম।

হঠাৎ একদিন মহাজ্ঞানী ঋভুর মনে পড়ে গেল তাঁর প্রিয় শিষ্য নিদাঘকে। থাকতে না পেরে, সামান্য একজন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে ঋভু এসে হাজির হলেন বীরনগরে। দেখলেন সারা নগর জুড়ে কিসের যেন এক উৎসব চলছে। হাতি, ঘোড়া, আর ঝলমলে সব পোশাক-পরা হাজার হাজার মানুষ যেন গিজ গিজ করছে।

নিদাঘ কোথায়?

এদিক ওদিক চোখ বোলাতে চোখে পড়ল ঋভুর, নগরের বাইরে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিদাঘ। কাঁধে এক বোঝা সমিধ, পেট ঢুকে গেছে ভেতরে, মুখ শুকনো।

সেখানে এসে ব্রাহ্মণবেশী ঋভু বললেন নিদাঘকে —আপনি এখানে শুকনো মুখে এভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

নিদাঘ বললেন—দেখছেন না, রাজা ঢুকছেন নগরে। সঙ্গে অত সব সাঙ্গপাঙ্গ। ভিড় আমার ভাল লাগে না, তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি

—রাজা? জিজ্ঞেস করেন ছদ্মবেশী।—তিনি আবার কে?

কাঁধ থেকে সমিধের বোঝা নামিয়ে নিদাঘ বললেন —ঐ যে বিশালকায় হাতির পিঠে যিনি বসে, উনি হলেন রাজা।

ঋভু যেন নীরেট গবেট, বোকা, এমন ভাব দেখিয়ে নিদাঘকে জিজ্ঞেস করলেন—হাতি, আবার হাতির পিঠে! ঠিক বুঝতে পারলাম না, রাজা কে?

—কি আশ্চর্য! এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারলেন না? বললেন নিদাঘ—নিচে ঐ যে শুঁড়ওলা কদাকার বিরাটকায় একটা জানোয়ার দেখছেন ঐটি হল হাতি। আর তার ওপরে ঝলমলে পোশাক, মাথায় পাগড়ি—উনি হলেন রাজা।

ছদ্মবেশী ঋভু তখনো যেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন—নিচ, ওপর কি সব বললেন, আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। রাজাকে তো চিনতে পারলাম না।

এবার মনে মনে খুবই বিরক্ত হলেন নিদাঘ। হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলেন। এক লাফে উঠে পড়লেন ছদ্মবেশী ঋভুর কাঁধের ওপর। কোনরকমে টাল সামলে নিলেন ঋভু। ভালভাবে তাঁর কাঁধে বসে দুদিকে দুটো পা ছড়িয়ে পা দিয়ে বসলেন—এবার কি বুঝতে পারছেন, নিচ আর ওপর কাকে বলে? আমি কোথায় বসে—আপনার ওপরে, আর আপনি কোথায় রয়েছেন—আমার নিচে।

—আচ···ছা! ছদ্মবেশী বললেন—তার মানে নিচে আমি যেন হাতি, আর আমার ওপরে আপনি যেন রাজা। বুঝেছি। তা ব্রাহ্মণ, তবুও আমার যেন ঠিক ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন, নিচে হাতি—আমিই বা কে? আর ওপরে রাজা—আপনিই বা কে?

এতক্ষণ যাঁকে গবেট বলে মনে হচ্ছিল নিদাঘের, তাঁর মুখ থেকে এই প্রশ্ন শোনার পরই দারুণভাবে চমকে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে নেমে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের ওপর। নিদাঘের মনে তখন আর কোনরকম সংশয় নেই যে এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাঁর গুরুদেব ঋভু ছাড়া আর কেউ নন। সকলকে সেই এক দেখার মত চোখ তাঁর গুরুদেবের ছাড়া তো আর কারো নেই।

—আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুদেব ঋভু। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

এবার নিজস্ব মূর্তি ধরে দাঁড়ালেন ঋভু শিষ্যের সামনে। সস্নেহে বললেন—তোমার আতিথেয়তা আমি ভুলতে পারি নি নিদাঘ। তাই তোমাকেও আমি ভুলতে পারি নি। সেই জন্যেই তো আবার এলাম এতদিন পরে তোমার কাছে, তোমাকে মনে করিয়ে দিতে—কে আমি? কে তুমি? কে রাজা? কে প্রজা? সবাই আমরা সেই এক—ভগবান বাসুদেব।

চলে গেলেন ঋভু। নিদাঘ হলেন আত্মভোলা।



ইন্দ্রের দম্ভ, তার প্রতিফল

ঋষির নাম দুর্বাসা। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি স্বাস্থ্য। গায়ে ছাই ভস্ম, পরনে কৌপিন। এক হাতে ত্রিশূল, আর এক হাতে কমণ্ডলু। চোখ দুটো তাঁর সব সময়ই জবার মত লাল আর লাট্টুর মত ঘোরে। দারুণ রাগী। ঐ রকম রাগ সে সময় আর কোন ঋষির মধ্যেই ছিল না। যে যত বড়ই হোক না কেন, কাউকে পরোয়া করতেন না দুর্বাসা। পান থেকে চুন খসলেই তার সর্বনাশ। তাই

সবাই তাঁকে চলতেন সমীহ করে, সবাই থাকতেন ভয়ে ভয়ে। কখন যে কার আতিথ্য গ্রহণ করবেন, আর কাকে অভিশাপ দিয়ে বসবেন। দুর্বাসাকে তাই সে সময় প্রায় সবাই বলতেন ক্রোধী মুনি!

কোথাও এক জায়গায় কয়েক দিনের জন্যেও স্থির থাকতে পারতেন না তিনি। ঘুরে বেড়াতেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত—যেন চরকি।

একদিন এমনি ভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন দুর্বাসা। বেড়াতে বেড়াতে এক বনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাকে এল এক মিষ্টি ফুলের গন্ধ। চারদিক যেন সেই গন্ধে মাতালের মত আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ভুর ভুর করে এত সুবাস কোথা থেকে আসছে দেখতে হয় তো। যেই না মনের ভিতর দুর্বাসার জাগল এই ইচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লেন তিনি সেই বনের ভেতর। ঢুকেই দেখেন, এক বিদ্যাধরী। হাতে তার অপরূপ এক ফুলের মালা। সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে সেই মালা থেকেই।

দেখেই দুর্বাসার মনে ধরে গেল মালাটি। বিদ্যাধরীকে বললেন—ও মেয়ে, এ মালা নিয়ে তুমি কি করবে? ওটা আমায় দাও।

বিদ্যাধরী চিনত দুর্বাসাকে। পড়ল সমস্যায়। আহা, এমন লক্ষ্মীমন্ত মালা যদিও বা সংগ্রহ করল সে, চেয়ে বসলেন দুর্বাসা। কি করবেন উনি মালাটাকে নিয়ে? ওঁর গলায় এ মালা মানাবেও না, আর যত্ন করে রাখারও কোন ঠাঁই নেই। আবার না দিলেও সর্বনাশ। অগত্যা কি আর করে বিদ্যাধরী। ঋষিকে প্রণাম জানিয়ে দিয়ে দিল মালাটি। দুর্বাসাও সেটিকে নিজের জটায় জড়িয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন সেখান থেকে।

যেতে যেতে দেখলেন দেবরাজ ইন্দ্র আসছেন ঐরাবতের পিঠে। সঙ্গে আর সব দেবতারা।

যখন খুব কাছে এসে গেছেন সবাই, দুর্বাসা নিজের জটা থেকে সেই মালাটা খুলে ছুঁড়ে দিলেন দেবরাজকে। দেবরাজ আবার সেটি নিয়ে দুর্বাসার সামনেই পরিয়ে দিলেন ঐরাবতের শুঁড়ে। ঐরাবত নাক দিয়ে একবার তার গন্ধ শুঁকে মাটির দিকে শুঁড় নামিয়ে ফঁ...স্-..স্ করে যেই নিঃশ্বাস ছাড়ল, বেরিয়ে এল তার সঙ্গে তার নাকের ভেতর জমে থাকা একগাদা সর্দি জল।

প্রথম থেকেই দুর্বাসার রাগ চড়তে আরম্ভ করেছিল, ঐরাবতের ঐ কাণ্ড দেখেই একেবারে ফেটে পড়লেন দুর্বাসা।

—কি, এত দূর স্পর্ধা তোমার? আমার দেওয়া ফুলের মালা মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ হিসেবে না নিয়ে তুমি কিনা ছুঁড়ে দিলে তাচ্ছিল্য করে ঐরাবতের শুঁড়ে! আমাকে কি কোন সাধারণ বামুন পেয়েছ? আর দেবতাদের রাজা হয়ে এতই তোমার অহঙ্কার যে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছ? ক্রোধে ঋষির লাল চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল—যদি তুমি আমায় চিনে না থাক, তাহলে আজই চিনবে। আমি দুর্বাসা, কাউকে তোষামোদ করে আমি চলি না। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি তুমি লক্ষ্মীহীন হবে, শ্রীহীন হবে, তোমার সর্বনাশ হবে।

শুনেই তো দেবরাজের মাথা গেল ঘুরে। তাঁর যে এত জলুস সবই তো লক্ষ্মীর দৌলতে। অমরাবতীতে লক্ষ্মী তাঁর অচলা। তাঁরই কৃপায় তাঁর এত সুখ, এত ঐশ্বর্য। তাঁরই কৃপায় তিনি



সকলের কাছ থেকে পাচ্ছেন এত সম্মান। এখন এই ঋষির কোপে পড়ে তাঁকে যদি হারাতে হয়, তাহলে তার মত বিপদ আর নেই! দুর্বাসাকে যে দেবরাজ চিনতেন না তা নয়। কিন্তু হঠাৎ এ কি কাণ্ড ঘটে গেল?

সঙ্গে সঙ্গে ঐরাবতের পিঠ থেকে নেমে ঋষির পায়ে উপুড় হয়ে পড়লেন দেবরাজ।

—ঋষিবর! আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা? ক্রোধে যেন আরো ফেটে পড়লেন দুর্বাসা—ক্ষমা কি জিনিস আমি জানি না। ওসব জানে বশিষ্ঠ, গৌতম, যারা সব সময়ই তোমার স্তব-স্তুতি করছে। আমার কাছে ক্ষমা-টমা নেই। যাও।

নাছোড় ইন্দ্র। বিলক্ষণ জানেন তিনি, ঋষিদের অভিশাপ বিফলে যাবার নয়। ফলভোগ করতেই হবে। তবু যদি ঠাণ্ডা করে কিছুটা কমানো যায়।

—ভুল হয়ে গেছে ঋষিবর। এবারের মত মার্জনা করুন। কাতর অনুনয় ইন্দ্রের।

—ভুল? আবার মিথ্যে কথা বলে অপরাধ ঢাকার চেষ্টা? আমি বুঝি না, তোমার ভেতরটা অহঙ্কারে গিজগিজ করছে। দম্ভ, অহঙ্কার যার এত বেশি, যে মানীর সম্মান রাখে না, তার কাছে থাকবে লক্ষ্মী? যাও যাও লক্ষ্মীছাড়া। আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও।

ক্রোধী মুনির ক্রোধ শান্ত হবার নয়। শেষে, আরও কোন বিপর্যয় না ঘটে বসে, ইন্দ্র সদলবলে ফিরে গেলেন সেখান থেকেই। কোথাও আর তাঁর যাওয়া হল না। মাথা হেঁট করে মলিন মুখে অমরাবতীতে ফিরেই দেখেন চলে গেছেন লক্ষ্মী। খাঁ খাঁ করছে তাঁর

অমন সুন্দর প্রাসাদ—যেন প্রেতের বাড়ি।

স্বর্গলোক থেকে লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হয়েছেন। শ্রীহীন হয়ে পড়েছেন স্বর্গের যত দেবতা। মর্ত্যেও তার প্রভাব প্রকট হয়ে উঠল। পৃথিবীতে মানুষজন যা ইচ্ছা তাই করতে শুরু করে দিল। যাগ গেল, যজ্ঞ গেল, তপস্যা গেল, দান ধ্যান গেল, অনাচারে ছেয়ে গেল পৃথিবী। ধৈর্য হারিয়ে মানুষজন যেন হিংস্র পশু হয়ে উঠতে লাগল। সুন্দর সুযোগ যেন আপনা থেকেই হাতের কাছে এসে গেল অসুরদের। লক্ষ্মী নেই, দেবতাদের আর সে ভোগও নেই। ভোগ নেই তো আর সে শক্তিও নেই। চিরশত্রু দেবকুলকে আক্রমণ করার এই সুযোগ কি আর অসুররা ছাড়ে? তাদের আক্রমণ এমন হতে লাগল যে দেবতাদের স্বর্গরাজ্যে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়াল।

দেবরাজ তখন সব দেবতাকে নিয়ে অগ্নিদেবকে সামনে রেখে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। কেননা ব্রহ্মাই তো তাদের এক একজনকে এক এক দায়িত্ব দিয়ে কাজে নিয়োগ করেছেন, সুতরাং আগে ব্রহ্মাকেই সব কিছু জানানো দরকার। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন—দেখ দেবগণ! এখানে আমারও হাত-পা বাঁধা, কিছু করার নেই। যদি কেউ কিছু করতে পারেন, তাহলে তা পারবেন একমাত্র স্বয়ং বিষ্ণু। বরং চল, অমরা তাঁর শরণাপন্ন হই।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে তখন বিষ্ণু। প্রথমে ব্রহ্মা, তারপর দেবতারা, সবশেষে দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে অনেক স্তব স্তুতি করলেন। তাঁর কাছে সকলেরই সেই একই আবেদন—দারুণ দুর্দিনে পড়েছি আমরা। আমরা সবাই লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছি। স্বয়ং লক্ষ্মী তো তোমারই পত্নী। তুমি যদি কৃপা না কর, আমরা যে লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদ পাই না। তোমার সৃষ্টি যে লোপ পেয়ে যায়।

শুনে বিষ্ণু বললেন—দেখ, সবই বুঝলাম। কিন্তু আমি যা বলব, তা যদি তোমরা করতে পার, তাহলে আবার তোমরা লক্ষ্মীকে ফিরে পেতে পার।

—আদেশ করুন প্রভু।

—এখন অসুরদের সঙ্গে কোনরকম বিরোধিতা না করে ভাব-ভালবাসা করে নাও। কেননা এখন লক্ষ্মীর কৃপা না পেয়ে অমৃত পান করতে না পেরে তোমরা হীনবল। এই যে ক্ষীরসমুদ্র দেখছ, এরই নিচে এখন চলে গেছে সব। তোমরা অসুরদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যত লতা পাতা গুল্ম ওষধি আছে এনে আগে এই সমুদ্রে ফেল। তারপর এর জলকে দই-ঘাঁটা কর। মন্থনের কাঠি হবে মন্দর পর্বত, নাগরাজ বাসুকি হবে দড়ি। তোমরা নেবে নাগের পেছন দিক, অসুরদের দেবে সামনের দিক। বেশ করে মন্দরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সমুদ্রের জলকে ঘোল করে ফেললেই দেখবে তোমরা আবার সব কিছু ফিরে পাবে। এই দুরূহ কাজ করতে যেটুকু শক্তির দরকার, তা অবশ্য আমি তোমাদের দেব।—বলে বিষ্ণু দিলেন শক্তি।

দেবতারাও বিষ্ণুর নির্দেশমত সেই ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করে আবার ফিরে পেয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবীকে।

সৌভাগ্য ফিরে পেল স্বর্গরাজ্য। হীনবল হয়ে লুটিয়ে পড়ল অসুরেরা। পৃথিবীও আবার শস্যশ্যামল হল, হল শান্তির আবাস।

একটু দম্ভ, একটু অহঙ্কার-এর পরিণতি যে কি দারুণ হতে পারে, লোকপাল দেবতারা বুঝি তা এবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন।



অসুর বিজয় কৌশল

দেব-দানবের যুদ্ধের আর শেষ নেই।

জন্মলগ্ন থেকে সেই যে শুরু হয়েছিল, যুগ যুগ ধরে তা শুধু চলেই গেছে। কখনো একটু বিরতি, কখনো বা দারুণ।

সবচেয়ে মজা হল—যতবারই যুদ্ধ হয়েছে, দেবতারা গেছেন হেরে, আর জিতেছে দানবেরা। স্বর্গ রাজ্যের সুখভোগ আর স্বাধীনতা হারিয়ে দানবদের অধীন হয়ে থাকতে হয়েছে তাঁদের বেশ কিছুকাল। পরে আবার কোন-না-কোন কৌশলে ফিরে পেয়েছেন তাঁদের অধিকার। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁদের ছুটতে হয়েছে হয় ব্রহ্মা, নয় বিষ্ণু, নয়তো বা মহেশ্বরের কাছে। স্তব-স্তুতিতে তাঁদের সন্তুষ্ট করে নিতে হয়েছে তাঁদেরই সাহায্য।

কিন্তু, কেন এরকম হতো? সব দিক থেকেই তো শ্রেষ্ঠ ছিলেন দেবতারা। আকাশ, বায়ু, জল, আগুন যা নিয়ে এই পৃথিবী, তাঁরাই তো এক একটার অধিপতি। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই তো তাঁদের নিযুক্ত করেছেন, যোগ্যতা অনুসারে এক-একটা দায়িত্ব দিয়ে। অসীম ক্ষমতা না থাকলে কি অধিপতি হওয়া যায়? তবুও যুদ্ধ বাধলে তাঁরা হেরে যেতেন অসুরদের কাছে

দিতির ছেলে বলে তারা পরিচিত হয়েছিল দৈত্য নামে, ঠিকই। কিন্তু দেবতাদের যিনি পিতা, সেই কশ্যপ মুনি তো তাদেরও পিতা। স্বয়ং ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপ। সুতরাং তিনি তো আর কোন সাধারণ বাবার মত নন। রীতিমত অসাধারণ। বাপের গুণ ছেলে পায়। দেবতারা যদি বেশির ভাগ পেয়ে থাকেন, তারাও নিশ্চয়ই খুব একটা কম পায় নি। তা যদি না পেত, তাহলে তারা আমাদের বেদগ্রন্থও মানত না, যাগ-যজ্ঞও করত না, বা বিষ্ণু-মহেশ্বরের আরাধনাও করত না। শুধু তাই নয়, তাদের আরাধনায় আবার এমন নিষ্ঠা থাকত, যে বিষ্ণু-মহেশ্বরও চুপ করে থাকতে পারতেন না। প্রাণ ঢেলে তাদের আশীর্বাদ করতেন আর বাসনা পূরণ করতেন। কিন্তু অত নিষ্ঠা দেবতাদের ছিল না। বিপদে পড়ে যখন তাঁদের প্রাণ হতো ওষ্ঠাগত তখন তাঁরা ছুটতেন 'বাঁচান…বাঁচান…' বলে। দোষের মধ্যে শুধু একটাই ছিল দৈত্যদের—হাতে ক্ষমতা পেলে, কিছুতেই তারা ব্যবহারটা ভালভাবে করতে পারত না। আর তারই সুযোগ নিতেন দেবতারা।

একবার বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলে ওদের মধ্যে। শেষ হয়েও যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না। যুগের পর যুগ চলে গেল, তবু শেষ হতে চায় না। হীনবল হয়ে পড়ছে দানবেরা যুদ্ধ করতে করতে। কত দানব প্রাণ দিচ্ছে, ওদের বাহুবল কমে যাচ্ছে, তবু যেন নাছোড়।

এসব দেখে দেবতারা পড়লেন মহা ফাঁপরে। কি করা যায়? কি করলে দৈত্যদের এই উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

নিজেরা ভেবেও যখন কোন কূল-কিনারা পেলেন না, তখন সবাই মিলে গিয়ে হাজির হলেন বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণুর কাছে।

ভগবান বিষ্ণু—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক। তাঁর কাছে সবাই সমান। একদিকে তিনি যেমন উদার, আর একদিকে তেমনি ভীষণ কঠোর। অনাচার করেছ কি—রেহাই নেই। যেখানেই লুকোও তাঁর সুদর্শন চক্র ঠিক মাথা উড়িয়ে দিয়ে যাবে।

দেবতারা সবাই মিলে ধরলেন বিষ্ণুকে। বোঝালেন ব্যাপারটা। অসুরদের তিনি যা দিয়েছেন তাতে তারা খুশি না থেকে স্বর্গরাজ্য এমন ভাবে জ্বালিয়ে মারছে যে তাঁরা তাদের কাজ ঠিকমত করতেও পারছেন না। যদি সব সময় যুদ্ধই করতে হয় তাহলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে কিভাবে?

শুনে বিষ্ণু চুপ করে বসে খানিকটা ভাবলেন। তারপর বললেন—দেখ, এখনও ওরা বেদ-গ্রন্থ মেনে ধর্ম-কর্ম করে চলেছে। এটাই ওদের রক্ষা করে চলেছে। বাড়াবাড়ি একটু করে ফেলছে ঠিকই, তাতে পৃথিবীর ক্ষতিও হচ্ছে, তোমাদেরও অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অনাচারী হলে তো আমার কিছু করার নেই।

দেবগণ বললেন—ভগবান। আমাদের যে অসুবিধে হচ্ছে, এটা আপনি স্বীকার করছেন। ওরাও যে বাড়াবাড়ি করছে, তাও আপনি বুঝতে পারছেন। আর যাতে বাড়াবাড়ি করতে না পারে, তার যে একটা বিহিত আপনাকে এবার করতেই হয়।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু ওরা ধর্মচ্যুত না হলে তো কিছু করার নেই।

—ভগবান, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের মুখ চেয়ে যা হোক আপনাকে একটা কিছু করতেই হবে, যাতে এই যুদ্ধের শেষ হয়, ওদেরও দম্ভ চূর্ণ হয়।

তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন—ঠিক আছে। আমি আমার একজন প্রতিনিধিকে দিচ্ছি। এর নাম হল মায়ামোহ। এর সঙ্গে যাও। এই তোমাদের যা হোক একটা হিল্লে করে দেবে।

এই বলে তিনি মায়ামোহকে ডেকে বললেন—তুমি দেবতাদের সঙ্গে গিয়ে এদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য কর।

বৈকুণ্ঠলোক থেকে মায়ামোহর সঙ্গে চলে এলেন দেবতারা সোজা পৃথিবীতে। কি অপরূপ দেখতে এই মায়ামোহকে। মুণ্ডিত কেশ, টানা-টানা দুটো চোখ দিয়ে যেন রাজ্যের ভালবাসা ঝরে পড়ছে, গেরুয়া বসন, দেখলে চোখ ফেরানো দায়। মন আন-চান করে উঠবে, বসে তার মুখ থেকে দুটো কথা শোনার জন্যে।

ঘুরতে ঘুরতে মায়ামোহ এসে হাজির হল নর্মদার তীরে। দেখল, বেশ কিছু অসুর এখানে ওখানে বসে। ধ্যানমগ্ন। মায়ামোহ তাদের ধ্যান ভাঙিয়ে ডাকল সকলকে এক জায়গায়। জিজ্ঞেস করল—তোমরা অমন চোখ বুজে কি করছ?

—তপস্যা করছি। বলল অসুররা।

—এতে কি লাভ হবে?

—কেন? তপস্যা, দান, যজ্ঞ—এসব তো আমাদের ধর্ম।

—ধর্ম? মৃদু হেসে বলে মায়ামোহ—তোমরা যাকে ধর্মকর্ম বলে শরীরকে কষ্ট দিয়ে এসব করছ, এতে কোন্ স্বর্গ তোমাদের লাভ হচ্ছে? ঘি খেলে শরীরের পুষ্টি বাড়ে। তা না খেয়ে আগুনে ঢেলে নষ্ট করে কোন পুষ্টি হচ্ছে? বেশ, অনেক ঘি পুড়িয়ে না হয় দেবতা হলে। তখন তোমরা কি খেতে পাবে? দেবতাদের নাম করে যে কাঠ তোমরা দিচ্ছ আগুনে, ওটাই হবে তোমাদের খাবার। তার চেয়ে তো পশুদের খাবার ভাল। নীরস কাঠ না খেয়ে ওরা তবু সরস ডালপালা খায়। কি গো, তাই না?

ওবাক হয়ে শুনতে থাকে অসুরেরা মায়ামোহর কথা।

—যজ্ঞে তোমাদের ধর্মে বলে পশু বলি দিতে, তাতে নাকি সেই পশু স্বর্গে যায়। তাই যদি হয়, তাহলে ছেলে বাবাকে খুন করলেও তো স্বর্গে যেতে পারে। কি গো, বল না? তোমাদের ধর্মে, মানে বেদে আছে, মা-বাবা মারা গেলে শ্রাদ্ধ করতে হয়। তাতে নাকি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তার জন্যে ধুমধাম করে মানুষ খাওয়াতে হবে। বেশ খাওয়ালাম। তাহলে মা-বাবা যখন বাইরে বেড়াতে যায়, সঙ্গে খাবার নিয়ে যায় কেন? বাড়িতে বসে তার ছেলে বাবার নাম করে খেলেই তো তার পেট ভরে যেত। কি গো, যেত না?

—ঠিক...ক...ঠিক বলেছেন আপনি। সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে সায় দিয়ে উঠল অসুররা—আমরা তো এরকম ভাবে কখনো ভেবে দেখি নি। আপনি ঠিক বলেছেন। যত্ত সব বুজরুকি, ধাপ্পাবাজি। ছিঃ ছিঃ, আমরা কিনা এতদিন বসে বসে মিছে সময় নষ্ট করলাম!

দেখতে দেখতে সারা অসুর-পুর সরগরম হয়ে উঠল—ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ আমরা মানি না, আর বেদের ধর্মও আমরা মানি না।

সঙ্গে সঙ্গে অসুরদের অনাচারে ছেয়ে গেল পৃথিবী।

এতদিন ধর্মই ছিল তাদের রক্ষাকবচ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তাই ছিলেন তাঁদের সহায়। এখন অসুররা যখন তাঁদেরও অগ্রাহ্য করল, তাঁরাও নিলেন মুখ ফিরিয়ে।

এমন চমৎকার সুযোগ কি আর দেবতারা ছাড়েন। তখনকার মত অসুরকুল নির্বংশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তাঁরা।



রাজা শতধনুর কাহিনী

বহু যুগ আগের কাহিনী।

শতধনু নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজত্বও ছিল তাঁর বিশাল। অরাজকতা ছিল না রাজ্যে। প্রতিবেশী রাজারাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন।

রাজা কিন্তু রাজকাজের চেয়ে বেশি সময় দিতেন জনার্দনের পুজো-আচ্চা, নাম-জপ-তপ এই সবেই। নিষ্ঠার সঙ্গে বার-ব্রত উপবাস স্নান মেনে চলতেন। কে কি ভাবছে, কে কি বলছে, সেদিকে ফিরেও তাকাতেন না। রাজ-মহিষী শৈব্যাও ঠিক স্বামীর মতই। তাঁরও দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি।

সেদিন কার্তিকী-পূর্ণিমা। মৌন থেকে, উপবাস করে, গঙ্গাস্নান করলেন। দেবারাধনার এমন অপূর্ব তিথিযোগ কি রাজা-রানী ছাড়তে পারেন ? দুজনে তাই উপবাস আর মৌনব্রত নিয়ে গেলেন স্নানে।

ভাগীরথীতে স্নান সেরেই উঠে দেখেন রাজা-রানী পরিচিত এক ব্যক্তিকে। সকলেই জানে ব্যক্তিটি কি রকম। অমন পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু যেহেতু সে ছিল আবার রাজা চাপাচার্যের বন্ধু, তাই তাকে একেবারে এড়িয়েও কেউ চলে যেতে সাহস পেত না। রাজা শতধনুর অবশ্য সে ব্যাপার ছিল না। যেহেতু প্রতিবেশী রাজার বন্ধু, পরিচিত জন, তাই ভদ্রতার খাতিরে তার সঙ্গে দু-একটা কথা না বলে চলে যেতে পারলেন না। রানী কিন্তু টু শব্দটি না করে, যেন সূর্যের স্তব করছেন, এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলেন সূর্যের দিকে।

সঙ্কল্প করেও রাখতে পারলেন না রাজা। মৌন ভঙ্গ হল। মনটাও খুঁত খুঁত করে উঠল। কি আর করেন। প্রসাদে ফিরে যথারীতি জনার্দনের পূজা সারলেন। বাকি কাজকর্মও নিষ্ঠার সঙ্গে করলেন।

এর কিছুকাল পর একদিন হঠাৎ মারা গেলেন রাজা। সতী-সাধ্বী রানী, তিনিও স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

এরপর বহু কাল কেটে গেছে। কাশীরাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করল একটি ফুটফুটে মেয়ে। মেয়ের রূপে প্রাসাদ যেন আলো হয়ে উঠল। রাজা-রানীর মন ভরে ওঠে।

যত দিন যায়, বড় হয়ে ওঠে মেয়েটি। আর সকলে দেখেন সাধারণ ছেলেমেয়েদের মত ঠিক যেন নয় সে। কেমন আড়োআড়ো-ছাড়োছাড়ো থাকে যেন নিজের মনে। আবার এতটুকু মেয়ে হলে কি হবে, দেব-দ্বিজে ভক্তি দেখে অবাক হয়ে যান রাজা-রানী। এতসব এই বয়সে শিখল কি করে।

দেখতে দেখতে মেয়ের বিয়ের বয়স হল। যার তার সঙ্গে তো এমন মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। সুপাত্র চাই। খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন রাজা।

শুনে মেয়ে একদিন বাবাকে নিরালায় ডেকে বলল—বাবা! আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে আপনি এত চিন্তা করবেন না। আমার যিনি স্বামী হবেন তিনি স্থির হয়েই আছেন। সময় এলেই আমাদের বিয়ে হবে বাবা। আপনি এত উতলা হবেন না।

এমন লক্ষ্মী প্রতিমার মত মেয়ে! বিয়ে দিলেই তো পর হয়ে যাবে,তবু দিতে হয়—এটাই নিয়ম। কিন্তু মেয়ে আবার এ কি কথা বলে ? খুবই রহস্য লাগে রাজার। তবুও মেয়ের অনুরোধ ঠেলতে পারেন না। মনে মনে ভাবেন, এমন মেয়ে যার, অমঙ্গল তার নিশ্চয়ই হবে না। অপেক্ষা করাই ঠিক হবে মনে করে রাজা আর কোন চেষ্টাও করলেন না।

কেমন করে জানবেন রাজা-রানী যে মেয়েটি তাঁদের জাতিস্মর। তাদের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মালে কি হবে, আগের জন্মের সব কিছু তার মনে আছে!

একদিন কাশীরাজকে মেয়ে বলল—বাবা, আমি বিদিশা নগরীতে গিয়ে দিনকয়েক থাকব। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিন।

সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মেয়ে এল বিদিশায়। একদিন নগরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তা থেকে যত্ন করে ডেকে নিয়ে এল একটা কুকুরকে। রাজকন্যার ইচ্ছে, কার কি বলার আছে ? নিজের বাড়িতে এনে মেয়ে কুকুরটিকে দারুণ যত্ন করতে লাগল, আর ভাল ভাল খাবার খেতে দিতে লাগল. মনের আনন্দে কুকুরটি সে সব খেত, আর সাধারণ প্রভুভক্ত কুকুরের মত পরম তৃপ্তি জানাত লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে। মেয়েটি এইসব যত দেখত, ততই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসত।

এভাবে কেটে গেল প্রায় এক-বছর। ইতিমধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে কুকুরটি। দেখতে দেখতে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না মেয়েটি। খাবার দেখিয়ে সকলের চোখের আড়ালে কুকুরটিকে ডেকে নিয়ে বলল—আপনি কুকুর হয়ে কুকুরের ধর্মই পালন করছেন দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি ছিলেন রাজা শতধনু, আর আমি ছিলাম আপনার পত্নী শৈব্যা। দেখুন তো, মনে পড়ে কিনা, গঙ্গায় স্নান করে উঠে একজন পাষণ্ডের সঙ্গে কথা বলে মৌন ভঙ্গ করেছিলেন।

কুকুরটি হঠাৎ যেন কান খাড়া করে উঠল, তার পর মেয়েটিকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সেখান থেকে দিল প্রাণপণ দৌড়। নগর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল এক পাহাড়ের চূড়ায়।



অপর প্রান্তে মরুভূমি। দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সেখানেই ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিল।

কাশী-রাজকন্যা ফিরে এল বাবার কাছে। পূর্ব জন্মে নিষ্ঠা আর সততার ফলে মেয়েটি শুধু জাতিস্মরই হয় নি, চোখ বুজলে সে সব কিছু দেখতেও পেত। দেখল, শতধনু এবার শৃগাল জন্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোলাহল পর্বতে।

মেয়েটি এল সেখানে। যত্ন করে সেই শৃগালকে কাছে ডেকে বলল—তুমি শৃগাল নও। মনে করে দেখ না, তুমি ছিলে রাজা শতধনু। আমি ছিলাম তোমার রানী। গঙ্গায় স্নান সেরে পাষণ্ডের সঙ্গে কথা বলে ব্রত ভঙ্গ করেছিলে। গত জন্মে তুমি কুকুর হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন।

যেই শোনা, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল শিয়ালের।

এরপর কাশী-রাজকন্যা দেখল, এক গভীর অরণ্যে নেকড়ে জন্ম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁর পূর্বজন্মের স্বামী।

বাবার অনুমতি নিয়ে সেও একদিন এল সেই অরণ্যে। মেয়ের কোন আবদারই অপূর্ণ রাখেন না রাজা। যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়, তার জন্যে সঙ্গে দিলেন জনকয়েক সজাগ প্রহরী। তারা দেখল,

রাজকন্যা সেখানে এসে যেন যাদুবলে বশ করে ফেলল একটা দারুণ নেকড়ে বাঘকে। তাকে নিয়েই ঘোরাফেরা করে, খেলা করে তারই সঙ্গে। এরই ফাঁকে একদিন নেকড়েকে শুনিয়ে দিল তার পূর্ব জন্মের কাহিনী। শোনা মাত্রই প্রাণত্যাগ করল নেকড়ে।

এরপর শতধনু নিলেন শকুন জন্ম। কাশীরাজ কন্যা আবার তাঁকে মুক্ত করলেন। এবার শকুন থেকে কাক, কাক থেকে মুক্তি পেয়ে হলেন অপূর্ব সুন্দর এক ময়ূর।

ইতিমধ্যে কয়েক বছর কেটে গেছে। মেয়ের গতিবিধি দেখেন, আর আশ্চর্য হন রাজা-রানী। কে জানে, ওর মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

প্রতিবেশী বিদেহ রাজ্যে মহা ধুমধাম। রাজা জনক করছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। সকলেই আমন্ত্রিত হয়েছেন সেখানে। গেছে কাশীরাজ-কন্যাও। তার তো আর কিছুই অজানা নেই। দেখল সেই ময়ূরটাকে রাজা স্নান করালেন। মেয়েটি নিজেও এক ফাঁকে স্নান সেরে নিয়ে হাজির হল ময়ূরটির কাছে। কেউ দেখতেও পেল না। আদর করতে করতে সুযোগ বুঝে তাকে শুনিয়ে দিল তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনী। মন দিয়ে সব শুনল ময়ূর। শেষ হল যজ্ঞ। ময়ূরটিও হঠাৎ মারা গেল।

এরপর কেটে গেছে আরও কয়েকটা বছর। আরও অপরূপ হয়ে উঠেছে রাজকন্যা। তার রূপ আর গুণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

এমনি সময়ে কন্যা বলল বাবাকে—বাবা, এবার আমার বিয়ের আয়োজন কর।

শুনে খুব খুশি কাশীরাজ। যাক, এতদিনে তাহলে মেয়ের মত হয়েছে।

ক্ষত্রিয় রাজকন্যার বিয়ে! যা-তা ব্যাপার নয়। সারা রাজ্যে পড়ে গেল মহা ধুমধাম। তোরণে তোরণে যেন নতুন হয়ে উঠল নগর। রাজপ্রাসাদে আলোর রোশনাই। দেশ-দেশান্তর থেকে স্বয়ম্বর সভায় খবর পেয়ে আসতে শুরু করেছেন যত রাজপুত্রের দল। কি দারুণ জাঁকজমক।

নির্দিষ্ট দিনে বসল স্বয়ম্বর সভা। রাজপুত্ররা বসে যে যাঁর আসনে। সকলেই উৎসুক কার ভাগ্যে জুটবে বরমাল্য। কন্যাকে নিয়ে রাজা এলেন সভায়, একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল কন্যা। তারপর সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা এক প্রান্তে এক যুবরাজের গলায় মালা পরিয়ে দিল।



যুবরাজটি আর কেউ নন, হলেন জনক রাজার পুত্র। সত্যভ্রষ্ট হওয়ায় যে পাপ হয়েছিল, ময়ূর জন্মেই তার শেষ হয়েছিল।

একটা পাপের পরিসমাপ্তি ঘটল জন্মজন্মান্তর ঘুরে। আর তা ঘটল কেবল পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনী স্মরণ করে।

রেবতীর বিয়ে

রৈবত ককুদ্মী, সুপ্রসিদ্ধ রাজা শর্যাতির নাতি। রৈবতের পিতা রেবত ছিলেন পরম ধার্মিক। অপূর্ব কৌশলে সাগরের নীচে তিনি তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর মনোরম প্রাসাদ—নাম কুশস্থলী। রেবতের ছিল একশ ছেলে। তাদের মধ্যে জ্ঞানে-গুণে আচারে-আচরণে বড় ছেলে এই রৈবত ককুদ্মীই ছিলেন সকলের প্রিয়।

তাঁর এক মেয়ে ছিল। তার নাম রেবতী। যেমন ছিল তার স্বাস্থ্যশ্রী, তেমনি ছিল তার রূপ-গুণ।

যে সময়ের এই কাহিনী, সে সময় পৃথিবীতে সকলেই ছিল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী—সে কি পুরুষ, আর কি নারী। আর পরমায়ুও ছিল অনেক, অনেক বছর। এখন যা শুনলে কোনমতেই তা আমরা বিশ্বাস করতে পারব না। এক হাজার বছর তো বটেই। এমন কি তারও বেশি কাল বাঁচতেন অনেকে। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে আজগুবি নয়। সত্যি সত্যিই তাই। যাই হোক শুধু স্বাস্থ্যই নয়, দেখতেও প্রায় সকলেই ছিলেন সুশ্রী। কিন্তু রেবতীর মত মেয়ের উপযুক্ত পাত্র, সব জায়গা খুঁজে খুঁজে রৈবত দেখলেন, মাত্র এমন কটি যা আঙুলের ডগায় গোনা যায়। আবার যে কটিও বা চোখে ধরল, সে কটির মধ্যে কাকে বাদ দিয়ে কার হাতে মেয়েকে দেবেন—এই ভাবনাতেই ঘুম হারালেন রৈবত।

এদিকে দিন যায়, মাস যায়। মেয়েও বড় হয়ে ওঠে। ঘরে তো আর রেখে দেওয়া যায় না। বিয়ে দিতেই হয়, কিন্তু কার সঙ্গে?

স্থির করতে না পেরে ভাবলেন, ভগবান ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। তিনি যাকে স্থির করে দেবেন, তারই সঙ্গে চোখ বুজে তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন।

মেয়েকে নিয়ে রৈবত ছুটলেন ব্রহ্মলোকে। গিয়ে দেখলেন, আপন আসনে বসে ব্রহ্মা। সামনে সঙ্গীত নিপুণ দুই গন্ধর্ব মধুর সুরে গান করছে, আর চোখ বুজে ব্রহ্মা তা উপভোগ করছেন।

সেই দুই গন্ধর্বের নাম হল—হাহা আর হুহু।

এমনি তাদের মিষ্টি গলা, আর এমন অপূর্ব তাদের সুরের বিস্তার যে রৈবতও সভায় বসে গেলেন তাদের গান শুনতে। সুরের লহরী, রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কার বাইরের সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে রৈবতকের সারা মন যেন তোলপাড় করে তুলতে লাগল।

এক সময় শেষ হল গন্ধর্বদের গান। শেষ হতেই খুব আপসোস জাগল রৈবতকের মনে। আরো আগে আসতে পারলে প্রথম থেকেই উপভোগ করতে পারতেন। এখন আসতে না আসতে গান শেষ হয়ে গেল। কতটুকুই বা শুনতে পেলেন?

গান শেষ হতেই চোখ মেললেন ব্রহ্মা। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালেন রৈবত ককুমী।

—তারপর! কি সংবাদ রৈবতক? সুমধুর বাক্যে প্রশ্ন করেন ব্রহ্মা।

—ভগবন্! আপনার তো অজানা কিছু নেই। আমার মেয়ে রেবতীর বিয়ে দেব মনস্থ করে আপনার সঙ্গে ওর সুপাত্র সম্বন্ধে একটু পরামর্শ নিতে এসেছিলাম।

—বাঃ! এত অতি উত্তম কথা রৈবতক। মুখে সস্নেহ হাসি ব্রহ্মার। বললেন—তুমি কাকে কাকে রেবতীর সুপাত্র বলে বেছেছ, শুনি।

পছন্দমত এক একটি পাত্রের নাম বলে গেলেন রৈবত। বলা শেষ করে রৈবতক বললেন—ভগবন্, এরা সকলেই সদ্বংশজাত, সুপাত্র। তবুও আপনিই আদেশ করুন, এদের মধ্যে কার হাতে আমার কন্যাকে তুলে দিই।

শুনে মৃদু হাসলেন ব্রহ্মা।

বললেন—এখানে কতক্ষণ এসেছ রৈবতক?

—কেন ভগবন্! শুনে একটু অবাক হয়েই বললেন রৈবতক—এই তো এলাম। বোধ হয় কয়েক মুহূর্ত হবে।

—তুমি তো জান না, রৈবতক। এই মাত্র যাদের নাম তুমি করলে তাদের আর কেউই তো এখন পৃথিবীতে নেই। শুধু তারা কেন, তাদের ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি, এমন কি তাদের ছেলেপুলেরাও কেউ আর বেঁচে নেই।

শুনে তো রৈবতক একেবারে যেন বোবা—সে কি?

—তুমি এখানে এসেছ, তা দেখতে দেখতে একটা দিন গেল। পৃথিবীতে এর মধ্যে যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আটাশটা মন্বন্তর হয়ে গেছে সেখানে। তার পরের মন্বন্তরেরও দুটো যুগ পেরিয়ে তৃতীয় যুগও প্রায় যেতে বসেছে। তা কি জান রৈবতক, তোমাদের পৃথিবীতে এখন প্রায় চোদ্দ কোটি বছর পেরিয়ে যেতে বসেছে। আর তুমি ভাবছ এই মাত্র!

—ভগবন্! তাহলে আমাদের বংশ, আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব...

—না রৈবতক। এখন আর কেউ নেই। তা ছাড়া তোমাদের বয়সীও আর কেউ নেই। সেখানে গিয়ে তোমাদের মত আর কাউকে দেখতেও পাবে না।

শুনে খুবই মুষড়ে পড়লেন রৈবতক।

ভগবন্! এখন তাহলে উপায়?

মৃদু হেসে বললেন ব্রহ্মা—যারা জন্মগ্রহণ করে তাদেরই মরতে হয়। তাদের এই জন্মমৃত্যু হল পাপ ক্ষয় করার জন্যে। এ ছাড়া আর এক ধরনের জন্ম আছে। সেটা নিজের পাপ ক্ষয় করার জন্যে নয়। পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্যে। তাঁদের কখনো মৃত্যু হয় না। কাজ শেষ হলে তাঁরা এমনভাবে আত্মগোপন করেন যে সাধারণে মনে করে তাঁরা মারা গেলেন। আসলে তাঁরা নিজেদের সরিয়ে নেন। তাঁদের মৃত্যু নেই। জন্ম নেই বলতে পার। মানুষের মত শরীর ধারণ করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যেই। পৃথিবীতে তোমাদের এখন চলেছে দ্বাপর যুগ। সেই অজয়, অমর ভগবানের এই অংশ বলরাম নামে শরীর ধারণ করে আছেন দ্বারকায়, যেটা ছিল তোমার রাজধানী কুশস্থলী। তুমি গিয়ে তোমার কন্যাকে তাঁরই হাতে সমর্পণ কর।

ব্রহ্মার আদেশে রৈবত ককুমী ফিরে এলেন পৃথিবীতে। সত্যিই সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। যে পৃথিবী থেকে তিনি গিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এই পৃথিবীর কি আকাশ-পাতাল তফাত। মানুষগুলোও সব কেমন বেঁটে। পথ দিয়ে যখন হেঁটে চলেছেন রৈবতক, অবাক চোখ মেলে সবাই যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাঁকে আর ভাবে, মানুষ এত লম্বা চওড়া হতে পারে! রৈবতকও যেতে যেতে আর মানুষজনদের দেখতে দেখতে ভাবেন মানুষ এত দুর্বল, এত হীন হতে পারে।

যাই হোক, দ্বারকাপুরীতে এসে রৈবতক দেখলেন বলদেবকে। স্ফটিকের মত সাদা বুক, আজানুলম্বিত বাহু, হাতে হল (লাঙ্গল)। ব্রহ্মার নির্দেশে কন্যা রেবতীকে তাঁরই হাতে সমর্পণ করে রৈবতক চলে গেলেন হিমালয়ে—তপস্যায়। কেননা, এই পৃথিবী আর তাঁর বাসের যোগ্য নয়।

দীর্ঘকায় রেবতীকে সাধারণ মাপের মানুষ বলদেবের পাশে পত্নী হয়ে দাঁড়াতে দেখে সবাই মিলে কি ঠাট্টা-মস্করাই না জুড়ে দিয়েছিল।

বলদেব হাসতে হাসতে বললেন—এই ব্যাপার! দাঁড়াও দাঁড়াও, ওসব এখনই ঠিক হয়ে যাবে। এই বলে কাঁধ থেকে হলটা তুলে রেবতীর কাঁধে আঁকসির মত বসিয়ে ঠিক ঠিক হিসেব করে, তলার দিকে দিলেন এক হেঁচকা টান। তারপর হলটা খুলে নিয়ে তুলে নিলেন আবার কাঁধে।

এরপর, রেবতী আর বলদেবকে দেখে কে বলবে বেমানান?

সেই থেকে বলরামও জগতে পরিচিত হয়ে গেলেন আর এক নামে। তা হল—রেবতী-রমণ-রাম।



মান্ধাতা ও ঋষি সৌভরির উপাখ্যান

ইক্ষ্বাকু বংশের সেই সুবিখ্যাত বীর কুবলয়াশ্ব, যিনি ধুন্ধু নামক অসুরকে বধ করে ঋষি উত্তঙ্ককে নির্বিঘ্নে যাগ-যজ্ঞ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যুবনাশ্বের জন্ম সেই কুলে। সুনামী রাজা, সুবিশাল রাজত্ব, তায় একশ রাজমহিষী—কত সুখেই থাকার কথা

যুবনাশ্বের। কিন্তু এমনি ভাগ্য, একটাও ছেলে হল না ? মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে যুবনাশ্ব তাই চলে গেলেন বনে। ইচ্ছে, বাকি জীবনটা তপস্যা করেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সঙ্গ ছাড়লেন না রানীরা। একশ রানীও বনে এলেন যুবনাশ্বের পিছে পিছে।

নিরালা, শান্ত তপোবন। ঋষিরা সব সময়ই করে চলেছিলেন যাগযজ্ঞ পরম নিশ্চিন্তে। যুবনাশ্ব আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানটায় যেন ছোটখাটো একটা রাজপ্রাসাদ গড়ে উঠল।

কি ব্যাপার, এই বয়সে অমন রাজ্য ছেড়ে সপরিবারে রাজা কেন হতাশ হয়ে এলেন বনে ?

সব শুনে, মনে মনে খুবই কষ্ট বোধ করলেন ঋষিরা। না, এর একটা প্রতিকার করবেন। ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করলে জগতে এমন কি বস্তু আছে, যা পাওয়া যায় না।

শুভদিন দেখে, একদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল যজ্ঞের আগুন। সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঋষিরা সেই যজ্ঞের আগুনে রাজার পুত্র কামনায় দিতে লাগলেন আহুতি। যজ্ঞ যখন শেষ হল তখন মধ্য রাত। যজ্ঞকুণ্ড নিভিয়ে মন্ত্রপূত জল কলসীতে ভরে যজ্ঞবেদীর ওপর রেখে ঋষিরা গেলেন বিশ্রাম নিতে। পরদিন সকালে রানীদের স্নান করিয়ে এই জল তাঁরা খেতে দেবেন। তাহলে রাজার ছেলে হবেই—মনে আর ক্ষোভ থাকবে না। যুবনাশ্ব কিন্তু এই জলের ব্যাপারটা কিছুই জানতেন না।

তখনো ভোর হতে বেশ কিছু দেরি। হঠাৎ যুবনাশ্বের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দারুণ তেষ্টায় তাঁর কণ্ঠ-তালু যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে খুঁজতে শুরু করলেন খাবার মত একটু জল। আশ্চর্য! কোথাও কি একটু খাবার জল নেই ? এমন সময় চোখে পড়ল যজ্ঞবেদীর ওপর সেই কলসীটা। তেষ্টায় যখন প্রাণ বেরিয়ে যায়, তখন কি আর কিছু ভাবার সময় থাকে ? সামনে নোংরা জল দেখলেও অমৃত মনে হয়। রাজারও তখন সেই অবস্থা। ছুটে গিয়ে কলসীর সেই জলটাই চোঁ-চোঁ করে শেষ করলেন। যেন প্রাণ বাঁচল। আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

দেখতে দেখতে ভোর হল। ঋষিদের মধুর কণ্ঠের স্তব-স্তুতিতে ভরে উঠল তপোবন। জেগে উঠেছেন যুবনাশ্ব। জেগে উঠেছেন রানীরাও। ঋষিদের নির্দেশে রানীরা স্নান সেরে এসেছেন। পুত্র-কামনায় যজ্ঞের পবিত্র জল এবার তাঁরা ঋষিদের হাত থেকে নিয়ে পান করবেন।

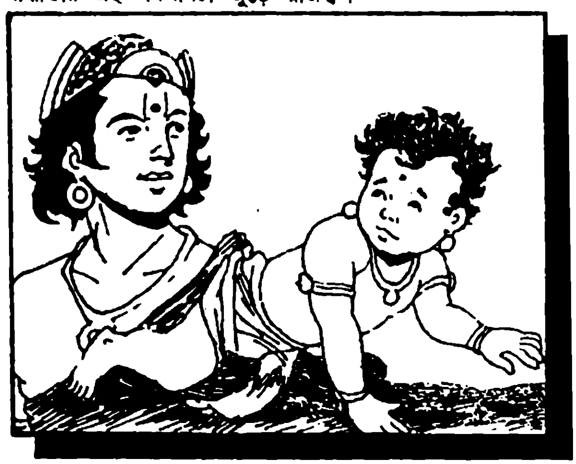
ঋষিরা যজ্ঞবেদী থেকে কলসী তুলতে গিয়ে অবাক। কি হল ? কলসী খালি কেন ? এর জল কোথায় গেল ? তারপর যখন শুনলেন যুবনাশ্বের কাণ্ড, তখন তো আর করার কিছু নেই।

যজ্ঞের মন্ত্রপূত জল। বৃথা যাবার নয়। যুবনাশ্বের পেটেই জন্ম নিল সন্তান। যথাসময়ে তাঁর ডানদিকের পেট চিরে ভূমিষ্ঠ হল হৃষ্ট-পুষ্ট একটি শিশু। যুবনাশ্ব অবশ্য এতে মারা গেলেন না। দিনকয়েক অসুস্থ থেকে আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এদিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই খিদের জ্বালায় ট্যাঁ ট্যাঁ শুরু করে দিল। শিশুর খাদ্য স্তনদুগ্ধ। কিন্তু এখন কে তাকে তা দিতে পারবে—ঋষিরাও পড়লেন মহা চিন্তায়। সন্তান তো হল ? কিন্তু জননী তো নেই যে, তার স্তনদুগ্ধ খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। তাহলে কি খেয়ে সে বেঁচে থাকবে ?

এমনি যখন চিন্তাকুল ঋষিরা, এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বললেন—ওর জন্যে আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। ওর দায়িত্ব আমার। ও 'মাময়ং ধাস্যতি'—আমাকে পান করবে। এই বলে তিনি তার বুড়ো আঙুলটি ঢুকিয়ে দিলেন শিশুর মুখে। কান্না ভুলে মনের আনন্দে, হাত-পা নেড়ে খেলা করতে করতে, শিশুও চুষতে লাগল সে আঙুল, যেন কি অমৃতই না পান করছে। আরও অবাক কাণ্ড—দেখতে দেখতে সকলের চোখের সামনেই শিশু আর থাকল না—হয়ে উঠল এক বলিষ্ঠ যুবক। যাবার সময় দেবরাজ বলে গেলেন—এর নাম রইল মান্ধাতা। পৃথিবীতে এ হবে নামকরা রাজা—রাজচক্রবর্তী। দেবরাজের 'মাং ধাতা' থেকে যেমন নাম হয়েছিল মান্ধাতা, ইন্দ্র' তেমনি আর একটা নামও এর রেখেছিলেন। তা হল 'ত্রসদস্যু'।

অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল কিন্তু ইন্দ্রের কথা। সুবিশাল রাজত্বের এমন একচ্ছত্ররাজ, এমন দানবীর রাজা আর দ্বিতীয় হয় নি। সেই সময় কেউ যদি জিজ্ঞেস করত—মান্ধাতার রাজত্ব কতখানি গো ? উত্তরে শুনত—'যাবৎ সূর্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতি তিষ্ঠতি। সর্বং তদযৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।।'—পূর্বে যেখানে সূর্য ওঠে আবার পশ্চিমে যেখানে অস্ত যায়, যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার এই সবখানটা জুড়ে রাজত্ব।



পুরুকুৎস, অম্বরীষ আর যোগী মুচুকুন্দ—মান্ধাতার এই তিন ছেলেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত। এঁরা ছাড়া মান্ধাতার ছিল সর্বগুণসম্পন্না পঞ্চাশটি মেয়ে।

সৌভরি নামে এক ঋষি লোকালয়, তপোবন ছেড়ে তপস্যার জায়গা বেছে নিয়েছিলেন জলের তলায়। আর সেখানেই সেই যমুনার নিচে বারো বছর ধরে করে আসছিলেন যোগ-সাধনা। জলের নিচে বসে সাধনা কি যার-তার কর্ম ! অসাধারণ শক্তিশালী সাধক ছিলেন সৌভরি। তার ওপর ঐভাবে সুদীর্ঘকাল সাধনা করতে করতে আরো কত শক্তিই না সঞ্চয় করেছিলেন। বহু দিন জলের তলায় থাকার ফলে তাঁর সর্বাঙ্গে জমে গিয়েছিল শ্যাওলা। দেখলেই মনে হতো একটা শ্যাওলার স্তূপ !

সেই জলে ছিল মাছের রাজা সম্মদ। বউ, ছেলে, নাতি-পুতি নিয়ে বিরাট সংসার তার। সৌভরি দেখতেন, কি মনের আনন্দেই না সম্মদ তাঁদের নিয়ে সদাসর্বদা তাঁকে ঘিরে খেলাধুলা করে। কখনো তাঁর পিঠের দিকে, কখনো সামনে, কখনো মাথার ওপর

শ্যাওলাভরা দেহের ওপর দিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে বুলিয়ে দিয়ে যায় লেজ, পাখনা ! মাঝে মাঝেই সৌভরি দেখেন দলে নতুন নতুন মুখ। বেশ লাগে দেখতে সৌভরির। বিশাল সংসার নিয়ে কেমন ফূর্তিতে আছে মৎস্যরাজ।

দিনের পর দিন এরকম দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন সৌভরির ইচ্ছে জাগল—বিয়ে-থা করে সংসারী হবেন। নির্জনে বসে এই সাধনার চেয়ে কত সুখ, কত আনন্দ রয়েছে ঐ জীবনটায় !

নদীর তলা থেকে উঠে পড়লেন সৌভরি। ভালভাবে স্নান-টান সেরে পরিষ্কার হয়ে সোজা এসে হাজির হলেন মান্ধাতার সভায়। হঠাৎ ঋষিকে আসতে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে মান্ধাতা তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর জানতে চাইলেন—ঋষিবর ! আপনার কি সেবা করতে পারি বলুন।

সৌভরি বললেন—শোন রাজা, আমার সংসারী হতে ইচ্ছে হয়েছে। তাই তোমার কাছে এসেছি, তোমার কুলের মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে। কেননা, তোমাদের কুলই হল মানী কুল। তোমার তো পঞ্চাশটা মেয়ে রয়েছে, তার মধ্যে যে কোন একটার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও।

সৌভরির ইচ্ছা শুনে মান্ধাতার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। সব কটি মেয়েই তাঁর অপূর্ব সুন্দরী। যেমন রূপে, তেমন গুণে। পৃথিবীতে তাদের যোগ্য স্বামী হবার মতো কোথাও কোন যুবরাজ আছে কিনা সন্দেহ। আর এই সৌভরি ! বয়সের তো গাছ-পাথর নেই, মাথার, দাড়ির একটা চুলও কালো নেই, শরীরটা জরাজীর্ণ। বাপ হয়ে কোন্ মেয়েকে প্রাণ ভরে তুলে দেবেন এঁর হাতে ? আবার যদি প্রত্যাখ্যান করেন, সে হবে আর এক সর্বনাশ। রাগের মাথায় অভিশাপ দিয়ে বসলে তা হাড়ে-হাড়ে ফলে যাবে, কেউ রোধ করতে পারবে না।

অনেক ভেবে শেষে মান্ধাতা বললেন—ঋষিবর ! আমাদের কুলের নিয়ম, মেয়েরা স্বয়ম্বরা হয়। নিজেদের মনোমত স্বামী তারা স্বয়ম্বর সভা থেকে বেছে নেয়। আমরা শুধু দাঁড়িয়ে থেকে বাকি কাজটুকু করে দিই।

যোগ-সাধনায় সিদ্ধ সৌভরি। রাজার মনের কথা বুঝতে কি আর তাঁর বাকি থাকে ? সঙ্গে সঙ্গে ঋষি বললেন—নিশ্চয়, নিশ্চয় রাজা। কুলের যা নিয়ম তা তো অবশ্যই পালন করতে হবে। তবে, আমি যে এখন এসেছি প্রার্থী হয়ে। এক কাজ কর, বরং দুদিকই বজায় থাকবে। তুমি তোমার অন্দর রক্ষককে বল, আমায় অন্তঃপুরে তোমার মেয়েদের কাছে নিয়ে যেতে। যদি কেউ পছন্দ করে, ভাল, নচেৎ আর কি করার আছে।

মান্ধাতা আর কি করেন। অগত্যা তাতেই রাজি হয়ে শিখণ্ডী-দ্বারী বর্ষবরকে ডেকে, সেইরকম আদেশ দিয়েই সৌভরিকে পাঠিয়ে ছিলেন তার সঙ্গে। জরাজীর্ণ দেহটা কোনরকমে টানতে টানতে দ্বারীর পেছন পেছন সৌভরিও ঢুকলেন অন্দরে। গেলেন যে মহলে কন্যারা আছে, সেখানে।

মান্ধাতার মেয়েরা দেখল, বর্ষবরের পেছনে সৌম্য সুদর্শন এক যুবক। টাটকা গোলাপের মত গায়ের রঙ। কি অপূর্ব ! কি অপূর্ব ! চোখ ফেরানো দায়। তারপর যখন বর্ষবরের মুখে শুনল তাঁর এখানে আসার কারণ, তখন রীতিমত একটা হুড়োমুড়ি পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে। কে আগে দেবে তাঁর গলায় মালা ! মেয়েদের কাণ্ড দেখে বর্ষবর পেছন ফিরে ঋষিকে দেখে তো অবাক।

সেখান থেকে সে বেরিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে রাজাকে সব বলল। ইচ্ছে না থাকলেও আর কিছু করার নেই রাজার। তাঁর পঞ্চাশটি মেয়ের সঙ্গেই রাজা বাধ্য হলেন সৌভরির বিয়ে দিতে।

বিয়ে করে সৌভরি রাজকন্যাদের নিয়ে চলে গেলেন নিজের তপোবনে। ডাকলেন বিশ্বকর্মাকে। বললেন—শোন, প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা প্রাসাদ তৈরি করে দাও। প্রত্যেকটি প্রাসাদই যেন দারুণ রমণীয় হয়। থাকবে উপবন। থাকবে সরোবর। এই সরোবরে সব সময় ফুটে থাকবে পদ্মফুল, কলকল করতে করতে হাঁসের দল খেলা করে বেড়াবে। প্রত্যেকটি ঘর হবে সুসজ্জিত—থাকবে সুন্দর সুন্দর বিছানা, আসবাবপত্র। অভাব



থাকবে না অতি উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদের। যেখানে যত ভাল খাবার-দাবার আছে প্রত্যেকটি প্রাসাদে তা যেন অঢেল থাকে।

ঋষি সৌভরির আদেশ—যথা আজ্ঞা। ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন, তেমনটি তৈরি হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সৌভরিও সব কিছু ছেড়ে নিজেকে পুরোপুরি ভাসিয়ে দিলেন সংসার-ধর্মে। এসব শুনে মান্ধাতাও হলেন রীতিমত অবাক। অত বড় একজন সাধক, এমন ঘোর-সংসারী হয়ে ওঠেন কিভাবে ?

যাই হোক, পিতার প্রাণ মেয়েদের দেখার জন্য একেবারে ছটফট করে উঠল। কি জানি, কেমন আছে তাঁর মেয়েরা। থাকতে না পেরে নিজেই গেলেন নিজের চোখে মেয়েদের দেখতে। প্রথমেই তো তাদের প্রাসাদ দেখে অবাক। তারপর প্রাসাদের ভেতরের সব

সাজসজ্জা দেখে তো আরো অবাক। মনে হল তাঁর, পৃথিবীর রাজা হয়েও এই অতুল ধনসম্পদের কাছে তিনি হেরে গেছেন। প্রতিটি প্রাসাদে গিয়ে প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা করলেন। জানতে চাইলেন, স্বামীর ঘরে তারা কেমন আছে। প্রত্যেকেরই মুখে শুনলেন সেই একই কথা, কোথাও কিছুর অভাব নেই। অতি বড় সৌভাগ্য না করলে এমন স্বামী মেলে কজনের ভাগ্যে? মান্ধাতা সৌভরিকে তাঁর যোগৈশ্বর্যের প্রতি সম্মান জানিয়ে ফিরে এলেন প্রাসাদে।

দেখতে দেখতে সৌভরি হলেন একশ পঞ্চাশটি পুত্রের পিতা। তাদের টাল মাটাল পায়ে হাঁটা, আধো আধো বুলি, মমতায় ভরিয়ে দিল সৌভরির মন। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল ছেলেরা। নাতি-পুতির মুখ দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল সৌভরির মন। এক একটা বাসনা পূরণ হয়, জাগে আর এক বাসনা। যেন শেষ আর হতে চায় না।

এমনিভাবে যখন কেটে চলেছে বছরের পর বছর, হঠাৎ একদিন সৌভরির মনের ওপর সজোরে কে যেন চাবকু মেরে বলল—কি গো সৌভরি! মৎস্যরাজের সংসার দেখে ভেবেছিল এখানে কি অমৃতই না আছে! অমৃত লাভ হয়েছে? তৃপ্তি পেয়েছ? বাসনা মিটেছে?

সম্বিৎ ফিরে পেলেন সৌভরি। সংসারে যে এত মায়া-মোহ, তা কে জানত? মোহে পড়ে তার এতদিনের সাধনা শেষে কিনা নষ্ট করে ফেললেন। আর নয়। যতদিন আরো থাকবেন এখানে, বাসনার জালে তিনি জড়িয়ে পড়বেন। এই জাল কেটে বেরিয়ে যেতে হবে। সঙ্কল্পমাত্রেই সব ছেড়েছুড়ে বিরাগী হলেন সৌভরি। বৈরাগী হলে সহধর্মিণীরা।

নিরালা তপোবনে এসে যাবতীয় পাপ শান্ত করে আকুল নয়নে ভগবান বিষ্ণুর পায়ে নিজেদের ধ্যান-জ্ঞান পাপ-পুণ্য সব অঞ্জলি দিয়ে হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ ভিক্ষু।



ইন্দ্রের প্রতারণা ও তার পরিণাম

চন্দ্রবংশে রাজা আয়ুর পর আরও অনেক রাজাই ছিলেন, যাঁদের শক্তি, সাহস এবং দাপট ছিল অপরিমেয়। কিন্তু আয়ুর ছেলে রজির মত এমন সুকৌশলী যোদ্ধা আর ধুরন্ধর রাজা বড় একটা ছিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে দেখলে শত্রুপক্ষের বড় বড় বীরদেরও ভয়ে বুক দুরদুর করে উঠত। নিশ্চিত জানত, নিজের প্রাণ নিয়ে আর তারা ফিরে যেতে পারবে না।

মাঝে মাঝেই তখন লেগে থাকত দেবাসুরের যুদ্ধ। এমনি এক যুদ্ধ চলেছে তখন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় আর কিছুতেই হচ্ছে না। উপায়ন্তর না দেখে দেবতা আর অসুর—দু দলই গিয়ে হাজির হল ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মার কাছে সবাই সমান। মন দিয়ে দু পক্ষেরই কথা শুনে বললেন—দেখ, এ যুদ্ধের নিষ্পত্তি করতে পারে একমাত্র রাজা রজি। যার হয়ে সে লড়বে, তার জয় অনিবার্য। তোমরা বরং তার কাছে গিয়ে তাকে দলে টানতে পার কিনা দেখ।

শুনেই দেবতাদের আগে ছুটল অসুররা।

রজি সব শুনে-টুনে বললেন—হ্যাঁ, রাজি আছি, তোমাদের হয়ে লড়তে। তবে, একটা শর্ত।

যুদ্ধে জিতলে কিন্তু আমার আধিপত্য তোমাদের মেনে নিতে হবে। চলতে হবে আমার কথানুসারে। অন্যথা করা চলবে না।

অসুররা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বসল—না। এরকম শর্ত আমরা মানতে রাজি নই। আপনি আমাদের হয়ে লড়বেন, আমাদের জেতাবেন, তার যথাযোগ্য সম্মান অবশ্যই আপনি পাবেন। কিন্তু আমরা আমাদের প্রহ্লাদ ছাড়া আর কারো কথা শুনি না, মানি না, মানবও না।

—বেশ, তাহলে তোমরা প্রহ্লাদকে নিয়েই যুদ্ধ কর গে। আমার কাছে এসেছ কেন।

—তাই যাচ্ছি। তাতে যদি আমরা হেরেও যাই সে-ও ভাল।

মুখ ঘুরিয়ে, বুক ফুলিয়ে চলে গেল অসুররা।

এবার সদলবলে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। রাখলেন একই আবেদন—রাজা, আপনি আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে আসুন। অসুরদের ঔদ্ধত্য যে আর সহ্য হয় না।

রজি বললেন—রাজি। ও ব্যাটাদের বড় দম্ভ। কিন্তু দেবরাজ, আমার একটা প্রশ্ন। আমি যে আপনাদের জীবন পণ করব, জিতলে কি পাব?

—আপনি যা চাইবেন। বললেন ইন্দ্র।

—আমার চাওয়ার মধ্যে শুধু একটাই আছে, তা হল ইন্দ্রত্ব। আমি তোমার ঐ সিংহাসনে বসে দেবরাজ ইন্দ্র হতে চাই। দিতে পারবে?

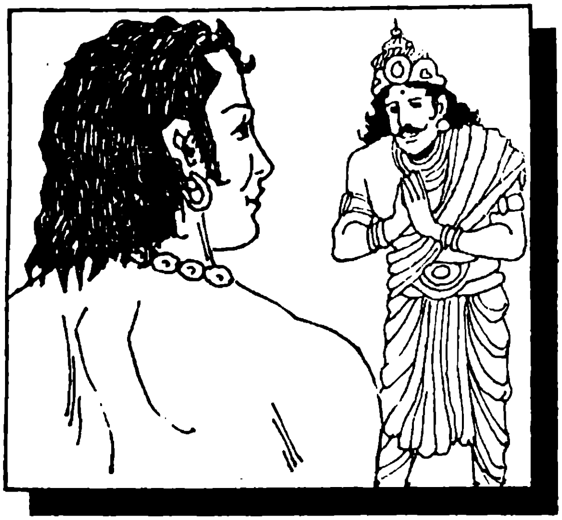
অন্যান্য দেবতারা শুনে যে যার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, কিন্তু ইন্দ্র কোনদিকে না তাকিয়ে সরাসরি বলে বসলেন—আপনি আমাদের হয়ে লড়াই করবেন, প্রাণসংশয়ের ঝুঁকি নেবেন, আর আমরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করব না? এত নেমকহারাম আপনি আমাদের ভাববেন না।

এরপর আর কথা চলে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে রজি নামলেন দেবপক্ষ সমর্থন করে।

শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। আহত সৈনিকদের আর্তনাদে ছেয়ে গেল রণভূমি। বাণে বাণে যেন অগ্নিকাণ্ড। বহুক্ষণ ধরে চলল সেই যুদ্ধ। তারপর যখন শেষ হল, অসুরদলের প্রায় সব শেষ। যে কজন ওরই মধ্যে বেঁচে ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে তারা তখন পালিয়ে গেছে। জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল দেবকুল।

এবার তো শর্ত রাখতে হয়। শর্ত অনুযায়ী দেবরাজকে সিংহাসন



থেকে সরে গিয়ে ইন্দ্রত্বের আসনে বসাতে হয় মর্ত্যের রাজা রজিকে।

যুদ্ধ জয়ের পর বিশ্রাম-টিশ্রাম নিয়ে অবশ্যই ইন্দ্র এলেন রাজার কাছে। এসেই সবিনয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন রজির পায়ের ওপর। তারপর গদগদ কণ্ঠে বললেন—কি ভয় থেকে যে আপনি আমাদের মুক্ত করলেন, তা আর কি বলব ! পুত্রের অমঙ্গল পিতা ছাড়া আর কে দূর করতে পারে। আপনি আমাদের পিতার তুল্য কাজ করেছেন। পিতার তুল্যই বা কেন বলি, জন্মদাতা পিতা তো নিশ্চয়ই পিতা। এ ছাড়াও যিনি ক্ষুধার অন্ন যোগান, যিনি যাবতীয় ভয় দূর করে দেন, যিনি নিজের মেয়েকে বরের হাতে দান করেন আর যিনি বিদ্যাশিক্ষা দেন, এঁরা সকলেই পিতা। আপনি আমাদের অমঙ্গল দূর করে ভয়মুক্ত করলেন। আপনি আমার পিতা। ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্র আপনার পুত্র। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আপনার সম্মান আমি অটুট রাখতে পারি।

এরপর কি আর রজির বুঝতে বাকি থাকে যে ইন্দ্র কৌশলে তার প্রতিশ্রুতি পালন থেকে এড়িয়ে গেলেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে ঐ পদ কেড়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে কোন একটা ব্যাপারই নয়। কিন্তু সেটা হয়ে যাবে আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই। দেখতে ভাল লাগবে না। তার ওপর ইন্দ্র আবার তাঁকে বাপ বানিয়ে দিলেন। এখন বাবা হয়ে ছেলের রাজ্য কেড়ে নেওয়াটাও শোভন হবে না। লোকে কি বলবে। অগত্যা নিজের লোভ নিজেকেই ঢোক গিলে হজম করতে হল। রজির আর ইন্দ্র হওয়া হল না।

সুকৌশলে বাজিমাৎ করে ইন্দ্রেরও পোয়া বারো। আর তাঁকে কে হটায় ? আগে যেমন ছিলেন, তেমনিই থেকে গেলেন। এবার বরং আগের চেয়ে আরও নিশ্চিন্ত। এখন তো আর কোথাও কোন অশান্তি নেই, সুতরাং ভোগ বিলাসের ঘটা এবার তাঁর দেখে কে।

এসব দেখে দেখে নারদের একদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

রজির ছেলেদের কাছে নারদ একদিন সোজাসুজি এসে বললেন—আচ্ছা, তোমরা কি ?

—কেন ? রজির পুত্রেরা তো অবাক।

—তোমরা কি সেই রাজা রজির ছেলে রাজেয় ক্ষত্রিয়। যাদের মত বীর নাকি আর পৃথিবীতে নেই ?

—আপনি এ কথা কেন বলছেন দেবর্ষি ?

—বলছি কি আর সাধে ? আমার সন্দেহ জাগে তোমরা আদৌ ক্ষত্রিয় কিনা।

—দেবর্ষি, আমরা আপনাকে সম্মান করি। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অসম্মান করবেন না।

—বলতে পার ইন্দ্রের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ?

—আমাদের দাদা।

—কি রকম দাদা, জানো ? পাতানো দাদা। তোমাদের বাবাকে ইন্দ্রত্ব দেবে কবুল করে তাঁকে বধ করলো। কেননা নিজেদের সামর্থ্যে কোনমতেই কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। জেতবার পর পাছে তোমাদের বাবাকে ইন্দ্রত্ব ছেড়ে দিতে হয়, লোভীটা করল কি, তোমাদের বাবার পায়ে ধরে তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলে যে সে তাঁর ছেলে। দেবতাদের রাজা হয়ে এমনভাবে যে কথার খেলাপ করে, প্রতারণা করে, তাকে তো বাপু বরদাস্ত করা উচিত নয়।

শুনতে শুনতে রাজেয়দের মাথাও বেশ গরম হয়ে ওঠে। সত্যিই তো, ইন্দ্র যদি তাদেরই দাদাই হবে, তাহলে তাদের সে রকম ভালবাসে কই, আপদে-বিপদে আসে কই ? ঠকিয়ে কাজ হাসিল করা ?

নারদ দেখলেন তাঁর কাজ মিটে গেছে। সরে পড়লেন সেখান থেকে।

রাজেয়রা হৈ হৈ করে গিয়ে আক্রমণ করল দেবরাজ্য অমরাবতী।

ইন্দ্রের সাধ্য কি, তাদের গতিরোধ করেন।

এর বহুদিন পরে দেবগুরু বৃহস্পতির দয়ায় ইন্দ্র আবার ফিরে পেয়েছিলেন নিজের সিংহাসন অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, কিন্তু প্রতারণার প্রতিফল তাঁকে হাড়ে হাড়ে ভোগ করতে হয়েছিল।



কল্মাষপাদের কাহিনী

ভগীরথের বংশে ঋতুপর্ণ রাজার এক নাতি ছিল, নাম সৌদাস। বাবা সুদাস খুব ধর্মভীরু আর দয়ালু রাজা হলে কি হবে, তার বাবা ঋতুপর্ণ ছিলেন আবার অন্য ধরনের। সে সময় পাশাখেলায় তাঁর জুড়ি মেলা ছিল খুবই কঠিন। ধুরন্ধর খেলোয়াড়। পাশা খেলে কত রাজার কত সম্পদ যে তিনি সে সময় আহরণ করেছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। নল রাজা ছিলেন আবার তাঁর একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঋতুপর্ণ যেমন পাশাখেলায়, নল ছিলেন তেমনি অশ্ববিদ্যায় ধুরন্ধর। নলকে পাশাখেলা শিখিয়ে ঋতুপর্ণ তার কাছ থেকে শিখে নিলেন অশ্ববিদ্যা। ফলে সে সময় ঋতুপর্ণের মত রাজাকে সকলেই সমীহ করে চলতেন।

সৌদাস তাঁরই নাতি। দারুণ বেপরোয়া। খুব ভালবাসতেন শিকার করতে। আর শিকারে গেলে সে যত বড় দুর্ধর্ষ শিকারই হোক না কেন, সৌদাসের তীর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ফলে রাজাকে শিকারে আসতে দেখলে পশুদেরও প্রাণ ভয়ে দুরু দুরু করে উঠত।

একদিন শিকারে গেছেন সৌদাস। ঢুকেই দেখলেন সামনেই দুটি বেশ বড়-সড় নধর বাঘ। যেখানে তাকে দেখলেই বনের পশুরা পালায় আর ঘোড়া ছুটিয়ে পিছনে ধাওয়া করে তবে শিকার করতে হয় সেখানে বাঘদুটোর রকম সকম দেখে সৌদাস একটু অবাকই হলেন। যেন গ্রাহ্যই করল না। মনে মনে সৌদাস ভাবলেন জাত বাঘের দম্ভ দেখানো হচ্ছে আমার কাছে? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। বলেই তূণ থেকে একটা তীর তুলে ধনুকের ছিলায় লাগিয়ে বোঁ করে ছুঁড়ে দিলেন একটা বাঘকে লক্ষ্য করে। আগে একটা নিকেশ হোক, তারপর পরেরটা। অব্যর্থ নিশানা সৌদাসের, তা কি ফসকায়? ঘ্যাঁক করে গিয়ে বিঁধল একেবারে বাঘের বুকে—এফোঁড় ওফোঁড়। সৌদাস দেখলেন বাঘটা কাতর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু তার জায়গায় দাঁড়িয়ে এক বিকট আকার রাক্ষস যেন বন কাঁপিয়ে ধরাশায়ী হল। নিজেকে সামলে দ্বিতীয় বাঘটাকে লক্ষ্য করার আগেই সেও বিশালকায় ভয়াবহ এক রাক্ষসের মূর্তি ধরে তর্জন-গর্জন করে উঠল—আমার ভাইকে তুই অযথা মারলি? দাঁড়া, তোর ব্যবস্থা আমি করছি। এই বলে সৌদাসকে আর কোন সুযোগ না দিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, আর কেউ তাকে খুঁজেও পেল না।



মিটে গেছে এ ব্যাপার। এই শিকারের কথা ভুলেও গেছেন সৌদাস। ইতিমধ্যে বেশ কটা বছর চলেও গেছে।

একদিন সৌদাস কুলগুরু বশিষ্ঠকে আচার্য করে বিরাট এক যজ্ঞ করলেন। রাজা-রাজড়াদের যজ্ঞ বলে কথা। নিয়মমত কাঠ-ঘি আগুনে যা পুড়বার তা তো পুড়লই। তার ওপর দিয়তাং-ভুজ্যতাং—দাও···দাও, খাও···খাও ব্যাপার। যজ্ঞের আগুন নিভলেও পাকশালার আগুনও যেমন চট করে নেভে না, তেমনি ছুটিও মেলে না পাচকের।

যজ্ঞ শেষ। একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন রাজা। এমন সময় বশিষ্ঠদেব এসে হাজির। বললেন—রাজা, তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি। যে যজ্ঞ করা হল, এর ফল ঠিক ঠিক পেতে গেলে সৎ ব্রাহ্মণকে মাংস খাওয়াতে হয়।

রাজা সৌদাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—আপনি ছাড়া সেই রকম ব্রাহ্মণ কোথায়, গুরুদেব? আপনি স্নান সেরে আসুন। আমি পাচককে দিয়ে সব বন্দোবস্ত করিয়ে রাখছি।

স্নান সেরে বশিষ্ঠদেব আসতেই রানীর সঙ্গে রাজা সৌদাস আসন পেতে গুরুদেবের আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্ন, নানারকমের ব্যঞ্জন, তার সঙ্গে আবার মাংস। পরিপাটি করে সাজিয়ে দেওয়া হল গুরুদেবের সামনে।

মাংস দেখে একটু বিস্মিত হলেন বশিষ্ঠ। মাংস এমন কেন? গ্রহণ করার ঠিক ইচ্ছে না থাকলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে যখন শিষ্যের দেওয়া, তখন ফিরিয়েও দিতে পারেন না।

আচমন সেরে খেতে বসতে গিয়েই আবার মাংসটার দিকে তাকাতেই খটকা লাগল বশিষ্ঠের। যে মাংস সাধারণত মানুষে খায়, এ তো সে মাংস নয় বলে মনে হচ্ছে। আরও একটু ভালভাবে দেখতেই সব সন্দেহ তাঁর দূর হয়ে গেল। খাওয়া উঠল মাথায়। রাগে চোখদুটো লাল হয়ে উঠল।

ঘরে যেন বাজ ফেটে পড়ল—কি, এতখানি তোমার দুঃসাহস! যে মাংস মানুষের খাদ্য নয়, অভক্ষ্য সেই নরমাংস তুমি আমায় খেতে দিলে? আমার কোনটা খাদ্য, কোনটা অখাদ্য সব জেনেও, তোমার এত বড় ঔদ্ধত্য যে তুমি আমাকে নরমাংস খেতে দাও?

সৌদাসও তো শুনে অবাক। তা কেমন করে হয়। পাচককে এখুনি ডাকা দরকার। জানা দরকার, এ মাংস কোথা থেকে এল।

কিন্তু বশিষ্ঠ তখন এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে সৌদাসের কোন কথা শোনার মত ধৈর্য তখন আর তাঁর ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৌদাসকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—আমাকে যেমন তুমি নর মাংস খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলে, তুমি তেমনি নরমাংসলোলুপ রাক্ষস হবে।

—গুরুদেব, এ আপনি আমাকে অযথা কি অভিশাপ দিয়ে বসলেন—বললেন সৌদাস—আমি স্বেচ্ছায় এত বড় অন্যায় করতে পারি না। আপনিই মাংসের অভিলাষ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই মাংস কোথা থেকে এল তার রহস্যটুকু জানার সুযোগ আপনি আমাকে দিলেন না।

বলতে বলতে সৌদাসেরও মাথা গরম হয়ে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক আঁজলা জল তুলে মন্ত্রশক্তিতে সেই জলকে ভীষণ করে তুলে বশিষ্ঠের উদ্দেশ্যে প্রতিশাপ হিসেবে ছুঁড়ে দিতে যাবেন, এমন সময় রানী মদয়ন্তী দৌড়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাধা দিলেন রাজাকে।

—ছি···ছি! ও কি করছেন রাজা? উনি আমাদের গুরুদেব, কুলগুরু। ওঁর প্রতি আপনার রূঢ় আচরণ শোভা পায় না।

যেন সম্বিত ফিরে পেলেন সৌদাস। ঠিকই তো, আমাদের অজান্তে কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে। হয়ত এটাই আমার ভাগ্যের লিখন। কিন্তু হাতের এই জল এখন ফেলি কোথায়। মাটিতে ফেললে গোটা পৃথিবীটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। অনেক ভেবে সৌদাস শেষে জলটা ফেললেন নিজের পায়ের ওপরই। সঙ্গে সঙ্গে হাজার রঙ একসঙ্গে মিলেমিশে গেলে যেমন দেখায় সৌদাসের দুটো পা-ই সেইরকম কল্মষ হয়ে গেল। সেই থেকে সৌদাস পরিচিত হয়ে গেলেন কল্মাষপাদ নামে।

বশিষ্ঠও নিজেকে ইতিমধ্যে সংযত করে নিয়েছেন। তিনিও ভাবতে শুরু করেছেন, এরকম ব্যাপার কেন ঘটল? যোগী তিনি,

জ্ঞানী তিনি। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল সব ঘটনা। দেখলেন, সৌদাসের কোন অপরাধ নেই। এ সেই বাঘবেশী রাক্ষসের চক্রান্ত, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়েই এত অঘটন ঘটিয়ে বসেছে। তাঁর অবর্তমানে সেই তাঁর রূপ ধরে সৌদাসকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁকে মাংস খাওয়াতে, আর পাচক হয়ে সে রেঁধে পাঠিয়েছে এই নরমাংস।

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুবই নরম হয়ে গেলেন বশিষ্ঠ। কিন্তু মুখ দিয়ে একবার যা বেরিয়ে গেছে, তা তো আর ফিরে আসবে না। অগত্যা সৌদাসকে নরমাংসভোজী হবার জন্য রাক্ষস হয়ে বনে চলে যেতেই হল, তবে বশিষ্ঠের কৃপায় তা জীবনভর না হয়ে মাত্র বারো বছরের জন্য।

কল্মাষপাদ থেকে গেলেন বনে। ঘুরে বেড়ান যেখানে সেখানে রাক্ষসের বেশে। আর সুযোগ পেলেই খিদে মেটান মানুষ ধরে, তার রক্ত মাংস খেয়ে। এই ভাবে চলেছে দিনের পর দিন। একদিন ক্ষুধার্ত কল্মাষপাদের চোখে পড়ল একসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীকে। সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে তাঁদের। তখনও কোন ছেলেপুলে হয় নি। মা হবার জন্যে ব্রাহ্মণীর প্রাণে খুব আকুলতা। কিন্তু আশা আর পূরণ হল না। কল্মাষপাদ এসে ধরল ব্রাহ্মণকে। তাই দেখে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ব্রাহ্মণী। বললে, এ আপনি কি করছেন? আমাদের শখ-সাধ মিটল না, আশা মিটল না, আপনি আমার কাছ থেকে ওকে কেন কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন? আপনি কি ভুলে গেলেন যে আপনি সত্যিই রাক্ষস নন, আপনি রাজা মিত্রসহ (সৌদাসের আর এক নাম)।

কিন্তু ব্রাহ্মণীর এই আকুলতা কল্মাষপাদের মনে কোন রেখাপাত করল না। বাঘ যেমন পশু খায়, তেমনি করে কল্মাষপাদও খেয়ে ফেললেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণী থাকতে না পেরে দিল অভিসম্পাত—ব্রাহ্মণকে যেমন পিতা হবার সুযোগ তুমি দিলে না, তুমিও তেমনি পিতা হবার সুযোগ পাবে না।

বারো বছর, বশিষ্ঠের অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন বটে সৌদাস, কিন্তু ব্রাহ্মণীর অভিশাপ তাঁকে জীবনভর বয়ে বেড়াতে হল।

নিমি থেকে নিমিখের কাহিনী

ইক্ষ্বাকুর পর সূর্যবংশের কত রাজাই না রাজত্ব করে, কত কীর্তিই না রেখে গেছেন। রাজা নিমি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সেই রকম একজন।

রাজা তো রাজা। ভয়-ডর কি জিনিস, তা তিনি কোনদিনই জানতে না।

একবার সঙ্কল্প নিলেন রাজা নিমি এক হাজার বছর যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের আগুন কখনো নিভবে না। দিনে-রাতে সমানে জ্বলবে।

কুলগুরু দেব বশিষ্ঠ। যেমন মানী বংশ, তেমনি তাঁর সুপণ্ডিত গুরু।

আহ্বান জানালেন রাজা নিমি গুরুদেবকে। বললেন—হাজার বছর যজ্ঞ করব ঠিক করেই ফেলেছি। আপনাকে তো দায়িত্ব নিয়ে সব ব্যবস্থা করতে হয়।

শুনে বশিষ্ঠ বললেন—এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমাকে আগে শোনাও নি কেন রাজা। আমি যে অন্য এক জায়গায় আটকে গেলাম।

—কোথায়? কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন নিমি।

—ইন্দ্র এসেছিল আমার কাছে, পাঁচশ বছর যজ্ঞ করবে। সেই যজ্ঞের প্রধান হিসেবে আমাকে তার চাই-ই। আমি তাকে কথাও দিয়ে দিলাম। তুমি যজ্ঞ করবে শুনলে ইন্দ্রকে আমি কথা দিতাম না। বললেন বশিষ্ঠদেব।

—ওঃ। বলেই চুপ করে মুখ ঘুরিয়ে অন্য কাজে মন দিলেন। ভাবখানা এমন, তিনি রাজা, বশিষ্ঠ তাঁরই আশ্রিত। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই ইন্দ্রের যজ্ঞে চলে গেলেন।

খুব সহজ-সরল বশিষ্ঠ। মনে কোন সাঁত-পাঁচ নেই। তাই রাজার মনে কিসের ঢেউ খেলে গেল, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

বশিষ্ঠ তেমনি সরল মনেই বললেন—তাহলে তোমার যজ্ঞের সময়টা একটু পেছিয়ে নাও। ইন্দ্রের যজ্ঞটা শেষ করে এসেই তোমারটা শুরু করব।

রাজা নিমি শুনে চুপ করেই রইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

বশিষ্ঠ ভাবলেন, রাজা যখন আর কিছু বললেন না, তখন তাঁর শর্ত নিশ্চয়ই মেনে নিলেন।

ব্যস, মিটে গেল ব্যাপারটা। খুশি মনে বশিষ্ঠও চলে গেলেন ইন্দ্রের যজ্ঞে। ওটা শেষ করে এসে শিষ্যের মঙ্গল-কামনায় নিশ্চিন্তে মন-প্রাণ দিয়ে নিমির যজ্ঞ করবেন। হাজার হোক, তিনিই হলেন এই বংশের কুলগুরু। বংশের যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, মঙ্গল হয়, সব দায়-দায়িত্বই যে তাঁর।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। আর এ রকমটা হয় তখনি, যখন কারো মনে বাসা বাঁধে দম্ভ, অহঙ্কার নামে সব রিপুগুলো।

রাজা নিমি কিন্তু বেশ একটু দাম্ভিক ছিলেন মনে মনে। তাই তিনিও ঠিক করে ফেললেন, কুলগুরুকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ করবেন। কেন, বশিষ্ঠ ছাড়া কি জগতে আর কেউ নেই যে তাঁর যজ্ঞ করতে পারেন না?

ডেকে আনলেন গৌতম ঋষিকে। তাঁকেই প্রধান হোতা করে জড়ো করলেন আরো মুনি-ঋষিকে। শুরু করে দিলেন যজ্ঞ। বশিষ্ঠ এসবের কিছু জানতেও পারলেন না।

ওদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হতেই মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বশিষ্ঠদেব ফিরে এলেন। দেখলেন প্রধান হোতা গৌতম যজ্ঞ



করছেন তাঁর শিষ্যেরা। দেখেই তো অবাক।

চুপ করে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন আর ভাবলেন নিমি ডেকে না আনলে, গৌতম তো আর স্বেচ্ছায় আসবেন না। নিমি তাহলে তখন চুপ করে থেকে তাঁকে অবজ্ঞাই করেছিল? কুলগুরুকে অবজ্ঞা!

এই কথা মনে আসতেই অমন যে শান্ত, ধীর, স্থির ঋষি বশিষ্ঠ, তাঁরও মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। রাজা হয়ে গুরুদ্রোহীতা! ঋষির অপমান! এত বড় ঔদ্ধত্য!

নিজেকে আর সামলে রাখতে না পেরে সোজা চলে গেলেন প্রাসাদে। দেখলেন মনোরম পালঙ্কে নিমি খোশ মেজাজে ঘুমোচ্ছেন। দেখামাত্রই মাথার ভেতরের জ্বলন্ত আগুন দপ্‌ করে উঠল। খুব চেঁচামেচি করে রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—আমাকে উপেক্ষা করে তুমি গৌতমকে দিয়ে যজ্ঞ করালে? তুমি বিদেহ হও। তোমার এই প্রাণ যেন আর তোমার দেহে না থাকে।

চেঁচামেচিতে ঘুম তো ভেঙেই গিয়েছিল রাজার। অভিশাপ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে তিনিও বশিষ্ঠকে দিয়ে বসলেন পাল্টা অভিশাপ—আমি রাজা। আমার একটা সম্মান আছে। আমাকে সেই ভাবে সম্ভাষণ না করে, অভিশাপ দিয়ে বসলে? বেশ, আমি যদি বিদেহ হই, তাহলে তুমিও বিদেহ হবে।

ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র তেজ। ব্রহ্ম তেজের চেয়ে খুব একটা কম যায় না। বশিষ্ঠের অভিশাপও যেমন ফলল, নিমির অভিশাপও বৃথা গেল না। মারা গেলেন রাজা। ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ আবার নতুন করে দেহ ধারণ করলেন মিত্রাবরুণের পুত্র হয়ে।

তখনো যজ্ঞ চলছে। সুতরাং তেল-গন্ধ মাখিয়ে রাজার দেহকে যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে রাখা হল।

যজ্ঞশেষে যজ্ঞকর্তাকে তাঁর মনের অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয়, তার জন্যে আশীর্বাদ জানাতে হয়। ঋষিরা গেলেন রাজাকে আশীর্বাদ জানাতে। মৃত রাজা। পড়ে আছেন বিছানায়, যেন এই মাত্র মারা গেছেন।

ঋষিরা গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। বললেন—রাজা, তোমার যজ্ঞ শেষ হয়েছে। সার্থক হয়েছে তোমার যজ্ঞ। বল, তোমার কি অভিলাষ?

সকলেই অবাক হয়ে শুনলেন, নিমির নিষ্প্রাণ দেহ যেন কথা বলে উঠল—ঋষিগণ! দেহকে ছেড়ে প্রাণের থাকতে যে কত কষ্ট, তা আমি বেশ অনুভব করলাম। দেহটার ওপর প্রাণের বড় মায়া পড়ে যায়। আমি আর নিজেকে এই কায়ায় জড়াতে চাই না। কিন্তু, আমি থাকতে চাই সকলের চোখের সামনে।

ঋষিরা আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—বেশ, তাই থাকবে।

সেই থেকে আমাদের চোখের পাতার যে ওঠানামা, যাকে আমরা নিমিখ (নিমেষ) বলি, এরই মধ্যে থেকে গেলেন নিমি সকলের চোখের সামনে।

নিমিখের মধ্যে প্রাণ নিয়ে সকলের চোখের সামনেই রাজা নিমি থেকে গেলেন ঠিকই, কিন্তু দেহটা তো আর সজীব নেই যে রাজত্ব করবেন, পুত্রও নেই যে সিংহাসনে বসবেন। ফলে দেশ ভরে গেল অরাজকতায়। রাজা না থাকায় রাজ্য পালন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। মুনিরা সবাই মিলে যুক্তি করে তখন অরণী কাঠ (যে কাঠে কাঠে ঘষলে আগুন হয়) দিয়ে নিমির মৃতদেহটাকে মন্থন করতেই এক পুরুষের উৎপত্তি হল। (যেভাবে বেণ রাজার ডান হাত মন্থন করে জন্ম হয়েছিল পৃথুর।) মৃতদেহ থেকে জন্ম বলে নাম হয় জনক। বি-দেহ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বলে অনেকে আবার বৈদেহ-ও বলতো। যাই হোক, এই নিমি-পুত্র জনকই মিথিলায় রাজ্য স্থাপন করে দেশে আবার শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই থেকে এখানকার সিংহাসনে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরাই পরিচিত হয়েছিলেন জনক-রাজা বলে। রামচন্দ্রের পত্নী সীতা ছিলেন এই বংশেরই, শীরধ্বজ জনকের কন্যা।



পুরুরবার উপাখ্যান

প্রতিষ্ঠানপুর, এখন যার নাম প্রয়াগ, শত শত বছর আগে ঐখানেই রাজত্ব করতেন এক মহা পরাক্রমশালী রাজা—নাম ছিল তাঁর পুরুরবা। শোনা যায়, জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে নবজাতক এমন ভরাট গলায় কেঁদে উঠেছিল যে সকলে চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, একরত্তি একটা শিশুর গলা থেকে এই কান্না বের হল, না কোন মদ্দ জোয়ানের? কিন্তু এখানে তো ঐ ছোট্ট শিশুটি ছাড়া আর কেউ নেই। তাহলে এমন পুরু, ভরাট গলা এই নবজাতকেরই। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল 'পুরুরবা।'

পুরুরবার কাহিনী এক বিচিত্র কাহিনী।

বৈবস্বত মনুর ছেলে ইক্ষ্বাকু হলেন সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আবার তাঁরই মেয়ে ইলা থেকে শুরু চন্দ্রবংশের। আর পুরুরবা হলেন, সেই বংশেরই প্রকৃতপক্ষে প্রথম রাজা।

সূর্যপুত্র মনু একবার সন্তান কামনায় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে ডেকে একটা যজ্ঞ করতে বললেন। বশিষ্ঠদেবও সব কিছু যোগাড় করে ব্রাহ্মণদের নিয়ে নিখুঁত ভাবে করলেন এক মহাযজ্ঞ। ফলে, মনুর হল সর্বসুলক্ষণা এক কন্যা। মনুপত্নীর খুব শখ ছিল একটি

মেয়ের। তাঁর শখ মিটল। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলেন স্বয়ং মনু। তাঁর ইচ্ছে ছিল একটি ছেলের। থাকতে না পেরে মনের দুঃখ মনু জানালেন বশিষ্ঠকে। শুধু ক্ষুণ্ণ নন, একটু ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। বশিষ্ঠদেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—ঠিক আছে, আমি বলছি, আমার শক্তি দিয়ে তোমার মেয়েকে ছেলে করে দেব।

দিলেনও তাই। সুন্দর সুপুরুষ ছেলে। মনুর মনে আর দুঃখ রইল না। ছেলের নাম হল সুদ্যুম্ন। কেউ কেউ আবার বলত—ইল।

সুদ্যুম্ন বা ইল শিকার খুব ভালবাসতেন। হিমালয়ের বনে-জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ইল এমনি মজে গেলেন যে, দেশে ফেরার আর নামটিও করলেন না। সঙ্গী-সাথীদের ফিরিয়ে দিয়ে একাই সেখানে থেকে গেলেন। মনের আনন্দে শিকার করে বেড়াতেন। ইল যেখানে আস্তানা করেছিলেন তারই পাশে এক গুহায় থাকত এক যক্ষ আর যক্ষপত্নী। নিরালা সুখের সংসার তাদের। হঠাৎ কোথা থেকে ইল এখানেই এসে এ কি ঝামেলা জুড়ে দিল ! মনে মনে খুবই বিরক্ত হয়ে যক্ষ একদিন যক্ষপত্নীকে বলল, দেখ, একমাত্র তুমিই এই ঝামেলা হটাতে পার। তুমি কৌশলে ওকে শিকারের লোভ দেখিয়ে কাছেই যে উমাবন রয়েছে, ওখানে নিয়ে যাও। তারপর দেখা যাবে বাছাধন কত বড় শিকারী বা বীর হয়েছে।

উমাবন ভারি রহস্যজনক বন। হর-পার্বতীর নিরালায় বসবাসের জন্য হিমালয়ের এই বনটায় যদি কোন পুরুষ হিংসার মন নিয়ে ঢোকে তো সে ঢোকা মাত্রই স্ত্রী বা নারী হয়ে যাবে। ইল তো আর এসব কিছু জানতেন না। ঘোড়ার পিঠে চেপে হাতে তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করতেই ঢুকছেন। সুতরাং মনে হিংসা রয়েই গেছে। ব্যস, ঢোকামাত্রই ইল হয়ে গেলেন নারী। পুরুষের সেই গর্ব, অহঙ্কার মুহূর্তে লোপ পেল। লজ্জায় মুষড়ে পড়লেন ইল। মনে মনে বারবার স্মরণ করতে লাগলেন কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে।

কিন্তু সেই সময় সেখানে তো আর করার কিছু নেই। যক্ষপত্নীই একমাত্র সহায়।

একদিন নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইলা। তাঁকে দেখলেন তারার পুত্র বুধ। দেখেই ভাল লেগে গেল। সব দিক থেকে অমন সুরূপা দেখতে যে মেয়ে, তাঁকে কার না ভাল লাগবে ? বুধ আগুপিছু না ভেবে তাঁকে বিয়ে করে ফেললেন। ইলাও থেকে গেলেন স্বামীর ঘরে। মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন বহু মনোরম স্থান। কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। এক সময় ইলা হলেন সন্তানসম্ভবা। ভূমিষ্ঠ হল পুরুরবা। মায়ের সব স্নেহ, সব ভালবাসা দিয়ে ইলা বড় করে তুলতে লাগলেন পুরুরবাকে। মনেই নেই যে, তিনি আসলে ছিলেন একজন রাজপুরুষ।

এদিকে ঋষি বশিষ্ঠ করলেন কি, আর কিছু খুঁজে না পেয়ে দেব হরকেই গিয়ে ধরলেন—ঠাকুর, তোমার অভিশাপেই মনুর বংশে এমন এক বিপর্যয় ঘটে গেল। তুমি ছাড়া এর প্রতিকার আর কে করে দেবে বল ? এইভাবে দেব হরকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক স্তব-স্তুতি করলেন। শেষে শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—দেখ বাপু, আমার কথা আমি একেবারে মিথ্যে করে দিতে পারব না। তবে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি যাতে তোমাদের ঐ ইলা এক মাস নারী আর এক মাস পুরুষ হয়ে থাকতে পারবে।

অগত্যা তা-ই সই।

শিবের অনুগ্রহে ইলা আবার পুরুষ সুদ্যুম্ন হয়ে উঠলেন। মনু তাঁকে দিলেন প্রতিষ্ঠানপুর নগর, রাজত্ব করার জন্য। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন তিনি। তবে রাজসভায় বসতেন এক মাস পর পর। শেষে তিনি পুরুরবাকেই সিংহাসনে বসিয়ে বনে চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে পুরুরবা হয়েছিলেন একচ্ছত্র রাজা।

স্বর্গে একবার এক কাণ্ড ঘটেছিল। স্বর্গ অর্থাৎ দেবরাজ্য। সেই রাজ্যের রাজা হলেন ইন্দ্র। সেখানে যা কিছু মনোরম, সব কিছুর ওপর অধিকার একমাত্র ইন্দ্রের, অন্য কোন দেবতার নয়। রাজ্যের অপ্সরা তাঁর মনোরঞ্জন করে চলে। কিন্তু উর্বশীকে না দেখতে পেলেই তাঁর চোখে স্বর্গ অন্ধকার। কেনই বা হবে না ! উর্বশী তো শুধু নারী নন, নারীরত্ন—যেন অপরাজিতা একটি ফুল। নাচ-গান থেকে শুরু করে যত রকম শিক্ষা-দীক্ষা আছে, তাঁর সমতুল আর কেউ ছিল না। আবার দেবরাজ হতে গেলে, তাঁরও এমন সব গুণ থাকা চাই, যা আর পাঁচজন দেবতার মধ্যে থাকবে না। ফলে ইন্দ্রেরও ভাল লেগেছিল উর্বশীকে। আবার উর্বশীরও ভাল লেগেছিল ইন্দ্রকে।

কিন্তু, রেষারেষি আছে সব জায়গায়। আছে দেবতাদের মধ্যেও। মিত্র আর বরুণদেব সহ্য করতে না পেরে উর্বশীকে এমন অভিশাপ দিলেন যে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বাধ্য হলেন উর্বশী স্বর্গলোক ছেড়ে মর্ত্যে এসে সাধারণ নারীর মত



বসবাস করতে। কিন্তু, স্বর্গসুখ কি ভোলা যায় ? না, যে একবার ভোগ করেছে, সে ভুলতে পারে ? ভুলতে পারেন না উর্বশী। ওদিকে দেবরাজ্যে ইন্দ্রের মনেও শান্তি নেই।

মর্ত্যে এসে হঠাৎ একদিন উর্বশীর চোখে পড়লেন পুরুরবা। আবার পুরুরবাও দেখলেন উর্বশীকে। পুরুরবাকে দেখে উর্বশী তো অবাক। মর্ত্যে এমন সুপুরুষ আছে ! পুরুরবার মনেও সেই এক বিস্ময়—এ তো নারী নয়, নারীরত্ন। দুজনেরই দুজনকে ভাল লেগে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীর মনে জাগল ভয়। তিনি দেবরাজ্যের উর্বশী। মর্ত্যের মরণশীল কোন মানুষের সঙ্গে তো তিনি থাকতে পারেন না। অভিশাপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে, তখন এই পুরুরবার মনের অবস্থা কি হবে ! আবার এমন একজন পুরুষ, দেখতে যাকে ঠিক দেবতার মত, যদি তাঁকে পত্নীর মর্যাদা দিতে চায়, ফিরিয়েও দিতে পারবেন না তিনি।

হলও ঠিক তাই। উর্বশীর সাধ্য হল না পুরুরবাকে ফিরিয়ে দেওয়া। বললেন—আপনার ইচ্ছা আমি পূরণ করতে পারি তিনটি শর্তে। আমার খাদ্য হল একমাত্র ঘি। তা ছাড়া আমি আর কিছু খাই না। দুই হল, আমার শোবার ঘরে বিছানার পাশে তিনটে ভেড়া থাকবে, আপনি তাদের সরাতে পারবেন না। তিন হল, আপনাকে আমি যেন কখনো বিবস্ত্র না দেখি।

পুরুরবা তাতেই রাজি। উর্বশীরও আর কিছু বলার নেই। পরম আনন্দে দুজনের কাটতে লাগল দিন। পৃথিবীতে যত মনোরম স্থান আছে, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে এমন হল যে, উর্বশী ভুলেই গেলেন যে, তিনি দেবরাজের উর্বশী, স্বর্গলোকের বাসিন্দা, তাঁর স্থান অমরাবতীতে। ভুলেই গেলেন মর্ত্যের কোন মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘর করা চলে না।

উর্বশী নেই। দেবরাজ ম্রিয়মান। অমরাবতী নিস্তব্ধ। কিন্নর, গন্ধর্বদেরও মন খুব খারাপ। এভাবে তো আর স্বর্গরাজ্য চলতে পারে না। ইতিমধ্যে প্রায় ষাট হাজার বছর চলে গেল। উর্বশী কি স্বর্গ, ইন্দ্র, দেবরাজ্য—এসবের কথা একেবারে ভুলেই গেল ?

ইন্দ্রের পরম বন্ধু হলেন গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু। ইন্দ্রের মলিন মুখ, স্বর্গরাজ্যের এই দুরবস্থা, তাঁর আর সহ্য হল না। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যেভাবেই হোক, উর্বশীকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতেই হবে।

কিভাবে কি কাজ করা হবে, ঠিক করে নিয়ে বিশ্বাবসু তাঁর জনকয়েক বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়ে এক রাতে হাজির হলেন পুরুরবার প্রাসাদে। গভীর রাত। শুয়ে আছেন ঘর অন্ধকার করে পুরুরবা আর উর্বশী।

এই সুযোগ। চুপি চুপি বিশ্বাবসু ঘরে ঢুকে একটা ভেড়াকে নিয়ে আসতে গেলেন। আনার সময় ভেড়াটা উঠল চেঁচিয়ে। চিৎকার করে উঠলেন উর্বশী—কে? কে আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ?

কোথাও কোন সাড়া নেই। ঘুম ভাঙলেও কিন্তু তখনো ঘুমের ঘোর কাটে নি পুরুরবার। জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে উর্বশী ? তুমি অমন আর্তনাদ করে উঠলে কেন ?

সব শুনে বললেন—যোৎ, তুমি স্বপ্ন দেখেছ। এখান থেকে কে চুরি করবে ?

এরই মধ্যে অন্ধকারে বিশ্বাবসু আবার এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আর একটি মেষকে। সেটিও চিৎকার করে উঠতেই উর্বশী আবার আর্তনাদ করে উঠলেন—এ কি ! আমার আর একটি ছেলেকে যে চোরে নিয়ে যায় ! এমন কি এখানে কেউ নেই, যে চোরের হাত থেকে আমার ছেলেকে বাঁচায়।

এবার তো আর পুরুরবা স্বপ্ন বলতে পারবেন না। সব কিছু নিজের কানেই শুনেছেন। তিনি ঘরে থাকতে, তাঁর শোবার ঘরে চোর ঢুকে চুরি করবে, আর উর্বশীকে তার জন্যে বিলাপ করতে হবে ? কিন্তু এই বিবস্ত্র অবস্থায় বিছানা ছেড়ে উঠবেন, আর যদি উর্বশী দেখে ফেলেন, তাহলে যে আরেক সর্বনাশ। কিন্তু উর্বশীর কান্না আর সহ্য করতে পারলেন না পুরুরবা। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তাঁর উলঙ্গ শরীর নজরে পড়বে না উর্বশীর। তিনি উঠতে পারলে যত অন্ধকারই হোক, চোরের সাধ্য কি, এখান থেকে চুরি করে পালায় ?

ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বিছানা ছেড়ে উঠলেন পুরুরবা। বিশ্বাবসুর নির্দেশে গন্ধর্বরা ছিল এই সুযোগেরই অপেক্ষায়। গন্ধর্বদের নিয়ে আসা ওষধিলতায় ঘর ভরে গেল আলোয়। কাজ হাসিল। উর্বশীর কাছে পুরুরবার শর্ত ভঙ্গ হল। মুখ ফিরিয়ে আবার স্বর্গে চলে গেলেন উর্বশী। মেষদুটিকে ছেড়ে দিয়ে গন্ধর্বরাও গা ঢাকা দিল।

উর্বশী নেই। এই ছিল, আর নেই। কোথায় গেলেন ?

রাজ-কার্য গেল, আহার গেল, নিদ্রা গেল—পাগলের মত চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন উর্বশীকে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হলেন অম্ভোজ-সরোবরে। দেখলেন, অনেকগুলি মেয়ে সরোবরের জল তোলপাড় করে স্নান করছে। তারই মধ্যে হঠাৎ পুরুরবা দেখলেন উর্বশীকে। সখীদের নিয়ে সেদিন সত্যিই উর্বশী এসেছিলেন সেখানে।

কোনদিকে না তাকিয়ে পুরুরবা সোজা উর্বশীর কাছে গিয়ে রাখলেন অনুযোগের পর অনুযোগ। অমন যে সুদর্শন, সুপুরুষ পুরুরবা, তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে উর্বশীরও মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। বললেন—এখন ফিরে যাও, পুরুরবা। আবার এক বছর পর তোমার সঙ্গে আমার এখানে দেখা হবে। আমি যে আর তোমার সঙ্গে থাকতে পারবো না।

এক বছর পর আবার পুরুরবা এসেছেন অম্ভোজ সরোবরের তীরে। এসেছেন উর্বশীও। পুরুরবার হাতে ফুটফুটে একটি শিশুকে তুলে দিয়ে উর্বশী বললেন, এই নাও তোমার সন্তান। একে যত্ন কোরো। এর নাম আয়ু। তোমাকে আমি আরও পাঁচটি সন্তান দেব।

—তুমি ?

—মর্ত্যলোকে তোমার সঙ্গে আর আমার থাকা চলে না যে। গন্ধর্বরা আমার আপনজন। এরা এসেছে তোমার অভিলাষ পূরণ করতে। মনে কোন সঙ্কোচ না রেখে তোমার কি বাসনা, এদের কাছে জানাও।

পুরুরবা বললেন—আমার তো কোন কিছুরই অভাব নেই। রাজ্য, রাজৈশ্বর্য, সম্মান, প্রতিপত্তি—কি নেই আমার ? কি চাইব ? চাইবার মধ্যে শুধু একটাই—উর্বশী। উর্বশী ছাড়া এসবের কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। গন্ধর্বরা, তোমরা কি আমার সে ইচ্ছা

পূরণ করতে পারে ?

গন্ধর্বরা বললেন—দেখুন, উর্বশীকে তো আমরা এখানে রেখে যেতে পারব না রাজা। তবে উর্বশী আপনার সঙ্গে সব সময় থেকে যে আনন্দ আপনাকে দিত সেই আনন্দ যাতে পান তার একটা ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি।

এই বলে তারা পুরুরবাকে দিল একটা অগ্নিস্থালী (আগুন জ্বালাবার পাত্র)। বলল—আপনি যেন উর্বশীর সঙ্গেই আছেন মনে করে ঈশ্বর চিন্তা করে এই অগ্নির পূজা করবেন তিনবার, তাহলেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

অগ্নিস্থালী নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুরুরবা ফিরলেন নিজ রাজ্যের দিকে। কিছুটা এসেই পড়ল এক বন। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পুরুরবার মনে হল—ছিঃ ছিঃ, আমি কি বোকা। উর্বশীকে সঙ্গে না নিয়ে শুধু থালি নিয়েই চলে এলাম ? এই ভেবে থালিটাকে বনের মধ্যে রেখেই দুঃখে চলে এলেন প্রাসাদে।

মাঝ রাত। চোখে ঘুম নেই পেরুরবার। হঠাৎ গন্ধর্বদের কথাগুলো মাথার ভেতর পাক খেয়ে উঠতেই বিছানা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটলেন সেই বনের ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে ফেলে রেখে এসেছিলেন থালিটা। গিয়ে দেখলেন থালি নেই। তার জায়গায় রয়েছে একটা শমী গাছ (শাঁই বাবলা)। আর সেই গাছের ভেতর দিয়ে ওপর দিকে উঠে এসেছে এক অশ্বত্থ।

পুরুরবা মনের মধ্যে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখে সেই অশ্বত্থকেই নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে। তা থেকেই কাঠ তৈরি করে, কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বেলে তিনবার করে নিষ্ঠার সঙ্গে হোম করে চললেন। যতক্ষণ হোম করেন, ততক্ষণ উপভোগ করেন যেন উর্বশী রয়েছে তাঁরই সঙ্গে। ফলে তাঁর মনে যত ব্যথা, যত দুঃখ ছিল, তার আর কণামাত্রও রইল না।

এইভাবে অগ্নিকে তিন ভাগে ভাগ করে নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞ করতে করতে পুরুরবা একদিন চলে গেলেন গন্ধর্বলোকে।

[পুরুরবা আর উর্বশীর এই উপাখ্যান শুধু পুরাণে নয়, আছে আমাদের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে। উর্বশীর অর্থ হল—উষা, আর পুরুরবার অর্থ হল—সূর্য। এই উপাখ্যান উষা আর সূর্যকে নিয়ে। সূর্য ওঠার আগে উষা। কিন্তু সূর্য উঠলে কি উষা থাকে ?]



মহাতাপস ধ্রুব

কয়েক কোটি বছর আগেকার কথা।

স্বায়ম্ভুব মনুর ছোট ছেলে উত্তানপাদ তখন পৃথিবীর রাজা। তাঁর সুশাসনে পৃথিবী ছিল তখন সমৃদ্ধ। তাঁর ছিলেন দুই রানী—সুনীতি আর সুরুচি। দুজনেই রাজমহিষী। তবুও রাজার কাছে সুরুচির ছিল যত আদর, যত্ন আর খাতির, তার এক কণাও সুনীতির ভাগ্যে ছিল না। সুনীতির ছেলে ধ্রুব, আর সুরুচির ছেলের নাম উত্তম।

ছোট্ট ছেলে ধ্রুব একদিন দেখল, সিংহাসনে বসে তার বাবা। আর বাবার কোলে বসে উত্তম খুব আদর খাচ্ছে। পাশে বসে বিমাতা সুরুচি। তাই দেখে ধ্রুবেরও খুব ইচ্ছে হল, বাবার কোলে চেপে অমন আদর খেতে। এগিয়ে গেল বাবার দিকে, কিন্তু রাজা উত্তানপাদ যেন তাকে দেখেও দেখলেন না। তার ওপর আবার তিরস্কার করে উঠলেন সুরুচি। বললেন—ধ্রুব, বাবার কোলে সিংহাসনে বসার ইচ্ছে হল কেন তোমার ? সিংহাসনে বসতে গেলে সে-রকম ভাগ্য করতে হয়। তুমি ছেলেমানুষ, কি করে বুঝবে, সে ভাগ্য তুমি কর নি। তা যদি করতে, তাহলে অভাগী সুনীতির ছেলে না হয়ে, আমার ছেলে হতে।

চার-পাঁচ বছরের ছেলে হলেও ধ্রুব কিন্তু সুরুচি যে কি বললেন, তা সবই বুঝতে পারল। ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম, ক্ষত্রিয়ের তেজই আলাদা। মনের ভেতর দপ্ করে জ্বলে উঠল তার দারুণ রাগ। কিন্তু, কাকে আর সে রাগ দেখাবে। নিজের ভেতরেই চেপে রাখতে রাখতে ফুঁপিয়ে উঠল। লাল হয়ে উঠল চোখ-মুখ, ঘন ঘন শ্বাস বইতে শুরু করল। তবুও দেখল, বাবা একটি কথাও বললেন না।

রাগে-দুঃখে-অপমানে ধ্রুব তখন সোজা সেখান থেকে চলে এল তার মায়ের কাছে। তখনো ফুলে-ফুলে উঠছে বুক, কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঠোঁট, লাল হয়ে উঠেছে চোখদুটো। দেখেই মায়ের বুক দুরদুর করে উঠল। বুকের কাছে টেনে নিয়ে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুনীতি—কি হয়েছে বাবা ? কে তোমায় কি বলেছে?

শুনে খুবই দুঃখ হয়েছিল সুনীতির। তবুও নিজের কষ্ট নিজের মধ্যেই চেপে রেখে বললেন—বাছা, এ সবই ভাগ্য। পূর্বজন্মের ফল। আগের জন্মে আমাদের চেয়ে ওদের তপস্যা নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছিল। এ জন্মে ওরা তারই ফলভোগ করছে। তার জন্যে রাগ বা দুঃখ করে কি হবে, বাবা। তুমিও যদি তপস্যা কর তাহলে ফল পাবে।

মন দিয়ে মায়ের কথাগুলো শুনে ধ্রুব প্রতিজ্ঞা করে বসল—মা, তপস্যা করলে যদি সবার সেরা ফল পাওয়া যায়, তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি যদি মনুবংশের রাজা উত্তানপাদের ছেলে হই, তপস্যা করে এমন পদ আমি লাভ করব, যা আমার পিতা-পিতামহ কখনো পান নি।

এই বলে মাকে প্রণাম করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল ধ্রুব। কোথায় যাবে, কার তপস্যা করবে—কিছুই জানে না বালক, তবুও বেরিয়ে পড়ল তপস্যা করতে। মনুবংশের জেদ, ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা।

রাজার ছেলে। রাজপ্রাসাদের বাইরে কতটুকুই বা তার জানা। তবুও নিঃসঙ্কোচে চলল পথ ধরে। কোথায় যাচ্ছে বা কোথায় যাবে, কিছুই জানে না। যেতে যেতে ধ্রুব এল এক বনে। বনের পথ ধরে কিছুটা যেতেই দেখল এক জায়গায় হরিণের ছালের ওপর বসে জটাজুটধারী সাতজন ঋষি। এঁরা হলেন ব্রহ্মার সাত ছেলে—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু আর বশিষ্ঠ।

ধ্রুব তো আর এঁদের চেনে না। তবুও ঋষি দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসল তাঁদের সামনে।

মুখ তুলে তাকালেন তাঁরা ধ্রুবর দিকে।

তারপর বললেন—দেখে তো মনে হচ্ছে বাপু, তুমি রাজার ছেলে। তা এত অল্প বয়সে বিরক্ত হয়ে মা-বাবাকে ছেড়ে এ পথে কোথায় চলেছ ?

ধ্রুব ঋষিদের সব কথা খুলে বলল।

সবই জানেন ঋষিরা। বিশ্ব-সংসারে কোথায় কি ঘটছে কিছুই অজানা নেই তাঁদের। তবুও, জিজ্ঞেস করে ধ্রুবকে একবার বাজিয়ে দেখলেন। দেখলেন, অভিমানে গজগজ করছে ছেলের মন। আরও দেখলেন, ঐটুকু ছেলে হলে কি হবে, প্রতিজ্ঞায় অটল।

সকলের কাছেই আবেদন রাখল ধ্রুব—কোথায় গিয়ে কার তপস্যা করলে আমার অভীষ্ট ফল আমি লাভ করব।

ঋষিরা বললেন, দেখ বাছা, যমুনার ধারে একটা খুব ভাল জায়গা আছে। তার নাম মধুবন। ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় জায়গা সেটা। সেখানে গিয়ে তুমি যদি সেই ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা করতে পার, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট লাভ হবে। তুমি যা চাও একমাত্র তিনিই দিতে পারেন—অবশ্য তুমি যদি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পার।

ধ্রুবর মনে জাগে প্রশ্ন—ভগবান বিষ্ণু ! তাঁকে দেখতে কেমন ? আর কিভাবেই বা তাঁর আরাধনা করব ?

ঋষিরা বললেন—তাঁকে দেখতে ? কচি ঘাসের মত শ্যামল তাঁর গায়ের রঙ, টানা টানা দুটি চোখ আর ঠোঁটে গোলাপের আভা, হাসি হাসি মুখ, গলায় বনমালা, পরনে পীতবসন, মাথায় মণি, কানে কুণ্ডল, হাতে বাজু, গলায় কৌস্তুভমণি, পায়ে সোনার নূপুর, চারটে হাতে তাঁর শঙ্খ-চক্র-গদা আর পদ্ম। দেখলে চোখ যায় জুড়িয়ে, আর মনও আনন্দে ভরে ওঠে।

আকুল হয়ে ওঠে ধ্রুবর মন। কি ভাবে তাঁর আরাধনা করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

ঋষিরা বললেন—বাপু, সে বড় কঠিন সাধনা। বাইরের সব কিছু ভুলে যেতে হবে। মনকে ঐদিকে একাগ্র করতে হবে যাতে মন কোন রকমেই চঞ্চল হয়ে না ওঠে। চলতে-ফিরতে-শুতে-বসতে সব সময়ই তাঁর নামগান করতে হবে। আর অনবরত জপ করতে হবে 'হিরণ্যগর্ভ পুরুষপ্রধানব্যক্তরূপিণে। ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপিণে॥'—তার মানে হল, ব্রহ্মা তুমি প্রধান পুরুষ—অব্যক্ত আকার। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, তুমি বাসুদেব, তোমায় নমস্কার। আবার এতটা না পারলে এটুকুও বলতে পার—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—যার মানে হল, হে ভগবান বাসুদেব, তোমায় নমস্কার। সব সময় মনে মনে ভাবতে হবে এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, মানুষ থেকে শুরু করে পশু পাখি গাছপালা কীট পতঙ্গ, সবাই সমান। তুমিও যে, তারাও সে। তোমার মধ্যে যিনি আছেন তাদের মধ্যেও তিনি আছেন। যেদিন সেই জ্ঞান হবে, সেদিন ভগবান বিষ্ণু তোমায় চোখের সামনে দেখা দেবেন। আর তাঁর কাছ থেকে তখন তুমি যা চাইবে তাই পাবে। তোমার ঠাকুর্দা স্বায়ম্ভুব তো এই ভাবে আরাধনা করেই মনু হয়েছিলেন। পৃথিবীর সকলের মান্য হয়েছিলেন।

অজানা পথ, তার ওপর অন্ধকার। কোথায় খানাখন্দ আছে, তাই একটু ভয়ে ভয়ে, আস্তে আস্তে চলতে হয়। কিন্তু কেউ যদি আলো ধরে পথটা দেখিয়ে দেয়, তখন কি আর ভয় থাকে, না সংশয় থাকে ? ঋষিদের উপদেশ শুনে ধ্রুবরও হল ঠিক তাই। ধ্রুব এবার পথ দেখতে পেয়েছে, আর তাকে ঠেকায় কে ? সোজা চলে এল ঋষিদের বলে দেওয়া সেই মধুবনে, এখন যার নাম মথুরা। যমুনার ধারে বসে শুরু করে দিল তপস্যা—ঋষিদের বলে দেওয়া সেই মন্ত্র জপ আর সেই রূপের ধ্যান।

কত মানুষ নিত্য যাওয়া আসা করে সেখান দিয়ে। দেখে, চোখ বুজে ধ্রুব ধ্যান করছে—নিশ্চল। দেখে অবাক হয়, ভাবে—আহা ! এতটুকু একটা দুধের ছেলে। কাদের ছেলে কে জানে ?

কোন দিকে আর দৃকপাত নেই ধ্রুবর। প্রথম দুদিন কাটাল শুধু যমুনায় স্নান আর কিছু না খেয়ে ভগবানের নাম জপ করতে করতে। তৃতীয় দিন থেকে একমাস কাটাল শুধু কদবেল আর কুল খেয়ে ভগবানের ধ্যানে। তার পরের মাস পাঁচদিন বাদ বাদ শুকনো ঘাস আর পাতা খেয়ে এক মনে বাসুদেবকে ধ্যান করে কাটাল। দু মাস কাটল। পরের মাস থেকে শুরু করল প্রতি ন দিনে একবার করে মাত্র জল খেয়ে। এভাবে চোদ্দ দিন কাটিয়ে সব খাওয়া ছেড়ে শ্বাসরোধ করে ধ্রুবর শুরু হল কঠিনতম তপস্যা।

এভাবে পাঁচ মাস কেটে গেল। বাইরের কোন শব্দ, কোন কোলাহলই তার কানে এখন আর বিন্দুমাত্র ঢোকে না। উঠে দাঁড়ায় ধ্রুব। কখনো বাঁ পায়ের ওপর, কখনো বা ডান পায়ের ওপর ভর রেখে, চোখ বুজে একমনে ডাকে—বাসুদেব, বাসুদেব ! মানুষজন দেখে, যেন একটা কাঠের পুতুল, শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে না, অথচ মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে। অবাক হয় দেখে, ঐটুকু ছেলের কি অসাধারণ ক্ষমতা ! এ কি তপস্যা রে বাবা ! এমন তো কখনো দেখি নি !

ওদিকে দেবরাজ্যের রাজা ইন্দ্রের মনেও সেই এক অবস্থা। তিনি ভাবতে শুরু করলেন—এ আবার কি ? প্রাসাদ ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে ধ্রুব আবার তপস্যা আরম্ভ করল কেন ? আর এমন তপস্যা তো কাউকে কখনো করতে দেখি নি। তা-ও আবার মথুরায়, যেটা ভগবান বিষ্ণুর প্রিয় স্থান। ধ্রুব কি পৃথিবীর রাজা হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না ? স্বর্গরাজ্য চায় নাকি? যে ভাবেই হোক, ধ্রুবর এই তপস্যা ভাঙতেই হবে। নইলে সর্বনাশ নিশ্চিত।

ইন্দ্র ডাকলেন লোকপাল দেবতাদের। যুক্তি পরামর্শ করে একটা উপায় তো ঠিক করতে হবে। সবাই এসে হাজির হলেন দেবরাজের সভায়। সব শুনে তাঁদেরও মনে ঢুকে গেল ভয়—কাকে সরিয়ে ভগবান ধ্রুবকে শেষে তাঁর জায়গায় বসিয়ে দেবেন, কে জানে ? সকলেই একমত—ধ্রুবর তপস্যা ভাঙতেই হবে।

দেবরাজের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হল—কাম আর ক্রোধ। দারুণ শক্তিশালী এই দুই অনুচর। এদের অসাধ্য কিছুই নেই। প্রথমে ঠিক হল, এদেরই পাঠানো হবে। তারপর ঠিক করলেন—না, ছেলেমানুষ হলে কি হবে, যেভাবে ধ্রুব ইতিমধ্যে নিজের মনকে সংযত করেছে, তাতে এরা গিয়ে কিছু করতে পারবে না। তাহলে ? আর দুটো পথ আছে। ধ্রুব খুবই মাতৃভক্ত। ওর মায়ের বেশে কাউকে পাঠিয়ে ওর মন টলানো যেতে পারে। নয়তো শেষ অস্ত্র ভয়। দেবরাজের যেসব বিকট বিকট অনুচর আছে তাদের দেখে ভয় পাবে না এমন বীরপুরুষ তো কাউকে দেখা যায় না।

শেষে ঠিক হল, তাই হোক।

দেবরাজ তখন তাঁর এক সুনিপুণা পিশাচীকে ডেকে বলে দিলেন কি করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পিশাচী চলে গেল মথুরায় সুনীতির ছদ্মবেশে। হাজির হল যেখানে ধ্রুব একপায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যান করছে



সেখানে। গিয়েই ভেঙে পড়ল আকুল কান্নায়—বাছা! এ কি দশা হয়েছে তোর? তুইও চলে এলি, আমারও চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কত জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে তোর দেখা পেলুম। বাছা, এই কচি বয়সে এমন কঠোর তপস্যা কি তোর সাজে? বাছা, ফিরে চ'। আমি তোর মা···চেয়ে দেখ···আমি তোর মা এসেছি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাছা, ফিরে চল।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। নিশ্চল ধ্রুব যেন পাথর। কোন কথাই যেন কানে ঢোকে নি, এমনি তন্ময়।

পিশাচীর চেষ্টা ব্যর্থ হল দেখে ইন্দ্র এবার পাঠালেন তার পিশাচ অনুচরদের। ভূত-প্রেত-পিশাচ যে যেখান ছিল, সবাই ধরল বিকটাকার, বীভৎস মূর্তি। এক একটা মুখ দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে উঠবে। ছুটে আসতে লাগল তারা মধুবনের দিকে মার···মার, কাট···কাট করতে করতে।

—ধ্রুব, পালাও··· পালাও। আর এখানে থেকো না। তোমাকে বাঁচানো যাবে না—বলতে বলতে পালাল পিশাচী।

দুর্জয় পিশাচদের চীৎকারে কেঁপে উঠল মধুবন। কিন্তু এতটুকু কাঁপল না ধ্রুবর মন। যেমন পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে বাসুদেবের ধ্যানে মগ্ন ছিল সে, তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। পিশাচরা অত করেও যখন একটুও টলাতে পারল না ধ্রুবকে, তখন দেবতারা আর স্থির থাকতে পারলেন না। সবাই মিলে ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। জানতে হবে, দেবলোকের কোন পদের জন্য ধ্রুব এমন কঠোর তপস্যা করছে।

দেবতাদের অত ভয় দেখে খুব এক চোট হেসে নিলেন ব্রহ্মা। তারপর বললেন—তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। ধ্রুবর তপস্যা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। এটা কেন বুঝলে না যে ধ্রুব যাঁর তপস্যা করছে তিনি ভগবান বিষ্ণু। যারা বিষ্ণুর ভক্ত, নারায়ণের ভক্ত, যারা বাসুদেব ছাড়া আর কিছু জানে না, তারা কারো কখনো অনিষ্ট চায় না।

ব্রহ্মা যখন অভয় দিয়েছেন, তখন আর ভয়ের কিছু নেই। তাই দেবতারাও এবার নিশ্চিন্ত মনেই ফিরে গেলেন।

এদিকে ধ্রুবর তপস্যার কালও শেষ হয়ে এলে।

ঋষিরা বিষ্ণুর যে রূপের বর্ণনা দিয়েছিলেন ধ্রুব নিজের ভেতরেই দেখতে শুরু করল সেই রূপ, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতে লাগল। একদিন এইরকম দেখতে দেখতে ধ্রুব যেই চোখ খুলেছে, সামনেই দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সেই তিনি। আনন্দে, আবেগে তার দু চোখ দিয়ে নেমে এল জলের ধারা। মুখ দিয়ে বের করতে পারল না একটা শব্দ। ভগবান তাঁর হাতের শাঁখটি ধ্রুবর গলায় ছুঁইয়ে দিতেই বালক ধ্রুব সুললিত কণ্ঠে সুমধুর বচনে স্তব করল তাঁর। তারপর বলল—আপনার দর্শন যখন পেয়েছি, তখন আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ ধ্রুব। তবু, তোমার মনের অভিলাষ কি, তা বল। আমি পূরণ করব।

ধ্রুব বলল—সকলের অন্তরে আপনি। আপনি অন্তর্যামী। আপনার অজানা তো কিছু নেই।

—ধ্রুব! বললেন ভগবান—তুমি যে সর্বোচ্চপদের অভিলাষ নিয়ে এই তপস্যা করেছ, সেই পদই তুমি পাবে। এত বড় তপস্যা যার, সে পদ তো তারই। তুমি হবে ধ্রুবলোকের অধিপতি। ঐ জগৎ আগে ছিল আমারই, এখন থেকে তোমার। সূর্য থেকে শুরু করে নটা গ্রহ ছাড়া আরও যেসব গ্রহ-নক্ষত্র-তারা, যাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে উত্তর আকাশে, সেই ধ্রুবজগতে গিয়ে তুমি সব কিছু এক কল্প (৪৩২ কোটি বছর) কাল পরিচালনা করবে। এখন ফিরে গিয়ে তোমার এখানকার কাজ শেষ কর। বলেই, সেই অপরূপ মূর্তি কোথায় যে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল, ধ্রুব আর দেখতে পেল না।

ধ্রুব উদ্যোগ নিল ঘরে ফেরার।

এদিকে রাজা উত্তানপাদের মনে এতটুকুও শান্তি ছিল না। ছেলে চলে গেল, অথচ রানী সুরুচির জন্য তাকে একটু আদর করা দূরের কথা, একটি কথাও বলতে পারেন নি, এ কি কম কষ্ট! যখন তাঁর মনের এমন অবস্থা, দেবর্ষি নারদ এসে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে—কিছু ভেবো না রাজা, তোমার ছেলে কঠোর তপস্যায় তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করে আবার ফিরে আসবে।

দেবর্ষির কথা মিথ্যা হয় না। তবু তো বাবার মন···সুরুচিও এতদিনে বুঝতে পারেন ধ্রুবকে কুবাক্য বলে কাজটা তিনি ভাল করেন নি। আর, জননী সুনীতির কথা আলাদা।

ঠিক এমনি সময় খবর এল, ফিরে আসছে ধ্রুব। রাজপ্রাসাদে আনন্দের জোয়ার। আহা! বাছার এতদিন কত কষ্টই না গেছে! ছেলেকে তাই যত্নের সঙ্গে আনার জন্য হাঁক-ডাক পড়ে গেল। সাজানো হল ঘোড়া। এক রথে স্বয়ং রাজা, সঙ্গে উত্তম। আর এক

রথে দুই রানী, সঙ্গে সুন্দরভাবে সাজানো একটা হাতি নিয়ে রাজা চললেন ছেলেকে আনতে।

সে কি আনন্দ ধ্রুবর। প্রণাম জানাল বাবাকে, দুই মাকে। বুকে জড়িয়ে ধরল ভাই উত্তমকে। তার পর সকলে ফিরে এল প্রাসাদে। হাতির পিঠে ধ্রুব যখন ঢুকল নগরে, তখন সকলের সে কি উল্লাস!

তারপর যখন দেহে-মনে পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠল ধ্রুব, মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা উত্তানপাদ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে সুলক্ষণা মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে চলে গেলেন বনে তপস্যা করতে। ভাই উত্তম কিন্তু বিয়ে-থা করল না।

একদিন মৃগয়া করতে বনে গিয়ে উত্তম আর ফিরল না। ছেলে ফিরল না দেখে মা সুরুচি গেলেন ছেলের সন্ধানে। তিনি ফিরলেন না। খবর এল, কোন এক যক্ষ ভাই উত্তমকে মেরেছে, আবার মাকেও মেরেছে। শুনেই ধ্রুব নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। যক্ষদের এত বড় ঔদ্ধত্য!

হিমালয়ের যেখানে থাকত যক্ষরা, ধ্রুব তা জানত। রথ নিয়ে সোজা সেখানে গিয়ে এত জোরে শঙ্খধ্বনি করল যে, গোপন জায়গা থেকে যক্ষরা হুড়মুড় করে সব বেরিয়ে আসতে লাগল। ধ্রুবও তীর ছুঁড়ে একে একে তাদের সব যমালয়ে পাঠাতে লাগল। রুখে দাঁড়াল এবার বেশ কিছু যক্ষ। ছুঁড়ল বাণ। কিন্তু কিছুই করতে পারল না ধ্রুবর। নিজেরাই প্রাণ দিল।

এরপর আর কি স্থির থাকতে পারে যক্ষরা! যক্ষসেনা নানা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে একযোগে আক্রমণ করল ধ্রুবকে। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, কোথায় যেন হারিয়ে গেল ধ্রুব—মেঘের আড়ালে যেমন সূর্য ঢেকে যায়, সেইরকম। পর মুহূর্তেই আপন তেজে ক্ষত্রিয় বীর ধ্রুবকে আবার দেখা গেল, তখন চতুর্দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে অগণিত যক্ষ সেনা। অনেকে তখন প্রাণভয়ে পালাতে ব্যস্ত।

ধ্রুব জানত, যক্ষ-রাক্ষসরা বড় মায়াবী। ওরা যে কখন কোন্ চাতুরী খেলে তা সহজে বোঝাও যায় না। সুতরাং ক্রুদ্ধ হাতির মতই রথে চেপে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা শেষ পর্যন্ত কি করে তা দেখার জন্য। ঠিক তাই-ই হল। হঠাৎ কোথা থেকে পাল পাল হাতি, সিংহ, বাঘ তার দিকে ছুটে আসতে লাগল লাল চোখ নিয়ে। আকাশ থেকে শুরু হল রক্ত, পুঁজ, যত মাংসের কুচির বৃষ্টি। যেন সে এক তাণ্ডব ব্যাপার। ধ্রুব এবার তুলে নিল শেষ অমোঘ অস্ত্র—নারায়ণাস্ত্র। যক্ষকুলে উঠল ত্রাহি ত্রাহি রব। আর বুঝি প্রাণ নিয়ে পালানো সম্ভব নয়। যক্ষকুল প্রায় নির্মূল হয় হয় অবস্থা, এমন সময় ধ্রুবর সামনে এসে তাকে বাধা দিয়ে দাঁড়ালেন তার ঠাকুর্দা স্বয়ং স্বায়ম্ভুব।

—ধ্রুব। ছি ছি! ভীষণভাবে তাকে তিরস্কার করে বললেন স্বায়ম্ভুব—এতদিন জপ-তপ করে শেষে তুমি আমার বংশে চুনকালি মাখাতে বসলে?

—কেন ঠাকুর্দা? আমি তো অন্যায় কাজ করি নি। আমার ভাই, মাকে যারা অযথা মারে যদি রাজা হয়ে আমি শাস্তি না দিই, সেটাই তো অন্যায় করা হবে।

ধ্রুব, মেরেছে একজন যক্ষ। তার জন্যে এতগুলি যক্ষ কি অপরাধ করল যে তুমি তাদের মারলে? তুমি এত বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছ যে, এতগুলি নিরপরাধ প্রাণকে বধ করতে তোমার বিবেকে একটুও বাজল না? ধ্রুব, জেনে রাখ, রাগ বড় সর্বনাশা। একে দমন করে না রাখতে পারলে যে ক্ষতি হবে, কোন কিছু দিয়ে তা কোনদিনই পূরণ করা যাবে না। তুমি না বিষ্ণুভক্ত!

সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব যেন এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল মনে। সত্যিই এমনভাবে প্রাণ সংহার করা তার উচিত হয় নি। উপদেশ দিয়ে চলে গেছেন ঠাকুর্দা। ধ্রুবও ফিরে সোজা চলে গেল বদরিকাশ্রমে। আবার সেখানে দীর্ঘকাল তপস্যা। তার মন আবার হল প্রশান্ত। দেখতে শুরু করল সবার মাঝে সেই ভগবান বিষ্ণুকে। এরপর ছত্রিশ হাজার বছর রাজত্ব করে একদিন ধ্রুব সশরীরে চলে গেল ভগবানের দেওয়া সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জগতে—ধ্রুবলোকে।

সেই থেকে উত্তর আকাশে, যাকে আমরা বলি ধ্রুব-নক্ষত্র, যাকে দেখে আগে অকূল সমুদ্রে নাবিকরা দিক ঠিক করত, সেই ধ্রুবলোকে আজও বাস করছে মহাতাপস ধ্রুব—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর ওপর অসীম আধিপত্য নিয়ে।



জড়ভরতের উপাখ্যান

কোটি কোটি বছর আগের কথা। তখন স্বায়ম্ভুব মনুর কাল। রাজা প্রিয়ব্রতের বংশধররা তখন এই পৃথিবীর অধিপতি।

তখন পৃথিবী বলতে ছিল সাতটা দ্বীপ আর সাতটা সমুদ্র। দ্বীপগুলো হল—জম্বু দ্বীপ, প্লক্ষ দ্বীপ, শাল্মলী দ্বীপ, কুশ দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, শাক দ্বীপ আর পুষ্কর দ্বীপ। আর এর চারিদিকে সাতটা সমুদ্র হল—লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, ঘৃত সমুদ্র, দধি সমুদ্র আর জল সমুদ্র।

[প্রাচীন পৃথিবীর এই সাতটি দ্বীপের বর্তমান নাম হল যথাক্রমে এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, আন্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি অঞ্চল এবং অস্ট্রেলিয়া, ওশিয়ানিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা। আবার কারো কারো মতে ভারতবর্ষ, এশিয়ার উত্তর, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আড্রিয়াটিক ও বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি অঞ্চল, ভারতের পশ্চিম সীমান্ত এবং কাস্পিয়ান ও পারস্য সাগরের সন্নিহিত অঞ্চল, জার্মানি, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর আয়ারল্যাণ্ড। রাজা প্রিয়ব্রত তাঁর সাত ছেলেকে এই সাতটি রাজ্যের রাজা করে দিয়েছিলেন। অগ্নীধ্র ছিলেন প্রিয়ব্রতর বড় ছেলে। তাঁকে দিয়েছিলেন জম্বু দ্বীপ। অগ্নীধ্র আবার তাঁর রাজত্বকে সাতটি বর্ষে (প্রদেশে) ভাগ করেছিলেন। তার মধ্যে একটা ছিল হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চল—যার বিস্তার ছিল ন যোজন। এঁর শাসনভার তিনি দিয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে ঋষভদেবের ওপর।]

সবার সেরা জম্বু দ্বীপের মধ্যে হিমালয়ের দক্ষিণে শস্যশ্যামল সেই বিশাল প্রদেশের রাজসিংহাসনে একদিন বসলেন ভরত। ইনি

ছিলেন ঐ প্রিয়ব্রত-বংশেরই ধার্মিক রাজাধিরাজ ঋষভদেবেরই মহারাজাধিরাজ ছেলে।

মহারাজাধিরাজ ছিলেন বটে ভরত। যেমন জ্ঞানে-গুণে, তেমনি আচারে-আচরণে, আবার প্রজা পালনে—সকলের কাছেই যেন একেবারে আপনজন। অজনাভ নামে সেই প্রদেশে তাঁর রাজত্বকালে কেউ জানত না চোরের ভয়, কেউ জানত না দুর্ভিক্ষ, এমন কি রোগ শোক কাকে বলে। তাই তো একদিন সবাই মিলে অজনাভ দেশের নামটাই দিল বদলে। রাখল সবার প্রিয় রাজা ভরতের নামে—ভারতবর্ষ।

সে সময়ে মানুষের পরমায়ুও ছিল যেমন অনেক, তেমনি সত্যবাদী, ন্যায়বান আর ধার্মিক ছিলেন বলে দেখতেও পেতেন অনেক অনেক দূর পর্যন্ত। একদিন ধ্যানে বসে দেখলেন তাঁর পরমায়ু অনেক। থাকতে হবে এই পৃথিবীতে তাঁকে আরও বহুকাল। ইতিমধ্যে এক হাজার অযুত বছর রাজত্ব করা হয়ে গেল। তাই ঠিক করলেন, আর রাজ্য-রাজত্বের দরকার নেই। যাতে তাড়াতাড়ি সব কিছু থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করাই ভাল। সুতরাং ছেলের হাতে রাজ্যভার দিয়ে, সব ভোগ সুখ ত্যাগ করে ভরত চলে গেলেন শালগ্রামে।

ভগবান ব্রহ্মা যে পাঁচজনকে পৃথিবীকে সবদিক থেকে সুন্দর করে তোলার জন্যে ভার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন ঋষি পুলহ। তিনি এই শালগ্রামে এসে মনোরম এক আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। হরিক্ষেত্র—বাসুদেবের ধ্যান-ধারণা করার উপযুক্ত জায়গা। চারদিক ঘিরে কুলকুল করে বয়ে চলেছে গণ্ডকী নদী। উঁচু তার পাড়। মাঝখানে তপোবন। দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আশ্রমে থাকা তো দূরের কথা!

রাজা ভরত রাজ্যপাট ছেড়ে সোজা চলে এলেন সেই আশ্রমে। একেবারে এক সন্ন্যাসী। গণ্ডকীর জলে স্নান আর বাসুদেবের ধ্যান। দেখলে তখন কে বলবে, ইনিই সেই মহারাজাধিরাজ ভরত, যাঁর নামে ভারতবর্ষ। একেবারে রাজর্ষি।

একদিন গণ্ডকীতে গেছেন স্নানে। দেখলেন, এক কালসার হরিণ এসেছে জল খেতে নদীতে। এমনি প্রতিদিন কত আসে, কত যায়। সেদিন কিন্তু ভরতের চোখের সামনে ঘটে গেল এক ঘটনা।

হরিণটি ছিল গর্ভবতী। দু-চারদিনের মধ্যেই হয়ত বাচ্চা হতো তার। সবেমাত্র জল খেতে যাবে কি, পাহাড়-বন কাঁপিয়ে উঠল বাঘের হুঙ্কার। শুনেই হরিণের জল খাওয়া উঠল মাথায়। প্রাণের ভয়ে মুখ ফিরিয়ে বাঁচার জন্যে সজোরে দিল এক লাফ, উঁচু পাড় লক্ষ্য করে। যেই না লাফ দেওয়া, পেট থেকে বাচ্চা বেরিয়ে পড়ল নদীর জলে।

হরিণ প্রাণ নিয়ে পালাল বটে, কিন্তু দুধের বাচ্চাটা জলের স্রোতে গেল ভেসে। কখনো ডুবছে, কখনো ভেসে উঠছে, কখনো পাড়ের দিকে আসার চেষ্টা করছে, আবার অসহায়ের মত ভেসে যাচ্ছে দেখে রাজর্ষি ভরত আর কোনমতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে। কোলে করে সযত্নে তুলে নিয়ে এলেন কালসার সেই হরিণ শিশুটিকে।

প্রাণ ভয়ে হরিণ পালিয়েছে শিশুকে ফেলে। ফিরে আর সে এল না। কোথায়, কার কাছে রেখে যাবেন রাজর্ষি অবোধ এই দুধের বাচ্চাকে? অগত্যা নিজের আশ্রমেই নিয়ে এলেন তাকে। মায়ের মতই স্নেহ দিয়ে তাকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

দিনে দিনে বড় হয় শিশু-শাবক। দিনে দিনে বাড়তে থাকে রাজর্ষির মায়া। ক্রমে এমন হল, জপ-তপ-ধ্যান-মাথায় উঠল রাজর্ষির। মন-প্রাণ তাঁর সব যেন কেড়ে নিল হরিণ-শিশুটি। যত



দিন যায়, ততই বাড়তে থাকে মায়া-মমতা। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের সামনে তাকে দেখতে না পেলে অস্থির হয়ে উঠতেন রাজর্ষি ভরত। চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতেন।

এভাবে চলতে চলতে একদিন মারা গেলেন ভরত। সেই আশ্রমেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে রাজর্ষি ভরত কোনমতেই আর ভগবান বাসুদেবের চিন্তা করতে পারলেন না। দেখলেন, চোখের সামনে সেই কালসার হরিণশিশুটি। চোখে তার জল।

পৃথিবীতে আবার যাতে জন্মগ্রহণ করে আসতে না হয়, আনন্দের বদলে দুঃখভোগ করতে না হয়, তার জন্যই তো জপ-তপ-ধ্যান, ভগবানের নাম-গান। এসব করলে মন পবিত্র হয়ে যায়। থাকে না লোভ-হিংসা-মায়া। এগুলোর মধ্যে একটাও যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ মুক্তি নেই। মহারাজাধিরাজ ভরত সব কিছু কাটিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে একেবারে প্রায় নদীর কিনারে এসে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষে ঐ হরিণশিশুর মায়ায় পড়ে মুক্তি আর পেলেন না। আবার জন্মগ্রহণ করতে হল। করতে হল হরিণ হয়ে, কালঞ্জর পাহাড়ে। হরিণ হয়ে জন্মালেও গত জন্মের কোন কিছুই তিনি ভুলতে পারেন নি। মনে মনে খুবই দুঃখ হল তাঁর। শেষে একটা হরিণশিশুর মায়ায় পড়ে এই দুর্গতি হল তাঁর? এ জীবন রাখবেন না স্থির করে কালঞ্জর থেকে সোজা শালগ্রামে এসে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

এবার তিনি জন্মগ্রহণ করলেন এক ব্রাহ্মণের ঘরে। উচ্চকুলের খুবই সৎ, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তাঁর ছিল দুই ব্রাহ্মণী। বড়র হল ছটি ছেলে। আর ছোটর হল একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। বড়র ছেলেরা দেখতে দেখতে সবাই সুপণ্ডিত হয়ে উঠল। আর পাঁচজনে তাদের ভালও বাসতে লাগল। কিন্তু ছোটর ছেলেটা কেমন যেন! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কি যে দেখছে মাথা-মুণ্ডু তা কেউ বুঝতেও পারে না। মুখে একটাও কথা নেই, যেন বোবা। অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলে হয়ত কোন রকমে একটা কথার জবাব দিল। তাও আবার কি বলল ঠিক বোঝা গেল না। খেতে দিলে খাবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসেই আছে—চাইতেও জানে না, খিদের

ধ্যাসায় কাঁদতেও জানে না। এক অদ্ভুত ছেলে। মা-বাবার মন খারাপ হবারই কথা। ব্রাহ্মণের মন যদিও বা একটু সামলে নিয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণী ছেলের কথা ভেবে ভেবে পড়লেন রোগে। তারপর একদিন ওদের বড় মায়ের হাতে দিয়ে মারা গেলেন।

যে ছেলে দুর্বল হয়, বাবার নজর তার দিকেই তো বেশি পড়ে। তার ওপর আবার অমন একটা হাবাগোবা ছেলে। ব্রাহ্মণও তাই বিশেষ যত্ন নিলেন ছেলেটিকে সবদিক থেকে তার দাদাদের মত করে তুলতে। সময়মত পৈতেও দিলেন, চেষ্টাও নিলেন ভালভাবে লেখাপড়া শেখাতে। কিন্তু হতাশ হলেন বাবা। ব্রাহ্মণের ছেলে, পৈতেও হয়েছে, আচার আচরণটা তো মেনে চলবে। তার জায়গায় একেবারে উল্টো, এমন কি মাঝেমধ্যে যেটুকুও বা কথাবার্তা বলে সব যেন কেমন কেমন। খালি ভুল, ভুল আর ভুল! আশ্চর্য—এতটুকু মগজ বলেও কি ছেলেটার কিছু নেই! ব্রাহ্মণ সব আশা ছেড়ে দিয়ে মনের দুঃখে শেষে মারাই গেলেন।

মা গেলেন, বাবাও গেলেন। কে আর অত যত্ন নেবে, লক্ষ্য রাখবে ছেলের ওপর! অভিভাবক হল দাদারা। তারাও দেখল ভাই তাদের এত নীরেট, গবেট যে হাজার চেষ্টা করলেও ওকে লেখাপড়া শেখানো যাবে না, যাতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের রুজি-রোজগারটাও অন্তত করতে পারে। অথচ ছোট ভাই। তাই ভার-বোঝা মনে করে বাড়ি থেকে বেরও করে দিতে পারে না। আবার বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো—সেও ঠিক হবে না।

দিন দিন অনাদর বাড়তে লাগল। পরনে একটা ময়লা ট্যানা। এদিকে বেশ বলিষ্ঠ দেহ। বাড়ি ছেড়ে সেই অবস্থাতেই ঘুরে বেড়াত পথে পথে। মানুষজন পিছু লাগত—পাগলা বোকা বামুন বলে অনেকে খোঁচাও দিত। কিন্তু কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। কেউ যদি বলত—তার এই কাজটা করে দিলে সে খেতে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়ত তার সেই কাজে। বিনিময়ে যা খেতে দিত তাই খেয়েই হাসিমুখে চলে যেত। সবাই দেখল খাবার লোভ দেখালে বেশ তো কাজ করে দেয় বোকা বামুনটা—অনেকেই তখন সেই সুযোগে নানা কাজ করিয়ে নিতে লাগল তাকে দিয়ে।

দাদারা দেখল ব্যাপারটা তো মন্দ নয়। খাবার লোভে যখন এত জনের কাজ করে দেয়, তাদের সেই সুযোগ নিতে আপত্তি কি? নিজেদের জমিজমা রয়েছে, চাষ আবাদ রয়েছে, মাঠে কত কাজ—সেখানেই ভাইকে লাগানো যাক না। বাড়িতে থাকবে, নিজেদের কাজকর্ম করবে—লোকে তো আর মন্দ কথা বলতে পারবে না। ফলে একজন জনমজুরের পেছনে যে খরচ হতো সেটা বাঁচবে। অনেক ভেবে-চিন্তে কাজের ফিরিস্তি দিয়ে দাদারা পাঠাল তাকে মাঠের কাজে। তারপর গিয়ে দেখে, সে এক উল্টোছিরি হয়ে বসে আছে। যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল, তাতে ফসলের উপকারই হতো। তা না হয়ে, যে কাজ করে বসে আছে, তাতে লাভ তো দূরের কথা, ক্ষতিই হয়ে গেছে দ্বিগুণ। রাগ হবারই কথা। কটূক্তি কম করল দাদারা? কিন্তু, ওসবে ওর যেন বড় বয়েই গেল। দাদারাও তাকে খেতে দিত সেইরকম। নিজেদের কাছে যেগুলো অখাদ্য-কুখাদ্য হয়ে পড়ে থাকত, সেগুলোই জুটত তার ভাগ্যে। তার জন্য কোন অভিযোগ নেই। অম্লান বদনে তাই খেয়ে পরম তৃপ্তির ঢেকুর তুলত। দেখেশুনে বেশ অবাক হত দাদারা।

কিন্তু যাকে কাজে পাঠালে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি, তাকে কি সে কাজে আর পাঠানো যায়, না পাঠানো উচিত? অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করল দাদারা—ঐ মাথা-মোটাটাকে পাহারাদারের কাজেই লাগানো যাক। শুয়োর, হরিণের জন্য তো ক্ষেতে ফসল রাখা দায়। ওকে দিয়ে ঐসব জানোয়ার তাড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ হবে না। ক্ষেতের ধারে দাদারা তৈরি করে দিল একটা মাচা। গবেট ভাই-এর ওপর হুকুম হল, ঐখানেই ও যেন দিন রাত থাকে আর পশু তাড়ায়।

বেশ, তাই সই। দিন-রাত মাচায় বসে থাকা আর পশুগুলো এলে হ্যাট-হ্যাট করে তাড়ানো। সময়মত দাদারা তদারকি করতে এসে যেটুকু খুদ-কুঁড়ো দিয়ে গেল, হাসিমুখে তাই অমৃতের মত খাওয়া।

এমনিভাবেই চলছে কদিন। এরই মধ্যেই ঘটল এক ঘটনা।

অমাবস্যার রাত। জমাট অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। থমথম করছে চারদিক। জড়বুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণী-সন্তান দাদাদের আদেশ মেনে বসে আছে একা, মাঠের মাঝে সেই মাচায়। চুপচাপ বসে আছে, আর মাঝে মাঝে হেসে উঠছে নিজের মনে। এমনিভাবে মাঝে মাঝে আগেও সে হেসে উঠত। কারণ নেই, অকারণ নেই, হঠাৎ হেসে উঠলি কেন? বাবা-বা জিজ্ঞেস করতেই একেবারে বোবা। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভাবতেন, জড়বুদ্ধি, বোধশক্তি তো আর নেই, সুতরাং ওর কোন কাজেরই কোন কিছু মানে নেই। দাদাদেরও তাই বিশ্বাস। কেমন করে তাঁরা জানবেন, ছোট ব্রাহ্মণীর ছেলে হয়ে যিনি এসেছেন তাঁদের বংশে—তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ, জাতিস্মর। কেমন করে জানবেন, ভারতবর্ষ, মানে যে দেশে তাঁরা বাস করছেন, যাঁর নামে এই দেশ ভারতবর্ষ, মহারাজাধিরাজ সেই ভরতই নতুন করে জন্ম নিয়েছেন তাঁদেরই বংশে; আর এভাবে নিজেকে সব কিছু থেকে ছাড়ো ছাড়ো করে রেখেছেন!

মৃগ-জীবন শেষ করে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেই দেখলেন, এবারেও তাঁর মুক্তি মেলেন নি। রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যথেষ্ট জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন। তাই জাতিস্মর হয়ে হরিণ-জন্মেই তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছিল, কেন এই বিপাক। তাই কারো সঙ্গে না মিশে, কোন কিছুর ওপর লোভ না রেখে, শুকনো ঘাস-পাতা খেয়ে হরিক্ষেত্রে এসে জীবনটা শেষ করে দিয়েছিলেন। এবারে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে তাই প্রথম থেকেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, কারো সঙ্গে আর তিনি অন্তরঙ্গ হবেন না। বেশি মেলামেশা করলেই আসবে মোহ। আবার এই জন্মযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাই প্রথম থেকেই এমন ভাব দেখাতে শুরু করলেন, যেন মাথা-মোটা, গবেট বোকা—বুদ্ধি-সুদ্ধির এতটুকু বালাই নেই। এসব, ব্রাহ্মণই বা কেমন করে বুঝবেন, আর পণ্ডিত হলেও দাদাদের তা বোঝার শক্তি কোথায়!

যাই হোক, অন্ধকার সেই রাত। মাচায় বসে একা জড়ভরত। হঠাৎ দেখল মশাল হাতে জনকয় মানুষ যেন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। দেখল বটে। তবে ঐ পর্যন্তই। কোন আগ্রহ, ভয় বা উৎকণ্ঠা কিছুই জাগল না তার মনে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মশাল হাতে মানুষগুলো এসে দাঁড়াল সেই মাচার কাছে। মাথায় পাগড়ি, কপালে সব লাল সিঁদুরের লম্বা তিলক, দু কানে সব বড় বড় মাকড়ি, কালো কাজল টানা বড়-বড় চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। খালি গা। বিশাল সব বুকের ছাতি, ফেটে পড়ছে মাংসপেশী।

সেখানে এসেই জড়ভরতকে দেখে দাঁড়াল তারা, তারপর একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—জয় মা ভদ্রকালী!

ওরা হল ডাকাত। প্রতি অমাবস্যাতেই একটি করে হৃষ্টপুষ্ট মানুষকে তাদের দেবীর সামনে হাড়িকাঠে বলি দিয়ে সেই রক্তে মায়ের পুজো করত তারা। এবারেও এসেছিল সব কিছুই যোগাড় করে নিয়ে। কিন্তু কোন ফাঁকে যে বলির মানুষটা সেখান থেকে সরে পড়েছিল, তা ওরা ঠাওর করতে পারে নি। পরে, দরকারের সময় যখন দেখল, তখন ওদের মাথায় হাত। মায়ের পুজোয় খুত! তা কি কখনো হয়। খোঁজ···খোঁজ···এই অন্ধকার রাতে এই সুদূর নির্জন শ্মশান থেকে কোথায়, কতদূর পালাবে সে? সঙ্গে সঙ্গে মশাল হাতে শুরু করল খোঁজা। কিন্তু তাকে আর পাওয়া গেল না। বদলে, জড়ভরতকে।

মাচা থেকে নামিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারা জড়ভরতকে। দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল।



—দেখ, দেখ! আগেরটার চেয়ে অনেক ভাল। বলল তাদেরই মধ্যে একজন।

—আরে, আমাদের মা কি আর যে-সে মা। কেমন জুটিয়ে দিলে বল?

—সত্যিই। আর একবার সবাই মিলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয় মা ভদ্রকালী। তারপর তাকে ধরে নিয়ে গেল বলির পশুর মত।

নির্বিকার জড়ভরত। তাকে যে বলি দেওয়া হবে, অকালে ডাকাতদের হাতে তার প্রাণটা খাঁড়ার ঘায়ে যাবে—তার জন্য কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা যেন কিছুই নেই তার মধ্যে। নিশ্চিন্ত মনে জড়ভরত গিয়ে হাজির হল তাদের সঙ্গে কালীর সামনে। ডাকাতরা তাকে স্নান করাল, ফুল-মালা দিয়ে সাজাল। পুরোহিত এসে পরিয়ে দিল সিঁদুরের টিপ। 'মা' 'মা' ডাকে কেঁপে উঠল সেই নির্জন শ্মশান। মদ খেয়ে চুর ডাকাতদের বাজনা-বাদ্যি ঢাক-ঢোল সব বেজে উঠল। হাড়কাঠে গলিয়ে দেওয়া হল জড়ভরতের মাথা। কোন ট্যা-টু নেই, প্রতিবাদ নেই—যেন কি হচ্ছে জড়ভরত তা বুঝতেই পারছে না। এবার বলি। বলির পরই সেই তাজা রক্ত নিয়ে মায়ের পুজো।

খাঁড়া তুলেছে ডাকাত পুরোহিত। এমন সময় কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল। বলির গলায় খাঁড়া না পড়ে, যত ডাকাত সেখানে ছিল একে একে সকলের মুণ্ডচ্ছেদ করল। এমন কি, রেহাই পেল না ডাকাত-পুরোহিতও।

মাথা তুলে দাঁড়াল জড়ভরত। দেখল একবার চারদিক। মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হেসে চলে গেল সেখান থেকে—যেন কোথায় কিছু হয় নি।

ইক্ষুমতী নদীর তীর ধরে চলেছে বিশাল এক পাল্কি। বেশ সাজানো গোছানো। হুম হুম করে বয়ে নিয়ে চলেছে সেই পাল্কি বেশ কয়েকজন মন্দ বাহক। পাশে পাশে চলেছে সর্দার। পাল্কির আরোহী হলেন সিন্ধু আর সৌবীরের রাজা রহুগণ। সে সময়ে রাজা রহুগণের নামে সকলেই মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাত। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন পরাক্রমশালী রাজা, আর একদিকে তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী, ধার্মিকও বড় একটা কেউ ছিলেন না। তবে যেহেতু তিনি রাজা, তাই রাজোচিত একটু দম্ভ ও অহঙ্কার তাঁর মধ্যে ছিল। কিছুদিন ধরেই তাঁর মনে একটা প্রশ্ন তোলপাড় করছিল। প্রশ্নটা হল, কি করলে এই সংসার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কোন দিক থেকেই এর কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে রাজা রহুগণ চলেছেন তাঁর গুরুদেব মহর্ষি কপিলের কাছে।

অনেকখানি পথ। সবুর সইছে না রাজার। যেতে হবে তাড়াতাড়ি। কালঘাম ছুটে যাচ্ছে মন্দদের। তবু পেছন থেকে তাড়া দেন রাজা। সর্দার দেখল, আর একজন বাহক হলে ভাল হয়। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল ময়লা ট্যানা-পরা জড়ভরতকে। দেখল, কাঁধে পৈতে। তাহলে ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই কোন কুলাঙ্গার। তা না হলে এমন ভাবে পথে পথে ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াবে কেন? তাকে ডেকে অন্য সব বাহকদের সঙ্গে দিল যুতে। আশ্চর্য! জড়ভরতও কোন কথা না বলে হাসিমুখে পাল্কিতে দিল কাঁধ লাগিয়ে। অন্য বাহকেরা যখন সমান তালে জোরে জোরে চলেছে, ভরত তখন মাথা নিচু করে চলেছে যেন মেপে মেপে পা ফেলে। ফলে পাল্কি উঠছে দুলে। রাজারও হতে লাগল খুব অস্বস্তি।

—কি হয়েছে? ওভাবে পাল্কি দুলছে কেন? ঠিকভাবে চলতে পারছ না? থাকতে না পেরে পাল্কির ভেতর থেকেই ধমকে ওঠেন রাজা।

সর্দার. ধমক লাগায় নতুন বাহককে।

নতুব বাহক জড়ভরতের কানে যেন কোন কথাই ঢোকে না। যেমন ভাবে চলছিল, সেভাবেই চলতে লাগল। কোথায় দুলুনি থামবে, যেমন চলছিল তেমনি চলবে, তা নয়, গেল কিনা আরো বেড়ে!

—কি ভেবেছ তোমরা? আমার কথা কানে গেল না? প্রচণ্ড রেগে ধমক দিয়ে উঠলেন রাজা রহুগণ।

—মহারাজ, তাড়াতাড়ির জন্যে নতুন এক বাহক নিয়েছি। যত বেচাল সে-ই করছে। কৈফিয়ৎ দিল সর্দার।

মুখ বাড়িয়ে দেখলেন রহুগণ। অযোগ্য বাহক তো নেওয়া হয় নি। তবে···

—কি হে বাপু! ওদের সঙ্গে একটু সমান তালে চল। অমন বেচাল করছ কেন?

রাজার নিজের হুকুম। এবার নিশ্চয়ই ঠিক চলবে। কিন্তু, কোথায় কি!

আবার মুখ বাড়ালেন রাজা—কি হে বাপু, কথাগুলো বুঝি কানে

গেল না ? শরীর-স্বাস্থ্যখানা তো বেশ মোটা-সোটা, ভালই বাগিয়েছ। এমন বুড়োও হয়ে পড় নি যে এরই মধ্যে হাঁপিয়ে পড়বে। কষ্ট সহ্য হয় না বুঝি ? কতক্ষণই বা আর পাল্কি বইছ ? তাড়াতাড়ি ঠিকমত চলতে পারছ না ?

এইবার মুখ খুলল জড়ভরত।

বলল—মহারাজ, আমি মোটাসোটাও নই, কষ্ট কি জিনিস তা-ও বুঝি না। আর আপনার পাল্কিও আমি বইছি না।

বাহকের কথা শুনে অবাক রাজা রহূগণ। বললেন—আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি মোটাসোটা, আর তুমি বলছ, তা নও ! কষ্ট বোধ না হলে, কেউ কি অমনভাবে চলে ? আমি দেখছি, আমার পাল্কি এখনও তোমার কাঁধে, আর তুমি বলছ, আমি পাল্কি বইছি না ?

জড়ভরত বলল—দেহটা তো বড়-সড় আর মোটাই হয়। তাই অবশ্য দেখায়। কিন্তু সত্যিই কি তা মোটা ? আর, কষ্টের কথা বলছেন রাজা ? হ্যাঁ, দেহটার কষ্ট আছে। যার দেহ বলে কিছু নেই, তার কষ্ট কোথায় ? আপনি দেখছেন, আমি আপনার পাল্কি বইছি। কিন্তু দেখুন তো রাজা, মাটির ওপর আমার একজোড়া পা, পায়ের ওপর হাঁটু, হাঁটুর ওপর জানু, জানুর ওপর কোমর, কোমরের ওপর বুক, বুকের ওপর দুদিকে দুটো হাত, তার সঙ্গে কাঁধ। আর আপনার পাল্কি রয়েছে, সেই কাঁধের একটু জায়গায়। তাহলে, আমি আপনার পাল্কি কেমন করে বইলাম ?

শুনতে শুনতে মাথা ঘুরতে শুরু করে দিয়েছিল রাজার। হাজার হোক, রাজা হলেও মূর্খ তো তিনি ছিলেন না। এবার রীতিমত চমকে উঠলেন, সামান্য একজন বাহকের মুখে এমন দুর্লভ কথা শুনে। এরকম কথা তো যার-তার মুখ থেকে বেরোতে পারে না। মহর্ষি কপিলের মত সাধকরাই বলতে পারেন। বলতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা বিশ্ব সংসারকে এক চোখে দেখেন। বালক হয়ত ছদ্মবেশী তেমন কেউ। স্বয়ং গুরুদেব কিনা, তাই বা কে জানে।

পাল্কির ভেতর আর বসে থাকতে পারলেন না রাজা রহূগণ। সঙ্গে সঙ্গে পাল্কি থেকে নেমে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে।

—কে আপনি ? এমনভাবে আমার চোখ খুলে দিলেন ! কে আপনি, এমনভাবে আমার সব সংশয় দূর করে দিলেন, যার জন্যে আমি যাচ্ছিলাম মহর্ষি কপিলের কাছে ? আপনাকে বাহক করার অপরাধ ক্ষমা করুন।

তারপর ?

সৌবীররাজ রহূগণ যখন সেখান থেকে ফিরে গেলেন আপন রাজ্যে, কে বলবে, এই সেই রাজা, অনেক ভাল কাজ করলেও, যাঁর মধ্যে ছিল দম্ভ, অহঙ্কার। জেনে গেলেন জড়রূপী সেই রাজর্ষি ভরতের কাছ থেকে, জগতে যারা সব সময় 'আমি', 'আমার' এই চিন্তা নিয়ে থাকে, তাদের জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে মায়ার বশে। আর যাঁরা দেখেন, 'আমি'-ই 'সবাই' আর 'সবই'-ই 'আমি', তাঁরাই হলেন মুক্তপুরুষ। কোন দুঃখ, কোন কষ্টই তাঁদের ভোগ করতে হয় না।

ব্রাহ্মণবংশে জন্মে জাতিস্মর ভরত সেভাবে থেকে নিজেও লাভ করেছিলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।



বাসুদেবের আবির্ভাব কাহিনী

দ্বাপর যুগের কথা।

সুবিশাল যদুকুল। এই কুলেরই এক রাজা, নাম তার কংস। যেমন লোভী, তেমনি ছিল তার নিষ্ঠুর স্বভাব। বদ্ যে হয়, রাজ্যের বদ্ মানুষজনদের সঙ্গেই তার বন্ধুত্ব হয়, খাতির জমে। যদুকুলে অনেক ভাল মানুষ থাকতেও তাই কংসের যত ভাব দুরাচার অসুরদের সঙ্গে। নিজের আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্বের চেয়ে অতি নীচ আর অত্যাচারী ধেনুক, কেশী, অরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ, বলির ছেলে বাণ—এদের সঙ্গেই তার যত আত্মীয়তা, যত মনের কথা। এরা কেউ তো আর সৎ ছিল না যে, সৎ পরামর্শ দেবে। ফলে দিন দিন কংস হয়ে উঠতে লাগল যেমন উগ্র, তেমনি জ্ঞাতি বিরোধী।

কংসের বাবা উগ্রসেন। যদুবংশের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি কিন্তু তাঁর ছেলেকে কারোরই প্রিয়পাত্র করে তুলতে পারেন নি।

এই কংসেরই এক বোন ছিল, নাম তার দেবকী। কংসের আরও কয়েকটা বোন ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দেবকীই ছিল ভাগ্যবতী। এই দেবকীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল যদুবংশেরই দেবমীঢ়ুসের ছেলে বসুদেবের। বসুদেব যখন জন্মান, তখন আকাশে নাকি আনক (ঢাক) বাদ্যি বেজে উঠেছিল। তাই বসুদেবের আর এক নাম তখন থেকেই হয়ে গিয়েছিল আনকদুন্দুভি। সেই থেকে সকলের মনেই বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিল, যদুবংশের সেরা ছেলে বসুদেব নিশ্চয়ই খুব ভাগ্যবান হবে। তা নাহলে আকাশে অমন আনন্দবাদ্যি বাজাবে কেন।

সত্যিই বড় ভাগ্যবান ছিলেন বসুদেব। এমন সুপাত্রের হাতে দিতে পেরে দেবকীর বাবা প্রাণ ভরে যৌতুক দিয়েছেন বসুদেবকে। সোনার মালা দিয়ে সাজানো চারশ হাতি, দশ হাজার ঘোড়া, আটশ রথ, সঙ্গে আবার দুশো দাসী। বিয়ের পর বসুদেব ফিরছে নিজের বাড়িতে দেবকীকে নিয়ে। অমনি সাজানো বিশেষ এক রথে তারা বসে। আর সেই রথে সারথি হয়ে চলেছে কংস নিজে। বোনকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসবে তার শ্বশুরবাড়ি। চারদিকে বাজছে শাঁখ। যেন রীতিমত বিরাট এক উৎসব।

কিছুটা পথ এসেছে দেবকী আর বসুদেবের রথ, হঠাৎ কোথা

থেকে কে যেন কংসকে বলে উঠল,"যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভর্ত্রা রথে স্থিতাম্। অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি"।—আরে মূর্খ কংস, স্বামীর সাথে রথে চড়িয়ে অমনভাবে যাকে নিয়ে যাচ্ছিস, তারই অষ্টম গর্ভের ছেলের হাতে তোর প্রাণ যাবে।

কে ? কে বললে এমন কথা ? চমকে উঠে সারথির আসনে বসে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে ওঠে কংস।

না, এমন কথা বলার মত তো এখানে কেউ নেই। তবে এ কি তার ভাগ্যের লিখন ? দৈববাণী তাকে সাবধান করে দিল।

রথের বেগ গেল কমে।

এতক্ষণ হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে যে কংস বোন আর ভগ্নীপতিকে নিয়ে যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে সেই কংস যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় উঠে দাঁড়াল আর এক কংস—নির্দয়, নিষ্ঠুর। অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ছাড়া যে আর কিছু জানে না।

সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করে ফেলল কংস—হোক বোন, তবু ওকে কোন রকমেই আর বাঁচতে দেওয়া হবে না।

মনে যা ভাবল, কাজেও তাই করল। সারথির আসন থেকে একলাফে উঠে হাতে ঝকঝকে খাঁড়াটা তুলে নিয়ে দৌড়ে এসে রথের ওপরেই ধরল দেবকীর চুলের মুঠি। গর্জন করে উঠল—শয়তানী ! আমারই পিঠে চেপে যাচ্ছিস তুই, আর তোরই ছেলের হাতে যাবে আমার প্রাণ ? তোর ছেলে হওয়া আমি ঘোচাচ্ছি। আজ আমি তোকেই শেষ করব।

শ্বশুরবাড়ি আসার আগে সখীরা কি সুন্দরভাবেই না সাজিয়ে দিয়েছিল দেবকীকে। সব এলোমেলো হয়ে গেল। কংসের হেঁচকা টানে আর্তনাদ করে উঠল দেবকী। চমকে উঠল দাসীরা। থমকে থেমে গেল হাতি-ঘোড়ার সেই অপূর্ব শোভাযাত্রা।

নিজের আসন ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ালেন বসুদেব। কংসকে তিনি খুব ভালই চিনতেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যে এমন একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটতে পারে ভাবতেই পারেন নি তিনি।,

বাধা দিলেন বসুদেব কংসকে। বললেন—এ কি ভাই ! এ তুমি কি করতে যাচ্ছ ? তুমি ভোজ বংশের ভাবী রাজা। কে কোথায় কি বলল, তাই শুনে বোনের ওপর তোমার এই আচরণ কি শোভা পায় ? সবে মাত্র বোনের বিয়ে দিয়েছ। এখনও বাড়ি গিয়ে পৌঁছল না।

যারা স্বভাব-দুর্বৃত্ত, তারা কি কোন কথা শোনে, না, তারা সময়-অসময়ের বিচার করে ? প্রাণের মায়া তাদের সবচেয়ে বেশি। তাই কোন জায়গা থেকে কোন আশঙ্কার ইঙ্গিত পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানেই তার মূল উপড়ে দিতে। কংসও এই মুহূর্তে বেছে নিয়েছে সেই পথ। দেবকীকে সরিয়ে দিলে আর কোন আশঙ্কাই থাকে না।

ধমকে উঠল কংস—থামো তুমি ! আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। বুঝতে পেরেছি, তোমরা সবাই আমার শত্রু। আগে ঐ শয়তানীটাকে শেষ করি, তারপর—

বসুদেব জানতেন, এভাবে বাধা দিয়ে কংসের মন টলানো যাবে না, থামানো যাবে না। আবার বুঝতে পেরে বসুদেবের আনন্দও হল যে তাঁদের বংশে এমন একজন আসবেন, এইসব অত্যাচারীর হাত থেকে যিনি মানুষকে রক্ষা করবেন। পৃথিবীতে শান্তি আনবেন। তাই যেভাবেই হোক, দেবকীকে এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে।

বসুদেব বললেন—ভাই কংস, আমার একটা কথা শোন। এখন তো আমরা তোমার হাতের মধ্যেই। আমার কথা যদি তোমার মনে না ধরে তখন তোমার যা ইচ্ছা হবে, তাই কোরো।

—বল, তাড়াতাড়ি বল। দেবকীকে ছেড়ে উদ্যত খাঁড়া নামিয়ে জিজ্ঞেস করে কংস।

বসুদেব বললেন—দেবকী তো কোন অপরাধ করে নি। মিছামিছি ঐ অবলা নারীকে এভাবে মেরে কোন কলঙ্কের ভাগী হবে ? ওর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে। তাই যদি সত্য হয় আমি তোমায় কথা দিচ্ছি কংস, যখনই আমাদের কোন সন্তান হবে, আমি নিজের হাতে তাকে তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে আসব। তোমরা তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা কোরো।

কথাটা খুব একটা খারাপ বলে নি বসুদেব। একটু ভেবে নিল



কংস। তারপর বলল—বেশ, তাই হোক। কিন্তু জেনে রেখো, কথার খেলাপ করা চলবে না।

আপাতত রেহাই।

ইতিমধ্যে সব গোলমাল পাকিয়ে দিলেন নারদ। হঠাৎ একদিন কংসের কাছে এসে বললেন—এ কি করছ, কংস ? তুমি কি জানো, তোমাকে বধ করার জন্যে এরা সবাই সুযোগের অপেক্ষায় আছে ? এরা সবাই সেই ভগবান শ্রীহরির অনুচর। দেবলোকে দেবতারাও পরামর্শ করছে তোমাকে বধ করার জন্য।

দেবর্ষি যখন বলেছেন, তখন তো আর তা মিথ্যে হতে পারে না।

বাবা উগ্রসেনকে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়ে কংস নিজে বসেছে মথুরার সিংহাসনে। সে-ই এখন রাজা, সর্বেসর্বা। আর কার কি বলার আছে ? সুতরাং নির্বিবাদে শুরু করে দিল অত্যাচার, নিপীড়ন আর হত্যা। তার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে যদুকুলে যেন বাতি দিতে আর কেউ না থাকে। থাকবে শুধু তারা, যারা তাকে প্রভুর মত সম্মান দেবে, খাতির করবে, কথা শুনবে।

কংসের এই অত্যাচারের সঙ্গে যোগ দিল প্রলম্ব, বক, চামুর। অঘ, তৃণাবর্ত, মুষ্টিক, কেশী, পুতনা, ধেনুক আর বাণ তো ছিলই।

সারা রাজ্য জুড়ে যেন এক তাণ্ডব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। চোখে দেখা যায় না সে সব অত্যাচার, ভাবাও যায় না। পালাতে লাগল যাদবেরা প্রাণভয়ে ঘর বাড়ি ফেলে। কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদেহ, কোশল—যে যে-দেশে পারল সেখানে পালাল।

উল্লাসে ফেটে পড়ল কংসের সঙ্গে অসুরদল। শ্রীহরির উদ্দেশে কংস বিদ্রূপ করে বলে উঠল—আমাকে বধ করার হুমকি দাও তুমি। এখন এদের বাঁচাও, দেখি, তুমি কেমন ভগবান ?

কংসের প্রাসাদে একদিকে যখন চলেছে এইরকম বীভৎস উল্লাস, আর একদিকে সারা পৃথিবী জুড়ে কান্নার রোল, ভগবানের কাছে সকলের আকুল প্রার্থনা—হে বিষ্ণু, হে নারায়ণ, হে বিশ্ববিধাতা। তুমিই তো বলেছিলে, অত্যাচারীর অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, অধর্মে যখন দেশ ছেয়ে যায়, তখনই তুমি আসো তার প্রতিকার করতে। তুমি আসো অত্যাচারীকে দমন করতে, ধর্মকে রক্ষা করতে। এখনও কি তোমার আসার সময় হয় নি প্রভু ? আমরা যে আর সহ্য করতে পারছি না।

মানুষের এই আকুলতায় কেঁপে উঠল পৃথিবীর বুক। গো-রূপ ধরে তিনি ছুটলেন সুমেরু পর্বতে দেবতা আর লোকপালদের কাছে। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সব দেবতাই তখন সেখানে। বললেন সব কিছু। কাতর আবেদন রাখলেন তিনি দেবতাদের কাছে—আপনারা আমাকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। এই অত্যাচার আর অনাচারে আমি যে জ্বলেপুড়ে যেতে বসেছি। আপনাদের তো অজানা নেই দেবগণ, কে এই কংস। এ হল সেই হিরণ্যকশিপুর ভাই কালনেমি। ভগবান বিষ্ণু একবার নৃসিংহরূপ ধরে যাকে হত্যা করে ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

দেবগণের, বিশেষ করে ব্রহ্মার এসব অজানা নয়। তিনি এ-ও জানতেন, কালনেমির ছিল ছ'ছেলে। তারা বাবার আদেশ অমান্য করে বিষ্ণুর পূজা করত প্রহ্লাদের কথা শুনে। ছেলেদের ওপর দারুণ আক্রোশে কালনেমি মেরে ফেলতে গিয়েছিল তাদের। কিন্তু পারে নি। চাপা সেই আক্রোশ নিয়েই নিজেকে মরতে হয়েছিল নৃসিংহের হাতে। এ জন্মে সেই কালনেমি হয়েছে উগ্রসেনের পুত্র কংস। সেই ছয় ছেলেও এবার জন্ম নেবে সুকৃতির বলে দেবকীর ছেলে হয়ে, আর কংস তার গত জন্মের আক্রোশ মেটাবে এ জন্মে নিজে হাতে তাদের হত্যা করে। সবই জানা। তবুও ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ ছাড়া তো করার কিছু নেই।

তাই দেবগণকে নিয়ে ব্রহ্মা গেলেন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে নারায়ণের কাছে। উত্তর তীরে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা অনেক স্তব করলেন অনন্তমূর্তি, গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুর। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বিশ্বরূপ আর্বিভূত হলে দেবতারা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—প্রভু, অসুরদের অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী এসেছে আপনার কাছে, তাঁকে ভারমুক্ত করার জন্যে। আর আমরাও এসেছি প্রভু আপনার কাছে, আমরা কি করব তা জানতে।

শুনে ভগবান বিষ্ণু তাঁর মাথা থেকে দুগাছি চুল ছিঁড়ে দেবতাদের হাতে দিয়ে বললেন, এই দুগাছি কেশ যথাসময়ে শরীর ধারণ করে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবে। আর তোমরা, পৃথিবীতে গিয়ে এক এক রূপে ওদের প্রতিরোধ করতে থাক। এই যে কৃষ্ণ কেশ, তা হল আমি নিজে। ভাগ্যবতী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম নেব আমি; আর এই সাদা কেশ জন্ম নেবে গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের যে আর এক স্ত্রী আছেন, তাঁর গর্ভে।

নারদ টুক করে এসে খবরটা শুনিয়ে দিয়ে গেলেন কংসকে। এতদিন যদিও বসুদেব আর দেবকীর কোন অনিষ্ট করে নি কংস, এবার তাদের তুলে নিয়ে এল নিজ প্রাসাদে। রাখল কড়া পাহারায়। আদেশ, দেবকীর যখনই কোন সন্তান হবে সে যেন খবর পায়।

সবই যেন ছকে বাঁধা ব্যাপার। দেবকীর একে একে ছয় ছেলে হল। বসুদেবও রাখলেন তাঁর কথা। কংস এসে তাদের সকলকেই



মেরে ফেলল। এল সপ্তম বার। দেবকীর মনে কষ্টের শেষ নেই। এটিও তাকে 'মা' বলে ডাকার সুযোগ পাবে না। কিন্তু সকলেই একদিন দেখল দেবকীর সেই গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল। আসলে কিন্তু বিষ্ণুরই নির্দেশে যোগমায়া সেই গর্ভে এসে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন যশোদার গর্ভে, যাতে দেবকীর গর্ভে শ্রীভগবানের আসার পথ সুপ্রশস্ত হয়। আগে থেকে সব ব্যবস্থাই ঠিক করা ছিল। যশোদার কন্যারূপে সে জন্মগ্রহণ করল। গোকুলে রোহিণীর গর্ভে জন্ম নিলেন বলরাম। ভগবান বিষ্ণু আশ্রয় করলেন দেবকীর গর্ভ।

যত দিন যায়, দেবকীর শরীর থেকে বেরোতে শুরু করল এক অপূর্ব জ্যোতি। নজর এড়াল না কংসের। সে আরও সজাগ করল প্রহরীদের। নিজেও রইল সদা সতর্ক। দেবকীর কিন্তু মনোকষ্টের শেষ নেই। এই সন্তানটিকে কি সে কংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে ?

যথাসময়ে যশোদার হল একটি কন্যাসন্তান। তার নাম যোগমায়া।

এদিকে কংসের প্রাসাদে, সবদিক যখন নিঝুম, নিস্তব্ধ—গভীর রাতে যখন প্রত্যেকেই প্রায় নিদ্রাতুর, শ্রাবণ মাসের অষ্টমীর সেই মহালগ্নে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন। জন্মগ্রহণ করেই বসুদেবকে নিজের স্বরূপ মুহূর্তের জন্যে দেখিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে ধরলেন কৃষ্ণ-বেশ। দুই হাত, দুই পা—যেন ঘরের এক সাধারণ ছেলে। একদিকে অপার আনন্দ আর একদিকে বিপদ ছেয়ে ফেলল বসুদেবকে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন শ্যামরূপ ধরে তাঁর ঘরে, এতদিন ধরে সকলেই ছিল যাঁর প্রতীক্ষায়। বিপদের কারণ হল, এখনি যদি কংস জানতে পারে।

যা অসাধারণ তার কোন কিছুই সাধারণ নয়। নির্দেশ পেলেন বসুদেব নবজাতককে গোকুলে যশোদার ঘরে এই মুহূর্তে রেখে সেখান থেকে যশোদার মেয়ে যোগমায়াকে এনে দেবকীর পাশে



রেখে দিতে কারো কিছু জানার আগেই। বাইরে আকাশে দারুণ মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, যমুনা উথাল। পুত্র বাসুদেবকে কোলে তুলে নিয়ে তারই মধ্যে বসুদেব বেরিয়ে পড়লেন। অমন ভয়ঙ্কর যমুনা বসুদেবকে ছুঁল মাত্র হাঁটু পর্যন্ত। সহস্র ফণা নিয়ে অনন্তনাগ তাঁদের মাথার ওপর নিজের ফণার ছাতা ধরল। এতটুকু বৃষ্টি লাগল না কারো গায়ে। বসুদেব গেলেন যশোদার ঘরে। সত্যিই সেখানে শুয়ে একটি ফুটফুটে মেয়ে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে যশোদাও। নিঃশব্দে বসুদেব নিজের কোলে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে তার জায়গায় শুইয়ে দিলেন বাসুদেবকে। তারপর ফিরে এলেন কংসের প্রাসাদে দেবকীর কাছে। প্রাসাদের মানুষজন তো দূরের কথা, বসুদেব-দেবকী ছাড়া, কেউ কিছুই জানতে পারল না কি হয়ে গেল।

সবেমাত্র আকাশের দাপট একটু থেমেছে। প্রহরীদের ঘুমের ঘোর কাটতে শুরু করেছে। এমন সময় নবজাত শিশুর কান্না শুনতে পেল তারা। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটল কংসের কাছে।

খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ সাপের মত ছুটে এল কংস দেবকীর ঘরে। অষ্টম গর্ভের সন্তান—এই সেই ভগবান শ্রীহরি, যে নাকি জন্ম নিয়ে তাকে বধ করবে বলে কথা দিয়েছে। নিজের মনেই কুটিল হাসি হাসল কংস—এবার কে কাকে বধ করে।

চিল যেভাবে শিকারকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়, ঠিক সেই ভাবেই অট্টহাসিতে প্রাসাদ কাঁপিয়ে ছোঁ দিয়ে দেবকীর পাশ থেকে তুলে নিয়ে গেল শিশুকে। তারপর শূন্যে তুলে সজোরে আছাড় দিল পাথরে—যেভাবে আছাড় দিয়ে মেরেছিল আগের ছয় ছেলেকে। সপ্তম সন্তানকে মারতে হয় নি। ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এমনিতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবার আছাড় দিয়েই আবার সেই অট্টহাসি।



কিন্তু মুহূর্তে থেমে গেল কংসের সেই হাসি। বড় বড় হয়ে উঠল চোখদুটি। দেখল, মরে যাওয়া তো দূরের কথা—মাথার ওপর শূন্যে যেন উঠে গেল সেই শিশু যোগমায়া। ধরল অপূর্ব এক মূর্তি। আটটি হাত—প্রতিটি হাতে তার নানারকম অস্ত্র। যেন পৃথিবী কাঁপিয়ে হেসে উঠল সে। বিদ্রূপ করে বলল—ওরে দাম্ভিক কংস। তোর সাধ্য কি, তুই আমাকে মারিস! তোদের মত অসুরদের কোন সাধ্য নেই। আমাকে মারার। তোর দিন ঘনিয়ে এসেছে। আগের জন্মে যার হাতে তোর মৃত্যু হয়েছিল সেই ভগবান পরমপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। নিজের ভাল চাস তো সাবধান হ' এইবেলা।—এই বলে যোগমায়া অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইনিই হলেন বিষ্ণুর সেই শক্তি যাকে সকলে দুর্গা, কালী ইত্যাদি বলে।

ঘোর কেটে গেল কংসের। বোন-ভগ্নীপতিকে আটকে রেখে, তাদের ওপর এত নির্যাতন করে, তাদের ছেলেগুলোকে মেরেও তো কিছু করা গেল না। যোগমায়া বলে গেল, জন্মেছে সে। তাহলে নিশ্চয় অন্য কোথাও। এতদিন শুধু এদের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিল সে। ছি…ছি… কি ভুলই না সে করেছে। মনে মনে রাগ হল তার আকাশবাণীর ওপর। অযথা বোন-ভগ্নীপতিকে কষ্ট দেওয়া হল। এই ভেবে কংস তাদের মুক্ত করে দিল।

ওদিকে গোকুলে নন্দের ঘরে যশোদার স্নেহে বাসুদেব (বসুদেবের ছেলে) সাধারণ গোপবালক 'শ্রীকৃষ্ণ' নামে সকলের নয়নের মণি হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই দিনটির জন্যে, যেদিন তিনি পৃথিবীর চোখের জল মুছিয়ে তাকে দেবেন শান্তি।



ভাগবত পুরাণ

ভগবান বিষ্ণুই যাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, বিষ্ণু ছাড়া অন্য কোন চিন্তা যাঁরা করতে পারেন না, তাঁদের কাছে 'ভাগবত-পুরাণ' অমূল্য সম্পদ। সমগ্র পুরাণে আছে বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের সব বিচিত্র কাহিনী। নানা বিকটাকার অসুরদের কিভাবে তিনি ধ্বংস করেছিলেন, সম্পর্কে মামা হলেও অত্যাচারী রাজা কংসকে কিভাবে তিনি পরাস্ত করেছিলেন, দুর্ধর্ষ সব রাজা-মহারাজা, যারা অন্যায়কে সমর্থন জানিয়ে ন্যায় এবং সত্যকে অবহেলা করে পৃথিবী থেকে ধর্মকে লোপ করে দিতে চাইছিলেন, কিভাবে তাঁদের বিনষ্ট করে ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, তারই বিচিত্র, অলৌকিক সব কাহিনী ভাগবত-পুরণের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। যদুবংশের মুকুটহীন রাজা হয়েও পৃথিবীর প্রতিটি ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয় 'ভাগবত-পুরাণ' না পড়লে ভালভাবে জানা যায় না।

বেদ ভাগ করা থেকে শুরু করে নানা শাস্ত্র, বেশ কিছু পুরাণ-গ্রন্থ রচনা করার পরেও মহর্ষি বেদব্যাস ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। মনে মনে কিসের যেন এক দারুণ অতৃপ্তি বোধ করছিলেন। নারদ মুনির পরামর্শে 'ভাগবত-পুরাণ' রচনা করার পরই ব্যাসদেবের মন মহানন্দে ভরে গিয়েছিল।



নন্দালয়ে বাল-গোপালের অলৌকিক কাণ্ড

ব্রজধামে মহা ধুমধাম। গোপরাজ নন্দের গোকুল আলো করা একটি ছেলে হয়েছে। এ কি কম আনন্দের! পরিণত বয়সে নন্দরাজের যে এমন একটি ছেলে হবে, নন্দপত্নী যশোদা এতদিন পরে যে আবার মা হয়ে মনের জ্বালা জুড়োবেন, তা কে ভাবতে পেরেছিল? গোপরাজ নন্দ আর ভক্তিমতী যশোদাকে ব্রজের সকলেই ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। তাই তাঁদের ছেলেপুলে না হওয়ার দুঃখটাও ছিল সকলের মনে। প্রথম ছেলে হয়েছে শুনে সকলের সে কি আনন্দ! ছেলে যেন শুধু নন্দ-যশোদার নয়—সকলেরই নিজের ছেলে। পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে যে যেখানে ছিল, তাই সবাই ছুটে আসতে লাগল নন্দের ঘরে। সকলেরই মুখে কে কথা—আহা! দেখি, দেখি কেমন ছেলে? এ যে সোনার চাঁদ গো! বেঁচে-বর্তে থাকুক, রাজা হোক, রাজ-রাজেশ্বর হোক।

গোপরাজ নন্দেরও আনন্দের আর শেষ নেই। যাকে যা পারলেন কাপড় গয়না থেকে শুরু করে গরু পর্যন্ত দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে যে এসে ছেলের মঙ্গল-বাসনা করে যা চাইতে লাগল, দু হাত ভরে তাই-ই দিতে লাগলেন নন্দ—যেন তাঁর সর্বস্ব উজাড় করে দিলেও বুঝি তৃপ্তি মিটবে না, এমনি তখন তাঁর মনের অবস্থা।

ওদিকে রোহিণীরও একটি ছেলে হয়েছে। রোহিণীর স্বামী বসুদেব মথুরায়। রাজা কংস তার বোন দেবকী আর তাকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। শুনেছিল দেবকীর অষ্টম গর্ভের ছেলের হাতে তার মৃত্যু হবে। তাই বসুদেবের সঙ্গে দেবকীকেই নিয়ে গিয়ে রেখেছিল প্রাসাদে, আর একটা একটা করে ছটা ছেলেকে মেরে ফেলেছিল, সম্পর্কে তারা ভাগ্নে হলেও সপ্তম গর্ভের সন্তানটি, সকলেই দেখেছিল, আপনা-আপনি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিভাবে নষ্ট হল, কেনই বা হল—কেউই তা বুঝতে পারে নি। আর তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় নি। সুকৌশলে সেই সন্তানটিকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রোহিণীর গর্ভে। আর সেই ছেলেই ভূমিষ্ঠ হল এক শুভ দিনে। বসুদেবের ছটি ছেলের পর এই একটি ছেলে তাই বেঁচে গেল কংসের হাত থেকে। এ কি কম ভাগ্যের কথা! তাই তাকে নিয়েও ব্রজবাসীর আনন্দ কিছু কম নয়। বিশেষ করে, শিশুর বাবা বসুদেব যখন গোকুলে নেই, তখন তার আদর যত্ন তো একটু বাড়বেই। গোপরাজ নন্দেরও এতে নিজের ছেলের আনন্দের তুলনায় কিছু কম আনন্দ হয় নি। প্রাণের বন্ধু বসুদেবের ছেলে বলে কথা! নন্দ তাই রোহিণীর ছেলেকে দেখতে লাগল নিজের ছেলের মত।



সময় এসেছে রাজকর দিতে যাবার। সবাই তারা কংসরাজার সামন্ত। একে তো কংসের অনুচরদের অত্যাচারে সকলেই বিব্রত। তার ওপর ঠিক সময়ে কর দিয়ে না এলে, না জানি আবার কোন্ বিপদ ঘটে বসবে। তাই গোপদের হাতে গোকুলের সব ভার দিয়ে গোপরাজ নন্দ গেছেন মথুরায়। কংস রাজাকে সম্মান জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে এসেই দেখা হয়ে গেল তার বন্ধু বসুদেবের সঙ্গে। এভাবে যে দুজনের এখানে দেখা হয়ে যাবে, কেউই তা ভাবতে পারে নি। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আনন্দ, তেমনি বিষাদ। এতদিন পর দুই বন্ধুর দেখা—আনন্দ তো হবেই। তার ওপর বসুদেবের জন্য তাঁর দুঃখও কম নয়। সব খবরই জানে সে—বসুদেবের সব কটি ছেলেকে মেরেছে কংস। এমন কি, শেষ যে মেয়েটা হয়েছিল, তাকেও বাঁচতে দেয় নি। ওরই মধ্যে একটু ভাল যে, বসুদেবের গোকুলে যে ছেলেটি হয়েছে, তার টের পায় নি কংস।

বসুদেব গোকুলের সব খবরাখবর নিল, এই বয়সে নন্দের ছেলে হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করল, প্রাণের কথা হল দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করল না যে, নন্দের ছেলেটি তারই ছেলে, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এসেছেন নর-রূপ ধরে। আর যে কন্যাটিকে কংস হত্যা করেছে, সেটি ছিল নন্দরই মেয়ে—যোগমায়া। ভগবানের নির্দেশে সকলের অজান্তে বসুদেবই তাদের পাল্টা-পাল্টি করে রেখেছিল। এ কথাও নন্দকে জানাল না যে, সেই মেয়েটিকে আছাড় দিয়ে মারার সময় মহাশক্তি অষ্টভুজা দেবীরূপে আকাশে উঠে অন্তর্হিতা হয়ে যাবার আগে কংসকে বলে

গিয়েছিল—তোমার যম এখানে নয়, বড় হয়ে উঠছে অন্য জায়গায়।

নন্দকে এ কথাও বলল না বসুদেব, যে তা শোনার পর থেকে কি পরিমাণ অস্থির হয়ে উঠেছে কংস। বন্ধু অসুরদের ডেকে পরামর্শও করা হয়ে গেছে—কে সে ছেলে? কোথায় তার জন্ম হয়েছে—তা তো জানা যাচ্ছে না। একদিকে নজর রাখতে গিয়ে ইতিমধ্যে চারদিকে অনেক ছেলেই জন্মেছে। আর তাদের শত্রু যে বিষ্ণু, তাদেরই কারো ঘরে আছে সে। তারাই তার পরিচর্যা করছে। সুতরাং নির্বিচারে যেখানে যত শিশু আছে সবাইকে মেরে ফেলতে হবে, সেই সঙ্গে সেই সব ভক্তদেরও। তাহলে তার শত্রুও নিকেশ হয়ে যাবে। পরামর্শমত কাজও শুরু হয়ে গেছে।

এসব কিছুই না বলে বসুদেব শুধু নন্দকে বলল—ভাই, কর তো দেওয়া হয়ে গেছে, আর কোন কাজ তোমার এখানে নেই। দেরি না করে এই বেলা গোকুলে ফিরে যাও। কংসকে বিশ্বাস নেই। যদি হঠাৎ কোন উৎপাত শুরু করে সেখানে?

শুনে নন্দ চমকে উঠে একবার তাকাল বসুদেবের দিকে। জানে, বসুদেব কখনো আজেবাজে কথা বলে না। তাহলে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কোন কাণ্ড শুরু হয়ে থাকবে। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিল ব্রজধামের দিকে।

এদিকে সত্যি সত্যিই কংসের আদেশে কাজ শুরু করে দিয়েছিল অসুররা—শিশুনিধন যজ্ঞ। ওরা এই কাজের জন্যে পাঠিয়েছিল পূতনা নামে এক রাক্ষসীকে। এমনি দেখতে রাক্ষসরা বা অসুররা কদাকার, কুৎসিত হলে কি হবে, তারা এমনি মায়াবিদ্যে জানত যে, ইচ্ছেমত শরীর ধারণ করতে পারত। আর পূতনা ছিল তাদের মধ্যে এদিক থেকে দারুণ ধড়িবাজ।

তাই বেছে বেছে কংস পূতনাকেই পাঠাল গোকুলে নির্বিচারে শিশুহত্যা করার জন্যে। যাদের মনে কোন মায়া দয়া নেই, তাদের কাছে ভাল আর মন্দ। হিংসেয় যাদের মন ভরা, মিষ্টি মুখের মিষ্টি হাসি তাদের হিংসে দেয় আরও বাড়িয়ে। আর পূতনা তো রাক্ষসী! তার কথাই আলাদা।

একদিন সকাল হতে না হতেই ব্রজবাসী রমণীরা দেখল এক



মহিলাকে। কি অপূর্ব তাকে দেখতে। আর কথাগুলি কি দারুণ মিষ্টি! হাসলে যেন মনে হয়, মুক্তোর মত ঝকমক করছে দাঁতগুলো। চোখ দিয়ে তার স্নেহ ভালবাসা ঝরে পড়ছে, ব্রজের গোপ রমণীদের কত যেন আপনজন। আর দিন যেতে না যেতেই কত না আপনার হয়ে গেল সকলের। কারো মনে কোন সন্দেহও জাগল না। কারো বোন, কারো দিদি, কারো বা আবার মাসি—সকলের বাড়িতেই অবারিত দ্বার, আর বেশ খাতির।

যে কাজ করতে এসেছিল পূতনা, সে কাজে তাই কোনদিক থেকেই তার কোন বাধা এল না। বেছে বেছে ঢুকতে লাগল এক এক বাড়িতে, কোলে তুলে আদর করল শিশুকে নানা রকম গল্প করতে করতে। তারপর এক ফাঁকে সকলের অলক্ষ্যে সেই দুধের ছেলের মুখে গুঁজে দিতে লাগল নিজের স্তন। খিদের সময় তো বটেই, যে কোন সময়েই শিশুর কাছে স্তনদুগ্ধ অমৃত। নিশ্চিন্তে চুকচুক করে খেয়ে নিত তারা ভরপেট। ব্যস, কাজ শেষ। চলে যেত সেখান থেকে। দিন কয়েক বাদেই, কোথাও কিছু নেই, ছেলের হতো পেটখারাপ। তারপর ক্রমশ নীলবর্ণ হয়ে মরে যেত শিশু। কান্নার রোল উঠত বাড়িতে। ছুটে আসত পূতনা। সান্ত্বনা জানিয়ে যেত। কেউ টেরও পেত না, কোথা থেকে কি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে দিনকয়েকের মধ্যেই ব্রজের কত শিশু যে মায়ের কোল ছেড়ে অকালে চলে গেল—তার আর হিসেব রইল না।

গোকুলের সব খবরই পূতনার জানা। জানা হয়ে গেছে, গোপরাজ নন্দ গেছে মথুরায়। তার ঘরের ছেলেটি নাকি ভারি সুন্দর। আর ছেলেটির মা যশোদাও ভারি ভালবাসে সকলকে।

ঘুরতে ঘুরতে পূতনা টুক করে গিয়ে হাজির হল তার বাড়িতে। মুহূর্তে ভাব জমিয়ে নিল যশোদার সঙ্গে। ছেলের প্রশংসা করলে মায়ের বুক ভরে ওঠে, রাক্ষসী তা জানত। তাই ছেলেটিকে দেখে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। একরত্তি দুধের ছেলেকে টুপ করে তুলে নিল নিজের কোলে—বাঃ বাঃ! খাসা ছেলে, যেন চাঁদের মণি। কোন কিছুই মনে হল না যশোদার। বরং প্রশংসা শুনে বুক যেন তাঁর ভরে গেল।

হঠাৎ কি একটা কাজে একটু তফাতে গেলেন যশোদা। পূতনাও ছিল এই সুযোগের অপেক্ষাতেই। চট্ করে তার বিষ মাখানো স্তনটি ঢুকিয়ে দিল শিশুর মুখে। আর পাঁচটি শিশুর মত সেও চুকচুক করে টানতে শুরু করে দিল তার স্তনদুগ্ধ। আর পূতনাও মনে মনে হাসতে লাগল, আর একটা শিশু শেষ হতে যাচ্ছে ভেবে।

চোখ বুজে শিশু তার কচি কচি দুটি হাতে পূতনার স্তন ধরে চুষছে স্তনের দুধ। কতক্ষণই বা আর খাবে? এটুকু তো পেট। এদিকে শিশু চুষে চলেছে তো চুষেই চলেছে। যেন, এত খিদে পেয়েছে তার যে খেয়ে আশ আর কিছুতেই মেটে না।

একসময় পূতনার বুকের দুধ ফুরিয়ে গেল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু কি আশ্চর্য! দাঁতহীন মুখের ফাঁকে এত জোরে তার স্তন চেপে ধরেছে যে পূতনার সাধ্য কি তা ছাড়ায়। যত চেষ্টা করে পূতনার মনে হয় ছেলেটা যেন তত জোরে চেপে ধরছে তাকে। এবার রীতিমত কষ্ট হতে লাগল পূতনার। রাগও হতে লাগল তার ওপর। ক্রমশ যেন ঘেমে উঠতে লাগল পূতনা। মনে হতে লাগল, তার স্তন দিয়ে দুধের বদলে এবার যেন রক্তের ধারা বইতে শুরু করেছে। এ কি আপদ রে বাবা! বারবার ঠেলা

দেয়, যদি কোনরকমে ছাড়িয়ে নিতে পারে। বলে—ছাড়, ছাড় আর কত খাবি! কিন্তু ছাড়ার নামগন্ধ নেই শিশুর। সেভাবে চোখ বুজেই টেনে চলেছে।

শেষে আর থাকতে পারল না পূতনা। চিৎকার করে উঠল—গেলুম···গেলুম···। আর সেই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ল তার আসল রূপ। বিকটাকার সেই রাক্ষসী-রূপ। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে লুটিয়ে পড়েছে। পরিত্রাহি চিৎকার করছে। আর শিশু গোপাল তখনও নির্বিবাদে টেনে চলেছে তার স্তন।

চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে গোপ রমণীরা যে যেখানে ছিল সবাই। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তাদের। আর মন-প্রাণ দিয়ে ডাকতে লাগল নারায়ণকে—হে বিষ্ণু! হে নারায়ণ! তুমি তো আমাদের। তোমাকে ছাড়া আমরা তো আর কাউকে জানি না। রক্ষা করো আমাদের এই যশোদা দুলালকে, রক্ষা কর।

গোপ রমণীরা কেমন করে জানবে, যাকে তারা চোখের জলে ডাকছে, সে-ই শিশুঘাতী রাক্ষসী পূতনার ভবলীলা ঐভাবে সাঙ্গ করছে।

সত্যি সত্যিই এক সময়, অসহ্য সেই টানের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে ভবলীলা সাঙ্গ করল পূতনা। বিকটাকার বীভৎস সেই দেহটা তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে রইল প্রাণহীন অবস্থায়। আর শিশু নির্ভয়ে তার বুকের ওপর খেলা করছে, হাত-পা ছুঁড়ে।

মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল। গোঠে, মাঠে যে যেখানে ছিল ছুটে এল সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখতে। সত্যিই তো! এতগুলো ছেলের প্রাণ যে নিল, এমন ভাবে নন্দ-র অতটুকু ছেলে নিল তার প্রাণ! এ তো সাধারণ ছেলে নয়।.

রাক্ষসীর বুকের ওপর থেকে আস্তে আস্তে তারা তুলে নিয়ে এল ছেলেটিকে। তুলে দিল মা যশোদার কোলে। জলের ধারায় তার দু গাল তো ভিজেই ছিল, তখনো থামে নি চোখের জল। সেই মুখ দিয়ে ছেলের গাল ঘষতে লাগল সস্নেহে। আর বলতে লাগল—বাছা আমার! বাছা আমার!

ঠিক সেই সময়েই নন্দ এসে হাজির হল সেখানে। সব দেখে, সব শুনে তো অবাক। বুঝতে পারল সবই কংসের চক্রান্ত। ভাগ্যি বসুদেব তাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিল। হায় রে! কত ছেলের প্রাণই না গেল এর মধ্যে!

যাই হোক, ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় তাদের ছেলে কোন রকমে বেঁচে গেছে মনে করে, যাতে আর তার কোন অমঙ্গল না হয় তাই মন-প্রাণ দিয়ে পুজো দিল তারা ভগবানের। যশোদা আর রোহিণী মিলে ছেলের গায়ে বুলিয়ে দিল গরুর লেজ, নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিমত। তারপর গরুর মূত, পরে গরুর ধুলোয় ছেলেকে স্নান করিয়ে তার কপালে চন্দনের অনেকগুলো ছাপ দিয়ে দিল—যাতে আর কোন অশুভ এসে ছেলের ক্ষতি না করতে পারে।

এবার সবাই মিলে কুড়ুল দিয়ে পূতনার দেহ টুকরো টুকরো করে জড়ো করে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল তাতে। রাক্ষসীর দেহ আগুনে পুড়লে কি বদ গন্ধই না বের হবে। তাই সবাই বেশ শক্ত করে চাপা দিয়েছিল নাক। কিন্তু আশ্চর্য! যত পুড়ছে, তত বের হচ্ছে অগুরু-চন্দনের গন্ধ। আর সেই গন্ধ এমনি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে যে তখনও পর্যন্ত যারা জানত না তারাও এসে হাজির হয়ে গেল সেখানে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় ব্রজে আর কোথাও কোন অশান্তি নেই। সকলের মন থেকে সব বিভীষিকাই দূর হয়ে গেছে। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সবার জীবন।

ওদিকে কিন্তু কংসের চোখে ঘুম নেই। খবর পেয়েছে পূতনা আর বেঁচে নেই। নন্দের ছেলেকে মারতে গিয়েই সে নিজে মরেছে। মহা চিন্তায় পড়েছে কংস। অমন পূতনাকে যে মেরে ফেলতে পারে, তবে সে-ই কি তার যম? দেবকীর অষ্টম গর্ভের ছেলে তাকে মারবে—আকাশবাণী সেই রকমই তাকে বলেছিল। তার ওপর নারদ মুনিও এসে তাকে সেই রকমই সাবধান করে দিয়েছিলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভের যে সন্তানটিকে মারতে গিয়েছিল, সে ছেলে না হয়ে হয়েছিল মেয়ে। সে-ও আবার যাবার সময় বলে গেছে—তোর যম আসছে। ওদিকে নন্দের ঘরের ছেলেটা। ছেলেটাকেও তো দেখা যাচ্ছে, এরই মধ্যে বড় মারাত্মক। বসুদেবের সঙ্গে নন্দের আবার দারুণ বন্ধুত্ব। কেমন যেন গোলমাল লাগে কংসের। যাই হোক, ঠিক করল কংস, এখন থেকে নন্দের ঐ ছেলেটার দিকেই নজর রাখতে হবে বেশি করে।

কংসের এক দৈত্য চাকর ছিল। নাম তার তৃণাবর্ত। সে যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি কুটিল।

অনেক ভেবে-চিন্তে তৃণাবর্তকে ডেকে কংস বলল—শোন তৃণাবর্ত, যেভাবেই হোক, নন্দের ঘরের ঐ ছেলেকে এখানে তুলে নিয়ে এসো। তারপর, যা করবার, আমি করব।

প্রভুর আদেশ। আকাশপথে তৃণাবর্ত ছুটল মথুরা থেকে ব্রজধামে।

নন্দালয়ে যশোদার ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে মনে হল, যেন ছেলেকে আর কোলে রাখতে পারছে না। নিত্য যাকে কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদর করে, কেন আজ এত অল্প সময়ের মধ্যেই ইচ্ছে হচ্ছে, কোল থেকে নামিয়ে দেয়? যতই চেষ্টা করে কোলে রাখতে, ততই যেন বাড়তে থাকে তার হাতের ব্যথা। শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক সময় বাধ্য হল কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিতে।

শুইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে এল যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। অসময়ে এমন ঝড় কেউ কখনো দেখে নি। ধুলো-বালি যেখানে যা ছিল বোঁ-বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। সেই সঙ্গে পাথরের কুচো। সে যেন এক ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ড! এমন ঢেকে গেল চারদিক ধুলো-বালিতে যে আশপাশের কিছু দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা, চোখ খোলাই দায়। তার ওপর আবার এমনি শব্দ যে কাছের মানুষের কথাও কানে আসে না।

যশোদা আর একটুও দেরি না করে, সেই অবস্থার মধ্যেই কোন রকমে চোখ আড়াল করে মাটি থেকে তুলে নিতে গেলেন ছেলেকে। কোথায় ছেলে? ধড়াস করে ওঠে মায়ের বুক। ছেলে কোথায় গেল? এদিক হাতড়ান, ওদিক হাতড়ান। না, ছেলেকে আর খুঁজে পান না। সেখানেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন যশোদা। তখনো ঝড়ের এমনি ঘূর্ণি আর শব্দ যে আশপাশের গোপ রমণীরা কেউ শুনতেও পেল না তাঁর কান্না।

এক সময় ঘূর্ণিঝড় ঘুরতে ঘুরতে মাটি ছেড়ে যখন অনেকখানি ওপরে উঠে গেল, তখন যশোদার কান্না শুনতে পেয়েই ছুটে এসেছে সকলে—কি হল ?...কি হল ?

—আমার ছেলে !...আমার ছেলেকে এখানে শুইয়ে রেখেছিলাম ।...কোথায় গেল ? বলতে বলতে যশোদা কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন ।

আশ্চর্য ব্যাপার ! যাবে কোথায় ? ঘূর্ণিঝড় কি কখনো একটা ছেলেকে একেবারে শূন্যে তুলে নিয়ে যেতে পারে ?

সকলে মিলে শুরু করে দিল খোঁজাখুঁজি । এপাশ-ওপাশ—চারপাশ । কিন্তু কোথায় ছেলে ? তাই তো, কোথায় গেল ছেলে ?

কেমন ভাবে জানবে গোপ-রমণীরা যে কংসের দৈত্য-অনুচর ঐভাবে শিশুকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ? গোপরাজ নন্দও খুবই চিন্তায় পড়ল ।

ওদিকে নিজের কাজ হাসিল করে দৈত্য তৃণাবর্ত অনেকখানি তুলে এনেছে শিশু গোপালকে । এবার তাকে নিয়ে রওনা দেবে মথুরায় । কতখানিই বা পথ, আর সময়ই বা কতটুকু লাগবে ? তৃণাবর্তের বুকে শিশু গোপাল । ছোট ছোট দুটো হাত দিয়ে ধরে আছে তার গলা ।

আকাশপথে কিছুটা উড়তেই মনে হল তৃণাবর্তর, যেন বড় ভারী লাগছে ছেলেটা !

ধুৎ ; এই তো একরত্তি ছেলে ! আর সে এক মন্দ অসুর । তার এক এক ঘুসিতে কত মানুষের প্রাণ গেছে । না, মনকে দুর্বল করলে চলে না ।

কিন্তু, সত্যি সত্যিই যে বড় ভার লাগতে শুরু করল ! বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না কেন ? এ কি, ক্রমশ নিচের দিকে নেমে পড়তে হচ্ছে কেন ?

এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল তৃণাবর্ত । এখান থেকে পড়লে তো আর রক্ষা নেই । দরকার নেই বাবা, এমন ছেলে বয়ে নিয়ে যাবার । মনে মনে বলল তৃণাবর্ত—আগে তো নিজের প্রাণ বাঁচাই । তারপর দেখা যাবে ।

এই ভেবে শিশু গোপালের হাতদুটো নিজের গলা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল তৃণাবর্ত । এ কি ! এ যে সাঁড়াশির মত আটকে আছে ।

ছাড়াবার জন্যে অনেক কসরৎ করল তৃণাবর্ত । কিন্তু কিছুতেই পারল না । আবার ঐ বিশাল ভারবোঝা নিয়ে যেতে পারল না ।

শেষে ব্রজের কাছেই এসে এমন জোরে আছড়ে পড়ল এক পাহাড়ের ওপর, যেন পাহাড় সমেত সারা ব্রজধাম কেঁপে উঠল ।

কি ব্যাপার, দেখার জন্যে সবাই ছুটল সেই পাহাড়ের দিকে । দেখল, বিকটাকার এক দৈত্য পড়ে । চারদিক তার থেঁতলে গেছে । আর তারই বুকের ওপর শুয়ে একটি শিশু—একেবারে অক্ষত ।

—আরে ! এ যে আমাদের গোপাল ! বলেই গোপেরা ছুটল সেইদিকে । সযত্নে মরা তৃণাবর্তের বুকের ওপর থেকে নিয়ে এসে তুলে দিল যশোদার কোলে ।

হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা যশোদার সে কি আনন্দ । চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল তার মুখ । তাঁর চোখের জলে ভেসে গেল ছেলের চোখের কাজল । বারবার বলতে লাগল—হে বিষ্ণু, হে নারায়ণ ! তোমাকে আমরা দিনরাত ডাকছি । আমাদের ডাক নিশ্চয়ই তুমি শুনতে পাও । তা নইলে কি এমন ভাবে আমাদের ছেলেকে আমরা ফিরে পেতাম ?

অবাক নন্দ । মনে পড়ে তার বসুদেবের কথা । বারবার সে সাবধান করে দিয়েছিল । না-জানি, এরপর, আরও কি কপালে আছে !

কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে নন্দের এই ভেবে, যে একরত্তি দুধের ছেলে তাদের—তার হাতে কেমন করে মারা গেল পূতনার মত রাক্ষসী, তৃণাবর্তের মত দুর্দান্ত কংসরাজার অনুচর ।



রাখাল-রাজার অসুর বধ

দেখতে দেখতে যশোদা-দুলাল বাল-গোপাল বড়-সড় হয়ে উঠল । সেই সঙ্গে রোহিণীর ছেলেও, যদিও গোপালের চেয়ে বয়সে সে একটু বড়ই । বুক-টান থেকে শুরু করে হামাগুড়ি, তারপর টাল-মাটাল পায়ে হাঁটা । মুখে আধো-আধো বুলি । ভরে ওঠে মায়েদের প্রাণ । গোপ রমণীদের মনে জাগে কত না কৌতূহল ।

ইতিমধ্যে একদিন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভগবান শঙ্করের শিষ্য গর্গমুনি এসে হাজির হয়েছিলেন ব্রজে । যদুকুলের পুরোহিত তিনি । মথুরা থেকে বসুদেবই তাঁকে লুকিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ছেলে দুটির অন্নপ্রাশনে, নামকরণ করে দিয়ে আসার জন্য । যাতে কংসের মনে কোন সন্দেহ না জাগে তাই সাধ্যমত বেশি ঢাক-ঢোল না পিটিয়েই সেই কাজ সেরে গেছেন তিনি । নন্দ আর যশোদাকে আড়ালে ডেকে, ছেলে দুটির জন্মের রহস্যও শুনিয়ে দিয়ে গেছেন । রোহিণীর ছেলের নাম রেখেছেন রাম । আর যশোদা-দুলাল থেকে একটু বলশালী বলে ডেকে গেছেন 'বলরাম' বলে । আবার রোহিণীর ছেলে বলে, তার আরও একটা নাম রেখেছেন 'রৌহিণেয়' । যশোদা-দুলালের গায়ের রঙ বলরামের মত সাদা ছিল না । ছিল নতুন ঘাসের মত শ্যামবর্ণ । গর্গমুনি তাই তার নাম রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ । আবার বসুদেবের ছেলে বলে আরও একটা নাম রেখেছিলেন—বাসুদেব ।

যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম—ভাই আর দাদা, দুজনেই এখন আপন ইচ্ছায় চলতে ফিরতে শিখেছে, নানারকম খেলাও খেলতে শিখেছে । সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেছে বেশ কিছু । মায়েদের চোখ সব সময় নজর রাখলে কি হবে, দামাল হলে ছেলেদের কি সব

সময় আটকে রাখতে পারে ?

এদিকে ব্রজের গোপদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই ; কংস যেভাবে গোকুলে অত্যাচার শুরু করেছে, তাতে এখানে আর ছেলেপুলে নিয়ে শান্তিতে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। তাই গোপরাজ নন্দ সকলের সঙ্গে একদিন পরামর্শ করে ব্রজ ছেড়ে সবাইকে নিয়ে চলে এসেছে বৃন্দাবনে। কুল কুল করে বয়ে চলেছে যমুনা। পাশেই গোবর্ধন পাহাড়। জায়গায় জায়গায় সুন্দর সুন্দর সব গো-চারণ। জায়গাটা কি ভালই না লেগে গেল দুই ভাই-এর। ক্রমে ক্রমে দু ভাই হয়ে উঠল দক্ষ রাখাল। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে পাল-পাল গরু নিয়ে যেতে লাগল গোচারণে। ঘাসের মাঠে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সখীদের নিয়ে মনের আনন্দে এমন ভাবে খেলায় মেতে উঠত যে খিদের কথাই ভুলে যেত। রাখাল-রাজা শ্রীকৃষ্ণের খেলার মধ্যে থাকত আবার এমন চাতুরী যে সাথীরাও তাতে মজে যেত।

একদিন সদলবলে গরুর পাল নিয়ে গেছে রাখাল-রাজা শ্রীকৃষ্ণ দাদা বলরামকে নিয়ে যমুনার তীরে। গরুগুলিকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে খেলায় মেতেছে মনের আনন্দে। খেলতে খেলতে হঠাৎ গরুর পালের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল রাখাল-রাজা। দাদা বলরামকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বলল—দাদা, দাদা, দেখ-দেখ, পালে একটা নতুন গরু না ?

ভাল করে দেখল বলরাম—ঠিকই তো রে ভাই। এ তো আমাদের এই দলে ছিল না। কোথা থেকে এল আবার ? ভাল ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তো।

রাখাল-রাজার কিন্তু জানা হয়ে গেছে। ও আর কেউ নয়। কংসের বন্ধু বৎসাসুর এসেছে, সুযোগ বুঝে তাদের মারবার জন্য।

কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ না করে বলল—লক্ষ্য রাখ দাদা, তবে একটা মজা দেখ।

এই বলে, যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গরুগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে যাচ্ছে, এমন ভান করে, বন্ধুদের খেলতে বলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর সেই গরুটির কাছে গিয়ে হঠাৎ তার লেজটা সাপটে ধরে চরকির মত শূন্যে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে শুরু করে দিল। বৎসাসুর ভাবতেও পারে নি, তাকে এমনি এক ফাঁদে পড়তে হবে। সে-ও শুরু করল পরিত্রাহি চিৎকার। কিন্তু কে তখন তাকে পরিত্রাণ করবে ? সঙ্গী-সাথীরা খেলা ভুলে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তাদের রাখাল-রাজার কাণ্ড। অত বড় একটা মদ্দ গরুকে কেমন করে রাখাল-রাজা অমন শূন্যে তুলে লাটুর মত ঘোরাচ্ছে রে বাবা ! গরুটার চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

বেশ খানিকক্ষণ এইভাবে ঘুরিয়ে এক সময় ছেড়ে দিল রাখাল-রাজা। বৎসাসুরও ছিটকে গিয়ে প্রাণহীন দেহ নিয়ে এমন সজোরে পড়ল গিয়ে এক কদবেল গাছে যে গাছটাও ভেঙ্গে পড়ল মাটিতে, আর বৎসাসুরও ধরাশায়ী হল।

বিদায় হল আর এক পাপ—কংসের আর এক দোসর।

বুঝতে থাকি থাকে না কংসের তার প্রতিপক্ষ কত শক্তিশালী। এই বয়সেই বিনা অস্ত্রে তার এমন বাঘা বাঘা অনুচরদের ছদ্মবেশ ধরে ফেলতে পারে ! নিশ্চয়ই এই সেই তার দৈববাণীর যম—স্বয়ং শ্রীহরি। দৈববাণী থেকে শুরু করে নারদ মুনি পর্যন্ত বলেছিলেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভের ছেলে তাকে মারবে। কিন্তু ছেলে না হয়ে মেয়ে হল। তাহলে তো ওদের সব কথাই মিথ্যে হয়ে গেছে। তাহলেও নন্দের ঘরে অমন ছেলে এল কোথা থেকে ? বেশ ধাঁধা লাগে কংসের। এই সংশয়ের নিরসন করতেই হবে। সে তো শুধু মথুরার নয়, তাদের সকলের রাজা। ভয় পেয়ে পিছিয়ে পড়লে তো চলবে না।

তাই এবার সে পাঠাল তার আর এক অনুচর—বকাসুরকে।

প্রতিদিনের মত সেদিনও মা যশোদা সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে। বলরামকে সাজিয়ে দিয়েছেন মা রোহিণী। সঙ্গী-সাথীদের সাথে গরুর পাল নিয়ে সবাই গেছে যমুনার তীরে।

মনের আনন্দে নধর ঘাসের বনে এখানে-ওখানে চরে বেড়াচ্ছে গরুর পাল। রাখাল-রাজা শ্রীকৃষ্ণ দাদাকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শুরু করে দিয়েছে খেলা। খেলতে খেলতে এক সময় বলল রাখাল রাজা—চল, গরুগুলোকে একটু জল খাইয়ে আনা যাক।

শ্রীকৃষ্ণের হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত গরু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, সকলকে তাড়িয়ে জড়ো করে ওরা নিয়ে চলল যমুনার জলের দিকে। গরুগুলোরও যেন খুব তেষ্টা পেয়েছিল। আকণ্ঠ জল খেল তারা। আবার তাদের তাড়িয়ে আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সবাই—এটা আবার কি ! পাহাড়ের চূড়া যেন একটা বাজের আঘাত খেয়ে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে পড়ে আছে পথ আগলে ? কই, যাবার সময় তো চোখে পড়ে নি কারো। এখন কোথা থেকে এল ?

দূর থেকে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখল সবাই—ঠিক যেন একটা বক। দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেল তারা—না জানি এ আবার কোন উৎপাত !

বলরামের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সঙ্গীসাথীরা যখন এই রকম ভাবছে, রাখালা রাজা শ্রীকৃষ্ণ পা-পা করে এগিয়ে চলল তার দিকে। নিষেধ শুনল না কারো। কেনই বা শুনবে ? সে হল ওদের রাজা। তার কি ভয় পেলে চলে ?

যেই এগিয়েছে কয়েক পা, হঠাৎ নড়ে-চড়ে উঠল মরার মত পড়ে থাকা বকের মত সেই প্রাণীটা। চোখের পলকে ঠোঁটদুটো ফাঁক করে বিশাল হাঁ নিয়ে মাছের মতই টুপ করে গিলে ফেলল রাখাল রাজাকে। দেখে তো বলরাম থেকে শুরু করে সকলেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। আর বুঝি তারা ফিরে পাবে না তাদের বন্ধুকে। গরু নিয়ে বাড়ি ফিরে কি বলবে তারা !

হঠাৎ দেখল, কি এক যন্ত্রণায় ছটফট শুরু করে দিল বকটা। অমন এক মানুষখেকো বক কি গোঙানিই না আরম্ভ করল ! জিভ-তালু পুড়ে গেলে যেমন জ্বালা হয়, বকাসুর তখন ভেতরে-ভেতরে সেই জ্বালায় জ্বলতে শুরু করেছে। শিকারকে তখনও তো একেবারে গিলে ফেলতে পারে নি। তাই মুখ ফাঁক করে বাইরের বাতাস নিয়ে যে সেই জ্বালা কমাবে, তারও উপায় নেই।

শেষে কিন্তু আর থাকতে পারল না। জিভ-তালু থেকে শুরু করে নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত ততক্ষণে যেন জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। মুখ ফাঁক করে বকাসুর বাধ্য হল যা গিলেছিল, তা বমি করে ফেলতে। যেই বমি করা, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল রাখাল-রাজা। তাকে ফিরে পেয়ে সকলের কি আনন্দ। দেখল দেহের কোথাও এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি তার।

বেরিয়ে এসেই বালক রাখাল-রাজা করে বসল আর এক তাজ্জব

কাণ্ড। ছোট ছোট তাঁর দুটো হাত দিয়ে বকাসুরের ফাঁক করা ঠোঁটদুটো ধরে এমনভাবে আরও জোরে ফাঁক করে ধরল যে দু-চির হয়ে চিরে গেল বকাসুর।

বকাসুরের ভবলীলাও সাঙ্গ হল। মনের আনন্দে ফিরে এল সবাই ঘরে।

ছেলের কীর্তি-কাহিনী শুনে গোপ-গোপীরা তো অবাক। এ যে বিশ্বাসই করা যায় না! মা যশোদা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে শুধু বললেন—ঠাকুর, তোমার দয়া না থাকলে কি আমার ছেলে আজ ফিরে আসত?

কংসের চিন্তা বাড়ল আরো। সামান্য পাঁচ বছরের একটা ছেলের হাতে মারা গেল বকাসুর?

এবার সে পাঠাল অঘাসুরকে। তার মত দুর্দান্ত অসুর অনুচর কংসরাজের খুব কমই ছিল। অমৃত পান করে দেবতারা অমর হলেও দারুণ ভয় খেতেন তাকে। মনে মনে দিনরাত কামনা জানাতেন—অসুরটা তাড়াতাড়ি মরুক, আমরাও ভয়ের হাত থেকে বাঁচি। কোন সময় কি কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, কে জানে?

পাল পাল গরু নিয়ে, দাদার সঙ্গে সাথীদের নিয়ে সেদিনও রাখাল রাজা এসেছে যমুনার তীরে। ছেড়ে দিয়েছে গরুগুলোকে। নিজেরা মেতেছে খেলায়। কত রকমের সব খেলা—ফুল ছোঁড়া, ময়ূরের পেখম গুঁজে দেওয়া, লুকোচুরি—যখনই যেটা মাথায় জাগে, তখনই শুরু হয়ে যায় সেই খেলা। খেলাতেই মত্ত সবাই। চুপি চুপি সেখানে এলো অঘাসুর। তফাতে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখতে লাগল তাদের। আর ভাবতে লাগল—সেই ছেলে কে হতে পারে এদের মধ্যে, যে তার বোন পূতনা আর ভাই বকাসুরকে মারতে পারে? রাজার চোখের ঘুম কেড়ে নিতে পারে? ভালভাবে দেখতে দেখতে নজর পড়ল পাঁচ বছরের কালো ছেলেটার দিকে। ছোট হলেও, সকলের থেকে যেন একটু আলাদা, আর সবাই খেলছে তাকে ঘিরেই। অঘাসুর নিশ্চিত হল— এই সেই ছেলে। রাগে কিড়মিড় করে উঠল দাঁত। মনে মনে বলল—দাঁড়া! এখন খেলছিস। মনের আনন্দে খেলে নে। তারপর···। আজ আর তোকে তোর গরু নিয়ে ফিরতে হবে না। কেমন তুই রাখাল রাজা, আজ টের পাবি।

খেলা শেষ করে গরু-বাছুরদের নিয়ে ফিরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল রাখাল বালকেরা। এ কি রে বাবা! এ যে দেখতে বিশাল একটা অজগর সাপের মত পথের মাঝে পড়ে রয়েছে মুখ হাঁ করে! একটু তফাত থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল ভাবে দেখল তারা—হাঁ-করা মুখখানা কি বিশাল! পথের ওপর বের করে রাখা জিভটা কি লম্বা! যেন আর একটা পথ, স্বচ্ছন্দে মাথা না নামিয়েই তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়! দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, যেন ঝকঝকে কুড়ুল, দুটো চোখ যেন আগুনের গোলা। নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে, যেন আগুনের হল্কা। দেখতে ঠিক অজগর। কিন্তু, এখানে এমন সাপ এল কোথা থেকে?

সত্যিই কি অজগর? সত্যিই কি সাপ? আরও একটু কাছে এগিয়ে এল রাখাল ছেলেরা গরুর পাল নিয়ে। দেখল জিভের ভেতর দিয়ে সোজা তাকালে বেশ একটা গুহার মত দেখাচ্ছে না?

ঠিক করে ফেলল ছেলেরা, সাপই হোক, আর যাই হোক, ওরা সোজা ওর ভেতরে ঢুকে মজাটা দেখে আসবে! আগে যতটা ভয়



ছিল, এখন আর তাদের তা মোটেই নেই। তাদের রাখাল রাজা অমন বাঘা বাঘা দুটো অসুরকে মেরে ফেলার পর থেকে যেটুকু ভয় ছিল মনে, সেটুকুও একেবারে উবে গেছে। আর কোন ভাবনা-চিন্তা না করে গরুর পাল নিয়ে সোজা তারা ঢুকতে শুরু করে দিল অজগরের সেই মুখের ভেতর। বলতে বলতে গেল—ভাই কৃষ্ণ, আমরা কিন্তু ভেতরে ঢুকছি। তেমন কিছু হলে তুমি তো আছই।

তফাতে দাঁড়িয়ে তখনও রাখাল-রাজা তার গরুর পাল নিয়ে। দেখল, নিষেধ করার আগেই সবাই—এমন কি দাদা-সুদ্ধ ঢুকে পড়ল ওর মুখের ভেতর। গরুর পাল নিয়ে তার জিভের ওপর কেমন হেঁটে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন আর ভাবছেন, নিষেধ করার সুযোগ যখন দিল না, তখন আর করার কি আছে! একটু ফলভোগ ওদের করতেই হবে।

রাখাল-রাজা দেখল, এতগুলো শিকার ওর মুখের মধ্যে ঢুকল, অথচ এখনও মুখ বন্ধ করল না অজগরটা। আবার জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

দাদার সঙ্গে সাথীরা যখন মৃত্যুর মুখে ঢুকে গেছে, রাখাল রাজা কি আর তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে? আবার সে না ঢুকলে অজগরও মুখ বন্ধ করে পথ ছাড়বে না।

গরুর পাল নিয়ে রাখাল-রাজাও তাই সোজা ঢুকে পড়ল তার মুখের ভেতর। যেই না ঢোকা সঙ্গে সঙ্গে অজগরের হাঁ-মুখ গেল বন্ধ হয়ে। থেমে গেল তার সেই আগুন নিঃশ্বাস। আকাশ-বাতাস যেন 'গেল' 'গেল' করে হাহাকার করে উঠল। অঘাসুরের বন্ধুরা তো উঠল আনন্দে মেতে—শত্রু খতম হয়েছে। আর ভাবনা কি?

এদিকে রাখাল-রাজা গলা পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওদের মত আর ভেতরে ঢুকল না। সেখানে থেকেই শুরু করল তার সেই খেলা। অঘাসুরের মনে হল, তার দম যেন ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসছে। যত চেষ্টা করে একরত্তি ঐ ছেলেটাকে গিলে ফেলবার, ততই যেন তার নিঃশ্বাস আটকে যেতে থাকে। না পারছে দম নিতে, না পারছে দম ফেলতে। রাস্তার উপর আছাড়-কাছাড়, দমাদমি শুরু করে দিল সে। পেটের ভেতরটা যেন চড়চড় ফুলে উঠতে লাগল, ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল চোখদুটো। তখন তার সে এক মারাত্মক অবস্থা। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারল না অঘাসুর। সশব্দে তার পেট গেল ফেটে। ছিটকে পড়ল চারদিকে নাড়িভুঁড়ি। বেরিয়ে এল গরু বাছুর নিয়ে বলরাম আর সঙ্গী-সাথীরা, সেই সঙ্গে গরু-বাছুর নিয়ে রাখাল-রাজাও। রাখালছেলেরা বেশ একটু জখম হয়েছিল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই সুস্থ হয়ে যেভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, সেভাবেই ফিরে গেল সকলে মিলে বাড়িতে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বৃন্দাবন উজাড় করে সবাই দেখতে এল অঘাসুরের মৃতদেহটাকে। দেখল বিশাল একটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে তার গায়ের চামড়া। যশোদা রোহিণী আবার কোলে নিয়ে দুধের ছেলেকে কত না আদরই করলেন, ফেললেন কত না চোখের জল! গোপরাজ নন্দ থেকে শুরু করে যত গোপ ছিল, তারা মনে মনে পুত্ররূপী ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে শরণ নিল তাঁর। বলল—বুঝতে পারছি, তুমিই সেই বিষ্ণু, সেই নারায়ণ। আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যই তুমি এসেছ ছেলে হয়ে আমাদের ঘরে।

বৃন্দাবনে যখন এই উল্লাস, মথুরায় তখন আবার বিষাদ। অঘাসুরের যে বন্ধুরা এতক্ষণ আনন্দে নাচছিল, এবার তারা মুষড়ে পড়ল। যার দাপটে দেবতারাও মাথা তুলতে পারত না, শেষে ঐ একরত্তি ছেলের হাতে তাকেও প্রাণ হারাতে হল!

কংসের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না এই তার সেই ভাগনেবেশী যম—শ্রীহরি। আরও খেপে ওঠে কংস। যাক পূতনা, যাক বৎস, বক, অঘ—এখনও অনেক দুর্ধর্ষ অনুচর আছে। শেষ পর্যন্ত, নিজেই দেখবে, কতখানি শক্তিমান সে।

রাখাল-রাজা শ্রীকৃষ্ণের বয়স এখন ছয়। আরো অনেক খেলা খেলতে শিখেছে সে এখন। তার ওপর অনুকরণ। বক, চক্রবাক, ভারুই, কোকিল, ময়ূর—সবকটা পাখি-পাখালির ডাক অবিকল নকল করে তাক লাগিয়ে দেয় সাথীদের। দু ভাই হাত ধরাধরি করে যখন নাচে, গান গায়, হাততালি দেয়, কি ভালই লাগে সকলের। একদিকে চরে গরুর পাল, আর একদিকে ওদের খেলা। এমনি ভাবেই হেসে-খেলে চলে দিন।

একদিন বন্ধু শ্রীদাম, সুবল সমেত রাখাল সাথীরা এসে বলরাম আর শ্রীকৃষ্ণকে বলল—জানো, সামনে ঐ যে গোবর্ধন পাহাড় ওরই কাছে সুন্দর এক বাগান আছে। নাম তার তালবন। অজস্র তালগাছ। গাছে গাছে কত তাল। নিচেও যে কত পাকা তাল পড়ে, তা আর কি বলব, ভাই। দেখে এত লোভ হয়। কিন্তু, তাল খাওয়া তো দূরের কথা বাগানে ঢোকার উপায় নেই।

—কেন? জিজ্ঞেস করে বলরাম।

—ধেনুকাসুর নামে একটা অসুর, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর আর পাজি, আত্মীয়দের নিয়ে থাকে ঐ বাগানে। দেখতে ঠিক যেন একটা বড় গাধা। ব্যাটা চারদিকে খালি পাক খায়, আর ঘুরে ঘুরে দেখে। বাগানে যদি কেউ ঢোকে তো আর রক্ষে নেই।

—তাই নাকি? বলে রাখাল রাজা—তাল ফল তো বড় ভাল মিষ্টি ফল, তাই না দাদা? জিজ্ঞেস করে বলরামকে।

—মিষ্টি মানে, দারুণ মিষ্টি। বলে বলরাম।

—তা যাবে নাকি? জিজ্ঞেস করে রাখাল রাজা।

—ওদেরও যখন এতই ইচ্ছে চল্ না ভাই, যাওয়াই যাক। তারপর দেখা যাবে, কত বড় সে অসুর। বলল বলরাম।

দাদারও যখন ইচ্ছে, তখন দ্বিতীয় আর কোন কথা নয়। সবাই মিলে হুট করে গিয়ে ঢুকল বাগানে। তারপর, তালগাছ ধরে নাড়াতেই ধুপধাপ করে পড়তে শুরু করল পাকা তাল।

শব্দ শুনেই কোথায় ছিল গর্দভাকার ধেনুকাসুর, হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে এল ছুটে—কে? কে আমার বাগানে ঢুকেছে না বলে? কার এত সাহস যে আমার বাগানে ঢুকে ফল পাড়ে?

এসেই দেখে, কতকগুলো কচি কচি ছেলে। রেগে আগুন হয়ে ওঠে ধেনুকাসুর।

—এই···এই···সব আমার বাগানে ঢুকেছিস কেন? আবার গাছ নাড়িয়ে ফল-ও পাড়ছিস? এত বড় সাহস! জানিস না, এখানে ঢুকলে কেউ আস্ত ফিরে যায় না।

—জানি! গম্ভীর স্বরে বলল বলরাম।

—জেনে ঢুকেছিস?

—হ্যাঁ, সব জেনেই ঢুকেছি। এত গাছের এত ফল, সব তুমি একা ভোগ করবে নাকি? আর আমরা দূর থেকে দেখে, না খেয়ে চলে যাব? বলে বলরাম।

—তোর সাহস তো কম নয় ? জানিস মানুষ, দেবতা তো কোন ছার, আমার বন্ধু হলেও রাজা কংস আমাকে সমীহ করে কথা বলে। গর্জন করে ওঠে ধেনুকাসুর।

—হ্যাঁ···একটা গাধা, তার ওপর স্বার্থপর ! তার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতে হবে ? ভেংচি কেটে ওঠে রাখাল-রাজা শ্রীকৃষ্ণ।

—তবে রে ! পুচকে পুচকে ছেলে সব, আবার বড় বড় কথা ! এই বলে চোখ পাকিয়ে, দাঁত খিচিয়ে ছুটে এসেই পেছন ফিরে পেছনের দুটো পা তুলে সজোরে মারল বলরামের বুকে। মেরেই তেড়ে গেল আর সব ছেলেদের দিকে। শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে শুধু বলল—গাধার আবার তেজ দেখ !

শুনেই ধেনুকাসুর ছুটে এল শ্রীকৃষ্ণের দিকে। বলরামও ইতিমধ্যে টাল সামলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ভাই-এর কাছে। গর্দভ আবার শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে পেছনের জোড়া পা। বলশালী বলরাম খপ্ করে পা-দুটো নিজের হাতের মুঠোয় ধরে বাঁই বাঁই করে শূন্যে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল একটা তালগাছের দিকে। ঘোরানোর ফলে প্রাণবায়ু তো ধেনুকাসুরের প্রায় বেরিয়েই গিয়েছিল, তার ওপর সজোরে গাছে এসে ধাক্কা লাগাতে একেবারে খতম হয়ে গেল। কিন্তু মজা হল এই যে, সেই তালগাছটা উপড়ে আর একটা তালগাছে, সেটা উপড়ে আবার অন্য এক গাছে—এই ভাবে বেশ কয়েকটা তালগাছ উপড়ে পড়ল।

সেই দেখে ধেনুকাসুরের আত্মীয়রা সব বেরিয়ে এল মার··মার···করতে করতে। কিন্তু কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারল না। কৃষ্ণ-বলরামের হাত থেকে।

গ্রীষ্মকাল। বেশ গরম চারদিকে। কিন্তু ছেলেদের কাছে গরমের আবার তাপ ! বৃন্দাবনের চারদিকেই ফুল ফলের বাগান। তারই মধ্যে একটা শান্ত-সুন্দর বাগান বেছে নিয়ে রাখাল রাজাকে নিয়ে গোপ-বালকেরা শুরু করেছে খেলা। পাশেই মনোরম এক সরোবর। সরোবরে খেলে বেড়াচ্ছে হাঁস। আর বাগানে ছেলেরা।

অসুর-রাজ কংস এবার পাঠিয়েছে তার আর এক অনুচর প্রলম্বকে। ভয় দেখিয়ে বা অন্য উপায়ে যখন তাকে মারা গেল না, তখন যেভাবেই হোক, ওদের এখানে তুলে আনতেই হবে।

প্রলম্ব এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ। সে এসে ওদের দলে রাখালের বেশে ভিড়ে গেল। বৃন্দাবনে কত গোপ, কত রাখাল ! সবাই কি সবাইকে চিনতে পারবে, না চেনে !

বেশ সুন্দর দেখতে রাখাল ছেলেটি। এসেই বলল—ভাই, তোমাদের সঙ্গে আমায় খেলতে নেবে ?

সকলেই রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু রাখাল-রাজার চোখকে ফাঁকি দেবে সাধ্য কার ! চোখ টিপে দাদাকে শুধু একটু ইশারা করে দিল সে।

তারপর বলল—ভালই হল। বিজোড় ছিলাম, এবার জোড় সংখ্যা হলাম। এবার একটা নতুন খেলা খেলি।

—বেশ ! বেশ ! নতুন খেলা···নতুন খেলা···

—দেখ, আমাদের মধ্যে সকলের বয়সও সমান নয়, আর শক্তিও সমান নয়। এসো, আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে খেলা করি। যে দল হারবে, সেই দলকে কিন্তু যারা জিতবে, তাদের পিঠে করে বইতে হবে।

—খুব ভাল ! খুব ভাল।

ভাগ হল—দুটো দল। এক দলে প্রধান শ্রীকৃষ্ণ। আর এক দলে বলরাম। রাখাল-ছেলেরা কেউ কেউ গেল শ্রীকৃষ্ণের দিকে, কেউ কেউ গেল বলরামের দিকে। শুরু হল খেলা। কখনো কৃষ্ণের পিঠে চাপে শ্রীদাম, কখনো বা শ্রীদামের পিঠে শ্রীকৃষ্ণ। এভাবে খেলতে খেলতে আর গরু চরাতে চরাতে তারা এসে হাজির হল ভাণ্ডরিক নামে এক বিরাট বটগাছের কাছে। এখানে এসে আবার শুরু হল খেলা। এবার শ্রীকৃষ্ণের দল হেরে যেতে কৃষ্ণ বাধ্য হল শ্রীদামকে পিঠে নিতে, ভদ্রসেন নিল বৃষভকে, আর রাখালবেশী প্রলম্ব পিঠে নিল বলরামকে। এবার নিশ্চিত জেতার খেলা। প্রলম্ব অভিযোগ করল কৃষ্ণের জন্যই তাদের হারতে হয়েছে। তবে এবার ঠিক সুযোগও এসেছে। দুজনকে না হোক, একজনকে তো এবার একটু ফাঁকা জায়গায় আনা গেছে। ভেবেই দল ছেড়ে প্রলম্ব বলরামকে পিঠে নিয়ে বন বন করে চলে এল অনেকখানি দূরে। ভাই-এর



ইশারায় আগে থেকে সতর্কই ছিল রাম. এবার আরও একটু সজাগ হল। দূর থেকে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ দেখছে আর সাথীরা চেঁচাচ্ছে —ওদিকে কোথায় যাচ্ছ, ও বলরাম দাদা—

বলরাম এমনিতেই একটু ভারি। সুতরাং বয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাতে গেলে তো আর এই বোঝা নিয়ে আস্তে আস্তে গেলে চলবে না। তাই একটু একটু করে নিজের আকৃতি ধরল প্রলম্ব। হঠাৎ তার চেহারাটাই গেল বদলে। মুখ হয়ে উঠল ভীষণ কদাকার, মাথার ওপর চুলগুলো হয়ে উঠল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। চোখদুটো যেন হয়ে উঠেছে আগুনের হল্কা। প্রথমটায় বেশ একটু ভয় পেয়ে গেল বলরাম। তবে কিছুক্ষণের জন্য। সাথীরা সব পেছনে হায়-হায় করে উঠল। দেখল, চুপ করে দাঁড়িয়ে তখনো ভাই কৃষ্ণ। তারপর অসুরের দিকে চোখ পড়তেই দেখল, ট্যারচা চোখে তাকিয়ে। তার মুখে সে কি কুটিল হাসি! রাগে আরো আগুন হয়ে উঠল বলরাম। বেশ করে মুঠো বাগিয়ে সজোরে ঘুসি বসিয়ে দিল প্রলম্বের মাথার ঠিক মাঝখানে।

বলরামের এক আঘাতেই অমন যে অসুর, তারা মাথা গেল ঘুরে। ঠেলে যেন বেরিয়ে এল চোখদুটো, হাঁটু দুমড়ে পড়ে গেল—যেন একটা কলাগাছ। তারপরেই এমন রক্তবমি শুরু করল যে তাতেই শেষ।

আর একবার হতোদ্যম হল কংস। কিন্তু থামল না। থামলে চলবে না। শেষ না দেখা পর্যন্ত থামা চলতে পারে না।

এদিকে ব্রজবাসীদের মনে কৃষ্ণ-বলরাম সম্বন্ধে যে ভয় ছিল, কংসের অনুচররা কখন তাদের কি করে বসে, সে ভয়ও আর নেই। জানাই হয়ে গেছে—এ দুটি ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। যশোদা আর রোহিণীর মন শুধু একটু ছটফট করে ওঠে কোনদিন ওদের ফিরতে দেরি হলে।

পূতনা গেল, তৃণাবর্ত গেল, ধেনুক গেল, প্রলম্বও গেল, ক্রমশ যেন গাঢ় হতে লাগল কংসের সংশয়। এবার পাঠাল সে ভীষণাকার অরিষ্টকে। কংসের নির্দেশ, যেভাবেই হোক, ছেলেদুটোর বিনাশ চাই-ই।

সবেমাত্র গরুর পাল নিয়ে গোঠে ফিরেছে কৃষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, আর সব রাখাল-বালকেরা। গরুর পায়ের ধুলোয় ধুলোয় ঢেকে গেছে তাদের শরীর। ঠিক এমনি সময়ে যেন আকাশ থেকে নেমে এল অরিষ্টাসুর—রাগী এক ষাঁড়ের বেশ ধরে। তার ঘন ঘন হুঙ্কার কেঁপে উঠল বৃন্দাবন। ভয় পেয়ে গরুবাছুরগুলো লাফালাফি শুরু করে দিল। রেগে গেলে ষাঁড় যেমন মাথা নিচু করে পায়ের খুর দিয়ে ঘন ঘন মাটি খোঁড়ে, তেমনি ভাবে ফোঁস ফোঁস করতে করতে মাটি খুঁড়তে লাগল সে। ব্রজে যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এসে অমন ষাঁড় আর কৃষ্ণ-বলরামকে লক্ষ্য করে, তার তর্জন-গর্জন শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভয়ে শুকিয়ে গেছে যশোদা-রোহিণীর মুখ। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গোপরাজ নন্দ থেকে শুরু করে সব গোপেরা। খুবই স্বাভাবিক। ছেলেদের বিপদের মুখে দেখে তাদের মা-বাবারা কখনো স্থির থাকতে পারে? যদিও জানে, ছেলেরা তাদের সাধারণ নয়।

অরিষ্টের কাণ্ড দেখে মুচকি-মুচকি হাসে রাখাল রাজা। রাখাল তো—তাই জানে এই সময় ওদের সামনে হাততালি দিলে ওরা আরো খেপে গিয়ে তেড়ে আসে। মজা করার জন্য সজোরে হাততালিও দিয়ে বসল।

আর যায় কোথা? ঘাড় গুঁজে শিং উঁচিয়ে আরো এমন জোরে মাটিতে খুর বুলোতে শুরু করে দিল যে, যেন পিছনে ধুলোর ঝড় বইতে লাগল।

রাখাল-রাজা শ্রীদামের কাঁধে হাত দিয়ে তখনো দেখছে আর হাসছে।

সহ্য হল না আর অরিষ্টাসুরের। শিং উঁচিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল শ্রীকৃষ্ণের দিকে।

কাছাকাছি যেতেই ঐটুকু ছেলে কৌশলে দু হাতে শিং দুটো ধরে এত জোরে ঠেলে দিল যে প্রায় আঠারো পা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল অসুর। বুঝল, যতটা সহজে কাজ সারবে ভেবেছিল, ততটা সহজ হবে না। অমনভাবে আচমকা যে ছিটকে এসে পড়তে পারে, তা ভাবতেও পারে নি। আহত অরিষ্ট। এবার ক্রোধ আরো বেশি। ঝড়ের মত ঘন ঘন তার নিঃশ্বাসে যেন ছুটতে শুরু করল আগুনের হল্কা। অন্ধ আক্রোশে দ্বিগুণ বেগে আবার যেই কাছে এল, সকলে দেখল, মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে ষাঁড়টা আর তার ওপর চেপে বসেছে তাদের রাখাল রাজা। পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে ষাঁড়টা। তবু নিষ্কৃতি নেই। দেখল, রাখাল রাজা এক টানে তার দুটো শিং-ই উপড়ে ফেলে, তাই দিয়েই নির্দয়ভাবে প্রহার করে চলেছে তাকে। সেই প্রহার আর সহ্য করতে না পেরে শুয়ে শুয়ে চারটে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক সময় একেবারে থেমে গেল। শেষ হল অরিষ্টাসুর।

কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল যশোদা আর রোহিণী। কোলে তুলে নিল ছেলেদের।

অরিষ্টাসুরের বিনাশ-সংবাদ পেয়ে মাথায় এবার যেন আগুন জ্বলে গেল কংসের।

বজ্রহুঙ্কার ছাড়ল কংস—কেশী। ব্যোম!

ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কেশী আর ব্যোমাসুর।

—কোন কথা নয়। এখনই বৃন্দাবন যাও। ঐ কৃষ্ণকে খতম না করে ফিরতে পাবে না।

রাজার হুকুম। আকাশপথে ছুটে কেশী গিয়ে নামল গোকুলে। বিশালকায়, বিকটাকার এক ঘোড়া। তার বিশাল চোখ যেন আগুনের গোলা, বিকট তার মুখের গহ্বর, যেমন মোটা তেমনি লম্বা গলা, আর গায়ের রঙ মেঘের মত কুচকুচে কালো।

গোকুলে নেমেই বৃন্দাবন কাঁপিয়ে ছাড়ল হুঙ্কার—কোথায় কৃষ্ণ? কোথায় সেই ছোঁড়া? বেরিয়ে আয়, দেখাচ্ছি মজা।

কৃষ্ণ যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। ডাক শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল গোষ্ঠ থেকে। আর তাকে দেখতে পেয়েই কেশী উর্ধ্বশ্বাসে এসে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল পিছনের জোড়া পা।

সুকৌশলে রাখাল-রাজা সেই মারাত্মক চাট এড়িয়ে গেল দেখে, মুখ ঘুরিয়ে আবার পা তুলে যেই মারতে এল, দু হাতে কৃষ্ণ ধরে ফেলল তার পা দুটো। তারপর যেমন করে ছেলেরা লাট্টু ঘোরায়, তেমনিভাবে ঘুরিয়ে যখন ছেড়ে দিল তখন কেশী গিয়ে ছিটকে পড়ল শতধনু (প্রায় চারশ হাত) দূরে। অমন ভাবে আচমকা ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে গেল। আবার জ্ঞান পেয়ে চোখ মেলে তাকাতে সামনে কৃষ্ণকে দেখে দ্বিগুণ আক্রোশে হাঁ করে ছুটে এল অতি বেগে—যেন গিলে ফেলল বলে! রাখাল-রাজাও সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা সজোরে ঢুকিয়ে দিল তার

মুখের ভেতর। হাতের মুঠোর আঘাতে কেশীর দাঁতগুলো গেল পড়ে। তার মনে হতে লাগল যেন আগুনে গরম-করা কোন লোহার শিক বুঝি এসে ঢুকল তার মুখে। সেই সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের নালীটাও যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। শত চেষ্টা করেও কেশী কিন্তু পারল না নিজেকে সেই হাত থেকে মুক্ত করতে। কাঁকুড় যেমন শেষে ফুটি-ফাটা হয়ে যায়, দম আটকে পেট ফুলে কেশীও তেমনি ফুটি-ফাটা হয়ে গেল।

আবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ব্রজবাসীরা।

ঠিক এমনি সময়ে কৃষ্ণ যখন একা, সকলের অলক্ষ্যে নারদ মুনি হাজির হলেন সেখানে। সাষ্টাঙ্গে রাখাল-রাজাকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—প্রভু আমি জানি, আপনিই তিনি, এসেছেন অসুরদের বিনাশ করতে, সৎ-মানুষদের রক্ষা করতে। দেবতারাও যে কেশীকে দেখে ভয় পেত, আজ নিজের চোখে দেখলাম, কেমন অবলীলায় তাকে আপনি বিনাশ করলেন।

নারদ আরও বললেন—

'যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দন।
তস্মাৎ কেশবনাম্না তু লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি॥'

অর্থাৎ—

জনার্দন, দুষ্টাত্মা কেশীকে যখন করিলে নিধন,
সেহেতু সর্বলোকে, তোমার কেশব নাম করিবে কীর্তন।

নারদ আর শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাপারটা কিন্তু কেউ জানতে পারল না।

আবার দিন যেমন চলছিল, তেমনি ভাবেই চলতে লাগল। গরুর পাল নিয়ে যায় কৃষ্ণ-বলরাম, সঙ্গে সাথীরা। জোটে এসে আরো সব রাখাল। খেলাধুলা, গরু চরানো সেরে ফিরে আসে নিজ গোঠে।

একদিন এমনিভাবেই গিয়ে ঘাসের বনে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, কাছেই এক পাহাড় দেখে, লেগে পড়ল সবাই লুকোচুরি খেলায়। [এখন যেমন ছেলেরা চোর-পুলিশ খেলে, কতকটা সেই রকম।] একজন হল গরু, একজন হল চোর। তারা দুজনে গিয়ে লুকোলো পাহাড়ের কোন্ আড়ালে। হঠাৎ, খবর এল, চোরে গরু চুরি করে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল খোঁজা। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় পাওয়া গেল। শেষ হল। আবার অন্যজনে শুরু করল সেই খেলা। বেশ মজা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেসব রাখালরা এতক্ষণ দেখছিল, তারাও সব ভিড়ে গেল। শেষ হল। আবার অন্যজনে শুরু করল সেই খেলা। বেশ মজা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেসব রাখালরা এতক্ষণ দেখছিল, তারাও সব ভিড়ে গেল। সকলেই যে চেনা, তা নয়, অচেনাও ছিল তার মধ্যে। তাতে কি যায় আসে! ছেলেদের কাছে, বিশেষ করে খেলার মধ্যে, চেনা আর অচেনা।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে ব্যোমাসুর একসময় রাখাল সেজে ভিড়ে পড়ল দলে। মেতে উঠল খেলায়। জমেও উঠল। অনেক ছেলে, অনেক রাখাল—আর অমন এক মজাদার নতুন খেলা। খেলা তো জমবেই।

খেলতে-খেলতে রাখাল-রাজার নজরে পড়ল, হঠাৎ ছেলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে যেন। দাদাকেও ইশারায় জানিয়ে দিল কথাটা। নজর আরো কড়া হয়ে উঠল দু ভাইয়ের। ঠিকই তাই। নতুন করে আবার যখন শুরু হচ্ছে খেলা, অনেক পরিচিত মুখকেই আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কার কাজ? আবার কোন শয়তান এল ঝামেলা পাকাতে? যে-ই আসুক, সাধ্য কি তার কৃষ্ণ বলরামের চোখ এড়ায়!

এক সময় ধরা পড়ে গেল ব্যোমাসুর। ছেলের দলে ছেলে সেজে চোর-পুলিশ খেলতে খেলতে ঐ শয়তানটাই এক একজনকে নিয়ে গিয়ে পাশের একটা গুহায় ফেলে পাথর চাপা দিয়ে আসছে। শেষে খেলার সাথী যখন আর মাত্র চার-পাঁচজন, রাখাল-রাজা আর থাকতে পারল না। সিংহ যেমন নেকড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেই ভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যোমাসুরের ওপর।

ব্যোমাসুর হল ময়দানবের ছেলে। বাবার মতই সে যেমন জানত মায়াবিদ্যে, তেমনি শক্তিও ধরত খুব। তাই সে ছিল কেশীর মতই কংসের দারুণ প্রিয়পাত্র।

রাখাল-রাজা যেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরল তার হাত, সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমাসুরও ধরল বিশাল আকার। ছিল এতটুকু ছেলে, চোখের সামনে হয়ে গেল পাহাড়প্রমাণ। ওদিকে মাথা হল যেমন তার আকাশ ছুঁই-ছুঁই, হাত আর পা-ও হয়ে গেল তেমনি থামের মত মোটা। ভাবল, এইবার ঐ একরত্তি শত্রু-সমেত হাতটা তুলে পাহাড়ের গায়ে দেবে এক আছাড়। ব্যস্।

কিন্তু কি আশ্চর্য! চেষ্টা করেও হাত তুলতে পারছে না কেন ব্যোমাসুর! তারপর চেষ্টা করল ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে, চেপে ধরতে। তাও না পেরে, দাঁত কড়মড় করে যখন কি করবে ভাবছে ব্যোমাসুর, সেই সুযোগে রাখাল-রাজা তাকে দিল এক ধাক্কা। ব্যোমাসুর সেই ধাক্কায় এমন থরথর করে কেঁপে উঠল যে, নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে সপাটে আছড়ে পড়ল পাহাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

এরপর সেই গুহা থেকে সকলকে উদ্ধার করে রাখাল-রাজা সকলের সঙ্গে গরু-বাছুরদের নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ফিরে গেল গোঠে।

ওদিকে মথুরায় খবর যাওয়া মাত্র কংসকে দেখে কে? একদিকে কেশী আর ব্যোমের মত তার বিশ্বস্ত দুই অনুচর মারা যাওয়াতে রাগ, আর একদিকে ভয়—সে কি বীভৎস আকার তখন কংসের!



রাখাল-রাজার কংস বধ

বৃন্দাবনের রাখাল-রাজা শুধু যশোদা-দুলাল নয়, সারা ব্রজধামের দুলাল, নয়নের মণি। ছেলের জন্য আকুল হয়ে ওঠে তাঁদের মন, আবার মনে জাগে সংশয়। সত্যিই তাদের ছেলে তো? না, তাঁদের আরাধ্য দেবতা ভগবান বিষ্ণু এসেছেন তাদের ঘরে, ছেলের বেশে! আদর করার জন্য কেঁদে ওঠে মায়েদের প্রাণ। আবার মনে জাগে ভয়—যদি সত্যিই তিনি হন, আর যদি হয়ে যায় কোন অপরাধ!

তাই মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ান যশোদা, রোহিণী আর গোপীরা।

রাজার রাজা রাখাল-রাজার চোখকে কি ফাঁকি দেবার উপায় আছে? ভাবে, এখনই যদি জেনে ফেলে তারা দু ভাইকে, তাহলে মায়ের আদর, বাবার স্নেহ, বন্ধুদের ভালবাসা সব তালগোল পাকিয়ে যাবে—সবাই থাকবে দূরে দূরে সরে। তা হতে দিলে চলবে না। তাই গোষ্ঠে যতক্ষণ থাকে, সাধারণ আর পাঁচটা ছেলের মতই উদব্যস্ত করে তোলে মায়েদের—দই চুরি, মাখন ছড়ানো, দুধের ভাঁড় ভেঙ্গে দেওয়া। আর সত্যি সত্যিই সব ভুলে সাধারণ মায়ের মত যশোদা ছুটে আসেন ছেলেকে শাসন করতে।

এদিকে বৃন্দাবনে যখন চলেছে রাখাল-রাজার এমনি মজার খেলা, ওদিকে মথুরায় কংসের প্রাসাদে দিনে-রাতে চলেছে রাজার বৈঠক। অতগুলো অনুচর তার মরল—মরল পূতনা, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, প্রলম্ব, অরিষ্ট, কেশী, ব্যোম, অথচ ছেলেটার গায়ে একটু আঁচড়ের দাগও পড়ল না। কে সে? সেই কি তাহলে তার যম? তাই যদি হয়, কিভাবেই বা সে নন্দালয়ে গেল? আর কিভাবেই বা তাকে মারা যাবে? আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে মাত্র জনকয় ছাড়া সকলেই তার ওপর বিরূপ।

ভাবনায়-চিন্তায় বুঝি পাগল হয়ে যাবে কংস। কোথাও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না, শুয়েও ঘুম আসে না।

এমনি যখন কংসের অবস্থা, হঠাৎ একদিন নারদ মুনি এসে হাজির হলেন তার কাছে। দেবতা-ঋষি-মুনিদের মধ্যে ঐ নারদকেই যা একটু ভাল চোখে দেখত কংস। আগে এই নারদমুনি এসেই একবার সাবধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন কংসকে। যার জন্য বসুদেব আর দেবকীকে প্রাসাদে আটকে রেখে তার ছেলে কটাকে মেরেছে। তবু এই বিপর্যয় কোথা থেকে এল, ভেবে উঠতে পারছিল না কংস।

এখন নারদকে দেখেই যেন ধরবার মত একটা কুটো পেল কংস।

সসম্মানে তাঁকে খাস-কামরায় বসিয়ে সব কথা বলে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার মুনিবর! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। দেবকীর যতগুলো সন্তান হল, সব কটাকেই তো হত্যা করলাম। তার পরেও....

—কটা ছেলেকে মেরেছ কংস—ছটা? তারপর দেবকীর সপ্তম গর্ভের?

—ছেলে তো আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

—তুমি একটি আস্ত বোকা। তোমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেই ছেলেটি জন্মগ্রহণ করেছে রোহিণীর ছেলে হয়ে। তার নাম, বলরাম।

ভূত দেখার মত চমকে ওঠে কংস।

—বলেন কি, মুনিবর!

—হ্যাঁ। আর অষ্টম গর্ভের তুমি কাকে মারতে গিয়েছিলে?

—আপনি বলেছিলেন অষ্টম গর্ভের ছেলে আমাকে মারবে। সেই নাকি স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি। তা ছেলে কোথায় হল? হয়েছিল তো মেয়ে!

—কংস, দৈববাণী কখনো মিথ্যা হয় না। আর আমিও কখনো মিথ্যে বলি না। দেবকীর অষ্টম গর্ভে ছেলেই হয়েছিল, তোমারই প্রাসাদে।

—কিন্তু দেখলাম যে গিয়ে—মেয়ে।

—ঠিকই দেখেছ। মেয়েটি হয়েছিল গোকুলে নন্দপত্নী যশোদার। তোমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে বসুদেব রাতারাতি তোমার প্রাসাদ থেকে ছেলেটিকে নিয়ে যশোদার কাছে রেখে, তার মেয়েটিকে এনে এখানে রেখে দিয়েছিল। তোমরা টেরও পাও নি।

শোনামাত্রই কংসের মাথায় যেন সারা প্রাসাদ ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগে হয়ে উঠল অগ্নিশর্মা।

যে বসুদেব আর দেবকীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের ছেড়ে দিয়েছিল, তারা ভেতরে ভেতরে এমন কুটিল চক্রান্ত করে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল কংসের—যেখানে থাকুক ওরা, ধরে নিয়ে এসে বন্দী কর প্রাসাদে। আর তারপর যাবে গোকুলে। ওখান থেকে ঐ নন্দ যশোদাকেও তুলে আনবে। এরপর ছেলেদুটোর ব্যবস্থা আমি করছি।

নারদ মুনি যে এই ফাঁকে সেখানে থেকে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন, খেয়ালই করে নি কংস। খেয়াল করার আর দরকারও নেই। মাথায় তার এখন খেলেছে অন্য চিন্তা। রাজনীতির কৌশল দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে, যাতে কেউ বলতে না পারে যে, সেই মামা হয়ে মেরেছে তার ভাগ্নেকে।

গোপরাজ নন্দর দূর-সম্পর্কের ভাইপো স্বফল্কের ছেলে অক্রূর থাকত মথুরায়। কংসের সঙ্গে মোটামুটি ভাব-সাব রেখেই চলত তারা। যদিও যদুবংশের ওপর কংসের অত্যাচার, তার নিষ্ঠুরতা এদের মোটেই ভাল লাগত না; তবুও বিশ্বাস করত—অত্যাচারীর অত্যাচার চিরকাল চলতে পারে না। তারপর, গোকুলে কৃষ্ণ-বলরামের কাছ থেকে যে আঘাত পেয়েছে, তাতে ওদের বিশ্বাস, দিন ফুরিয়ে এসেছে কংসের। আরও যাতে তাড়াতাড়ি দিন ফুরোয়, তার চেষ্টাই করা উচিত। কিন্তু বাইরে তারা এমন ভাব দেখাত যে, রাজার তারা পরম বন্ধু।

কংস যখন দেখল, এতগুলো অনুচরকে পাঠিয়েও গোকুলে তাদের কায়দা করা গেল না, তখন কৌশলে তাদের তুলে আনতে হবে মথুরায়। এখানে ওদের আনতে পারলে দেখা যাবে তখন, ওদের রাখে কে? এখন কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে।

তাই অক্রূরকে ডেকে বলল—ভাই, সবাই এখন আমার শত্রু। জানি, একমাত্র তুমিই এখনও আছ আমার পরম বন্ধু। বন্ধুর একটা উপকার তোমায় করতে হবে ভাই। গোকুলে যেতে হবে। আমি রথ দিচ্ছি। ঐ কৃষ্ণ-বলরামকে এখানে তুলে আনতে হবে। একাজ তুমি ছাড়া আর কারো করার সাধ্য নেই।

এক কথাতেই অক্রূর রাজি। মনে মনে এতদিন যে ইচ্ছে পোষণ করছিল সে, কংস রাজা নিজেই তাকে সেই সুযোগ করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে রথ নিয়ে অক্রূর ছুটল গোকুলে। অজানা তো আর নয়। সোজা গিয়ে হাজির নন্দ রাজার বাড়ি। দেখল, দুই কিশোর—একজনের রঙ কালো, পরনে পীত বসন, আর একজন ফর্সা, পরনে নীল বসন—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাই দোয়া দেখছে। দেখামাত্রই রথ থেকে নামল অক্রূর। নন্দও তাকে দেখে যেমন খুশি, তেমনি খুশি দুই ভাই। প্রাণভরে অক্রূরকে খাইয়ে, সেবা যত্ন করে, জানতে চাইল দুভাই তার আসার কারণ।

—রাজা রথ পাঠিয়েছে। মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব হবে। তোমাদের সকলকে নিয়ে যেতে বলেছে। বলল অক্রূর।

শুনে মুচকি মুচকি হাসল দুই ভাই। রাজা নন্দ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল গোপদের—যত দুধ-দই-ক্ষীর আর ভাল ভাল জিনিস আছে, সব দিয়ে গাড়ির পর গাড়ি সাজাও। মথুরায় যাব। রাজদর্শনের সঙ্গে ধনুর্যজ্ঞ দেখতে।

ব্রজবাসীর মাথায় হাত। কিন্তু, নন্দরাজার হুকুম। সকলেরই মন গেল ভেঙ্গে। রাগও হল সকলের অক্রূরের ওপর।

যাই হোক, কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে অক্রূর যখন মথুরায় ঢুকল, তখন দিনের শেষ। নগরের মাঝে এক উপবন। সেখানেই রথ থেকে নেমে পড়ল তারা। অক্রূরকে বলল, নিজের বাড়ি যেতে। অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেও অক্রূর কিন্তু নিজের বাড়িতে তাদের নিয়ে যেতে পারল না।

কি আর করে অক্রূর! কংসকে খবরটা দিয়ে ফিরে গেল বাড়িতে।

এদিকে দু ভাই উপবন থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যাতেই এগিয়ে চলল নগরের পথে। নগর তো নয়, যেন ইন্দ্রের অমরাবতী। সব যেন ঝকঝক-তকতক করছে, যেমন সাজানো সব তোরণ, তেমনি আলোর মালা।

দেখতে দেখতে আর যেতে যেতে হঠাৎ দেখল, ভাল ভাল কাপড়-চোপড়ের বোঝা নিয়ে এক রজক আসছে, সঙ্গে চাকরদের মাথায় আরো বোঝা চাপিয়ে।

তাকে দেখেই দাঁড় করালো দু ভাই। বলল—ওহে রজক, আমাদের পরার মত গোটাকয়েক ভাল পোশাক-টোশাক দাও তো?

শুনেই চোখ-মুখ পাকিয়ে উঠল রজক।

—কোথাকার কে এলেন রে! পোশাক দাও। ভাগ···ভাগ···।

—দেখছ তো, আমাদের পরনে প্রায় কিছুই নেই। অত ভাল ভাল পোশাক রয়েছে তোমার সঙ্গে, দুটো দিলে ক্ষতি কি?

—কি বললি? পথের ছোঁড়া পরবে রাজার পোশাক? জানিস্, এসব কংস রাজার পোশাক? আমি কেচে নিয়ে যাই। তোদের সাহস তো মন্দ নয়! একবার, রাজার কানে গেলে, তোদের আর রক্ষে থাকবে না। পালা···পালা···এই বেলা পালা।

কৃষ্ণ আর সহ্য করতে না পেরে তাকে এমন প্রহার দিলেন যে তাতেই যণ্ডা রজক খতম। আর চাকররা পালাল প্রাণভয়ে।

ভাল-ভাল পোশাক বেছে, কৃষ্ণ-বলরাম পরে নিল। মথুরার সাধারণ মানুষের মন, ঢোকা-মাত্রই জয় করে নিয়েছিল দুই ভাই। তারপর, রজকের এই ব্যাপার দেখে, তাদের দুর্জয় সাহসের কাছে যেন অনায়াসে মাথা নুইয়ে দিল। সকলেরই চোখ যেন ফিরতে লাগল দুভাই-এর দিকে।

একে-ওকে জিজ্ঞেস করে কৃষ্ণ এবার দাদাকে নিয়ে ঢুকলেন যেখানে ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব হচ্ছিল। কৃষ্ণ দেখলেন, বিশাল এক ধনুক, ছিলে লাগানো, রাখা রয়েছে দেয়ালে। জোয়ান-জোয়ান সব পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে সেটা। বেশ কয়েকটা পালোয়ানেরও সাধ্য নয়, সেই ধনুক তোলার।

দাদাকে ইশারা করে কৃষ্ণ যেই এগোতে গেলেন ধনুকের দিকে, বাধা দিল পাহারাদাররা। কৃষ্ণ ওদের অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গিয়ে এক হাতে তুলে নিলেন সেই ধনুক, যেন দারুণ একটা হাল্কা কিছু। তারপর এক মুহূর্তে দুহাতের চাপে তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলেন।

সামান্য এক কিশোরের হাতে ঐভাবে ধনুকটা নষ্ট হয়ে যেতে দেখে, প্রথমে পাহারাদাররা বেশ খানিকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর সবাই মিলে আক্রমণ করল দুভাইকে। কিন্তু পারবে কেন? যে যেভাবে তেড়ে এসেছিল, ভাঙা ধনুকের এক-এক ঘায়ে, তারা সেখানেই লুটিয়ে পড়ল আর নিশ্চিন্তে দু ভাই ফিরে গেল সেই উপবনে। মথুরায় তখন নেমে এসেছে রাত।



খবর গেল কংসের কানে। বিশ্বাস যেন হয় না, তেমনি অবিশ্বাসও করতে পারছে না! সারাটা রাত গেল রাজার ছটফট করে।

পরদিন। সকাল হতেই নগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল—আজ মল্লযুদ্ধের খেলা হবে।

সে সময় এই সবই ছিল উৎসব। নগরের তো বটেই, দূর থেকে আসত সব মল্লবীররা। খেলা দেখার জন্যে ভেঙে পড়ত সাজানো-গোছানো ময়দানে নারী-পুরুষ সব দর্শকের দল। বিশেষ মঞ্চে বসতেন রাজা নিজে, মন্ত্রীদের নিয়ে।

আজও তেমনি ভরে গেছে ময়দান। সকলেই জানে, চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল এক-একজন মহা মহা মল্লবীর। কি সুন্দর সব খেলাই না তারা দেখায়, মল্লযুদ্ধের কত না কৌশল।

নিজে মঞ্চে এসে বসল রাজা কংস। গোপরাজ নন্দকেও এনে সম্মানের সঙ্গে বসিয়েছে এক জায়গায়।

বেজে উঠল বাজনা—তূরী, ভেরী। বীর মল্লরা সব একে একে এসে ঢুকল ঘেরা জায়গায়। আর একবার হর্ষধ্বনি উঠল। কেউ তো আর জানে না, কোন্ দুরভিসন্ধি নিয়ে কংস আজ চাণূর, মুষ্টিকদের নামিয়েছে, খেলার নাম করে মল্লের ময়দানে?

সকালেই বাজনা-বাদ্যি আর মল্লযুদ্ধের উৎসব শুনে, দু ভাই নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করল—এত কিছুর পরেও যখন কংস থামল না, তাঁদের মা-বাবা বসুদেব-দেবকীকে মুক্তি দিল না, তখন মামা বলে আর সমীহ করা যায় না। এবার ওকে উচিত শিক্ষাই দিতে হবে।

এই বলে দুই ভাই এগিয়ে চলল ময়দানের দিকে। ময়দানে ঢোকার কিছুটা আগেই ছিল কুবলয়াপীড়।

কুবলয়াপীড় হল কংসের নিজস্ব হাতি। যেমন বিকট, তেমনি দুর্দান্ত। যেমন তার লম্বা শুঁড়, তেমনি দুদিকে দুই বিশাল দাঁত—যেন ছুঁচমুখ দুটো বিশাল লম্বা গোল মোটা তলোয়ার। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে, যে একটু না সরলে যাওয়া যাবে না ময়দানে।

হাতির পিঠে মাহুত বসে। কৃষ্ণ তাকে অনুরোধ জানালেন—হাতিটা একটু সরাও না ভাই, আমরা যাব।

খিঁচিয়ে উঠল মাহুত—কোথাকার কে এল রে? ওদের জন্যে পথ করে দিতে হবে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্তি ধরলেন বালক কৃষ্ণ—ভাল চাও তো এখনি সরাও। নইলে সব-সমেত যমালয়ে পাঠিয়ে দেব।

শুনেই লাফিয়ে উঠল মাহুত—তবে রে?

এই বলে অঙ্কুশের ঘায়ে কুবলয়াপীড়কে খেপিয়ে দিতেই শুঁড় তুলে হাতি ধরতে গেল কৃষ্ণকে। সুকৌশলে কৃষ্ণও শুঁড় এড়িয়ে দাদাকে নিয়ে তার পায়ে একটা আঘাত দিয়ে লুকিয়ে পড়ল পেছনে। গন্ধ শুঁকে হাতিও মুখ ঘুরিয়ে আবার যেই শুঁড় বাড়িয়ে ধরতে গেল তাকে, কৃষ্ণ তার আগেই শুঁড়টা ধরে এত জোরে ঠেলে দিল হাতিকে যে প্রায় পঁচিশ ধনু অর্থাৎ একশো হাত পিছিয়ে গিয়ে কোনরকমে টাল সামলে থমকে দাঁড়াল।

এরপর কুবলয়াপীড়কে আর দেখে কে? কুতকুতে চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোতে লাগল আগুন। শুরু হল ঘন-ঘন শুঁড়ের ওঠা-নামা। সেই সঙ্গে বের হতে লাগল গরম নিঃশ্বাসের ফেণা, কানদুটো দিয়ে তুলতে লাগল ভীষণ ঝড়, তার সঙ্গে ক্রুদ্ধ গর্জন। পৃথিবী যেন তোলপাড় করে দেবে, এভাবে এগিয়ে আসতে লাগল কৃষ্ণ-বলরামের দিকে। দু ভাইও প্রস্তুত। হাতি আসে সামনা-সামনি, তো ওরা সরে ডান দিকে। হাতি ঘোরে ডানদিকে, তো ওরা লুকোয় বাঁ দিকে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ হাতিকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার পর, একসময় হঠাৎ কৃষ্ণ শুয়ে পড়লেন, যেন চোট পেয়েছেন। গজরাজ দাঁত বাগিয়ে কৃষ্ণকে দেয় বুঝি এফোঁড় ওফোঁড় করে। কিন্তু সে সুযোগ পেল না হাতি। লাফিয়ে উঠেই কৃষ্ণ এক টানে গজরাজের একটা দাঁত সমূলে তুলে ফেললেন, বলরাম আর একটা। তারপর, সেই দাঁতদুটো দিয়েই এমনভাবে পিটতে লাগলেন গজরাজকে যে মার আর সহ্য করতে না পেরে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আর্তনাদ করতে করতে প্রাণ হারাল। সেই সঙ্গে মারা গেল মাহুতও।

কুবলয়াপীড়ের সেই বিশাল বিশাল গজদন্তদুটি দু ভাই কাঁধে তুলে নিয়ে এবার ঢুকলেন মল্লযুদ্ধ খেলার ময়দানে।

ইতিমধ্যে কংসরাজার কানে গেছে সেই দুঃসংবাদ। তারপর দাঁত কাঁধে, রক্তের দাগ লাগা পোশাকে ছেলেদুটোকে ঢুকতে দেখে মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেল কংস। কিন্তু, মুখে কিছুই প্রকাশ করল না। শুধু ইশারা করে দিল চাণূরকে।

কৃষ্ণ-বলরাম কাছে আসতেই এগিয়ে এল চাণূর। বলল—রাজার ইচ্ছে, আজ তোমাদের সঙ্গেই মল্লযুদ্ধ খেলা হবে। এস, খেলবে এস।

কৃষ্ণ বললেন— রাজার যখন ইচ্ছে, তখন না বলি কেমন করে। কিন্তু, দেখ আমাদের বয়সই বা কত? আর তোমাদের তুলনায় কত ছোট। খেলা তো সমানে-সমানেই হওয়া উচিত, তাই না?

চাণূর বলল—তা ঠিক। বয়সে বালক হলেও, তোমরা অসমান নও। বনে বনে যখন গরু চরিয়ে বেড়াও, মল্লযুদ্ধের অভ্যাস তখন নিশ্চয়ই আছে। আর ক্ষমতা? তাতেই বা তোমরা কম কিসে? তা না থাকলে কি আর কুবলয়াপীড় হাতির মত গজরাজকে মারতে পারতে? এস, এস, তোমাদের সঙ্গে খেলে আমরাও যেমন আনন্দ পাব, দর্শকরাও তেমনি পাবে, রাজাও খুশি হবেন।

কৃষ্ণ বললেন—রাজার বনচর প্রজা আমরা। ও খেলা একটু-আধটু অবশ্য আমাদের শিখতেই হয়। তা তোমাদের সকলেরই যখন আনন্দ হবে বলছ, তখন চল, খেলাই যাক।

চাণূর বেছে নিল কৃষ্ণকে। আর মুষ্টিক এগিয়ে এল বলরামের সঙ্গে খেলতে।

শুরু হল খেলা। দেখতে দেখতে খেলা হয়ে উঠল রীতিমত হাতে-পায়ের রণ। একদিকে দুর্দান্ত মল্লবীর চাণূর আর মুষ্টিক, যাদের ভয়ে ত্রিভুবন কাঁপে, আর একদিকে দুই কিশোর কৃষ্ণ আর বলরাম।

দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এমন অসমান খেলা সমর্থন করল না। আবার রাজার ভয়ে ময়দান ছেড়ে চলেও যেতে পারল না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল দু-পক্ষের কসরৎ। প্রতি মুহূর্তে কংসের আশা, এইবার তার দুই মল্লবীরের হাতে খতম হবে বুঝি তার শত্রুরা। আবার ওদের কৌশল দেখে, অবাকও হয় কংস। এত অল্প বয়সে এত সব কৌশল ওরা শিখল কোথা থেকে?

ওদিকে সমান তালে বেজে চলেছে বাজনা। আর এদিকে চলেছে সেই দারুণ হাতে-হাতে, পায়ে-পায়ে লড়াই।

এক সময় সকলেই দেখল মল্লবীর চাণূর হাত দুটো সামনে তুলে বেশ কয়েক হাত লাফিয়ে কৃষ্ণের বুকে মারল সজোরে এক লাথি। চুপি চুপি হায়-হায় করে উঠল দর্শকরা, উল্লসিত হয়ে উঠল কংস। ঐ বেদম প্রহার সহ্য করার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখল ঐ বিশালদেহী চাণূর-এর হাত কিশোর কৃষ্ণের হাতে বাঁধা পড়ে শূন্যে চরকির মত ঘুরছে, তখন কংস যেন নিজের চোখকেই আর বিশ্বাস করতে পারল না।

কৃষ্ণ সেইভাবে বেশ কয়েক পাক চাণূরকে ঘুরিয়ে যখন ছেড়ে দিলেন, তখন তার প্রাণহীন দেহটা শুধু গিয়ে পড়ল বেশ কয়েক হাত দূরে। আর সেই সঙ্গেই ধসে পড়া কলাগাছের মত লুটিয়ে পড়ল মুষ্টিক বলরামের মুঠোর এক আঘাতে। তারপর রক্তবমি আর ছটফট করতে করতে মারা গেল রাজার চোখের সামনেই। মুষ্টিক মারা যেতেই দৈত্যাকার কূট এসে সদম্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলরামের ওপর। বলরাম যখন তার মোকাবিলা করছেন ইতিমধ্যে কৃষ্ণের পায়ের আঘাতে শল আর তোশলের দেহও দু টুকরো হয়ে গেল। সেই সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল কূট।

ঘেরার মধ্যে কৃষ্ণ-বলরাম তখন আহ্বান জানাতে লাগলেন আর সব মল্লদের দুই মূর্তিমান রুদ্রের মত। কিন্তু, এরপর কে আর আসতে সাহস করবে, ওদের সামনে? যে যার তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত।

আরো জোরে বেজে উঠল বাজনা। আর ধৈর্য থাকল না কংসের।



যেখানে বসেছিল, নিরাপদ সেই মঞ্চ থেকেই বজ্রগম্ভীর সুরে আদেশ দিল তার অনুচরদের—ঐ ছোঁড়াদুটোকে একেবারে নগরের বাইরে বের করে দাও। গোকুলে যেখানে যা আছে, সব লুট করে নিয়ে এস। এখানে কোথায় আছে নন্দ—নিয়ে এস তাকে। কারাগার থেকে নিয়ে এস বসুদেবকে। কোতল কর আমার সামনে।

যেন ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেছে কংস। কি যে বলছে, যেন নিজেই জানে না—হ্যাঁ উগ্রসেন…উগ্রসেন! হোক বাবা, আজ তারও রেহাই নেই। দেবক…দেবককেও শেষ কর। ঐ কাকারই মেয়ে দেবকী।…মার…মার…সব!

কৃষ্ণ দেখলেন, আর নয়। এবার এসেছে ঠিক সময়। দর্প, অহঙ্কার এবং নিষ্ঠুরতা মাত্রা ছাড়িয়ে নিজের বাবা, কাকার, এমন কি তার বাবা-মা এবং পিতৃতুল্য নন্দরাজের ওপর চড়াও হয়েছে। এরপরও সময় দিলে হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে।

ভেবে নিয়েই চোখের পলকে এক লাফে কৃষ্ণ উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন মামা কংসের মুখোমুখি। চমকে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মহাবীর কংস আত্মরক্ষার জন্য চকিতে তুলে নিল ঢাল-তরোয়াল।

কৃষ্ণ কিন্তু আর এক মুহূর্তও সুযোগ দিলেন না। মাছরাঙা যেমন জল থেকে ঠোঁটে মাছ তুলে নিয়ে গাছের ডালে বসে খায়, কৃষ্ণও ঠিক সেইভাবে সুন্দর করে বাঁধা চুলের ঝুঁটি ধরে দিলেন এমন এক হেঁচকা টান যে রাজার বেশবাস তো আলুথালু হয়েই গেল, হাত থেকে খসে পড়ল ঢাল-তরোয়াল আর ওপর থেকে পড়ল এসে সজোরে নিচে। তাতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল কংসের। দাদাকে ঐভাবে মরতে দেখে কঙ্ক, ন্যগ্রোধ—আট ভাই ভীমবেগে যেমন ছুটে এল ওঁদের দিকে, বলরামের গদার ভীম আঘাতে তেমনি প্রাণও দিল সকলে।

শেষ হল নিষ্ঠুর এক অত্যাচারীর অত্যাচার।

কারাগার থেকে মুক্ত হলেন উগ্রসেন। সেই সঙ্গে বসুদেব-দেবকীও।

কৃষ্ণ-বলরাম দু ভাই সব রকম আশ্বাস দিয়ে আবার দাদু উগ্রসেনকে বসালেন সিংহাসনে। কংসের অত্যাচারে যারা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গিয়েছিল দূর দূর দেশে, আবার তারা উদ্বাস্তু জীবন কাটিয়ে ফিরে এল নিজেদের বাড়িতে।

মথুরায় নেমে এল শান্তির সাম্রাজ্য।



শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মার পরীক্ষা

কংসের পাঠানো অজগর-রূপী অঘাসুরকে মেরে দাদা বলরাম, সঙ্গী-সাথী, গরু আর বাছুরদের নিয়ে কৃষ্ণ এলেন এক সরোবরের তীরে। টল টল করছে সরোবরের নীল জল, ফুটে আছে তাতে অজস্র পদ্মফুল। তার চারদিকে নধর ঘাস। ঠিক করল কৃষ্ণ, আজ এখানেই গরু ছেড়ে তারা খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা করবে।

কৃষ্ণ হল রাখাল-রাজা। তার ইচ্ছেই শেষ ইচ্ছে। তা-ই হল। বাছুরগুলোর সঙ্গে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে সব গোল হয়ে বসে খেতে লাগল। মাঝখানে কৃষ্ণ। কোমরে বাঁশি, বাঁ-বগলে শিঙ্গা, বাঁ-হাতে বেত, আর ডান হাতে দই-মাখা ভাতের গ্রাস। সকলেই এনেছে খাবার। খাচ্ছে সব খোশ গল্প করতে করতে। হঠাৎ খেয়াল পড়ল, গরুর পাল তো নেই। গেল কোথায় সব? একটু চঞ্চল হয়ে উঠল রাখাল বালকেরা। তাই তো, গেল কোথায়?

তখনও খাওয়া শেষ হয় নি কৃষ্ণের। বললেন তাদের—কোথায় আর যাবে? নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও ভাল ঘাস পেয়ে খেতে চলে গেছে। তোমরা খাও। আমি দেখে নিয়ে আসছি।

গরুর পাল খোঁজা শুরু হল কৃষ্ণের। এ-বন, ও-বন, সে-বন—কোথাও নেই। আশ্চর্য! কোথায় উধাও হয়ে গেল! ভাবতে ভাবতে সরোবরের তীরে এসে দেখেন, সাথীরাও নেই। আরে? ওরা আবার গেল কোথা? ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, খোঁজখুঁজি চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। কিন্তু না। কোথাও নেই।

এ যে অবাক কাণ্ড! দিন-দুপুরে সব উধাও! বিশেষ করে তার চোখ এড়িয়ে! এমন তো হতে পারে না। বেশ একটু চিন্তায় পড়লেন কৃষ্ণ। একা একা গোঠে ফিরে যেতে হবে! সকলেই চেয়ে থাকবে তাঁর মুখের দিকে। কি জবাব দেবেন তাদের?

একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেই কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা।

সাদামাটা গোপের ঘরে সাধারণ ছেলে হয়ে জন্মালেও আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মত সে তো আর সাধারণ ছিল না। ব্রজের গোপেরা না জানুক, দেবতাদের তো আর অজানা ছিল না। আর ব্রহ্মার তো অজানা থাকার কথাই নয়। পৃথিবীতে অসুরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা যখন গিয়েছিলেন

ভগবান বিষ্ণুর কাছে, তিনি তো তাঁর হাতেই দু গাছি কেশ তুলে দিয়েছিলেন—একগাছি সাদা, আর এক গাছি কালো। বলেছিলেন, দেবকীর গর্ভে এই কালো কেশই জন্মগ্রহণ করবে কৃষ্ণ-রূপে, মুক্ত করবে পৃথিবীর জঞ্জাল। এতগুলো অসুর বধের পরেও, তাঁর শক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাঁর আবার এই বদ খেয়াল চাপল কেন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা করার বদ খেয়ালই চেপেছিল ব্রহ্মার মাথায়। শুধু শক্তি পরীক্ষা নয়, একটু অহঙ্কারও। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা—পৃথিবীতে যা কিছু তা সৃষ্টি করার অধিকার তাঁর। ভগবান বিষ্ণু হলেন সৃষ্টির পালক। নর-রূপী কৃষ্ণ যদি ভগবান বিষ্ণুই হয়ে থাকেন, তবুও বিশেষ কারণে তাঁকে ডাকতেই হবে। এই সব ভেবে, ওরা যখন মজা করে খাওয়ায় মত্ত ছিল, ব্রহ্মাই গরুর পাল কৌশলে ওদের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন যে, কার সাধ্য খুঁজে বের করে? আবার কৃষ্ণ যখন পাল খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সাথীদেরও চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনিই কৃষ্ণকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্যই।

সব বুঝে কৃষ্ণ শুধু একটু মুচকি হাসলেন।

গোঠে ফেরার সময় এসে গেল দেখতে দেখতে। জানতে আর বাকি নেই কৃষ্ণের,কোথায় ব্রহ্মা লুকিয়ে রেখেছেন গরুর পাল আর গোপালদের। ইচ্ছে করলেই স্বচ্ছন্দে সেখান থেকে বের করে আনতে পারত রাখাল-রাজা। কিন্তু, তার কিছুই করল না।

অথচ বিকেলের আকাশ-গোধূলি করে সবকটি গরু-বাছুর, যে যেমনটি দেখতে ছিল তাদের সঙ্গে সেইসব সাথীদের নিয়ে গোঠে ফিরে এল কৃষ্ণ হৈ হৈ করতে করতে। মায়েরা যে যার ছেলেকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে, গা-মুছিয়ে, কোলে নিয়ে আদর করল। কেউ কিছু অন্য রকম ভাবতেও পারল না।

দিন যায়, দিন আসে।

নিত্যদিনের মত প্রতিদিনই সকালে মায়েরা সাজিয়ে দেয় গোপবালকদের। হাতে দিয়ে দেয় দিনের খাবার। রাখাল-রাজা আসে সকলকে নিয়ে দাদার সঙ্গে গোচারণে। গরু আর বাছুরদের ছেড়ে দিয়ে নিত্যদিনের মতই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া, খেলাধুলা সেরে ফিরে আসে গৃহে বিকেলে। ঠিক তেমনি করেই মায়েরা আদর-যত্ন করে তাদের ছেলেদের। ঠিক তেমনিই ভাবেই গরু দুধ দেয়। তৈরি হয় দই, ক্ষীর, ননী।

এমনি ভাবে যখন কেটে গেছে প্রায় তিনশ ষাটটা দিন, হঠাৎ একদিন কেমন যেন সন্দেহ হল বলরামের।

—ভাই, সত্যি করে বল তো, ব্যাপারটা কি? আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।

দাদার কাছে তো আর গোপন করা যায় না। বিশেষ করে দাদা যখন জানতে চেয়েছে, বলতেই হয়। নিঃসঙ্কোচে কৃষ্ণ তখন সবই বলল দাদাকে। আর বলরাম শুনে খুবই কষ্টবোধ করল ভাইয়ের জন্য। ভাই-গত প্রাণ বলরামের। কষ্ট তো হবেই। ব্রজবাসীকে খুশি করার জন্যে একা কৃষ্ণকে কত রূপই না ধরতে হয়েছে। রাগও হল ব্রহ্মার ওপর। কিন্তু ভাইয়ের জন্য তাও চেপে যেতে হল।

পূর্ণ হল এক বছর।

পৃথিবীতে যখন পূর্ণ হল এক বছর, ব্রহ্মার তখন একটা মাত্র পলক পড়ল। তাকিয়েই তাঁর চোখ হয়ে গেল বড় বড়। কি ব্যাপার! সবাইকে তিনি হরণ করে এনেছেন, এখনো সবাই রয়েছে তাঁর জিম্মায়, অথচ অবিকল সব সেইরকম, মাঝে কৃষ্ণ, বলরাম! আশ্চর্য তো! অহঙ্কারের বশে পরীক্ষা করতে গিয়ে শেষে এ কি দেখতে হল তাঁকে।

মুহূর্তে সব অহঙ্কার ভেঙ্গে গেল ব্রহ্মার। এসে লুটিয়ে পড়লেন কৃষ্ণের পায়ের ওপর। দু চোখ ভরা জল নিয়ে আবেদন রাখলেন—অপরাধ আমার ক্ষমা করুন প্রভু।

সব কিছুই যেন ভোজবাজি।

সরোবরের তীরে এক বছর আগে যেমন ভাবে সকলের সঙ্গে বসে খেতে গাভীদের খোঁজে উঠে গিয়েছিল রাখাল-রাজা, এক বছর পর ঠিক সেইখানে সেইভাবেই বসে কৃষ্ণ-সখারা, হাতে খাবার। তাদের মনেও হয় নি এক বছর তারা ছিল না এইভাবে এইখানে।

কৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখল তারা। এক বছর আগে খেতে খেতে উঠে গিয়েছিল গরুর খোঁজে, তা তারা মনেও আনতে পারল না। মনে হল তাদের, যেন এইমাত্র গিয়েই আবার ফিরে আসছে। কলকল করে উঠল সাথীরা—ভাই, তাড়াতাড়ি এসো। তোমাকে ফেলে কি আমরা খেতে পারি? গরুর পাল তো কাছেই রয়েছে, আমরা দেখতে পেয়েছি।

হাসি মুখে কৃষ্ণ এসে বসল তাদের সঙ্গে। শেষ করল খাওয়া, খেলা, গরু-চরানো। তারপর বিকেল হতে নিত্যদিনের মত গোধূলি তুলে ফিরে এল গৃহে। বাছুরদের নিয়ে গাভীরা গেল নিজেদের জায়গায়। মায়েরা আদর করে কোলে তুলে নিল ছেলেদের।

কিন্তু, কেউ জানতে, এমন কি বুঝতেও পারল না, তাদের আসল গাভী আর ছেলেদের, তারা ফিরে পেল এক বছর পর।



কালিন্দীর হ্রদে কালিয় দমন

বৃন্দাবনের গোচারণ ছুঁয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে যমুনার জল। গাভী আর গো-বৎসের পাল নিয়ে সাথীদের সাথে রাখাল-রাজা কিশোর কৃষ্ণের যত খেলা এইখানেই। যশোদা-দুলাল কৃষ্ণের সঙ্গে যেমন আসে শ্রীদাম, সুদাম সখারা, তেমনি আসে রোহিণী-দুলাল দাদা বলরাম।

একদিন দাদাকে বাদ দিয়ে সখাদের সঙ্গে গরুর পাল নিয়ে রাখাল-রাজা কৃষ্ণ এল যমুনার তীরে। সখারা কৃষ্ণকে পেয়েই খুশি, দাদার কথা আর কারো মনেই নেই। ঘাসের বনে গরুর পাল ছেড়ে

দিয়ে, যেমন খেলা করে, সেদিনও সেইভাবেই শুরু করে দিল খেলা। খেলতে খেলতে এক সময় তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল সখাদের। ছুটে কালিন্দীতে গিয়ে সবাই মিলে আকণ্ঠ জল পান করল। জল পান করে কোথায় তৃপ্তি নিয়ে আবার শুরু করবে খেলা, তা নয়, সকলেরই যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করতে আরম্ভ করল। তারপর এক সময় মরার মত ঢলে পড়ল। রাখাল-রাজা দেখল, সখাদের সর্বাঙ্গ বিষে নীল হয়ে গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ মরার মত পড়ে থাকার পর এক সময় আবার সকলে জ্ঞান ফিরে পেল, উঠে দাঁড়াল—এই মাত্র যেন সব ঘুম থেকে জেগে উঠল। উঠে, সকলেই দেখল, তাদের রাখাল রাজার মুখটা যেন একটু ভার-ভার।

কেন এমন হল, ভাবতে শুরু করেছে তখন কৃষ্ণ। ভাবতে ভাবতেই তার জানা হয়ে গেল রহস্য। বিষধর সাপ কালিয় বিষ ঢেলে এর জলকে এমন বিষাক্ত করে তুলেছে। এমন অন্যায় কাজ করা কালিয়র ঠিক হয় নি। কালিন্দীর এই জল মানুষ থেকে শুরু করে গরু-বাছুর, পাখি-পাখালি সবাই খাবে, আর মারা যাবে! এর বিহিত করতেই হবে।

ঠিক তাই।

বিনতার ছেলে পক্ষীরাজ গরুড়ের সঙ্গে সৎ-মা কদ্রুর ছেলে সাপেদের শত্রুতা ছিল প্রথম থেকেই। সুযোগ পেলেই গরুড় ছোঁ দিয়ে সাপদের তুলে নিয়ে যেত আর মেরে ফেলত। এইভাবে গরুড় যখন একের পর এক তার সৎ-ভাইদের মেরে চলেছে, অথচ প্রতিকারের কোন উপায় নেই দেখে, সাপরা প্রাণভয়ে গরুড়কে দেখলেই লুকিয়ে পড়ত। সবলরা আক্রমণ করলে দুর্বলরা লুকোবেই, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু, লুকিয়ে আর কত থাকা যায়?

ওদের মধ্যেই কালিয় নামে কদ্রুর এক সাপ ছেলে বেশ বলশালী হয়ে উঠল। যেমন বিশাল তার দেহ, তেমনি উৎকট হয়ে উঠল তার বিষ। তার ওপর ফণা তুলে দাঁড়ালে ধরত হাজারটা মুখ।

শক্তি যার বাড়ে, তার দম্ভও বাড়ে। চায় না সে কাউকে গ্রাহ্য করে চলতে। ভাবে, তার চেয়ে আর বলশালী কে আছে? কালিয়রও তখন মনের সেই অবস্থা। তাই গরুড়কে দেখেও সে গ্রাহ্যই করল না।

পক্ষীরাজ উঠল রেগে। তবে রে—এত অহঙ্কার! কুটিল মন আর বিষের থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াস! কারো খারাপ ছাড়া ভাল তোরা করতে পারিস না। দেখাচ্ছি মজা। এই বলে, আকাশ থেকে সোঁ করে নেমে লম্বা ঠোঁটে বসিয়ে দিল কালিয়র দেহে এক ঠোক্কর। ইচ্ছে, দেখা যাক, ওর খেলাটা কত দূর। তারপর তো আছেই। ঠোক্কর দিতেই ফুঁসে উঠল কালিয়। ঝট্ করে তুলল তার বিরাট ফণা অনেকখানি উঁচু পর্যন্ত পক্ষীরাজকে ধরবে বলে। কিন্তু পারে কখনো? পক্ষীরাজ ততক্ষণে চলে গেছে তার নাগালের বাইরে। আকাশপথে ঘোরে পক্ষীরাজ কালিয়কে লক্ষ্য করে, নিচে বিশাল দেহ নিয়ে ফণা তুলে কালিয়ও ঘোরে গরুড়কে লক্ষ্য করে। ঘন ঘন ছাড়ে বিষ-নিঃশ্বাস। সেই নিঃশ্বাসে গাছের পাতা যায় ঝলসে, গাছ যায় শুকিয়ে, কিন্তু কিছুই হয় না গরুড়ের। আবার এই ঘোরা-ফেরার ফাঁকে একবার সাঁ করে পক্ষীরাজ নেমে খাবলা দিয়ে তুলে নিয়ে যায় তার গায়ের মাংস।

এইভাবে বেশ কিছুদিন ধরে কালিয় গরুড়ের সঙ্গে লড়াই করেও কিছুতেই তাকে বাগে আনতে পারল না। পরিবর্তে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হল, হাঁপিয়ে পড়ল। তখন আর উপায় নেই দেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিল কালিন্দীর হ্রদে, জলের নিচে। সেই থেকে সেখানেই সে থেকে গিয়েছিল তার গোপন আস্তানায়। আর উঠত না ডাঙ্গায়। হাজার মুখের হাজার দুই দাঁতে তার জমত যত বিষ, সব ঢেলে দিত সেই জলে। ফলে জল হয়ে গিয়েছিল কালো। মাঝে মাঝে মুখ তুলে যখন ছাড়ত বিষ-নিঃশ্বাস—আশপাশের গাছপালা যেত শুকিয়ে। গিয়েও ছিল তাই। যে কোন ভাবেই হোক, বেঁচে ছিল মাত্র একটা কদম্ব গাছ। সেই হ্রদের সঙ্গে ছিল যমুনার যোগাযোগ। তাই যমুনার জলও হয়ে গিয়েছিল বিষ।

চারদিক একবার ভালভাবে দেখে নিয়ে কৃষ্ণ সখাদের বললেন—দাঁড়াও তোমরা এখানে। ব্যাপারটা কি একবার দেখাই যাক।

এই বলে ওদের রেখে সোজা চলে গেলেন কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে সেই কদম গাছে। সতেজ গাছ। বিরাট গাছ। একটা ডাল তার ঝুঁকে আছে কালিন্দীর ওপর। পাকা গেছুড়ে যেন—কৃষ্ণ টপ করে সেই ডালে এসে ঝপ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন হ্রদের জলে। শুরু করে দিলেন সাঁতার কাটা আর জল তোলপাড় করা।

কৃষ্ণের কাণ্ড দেখে সখারা তো অবাক। এ আবার কি শুরু করল তাদের সখা।

প্রচণ্ড ঝাঁপাই-এর ফলে সত্যি সত্যিই জলে শুরু হল দারুণ আলোড়ন। ওপরের জল থেকে নিচে, আরো নিচে শেষে হ্রদের তলাকার মাটি পর্যন্ত উঠল ঘুলিয়ে। মাছেরা, সাপেরা সবাই হঠাৎ এই তোলপাড়ায় বেশ হকচকিয়ে গেল। এ আবার কোন শত্রু এল তাদের শান্তি নষ্ট করতে! নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল মাছেরা। সাপেরা ছুটল তাদের রাজা কালিয়র কাছে।

কালিয় থাকত জলের নিচে এমন এক নিরাপদ স্থানে যে, চট করে তার কাছে যাওয়া ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য। তবুও টের পাচ্ছিল সে, একটা কিছু হচ্ছে জলের ওপর—আর বেশ ভাল রকমের কিছু। তা নইলে, তার আস্তানা এমনি ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠত না। সদলবলে সাপেরা যখন ছুটে এল, আর স্থির থাকা সম্ভব নয় কালিয়র। মুখ তুলে দেখে, সামান্য একটা ছেলে। দেখা মাত্রই রেগে উঠল কালিয়। সজোরে তার বুকে এক ছোবল বসিয়ে দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ভেসে উঠল জলে।

তাই দেখে হায়-হায় করে উঠল বন্ধুর দল। অনেকে প্রায় জ্ঞানই হারিয়ে ফেলল।

ওদিকে ব্রজে, একটু বেলা হতেই হঠাৎ যখন সকলের খেয়াল পড়ল, কৃষ্ণ আজ বলরামকে সঙ্গে না নিয়েই গরু চরাতে গেছে, ভয়ে দুরু দুরু করে উঠল সকলের বুক। হবারই কথা। মাঝ-মধ্যে যে রকম সব অসুরের উৎপাত হচ্ছে! বলরাম সঙ্গে থাকে, তবু একটা ভরসা। কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড়, গায়ে সেই তুলনায় ক্ষমতাও অনেক। আর আজ যদি কিছু হয়!

নন্দরাজও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মা-বাবার মন তো! চঞ্চল একটু হবেই। তাই দেরি না করে বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজ প্রায় ফাঁকা করে সবাই ছুটে এল যমুনার ধারে। এসেই তারা কৃষ্ণকে জলের মাঝে বিশালকায় সাপ জড়ানো অবস্থায় দেখে হাউ মাউ করে উঠল। নন্দ-যশোদা তো কেঁদেই আকুল। চোখের জলে তারা



বারবার বলতে লাগল—ঠাকুর, এ আমাদের কি সর্বনাশ করলে ? ছেলেকে ফিরিয়ে দাও, ঠাকুর। বলরাম কিন্তু কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নন্দ থাকতে না পেরে ছুটে যাবার চেষ্টা করতে বাধা দিল বলরাম।

এদিকে সবাই যখন ভয়ে প্রায় আধমরা, কৃষ্ণ তখন ওদিকে দেখল, আর নয়। এবার আস্তে আস্তে জলের ভেতরেই ফোলাতে লাগল নিজের শরীর। শেষে এমন আকার নিল যে সাপ বাধ্য হল তাকে ছেড়ে দিতে। বাঁধনমুক্ত করে আগুন-ঠেকরানো চোখে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। নিঃশ্বাসে ছুটছে বিষ-প্রবাহ, চোখে মুখে আগুনের হল্কা। দু ভাগ জিভ মাঝে মাঝে বেরিয়ে লক্লক্ করে উঠছে।

কৃষ্ণ এবার তাকে নিয়ে শুরু করল মজার খেলা। সাপকে ঘিরে শুরু করল সাঁতার দিতে। কৃষ্ণও ঘোরে, সাপও ঘোরে—কিন্তু চট করে ছোবল আর বসাতে পারে না। তার মনেও ঢুকে গেছে একটু ভয়। অমন মারাত্মকভাবে ঠিক বুকে ছোবল বসিয়েও যখন খতম করতে পারল না, তখন ব্যাপারটা তো বেশ সুবিধের নয়। তার ওপর অমনভাবে বাঁধন ছাড়িয়ে নিল ! তাই কালিয় এবার একটু সাবধান হয়েই লক্ষ্য রেখে চলেছিল কৃষ্ণকে।

সুচতুর কৃষ্ণ। খেলাতে খেলাতে যখন দেখল প্রায় হাঁপিয়ে পড়েছে, তখন এক ফাঁকে টুক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল তার ফণায়। শুরু করে দিল নাচতে। পায়ের ভারে থেঁতলে যেতে লাগল কালিয়র এক-একটা মাথা। আর কি ভীষণ দাপাদাপি কালিয়র।

যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে নন্দ-যশোদা থেকে শুরু করে সকলেই ছেলের ঐ কাণ্ড দেখে তো অবাক।

ইতিমধ্যে নাচের চোটে কালিয়র হাজারটা ফণা গেল থেঁতলে, শরীর গেল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে, হ্রদের জল হয়ে গেল তার রক্তে লাল। মরার মত নেতিয়ে পড়ল সে।

রাখাল-রাজা কিন্তু তাকে প্রাণে মারল না। তার দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়ে শুধু বলল—জলে বিষ ঢেলে, কত প্রাণীর সর্বনাশ করছ বল তো ? এখানে তুমি আর থাকতে পাবে না। এই হ্রদ ছেড়ে চলে যাও রমণক দ্বীপে। খবরদার, আর এ মুখো হবে না।

সেই শর্ত স্বীকার করে কালিয় চলে গেল। ফিরে এল রাখাল-রাজা।

এতক্ষণ ছেলের জন্য যাদের চোখে বইছিল জলের ধারা, এখন ছেলেকে ফিরে পেয়ে তারা হল আনন্দে দিশেহারা।



ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ

সে সময় খুব ধুমধাম করে চারদিকে হতো ইন্দ্রযজ্ঞ।

দেবরাজ ইন্দ্র। মেঘেরা চলে তাঁর কথায়। তিনিই পাঠান মেঘদের পৃথিবীর আকাশে বর্ষার সময়, জল দেবার জন্যে। সেই জলে হয় চাষবাস, ভরে ওঠে খাল-বিল-নদী-সরোবর। সেই জল পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে গাছপালা। মাঠের পর মাঠ জুড়ে কচি কচি সবুজ ফসল নেচে বেড়ায় আনন্দে। গোচারণ ভরে যায় নধর সবুজ ঘাসে।

তাই সকলেরই তখন ধারণা ছিল, দেবরাজ ইন্দ্র যদি বৃষ্টি না দেন, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেজন্য তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যে যেমন পারত, দেবরাজের জন্য ভাল-ভাল খাবার তৈরি করত। কাঠ যোগাড় করে, আগুন জ্বেলে, ঘটি-ঘটি খাঁটি ঘি-এর সঙ্গে সেই সব খাবার আগুনে নিবেদন করত ইন্দ্রের উদ্দেশে। দেবতাদের ব্যাপার। তাঁরা এভাবেই খেতে অভ্যস্ত। তাই বেশ ভাল খাওয়াই হতো তাঁর।

কৃষ্ণ হঠাৎ একদিন দেখল, ব্রজে ঘরে ঘরে সবাই বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যেন। ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে পায়েস, ডাল, নানারকমের খাদ্যসামগ্রী, তার সঙ্গে আবার জিলিপি।

দেখে খুব কৌতূহল জাগল কৃষ্ণের। ব্যাপার কি জানতে হবে। মোটে তখন তার সাত বছর বয়স। অত কম বয়স হলে কি হবে,

সকলেই কিন্তু তাকে দেখত অন্য চোখে। জন্মগ্রহণের পর পরই পূতনার মত রাক্ষসীর স্তন পান করে যে তাকে মেরে ফেলতে পারে, মাত্র তিন মাসের শিশু যখন, পা ছুঁড়ে দুধ-দই বোঝাই ভারি গাড়ি যে উল্টে দিতে পারে, এক বছর বয়সে যে দৈত্য তৃণাবর্তকে শুধু গলা জড়িয়ে ধরে মারতে পারে, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, প্রলম্বাসুর-এর মত দুর্দান্ত কংস-অনুচরদের যে বিনাশ করতে পারে, কালিয়ার মত বিষধর সাপের মাথায় শুধু নেচে যাকে জখম করে দিতে পারে—সে কি কোন সাধারণ ছেলে? গর্গমুনির দৌলতে নন্দ তার পরিচয় জেনেছেন। জেনেছেন, স্বয়ং ভগবান এসেছেন তাঁদের ঘরে কৃষ্ণ-রূপে। কিন্তু নন্দ ছাড়া আর তো কেউ তা জানে না। তারা ঐটুকু ছেলের অতসব কাণ্ড দেখে, অন্য চোখে যেমন দেখে তাকে, তেমনি ভালও বাসে। তাই কৃষ্ণ কিছু জিজ্ঞেস করলে, তারা যেমন তার জবাব না দিয়ে থাকতে পারত না, তেমনি আবার কিছু বললে, সেটাই মেনে নিত, ছোট ছেলের বাচালতা বলে কোন মতেই উড়িয়ে দিতে পারত না।

ঘরে ঘরে খাবার তৈরির আয়োজন যখন চলেছে সমানে, বয়স্ক গোপরাও যখন খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন একদিন গুটি গুটি কৃষ্ণ গিয়ে বসল নন্দরাজার কাছে। সমবয়স্ক কয়েকজন গোপের সঙ্গে বসে তখন নন্দরাজ।

কৃষ্ণকে দেখে সকলেই যেন একটু শশব্যস্ত হয়ে উঠল—কিছু বলবে, বাবা?

—ভাল ভাল সব খাবার তৈরি হচ্ছে, সকলেই ব্যস্ত, সামনে কোন উৎসব আসছে নাকি?

—হ্যাঁ বাবা, ইন্দ্রযজ্ঞ হবে। তারই আয়োজন চলছে। বললেন নন্দ।

—ইন্দ্রযজ্ঞ! শুনে অবাক হবার ভান করল কৃষ্ণ—কেন?

—দেবরাজ ইন্দ্রকে পুজো না দিলে যে বৃষ্টি হবে না, বাবা। পুজো না পেলে, তিনি যদি রেগে যান, তাহলে⋯?

—তাহলে কি হবে? যেন কিছুই জানে না কৃষ্ণ।

—বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি না হলে ফসল হবে না। গাছপালা হবে না। জল না পেয়ে সব শুকিয়ে মরবে। তাঁরই দেওয়া জলে-ফলে-ফুলে তাঁরই পূজা—এটাই তো ধর্ম বলে জানি।

—এই ধর্ম না মানলে যে অমঙ্গল হবে, কৃষ্ণ—বলল একজন প্রবীণ গোপ।

চুপ করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনল কৃষ্ণ। তারপর বলল—আমি কিন্তু তোমাদের কথা মানতে পারছি না বাপু।

—কেন? কেন? সকলের মুখে-চোখে বিস্ময়ের প্রশ্ন।

—আচ্ছা, বৃষ্টি আসে কোথা থেকে? মেঘ থেকে। জলভরা মেঘ আকাশে না জমলে তো আর বৃষ্টি হচ্ছে না। জমলে, সে জল হয়ে ঝরে পড়বেই। এটা তার স্বভাব। বলল কৃষ্ণ।

—কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ইচ্ছে না করলে তো আর ঐ মেঘ আকাশে জমবে না, বাবা। বাধা দিয়ে বলল আর এক প্রবীণ গোপ।

—বেশ, তাই না হয় হল। বলল কৃষ্ণ—কিন্তু সেই জল নিয়ে আমরা যদি কোন কাজ না করি, তাহলে কি ফল লাভ করব?

মারাত্মক এক প্রশ্নের ফাঁদে তাদের ফেলল কৃষ্ণ।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—না। কাজ না করলে ফল পাওয়া যাবে কি করে?

—তাহলে ইন্দ্রের বাহাদুরিটা কোথায়? কেন ইন্দ্রের যজ্ঞ করব? কাজ না করলে যখন আমরা বেঁচে থাকতে পারব না, তখন কাজই আমাদের কাছে দেবতা। কাজ করলে ফল মেলে যখন, তখন কাজেরই পুজো করা উচিত। যজ্ঞ করতে গেলে, কাজেরই যজ্ঞ করা উচিত। ধর, তোমাদের ঐ দেবরাজ ইন্দ্র খুব জল দিল, এদিকে কারোরই কাজ করার ক্ষমতা নেই, তাহলে তোমাদের কি লাভ হবে? কি-ই বা ফল পাবে।

কৃষ্ণের এই কথা কি দিয়ে কাটাবে গোপরা? একেবারে তো উড়িয়ে দেবার মত কথা নয়! সত্যিই তো, কাজ না করে কোন



দেবতার পুজোয় কি ফল? আবার, কাজ করলে তবে ফল যখন, তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ এই সব গাদা গাদা দেবতার নামে যাগ-যজ্ঞ, পুজো করে কি লাভ? গরু প্রতিপালন আমাদের কাজ। সেই কাজ আমরা ঠিকমত না করে যদি ইন্দ্রযজ্ঞ করি, কি ফল হবে? আবার, এতদিন ধরে যা চলে আসছে, তাকে বন্ধ করলে যদি কোন অনিষ্ট হয়?

এভাবে নানা ভাবনায় যখন হাবুডুবু খাচ্ছে প্রবীণ গোপরা, তখন কৃষ্ণ বলল—শোন, আমি একটা কথা বলি। আমরা জাতিতে গোপ। থাকি বনে-পাহাড়ে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে আমরা গরু চরিয়ে বেড়াই। মাঝে মাঝে সেখানে হয় সাপের উৎপাত। আমরা যখন কোন গ্রামে-নগরে থাকি না, থাকি বনে-পাহাড়ে, তখন ইন্দ্রযজ্ঞ না করে পর্বত-যজ্ঞ কর না। ইন্দ্রের জন্য যা সব করা হয়েছে, তাই দিয়েই পর্বতের পুজো হয়ে যাবে। ভাল ভাল ব্রাহ্মণদের এনে যজ্ঞ হোক না। ঘড়া-ঘড়া দুধ দিয়ে তাঁরা আগুনে পর্বতের উদ্দেশে হোম করুন। যেখানে যত আতুর আছে, এমন কি চণ্ডাল থেকে কুকুর যত আছে, ডেকে এনে তাদের পেট পুরে খাওয়ানো হোক। আমার তো মনে হয়, বাবা, তোমাদের ঐ ইন্দ্রযজ্ঞ থেকে এই কাজে অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ছোট হলেও কৃষ্ণের কথা পাশ কাটিয়ে যায় এমন সামর্থ্য কারোরই নেই। গোপরাজ নন্দ থেকে শুরু করে প্রবীণ গোপরা স্থির করে ফেললেন, বেশ, তা-ই হোক।

আসল ব্যাপারটা ছিল অন্যত্র।

ইন্দ্র যেহেতু দেবতাদের রাজা, তাই মুখে সবসময় প্রকাশ না করলেও, মনে মনে তাঁর দর্প আর অহঙ্কার ছিল দারুণ। ভাবতেন,

তাঁর মত শক্তিমান এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে—যাঁর এক ডাকে সব দেবতা থেকে শুরু করে মুনি ঋষি লোকপালেরা 'জো হুজুর' করে এসে হাজির হয় ! অবশ্য রাজ-সিংহাসনের ধর্মই তাই। বসলেই সে হয়ে যায় অন্যরকম। কিন্তু, একজন দেবপুরুষকে এরকম মোহগ্রস্ত হলে চলবে কেন ? তাহলে, সাধারণ মানুষ আর দেবতায় তফাত থাকল কোথায় ? নররূপী ভগবান কৃষ্ণ সেটা বুঝতে পেরেই তাঁকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। ভেতরের এসব কথা গোপরা কেমন করে বুঝবে। কৃষ্ণের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস আর দারুণ ভরসা। এটুকু তারা মনে-প্রাণে বুঝে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে যতক্ষণ কৃষ্ণ আছে, কেউ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

যাই হোক, কৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী হলও তাই। মহাসমারোহে যজ্ঞ হল। গরু-বাছুর নিয়ে ব্রজবাসীরা পর্বত প্রদক্ষিণ করল। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, আর্ত-আতুর যে যেখানে ছিল, সকলকে পেট ভরে খাওয়াল, দানও করল ভূরি-ভূরি।

যজ্ঞ শেষ।

ওদিকে টনক নড়ে উঠে দেবরাজের। কি ব্যাপার ? তাঁর উদ্দেশে এত দিন ধরে যে যজ্ঞ হয়ে আসছিল, খাচ্ছিলেন দুধ, দই, ক্ষীর, ননী থেকে সব রাজকীয় অমৃত, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন ? নন্দ প্রভৃতি গোপদের ওপর খুব রেগে উঠলেন তিনি। পাঠালেন চর। সঠিক ব্যাপারটা জেনে আসার জন্য।

চর ফিরে এসে সব জানাতেই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ইন্দ্র।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল দুরন্ত মেঘ সংবর্তকের, যে চোখের নিমেষে প্রলয় ঘটায়।

সংবর্তক আসতেই বজ্র-হুঙ্কার ছাড়লেন ইন্দ্র—শোন সংবর্তক, আমি ব্রজবাসীদের এই অবহেলা কিছুতেই সহ্য করব না। ঔদ্ধত্যের চরম সীমায় চলে গেছে ওরা। জানো, ঐ গোপরাজ নন্দের একটা ছেলে আছে। তার নাম শুনলাম, কৃষ্ণ। সেদিনের ছেলে, নিজেকে ভেবে নিয়েছে বিরাট পণ্ডিত। বিধান দিয়ে ব্রজে আমার যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছে। বাচাল, জানে না, কার বিরুদ্ধাচরণ করেছে সে ! আর ব্রজবাসীরা তাকেই কাণ্ডারী ধরে নিয়ে আমাকে বাদ দিয়ে পর্বতের যজ্ঞ শুরু করে এল। এতই তাদের স্পর্ধা ! তুমি এখুনি তোমার অনুচরদের নিয়ে ব্রজে যাও, প্রলয় কাণ্ড ঘটাও সেখানে। দেখি, ঐ বাতুল কৃষ্ণ কেমন করে বাঁচায় তাদের। আমিও আমার ঐরাবত নিয়ে যাচ্ছি ওর ভবলীলা শেষ করতে।

দেবরাজের আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে অনুচরদের নিয়ে সংবর্তক ছুটল ব্রজের পথে।

বর্ষাকাল নয়। তাই পরিষ্কার ব্রজের আকাশ।

ব্রজবাসীরা দেখল, হঠাৎ কোথা থেকে প্রবল ঝড় তুলে সাঁ সাঁ করে ছুটে এল কালো কালো মেঘের দল। ঢেকে গেল আকাশের নীল। নেমে এল যেন অকাল-সন্ধ্যা। শুরু হল মেঘের গুরু গুরু গর্জন, পড়তে লাগল ঘন ঘন চোখ-ঝলসানো বাজ, আর সেই সঙ্গে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি।

মাথা গোঁজার মত আশ্রয় যার যেখানে এতটুকু ছিল, শিলার আঘাতে সব ফুটি-ফাটা হয়ে গেল। পাথরের টুকরোর মত এসে পড়তে লাগল বৃষ্টির সঙ্গে গোঠে গরু-বাছুরদের পিঠে-মাথায়। প্রচণ্ড শীতে তারা কাঁপতে শুরু করে দিল। দেখতে দেখতে পায়ের নিচেও জমে উঠতে লাগল জলের ওপর জল, তার ওপর জল। মুহূর্তে চারদিক যেন ভেসে গেল বন্যার জলে।

অকস্মাৎ এমন কাণ্ড ! এ যে অভাবনীয়। ব্রজবাসী কারোরই বুঝতে বাকি রইল না—তাদের আচরণে দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র পাঠিয়েছে মৃত্যুদূত। মনে মনে ভাবলেও একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল না কেউই। কৃষ্ণের ওপর তাদের যে অগাধ আস্থা।

লহমার মধ্যে কৃষ্ণ বুঝে নিল, ব্যাপারটা কি। মনে মনে শুধু একটু হাসল ইন্দ্রের কাণ্ড দেখে। সামান্য একজন দেবপুরুষ যদি নিজেকে ভাবে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ভগবান, সেই ভুল তার ভেঙ্গে দেওয়াই উচিত। না দেওয়াটাই অনুচিত হবে।

ইতিমধ্যে চতুর্দিকে জল জমে গেছে। থৈ থৈ ভাসতে শুরু করেছে—মানুষ, গরু, বাছুর। গোবর্ধন পাহাড়ও ডুবে গেছে অনেকখানি। আর দেরি করলে প্রাণনাশ শুরু হয়ে যাবে।

সকলকে ডাকল কৃষ্ণ। বলল—গরু, বাছুর, গাড়ি যা যা আছে, সব নিয়ে তোমরা গোবর্ধন পাহাড়ের ওপর যে বড় গুহাটা আছে, ওর ভেতর আশ্রয় নাও। তাহলে আর ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট পেতে হবে না।

—কিন্তু, যেভাবে জল বাড়ছে, কৃষ্ণ···। উদ্বেগ জাগে নন্দের কণ্ঠে।

—তার জন্য তোমাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না, বাবা। হাসি-হাসি অথচ বেশ গম্ভীর মুখ কৃষ্ণের।—হোক বৃষ্টি, বাড়ুক জল, গোটা পাহাড়টা আমি তুলে ধরে রাখব। তোমাদের কোন ভয় নেই।

—যে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে···।

—ওকে আটকানোর ভার আমার, বাবা। তোমরা আর দেরি কোরো না।

মনে মনে কেঁদে ওঠে মা যশোদার প্রাণ। চোখ বুজে একটু আশ্বস্ত হয় নন্দ। তারপর সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ে ব্রজ খালি করে সেই গুহায়। আর কৃষ্ণ মূল-সমেত তুলে নিয়ে হাত দিয়ে ওপরদিকে তুলে ধরে গোবর্ধনকে।

প্রথমটা দেখেই একটু চমকে ওঠেন ইন্দ্র। যেন চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। তার আদেশে সংবর্তক আরো প্রলয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বাড়তে থাকে জল। ইন্দ্র দেখেন, জল যত বাড়ে, তত ওপরে ওঠে গোবর্ধন সামান্য ঐ বালক কৃষ্ণের হাতের ভারে। একটানা চলল সেই কাণ্ড—সাতদিন, সাতরাত। তবু কিছুই করতে পারলেন না ইন্দ্র। না মারতে পারলেন একটা প্রাণী, না নষ্ট করতে পারলেন ব্রজবাসীর ধনসম্পদ। উপরন্তু লজ্জায় মাথা নিচু করে, এসে লুটিয়ে পড়লেন কৃষ্ণের পায়ে—প্রভু, না বুঝে যে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।

বালক কৃষ্ণ হাসিমুখে শুধু বলল—দেবতা যারা হয়, তাদের কি অহঙ্কার শোভা পায় ?

মুহূর্তে কেটে গেল মেঘ। সরে গেল জলের প্লাবন। অবাক চোখ মেলে ব্রজবাসীরা দেখল তাদের বাল-গোপালের আর এক অপরূপ লীলা।



সমুদ্রগর্ভে পুরী নির্মাণ ও জরাসন্ধ

চন্দ্রবংশ—যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব নামে পঞ্চপাণ্ডব। সেই বংশেরই অন্যতম পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন বৃহদ্রথ। এঁর ছিল দুই ছেলে। বড়-র নাম কুশাগ্র, আর ছোট জরাসন্ধ। বড় ছেলে কুশাগ্র ভালভাবেই হয়েছিল, কিন্তু ছোটটির বেলায় মহারানী প্রাণহীন দুটি মাংসখণ্ড নাকি প্রসব করেছিলেন। শোকে-দুঃখে-লজ্জায় তিনি সে দুটি বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন। অনেকে আবার বলে, নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। সে যাই হোক, কেমন করে যেন মানুষের আকারের ঐ মাংসখণ্ড দুটো চোখে পড়ে যায় জরা নামে এক মায়াবী রাক্ষসীর। সে ঐ খণ্ডদুটো তুলে নিয়ে জোড়া লাগিয়ে কয়েকবার 'বেঁচে ওঠ, বেঁচে ওঠ' বলতে বলতেই নাকি শিশুটি বেঁচে উঠেছিল। সেই জন্য তার নামই হয়ে গিয়েছিল জরাসন্ধ।

মগধের সিংহাসনে বৃহদ্রথের পর রাজা হয়ে বসেছিল এই জরাসন্ধই। যেমন ছিল তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, তেমনি ছিল ক্ষমতায় অসাধারণ। যাকে সত্যিকারের বীরপুরুষ বলা যেতে পারে। গদা-যুদ্ধে সে সময় তার সমান আর কেউই ছিল না।

কাজেই এত বড় বীর যে, তাকে তো সকলে সমীহ করে চলবেই। তার ছিল দুই মেয়ে—অস্তি আর প্রাপ্তি। জরাসন্ধ তাদের বিয়ে দিয়েছিল আর এক বীর মথুরার রাজা কংসের সঙ্গে। কংস চলত তারই নির্দেশে। তাই জরাসন্ধকে যেমন সকলে সমীহ করত, তেমনি, যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি আত্মীয়-পরিজনদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে চলা সত্ত্বেও কংসের বিরুদ্ধাচরণ করতে বড় কেউ সাহস পেত না।

সেই কংস যখন নিহত হল উৎসবের দিনে মথুরায় সামান্য এক রাখাল ছেলে কৃষ্ণের হাতে, তার দুই মেয়ে বিধবা হয়ে যখন ফিরে গিয়ে সব বলল তাদের বাবাকে, তখন বীর জরাসন্ধের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

কি! সে বেঁচে থাকতে, মরতে হল তার জামাইকে? বিধবা হতে হল তার মেয়েদের? জামাইয়ের বংশ গেল লোপ পেয়ে? রাখাল ছেলে কৃষ্ণ কিনা আবার উগ্রসেনকে (জরাসন্ধের বেয়াই) বসাল মথুরার সিংহাসনে? তার মানে, এঁটুকু ছেলেই তাহলে ঘুরে ফিরে হল কিনা মথুরার রাজা? গরু চরানো ছেড়ে রাজ্যশাসন? অসম্ভব··· অসহ্য!

অবশ্য ঘটেছিল তা-ই। কংসকে বধ করে সকলের মনের ক্ষোভ মিটিয়ে কৃষ্ণ বসুদেব, দেবকী, কংসের বাবা, নিজের দাদু উগ্রসেনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দাদুকেই বসিয়েছিল সিংহাসনে। দাদুর ইচ্ছে ছিল না। বলতে গেলে নাতি কৃষ্ণই তাকে এক রকম জোর করে সিংহাসনে বসিয়েছিল। তাই আর উপায় ছিল না উগ্রসেনের। কিন্তু মনে মনে বুঝেছিল, কৃষ্ণ কাছে না থাকলে সর্বনাশ। সেজন্য নিজের কাছে কৃষ্ণকেও আটকে রেখেছিল।

নন্দের ঘরে জন্মালেও, কৃষ্ণ তো আসলে বসুদেবেরই ছেলে—ক্ষত্রিয়। বলরামের সম্বন্ধে অন্য কোন কথাই নেই। ক্ষত্রিয়-সংস্কারের সময়ও হয়ে গেছে তার দুই ছেলের। বসুদেব এই সুযোগে কুলগুরু গর্গমুনিকে এনে তাদের সেই কাজ করিয়ে দিল। তারপর পাঠাল সন্দীপন মুনির কাছে বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য। বেশিদিন লাগে নি দুই ভাইয়ের বেদ-উপনিষদ অধ্যয়ন থেকে শুরু করে যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি শিখতে। অসাধারণ প্রতিভা নিয়েই যারা জন্মায়, তাদের কাছে কোন কিছুই কঠিন নয়। কৃষ্ণ-বলরামের কথাই আলাদা। বয়সে কিশোর হলে কি হবে, ওদের সব ব্যাপারই স্বতন্ত্র। একদিনেই তা বোঝা হয়ে গিয়েছিল সন্দীপন-এর। স্বয়ং ভগবান, মানুষের বেশে তাঁর শিষ্য হয়েছে, এ কি তাঁর কম ভাগ্যের কথা? সাধারণের কাছে কৃষ্ণ-বলরাম আর সাধারণ গোপ-বালক নয়, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বীর ক্ষত্রিয়। স্বাভাবিকভাবেই ভাল ভাল ক্ষত্রিয় রাজারা উৎসুক হয়ে উঠল তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে।



এদিকে ক্ষত্রিয় মগধরাজ জরাসন্ধ আর যারা তার অনুগামী ছিল, তারা সবাই মিলে জোট বাঁধল। কৃষ্ণ-নিধন তো বটেই, মথুরাপুরীকেও ধ্বংস করে দিতে।

মগধে উঠল সাজ-সাজ। ধ্বংস কর যাদববংশ।

জরাসন্ধ সরোষে এসে মথুরাপুরী ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে একুশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে, যাতে একটা প্রাণীও মথুরার বাইরে বেরিয়ে না পালাতে পারে। (চার রকমের সৈন্যবাহিনী নিয়ে হয় অক্ষৌহিণী, তাই একে চতুরঙ্গ বাহিনীও বলে। এর মধ্যে থাকে ১,০৯,৩৫০ জন পদাতিক, ৬৫,৬১০ জন অশ্বারোহী, ২১,৮৭০ হস্তীবাহিনী, ২১,৮৭০ রথী—মোট ২,১৮,৭০০ সৈন্য নিয়ে হয় এক অক্ষৌহিণী। এইরকম ২১ অক্ষৌহিণী নিয়ে জরাসন্ধ অবরোধ

করেছিল মথুরা।) মথুরায় সামান্য কিছু যাদব-সেনা, শত্রুপক্ষের সঙ্গে যার কোন তুলনাই চলে না। বাইরে থেকে যে কোন সাহায্য আসবে, সে পথও বন্ধ। খুবই চিন্তায় পড়লেন উগ্রসেন, বসুদেব থেকে সকলেই। সবাই মুখ চেয়ে আছে বালক কৃষ্ণের।

চিন্তায় পড়েছে কৃষ্ণ-বলরামও জরাসন্ধের কাণ্ড দেখে। উগ্রসেন, বসুদেবদের মধ্যে যেমন ঢুকেছিল প্রাণের ভয়, ওদের মধ্যে কিন্তু সে চিন্তা ছিল না। ওরা ভাবতে লাগল—কাকে মারা হবে—জরাসন্ধকে, না তার ঐ বিশাল-বাহিনীকে? জরাসন্ধকে বধ করলে এই বিশাল বাহিনী সহজেই তাদের মুঠোয় চলে আসবে, নিজেদের শক্তিও বাড়বে। কিন্তু এইরকম ভাবে শক্তি বাড়িয়ে লাভ? এরা যখন স্বার্থপর, দাম্ভিক জরাসন্ধের অনুগামী হয়ে এসেছে তখন মনে-প্রাণে এরাও জরাসন্ধের মতই কুটিল। তাছাড়া, পৃথিবীকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের জন্ম। অত্যাচারী জরাসন্ধ এক সময় মরবেই। কিন্তু এতগুলো অত্যাচারীকে এক জায়গায় পাওয়া তো আর সব সময় সম্ভব নয়। তাই দু ভাই ঠিক করেই ফেলল যে, আগে এই সৈন্যবাহিনীকেই নিকেশ করা হোক।

মনস্থ করা মাত্রই আকাশ থেকে নেমে এল দিব্য এক রথ। রথের মাথায় উড়ছে গরুড় আর তালধ্বজের ছবি আঁকা পতাকা। দারুক নামে একজন হল সেই রথের সারথি। বিশাল এক ধনুক, নাম তার শার্ঙ্গধনু, রয়েছে সেই রথে। রয়েছে অজস্র শক্তিশালী বাণ-ভরা তূণীর। রথ নামিয়ে দারুক প্রণাম জানাল কৃষ্ণ-বলরামকে।

যেন এরই অপেক্ষায় ছিল কৃষ্ণ, এমনিভাবে রথ আসামাত্রই দাদা বলরামকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ উঠল রথে। পেছনে কিছু যাদব সেনা। ওঠামাত্রই রথ তাদের নিয়ে এল মথুরার বাইরে। সামনেই রথে জরাসন্ধ। তারপর সেই অগণিত সেনা।

এসেই কৃষ্ণ রথ থেকে তুলে নিল তার শিঙ্গা। তারপর এত জোরে ফুঁ দিল যে দিগন্ত কাঁপিয়ে রণভেরীর মত বেজে উঠল তা। এত প্রচণ্ড সে শব্দ, যে তাতেই সেনাবাহিনীর বুক যেন দুরু দুরু করে উঠল।

তাই দেখে রথ নিয়ে জরাসন্ধ এল এগিয়ে। কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলল—ভেবেছিলাম, তোরা আত্মসমর্পণ করতে এলি। কিন্তু রণভেরী বাজালি যে? যুদ্ধ করবি নাকি?

—ক্ষত্রিয়ের ধর্মই তো যুদ্ধ করা। যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণের কথা ভাবলে কিভাবে? মন্তব্য করল কৃষ্ণ।

—যুদ্ধ করবি আমার সঙ্গে? তোর সাহস তো কম নয়! কিন্তু, তোর সঙ্গে যুদ্ধ আমি করব না কৃষ্ণ। সেদিনের এক পুঁচকে ছেলে তুই। এতে আমারই বদনাম হবে। তবে তোর দাদা যদি যুদ্ধ করার সাহস রাখে, তাহলে ওর সঙ্গে যুদ্ধ করা যেতে পারে। উপেক্ষা ভরে বলল জরাসন্ধ।

—ক্ষত্রিয় বীর হয়ে কথাটা বাতুলের মত বলা হল না? এমনভাবে মন্তব্য করল কৃষ্ণ, যাতে জরাসন্ধ নিজের দম্ভ আর চেপে রাখতে পারল না।

শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। আর মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধ নিল ভীষণ আকার। একদিকে সামান্য কিছু যাদব সেনা নিয়ে একটি রথে কৃষ্ণ-বলরাম। আর একদিকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য, হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে জরাসন্ধ।

কৃষ্ণের শার্ঙ্গধনুতে ওঠে টঙ্কার। তূণীর থেকে বেরিয়ে ছোটে চোখের পলকে এক একটা বাণ, যেন দাবানল। এক এক বাণে প্রাণহীন ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল এক এক দল সেনা হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে। ঘন ঘন উঠতে লাগল জরাসন্ধের হুঙ্কার। এগিয়ে আসতে লাগল 'মার··· মার···' করে সেনারা, আর শেষ হয়ে যেতে থাকল এক এক বাণে। বইতে শুরু করল রক্তের নদী।

একুশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রায় শেষ। বলরাম এবার মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল জরাসন্ধকে। যত বড় বীরই সে হোক, এই পাশ অস্ত্র থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। কৃষ্ণ তা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল দাদাকে। বলল—ওকে আর মেরে কি করবে দাদা? ও যে কত বড় বীর, তা তো দেখাই গেল। ওকে ছেড়েই দাও।

ভাই-এর অনুরোধ। বলরাম ছেড়ে দিল জরাসন্ধকে।

একজন ক্ষত্রিয় রাজা, বিশেষ করে বীরের পক্ষে এ যে কত বড় অপমান, তা মর্মে উপলব্ধি করে ছেলে দুটোর সামনে মাথা নিচু করে সেখান থেকে চলে গেল সে।

মন ভার। নিজের ওপরই ধিক্কার এসে গেল জরাসন্ধর। ভাবল, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বনেই চলে যাবে।

কিন্তু যাওয়া আর হল না। বন্ধু-বান্ধবরা আবার তাকে চাঙ্গা করে তুলল। একবার পরাজয় ঘটেছে বলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে? এটা কোন ক্ষত্রিয় বীরের কাজ নাকি?

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল জরাসন্ধ। ঠিকই তো। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—হয় শত্রু নিধন, নয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন।

তোড়জোড় শুরু হল আবার জরাসন্ধের। বালকই হোক, আর আত্মীয়ই হোক, আর উপেক্ষা নয় কৃষ্ণকে। যদুকুল নির্মূল তাকে করতেই হবে।

এবারে আর একুশ নয়, তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে জরাসন্ধ আবার অবরোধ করল মথুরা। কিন্তু পারল না কৃষ্ণ-বলরামকে কায়দা করতে, পারল না মথুরা জয় করতে। না পারুক, চেষ্টা এবার থেকে চালিয়ে যেতেই হবে। জিদ চেপে গেল জরাসন্ধর মাথায়। কিছুদিন বাদ-বাদ তেইশ অক্ষৌহিণী নিয়ে বারবার জরাসন্ধ হানা দিতে শুরু করল মথুরায়। আর বিব্রত করে তুলতে লাগল যাদবদের।

এমনিভাবে সতের বার শেষ হয়ে গেছে হানা দেওয়া। কৃষ্ণ-বলরামের হাতে প্রতিবারেই তেইশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে সামান্য কিছু সেনাই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছে। অপমানের জ্বালা নিয়ে প্রতিবারই ফিরে গেছে জরাসন্ধ। তবুও প্রতিজ্ঞা তার, এর শেষ দেখতেই হবে।

দিনকয় বাদেই মথুরায় আবার খবর এল—তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে আবার মথুরা আক্রমণের আয়োজন প্রায় শেষ করে এনেছে জরাসন্ধ। এই নিয়ে সে আসবে আঠেরোবার। আসুক ক্ষতি নেই। তাতে অসাধু লোকেরাই মরছে, পৃথিবীর ভার কমছে। কিন্তু মথুরার জনসাধারণ যাদবদের পক্ষে যদিও ক্ষয়-ক্ষতি কম, তবুও এত ধকল কি বারবার সহ্য করে চলা সম্ভব?

বুঝতে পারছে কৃষ্ণ, ক্রমশই বিচলিত হয়ে উঠেছে যাদবরা। শান্তিতে বসবাস করতে না পারলে বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আর যতদিন যাদবরা এই মথুরায় থাকবে, জরাসন্ধ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন এই অশান্তি সে করেই চলবে। অথচ, কৃষ্ণ কিন্তু এই মুহূর্তে জরাসন্ধকে হত্যা করে আপদের শেষ করতে মোটেই রাজি নয়। বাধ্য হয়ে বসুদেব, উগ্রসেনকেও চলতে হচ্ছে কৃষ্ণের মতে।

কিন্তু এইবারে কৃষ্ণ-বলরাম সত্যি সত্যিই একটু বিচলিত হয়ে উঠল।

বিভিন্ন দেশ জয় করতে করতে এক ম্লেচ্ছ, নাম তার কালযবন, তিন কোটি ম্লেচ্ছবাহিনী নিয়ে, হঠাৎ একদিন অবরোধ করে বসল মথুরা।

এদিকে কালযবনের ম্লেচ্ছ-বাহিনী, আবার দিনকয়েকের মধ্যেই তেইশ অক্ষৌহিণী নিয়ে আসছে জরাসন্ধ। একই সঙ্গে দুটো শত্রুদলকে ঠেকানো, আবার মথুরা রক্ষা করে যাদবদের নির্ভয়ে রাখা, রণকৌশলের বাইরে। শত্রুকুল বিনাশ হবেই। কিন্তু যাদবকুলের কোন ক্ষতি কৃষ্ণ আদৌ সহ্য করতে পারবে না।

দাদা বলরামের সঙ্গে তাই যুক্তি করে ঠিক করল, মথুরা থেকে যাদবদের কোন সুরক্ষিত দুর্গ নগরীতে সরিয়ে দিতে হবে। তারপর শত্রুদের মোকাবিলা। কিন্তু, সে রকম দুর্গ স্থাপন করার জায়গাই বা কোথায়? আর করবেই বা কে? স্থলভাগের যেখানেই দুর্গ তৈরি করুক না কেন, হানাদারদের হানার হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই দু ভাই মিলে ঠিক করল এই দুর্গ-নগর তৈরি করতে হবে সমুদ্রের নিচে, যেখানে সহজে কেউ যেতে পারবে না। ডাক পড়ল বিশ্বকর্মার।



দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মা। তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। কৃষ্ণ বলরামের ইচ্ছা অনুযায়ী সমুদ্রের নিচে বারো যোজন (আটচল্লিশ ক্রোশ) এলাকার জল সরিয়ে দিয়ে শুরু করে দিল দুর্গ-নগর তৈরির কাজ। দেখতে দেখতে বাইরের মজবুত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়ে গেল নগর এলাকা। তৈরি হয়ে গেল বসবাসের উপযোগী মনোরম সব ঘর, উপবন, প্রাঙ্গণ, রাজপথ, বাগান। সাদা পাথর দিয়ে তৈরি হয়ে গেল সব পুরদ্বার আর অট্টালিকা—চূড়াগুলো তার সোনার। প্রস্তুত হল রন্ধনশালা, অশ্বশালা, যার চূড়াগুলোয় বসানো হল রূপো আর পিতলের কলসী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেরই থাকার জন্য আলাদা আলাদা সব সাজানো বাসভবন তৈরি হল। আর নগরের ঠিক মাঝখানে যদুপতি উগ্রসেনের জন্য অপূর্ব রাজপ্রাসাদ। উগ্রসেন ছাড়াও বসুদেব, বলরাম আর কৃষ্ণের জন্যও নির্মিত হল রাজপ্রাসাদের ভেতর সব মনোরম প্রাসাদ। যেমন অপূর্ব, তেমনি অতুলনীয় সেই কৃৎকৌশল। সমুদ্রগর্ভের অপরূপ সেই পুরীর নাম রাখা হল দ্বারকা।

নগরদুর্গ নির্মাণ হয়ে গেলে, কৃষ্ণ দারুণ কৌশলে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মথুরা থেকে সব্বাইকে সেখানে রেখে খালি হাতে দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল মথুরায়। স্বজনদের জন্য আর কোন চিন্তা নেই কৃষ্ণের। এবার শত্রুর মোকাবিলা।

মথুরাদ্বার অবরোধ করে সসৈন্যে অপেক্ষা করছে কালযবন। সময় বুঝে খালি হাতেই বেরিয়ে এল কৃষ্ণ-বলরাম। তাদের অনুসরণ করল কালযবন। কৃষ্ণ কালযবনের হাতে ধরা না দিয়ে বা নিজে তার সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ না করে তাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেল পাশেই এক পর্বত গুহায়। সেখানে গিয়ে কৃষ্ণ সরে পড়ল। শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের এক প্রাচীন রাজা মুচুকুন্দ, রাজা মান্ধাতার ছেলে। এক সময় দিনরাত দেবতাদের হয়ে কাজ করার পর তাঁদেরই ইচ্ছায় এই নির্জন স্থানে ঘুমোতে এসেছিলেন একটা শর্তে—হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে চোখের সামনে যাকে দেখবেন, সে-ই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কালযবন তো আর জানত না। সে ভাবল এখানে এসে বুঝি কৃষ্ণই মরার মত পড়ে আছে। তাই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মুচুকুন্দকে মারল এক লাথি। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলতেই দেখে কালযবন, পুড়ে সে ছাই হয়ে গেল। ম্লেচ্ছদের আক্রমণও শেষ হল।

এখন, এবার জরাসন্ধ।

মথুরায় ফিরে ম্লেচ্ছ সেনাদের নিধন করে তাদের যা ধনসামগ্রী ছিল, তা নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যখন ফিরে চলেছে দ্বারকায়, পথে হঠাৎ জরাসন্ধ আক্রমণ করল তাদের, তার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে।

কৃষ্ণ কিন্তু ইচ্ছে করেই এই যুদ্ধ এড়িয়ে গেল। যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেছে এমন ভাব দেখিয়ে কিছু কিছু ধনরত্ন ফেলে পালাতে লাগল সে। এই ভীরুতা দেখানো বলরামের ভাল না লাগলেও উপায় নেই। ভাইগত প্রাণ দাদা বলরামের। বাধ্য হয়ে তাঁকেও কৃষ্ণের অনুকরণ করতে হল।

পেছন দিক থেকে তীরবেগে তেড়ে আসতে আসতে অনেকে টিটকারি দিল, টিপ্পনি কাটল, কটু কাটব্য করল, কিন্তু কোন কিছুকেই আমল দিল না কৃষ্ণ। যেমন পালাচ্ছিল, তেমনি পালাতেই থাকল। দৌড়োতে দৌড়োতে খুবই হাঁফিয়ে পড়েছে রাম-কৃষ্ণ। সামনেই পড়ল প্রবর্ষণ নামে পাহাড়। বেশ উঁচু। দূর থেকে জরাসন্ধ দেখল, দু ভাই গিয়ে লুকলো ঐ পাহাড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই এসে ঘিরে ফেলল পাহাড়। তন্ন তন্ন করে খুঁজল পাহাড়ের সবদিক। আশ্চর্য! লুকালো কোথায়? আবার শুরু করল ভালভাবে খোঁজা। এবারেও না পেয়ে রাগে জরাসন্ধ পাহাড়ে ধরিয়ে দিল আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল পাহাড়। গাছপালা থেকে শুরু করে পশু পর্যন্ত যে যেখানে ছিল আগুনের বেড়াজাল ডিঙ্গোতে না পেরে পুড়ে মরল। কৃষ্ণ বলরাম এই পাহাড়েই লুকিয়েছে, নিজের চোখে দেখেছে জরাসন্ধ। সুতরাং পুড়ে তাদের অবশ্যই মরতে হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে ফিরে গেল মগধে। জানতেও পারল না যে ওরই মধ্যে এক ফাঁকে দু ভাই পাহাড় থেকে প্রায় এগারো যোজন (চুয়াল্লিশ ক্রোশ)

দূরে লাফ দিয়ে এসে ঢুকে পড়েছে সমুদ্রগর্ভে সুরক্ষিত দ্বারকায়।

তারা যে পুড়ে মরে নি, তা জানতে পারল অনেক পরে, যখন বিদর্ভ (বর্তমানে বেরার)-রাজ রাক্ষস ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীকে স্বয়ম্বর সভা থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। তারপর থেকে জরাসন্ধ কৃষ্ণ-বিদ্বেষীদের নিয়ে কত না চেষ্টা করেছিল তাকে মারতে। কিন্তু, পারে নি।

ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বসেছেন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে। কৃষ্ণকে ডেকে এনে শুরু করেছেন, তাঁরই অনুমতি নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ। প্রায় সব দেশের রাজাই ভেট পাঠাল যুধিষ্ঠিরকে। কিন্তু জরাসন্ধ তাদের বিমুখ করল।

রাজনীতিতে বলে, শত্রুর শেষ রাখতেই নেই। কৃষ্ণ দেখলেন, এবার সত্যি-সত্যিই ঘনিয়ে এসেছে জরাসন্ধের সময়। যুধিষ্ঠিরকে তাই পরামর্শ দিলেন, জরাসন্ধকে বধ করাই ভাল।

নিজে অর্জুন আর ভীমকে নিয়ে একদিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ওঁরা এসে হাজির হলেন মগধের রাজসভায় জরাসন্ধের সামনে ভিক্ষার্থী হয়ে। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের সকলেই শ্রদ্ধা করত সাধ্যমত দান করত। ব্রাহ্মণ দেখে রাজা জরাসন্ধও তাদের যথেষ্ট খাতির যত্ন করল। কিন্তু রাজার চোখ, তাকেও যেমন ফাঁকি দেওয়া যায় না, তেমনি আগুনকেও বেশিক্ষণ ছাই দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। জরাসন্ধের কাছে ধরা পড়ে গেল ওদের ছদ্মবেশ। তবু বিরক্ত না হয়ে রাজা জিজ্ঞেস করল—ভিক্ষুক হয়ে যখন এসেছে, বল, কি চাই? যা চাইবে, আমি এখন তা-ই দেব।

ধরা যখন পড়েই গেছে তখন আত্মগোপন করে আর লাভ নেই। কৃষ্ণ, নিজের সঙ্গে ভীম আর অর্জুনের পরিচয় দিয়ে বলল—আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ চাই।

বিকট হাসি হাসল জরাসন্ধ। বলল—ঠিক আছে, তাই হবে। তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ আমি করব না, তুমি ভীরু, কাপুরুষ। আমার ভয়ে সমুদ্রের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছ। অর্জুন নিতান্ত নাবালক। একমাত্র স্বাস্থ্যে আর শক্তিতে তোমাদের মধ্যে ভীমই যা একটু। লড়তে গেলে ভীমের সাথেই।

—বেশ, তাই হোক।

জরাসন্ধ নিজে ভীমের হাতে একটা লোহার গদা তুলে দিল। নিজে তুলে নিল আর একটা রণহুঙ্কার আর গদায় গদায় ঘর্ষণে উঠল আগুনের ফুলকি। শেষে দুজনেরই গদা যখন ভেঙে খান খান হয় গেল, শুরু হল হাতে হাতে যুদ্ধ। শুধু রাতটুকু বাদে চলল সেই যুদ্ধ সমানে সাতাশ দিন। জয়-পরাজয় সুদূর। এখন উপায়!

ভগবান কৃষ্ণ জানতেন, জরাসন্ধের জন্মরহস্যের জীবন-কাঠিটা কোথায়। একদিন যখন চলেছে এমনি সাপটাসাপটি, কৃষ্ণ তখন ইশারায় একটা কাঠিকে দু ভাগে ভাগ করে দেখিয়ে দিলেন।

ভীমের এক প্রচণ্ডতম আঘাতে মাটিতে কাত শুয়ে পড়ে আবার উঠতে যাবে জরাসন্ধ, সেই সুযোগে ভীম তার একটা পা নিজের পা দিয়ে চেপে ধরে, আর একটা পা হাতে নিয়ে বাঁশ চেরার মত তাকে চিরে দু ফালা করে ফেলল।

শেষ হল জরাসন্ধের জীবন। নররূপী কৃষ্ণ নিধন করলেন আর এক অসুরাধিপকে। সেই সঙ্গে রেখে গেলেন বিশ্বের এক বিস্ময়—সমুদ্রগর্ভে নগর দ্বারকা।



মুর ও নরকাসুর বধ কাহিনী

সুরক্ষিত দ্বারকায় যাদবদের নিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামের মহানন্দে দিন কেটে চলেছে। শৌর্যে-বীর্যে-ঐশ্বর্যে এই দুই যুবকের কোন তুলনাই চলে না পৃথিবীর কারো সঙ্গেই। প্রায় সকলেরই এখন স্থির বিশ্বাস, মানুষ হয়ে জন্মালেও কৃষ্ণ-বলরাম মানুষ নয়, স্বয়ং ভগবান। তা নইলে কি রূপে, কি গুণে ওঁরা এমন অতুলনীয় হতে পারেন কি করে? যাদবদের মনে এই বিশ্বাস প্রায় বদ্ধমূল। যাদবদের মেয়েরাও কৃষ্ণ ছাড়া আর যেন কাউকে স্বামী হিসেবে ভাবতেও পারে না।

এমনিভাবে চলেছে দিন। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন দেবরাজ ইন্দ্র এলেন দ্বারকায়। অনেক অভিযোগ তাঁর।

পৃথিবী-পুত্র নরকাসুর বড় বেশি মদমত্ত হয়ে উঠেছে। দেবরাজ্যের অমূল্য ছাতা চুরি করে তাঁকে অমরাদ্রি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেবমাতা অদিতিকে পর্যন্ত অপমান করে তাঁর কানের দুটি বালা কেড়ে নিয়ে গেছে। শক্তিসামর্থ্যে বলীয়ান হয়ে দেবরাজ্যে নরকাসুর রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করেছে।

শুনে কৃষ্ণের খুব রাগ হল। এ তো অন্যায়! দেবতাদের হেনস্থা, দেবমাতার অপমান—এ কি বরদাস্ত করা যায়? না, উচিত নয়।

জিজ্ঞেস করে জানলেন কৃষ্ণ, মুর নামে তার এক দুরন্ত অনুচরকে নিয়ে পাহাড়-ঘেরা প্রাগজ্যোতিষপুরে (বর্তমান গুয়াহাটি বা গৌহাটি) প্রায় দুর্ভেদ্য নগরে থেকে সে এইরকম অত্যাচার চালিয়ে চলেছে।

ইন্দ্রকে আশ্বাস দিয়ে তাঁকে দেবরাজ্যে পাঠিয়ে কৃষ্ণ বের হলেন দ্বারকা থেকে, সঙ্গে অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা।

দ্বারকা থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অনেকখানি পথ। বাহন হয়ে এল সেই বিশালকায় পক্ষীরাজ গরুড়। অস্ত্রশস্ত্রে সেজে সত্যভামাকে নিয়ে কৃষ্ণ চেপে বসলেন গরুড়ের পিঠে। বলশালী দ্রুতগামী পক্ষীরাজ। কত সময়ই বা লগাল তার নরকাসুরের সেই নগরে এসে পৌঁছতে।

এসেই দেখলেন কৃষ্ণ, সত্যিই সাধারণের জন্য বড়ই দুর্ভেদ্য করে রেখেছে নগরকে। চারদিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সব অস্ত্র-দুর্গ। তার চারদিকে আবার আগুন, জল আর বায়ু-দুর্গ।

তাতেও নিশ্চিন্ত হয় নি নরকাসুর। মুরকে দিয়ে পাশ নামে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে ঘিরে জায়গাটার কাছে যাওয়া পর্যন্ত দুঃসাধ্য করে রেখেছে।

সব দেখে কৃষ্ণ একটু মুচকি হাসলেন মাত্র। ভাবটা যেন, মরতে যদি এতই ভয়, তবে কোন্ লজ্জায় দম্ভ দেখাস, অত্যাচার করিস ?

প্রথমেই কৃষ্ণ করলেন কি, গদার এক এক ঘায়ে ভেঙ্গে ফেললেন পাহাড়ের চূড়াগুলো। মারাত্মক এক অস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন পাহাড়ের গায়ের অস্ত্র-দুর্গ। তারপর সুদর্শন চক্র ছুঁড়ে নিভিয়ে দিলেন আগুন-দুর্গ, শুকিয়ে দিলেন জল আর বায়ুর দুর্গ। তরোয়াল দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলেন মুরের রাখা পাশ।

ব্যস, এবার ঢোকার পথ পরিষ্কার। এবার কৃষ্ণ তুলে নিলেন তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ—যে শাঁখের শব্দে অতি বড় বীরের বুকও কেঁপে ওঠে। এত জোরে কৃষ্ণ সেই শাঁখে ফুঁ দিলেন যে, তার শব্দ নগর-প্রাচীর ভেদ করে চতুর্দিক থরথর করে কাঁপিয়ে তুলল।

মুর দৈত্য পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল জলে। জলেই তার বাসা। জলেই থাকত। পাঁচটা তার মাথা। দেখতে দারুণ কদাকার। যেমন বীভৎস, তেমন হিংস্র। হঠাৎ এমন বিকট আওয়াজ শুনে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে জল থেকে। উঠেই দেখে, সামনে বিরাট পাখির পিঠে এক পুরুষ আর এক নারী। দেখেই প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলে উঠল মুর। পাঁচটা মুখে এক সঙ্গে তুলল বিকট আওয়াজ। এমনভাবে হাঁ করল যেন এখনই বুঝি সব গিলে ফেলল। ত্রিশূল তুলে নিয়ে জোরে ছুঁড়ল গরুড়ের দিকে। উদ্দেশ্য, গরুড়কে মারতে পারলেই ওরা এসে যাবে তার নাগালের মধ্যে।

আগুনের ফুলকি নিয়ে সেই ত্রিশূলকে ভীমবেগে গরুড়ের দিকে ছুটে আসতে দেখে কৃষ্ণ এক বাণে তাকে তিন টুকরো করে ফেলে দিলেন নিচে। আর মুরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন কয়েকটা বাণ। মুরের পাঁচটা মুখই আঘাতে জর্জর হয়ে উঠতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পাঁচটা মুখে বিশাল পাঁচটা হাঁ করে কৃষ্ণকে গিলে ফেলার জন্য লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে দিলেন তাঁর সুদর্শন চক্রকে। অজেয় মুরের পাঁচটা মাথাই কেটে খসে পড়ল দেহ থেকে। সব দেবতাদের অজেয় মুরকে এভাবে বিনাশ করার জন্য কৃষ্ণের আর এক নামই হয়ে গেল 'মুরারি।'

বাবাকে ঐভাবে নিহত হতে দেখে তার সাত ছেলে দুর্দান্ত দৈত্য পীঠকে সেনাপতি করে মার-মার করতে করতে ছুটে এল কৃষ্ণের দিকে। খাঁড়া গদা শূল বাণ দিয়ে যেন ছেয়ে ফেলল কৃষ্ণ-সত্যভামাকে। কিন্তু অত বড় বৎসাসুর, বকাসুর-এর মত অসুর যার কাছে শুধুমাত্র হাতের জোরে মারা যায়, সেখানে অস্ত্রধারী কৃষ্ণের কাছে ঐসব অস্ত্র যেমন নগণ্য ঐ দৈত্যরাও তেমনি তুচ্ছ। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সব শেষ।

নরকাসুরের একান্ত ভরসা মুর গেল, দুরন্ত সেনাপতি দেবকুল-ত্রাস পীঠের সঙ্গে সৈন্যসামন্তও গেল দেখে নরকাসুর কি আর স্থির থাকতে পারে ?

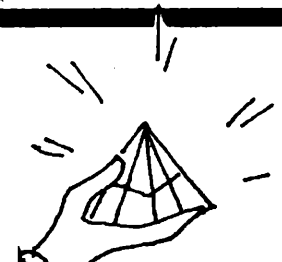
সঙ্গে সঙ্গে তার সমুদ্রজাত বিশাল হাতির পিঠে চেপে আর যে কজন সেনা ছিল, তাদের নিয়ে সরোষে সে আক্রমণ করল কৃষ্ণকে। সেই সঙ্গে তার সেনারাও করতে লাগল অস্ত্রবৃষ্টি। নির্বিকার কৃষ্ণ এতটুকু বিচলিত না হয়ে এক এক বাণে সেই শরজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে মারতে থাকলেন নরকাসুরের সেনাদল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণহীন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল তারা। বাহন গরুড়ের তাড়নায় পাহাড়-দুর্গ ছেড়ে হাতিরা পালাল নগরে।

নরকাসুর এবার একেবারে একা। শক্তি নামে মারাত্মক অস্ত্র সে ছুঁড়ল গরুড়কে লক্ষ্য করে। যার হাত থেকে কারোরই প্রাণ বাঁচে না। কিন্তু গরুড়ের তাতে কোন ক্ষতিই হল না দেখে মারাত্মক এক শূল তুলে নিল, কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বে বলে। কিন্তু ছোঁড়া আর তার হল না। তার আগেই কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র এসে নামিয়ে দিল তার মাথা।

শেষ হল নরকাসুর।

ইন্দ্রের ছাতা, অদিতির কানের বালা উদ্ধার করে নিয়ে কৃষ্ণ সব ফিরিয়ে আবার ফিরে এলেন নরকাসুরের আস্তানায়। দেখলেন অঢেল মণিরত্ন, সেই সঙ্গে অন্তঃপুরে ষোল হাজার মেয়ে হরণ করে এনে আটকে রেখেছে। তাদের বন্ধ দরজা খুলে দিতেই তারা শরণ নিল কৃষ্ণের। কৃষ্ণ ধনরত্নের সঙ্গে সেই সব মেয়েদেরও উদ্ধার করে নিয়ে এলেন দ্বারকায়।

পৃথিবীর বুক থেকে নামল আর একটা ভারী বোঝা।



স্যমন্তক মণির রহস্য-কাহিনী

প্রায় ছ হাজার বছর আগের কাহিনী।

সমুদ্রগর্ভে সুরক্ষিত দ্বারকা নগরীতে বুক ফুলিয়ে বাস করছে যাদবরা। যদিও উগ্রসেন রাজা কৃষ্ণ-বলরামকে সমীহ করে, তবুও সবাই থাকে স্বাধীন সুখে। আত্মীয়স্বজন, ছেলেপুলে নিয়ে দিন দিন এমনভাবে ফুলে ফেঁপে উঠছে তারা দ্বারকায় যে, অন্যান্য দেশের রাজারা বেশ চিন্তায় পড়তে আরম্ভ করেছে।

কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে খুব নিকট আত্মীয়তা ছিল পাণ্ডবদের। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পর হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে বসার কথা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে দুর্যোধনরা তাদের এই ন্যায্য অধিকার কোনমতেই দেবে না। সব সময়ই সে তাই শয়তানী বুদ্ধি খেলে চলেছে। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণকে আবার সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। বারণাবতে দুর্যোধন জতু (লাক্ষা) দিয়ে তৈরি করিয়েছে দারুণ এক প্রাসাদ। ইচ্ছে, কৌশলে সপরিবারে যুধিষ্ঠিরদের পাঠাবে সেখানে। তারপর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

ঠিক এরকম সময়েই দ্বারকায় শুরু হয়েছিল স্যমন্তক মণি নিয়ে রহস্য খেলা।

দ্বারকায় যদিও কৃষ্ণ-বলরাম ছিল সবার সেরা, সকলেই সমীহ করে চলত তাদের, তবুও যদুকুলের সাত্বত-বংশধর অন্ধকের নাতি প্রসেন এবং সত্রাজিৎ, বৃষ্ণি বংশের স্বফল্কের ছেলে অক্রুর, তাদেরও প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না।

সত্রাজিৎ ছিল সূর্যের উপাসক। তার বড় ইচ্ছে, সূর্য সব সময়ই তার কাছে থাকুক বন্ধুর মত। তাই প্রতিদিনই সে স্নান সেরে আঁজলা ভরে জল তুলে দিত সূর্যের উদ্দেশে, পুজো করত, স্তবস্তুতি করত।

একদিন স্নান সেরে চোখ বুজে এক মনে ঐভাবে সূর্যের স্তব করছিল সত্রাজিৎ, হঠাৎ শুনল, মিষ্টি গলায় কে যেন বলে উঠল—এই তো বন্ধু, আমি এসেছি! চেয়ে দেখ।

ধড়মড় করে চোখ খুলেই আবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলল সত্রাজিৎ। সামনে বিরাট যেন একটা আগুনের গোলা, ধকধক করে জ্বলছে, অথচ কোন উত্তাপ নেই। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে, সাধ্য কার।

সত্রাজিৎ বলল—যদি তুমি আমার বন্ধু সূর্যদেবই এসে থাক, তাহলে তোমাকে রোজ পুব আকাশে যেমন দেখি, তেমন ভাবে দেখছি না কেন? চোখ মেলে তাকাতে পারছি না কেন তোমার দিকে?

সত্রাজিতের কথা শুনে মৃদু একটু হাসলেন সূর্যদেব।

সূর্যদেব তাঁর গলায় পরেছিলেন এক মণি। সূর্যের গায়ে যত অলঙ্কার ছিল, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হল ঐ মণি—নাম স্যমন্তক। তার দীপ্তি ভয়ানক। সরাসরি চোখ মেলে সত্যিই তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। তাঁকে দেখার জন্য সত্রাজিতের আকুতি দেখে সূর্যদেব তাঁর গলা থেকে মণিটা খুলে নিয়ে বললেন—এবার দেখ তো, আমি তোমার সেই বন্ধু কিনা।

এবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে সত্রাজিতের কিছুমাত্র কষ্ট হল না। যেমনভাবে বন্ধুকে দেখেন রোজ পুব আকাশে, তেমনিভাবে তাকে সামনে দেখে মন-প্রাণ ভরে গেল তাঁর।

চলে যাবার আগে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে সূর্যদেব সত্রাজিৎকে দিয়ে গেলেন সেই মণি।

ভারি খুশি সত্রাজিৎ। বন্ধুর দেওয়া মণি গলায় পরে নগরে ঢোকা মাত্রই সারা নগরটা যেন হঠাৎ আলোয় ভরে গেল। তাড়াতাড়ি যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, স্বয়ং সূর্যদেব যেন চলেছেন তাদের নগরের পথ দিয়ে। সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, কেউ কেউ আবার প্রণামও করতে শুরু করে দিল।

হঠাৎ খবরটা গিয়ে পৌঁছল কৃষ্ণের কাছে। প্রাসাদ থেকে তাড়তাড়ি বেরিয়ে এসে ভাল করে দেখে সকলকে ডেকে বললেন—আরে, তোমরা কাকে সূর্যদেব বলে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছ? ও তো আমাদের সত্রাজিৎ!

ভুল ভাঙ্গল দ্বরকাবাসীর। সত্যিই তো! এ তো তাদের সত্রাজিৎই বটে। সেই সঙ্গে সকলেই অবাক হল ছোট্ট একটা মণির অমন তেজ দেখে।

কৃষ্ণও কিছু কম বিস্মিত হন নি। সূর্যদেবের ঐ স্যমন্তক মণি সত্রাজিতের গলায় শোভা পায় না। বন্ধু হিসেবে সূর্যদেবের কাছ থেকে যখন পেয়ে গেছে, তখন বলার কি আছে। অমূল্য ঐ মণি একমাত্র মানায় দাদু উগ্রসেনের গলায়। আর নিজের মধ্যেও যে একটু লোভ জাগে না তা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ সামলে নেন নিজেকে। সত্রাজিতের বাছ থেকে ঐ মণিটা কেড়ে নেওয়া আদৌ কোন ব্যাপার হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তা ঠিক হবে না। সবাই বলতে শুরু করবে, লোভী কৃষ্ণ। তার ওপর হবে জ্ঞাতি-বিরোধ। সকলে তাঁকে যে চোখে দেখে, সে চোখে আর দেখবে না। তাই সকলের ভুলটা শুধু ভাঙ্গিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ সরে গেলেন সেখান থেকে।

বুদ্ধিমান সত্রাজিৎ। কৃষ্ণের চোখ দেখেই সে বুঝে গিয়েছিল তার মনের কথা। ভাগ্যি, চেয়ে বসল না। তাহলে এই মণি নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে হতো না। চুপি চুপি মণিটা নিয়ে গিয়ে রেখে দিল নিজের বাড়িতে। কিন্তু, সব সময়ই রইল ভয়ে ভয়ে, এই বুঝি আসে কৃষ্ণের দূত!

স্যমন্তক এই মণিটার ছিল বিশেষ কয়েকটা গুণ। মণিটা যার কাছে থাকবে, সে যদি নিয়মনিষ্ঠা মেনে শুদ্ধাচারে থাকে, ব্রহ্মচারীর মত সংযত জীবনযাপন করে, মনে তার যদি কোন কুটিলতা না থাকে, অর্থাৎ সে যদি স্বভাব-নির্মল হয়, তবে এই মণি তাকে প্রতিদিন দেবে আট ভার (১,৪৪,০০০ তোলা) করে সোনা। শুধু তাই নয়, যেখানে থাকবে, সেখান থেকে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কোন রোগের বালাই থাকবে না। ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক মত বৃষ্টি হবে, মাঠে মাঠে প্রচুর ফসল ফলবে। কিন্তু, মণি নিয়ে শুদ্ধাচারে না থাকলে এই মণিই তার প্রাণনাশ করবে।

সূর্যদেবের কাছ থেকে মণির এই গুণাগুণ জেনেছিল সত্রাজিৎ। সর্বজ্ঞ, সুপণ্ডিত কৃষ্ণও তা জানতেন।

মণিটাকে গোপনে রেখে সত্রাজিতের কাটল দিনকয়েক। যতই নিজেকে সংযমের মধ্যে রাখুক, সব সময়ই ভয় ভয়। শান্তি পায় না কিছুতেই। এই বুঝি কৃষ্ণ এসে চেয়ে বসল! শেষ পর্যন্ত এই অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে মণিটা রেখে দিল তার ভাই প্রসেনের কাছে।

এমনিতে প্রসেন ছিল খুবই ভাল। তবে দারুণ ডাকাবুকো। কারো কাছে সহজে সে মাথা নোয়াতে জানত না, এমন কি কৃষ্ণের কাছেও না! নিজের কাছে না থাক, তবু তো নিজেদের মধ্যেই রইল, এই ভেবে এতদিনে একটু শান্তি পেল সত্রাজিৎ।

প্রসেনের নেশার মধ্যে ছিল দারুণ শিকারের নেশা। দুর্ধর্ষ শিকারী হিসেবে দ্বারকায় তার খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট।

একদিন মণিটা গলায় পরে, ঘোড়ায় চেপে দুম করে বেরিয়ে পড়ল শিকারে। পার্বত্য বন। কত না হিংস্র জন্তুর আবাস। তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, অব্যর্থ তার লক্ষ্য—সুতরাং প্রসেনের কাছে ওটাই আনন্দ। হঠাৎ তার চোখ এড়িয়ে কোথা থেকে এক সিংহ লাফিয়ে পড়ল প্রসেনের ঘাড়ে। টাল সামলাতে না পেরে প্রসেন উলটে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণও গেল। আশ্চর্য, সিংহ কিন্তু প্রসেনকে ছেড়ে দিয়ে গলার ঐ মণিটা টেনে নিয়ে চলে গেল। নিশ্চিন্তে সিংহ চলেছে আপন ডেরায়, হঠাৎ ভল্লুকরাজ জাম্ববান কোথা থেকে এসে সিংহকে মেরে নিয়ে গেল মণিটা। দিলে তার ছেলে সুকুমারকে গুলি খেলার জন্যে।

এদিকে দ্বারকাপুরীতে কেটে গেল দিনের পর দিন। অন্ধক বংশের সঙ্গে তাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতিদিনের উৎকণ্ঠা—এই বুঝি ফিরে এল প্রসেন। কিন্তু প্রতিদিনই আশা যায় বিফলে। ধুরন্ধর

শিকারী প্রসেনের তো কোথাও কোন বিপদ ঘটার কথা নয়; তবে? গুঞ্জন ওঠে অন্ধক-বংশধরদের মুখে—মণির লোভে লোভী কৃষ্ণ নিশ্চয়ই গোপনে প্রসেনকে অনুসরণ করে তাকে কোথাও হত্যা করেছেন। দেখতে দেখতে সেই গুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল দ্বারকায়।

কৃষ্ণের কানে এল সেই গুঞ্জন। শুনে অবাক হলেন। এ আবার কি কথা? তিনি কি এতই হীন আর দুর্বল যে ঐ একটা সামান্য মণির জন্য গোপনে গোপনে জ্ঞাতি-ভাইকে হত্যা করতে হবে?

রাজবাড়িতে ডাক পড়ল সকলের। কৃষ্ণের ডাক। যদুকুলের যে যেখানে ছিল, সবাই এল। এল অন্ধক-বংশীয়েরাও। সকলে এলে কৃষ্ণ বললেন—শিকার করতে গিয়ে প্রসেন যে কেন ফিরল না, তা সত্যিই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। চল, আমরা সবাই মিলে তার খোঁজে যাই।

কৃষ্ণের আদেশ। পেছনে কোন দুরভিসন্ধি থাকলেও মুখে কিছু বলা যাবে না। বাধ্য হয়েই মুখ বুজে সবাই বেরিয়ে পড়ল দ্বারকা থেকে।

প্রসেন যে ঘোড়ায় চেপে শিকারে গিয়েছিল, সেই ঘোড়ার পায়ের দাগের ওপর নজর রাখতে রাখতে ওরা সবাই এল সেই পার্বত্য অরণ্যে। তারপর কিছুটা এগোতেই দেখল, প্রসেনের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে চিৎ হয়ে। দেখে প্রায় সকলেই তখন হায়-হায় করে ঝুঁকে পড়ল প্রসেনের ওপর। দাদা বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণ মৃতদেহ ছেড়ে আর একটু এগোতেই দেখলেন, পড়ে রয়েছে একটা মরা সিংহ।

একটু চিন্তায় পড়লেন কৃষ্ণ। ওখানে মৃত প্রসেন, এখানে মরা সিংহ। পায়ের ছাপ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে সিংহ-ই মেরেছে প্রসেনকে। কিন্তু রক্ত-মাংসে লোভী সিংহ প্রসেনকে না নিয়ে এতটা তফাতে চলেই-বা এল কেন? আর মরলই-বা কি করে? প্রসেনের কাছে আর একবার ফিরে এলেন। শুনেছিলেন, গলায় সেই মণিটা পরেই সে এসেছিল শিকারে। দেখলেন, মণিটা নেই। কৃষ্ণের মাথায় আরও চিন্তা দানা বাঁধল। তবে কি শিকার ফেলে মণিটাই নিয়ে যাচ্ছিল সিংহ? মরা সিংহের আশপাশ ভাল করে দেখতে গিয়েই কৃষ্ণের চোখে পড়ল কয়েকটা বড় বড় পায়ের ছাপ। ইতিমধ্যে প্রায় অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে কৃষ্ণের পাশে।

এবার ঐ বড় চওড়া পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে সদলবলে এগিয়ে চললেন কৃষ্ণ। বদ্ধমূল ধারণা এখন তাঁর, এই পায়ের ছাপ যার, সিংহ মরেছে তারই হাতে। আর মণিটা নিশ্চয় তার কাছেই আছে।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে খানিকটা এসেই ওঁরা থমকে দাঁড়ালেন এক গুহামুখের সামনে। পায়ের ছাপ চলে গেছে গুহার ভেতরে। ঠিক হল, এখানেই অপেক্ষা করে একটু দেখা যাক, ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ ওঠে কিনা।

একটুখানি দাঁড়াতেই ওরা শুনতে পেল—গুহার ভেতর একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, আর এক বুড়ি তাকে এই বলে ভোলাচ্ছে—কাঁদছিস কেন? তোর বাবা অত বড় একটা সিংহকে মেরে তোর খেলার জন্য কেমন মণির বল এনে দিয়েছে। দেখ না, চেয়ে দেখ, কেমন সুন্দর! কেমন আলো-করা বল!

সংশয় দূর হয়ে গেল কৃষ্ণের। প্রসেনকে মেরে সিংহ মণি নিয়ে পালাচ্ছিল। আবার ভল্লুকরাজ জাম্ববান সিংহকে মেরে সেটা নিয়ে খেলার জন্য এনে দিয়েছে তার ছেলেকে। তাহলে গুহার মধ্যে এখনও মণিও আছে, আর জাম্ববানও আছে। সুতরাং আর কালবিলম্ব নয়।

সরোষে কৃষ্ণ এবার এক দারুণ হুঙ্কার ছাড়লেন গুহামুখে। তারপর দাদা বলরাম আর কিছু যাদব অনুরাগীকে গুহামুখে রেখে একাই সবেগে ঢুকে গেলেন গুহার ভেতর। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল জাম্ববান। হঠাৎ গুহার ভেতরে অমন একটা হুঙ্কার শুনে ধড়মড় করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়েই সামনে কৃষ্ণকে দেখে রাগে ফুলে উঠল। সেই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কৃষ্ণের ওপর। কৃষ্ণও সাপটে ধরলেন জাম্ববানকে। শুরু হয়ে গেল দুই বীরের মল্লযুদ্ধ।



গুহামুখে বলরাম থেকে শুরু করে যাঁরা ছিলেন কৃষ্ণের অপেক্ষায়, তাঁদের কেটে গেল গোটা দিন, গোটা রাত। তার পরের দিন গেল, রাতও গেল। কিন্তু গুহার ভেতর থেকে কৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন না দেখে হতাশ হয়ে সবাই ফিরে গেলেন দ্বারকায়। গিয়ে, তাঁরা রটিয়ে দিলেন জাম্ববানের কাছ থেকে মণি উদ্ধার করতে গিয়ে কৃষ্ণকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সারা দ্বারকা হায় হায় করে উঠল, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের ওপর মিথ্যা সন্দেহ করার জন্য সকলের সে কি অনুশোচনা।

এদিকে একা কৃষ্ণ দুরন্ত বলশালী ভল্লুকরাজ জাম্ববানের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে চলেছেন। দেখতে দেখতে অবিরাম প্রহারের ঘাত-প্রতিঘাতে কেটে গেল একুশটা দিন। প্রহারে জর্জর জাম্ববান ক্রমশ এমন হীনবল হয়ে পড়ল যে আর কোন আঘাত সহ্য করতে না পেরে স্বীকার করে নিল পরাজয়। কৃষ্ণ কিন্তু তাকে হত্যা করলেন না, ক্ষমা করলেন। প্রাণ পেয়ে কৃতজ্ঞ জাম্ববান কৃষ্ণকে সেই মণিটা তো ফিরিয়ে দিলই, সেই সঙ্গে বীর কৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্কও পাতিয়ে ফেলল, নিজের মেয়ে জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দিয়ে।

গুহা থেকে বেরিয়ে কাউকে কোথাও দেখতে না পেয়ে জাম্ববতী আর মণি নিয়ে কৃষ্ণ ফিরতেই দ্বারকায় আবার আনন্দের যেন হাট বসে গেল। কৃষ্ণ মণিটি নিয়ে সোজা সত্রাজিতের কাছে গিয়ে তারই হাতে তুলে দিলেন সেটি। কেননা, সূর্যদেব তো তাকেই তা

দিয়েছিল। কৃষ্ণের ওপর মিথ্যা সন্দেহে লজ্জায় যেন মরে গেল সত্রাজিৎ। মনে মনে ঠিক করল, মানসিক এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার একটাই পথ। শেষে তাই করল সে। নিজের মেয়ে সত্যভামা সব দিক থেকে সুলক্ষণা। তাকে তুলে দিল কৃষ্ণের হাতে। এবার সত্রাজিৎ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মহা সঙ্কট উপস্থিত হল এইবার।

সত্যভামাকে আগে থেকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল বৃষ্ণি বংশের অক্রূর, আবার অন্ধক বংশের হৃদিকের দুই ছেলে কৃতবর্মা আর শতধন্বা। কাউকেই সত্রাজিতের মনে ধরে নি। এখন এই সব ঘটনার পর কৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিয়ে দেওয়ার ফলে সকলেই গেল দারুণ খেপে। কি, এত বড় অপমান! এবার সবাই মিলে শুরু করল সত্রাজিতের শত্রুতা। পেছন থেকে শতধন্বাকে দিল দারুণ উত্তেজিত করে। কিন্তু কাছাকাছি কৃষ্ণ থাকায় কোন কিছু করার ঠিক সুযোগ পাচ্ছিল না।

কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ সুযোগ এসে গেল হাতের মুঠোয়।

হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুধিষ্ঠিরদের সবংশে পুড়িয়ে মারার জন্য দুর্যোধন বারণাবতে তৈরি করেছে এক জতুগৃহ। ভাই-এর প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে কোন অমঙ্গল-আশঙ্কা না করেই ভীম অর্জুন নকুল সহদেবের সঙ্গে স্ত্রী দ্রৌপদী আর কুন্তীকে নিয়ে সরলপ্রাণ যুধিষ্ঠির গেছেন সেখানে। দ্বারকায় কৃষ্ণের কাছে এ সংবাদ আসতেই মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সত্যভামাকে বাপের কাছে রেখে ছুটে গেছেন বারণাবতে ভায়েদের উদ্ধার করতে।

কৃষ্ণ দ্বারকায় নেই। চমৎকার সুযোগ।

প্রাসাদে নিজের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সত্রাজিৎ। হঠাৎ শতধন্বা ঢুকে তাকে খুন করে বসল, চুরি করল মণিটা। তারপর প্রাসাদ থেকে গোপনে পালাতে গিয়ে ধরা না পড়লেও চিহ্নিত হয়ে গেল। হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। শত্রু শেষ, মণি তার হাতে। আর তার সহায় কৃতবর্মা, অক্রূর—আরো বেশ কিছু যাদব। বেপরোয়া যেন শতধন্বা।

রাগে-দুঃখে বুঝি-বা উন্মাদ হয়ে যাবে সত্যভামা। রথ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল বারণাবতে। হঠাৎ সত্যভামাকে ঐ অবস্থায় আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। তারপর সব যখন শুনলেন, তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। সত্রাজিতকে খুন করে মণি নিয়ে যাবে শতধন্বা, তিনি থাকতে?

বারণাবত থেকে কৃষ্ণ আসছেন। বোঝাপড়া এবার একটা নির্ঘাত। তবে ভয় পায় না শতধন্বা। গেল অক্রূর, কৃতবর্মা আর সেই সব যাদবদের কাছে, যারা সব সময়ই তাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে।

দ্বারকায় ফিরেই কৃষ্ণ ডাকলেন বলরামকে। বললেন—দাদা, স্যমন্তক মণির ব্যাপারটা কিছু জানো নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, সে তো সূর্যদেব সত্রাজিৎকে দিয়েছিল। সত্রাজিৎ দিয়েছিল প্রসেনকে। প্রসেন মারা যাবার পর তুমি তো সেটা জাম্ববানের কাছ থেকে উদ্ধার করে আবার যার জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দিয়েছ। যার জন্য সত্রাজিৎ সত্যভামাকে দিয়েছে তোমায়।

—তুমি কি জানো দাদা, শতধন্বা সত্রাজিৎকে খুন করে সেই মণি হস্তগত করেছে?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওটা কি শতধন্বার পাওয়া উচিত, না আমাদের?

একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন বলরাম—কখনোই না। ওটা আমাদেরই পাওয়া উচিত। যেহেতু সত্রাজিতের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা।

—তাহলে আর দেরি নয়। এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হয়। শয়তানটাকে উপযুক্ত সাজা দিয়ে মণি উদ্ধার করে আনতে হয়—বললেন কৃষ্ণ।

—নিশ্চয়ই। সে কথা আর বলতে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল কৃষ্ণের সারথির।

এদিকে তখন যারা আশ্বাস দিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ হল শতধন্বা। শেষে এল অক্রূরের কাছে।

কাতরভাবে বলল শতধন্বা—বুঝতে পারছি কৃষ্ণের হাতে আমার আর রেহাই নেই। তবু চেষ্টা করব কোন রকমে পালাতে। যদি অন্য কিছু হয়ে যায়, বলা তো যায় না। আমার অনুরোধ, ভাই, মণিটা তুমি তোমার কাছে রেখে দাও। কৃষ্ণের হাতে পড়ুক, আমি তা চাই না।

একটু ভেবে অক্রূর বলল—রাখতে পারি একটা শর্তে। যদি কৃষ্ণের হাতে মারাও যাও, মরার মুখেও কিন্তু বলতে পারবে না মণিটা কোথায় আছে।

—কথা দিলাম। বলে শতধন্বা মণিটা অক্রূরকে দিয়ে উঠে বসল নিজের ঘোটকীর পিঠে।

অসম্ভব দ্রুতগামী ছিল শতধন্বার সেই ঘোটকী।

কৃষ্ণ যখন তার সন্ধান পেলেন, তখন সে প্রায় একশ যোজন (চার ক্রোশ) পথ পেরিয়ে চলে এসেছে।

তীরবেগে কৃষ্ণ-বলরামের রথও ছুটে এল পিছু পিছু।

শতধন্বা ইতিমধ্যে চলে এসেছে মিথিলায় (এখন যেখানটা উত্তর বিহারের তিরহুত বিভাগ)। সামনেই বন, ঘন বন। ভেতরে একবার ঢুকে পড়তে পারলে আর তাকে পায় কে? ঠিক এই সময়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোটকী। মারাও গেল।

বাহন গেল। শতধন্বা এবার প্রাণপণে দৌড়োতে শুরু করল বনের দিকে।

খুবই কাছাকাছি এসে গেছে রথ। হঠাৎ রথ থামিয়ে দিলেন কৃষ্ণ। বললেন—দাদা, রথ নিয়ে যেতে গেলে মরা ঘোড়া ডিঙ্গাতে হবে, সেটা ঠিক হবে না। তুমি বরং এখানে রথে অপেক্ষা কর। আমি মণি নিয়ে এসে তোমায় দিচ্ছি।

—বেশ। বেশি দেরি কোরো না—বলে রথেই বসে রইলেন বলরাম।

ইতিমধ্যে দৌড়ে প্রায় দু-ক্রোশ পথ পেরিয়ে গেছে শতধন্বা। পাছে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, তাই কৃষ্ণ আর অপেক্ষা না করে ছুঁড়লেন চক্র। আর চক্র গিয়ে শতধন্বার দেহ থেকে মাথাটা নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল কৃষ্ণের হাতে।

এবার কৃষ্ণ গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন শতধন্বার সর্বাঙ্গ। কিন্তু মণি পেলেন না। কপালে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। তাই তো, মণি কোথায় গেল? আসলে মণির লোভেই কৃষ্ণ মারলেন শতধন্বাকে, অথচ সেটাই পেলেন না। বিষণ্ণ মুখে নিজের রথে ফিরে এলেন কৃষ্ণ।

উদগ্রীব হয়েই ছিলেন বলরাম।

—স্যমন্তক কই? এনেছ? দাও—হাত বাড়ালেন বলরাম।

—না দাদা। স্যমন্তক ওর কাছে নেই।

—মিথ্যে কথা। আমার কাছে লুকিয়ে যাচ্ছ? গর্জে উঠলেন বলরাম।

—বিশ্বাস কর। আমি তোমায় মিথ্যা বলছি না। বলে আমার লাভ?

—লাভ? থাম...থাম...। তুই যে কত বড় লোভী তা কি আমায় নতুন করে জানতে হবে? রাগে তিরস্কারে ফেটে পড়েন বলরাম।

—কি বলছ দাদা। এত বড় অপবাদ তুমি আমাকে দিতে পারছ? বাক্যবাণে যেন জর্জর কৃষ্ণ।

—ঠিকই বলছি। তোকে আমায় আর নতুন করে চিনতে হবে না। ঐ মণি তুই-ই ভোগ কর। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকল না। তুই তোর রথ নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যা। ওখানে আমি ঢুকব না।

—দাদা! আর্তনাদ করে ওঠেন কৃষ্ণ। আমাকে ভুল বুঝো না দাদা। দোহাই তোমার।

কিন্তু বড়ই একরোখা বলরাম। ভায়ের কোন আবেদনে কান না দিয়ে সোজা চলে গেলেন বিদেহ (মিথিলা) রাজ জনকের কাছে।

একদিকে মণি না পাওয়ার হতাশা, আর একদিকে ঐ মণিকে উপলক্ষ করে এই মর্মান্তিক ভ্রাতৃবিচ্ছেদ। মুহ্যমান কৃষ্ণ একাই ফিরে এলেন দ্বারকায়।

কিন্তু কোথায় গেল মণি? কোথায় যেতে পারে? কৃষ্ণের সজাগ দৃষ্টি সর্বত্র। দ্বারকাতেই যে মণি আছে এবং শুদ্ধাচারী কোন যাদবের কাছেই আছে, সে বিষয়ে কৃষ্ণ নিশ্চিত। কেননা দ্বারকার আকাশে নিয়মিত বৃষ্টি, মাঠে মাঠে ফসল, সর্বত্র শান্তি। কিন্তু তা আছে কার কাছে?

এদিকে প্রতিদিন আট ভার করে সোনা দিয়ে চলেছে সেই মণি অক্রূরকে। কি করবে সে এত সোনা নিয়ে? অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করল এই সোনা দিয়ে সে দান-যজ্ঞ করবে। যজ্ঞ করলে কৃষ্ণ যদি জানতেও পারে, তাহলেও তার কাছ থেকে কেড়ে সে নিতে পারবে না।

অক্রূর তাই শুরু করল যজ্ঞ। দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল অক্রূরের যজ্ঞের সুখ্যাতি। দেখে সজাগ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ। এমনভাবে যজ্ঞ করে যাওয়ার সামর্থ্য তো অক্রূরের কোন দিনই ছিল না। তবে কি মণি ওরই কাছে আছে? নিঃসংশয় হওয়া যায় কিভাবে?

ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক বীভৎস ঘটনা।

অক্রূর-পক্ষের ভোজ সেনারা সামান্য একটা কারণে জ্ঞাতি সাত্বতের নাতির ছেলে শত্রুঘ্নকে খুন করে বসল। জ্বলে উঠল আগুন। শত্রুঘ্নর পরিজনদের হাতে পাছে প্রাণ যায়, এই ভয়ে গোপনে অক্রূর মণি সমেত পালাল দ্বারকা থেকে।

অক্রূর চলে গেছে। পরিবেশও আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এর ভেতর অক্রূরের কতখানি হাত ছিল, তা কেউ তলিয়ে দেখল না। অক্রূরকেই সবাই দোষের ভাগী করল। যাই হোক, সে যখন এখানে আর নেই, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবারও আর দরকার নেই।

উগ্রসেন, বভ্রু প্রভৃতি প্রধান যাদবরা প্রায় এক বছর কেটে যাবার পর, আর থাকতে না পেরে সদলবলে মিথিলায় গিয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল বলরামকে দ্বারকায়। দুই ভাই-এ আবার মিলন হল বটে, কিন্তু বলরাম কিছুতেই আর আগের মত স্বাভাবিক হতে পারলেন না। কৃষ্ণের ওপর তাঁর একটা বিরূপ ভাব থেকেই গেল।

হঠাৎ এক সময় দ্বারকার আকাশে শকুনের ডানার মত নেমে এল দুর্ভিক্ষ। খরতাপে জ্বলতে লাগল আকাশ। কোথাও ছিটেফোঁটা মেঘ নেই, নেই বৃষ্টি। মুহূর্তে যেন সব কোথায় উধাও হয়ে গেল। কেন এমন হল? এমন আকাল তো দ্বারকায় নামার কথা নয়। স্বয়ং কৃষ্ণের মনেও একই প্রশ্ন।

চিন্তিত দ্বারকা। চিন্তিত যাদবকুল। আর কিছুদিন এই রকম চলতে থাকলে ছারখার হয়ে যাবে দ্বারকা।

যাদবদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হলেন অন্ধক। অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। অনেক কিছুই দেখেছেন। তিনি একদিন ডাকলেন সকলকে। বললেন—দেখ, আমার ধারণা, অক্রূর দ্বারকা ছেড়ে চলে যাওয়াতেই আমাদের এই দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে।

—কেন? কেন? সকলের মুখে এক প্রশ্ন। চুপ করে বসে শুধু কৃষ্ণ আর বলরাম।

—দেখ, তোমরা হয়ত ঠিক জান না, আমি জানি। অক্রূরের বাবা শ্বফল্ক ছিল একজন মহাপুরুষ। যেখানে সে থাকত, সে দেশ কখনো অনাবৃষ্টির মুখ দেখত না। একবার কাশীরাজ্যে দেখা দিয়েছিল অনাবৃষ্টি আর মড়ক। কাশীরাজ সাদরে শ্বফল্ককে নিজের রাজ্যে নিয়ে যেতেই রাজ্যের সব আপদ কেটে গিয়েছিল। আর অক্রূরের মা কাশীরাজের মেয়ে গান্দিনী—সেও অসামান্যা। অমন দানশীলা বড় একটা দেখা যায় না। অক্রূর তাদেরই ছেলে। তোমরা বাধ্য করলে তাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে। আমার বিশ্বাস, তাকে যদি তোমরা ফিরিয়ে আনতে পার, তাহলে আমাদের এই দুর্দিন কেটে যাবে।

মন দিয়ে অন্ধকের কথাগুলো শুনল সকলে। ভাবল, হলেও হতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের ভাবনা অন্য জায়গায়। অক্রূরের ক্ষমতা কতখানি, তা তাঁর অজানা নেই, তবে এই সুযোগে একবার যাচাই করা হয়ে যাবে। কিন্তু মুখে সে কথা প্রকাশ না করে বললেন—অক্রূর এলে যদি দুর্দিন কাটে, তাহলে তার আসায় ক্ষতি কি? নিয়ে আসা হোক। তার কোন ভয় নেই।

কিন্তু কারা আনতে যাবে? বেছে বেছে কিছু যাদবকে পাঠালেন কৃষ্ণ, যাদের কথা অন্তত অক্রূর ঠেলতে পারবে না। হলও তাই। অক্রূর ফিরে এল দ্বারকায়। আকাশে জমল মেঘ, নামল বৃষ্টি—যেন অক্রূর সঙ্গে করেই সব নিয়ে এল। কিছুদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল দ্বারকা। অক্রূরের খাতিরও গেল বেড়ে।

ব্যস, নিশ্চিত কৃষ্ণ। আর কোন চিন্তাই রইল না তাঁর। প্রকৃতির এই যে পরিবর্তন ঘটল, এর পেছনে যে স্যমন্তক মণির প্রভাব, তা আর কেউ না বুঝুক, কৃষ্ণ কিন্তু ঠিক বুঝে নিলেন। এবার সবই পরিষ্কার হয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে। অক্রূর কোথা থেকে দানযজ্ঞ করত, তাও আর বুঝতে বাকি থাকল না তাঁর।

এখন কিভাবে এই রহস্যের ওপর যবনিকা টানা যায়?

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা কৌশল উদ্ভাবন করলেন কৃষ্ণ।

যাদবদের মধ্যে যারা একটু প্রধান, তাদের সকলকেই একদিন

কৃষ্ণ ডাকলেন তাঁর প্রাসাদে এক ভোজসভায়। সবাই এসেছে। উগ্রসেন, বলরামও আছেন। সত্যভামার সঙ্গে আর সব পত্নীদের নিয়ে কৃষ্ণ নিজে সকলকে আপ্যায়ন করে চলেছেন। ভূরিভোজ ভালই হল। তারপর শুরু হল খোশগল্প। গল্পে-গল্পে, হাসি-ঠাট্টায় মজে গেছে সবাই—এমনকি বলরাম, উগ্রসেনের সঙ্গে অক্রূরও। মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটছিলেন কৃষ্ণও।

হঠাৎ এক ফাঁকে অক্রূরের দিকে তাকিয়ে দুম করে বলে বসলেন কৃষ্ণ—দেখ অক্রূর, আমি জানি শতধন্বা মারা যাবার আগে স্যমন্তক মণি তোমার কাছে রেখে গিয়েছিল। তুমিও এতদিন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই রেখে দিয়েছ। এতে আমিও খুশি। আর কিছু না হোক, গোটা দেশটা এর সুফল ভোগ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে কি দুঃখের জান অক্রূর, আমার দাদা কোন মতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে মণিটা আমার কাছে নেই। ওর বিশ্বাস, শতধন্বাকে মেরে আমিই ঐ মণিটা ওঁকে না দিয়ে আত্মসাৎ করেছি। তুমি ভাই, ইচ্ছে করলে আমার এই অপবাদ ঘোচাতে পার, আর দাদারও ভুল ধারণা ভেঙে দিতে পার। জানি, মণিটা তোমার সঙ্গেই আছে। যদি একটু বের করে ওদের দেখাও, আমি একটু শান্তি পাই।

অক্রূর জানত, সুচতুর কৃষ্ণের ফাঁদে একদিন তাকে পড়তেই হবে। কিন্তু তা যে এমন এক পরিবেশে ঘটবে, তা কল্পনাও করতে পারে নি। নিরুপায় এখন অক্রূর—বাধ্য হল, জামার ভেতর লুকিয়ে রাখা সোনার কৌটোটা বের করে তার ঢাকনা খুলতে। সঙ্গে সঙ্গে একশ সূর্যের আলো যেন ঝলমল করে উঠল সেখানে। সকলেই স্তম্ভিত, হতবাক। মিটিমিটি হাসছেন তখন কৃষ্ণ।

অক্রূর আর থাকতে না পেরে বলে উঠল—কৃষ্ণ, যেদিন থেকে শতধন্বা এটিকে রেখে গেছে আমার কাছে, সেদিন থেকে আমার মনে একটুও শান্তি নেই। প্রতিটা মুহূর্ত আমার কেটেছে ভয়ে আর অশান্তিতে। এ মণি রাখার মত সামর্থ্য আমার নেই। তুমি ভাই, দয়া করে এটি নিয়ে আমায় শান্তি দাও। আমি জানি, এ মণি তোমারই যোগ্য।

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করে উঠলেন বলরাম—তা কেন হবে? ওতে কৃষ্ণের সঙ্গে আমার সমান অধিকার। সবটা তো ও একা পেতে পারে না।

—না। ন্যায্যত ওটা আমারই প্রাপ্য। ওটা আমার পিতৃধন। সকলকে উড়িয়ে দিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে সত্যভামা।

চুপ করে সব দেখলেন কৃষ্ণ। তারপর বললেন বলরাম আর সত্যভামাকে উদ্দেশ করে—না। ঐ দিব্য রত্ন রাখার মত সামর্থ্য আমাদের কারোরই নেই। রাখলে, সর্বনাশ ছাড়া লাভ হবে না।

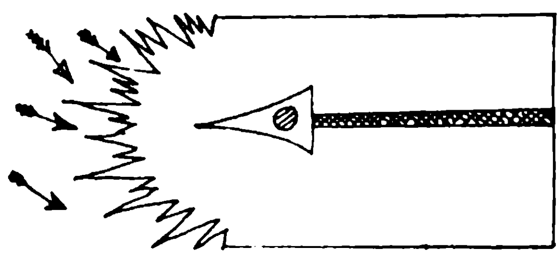
—কেন?...কেন? ঝকঝক করে ওঠে প্রশ্ন।

—এখানে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে আমি, বলরাম আর সত্যভামা ছাড়া ঐ রত্নে কারোর অধিকার নেই। কিন্তু ঐ দিব্য রত্ন কাছে রাখতে গেলে যে নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে চলার দরকার, যে গুণ থাকা দরকার, তা কি আমরা মেনে চলি, না আছে? দাদা, তুমি কি তোমার ঐ মদিরায় আসক্তি আর ক্রোধ ত্যাগ করতে পারবে? পারবে না। ওটা তোমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ওটা সত্যভামার পিতৃধন ঠিক। কিন্তু সত্যভামা কি তার বাবা সত্রাজিতের মত সংযত? আর আমি? আমি তো ঘোরতর সংসারী। ব্রহ্মচর্যের লেশমাত্র আমার নেই। সুতরাং ঐ রত্ন আমার কাছেও সর্বনেশে। একমাত্র আমাদের সকলের মধ্যে অক্রূর হল সত্যিকারের সংযত, ব্রহ্মচারী—মেনে চলে সব নিয়ম-নিষ্ঠা।

শুনতে শুনতে হতবাক হয়ে যায় অক্রূর। কৃষ্ণ যে কে, তা তো জানতে বাকি নেই তার। কিন্তু তার মুখে এ কি কথা?

—অক্রূর। সকলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন কৃষ্ণ—ভাই, এ রত্ন ধারণ করার যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে। আমার অনুরোধ, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ওটি নির্ভয়ে তোমার গলায় হার করে রেখে দাও।

স্যমন্তক মণির ওপর রহস্যের যবনিকাও পড়ল, আর অক্রূরেরও দু-চোখ ছলছল করে উঠল।



বাণের দম্ভনাশ

বিষ্ণুভক্ত দানব-রাজবলির ছিল একশ ছেলে। তাদের মধ্যে বাণ হল সবার বড়। তার রাজত্ব ছিল পাহাড়-ঘেরা শোণিতপুরে (বর্তমান আসামের তেজপুর)।

যেমন সুরম্য ছিল বাণরাজার প্রাসাদ, তেমনি ছিল সুরক্ষিত। আর সে রাজত্বও করত দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গে।

বাবা বলি বিষ্ণুভক্ত হলে কি হবে, বাণ ছিল দারুণ শিবভক্ত। শিবের পুজো না করে সে জল খেত না। শিবই ছিল তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। বিশ্ব-সংসারে শিব-ছাড়া আর কাউকে সে জানত না।

এমন যার ভক্তি-শ্রদ্ধা, তাকে কি অবহেলা করা যায়?

শিব-ও আর থাকতে না পেরে একদিন বাণ রাজাকে দেখা দিয়ে বললেন—দেখ, তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমি খুব খুশি হয়েছি। কি চাই বল?

বাণ অনেক ভেবে-চিন্তে বলল—আমার কিন্তু দুটো জিনিস চাই।

—বল, কি কি? আমি নিশ্চয়ই দেব। আশ্বাস দিলেন শিব।

চতুর বাণ। বলল—দেখ, মাত্র এই দুটো হাতে আমি খুশি নই। আমার হাজারটা হাত চাই।

—বেশ, তাই হবে।

বলতে বলতেই বাণের দু-দিকে গজিয়ে উঠল হাজারটা হাত। সেই সঙ্গে দেখতেও সে হয়ে উঠল ভীষণ। দেখে খুব খুশি বাণ।

—আর কি চাই বল? বললেন শিব।

—আমার ইচ্ছে, আপনি নিজে আমার রক্ষী হয়ে থাকুন।

মৃদু হেসে শিব বললেন—বেশ, তাই হবে।

একদিকে হাজার হাত, আর একদিকে স্বয়ং শিব তার রক্ষী—বাণরাজাকে এবার দেখে কে?

দিন দিন প্রতাপ তার বেড়েই চলল। তবুও কিছুতেই মন ভরে না বাণের। হাজারটা হাত নিয়ে এতদিন হয়ে গেল এমন কিছু সে করতে পারল না যাতে সব কটা হাতের সুখ অন্তত একটু মেটে।

একদিন ধরল শিবকে। বলল—ঠাকুর, হাজারটা হাত তো দিলে, কিন্তু এখনও এমন কারো সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ এল না, যাতে হাত কটা কাজে লাগাতে পারি।

শুনে শিব একটু রেগে গিয়ে বললেন—একটু অপেক্ষা কর। যেদিন তোমার রথের ঐ ময়ূর মার্কা ধ্বজা ভেঙে পড়বে, সেদিন তোমার এই ক্ষোভ মিটবে।

অন্য কোন কিছু না ভেবে বাণ মহা আনন্দে দিন গুণতে লাগল কবে ঐ ধ্বজা ভেঙে পড়বে।

সত্যি সত্যিই একদিন ধ্বজা ভেঙে পড়ল। যুদ্ধের উন্মাদনায় মহা আনন্দে লাফিয়ে উঠল বাণ রাজা। এতদিন পরে তাহলে তার হাজার হাতের খেলা প্রাণ ভরে দেখাবার সুযোগ এল। কিন্তু কোথায়, কাকে দেখাবে এই নিয়ে তুমুল সোরগোল, আর তম্বিতম্বি তুলেছে রাজসভায়, এমন সময় প্রাসাদের ভেতর থেকে যে খবর এল, শুনে আগুনের মত জ্বলে উঠল তার বিকট মুখ। থরথর করে কেঁপে উঠল রাগে।

বাণের মেয়ে উষা, নিজের ইচ্ছায়, গোপনে বিয়ে করেছিল অনিরুদ্ধকে। এই বিয়েতে সাহায্য করে ছিল উষারই সবচেয়ে কাছের সখী চিত্রলেখা। একমাত্র এই এই সখী ছাড়া ওদের এই মেলামেশার ব্যাপারটা আর কেউ জানত না। সুরক্ষিত বাণরাজার প্রাসাদে যেমন চোখ এড়িয়ে কারোর ঢোকার ক্ষমতা ছিল না, তেমনি বের হবারও উপায় ছিল না। ওদের মধ্যে চিত্রলেখাই এমন এক যাদুবিদ্যে জানত যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে নিজেও যেমন বেরিয়ে যেতে পারত, তেমনি যাকে ইচ্ছা তাকেই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে প্রাসাদে ঢোকাতে পারত।

অনিরুদ্ধ ছিল প্রদ্যুম্নের ছেলে, কৃষ্ণের নাতি। কেমন করে যেন উষার তাকেই ভাল লেগে গিয়েছিল। তার জেদ, তাকে ছাড়া কাউকে সে বিয়েই করবে না। আবার এ-ও জানত, বাবা বাণরাজ জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। কৃষ্ণ-বলরাম আর দ্বারকার ওপর বাবার যা রাগ! চিত্রলেখা তাই তার যাদুবিদ্যের জোরে দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে তুলে আনত গোপনে। আর তেমনি ভাবেই ঢুকিয়ে দিত প্রাসাদে।

যেদিন ভাঙল বাণের ধ্বজা, যুদ্ধের আনন্দে লাফিয়ে উঠল বাণ, সেদিন ঠিক সেই সময়েই অনিরুদ্ধ ছিল উষার ঘরে। হঠাৎ দেখেও ফেলল কয়েকজন। আর সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল বাণের কানে।

অমনি প্রাসাদ কাঁপিয়ে উঠল বাণের হুঙ্কার—এতখানি দুঃসাহস? কোন কথা নয়, কোতল কর।

সামান্য একটা ছেলে অনিরুদ্ধ। কজনই-বা যাবে? আর কতক্ষণেরই-বা ব্যাপার?

মার মার করে বাণ-সেনারা অন্দরমহলে উষার ঘরের সামনে যেতেই অনিরুদ্ধ লোহার মুগুর তুলে নিয়ে এমন ঝড়ের মত চালাতে আরম্ভ করল যে সেখান থেকে তখন প্রাণ নিয়ে ফিরে যায়, সাধ্য কার? বাণ ভেবেছিল, এতেই তার কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু যখন দেখল, তার অমন দুর্ধর্ষ রক্ষীরা মারা গেল, তখন থাকতে না পেরে নিজেই এগিয়ে ছুঁড়ল নাগপাশ। মারাত্মক অস্ত্র। ছুটে গিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে অনিরুদ্ধকে। বড় কঠিন সে বাঁধন। লোহার গদা ছাড়া আর তো কিছু ছিল না অনিরুদ্ধের হাতে যে নাগপাশ আটকাবে। বাধ্য হয়েই বাঁধা পড়তে হল অনিরুদ্ধকে।

তাই দেখে উষার দু-চোখ বেয়ে নেমে এল জল।

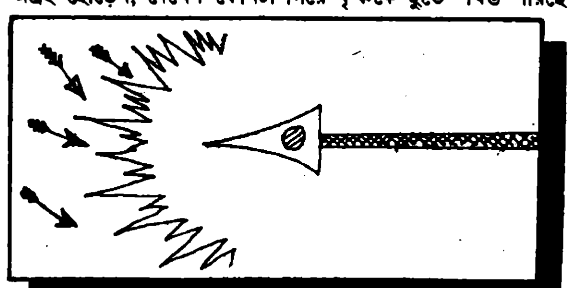
এদিকে দ্বারকার চারদিকে চলেছে খোঁজাখুঁজি। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল অনিরুদ্ধ? তোলপাড় চারদিক। কোথাও কোন সন্ধান নেই। প্রায় সকলেই শোকে মুহ্যমান। প্রায় চার মাস কেটে গেল। কৃষ্ণ-বলরামও চিন্তাকুল। নাতি হলেও অনিরুদ্ধ তো কম বীর নয়। কে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখতে পারে?

এমন সময় ঢেঁকিবাহন নারদ এলেন দ্বারকায়। কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে খবর দিলেন, শোণিতপুরে বাণরাজার নাগপাশে বাঁধা পড়ে আছে অনিরুদ্ধ।

খবর পেয়েই দ্বারকায় উঠল সাজ-সাজ রব। কৃষ্ণের নাতিকে আটকে রাখে বাণ? যার বাবা অত সদাশয়, তার ছেলে বাণের সামান্য এক দানব হয়ে এত দুঃসাহস? এত ক্ষমতার দম্ভ? উচিত শিক্ষা দিতে হবে বাণকে। বার অক্ষৌহিণী যাদব সেনা নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম গিয়ে শোণিতপুরের চারদিক ঘিরে ফেললেন। প্রদ্যুম্ন, যুযুধান, শাম্ব প্রভৃতি কৃষ্ণের বীর ছেলেরাও গেল কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে। গিয়েই তারা নগর বাইরের দুর্গগুলো ভাঙচুর করতে শুরু করল।

হাজার হাত নিয়ে বাণ যে রকম একটা যুদ্ধের জন্য এতদিন মনে মনে ছটফট করছিল, হাতগুলোর সুখ মিটিয়ে নেবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল, সেই সুযোগ আসতেই বাণও উঠল লাফিয়ে। সেও তক্ষুণি কৃষ্ণের মতই বারো অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে এল নগর থেকে। বাণ যখন নিজে যুদ্ধে এসেছে, তার রক্ষী শিবকেও হবে আসতে। ষাঁড়ের পিঠে চেপে রুদ্রদেবও এলেন, সঙ্গে নন্দী-কার্তিককে নিয়ে। রুদ্রদেব এলে, তাঁর অনুচর যত ছিল, সেই ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, ব্রহ্মরাক্ষসরাও দলে দলে এসে হাজির হল।

শুরু হয়ে গেল দু-পক্ষের তুমুল লড়াই। যাদব সেনারা অস্ত্রবিদ্যায় বাণ-সেনাদের চেয়ে অনেক সুনিপুণ। ফলে তারা তো মারা পড়তেই লাগল, এমন কি কৃষ্ণের এক একটা বাণের হল্কায় রুদ্রের অনুচররাও পালাতে পথ পেল না। প্রদ্যুম্নের তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কার্তিকও পালালেন। শিব কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে যে অস্ত্রই ছোঁড়েন, দেখেন কোনটা গিয়ে কৃষ্ণকে ছুঁতে পর্যন্ত পারছে



না। কৃষ্ণের হাতে তখনো ছিল এক মারাত্মক অস্ত্র। তার কাজ হল, যাকে লক্ষ্য করে তা ছোড়া যাবে, তার দেহ-মন অবশ হয়ে যাবে। খালি হাই তুলবে, আর ভীষণ ঘুম পাবে। সুযোগ বুঝে কৃষ্ণ সেই অস্ত্র শিবকে লক্ষ্য করে ছুড়তেই শিব কাত।

বাণ দেখল, এ তো বেশ হল। সৈন্য-সামন্ত গেল, শিবের মত অমন রক্ষী—সেও ঝিমোতে শুরু করল। এবার হাজার হাতে বাণ তীরের জাল ছুড়ে নিজেই নেমে পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে। সুকৌশলী কৃষ্ণ, তীরের সেই জাল তো সরিয়ে দিলেনই, এমন কি বাণের হাতের পাঁচশ ধনুকও কেটে টুকরো টুকরো করে এগিয়ে আসতে লাগলেন তাকে মারতে। ঠিক এমনি সময়ে প্রায় উন্মাদের মত বাণের মা ছেলের প্রাণ ভিক্ষের জন্য এমন ভাবে ছুটে আসতে লাগলেন কৃষ্ণের দিকে যে পরনের পোশাকটাও যে তাঁর খুলে গিয়েছিল, সেদিকে হুঁশও ছিল না। কৃষ্ণ বাণের মাকে ঐ অবস্থায় দেখে যেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছেন, সেই সুযোগে বাণও চম্পট দিল একেবারে প্রাসাদে।

ইতিমধ্যে শিবের ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেছে। চেয়ে দেখেন, নিজের অনুচররা তো নেই-ই, এমন কি তাঁর ভক্ত বাণও নেই, সৈন্য-সামন্তও শেষ। দারুণ রেগে রুদ্রদেব সৃষ্টি করলেন রুদ্রজ্বরের। বীভৎস তার আকার। তিনটে মাথা, তিনটে পা। আদেশ দিলেন শিব, যাদব সেনা ধ্বংস করতে। ভীমবেগে রুদ্রজ্বর এগিয়ে আসছে দেখে কৃষ্ণও সৃষ্টি করে ফেললেন বৈষ্ণবজ্বরকে।

রুদ্রজ্বর বীর বিক্রমে কাছে আসতেই রুখে দাঁড়াল বৈষ্ণবজ্বর। বাধল এবার দুই জ্বরের লড়াই। কিন্তু রুদ্রজ্বর শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কায়দা করতে না পেরে বৈষ্ণবজ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

এর কিছুক্ষণ পরেই বাণ বেরিয়ে এসে সবাইকে ছেড়ে এবারে সরোষে আক্রমণ করল কৃষ্ণকে। হাজার হাতে বাণের ওপর বাণ, তার ওপর বাণ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ।

আর থাকতে না পেরে কৃষ্ণ এবার তুলে নিলেন সুদর্শন চক্র। ছুড়লেন বাণের হাতগুলো লক্ষ্য করে। চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে চক্র যখন এসে বাণের একের পর এক হাত কাটতে শুরু করল, শিব আর থাকতে পারলেন না। কৃষ্ণ যে কে, তা সেই জ্বরের লড়াইয়ের পরই বোঝা হয়ে গিয়েছল শিবের। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে ছুটে এসে অনুরোধ জানালেন শিব—কৃষ্ণ, ও আমার ভক্ত, আমারই সেবক। আমার বরে ওর ঐ হাজার হাত। ও আমারই আশ্রিত। তুমি ওকে প্রাণে মেরো না।

শুনে কৃষ্ণ শিবকে অভয় দিয়ে বললেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তুমি তো কিছু অন্যায় কর নি। ঐ হাজার হাতে বাণ কত ভাল কাজ করতে পারত। কিন্তু মনে ওর বড় দম্ভ জেগেছে। ওটার বিনাশ নিশ্চয় তুমিও চাও। আর বলির ছেলেদের আমি কখনো মারব না, এটা আমার প্রতিজ্ঞা। নিশ্চিত থাক, সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙব না।

আর মাত্র চারটে হাত বাকি আছে বাণের। কৃষ্ণ ফিরিয়ে নিলেন তাঁর সুদর্শন চক্রকে।

তারপর বললেন—আমি শুধু তোমার হাজার হাতের দম্ভই নষ্ট করলাম, আর কিছু নয়। যাও, শিবভক্ত তুমি, ঠুনকো জিনিস নিয়ে আর আস্ফালন কোরো না।

মনে-প্রাণে বুঝল বাণ, সত্যিকারের ক্ষমতা যার আছে দম্ভ করা তারই সাজে। শুধু গায়ের জোরকেই ক্ষমতা বলে না।

প্রাণ ফিরে পেয়ে আর প্রকৃত শিক্ষালাভ করে কৃতজ্ঞ বাণ অন্দরমহল থেকে অনিরুদ্ধকে নাগপাশের বাঁধন থেকে মুক্ত করে এনে তুলে দিল কৃষ্ণের হাতে, সেই সঙ্গে তার মেয়ে উষাকেও। অনেক যৌতুকের সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিল দ্বারকায়।



শিশুপাল সংহার কাহিনী

চেদীরাজ দমঘোষ। বৎস আর মালবের পশ্চিমে নর্মদা নদীর তীরে মনোরম এই দেশের রাজা দমঘোষ কুলে-শীলে, জ্ঞানে-গুণে সে সময় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যদু বংশের বসুদেবও তাই নিশ্চিন্ত মনে তাঁর চতুর্থ বোন শ্রুতশ্রবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কি আর বসুদেব ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভাগনে হবে তাঁদেরই চরম শত্রু? না, দমঘোষ আর শ্রুতশ্রবাই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে এক কুলাঙ্গার জন্মাবে তাঁদের বংশে।

শুধু কুলাঙ্গার নয়, কি বীভৎস আকৃতি নিয়েই না জন্মেছিল তাঁদের ছেলে শিশুপাল। তিনটে চোখ, চারটে হাত। তার ওপর যখন কেঁদে উঠল সে, রীতিমত গাধার চিৎকার। দেখে দুঃখ তো হয়েছিলই। বিকৃত ছেলে হলে কোন্ মা-বাবার না মন খারাপ হয়? কিন্তু তার থেকেও বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা, কোথা থেকে এমন বিকট ছেলে জন্মালো তাঁদের বংশে, আর কি-ই বা করবেন তাকে নিয়ে। দেখতেই যেন বিকট একটা অসুরের মত, গলায় নেই মিষ্টি সুর—ভবিষ্যতে এ কি হবে? একদিকে পুত্রস্নেহ, আর একদিকে ভয়—এমনি যখন দোটানায় অস্থির মা-বাবা, শুনলেন আকাশবাণী—তোমাদের ছেলে হয়ে যে জন্মেছে, তাকে তোমরা অবহেলা, অনাদর কোরো না, তাকে যত্ন কোরো। ও একজন মহাবীর। জন্মেছে যখন একদিন ওকে মরতেই হবে। তবে বীর যেমন অস্ত্রাঘাতে মরে, সেই ভাবেই মরবে। আর যার হাতে ও মরবে, সে-ও জন্মেই আছে।

এতক্ষণ ছেলেকে দেখে ভয়ে অস্থির হচ্ছিলেন মা-বাবা। পাছে এই ছেলের জন্য সংসারে কোন অমঙ্গল আসে, তাই ছেলেকে গোপনে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবেন, এ রকম চিন্তাও করছিলেন। কিন্তু আকাশবাণীতে মৃত্যুর কথা শুনে ধড়াস করে উঠল মায়ের বুক। থাকতে না পেরে আকাশবাণীকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে এ কথা বললেন জানি না। আপনি যখন বলছেন, ছেলেকে আমরা অযত্ন করব না, কিন্তু জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে, কার হাতে আমার ছেলের মৃত্যু হবে, কি তার নাম?

প্রত্যুত্তরে আকাশবাণী শুধু বললেন—যাঁর কোলে ওঠা মাত্রই তোমার ছেলে আর অমন বিকট-দর্শন থাকবে না, স্বাভাবিক

মানুষের মত দেখতে হয়ে যাবে, তাঁরই হাতে তোমার ছেলের মৃত্যু হবে।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল চেদীরাজ দমঘোষের অদ্ভুত এক ছেলে হয়েছে—তিনটে চোখ, চারটে হাত। একে রাজার ছেলে, তায় আবার অদ্ভুত দেখতে, কৌতূহলী হয়ে দলে দলে বন্ধু রাজারা আসতে শুরু করলেন প্রাসাদে। সকলেই একবার করে কোলে তুলে একটু আদর করে নামিয়ে রেখে নিজেরাই জল্পনা-কল্পনা করতে করতে চলে গেলেন। সজাগ মা-বাবার চোখ। দেখলেন, এত রাজা এলেন, কোলে নিলেন, রেখে দিলেন আবার, কিন্তু ছেলের দেহের তো কোন পরিবর্তন ঘটল না।

খবর গেছে দ্বারকাতেও। কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে নিয়ে বসুদেবও এসেছেন তাঁর ভাগনেকে দেখতে। বসুদেবের কোল থেকে বলরামের কোল ঘুরে যেই কৃষ্ণ তার ভাইকে আদর করার জন্য তুলে নিলেন নিজের কোলে, অবাক হয়ে সকলেই দেখল, যেন ভোজবাজি ঘটে গেল। কোথায় চার হাত, তিন চোখ! এ তো একেবারে স্বাভাবিক ছেলে—দুই হাত, দুই চোখ! আবার মিটিমিটি হাসছে।



আকাশবাণীর কথা মনে জাগতেই ডুকরে উঠল মায়ের প্রাণ। শেষে তার ছেলের মৃত্যু ঘটবে তারই দাদার ছেলের হাতে! হে ভগবান! ভাই-এর হাতে মরবে ভাই!

শিশুপালকে নামিয়ে রাখতে শ্রুতশ্রবা ছলছল চোখে কৃষ্ণের দুটো হাত চেপে ধরে বললেন—কৃষ্ণ, আমায় কথা দে, তুই আমার ছেলের সব অপরাধ ক্ষমা করবি?

শুনে কৃষ্ণ বলল—পিসিমা, এমন করেই যখন বলছ, তখন ওর একশটা অপরাধ আমি ক্ষমা করব, কথা দিচ্ছি। তারপর কিন্তু আর কথা রাখতে পারব না, অন্যায় হবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।

এই বলে ওরা সবাই আবার ফিরে গেল দ্বারকায়।

মায়ের প্রাণ কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? তবু থাকতেই হবে। কপালের লেখা কে ঘোচাবে।

হ্যাঁ, এটাই নির্দিষ্ট ছিল বহুকাল আগে থেকেই।

বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর দুই দ্বারী জয় আর বিজয়কে একবার ব্রাহ্মণরা তাদের ঔদ্ধত্যের জন্য অভিশাপ দিয়েছিলেন, মর্ত্যলোকে তিন জন্ম নাস্তিক আর নিষ্ঠুর হয়ে কাটাতে হবে। এই তিনটে জন্মই তাদের কাটাতে হবে প্রচণ্ড দেব-বিরোধিতা করে, অসুর মনোভাব নিয়ে অত্যাচার করে। এই দুই দ্বারীকে খুবই ভালবাসতেন বিষ্ণু। তবুও ঔদ্ধত্যের শাস্তি পাওয়া উচিত বিবেচনা করে ব্রাহ্মণদের সেই অভিশাপ তিনি অনুমোদন করেছিলেন। তবে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি মর্ত্যে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনবেন। [দ্রষ্টব্য : হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের কাহিনী।]। জয় প্রথম মর্ত্যে জন্ম নিয়েছিল প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু হয়ে। ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহের বেশে তাকে সংহার করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু নৃসিংহকে তার প্রভু বলে চিনতে পারে নি, তাই মুক্তি না পেয়ে দ্বিতীয়বার তাঁকে জন্মাতে হয়েছিল রাবণ নামে। সেবারও ভগবান এসেছিলেন শ্রীরামচন্দ্ররূপে। রাবণ অনুমানে ধরলেও এতই মোহগ্রস্ত ছিল যে ঠিক চিনতে পারে নি। তাই এবারেও মুক্তি না পেয়ে শেষে জন্ম নিল শিশুপাল নামে। এমন ঘরে জন্ম নিল যে কৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তার কিছুই জানতে বাকি ছিল না। বসুদেব আর দেবকীর মত শিশুপাল না জানুক যে কৃষ্ণ, সেই ভগবান—বিষ্ণুরই মানুষ রূপ, তবে অনেক কিছুই অনুমান করতে পারত। কিন্তু আগে থেকেই নির্দিষ্ট যে, ঘোরতর শত্রুতা করতেই হবে, তবে ভগবান বিষ্ণু তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন। কৃষ্ণ সেই সুযোগটাই সকলের অজান্তে শিশুপালকে দিয়ে গেলেন। মনে মনে জানতে পারলেন তা বসুদেব আর দেবকী।

এরপর কেটে গেছে অনেক দিন। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক। শ্রুতশ্রবা হাজার চেষ্টা করেও ছেলেকে কোন মতেই ধীর, শান্ত, বিনয়ী করে তুলতে পারে নি। জিদ তো জিদ। যেটা সে মনে করবে ভাল, সেটা যত খারাপই হোক, তার কাছে ভাল। যে কাজটা একবার করব মনে করবে, যত খারাপই হোক না কেন সে কাজ, নিষেধ সত্ত্বেও করবে। আর না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। শ্রুতশ্রবা দেখেন, আর উদ্বিগ্ন হন ছেলের জন্য। এটাই কি ওর নিয়তি? কে জানে?

দমঘোষ মারা গেছেন। এখন চেদীর সিংহাসনে শিশুপাল। রাজা শিশুপাল। অনেক রাজাই এখন তার বন্ধু। শিশুপালের বিশেষ বন্ধু তারাই, যারা যাদব-বিরোধী—আর কৃষ্ণের আধিপত্য যারা কোন মতেই সহ্য করতে পারে না। মা শ্রুতশ্রবা এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে যেন আগুনের মত জ্বলে ওঠে শিশুপাল। বলে ওঠে—ওসব আমাকে বলতে এসো না মা। মামা, মামাতো ভাই। ওদের সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। তোমার ঐ ভাইপো কৃষ্ণের মত নীচ, লম্পট আর দ্বিতীয় নেই! তোমার ভাই বসুদেব। ও কি রাজা যে ওকে আমায় খাতির করে চলতে হবে, সম্মান দেখাতে হবে? আমার মামার কুল একটা গোপালের কুল, পরিচয় দিতেও লজ্জা লাগে। ছেলের মুখ চেয়েই ভাই-ভাইপোদের ওপর বিষোদ্গার শ্রুতশ্রবাকে হজম করতেই হয়। চোখ বুজে দেখতে হয়, যাদবকুল ধ্বংস করতে যারা শত্রুতা করে চলেছে দিনরাত, শিশুপাল কেমন নির্বিবাদে তাদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে চলেছে।

এমনিভাবে যখন চলেছে দিন, পাণ্ডুর ছেলে যুধিষ্ঠির, প্রবীণ ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতির সঙ্গে আলোচনা করে, বিশেষভাবে কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে ঠিক করলেন, রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের নিয়ম অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের চার ভাই ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব বেরিয়ে পড়লেন চারদিকে। পৃথিবীতে যত রাজা আছেন, তাঁদের

কাছে এই সম্মতি নেওয়া এইজন্য যে, তাঁরা সকলে যুধিষ্ঠিরকে রাজাধিরাজ বলে মেনে নিচ্ছেন কিনা। যাঁরা এক কথায় মেনে নিলেন, যজ্ঞের জন্য উপঢৌকন দিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। সাদরে তাঁরা সকলেই আমন্ত্রিত হলেন। আর যাঁরা এক কথায় মেনে নিতে পারেন নি, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে হারিয়ে প্রভুত্ব আদায় করে আবার সব ভাই ফিরে এসেছেন হস্তিনায়। এই সময়েই জরাসন্ধ উপেক্ষা করেছিল বলে তাকে ভীমের হাতে মরতে হয়েছিল।

যাই হোক, সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে যজ্ঞের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির তৈরি করিয়েছেন অপূর্ব এক সভাগৃহ। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দেশ-বিদেশের রাজারাও। যজ্ঞ দেখার জন্য দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, চ্যবন, বিশ্বামিত্র, বামদেব, জৈমিনি, পৈল, পরাশর, গর্গ, কশ্যপ প্রভৃতি মুনি ঋষিরাও যেমন এসেছেন, তেমনি এসেছেন দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দুর্যোধন প্রভৃতি একশ ছেলে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর।

একে বসন্তকালের আমেজ, তার ওপর দাও-দাও, খাও-খাও, নাও-নাও—যেন রীতিমত এক মেলা বসে গেল হস্তিনায়।

শুভ সময় দেখে যুধিষ্ঠির শুরু করলেন যজ্ঞ। সোনার লাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞস্থান চষা হল। তৈরি হল যজ্ঞবেদি। ঋত্বিক পুরোহিতদের বরণ করে বসানো হল যাঁর যাঁর জায়গায়।

যজ্ঞে আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করার আগে নিয়ম মত শ্রেষ্ঠ সভাসদ হিসেবে আগে একজনকে বরণ করে বসাতে হবে। এখানেই সমস্যায় পড়লেন যুধিষ্ঠির। বয়সে প্রবীণ দাদামশায় ভীষ্ম থেকে শুরু করে তাঁদের দীক্ষাগুরু, অস্ত্রগুরুরা সকলেই এসেছেন, ওদিকে অনেক প্রধান রাজাও এসেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সভাসদের পদ মাত্র একটাই। কাকে বাদ দেবেন, আর কাকেই বা বরণ করবেন।

এমনিভাবে যখন চিন্তায় মগ্ন যুধিষ্ঠির, ছোট ভাই সহদেব হঠাৎ বলে বসলেন—দাদা, এ নিয়ে তো ভাববার কিছু নেই। এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ সদস্য হবার মত একজনই রয়েছেন, তিনি কৃষ্ণ। তাঁকেই পূজা করে অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করুন। (মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠিরকে এই পরামর্শ পিতামহ ভীষ্মই দিয়েছিলেন, যার জন্য শিশুপাল ভীষ্মকে যারপরনাই তিরস্কার করেছিল, অপমান করেছিল।

সভায় মুনি-ঋষি থেকে প্রবীণ যাঁরা ছিলেন, যুবক সহদেবের বিচারবুদ্ধির খুব প্রশংসা করলেন, এমন কি ভীষ্মও। তবে, সবাই নীরবে।

সভাসদরা সবাই নীরবে সহদেবের মতে সায় দিলেন দেখে যুধিষ্ঠির মহানন্দে কৃষ্ণকে মালা চন্দন দিয়ে সাজালেন। পূজা করলেন, পা ধুইয়ে সেই জল নিজে মাথায় নিলেন, ভাই আর পরিজনদের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে ভীষ্ম পর্যন্ত প্রধান সভাসদরা উঠে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

এই বিশাল সভায় যেখানে পৃথিবীর তাবৎ রাজারা উপস্থিত, সেখানে কৃষ্ণকে ঐভাবে সমাদর পেতে দেখে শিশুপালের আর ধৈর্য রইল না।

তড়াক করে নিজের জায়গাতেই লাফিয়ে উঠে বেশ কড়া কড়া কথায় ছুঁড়তে শুরু করল বাক্যবাণ—বাঃ বাঃ, চমৎকার! সেদিনের এক ডেঁপো ছোকরা সহদেব যা বলল, এখানে এত জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, প্রধান সবাই একবাক্যে তা মেনে নিল? আশ্চর্য, বলি, শাস্ত্রধর্ম কি লোপ পেয়ে গেল? এ যে ঘোর কলি।

চমকে উঠল সবাই শিশুপালের কথা শুনে। প্রবীণরা হতবাক। রাজন্যবর্গের মধ্যে শুরু হয়ে গেল গুঞ্জন। শুরুর মুহূর্তেই এ কি কাণ্ড। যুধিষ্ঠির থামাতে গেলেন শিশুপালকে; বোঝাবার চেষ্টা করতে গেলেন। কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ সভাসদের পদে বরণ করে তিনি কোন অশাস্ত্রীয় কাজ করেন নি, অধর্ম করেন নি। কিন্তু শিশুপাল তখন এতই রেগে আগুন যে, কারো কথা শোনার সময় কোথায় তার? সে নিজেই জ্বলছে দাউ দাউ করে।

—থাম···থাম। প্রচণ্ডভাবে যুধিষ্ঠিরকে ধমক দিয়ে ওঠে শিশুপাল—শোন যুধিষ্ঠির, আমরা জানতাম তুমি ধার্মিক। ধর্মাচরণে ব্রতী হয়েছ, ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছ, তাই আমরা তোমার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে তোমায় কর দিয়েছি। ভেবো না, তোমার ভয়ে তোমাকে কর দিয়েছি। এখন দেখছি আমাদের ভুলই হয়েছে। আমাদের মত রাজাদের ডেকে এনে তুমি অপমান করলে। এ অধিকার আমরা তোমাকে দিই নি।

শিশুপালের অনুগামী বেশ কিছু রাজা হইহই করে উঠল—আমাদের ডেকে এনে এভাবে অপমান করার অধিকার কে তোমাকে দিল?

—আমরা বুঝতে পারছি না, ভাবছি যে কেন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যের মত প্রধান বীররা থাকতে তুমি কৃষ্ণকে প্রধান সদস্য করলে? কৃষ্ণ তোমাদের পরম আত্মীয়। সব সময় যেহেতু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তোমাদের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুর মত আচরণ করে, তাই এই সুযোগে তুমি তাকে যে সম্মান দেখালে, তা পাবার যোগ্যতা তার নেই। সকলেই বলে, তুমি ধর্মপুত্র ধর্মরাজ। এখন তো দেখছি তুমি স্বজন-তোষণ আর স্বজন-পোষণ ছাড়া আর কোন ধর্মই জান না।

শুনতে শুনতে ভেতরে জ্বলে উঠতে থাকেন ভীম। বিব্রত বোধ করতে শুরু করেন যুধিষ্ঠির। যজ্ঞ কি শেষে পণ্ড হয়ে যাবে? তাকান কৃষ্ণের দিকে। দেখেন চুপচাপ বসে কৃষ্ণ। যেন কিছুই শুনছেন না।

—রাজসূয় যজ্ঞে তুমি ব্রতী হয়েছ যুধিষ্ঠির। শ্রেষ্ঠ সদস্যের পদে যদি কোন প্রবীণকে বরণ করার ইচ্ছে তোমার না থেকে থাকত, তখন ধর্মত নিদেনপক্ষে কোন রাজাকে বরণ করা উচিত ছিল। কৃষ্ণ কি রাজা? না, কৃষ্ণের বাবা বসুদেব রাজা? কোন দিন ওদের বংশের কেউ রাজা হতে পারবে? তুমিও বিলক্ষণ জানো, যযাতি ওদের সেই আশায় ছাই দিয়ে গেছে। তাঁর অভিশাপে ওদের বংশের কেউ কোন দিন রাজা হতে পারবে না। তা জেনেও তুমি কোন আক্কেলে আমাদের সকলের সামনে, আমাদের সকলের চেয়ে বড়র সম্মান দিলে ঐ অর্বাচীনটাকে?

শিশুপাল-পক্ষের রাজারা আবার হইহই করে উঠল—ঠিক। ঠিক কথা বলেছ শিশুপাল। এ অন্যায়। এ অসহ্য।

—আমি আরো অবাক হচ্ছি কৃষ্ণ তোমায় দেখে। মানুষের একটা স্বাভাবিক কুণ্ঠা, লজ্জা-শরম থাকে। তোমার কি তা-ও নেই। এখানে এত মানী-গুণী-প্রবীণ, তোমার চেয়ে কুলে-শীলে উন্নত সভাসদ থাকতে মুখ বুজে যুধিষ্ঠিরের দেওয়া অর্ঘ্য তুমি নিয়ে নিলে? সম্মান পাবার এত লোভ তোমার? কিন্তু সে যোগ্যতা তোমার আছে? তুমি যে একটা কাপুরুষ, কে তা না জানে?

প্রাণভয়ে তাই দুর্গ তৈরি করে আছ সমুদ্রের নীচে দ্বারকায়। তুমি যে কি পরিমাণ শয়তান, তা তো বেশ ভালভাবেই দেখা গেল ভীমকে দিয়ে জরাসন্ধকে মারবার সময়। তোমার মত লম্পট, চরিত্রহীন, দুরাচার আর দ্বিতীয় কেউ আছে? কেশী তৃণাবর্তের মত কয়েকটা রাক্ষস মেরে তুমি নিজেকে কি মনে করেছ সকলের সেরা বীর? উই-এর ঢিপির একটা পাহাড় সাতদিন ধরে তুলে রেখে তুমি কি নিজেকে ভেবে নিয়েছ এক দারুণ পুরুষ? ও সব ভেল্কিবাজি দেখিয়ে ঐ কাপুরুষদের কাছে দেবতা বনতে পার, আমাদের কাছে নয়।

কৃষ্ণকে যাঁরা জেনেছেন বা চিনেছেন, তাঁর প্রতি শিশুপালের এই কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে তাঁদের মধ্য থেকে অনেকেই সভা ছেড়ে চলে গেলেন। ভীম আর সহ্য করতে না পেরে শিশুপালকে মারতে গেলে ভীষ্ম তাঁকে বাধা দিলেন।

চিৎকার করে উঠলেন সহদেব—কৃষ্ণকে পূজা করে, শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়ে আমরা ন্যায়ত, ধর্মত ঠিক করেছি। যে রাজারা তা সহ্য করতে না পেরে চেঁচামেচি শুরু করেছে, আমি তাদের মাথায় লাথি মারি। ক্ষমতা থাকে এগিয়ে আসুক। জবাব আমি দেব।

কৃষ্ণ তখনো কিন্তু চুপ।

—সহদেব কি ভেবেছে? এত দম্ভ? গর্জন করে ওঠে শিশুপাল।

—আমি···আমি বাধা দেব। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুনীথ নামে এক বীর সেনাপতি প্রায় লাফিয়ে পড়ল—যদুকুল আর এই পাণ্ডুকুল আমি নির্মূল করব।

সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডু ছেলেরা, মৎস্য, সৃঞ্জয় আর কেকয় বংশের বীররাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লাফিয়ে উঠল।

ওদিকে শিশুপালও রণসাজে সেজে খাঁড়া হাতে আস্ফালন করে উঠল—চুপ করে বসে কেন, কৃষ্ণ? যদি বীরশ্রেষ্ঠই হও তো এসো আমার কাছেই আগে পরিচয়টা রেখে যাও।

যুদ্ধোন্মাদে তখন প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে যজ্ঞস্থল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সরোষে উঠে দাঁড়িয়েছে শিশুপাল। সঙ্গে অনুগামী রাজাদের নিয়ে এদিকে গর্জে উঠেছেন ভীম, অর্জুন আর তাঁদের অনুগামীরা। কৃষ্ণ আর বসে না থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বাধা দিলেন পাণ্ডবদের!

তারপর শিশুপাল আর তার অনুগামীদের রণহুঙ্কার ছাপিয়ে এমন এক ভীষণ গর্জন করে উঠলেন যে মুহূর্তের মধ্যে ওদের দাপাদাপি বন্ধ হয়ে গেল। আবার শুরু করার আগেই ঠিক তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই কৃষ্ণ বললেন শিশুপালকে—হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছা শিশুপাল আমিই পূরণ করব। তার আগে আমি সভাসদদের কয়েকটা কথা শুনিয়ে রাখি। নইলে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তাতে এঁরা হয়ত ভুল বুঝতে পারেন।

এই বলে কৃষ্ণ তাকালেন অনুগামী এবং প্রধান সভাসদদের দিকে। বললেন—দেখুন সভাসদগণ, শিশুপাল সম্পর্কে আমার পিসতুতো ভাই, আমার পিসিমা শ্রুতশ্রবার ছেলে। ও জন্মাবার পরই ওর মা জানতে পেরেছিলেন যে ওর মৃত্যু আমার হাতে। অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন ওর সব অপরাধ ক্ষমা করি। পিসিমার অনুরোধে আমি বলেছিলাম আমি ওর একশ অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, তারপর আর করতে পারব না। করলে অন্যায় করা হবে। আজ শিশুপালের ক্ষমার যোগ্য সেই একশ অপরাধ শেষ হয়ে গেল। এবার অবশ্যই ওর কাছে আমার পরিচয়টা রাখতে হয়। দেখুন, সম্পর্কে আমাদের ভাই হয়েও চোখ ফোটার পর থেকেই কি ভাবে সে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছে। কত রকম ভাবে যে আমাদের ক্ষতি করে আসছে তার আর শেষ নেই, তার সঙ্গে অনাচার। কত আর বলব? কয়েকটা বলি শুনুন। প্রাগজ্যোতিষপুরে (গৌহাটিতে) বাণ যখন অনিরুদ্ধকে আটকে রেখেছিল, আমরা গিয়েছিলাম ছাড়াতে, দ্বারকায় তখন কেউ ছিল না, সেই সুযোগে এই শিশুপাল দ্বারকাপুরীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ভোজরাজ তাঁর সহচরদের নিয়ে রৈবতক পর্বতে (গির্ণার পর্বত) গিয়েছিলেন বেড়াতে, এই শিশুপাল অযথা তাঁদের আক্রমণ করে অনেককে হত্যা করেছিল। আমার বাবা বসুদেব, ওর মামা, অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে গেলে, এই শিশুপাল সেই ঘোড়া চুরি করে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল। এছাড়া আরো কত যে কুকাজ করেছে, তা আর কি বলব আপনাদের? শুধু পিসিমার অনুরোধে আমি এত দিন সহ্য করে গেছি। আর আজ এই সভায় এসে আমাকে, সেই সঙ্গে প্রধান ধার্মিকদের, যে অপমান করল, সে তো নিজেরাই দেখলেন, শুনলেন। এসব ক্ষমার অযোগ্য, সুতরাং····

বলেই কৃষ্ণ শিশুপালকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন তাঁর অমোঘ সুদর্শন চক্র।

নিমেষের মধ্যে দেহ থেকে শিশুপালের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রাণহীন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল শিশুপাল।

আর একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল সকলের চোখের সামনেই। দেখল, শিশুপালের দেহ থেকে এক ঝলক আলোর মত কি যেন বেরিয়ে এসে মিশে গেল কৃষ্ণের দেহের সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ-শাপের শেষ জন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় আবার ফিরে গিয়েছিল বৈকুণ্ঠে।

এদিকে, তারপর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞও সমাধা হয়েছিল নির্বিঘ্নে।

নৃগ-রাজার কাহিনী

শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, চারু, ভানু প্রভৃতি কৃষ্ণের ছেলেরা তখন খুবই ছোট। খেলা করতে করতে একদিন তারা গিয়ে ঢুকল দ্বারকারই এক উপবনে। খেলতে খেলতে এক সময় খুবই তেষ্টা পেয়ে গেল তাদের। জলের খোঁজে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে সামনেই একটা কুয়ো দেখে তাড়াতাড়ি গেল সেখানে। জল খেতে গিয়ে দেখে, কুয়োয় এক ফোঁটা জল নেই। আর তলায় পড়ে আছে এক কৃকলাস (গিরগিটি)। দেখল বেশ বড়-সড় গিরগিটিটা মরার মত পড়ে আছে।

দেখে খুবই মায়া হল ছেলেদের। আহা, কিভাবে গিয়ে পড়েছে কে জানে? কতদিনই-বা এই ভাবে পড়ে আছে, কে জানে? ভুলে গেল পিপাসা। যে যা পারল, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে দড়ি, চামড়া এনে তাকে কুয়োর ভেতর থেকে তুলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে দিল।

বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও না পেরে ছুটল বাবার কাছে।

গিয়ে বলল—বাবা, দেখবে এসো, কত বড় একটা গিরগিটি কুয়োর ভেতর পড়ে আছে।

—তাই নাকি? বলে কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে এলেন সেখানে। তারপর কুয়োর ভেতর ঝুঁকে দেখে বললেন—তাই তো রে! তা তোরা তুলতে পারলি না?

—অনেক চেষ্টা করলাম বাবা। কিন্তু কিছুতেই নড়াতে পারলাম না। তাই তো তোমাকে ডাকতে গেলাম। কলবল করে উঠল ছেলেরা।

—আ…চ্ছা। তোরা নড়াতে পর্যন্ত পারলি না? তাহলে তো আমাকেই একবার চেষ্টা করতে হয়। এই বলে কুয়োর মুখে ঝুঁকে, সোজা হাত বাড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণ কুয়োর ভেতর। তারপর সেখান থেকে হাতে করে তুলে নিয়ে এলেন গিরগিটিটা, যেন একটা খড়ের কুটো।

কিন্তু মাটিতে নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক তাজ্জব কাণ্ড। ছেলেরা দেখল, কোথায় গিরগিটি? তার জায়গায় সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় সোনার মুকুট, ধবধবে রং, গায়ে ঝলমলে পোশাক—এক রাজা যেন।

মুকুট-সমেত মাথা হেঁট করে সে তাদের বাবাকে প্রণাম করে আবার উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণের কিছুই অজানা ছিল না। তবুও যেন কিছুই জানেন না, এমনি ভান করে তাকে সকলের সামনেই জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

সবাই এবার শুনল তার অবাক-করা কাহিনী।

সে বলল—আমি ছিলাম সূর্য বংশের বিখ্যাত রাজা ইক্ষ্বাকুর ভাই নৃগ। আপনার অজানা কিছু নয়, তবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলতেই হয়। যে কজন রাজা পৃথিবীতে দানবীর বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, লোকে তাঁদের সঙ্গে আমার নামও উচ্চারণ করে থাকে। রাজা হয়েও অসৎ পথে আমি কখনো ধন উপার্জন করি নি। সৎ ভাবে থেকে, সৎ ভাবে জীবনযাপন করে যা কিছু আমি পেয়েছিলাম, সবই আমি লাগিয়েছিলাম আমার দান কাজে। আমি বসন্তকালীন পাঁচ দিন যজ্ঞ (অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ) করেছি। সৎ ব্রাহ্মণদের, শুদ্ধচেতা মানুষদের যথাসাধ্য বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী দান করেছি। পুকুর, দিঘি যেখানে যা প্রয়োজন, তা কাটিয়ে দিয়েছি, যাতে প্রজারা কষ্ট না পায়। নিজে যতদূর সম্ভব শুদ্ধাচারে থেকেছি, যাতে কোন রকমে কোন পাপ আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, যাতে নরকযন্ত্রণা, জন্মযন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। তবু কপালের লিখন এড়াতে পারলাম না।

একদিন এক দুঃখজনক ব্যাপার ঘটে গেল।

এক সৎ ব্রাহ্মণকে আমি একবার বেশ কিছু গরু দান করেছিলুম। কিভাবে আর কখন জানি না, তার মধ্য থেকে একটা গরু ব্রাহ্মণের জিম্মা থেকে পালিয়ে আমার আর সব গরুর দলে মিশে গিয়েছিল। পরে আর এক সৎ ব্রাহ্মণকে যখন গরু দান করি, সেটিও থেকে গিয়েছিল দানের মধ্যে।

এবার সেই ব্রাহ্মণ যখন গরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন পথে সেই ব্রাহ্মণ, আগে যাকে গরু দান করেছিলাম, পালের মধ্যে নিজের হারিয়ে যাওয়া গরুটা দেখতে পেয়েই আগলালেন তাঁর পথ। দাবি জানালেন, রাজার দেওয়া তাঁর গরুটাকে কেন তিনি নিজের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

শুনে পরের ব্রাহ্মণটি অবাক হয়ে বলেছিলেন—আমি আপনার গরু নিতে যাব কেন? এগুলো সবই তো রাজা আমাকে দান করলেন।

নাছোড় প্রথম ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণও অনড়। দুজনেই অভিযোগ নিয়ে এলেন আমার কাছে। শুনে বুঝলাম, ভুল বা অপরাধ, যা কিছুই হোক তা আমারই হয়েছে। একবার এক ব্রাহ্মণকে দান করা গরু, আর এক ব্রাহ্মণকে তা দেওয়ার অর্থই হল, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি আমি নিয়েছি—তা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, মহাপাতকের কাজ এটা।

মনে মনে খুবই ভয় পেয়ে গেলাম। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি জেনেই হোক, আর না জেনেই হোক, নিলে নরকভোগ নিশ্চিত। তাই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেছিলাম, ঐ গরুটির বিনিময়ে আমি এক লক্ষ গরু দিচ্ছি। শুনে ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ না করে সব গরু ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।



প্রথম ব্রাহ্মণকেও ঐ একই অনুরোধ করেছিলাম, ঐ গরুটির বিনিময়ে আমি এক লক্ষ গরু দিচ্ছি। মনের অশান্তি যেন ঝেড়ে ফেলে দেন। আমারও সুফল নষ্ট হয় না। শুনে সে ব্রাহ্মণও তাঁর সব দান ফেরত দিয়ে গেলেন।

মনে খুবই আঘাত পেলাম। এমন সময় মৃত্যু এসে আমায় নিয়ে গেল যমালয়ে। যমরাজ দেখে শুনে বললেন—তাই তো, তোমার যা পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে, তাতে তোমার স্থান দেবলোকে, স্বর্গে। শুধু সামান্য একটু ত্রুটি—তার জন্য যা একটু ফলভোগ করতে হবে। তা তুমি কোনটা চাও? আগে স্বর্গসুখ ভোগ, না আগে পাপটুকুরই প্রায়শ্চিত্ত করতে?

আমি বলেছিলাম—ধর্মরাজ। আমি আগে পাপের প্রায়শ্চিত্তটাই করে নিতে চাই।

যমরাজ বললেন—এ যা পাপ, তাতে কৃমি-কীট হয়ে জন্মাবার কথা, তবে তোমাকে তা হতে হবে না। তুমি কৃকলাস হয়ে জন্মাও। তারপর কোন দেবপুরুষের স্পর্শে তুমি আবার নিজের রূপ ফিরে পেয়ে স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখ ভোগ করবে। এরপর আমি কৃকলাস

হয়ে জন্মে এই কূপেই অপেক্ষা করছিলাম। আমার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নি, তাই সবই বলতে পারলাম। এখন আপনার স্পর্শে আমার মুক্তি লাভ হল।

এই বলে রাজা নৃগ আবার প্রণাম করলেন কৃষ্ণকে। তারপর সকলকে বললেন—আপনারা অনুমতি করুন, আমি স্বর্গে যাই।

সকলে সম্মতি জানালে দিব্য রথ এসে নিয়ে গেল নৃগরাজাকে।



শ্রীদাম ব্রাহ্মণ ও সখা কৃষ্ণ

যদিও পৃথিবীর প্রায় সবাই কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে, স্বয়ং ভগবান বুঝি মানুষের বেশে এসেছেন ভেবে মনে মনে প্রতিদিন তাঁকে স্মরণ করে প্রণাম জানায়, তবুও মুষ্টিমেয় কিছু মানুষজন ছাড়া কৃষ্ণ নিজেকে কারো কাছেই ধরা দেন নি। জন্মগ্রহণের পর থেকেই এমন সব কাণ্ডকারখানা করে আসছেন, যার রহস্য ভেদ চট করে করা সবার পক্ষে সম্ভবই হচ্ছে না। সবাই যাকে শত্রু ভাবছে, দেখা গেল, কৃষ্ণের সে বিশেষ বন্ধু। অনেকেরই যে বন্ধু বা হিতৈষী, কৃষ্ণ তার দারুণ শত্রু। অনেকে দেখেছে, এই মুহূর্তে কৃষ্ণের যে আপনজন, পরমুহূর্তেই সামান্য এক কারণে হয়ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল তার সঙ্গে। আবার যে তাঁর কাছে একেবারে আত্মসমর্পণ করে দিচ্ছে নিজের পদমর্যাদা, দম্ভ, অহঙ্কার, লাজলজ্জা ভুলে, কৃষ্ণ তাকে যেন সব সময় আগলে রেখেছেন। মনের কথা বলার আগেই, কথামত সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। দেখে শুনে অনেকে ভাবে এসব অলৌকিক ভোজবাজি। আবার অনেকে মনে করে, এমন শক্তি এক ভগবান ছাড়া আর কার থাকতে পারে? যাঁরা কৃষ্ণকে ভাবেন ভগবান, তাঁরাও আবার পড়েন গোলকধাঁধায়—যখন দেখেন হাজার হাজার রমণী নিয়ে কৃষ্ণ ঘর করছে, সংসার করছে, আবার বিশেষ করে ব্রাহ্মণ দেখলে, সসম্মানে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের হাতে তার পা ধুইয়ে-মুছিয়ে দিচ্ছে, সেবা করছে। ব্রাহ্মণরা কুণ্ঠা বোধ করলেও দেখে, সেই সেবায় কৃষ্ণের সে কি আন্তরিকতা। বুঝি-বা স্বয়ং ঈশ্বরই গেছেন কৃষ্ণের কাছে। সব সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে, যাতে ব্রাহ্মণের কোন অসুবিধে না হয়। তিনি যেন সন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারেন।

সাধারণ মানুষ এই সব দেখে শুনে পড়ে গোলকধাঁধায়। কিন্তু চোখ খুলে যারা শান্ত মন নিয়ে কৃষ্ণের এই সব দেখে, তারা মনে মনে নররূপী ভগবান বলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

যে যাই ভাবুক, ভোজ আর অন্ধক বংশের সকলেই এক বাক্যে কৃষ্ণের আধিপত্য মেনে নিয়ে তাঁকে তখন তাদের রাজা বলে মেনে নিয়েছে। দ্বারকার রাজা কৃষ্ণ। যে তাঁর অনুগামী, যে তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার কাছে কৃষ্ণ যেন কল্পতরু।

একবার সপরিবারে এক ব্রাহ্মণের দিন কাটছিল মহা দুর্দশা আর অভাব অনটনের মধ্যে। ব্রাহ্মণের নাম শ্রীদাম। থাকত মথুরায়, এত অভাব তাদের যে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া তো দূরের কথা, পরার কাপড়ও জুটত না। ব্রাহ্মণ থাকত একটা ট্যানা পরে। আর ব্রাহ্মণী কোন রকমে একখণ্ড কাপড় গায়ে মাথায় জড়িয়ে থাকত।

এত অভাব, তবু ব্রাহ্মণ কারো কাছে যাবে না, হাত পাতবে না, মুখ ফুটে কারো কাছে গিয়ে কিছু বলবেও না। নিজের ইচ্ছেয় যে যেটুকু দিয়ে গেল তাতেই খুশি। যেন অনেক পাওয়া হয়ে গেল—এত আনন্দ।

এমন ভাবেই কেটে যাচ্ছিল, তাদের দিন। একদিন ব্রাহ্মণী আর সহ্য করতে পারল না। গায়ের কাপড়টা শতছিদ্র হয়ে গেছে, পেটেও কদিন ধরে প্রায় কিছু নেই বললেই চলে। ঘরেও এমন কিছু সম্বল নেই যে মন স্থির থাকে। ব্রাহ্মণ তো নিজে কোথাও যাবে না, খালি বসে বসে 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' করে। এদিকে নজরও নেই। একে কি বেঁচে থাকা বলে? না, এভাবে বেঁচে থাকা যায়? আর থাকতে না পেরে ব্রাহ্মণকে বলল—অন্য কারো কাছে না যাও তো, দ্বারকায় যেতে আপত্তি কি?

—কেন? প্রশ্ন রাখে ব্রাহ্মণ।

—শুনলাম, দ্বারকায় এখন রাজা হয়েছে কৃষ্ণ। সে তো তোমার বিশেষ বন্ধু। বন্ধু রাজার কাছে গিয়ে আমাদের অভাবে কথা জানাতে আপত্তি কি?

—কৃষ্ণের কাছে গিয়ে জানাব আমাদের অভাবের কথা? কি বলছ তুমি ব্রাহ্মণী? কৃষ্ণ যে কে, তা আমার ছোটবেলাতেই জানা হয়ে গেছে। ওঁর কাছে গিয়ে আমি এসব কথা বলতে পারব না। বলল ব্রাহ্মণ।

—আশ্চর্য মানুষ তুমি! বাইরের কোন মানুষের কাছে গিয়ে কিছু বলতে বলছি না। বলছি, বন্ধুর কাছে গিয়ে বলতে। বন্ধুর কাছে গিয়েই তো বন্ধু দুঃখ-কষ্টের কথা বলে। তোমার সেখানেও সঙ্কোচ? যদি জানতাম কৃষ্ণ বন্ধুবৎসল নয়, কারো কথা শোনে না, নিজের স্বার্থ ছাড়া চলে না, তাহলে অবশ্যই একথা তোমায় আমি বলতাম না।

ব্রাহ্মণ ভাবে, একটুও বেঠিক কথা বলে নি ব্রাহ্মণী। কৃষ্ণ কতখানি বন্ধুবৎসল, তার মত আর কজন তা জানে? সেই জন্যই তো তাঁর কাছে গিয়ে এসব কথা বলতে তার মনে এত সঙ্কোচ জাগছে।

ব্রাহ্মণী নাছোড় দেখে, অগত্যা রাজি হল ব্রাহ্মণ।—বেশ, কৃষ্ণের কাছে না হয় গেলাম। এখন সে রাজা। জান তো রাজদর্শন শুধু হাতে হয় না। তোমার ভাঁড়ারে কি আছে যা আমি ভেট হিসেবে নিয়ে যাব। অনেক ভেবে-চিন্তে ব্রাহ্মণী বলল—দাঁড়াও দিচ্ছি।

এই বলে ভাঁড়ার থেকে শেষ সম্বল চার মুঠো চিঁড়ে ব্রাহ্মণের চাদরের খুঁটে হাসতে হাসতে বেঁধে দিয়ে বলল—এটাই নিয়ে গিয়ে দেবে। এছাড়া তো আমাদের আর কিছু নেই।

ব্রাহ্মণও তা জানে। কিন্তু এই চার মুঠো চিঁড়ে নিয়ে রাজদর্শন!

ব্রাহ্মণীর পীড়াপীড়ি। উপায় নেই। বাধ্য হয়ে সামান্য চিঁড়েটুকু নিয়েই যেতে হল দ্বারকার দিকে। যাচ্ছে আর ভাবছে ব্রাহ্মণ—সেই গুরুগৃহ থেকে পাঠশেষে বেরিয়ে এসেছে তারা। ইতিমধ্যে

পৃথিবীতে কত কাণ্ডই না ঘটে গেল। চারদিকে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কতদিন ছাড়াছাড়ি। কৃষ্ণ এখন রাজা। কত মানুষের চোখের মণি। এখন আরো কত না সুন্দর হয়েছে তাঁকে দেখতে। এই ময়লা ট্যানা-পরা হাড়-জিরজিরে তার সেই পাঠশালার বন্ধুকে কি সে এখন চিনতে পারবে ?

এই রকম নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় শ্রীদাম এসে পড়ল দ্বারকায়। ঢুকে পড়ল প্রাসাদে। অনেকেই দেখল। কিন্তু কেউ তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করল না, বাধাও দিল না। বরং সকলেই যেন সসম্ভ্রমে পথ করে দিল। অবাক লাগে শ্রীদামের, ব্যাপার কি ? সে তো আর জানে না, কৃষ্ণ দ্বারকার প্রতিটি মানুষকে শিখিয়েছে ব্রাহ্মণকে সমাদর করতে। শ্রীদামের গলায় ঐ পৈতেটা দেখেই তাই সকলে তাকে সমীহ করে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

প্রাসাদে ঢুকে শ্রীদাম পড়ল আর এক দফা লজ্জায়। চারদিকে মণি-রত্ন, নানা অলঙ্কার প্রাসাদে ঝলমল করছে। চারদিকে আলো, কোথাও এতটুকু অন্ধকার নেই। কৃষ্ণ রয়েছে এরই মধ্যে। কিভাবে এই অবস্থা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে তার সামনে ? তবু এসে যখন পড়েইছে, তখন দেখা না করে ফিরে যাওয়াটাও ঠিক হবে না।

এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে খুঁজতে এক সময় শ্রীদাম দেখা পেল কৃষ্ণের। পত্নী রুক্মিণীর ঘরে তাঁর পালঙ্কে মেজাজে শুয়ে কৃষ্ণ। পায়ের কাছে বসে রুক্মিণী। গল্পে মাতোয়ারা।

শ্রীদাম দেখেই থমকে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। দীর্ঘদিন পর কৃষ্ণকে আর লক্ষ্মীর মত রুক্মিণীকে দেখে আবেগে তার বুকটা কুলকুল করে উঠল।

শ্রীদামকে দোরগড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৃষ্ণ চোখের পলকে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে দু-হাত দিয়ে নিজের বুকে শ্রীদামকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—বন্ধু ! বন্ধু, তুমি এসেছ ? ভেবেছিলাম, আমাকে বুঝি তোমরা ভুলেই গেছ।

বন্ধুর কি মধুর সেই আলিঙ্গন ! শ্রীদামের দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চিনতে না পারা তো দূরের কথা, এতদিন ধরে দেখা-সাক্ষাৎ না করার জন্য আবার এ কি মধুর অভিযোগ !

তারপর একরকম টানতে টানতেই কৃষ্ণ শ্রীদামকে নিয়ে এসে বাসল রুক্মিণীর সেই পালঙ্কে, যেখানে সে শুয়ে ছিল। তারপর তাড়াতাড়ি নিয়ে এল জলপাত্র। সযত্নে নিজের হাতে ধুইয়ে দিল তার পা। মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিল। রুক্মিণীও সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিল পাখা নিয়ে ব্রাহ্মণকে হাওয়া করতে।

অনেকখানি পথ হেঁটে আসতে হয়েছে ব্রাহ্মণের। শ্রান্তি অবশ্যই একটু হয়েছিল। হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেবার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী যে নিজের হাতে এভাবে তার সেবা-পরিচর্যায় লেগে পড়বে, তা ভাবতে পারে নি শ্রীদাম। আর যারা ছিল, তারাও তা দেখে শ্রীদামের মতই অবাক হয়েছিল।

কৃষ্ণের আলিঙ্গনেই দূর হয়ে গিয়েছিল শ্রীদামের ক্লান্তি। তার ওপর এই সেবা-পরিচর্যা। আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল শ্রীদামের বুক। ভাবল, এত ঐশ্বর্য নিয়ে যে এমন ভাবে তাকে দর্শন দিল, কি করে এই চার মুঠো চিঁড়ে সে তাকে দেবে দর্শনের ভেট হিসেবে ! তাই শ্রীদাম তা আর বের না করেই ছলছলে চোখে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণের দিকে। যেন ভুলেই গেল তার আসার উদ্দেশ্য !

শ্রীদামকে যথারীতি আপ্যায়ন করে রুক্মিণীর সামনেই কৃষ্ণ শুরু করে দিল শৈশবের স্মৃতিচারণ।

—ওঃ, কতদিন পর তোমায় দেখলাম শ্রীদাম, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা···আচ্ছা শ্রীদাম, তোমার সেসব দিনগুলোর কথা মনে আছে ? যখন আমরা এক সঙ্গে পাঠ নিতাম সন্দীপন মুনির কাছে ? ক···ত···দি···ন হয়ে গেল, তাই না ? আচ্ছা, শ্রীদাম, মনে পড়ে সেই···সেই দিনটার কথা ? গুরু-মা বললেন, ঘরে কাঠ নেই। কাঠ না আনলে রান্না হবে না। আমরা দুজনে গেলাম কাঠ যোগাড় করতে। ঢুকেছিলাম গহন এক বনে। কাঠ-কুটো যোগাড় করে আনতে যাব এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ এসে ঢেকে দিল আকাশ। উঠল ঝড়, নামল তুমুল বৃষ্টি। সূর্য ডুবে গেল। চারদিক ঢেকে গেল অন্ধকারে। পথ হারিয়ে ফেললাম আমরা। পাছে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ি তাই যে যার হাত ধরলাম। তার ওপর কাঠের ঝোলা তুলে নিয়ে ঝড় কাটিয়ে আসতে লাগলাম। পায়ের নীচে তখন জলের বন্যা বইতে শুরু করেছে। ঝড় ভেদ করে আসে কার সাধ্য ? তবু আমরা হাত ছাড়াছাড়ি না করে সেই অন্ধকারেই আন্দাজ করে আসছিলাম। মনে পড়ছে শ্রীদাম, সবাই আমরা খিদেয় ঝড়ে জলে প্রায় কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিলাম, তবুও আমরা কেউ কারো হাত ছাড়ি নি, কাঠও ফেলি নি—মনে পড়ছে ?

সে-সব দিনের কথা কি ভোলা যায়, না কেউ ভুলতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণের কথায় আবার তা ভেসে ওঠে শ্রীদামের চোখের সামনে ছবির মত।

সারাটা রাত সেই বনের মধ্যে ঝড়-জল মাথায় নিয়ে আর হাতে কাঠের বোঝা নিয়ে কাটাতে হয়েছিল তাদের। কষ্ট হয়েছিল খুবই।

—তারপর···তারপর মনে পড়ছে শ্রীদাম ? সকাল হতে না হতেই গুরুদেব নিজে বনের মধ্যে ঢুকে সাড়া দিতে দিতে এলেন আমাদের কাছে ! এসে আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে কি বলেছিলেন মনে আছে শ্রীদাম ?

মনে থাকবে না ? সে কি ভোলা যায় ? বলেছিলেন—বৎসগণ ! অপূর্ব তোমাদের গুরুভক্তি। সার্থক শিষ্য তোমরা। গুরুর ওপর এই ভক্তি না থাকলে কি জ্ঞানলাভ করা যায় ? তোমাদের জ্ঞান অক্ষয় হোক, অমর হোক।

—এই দেখেছ, জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছলাম। বিয়ে-থা করেছ ? ঘর-সংসার ?

ঘাড় নাড়ল ব্রাহ্মণ।

—বেশ করেছ। আমাদের আবার ঘর-সংসার ! তারপর রুক্মিণীর দিকে একবার তাকিয়ে বলল ব্রাহ্মণকে—তা হ্যাঁ ভাই, তুমি যে এলে বাড়ি থেকে, বন্ধুর জন্য কি নিয়ে এলে ? দাও, দিচ্ছ না যে ?

ইতস্তত করতে লাগল শ্রীদাম। কেমন করে ঐ চার মুঠো চিঁড়ে সে তুলে দেবে কৃষ্ণকে।

—কি, দিতে লজ্জা হচ্ছে ? আরে, বন্ধুর কাছে বন্ধুর লজ্জা ? এ আবার কি কথা ভাই। দাও,দাও।

তবুও শ্রীদামকে ইতস্তত করতে দেখে কৃষ্ণ চট করে হাত ঢুকিয়ে দিল তার চাদরের ভেতর। টেনে বের করে আনল চাদরের খুঁট। বলে উঠল—এই তো ! ভেবেছিলে, লুকিয়ে রেখে পার পেয়ে

যাবে ? খোল; খোল—বলতে বলতে নিজেই ফাঁস খুলে ফেলে যেন আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল—দেখ, দেখ রুক্মিণী, বন্ধু আমার জন্য কি এনেছে, দেখ ! বলেই সোল্লাসে এক মুঠো চিঁড়ে নিয়ে মুখে ফেলে, যেই আর এক মুঠো নিতে গেল, বাধা দিল রুক্মিণী। বলল—দোহাই তোমার। ঐ এক মুঠোই যথেষ্ট। এর পরেও যদি খাও, তাহলে আমার আর রেহাই থাকবে না। মুচকি হেসে কৃষ্ণ বাকিটা রেখেই দিল।

সাধারণের চোখে নিছক ছেলেমানুষী। কিন্তু ভরে উঠল শ্রীদামের মনপ্রাণ। সব সঙ্কোচ নিজেই কেমন এক মুহূর্তের দূর করে দিল কৃষ্ণ। সামান্য চিঁড়ে, যার কোন মূল্যই নেই, কেমন তৃপ্তি সঙ্গে নিয়ে খেল তার সামনে। এমন বন্ধু জোটে কজনের ভাগ্যে ?

শ্রীদামের সে রাত দ্বারকাতেই কেটে গেল, কৃষ্ণের কাছে। প্রাণ ভরে খাওয়াল কৃষ্ণ। প্রায় সারারাত ধরে কত পুরনো কথাই না হল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারল না সে কৃষ্ণকে তার অভাবের কথা, অভাব-অনটনের কথা। শ্রীদামের যেন মনেই ছিল না।

পরদিন সকাল হতেই বিদায় নিল শ্রীদাম। দ্বারকাপুরীর অনেকখানি পথ কৃষ্ণ নিজে এল তার সঙ্গে। তারপর ব্রাহ্মণ-সখা শ্রীদামকে প্রণাম করে, বিদায় জানিয়ে আবার ফিরে এল নিজের প্রাসাদে।

আবার পাড়ি দিতে হবে অনেকখানি পথ। বন্ধুর অহঙ্কারহীন ভালবাসা তোলপাড় করছে তার মনকে। আচ্ছন্ন শ্রীদাম। কোথা দিয়ে কিভাবে যে হেঁটে চলেছে, খেয়ালই ছিল না তার। গ্রামের সীমানায় পৌঁছতেই যেন চমক ভাঙল। সে কি—এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল ? এতখানি পথ যে হাঁটল, তার জন্য কোন অবসাদও তো আসছে না ?

নিজের ঘরের দিকে যাবার পথ ধরল শ্রীদাম। কিন্তু ঘরের কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল সে। নিজের ঘরে যাবার পথ—নিজের ঘরের জায়গা তো কোনদিনই ভুল হবার নয়। হোগলা-ছাওয়া সেই মাটির ঘর কোথায় গেল ? ভাল করে দেখল একবার আশপাশ। সেই পুরনো বটগাছ, সেই ঝোপ—না, জায়গাটা তো ভুল হয় নি। তাহলে এখানে এই তল্লাট জুড়ে এমন একটা প্রাসাদ কোথা থেকে এল ? এমন উপবন, গাছে গাছে পাখির কূজন, এমন সরোবর ! টলমল জলে ভাসছে পদ্ম ! প্রাসাদ থেকে ভেসে আসছে মধুর গান। রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেউড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ।

রাতারাতি এই জায়গাটা এমন মনোরম হয়ে উঠল কি করে ? কে এখানে এই রাতেই তৈরি করে ফেলল এত বড় প্রাসাদ ? তার ঘর, তার ব্রাহ্মণী কোথায় গেল ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে ব্রাহ্মণ, হঠাৎ অপ্সরীর মত কতকগুলি তরুণী এসে প্রণাম জানিয়ে তাকে ভেতরে আসতে বলল। শ্রীদাম তো আরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এমন সময় দেখল, ঠিক লক্ষ্মী প্রতিমার মত এক রমণী আকুল হয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে, প্রণাম করল।

রমণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রীতিমত হতবাক ব্রাহ্মণ শ্রীদাম। এ যে তার সেই ব্রাহ্মণী। শতছিদ্র এক টুকরো কাপড়ে যাকে ঢেকে রেখে সে গিয়েছিল দ্বারকায় ! যাবার আগে কৃষ্ণকে দেবার জন্য যে শেষ সম্বল চার মুঠো চিঁড়ে দিয়েছিল।

এ যে রীতিমত অভাবনীয় ব্যাপার। শ্রীদাম তাহলে নিজের জায়গাতেই এসেছে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে প্রাসাদে ঢুকে আসবাবপত্র দেখে আর এক দফা অবাক হল শ্রীদাম। দেখতে দেখতে আর যেন সে দেখতে পাচ্ছে না—দু-চোখ তার ভরে গেছে জলে ! মনে মনে বিড় বিড় করে চলেছে—না চাইতেই তুমি এত দিলে জনার্দন ? কিন্তু কি করবো এত নিয়ে ?

শ্রীদাম ব্রাহ্মণের হঠাৎ এইভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠায় সকলেই একটু অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল, এরপর শ্রীদামের পা আর মাটিতে পড়বে না।

কিন্তু ভুল হয়ে গেল সকলের ধারণা। এত বিষয় এত সম্পদ—তবু সকলে দেখল, তার জন্য এতটুকু অহঙ্কার নেই ওদের কারো মনেই। আগেও যেমন ছিল সাদামাটা, এখনও ঠিক তেমনি—পরিবর্তন হয় নি কোথাও এতটুকু। নেই কোন লোভ, কোন দম্ভ। দু-চোখে অবিরত ঝরে চলেছে জলের ধারা। আর মুখে—মাধব-মাধব ! জনার্দন…জনার্দন !

এভাবেই জীবনের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী চলে গেল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বৈকুণ্ঠে।



পাগল ব্রাহ্মণের পরিণতি

বহুকাল আগেকার কথা।

মালব দেশে (রাজস্থানের কাছে) থাকত এক ব্রাহ্মণ। জাতে ব্রাহ্মণ হলে কি হবে, ব্রাহ্মণের কোন গুণই ছিল না তার মধ্যে। চাষবাস আর ব্যবসা-বাণিজ্য করে অঢেল ধনসম্পদ উপার্জন করেছিল সে। টাকাকড়ির ওপর এতই মোহ জন্মে গিয়েছিল তার যে দিন-রাত তার ছিল শুধু ঐ এক চিন্তা—কি করে আরো বেশি রোজগার হয়, কি করে টাকা আরো বেশি বাড়ে। মাথা ঘামালেই কৌশল বের হয়। ব্রাহ্মণের মাথায় গজাতে থাকে নিত্য-নতুন কৌশল। আর ঘরে আসতে থাকে টাকার ওপর টাকা, তার ওপর টাকা। শেষ নেই যেন টাকা আসার।

যত টাকা আসে, সে নিজেও হয়ে ওঠে তত কৃপণ। কেউ কিছু দান-টান করার কথা বললেই খেঁকিয়ে উঠত ব্রাহ্মণ—এত কষ্ট করে রোজগার করছি খয়রাতি করার জন্য ? রোজগার করে দেখ না, কেমন মজা লাগে, কত সহজ ! তারপর দান কোরো।

বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন। কিন্তু টাকার কাছে কেউ নয় তার

আপনজন। সকলকেই অবিশ্বাস। এই বুঝি তার সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিল! আপদে-বিপদে জ্ঞাতিরা এলে ফিরে যেত নিরাশ হয়ে। নিয়ে যেত শুধু ব্রাহ্মণের মুখের সমবেদনা। যার যত আপদ-বিপদই আসুক, আর সে যত নিজের লোকই হোক, ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে জল গলায় সাধ্য কার।

সকলেই ক্রমে ক্রমে বীতস্পৃহ হয়ে উঠতে লাগল তার ওপর। আড়ালে-আবডালে, এমন কি অনেকে সামনা-সামনি মন্তব্য করতে শুরু করে দিল—ব্রাহ্মণ না ছাই, ব্যাটা কেপ্পনের রাজা…চশমখোর…দেখতে মানুষ হলে কি হবে, এক নম্বর যক্ষ। এ রকম আরও সব মন্তব্য কানে আসে ব্রাহ্মণের। আমলই দেয় না। বড়জোর হয়ত বলে—রোজগারের তো মুরদ নেই, তাই অপরের দেখে চোখ টাটায়! তা টাটাক, আমার কি?

ব্রাহ্মণের আচারে-আচরণে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ব্যবহারে ক্রমশই সকলের চক্ষুশূল হয়ে উঠতে লাগল সে। তবুও তার সে কি দম্ভ আর অহঙ্কার! ধরা তার কাছে যেন একটা সরা।

ক্রমে ক্রমে যারা এতদিন ছিল ব্রাহ্মণের আশেপাশে, তারা সরে যেতে লাগল তার কাছ থেকে। প্রতিবেশীরা নাম উচ্চারণ করা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে লাগল। বলতে লাগল—খবরদার, ভুলেও ওর নাম করিস না। যে হাঁড়ি ঘরে আছে, তাও ফেটে যাবে।

যুবক ব্রাহ্মণ, তার ওপর টাকার গরম। বেপরোয়া। কে এল, কে গেল সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই তার। একটা দিকেই শুধু তীক্ষ্ণ নজর—তা হল টাকা। সেটা যাতে কোন রকমে বেফাঁসেও বেরিয়ে না যায়, তার লক্ষ্য সেদিকে সজাগ। তার ওপর জমানো। জমতে জমতে ইতিমধ্যে প্রায় পাহাড় হয়ে গেছে, তবু আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, লোভেরও শেষ নেই।

শেষে ব্রাহ্মণের এমন অবস্থা হল যে বিশ্ব-সংসারে তার একমাত্র পরম আত্মীয় হয়ে রইল টাকা। সে আর টাকা। টাকা আর সে।

এমনি যখন অবস্থা, ব্রাহ্মণের ওপর নেমে এল চরম সর্বনাশ। হঠাৎ একদিন বাড়িতে গেল আগুন লেগে, পড়ল ডাকাত। যদিও ডাকাতের দলে জ্ঞাতিরাই ছিল বেশি, কিন্তু তখন ব্রাহ্মণ আর কাকে চিনতে পারবে? ঘর-বাড়ি গেল পুড়ে। যথাসর্বস্ব লুটপাট হয়ে গেল। এতদিন ধরে শরীরকে কষ্ট দিয়ে যা জমিয়েছিল তার আর ছিটেফোঁটাও থাকল না।

হায় হায় করে উঠল ব্রাহ্মণ। এ যেন তার কাছে মৃত্যুরই সামিল। আর সে সামর্থ্যও নেই যে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। ঐ কষ্ট স্বীকার করে আবার অর্থ রোজগার করবে।

বেশ কয়েকদিন ধরে নিঝুম বসে বসে ভাবল ব্রাহ্মণ। কেন এমন হল? ধাক্কা না খেলে কোন কোন মানুষের চৈতন্যোদয় হয় না। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও হল ঠিক তাই। এবার সে অন্যভাবে ভাবতে শুরু করল—কেন এমন হল?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও পেয়ে গেল মনের মধ্যে।

ঠিকই হয়েছে। যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে।

কত জন্ম সাধনা করলে তবে মানুষ-জন্ম পাওয়া যায়। আবার মানুষ জন্মের মধ্যে কত পুণ্য সঞ্চয় করলে তবে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করা যায়। সেই বংশে জন্মে, ব্রাহ্মণ হয়ে এতদিন ধরে সে কি ব্রাহ্মণের কাজ করেছে? সে কি নিজেকে নিঃস্বার্থ লোভহীন রাখতে পেরেছে? মানুষের কল্যাণ কামনা করেছে? না। সে ছিল স্বার্থপর, লোভী। একবারও সে ভাবে নি পাঁচ জনের কথা। যা রোজগার করেছিল তা সমান ভাবে সকলের মধ্যে ভাগ না করে নিজে ভোগ করতে চেয়েছিল। তাই ভোগও হল না। সামান্য টাকা নিয়ে, সামান্য সম্পত্তি নিয়ে কত সংসারে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, মা-ব্যাটার সম্পর্ক তেতো হয়ে উঠেছে, বন্ধুতে বন্ধুতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে—এসব দেখেও এতদিন তার চোখ খোলে নি কেন? এই অনর্থের পেছনে এতদিন ধরে কেন ছুটোছুটি করে মরল?

নিজেকেই নিজে এবার যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিল ব্রাহ্মণ। ঠিক করল, এবার আর ঐ অর্থ নয়, সেই অর্থ রোজগার করার জন্য প্রাণপাত করবে, যা কেউ কখনো চুরি করে নিতে পারবে না।

ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে লোটা-কম্বল, কমণ্ডলু আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ দেশ ছেড়ে বিবাগী হয়ে। কোন এক তীর্থস্থানে গিয়ে স্নান সেরে মাথা মুড়িয়ে, গেরুয়া পরে, হাতে দণ্ড নিয়ে হয়ে গেল একেবারে পুরো এক সন্ন্যাসী। নিল মৌনব্রত। স্থির করল, জীবনের আর যে কবছর আছে, ঈশ্বরের নাম ছাড়া অযথা আর বাক্যব্যয় করবে না। সেই সঙ্গে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ করার জন্য কঠোর তপস্যা করবে। হবে পরিব্রাজক। কোন এক স্থানে থাকবে না।

সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণের শুরু হল আবার এক জীবন। আজ এ-গ্রাম, কাল সে-গ্রাম—মৌন সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কেউ ভিক্ষা দিলে সেদিন যা হোক দু-মুঠো আহার জোটে। বেশির ভাগ জোটে লাঞ্ছনা। কেউ ভণ্ড বলে তাড়িয়ে দেয়, কেউ কেউ আবার দণ্ড কমণ্ডলু লোটা কম্বল কেড়ে নেয়। আবার ফেরত নিতে যেই হাত বাড়ায়, অমনি সরিয়ে নিয়ে হেনস্তা করে। কোথাও-বা মানুষেরা তাকে চোর বলে নগর থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেয়। কোথাও-বা শোনে কটূ মন্তব্য—'বক ধার্মিক'! কেমন কথাটি না বলে চুপ করে সব দেখছে দেখ। ব্যাটা সুযোগ পেলেই টুপ করে ঝেড়ে নিয়ে পালাবে! কোথাও-বা নদীর ধারে সারাদিনের মত আহারে বসেছে, কোথা থেকে পাপিষ্ঠের দল এসে খাবারের ওপরই দিল মুতে। যেখানেই যাক নির্যাতন আর নিপীড়নের শেষ নেই। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাকে কেউ রাগিয়ে দিতেও পারল না, মৌনব্রতও ভাঙাতে পারল না। সব কিছুই সে হাসি মুখে মেনে নিতে লাগল, যেন তার প্রাপ্যই সে পাচ্ছে।

এমনি ভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। অনেক বয়স হয়েছে এখন ব্রাহ্মণের। আগেকার সেই মনের চিহ্নটুকুও এখন আর তার মধ্যে কেউ খুঁজে পাবে না। শরীরের কোন কষ্টই আর তার কষ্ট বলে মনে হয় না। মনে আসে না আগের মত সেই 'আমি' 'আমি' ভাব। জাগে না আগের মত সেই 'আমার'…'আমার' বলে আগলে রাখার স্পৃহা। আর এক নতুন জন্ম যেন ব্রাহ্মণের। কোন ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই, লালসা নেই। এ বিশ্ব সংসারে যেন কেউ তার শত্রুও নয়, মিত্র নয়। আপন মনে, আপন আনন্দে এমন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যে দেখলে মনে হবে বুঝি-বা এক পাগল।

মাঝে মাঝে আপন মনে হাসে ব্রাহ্মণ আর বলে ওঠে বেশ কিছু মানুষজন দেখলে—ওরে জ্ঞানের আলোয় মনটাকে কর পরিষ্কার। লাভ হবে তোর পরম অর্থ, ক্ষয় নাইকো যার।

লোকে বলত 'পাগলা সাধু'।

এভাবে পরম তৃপ্তি নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আর বলতে বলতে একদিন শেষ হল তার ঘোরা, শেষ হল তার বলা।

পরম বিশুদ্ধ মন নিয়ে ব্রাহ্মণ চলে গেল এতদিন ধরে যা সঞ্চয় করল তা নিশ্চিন্তে ভোগ করতে।

সে চলে গেল বটে, কিন্তু তখন তাকে ঘিরে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিল তাদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল পাগলা সাধুর সেই দু-কলি গান—'ওরে জ্ঞানের আলোয় মনটাকে কর পরিষ্কার। লাভ হবে তোর' পরম অর্থ, ক্ষয় নাইকো যার।'



নারদ মুনির ইতিকথা ও ভাগবত

ঢেঁকিবাহন নারদ—নারদ মুনি।

সৌম্য, সুদর্শন। গলায় তুলসীর মালা দুই হাতে ওপরে-নিচে দুগাছা করে তুলসীর বালা। হাতে বীণা। হাসি যেন লেগেই আছে মুখে। রাগ কাকে বলে যেন জানাই নেই তাঁর। আর বয়স? যত বয়সই হোক না কেন, সাধ্য কি বার্ধক্যের যে ছাপ বসিয়ে দেয় তাঁর দেহে!

অবাধ গতি তাঁর সর্বত্র। দেবলোকের এমন কোন দেবতা নেই যে নারদ মুনিকে ভাল না বাসে। কিন্নর, গন্ধর্বলোকেও তাঁর যাওয়ার কোন বাধা নেই। এমন কি অসুরলোক, যারা ঘোরতর দেববিরোধী, সে যত প্রবল পরাক্রান্তই হোক না কেন, সেখানেও নারদের অবাধ গতি। ত্রিভুবনে যত প্রলয় কাণ্ডই ঘটুক না কেন, নারদ মুনির কিন্তু কোথাও বাধা নেই যাতায়াতের। হাতের বীণায় টুং টুং করে সুর তুলে যেখানেই হাজির হোন না কেন, সেখানেই তাঁর সমান খাতির যত্ন, আপ্যায়ন। আড়াল থেকে কেউ বলে—ভারি কুটিল, কেউ বলে—ভারি সরল, কেউ বলে—ঝগড়া লাগাবার একখানি, কেউ বলে—আহা, ওর মুখে নারায়ণের নাম শুনলে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। এমনি কত না মন্তব্য গুণগুণ করে নারদকে ঘিরে। কিন্তু যেই হাসি-মুখে সামনে এসে দাঁড়ান নারদ মুনি, সব যেন গলে জল।

যেখানে সমস্যা, সেখানেই নারদ মুনি'। কিভাবে যে জানতে পারেন কে জানে? হুস করে ঢেঁকি নিয়ে নেমে পড়েন সেখানে। তারপর এমন সব কথা শুনিয়ে দিয়ে যান সব সমস্যা যায় উবে। মনে হয়, এত সহজ সরল ব্যাপারটা নিয়ে মিছামিছি এতক্ষণ ধরে মাথা ঘামাচ্ছিল কেন তারা?

কুরুক্ষেত্রের কাছে সরস্বতী নদীর তীরে মনোরম এক আশ্রম।



মহামুনি, জ্ঞানী মহর্ষি ব্যাসদেবের আশ্রম। ছোট ছোট ঢেউ তুলে কুল কুল করে বয়ে চলা নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন মহর্ষি। তাঁরও মাথায় অগণিত চিন্তার ঢেউ, সরস্বতীর মতই বয়ে চলেছে।

জগতে সব কিছুই একটা নিয়ম মেনে চলে। নিয়ম ভাঙলেই সর্বনাশ।

ব্যাসদেবও বহুদিন ধরে, বহু শাস্ত্র ঘেঁটে মানুষের জন্য তেমনি তৈরি করেছিলেন নানারকম নিয়মকানুন, যা মেনে চললে মানুষ জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ হবে, উন্নত হবে। এক কথায় মানুষই হবে দেবতা। সব মানুষ তো আর সমান নয়। তবু মিলেমিশে থাকে সবাই এক জায়গায়, যাকে বলে সমাজের মধ্যে। সকলের জন্য ব্যাসদেব তৈরি করেছিলেন নিয়মকানুন, যা মেনে চললে, সব রকমের মানুষই থাকবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, সমাজ চলবে গড়গড়িয়ে।

চলছিলও এত দিন তাই। হঠাৎ দেখলেন, হাওয়া বইতে শুরু করেছে উলটোদিকে। সবাই যেন কেমন বেপরোয়া হয়ে গেছে। কেউ আর যেন কাউকে মানতে চায় না। মানতে চায় না নিয়মকানুন। অনুশাসনের কথা বললে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। শাস্ত্র যে তারা কেউ অনুশীলন করে নি, তা নয়। মূর্খ যে, তাও নয়। তবু এই বিপর্যয় আসছে কেন? কোন ভাবেই কি আর মানুষে মানুষে মিল করানো যাবে না? এই রেষারেষি, হিংসা-কলহ কি বন্ধ করা যাবে না?

মানুষের যিনি উন্নতি চান, সামাজকে যিনি ভালবাসেন, তাঁর মাথায় এ চিন্তা আসা স্বাভাবিক। ব্যাসদেবও তাই চিন্তায় আকুল হয়ে নিজের আশ্রমে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে চলা সরস্বতীর দিকে।

এমন সময় সেখানে হাজির হলেন ঢেঁকিবাহন নারদ মুনি।

ব্যাসদেব শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। বসবার আসন দিলেন। বেশ আরাম করে নারদ বসলেন আসনে।

তারপর বললেন—দেখে মনে হচ্ছে, কি যেন খুব ভাবছ! কি এত ভাবছ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাসদেব বললেন—ভাবছি মুনি, এ কি যুগ এল? কোন শাস্ত্র কেউ আর মানতে চায় না। সবাই যেন পণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যার যা খুশি, তাই করে চলেছে। এতদিন ধরে, এত

সাধনা করে মানুষের জ্ঞানলাভের জন্য যে শাস্ত্র তৈরি করলুম, তা সবই যে আমার চোখের সামনেই নষ্ট হয়ে যেতে বসল, মুনি। তাই ভাবছি, এ থেকে মানুষের পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই?

শুনে বীণার তারে টুং টুং করে একটু সুর তুলে মুনি বললেন—তোমার মত পণ্ডিত-ঋষির ভাববারই কথা।

—শুধু আমি কেন? তুমিও তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছ, দেখছ কত অনাচারে দেশ ছেয়ে গেছে। তোমার মনে ভাবনা জাগে না, নারদ?

এক মুখ হেসে আবার সুর তুললেন নারদ বীণায়। বললেন—নারায়ণ, নারায়ণ! দেখছি বৈকি। ভাবিও। ভাবি, ব্যাসঠাকুর সকলকে পণ্ডিত করে দিয়ে কি সর্বনাশটাই না করল।

—জ্ঞানী হয়ে ওঠায় সর্বনাশটা কোথায় দেখলে মুনি? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ব্যাসদেব।

—দেখ ঠাকুর, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। ঐ বেদ, সংহিতা, স্মৃতি, কি সব শাস্ত্র আছে না, আমি ও সব কিছুই পড়ি নি, জানিও না। তবে একটা কথা বুঝি, দুটো বাঘ কি এক গুহায় থাকে?

—না। তা থাকে না।

—তাহলে, সবাই যদি পণ্ডিত হয়ে ওঠে, এক জায়গায় থাকবে কেন? শাস্ত্রের কচকচানি, আর চাপান-উতরোন চালালে কি ঝগড়া লাগবে না? ঝগড়া লাগলে কি মনের মিল থাকবে?

মোক্ষম কথা বলেছেন নারদ, ভাবেন ব্যাসদেব। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষকে জ্ঞানী করে তুলতে, তার জায়গায় সকলেই হয়ে উঠেছে পণ্ডিত। জ্ঞানী হলে তার মন হবে উদার; সকলকে সে দেবে তার সমান মর্যাদা। মনের মধ্যে তার থাকবে না কোন হিংসা, কারোর ওপর কোন রাগ। কোন লোভের বশীভূত সে হবে না। যদিও তিনি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, কিন্তু এখন দেখছেন, মানুষজন তাঁরই শাস্ত্রের বচন নিয়ে নিশ্চিন্তে কেমন আজে-বাজে অর্থ করে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করে চলেছে।

ব্যাসদেবকে কোন জবাব দিতে না দেখে মুনি বললেন—কি গো ঋষি, এই মুখ্যুটার কথা শুনে মনে যেন বড় ধাক্কা খেলে বলে মনে হচ্ছে?

—নারদ, বারবার নিজেকে মুখ্যু বলে আমায় লজ্জা দিচ্ছ কেন? তোমার মত জ্ঞানী এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে? নইলে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তোমাকে অত ভালবাসেন কেন? বললেন ব্যাসদেব।

—ঠাকুর, সত্যি করে বলছি, তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্য আমি ও কথা বলি নি। বিশ্বাস কর, লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগই আমি পাই নি। তবু নারায়ণ যে আমায় ভালবাসেন তার কারণ, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। তোমাকে আর নতুন করে কি বলব? রাজার রাজা রাজাধিরাজের কাছে কেউ যদি গিয়ে বলে, ওগো, তুমিই আমার বাবা-মা, সব কিছু, আমি তোমার কাছেই এলাম—রাখতে হয় রাখো, মারতে হয় মারো—তখন রাজাধিরাজ কি তাকে ঠেলে ফেলে দেবে? তাহলে শোন, বলি আমার কথা। বলতে শুরু করলেন নারদ।

—ঠাকুরের দয়ায় আমার পূর্বজন্মের কথা আমি ভুলি নি। আমি ছিলাম দাসীর ছেলে। আমার মা বেদজ্ঞ এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করত। খুব সাদামাটা। আমি তখন খুব ছোট, চার-পাঁচ বছর বয়স হবে। বর্ষাকাল। বাইরে বের হবার উপায় নেই। বেশ কিছু যোগী-ঋষির সমাগম হল। তাঁদের দেখে আমার তখনই এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, খেলাধুলো ছেড়ে সব সময় থাকতুম তাঁদের কাছে। সেবা-শুশ্রূষা করতুম, ফাই-ফরমাস খাটতুম। ওঁরা বসে বসে কৃষ্ণকথা আলোচনা করতেন, আমি শুনতুম। কেন যেন, সকলকে সমান চোখে দেখলেও, ঋষিরা আমাকে একটু বেশি ভালবাসতেন। তাই সব সময় কাছে কাছে থাকার অনুমতিও পেয়েছিলুম। কাছে কাছে থাকি, সেবা-শুশ্রূষা করি, আর কৃষ্ণ-কথা শুনি। সেই বয়সেই ঐ সব কথা যেন আমাকে কাচপোকার মত টেনে রাখত। শুনতে না পেলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। শুনতুম, আর ভাবতুম। যত ভাবতুম, ততই যেন দেখতুম, মানুষরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মনকে ভালবাসায় ভরিয়ে দেবার জন্য কি বিচিত্র লীলাই করে চলেছেন। ঋষিরা একদিন খাওয়া শেষ করে উঠে গেছেন, পাতে কিছু এঁটো ভাত-তরকারি পড়ে আছে। দাসীর ছেলে আমি, উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়ার অধিকার আমার নেই। কিন্তু সেদিন মনে মনে খুব ইচ্ছে জাগল। ঋষিরাও অনুমতি দিলেন, আমিও খেলুম। মনে হল, যেন অমৃত খেলুম।

—কেটে গেল বর্ষা, শরৎ। চলে গেলেন ঋষিরা। আমি থেকে গেলাম আগের মতই মায়ের কাছে, ব্রাহ্মণের বাড়িতেই। কিন্তু কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। খালি মনে হতে লাগল, দূর ছাই, ছুটে যাই কোথাও, যেথায় গেলে কৃষ্ণ পাই। কিন্তু মায়ের একমাত্র ছেলে আমি, তার স্নেহ কাটাই কেমন করে? ঠাকুরের এমনি দয়া যে, তাও একদিন কেটে গেল। ভোরবেলা উঠেই মায়ের কাজ ছিল গাই দুইতে যাওয়া। যাবার পথে মায়ের পা পড়ল আচমকা এক সাপের ঘাড়ে। আর সাপও দিল বিষ ঢেলে। আমিও মুক্তি পেয়ে গেলুম। বেরিয়ে পড়লুম এই সুযোগে ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে। কোথায় যাব, তাও জানি না। কোথায় যাচ্ছি, তাও জানি না। কত গ্রাম, নগর, নদ-নদী, পাহাড়, কত খেত-খামার যে পার হয়ে চললাম তার ঠিক নেই। চলতে চলতে এসে ঢুকলাম এক বনে। ভীষণ বন। তার উপর কাঁটা গাছে ভরতি। তেষ্টাও পেয়েছিল। সরোবরের জলে গা-হাত ধুয়ে জল খেয়ে ভাবলাম, এখানে বসে আপাতত একটু জিরিয়ে নিই। বসার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা ভেতরে যেন কুলকুল করে উঠল। তারপর এমন তন্ময় হয়ে গেলাম যে, কোথায় বসে আছি তাও ভুলে গেছি। খিদে তেষ্টা সব ভুলে গেছি, কতখানি সময় ধরে বসে আছি, তাও ভুলে গেছি। বসে আছি চোখ বুজে। হঠাৎ মনে হল, আমার ভেতরে এক সঙ্গে জ্বলে উঠল অনেক, অনেক আলো। রং-বেরং-এর যে কত আলো, কত বিচিত্র নাচন। তারপর মনে হল, নাচতে নাচতে সব কটা আলো এক সঙ্গে মিশে গিয়ে হয়ে গেল ঠিক যেন সকালের একটা সূর্য। শীতকালে রোদে পিঠ রেখে বসে থাকলে যেমন ভারি মিষ্টি লাগে সেই রোদ, সূর্যের সেই আলোও তেমনি মিষ্টি। তার মধ্যেই আবার দেখলাম তাঁকে। পরনে পীতবসন, গলায় বনমালা। আর কি মধুর হাসি! আমার মনে ভরে গেল আনন্দে। সে যে কি আনন্দ ঠাকুর, তা মুখে বলা যায় না।…কিছুক্ষণ। তারপর মিলিয়ে গেল কোথায়। আর দেখতে পেলাম না। খুব কষ্ট হতে লাগল। আবার চোখ বুজে বারবার চেষ্টা করলাম দেখবার জন্য। দেখতে না পেয়ে খুব কান্না পেল। এমন সময় শুনলাম আকাশবাণী—এ জন্মটা তুমি আকুলতা

নিয়ে কাটাও। পরজন্মে তুমি আমার সহচর হবে।

—জানো ঠাকুর, তারপর থেকে যে কবছর বেঁচে ছিলাম, সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে করে। সেই দেহটা চলে যাবার পর উনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। আমার হাতে তুলে দিলেন এই দেবদত্ত বীণা। পেলাম নতুন শরীর।

—এখন এই বীণা নিয়েই ঘুরে বেড়াই ঠাকুর স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। বীণা দিন-রাত শোনায় আমায় নারায়ণের নাম। আমিও ঘুরি মনের আনন্দে তাঁরই গান গেয়ে। আমার নেই কোন শত্রু, আমার নেই কোন মিত্র। সবাই আমার আপন, সকলের কাছেই আমি আপন।

নিজের ইতিকথা শুনিয়ে বীণায় টুং টুং আওয়াজ তুলে চলে গেছেন ঢেঁকিবাহন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যাসদেব। আর কোন অস্থিরতা নেই তাঁর মনে।

মনে মনে ব্যাসদেব বললেন—ধন্য তুমি নারদ। তোমার ঐ ভক্তিই তোমায় দিয়েছে জ্ঞান। তাই তো তুমি হতে পেরেছ জগৎ-স্রষ্টা নারায়ণের সহচর।

ভক্তি···ভক্তি···ভগবানের ইতিকথা। ভাল বাংলায় যাকে বলে ভাগবতকথা, সব মানুষেরই তা শোনার খুব আগ্রহ। সকলের আগ্রহ যাতে বেশি, একমাত্র সে-ই পারে, সকলকে একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে চলতে। সৃষ্টি হল আর এক অমর গ্রন্থ 'ভাগবত'।



গজরাজ ও কুমীরের কাহিনী

ক্ষীরসমুদ্র ঘেরা ত্রিকূট পাহাড়।

পাহাড় বলতে যা বোঝায়, খালি পাথর, বনজঙ্গল আর হিংস্র প্রাণীর আবাস, এই ত্রিকূট (এখানেই ছিল লঙ্কার রাজা রাবণের রাজধানী) কিন্তু তা ছিল না। যেন সব কিছু দিয়ে সাজানো বিশাল এক বাগান। উঁচুতেও দশ হাজার যোজন, আবার বিস্তারেও তাই। পাহাড়ের ছিল তিনটে চুড়ো—একটা সোনার, একটা রুপোর আর একটা লোহার। আর হেন মণি-মুক্তো নেই, যা ঐ পাহাড়ে ছিল না। নদ-নদী, ঐ পুকুর-সরোবর, নানা রকমের ফল-ফুলের গাছ, বন, উপবন—ত্রিভুবনে এমন মনোরম পাহাড় বুঝি আর কোথাও ছিল না।

একদিন এক বিশালকায় গজরাজ তার স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল বন থেকে। মদমত্ত হাতির দল খেলা শুরু করল গাছেদের সঙ্গে। খেলা তো নয়, গাছেদের প্রাণ যাওয়া। কত যে গাছ তাদের শুঁড়ে উপড়ে পড়ল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মাথার ওপর রোদ। রোদের প্রখর তাপ। তারই মধ্যে খেলতে খেলতে এক সময় দুরন্ত পিপাসা পেয়ে গেল তাদের। তার ওপর গায়ের চামড়াও জ্বালা-জ্বালা করতে শুরু করল। একটু স্নান করে আর খানিকটা জল না খেলে তো আর চলে না।

জলের খোঁজ করতে করতে গজরাজ কিছুটা আসতেই দেখল বিশাল এক দিঘি। কাচের মত স্বচ্ছ জল টলটল করছে। দেখে গজরাজের সে কি আনন্দ! স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল জলে। শুঁড় দিয়ে শুষে জল তুলে নিয়ে ফোয়ারার মত ছিটিয়ে দিতে শুরু করল এ-ওর গায়ে। সে আর এক মজার খেলা। জল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা যেন শেষ আর হতে চায় না। তারপর এক সময় ঠাণ্ডা হল গায়ের জ্বালা। পেট পুরে জল খেয়ে ফোঁস করে তৃপ্তির শ্বাস ফেলে পাড়ে উঠে গেল ছেলেদের নিয়ে তাদের মা। কিন্তু গজরাজ যেই উঠতে যাবে, অমনি কোথা থেকে একটা কুমীর এসে কামড়ে ধরল তার পা। হকচকিয়ে গেল গজরাজ। তারপর থামের মত ছুঁড়ল সজোরে। যে পায়ের ঘায়ে পাহাড় ধসে পড়ে। আশ্চর্য, কুমীরের কামড় কিন্তু ছাড়ল না। বরং আরো শক্ত হয়ে জেঁকে বসল কামড়। সেই সঙ্গে টান পড়তে লাগল জলের দিকে।

খুবই বেকায়দায় পড়ল গজরাজ। রেগে ছাড়তে লাগল ভীষণ চিৎকার। জলের মধ্যে গজরাজকে ঐ অবস্থায় দেখে ছুটে এল ছেলেরা। শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে চেষ্টা করল বাবাকে টেনে কোন রকমে পাড়ে তুলে আনতে। কিন্তু না পেরে পাড়ে দাঁড়িয়ে শুরু করে দিল কান্নাকাটি। তাই দেখে হস্তিনীরও সে কি আর্তনাদ, আর হা-হুতাশ!

এদিকে কুমীর করল কি—টানতে টানতে গজরাজকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল দিঘির মাঝে, আর গজরাজও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল কুমীরকে টেনে তুলে আনতে। দুজনের সেই টানাটানি যুদ্ধ চলল সমানে। যত পশু সেখানে ছিল, সবাই সব কিছু ভুলে দেখতে লাগল সেই অবাক কাণ্ড। শুধু পশুরা কেন—সিদ্ধ, কিন্নর, গন্ধর্ব, দেবতা যে যেখানে ছিল সবাই দেখতে লাগল।

প্রাণ বাঁচানোর এই লড়াইয়ে কেটে গেল এক হাজার বছর। না পারে কুমীর গজরাজকে কায়দা করতে, আবার গজরাজও পারে না কুমীরকে টেনে তুলে শেষ করতে। কুমীর জলের জীব। সে না হয় আরো লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু জলের মধ্যে গজরাজ আর কতদিন পারবে? শেষে নিরুপায় হয়ে সে একমনে ডাকতে শুরু করল নারায়ণকে।

গজরাজের সেই আকুল-করা ডাক উপেক্ষা করতে পারলেন না নারায়ণ। সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ থেকে গরুড়ের পিঠে চেপে সুদর্শন চক্র নিয়ে এলেন সেখানে। স্বয়ং নারায়ণ আসছেন দেখে দেবতাদেরও খুব কৌতূহল হল। ব্যাপার কি? একটা হাতি আর একটা কুমীরের লড়াই হচ্ছে, তা সেখানে নারায়ণ কেন চলেছেন সুদর্শন হাতে!

নারায়ণ এসেই সুদর্শন চক্র ছুঁড়লেন কুমীরের মুখ লক্ষ্য করে। অব্যর্থ চক্র কুমীরের মুখ থেকে গজরাজকে মুক্ত করে ফিরে এল আবার নারায়ণের হাতে।

এদিকে ঘটল এক অবাককাণ্ড।

সবাই দেখল, কোথায় সেই গজরাজ আর কোথায়ই বা সেই কুমীর। তার জায়গায় সুদর্শন দুই সহচর যেন দাঁড়িয়ে নারায়ণের

তারপর আস্তে আস্তে দেবতাদের সামনে খুলে গেল রহস্যের আবরণ।

সকলেই জানল, এই কুমীর আর কেউ নয়, সেই বিখ্যাত গন্ধর্ব হুহু, দেবলোক যার গান শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত।

দেবল ঋষি একবার তাঁর পত্নীদের সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেলে হুহু তামাসা করে একবার জলের নীচে তাঁর পা টেনে ধরেছিল। তাতে ঋষি খুব রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, কুমীর হও। হুহু খুব ভয় পেয়ে গিয়ে দেবলের পা জড়িয়ে ধরে অনেক অনুনয়-বিনয় করে ছিল। তখন ঋষিই তাঁকে এই সুযোগ দিয়েছিলেন।

ওদিকে গজরাজ ছিলেন আসলে পাণ্ড্যদেশের (দক্ষিণ ভারতের তিনেবেল্লী জেলা) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি ছিলেন আবার পরম বিষ্ণুভক্ত। একবার বিষ্ণুর ধ্যানে তন্ময় ছিলেন রাজা, কখন যে শিষ্যদের নিয়ে অগস্ত্য মুনি এসেছেন তাঁর কাছে, জানতেও পারেন নি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুনি যখন দেখলেন রাজা তাঁদের কোন আপ্যায়ন করলেন না, রেগে গিয়ে দিলেন অভিশাপ—এত অহঙ্কার তোর মূর্খ! তুই হাতি হয়ে জন্মা গে! অভিশাপ শুনেই চমক ভেঙে গিয়েছিল রাজার। কিন্তু মুনি আর সেখানেই নেই দেখে কি আর করেন। মনে মনে বিষ্ণুকেই চিন্তা করতে লাগলেন।

ঋষির অভিশাপ বিফলে যাবে না। মৃত্যুর পর তাই হাতি হয়েই তাঁকে জন্মাতে হয়েছিল। তার সংস্কার জন্মান্তর হলেও যাবে কোথায়? তাই বিপদের সময় মনে মনে হাতি সেই নারায়ণকেই স্মরণ করেছিল। তাই তো বৈকুণ্ঠ থেকে ছুটে আসতে হয়েছিল নারায়ণকে, তাঁর ভক্তকে মুক্ত করার জন্য।

মুক্তি পেলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। মুক্তি পেল সেই সঙ্গে গন্ধর্ব হুহু।



অজামিলের কাহিনী

মানুষ বা পশু—যে যেমনই হোক না কেন, হোক না সে রাজা-উজির, ভিখারি-ফকির, হোক না যতই সে মহাপুরুষ বা কাপুরুষ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে মরতে তাকে একদিন হবেই। আর বেঁচে থাকার সময় এখানে যে যেমন কাজ করবে, মরার পর সেই রকম ফল তাকে ভোগ করতেই হবে।

জন্মালেই কাজ করতে হবে। একেবারে দম দেওয়া ঘড়ির কাঁটার মত ঘুরতেই হবে। দম দেওয়া কলের পুতুল যতক্ষণ দম শেষ না হচ্ছে, যেমন নেচেই চলে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে, মানুষও ঠিক তাই। জন্মানোর পর থেকেই সে দম-দেওয়া ঐ পুতুলের মত। প্রথমে মায়ের কোলে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে, তারপর একটু বড়



হতেই কেউ বা শুরু করে লেখাপড়া, কেউ বা অভাবে হয়ে যায় বাউণ্ডুলে। লেখাপড়া শিখে বিদ্বান, পণ্ডিত হয়ে কেউ শুরু করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, কেউ বা হয়ে যায় এত অমায়িক, দেখলে মনেই হবে না যে সে এক বিরাট পণ্ডিত। কেউ শুরু করে খুন-জখম, চুরি-ডাকাতি—কেড়ে নেয় মানুষের চোখের ঘুম, মনের শান্তি; কেউ বা যা রোজগার করে দু হাতে দেয় বিলিয়ে, নিজের সুখের দিকে ফিরেও তাকায় না। অনেকে আবার নিজে গরিব হলে কি হবে, আর্ত আতুর দেখলেই নিজের কথা ভুলে, তার কষ্ট দূর করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনিভাবে নানারকমের নানা কাজের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে যার দম যত ফুরিয়ে আসে, সে ততই নির্জীব হয়ে পড়ে। তারপর, দম একেবারে ফুরিয়ে গেলে কলের পুতুল যেমন ধপাস করে পড়ে যায়, ঘড়ির কাঁটা আর টিক টিক শব্দ তুলে নড়ে না, মানুষেরও হয় ঠিক সেই রকম অবস্থা। মরে যায়। তখন কাউকে দেওয়া হয় চিতার আগুনে পুড়িয়ে, কাউকে আবার মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে দেওয়া হয় পুঁতে। পৃথিবীতে আর তাকে দেখা যাবে না।

পৃথিবীতে দেখা গেল না ঠিকই, কিন্তু একেবারে কি অদৃশ্য হয়ে যায় সে? ভোরবেলা সূর্য উঠল, সন্ধে হলে সূর্যকে আমাদের আকাশে আর দেখা গেল না। তাই বলে কি সূর্যকে আর দেখা যায় না কোথাও? আমাদের আকাশে যখন অন্ধকার, পৃথিবীর আর এক আকাশে তখন শুরু হয়েছে সূর্যের খেলা।

আমাদের জীবনটাও ঠিক তাই। এখানে শেষ হলে কি হবে, শুরু হল আর এক রাজত্ব—যে রাজ্যের রাজা হলেন যমরাজ। তিনি আবার সেখানে দিয়ে দিলেন দম, শুরু করালেন খেলা। সে খেলা আবার আর এক রকমের। পৃথিবীতে থাকার সময় ভাল কাজ করলে, ভাল ব্যবহার করলে, সকলের কাছেই খাতির-যত্ন মেলে। কিন্তু চুরি ডাকাতি খুন জখম রাহাজানি বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করলে শাস্তি মেলে, আদালত থেকে অল্পদিনের জন্যে কারাবাস, দীর্ঘদিন বা যাবজ্জীবন কারাবাস। আবার কারাবাসকালে কারো জন্যে নির্দিষ্ট

থাকে রাজভোগ, কারো ভাগ্যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এক থালা ভাত, কারো বা আবার হয় ফাঁসি—যমের রাজত্ব, যার নাম নরক, সেখানেও শুরু হয় তারই রেশ ধরে নানা রকমের খেলা। সেই খেলাকে আমরা বলি নরক-যন্ত্রণা। খারাপ কাজ যারা এখানে করে, নরক-রাজ্যে গিয়ে তাদের তো যন্ত্রণার শেষ থাকে না। আবার ভাল কাজ করে এখানে যারা সম্মান পেয়েছে, খুব ভাল করে যমরাজ আবার তাদের খতিয়ে যদি দেখেন, পৃথিবীতে এমন কোন কাজ তিনি করেন নি, যা মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, তাহলে সেখানেও তিনি তাঁকে খাতির করে পাঠিয়ে দেন ভাল জায়গায়, নয়ত একটু-আধটু কষ্ট দিয়ে ছেড়ে দেন। মিটিয়ে দেন সেখানকার খেলা।

এমনি ভাবে বেশ চলছিল জীবন নিয়ে নানা ধরনের খেলা। কিন্তু একদিন এই খেলায় গোলমাল বাধিয়ে দিল অজামিল।

সদাচারী, সৎ আর পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দেশ বলতে সে সময় যে কটি দেশ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল কান্যকুব্জ (কনৌজ)। অজামিল এই দেশেরই এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে। খুবই মেধাবী। অল্প বয়সেই বাবার কাছে পড়াশুনা করে সব শাস্ত্রেই বেশ সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিল সে। সেই সঙ্গে যাগ-যজ্ঞের কাজেও কাজেও। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তার সঙ্গে ঈশ্বরে যাদের বিশ্বাস থাকে, তাদের মন হয় উদার। দুই-দুই ভাব তাদের মধ্যে আদৌ থাকে না। তাদের মধ্যে দয়া-ক্ষমা-মমতা এসব গুণগুলো এত বেশি থাকে, সে যে সকলকেই মুহূর্তে আপন করে নেয়। অজামিলেরও ছিল সব কটি গুণ। তাই সকলেই তাকে খুব ভালবাসত। বিয়ের বয়স হলে, বাবা একটি সুলক্ষণা টুকটুকে মেয়ে দেখে বউ করে নিয়ে এলেন ঘরে। যাগ-যজ্ঞ-হোম নিয়ে সুখের সংসার।

হঠাৎ একদিন কান্যকুব্জের মানুষরা দেখল, তাদের অত প্রিয় অজামিলের মধ্যে কেমন যেন সব গরমিল হয়ে বসে আছে।

দেখে-শুনে সকলেই তো অবাক—এমন হয় নাকি?

অজামিলের বাবা একদিন পাঠালেন বনে যজ্ঞের জন্য যজ্ঞ ডুমুরের ডাল (সমিধ) সংগ্রহ করে আনতে। সেখানে গিয়ে খুবই নিচু জাতের একটা মেয়ের সঙ্গে এমনি ভাব হয়ে গেল অজামিলের যে ঘর-সংসার এমন কি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে তার সঙ্গে ঘরকন্না শুরু করে দিল। লজ্জায় বাবার মাথা হেঁট হল, স্ত্রী কত চোখের জল ফেলল, তবু অজামিলকে আর ফিরিয়ে আনতে পারল না।

কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গেল অজামিলের সর্বনাশ। নিচু জাত। না আছে তাদের আচার-বিচার, না আছে ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান। সভ্যতা-ভব্যতা কাকে বলে, তা-ও তারা জানে না। সব সময়েই ধেনো মদ আর অনাসৃষ্টি নিয়ে থাকে তারা। অজামিলও একেবারে মিশে গেল তাদের সঙ্গে। যা কিছু শিখেছিল, সব গেল ভুলে। শুরু করে দিল মদ খাওয়া, পাশা খেলা, চুরি, লোক ঠকানো। না করলে সংসারই বা চলবে কেমন করে? অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখলে এক সময় যে নিজে কাতর হয়ে উঠত, এখন কাউকে বিপাকে ফেলে কষ্ট দিতে, যন্ত্রণা দিতে কি আনন্দই না পায় সেই অজামিল। কনৌজের মানুষরা আর অজামিলের মুখ পর্যন্ত দেখে না। তাতে অজামিলের মনে কোন দুঃখও নেই, লজ্জাও নেই। লেখাপড়া শিখে, শাস্ত্র পড়ে অজামিল জেনেছিল, দান, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থ ভালবাসাই হল ধর্ম। এখন সে শিখল, সেই কথায় আছে, 'এই পৃথিবী ঢোঁকার টাটি, খাই-দাই আর মজা লুটি', ঠিক তাই। ধেনো মদের মজা, পরের জিনিস চুরি করে এনে ভোগ করার মজা—কি মজা এখন অজামিলের! এখন সে দশটি ছেলের বাবা। অজামিল তাঁর ছোট ছেলেটার নাম দিয়েছিল—নারায়ণ। আর, কেন যেন, সব কটি ছেলের চেয়ে তাকেই সে খুব ভালবাসত। চলতে ফিরতে হুট করে কিছু দরকার পড়লে, সে ছোট ছেলেকেই ডাকত—নারায়ণ, নারায়ণ, শোন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেও ছুটে আসত বাপের কাছে।

এমনি ভাবে চলতে চলতে, একদিন দম ফুরিয়ে এল অজামিলের। আশি বছর বয়স হল তার। ঘড়ির দম ফুরোতে থাকলে যেমন টিক্ টিক্ শব্দের জোর কমে আসে, কাঁটা চলে আস্তে আস্তে, তারপর শব্দ শোনা যায় না, কাঁটাও যায় থেমে, অজামিলেরও এল সেই অবস্থা।

যে কোন মুহূর্তে বুকের ধুকধুকানি বন্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে তার খেলা ফুরিয়ে গেছে। চোখ বুজে পড়ে আছে সে। হঠাৎ দেখল কোথা থেকে চারজন কিম্ভূতকিমাকার লোককে। কারা যেন বিকট মুখ করে এসে দাঁড়াল তার সামনে—মিশমিশে কালো, খাড়া খাড়া গায়ের লোম, হাতে পাশ। লম্বা লম্বা হাতে তারা যেন ধরতে আসছে তাকে। ভয়ে অজামিল গোঁ গোঁ করতে করতে ডেকে উঠল তার ছোট ছেলেকে—নারায়ণ, নারায়ণ! অমনি কোথা থেকে অন্য যেন চারজন এসে রুখে দাঁড়াল ঐ কিম্ভূতকিমাকারদের। এরা দেখতে ছিল ভারি সুন্দর। প্রত্যেকের পরনে হলুদ ছাপানো কাপড়, গলায় বনমালা, চারটে করে হাত, হাতে সবার তীর, ধনুক, অসি, শঙ্খ, চক্র, পদ্ম।

বাধা পেতেই খেপে উঠল কিম্ভূতকিমাকারের দল—কারা তোমরা, আমাদের কাজে বাধা দিতে এলে? জানো, আমরা যমরাজার অনুচর। এখানে যারা মরবে, তারা আগে যাবে আমাদের রাজার কাছে?

মৃদু হেসে সেই সুবেশধারী চারজন বলল—জানি, কিন্তু অজামিল তোমাদের রাজ্যে যাবে না।

—ওকে আমরা নিয়ে যাব, আমাদের রাজার আদেশ! আমরা বৈকুণ্ঠবাসী নারায়ণের সহচর।

ওদের পরিচয় শুনে একটু থমকে দাঁড়াল যমদূতেরা। নারায়ণকে অবজ্ঞা করে এমন সাধ্য কারো নেই।

—কিন্তু, আপনারা কেন এলেন? আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল যমদূতেরা—এর মত চরিত্রহীন, লম্পট, অনাচারী পাপীর স্থান তো আমাদের নরকরাজ্যে।

—তা ঠিক। বললেন নারায়ণ সহচরেরা—তোমরা কি শুনেছ, শেষ মুহূর্তে কি রকম আকুল হয়ে অজামিল নারায়ণকে ডেকেছিল? আমাদের ঠাকুর তা শুনেই তো, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

—সে তো ওর ছেলেকে ডেকেছিল?

—ছেলেই হোক, আর যে-ই হোক, মরার কালে যে আকুল হয়ে 'নারায়ণ' বলে ডাকে, সে যত পাপীই হোক, তাকে তোমাদের নিয়ে যাবার কোন অধিকার নেই। তোমাদের রাজাকে গিয়ে এ কথা বলো গে। তিনি ঠিক বুঝবেন।

এই বলে তারা অজামিলের প্রাণটাকে নিয়ে চলে গেল বৈকুণ্ঠে। আর আপসোস করতে করতে ফিরে গেল যমদূতেরা।



বরাহ-হিরণ্যাক্ষ সংগ্রাম কাহিনী

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ, যাদের ভয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ছিল অস্থির, প্রহ্লাদের আকুল আহ্বানে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধরে বধ করেছিলেন হিরণ্যকশিপুকে। যমজ দু-ভাইয়ের মধ্যে হিরণ্যকশিপু মারা গেলে, দৈত্যরাজ হল হিরণ্যাক্ষ।

সিংহাসনে বসেই হিরণ্যাক্ষ বেরিয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ে। শৌর্যে-বীর্যে হিরণ্যকশিপুর তুলনায় এও কিছু কম যায় না। আবার বেজে উঠল রণডঙ্কা। দৈত্যসৈন্যরা তুলল রণহুঙ্কার। স্বয়ং ভগবানকে দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন দেবতারা। ইন্দ্র আবার দেবরাজ হয়ে সুখভোগ করছিলেন। আর সব দেবতারাও যে যার রাজ্যে আবার কাল কাটাচ্ছিলেন সুখে। সকলেরই টনক উঠল নড়ে, বুক উঠল কেঁপে। বীর যোদ্ধা হিরণ্যাক্ষ যেখানেই যায়, দেখে কেউ আসে না তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে, পালিয়ে যায় কিংবা খাতির করে। দেবরাজ্যে ঠিক একই অবস্থা। গদা হাতে ভীমকায় হিরণ্যাক্ষকে সদলবলে আসতে দেখেই ইন্দ্র থেকে শুরু করে সব দেবতারাই ফাঁকে-ফোকরে গা ঢাকা দিয়ে বসলেন। রাজত্ব দখল হল বটে, কিন্তু তৃপ্ত হল না হিরণ্যাক্ষ। অসুর হলেও এসেছিল সে ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধ করে রাজ্য জয় করতে। তা না হয়ে বিনা যুদ্ধেই যদি রাজ্য জয় হয়ে যায়, তাহলে কি বীরের আশা মেটে?

হিরণ্যাক্ষ যখন এইভাবে দাপাদাপি করে চলেছে, তার কিছু আগেই বিশাল প্রলয় হয়ে গেছে। প্রবল বান-বন্যায় ডুবতে ডুবতে গাছপালা নিয়ে পৃথিবীর মাটি চলে গেছে একেবারে রসাতলে। নিশ্চিহ্ন মর্ত্যলোক, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এতটুকু চিহ্ন ছিল না তার কোথাও। পৃথিবী যে রসাতলে চলে গেছে স্রষ্টা ব্রহ্মার তা খেয়ালই ছিল না। নিজের মনে তিনি তখনও সৃষ্টিই করে চলেছেন।

মনু মহারাজদের মধ্যে প্রথম হলেন স্বায়ম্ভুব মনু। এঁরা হলেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি—মহারাজাধিরাজ। এঁরাই ঠিক করে দেন সব নিয়মকানুন, যা মেনে চলতে পৃথিবীর সব মানুষই বাধ্য। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবকে সৃষ্টি করেই ব্রহ্মা নির্দেশ দিলেন ধরণীকে ধারণ কর, পৃথিবীকে এমন ভাবে শাসন কর, যাতে প্রজারা সুখে শান্তিতে থাকে। ব্রহ্মার আদেশ, পৃথিবী পালন করতে হবে। কিন্তু, কোথায় পৃথিবী! সে তো গেছে রসাতলে। এতটুকু মাটি কোথাও নেই, যেখানে তার প্রজারা বসবাস করবে। ব্রহ্মাকে সে কথা বলতেই চমকে উঠলেন ব্রহ্মা। তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই তো। তাঁর প্রধান সৃষ্টিই তো চলে গেছে জলের তলায়। মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন ব্রহ্মা। জগৎ-পালক ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে ছাড়লেন এক দীর্ঘশ্বাস। যেই ছাড়লেন দীর্ঘশ্বাস, অমনি তার নাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি শূকর—ছোট্ট একটি কীটের মত। বেরিয়ে এসেই সঙ্গে সঙ্গে সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে থাকল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন বিরাটকায় হয়ে উঠল যে দেখলেই রীতিমত অবাক হতে হয়। যখন নাকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, তখন ছিল প্রায় এক আঙুল। আর দেখতে দেখতে হাতির আকার! ধবধব করছে সাদা দাঁত, বিশাল বিশাল গায়ের লোমগুলো এমন খাড়া যে দেখলেই মনে হয়, যেন এক একটা বর্শার ফলা। লাল টকটকে চোখ যেন লাটুর মত ঘুরছে। তার ওপর কি বিকট ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ! গলার আওয়াজেই যেন আকাশ কেঁপে উঠল। স্বয়ং ব্রহ্মা তো বটেই, মরীচি, সনক প্রভৃতি ঋষিরা এমন কি মনু মহারাজ পর্যন্ত তা দেখে অবাক। এ কি অসম্ভব বিস্ময়কর কাণ্ড। যদি ভগবান নারায়ণ নিজে কোন অলৌকিক শক্তি ঘটাতে না চান তাহলে এমনটা কিভাবে সম্ভব। সবাই যখন এরকম ভাবছেন, দেখলেন, সেই বরাহ (শূকর) এগিয়ে চলেছে নাক নিচু করে কিসের যেন গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে। তারপর, সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে। বিশাল আলোড়ন তুলল সমুদ্র। সবাই দেখলেন স্পষ্ট দু-ভাগে যেন ভাগ হয়ে গেল সমুদ্রের জল, আর দেখা যেতে লাগল তার ভেতরের মাটি। বরাহ যেন দাঁত দিয়ে চিরে দিল সমুদ্রের বুক। এরপর বরাহ ঠিক তেমন ভাবেই নাক দিয়ে কিসের যেন গন্ধ নিতে নিতে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল রসাতলে! সেখানে গিয়েই জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া পৃথিবীকে দাঁতে করে তুলে ধরল। এসব দেখার পর আর কারো সন্দেহ রইল না যে ব্রহ্মার মনোকষ্ট দূর করার জন্য ভগবান বিষ্ণু নিজে বরাহের রূপ ধরে নেমে এসেছেন। জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে ব্রহ্মার মুখ রাখার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতায়, শ্রদ্ধায় ভরে উঠল সকলের বুক।

সেই বরাহমূর্তি যখন জলের নীচে ঐভাবে দাঁতে করে ধরেছিল পৃথিবীকে, হিরণ্যাক্ষ সেই সময়েই গিয়েছিল স্বর্গরাজ্যে। শুধু রাজ্য জয় নয়, রীতিমত যুদ্ধ করতে। যখন দেখল কেউ নেই স্বর্গে, সব পালিয়েছে, তখন রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সে এল সমুদ্রের রাজা বরুণদেবের কাছে।

শক্তিশালী বরুণদেব। অগণিত তার জলচর সেনা। হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রে ঢুকেই বীর বিক্রমে শুরু করল তার ভীম গদা চালাতে। জলচর-সেনারা প্রতিরোধ করবে কি, ভয়েই অস্থির। যে যার প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। এগোতে এগোতে হিরণ্যাক্ষ লোহার গদা হাতে এল বিভাবরীতে। বিভাবরী হল বরুণদেবের পুরীর নাম। সেখানে এসেই হিরণ্যাক্ষ পুরীতে ঢুকতে ঢুকতেই হুঙ্কার ছাড়ল—কোথায় বরুণ? সে-ও কাপুরুষের মত পালিয়েছে নাকি?

বরুণদেব কিন্তু পালান নি। হিরণ্যাক্ষকে ঢুকতে দেখেই তিনি বলে উঠলেন—আরে এসো, এসো। কি ব্যাপার?

বরুণদেবকে দেখে হিরণ্যাক্ষ বিদ্রূপের সুরে বলল—পেন্নাম হই অধিরাজ। যাক, শেষ পর্যন্ত আপনাকে যে দেখতে পেলাম এটাই

আমার সান্ত্বনা।

—সান্ত্বনা কেন? মৃদু হেসে বললেন, বরুণদেব।

—স্বর্গে গেলাম। ভেবেছিলাম, মহাবল সব দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, একটু মুলাকাত করব, তা আশ্চর্য! কাউকেই দেখতে পেলাম না। সবাই পালিয়েছে। শেষে ভাবলাম, দেখি, আপনাকে পাওয়া যায় কিনা! আপনি নিশ্চয়ই ওদের মত কাপুরুষ হবেন না। হাজার হোক, আপনি একাই তো একবার আমাদের যত আত্মীয়স্বজন ছিল, তাদের বধ করে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। ঠিক তেমনিভাবেই বলল হিরণ্যাক্ষ।

—বেশ, বেশ, তা আমার দর্শনে কেন হিরণ্যাক্ষ।

—দেখুন অধিরাজ, আমরা হলাম বীরের জাত। যুদ্ধ না করলে আমরা ঠিক তৃপ্তি পাই না। তা যত জায়গা ঘুরে এলাম, কোথাও সে আশা মিটল না। তাই এলাম আপনার কাছে। দেখাই যখন পেলাম, আমার আশটা একটু মিটিয়ে দিন। আপাতত একটুকু তৃপ্তি তো অন্তত পাব যে, দেবতাদের মধ্যে একজন প্রকৃত বীরের সঙ্গে আমি লড়াই করছি।

—ওঃ, এই কথা! তবু তার জন্যে এত কষ্ট করে তুমি এখানে এলে? তাহলে, একটা কথা তোমায় বলি হিরণ্যাক্ষ, শোন। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্য আমি করতে পারি। কিন্তু তাতে তোমার আশ মিটবে?

—কেন? একজন বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে আশ না মেটার কারণ?

—দেখ, তুমি তো শুধু বীর নও, মহাবীর। আর আমাদের মধ্যে মহাবীর হলেন বিষ্ণু, যিনি তোমাদের প্রচণ্ড শত্রু, তোমার ভাই হিরণ্যকশিপুকে যিনি মেরেছেন। তাঁর সঙ্গেই তোমার যুদ্ধ করা মানায়, কি বল?

বরুণদেবের কথা শুনে একটুখানি ভাবল হিরণ্যাক্ষ। লাল হয়ে উঠল তার মুখ। তারপর বলল—ঠিক, ঠিক কথা বলেছ তুমি। তোমাদের মত চুনোপুঁটির সঙ্গে লড়াই করে আমার আশ মিটবে না। তোমাদের ঐ কুটিল মহাবীরের সঙ্গেই যুদ্ধ করব।

এই বলে হিরণ্যাক্ষ কাঁধে লোহার গদা নিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এল বরুণদেবের পুরী থেকে। ছুটল বিষ্ণুর খোঁজে।

তন্ন তন্ন করে হিরণ্যাক্ষ যখন খুঁজে বেড়াচ্ছে বিষ্ণুকে, হঠাৎ পথে দেখা তাঁর নারদ মুনির সঙ্গে।

—এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ হিরণ্যাক্ষ? জিজ্ঞেস করেন নারদ।

—হ্যাঁ, তোমাদের সেই শয়তান ঠাকুরটা কোথায়, দেখতে পাচ্ছি না কেন।

—ও, তুমি আমাদের নারায়ণ ঠাকুরকে খুঁজছ? তা এখানে তাঁকে কোথায় পাবে?

—কেন? কোথায় সে?

—দেখ গে, রসাতল থেকে এখন পৃথিবী উদ্ধার করছে।

—পৃথিবী উদ্ধার করছে? তাহলে মুলাকাতটা বেশ ভালই জমবে। বলেই হিরণ্যাক্ষ নারদকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উল্কার বেগে ছুটে এসে দেখে, চতুষ্পদ এক বরাহ দাঁতে করে তুলে ধরে রয়েছে পৃথিবীকে।

প্রথমে একটু হতাশ হয়ে পরক্ষণেই আবার সজাগ হয়ে উঠল সে। সে জানে, নানারকম বেশ ধরতে দেবতারাও তো তাদের তুলনায় কম পটু নয়; বিশেষ করে আবার বিষ্ণু! ভাইকে মারার সময় কি অদ্ভুত এক পশুর বেশই না ধরেছিল!

কাঁধে গদা নিয়ে দাঁড়াল হিরণ্যাক্ষ বরাহের সামনে।

তারপর প্রায় গর্জন করার মত করে বলে উঠল—ভয়ে তো সবাই সরে পড়েছে। তুইও এখানে এসে জলজন্তু শুয়োর সেজে ভেবেছিস রেহাই পাবি? আবার বীরত্ব! দাঁতে পৃথিবী তুলে ধরে বীরত্ব দেখাচ্ছিস? কোন্ অধিকারে তুই এখান থেকে পৃথিবীকে তুলেছিস? জানিস, এটা কার রাজত্ব? গদার এক ঘায়ে তোর মাথা চুরচুর করে দেব, জানিস।

হিরণ্যাক্ষের এই তর্জনে বরাহ চুপচাপ থাকলে কি হবে, তার মনে হল, পৃথিবী এমনভাবে কাঁপতে শুরু করেছে যে বেশি সময় মুখে ধরে রাখা যাবে না। তাই বরাহ চট করে বেরিয়ে এল সমুদ্রের ভেতর থেকে।

দ্রুতগতিতে পৃথিবীকে নিয়ে বরাহকে বেরিয়ে আসতে দেখে হিরণ্যাক্ষও তার পিছু নিল। পালাচ্ছিস? একবার যখন ধরা পড়েছিস, পালাবি কোথায় রে শুয়োর?

ইতিমধ্যে বরাহ পৃথিবীকে জলের তলা থেকে উদ্ধার করে এনে রাখলে মনোমত একটা জায়গায়। ভার মুক্ত হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ব্রহ্মা ও ঋষিরা। সর্বাঙ্গ তার সোনার কবচে ঢাকা, হাতে লোহার গদা নিয়ে অশ্রাব্য সব কটু কথা বলতে বলতে পেছনে ছুটে আসছে দৈত্যাধিপ হিরণ্যাক্ষ। সেই অবসরে, অলক্ষ্যে ব্রহ্মা এসে বরাহরূপী ভগবান নারায়ণকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন হিরণ্যাক্ষের নিদারুণ অত্যাচারের কথা। বলে গেলেন—নিজের সমান যোদ্ধার খোঁজে ব্রহ্মাণ্ড ছারখার করছে। প্রভু, আমাদের বরে ও আমাদের কাছে অজেয়। একমাত্র আপনি ছাড়া। কিন্তু প্রভু, সূর্যাস্তের আগে যদি ওকে মারতে না পারেন, তাহলে কিন্তু ওকে রোখা খুব কঠিন হবে।

সবই জানা নারায়ণের। তবু ব্রহ্মার কাছ থেকে একবার শুনে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল বরাহ। তারপর হিরণ্যাক্ষ কাছে আসতেই বলল—কি বলছিস অসুর? আমি জলজন্তু, তাই না? ঠিকই তো, আমাদের মত জলজন্তুরা তোদের মত কুকুরদেরই খুঁজে বেড়ায়। নিজেই যখন যেচে এসেছিস, ভালই হয়েছে। দেখ না চেষ্টা করে, তোর গদার ঘায়ে আমার মাথা ভাঙতে পারিস কিনা।

ত্রিভুবনে যাকে কোন কটু কথা বলার সাহস কেউ রাখে না, সামান্য এক শুয়োর কিনা তাকে বলে, কুকুর। এত বড় স্পর্ধা! এবার বিষধর সাপের মত যেন ভীষণ হয়ে উঠল হিরণ্যাক্ষ। ঘন ঘন ওঠানামা শুরু করল বুক। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে উঠল যেন ঝড়। লোহার গদাটা তুলে সজোরে ছুঁড়ে মারল বরাহের মাথা লক্ষ্য করে। চকিতে একটু সরে গিয়ে বরাহ এড়িয়ে গেল মারটা। ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষ আবার গদা তুলে ছুঁড়ল। এবারও হল লক্ষ্যভ্রষ্ট। এবার হিরণ্যাক্ষ আর গদা না ছুঁড়ে, হাতে নিয়েই লাফিয়ে পড়ল বরাহর ওপর। বরাহও তার গদা হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। দুই যেন মল্লবীর—মুখোমুখি শুরু হয়ে গেল ভীষণ রণ। দুই পটু গদাবরী যেন মারতে থাকে একে অপরকে লক্ষ্য করে। ক্ষতবিক্ষত দুজনের সর্বাঙ্গ। দুজনেই রক্তের গন্ধে দারুণ ক্ষিপ্ত। বরাহের চোখ জ্বলছে; চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে হিরণ্যাক্ষেরও। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সেই

ভীষণ রূপ দেখতে লাগলেন ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য মুনি-ঋষিরা। দেখতে দেখতে এক সময় তাঁরা 'হায়' 'হায়' করে উঠলেন। সর্বনাশ! বরাহদেবের হাতের গদা যে হিরণ্যাক্ষের আঘাতে খসে পড়ে গেল! এখনই বুঝি নিরস্ত্র বরাহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মহাবল অসুরটা। কিন্তু আশ্চর্য! এমন একটা সুযোগ হিরণ্যাক্ষ নিল না। নিরস্ত্রকে প্রহার করা যুদ্ধের ধর্ম নয়। তাই অসুর আর আক্রমণ না করে অপেক্ষা করে রইল।

বরাহরূপী নারায়ণ এবার স্মরণ করলেন সুদর্শন চক্রকে। স্মরণ মাত্রেই চক্র হাজির। আগ্নেয়গিরির মত এবার ফুঁসে উঠল হিরণ্যাক্ষ। কি, শেষে সুদর্শন! দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অসুর সজোরে ছুঁড়ল গদা। ঝড়ের বেগে গদা ছুটে আসছে। বরাহ এবার কিন্তু আর একটুও নড়ল না। কাছাকাছি আসতেই বাঁ পা তুলে ছুটে আসা একটা বল আটকালো যেন। পড়ে গেল গদাটা।

বরাহ কিন্তু অসুরকে আক্রমণ না করে বলল—মহাবীরকে কি নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যায়? নে নে, গদা তুলে দেখ, যদি আমায় মারতে পারিস।

কোন সঙ্কোচ না করে হিরণ্যাক্ষ গদা তুলে আবার ছুঁড়ল। এবারেও নিষ্ফল।

গদা আবার ফিরিয়ে নিতে বলল বরাহ। কিন্তু বার বার এই অপমান বীর হিরণ্যাক্ষের পক্ষে সহ্য করা দারুণ শক্ত হয়ে দাঁড়াল, তাই গদা ছেড়ে এবার সে ছুঁড়ল তার অমোঘ শূল। জ্বলন্ত আগুনের মত সেই শূলকে ছুটে আসতে দেখে বরাহ নির্দেশ দিল চক্রকে। লাটুর মত ঘুরতে ঘুরতে চক্র তীরবেগে এসে টুকরো টুকরো করে দিল সেই শূলকে।

অসুর হিরণ্যাক্ষ তখন বরাহের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই ছেড়ে নিল মায়ার আশ্রয়।

হঠাৎ চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পরিবর্তে উঠল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা। চারদিক ঢেকে গেল অন্ধকারে। কোথা থেকে অজস্র পাথরের টুকরো বর্ষার ধারার মত এসে আছড়ে পড়তে লাগল। নির্বিকার দাঁড়িয়ে বরাহরূপী নারায়ণ। ক্রোধারুণ নয়ন তাঁর। যেন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল পুঁজ, রক্ত, মাংসের টুকরো, মল, মূত্র-র বৃষ্টি। দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীটায় সে কি অনাসৃষ্টি ব্যাপার! কোথা থেকে যেন মার···মার, কাট···কাট করতে করতে ছুটে আসতে লাগল হাজারে হাজারে ভূত-প্রেত, পিশাচ, রাক্ষসীর দল। হাতে তাদের নানা অস্ত্র। ভয়ে আর একবার কেঁপে উঠল পৃথিবী। বরাহরূপী নারায়ণ তখনও দাঁড়িয়ে, নিশ্চুপ। যেন কোথাও কিছু হয় নি। যেন অপেক্ষায় আছে দৈত্যের।

ভয় দেখিয়ে মারবার যত রকমের বিদ্যে জানা ছিল দৈত্যের, সব প্রয়োগ করেও যখন কোন ফল হল না, হিরণ্যাক্ষ তখন আবার এসে দাঁড়াল তার মুখোমুখি।

এবার তার আর এক রূপ। শরীরের মাংসপেশীগুলো কঠিন হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। ইচ্ছে হল তার, আর অস্ত্র নয়, বুকের মাঝে হাতের চাপে পিষেই মেরে ফেলবে তাকে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই দু-হাত বাড়িয়ে সত্যই চেপে ধরল যেন বরাহকে। অস্বাভাবিক জোরে নিজের হাতদুটো নিজের বুকের ওপরই চেপে ধরে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর হুঁশ হতে দেখে, বরাহ তো তার হাতের ভেতর নেই। যেমন দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

একটু হতচকিত হিরণ্যাক্ষ। হঠাৎ একটা ভীম ঘুসি এসে পড়ল তার কানের ওপর। মুহূর্তে তার চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল। পায়ের নীচটা এমনভাবে টলে গেল যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। লুটিয়ে পড়ল ডালপালা নিয়ে যেন বিশাল একটা গাছ। সুন্দরভাবে বাঁধা তার মাথার চুল ছড়িয়ে পড়ল, নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল তার দুটো হাত, দুটো পা দুদিকে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল প্রাণবায়ু।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দেবতারা। আর নিজের কথাও রাখলেন নারায়ণ। তাঁর শাপগ্রস্ত দুই প্রিয় পার্ষদ জয় আর বিজয়ের মধ্যে নৃসিংহের বেশে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে জয়কে মুক্ত করেছিলেন। আর এখন বরাহরূপ ধরে মুক্ত করলেন তাঁর প্রিয় বিজয়কে।



বৃত্রাসুর বধ কাহিনী

দিতি আর দনুর ছেলে—দৈত্য-দানবরা ভাই-ভাই হলেও তাদের নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ির শেষ ছিল না। প্রত্যেকেই শক্তিশালী, প্রত্যেকেই প্রধান। ওদিকে অদিতির ছেলেদের মধ্যে কোন খেয়োখেয়ি নেই, রেষারেষি নেই। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সবাই একজোট। তবুও অসুরদের আক্রমণে বার বার নাজেহাল হন দেবতারা, বিব্রত হন, এমন কি মাঝে মাঝে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতেও বাধ্য হন।

কেন এমন হয়? ভেবেও যখন কোন কূলকিনারা করতে পারলেন না দেবতারা, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা তাদের বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

ব্রহ্মা বললেন—দেখ বাপু, তোমরা হলে গিয়ে দেবতা। পৃথিবীর সবাই তাকিয়ে আছে তোমাদেরই দিকে। কেন? না, তোমরা তাদের মঙ্গল করবে বলে। তোমাদের মধ্যে মায়া-দয়া-ক্ষমা আছে, সকলকে তোমরা সমান ভাবে ভালবাস, সমান চোখে দেখ বলেই তারা তোমাদের পুজো করে, শ্রদ্ধা করে। তা তোমরা যদি নিজেদের সেই মর্যাদা রাখতে না পার, তাহলে অসুরদের হাতে তো হেনস্তা হতেই হবে। তোমরা নিজেরাও স্থির থাকতে পারবে না। আর পৃথিবীকেও শান্তি দিতে পারবে না।

ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতারা চিন্তায় পড়লেন। কিছুতেই ভেবে পেলেন না, এমন কি কাজ তাঁরা করেছেন যাতে তাঁদের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। দেবরাজ ইন্দ্র কিন্তু ব্রহ্মার ইঙ্গিত সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছিলেন। আসলে দেবতারা তো কোন অপরাধ করেন নি, করেছিলেন ইন্দ্র নিজেই। তার জন্যে অবশ্য মনে মনে অনুশোচনাও

ভোগ করেছিলেন। কিন্তু অপরাধ-মুক্ত হবার সুযোগ আর কোনমতেই মিলছিল না। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। দেবরাজের সেই পাপ-অন্যায় কাজের ফল তাই দেবতাদের সঙ্গে দেবরাজকেও ভোগ করতে হচ্ছিল।

ইন্দ্র হলেন গিয়ে দেবতাদের রাজা। তাঁর কত ঐশ্বর্য! অমরাবতীর মত তাঁর প্রাসাদের সঙ্গে তুলনাই চলে না আর কোন প্রাসাদের। দেবতাদের নিয়ে একদিন সভায় বসেছিলেন ইন্দ্র। এলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। সকলেই সমীহ করে উঠে দাঁড়ালেন, প্রণাম জানালেন, কিন্তু নিজের সিংহাসন ছেড়ে দেবরাজ উঠলেন না, অভ্যর্থনাও জানালেন না। ঐশ্বর্যের গর্বে ইন্দ্র তখন এতই গর্বিত ছিলেন যে গুরুদেবের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেওয়ার কথা তাঁর মনে জাগে নি। বৃহস্পতি তা বুঝতে পেরে ঠিক করেছিলেন ইন্দ্রকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সভা ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন নিজের আবাসে। তারপর দেবরাজের যখন চৈতন্য হল, তখন লজ্জায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ছিঃ ছিঃ! এ কাজ করা ঠিক হয় নি। এখুনি গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বলেই তিনি ছুটেছিলেন দেবগুরুর আবাসের দিকে। দেবগুরুও তা বুঝতে পেরে এমন ভাবে আত্মগোপন করেছিলেন যে কোথাও তাঁর সন্ধান দেবরাজ পেলেন না আর। খুবই অনুশোচনা ইন্দ্রের মনে। কিন্তু গুরুদেবকে না পেলে তো আর কিছু করার নেই।

নিজেদের মধ্যে যত দলাদলিই থাকুক, অসুররা কিন্তু দারুণ সমীহ আর শ্রদ্ধা করত তাদের গুরুদেব শুক্রাচার্যকে। ফলে দানব-গুরুর কৃপায় তারা কেউই কোন দিন হীনবল হয়ে পড়ে নি।

এসব জানতে পেরেছিলেন ব্রহ্মা। বললেন—দেবগুরুকে রুষ্ট করে তুমি যে সর্বনাশ করেছ, তার ফল তোমাদের সকলকেই ভোগ করতে হচ্ছে। কোন দিন না অসুররা আমার পুরীও দখল করে বসে!

—আমি বুঝতে পেরেছি। বললেন দেবরাজ—কিন্তু কোথাও যে তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপাতত কি করা যায়, বলুন।

ব্রহ্মা বললেন—একটা কাজ করতে পার। তোমরা যদি ত্বষ্টার ছেলে বিশ্বরূপকে এনে তাঁকে পুজো করতে পার, তাহলে একটা উপায় মিলতে পারে।

দেবমাতা অদিতির যে বারোটি ছেলে 'আদিত্য' নামে পরিচিত, ত্বষ্টা ছিলেন তাঁদের মধ্যে চতুর্থজন। (আগের তিনজন হলেন—বিবস্বান, অর্যমা, পূষা। আর পরের আটজন হলেন—সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র, উরুক্রম। ত্বষ্টা সমেত এঁরা 'দ্বাদশ আদিত্য' নামে পরিচিত। সকলেই ছিলেন পৃথিবীর প্রজাসৃষ্টিকারী—প্রজাপতি।) ত্বষ্টা বিয়ে করেছিলেন দৈত্যকন্যা রচনাকে। দুই ছেলের মধ্যে ছোট বিশ্বরূপ ছিল দেবদুর্লভ জ্ঞান-গুণের অধিকারী। তার আবার ছিল তিনটে মাথা।

সে যাই হোক, ব্রহ্মার আদেশ। দেবতারাও রাজি হয়ে ব্রহ্মাকে নিয়ে গেলেন বিশ্বরূপের কাছে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বিশ্বরূপকে রাজি করিয়ে দেবরাজ তাঁকে দিয়েই শুরু করালেন এক মহাযজ্ঞ।

যজ্ঞভাগের অধিকারী সব সময়ই দেবতারা, অসুররা নয়। ইন্দ্র দেখলেন, বিশ্বরূপ একটা করে যজ্ঞভাগ তাঁর মামাদের জন্যেও রেখে দিচ্ছেন। দেখেই দেবরাজ রেগে আগুন। কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে নিজেই এক কোপে বিশ্বরূপের তিনটে মাথাই কেটে ফেলে দিলেন। অসমাপ্ত রয়ে গেল যজ্ঞ। ওদিকে তিনটে মুখের মধ্যে যেটা দিয়ে বিশ্বরূপ সোমরস পান করতেন তা চাতক পাখি, যেটাই সুরা পান করতেন সেটা চড়ুই, আর যে মুখ দিয়ে অন্ন খেতেন, সেটা তিতির পাখি হয়ে উড়ে গেল আকাশে।

ইন্দ্রের হাতে পুত্র খুন হয়েছে শুনে বাবা প্রজাপতি (ত্বষ্টার আর এক মূর্তি) বললেন—এত স্পর্ধা? এত ঔদ্ধত্য ইন্দ্রের! ইন্দ্রকে বধ করার জন্যে প্রজাপতি ত্বষ্টা জ্বালালেন আগুন। আকাশ-ছোঁয়া আগুনের সেই লকলকে শিখায় ত্বষ্টা ঘি ঢালতে ঢালতে বললেন—ইন্দ্রকে যে নিধন করবে, উঠে এসো সে এই অগ্নিকুণ্ড থেকে। বলতে বলতেই সেই অগ্নিকুণ্ড ভেদ করে উঠে এল বিকটাকার এক অসুর। চোখের এক একটি পলক পড়তে থাকে, আর সেই অসুরও লম্বায়-চওড়ায় বাড়তে থাকে অসম্ভব রকম দ্রুত গতিতে। দেখতে দেখতে তার আকার হয়ে উঠল ভীষণ। যদিও আগুনে পোড়া পাহাড়ের মত দেখতে লাগছিল তাকে, তবুও সন্ধ্যার আকাশে জমাট মেঘের রং যেমন উজ্জ্বল দেখায়, তেমনি উজ্জ্বল তার গায়ের রং। একমুখ দাড়ির রং যেন গরম তামা, দুটো চোখ যেন দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ। হাতে তার তিন ফলা বিশাল এক ত্রিশূল। বিকটাকার আর বিশালকায় সেই অসুরের তর্জনে-গর্জনে সকলের বুক কাঁপতে শুরু করল। দাপাদাপিতে কেঁপে উঠতে লাগল পৃথিবী। বিশাল বিশাল দাঁত দিয়ে এখনি বুঝি চিবিয়ে খাবে গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাকে। পৃথিবী ছেড়ে মানুষজন পালাতে শুরু করল প্রাণভয়ে। দেবলোকে দেবতারাও প্রায় দিশেহারা হয়ে উঠল তাকে ঐভাবে সব দিক গ্রাস করতে উদ্যত দেখে।

এই অসুরের নামই হল বৃত্রাসুর।

বৃত্রাসুরকে বধ করতে দেবতারা তুলে নিলে যে যার মারাত্মক অস্ত্র। ছুঁড়লেন। কিন্তু আশ্চর্য। অত সব শক্তিশালী অস্ত্র, দেবতারা দেখলেন নিষ্ফল হয়ে গেল। তার গায়ে কেউ একটা আঁচড়ও কাটতে পারল না।

ত্রিভুবন কাঁপিয়ে সেই ত্রিশূল হাতে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বৃত্র এগিয়ে আসতে লাগল ইন্দ্রের দিকে।

সমূহ বিপদ দেখে দেবতারা তখন প্রাণভয়ে ডাকতে লাগলেন ভগবান শ্রীহরিকে। তাঁদের এই আকুল আহ্বানে শ্রীহরি না এসে থাকতে পারলেন না। তিনি আসতেই সকলেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে আবেদন রাখলেন—প্রভু, দেবতা-দানব-অসুর-স্থলচর-খেচর সবই আপনার সৃষ্টি। তাদের মধ্যে যারা মদমত্ত হয়ে আপনার সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, আপনিই তাদের যোগ্য সাজা দেন। এখন বৃত্রাসুর যে কাণ্ড আরম্ভ করেছে তাতে সকলেই ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। যদি মনে করেন এই অসুর বধের যোগ্য, তাহলে এর একটা উপায় করুন প্রভু। আমরা তো কিছুই আর ঠিক করে উঠতে পারছি না। আমাদের সব অস্ত্রশস্ত্র বিফল হয়ে গেছে। ওর কাছে আমরা প্রায় হেরেই গেছি। এখন আপনিই একমাত্র আমাদের ভরসা।

সব শুনে ভগবান শ্রীহরি দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—ইন্দ্র, অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচিকে তো তুমি চেনো। জ্ঞানে-গুণে-বিনয়ে-দানে অত বড় ঋষি প্রায় দুর্লভ। অসম্ভব তেজস্বী তিনি। নারায়ণ-কবচ

নামে দারুণ শক্তিশালী বিদ্যা; তিনিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বরূপের বাবা ত্বষ্টাকে। নারায়ণ-কবচ এমনি দুর্ভেদ্য যে ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন অস্ত্র নেই যা তাকে ঘায়েল করতে পারে। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে তোমাদের দুরবস্থা জানিয়ে তাঁর দেহটা চেয়ে নাও। তারপর বিশ্বকর্মাকে বলবে, তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্রনামে একটা অস্ত্র তৈরি করে দিতে। একমাত্র সেই অস্ত্র ছাড়া তোমরা কোনমতেই ঐ মহাসুর বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারবে না। বলেই অন্তর্হিত হলেন শ্রীহরি।

দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ এবার এলেন দধীচির আশ্রমে। তাঁদের সকলকেই অভ্যর্থনা জানালেন ঋষি। তারপর জানতে চাইলেন তাঁদের আসার কারণ।

দেবরাজ বললেন—ঋষিবর, পৃথিবীর অশান্তি দূর করার জন্যই আমরা এসেছি আপনার কাছে সাহায্যের আশায়।

—আমি আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন দেবরাজ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন দধীচি।

—আপনার দেহটা আমাদের দরকার। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বৃত্রাসুর কিভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করে চলেছে। আমরা জেনেছি ওকে বধ করার একমাত্র অস্ত্র হল বজ্র। আর সেই বজ্র তৈরি আপনার অস্থি ছাড়া হবে না। তাই আমরা এসেছি আপনার কাছে, যদি কৃপা করেন।

শুনে মনে মনে দধীচির সে কি আনন্দ! মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। মৃত্যু তার একদিন হবেই। তখন এই দেহটা হয় আগুনে পুড়ে ছাই হবে, নয়ত জন্তু-জানোয়ারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। দেবতারা এসেছেন তাঁর কাছে তাঁর দেহ নিতে মহৎ কাজের জন্য। দেহধারণে এর মত সুখ কি আর কিছু আছে?

সঙ্গে সঙ্গে যোগাসনে বসে হাসতে হাসতে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করলেন দধীচি। নিষ্প্রাণ দেহটা নিয়ে দেবতারা চলে গেলেন। তারপর বিশ্বকর্মাকে ডেকে তাঁর অস্থি থেকে শ্রীহরির নির্দেশমত তৈরি করালেন সেই অমোঘ অস্ত্র বজ্র।

আর আশঙ্কার কিছু নেই। অমোঘ অস্ত্র হাতে দারুণ মনোবল নিয়ে ঐরাবতের পিঠে দেবরাজ। সঙ্গে নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতারা এগিয়ে আসতেই মার মার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অসুররা। বৃত্রাসুর এখন আর একা নয়। অসুরকুলের সব মহা মহা অসুররা এসে যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। বিপ্রচিত্তি, পুলোমা, ময়, নমুচি, সম্বর, মালি, হেতি, প্রহেতি—যাদের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পমান—সকলেই একসঙ্গে আক্রমণ করল দেবতাদের। কিন্তু তাদের আঘাতে এমনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল যে প্রাণ নিয়ে আর পালাতে পথ পেল না। বৃত্রাসুরকে রণক্ষেত্রে একা রেখে সবাইকে পালাতে দেখে ধিক্কার দিয়ে উঠল বৃত্রাসুর—ছিঃ-ছিঃ, যুদ্ধ করতে এসে প্রাণের এত মায়া? এর নাম, তোমরা অসুর? এর নাম, তোমরা বীর? তোমাদের পেছন পেছন ধাওয়া করবে শত্রুরা, আর তোমরা তা দেখেও মার খেয়ে পালাবে?

মহাক্রোধে বৃত্রাসুর এবার এমন এক হুঙ্কার ছাড়ল যে থরথর করে কেঁপে উঠল পৃথিবী, সেই সঙ্গে দেবতারাও। চোখে আগুনের হল্কা ছড়াতে ছড়াতে বৃত্র কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা ইন্দ্রের কাছাকাছি এসে ঐরাবতের মাথা লক্ষ্য করে এমন ভাবে সজোরে হাতের গদা ছুঁড়ল যে, ইন্দ্রকে পিঠে নিয়ে তার টাল সামলাতে প্রায় আঠারো হাত পিছিয়ে গিয়ে রক্তবমি শুরু করে দিল। বেশ কিছুক্ষণ গেল ঐরাবতের সেই ধকল সামলাতে।

গর্জন করে উঠল আবার বৃত্রাসুর—নির্লজ্জ, কাপুরুষ! বিনা অপরাধে আমার ভাই বিশ্বরূপকে তুই মেরেছিস। তোকেও মরতে হবে আমার এই ত্রিশূলে। সাহস থাকে এগিয়ে আয়।

ইন্দ্র এবার বজ্র তুলে এগিয়ে এলেন বৃত্রের দিকে।

তাই দেখে উপহাস করল বৃত্র—শেষ পর্যন্ত হাতে বুঝি এসে ঐ একটা অস্ত্র বজ্র ঠেকল রে কাপুরুষ? বেশ, ওটা দিয়েই একবার চেষ্টা করে দেখ। বলেই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বৃত্র ছুঁড়ল ত্রিশূল।

উল্কার বেগে ত্রিশূল ছুটে আসছে দেখে ইন্দ্র আর কালক্ষেপ না করে ছুঁড়লেন বজ্র। আগুনের দুরন্ত একটা গতি যেন মাঝপথে ত্রিশূলকে টুকরো টুকরো করে সোজা গিয়ে আঘাত হানল বৃত্রের শুঁড়ির মত মোটা ডান হাতে। আর দেহ থেকে কেটে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। বৃত্রাসুরের দেহ থেকে ছুটল রক্তের ফোয়ারা। তবুও কাতর হল না বৃত্র। সেই অবস্থাতেই বাঁ হাতে বিশাল পরিঘ নামে আর এক শক্তিশালী অস্ত্র তুলে নিয়ে ছুঁড়ল ইন্দ্রের দিকে। আর আচম্বিতে সেই অস্ত্র এসে ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্র খসিয়ে ফেলে দিল মাটিতে।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ইন্দ্রের মুখ। বৃত্রের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। বৃত্রের হাতে এখন অপূর্ব সুযোগ। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়েছিল বৃত্র, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এক পা এগিয়ে এল না। বরং তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে উঠল—তোদের মত কাপুরুষ আমি নই যে পেছন দিক থেকে মারব বা নিরস্ত্রকে মারব। লড়াই যখন করতে এসেছি তখন বীরের মতই লড়াই করে ঠিক করে নেব কে বাঁচবে, কে মরবে। তুলে নে তোর বজ্র। সাহস থাকে তো আবার মার।

কি আর করেন ইন্দ্র। আর তো কোন হাতিয়ার নেই যা দিয়ে অমন অসুরকে কায়দা করা যাবে। বাধ্য হয়েই তুলে নিলেন বজ্র।

বৃত্রাসুর এবার বাঁ হাত দিয়ে আবার ছুঁড়ল পরিঘ। ইন্দ্রও ছুঁড়লেন বজ্র। পরিঘ কেটে বজ্র এবারও বৃত্রাসুরের দেহ থেকে বাঁ হাতটা সমূলে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

বৃত্রের দুটো হাতই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ক্ষতস্থান থেকে প্রবল বেগে ঝরে পড়ছে রক্ত, যেন রক্তের নদী। শাখা-প্রশাখাহীন বিশালকায় এক অশ্বত্থ গাছ যেন এখন বৃত্রাসুর। যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই, বরং ক্রোধে আরও ভীষণকায় হয়ে উঠেছে সে। করাতের মত ধারালো বিশালকায় দাঁতে ভরা বিশালাকার মুখটা হাঁ করে এবার সে চকিতে এগিয়ে এসে ঐরাবত-সমেত ইন্দ্রকে গিলে ফেলল, যেমন করে টিকটিকি টুপ করে গিলে ফেলে পোকা-মাকড়। স্বর্গ-মর্ত্যে উঠল হাহাকার—গেল, সব গেল। এই অসুরের হাত থেকে আর বুঝি কারও রেহাই নেই।

যখন চতুর্দিক এই রকম হাহাকারে ভরে উঠেছে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে বৃত্রাসুরের পেট চিরে ঐরাবত-সহ ইন্দ্র বেরিয়ে এলেন অক্ষত অবস্থাতেই। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্র দিয়ে কেটে ফেললেন বৃত্রাসুরের মাথা।

অতি শক্তিশালী আর অতি দ্রুতগামী বজ্র। তবু বৃত্রাসুরের গলা দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে কেটে নামিয়ে দিতে লেগেছিল তিনশ ষাট দিন।

বৃত্রাসুর নিহত হল। পৃথিবীর মানুষজন হল আতঙ্কমুক্ত।

দেবরাজ্যে দেবতারাও হলেন নিশ্চিন্ত।

[এই কাহিনী শুধু পুরাণে নয়, আমাদের সুপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও আছে। সত্যযুগের শেষে আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে, ইন্দ্রের সঙ্গে, বৃত্রাসুরের এই সংগ্রাম হয়েছিল। মনীষীদের মতে, এটি একটি বানানো কাহিনী। আসলে 'বৃত্র' শব্দের অর্থ হল যা সব কিছু ঢেকে রাখে। মেঘের অপর নাম 'বৃত্র'। মেঘ সারা পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছিল, বৃষ্টি আর হচ্ছিল না। ইন্দ্র বজ্র দিয়ে প্রহার করে মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি নামিয়েছিলেন। সেটিই এখানে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের সংগ্রাম নামে কাহিনী হয়ে গেছে।]



চিত্রকেতুর জন্মান্তর

বহুকাল আগের কথা। তা বেশ কয়েক কোটি বছর আগে তো হবেই।

শূরসেনের (অর্থাৎ বর্তমান দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে রাজস্থানের জয়পুর, আলোয়ার পর্যন্ত) অধিপতি ছিলেন চিত্রকেতু। তাঁর রাজধানী ছিল মথুরায়। রূপে-গুণে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তাঁর মত সম্রাট আর কেউ ছিলেন না সে সময়। তিনি যেমন ভালবাসতেন প্রজাদের, প্রজারাও তেমনি ভালবাসত তাঁকে। এক কোটি রানী তাঁর। কোন কিছুরই অভাব নেই রাজার। অভাব নেই প্রজাদেরও। কিন্তু শান্তি নেই রাজার মনে।

অঙ্গিরা ঋষি একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন রাজ-দরবারে। সিংহাসন ছেড়ে উঠে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। যথাযোগ্য আসনে তাঁকে বসিয়ে আগে তাঁর সেবা করলেন। তারপর অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে অপর একটি আসনে বসলেন তাঁর পাশে।

তারপর অঙ্গিরা সম্রাটের কয়েকটি কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বললেন—আচ্ছা রাজা, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন শান্তি নেই। কি হয়েছে আমাকে বল।

ঋষির চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না, তিনি ঠিকই ধরেছেন।

চিত্রকেতু বললেন—আমার সব আছে ঋষিবর। বিশাল সাম্রাজ্য, সুপ্রচুর ধনসম্পদ, এক কোটি রানী, সুশীল প্রজা। কিন্তু আমার কোন সন্তান না থাকায় মনে কোন আনন্দই পাচ্ছি না। মনে যদি কোন আনন্দই না রইল, কি হবে এসব দিয়ে?

শুনে অঙ্গিরা বললেন—ওঃ, এই কথা! ঠিক আছে, তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

এই বলে ঋষি অঙ্গিরা চরু পাক করে প্রজাপতি ত্বষ্টার উদ্দেশে হোম করলেন। প্রজাপতিকে নিবেদন করে বাকি চরুটা তিনি খেতে দিলেন রানী কৃতদ্যুতিকে। ইনিই হলেন সম্রাটের প্রথম এবং প্রধান রানী।

তারপর বললেন—শোন রাজা, যথাসময়ে তোমার একটি ছেলে হবে। তবে, সে তোমাকে সুখ এবং দুঃখ দুই-ই দেবে।

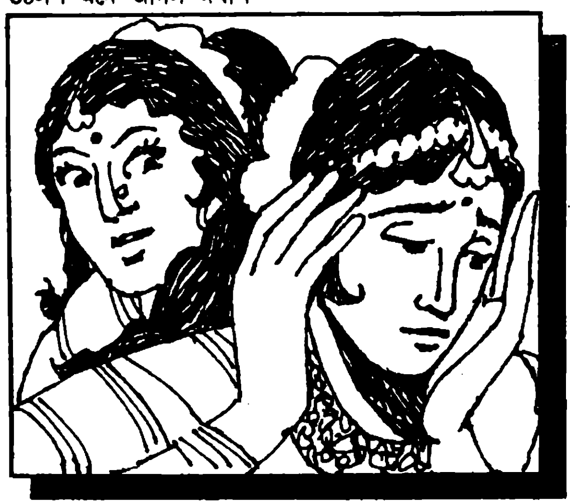
এই বলে চলে গেলেন ঋষিবর!

এদিকে সত্যি সত্যিই যথাসময়ে কৃতদ্যুতির একটি ছেলে হল। ছেলে তো নয়, যেন সোনার চাঁদ।

এতদিন বাদে রাজার ছেলে হয়েছে। নিমেষের মধ্যে সারা শূরসেনে ছড়িয়ে পড়ল খবর। আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল সাম্রাজ্য। রাজকোষের দরজা গেল খুলে। যে এল সে-ই দু-হাত ভরে নিয়ে গেল রাজার দান। সে যেন এক হই...হই...রই...রই ব্যাপার!

ছেলে পেয়ে চিত্রকেতুর যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ কৃতদ্যুতিরও। যতদিন যায়, ততই বাড়ে মায়া। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও দেখার আশ যেন তাঁর আর মেটে না। মায়ের পক্ষে মায়া জাগা তো স্বাভাবিক। ছেলের যাতে কোন দিক থেকে কোন অসুবিধে না হয়, সম্রাট তার সব বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

ওদিকে অন্দরমহলে রানীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ফিসফাস, গুজগুজ। ছেলে যখন ছিল না, তখন সম্রাটের কাছে সকলেরই ছিল সমান কদর। আর এখন ছেলে হওয়ায়, ওরা দেখল বড় রানীর কদরই যেন বেশি বেড়ে গেছে। দেখে দেখে চোখ তাদের টাটিয়ে উঠল। মনে জাগল ঈর্ষা।



একদিন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে টুকিটাকি কাজগুলো সেরে নিতে গেছেন কৃতদ্যুতি। ধাই-ও কাছে নেই। না থাক, আর সব রানীরা তো রয়েছে। যদি জেগে ওঠে ওরা দেখবে 'খন, ইতিমধ্যে তিনি এসে পড়বেন। মনে তো তাঁর কোন আর চিন্তা নেই।

সেই সুযোগে রানীরা যুক্তি করে ছেলেকে তুলে দিলেন বিষ খাইয়ে। জানতেও পারলেন না কৃতদ্যুতি।

কাজকর্ম সারা হয়ে গেছে। তবু ছেলে ওঠে না দেখে ধাইকে ডেকে কৃতদ্যুতি বললেন—যা তো, ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আয়।

রানী-মার কথা শুনে ধাই ছেলেকে তুলতে গিয়েই দেখল, নেতিয়ে পড়ল ছেলে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বুকে কান পেতে যখন দেখল শ্বাস-প্রশ্বাসও বইছে না, হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে।

ধাই-এর কান্না শুনে পাগলের মত ছুটে এলেন কৃতদ্যুতি। অন্দরমহলে যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এল—কি হয়েছে? কি হল?

তারপর যখন শুনল ছেলেটি মারা গেছে, কৃতদ্যুতি আর ধাই-এর সঙ্গে তারাও কান্নায় ভেঙে পড়ল। যে রানীরা ষড়যন্ত্র করে বিষ খাইয়েছিল, তারাও ভাল মানুষ সেজে এসে দলে ভিড়ে গেল।

খবর চলে গেল রাজসভায় চিত্রকেতুর কাছে। হঠাৎ যেন তাঁর মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়ল। সিংহাসন ছেড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসতে গিয়ে পড়ে গেলেন। আঘাত পেলেন। মন্ত্রী সেনাপতিদের সাহায্য নিয়ে তিনিও এসে আছড়ে পড়লেন ছেলের পায়ের কাছে। নতুন করে চার গুণ শোক যেন উথলে উঠল। সবাই কপালে করাঘাত করে। সবাই নানারকম সুর তুলে কাঁদে। আর মুহূর্তে প্রাসাদটাই হয়ে গেল যেন কান্নার প্রাসাদ। কে কাকে থামাবে? কে কাকে সান্ত্বনা দেবে?

সর্বজ্ঞ ঋষি অঙ্গিরা। ঠিক সময়ে জানতে পেরে নারদ মুনিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন চিত্রকেতুর কাছে।

বললেন—মহারাজ, আপনি না হরিভক্ত? আপনার কি এই শোক সাজে?

শুনেই চমকে উঠলেন চিত্রকেতু। কান্নায় ফোলা ফোলা দুটি চোখ তুলে তাকালেন তাঁদের দিকে।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—কে আপনারা? এই সময় এলেন আমাকে সজাগ করে দিতে?

অঙ্গিরা বললেন—আমায় চিনতে পারলে না মহারাজ? আমিই সেই অঙ্গিরা। তুমি পুত্র কামনা করলে যে তোমার বাসনা পূরণ করেছিল। আর ইনি হলেন ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ। তোমার এই অবস্থা দেখে আমরা নিজেরাই এলাম তোমার কাছে। তুমি ছেলে চাইলে, আমি তার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলেছিলাম, 'রাজা, সুখ আর দুঃখ দুই-ই পাবে'। হরিভক্ত হয়ে ছেলেতে তুমি সুখ খুঁজতে গিয়েছিলে, রাজা? ভেবেছিলাম, তখনি তোমায় বলি, ওর মধ্যে সুখ খুঁজতে গেলে সত্যিকারের সুখ মেলে না। দুঃখ পেতেই হয়। সব সুখের, সব আনন্দের মধ্যমণি হলেন স্বয়ং ভগবান হরি। তাঁকে ছেড়ে অন্য কোথাও সুখ চাইতে গেলে পাবে কেন রাজা? যারা স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কিছু জানে না, একেবারে ঘোর সংসারী, এই রকম সুখ-দুঃখ তারাই ভোগ করে। তুমি তো সে দলে নও। যারা মনে করে, এ সবই তাঁর খেলা—তিনি একজনকে আর একজনের বাবা করে দিচ্ছেন, বা সন্তান করে দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে থেকে সংসারে খেলা করে আবার চলে যাচ্ছেন, তাদের কি মায়া-মোহ থাকে?

শোকাতুর চিত্রকেতুর যেন সম্বিত ফিরে এল। সত্যিই তো, তিনি যে এসব কিছু বোঝেন না তা নয়, তবু এ কি বিভ্রান্তি!

চিত্রকেতুকে আরও খানিকটা জ্ঞান দেবার জন্য নারদ বললেন—রাজন, অকালে তোমার পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। তাই তোমাদের এত দুঃখ, এত শোক। বলেই নারদ মন্ত্রশক্তি-বলে চিত্রকেতুর সেই মৃত ছেলেটির আত্মাকে এনে বললেন—পুত্র, তুমি চলে যাওয়াতে দেখ, তোমার বাবা-মা কত কান্নাকাটি করছেন। তোমার আয়ু এখনও আছে। তুমি আবার তোমার ঐ দেহে প্রবেশ কর। মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাও। বিষয় ভোগ কর। সিংহাসনে বস।

নারদের কথা শুনে শিশুর আত্মা বলে উঠল—আমার তো কোন বিশেষ বাবা, বিশেষ মা নেই। কতবার যে এই পৃথিবীতে কত ভাবে জন্মগ্রহণ করেছি, তার কি ইয়ত্তা আছে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গেই এক একবার এক এক সম্বন্ধ নিয়ে জন্মেছি, আবার চলে গেছি।

বলেই বালকের আত্মা সেখান থেকে চলে গেল। আর চিত্রকেতুও, হাতি যেমন পাঁক থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে সব ছেড়েছুড়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন প্রাসাদ থেকে।

যে রানীরা এই পাপ কাজ করেছিল তারাও আর স্থির থাকতে পারল না। পাপমুক্ত হবার জন্য সকলে মিলে এল যমুনায়। তার জলে স্নান করে তীরে বসে শিশুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করল।

এদিকে চিত্রকেতু যমুনায় স্নান সেরে দুই ঋষিকে প্রণাম করে কঠোর সংযম আরম্ভ করে দিলেন। সাত দিন শুধুমাত্র জল খেয়ে তিনি এমনভাবে থাকলেন যে তার বলে হয়ে গেলেন বিদ্যাধরদের অধিপতি। আরও কিছুকাল পর চিত্রকেতু সেই অনন্তদেব ভগবানকে দেখে যেমন আনন্দ লাভ করলেন, তেমনি মনের যাবতীয় ময়লা তাঁর বেরিয়ে গেল চোখের জল দিয়ে।

চিত্রকেতু দেখলেন, অঙ্গিরা এবং নারদ অনন্তদেব ভগবানের যে রূপের বর্ণনা তাঁকে দিয়েছিলেন ঠিক সেই রূপ। গৌরবর্ণ গায়ের রং, মাথায় উজ্জ্বল মুকুট, কেয়ূর। পরনে নীল বসন, মুখে নির্মল হাসি।

প্রাণভরে তাঁর স্তব করলেন চিত্রকেতু। অনন্তদেবও সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন—চিত্রকেতু, মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে যে আত্মাকে জানতে পারল না, সকলকে যে সমান চোখে দেখতে পারল না, সকলকে যে সমানভাবে ভালবাসতে পারল না, লোভ-স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে পারল না, তার জন্মই বৃথা। তুমি সংযত হও। অনুশীলন কর। সিদ্ধি লাভ করবে।

এই বলে ভগবান অন্তর্হিত হলেন।

বিদ্যাধর চিত্রকেতুও ভগবান বিষ্ণুর গুণগান গাইতে গাইতে তাঁরই দেওয়া মনোরম এক বিমানে চড়ে আকাশপথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এভাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে গেল। কিন্তু বয়সের কোন ছাপই চিত্রকেতুর দেহে বা মনে নেই।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চিত্রকেতু দেখলেন, শঙ্কর বসে আছেন পার্বতীকে কোলে নিয়ে। তাঁকে ঘিরে সিদ্ধ-চারণরা গান গাইছে। মুনিরাও ঘিরে বসে আছেন তাঁকে।

দেখেই আকাশপথে বিমান থামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন চিত্রকেতু। সব কিছু ভুলে শুরু করে দিলেন শিবের নিন্দা—ছিঃ-ছিঃ! একটু লজ্জা-শরমও নেই। সকলের সামনেই বসে আছে স্ত্রীকে কোলে নিয়ে। ইনি হলেন গিয়ে আবার লোকগুরু, পূজনীয়! এর থেকে লজ্জার আর কি আছে?

শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন শিব! চুপ করে রইলেন সিদ্ধ-চারণ আর মুনিরা।

কেউ কোন মন্তব্য করল না দেখে চিত্রকেতু আরো অনেক কটূক্তি করে বসলেন শিবের উদ্দেশ্যে।

সহ্য করতে পারলেন না পার্বতী! বলে উঠলেন —কে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ এল জ্ঞান দিতে? ওহে চিত্রকেতু, তুমি নিজেকে খুব

জ্ঞানী বলে মনে কর, তাই না ? তা না হলে, মুনি-ঋষিরা যার পূজা করে থাকে, তুমি সেই শিবকে এসব কটু কথা বলার ঔদ্ধত্য পেলে কোথা থেকে ? ঔদ্ধত্য যাদের এত, বিষ্ণুর কাছাকাছি থাকার যোগ্যতা তাদের নেই। যাও, তুমি অসুরকুলে জন্ম নিয়ে অসুর হও গে।

পার্বতীর অভিশাপ শুনেই বিমান নিয়ে নেমে এলেন চিত্রকেতু। তারপর বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—মা, আপনার অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিলাম। মর্ত্যের মানুষ আমরা। আমাদের ওপর আপনাদের আশীর্বাদ বা অভিশাপ সবই আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ফল। তা অবশ্যই আমাদের ভোগ করতে হবে। তাই, কিভাবে আমি শাপমুক্ত হব তা জানতে আমি চাই না। কর্মফল ভোগ করার জন্যই মা, আপনার অভিশাপ নিয়েই চললাম।

এই বলে বিমান নিয়ে চিত্রকেতু চলে গেলেন সেখান থেকে। হতবাক সিদ্ধচারণ মুনির দল।

মৃদু হেসে শুধু শিব বললেন পার্বতীকে—দেখলে পার্বতী, বিষ্ণুভক্ত কাকে বলে। তাদের কাছে সবই সমান।

এই চিত্রকেতুই অভিশপ্ত জীবনযাপন করার জন্য দানবদেহ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল ত্বষ্টার যজ্ঞের আগুন থেকে। তারই নাম হয়েছিল বিশ্বত্রাস বৃত্রাসুর।



দেবাসুর সংগ্রাম ও সমুদ্র মন্থন

দিতি আর দনুর ছেলেদের সঙ্গে অদিতির ছেলেদের মধ্যে সেই সে হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষকে নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছিল, তা কিছুতেই যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। অবশ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। জলে আর তেলে কি কখনো মিলে-মিশে যেতে পারে ? সহজ সরল স্বাভাবিক জল—সকলেই তার কাছে আপনার জন। কাউকেই সে ফেরায় না। এমন কি তার অতি বড় শত্রুকেও নয়। কিন্তু তেল ? দেখতে জলের মত হলে কি হবে, তার মেজাজই আলাদা, ঝাঁঝটাই যেন তার সব। তার ওপর একটু গরম খেয়ে গেলে তখন আর কাউকে তোয়াক্কাই করে না। তখন আবার শান্ত করার জন্যে যদি কেউ জল ঢালে তাহলে তো আর রক্ষেই নেই। জলকে ফুটিয়ে-ফুটিয়ে কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে তবে তার শান্তি। দিতি আর দনুর ছেলেরা অর্থাৎ দৈত্য-দানবরা হল ঠিক তাই। অদিতির ছেলে দেবতারা যে ওদের ভালবাসে না, তা নয়। মাঝে মাঝে ওরা যা চায়, তা দুর্লভ হলেও দেয়, কার্পণ্য করে না। কিন্তু ঐ যে দম্ভ, অহঙ্কার আর মেজাজ। এরা কোন মতেই নিজেদের সামলে রাখতে পারে না। একটু চাঙ্গা হলেই চড়াও হয়ে ওঠে দেবতা-ভাইদের ওপর। শুরু হয়ে যায় মারামারি। আর সে সব সাঙ্ঘাতিক মারামারি। কখনো দানবরা হেরে গিয়ে প্রাণ হারায়। কখনো আবার দেবতারা হেরে গিয়ে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়ান, নয়ত দানব-রাজের আজ্ঞাবহ হন।

দিন-রাত্রি এই যে দু-পক্ষের লড়াই এর মূলে কিন্তু ঐ ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর। এই তিনজনই অদিতির ছেলেদের ভালবেসে দেবতা করে দেবরাজ্য দিয়েছেন, পৃথিবীকে লালন-পালন-শাসন করার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছেন। দিতি আর দনুর ছেলেরা জন্মাবধি যে সৎ নয়, ফন্দি-ফিকিরবাজ, তাঁরা তাও জানেন। তবুও ওঁরা এমনি আত্মভোলা যে তাঁদের স্তব-স্তুতিতে গলে নিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যে তার জন্যে মান-সম্মান নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি পড়ে যায় দেবতাদের, নিজেরাও বিব্রত হয়ে পড়েন। সমস্যায় পড়তে হয় সকলকেই।

এমনিভাবে কেটে গেল প্রায় একশ চুয়ান্ন কোটি বছর ধরে পাঁচজন মনুর রাজত্বকাল। এল খনিত্রের পুত্র চাক্ষুষ মনুর শাসনকাল। দেবাসুরের সংগ্রাম উঠল তুঙ্গে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তোলপাড়। আকাশ-বাতাস জুড়ে শুধু একটাই আওয়াজ গর্জন করে চলেছে—মার···মার···কাট···কাট। সেই সঙ্গে আর্তনাদ।

দেবগুরু বৃহস্পতির যেন আর সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না দেবতাদের শক্তি যুগিয়ে যাবার। ওদিকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার বলে ক্রমশই প্রবল-পরাক্রান্ত করে তুলছেন তাদের। দুর্বার তাদের গতি ঠেকান, দেবতাদের সাধ্য কি ? কত দেবতা যে প্রাণ হারালেন তার আর ইয়ত্তা নেই। খুব বিব্রত হয়ে পড়লেন দেবতারা। সুখ-শান্তি উধাও, স্বর্গরাজ্য তছনছ। পৃথিবী লণ্ডভণ্ড। চারদিক জুড়ে যেন প্রলয় চলেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন দেবতারা। অজেয় হয়েও দানবদের কাছে হেরে যাচ্ছেন। একের পর এক অধিকার তাঁদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে দানবদের হাতে। চিন্তিত দেবরাজ ইন্দ্র মন্ত্রদ্রুম। ম্লান হয়ে গেছে তাঁর অমরাবতীর সৌন্দর্য। লক্ষ্মীদেবীও আত্মসম্মান বাঁচাতে প্রাসাদ ছেড়ে আত্মগোপন করেছেন সমুদ্রগর্ভে। তাঁর অমন ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা থেকে শুরু করে যাবতীয় সম্পদ, অমরাবতীতে আর কিছুই নেই। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। হঠাৎ মনে পড়ে যায় দেবরাজের ক্রোধী মুনি দুর্বাসার সেই অভিশাপ। সামান্য একটা কারণে ঋষি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন তাঁকে—তুই লক্ষ্মীছাড়া হবি। সেই অভিশাপ কি সত্যি সত্যিই ফলল ? তা নইলে এমন দুর্বিপাকই বা ঘটবে কেন, আর দানব-দৈত্যদের হাতে এমনভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে তাঁদের বিব্রতই বা হতে হবে কেন ? বলি, শম্বর, অরিষ্টনেমি কালনেমি, ময়, নমুচির মত অসুররা এত বলশালীই বা হয়ে উঠল কেন ?

খুবই হতাশ ইন্দ্র মন্ত্রদ্রুম। আর কোন উপায় না দেখে আর সব দেবতাদের সঙ্গে মুনি-ঋষিদের নিয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে।

সুমেরু পর্বতে নিজের প্রাসাদে তখন ব্রহ্মা। খোশ মেজাজে সময় কাটাচ্ছিলেন আপন মনে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে যে এত প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তার যেন কোন খবরই তিনি রাখেন না।

হঠাৎ দেবতাদের সঙ্গে মুনি-ঋষিদের অমন শুখুকুখু অবস্থায় আসতে দেখে টনক নড়ে উঠল তাঁর। তারপর সব শুনে দেখলেন এখন যে অবস্থা তাকে সামাল দেবার সাধ্য আর তাঁর নেই। যদি কেউ কিছু করতে পারেন তবে একমাত্র শ্রীহরিই পারবেন।

সে সময় পৃথিবীকে যে সাতটি সমুদ্র ঘিরে রেখে ছিল তার মধ্যে একটি হল ক্ষীরসমুদ্র। এই সমুদ্রের তীরেই তখন থাকতেন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি।

আগে ব্রহ্মা, পিছে দেবতা থেকে গন্ধর্ব, কিন্নর, মুনি-ঋষির দল হাজির হলেন সেখানে। অনেক স্তব-স্তুতির পর ভগবান শ্রীহরির দেখা পেতে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন তাঁরা সামনে। বললেন—প্রভু, এই ঘোর দুর্দিনে আপনি ছাড়া আর কে আছে আমাদের রক্ষা করার। প্রবল হয়ে উঠেছে অসুরের দল। কোন কিছুই আর গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না। যাগ গেল, যজ্ঞ গেল। এবার আমরাও যেতে বসেছি। আপনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, আপনিই তার রক্ষক। এখন আপনার সৃষ্টিই যে ধ্বংসে হতে বসেছে। অসুরদের অত্যাচার আর যে সহ্য হয় না প্রভু। এর বিহিত আপনি না করলে আর কে করবে।

সব শুনলেন শ্রীহরি। ভালভাবে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন, সকলেই প্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে পড়েছেন। শুধু তাই নয়, দেখলেন প্রত্যেকের মনেই কিছু না কিছু পরিমাণ বাসা বেঁধেছে লোভ, মোহ আর রাগ। ওগুলো যতক্ষণ মনের ভেতর থাকবে, ততক্ষণ কার সাধ্য ওদের বাঁচায়। অপরদিকে অসুর-গুরু শুক্রাচার্যের হাতে মৃতসঞ্জীবনী। এই মন নিয়ে দেবতাদের সাধ্য কি, ওদের রোখে।

তারপর বললেন—দেখ বাপুরা, তোমরা আমার আপনজন। ওরাও যে আমার পর, তা নয়। তবুও ওদের চেয়ে তোমরা আমার প্রিয়। কিন্তু এখন যে অবস্থায় নিজেদের এনে দাঁড় করিয়েছ, তাতে আমি যা বলব, তা যদি তোমরা করতে রাজি থাক, তাহলে একটা উপায় বলতে পারি।

—প্রভু, আপনি যা বলবেন, আমরা তাই করতে রাজি আছি। সকলেই সম্মতি জানালেন।

—তাহলে আপাতত তোমাদের প্রথম কাজ হবে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা। শুধু সন্ধি নয়, এমন ভাব দেখাতে হবে, তারা যেন মোটেই তোমাদের শত্রু নয়। তারপর ভাবসাব জমিয়ে এই ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে হবে তাদের নিয়ে।

—সমুদ্র মন্থন কেন প্রভু।

—তোমাদের যা কিছু ঐশ্বর্য, যা কিছু উৎকৃষ্ট জিনিস ছিল, সব যে গিয়ে লুকিয়েছে ঐ সমুদ্রেরই তলায়। একটু হেসে বললেন শ্রীহরি—ওগুলো চলে গেছে বলেই তো তোমাদের এই দুরবস্থা। সমুদ্র মন্থন করতে করতে অনেক লোভনীয় জিনিস উঠবে। দেখ বাপুরা, সেগুলোর ওপর তোমাদের কিন্তু একটুও লোভ করলে চলবে না। শেষে উঠবে অমৃত। সেটি খেয়ে যদি তাজা হয়ে উঠতে পার, তাহলে তোমরা আবার নির্ভয়ে, নির্ভাবনায় থাকতে পারবে।

—ঐ বিশাল সমুদ্র কিভাবে মন্থন করা যাবে প্রভু।

—বিশালকায় মন্দর পর্বতকে তুলে এনে সমুদ্রের মাঝখানে বসিয়ে তাকে করবে দণ্ড (কাঠি), আর নাগরাজ বাসুকিকে করবে দড়ি। তার একদিক ধরবে তোমরা, আর একদিক অসুররা। তারপর যেমন করে ঘোল মওয়া হয়, তেমনি করে বাসুকিকে দিয়ে পাহাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রকে মুইতে থাকবে।

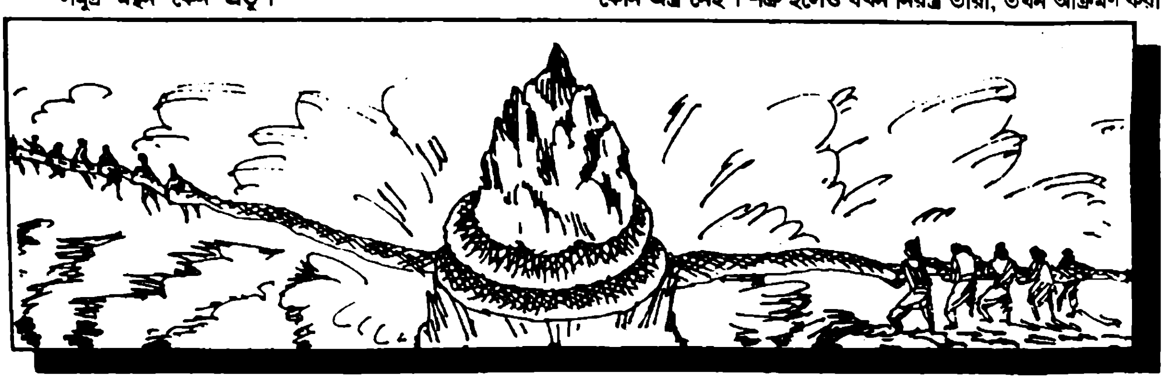
বলেই শ্রীহরি কোথায় যে অন্তর্ধান করলেন, কেউ আর খুঁজে পেলেন না। দেবতারাও ফিরলেন ক্ষীরসমুদ্র থেকে।

শ্রীহরি ঠিকই বলেছেন, অমৃত না খেলে দেবতাদের আর পরিত্রাণ নেই। অমৃত খেলেই একেবারে অমর। তখন যত প্রবল শত্রুই মারতে আসুক না কেন, প্রাণে আর মারতে পারবে না। কিন্তু একা দেবতাদের সামর্থ্য কোথায় যে ঐভাবে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত তোলেন ? সুতরাং কাজ উদ্ধারের জন্যে সাহায্য নিতে হবে সকলেরই।

সবাই মিলে এক জায়গায় বসে যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করলেন কিভাবে কি করা হবে। স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি যখন তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, তখন নতুন করে আর তাঁদের ভাববার কিছু নেই।

পাতালে বলির জমকালো প্রাসাদে জমকালো সভা। মাঝখানে সুবিশাল অপূর্ব এক সিংহাসন। তার দু-পাশে আরও অনেক সিংহাসন, এমনভাবে সাজানো, যেন সভার আকাশে আধখানা চাঁদ। বড় সিংহাসনে বসে স্বয়ং দৈত্যরাজ বলি। তাঁর দু-দিকে শম্বর, অরিষ্টনেমি, ময়, নমুচি, বল, পাক, জম্ভ প্রভৃতি মহাবল দানবপতিরা বসে। গুরু শুক্রাচার্যও বসে নিজের বিশেষ আসনে। চলছে জল্পনা-কল্পনা। নতুন করে দেবতাদের জব্দ করার ফন্দি-ফিকিরের আলোচনা চলছে।

হঠাৎ অসুরপুরে গোলমাল আর অসুর সেনাদের তর্জন-গর্জন কানে আসতেই দানবরাজ বলি সভা ছেড়ে উঠে দেখে, বেশ কয়েকজন দেবতাকে নিয়ে দেবরাজ আসছেন। কারো হাতেই কিন্তু কোন অস্ত্র নেই। শত্রু হলেও যখন নিরস্ত্র তাঁরা, তখন আক্রমণ করা



উচিত নয়—সেদিক থেকে বলিরাজের জ্ঞান যথেষ্ট। বলির হুকুমে প্রহরীরা দেবতাদের আর মারধোর না করে চারদিকে ঘিরে সাবধানে এনে দাঁড় করাল সভার মাঝখানে, রাজা বলি আর তাঁর অনুগতদের সামনে।

ব্যাপারটা চমকে ওঠার মত হলেও, একেবারে অবাক হয় নি বলি। ঝানু রাজনীতিবিদ সে। জানত, যেভাবে দেবকুল নিধন হচ্ছে, তাতে ওদের একদিন না একদিন নতি স্বীকার করতেই হবে সম্মান বাঁচাবার জন্যে। তাছাড়া, নিজেদেরও তো কিছু কম ক্ষতি হচ্ছে না। গুরু শুক্রাচার্য আর কতদিন সামাল দেবেন ? তাদেরও একদিন দেবতাদের সঙ্গে হয়ত একটা চুক্তি করতেই হতো। এখন দেবরাজ যখন নিজেই আগে এগিয়ে এসেছেন, দেখাই যাক।

—কি ব্যাপার দেবরাজ ! শত্রুপ্রাসাদে নিরস্ত্র ! একটু বিদ্রূপ করল দৈত্যরাজ বলি।

—ভাই বলি, ভগবান বিষ্ণুর আদেশেই তোমার কাছে এলাম। বললেন দেবরাজ।

বলিরাজ মনে মনে ভগবান বিষ্ণুকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করত। তাই দেবরাজের মুখে তাঁর নাম শুনেই নিজেকে সামলে নিল সে।

—কি বলে পাঠিয়েছেন তিনি ? আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল বলি।

—বললেন, তোমরা কেউই অমর নও। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে নিজেরা যেমন কলঙ্কের ভাগী হচ্ছ, পৃথিবীর তেমনি কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ত্রিভুবনের সব সম্পদ গিয়ে লুকিয়েছে সমুদ্রের তলায়। এমন কি, যে সুধা পান করলে মৃত্যু ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না, সেই অমৃতও লুকিয়েছে ক্ষীরসমুদ্রের নীচে। যুদ্ধ করতে গিয়ে সবই যদি চলে গেল, কি ভোগ করবে এরপর ? আর যদি অমরই না হতে পারলে, তবে ভোগ করেই বা কি আনন্দ পাবে ?

মন দিয়ে কথাগুলো শুনল বলি, শুনল আর সব দানবরাজেরা। ভাবল, ভগবান শ্রীহরির কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

—তাহলে এখন কি করতে হবে ? জিজ্ঞাসা করে বলিরাজ।

—বলছি কি, নিজেদের মধ্যে আপাতত এই লড়াই বন্ধ থাক। এসো, আমরা সকলে মিলে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে অমৃতকে উদ্ধার করি। দু-ভাই-এর দল আমরা ভাগ করে খাই। সমান সুখ ভোগ করি। তখন আমাদের মধ্যে এই রেষারেষিও থাকবে না।

একটু ভেবে নিয়ে বলল বলিরাজ—কথাটা মন্দ বল নি দেবরাজ। আমরা রাজি। কিন্তু ঐ বিশাল সমুদ্র কিভাবে মন্থন করা যাবে ?

—উপায়ও ঠিক করে দিয়েছেন ভগবান বিষ্ণু। বলেছেন মন্দর পর্বতকে কাঠি আর নাগরাজ বাসুকিকে দড়ি করতে। বাসুকির একদিক তোমরা, আর একদিক আমরা ধরে পাহাড়কে জলে দাঁড় করিয়ে ঘোরাতে থাকব।

—উত্তম প্রস্তাব। বলল বলিরাজ। তোমরা নিশ্চিন্তে গিয়ে যোগাড় কর, আমরা যাচ্ছি।

কাজ হাসিল হল দেখে মনের আনন্দে দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ চলে গেলেন। প্রাসাদে শত্রুপক্ষের আর কেউ নেই দেখে দৈত্যরাজ যেন আর এক উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠল। ফিসফিস করে সকলকে শুনিয়ে দিল—অমৃত উঠলে তার সবটা হবে আমাদেরই। এখনো আমাদের সে শক্তি আছে। দেবতাদের সাধ্য হবে না আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেবার। একবার অমর হতে পারলে, তুড়ি দিয়ে ওদের উড়িয়ে দিতে আর কতক্ষণ ? আর সব দানবরাজরাও বলির সঙ্গে একমত হয়ে চলল দেবরাজের সঙ্গে।

বলির প্রাসাদ থেকে কাজ উদ্ধার করে বেরিয়ে মনে মনে দেবতারা আর একবার ডাকলেন শ্রীহরিকে —প্রভু, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা। দেখো, অসুররা যেন ঐ অমৃতের একফোঁটাও খাবার সুযোগ না পায়।

এরপর সকলে মিলে হাজির নাগরাজ বাসুকির কাছে।

প্রস্তাব শুনে বাসুকি গেল কুঁচকে।

—তুমি এত ভাবছ কেন ? এখন একটু কষ্ট হবে ঠিকই। কিন্তু অমৃতের ভাগ পেলে, তখন তো এ কষ্ট তোমার আর থাকবে না। বললেন দেবরাজ।

শুনেই প্রলুব্ধ হয়ে উঠল বাসুকি —সত্যিই অমৃতের ভাগ আমায় দেবে ?

—বা রে, তুমি এত কষ্ট করবে, আর আমরা তোমাকে ঠকাবো ? তা কি কখনো হয় ?

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল বাসুকি।

সবাই মিলে এবার মন্দর পাহাড়ের কাছে গিয়ে তাকে টেনে তুলে ফেলল মাটি থেকে। ধরাধরি করে বয়ে আনতে লাগল ক্ষীরসমুদ্রের দিকে। যেমন উঁচু, তেমনি ভারী পাহাড়। সোনালী রঙ তার। বয়ে আনতে গিয়ে অমন সব বিশালকায়, বলশালী দৈত্যদেরও যেন কালঘাম ছুটে গেল। তবুও আনতেই হবে। কিছুটা আনার পর আর কোন রকমেই পাহাড়ের টাল সামলে রাখতে পারল না কেউই। হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তার তলায় চাপা পড়ে মরল কত যে দেব-দানব, তার ইয়ত্তা নেই। হাত ভেঙে, পা ভেঙে, চোট পেয়ে কতজন যে গড়িয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল, তাও গুণে শেষ করা যাবে না। দু দলই খুব হতাশ হয়ে পড়ল। এখনো অনেকখানি পথ। দেবতারা আকুল হয়ে উঠলেন। অসুররা বলাবলি শুরু করে দিল —দূর ছাই, মিছিমিছি এতগুলো প্রাণ গেল। দরকার নেই অমৃতে।

এমনি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ গরুড়ের পিঠে চেপে ভগবান শ্রীহরি নিজে সেখানে এসে হাজির। তাঁকে দেখে সকলেই তটস্থ হয়ে দাঁড়াল।

মুচকি হেসে শ্রীহরি বললেন সকলকে —এমনি সব পালোয়ান তোমরা যে সামান্য এই পাহাড়টাকে বয়ে নিয়ে যেতে হিমসিম খেয়ে গেলে।

বলেই একটা আঙুলে তিনি পাহাড়টাকে তুলে চাপিয়ে দিলেন গরুড়ের পিঠে। আর গরুড়ও তার বিশাল ডানা মেলে উড়ল আকাশে, যেন পিঠে তার কোন ভার-বোঝাই নেই।

শ্রীহরিকে অনুসরণ করে দেব-দানবের দল এবার খালি হাতেই আসতে লাগল ক্ষীরসমুদ্রের দিকে। আকাশপথে গরুড়ের পিঠে মন্দর। সমুদ্র-জলের একেবারে কিনারে গরুড় পাহাড়টাকে নামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ইতিমধ্যে সকলেই পৌঁছে গেছে সেখানে। এবার ঠেলে জলে নামিয়ে দিলে মন্থন করতে আর কোন অসুবিধেই নেই। কিন্তু বাসুকি ! বাসুকি কোথায় গেল ? এতক্ষণ তো নাগরাজ সঙ্গে সঙ্গে ছিল। হঠাৎ কোথায় পালাল আবার ?

চারদিকে শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজি। দেখা গেল, বহুদূরে আড়ালে সে লুকিয়ে। কোনমতেই আর বেরিয়ে আসতে রাজি নয়।

ব্যাপারটা বুঝলেন শ্রীহরি। সকলকে আশ্বাস দিয়ে বললেন —ঠিক আছে, ও যাতে আসে তার বন্দোবস্ত করছি। বলে তিনি তাঁর বাহনকে বললেন —গরুড়, এখন তুমি যাও। আবার যখন ডাকব, তখন আসবে, কেমন?

প্রভুর আদেশ। গরুড় চলে যেতেই শত্রুভয় থেকে মুক্ত হয়ে বাসুকি বেরিয়ে এল এবার। বিশাল তার লম্বা দেহটাকে সবাই মিলে জড়ালো পাহাড় ঘিরে। তারপর মন্দরকে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে মন্থন করবে কি, জলের নিচে পাহাড় যেন ক্রমশ তলিয়েই যেতে যেতে ডুবেই গেল। আবার হতাশ হয়ে পড়ল সকলেই। স্বয়ং শ্রীহরিরই পরম আত্মীয় দেবসম্ভূতির ছেলে অজিত, এমন একটা বিরাট কাজ পণ্ড হয়ে যেতে বসেছে দেখে ভগবানের নির্দেশেই নিজে অতি বিশালকায় এক কচ্ছপের মূর্তি ধরে চলে গেল সমুদ্রের তলায়। তারপর নিজের বিশাল উঁচু পিঠের ওপর পাহাড়কে তুলে ভাসিয়ে ধরল সমুদ্রের জলে। জেগে উঠল পাহাড়। স্বচ্ছন্দে এবার মন্থন করা যেতে পারে দেখে আগেভাগেই শ্রীহরি নিজে এগিয়ে এসে ধরলেন বাসুকির মুখ। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল অসুররা। সাপের লেজের দিক তারা কোনমতেই ধরবে না। লেজ ধরা মানেই সমূহ ক্ষতি। এত কষ্ট করার পর ক্ষতি স্বীকার করতে মোটেই রাজি নয় তারা।

শ্রীহরি বুঝতে পেরে অসুরদের জন্য হাসতে হাসতে বাসুকির মুখের দিক ছেড়ে দিয়ে এসে ধরলেন লেজের দিক। শুরু হল ক্ষীর সমুদ্র মন্থন।

মুখের দিকে অসুর আর লেজের দিকে দেবতারা। দুদলের টানাটানিতে কচ্ছপের পিঠে ভাসমান মন্দর বিকট ঘড়ঘড় শব্দ তুলে লাট্টুর মত ঘুরতে শুরু করল জলে। তোলপাড় হয়ে উঠল জল। ঘুলিয়ে গেল তার রঙ। মকর, সাপ, তিমি, কুমীর প্রভৃতি জলের প্রাণীরা আকুল হয়ে উঠল। জল থেকে উঠতে থাকল ফেণা। ফেণা আবার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মিশে যেতে লাগল বাতাসে। বিশালকায় কচ্ছপের পিঠে অবিরাম ঘড়...ঘড়...ঘড় বিশাল আলোড়ন তুলে ঘুরে ফিরে সমুদ্র মন্থন করে চলেছে মন্দর। হাজার মাথা বাসুকির মুখ আর চোখ থেকে যেন বেরিয়ে আসতে লাগল আগুনের হল্কা। নিঃশ্বাসে তপ্ত বায়ু। দানবদের শরীর যেন ঝলসে যেতে লাগল। ক্রমশ যেন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল তারা। পৌলম, কালেয়, বলি, ইল্বল নামে বিশালকায় অসুররা একদিকে যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল, অপরদিকে দেবতারাও ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন দেখে শ্রীহরি এবার নিজে এসে যোগ দিলেন দেবতাদের সঙ্গে। উদ্যম যেন মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল আবার শতগুণ। কশ্যপের ছেলেরা আবার দুরন্ত উৎসাহে শ্রীহরির সঙ্গে শুরু করল অমৃতের জন্য মন্থন।

প্রথমেই সমুদ্র থেকে উঠে এল হলাহল নামে এমন তীব্র এক বিষ যে তার ধারে-কাছে থাকে এমন সাধ্য কার? অথচ এই বিষকে আগে সরাতে না পারলে বাকি কাজও করা যাবে না। অমৃতও মিলবে না। অনেক ভেবেচিন্তে দেবতারা ঠিক করলেন, এই বিষ সরাতে পারেন একমাত্র সদাশিব। তিনিই সকলের মধ্যে একমাত্র সাহসী। সবাই ছুটলেন কৈলাসে শিবের কাছে। আত্মভোলা, সর্বজয়ী শিব দেবতাদের অনুরোধ শুনে তখুনি এলেন ক্ষীরসমুদ্রে। হাতে তুলে সেই বিষ তিনি পান করতে শুরু করলেন। এক সময় সব বিষ যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর গলাটাই একেবারে নীল হয়ে গেল। সেই থেকে শিবের আর এক নাম হয়ে গেল 'নীলকণ্ঠ'। যাতে সেই হলাহলের এক ফোঁটাও বাইরে কোথাও না পড়ে, তাই বেশ শক্ত করেই আঁজলা ভরে শিব তা পান করলেও যে দু-চার ফোঁটা পড়েছিল মাটিতে সেটুকু খেয়েই সাপ, বিছে আর বিষাক্ত গাছ গাছড়ার এত বিষ!

যাই হোক, সমুদ্র বিষমুক্ত হলে আবার শুরু হল মন্থনের কাজ। এবার প্রথমেই উঠল সেই কামধেনু সুরভি গাই। যার দুধ আর ঘি দিয়ে ঋষিরা করতেন যজ্ঞ। উঠে এল উচ্চৈঃশ্রবা নামে অতি উৎকৃষ্ট



এক সাদা হাতি। বলির খুব ইচ্ছে জাগল হাতিটা ধরে রাখে। কিন্তু চোখের পলকে সে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। উঠে এল গজরাজ ঐরাবতের সঙ্গে আটটা মদ্দা আর আটটা মাদী হাতি। সুন্দর সুন্দর সব জিনিস দেখে লোভাতুর হয়ে উঠতে লাগল অসুররা। কিন্তু একটাকেও ধরতে পারল না। শ্রীহরির নির্দেশে দেবতারা কিন্তু নিজেদের এত কঠিন করে রেখেছিলেন যে মনের ভেতর কোন লোভ জাগতে দেন নি। এরপর মহাসমুদ্র থেকে পদ্মরাগ কৌস্তুভ মণি উঠে এসেই বিষ্ণুর অঙ্গের অলঙ্কার হয়ে গেল। উঠল পৃথিবীর সর্বইচ্ছা পূরণকারী স্বর্গোদ্যানের সেই পারিজাত। উঠে এল অপ্সরারা। এরপর উঠে এলেন অপরূপ রূপ-কান্তি নিয়ে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। তাঁর মৃদু হাসিতে ভরে গেল চারদিক। দেবতা, অসুর সকলেই তাঁকে লাভ করার জন্য এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে থেমে গেল মন্থনের কাজ। তাই দেখে মুচকি মুচকি হাসলেন ভগবান বিষ্ণু। একবার সবার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীদেবী তাঁর হাতের মালাটি সোজা নিয়ে গিয়ে পরিয়ে দিলেন বিষ্ণুর গলায়। তখন আর কারও কিছু বলার থাকল না। শুরু হল আবার মন্থনের কাজ। উঠে এলেন বারুণী। ইনি হলেন সুরার (মাদক দ্রব্যের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভগবান শ্রীহরির অনুমতি নিয়ে তাকে গ্রহণ করল অসুররা।

ঠিক এর পরেই সমুদ্র জল থেকে উঠে এলেন দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। যেমন দীর্ঘ, তেমনি বলিষ্ঠ। গায়ের রঙ শ্যামল, চোখদুটি যেন রক্তজবা। পরনে পীতবসন, দুটি কানে সোনার বালা। ইনি

হলেন ধন্বন্তরি। উঠে এলেন তিনি অমৃত-কলস হাতে।

ওঠা মাত্রই বলির পরামর্শমত মুহূর্তের মধ্যে কাজ হয়ে গেল। বাসুকির মুখ ফেলে সদলবলে অসুররা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধন্বন্তরির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল অমৃতের কলস। তাই দেখে দুর্বল দেবতারা হায়···হায় করে উঠে শরণাপন্ন হলেন শ্রীহরির।

দেখে-শুনে শ্রীহরি বললেন —ঠিক আছে, এ নিয়ে তোমাদের হা-হুতাশ করতে হবে না। তোমরা যখন আমার ওপরই ভরসা করে আছ, তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা আমি করছি, যাতে তোমরা অমৃত পাও।

ওদিকে অসুরদের মধ্যে মহা উল্লাস, মহা ধুমধাম শুরু হয়ে গেছে। অমৃত এসে গেছে হাতের মুঠোয়, আর তাদের পায় কে ?

কিন্তু গোলমাল বেধে গেল খাওয়া নিয়ে। কে আগে খাবে ? এ বলে আমি আগে, ও বলে আমি আগে ! কেউ যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না—যদি সবটাই খেয়ে ফেলে ! ফলে অমৃতের কলসী নিয়ে নিজেদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল কাড়াকাড়ি। কাড়াকাড়ি থেকে শেষে যখন প্রায় মারামারি হবার উপক্রম, এমন সময় কোথা থেকে অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। তাকে দেখেই অসুরদের মাথা গেল ঘুরে। এমন এক রমণীর কাছে কোথায় লাগে লক্ষ্মী ! কাড়াকাড়ি, মারামারি ভুলে সকলেই গিয়ে ধরল তাঁকে। বলল —শোন, আমাদের মধ্যে এই বিবাদ তুমিই মিটিয়ে দাও। তোমারই হাতে এই কলসী আমরা তুলে দিচ্ছি। তুমিই ভাগ করে দাও।

রমণী জিজ্ঞাসা করল —আমাকে বিশ্বাস করছ তো ?

অসুররা সকলে একবাক্যে বলল —চোখ বুজে বিশ্বাস করছি।

—তাহলে, আমি যা করব, তাতে তোমরা কোন ঝামেলা যদি না কর, তবে আমি এ কাজ করতে পারি।

—কথা দিচ্ছি, তুমি যা করবে, আমরা তা চোখ বুজে মেনে নেব।

—আমি ঠিক করেছি কি বেঠিক করেছি, তা নিয়েও কোন আলোচনা করা চলবে না বলে রাখছি। ভেবে দেখ এর পরেও আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছ তো ?

—তুমি যা করবে, আমরা তাই মেনে নেব, কথা দিচ্ছি ! একটি কথাও বলব না।

—বেশ। বলে সেই রমণী অমৃত কলসী নিয়ে যেন নাচতে নাচতে চারদিক ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হল দেবতাদের মাঝে। আর তাদেরই মুখে মুখে ঢেলে দিতে লাগল অমৃত। দানবরা একটু অবাক হলেও যেহেতু কথা দিয়েছে কিছু বলবে না, তাই চুপ করে রইল আর ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগল। অসুরদের মধ্যে রাহু গোপনে সূর্য আর চন্দ্রের মাঝে ভিড়ে গিয়ে যেই পান করতে যাবে অমৃত, অমনি তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল সূর্যের কাছে। গলা থেকে পেটে নামবার আগেই একেবারে তার মাথাটা থেকে দেহটা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন দেবতারা। রাহুর দেহটা নষ্ট হয়ে গেল বটে, কিন্তু মুখটা অমর হয়ে রইল। আর সূর্যের ওপর এত রেগে গেল সে যে, আর স্থির থাকতে না পেরে এক এক দিন সূর্যকেও গ্রাস করে ফেলতে শুরু করল সে। আজও তার রাগ কমে নি। আজও সে গ্রাস করে— যাকে বলা হয় সূর্যগ্রহণ।

যাই হোক, অসুররা আর অমৃতের ছিটে-ফোঁটাও পেল না। তাই দেখে মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তারা। এদিকে সেই রমণী চোখের পলকে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, কেউ আর তার কোন সন্ধানই করতে পারল না। এখন আর দানবদের বুঝতে বাকি রইল না যে, ভগবান নিজেই তাদের ঠকালেন।

এবার আক্রোশে ফুলে উঠল অসুরের দল। অমৃত খেয়ে, আর ঐ সব ভাল ভাল জিনিস পেয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট বলশালী হয়ে উঠেছেন দেবতারা ঠিকই, তবু অসুররা প্রবল-পরাক্রম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। খাটিয়ে-খুটিয়ে নিয়ে শেষে প্রতারণা ! এ কোন মতেই বরদাস্ত করা যায় না। এর সমুচিত জবাব দিতেই হবে। বেধে গেল ক্ষীর সমুদ্রের ধারে তুমুল কাণ্ড। এক এক দানবরাজ ঝাঁপিয়ে পড়ল এক এক দেবতার ওপর। দানবরাজ বলি স্বয়ং ঘোরতর সংগ্রাম শুরু করে দিল দেবরাজের সঙ্গে। ঐরাবতের পিঠে দেবরাজ, আর নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দানবরাজের বিমান। বলির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে শেষে দেবরাজ বজ্র দিয়ে বিমানসহ বলিকে নিহত করলেন। বলিবন্ধু জম্ভাসুর রোষে আক্রমণ করল ইন্দ্রকে। প্রচণ্ড সেই লড়াইয়ে প্রাণ হারাল জম্ভাসুর, পাক, এমন কি কালনেমির মত দুরন্ত দানবও। এবার এগিয়ে এলেন নমুচি। বীরবিক্রমে তার দিকে বজ্র ছুঁড়েও তাকে মারতে না পেরে বেশ ভীত হয়ে পড়লেন ইন্দ্র। দৈববাণী হল —শুকনো অথবা ভিজে যে কোন অস্ত্রে নমুচি অবধ্য। ইন্দ্র তখন সুকৌশলে সমুদ্রের ফেণা দিয়ে নিহত করলেন তাকে। অমর দেবতারা ঠিকই রইলেন, অপরদিকে হতাহত অসুরদের দেহে ক্ষীরসমুদ্রের তীর প্রায় ঢেকে গেল দেখে নারদ এলেন সেখানে। বললেন —অমৃত খেয়ে অমর তো হয়েছ। আর কেন মিছিমিছি এদের মারছ ?

নারদের কথায় দেবতারা যুদ্ধ শেষ করে ফিরে গেলেন স্বর্গরাজ্যে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এসে বলিরাজের সঙ্গে আরও যাদের পারলেন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়ে আবার প্রাণ সঞ্চার করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তাদের রাজ্যে।

সেই সঙ্গে শেষ হল ভয়াবহ এক বিশ্বযুদ্ধ।

সুকন্যার ইতিকথা

বৈবস্বত মনুর চতুর্থ পুত্র, পৃথিবীপতি ইক্ষ্বাকুর এক ভাই শর্যাতি। যেমন ধর্মনিষ্ঠ, তেমনি বেদজ্ঞ হিসেবে সকলেরই তিনি ছিলেন খুব প্রিয়। যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল এত গভীর যে ঋষিরাও তাঁর পরামর্শ নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

মনু-পুত্র এই শর্যাতির ছিল এক মেয়ে। নাম তার সুকন্যা। সুকন্যাই বটে। চাঁদের মত মুখ, পদ্মের পাপড়ির মত চোখ, পদ্মের ডাঁটার মত তার দেহের গড়ন। যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল তার

গুণ। শর্যাতি খুব ভালবাসতেন মেয়েকে। শুধু শর্যাতি কেন, প্রায় সকলেই তাকে ভালবাসত, স্নেহ করত, তার মঙ্গল কামনা করত।

একদিন মেয়েকে নিয়ে বনে বেড়াতে গেছেন শর্যাতি। বনে বেড়াতে যাওয়ার মত আনন্দ তখনকার দিনে আর কিছু ছিল না। সখীদের নিয়ে সুকন্যা বাবার সঙ্গে গেল বনে বেড়াতে।

কত রকমের সব গাছ। গাছে গাছে কত রকমের, কত রঙের সব ফুল ফল। দেখে কিশোরী সুকন্যার সে কি আনন্দ! খাঁচাছাড়া পাখির মত সখীদের নিয়ে সুকন্যা শুরু করে দিল নানা রকমের ছেলেমানুষী খেলা। মেয়ের আনন্দে ভরে ওঠে বাপের মনও। শর্যাতির অনুচর-সহচররাও দারুণ খুশি।

বেড়াতে বেড়াতে তারা সবাই এল মনোরম এক তপোবনে। পর্ণকুটির। কুটির ঘিরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নানারকম সব মন ভোলানো ফুলের গাছ। গাছে গাছে ফুটে আছে অজস্র ফুল। কার এই আশ্রম, সুকন্যার মনে জানার ইচ্ছে জাগলেও ফুল দেখে, সব ভুলে সখীদের নিয়ে সে শুরু করে দিল ফুল তুলতে। এ গাছ, ও গাছ, সে গাছ করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে মেয়ে দেখল এক উই-এর ঢিবি। দেখল, ঢিবির ভেতর থেকে যেন পিটি পিটি করে জ্বলছে পাশাপাশি দুই জোনাকি।

কিশোরী সুকন্যার মনে তখন খেলার নেশা। কিভাবে এখানে এল এই ঢিবি, আবার ঢিবির ভেতর থেকে জোনাকির মত জ্বলছে এ দুটো কি—এসব ভাববার মত সময় কোথায় তখন? খেলার ঝোঁকে কাঁটা তুলে টুকটুক করে সুকন্যা চোখের পলকে বিঁধিয়ে দিয়ে বসল সেই দুই চোখ। যেই বিঁধিয়ে দেওয়া, উই-এর ঢিবি ভিজিয়ে গলগল্ করে নেমে আসতে লাগল রক্ত—যেন রক্তের বন্যা। দেখে তো মেয়ের আনন্দ গেল উড়ে, ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল সখীদের। ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুকন্যা সেই ঢিবির সামনে।

ওদিক হল আর এক কাণ্ড।

শর্যাতির সঙ্গে যারা ছিল, হঠাৎ তাদের মল-মূত্র বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। দেখে শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেলেন শর্যাতি। তিনি জানতেন, এই আশ্রম হল মহামুনি ভৃগুর পুত্র চ্যবন মুনির। পবিত্র এই আশ্রমে তাঁদের মধ্যে কেউ কি কোন অন্যায় কাজ করে বসল? টনক নড়ল শর্যাতির—মেয়ে কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখেন, একটা উই ঢিবির সামনে কাঠের মত দাঁড়িয়ে সখীদের নিয়ে সুকন্যা। আর ঢিবি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা।

দেখেই তো শর্যাতি ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। এ কি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল তাঁর মেয়ে! ভৃগুবংশের মুনিরা এমনিতেই দারুণ রাগী। সেই বংশের চ্যবন মুনিকেই অন্ধ করে দিল তাঁর মেয়ে!

ঠিক তাই। সুদীর্ঘকাল ধরে মুনিবর যোগাসনে বসে তপস্যা করছিলেন। তাঁর আপাদমস্তক ঢেকে গিয়েছিল উই মাটিতে। তবুও তিনি ছিলেন ধ্যানমগ্ন। আজ হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় ধ্যানভঙ্গ হয়ে গেছে তাঁর। সেই সঙ্গে হলেন অন্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে শর্যাতি হাঁটু মুড়ে বসে মাটি সরিয়ে বের করলেন চ্যবন মুনিকে। দেহে মাংসের নামগন্ধ নেই। তা খেয়ে খেয়ে পেট ভরিয়েছে উই-এর দল। রয়েছে শুধু কঙ্কালের কাঠামোটা। গাছ-পাথর নেই মুনির বয়সের।

—মুনিবর, আমার মেয়ে সুকন্যা যা করেছে তার কোন ক্ষমা নেই। আদেশ করুন, কিভাবে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব।

চ্যবন মুনি বললেন—শর্যাতি, তুমি ধার্মিক। তোমাকে আমি আর কি উপদেশ দেব? এতদিন চোখ ছিল, স্বাধীন ছিলাম। এখন এই অন্ধের ভার তোমার মেয়ে ছাড়া আর কে বইবে বল?

কিছুমাত্র অযৌক্তিক কথা বলেন নি মুনিবর। বৃদ্ধ হলেও চ্যবন মহামুনি।

আর সুকন্যাও এমন মেয়ে, কোন বাদ-প্রতিবাদ না করে অতি বৃদ্ধ চ্যবন মুনিকেই নিজের স্বামীজ্ঞানে সেবা শুশ্রূষা করতে লেগে পড়ল। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পর্ণকুটিরে, জনস্থান ছেড়ে জনহীন আশ্রমে, সখীদের সঙ্গে খেলাধুলো ছেড়ে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামীর সেবা। মনে কোন ক্ষোভ নেই সুকন্যার। বরং এক নতুন জীবনের আনন্দে সেই বয়সেই প্রায় তপস্বিনী হয়ে উঠল সে।

দিনের পর দিন যায়, বছরের পর বছর। অন্ধ স্বামী চ্যবন। তাঁর সেবা-পরিচর্যায় কোথাও কোন ত্রুটি নেই সুকন্যার। নেই কিছুমাত্র অবহেলা।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে দুই ভাই অশ্বিনীকুমার এলেন চ্যবন মুনির আশ্রমে, মুনিকে দেখতে। দুই ভাই-ই হলেন দেববৈদ্য। হেন রোগ-বালাই, অসুখ-বিসুখ নেই যে তাঁরা ইচ্ছে করলে চট করে ভাল



না করে দিতে পারেন। তাই সকলের কাছেই তাঁদের সম্মান খাতির, সম্মান মর্যাদা। সকলে তাঁদের খাতির করলেও বৈদ্য বলে ঠিক দেবতার মর্যাদা দিতেন না। যাগযজ্ঞ হলে দেবতারা নিমন্ত্রিত হতেন সোমরস পান করার জন্যে, কিন্তু অশ্বিনীকুমাররা হতেন না। আর সে অধিকারও তাঁদের ছিল না।

যাই হোক, অশ্বিনীকুমাররা আসতেই চ্যবন মুনি তাঁদের যথোচিত সম্মান দেখিয়ে বসালেন। সুকন্যাও তাঁর কর্তব্য পালন করল।

তারপর চ্যবন বললেন—দেখ, আমি অতি বৃদ্ধ, তার ওপর অন্ধ। আমার বড় ইচ্ছে যৌবন ফিরে পেতে। তোমরা যদি আমার ইচ্ছে পূরণ করতে পার, তাহলে যজ্ঞে যাতে তোমরাও সোমরস পান করতে পার, তার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

সোমরস পানের অধিকার পাক আর নাই পাক, সুকন্যার মত অমন এক ফুটফুটে মেয়েকে বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত অমন স্বামীর সেবা যত্ন করতে দেখে তাঁদের মনে একটু মায়াই জেগেছিল।

এখন চ্যবনের অনুরোধ শুনে বললেন—বেশ, আমাদের হাত ধরে আসুন।

চ্যবন মুনি ওঁদের হাত ধরলে তাঁরা তাঁকে নিয়ে গেলেন অল্প একটু দূরে এক হ্রদে। জলে নামিয়ে দিয়ে বললেন—স্নান সেরে উঠে আসুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নান সেরে হ্রদের সেই জল থেকে উঠে এলেন তিন অপরূপ যুবক। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দর। তিনজনেরই গলায় পদ্মের মালা, কানে কুণ্ডল। এসে দাঁড়ালেন সুকন্যার সামনে।

অশ্বিনীকুমার দুভাই বললেন—সুকন্যা, এঁদের মধ্যে যিনি তোমার স্বামী তাঁকে বেছে নাও।

সুকন্যা পড়ল মহা ফ্যাসাদে। একই মুখ, একই চোখ, একই দেহের গড়ন। তার স্বামী চ্যবন মুনিকে এদের মধ্য থেকে কেমন করে সে বেছে নেবে ? যাঁকে বেছে নেবেন, তিনি যদি তাঁর প্রকৃত স্বামী না হন, তাহলে যে কলঙ্কের শেষ থাকবে না।

দারুণ বিভ্রান্ত হয়ে সুকন্যা দেখল, অশ্বিনীকুমারদের সাহায্য ছাড়া এ বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নেই।

সুকন্যার স্বামীভক্তি দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন অশ্বিনীকুমাররা। তাঁরাই শেষে তাঁদের মধ্য থেকে নব্য যুবক আসল চ্যবনকে সুকন্যার কাছে দিয়ে চলে গেলেন অন্যত্র। আর চ্যবন মুনিও সুকন্যাকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে গুছিয়ে শুরু করে দিলেন ঘর-সংসার। সুকন্যারও মন ভরে উঠল পরম আনন্দে।

বহুদিন ধরে হঠাৎ নানা ঝামেলায় পড়ে মেয়ের আর কোন খবর নিতে পারেন নি শর্যাতি। তার ওপর কদিন ধরে খুবই আনচান করছিল মনটা। তাই আর থাকতে না পেরে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে শর্যাতি এলেন চ্যবন মুনির আশ্রমে মেয়েকে দেখতে।

এসেই দেখেন, কোথায় সেই জরাগ্রস্ত চ্যবন মুনি ! তার জায়গায় অপূর্ব দেহকান্তি নিয়ে এক নব্য যুবক। আর তাঁর মেয়ে সুকন্যা সেই যুবকের সঙ্গে বসে বসে আলাপ করছে। দেখামাত্রই মনু বংশের রক্ত দপ করে জ্বলে উঠল শর্যাতির মাথায়। ছিঃ ছিঃ, তাঁর মেয়ে শেষে অধর্ম করে বসল ? অতবড় একজন মুনির কাছে তাঁকে আবার অপরাধী করল ? মুখে যা এল, তাই বলে মেয়েকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন শর্যাতি।

সুকন্যা কোন প্রতিবাদ না জানিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে বলল—বাবা, তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি তো তোমারই মেয়ে। যাঁর হাতে তুমি আমায় তুলে দিয়েছিলে, ইনিই সেই ভৃগুপুত্র চ্যবন।

তারপর যখন সব ঘটনা শুনলেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন শর্যাতি। কন্যা সুকন্যাকে প্রাণঢেলে আশীর্বাদ করে মনের আনন্দে ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে।



দুর্বাসার দর্পনাশ

ব্রহ্মর্ষি নাভাগার ছেলে অম্বরীষ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হয়েও দিন কাটাতেন রাজর্ষির মত। অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী, সবই তাঁর বশীভূত। ইচ্ছে করলে তিনি আরও সম্পদ বাড়াতে পারতেন, বাড়াতে পারতেন নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি। কিন্তু সেসব চিন্তা তার মনে কখনও জাগত না। যেমন ছিল না লোভ, তেমনি ছিল না ধনসম্পদের ওপর কোন মোহ বা মমতা। বিষ্ণুর পরম ভক্ত অম্বরীষ জীবনধারণের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই মাত্র ভোগ করতেন।

কেনই-বা তা হবে না ? কেমন বাবার ছেলে, সেটা তো আবার দেখতে হয়। বাবা নাভাগা অল্প বয়সেই ব্রহ্মচারী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে থেকে গিয়েছিলেন গুরুকুলে। ভাই যে কোন দিন আবার সংসারে ফিরে আসতে পারে, তা দাদারা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। নিজেরা সংসারী হয়ে বাপের যা সম্পত্তি আর বিষয়-আশয় ছিল, নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিয়ে মেজাজে ভোগ করছিল। গুরুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করে হঠাৎ একদিন নাভাগা ফিরে আসতেই নড়েচড়ে উঠল দাদারা। নিজেদের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করে ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিল।

নাভাগা এসে জিজ্ঞাসা করলেন দাদাদের—দাদা, বাবার বিষয়-আশয় তো দেখছি বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই ভাগ করে নিয়েছ। তা আমার ভাগে কি রেখেছ ?

একেবারে মুখস্থ করা মোক্ষম জবাব পেলেন নাভাগা—কেন ? তোমার ভাগও তো ঠিক করেই রেখেছি ভাই। আমাদের বাবা পড়েছেন তোমার ভাগে। তুমি নিয়ে যাও।

যেন আকাশ থেকে পড়লেন নাভাগা। বাবার যা কিছু ছিল আয়ের পথ, সেগুলি নিজেরা নিয়ে, বাবাকে ভিখারি করে, চাপিয়ে দিল দাদারা শেষে এক ভিখারির ঘাড়ে। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। শুধু বাবাকে বললেন—বাবা, দাদারা আপনার দায়িত্বভার দিয়েছেন আমার ওপর।

শুনে নাভাগার বাবা বলেছিলেন—এর জন্য দুঃখ করো না

বাবা। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ওরা যদি সুখী হয় হোক। আমি যা বলি, তুমি যদি তা করো, তাহলে তোমার কখনো অভাব হবে না।

—বলুন বাবা। জানতে চাইলেন নাভাগা।

—আঙ্গিরস মুনিরা ছ-দিনের এক যজ্ঞ করছেন। যদিও তাঁরা খুবই মেধাবী, তবুও শেষদিনের মন্ত্র উচ্চারণে ওঁদের বিভ্রান্তি আসবে। তুমি থেকে তা ঠিক করে দিও। তাঁরা খুশি হয়ে চলে যাবার সময় যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন তোমায় দিয়ে যাবেন। তাতেই তোমার চলে যাবে।

নাভাগাও ঠিক সেই মত কাজ করলেন সেখানে গিয়ে। মুনিরাও তাঁকে দিয়ে গেলেন যজ্ঞশেষের সুপ্রচুর ধন-সম্পদ। কিন্তু যেই নাভাগা তা নিতে যাবেন, যজ্ঞভূমি ভেদ করে যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন মিশমিশে কালো এক পুরুষ। বাধা দিলেন নাভাগাকে—কার ধন তুমি নিয়ে যাচ্ছ? এ যজ্ঞভূমির সব ধন আমার।

—কেন? মুনিরা তো এসব আমাকেই দিয়ে গেছেন। বললেন নাভাগা।

—বেশ। তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করে এস, এখানকার এই ধনে কার অধিকার?

নাভাগাও এলেন বাবার কাছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, দক্ষযজ্ঞের পর ঋষিরা ঐ যজ্ঞভূমির যাবতীয় ধন রুদ্রদেবকেই দিয়ে গেছেন।

শুনে নাভাগা আবার ফিরে গেলেন যজ্ঞভূমিতে। বললেন—আমি না জেনে যে অন্যায় করতে গিয়েছিলাম রুদ্রদেব, তার জন্য আমায় আপনি ক্ষমা করুন। বাবা বলেছেন, এসব ধন আপনার। আপনি নিশ্চিন্তে নিয়ে যান।

নাভাগার সততা আর নির্লোভ মন দেখে খুবই খুশি হয়ে রুদ্রদেব নিজে কিছু না নিয়ে তাঁকে সব দিয়ে গিয়েছিলেন। আর নাভাগাও লোভশূন্য থেকে তা ব্যয় করেছিলেন সৎ পথেই।

অধিপতি অম্বরীষ তো তাঁরই ছেলে। কেনই বা অমন নির্লোভ আর নিস্পৃহ হবেন না? তার ওপর এমন অসাধারণ বিষ্ণুভক্ত তিনি যে, যাতে তাঁর কোন অনিষ্ট না হয়, সে জন্যে বিষ্ণু নিজের চক্রকে রেখেছিলেন তাঁর পাহারায়।

এহেন অম্বরীষ সারা বছর ধরে পালন করলেন দ্বাদশীব্রত। যতগুলি ব্রত আছে, তার মধ্যে এটি হল শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় ব্রত। ভাল ভাল বস্ত্র, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পুজো করে সন্তুষ্টচিত্তে করলেন ব্রাহ্মণদের পুজো। তাঁদের দান করলেন ষাট কোটি বাছুর সমেত শান্ত দুগ্ধবতী গাই, গরু, সোনার শিং আর সোনার খুর। আশীর্বাদ করতে করতে দান গ্রহণ করে চলে গেলেন ব্রাহ্মণরা। শেষ দিনে পারণ অর্থাৎ ব্রতের উদ্‌যাপন। স্নান সেরে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ভূরিভোজ করিয়ে নিজে আহার করতে বসবেন, এমন সময় দুর্বাসা মুনি সেখানে এসে হাজির। রাজাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আপ্যায়ন জানিয়ে বললেন, মুনিবর, আপনি অন্ন সেবা করে আমার ব্রত উদ্‌যাপন সার্থক করুন।

দুর্বাসা বললেন—অবশ্যই, আমিও ক্ষুধার্ত। একটু সবুর কর, আমি স্নানটা সেরে আসি। বলে কালিন্দী গিয়ে স্নান সেরে জপে এমন তন্ময় হয়ে গেলেন যে কতখানি সময় চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই ছিল না।

অপেক্ষা করতে করতে অম্বরীষ ক্রমশ অধীর হয়ে উঠছেন। মুনিকে তিনি নিজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অন্নগ্রহণ করতে। আগে মুনিবর সেবা গ্রহণ না করলে নিজে খেতে পারেন না। ওদিকে আবার সময়ও বেশি হাতে নেই। ব্রতশেষে পারণ যদি ঠিক সময়ে করা না যায়, তাহলে যে ব্রতই হয়ে যাবে বৃথা। উভয়সঙ্কটে পড়ে অম্বরীষ শেষে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করে নিজেই খেয়ে নিলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই দুর্বাসা ফিরে এসে যখন সব দেখলেন, তখন তাঁকে আর দেখে কে? দুর্বাসা কি পরিমাণ রাগী, তা তো জানো। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই।

গর্জন করে উঠলেন দুর্বাসা তাঁর লাল চোখ নিয়ে—কি, এত বড় স্পর্ধা তোর? নিমন্ত্রণ করে অপমান! তুই মর। বলেই নিজের মাথার একগোছা বিশাল লম্বা জটা ধরে তা আছাড় দিলেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গ ত্রিশূল হাতে বিকটাকার এক মারণ দেবতার আবির্ভাব হল। দুর্বাসা তাকে হুকুম দিলেন—পাপাচারী ঐ অম্বরীষকে এখুনি ধ্বংস কর।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে কৃত্যা অর্থাৎ সেই মারণ দেবতা যেই খানিকটা শূল উঁচিয়ে ছুটে গেল অম্বরীষের দিকে, অমনি কোথা থেকে হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল চক্র। সে যেন বনবন শব্দে ঘুরন্ত এক তীক্ষ্ণধার জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। কাছাকাছি আসতেই তার তেজে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কৃত্যা। তারপর দুর্বাসা বড় বড় চোখ মেলে দেখলেন সেই চক্র বনবন করে ছুটে আসছে তাঁরই দিকে। তখন কোথায় গেল তাঁর রাগ। প্রাণভয়ে সেখান থেকে দিলেন দৌড়। হাওয়ার বেগে ছোটেন দুর্বাসা, পেছনে ওড়ে জটা। তার পেছনে তাড়া করে আসে চক্র। ছুটতে ছুটতে দুর্বাসা এসে আছড়ে পড়লেন ব্রহ্মার কাছে।

—ঠাকুর, আমাকে বাঁচাও।

—কেন, কি হয়েছে দুর্বাসা? জিজ্ঞেস করেন ব্রহ্মা।

—দেখছ না, আমাকে মারবে বলে ছুটে আসছে অম্বরীষের চক্র।

ব্রহ্মা বললেন—তাই তো বটে। কিন্তু দুর্বাসা, তোমার মত মুনির তপস্যাই যখন ওকে রুখতে পারল না, তখন বিষ্ণুর ঐ চক্র রোখার সাধ্য কি আমাদের? কোন দিন আমাদেরও হয়ত মৃত্যু ঘটবে ওর হাতে।

ব্রহ্মার কাছে কোন অভয় না পেয়ে দুর্বাসা এবার প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটলেন কৈলাসে শিবের কাছে।

যদিও রুদ্রের অংশে দুর্বাসার জন্ম এবং শিবের প্রিয়পাত্র, তবুও এখানেও বিফল হলেন তিনি। শঙ্কর বললেন—দুর্বাসা, ঐ অস্ত্র ঠেকাবার মত কোন অস্ত্রই আমাদের নেই। ও যাঁর অস্ত্র, তুমি তাঁর কাছে যাও। যদি ইচ্ছে করেন, তবে তিনিই তোমায় বাঁচাতে পারবেন।

অগত্যা দুর্বাসা ছুটলেন বৈকুণ্ঠে। একে তো চক্রের তেজে শরীর প্রায় কালিবর্ণ, তার ওপর এই ছোটাছুটি প্রাণের জন্য। দুর্বাসার আর দম নেই বললেই চলে। কোন রকমে বৈকুণ্ঠে এসেই আছড়ে পড়লেন শ্রীহরির পায়ে—প্রভু, বাঁচান আমায়। ঐ চক্রের হাত থেকে বাঁচান।

শুনে শ্রীহরি বললেন—মুনি, তুমি তো জান, সাধুজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে তার ফলভোগ করতেই হয়। যদি সত্যিই তুমি

বাঁচতে চাও, তা হলে তোমাকে অম্বরীষের কাছে গিয়েই অপরাধ স্বীকার করে প্রাণভিক্ষা করতে হবে। এছাড়া তো ঐ চক্রের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন আশা নেই দুর্বাসা।

এরপর কি আর করেন দুর্বাসা। প্রাণের মায়া যে বড় মায়া! গেল দুর্বাসার দম্ভ, অহঙ্কার, দর্প। আবার সেইভাবেই ছুটতে ছুটতে এলেন অম্বরীষের কাছে। এসেই জড়িয়ে ধরলেন রাজার দুটি পা। কঙ্কালসার হয়ে গেছেন দুর্বাসা। চক্রের তেজে আর অভুক্ত অবস্থায় অবিরাম ছুটে মুখ দিয়ে কথা যেন আর বের হয় না। বললেন কোনরকমে—রাজা, আমার অপরাধের শেষ নেই, আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা অম্বরীষও সসম্মানে তাঁকে তুলে বসালেন মহামূল্যবান এক আসনে। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুনি কোথাও আর কোন চক্র নেই। নিশ্চিন্ত হলেন।

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছিল একটা বছর। রাজা অম্বরীষ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেবা করলেন। নিজেও অভুক্ত। মুনির অন্ন গ্রহণের পর রাজ তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

যাবার সময় দুর্বাসা প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করে গেলেন রাজাকে—ধন্য তুমি রাজা। ধন্য তোমার ভক্তি। আমার মত মুনিরও তুমি জ্ঞানচোখ খুলে দিলে!



ঋষি জমদগ্নি ও পরশুরামের কাহিনী

ত্রেতাযুগের কথা।

ক্ষত্রিয়-প্রধান গাধির ছিল বিশ্বামিত্র নামে এক তেজস্বী পুত্র। কঠোর তপস্যা করে তিনি পরে পেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের মর্যাদা। তাঁর ছিল সত্যবতী নামে এক মেয়ে। রূপে-গুণে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুলনীয়া এই মেয়েটির জন্যে যখন ভাল একটি ছেলের সন্ধান করছেন রাজা গাধি, তখন ঋচীক নামে এক ব্রাহ্মণ এলেন তাঁর কাছে সত্যবতীকে বিয়ে করার ইচ্ছা নিয়ে।

কোথাকার কে এক ভিখারি ব্রাহ্মণ, তার হাতে এমন মেয়ে! ঠিক সায় দিল না গাধির মন। সরাসরি তাড়িয়েও দিতে পারলেন না। তাই ঘুরিয়ে বললেন—দেখ ব্রাহ্মণ, যে ঘোড়ার দেহের রং চাঁদের মত, আর একটা কান শ্যামবর্ণ, এই রকম এক হাজার ঘোড়া যদি আমায় এনে দিতে পার, তাহলে বুঝব, তুমি আমার মেয়ের যোগ্য পাত্র।

চলে গেলেন ব্রাহ্মণ। হাঁফ ছাড়লেন গাধি। যাক, সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। আপদ বিদেয় হল, অথচ শাপও কুড়োতে হল না। মনে মনে নিজের বুদ্ধির খুবই প্রশংসা করলেন গাধি। এমন জিনিস চেয়েছেন, ঐ বামুনের সাধ্য কি যে এনে দেয়।

এদিকে ঋচীক করলেন কি, সোজা চলে গেলেন বরুণদেবের কাছে। বরুণদেবের তিনি ছিলেন খুবই প্রিয়পাত্র।

—কি ব্যাপার ঋচীক? হঠাৎ এই অসময়ে?

ঋচীক তাঁকে সব কিছু বলে বললেন—এর যে একটা ব্যবস্থা তোমায় করে দিতে হয়, বরুণদেব।

—এ আর কি আছে? নিয়ে যাও।

গাধির নির্দেশমত ঋচীক এক হাজার ঘোড়া নিয়ে আবার এসে হাজির তাঁর কাছে। দেখে তো গাধি অবাক। আর ফেরানো যায় না, উচিতও হবে না। বুঝলেন, দেখতে ভিখারি হলে কি হবে, যথেষ্ট ক্ষমতা ধরেন। নইলে অমন অসম্ভব ব্যাপার কি কেউ সম্ভব করতে পারে? অগত্যা বেশ ঘটা করেই ঋচীকের সঙ্গে মেয়ে সত্যবতীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। ঋচীকও সত্যবতীকে নিয়ে চলে এলেন নিজের আশ্রমে।

বেশ কিছুকাল পর শাশুড়ির খুব ইচ্ছে হল, ভাল ছেলে হওয়ার জন্য বেদজ্ঞ ঋষি জামাই ঋচীককে দিয়ে একটা যজ্ঞ করাবেন। মেয়ের মারফৎ তা তিনি জামাইকে জানালেনও।

বিয়ে হয়েছে কোন্ কালে। সত্যবতীরও এ যাবৎ কোন ছেলেপুলে হয় নি। সে-ও ধরল এই সুযোগে স্বামীকে।

রাজি হলেন স্বামী। যজ্ঞও করলেন। তৈরি করলেন দুটো চরু (মন্ত্রঃপূত পরমান্ন)। একটা শাশুড়ির জন্যে, আর একটা সত্যবতীর। শাশুড়ির চারুর মধ্যে তিনি দিয়েছিলেন ক্ষাত্র-তেজ, আর সত্যবতীর চরুর মধ্যে ব্রহ্মতেজ। সেদিক থেকে ঠিকই করেছিলেম ঋচীক। ক্ষত্রিয় শাশুড়ির জন্য শক্তিধর ক্ষত্রিয় ধর্মপরায়ণ সন্তান। আর নিজে যেহেতু ব্রাহ্মণ, তার ওপর ঋষি, তাই বংশধরের জন্য সেভাবেই চরু পাক করে রেখেছিলেন।

যজ্ঞশেষে আলাদা দুটি পাত্রে দু-জনের জন্য চরু দুটি ঠিক করে রেখে ঋচীক গেছেন স্নানে।

এদিকে শাশুড়ির মাথায় খেলে গেল এক কূট চিন্তা। ঋচীক এখন নেই, এই সুযোগে পালটাপালটি করে নিতে হবে।

নিলেনও তাই। এসে মেয়ে সত্যবতীকে আবোল-তাবোল বলে মেয়ের চরুটি নিজে খেলেন, আর তাঁর চরুটি মেয়েকে খাইয়ে চলে গেলেন।

স্নান সেরে ঋচীক ফিরে এসে শুনেই তো মাথায় হাত। শেষে এ কী কাণ্ড করে বসল সত্যবতী!

সত্যবতীও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর কোন উপায় নেই দেখে জড়িয়ে ধরল স্বামীর পা। ভেঙে পড়ল কান্নায়—একটা বিহিত করুন, যাতে অমন ছেলে আমার না হয়।

ঋচীক বললেন—তোমার ব্যাপারটা না হয় কোন রকমে ঠেকানো যাবে। কিন্তু ঐ চরু তো বিফলে যাবে না। তোমার যে নাতি হবে, তাকে তো আমাদের বংশে ঐ চরুর ক্ষাত্রশক্তি নিয়ে জন্মাতে হবে।

—তা হোক। এখন আমাকে বাঁচান।

অগত্যা সত্যবতীর মুখ চেয়ে ঋচীক আবার আর এক কাজ

করলেন। তারই ফলে সন্তানবতী হলেন এক শক্তিধর সুপুত্রের জননী। ঋষি জমদগ্নি হলেন সেই পুত্র।

সত্যিই জমদগ্নি। আগুনের তেজ নিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠল ছেলে। প্রখর তাঁর তপস্যা, আর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। অল্পদিনের মধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ করল ছেলে। ভরে উঠল মায়ের মন। সর্বসুলক্ষণা মেয়ে রেণুকার সঙ্গে যথাসময়ে ছেলের বিয়েও দিলেন সত্যবতী।

ঘর-সংসার নামমাত্র। জমদগ্নির বেশির ভাগ সময়ই কাটে জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞে। আর সেই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করে চলে রেণুকা। কয়েকটি ছেলেও হল তাঁদের। সবচেয়ে যেটি ছোট, জমদগ্নি তাঁর নাম রাখলেন রাম। দিব্যদৃষ্টিতে জমদগ্নি দেখলেন, এ ছেলে আর পাঁচটা ছেলের মত নয়। সুবিশাল ক্ষাত্রতেজ নিয়ে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে তাঁর বংশে। তাঁর পিতা ঋচীকের সেই চরুর প্রভাবে। দিব্যদৃষ্টিতে আরও দেখলেন, স্বয়ং বিষ্ণু এসেছেন তাঁর ঘরে অবতাররূপে। নিজে সবই জানতে পারলেন বটে, কিন্তু বাইরে কিছুই প্রকাশ করলেন না।

দিনে দিনে বাড়ে রাম, বাড়ে বয়সের তুলনায় শক্তি। সব সময়ই কাঁধে পরশু (টাঙির মত দেখতে, অসম্ভব ধারালো কুড়ুল) নিয়ে ঘুড়ে বেড়াতেন বলে সকলেই তাঁকে বলত 'পরশুরাম'।

সে সময় পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাজারা এত বেড়ে উঠেছিলো যে, যা ইচ্ছা তাই করত। ব্রাহ্মণদের অপমান তো সামান্য কথা, মুনি-ঋষিদের আশ্রমে পর্যন্ত চড়াও হত। সকলেই সব সময় থাকতেন সন্ত্রস্ত হয়ে। আর ভাবতেন, এ কি কাল হল ! এতদিন ধরে যারা যাগযজ্ঞে উৎসাহ দিত, আজ তারাই কিনা সব কিছু নষ্ট করে দিতে শুরু করল ?

বিশেষ করে হৈহয় রাজ্যের (পশ্চিম ভারতের কয়েকটি দেশ) ক্ষত্রিয় রাজা অর্জুন যেন বড় বেশি বেড়ে উঠেছিল। দত্তাত্রেয় ঋষিকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন পেয়েছিল হাজার হাত। সেই সঙ্গে অধিকারী হয়েছিল অসীম শক্তি ও অফুরন্ত সম্পদের। হয়ে উঠেছিল দুর্ধর্ষ। পৃথিবীতে তখন এমন কেউ ছিল না যে তাকে পরাজিত করতে পারে। মাহিষ্মতী নামে তার ছিল এক প্রাসাদ। সে-ও প্রায় দুর্গবিশেষ। একবার নর্মদার তীরে শিবির করে বৈজয়ন্তী মালা গলায় দিয়ে স্ত্রীদের নিয়ে নর্মদার জলে সাঁতার কাটতে নেমেছিল অর্জুন। তাতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে নদীর জল প্রায় সেখানেই আটকে গিয়েছিল। দশানন রাবণ তখন বেরিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে। নদীর এই অবস্থা দেখে রেগে গিয়ে তিনি এসে আক্রমণ করেছিলেন অর্জুনকে। বাজপাখি যেমন ছোঁ দিয়ে শিকার তুলে নিয়ে যায়, অর্জুনও তেমনি সকলের সামনেই দশাননকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছিল নিজের প্রাসাদে। যদিও অবশ্য পরে ছেড়ে দিয়েছিল, তবুও দশাননের পক্ষে এ কী কম অপমান !

সে না হয় গেল রাজায়-রাজায়। কিন্তু মদমত্ত অর্জুন একবার যাচ্ছেতাই এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল জমদগ্নির আশ্রমে এসে।

অমাত্য ও সৈন্যসামন্তদের নিয়ে অর্জুন একবার বেরিয়েছিল মৃগয়ায়। ঘুরতে ঘুরতে সদলবলে এসে হাজির হল জমদগ্নির আশ্রমে। অতিথি এলে সৎকার করতেই হবে। কিন্তু এত মানুষের আয়োজন। তার জন্য অবশ্য কিছুমাত্র চিন্তিত নন জমদগ্নি। তাঁর ছিল এক কামধেনু। সব প্রয়োজন সে মুহূর্তে মিটিয়ে দিত। মিটিয়েও দিল। অর্জুন থেকে শুরু করে সবাই আকণ্ঠ খেল চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। এমন কি তাদের ঘোড়াগুলোও পেট পুরে খেল দানাপানি।

সব দেখে অর্জুনের খুব লোভ জাগল ঐ কামধেনুটির ওপর। ভাবল, তার যত ঐশ্বর্যই থাক, এর কাছে ওসব একেবারে তুচ্ছ। অতএব যেমন করেই হোক, ধেনুটি তাকে নিতেই হবে।

তাই মুনি যে অসময়ে অমন করে অতিথি সৎকার করলেন তার জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা, সৈন্যদের হুকুম দিল জোর করে কামধেনুটাকে নিয়ে যেতে। রাজার আদেশ সঙ্গে সঙ্গে তামিল করল সেনারা। বাছুরসমেত কামধেনুকে নিয়ে গেল মাহিষ্মতী নগরীতে। কি আর করেন জমদগ্নি। চুপ করে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

রাম আশ্রমে ফিরে যেই শুনলেন সব, অমনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বর্ম এঁটে কাঁধে পরশু আর পিঠে বাণ-তূণীর নিয়ে উল্কাবেগে ছুটে চললেন মাহিষ্মতী নগরীর দিকে।

নগর-দ্বারে দাঁড়িয়ে ছাড়লেন এক বিকট হুঙ্কার। অর্জুন দেখল রণসাজে দাঁড়িয়ে নগর-দ্বারে পরশুরাম। প্রথমে নিজে না এগিয়ে হাতি ঘোড়া রথ আর পদাতিক নিয়ে সতের অক্ষৌহিণী সেনা পাঠিয়ে দিল পরশুরামকে নিধন করতে। কিন্তু মুহূর্তে তারাই নিধন হয়ে গেল পরশুরামের হাতে। ছিন্নমুণ্ড আর দেহের স্তূপ জমে গেল রণক্ষেত্রে। নদীর মত বইতে শুরু করল রক্ত। দেখে আর থাকতে পারল না অর্জুন। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পাঁচশো হাতে নিল ধনুক, আর পাঁচশো হাত দিয়ে জুড়ল তীর, যাতে কোন রকমেই পরিত্রাণ না পান পরশুরাম। কিন্তু ছোঁড়ার আগেই পরশুরামের ছোঁড়া এক তীরেই অর্জুনের সব কটা ধনুকই গেল কেটে। নিরুপায় অর্জুন এবার হাতের সামনে যা পেল, গাছ-পাথর তুলে ছুঁড়তে যাবে, অমনি রামের পরশু চোখের পলকে ছুটে এসে তার সব কটা হাতই কেটে দিল। শেষে মাথাটা কেটে ফেলতেই পাহাড়ের একটা চূড়া এসে ধপ করে পড়ল মাটিতে। কেঁপে উঠল পৃথিবীর মাটি। এতদিন যে অর্জুন ছিল অজেয়, পরশুরামের হাতে তাকে ঐভাবে নিহত হতে দেখে প্রাণভয়ে পালাল তার দশ হাজার ছেলে।

কামধেনুটিকে উদ্ধার করে সযত্নে আবার তাকে পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন রাম। কিন্তু জমদগ্নি যখন শুনলেন অর্জুন নিহত হয়েছে, তখন বললেন—পুত্র, এ কাজটা ভাল কর নি। আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাই আমাদের ধর্ম। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজাকে বধ করা নীতিবিরুদ্ধ। এতে তোমার পাপ হয়েছে। আর এই পাপ দূর হবে একমাত্র তীর্থসেবা করে।

পিতার আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন রাম। সব তীর্থ ঘুরে আবার ফিরে এলেন পিতার কাছে। আবার আগের মতই চলে যাচ্ছিল রামের দিন।

যজ্ঞ করেন জমদগ্নি। কাঠ (সমিধ) পর্যন্ত যোগাড় করে এনে দেয় রেণুকা থেকে শুরু করে ছেলেরা।

একদিন ঋষিবর রেণুকাকে পাঠিয়েছেন কাঠ সংগ্রহ করে আনতে। স্বামীর কাজে সব সময়েই সজাগ তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন কাঠের খোঁজে। বোঝা নিয়ে আসতে আসতে দেখলেন, অপূর্ব সুন্দর কান্তিময় এক গন্ধর্ব মনের আনন্দে তোলপাড় করছে নদীর জল। দেখে খুব ভাল লাগল রেণুকার। কাঠের কথা ভুলে



বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাকে, মনে মনে খুবই প্রশংসা করলেন তার। এদিকে রেণুকার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ক্রমশই অধীর হয়ে ওঠেন জমদগ্নি।

ওদিকে রেণুকার যখন হুঁশ হল, সত্যিই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বোঝা তুলে দ্রুত পায়ে আশ্রমে এসে রেণুকা গলবস্ত্র হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন স্বামীর কাছে।

দিব্যদ্রষ্টা ঋষি জমদগ্নি। এমনিতে খুবই শান্ত, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দারুণ কঠোর। রেণুকার এত দেরিতে আসার কারণ বুঝতে তাঁর আর দেরি হল না। সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন ছেলেদের।

বাবার ডাকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল বসুমান থেকে শুরু করে রাম পর্যন্ত তাঁর ছেলেরা।

সকলেই জড়ো হয়েছে দেখে তিনি একে একে ডেকে প্রতিটি ছেলেকে বললেন—তোমার মা বিপথগামিনী হয়েছে। আমার আদেশ, তোমার মাকে তুমি খুন কর।

মাকে খুন! সভয়ে সব ছেলেরা একে একে পিছিয়ে গেল। বাবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

শেষে ডাক পড়ল রামের। ঋষি বললেন—রাম, তোমার মা আর সৎ পথে নেই। আমার আদেশ, তুমি ওকে খুন কর। তোমার দাদাগুলোও দেখছি কুলাঙ্গার।

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতে রাম তুলে নিলেন তাঁর কুঠার। এক কোপে ধড় থেকে মায়ের মুণ্ডটা তিনি নামিয়ে দিলেন। তারপর একে একে খতম করলেন তাঁর সব কটি ভাইকে।

—তুমি যে বিনা প্রতিবাদে আমার আদেশ পালন করলে, এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। বল, তোমার কি চাই? যা চাইবে, আমি তাই দেব। বললেন জমদগ্নি।

—বাবা, আমি যা চাইব, সত্যিই যদি তাই দেন, তাহলে আমার মা আর দাদারা আবার যেন প্রাণ ফিরে পান, বেঁচে উঠুন।

পুত্র রামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন জমদগ্নি। বললেন—বেশ, ঐ যখন চাইছ, তখন তাই হবে।

সকলেই আবার মুহূর্তের মধ্যে বেঁচে উঠল, প্রণাম জানাল ঋষিবরকে। যেন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিনের মত প্রণাম জানাচ্ছে তাঁকে।

সামান্য এক ব্রাহ্মণের হাতে অত বড় বীর পিতার মৃত্যুর পর মনে কোন শান্তি ছিল না হৈহয় রাজ অর্জুনের ছেলেদের। তাদের স্বভাবও যে ভাল ছিল তা নয়। তাদের শাসনে রাজ্যপাট এমনিতেই প্রায় লণ্ডভণ্ড। কিন্তু সে দিকে কোন খেয়ালই ছিল না তাদের। ফিকির খুঁজতো সব সময়ই, কিভাবে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

একবার দাদাদের নিয়ে রাম আশ্রম ছেড়ে গেছেন বনে, সেই সুযোগে অর্জুনের ছেলেরা এসে চড়াও হল আশ্রমে। ঝাঁপিয়ে পড়ল জমদগ্নির ওপর। তাদের আসল শত্রু না থাক, তার বাবা তো আছে। আগে প্রতিশোধটা তাঁর ওপরই নেওয়া যাক, তারপর একে একে দেখা যাবে। এই ভেবে রেণুকার সব বাধা অগ্রাহ্য করে তারা ঋষি জমদগ্নির মাথা কেটে চলে গেল।

আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন রেণুকা। দূর থেকে কান্নার আওয়াজ আর মায়ের গলা শুনেই চমকে উঠলেন রাম। বেড়ানো ছেড়ে দাদাদের নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আশ্রমে এসেই দেখেন বাবার ছিন্নমুণ্ড।

পিতৃশোকে আকুল হয়ে উঠল তাঁর বুক। তাঁর অমন বাবাকে শেষে অপঘাতে প্রাণ দিতে হল?

দাদারাও শোকে অধীর। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন রাম। জিজ্ঞেস করলেন মাকে—মা, কে সেই দুর্বৃত্ত যে আমাদের বাবাকে এভাবে হত্যা করে গেল? বল মা, বল।

কান্নার বেগ সামলে রেণুকা যখন সব বললেন, কঠিন হয়ে উঠল রামের মাংসপেশীগুলো, রক্ত পলাশের মত লাল হয়ে উঠল চোখ-মুখ। শক্ত মুঠোয় তিনি তাঁর পরশু (কুঠার) তুলে নিয়ে সকলের সামনে করে বসলেন কঠিন প্রতিজ্ঞা—পৃথিবীতে যত ক্ষত্রিয় আছে তাদের সবংশে আমি নির্মূল করব, তবে আমার হাত থেকে নামবে এই কুঠার। বলেই তিনি ছুটলেন হৈহয় রাজ্যের দিকে।

এমনিতেই শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল মাহিষ্মতী নগরী। তবুও সুবিশাল বাহিনী নিয়ে অর্জুনের ছেলেরা রুখে দাঁড়াল পরশুরামকে। কিন্তু তাদের সমূলে শেষ হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। হৈহয় রাজ্যের নগরদ্বারে পথে পথে ছোট ছোট পাহাড়ের মত জমে গেল রাশি রাশি মুণ্ড। বয়ে গেল রক্তের নদী।

আততায়ীদের নির্মূল করে পরশুরাম ফিরে এসে পিতার সৎকার



করলেন। কিন্তু কুঠার নামালেন না হাত থেকে।

যেখানেই তিনি শুনতেন, ধর্মচ্যুত হয়ে ক্ষত্রিয়রা অত্যাচার, অনাচার শুরু করেছে, কুঠার হাতে একা পরশুরাম ছুটতেন সেখানে। নির্মূল করে আসতেন তাদের। স্থির হয়ে এক জায়গায় না থেকে ঘুরে বেড়াতেন পৃথিবীর সর্বত্র, আর ধ্বংস করতেন ক্ষত্রিয়কুল। একবার-দুবার নয়, ক্ষত্রিয়ত্রাস পরশুরাম এভাবে একুশবার পৃথিবী থেকে অনাচারী ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করে এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন একাই যে, আর কোন দিন মাথা তুলে দম্ভের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে নি তারা।

সর্বশক্তিমান ভগবান ভক্তদের কাছে কথা দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে যখন তাঁরা লাঞ্ছিত হবেন, অনাচার-অত্যাচার যখন দুর্বার হয়ে উঠবে, তখনই তিনি নিজে আসবেন পৃথিবীতে তাঁদের দমন করতে।

ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয় রাজারা, যাদের হাতে ছিল শাসনের ভার, ছিল প্রজাদের সুখ শান্তিতে রাখার দায়িত্ব, তারা যখন তা না করে পৃথিবীতে আনতে শুরু করেছিল অশান্তির বন্যা, মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল অতিষ্ঠ, তখন ঋষি জমদগ্নির ছেলে হয়ে তিনিই এসেছিলেন 'পরশুরাম' নামে।

কলির লাঞ্ছনা

সামান্য এক ব্যাধের হাতে প্রাণ দিয়েছেন কৃষ্ণ। যদুকুলও নির্মূল।

পাণ্ডবদের আপদে-বিপদে যিনি ছিলেন একমাত্র সহায়, তিনি আর নেই শুনে স্ত্রী, মা আর ভাইয়েদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরও রাজ্যপাট ছেড়ে চলে গেছেন মহাপ্রস্থানের পথে। এই সুযোগে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে দুরাত্মারা। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে কলি রাজা সেজে। শুরু করে দিয়েছে যা খুশি তাই।

সিংহাসন তো কখনো খালি পড়ে থাকে না। অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি পাণ্ডবদের কোন ভবিষ্যৎ বংশধর বাঁচিয়ে রাখবেন না। অস্ত্রবিদ অশ্বত্থামা তাই ব্রহ্মাস্ত্র শির নামে এমন এক অস্ত্র ছেড়েছিলেন যে, কোন পাণ্ডব শিশুই তা থেকে রেহাই পায় নি। সে সময় অর্জুনের পুত্রবধূ, অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা ছিলেন সন্তান-সম্ভবা। ভূমিষ্ঠ হবার আগে এমন ছেলেটি যখন মায়ের গর্ভে, অশ্বত্থামার অস্ত্র সেখানেও তাকে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল। বেশ কষ্ট পাচ্ছিল ছেলেটি সেখানেই। হঠাৎ একদিন দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে অপরূপ সুন্দর এক পুরুষ। মাত্রা আট আঙুল লম্বা। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল শিশুর, সেই পোড়ার জ্বালা আর যেন নেই।

আসলে ভগবান বাসুদেবই তাঁকে অশ্বত্থামার সেই তেজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, যাতে পাণ্ডবদের স্মৃতি মুছে না যায়।

যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেই ছেলে। পাণ্ডববংশের একমাত্র কুলতিলক। যুধিষ্ঠির ছিলেন তখন সম্রাট। নাতির মঙ্গল কামনার জন্য মহা ধুমধাম করেছিলেন। প্রচুর দান করেছিলেন ব্রাহ্মণদের। খুশি হয়ে ব্রাহ্মণরা শিশুর নাম রেখে গিয়েছিলেন 'বিষ্ণুরাজ'।

ছেলেটি কিন্তু চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে যাকেই দেখত, তাকেই বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। গর্ভে থাকতে যাঁকে দেখেছিল, তাঁকে কিন্তু সে ভুলতে পারে নি। ছেলেটি অমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত বলে সবাই অবাক হয়ে বলাবলি করত—কি এত পরীক্ষা করছে বল তো? কেউ তো আর ভেতরের কথা জানে না। সেই থেকে ছেলেটির নামই হয়ে গিয়েছিল 'পরীক্ষিৎ'।

যাই হোক, যুধিষ্ঠিররা চলে গেলে এই পরীক্ষিৎই বসলেন সিংহাসনে। অল্প বয়সেই অসম্ভব সাহসী আর বীর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অস্ত্রবিদ্যায় ওঁর জুড়ি ছিল না। দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্য কানে আসতেই পরীক্ষিৎ মনস্থ করলেন দিগ্বিজয় করে সকলের মাথা মুড়িয়ে দিতে হবে।

পড়ে গেল সাজ সাজ রব। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সকলের সাজা হয়ে গেল। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝলমল করে উঠল পদাতিক বাহিনী।

পরীক্ষিৎ বের হলেন দিগ্বিজয়ে, চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে। একের পর এক দেশ মেনে নিল তাঁর অধীনতা। করও দিল। শুধু তাই নয়। যদুকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ আর পাণ্ডবদের প্রচুর প্রশংসাও করছিল তারা। আর তাই শুনে ফুলে ফুলে উঠছিল তাঁর বুক।

ঘুরতে ঘুরতে পরীক্ষিৎ এসেছেন কুরুজাঙ্গলে (কুরুক্ষেত্রে) সরস্বতী নদীর তীরে। তাঁবু ফেলেছেন সেখানে।

হঠাৎ দেখলেন যাত্রাদলের রাজার মত বেশভূষা পড়ে এক পুরুষ বেদম প্রহার করছে এক শীর্ণকায় গাই গরু, আর এক-পা-ওলা এক ষাঁড়কে।

দেখেই রাজা পরীক্ষিতের মাথায় গেল আগুন জ্বলে। নিরীহ গোবেচারাগুলো মুখ বুজে এমন নির্দয় প্রহার খাচ্ছে, আর থরথর

করে কাঁপছে, অথচ একবারের জন্যও শিং দুলিয়ে ফোঁসও করছে না। আবার প্রহার যে করছে তার সে কি উল্লাস ! দেখে কি মেজাজ ঠিক রাখা যায় ?

রুক্ষ মেজাজে ছুটে গিয়ে পরীক্ষিৎ সেই পুরুষটিকে দিলেন প্রচণ্ড ধমক—এই, কে তুই ! এত বড় স্পর্ধা তোর যে রাজা পরীক্ষিতের সামনে এসব নিরীহ দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করিস। পোশাকআশাক দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভদ্রলোক। তা এমন অধমের মত নীচ কাজ করছিস কেন ? কি করেছে তোর ওরা ?

ধমক খেয়ে লোকটা থমকে দাঁড়াল, তারপর বলল—আমার যা কাজ, আমি তাই করছি।

ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধরলেন পরীক্ষিৎ। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর তীক্ষ্ণধার লম্বা অসি উদ্যত করে তার দিকে ছুটে যেতেই সে জড়িয়ে ধরল রাজার পা।

তাকে আর হত্যা করতে পারলেন না পরীক্ষিৎ। শরণাগত হলে তাকে তো আর হত্যা করা চলে না, তা সে যত নিষ্ঠুরই হোক। এ হল রাজার ধর্ম।

কিন্তু ষাঁড়টিকে দেখে অবাক হন রাজা। অত বড় ষাঁড়, অথচ এক পা কেন ? মনে মনে খুবই সন্দেহ হল তাঁর। আত্মপরিচয় গোপন রেখে কেউ তাঁকে ছলনা করছে না তো ?

তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন এবার—কে তুমি ? কি তোমার পরিচয় ? আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না, বল।

ষাঁড়টি বলল—আমি ধর্ম।

শুনেই চমকে উঠল পরীক্ষিৎ—সে কি, আপনার এ অবস্থা কেন ? বাকি তিনটি পা-ই বা কোথায় গেল ? আর নিজে শক্তিমান হয়েও এমনভাবে এর হাতে আপনি মার খাচ্ছেন ?

ষাঁড়-বেশী ধর্ম বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ রাজা। আগে তপস্যা, শুদ্ধাচার, দয়া আর সত্য ; বলতে পার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি এই চারটে পায়ের ভর রেখেই আমি থাকতাম। এখন সবই চলে গেছে, আছে শুধু শেষেরটি। তাই এখন আমার একটা পা। আর মুখ বুজে মার খাওয়ার কথা বলছ ? এক পায়ে ভর রেখে কেউ কি আর শত্রুকে রুখতে পারে ? তাই মার খাওয়া ছাড়া উপায় কি, বল ?

একটা রহস্যের সমাধান হল। পরীক্ষিৎ বুঝলেন ধর্ম অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাই অধর্মের চেলা-চামুণ্ডারা মাথা চাড়া দিয়েছে।



এবার পরীক্ষিৎ তাকান গাইগরুটির দিকে। তার চোখের কোণে টলটল করছে জল।

সে বলল—রাজা, আমি হলাম ধরণী। যেদিন থেকে রাজা পৃথু আমায় উদ্ধার করে এনেছেন, সেদিন থেকে ধর্মই ছিল আমার সহায়, আমার সুখ-দুঃখের একমাত্র ভরসা। এক একটা করে পা তার গেছে, আর যত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, আমিও তত দুর্বল হয়ে পড়ছি। এখন মাত্র একটা পা সম্বল করে তিনি অধর্মের হাতে মার খাচ্ছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও আমায় ছেড়ে গেছেন। তাই আমিও ক্ষীণ হয়ে পড়ছি। আমার সেই সম্পদ, সেই ঐশ্বর্য আজ আর কিছুই নেই। আমার আর কে আছে রাজা যে আমাকে দেখবে?

কথায় আছে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। পরীক্ষিৎ এমন পাপ করেন নি যে, তার জন্য পৃথিবীকে শ্রীহীনা হতে হবে।

রক্তচক্ষু তুলে তাকালেন পরীক্ষিৎ কলির দিকে। বললেন—শোন, তুমি আমার কুরুজাঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে। তুমি হলে অধর্মের রাজা। তোমার স্থান এখানে কোনমতেই হবে না।

নিষ্পাপ, ধর্মপরায়ণ তেজস্বী পরীক্ষিতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায় বা গলা চড়িয়ে কথা বলে, এমন সাধ্য ছিল না কলির। শুধু সবিনয়ে বলল—তাই যাব। তবে আমার থাকার মত জায়গা অন্তত দিন।

পরীক্ষিৎ বললেন—ক্ষমাই যখন করেছি, তখন অবশ্যই তোমার থাকার জায়গাও আমি ঠিক করে দিচ্ছি। বুঝতে পারছি, তুমি তোমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সুচ হয়ে আমার রাজ্যে ঢুকে পড়েছ। তবু যতদিন আমি আছি, ততদিন তুমি থাকবে সেখানে, যেখানে ধর্মকর্ম হয় না, যাগ-যজ্ঞ হয় না, যেখানে একজন অপরজনের ধন-সম্পদ চুরি করে, যেখানে একে অপরের সঙ্গে কলহ করে, নারীর সম্মান রাখে না। যাও তুমি, তোমার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সেই সব জুয়াড়ী লম্পটদের কাছে থাকো গে। খবরদার, তার বাইরে আসার চেষ্টা করবে না। সচ্চরিত্র নিয়ে সৎপথে থেকে যারা ধর্মকর্ম নিয়ে আছে কখনও যেন না শুনি তুমি তাদের বিরক্ত করছ।

মাথা নিচু করে পরীক্ষিতের সেই আদেশ মাথায় নিয়ে চলে গেল কলি সেখান থেকে। অত্যাচার থেকে রেহাই পেলেন ধর্মরূপী ষাঁড় আর গাভীরূপী পৃথিবী।

রাজা পরীক্ষিতের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে সেই থেকে অধর্মকে সঙ্গে নিয়ে কলি আজও রয়ে গেছে সেখানে।



গরুড় পুরাণ

ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদে তাঁরই বাহন গরুড় জ্ঞান আরোহণ করে এই পুরাণ রচনা করেছিলেন এবং পরে ব্যাসদেব এটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলেই এর নাম 'গরুড় পুরাণ'। কিভাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজো করতে হবে, ব্রত পালন করতে হবে এই গ্রন্থে তা বিশদভাবে দেওয়া আছে। বাবা-মা মারা গেলে কেন শ্রাদ্ধ করতে হয়, কিভাবে করতে হয়, তারও বিবরণ আছে এই গ্রন্থে। এছাড়াও জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, গ্রহ-রত্নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিভাবে করতে হয় এই গ্রন্থ তারও আলোচনা করেছে সুন্দরভাবে। কোথায় কোন্ রত্ন পাওয়া যায়, বিশেষ করে হীরে নিয়ে এমন আলোচনা, আর বড় কোথাও একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, জীবন-যাত্রায় অপরিহার্য, এমন অনেক নীতিকথাও এই পুরাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে চাণক্য শ্লোক নামে বিখ্যাত যে পুস্তক প্রায় প্রতিটি ঘরেই রয়েছে তার অনেকখানিই তিনি নিয়েছেন এই পুরাণ থেকে। বিষ্ণুশর্মা যে 'হিতোপদেশ' রচনা করেছিলেন তার মধ্যে গরুড় পুরাণের অনেক নীতিকথাই পাওয়া যায়।



গরুড় পুরাণের ইতিকথা

যজ্ঞক্ষেত্র নৈমিষারণ্য (বর্তমানে উত্তর প্রদেশের নিমসার)।

যজ্ঞশেষে শৌনিক প্রভৃতি ঋষিরা বসে আছেন, ধর্মালাপ করছেন নিজেদের মধ্যে, এমন সময় লোমহর্ষণের ছেলে সূত হাজির হলেন সেখানে।

সূত পুরাণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ব্যাসদেবের কাছে।

মুনি-ঋষিরা ধ্যান-ধারণায়, যাগ-যজ্ঞে সুদক্ষ। হলে কি হবে, মাঝে মাঝেই তাঁদের মনে জাগত সংশয়, জাগত নানা প্রশ্ন। সূত পুরাণশাস্ত্র থেকে নানা কাহিনী শুনিয়ে তাঁদের প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন। তাই, সূত জাতে ব্রাহ্মণ না হলেও মুনি-ঋষিরা তাঁকে ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদা দিতেন।

সূতকে আসতে দেখেই মুনি-ঋষিরা খুব খুশি হয়ে তাঁকে সসম্মানে বসিয়ে বললেন—সূত, আমাদের মনে হঠাৎ কতকগুলো প্রশ্ন জেগেছে, তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। এবার আমবা এর সঠিক উত্তর পাব।

—কি আপনাদের প্রশ্ন মুনিবর, বলুন। দেখি, আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারি কি না।

—আচ্ছা সূত, আমরা জানি, আমাদের ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি নামে অনেক দেবতা আছেন। আচ্ছা, এঁদের ওপরেও তো নিশ্চয়ই কোন দেবতা আছেন। তিনি কে? ঈশ্বরই-বা কে? আমরা কারই-বা পূজা করব?

—এরপর আর কি প্রশ্ন, মুনিবর?

—আমরা তো নানা দেব-দেবতার ধ্যান করি। কি সত্যিকারের ধ্যান কার করা উচিত?

—আর?

—আমরা দেখছি এই পৃথিবীতে প্রতিদিনই কত রকমের ক প্রাণী জন্মাচ্ছে। কিছুকাল থেকে তারা আবার লোপ পেয়ে যাচ্ছে এর পেছনে নিশ্চয়ই কারো শক্তি কাজ করছে, কে তিনি?

—আচ্ছা। তারপর?

—আমাদের ধর্মকে বলা হয় সনাতন ধর্ম। আমাদের ধর্মে আ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণ। আবার ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রম। আচ্ছা সূত, কিভাবেই বা এ ভাগ এল, আর কে-ই বা তা করল?

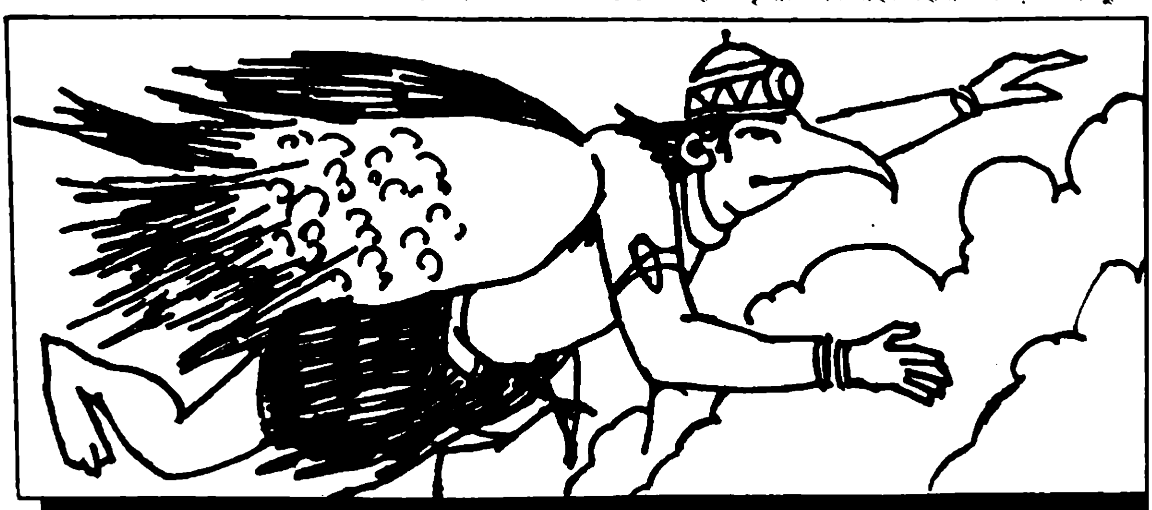
—ভাল প্রশ্ন, মুনিবর। তারপর?

—শুনেছি দুষ্টের দমনের জন্য তিনি আসেন। যিনি আসে তিনি কি রূপে আসেন? কি কি ব্রত পালন করলে, কিভাবে তঁ পূজা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন?

প্রশ্নগুলি রেখে মুনিরা বললেন—সূত, বড় বিব্রত বে করছিলাম প্রশ্নগুলো নিয়ে।

ঈষৎ হাসলেন সূত। তারপর বললেন— আপনাদের স প্রশ্নেরই জবাব আমি দেব। তার আগে আমার নিজের একবার অবস্থা হয়েছিল শুনুন। একদিন আমি মুনিদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুর গেলাম মহামুনি ব্যাসদেবের বদরিকাশ্রমে। গিয়ে দেখি, তি ধ্যানমগ্ন। ধ্যান ভাঙলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মুনিশ্রেষ্ঠ, শ্রীহরিকে আপনি ধ্যান করছেন, তাঁর রূপ কি রকম! আর পৃথিবী মধ্যে সৃষ্টি থেকে শুরু করে লয় পর্যন্ত যে শত শত রহস্য লুকি আছে, দয়া করে আমায় তা বলুন।

ব্যাসদেব বললেন—সূত, তোমার যা প্রশ্ন, তার উত্তর ছড়ি আছে আমাদের বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, আমাদের আয়ুর্বেদ, ভেষজ শ এই সব কিছুর মধ্যে। একটা জীবনে যা জানা যাবে না। জানা গেলে শ্রীহরির কৃপায় তাঁর বাহন মহামতি গরুড় সব কিছুর স



সংগ্রহ করে যে পুরাণ রচনা করে গেছেন, সেই গরুড় পুরাণকে জানতে হবে।

গরুড়-রচিত পুরাণের কথা শুনে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। একটা পাখির এত জ্ঞান কি করে হতে পারে? তবে, একথা ঠিক যে মুনিবর, শ্রীহরির কৃপায় পাথরও জলে ভাসতে পারে।

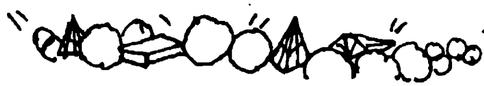
সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব আমি অবাক হয়েছি বুঝতে পেরে বললেন—জানো সূত, এটা আমার ব্রহ্মার কাছ থেকেই শোনা। তপস্যায় গরুড় একবার শ্রীহরিকে তুষ্ট করলে তিনি গরুড়কে বর দিতে চাইলে গরুড় বলেছিল, 'ঠাকুর, আমার মা সাপদের দাসী হয়ে আছে। তাদের দাবি, আমি অমৃত এনে দিলে তারা আমার মাকে মুক্তি দেবে। আপনি আমাকে এই বর দিন, আমি যেন দেবতাদের হারিয়ে অমৃত এনে মাকে মুক্ত করতে পারি। দ্বিতীয়ত, ঠাকুর, সাপরা যেন আমার হাতে মরে। তৃতীয়ত, আমি যেন চিরকালের জন্য আপনার বাহন হতে পারি, সেই সঙ্গে শক্তিমানও। চতুর্থত, আমি যেন সর্বজ্ঞ হয়ে পুরাণ রচনা করতে পারি।'

শ্রীহরি তাঁর সব প্রার্থনাই মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। গরুড় সেই জ্ঞানেরই সব কিছুর সার নিয়ে গরুড় পুরাণ রচনা করে তা শুনিয়েছিলেন প্রথমে কাশ্যপকে। মহাত্মা কাশ্যপ তা শুনে, জেনে পরখ করার জন্য প্রয়োগ করেছিলেন বাজে পুড়ে যাওয়া একটা গাছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছ সজীব হয়ে উঠেছিল। তারপরে অনেক মৃত পদার্থের ওপরই তিনি পুরাণের এই বিদ্যে প্রয়োগ করেছিলেন। কোনটাই বিফলে যায় নি।

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি প্রভু ব্রহ্মার কাছে কেন গিয়েছিলেন?

তাতে ব্যাসদেব বললেন—শুধু আমি নয়, নারদ এবং দক্ষ প্রজাপতি তিনজনে মিলে আমরা একদিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তোমারই মত প্রশ্ন রেখেছিলাম। তাতে ব্রহ্মা বলেছিলেন, ঠিক এই রকমই প্রশ্ন নিয়ে তিনি একবার ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে নিয়ে গিয়েছিলেন কৈলাসে মহাদেবের কাছে। গিয়ে দেখেছিলেন, মহাদেব নিজেই ধ্যানমগ্ন। দেখে ব্রহ্মার খুব বিস্ময় জেগেছিল। যিনি নিজেই জগতের ঈশ্বর, তিনি আবার কার ধ্যান করছেন? স্তবস্তুতি করে তাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ভুল করেছ। পরমাত্মা বিষ্ণুই হলেন সেই ঈশ্বর, যাঁর কৃপায় আমরা সবাই শক্তিমান। তাই মাথায় জটা রেখে, গায়ে ছাই মেখে আমি সব সময় তাঁরই ধ্যান করি। এখন তিনি শ্বেতদ্বীপে। চল, আমার সঙ্গে, তোমাদের আর কোন সংশয় থাকবে না। সত্যিই ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন, ইনিই সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, দেবতাদেরও দেবতা, সনাতন ধর্মের প্রবর্তক, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তাঁরই কাছ থেকে ব্রহ্মারা শুনে এসেছিলেন গরুড় পুরাণ।

এই কথা বলে সূত শৌনিক ঋষিদের বললেন—তাই বলছিলাম মুনিবর, আপনাদের ঐ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে একমাত্র গরুড় পুরাণ।



পান্না-চুনি-হীরে-মুক্তোর ইতিকথা

টাকা-পয়সা-ধনদৌলতের পেছনে মানুষের যেমন ছোটার শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই পান্না-চুনি-হীরে-মুক্তোর পেছনে ছোটার। যেদিন থেকে মানুষ জেনেছে ওগুলি এক একটি রত্ন, আর রত্নের মেজাজই আলাদা, সেদিন থেকে মানুষ শুরু করেছে এগুলিকে মর্যাদা দিতে। সেকালের রাজা-রাজড়ারা তো রত্নের অলঙ্কার, রত্নের পোশাক ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতেন না। ভাঁড়ারে যাঁর যত বেশি রত্ন, তাঁর খাতির তত বেশি। সেই জন্যই বোধ হয় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে কুবেরের ছিল প্রাণের বন্ধুত্ব।

কিন্তু পৃথিবীতে নানা রকম এত রত্ন এল কোথা থেকে?

সে এক বিচিত্র কাহিনী।

বহু...বহু...বহুকাল আগে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল দাবিয়ে বেড়াত এক অসুর। তার নাম ছিল বল।

এমনই বলবান ছিল সেই বলাসুর যে, দিব্য সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অনেকবার অনেকভাবে দেবতারা সবাই মিলে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেও হারাতে তো পারেনই নি, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র খুইয়ে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াতেন দেবতারা এখানে সেখানে।

দেবতাদের ওপর রাগ থাকলে কি হবে, বলাসুরের ছিল দুটো মস্ত গুণ। একটা হল যাগ-যজ্ঞ, ধর্মকর্মে মতি। ওসব কাজ কেউ করলে সে বড় একটা তাকে বাধা দিত না। আর একটা হল, যে যা চাইত, তাকে তাই দিত।

হতচ্ছাড়ার মত ঘুরতে ঘুরতে দেবতারা একদিন একজোট হয়ে যুক্তি করলেন, বলাসুরের এই সুযোগটা নিতে হবে। বলে তো পারা গেল না বলাসুরকে, যদি ছলে কায়দা করা যায়, তাহলে নিজেদের সম্মানটা বাঁচে।

যুক্তি-পরামর্শ সব ঠিকঠাক করে দেবতারা সবাই মিলে হাজির হলেন বলাসুরের কাছে।

খোশ মেজাজে নিজের সিংহাসনে বসে তখন তিন লোকের রাজা বলাসুর। দেবতাদের সবাইকে দেখেই বলে উঠল—আরে, এসো....এসো। তা এতদিন পরে আমার কাছে, কি মনে করে?

দেবতারা বললেন—দেখ, অনেকদিন হল কোন যাগ-যজ্ঞ করা হয় নি। ভাবছিলাম, একটা করব।

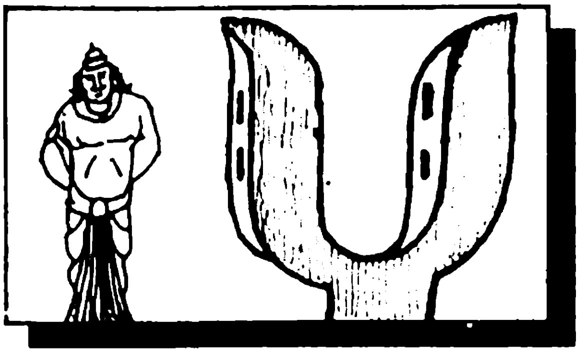
—সে তো খুব ভাল কথা।

—অবশ্য আমরা জানি যে এতে তোমার কোন অমত হবে না। তবু তুমি যখন রাজা, তোমার অনুমতি তো নিতেই হবে। বললেন দেবতারা।

—অবশ্যই কর। যদি কিছুর অভাব থাকে, বল, আমি তাও পূরণ করে দেব। আশ্বাস দিল বলাসুর।

দেবতারা দেখলেন, বলাসুর আগেই ফাঁদে পা দিয়ে দিয়েছে, সুতরাং আসল কথাটা বলায় আর কোন সঙ্কোচের কারণ নেই।

বললেন—দেখ, আমরা সবই পেয়েছি, সবই যোগাড় হয়ে গেছে, শুধু পাচ্ছি না মনের মত একটা বলি। তুমি তো জান, ভাল



বলি ছাড়া যজ্ঞে কোন ফল হয় না। তাই তোমার কাছে আমরা আরও এসেছি সেই কারণে—তুমি যদি নিজে বলি হয়ে আমাদের অভাবটা মিটিয়ে দাও।

কোন কিছু না ভেবেই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল বলাসুর। বলল—যজ্ঞে হাড়কাঠে আমাকে বলি দিলে যদি তোমাদের যজ্ঞ নিখুঁত হয়, চল, আমি এখনই যাচ্ছি।

এমন সহজে যে কাজ হাসিল হয়ে যাবে, দেবতারা তা ভাবতেই পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল তাড়াহুড়ো। সুযোগ যখন এসে গেছে, দেরি করতে আছে?

শুরু হয়ে গেল যজ্ঞ। জ্বলে উঠল যজ্ঞের আগুন। আগুন ছাড়িয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠল আকাশে।

এসে গেল পশুবলির সময়। যজ্ঞে আজ বলাসুর নিজেই যজ্ঞের বলি। স্নান সেরে, মালা-চন্দন পরে, যেন মনের আনন্দে বলাসুর কারোর কোন কথার অপেক্ষা না রেখেই নিজের মাথা পশুর মত গলিয়ে দিল বলির হাড়কাঠে। বলিও হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত দেবকুল। প্রবল শত্রু শেষ। আবার ফিরে পেলেন দেবতারা যে যার অধিকার!

যজ্ঞে স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল বটে বলাসুর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে তা দেখে দেবতারাও অবাক।

তাঁরা তখন করলেন কি, বলাসুরের সেই নিষ্প্রাণ দেহটা নিয়ে উড়লেন বিমানে চেপে আকাশে।

বায়ুর চেয়েও দ্রুতগতি সেই বিমানে যেতে যেতে একটু একটু করে খসে পড়তে লাগল বলাসুরের মাংস। পৃথিবীর যে যে জায়গায় গিয়ে পড়েছিল মাংসের কণা, সেখানটাই হয়ে গিয়েছিল এক একটা রত্নের আকর। কোথাও ইন্দ্রনীল মণি, কোথাও পদ্মরাগ মণি, কোথাও প্রবাল, কোথাও স্ফটিক। আরো অনেক মণি-মুক্তো। কোনটার কদর খুব বেশি, কোনটা আবার তুলনায় কম হলেও ফেলনা নয়। একমাত্র রত্নকারেরাই বলতে পারে কোন রত্নের কি দাম, কি গুণ—রতনেই রতন চেনে।

পাহাড়ে-পর্বতে-মাটিতে-জলে বলাসুরের সেই দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে লাগল দেবতার সেই বিমান থেকে স্বর্গে যাবার পথে, আর তৈরি হয়ে যেতে লাগল এক একটা মণি-রত্নের স্থান।

যেখানে যেখানে পড়েছিল হাড়ের টুকরো, সেখানে গড়ে উঠল হীরের খনি। হীরের আর এক নাম হল বজ্র। সেগুলো বিশেষভাবে পড়েছিল হিমালয় আর মাতঙ্গ পর্বতে, সৌরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, কোশল, বেন্বাতট আর সৌবির দেশে। পাহাড়ের হীরের রংগুলো হয়ে গেল খানিকটা তামার মত; বেন্বাতটের হীরের রং হল চাঁদের মত। সৌবিরে হল নীলপদ্ম আর খানিকটা মেঘের মত। কলিঙ্গদেশে যে হীরে জন্মালো, দেখতে তার রং ঠিক সোনার মত। কোশলের হীরের রং হল হলুদের মত, পুণ্ড্রদেশের হীরে হল শ্যামবর্ণ। মাতঙ্গের রংও হল হলুদের মত, আবার সৌরাষ্ট্রের রং হল তামার মত।

হীরে বলে কথা। রত্নের মধ্যে এর মর্যাদাই আলদা। স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি থেকে প্রায় সব দেবতা আর ব্রাহ্মণের কাছে দারুণ প্রিয় হয়ে উঠল এই হীরে। বায়ুদেবের চোখে খুব ভাল লেগে গেল তামা রঙের হীরে। যমরাজ চোখ ফেরাতে পারলেন না শ্যামবর্ণ হীরে থেকে, দেবরাজ ইন্দ্র খুব ভালবেসে ফেললেন পীত রঙের হীরে। আবার বরুণদেব সাদা রঙের, অগ্নিদেব পিঙ্গলবর্ণের হীরে কোনমতেই ছাড়তে রাজি হলেন না। আর স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি হলুদ রঙের হীরেকে যে কি চোখে দেখলেন!

যেমন নানা রঙের, তেমনি নানা আকারের সব হীরে। আর এক এক হীরের তেমনি আবার এক এক গুণ। আবার এমন হীরেও আছে, যাকে জলে ফেলে দিলে ডুবে যায় না, ভেসেই থাকে। জহুরীরা বলে, সবচেয়ে দামি সেই হীরে, তার মর্যাদা সব থেকে বেশি। মণিরত্ন যত ভারী হবে, তার গুণ তত বেশি, কিন্তু হীরের বেলায় ঠিক উলটো। পদ্মরাগ আর হীরে দিয়ে সব মণিরত্নকেই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়। কিন্তু হীরে ছাড়া হীরেকে কাটে এমন শক্তি আছে কার? তাই তো হীরের আর এক নাম বজ্র।

হীরে যেমন রত্নের রাজা, মুক্তোও কিছু কম নয়।

সমুদ্রের জলে শুক্তি থেকে হল মুক্তোর জন্ম।

বলাসুরের সেই জ্বলজ্বলে দাঁতগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল সমুদ্রজলের এখানে ওখানে। সেগুলোই শুক্তির মধ্যে ঢুকে হয়ে গেল মুক্তো। এই মুক্তোর খোঁজেই দিনরাত কত ডুবরীই না ডুব দিচ্ছে সমুদ্রজলে—বিশেষ করে সিংহল, পারলোক, সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণ, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য, হেমক (বিরাট) আর হাটকে। তুলে আনছে মুক্তো, আর লুফে নিচ্ছে সবাই। কারণ এই কটা সমুদ্রজলের মুক্তোই নাকি সবার সেরা।

শুধু কি শুক্তি থেকেই মুক্তো হয়?

না, আরও অনেক কিছু থেকেই মুক্তো হয়।

হাতি, শূকর, মাছ, সাপ, মেঘ, বাঁশ—এসব থেকেও হয় মুক্তো। শুক্তির মুক্তো যত নরম, এ মুক্তোগুলো আবার তত কঠিন। গর্ত করে সাধ্য কার?

আবার সব জায়গায় সব রকমের মাছ, বাঁশ, হাতি, শূকর থেকেই

যে মুক্তো হয়, তা নয় । এরা এক বিশেষ জাতের । সাগরের জলে অনেক মাছই সাঁতার দেয়, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা মাছ আছে যাদের মুক্তো হয় । সে মুক্তোগুলো দেখতে ঠিক বোয়াল মাছের পিঠের মত—খুব ছোট, আর খুব হালকা । বাঁশের মুক্তো খুঁজতে গেলেই হয়ে যেতে হবে বাঁশবনে ডোম কানা । বাঁশের রঙের সঙ্গে সেগুলো একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে । সব হাতির নয়, তারই মধ্যে এক জাতের হাতি আছে, যাদের মাথার পাশে যে মাংস তার মধ্যে হয় মুক্তো। তাকে বলে 'গজমুক্তো' । দেখতে খানিকটা হলুদ রঙের আর ম্যাড়মেড়ে । আবার ঠিক একই রকমের মুক্তো হয় শাঁখ থেকে । শূকরের দাঁতে যে মুক্তো হয়, তা ঠিক নতুন দাঁতের মত ঝকঝকে ।

যাই হোক, আট রকমের মুক্তো আছে ঠিকই, আবার কোন মুক্তোই একেবারে ফেলনা নয় । কিন্তু বলাসুরের দাঁত থেকে সাগরে শুক্তির মধ্যে যে মুক্তো, তার সঙ্গে আর কারো তুলনাই চলে না ।

সূর্যদেব দেখে-শুনে নিজের বিমানে বলাসুরের সব রক্ত তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু নিজের রাজ্যে কিছুই নিয়ে যেতে পারলেন না ।

যজ্ঞে বলাসুরকে বলি দিয়ে দেবতারা তার দেহ নিয়ে যাচ্ছেন, আবার সেই দেহ থেকে মাংস, হাড় খসে খসে পড়ে বিভিন্ন রত্নের আকর হয়ে যাচ্ছে শুনে ত্রিভুবনজয়ী রাজা রাবণ তার বিমান নিয়ে এসে আক্রমণ করল সূর্যদেবকে । প্রাণভয়ে দিবাকর সিংহলের এক নদীতে সেই রক্ত ফেলে দিতে বাধ্য হলেন । বলতে গেলে, সেই নদীটাই ছিল সিংহলের প্রাণ । দুপাশে নানারকমের গাছ, মাঝখানে টলটলে জল । সবাই সেখানে স্নান করত মনের আনন্দে ।

একদিন রাতে হঠাৎ সবাই দেখল, নদীর দুপাশ জুড়ে যে অন্ধকার থাকত সব সময়, তা আর নেই । তার জায়গায় মিষ্টি আলো যেন চিকমিক করছে । সকলেই অবাক । কি ব্যাপার ? ছুটে এসে দেখে, সারা নদীটা ভরে পদ্মরাগ থেকে শুরু করে কত-বা মণি । তার থেকেই চারদিকে ঠিকরে পড়ছে আলো । সেই থেকে নদীটার নামই হয়ে গেল 'রাবণ গঙ্গা' । আর, মণির শেষ নেই তার । কত রকমের যে মণি !

বলাসুরের পিত্তি থেকে হল মরকত মণি । এ মণির শক্তি অসাধারণ । আবার এই মণির আশেপাশে যে সব গাছগাছালি আছে, তাদের তেজও এত বেশি যে সাপের সাধ্য কি বিষ ঢেলে দিয়ে কাউকে মেরে ফেলে ?

হল কি—নাগরাজ বাসুকি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাচ্ছিল পিত্তি নিয়ে । হঠাৎ তা গরুড়ের চোখে পড়ে গেল । বিষ্ণুর কাছ থেকে গরুড় আগেই বর নিয়ে রেখেছিল যে, সাপদের সে দেখবে আর চিরে ফেলবে । বাসুকি তা জানত । তাই দেখামাত্র ভয়ে পিত্তি ফেলে দৌড় । পিত্তি আকাশপথ থেকে এসে পড়ল মাণিক্যগিরির উপত্যকায় । সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে, চলে গেল লক্ষ্মীদেবীর কাছে । নীচে পড়ার সময় লোভের বশে গরুড় তার কিছুটা খেয়েছিল । তাতেই অজ্ঞান সে হয়ে গিয়েছিল । যা গিলেছিল, সবই বেরিয়ে এসেছিল নাক দিয়ে, আর যেখানে যেখানে গিয়ে তা পড়েছিল, সেখানে সেখানেই গড়ে উঠল মরকত মণির এক একটা প্রায় আড়ত ।

আবার সমুদ্রের ধারে সিংহলের যে জায়গায় গিয়ে পড়েছিল বলাসুরের সুন্দর চোখদুটো, সেখানে যে কত রকমের ইন্দ্রনীল মণি হতে শুরু করল, তার ইয়ত্তা নেই ।

হিমালয়ের যেসব জায়গায় গিয়ে পড়ল বলাসুরের চামড়া, সে সব জায়গায় হল পুষ্পরাগ মণি । দেখতে একটু হলুদ কিন্তু গুণ তার অনেক, যেমন ক্ষমতা বৈদূর্যমণির । এই বৈদূর্যমণি যার হাতে থাকবে, দুর্ভাগ্যের ক্ষমতা কি তার কাছে আসে ? বিদূর পর্বত থেকে বেশ কিছুটা জুড়ে জন্ম হয়েছিল এই বৈদূর্যমণির, বলাসুর প্রাণ বিসর্জন দেবার আগে যখন হুঙ্কার ছেড়েছিল, তখন সেই বিকট শব্দ থেকে ।

বলাসুরের বীর্য থেকে হল দারুণ শক্তিশালী ভীষ্মক মণি, নখগুলো থেকে হল নানা রঙের কর্কেতন মণি, রূপ থেকে হল ইন্দ্রগোপ মণি ।

অনন্তদেব এক সময় বলাসুরের অস্ত্রশস্ত্রগুলো আকাশপথ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন । সেগুলো এসে পড়েছিল কেরল প্রদেশে । যেখানে যেখানে সেগুলো এসে পড়ল, সেখানে সেখানে খনি হয়ে গেল বিদ্রুম মণির ।

যজ্ঞে প্রাণ দিল বটে বলাসুর । কিন্তু হীরে-চুনি-পান্না-মণিরত্ন হয়ে দেবতা থেকে মানুষের কাছে চিরকালের জন্য হয়ে থাকল একান্ত আপনজনের মত, বিপদে-আপদে এমন কি দৈব-দুর্বিপাকেও প্রাণের বন্ধুর মত ।



মহামুনি রুচির কাহিনী

মহামুনি রুচি ।

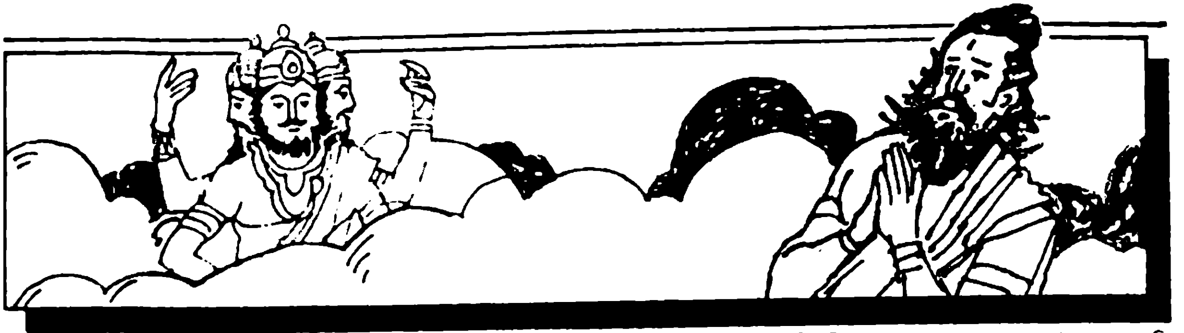
অল্প বয়সেই সংসার-বিরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি । থাকতেন কঠোর সংযমের মধ্যে । সারা দিনে রাতে একবার মাত্র সামান্য কিছু ফলমূল খেতেন । কোন আশ্রমে তিনি থাকতেন না । টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন ।

একদিন যদি কেউ বলেছেন রুচিকে—রুচি, এইভাবে ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে বিয়ে-থা করে সংসার কর, তারপর দিন আর মুনিকে সে তল্লাটে কেউ দেখতে পাবে না ।

শুধু শুধু ঘুরে বেড়ানো নয়—জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা করেও যথেষ্ট জ্ঞান আর শক্তিও ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন রুচি ।

সুযোগ বুঝে একদিন পিতৃদেবরা ধরলেন রুচিকে—রুচি, বিয়ে-থা কর, সংসার হল গার্হস্থ্য ধর্ম । তা পালন না করলে যেমন তোমার পাপ হবে, তোমার পিতৃপুরুষদেরও তেমনি ক্ষতি হবে ।

রুচি বললেন—এ কথা আমি মেনে নিতে পারি না । সংসার মানেই মায়া । স্ত্রী-পুত্র মানেই মোহ । ঐ ফাঁদে একবার পা দিলে গুটি কেটে বেরিয়ে আসা মোটেই সম্ভব নয় ।



পিতৃদেবেরা বললেন—রুচি, তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। তুমি জ্ঞানী। ঐ মায়া-মোহের ফাঁদে তুমি পা দেবে কেন?

—পিতৃদেব, ওটা যে সংসারের ধর্ম। বললেন রুচি—একটা থাকলে, কিভাবে তা থেকে বাঁচটা হবে সংসারে থাকলেই মাথায় আসবে সেই চিন্তা। নিজে জানতেই পারবে না, কখন সে সেই লোভের পেছনে ছুটতে শুরু করবে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার—এ তো ছেলেখেলা। আমরা কতদিনই বা বাঁচব! যদি লোভ-মায়া-মোহর মধ্যেই ডুবে থাকলাম, তাহলে ঈশ্বরকে জানব কেমন করে।

—তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে আমরা দিচ্ছি না রুচি। বললেন পিতৃদেবেরা—আমাদের পরমায়ু আর কতদিন। একদিন আমাদের সকলকেই মরতে হবে। রুচি, মৃত্যুর পরের কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি? মৃত্যুর পর এই শরীর যখন আমাদের থাকবে না, বায়বীয় শরীর ধারণ করব নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, তখন কে আমাদের উদ্ধার করবে? রুচি, মৃত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র তোমার পুত্র। পুত্রের দেওয়া অন্নজল খেতে পেলে তবে পিতার সদ্‌গতি হয়। এ কথা তো অস্বীকার করতে পার না। পুৎ নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র পুত্র। তাই তো তাকে পুত্র বলে। তুমি জ্ঞানী। জ্ঞানীরা কি কখনো মায়া-মোহের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারে?

সবই জানেন, সবই বোঝেন রুচি। তাই ওদিকে আর না গিয়ে এবার বললেন—কিন্তু পিতৃদেব, এখন আমাকে এই বয়সে কে বিয়ে করবে? বয়সটা তো অনেকদিন আগেই পেরিয়ে গেছে। কে আর আমাকে মেয়ে দেবে, বলুন।

—চেষ্টা কর রুচি। বলে পিতৃদেব চলে গেলেন।

এদিকে রুচির মাথায় এতদিন নরকের চিন্তা না থাকায় মেজাজেই কাটাচ্ছিলেন, পিতৃদেবের কথা শুনে এবার খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন রুচি পাত্রীর সন্ধানে, কিন্তু কোথাও আর পান না। শেষে ঠিক করলেন, তপস্যা করবেন ব্রহ্মার কাছে তাঁর উপযুক্ত পাত্রীর জন্য।

কঠোর সংযম নিয়ে রুচি মুনি ব্রহ্মার তপস্যা করলেন একশো দিব্য বর্ষ (তিন হাজার ছশো বছর)।

রুচির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে একদিন দেখা দিলেন ব্রহ্মা। বললেন—তোমার কি ইচ্ছে বল। আমি তা পূরণ করব।

রুচি বললেন—কমলযোনি, পিতৃগণ আমাকে সংসারী হতে আদেশ করেছেন। আমি যাতে তাঁদের আদেশ পালন করতে পারি, আপনি তাতে সাহায্য করুন।

ব্রহ্মা বললেন—রুচি, পিতৃগণকে পুজো করে সন্তুষ্ট কর। তুমি পুত্রলাভ করবে। প্রজাসৃষ্টি করবে।

এই বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন।

রুচিও এলেন নির্জন এক পাহাড়ী এলাকায়। সেখানে এসে প্রথমে তিনি পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। তারপর তাঁদের স্তুতি শুরু করলেন।

এই পিতৃগণ হলেন দারুণ শক্তিশালী। মানুষ দেবতার পুজো করে। পিতৃগণকে পুজো করেন দেবতারা। তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবীর প্রজাদের যাবতীয় আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর মেয়ে স্বধার সঙ্গে তাই বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের।

রুচির মনোরম স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে রুচির সামনে এসে দাঁড়ালেন পিতৃগণ। অপরূপ সব দেখতে। বারবার প্রণাম জানালেন রুচি।

পিতৃগণ বললেন—তোমার তপস্যায় আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। বর চাও।

রুচি বললেন—পিতৃগণ, ব্রহ্মা আমাকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার উপযুক্ত ক্ষেত্র তো আমার নেই। আপনারা আমায় সেই ক্ষেত্র দিন।

পিতৃগণ বললেন—পাবে। আর সেই ক্ষেত্রে তোমার যে বংশধর হবে, সে হবে মনু। প্রজাবৃদ্ধির সুখে তুমি সুখী হবে। তোমার পিতৃপুরুষরাও তৃপ্ত হবেন।

এই বর দিয়ে পিতৃগণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পিতৃগণ অদৃশ্য হতেই হঠাৎ নদী থেকেই যেন উঠে এল স্বর্গের অপ্সরা প্রম্লোচা।

রুচিকে বলল—মুনিবর, আমার একটা অনুরোধ ছিল তোমার কাছে।

—বল অপ্সরা, কি তোমার অনুরোধ!

—আমার কৃপায় বরুণের ছেলে পুষ্করের একটি মেয়ে হয়েছিল। রূপে-গুণে-শীলে অমন মেয়ে সারা পৃথিবীতে আর একটাও নেই। বিয়ের বয়স হয়েছে মেয়ের। কিন্তু উপযুক্ত পাত্র চারদিক খুঁজেও মিলল না। তা তোমাকে হঠাৎ এখানে দেখে মনে হল তুমি সেই মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। তাই আমার অনুরোধ, তুমি এই মেয়েটিকে বিয়ে কর। সুখী হবে। বলল প্রম্লোচা।

রুচি বুঝলেন, এ আর কিছুই নয়, পিতৃগণের আশীর্বাদ, ব্রহ্মার ইচ্ছা। তিনি আর আপত্তি করলেন না।

বিয়ে হয়ে গেল। দীর্ঘদিন ঘর-সংসারও করলেন। এঁরই ছেলে হলেন রৌচ্য মনু। তারপর একদিন আবার সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে গেলেন বনে তপস্যা করতে।



গয়াসুর ও গয়াক্ষেত্র

কীকট দেশে (বিহারে) গয়া হল একটি তীর্থস্থান।

বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অপরিচিত কোন জন মারা গেলে বলে, গয়ায় যাও। পিণ্ড দিয়ে এসো। প্রেতশিলায় পিণ্ড দিলে প্রেতরা মুক্তি পাবে, আর গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড দিলে মা-বাবা নরক থেকে উদ্ধার পাবেন।

কিন্তু কেমন করে এটি হল পুণ্যক্ষেত্র ? আর কেনই-বা এর নাম হল গয়া ?

বহুকাল আগের কথা।

দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল এক বিশালকায় বলবান অসুর। তার নাম ছিল গয়াসুর।

একবার গয়াসুর অমরত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল।

নিদারুণ সে তপস্যা। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধ্যানে নিশ্চল গয়াসুর।

তপস্যার ফলে ক্রমশই তার তেজ বেড়ে উঠতে লাগল। বাড়তে বাড়তে শেষে এমন অবস্থা হল যে দেখে দেবতারাও ভয় পেয়ে গেলেন। গেল বুঝি স্বর্গরাজ্য। অনেক চেষ্টা করেও দেবতারা যখন তার ধ্যান ভাঙাতে পারলেন না, তখন নিরুপায় হয়ে গেলেন শ্রীহরির কাছে।

—ভগবান, আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনি ছাড়া আমাদের এই বিপদ থেকে কে উদ্ধার করবে প্রভু ? আপনি দয়া করুন। ঐ গয়াসুরকে আপনি বধ করুন, প্রভু।

শুনে শ্রীহরি বললেন—শিবের তপস্যা করে ইতিমধ্যেই শিবশক্তি লাভ করেছে গয়াসুর। এখন ওকে হত্যা করলে ও কিন্তু শিবত্ব লাভ করবে।

—সশরীরে বেঁচে থেকে আমাদের ওপর খবরদারি করার চেয়ে অশরীরে ও যদি শিবশক্তি হয়েও থাকে, তাহলেও আমরা নিরাপদে থাকব। আপনি আমাদের বাঁচান।

—বেশ, তাই হবে। আশ্বাস দিলেন শ্রীহরি।

চলে গেলেন দেবগণ।

এর কিছুকাল পরে একদিন গয়াসুর শিবপুজো করবে বলে ক্ষীরসাগর থেকে পদ্ম তুলে আনতে গিয়ে শুরু করল ঘন ঘন হাই তোলা। মনে হল তার, যেন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

নিজের ওপর খুবই বিরক্তি আসতে লাগল গয়াসুরের। এ আবার কি উৎপাত ! এতদিন তো বেশ কাটল। হঠাৎ এখন এত ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে কেন ? ক্লান্তিতে যেন অবসন্ন হয়ে আসছে দেহ। অনেক চেষ্টা করেও গয়াসুর কিছুতেই সেই অবসাদ কাটাতে পারল না। ঘুমকেও এড়াতে পারল না।

পারবে কেমন করে ? গয়াসুর তো আর জানে না যে বিষ্ণু তাকে মরণফাঁদে ফেলেছেন। আর থাকতে না পেরে গয়াসুর প্রায় ঘুমের ঘোরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, পাশে পদ্ম। সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকিয়ে ঘুম।

এই সুযোগে বিষ্ণু গদা দিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

গয়াসুর মারা গেল বটে, কিন্তু গদাধর বিষ্ণুকেও সেখানে থেকে যেতে হল।

বিহারের যেখানে এই দুরন্ত অসুর নিহত হয়েছিল, অসুরের নাম অনুসারে সেই জায়গাটারই নাম হয়ে গেল গয়া। আর, গদাধর বিষ্ণুও সেখানে বাঁধা পড়ে মৃতের সদ্‌গতি দিচ্ছেন বলেই এটা হয়ে গেল তীর্থক্ষেত্র।

পিতামহ ব্রহ্মা এখানে একবার যজ্ঞ করেছিলেন। পাঁচ ক্রোশ এলাকা জুড়ে এই গয়াক্ষেত্র যজ্ঞের দ্বারা সুসমৃদ্ধ করে তিনি দিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণদের। এর মধ্যে এক ক্রোশ হল গয়াশির। অনেকে এটাকে ফল্গুতীর্থও বলে।

সে যাই হোক, অসুরের দৌলতে আজও অনেক মানুষকেই মৃত্যুর পর আর নরক দেখতে হয় না।

শিবরাত্রি ও সুন্দরসেনের কাহিনী

শীতের শেষ মাঘ, অথবা বসন্তের শুরু ফাল্গুন মাস। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। এই রাতটা হল শিবের রাত। ভাল কথায় হল, শিবরাত্রি।

সারাদিন উপবাস থেকে রাত জেগে শিবের পুজো করলে যত বড় পাপীই সে হোক না কেন, মহাদেব তাকে নরক থেকে অবশ্যই উদ্ধার করে আনেন। মহাদেব নিজেই পার্বতীকে একথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, শাস্ত্রের নিয়ম মেনে যে এইভাবে পুজো করবে, মুক্তি তার অবশ্যই হবে। না জেনে ব্যাধ সুন্দরসেন যদি সেই ফল পায় তাহলে জেনেশুনে নিষ্ঠার সঙ্গে করলে তো কথাই নেই।

বহু···বহুকাল আগে এই ভারতবর্ষে অর্বুদ নামে এক দেশ ছিল। সেখানে ছেলে-বউ নিয়ে থাকত এক ব্যাধ। তার কাজই ছিল, বনে বনে ঘুরে বেড়ানো, আর পশুপাখি শিকার করা। শিকারই ছিল তার জীবিকা।

শিকার যারা করে, তাদের প্রাণে বড় একটা মায়া-দয়া থাকে না। তা নইলে যে পাখির দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, যার গান শুনলে মন-প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে, কেউ কি তাকে তীরের ডগায় মারতে পারে? হরিণ-হরিণীর দল এমনিতেই ভীরু। যাদের চোখের দিকে তাকালে এমনিতেই ভালবাসতে ইচ্ছে যাবে—নির্দয় নিষ্ঠুর না হলে কেউ কি তাদের মারতে পারে?

ব্যাধ সুন্দরসেনের কাছে একটাই কথা—দেখ আর মার। আর বাড়ি নিয়ে এসে আগুনে পুড়িয়ে সবাই মিলে খাও।

প্রতিদিনের মত সেদিন সকাল হতেই ধনুক-তীর নিয়ে শিকারে বের হল ব্যাধরাজ সুন্দরসেন। ঘুরল বনে বনে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। অন্য দিন এরই মধ্যে বেশ কিছু তার শিকার হয়ে যেত, ফিরত ঘরে। সেদিন কিন্তু তখনো পর্যন্ত একটা শিকারও তার মিলল না। পেটে তখনো পর্যন্ত কিছু পড়ে নি, মুখে একফোঁটা জল পর্যন্ত। খিদে-তেষ্টায় প্রাণ টা-টা করলেও সব কিছু অগ্রাহ্য করে সে তখনো ফিরতে লাগল শিকারের খোঁজে। শিকার না নিয়ে ঘরে ফিরবে কোন মুখে? জমানোও তো কিছু থাকে না যে, একদিন শিকার না মিললেও কোন ক্ষতি নেই।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে হল সন্ধেরাত।

সেদিন ছিল আবার কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী। অমাবস্যার অন্ধকারের মতই অন্ধকার রাত। ঘরে আর ফেরা হল না তার।

একদিকে রাত আর একদিকে খিদে-তেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সুন্দরসেন।

পাহাড়ের মাঝেই এক জায়গায় এক সরোবর। তারই পাশে গাছগাছালি ঢাকা একটা জায়গা। নিরাপদ আস্তানা মনে করে সুন্দরসেন রাতের মত সেখানেই আশ্রয় নিল।

দারুণ ধুলো ছিল জায়গাটায়। এত ধুলোর ওপর কি থাকা যায়? সরোবর থেকে আঁজলা আঁজলা জল তুলে এনে বেশ করে ছিটিয়ে দিল। ধুলোগুলো বসে গেল। তারপর চুপ-চাপ জেগে সেখানে বসে রইল সুন্দরসেন। ছিল পাশে একটা বেলগাছ। হাওয়ায় মাঝে মাঝে টুপটাপ করে গাছ থেকে পাতা খসে এসে পড়তে লাগল সেখানে। তারপর বাকি রাত জেগে জেগেই বসে কাটিয়ে দিল। সকাল হতে ফিরে এল বাড়িতে।

ব্যাধরাজ সুন্দরসেন তো আর জানে না, সেই রাতে কতখানি পুণ্য সে সঞ্চয় করে ফিরল।

সুন্দরসেন যেখানে আস্তানা নিয়েছিল, সেখানেই ছিল এক শিবলিঙ্গ। কেমন করে আর তা জানবে সুন্দরসেন। সময়টাও ছিল কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথি। আঁজলা করে জল এনে ধুলো ভেজাতে গিয়ে সেই জলে শিবলিঙ্গেরও স্নান হয়ে গেল। বেলগাছ থেকে খসে পড়া পাতা লিঙ্গের মাথায় পড়ায় আপনা আপনি তার পুজোও হয়ে গেল। হাত থেকে একটা তীর খসে পড়েছিল ব্যাধরাজের। সেটি কুড়িয়ে নিতে গিয়ে তাকে ছোঁওয়াও হয়ে গেল তার। এর ওপর ছিল সারাটা দিন উপবাস। সব মিলেমিশে শিবরাত্রি হয়ে গেল ব্যাধরাজের।

ক্রমে বয়স বাড়ল, একদিন মারাও গেল ব্যাধরাজ।

মৃত্যু হওয়ার আগে থেকেই যমরাজের দূতরা এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে ঘিরে। কেননা পৃথিবীর প্রাণীরা মারা গেলে একমাত্র যমরাজেরই অধিকার আছে তাকে নিয়ে যাবার। সেখানে যমরাজের



সভায় বিচার হবার পর পাঠানো হবে নরকে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করার জন্য। তাছাড়া সুন্দরসেনের মত এত নিষ্ঠুর নির্দয় প্রাণীঘাতক, সারাটা জীবন যে শুধু প্রাণীহত্যা করেই কাটাল—তার নরক ছাড়া আর স্থান কোথায়?

ইতিমধ্যে সেখানে এসে হাজির হল শিবদূতরা। তাদের দাবি, সুন্দরসেনকে তারা নিয়ে যাবে। তার ওপর যমরাজের কোন অধিকার নেই।

সে কি কথা? সারাটা জীবন যে শুধু জীবহত্যার মত পাপ কাজ করে গেল, তার স্থান কি কৈলাসে হতে পারে, কখনই না। নরকই ওর যোগ্য স্থান।

সারাটা জীবন পাপ কাজ করেছে ঠিকই, তবুও সুন্দরসেন কখনো যমলোকে যাবে না।

কেন?

শিবরাত্রির মুহূর্তটি শাস্ত্রে যা লেখা আছে, ব্যাধরাজ তা না জেনেও সারাটা দিন যেভাবে কাটিয়েছে তাতেই তার সব পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে। ওকে আর নরক ভোগ করতে হবে না।

যমদূতরা এরপর আর কি করে। মৃত ব্যাধরাজকে শিবদূতদের হাতে দিয়ে ফিরে গেল। আর সুন্দরসেনও কৈলাসে গিয়ে হল শিবের পার্শ্বচর।

কৌশিক ও ধনপালের কাহিনী

বিখ্যাত পাটলিপুত্র নগর। দেশের যত সৎ আর পণ্ডিত ব্যক্তিদের বাস ছিল সেখানে।

এক সময়ে এখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল বীর। স্ত্রী রম্ভাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। এক ছেলে কৌশিক, আর এক মেয়ে বিজয়া। সম্পত্তির মধ্যে ছিল মাত্র একটি ষাঁড়। আদর করে তার নাম রেখেছিলেন ধনপাল। খুব একটা সুখের সংসার না হলেও কেউ কোনদিন দুঃখে ব্রাহ্মণকে ভেঙে পড়তে দেখে নি।

একবার গ্রীষ্মকালে যেমন রোদ, তেমনি গরম। ছেলে কৌশিক ষাঁড় ধনপালকে নিয়ে গেল এক জলাশয়ে। স্নান করাবে ধনপালকে, নিজেও প্রাণ ভরে স্নান করবে। করছিলও তাই। বেশ ঠাণ্ডা জল। কি ভালই না লাগছিল কৌশিকের জলে সাঁতার কাটতে। জলের নীচে সারা শরীর রেখে, শুধু মুখটুকু তুলে ধনপালেরও জল নিয়ে সে কি খেলা!

ধনপালের ওপর লোভ ছিল কয়েকটা চোরের। কৌশিক যখন সাঁতারে মত্ত, চোরেরা সেই সুযোগে জল থেকে ধনপালকে তুলে বনের পথে চম্পট দিল। কৌশিকও তাড়াতাড়ি পাড়ে এসে উঠল বটে, কিন্তু তাদের আর দেখতে পেল না।

মন খুব খারাপ হয়ে গেল কৌশিকের। ধনপালকে না নিয়ে কি করে বাড়ি ফেরে? যেভাবেই হোক খুঁজে তাকে বের করতেই হবে। ভেবে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে চলল বনের পথে।

বোন বিজয়া গিয়েছিল গঙ্গায় জল আনতে। ফেরার পথে হঠাৎ দেখা তার ভাই-এর সঙ্গে। ভেজা কাপড় মাথায় জল, শুকনো মুখে ভাইকে একা বাড়ির পথ ছেড়ে উলটোদিকে যেতে দেখে চমকে উঠল বিজয়া।

—ভাই, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ওরকম শুকনো মুখ কেন? কি হয়েছে রে?

—কতকগুলো চোর আমাদের ধনপালকে নিয়ে এই বনে ঢুকে পড়ল রে দিদি? এখন ধনপালকে না নিয়ে ফিরি কেমন করে বল? বলল কৌশিক।

শুনে বিজয়ারও খুব দুঃখ হল। ধনপাল বাবা বীরের প্রাণ। জানে, ধনপালকে না পেলে বাবা কি কষ্টই না পাবেন!

বাড়ি না ফিরে বিজয়াও চলল কৌশিকের সঙ্গে ধনপালের খোঁজে। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে খুবই পিপাসা পেয়ে গেল তাদের। মৃণালের ডাঁটা চুষলে পিপাসা আর থাকে না। তারা দুজনে তাই কাছেই এক সরোবরে গেল মৃণাল তুলতে। গিয়ে দেখে, বেশ কয়েকজন মহিলা সরোবরের তীরে কিসের যেন পুজো করছে।

খুবই কৌতূহল জাগল ভাইবোনের তা দেখে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমরা কি করছ গো?

ওরা বলল—আমরা বুধাষ্টমীর ব্রত পালন করছি। তা তোমরা এখানে কেন?

ভাইবোন বলল তাদের দুর্ভাগ্যের কথা। তারপর বলল—দেখ, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিতে পার?

শুনে সেই মহিলারা বললে—শোন, আমরা যেভাবে ব্রত পালন করছি, তোমরাও আমাদের সঙ্গে এভাবে মনের কামনা বুধদেবকে জানিয়ে ব্রত কর। দেখবে, তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

এই বলে তারা দুই ভাইবোনকে আমপাতার ঠোঙা, কিছু চাল ইত্যাদি দিল। তারাও মহিলাদের দেখে দেখে মনের বাসনা বুধদেবকে জানিয়ে ব্রত পালন করল। প্রসাদ খেল।

ব্রতের শেষে স্ত্রীলোকেরা যে যার বাড়ি চলে গেল। কৌশিক আর বিজয়া আবার ধনপালকে খোঁজা শুরু করল।

কিছুটা পথ আসতেই কৌশিক দেখতে পেল ধনপালকে। চোরও কৌশিককে দেখে ধনপালকে ছেড়ে পালাল।

ভাইবোন যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধে।

এদিকে ছেলেমেয়েকে সময় মত ফিরতে না দেখে খুবই ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। খেতে পর্যন্ত পারেন নি। সারাটা দিন ঘর-বার করেছেন। ছেলেমেয়েকে সন্ধ্যায় ফিরতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর সব শুনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাদের।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল মেয়ে বিজয়া। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এখন এই গরিবের ঘরে ছেলে কোথায় মেলে? ভেবে আকুল ব্রাহ্মণ বীর।

বাবা-মাকে ঐরকম দেখে বিজয়া একদিন বলেই বসল—আমাকে তোমরা যমের হাতেই দাও না। অত ভাবছ কেন?

বললেই কি আর দেওয়া যায়? না, কেউ ইচ্ছে করে নিজের মেয়েকে যমের হাতে তুলে দেয়।

ভাবতে ভাবতে ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ব্রাহ্মণীও গেলেন।

সেই যে সরোবরের তীরে বুধরাজার পুজো আর বুধাষ্টমীর ব্রত করে এসেছিল ভাইবোন মনের কামনা জানিয়ে, তা কিন্তু তারা করেই যেত।

তারই ফলে কৌশিক হল রাজা। অযোধ্যায় রাজ্য স্থাপন করে বসল সিংহাসনে।

এরপর একদিন সত্যি সত্যিই যমরাজ এসে হাজির হলেন কৌশিকের কাছে। বিজয়াকে ডেকে বললেন—চল আমার সঙ্গে। তুমি হবে আমার ঘরনী।

খুবই খুশি মনে কৌশিক দিদিকে তুলে দিল যমরাজের হাতে। বিজয়া ব্রতের ফল পেয়ে খুব খুশি।

স্বামীর সঙ্গে যমপুরে গিয়ে দেখে সেখানে তার মা দারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে।

বুধাষ্টমী ব্রত করে বিজয়া পেয়েছে এই সৌভাগ্য। মাকে কষ্ট পেতে দেখে স্বামীর অনুমতি নিয়ে আবার ব্রত করল বিজয়া। এবার তার কামনা ছিল, মায়ের মুক্তি।

সত্যিই ফল ফলল। ব্রতের শেষে মা মুক্ত হয়ে চলে গেলেন স্বর্গে।

গরুড়-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ (১)

জন্ম-মৃত্যুর ইতিকথা

বৈকুণ্ঠ থেকে বেশ কিছুদিনের জন্য বিষ্ণু-বাহন পক্ষীরাজ গরুড় বেরিয়ে পড়ল নিজের খেয়াল-খুশিমত বেড়াতে। শ্রীভগবানের সঙ্গে গরুড় সব সময়ের জন্যই বৈকুণ্ঠবাসী। থাকতেই হয় বৈকুণ্ঠে।

কারণ, কখন ঠাকুরের ডাক পড়বে, পিঠে নিয়ে কোথায় ছুটতে হবে, তার তো আর ঠিক নেই। ঠাকুরকে নিয়ে যেতে হয়েছে তাকে প্রায় সব জায়গাতেই। কখনও দেবলোকে, কখনও গন্ধর্বলোকে, কখনও মনুষ্যলোকে, কিন্তু কোন জায়গাই তার ভালভাবে দেখার সুযোগ আর হয় নি।

তাই কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে গরুড় একদিন বৈকুণ্ঠ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল সব কিছু ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে।

অসম্ভব দ্রুতগামী পক্ষীরাজ। বিশাল বিশাল ডানায় প্রায় তুফান তুলে ঘুরতে লাগল এ-লোক থেকে সে-লোক ; আবার সে-লোক থেকে অপর এক লোক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সব কিছু। তারপর আবার ফিরে এল বৈকুণ্ঠে।

ফিরেই প্রণাম জানিয়ে বসল সামনে।

গরুড়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন বিষ্ণু—তারপর গরুড়, কোথায় কোথায় ঘুরে এলে ? কি সব দেখে এলে একটু বল ?

গরুড় বলল—প্রভু, তিনটে লোক ঘুরে এলাম।

—কোন্ কোন্ লোক গো, গরুড় ?

—আজ্ঞে প্রভু, ভূলোক, ভুবর্লোক আর স্বর্গলোক।

—আর পাতাল ?

—প্রভু, ইচ্ছে করেই যাই নি। ওরা তো সব সময় আমার ভয়েই অস্থির। আমাকে দেখতে পেলেই পালাবে। কিছু দেখা হবে না, জানাও যাবে না।

—ওঃ, তাই নাকি ? আবার হেসে বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন—বেশ তা, যমলোকে গেলে ?

—প্রভু, ইচ্ছে করেই বাদ দিলাম। দেখতে দেখতে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে, আর থাকতে না পেরে সোজা চলে এলাম আপনার কাছে।

—সে কি গরুড় ? কেন, মন খারাপ হওয়ার কারণ ?

—প্রভু, দেখলাম একমাত্র এই বৈকুণ্ঠ ছাড়া আর কোথাও শান্তি নেই। অমন যে দেবলোক, যেখানে সব দেবতাদের বাস, দেখলাম দৈত্য-দানবদের ভয়ে সেখানে শান্তি নেই। দেবতারা যেন সব সময় তটস্থ হয়েই রয়েছেন। দেবতাদের মুখে মর্ত্যলোকের ভারতবর্ষের কত প্রশংসা ! স্বর্গে দেবতা হয়ে থাকার চেয়ে নাকি ভারতবর্ষে মানুষ হয়ে জন্মানো অনেক ভাগ্যের ফল। শুনে গেলাম মর্ত্যলোকে। সেখানে গিয়ে আবার যা দেখলাম, তাতে মন আমার আরও খারাপ হয়ে গেল।

—কেন ?

—প্রভু, দেখলাম মর্ত্যলোকের সে কি দুর্দশা ! ভারতবর্ষের এত যে প্রশংসা দেবতাদের মুখে, সেখানে তো আবার দুর্গতির সীমা-পরিসীমা নেই। কেমন সব দেখতে মানুষগুলোকে ! কেউ ট্যারা, কেউ কানা, কেউ বোবা, কেউ হাবা, কেউ-বা কালা। কারো গলার স্বর যেন খলখল করে কাঁসি বাজাচ্ছে, কেউ-বা তোতলা। নিখুঁত, সুন্দর দেখতে তো প্রায় চোখেই পড়ল না। তবুও কি সব দম্ভ আর অহঙ্কার ! তার ওপর প্রভু, সব কি দারুণ স্বার্থপর ! নিজে কিভাবে ভাল থাকবে, ভাল খাবে। সব সময় দেখলাম, প্রভু, মানুষগুলো সব সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত। তার জন্য হেন কাজ নেই, তা সে যত খারাপই হোক, করে বেড়াচ্ছে না। চোখের সামনে চোখের পলকে ওদের কত আত্মীয়-পরিজনই না মারা যাচ্ছে। কেউ মরছে রোগে ভুগতে ভুগতে দারুণ কষ্টে, কেউ মরছে টুপ করে। ওদের দেখলাম, এসব ব্যাপারে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। আমি কিন্তু দেখে-শুনে আর থাকতে পারলাম না।

শুনে আবার মৃদু হাসলেন ভগবান।

—আচ্ছা প্রভু, একটু থেমে জিজ্ঞেস করে গরুড়—এই যে মৃত্যু, এটা কি ? আর এত বৈচিত্র্যই-বা কেন ?

—ঠিক প্রশ্নই করেছ গরুড়। এ সব আর তুমি জানবে কেমন করে ? বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—জন্মালেই মরতে হয়। জীবজগতের এটাই নিয়ম। সময় এলেই চলে যেতে হবে সে মর্ত্যলোকের জীবই হোক, আর স্বর্গলোকের দেবতাই হোক। মৃত্যু মানে একেবারে চলে যাওয়া বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নয়। যে রকমটি ছিল ঠিক সে রকমটি না থেকে অন্য রকমে থাকা। যেমন জল আর বরফ। এই যাকে দেখলে টলটলে জল, কিছুকাল পরে জলের আয়ু ফুরিয়ে গেল। কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। শক্ত বরফ হয়ে থেকে গেল। এখন বৈচিত্র্যের কারণ বলছি শোন। এ সবই হল কর্মফল। মানুষজন্ম তো আর এক জন্মে হয় না। অনেক জন্ম ঘুরতে ঘুরতে তারপর মানুষজন্ম মেলে। সেই জন্মে যে যেমন কাজ করবে, সে সেই রকম ফল পাবে। ভাল কাজ করলে ভাল। আবার মন্দ কাজ করলে মন্দ। যে ধর্মের পথ ছেড়ে অধর্ম করবে, অপরের সম্পত্তি চুরি করবে, কারও অনিষ্ট করবে, মনে কষ্ট দেবে, সে কি যমরাজের হাতে কোন শাস্তি ভোগ না করেই ছাড়া পেয়ে যাবে ? তা যায় না গরুড়। যমদূতরা লাঠি, গদা নিয়ে এসে নিয়ে যাবে তাকে যমরাজের কাছে। যে যে রকম পাপ করবে, তাকে নরকে সেই রকমভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—নরক কি জিনিস, প্রভু ? মাঝপথে হঠাৎ প্রশ্ন করে গরুড়।

—পুণ্য কাজ করলে যেমন দেবলোকে গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করে, পাপ কাজ করলে তার স্থান তেমনভাবেই যমরাজের রাজত্বে। ঐ যে বললাম, প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যেতে হয়। নরক নামে যমরাজের অনেকগুলো ভীষণ ভীষণ জায়গা আছে। মানুষের দেহ থেকে জীবটাকে বের করে যমদূতরা নিয়ে যায়। সেই জীবের আকৃতি এক আঙুল পরিমাণ।

—সে কি প্রভু ! অত বড় যে দেহগুলো ? বিস্ময় জাগে গরুড়ের।

—দেহটা তো হল ঐ এক আঙুল জীবের ঢাকনা। সাড়ে তিন কোটি রোমকূপ, কুড়ি কোটি নখ, তিনশ বাষট্টিটা হাড়, এক হাজার পল (১ পল = ৮০ তোলা) মাংস, আর প্রায় সাড়ে সাতাশ কোটি চুল নিয়ে দেহটা। এগুলো হয়েছে মাটি, জল, আগুন, বায়ু আর আকাশ থেকে। যাকে বলে পঞ্চভূত। মারা যাবার পর পুড়িয়ে দিলে বা মাটিতে পুঁতে দিলে এই ঢাকনার যে অংশটা যা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সেখানেই মিশে যায়। থাকে ঐ এক আঙুল জীব মাত্র। তাকে যমদূতরা টানতে টানতে নিয়ে যায়। যে যেমন পাপকর্ম করেছে, যমরাজের নির্দেশে তাকে তার উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়।

শুনতে বেশ কৌতূহল জাগে গরুড়ের।

—জানো গরুড়, যে মানুষটা সারা জীবন মিথ্যে কথা বলেই কাটাল, তার জীবনটাকে নিয়ে গিয়ে যমরাজের আদেশে যমদূতরা

ফেলে দেয় রৌরব নামে নরকে। দু-হাজার যোজন (আট হাজার ক্রোশ) এলাকা জুড়ে এই নরক। এর সর্বত্র হাঁটু পর্যন্ত গর্ত, গর্তে জ্বলন্ত কয়লা। কি গরম! মিথ্যেবাদী এখানে পড়েই এখানে-ওখানে প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করে দেয়। কিন্তু যাবে কোথায়? তেতে পুড়ে তো খাক। পালাতে কি পারে? ছটফট করতে করতে যখন অর্ধেকটা পেরোয় তখন সেখান থেকে তাকে তুলে এনে আবার অন্য জায়গায় পাঠায়। এ তো সামান্য। পাপ যেমন করবে, তার জন্য যমরাজের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে সেই রকম। যেমন মহারৌরব। সেখানকার মাটিটাই জ্বলন্ত তামা। উত্তাপে গনগন করছে কুড়ি হাজার ক্রোশ জুড়ে মহারৌরব এলাকা। মহাপাপীকে হাত-পা বেঁধে যমদূতরা এখানে ফেলে দেয়। পাপী গড়ায় আর চিৎকার করে। তার ওপর আবার কাক, বক, নেকড়ে, পেঁচা, মশা, বিছে সবাই এসে এসে ছোবল বসায়। আর পাপী চিৎকার করতে থাকে 'বাবাগো' 'মাগো'। যত পাপ সে জীবনে করেছে সবটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে তার মুক্তি নেই। এরকম আরো অনেক, অনেক রকমের নরক আছে। কোথাও কনকনে ঠাণ্ডা, কোথাও শুধু ভয়ানক সব ক্রিমিতে ভরা। পাপীরা এই সব নরকে পাপ ভোগ করে হাজার হাজার বছর ধরে। তারপর আবার জন্মায়।

—কিভাবে সব জন্মায় প্রভু? শুনতে শুনতে যেন নেশা লেগে গেছে গরুড়ের।

—সেও বড় মজার গরুড়। কেউ হল মা, কেউ হল বাবা। জন্মাবার জন্য মায়ের গর্ভে জীবন আশ্রয় নিল। ঐ যে আগে পঞ্চভূতের কথা বললাম, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু আর আকাশ—এরাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। মাটি দিল হাড়, চামড়া, নাড়ি, রোম, আর মাংস—এই পাঁচটা জিনিস। জল দিল রক্ত, মজ্জা, শুক্র, মূত্র আর লালা। তেজ দিল দেহের কান্তি, উৎসাহ, খিদে, তেষ্টা আর ঘুম। বায়ু দিল রাগ, দ্বেষ, পৌরুষত্ব, ভয় আর মোহ। এই পাঁচটা ছাড়াও ছোটার শক্তি, চলার শক্তি, ছড়িয়ে যাওয়া, কুঁচকে যাওয়া, দম বন্ধ হয়ে যাওয়া, এগুলোও দিয়ে দেয় বায়ু। আর আকাশ দিল শব্দ, চিন্তা, গাম্ভীর্য, শোনার শক্তি আর উদারতা। গরুড়, জীবন এভাবে সকলের সাহায্যের আবরণ নিয়ে আবার ভূমিষ্ঠ হয় মাতৃগর্ভ থেকে। বড় হয়। কাজ করে। পূর্বজন্মের ফল ভোগ করে।

—নরকে অত প্রায়শ্চিত্ত করার পরও আবার তাকে ফলভোগ করতে হবে?

—হবে বৈকি। নরকেই সব শেষ হয়ে যায় না। ঐ যে তুমি বললে, কাউকে দেখলে ট্যারা, বোবা, কালা, হাবা, কাউকে দেখলে তোতলা? যদি সব ভোগ শেষই হয়ে যাবে তাহলে এত রকমফের দেখবে কেন? কেউ পুরুষ হয়ে জন্মেও পুরুষ নয়, হিজড়ে কিংবা মেয়েছেলের মত, কেউ-বা আবার মেয়েছেলে হয়ে জন্মে ঠিক পুরুষের মত আচারে-আচরণে। এ সবই গরুড়, পূর্বজন্মের ফল। তার ওপর আবার ওরা কত রকম রোগে ভোগে। তাহলে বলি শোন, গরুড়। গত জন্ম যে কাটিয়েছে অজস্র মিথ্যে কথা বলে, পরজন্মে কথা তার আটকে যাবেই, তোতলা হবেই। নারীর সম্মান যে রাখে নি, কোন্ অধিকারে সে পর জন্মে পুরুষ হয়ে জন্মাবে, বল। হিজড়ে তাকে হতেই হবে। যারা জীবনটাকে শুধু ভোগের মনে করে, যারা মনে করে ভোগ করার জন্য ভাল-মন্দ পথের আবার বিচার কি, পরের জন্মে তারা হবে জন্মান্ধ। অকথা-কুকথা বলে যারা শুধু অপরকে জীবনভর কষ্টই দিয়ে যায়, পরের জন্মে তারা বোবা, হাবা, কালা হবে না তো আর কারা হবে? অখাদ্য খেয়ে থাকলে পরের জন্মে তাকে সেই খাদ্যের রোগে ভুগতেই হবে। মিষ্টি কার না খেতে ভাল লাগে, বল? সেই জিনিস যদি কাউকে একটুও না দিয়ে একা একা কেউ খায়, তার বাত রোগ জানবে নিশ্চিত। অপরের অন্ন যে চুরি করে খাবে, পর জন্মে তাঁকে বদহজমের রোগী হতেই হবে। বিয়েতে যারা ঘোঁট পাকিয়ে শুভ কাজ নষ্ট করে পরজন্মে তারা জন্ম থেকেই হয় গনাকাটা (ঠোঁটকাটা)। শুধু সেখানেই শেষ নয়, তার পরের জন্মে সে হবে ষাঁড়। আদালতে দাঁড়িয়ে যারা মিথ্যে সাক্ষী দেয় পরের জন্মে তারা পেটে জলের রোগ নিয়ে ভোগে, তার পরের জন্মে হবে মশা। কাপড় চুরি করলে শ্বেতকুষ্ঠ রোগে ভুগবেই। তাও আবার যদি সবাই মনুষ্যজন্ম পায়।

—সবাই কি মনুষ্যজন্ম পায় না প্রভু? জিজ্ঞেস করে গরুড়।

—না গরুড়। যাদের পাপের বোঝা এত বেশি যে নরকে অযুত বছর শাস্তি ভোগ করেও শেষ হল না, অথচ আবার জন্মাবার সময় এসে গেছে, তারা যে যে রকম পাপ করেছে সেই রকমভাবে জন্মায়। ঘাস, লতাপাতা থেকে শুরু করে কেউ জন্মায় ডানাওলা পাখি হয়ে, আবার কেউ-বা বাঘ, হাতি, কুকুর, উটের মত পশুকুলে।

—সে তো আর এক যন্ত্রণা প্রভু। বলে গরুড়।

—হ্যাঁ গরুড়। যতদিন জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে জীবন ঘুরবে, ততদিন এই যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে। পুণ্য কাজ করে স্বর্গে গিয়েও তাদের শান্তি নেই।

—এর থেকে পরিত্রাণের কি কোন উপায় নেই। ঠাকুর? শুনতে শুনতে যেন খুব কষ্ট বোধ হচ্ছিল গরুড়ের।



—আছে বৈকি গরুড়। আশ্বাস দেন শ্রীকৃষ্ণ। —যে মনকে নিজের বশে রাখতে পারে, যে নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না, নিজের দেহকান্তি, বিদ্যে, বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি নিয়ে মদমত্ত হয় না, সকলকে যে নিজের মত করে ভালবাসে, সবার মাঝে নিঃসঙ্কোচে বিলিয়ে দেয় নিজেকে, সকলের মধ্যে যে আমাকে (ভগবানকে) দেখে তাকে আর জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না, গরুড়। তাকে নরকও আর কখনও দেখতে হয় না।

গরুড়-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ (২)

প্রেতলোকের ইতিকথা

অতি প্রিয় বাহন পক্ষীরাজ গরুড়কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মৃত্যুর পর-পরই মানুষের কি অবস্থা হয়, তা কি জানো ?

ঘাড় নাড়ে গরুড়। জানে না।

—শোন তাহলে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মানুষ মারা যাবার পর দেহটা তার পড়ে থাকল পৃথিবীতে। তাকে ঘিরে ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করে এক সময় তার সৎকার করে এল। তারপর শাস্ত্রের নিয়ম মেনে অশৌচ পালন সেরে বারো দিনের দিন ছেলে মাথা কামিয়ে বাপের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে শাস্ত্রমত বাবার প্রিয় খাদ্যগুলি পাক করে পিণ্ড পাকিয়ে দেহহীন বাবাকে দিয়ে বলল, 'বাবা, আমি তোমার ছেলে। আমার দেওয়া এই অন্ন তুমি দয়া করে গ্রহণ করো। এই অন্নজল খেয়ে আমার ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা যেখানে আছেন, যেখানে আছেন আমার পূর্বপুরুষরা, তুমিও সেখানে যাও।' তের দিনে এই শ্রাদ্ধ শেষ করে, যে তিথিতে তার বাবা মারা গয়েছিল, সেই তিথি ধরে প্রতি মাসে একবার করে বাবার উদ্দেশ্যে ঐভাবে পিণ্ড দিয়ে শেষ করে বছরে এসে। তাকে বলে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। ছেলে তো আর জানে না, এই দেওয়ার ফলে তার বাবা কতখানি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে!

—ঠিক বুঝতে পারলাম না, প্রভু, ছেলেকে কেন এ কাজ করতে হবে। বেঁচে থাকার সময় বুড়ো বাবাকে খাওয়ানো পরানোর ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু মৃত্যুর পর ছেলের দেওয়া এই পিণ্ড তার বাবার কি উপকার করবে ?

—পক্ষীরাজ! বললেন শ্রীকৃষ্ণ—ছেলে ছাড়া আর কারো দেওয়া অন্ন-জল সে নিতে পারবে না। কেননা, ছেলের সঙ্গে যে তার রক্তের সম্পর্ক। মারা গেছে, দেহটা আর নেই বলে কি মনে করছ, তার খিদে-তেষ্টাও আর নেই ? সবই থাকে, গরুড়, সবই থাকে। এই দেহ নিয়ে পৃথিবীতে যে খিদে-তেষ্টাকে জয় করে থাকতে পেরেছে, সে তো মুক্তপুরুষ। তার আর সংখ্যা কত ? বেশির ভাগই তো সাধারণ। কিভাবে থাকে তারা মৃত্যুর পর, শোন বলি।

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে বলতে লাগলেন— তের দিনের দিন ছেলের দেওয়া সেই অন্ন পিণ্ড খাওয়ার পরই মৃত বাবার শরীরটা আগের দেহের যে রকম বয়স আর অবস্থা ছিল, ঠিক সেই রকম হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা অবশ্য তাকে সে অবস্থায় দেখতে পায় না। বাতাসের চেয়েও হালকা হয়ে যায় সে। সে শরীরটাকে বলে প্রেতশরীর। যমরাজের অনুচরবরা হাতে লাঠি, অঙ্কুশ, ডাণ্ডস নিয়ে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে করতে তখন নিয়ে চলে তাদের রাজার দরবারে। দুর্গম পথ। অবশ্য এই দুর্গম পথ পাপী মানুষদের জন্য। সাধু মানুষদের পথ আলাদা। সেখানে এত কষ্ট নেই। মনুষ্যলোক থেকে যমলোকের দূরত্ব ছিয়াশি হাজার যোজন অর্থাৎ তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ক্রোশ। প্রেত শরীরটাকে যমদূতরা নিয়ে যায় নশ অষ্ট-আশি ক্রোশ। ভেবে দেখ, কি দুরন্ত গতিতে তারা ছোটে। তিনশো আটচল্লিশ দিনে তারা গিয়ে হাজির হয়ে যায় যমরাজের সংযমনী পুরীতে। এতটুকু ক্লান্তি নেই দূতদের, কিন্তু প্রেতশরীরের তখন প্রায় আধমরা অবস্থা।

তা তো হবেই। কষ্টবহুল সেই পথে তাদের ছোটা। মাহুতের হাতি যেমন মাহুতের আঁকশির ঘা পেয়ে ঐ বিরাট দেহ দিয়ে ছোটে, অঙ্কুশের আঘাতে লাঠির ঘায়ে প্রেতশরীরও তেমনি ছোটে। ছেলের দেওয়া ঐ পিণ্ড জলটুকুই তখন তাদের একমাত্র ভরসা, একমাত্র সম্বল। নিদারুণ পথ। কোথাও আগুনের উত্তাপ, কোথাও পাথরের খোঁচা, কোথাও কুশের বন। ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় দেহ। কোথাও ঠাণ্ডা জায়গা পেয়ে জিরিয়ে নেবার ইচ্ছে জাগলেও উপায় নেই। আঁকশির খোঁচা, আর যমদূতদের বিকট খ্যাকখ্যাকানি। থামার সময় নেই। তার ওপর আবার আছে শিয়াল-কুকুরের উৎপাত। বোঁ-বোঁ করে এসে তারা আবার খাবলা খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে যায় প্রেতশরীর থেকে। বাধা দেবার সামর্থ্য নেই।

জানো গরুড়, যমপুরীতে যাবার আগে এই প্রেতশরীরটাকে পেরোতে হয় ষোলটা নগর—তাকে বলে ষোলটা পুরী।

প্রথমেই পড়ে যাম্যপুরী। মনোরম জায়গা। তিরতির করে বয়ে চলেছে পুষ্পভদ্রা নদীর জল। বটগাছের পর বটগাছ। ছায়া। ঠাণ্ডা হাওয়া। ছেলের দেওয়া ঐ পিণ্ডটুকু খেয়ে একটানা আঠারো দিন দৌড়ে প্রেতশরীর যখন আসে এই পুরীতে, মনে মনে ভাবে, এবার একটু বিশ্রাম অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় ? বিশ্রাম নিতে যাবে কি, ডাণ্ডস তুলে তেড়ে আসে যমদূতরা। বলে—নদীর জলে স্নান, গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেবার মত কোন কাজ করেছিস তোরা ? হতচ্ছাড়া! শিয়ালের মত শব্দ করে কেঁদে ওঠে প্রেতশরীর। সত্যিই তো, যতদিন বেঁচে ছিল, একটা পুকুরও কাটায় নি। গাছ বসানো তো দূরের কথা। বরং গাছ কেটেছে অনেক। হায় হায় করে ওঠে সে তখন। অনুশোচনা জাগে। হাসে যমদূতরা। আবার দৌড়। ছেলের ভালবেসে দেওয়া পিণ্ড খেয়ে এবার আসে সৌরিপুরে। জঙ্গম নামে কামরূপী রাজার পুরী। বিশ্রামের অবকাশ নেই। বিলাপ করতে করতে ছোটে প্রেত শরীর—দান করি নি, বেদ-পুরাণ পড়ি নি। কত অভাবী ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করার জন্য বই চাইতে এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার এই দুর্গতি হবে না তো কার হবে ?

সৌরিপুর পেরিয়ে প্রেতশরীর এবার আসে নগেন্দ্রনগরে। হাঁফিয়ে পড়ে সে। পিণ্ড-অন্ন যতই মদত দিক, ক্লান্তি তো আসে।

খিঁচিয়ে ওঠে যমদূতরা—তুই যখন বেঁচে ছিলি, যাকে সুযোগ পেয়েছিস, তাকেই তো নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়েছিস। কারো মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলি ? শুধু নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া ?

আবার আর্তনাদ করে ওঠে প্রেতশরীর। কথার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর এসে পড়ে যমদূতের খাঁড়া। প্রাণভয়ে আবার সে শুরু করে ছোটা।

প্রেতশরীর তাড়া খেতে খেতে এল গন্ধর্বনগরে। তৃতীয় মাস। ছেলের দেওয়া পিণ্ড খেয়ে এখানে একটু চাঙ্গা হল বটে, কিন্তু বিশ্রাম ?

আবার যমদূতের তাড়না—যাগ-যজ্ঞ-হোম-দান করেছিস নিজের স্বার্থ ছাড়া ? তপস্যা করেছিস ? গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল খেয়েছিস যে এখানে বিশ্রাম নিবি ?

উদ্যত ডাণ্ডসের ভয়ে আবার ছোটে প্রেতশরীর। এক মাস টানা ছুটে আসে শৈলাগম পুরীতে। সব সময়ই সেখানে হয়ে চলেছে শিলাবর্ষণ। আঘাতে আঘাতে জর্জর হয়ে ওঠে তার শরীর। চতুর্থ মাসের পিণ্ড এখানে খেয়ে তবু তাদের অতিক্রম করতে হয় এই পুরী।

এরপর প্রেতশরীর নিয়ে যমদূতরা আসে ক্রূরপুরে। দিন নেই, রাত নেই, অবিরাম ছোটা, এক টানা চার মাস। এখানে এসে সে ছেলের দেওয়া পিণ্ড আবার খায় বটে, কিন্তু অনুভব করে দারুণ কষ্ট। তার ওপর যমদূতদের পট্টিশের আঘাত। ব্যাকুল হয়ে ওঠে প্রেতশরীর তার ছেলে-মেয়ে-ভাইবোনদের জন্য। আর্তনাদ করে বলে—কোথায় তোমরা ? দেখ, কি দুরবস্থা আমাদের !

পট্টিশ মেরে যমদূতরা খিঁচিয়ে ওঠে—মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েকে ডাকছিস ? কি করবে তারা ? তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ? মুখ্যুর দল সব। নিজে যা করছিস তার ফলভোগ কি তারা করবে নাকি ? চল···চল···।

আবার ছোটে প্রেতশরীর একটানা এক মাস। এসে থামে ক্রৌঞ্চপুরে।

ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত শরীর। তার ওপর যমদূতদের নির্যাতন। শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় ছেলের দেওয়া পিণ্ড খেয়ে এখানে এসে মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য বিশ্রাম মেলে তাদের। সে বিশ্রাম কিন্তু সুখের নয় গরুড়। মাঝে মাঝেই খায় যমদূতের শূলের খোঁচা। আর আর্তনাদ করে ওঠে। বিলাপ করে এই বলে—ওঃ, এ কি কষ্ট। স্বাধীনতা নেই, শান্তি নেই। আর যে সহ্য হয় না। আমরা তো মরে গেছি। তবুও আমরা একেবারে মরে যাচ্ছি না কেন ? কেন এই প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে না ?

বিশ্রামের সময় ফুরিয়ে আসে। তাড়া দেয় যমদূত। আবার ছুটতে হয় প্রেতশরীরদের।

এবার ক্রূরপুর পেরিয়ে বিচিত্রনগর। বিচিত্রনগর পেরিয়ে আবার ছোটে প্রেতশরীর। ছুটতে ছুটতে এসে থমকে দাঁড়ায় এক নদীর ধারে। নদী দেখে শিউরে ওঠে তারা। ওঃ, কি ভয়ানক ! চারশো ক্রোশ। খালি রক্ত আর পুঁজ নদীর মত বয়ে চলেছে। একটা মাত্র পার-ঘাট। ঘাটে বাঁধা একটি মাত্র নৌকা। যাত্রী তুলে সেই নৌকার মাঝিই পার করে দেয় নদী।

পেছনে যমদূতের তাড়া। সামনে রক্তপুঁজের নদী। নাম বৈতরণী।

অনুরোধ করে প্রেতশরীর—দাও না ভাই, পার করে।

মাঝি জিজ্ঞেস করে—পার যে করে দেব, পারানি দিয়েছিলে ?

—কি পারানি ?

—গাই গরু। আমার পারানি গাই গরু। যদি দিয়ে থাক, বেঁচে থাকতে দিয়ে থাক কাউকে, তবেই আমার এই নৌকায় তোমাদের জায়গা হবে।

মুষড়ে পড়ে প্রেতশরীর। না, কাউকে তো সে গাই গরু দান করে নি।

পেছন থেকে তাড়া আসে যমদূতের। হ্যাঁচকা টান দেয় মাঝি। কোমর সমান রক্তপুঁজের বৈতরণী বাধ্য হয়ে পার হতে হয় হেঁটে, আর ঠোক্কর খেতে হয় ধারালো ঠোঁটওয়ালা কাক-পেঁচাদের।

এইভাবে বৈতরণী পেরিয়ে প্রেতশরীর কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়ায় বহ্বাপদপুরে।

আবার ছোটা। দুঃখদপুর। সেখান থেকে নানাক্রন্দপুর।

নটা মাস পেরিয়ে গেল পথে এভাবে কেবলমাত্র ছেলের দেওয়া পিণ্ডজল খেয়ে। শূল, মুষলের আঘাত সহ্য করতে করতে। বার বার মনে পড়ে তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে। মনে পড়ে তাদের ভালবাসা, আর হা-হুতাশ করে ওঠে, তখনই তাদের পিঠে এসে পড়ে যমদূতের শূলের খোঁচা।

এবার প্রেতশরীর আসে রৌদ্রপুরে। সেখান থেকে পয়োবর্ষণপুর।

পেছনে যমদূতের কুড়ালের আঘাত। ছেলের দেওয়া জলপিণ্ড।

পয়োবর্ষণপুর ছেড়ে শীতাঢ্যপুরী পেরিয়ে একটানা দৌড়ে এসে যেখানে থামে, সে পুরীর নাম হল বহুভীতিকর।

পৃথিবীতে তার ছেলে তখন করছে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। সেই বর্ষশেষের দেওয়া পিণ্ডজল এই বহুভীতিকর পুরীতে এসে খায় প্রেতশরীর।

শেষ হল তার যাত্রাপথ।

ছেলে যদি মা-বাবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই অন্নজল না দিত, তাহলে এতখানি পথ অনাহারে এভাবে আসতে কতখানি কষ্ট হত, বল তো গরুড়। বিশেষ করে, যারা পাপী, তাদের কথা একবার ভেবে দেখ তো !

এরপর যমদূতরা তাদের নিয়ে আসে যমরাজার বিশাল পুরীতে। লম্বায়-চওড়ায় এর চারটে দিকই সমান চার ক্রোশ। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেই পুরীর তেরজন দ্বারী। প্রত্যেকেরই নাম হল শ্রবণ।

প্রেতশরীরদের ঢুকতে হয় সেই যমপুরী সংযমনীতে এই দ্বারীদের সন্তুষ্ট করে।

পুরীতে ঢুকেই প্রেতশরীর দেখে, বিশালকায় কদাকার এক পুরুষ। গায়ের রং যেন তার ঘন নীল কাজল। ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূ। বিকট মুখ। মিশকালো দাঁতগুলো কি ভীষণ ধারালো ! এক হাতে দণ্ড। আর এক হাতে পাশ-অস্ত্র।

ইনিই হলেন যমরাজ।

যমদূতরা প্রেতশরীরকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এই রাজার সামনেই।

এখানেই হয় তাদের শেষ বিচার।

গরুড়, মর্মান্তিক এই প্রেতলোকের কথা।

গরুড়-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ (৩)

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের ইতিকথা

বাবা-মা মারা যাবার পর শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অনেকেই অনেক রকমের শ্রাদ্ধ করে। এই জল-পিণ্ড দান করে মা-বাবার প্রেতদেহ যাতে খিদেয় কাতর হয়ে না পড়ে, যাতে ঐ কষ্ট থেকে তারা মুক্তি পায়। কিন্তু সব শ্রাদ্ধের মধ্যে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হল সেরা।

শুনে গরুড়ের মনে খুব কৌতূহল জাগল। জিজ্ঞেস করল ভগবানকে—এটা একটু ভাল করে বলুন প্রভু, যাতে আমি বুঝতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তাহলে একটা কাহিনী বলি, শোন পক্ষীরাজ। বহুকাল আগে বিরাধনগরে বীরবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। খুব ধার্মিক, সত্যবাদী, প্রজাহিতৈষী। ব্রাহ্মণদেরও খুব শ্রদ্ধা করতেন।

একদিন শিকারে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। দেখলেন ঋষিরা সব ঘিরে বসে আছেন তাঁকে। রাজা এগিয়ে এসে প্রণাম জানিয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন মুনিবরকে, কি করলে যমরাজ আর নরক দেখতে হবে না। জীবনে ধর্ম ছাড়া অধর্ম তিনি কিছু করেন নি ঠিকই, তবুও ঐ যম আর নরক শুনলে ভয়ে তাঁর বুক শুকিয়ে যায়।

বশিষ্ঠদেব বললেন—পিতা-মাতার শ্রাদ্ধকাজ হল ধর্মকাজ। অনেকরকম ভাবেই এই ধর্মকাজ করা যায় ঠিকই, তবে বৃষোৎসর্গই হল শ্রেষ্ঠ।

—কেন মুনিবর?

—বৃষ হল স্বয়ং ধর্ম। লাল রঙের বৃষ এনে তার ডান পাঁজরায় ত্রিশূল চিহ্ন আর বাঁ পাঁজরায় চক্রচিহ্ন দিয়ে মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করে তার ইচ্ছেমত যারা ঘুরে বেড়াবার সুযোগ করে দেয়, তারাই মা-বাবাকে প্রেতজগৎ থেকে মুক্ত হবার পথ পরিষ্কার করে দেয়।

এই বলে বশিষ্ঠদেব রাজা বীরবাহনকে শুনিয়েছিলেন এক পুরা-কাহিনী।

ত্রেতাযুগে বিদেহ দেশে ধর্মবৎস নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, খুব নিষ্ঠাবান আর সদাচারী। বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত। কোন লোভ ছিল না তাঁর। যা পেতেন, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন।

একদিন এক কাজের জন্য কুশ সংগ্রহ করতে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন বনে। এখান সেখান ঘুরে ঘুরে কুশ সংগ্রহ করছেন ব্রাহ্মণ। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ সুবেশ চারজন পুরুষ কোথা থেকে এসে ব্রাহ্মণকে আকাশপথে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে গেল।

দেখে-শুনে ব্রাহ্মণ তো হতবাক। কত নদী, কত পাহাড় পেরিয়ে তারা ব্রাহ্মণকে নিয়ে এল এক নগরে। বেশ সমৃদ্ধশালী নগর। বড় বড় প্রাসাদ। ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে চারদিকে। লোকে লোকারণ্য। চারদিকে গান-বাজনা, হই-হল্লা। তারই মধ্যে ব্রাহ্মণ কতকগুলি মানুষকে দেখলেন গায়ে একপুরু ময়লা, খিদেয় পেট যেন ঢুকে গেছে, মুখ শুকনো। আবার কতকগুলো মানুষকে দেখলেন, ওরই মধ্যে ভাল, কিন্তু পরনে সব ময়লা কাপড়-চোপড়। এরপর আরো কিছু মানুষকে দেখলেন, সর্বাঙ্গে সোনা-দানা নিয়ে ঝলমল করছে। দারুণ মেজাজ। আবার কিছু মানুষকে দেখলেন, ঠিক যেন দেবতার মত।

ব্রাহ্মণ ভাবতে শুরু করলেন—ব্যাপারটা কি রকম হল। স্বপ্ন দেখছেন না তো?

এমন সময় সেই চারজন পুরুষ ব্রাহ্মণকে নিয়ে ঢুকল এক রাজপ্রাসাদে।

মাথায় সোনার মুকুট, পরনে উজ্জ্বল পোশাক, সোনার সিংহাসনে বসে আছেন রাজা। পেছন দিক থেকে একজন তাঁর মাথায় ধরে আছে সোনার ছাতা। গায়করা রাজার স্তুতি গাইছেন। এমন সময় ওরা ঢুকল।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই শশব্যস্তে সিংহাসন ছেড়ে উঠে এলেন রাজা। ব্রাহ্মণকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুজো করলেন, প্রণাম জানালেন। তারপর দূতদের ডেকে বললেন—যাও, এঁকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলে, সেখানে রেখে এসো।

দেখে-শুনে ব্রাহ্মণ তো রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার?

রাজা বললেন—আমার কোন অপরাধ নেবেন না। বিষ্ণুভক্তদের আমি খুবই শ্রদ্ধা করি। শুধু আপনার দর্শনের জন্যই আপনাকে এখানে এভাবে আনিয়েছি।

রহস্য যেন আরো জটিল হয়ে উঠল ব্রাহ্মণের কাছে।

রাজার যিনি মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। রহস্যটা এবার তিনি পরিষ্কার করে দিলেন ব্রাহ্মণের কাছে।

—এই রাজা পূর্বজন্মে ছিলেন বণিক। থাকতেন বিরাজনগরে।



নাম ছিল বিশ্বম্ভর। সেই নগরটায় বেশির ভাগই ছিল সব ব্রাহ্মণদের বাস। এই বিশ্বম্ভর ছিলেন সৎ, নিষ্ঠাবান। ব্রাহ্মণদের সেবা-পরিচর্যায় আনন্দ পেতেন। কোন অতিথি অভুক্ত হয়ে ফিরে যেত না এঁর দ্বার থেকে। যত রোজগার করেছিলেন, দান-সেবাতেই তার বেশির ভাগ ব্যয় করেছিলেন।

একসময় বিশ্বম্ভর সংসার ছেড়ে বিরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ ভ্রমণে। মনে মনে স্থির করেছিলেন, আর কতদিনই বা বাঁচবো, তীর্থভ্রমণের পুণ্যটা সঞ্চয় করে নিই।

তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরছিলেন বিশ্বম্ভর, পথে হঠাৎ দেখা লোমশ মুনির সঙ্গে। মুনিকে দেখে বিশ্বম্ভর মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম জানালেন।

মুনিবর জিজ্ঞেস করলেন—এই সব ব্রাহ্মণ বন্ধুদের নিয়ে কোথা থেকে আসছ?

বিশ্বম্ভর বললেন—মুনিবর, তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলাম।

লোমশ মুনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন কোন তীর্থ ঘুরলে? আমাদের ভারতে তীর্থস্থান তো অনেক।

বিশ্বম্ভর বললেন—আজ্ঞে, সব তীর্থ ঘুরলাম। সৌভাগ্যবলে আপনার দর্শনও পেলাম। মুনিবর, দয়া করে বলুন, মন আমার এখনও কেন এত বিষয়-সম্পত্তির দিক ঝোঁকে। এর আকর্ষণ আমি কিভাবে কাটাতে পারি?

লোমশ মুনি বললেন, বণিকের মন তো। স্বভাবটাই ঐ। তবে যদি চাও তাহলে সাধন-ভজন কর, সব সময় সাধু সঙ্গ কর, দেব-দ্বিজে ভক্তি যদি ধরে রাখতে পার, ঐ ঝোঁকটা তাহলে কেটে যাবে। মন তোমার বশে চলবে। জানি, তুমি অনেক পুণ্য কাজ করেছ, তবুও মনকে তুমি শান্ত করতে পার নি। এত তীর্থ ঘুরে এলে, তবুও তোমার মন শান্ত হল না। শোন বিশ্বম্ভর, তুমি পুষ্কর তীর্থে গিয়ে বৃষোৎসর্গ কর। সব তীর্থের ফল তুমি ঐ একটা কাজের মধ্যে পাবে।

উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন লোমশ মুনি।

বিশ্বম্ভরও ধরলেন পুষ্করের পথ। সেখানে গিয়ে সেই পরিণত বয়সে নিষ্ঠার সঙ্গে করলেন বৃষোৎসর্গ।

মারা গেলেন বিশ্বম্ভর। যমরাজের সাধ্য কি যে তাঁর কাছে যান? স্বর্গীয় বিমানে চেপে বেশ কিছুকাল স্বর্গসুখ ভোগ করে এবারে উনি বীরসেন রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। নাম বীর পঞ্চানন।

—ব্রাহ্মণ, আসবার সময় ঐ যে নানা রকমের মানুষ দেখে এলেন—বললেন মন্ত্রীবর—তাদের মধ্যে যারা প্রায় দেবতার মত দেখতে, তারা ছিল সেই বৃষোৎসর্গের সাহায্যকারী। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে যারা দেখেছিল, তারা একটু হৃষ্টপুষ্ট। আরো দূরে দাঁড়িয়ে যারা দেখেছিল, তাদের পরনে ঐ ময়লা-কাপড়। আর যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, তারা ঐ রোগা, পেট ঢোকা, ময়লা-কদাকারের দল।

হতবাক ব্রাহ্মণ কাহিনী শুনে দূতদের সাহায্যে আবার ফিরে এসেছিলেন সেই কুশবনে।

বশিষ্ঠের কাছ থেকে এই কাহিনী শুনে রাজা বীরবাহন রাজ্যে ফিরে বশিষ্ঠের উপদেশ অনুসারে চলে গেলেন বৃষোৎসর্গ করার জন্য মধুপুরীতে (মথুরায়)। নিষ্ঠাভরে কাজ করে পরম তৃপ্তি নিয়ে আবার ফিরে এলেন।

কিছুকাল পরেই মৃত্যু হল রাজার।

যমদূতরা এসে সসম্মানে নিয়ে চলল রাজাকে ধর্মরাজার কাছে। বীরবাহন জানতেন, শ্রাদ্ধদেবপুর নামে একটা জায়গা আছে যেখানে ধর্মরাজ মৃতদের বিচার করেন।

যমকিঙ্করদের সঙ্গে কালনগর ছেড়ে যেতে যেতে তাই বীরবাহন জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাগো, তোমাদের সেই শ্রাদ্ধদেবপুর আর কত দূর?

—এখান থেকে অনেক দূর। সে জায়গার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? সেখানে তো পাপীদের বিচার হয়। আপনার মত পুরুষের····

কথা শেষ হতে না হতেই বীরবাহন দেখলেন, দেবতা, গন্ধর্বদের সঙ্গে ধর্মরাজ দিব্যরূপে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম জানালেন তাঁকে।

ধর্মরাজ হাসি হাসি মুখে তাঁর দূতদের বললেন—যাও, এঁকে সাদরে দেবলোকে নিয়ে যাও।



বীরবাহন জিজ্ঞেস করলেন—প্রভু, আমি কি এমন পুণ্য কাজ করেছি যে আমাকে একেবারে স্বর্গে পাঠাচ্ছেন?

হাসিমুখে ধর্মরাজ বললেন—জীবনভর অনেক দান যজ্ঞ করেছ। সেগুলো তো নিশ্চয়ই পুণ্য কাজ। কিন্তু সবচেয়ে সেরা পুণ্য কাজ করেছ তুমি বশিষ্ঠের কথা শুনে মথুরায় বৃষোৎসর্গ করে। এর চেয়ে বড় পুণ্য কাজ আর দ্বিতীয় নেই।

রাজা বীরবাহনকে নরক কি জিনিস জানতে হয় নি মৃত্যুর পর—নরক-যন্ত্রণা তো দূরের কথা! স্বর্গে গিয়ে তিনি দেবতার মত বাস করতে লাগলেন।

গরুড়-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ (৪)

পাঁচ প্রেতের ইতিকথা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের কৌতূহল মেটাবার জন্য শুরু করলেন আর এক কাহিনী।

—একবার পাঁচ পিশাচ মিলে এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে সে কি কাণ্ড!

—কি রকম প্রভু ?

—বহুকাল আগেকার কথা। সন্তুস্তক নামে এক ব্রাহ্মণ একবার সংসার ছেড়ে চলে গেল বনে। সংসার তার আর ভাল লাগে না। ঘুরে বেড়ায় বনে বনে। খায় বনের ফলমূল।

এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এমন এক বনের ভেতর সে ঢুকে পড়েছিল, যে বনটা ছিল সাঙ্ঘাতিক। নানারকম গাছ-গাছালিতে এমন ঘেরা যে সূর্যের আলো তো ঢোকেই না, তার ওপর আবার হিংস্র জন্তু। ঢুকে পড়েছে সে। বেরিয়েও আসতে পারছে না। আবার এগোতেও ভয় হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, কপালে যা আছে, তা হবেই। তবে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে লাভ কি ?

আবার ঝোপ-ঝাড় ঠেলে এগোতে শুরু করল সন্তুস্তক।

কিছুটা এগিয়েছে। দেখল সামনে একটা গাছ। গাছের ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে একটা মৃতদেহ। আর পাঁচটা পিশাচ মনের আনন্দে হই-হল্লা করতে করতে তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

পিশাচগুলোকে দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠেছিল ব্রাহ্মণ। কি কুৎসিত দেখতে তাদের ! পাঁচটা জীবন্ত কঙ্কাল যেন। লকপক করছে হাত-পায়ের হাড়গুলো। গর্তে ঢোকা চোখ, নাক নেই-ই প্রায়। পেট যেন ঢুকে আছে পিঠের মধ্যে।

ওদিকে পিশাচগুলোও জ্যান্ত ব্রাহ্মণকে দেখে মৃতদেহ ফেলে আনন্দে হাউ-মাউ করতে করতে কঙ্কাল-হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসতে লাগল তার দিকে। প্রায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য।

এসেই সাপটে ধরল একজন, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন। এমনি করে পাঁচজনে ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। আর লাগল নিজেদের মধ্যেই ঝামেলা—ছাড়-ছাড়। আমি আগে ধরেছি। আগে খাব। প্রত্যেকের মুখেই সেই এক কথা।

একে তো পিশাচের কবলে। তার ওপর এই টানাপোড়েন। ব্রাহ্মণ নিশ্চিত যে, এ থেকে আর পরিত্রাণ নেই। সে তখন প্রাণপণে ডাকতে লাগল আমাকে—হে কৃষ্ণ ! হে কেশব ! হে মধুসূদ তুমি ছাড়া এই বিপদে আর রক্ষার কে আছে প্রভু !

দেখ গরুড়, ব্রাহ্মণের সেই আকুল ডাক শুনে আমি আর থাব পারলাম না।

ইতিমধ্যে পিশাচগুলো জড়াজড়ি করে ব্রাহ্মণকে নিয়ে উ শূন্যপথে। অন্য কোন নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে খাবে আর ি

সবেমাত্র উঠেছে, হঠাৎ সেই শবটা, যেটা ওরা আগে খাচ্ছি কিভাবে ফাঁস খুলে ডাল থেকে পড়ে গেল মাটিতে। পিশাচরা সঙ্গে সঙ্গে আবার নেমে এসে নিজেদের পায়ে-পায়ে খিলেন তাতে চাপিয়ে নিল তাকে। এতই লোভ যে কোনটারই মায়া ছাড় পারছে না।

ব্রাহ্মণের আহ্বান। আমিও অনুসরণ করে চলেছি লুকি লুকিয়ে। হঠাৎ দেখি শূন্য পথে যক্ষরাজ মণিভদ্র আসছে

তাকে দেখেই চোখের ইশারায় মণিভদ্রকে ডে বললাম—মণিভদ্র, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন প্রভু।

বললাম—ঐ যে দেখছ কতকগুলো পিশাচ একজন ব্রাহ্ম আর একটা শবদেহকে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ ?

—হ্যাঁ প্রভু।

—ঐ শবদেহটাকে তোমায় ওদের কাছ থেকে কেড়ে আন হবে। দেখো, যেন ব্রাহ্মণের কোন ক্ষতি না হয়।

শোনামাত্রই যক্ষ মণিভদ্র ধরল দারুণ এক পিশাচের রূ তারপর তাদের কাছে গিয়ে দু-হাত দিয়ে দু-জনকে, দু-পা দি দুজনকে আর মাথা দিয়ে অপরজনকে এমন জোরে মারল ছিটকে পড়ল শব, ছিটকে পড়ে আর কি ব্রাহ্মণ। নীচেই পাহাড়। পিশাচগুলো তাড়াতাড়ি নেমে ব্রাহ্মণকে ছেড়ে এক জো আক্রমণ করল মণিভদ্রকে। কিন্তু পারবে কেন ? মণিভদ্র তা মেরে-ধরে শবটাকে তুলে নিয়ে দিল চম্পট। এত লোভ ছিল শবটার ওপর পিশাচদের যে, তারাও উঠে পিছু নিল মণিভদ্রে



ইতিমধ্যে মণিভদ্র যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, ওরা খুঁজেও পেল না।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ব্রাহ্মণ। তার প্রাণ তখনও ডেকে চলেছে আমাকে।

শবটাকে না পেয়ে পিশাচরা অগত্যা ফিরে এল ব্রাহ্মণের কাছে। কি আর করা যায়। এখন ওকেই ভাগ করে খাবে।

কাছে এসেই সবাই মিলে যেই মুহূর্তে ওরা ব্রাহ্মণকে ধরল, অমনি চমকে উঠে ছেড়ে দিয়ে প্রণাম শুরু করে দিল।

দেখে তো ব্রাহ্মণ হকচকিয়ে গেল। এ আবার কি হল ?

জিজ্ঞেস করে ব্রাহ্মণ—কি হল ? তোমরা তো আমায় খাবে বলে নিয়ে এলে। এখন আবার এসব কি ?

পিশাচরা বলে উঠল—ক্ষমা করুন ব্রাহ্মণ। আমাদের আপনি ক্ষমা করুন। আমাদের আর এক জঘন্য কাজ থেকে আপনি বাঁচালেন।

ব্রাহ্মণ তো আরো হকচকিয়ে গেল।

—এ সব কি বলছ তোমরা ?

—ব্রাহ্মণ, আপনি আমাদের এই মুহূর্তে পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

—কারা তোমরা ? তোমাদের পরিচয় কি ?

ওদের মধ্যে থেকে একজন এবার মুখ খুলল।

বলল—ব্রাহ্মণ, আমার নাম পর্যুষিত। এর নাম সূচীমুখ। তার পরের যে জন, ওর নাম শীঘ্রক। তার পরের জন রোধক। আর শেষ জনের নাম হল লেখক। পিশাচদেহে এই আমাদের পরিচয়, ব্রাহ্মণ।

জিজ্ঞেস করল ব্রাহ্মণ—তোমাদের এ রকম হওয়ার কারণ ?

জানো গরুড়—বললেন শ্রীকৃষ্ণ—ব্রাহ্মণ যখন জানতে চাইল, তখন একে একে তারা বলতে শুরু করল তাদের পাপের কথা, যার ফলে তারা পিশাচ হয়েছিল।

প্রথমে বলল পর্যুষিত।

—জানেন ব্রাহ্মণ, বাড়িতে একদিন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করছিলাম। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। তাই কয়েকজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। তাঁদের খাওয়া শেষ না হলে তো আমাদের খেতে নেই। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি আসতে এত দেরি করতে লাগলেন যে আর কি বলব। অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। দুরন্ত খিদে পেয়েছিল। এত খেয়ে নিলাম যে আর কিছু ছিল না বললেই চলে। সবেমাত্র খেয়ে উঠেছি, এমন সময় বৃদ্ধ এসে হাজির। কি আর করি। চেটে-পুটে যা ছিল, তার সঙ্গে আমার পাতেও যা পড়ে ছিল সব মিলিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খেতে দিলাম। সেই পাপে আজ আমি পিশাচ। আর উচ্ছিষ্ট খাইয়েছিলাম বলে আমার নাম পর্যুষিত।

দ্বিতীয় পিশাচ সূচীমুখ বলল, তারপর ?

—ব্রাহ্মণ, আমার ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হলেও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আমি পালন করি নি। শুধু অত্যাচারই করেছি। ভদ্রতটতীর্থে একবার এক ব্রাহ্মণী তার পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে তীর্থ করতে গিয়েছিল। আমি সেই ব্রাহ্মণীকে মেরে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলাম। সেই ছোট্ট ছেলেটা তেষ্টায় কাতর হয়ে যখন জল খেতে গেল, তার হাত থেকে পাত্র কেড়ে নিয়ে আমিই তা খেয়ে নিলাম। চোখের সামনে ছেলেটা ছটফট করতে করতে মারা গেল। ব্রাহ্মণী শোকে-দুঃখে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরল। আমার কিন্তু তখন কিছুমাত্র অনুতাপ আসে নি। মানুষের মুখের গ্রাস আমি তাদের মুখকে মেরে সুচ করে দিয়ে নিজে খেয়েছি। আজ সেই পাপে আমি পিশাচ। দেখতেই পাচ্ছেন, দেহটা আমার বিশাল, কিন্তু মুখটা আমার সুচের মত সরু। কিছুই খেতে পারি না এখন। ব্রাহ্মণ, আপনাকে দেখে, আপনাকে বলে আজ আমি কষ্ট থেকে মুক্তি পেলাম।

তৃতীয় পিশাচ শীঘ্রক বলল।

—হায় ব্রাহ্মণ, আমার মত নরাধম, বিশ্বাসঘাতক আর দ্বিতীয় কেউ নেই। জানেন, কি জঘন্য কাজ আমি করেছিলাম। আমি ছিলাম বণিক। আমার এক দাদা ছিল। দু-ভাইয়ে মিলে গেলাম বাণিজ্য করতে। সেবারে খুব ভাল ব্যবসা হল। মনে খুব আনন্দ। প্রচুর সোনা-দানা নিয়ে নদীপথে ফিরছি এবার দেশে। কিছু দূর এসেই আমার মাথায় চাপল এক দুর্বুদ্ধি। দেশে ফিরলে একসঙ্গে তো ভাগাভাগি করে ভোগ করতে হবে। তার চেয়ে যদি দাদাকে সরিয়ে দিই, ক্ষতি কি ? করলামও তাই। দাদাকে সরিয়ে দিলাম। নদীর মাঝে একটা চড়ায় তাকে নামিয়ে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম বাড়িতে। এসেই বউদিকে বললাম—সর্বনাশ হয়েছে বউদি। পথে দস্যুরা আক্রমণ করেছিল। তাদের রুখতে গিয়ে দাদা মারা গেছে। আহা ! শোনার পর বউদির সে কি অবস্থা ! নিজের হাতে চিতা সাজালো বউদি, আগুন দিল। তারপর সেই আগুনে নিজে পুড়ে মরল। আর আমি নির্লজ্জের মত সেই ধন-সম্পদ সারা জীবন ভোগ করলাম। মৃত্যুর পর সেই পাপে আজ আমি পিশাচ।

চতুর্থ পিশাচ রোধক বলল।

—ব্রাহ্মণ, আমার কুকাজের কথা মুখে আনা যায় না। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে সব কিছু ভেসে উঠছে। জানেন ব্রাহ্মণ, আমি কি নরাধম ছিলাম ! বাবা-মা আর এক ভাই নিয়ে ছিল আমাদের সংসার। চাষ-বাস করে খেতাম, বেশ ভালভাবেই দিন চলে যেত। একদিন কি যে হল—ভাইকে বাবা-মার সামনেই দিলাম আলাদা করে। তার কোন সহায় সম্বল ছিল না। আমরা খেতাম পেট পুরে, আর সে থাকত শুকিয়ে। মনে মনে বলতাম—মরুক না খেয়ে, তাতে আমার কি ? ওসব ভার বোঝা আমি বইতে পারব না। ছেলে না খেয়ে থাকবে, তা কি বাবা-মা চুপ করে দেখতে পারে ? লুকিয়ে লুকিয়ে মা-বাবা তাই তাকে সাহায্য করত। একদিন জানতে পেরে খুব রেগে গেলাম আমি। অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় মা-বাবাকে গালি দিলাম। তাতেও শান্তি পেলাম না। যাতে আর তারা কোন রকম সাহায্য করতে না পারে, হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তাদের ফেলে রাখলাম একটা ঘরে। সেই দুঃখে মা-বাবা আমার বিষ খেয়ে মরল। আর ভাইটা ? ব্রাহ্মণ, সে আর কি বলব ! খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে অল্প দিনের মধ্যেই আমার ভাইটা মারা গেল। সেই পাপে আজ আমার এই অবস্থা। অযথা বাবা-মাকে ঘরে আটকে রেখেছিলাম বলে আমার পিশাচ নাম রোধক।

এবার পঞ্চম পিশাচ লেখক বলল।

—জানেন ব্রাহ্মণ, আমারও ব্রাহ্মণ বংশেই জন্ম হয়েছিল। আমি ছিলাম অবন্তী দেশের রাজপুরোহিত। রাজার দেবমন্দিরে ছিল

অনেক অনেক প্রতিমা। সোনার অলঙ্কার, নানারকম মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো ছিল সেই বিগ্রহগুলো। কি যে মতিচ্ছন্ন হলো আমার, হঠাৎ দারুণ লোভে পেয়ে বসল আমাকে। আমি লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মণি-মুক্তো-সোনা চুরি করতে শুরু করে দিলাম। খবর গেল রাজার কানে যে, বিগ্রহ থেকে সব চুরি হচ্ছে। রাজা প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, চোরকে অবশ্যই তিনি ধরবেন, আর সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, তবু তাকে বধ করবেন। শুনে আমিও শয়তানি করলাম। রাতে নিজের ঘরে রাজা একদিন ঘুমোচ্ছেন নিশ্চিন্তে। রাজবাড়িতে আমার তো ছিল অবারিত দ্বার। আমি সেই সুযোগে করলাম কি, ঘরে ঢুকে রাজাকে খুন করলাম। তারপর লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিগ্রহের গায়ে আঁচড়ের দাগ ফেলে যতখানি পারলাম সোনা-দানা মণি-মুক্তো নিয়ে রাজবাড়ি থেকে সকলের অলক্ষ্যে চম্পট দিলাম। কিন্তু নিয়তি যাবে কোথায়? পথে আমার প্রাণ গেল এক বাঘের থাবায়। তারপর নরক যন্ত্রণা ভোগ করে আজ আমি পিশাচ। লোহা দিয়ে বিগ্রহের গায়ে আঁচড় কেটেছিলাম, তাই আমার নাম হয়েছে লেখক।

চুপ করে ব্রাহ্মণ সব শুনে জিজ্ঞেস করল—বুঝলাম তোমাদের অবস্থা। তা এখন তোমরা কোথায় থাক? আর কি খেয়ে থাক?

—ব্রাহ্মণ, আমাদের থাকার জায়গা হল সেখানে যেখানে লজ্জা, ধর্ম, দয়া, ক্ষমা, ভীতি, জ্ঞান, সদাচার নেই। আমরা থাকি সেই সব জায়গায় আর তাদের উত্তেজিত করি। আর খাবার? ব্রাহ্মণ, আপনি তো নিজে চোখেই দেখলেন। ঐসব অনাচারীদের রক্ত আর মাংসে আমাদের খাদ্য। আর পানীয় হল শ্লেষ্মা, কফ, বমি, গু, মুত, চোখের ময়লা। দোহাই আপনার, আর জানতে চাইবেন না, ব্রাহ্মণ।

এরপর একটু থেমে ওরা অবাক হয়ে বলাবলি শুরু করল—আপনি নিশ্চয়ই একজন সিদ্ধ যোগী। নইলে, আমাদের এমনভাবে পূর্বস্মৃতি এল কেন? কেন এত অনুতাপ জাগল মনে?

জানো গরুড়—বললেন শ্রীকৃষ্ণ—এতক্ষণ আমি ছিলাম আড়ালে। এবার গিয়ে দাঁড়ালাম ওদের সামনে। আমাকে দেখে ওরা সবাই লুটিয়ে পড়ল। কেঁদে আকুল হল। আমিও ছটা বিমান আনিয়ে ঐ পাঁচজন পিশাচ আর ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দিলাম বৈকুণ্ঠে। সেই ব্রাহ্মণই হল আমাদের বিষ্বকসেন!

শুনে গরুড় বলল—জানি প্রভু, আপনার কৃপা ছাড়া কি অসাধ্য সাধন হতে পারে?

গরুড়-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ (৫)

বভ্রূবাহন ও প্রেতবাহনের কাহিনী

গরুড় একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলে বসল শ্রীকৃষ্ণকে—আচ্ছা ভগবান, শাস্ত্রে বলেছে আর আপনিও বলেছেন, ছেলের দেওয়া অন্ন-জল প্রেতলোকে বাবা খেয়ে তৃপ্তি পান আর নরক থেকে মুক্তিও পান। কিন্তু সংসারে এমন মানুষও আছে, যারা বিয়ে-থা করে নি, বা বিয়ে-থা করেও ছেলেপুলে হয় নি। তাদের গতি কি হবে? আর একটা কথা প্রভু। ছেলে শ্রাদ্ধে পিতার উদ্দেশে যে পিণ্ড দেয়, সেই অন্নজল যে তারা সত্যিই গ্রহণ করেন, তার প্রমাণ কি? মৃত্যুর পর তো আর তাঁদের দেখা যায় না। কেমন করে জানব যে ছেলের দেওয়া অন্নজল সত্যিই তিনি তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—খুব. ভাল প্রশ্ন করেছ পক্ষীরাজ। শোন, তাহলে বলি। ছেলেপুলে হয় নি, অথচ ধন-সম্পত্তি রেখে মারা গেছে, যদি এমন হয়, তাহলে সেই ধন-সম্পত্তি যে নেবে, সে-ই করবে তার শ্রাদ্ধ কাজ। আর যদি নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার কাজ করবেন দেশের রাজা। কারণ রাজাই তো সবার প্রতিপালক।

এক সময় এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল।

সেটা হল সত্যযুগ। পৃথিবীর রাজা তখন বভ্রূবাহন। যেমন তেজস্বী, তেমনি ধার্মিক। তাঁর রাজত্বে প্রজারা যেখানে-সেখানে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারত। ধন-সম্পদ নিয়ে কোন চিন্তা করতে হত না। রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রেখে শোবার কথা কেউ ভাবতেও পারত না।

রাজা ছিলেন মস্ত বড় শিকারী। প্রায়ই শিকারে যেতেন। সঙ্গে সেনাদল, নানা রকমের বাজনা-বাদ্যি। প্রজারা দু-হাত তুলে তাঁর মঙ্গল কামনা করত।

একদিন রাজা বভ্রূবাহন এভাবে বেরিয়েছেন শিকারে। মনের আনন্দে শিকারও করেছেন অনেক। কিন্তু তীর খেয়েও একটা হরিণ পড়ে না গিয়ে পালাতে লাগল। দেখে রাজাও ঘোড়া ছুটিয়ে তার পিছু নিলেন।

কিন্তু হরিণটা কোথায় গিয়ে যে লুকালো, আর দেখতেই পেলেন না রাজা। বনের পর বন, তারপরে বন। নিজের সেনাদল থেকে কতদূরে যে চলে এসেছেন, তাও ঠিক করতে পারলেন না তিনি। এদিকে তেষ্টায় প্রাণ যায় যায়।

বাধ্য হয়েই হরিণ-খোঁজা ছেড়ে রাজা এবার খুঁজতে শুরু করলেন কাছাকাছি কোথাও জলাশয় আছে কিনা। খানিকটা যেতেই দেখলেন, আকাশ থেকে ডানা মেলে নেমে আসছে পাখিরা, একটু ঠাণ্ডা বাতাসও যেন বইছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে খানিকটা যেতেই দেখলেন এক সরোবর। টলটল করছে নীল জল। এখানে-ওখানে ফুটে আছে পদ্ম। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস যেন প্রাণ ভরিয়ে দিল রাজার।

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা গেলেন সরোবরে। পোশাক খুলে বেশ করে স্নান সারলেন। আবার এঁটে নিলেন পোশাক। আকণ্ঠ খেলেন জল। প্রাণ ঠাণ্ডা হল। সেই সঙ্গে এল ক্লান্তি। সরোবরের ধারে একটা গাছের নীচে বসলেন। অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে এক সঙ্গে একটা বালিশের মত করে শুয়ে পড়লেন নিশ্চিন্তে।

সবেমাত্র ঘুম ঘুম আসছে রাজার। আর একটু পরেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়বেন। এমন সময় হঠাৎ অনুভব করলেন, আশপাশের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠল। এতক্ষণ ধরে ফুলের যে সুগন্ধ ছড়িয়েছিল জায়গাটা জুড়ে, তা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। পরিবর্তে যেন কি একটা বিটকেল গন্ধ প্রাণ যায় যায় অবস্থা করে



তুলল।

কেন এমন হল ? চোখ বুজে ছিলেন রাজা। চোখ খুলতেই দেখলেন, তারই দিকে এগিয়ে আসছে এক মোড়ল গোছের প্রেত। পেছনে শয়ে শয়ে প্রেতের দল।

দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন রাজা। হাতে ধনুক তুলে নিয়েই ছুঁড়লেন তীর।

দেখে থমকে দাঁড়াল মোড়ল প্রেত। বলল—রাজা, আমরা তোমার কাছেই যাচ্ছি একটা আবেদন নিয়ে। দয়া করে তোমার ঐ তীরধনুক নামাও।

নির্ভীক রাজা বভ্রুবাহন। নামিয়ে নিলেন অস্ত্র। বললেন—ঠিক আছে, এসো। তবে কাছে এসে কিন্তু কিছু উলটোপালটা করার চেষ্টা কোরো না।

—না রাজা, আমরা কথা দিচ্ছি। বলে অনুচরদের রেখে কাছাকাছি এগিয়ে এল মোড়ল প্রেত।

তারপর রাজাকে বলল—রাজা, আমার নাম প্রেতবাহন। এটা অবশ্য আমার এই প্রেতশরীরের নাম। গত জন্মে আমি বৈদিশ নগরের বণিক ছিলাম। নাম ছিল সুদেব। বাণিজ্য করতাম। ধনসামগ্রীও উপার্জন করেছিলাম অনেক। যা উপার্জন করেছিলাম, তা অসৎ পথে খরচ না করে, দান যজ্ঞতেই খরচ করেছিলাম। কোন দিন কোন পাপ কাজ করেছি বলে জানি না। তবুও আজ আমার এই অবস্থা।

—কেন ? জিজ্ঞেস করেন রাজা।

—আমার কোন ছেলেপুলে এমন কি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবও নেই যে আমার শ্রাদ্ধ করে। অন্নজল দেয়। পিণ্ড-জল না পেয়ে এই প্রেতশরীরে এক পেট খিদে আর এক গলা তেষ্টা নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—আর তোমার পেছনে ঐ যে হাড়-জিরজিরের দল ?

—ওদেরও সকলের প্রায় আমার মতই অবস্থা, রাজা। ওদেরও সংসারে এমন কেউ ছিল না যে শ্রাদ্ধ করে, পিণ্ডজল দেয়। তাই প্রেত হয়ে ওরা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখলে মানুষ ভয়ে পালায়। কাকে বলব, আমাদের এই দুঃখের কথা। আপনি দেশের রাজা। বীর। সত্যনিষ্ঠ। তাই আপনার কাছে আমরা এসেছি রাজা।

শুনে বভ্রুবাহন বললেন—তা আমায় তোমাদের জন্য কি করতে হবে ?

—আমাদের এই প্রেতযোনি থেকে আপনি মুক্ত করুন, রাজা। আমাদের উদ্দেশ্যে আপনি পিণ্ড দিন, শ্রাদ্ধ করুন—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

—তাতে কি তোমরা মুক্তি পাবে ?

—রাজা, আপনি বিচক্ষণ। বলল প্রেতবাহন—আপনাকে আর বলার কি আছে। যাদের সংসারে কেউ নেই, তাদের বন্ধু, আত্মীয়, যা কিছুই বলুন, সবই হলেন রাজা নিজে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে কাজ করলে সদগতিই হবে।

এই বলে প্রেতবাহন অমূল্য একটি মণি তুলে দিল রাজার হাতে।

—এটা কি হবে ? জিজ্ঞেস করেন বভ্রুবাহন।

—অপরাধ নেবেন না, রাজা। জানি, আপনার কোষাগারে যা আছে, তার কাছে এই মণির কোন মূল্যই নেই। তবু এটি আপনাকে নিতে হবে। আমাদের এটিই একমাত্র সম্বল ছিল। এটি বিক্রি করে এর অর্থে আপনি আমাদের কাজ করবেন, রাজা। তবেই আমাদের মুক্তি হবে।

আর কিছু না বলে বভ্রুবাহন সেটি গ্রহণ করলেন।

এমন সময় পেছন দিক থেকে বনজঙ্গল কাঁপিয়ে রাজার সেনারা রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বিশাল প্রেত-মিছিল নিয়ে প্রেতবাহন।

রাজাও ফিরে এলেন রাজ্যে। তারপর প্রেতবাহন সেই পাপী-তাপী-প্রেতদের উদ্দেশ্যে করেছিলেন বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

প্রেতযোনি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন প্রেতরা। রাজাও এই কাজ করে আরও পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন।

কাহিনীটি শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সংসারে যাদের জন্য কেউ থাকে না, পরলোকে তাদের মঙ্গলের জন্য পিণ্ড-জল দেবেন রাজা কিংবা যে তার ধন-সম্পত্তি ভোগ করবে, সে। এটাই নিয়ম। আর পাপী ! রাজাই তো প্রজার পাপ-তাপের কারণ। তাই প্রজা যত পাপই করুক, তাদের পাপের ফল থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র রাজা। তুমি আর একটা কি যেন জিজ্ঞেস করলে গরুড় ? মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশ্যে যে অন্ন-জল দেওয়া হয়, তা সত্যি সত্যিই পৃথিবীতে এসে সে খায় কিনা ? তাহলে শোন ঃ

—রামচন্দ্র বনবাসে গেছেন পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে। রাজা দশরথ ছেলের শোকে কাতর হয়ে অযোধ্যায় মারা গেলেন। খবর

এল রামচন্দ্রের কাছে। যথারীতি অশৌচ পালন করে বনবাসী রাম পিতার পারলৌকিক কাজ করার জন্য এলেন পুষ্কর তীর্থে। বনবাসী হলেও যথাসাধ্য মনপ্রাণ দিয়ে আয়োজন করেছেন রামচন্দ্র। নিমন্ত্রণ করেছেন মুনি-ঋষিদের।

নিমন্ত্রণ রাখতে দলে দলে আসতে লাগলেন মুনি-ঋষিরা। দেখে, সীতাদেবী সকলকে আহ্বান জানিয়ে তাড়াতাড়ি অন্ন পরিবেশন করে তাঁদের তৃপ্তি দেবার জন্য রামচন্দ্রের নির্দেশে তৈরি হতে লাগলেন। রামচন্দ্র সকলকে আপ্যায়ন করে বসালেন। কিন্তু সীতাদেবী আর অন্ন নিয়ে আসেন না। কি হল? কয়েকবার ডাকলেন রামচন্দ্র 'সীতা' 'সীতা' করে। কিন্তু সাড়া পেলেন না। আরে, গেল কোথায়? মুনিদের বসিয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখলেন সীতাদেবী একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন।

—কি হল সীতা? তুমি এখানে এভাবে লুকিয়ে কেন? দেখ তো, ওখানে সব নিমন্ত্রিতরা বসে রয়েছেন।

সীতাদেবী বললেন—প্রভু, সামান্য এই বল্কল পরে আমি ওখানে গিয়ে পরিবেশন করব কি করে? তাছাড়া সামান্য এই অন্ন ওঁদের পাতে আমি দেবই-বা কেমন করে?

—হঠাৎ তোমার মুখে এরকম কথা কেন সীতা? আমরা বনবাসী? গাছের ছাল-বল্কল ছাড়া আমাদের পরার কি আছে? এত জায়গা আমরা তো এই পরেই ঘুরলাম। আজ তোমার এমন লজ্জা হল কেন? মুনিরা সবাই জানেন, এখন আমাদের সম্বল কতখানি। সাধ্যমত যতটা পেরেছি, কার্পণ্য না করে তার আয়োজন করেছি। মুনি-ঋষিরা তাতেই সন্তুষ্ট হবেন। এতে তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। চল, দেরি কোরো না।

তখনো সঙ্কোচ সীতাদেবীর। গলায় কান্না এসে গেল তাঁর। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন—প্রভু, আপনি কি দেখেন নি, ঐ সব মুনি-ঋষিদের মধ্যে তিনজন এসে বসেছেন শেষের দিকে। পরনে রাজকীয় পোশাক, গায়ে অলঙ্কার। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি, প্রভু। আপনার পিতা রাজা দশরথ আর দুজন বোধ হয় আপনার ঠাকুর্দা আর তাঁর বাবা হবেন, আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু আমার শ্বশুরকে চিনতে তো ভুল হবে না প্রভু। যিনি আমাকে ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল অলঙ্কারে সাজিয়ে রাখতেন, তাঁর সামনে



এখন এই সামান্য বল্কল পরে যাই কেমন করে? সোনার থালায় যাঁকে একদিন অন্ন দিয়েছি, রুপোর গেলাসে দিয়েছি জল, উত্তম উত্তম খাদ্য যাঁকে একদিন পরিবেশন করেছি, তাঁকে এখন এই ঘাসের পাতায়, সামান্য এই অন্ন কেমন করে দেব প্রভু?

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সীতা।

রামচন্দ্র তাঁকে আর কিছু না বলে নিজেই ভাইকে নিয়ে মুনি-ঋষিদের খাইয়ে তৃপ্ত করলেন।

কাহিনীটি বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—গরুড়, এই ঘটনা মিথ্যে নয়, সত্যি। মৃত্যুর পর ছেলের হাত থেকে অন্ন-জল পাবার জন্য বাবারা সব সময় উদগ্রীব হয়ে থাকেন। মনপ্রাণ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রাদ্ধ করলে তাঁরা শরীর ধরে পৃথিবীতে আসেন, গরুড়। নিমন্ত্রিতদের সারিতে বসে সকলের মাঝে তৃপ্তির সঙ্গে তাঁরাও অন্ন গ্রহণ করেন।



মার্কণ্ডেয় পুরাণ

মহর্ষি বেদব্যাস সুবিশাল মহাভারত রচনা করেছিলেন। মহাভারত হল আমাদের ইতিহাস। এটি রচনার কালে তিনি কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখেন নি। মহাভারত পড়লে অনেক কিছু জানা যায় ঠিকই, আবার মনে অনেক প্রশ্নও জাগে। ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনির মনেও সেই সব প্রশ্ন জেগেছিল। তাই তিনি গিয়েছিলেন মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে উত্তর জানতে। এবং জৈমিনি যথাস্থানে গিয়ে তার উত্তরও পেয়েছিলেন। মুনিবর এই পুরাণেই মাতৃশক্তি যে কি অপরিসীম, তা বলেছেন দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীতে। এই পুরাণ একদিকে যেমন মহাভারতের সহায়িকা, তেমনি কি ভাবে মনকে শান্ত রাখা যেতে পারে তা এই পুরাণে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। আমাদের জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজোর সময় যে চণ্ডীপাঠ হয়, তা প্রথম এই মার্কণ্ডেয় পুরাণেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।



আশ্চর্য পাখিদের সঙ্গে ঋষি জৈমিনি

মহর্ষি বেদব্যাস লিখে গেছেন মহাভারত। এমন অপূর্ব গ্রন্থ আর দ্বিতীয়টি নেই। যে কোন সমস্যাতেই কেউ পড়ুক না কেন, মহাভারত যদি মন দিয়ে পড়ে, তাহলে তার সামনে আর কোন সমস্যাই থাকবে না—দেখবে সব কেমন সহজ, সরল। পৃথিবীতে যত রকমের জ্ঞান আছে, আর যত কঠিনই হোক না সে জ্ঞান, গল্পের ছকে এমন সুন্দর করে তিনি লিখে গেছেন গুছিয়ে-গুছিয়ে, যেন মনে হবে, মাটি খুঁড়ে থাকে থাকে সাজিয়ে রেখেছেন জ্ঞানের হীরে-পান্না-মণি-মুক্তো।

এহেন মহাভারত পড়তে পড়তে মহামুনি জৈমিনির মনে জাগতে আরম্ভ করল কিছু কিছু প্রশ্ন। যেমন, ভগবান বিষ্ণু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা, যিনি মাথা একটু দোলালেই সব লয় পেয়ে যাতে পারে, তাঁকে আবার মানুষের মূর্তি ধরে পৃথিবীতে এসে এত লড়াই করতে হল কেন? শাস্ত্রে আছে, এক পুরুষ এক স্ত্রীকে বিয়ে করবে। এক স্ত্রী তো আর অনেকগুলো পুরুষকে বিয়ে করে সমাজে থাকতে পারে না। তাহলে, সেই মহিলা স্ত্রীর মর্যাদাই পাবে না। অথচ, দ্রৌপদী কিভাবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, পাণ্ডুরাজার এই পাঁচ ছেলে অর্থাৎ পাঁচ ভাইকেই স্বামী হিসেবে বরণ করলেন, সম্মানও পেলেন।

এই সব নানা প্রশ্নে বিব্রত হয়ে জৈমিনি একদিন গেলেন মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে। সে সময় মার্কণ্ডেয় মুনির মত জ্ঞানী আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। নিজের আশ্রমে বসে বসে তখন বেদ পড়ছিলেন তিনি।

জৈমিনি আসতেই তাঁকে সাদরে বসিয়ে শুনলেন তাঁর প্রশ্নগুলো। তারপর বললেন—দেখ বাপু, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। আমার বাপু, এখন অত সময় নেই। সন্ধে হয়ে আসছে, জপ-আহ্নিকে বসতে হবে। তুমি বরং বিন্ধ্য পর্বতে যাও। সেখানে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দ্রোণের পিঙ্গাক্ষ, বিরোধ, সুপুত্র আর সুমুখ নামে চার ছেলে আছে। যদিও তারা পাখি, তবুও তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। দারুণ পণ্ডিত তারা। তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার।

—পাখি! মানুষের মত কথা বলবে। এই সব কঠিন কঠিন প্রশ্নের জবাব দেবে? শুনে তো জৈমিনির চোখ কপালে ওঠে আর কি। দ্রোণ তো মানুষ। তাঁর ছেলেরা আবার পাখি হল কেমন করে? আর এত জ্ঞানই বা সঞ্চয় করল কোথা থেকে?

একটু মুচকি হেসে মার্কণ্ডেয় বললেন—পৃথিবীটাকে যদি তুমি তোমার মত করে দেখ, তাহলে তো জৈমিনি, পদে পদে অবাক হবেই। যেমন মহাভারত পড়তে পড়তে অবাক হয়েছ।

—সত্যিই ঋষিবর, দ্রোণের ছেলেরা হল পাখি, তারা আবার হল মহাজ্ঞানী! এ যেন আমার বড় রহস্য-রহস্য লাগছে। বললেন জৈমিনি।

—তাহলে জৈমিনি, আমাকে সেই কাহিনীটা বলতে হয়। যেটা শুনলে তোমার আর ঘোর থাকবে না।

আমার সেই ঘোরটাই আগে কাটান ঋষিবর। অনুরোধ জানান জৈমিনি।

—শোন তাহলে, বলি। এই বলে ঋষি মার্কণ্ডেয় শুরু করলেন সেই পুরোনো কাহিনী।

একবার দেবসভায় খোশমেজাজে দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে বসে অপ্সরাদের নাচ দেখছেন। জোর মজলিশ। এমন সময় হঠাৎ এসে হাজির নারদ মুনি।

দেবর্ষি নারদ বলে কথা। শশব্যস্তে দেবরাজ সিংহাসন থেকে উঠে আপ্যায়ন করে আর একটা সিংহাসনে বসিয়ে বললেন—মজলিশে যখন এসেই পড়েছেন দেবর্ষি, বলুন, কার নাচ আপনি দেখবেন। রম্ভা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, উর্বশী, মেনকা—সবাই···সবাই আছে। আপনি যাকে আদেশ করবেন, সে-ই আপনার সামনে নাচবে।

নারদের কি আর ঐ অপ্সরাদের নাচ-টাচ ভাল লাগে। অথচ এই মজলিশে এসেও পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। সরাসরি 'না' বলা মানে দেবরাজের অপমান। সেটাও ঠিক হবে না। চট করে মাথায় তাঁর এক ফন্দী এসে গেল। বললেন—দেখ বাপু, পা নাচালেই তো আর নাচ হয় না। তার অনেক কলা-কৌশল আছে। তোমাদের মধ্যে সব কলা-কৌশল যার জানা আছে, সে আমার সামনে এসে নাচতে পার।

দেবর্ষিকে নাচ দেখিয়ে খুশি করা—এ তো আর কম ভাগ্যের কথা নয়। সব অপ্সরাই ছিল উদগ্রীব হয়ে। কিন্তু নারদ দাবায় এমন এক চাল চেলে ঘোঁট পাকিয়ে দিলেন যে তা বলবার নয়। অপ্সরাদের মধ্যেই লেগে গেল দারুণ ঝগড়া—এ বলে, আমি ভাল জানি; ও বলে—আমি। শেষে চুলোচুলি হয় আর কি।

দেখে-শুনে দেবরাজ তো অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবর্ষির সামনে তাঁর অপ্সরারা এ কি অসভ্য কাণ্ড আরম্ভ করল। ধমকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—নিজেদের মধ্যে এ কি খেয়োখেয়ি শুরু করে দিলে? তোমরা দেবর্ষিকেই জিজ্ঞেস করছ না কেন?

দেবরাজের ধমক খেয়ে থামল অপ্সরারা। তারপর খুব লজ্জা পেয়ে গেল। সত্যিই তো, দেবর্ষির অজানা কিছুই নেই। তখন তারা গিয়ে ধরল নারদকে। বলল—আপনিই বলে দিন, কে ভাল নাচিয়ে।

দেবর্ষি বললেন—শোন, ঐ যে পাহাড় দেখছ, ঐ পাহাড়ে দুর্বাসা তপস্যা করছেন। তোমাদের মধ্যে যে সেখানে গিয়ে তাঁর ধ্যান ভাঙাতে পারবে, আমার কাছে সেই-ই হবে ভাল নাচিয়ে।

দুর্বাসার নাম শুনেই অপ্সরাদের নাচ গেল মাথায় উঠে। সর্বনাশ! একবার রেগে গেলে আর রক্ষে নেই। যখন সবাই আস্তে আস্তে কেটে পড়ছে, তখন এগিয়ে এলো বপু। খুব ডাকাবুকো অপ্সরা। বললে—ঠিক আছে, আমি যাব। বলেই এসে হাজির সেই



পাহাড়ে। দেখল, চোখ বুজে ধ্যান করছেন দুর্বাসা। নিশ্চল। বপু সরাসরি তাঁর সামনে অপ্সরাবেশে না গিয়ে করল কি, পাশেই ছিল এক সুন্দর ঝোপ, সেখানে গাছের একটা ডালে পুরুষ কোকিলের রূপ ধরে কু···হু, কু···হু করে ডাকতে আরম্ভ করল। কোকিলের ডাক শুনলে সকলেরই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। বপু ভেবেছিল, এই দিয়ে অবশ্যই সে বাজিমাৎ করবে।

কোকিলের সুরেলা কণ্ঠের কুহু···কুহু ডাক শুনতে শুনতে এক সময় ধ্যান ভেঙে গেল দুর্বাসার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, ঝোপে কোকিল। কিন্তু এখন তো বসন্তকাল নয়। তবে এ সময় কোকিল কোথা থেকে এল। মহাতপস্বী দুর্বাসা। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি এতই সোজা? ধরা পড়ে গেল বপু। দারুণ খেপে গেলেন দুর্বাসা—একটা অপ্সরা হয়ে তোর এত বড় স্পর্ধা যে আমার ধ্যান ভাঙতে আসিস্। যাঃ, তুই পাখি হয়ে থাক। বলেই দুর্বাসা উঠে চলে যেতে গেলেন অন্য জায়গায়।

বপুর তো মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। কোথায় অপ্সরার সুখভোগ, আর কোথায় পাখির জীবন। লুটিয়ে পড়ল মুনির পায়ে। যেমন চট করে রেগে যেতেন দুর্বাসা, তেমনি আবার চট করে ঠাণ্ডাও হয়ে যেতেন। বপুকে বললেন—দেখ, মুখ দিয়ে যখন আমার বেরিয়ে গেছে, তখন পাখির জীবন তোমাকে ভোগ করতেই হবে, উপায় নেই। তবে এতই যখন কান্নাকাটি করছ, তখন ষোলটা বছর ভোগ কর। এর মধ্যে তোমার চারটে ছেলে হবে বটে, কিন্তু তুমি তাদের দেখতে পাবে না, কেননা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের তীরে তার আগেই তোমার প্রাণ যাবে। তারপর যেমনি ছিলে তেমনি হবে।

এই বলে দুর্বাসাও চলে গেলেন। কোকিলবেশী বপুকেও পাখির কুলে জন্ম নেবার জন্য প্রাণত্যাগ করতে হল।

এদিকে যখন এই ব্যাপার, মর্ত্যে তখন বেধে গিয়েছিল এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

পক্ষীরাজ গরুড়ের নাতির পুত্রের নাম প্রলোলুপ। তার ছিল দুটি ছেলে—কঙ্ক আর কঞ্জর। গরুড় বংশে জন্ম তাদের, মেজাজই আলাদা।

একদিন কঙ্ক বেড়াতে বেড়াতে এল কৈলাস পর্বতে। এসে সুন্দর এক সরোবর দেখে নামল সেখানে। টলটল করছে সরোবরের নীল জল, চারদিকে পদ্ম ফুটে রয়েছে। বইছে ফুরফুরে বাতাস। কুবেরের অনুচর বিদ্যুৎরূপ তখন তার স্ত্রী মদনিকাকে নিয়ে ঐ সরোবরের একটা ধাপে বসে মদ নিয়ে মৌতাত করছিল। কঙ্ক অতটা খেয়াল করে নি। জায়গাটা ভাল লাগতে সে-ও একটু বিশ্রাম করার জন্য যেই নেমেছে অমনি খিঁচিয়ে উঠল বিদ্যুৎরূপ—এই বেল্লিক! তুই আবার কোথা থেকে এলি এখানে? বেরো শীগগির!

অশ্লীল মন্তব্য, তার ওপর ধমক শুনে কঙ্কের মেজাজ গেল গরম হয়ে। বললে—কেন যাব? এ জায়গাটা কি তোর, না, তোর বাপের যে আর কেউ এখানে আসতে পারবে না?

আর যায় কোথা? সঙ্গে সঙ্গে খাঁড়া তুলে গর্জন করতে করতে বিদ্যুৎরূপ ঝাঁপিয়ে পড়ল কঙ্কর ঘাড়ে—সামান্য একটা পাখি। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? বলেই এক কোপে কঙ্কের গলা নামিয়ে দিল।

বিনা দোষে দাদাকে মেরেছে রাক্ষস শুনেই পক্ষীরাজের রক্ত চনমন করে উঠল ভাই কঞ্জর-এর শরীরে। গাঁক···গাঁক করতে করতে সেখানে হাজির হয়েই দেখল, মদে চুর বিদ্যুৎরূপ তখনও বসে মৌতাত করছে, আর তার দাদা ছিন্নমুণ্ড হয়ে পড়ে আছে পাশে।

গিয়েই গাঁক গাঁক করে উঠল কঞ্জর—ওরে বেইমান, শয়তান রাক্ষস, আয় দেখি, তুই কত বড় বীর হয়েছিস? আমার নিরপরাধ দাদাকে মারতে তোর এতটুকু লজ্জা হল না? আজ তোকে কে বাঁচায়, একবার দেখব। আয়···আয়, সাহস থাকে তোর খাঁড়া নিয়ে উঠে আয়।

মদের নেশায় রক্ত তখন এমনিতেই গরম, তার ওপর স্ত্রীর সামনে একটা পাখি করবে অপমান, এ কি কোন পুরুষ সহ্য করতে পারে? চোখ লাল করে বিদ্যুৎরূপ খাঁড়া তুলে দৌড়ে এল। সজোরে কঞ্জরকে লক্ষ্য করে রাক্ষস যেই খাঁড়া ছুঁড়ল, টুক্ করে একটু সরে যেতেই খাঁড়া এসে পড়ল মাটিতে। বিদ্যুৎরূপ তা কুড়িয়ে নেবার আগেই, কঞ্জর সেটা ঠোঁটে ধ'রে পায়ের চাপে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে বলল—তোর আর কি অস্ত্র আছে, বের কর রে বেইমান! আর তো কিছু ছিল না বিদ্যুৎরূপের। হাত দুটোই সম্বল। তাই নিয়েই রাক্ষসটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কিন্তু কঞ্জরের ঠোঁটের ঘায়ে জর্জর হতে হতে এক সময় নিষ্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ওদের লড়াই দেখে এতক্ষণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছিল মদনিকা। বিদ্যুৎরূপ যেই মারা গেল, মদনিকাও এসে লুটিয়ে পড়ল কঞ্জরের পায়ে। কঞ্জর আর কি করে, মদনিকাকে নিয়ে গেল নিজের বউ করে।

—তা কেমন করে হল? বাধা দিয়ে বললেন জৈমিনি—কঞ্জর তো পাখি। আর মদনিকা রাক্ষসী। দুজনের মধ্যে বিয়ে কেমন করে হবে?

মার্কণ্ডেয় বললেন—নিশাচর-নিশাচরীরা যে কোন সময়ে যে কোন রূপ ধরতে পারে, জৈমিনি। এর জন্য তাদের কোন কষ্ট করতে হয় না। সেজন্যই তো ওদের মায়াবী বলে। মদনিকাও তক্ষুণি পক্ষিণী হয়ে গিয়েছিল।

তারপর শোন:

—বেশ কিছুদিন দুজনে ঘর সংসার করার পর পক্ষিণী মদনিকার একটি মেয়ে হল। কত্তর আদর করে করে তার নাম রাখল তার্ক্ষী।

জান জৈমিনি, সেই অপ্সরা বপুই হল এই তার্ক্ষী। তাই পক্ষিণী হলে কি হবে, যেমন ছিল তার রূপ, তেমনি ছিল তার গুণ। আর তারই জন্য ব্রাহ্মণ মন্দপালের ছোট ছেলে সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দ্রোণ তাকে হাসিমুখে বিয়ে করে বউ করে নিয়েছিল। ঐ যে চার ছেলের কথা তোমায় বললাম, তারা হল এদেরই ছেলে।

—বুঝলাম। বললেন জৈমিনি—পাখির বংশে পাখি হয়ে জন্মে তো তারা আর আমাদের মত পড়াশুনা করার সুযোগ পায় নি। তাহলে এমন সুপণ্ডিত হল কিভাবে?

—হ্যাঁ। সে-ও ঘটনা। তার আগে শোন:

শাপ দেবার পর দুর্বাসা বপুকে বলেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের শরে তার পক্ষিণী জীবন শেষ হলে সে মুক্তি পাবে। ঘটেও ছিল তাই।

কিছুদিন পরেই তার্ক্ষী শুনল কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবে দারুণ লড়াই শুরু হয়েছে। স্বামীকেও যেতে হয়েছে। তার্ক্ষীরও কি মনে হল, সে-ও একদিন উড়তে উড়তে গিয়ে হাজির। তখন সে যে মা হতে যাচ্ছে, পেটে বাচ্চা, সে হুঁশই তার ছিল না।

গিয়ে দেখে, একদিকে দৈত্যের মত বিশালকায় হাতির পিঠে ভগদত্ত, আর একদিকে রথে অর্জুন। দুজনের মধ্যে লড়াই চলছে দারুণ। দু দিক থেকেই শাঁ শাঁ করে ছোটাছুটি করছে উল্কার মত সব তীর। আকাশ থেকে দেখছে তার্ক্ষী। হঠাৎ অর্জুনের একটা তীর তার পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে চলে গেল। প্রাণ শেষ তার্ক্ষীর। মাটির কাছাকাছি এসে লুটিয়ে পড়তে যাবে কি, পেট থেকে তার চারটে ডিম গড়িয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সময়েই অর্জুনের আর এক তীর গিয়ে ভগদত্তের হাতির গলায় যে বিশাল ঘণ্টাটা বাঁধা ছিল, সেটা দিল কেটে। ঘণ্টাটা গলা থেকে এসে এমনভাবে পড়ল যে, তার ভেতর ডিমগুলো গেল চাপা পড়ে। তাই ডিমগুলো আর কারো নজরেই পড়ল না।

—ভারি অদ্ভুত তো। বললেন জৈমিনি।

—পৃথিবীতে এইরকম কত অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটছে, তার কটার খবর কজন রাখে? তারপর কি হয়েছিল শোন:

—ভীষ্মদেব তখন শর-শয্যায়। যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই গেছেন তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতে। সেখানে আরো কিছু ব্রাহ্মণের সঙ্গে ছিলেন শমীক মুনি।

হঠাৎ শমীক মুনির কানে এল, ঘণ্টার ভেতর থেকে যেন কিচ-কিচ শব্দ উঠছে। ভাল করে কান পেতে শুনে সকলকে ডেকে ঘণ্টা সরাতেই দেখলেন, চারটে পাখির বাচ্চা।

দেখে খুবই মায়া হল শমীক মুনির। আহা রে, না জানি কাদের বাচ্চা। কতদিন না খেয়ে আছে? খুব যত্ন করে শমীক মুনি তাদের তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যে, নিজের আশ্রমে। ছেলের মত লালন-পালন করতে লাগলেন। শিষ্যদের পড়ানো আর পাখির



বাচ্চাদের সেবাযত্নেই কেটে যেতে লাগল মুনির দিন।

পাখনায় ভর দিয়ে ইতিমধ্যে উড়তে শিখেছে পাখিরা। ঘুরে ঘু বেড়ায় আকাশে। যতক্ষণ না ফেরে, ততক্ষণ পথ চেয়ে তাকি থাকেন শমীক মুনি। কোন কোনদিন কোথাও যায় না। শিষ্যদে শমীক মুনি পড়ান, আর পাখিরা যেন ডালে বসে তা শোনে

এর বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন পাখিরা শমিক মুনি বলল—পিতা, আমরা এখন বড় হয়েছি, সাবালক হয়েছি। আম আমাদের জন্মদাতা পিতা-মাতাকে দেখি নি। আপনিই আমাদে লালন-পালন করেছেন, আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপন কৃপায় আমরা কিছু জ্ঞানলাভও করেছি। এখন আদেশ কর আমরা আপনার জন্যে কি করতে পারি।

এতদিন যাদের মুখে পাখির কলকাকলিই শুনে এসেছেন, তা

মুখে মানুষের ভাষা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন মুনি। একটা ধারণা তাঁর মনে বরাবরই ছিল যে পাখিগুলো আর পাঁচটা পাখির মত নয়। নইলে, ঘণ্টা চাপা থাকা অবস্থায় কবে মারা যেত। এখন তাদের মুখে আবার মানুষের ভাষা শুনে তাঁর যেমন আনন্দ হল, তেমনি রীতিমত অবাকও হলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা তো সবাই পাখি, তবে আমাদের মত ভাষায় কিভাবে কথা বলছ তোমরা?

পাখিরা বলল—পিতা, পাখির বংশে জন্মেছি, সে আমাদের অদৃষ্ট। তবে পূর্বজন্মের স্মৃতি আমরা ভুলি নি। পূর্বজন্মে আমরা ছিলাম বিপুলস্বান মুনির নাতি। মহাতপা সুকৃষের ছেলে। বাবা সব সময়ই যাগ-যজ্ঞ নিয়ে থাকতেন। আমরাও থাকতাম বাবার কাছে। সমিধ যোগাড় করে দিতাম। যজ্ঞে সাহায্য করতাম। বড় হলে বাবা আমাদের সকলের বিয়েও দিয়েছিলেন। আমাদের নিজেদেরও যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা নিয়ে দিন কাটত।

একদিন সকলেই রয়েছি আশ্রমে। হঠাৎ কোথা থেকে ঝপ করে বিশালকায় এক পাখি এসে নামল আমাদের সামনে। দেখলাম, খুব হাঁফাচ্ছে। বেশ বয়স হয়েছে। গলার চামড়াগুলো ঝুলে পড়ে থলথল করছে। পাখনায় তার পালক নেই বললেই হয়, গায়ের রং-ও তামাটে।

নেমেই বললে—ব্রাহ্মণ, আমার অসম্ভব খিদে পেয়েছে। এখনই কিছু খেতে না পেলে মারা যাব।

শুনে বাবা আমাদের শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন—সে কি কথা? বলুন, আপনি কি খেতে চান? কি খেলে আপনি সুস্থ হবেন?

পাখি বলল—মানুষের মাংস। মহামাংস খেতে পেলেই আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠব।

বাবা শুনে খুবই অবাক হয়েছিলেন। আমরাও। পাখির যে বয়স, তাতে মানুষের মাংস খাওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অথচ চেয়ে বসল সেই মাংসই। অতিথিকে ফেরানোও অধর্ম। তাই বাবা বললেন—ঠিক আছে, মানুষের মাংসই দেব।

তারপর, আমাদের ডেকে বলেছিলেন অতিথির সেবা করতে। জানেন মুনিবর, আমাদের সকলেরই প্রাণের মায়া ছিল এত বেশি যে আমরা রাজি হই নি। তাতে বাবা আমাদের উপর খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন—এত কষ্ট করে আমি তোদের লালনপালন করলাম, ধর্ম শেখালাম। আর এখন এই তার নমুনা? এই তোদের মনুষ্যত্ব? বাবাকে অগ্রাহ্য করিস? নিজের সুখ-শান্তি চাস? ধিক তোদের! মানুষের বংশে মানুষ হয়ে থাকার যোগ্যতা তোদের নেই। যা, তোরা পাখির বংশে জন্ম নে।

কথা যখন দিয়েছি, তখন আমি নিজেই কথা রাখব। এই বলে বাবা সেই পাখিকে বলেছিলেন—পক্ষীরাজ, আপনি অতিথি, ক্ষুধার্ত। সময় নষ্ট না করে আমার মাংস খেয়ে আপনি তৃপ্ত হন। বলেই এগিয়ে গেলেন পাখির কাছে।

পাখি তখন বলল—দেখ ব্রাহ্মণ, আমি তো জ্যান্ত মানুষের মাংস খেতে পারি না। তুমি তো যোগী। যোগবলে শরীর ত্যাগ কর, তারপর তোমায় খেয়ে আবার খিদে মেটাব।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বসে গেলেন—প্রাণ ত্যাগ করবেন।

আর ঠিক সেই সময়েই দেখি মুনিবর, কোথায় সেই পাখি, সামনে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র। বলছেন—ব্রাহ্মণ, তুমি কতখানি সৎ আর সত্যনিষ্ঠ, তা পরীক্ষা করতেই আমি এসেছিলাম। সার্থক তুমি। এ জীবনটা কাটিয়ে তুমি আমার ইন্দ্রলোকে আসবে। বলে দেবরাজ তো অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর আমরা? নিজেদের বোকামি বুঝে হায়...হায় করে উঠেছিলাম। ব্রাহ্মণ হয়ে যদি স্বার্থত্যাগ করতেই না পারলাম, তাহলে আর ব্রাহ্মণ কিসের। ধর্মশাস্ত্র পড়ার পরেও যদি কেউ 'আমি' 'আমি' করে নিজের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করে, তবে সে ধর্মের কি শিখলো?

ঐ দেখে আমাদের চোখ খুলে গেল। বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়লাম—আমাদের ক্ষমা কর বাবা!

যাঁরা সত্যবাদী হন মুনিবর, তাঁদের মুখের কথা তো আর বিফলে যায় না। চার ভাই আমরা তাই পক্ষিকুলে জন্মে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছি। তবে, তাঁর দয়ায় পূর্বজন্মের কিছু আমরা ভুলি নি। এ জন্মে আপনিই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ করে দিয়েছেন—প্রাণদাতা পিতা আপনি। বলুন, আপনার যদি কোন কাজে আমরা লাগতে পারি।

কি আর বলবেন শমীক মুনি সেই জ্ঞানী পাখিদের। মনে মনে খুব তৃপ্তি পেলেন তিনি।

সেই থেকে চারজন—পিঙ্গাক্ষ, বিরোধ, সুপুত্র আর সুমুখ পাখি হয়ে সেখানেই আছে। তুমি, জৈমিনি, তাদের কাছে গিয়ে, তোমার প্রশ্ন রেখো। মনের সব সংশয় তারা দূর করে দেবে।

বলেই মার্কণ্ডেয় চলে গেলেন জপ-আহ্নিক সারতে।

আর জৈমিনিও খুব কৌতূহলী হয়ে সেখানে আর না থেকে সোজা চলে এলেন বিন্ধ্যপর্বতে।

কাছাকাছি আসতেই শুনলেন, কারা যেন সুমধুর গলায় তাল-লয়-মান-ছন্দ সব ঠিক রেখে বেদ গান করছে। কোথাও এতটুক ভুলচুক নেই। সেই গান শুনতে শুনতে কাছে এসে জৈমিনি দেখলেন, গান যারা গাইছে, তারা কোন মুনি বা ঋষিবালক নয়, সেই চার পাখি। পাথরের ওপর বসে তারা গানে বিভোর হয়ে আছে।

জৈমিনি তাদের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন—আমি ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি।

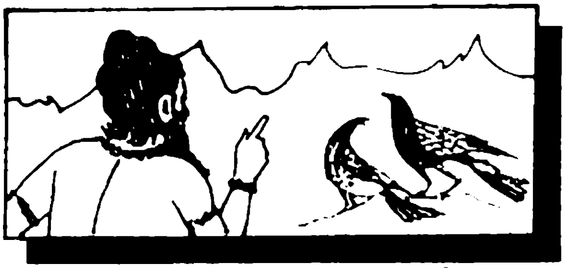
শুনে শশব্যস্ত হয়ে পাখিরা তাঁকে সাদরে আসন দিয়ে বসিয়ে বলল—আপনি এসে আমাদের যে কি উপকার করলেন, তা আর কি বলব। এখন বলুন, আমরা আপনার কি উপকার করতে পারি।

জৈমিনি বললেন—দেখ, মহাভারত পড়তে গিয়ে আমার মনে কতকগুলো প্রশ্ন জেগেছিল। গিয়েছিলাম মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে। তা তিনিই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পাখিরা বলল—বলুন মুনিবর, কি কি সংশয় জেগেছে আপনার মনে, আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকলে অবশ্যই তার সমাধান করে দেব।

জৈমিনি বললেন—স্বয়ং ভগবানের কোন গুণ নেই, মূর্তিও নেই। তাঁর মধ্যেই তো এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তাই তো জানি।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, মুনিবর। তবুও আছে। তিনি আকারহীন হয়েও আকার ধারণ করেন। এ তাঁর লীলা। মোটামুটি চারটি রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন। একটা তাঁর তেজোময় মূর্তি, যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন। সেটি হল বাসুদেব মূর্তি। এটিই হল তাঁর প্রথম মূর্তি। দ্বিতীয় মূর্তিতে তিনিই শেষনাগের বেশে পৃথিবী



ধারণ করে আছেন। এটি হল সঙ্কর্ষণ মূর্তি। যে মূর্তিতে ভগবান নারায়ণ অধর্ম বিনাশ করে ধর্মকে রক্ষা করেন, সেটি হল তাঁর প্রদ্যুম্নমূর্তি। আর চতুর্থ মূর্তি তাঁর জলের মধ্যে সাপের পিঠে শুয়ে। তা হল অনিরুদ্ধ মূর্তি। পৃথিবীতে যখনই দানব-অসুররা মাথাচাড়া দিয়েছে, তখন এই প্রদ্যুম্নমূর্তিই ধ্বংস করেছে তাদের। পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে। এখন তিনি এসেছেন মানুষের মূর্তি ধরে শ্রীকৃষ্ণ নামে, পৃথিবীকে দুর্দশামুক্ত করতে। প্রদ্যুম্ন মূর্তিই তাঁকে রক্ষা করছেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। বলল পাখিরা।

এরপর জৈমিনি রাখলেন তাঁর দ্বিতীয় সংশয়—আচ্ছা, পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। এই পাঁচজনেরই স্ত্রী হলেন এক নারী দ্রৌপদী। এ কেমন করে সম্ভব?

—মুনিবর, বলল পাখিরা—ওরা আলাদা-আলাদা পাঁচ বটে। কিন্তু ঠিক পাঁচ নয়। ওরা পাঁচে মিলে এক।

—কি রকম?

—তাহলে শুনুন। একবার অসুররা মায়াবলে পৃথিবীর রাজশক্তিগুলোর মধ্যে ঢুকে প্রজা-সাধারণকে অত্যাচারে জর্জর করে তুলেছিল, তখন ধরিত্রীদেবী তা আর সহ্য করতে না পেরে দেবতাদের নিয়ে ভগবানের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে বলেছিলেন, 'ভগবান, এইসব অধার্মিক অত্যাচারীদের ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি আমাকে বাঁচান।' ভগবান নারায়ণ তখন পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়ে দেবতাদের বলেছিলেন, 'শোন, তোমরা যে যার শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে যাও। আমিও শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম এই দুটো রূপ নিয়ে পৃথিবীতে যাচ্ছি। তারপর আমরা একসঙ্গে অসুরদের নিধন করে পৃথিবীর চোখের জল মোছাব।' তখন, দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রধান রূপ ধর্মকে পাঠালেন পাণ্ডুর ছেলে যুধিষ্ঠির করে। বল নামে তাঁর যে শক্তি, তাঁকে পাঠালেন ভীম করে, নিজের খানিকটা শক্তিকে পাঠালেন অর্জুন করে। এরা সবাই জন্ম নিল কুন্তীর গর্ভে। আর পাণ্ডুর আর এক স্ত্রী যে মাদ্রী, ইন্দ্র তাঁর যমজ-শক্তি অশ্বিনীকুমারদের পাঠালেন তাঁর গর্ভে। তাঁরা হলেন নকুল আর সহদেব। এইভাবে এক ইন্দ্র যখন পাঁচরূপে চলে গেলেন পৃথিবীতে, তখন শচী আর কি করেন। দ্রুপদ রাজার যজ্ঞকুণ্ড থেকে পৃথিবীতে এলেন দ্রৌপদী নামে। তাঁর চোখে, এই পাঁচজন তো আলাদা-আলাদা কেউ নন—এক তাঁর সেই স্বামী দেবরাজ ইন্দ্র। সতী-সাধ্বী যিনি হন, তিনি কি কখনো অন্যায় করতে পারেন?

—সব ব্যাপারটাই তোমরা আমার কাছে পরিষ্কার করে দিলে। কি বলে যে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব।

পক্ষীদের জ্ঞান দেখে দারুণ অবাক হয়ে জৈমিনি মুনি বেশ কিছুকাল থেকেই গেলেন তাদের কাছে নানা আলাপ-আলোচনা নিয়ে।



হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান

ত্রেতাযুগের কাহিনী, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় কয়েক কোটি বছর আগের কথা।

ঋষি বিশ্বামিত্র নির্জন অরণ্যে বসেছেন কঠোর তপস্যায়। ব্রাহ্মণের সমান মর্যাদা আর ব্রহ্মর্ষি হবার জন্যই তাঁর এই তপস্যা। তাই মনকে কোন রকমে চঞ্চল হতে না দিয়ে, যা কিছু নিয়মকানুন আছে সব নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন ব্রহ্মবিদ্যা, যা ব্রাহ্মণদের কাছেও দুর্লভ, তা আয়ত্ত করে ব্রহ্মর্ষি তাঁকে হতেই হবে। অনেকেই অনেক ভাবে চেষ্টা করেছেন তাঁর তপোভঙ্গ করবার, কিন্তু পারেন নি। অমন যে গণেশ, সব কাজে যিনি ব্যাঘাত ঘটাতে ওস্তাদ বলে সকলের কাছে বিঘ্নরাজ, তিনিও হেরে গিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছেন।

তখন সসাগরা এই পৃথিবীর রাজা হলেন হরিশ্চন্দ্র, মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ছেলে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন যেমন নির্ভীক, তেমনি বীর, আবার যেমন ধার্মিক, তেমনি সত্যবাদী। রাজা হয়েই তিনি প্রজার মন জয় করে ফেললেন সহজেই। তাঁর রাজত্বে না ছিল চুরি-ডাকাতি, না ছিল কোন অত্যাচার। প্রজারা থাকত মহাসুখে।

একদিন রাজা বেরিয়েছেন মৃগয়ায় সদলবলে। মহা উল্লাসে মৃগয়া করতে করতে ঢুকছেন বনের ভেতর। মৃগরা পালায় প্রাণভয়ে, রাজা ছোটেন বাণ নিয়ে। বিঘ্নরাজ গণেশ দেখলেন, এই সুযোগ! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। অযোধ্যায় রাজা হবার পর, রাজা পুত্র কামনায় যজ্ঞ করলে বরুণদেবের অনুগ্রহে ছেলে হয়েছিল বটে রাজার, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-মত নিজের ছেলের বদলে গরিব এক ব্রাহ্মণের ছেলে শুনঃশেফকে বলি দিতে গিয়েছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র এসে সেই ছেলেটিকে প্রাণেও বাঁচিয়েছিলেন, আবার রাজাকেও বরুণদেবের কাছ থেকে দায়মুক্ত করেছিলেন। সেই থেকে রাজার সঙ্গে যেমন বিশ্বামিত্রের পরিচয়, তেমনি বিশ্বামিত্রও বিলক্ষণ চেনেন রাজাকে।

মৃগের পিছু ছুটতে ছুটতে হঠাৎ রাজার কানে এল কতকগুলো মেয়ের আর্তনাদ—'কে কোথায় আছ, বাঁচাও...বাঁচাও...'। শুনেই শিকার ছেড়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা। এই বনের ভেতর নারীকণ্ঠ! তার ওপর আর্তনাদ! নিশ্চয়ই কোন শয়তান আমার চোখ এড়াবার জন্য এই বনে এসে মায়েদের ওপর অত্যাচার করছে। রাজার শিকার উঠল মাথায়। তখন সে কি মূর্তি তাঁর! গলার স্বর তখন তাঁর যেন বাজের ডাক। অনুচরদের ডেকে বললেন—বন ঘিরে ফেল। যেন কেউ কোন ভাবে পালাতে না পারে। নিজেও হুঙ্কার ছেড়ে হাতে তীর-বাণ নিয়ে গাছপালা দুমড়ে-মুচড়ে ছুটলেন

সেই আর্তনাদ লক্ষ্য করে, আর ছাড়তে লাগলেন ঘনঘন হুঙ্কার—একটুখানি...আর একটুখানি সবুর কর মায়েরা। আমি যাচ্ছি।... আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র।... এদিকে সেনাদের ডাক-হাঁক, ঘোড়ার চিঁ-হিঁ। বন যেন মুহূর্তে হয়ে গেল রণক্ষেত্র।

যেখান থেকে আর্তনাদ আসছিল, রাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে তার কাছাকাছি গিয়ে দেখেন, কোথায় কি? আশেপাশে কোথাও তো কোন নারী নেই। বরং সামনে দাঁড়িয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র। জবাফুলের মত টকটকে লাল তাঁর চোখ। তা দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি রাজার দিকে চেয়ে।

ব্যাস, কাজ হাসিল দেখে বিঘ্নরাজ গণেশ লুকিয়ে তো ছিলেনই, এবার সেখান থেকে একেবারেই সরে পড়লেন। বিশ্বামিত্র রেগে উঠেছেন। তপস্যার সব ফলই তাঁর নষ্ট হয়ে গেল। আর তাঁর সেখানে থাকার দরকার কি?

সবই যে গণেশের খেলা, রাজা তা বুঝবেন কি করে? সামনে ঋষিবরকে দেখেই তো থমকে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। প্রণাম জানালেন।

গর্জন করে উঠলেন বিশ্বামিত্র—দুরাত্মা, আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাও কোন সাহসে?

হরিশ্চন্দ্র বললেন—আপনার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটানো আমার উচিত হয় নি ঠিকই। কিন্তু আমি কোন অধর্ম করি নি। এই বনের ভেতর কতকগুলো নারীর আর্তনা শুনে তাদের রক্ষা করতেই আমি এসেছিলাম। তাছাড়া আমি এখন রাজসূয় যজ্ঞে ব্রতী, ঋষিবর। আমার কাছে কেউ কিছু চাইলে আমি তো তা প্রত্যাখ্যান করতে পারব না।

—আমার তপস্যা ভাঙিয়ে আবার ধর্মজ্ঞান দেখাচ্ছ হরিশ্চন্দ্র। রাগে যেন কাঁপছেন বিশ্বামিত্র—বল তো রাজার ধর্ম কি?

—আজ্ঞে ঋষিবর, আর্ত-আতুরকে রক্ষা করা; দেশের যারা শত্রু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর তপস্যারত ব্রাহ্মণদের দান করা—আমি তো এই তিনটেকেই বড় ধর্ম বলে মনে করি। সবিনয়ে বললেন হরিশ্চন্দ্র।

শুনতে শুনতে বিশ্বামিত্রের চোখে-মুখে ফুটে উঠল এক কুটিল ভাব।

—হুঃ। তুমি দানব্রত নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করছ, তাই না? আমিও তো একজন তপস্বী। যা চাইব, তা দেবে?

—অবশ্যই ঋষিবর। আপনি মনে মনে যা চাইছেন, তা বলার আগেই নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারেন যে তা পেয়ে গেছেন। এবার বলুন, আপনি কি পেলে সন্তুষ্ট হবেন? বললেন রাজা হরিশ্চন্দ্র।

ভুরু কুঁচকে বিশ্বামিত্র বললেন—আমি চাই তোমার সিংহাসন, তোমার রাজত্ব। দিতে পারবে?

হাসিমুখে হরিশ্চন্দ্র বললেন—কেন দিতে পারব না, ঋষিবর। এক্ষুণি। অনুগ্রহ করে আসুন আমার সঙ্গে, বসুন সিংহাসনে।

বন থেকে সমাদরে বিশ্বামিত্রকে এনে হরিশ্চন্দ্র বসিয়ে দিলেন অযোধ্যার সিংহাসনে।

বিশ্বামিত্র এলেন রাজসভায়। ইতিমধ্যে রাজ্যের সর্বত্র খবর ছড়িয়ে গেছে রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করতে বসে রাজ্য দান করে দিয়েছেন ঋষি বিশ্বামিত্রকে। দলে দলে মানুষজন আসতে শুরু করেছে অযোধ্যায়। সকলের মুখেই এক কথা—এ কি করলেন রাজা। যাঁর দয়ায় আমরা এতদিন সুখে বাস করছিলাম, আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে যিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন, আর তিনি থাকবেন না! কিন্তু এখানে বলার তো কিছু নেই।

বিশ্বামিত্র একবার দেখলেন চারদিক। বুঝলেন সকলের কতখানি প্রিয় রাজা হরিশ্চন্দ্র। তারপর বললেন—হরিশ্চন্দ্র, তাহলে তুমি আমায় এই সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য দান করলে তো?

—এতে তো আর কোন সংশয় নেই ঋষিবর। এখন থেকে এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি আপনি। এই প্রজাবৃন্দ আপনার। আমিও আপনার এখন থেকে দাস।

—হুঃ, তাহলে, পৃথিবী আর সমুদ্রের যাবতীয় সম্পদ এখন আমার তো?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে রাজা, তোমার গায়ে যেসব অলঙ্কারের পোশাক, তোমার স্ত্রী, শৈব্যার গায়ে যেসব অলঙ্কার, ওগুলোতেও এখন তোমার কোন অধিকার নেই। সব খুলে আমার রাজকোষে রাখ।

হরিশ্চন্দ্রও সঙ্গে-সঙ্গে সব খুলে দিলেন, শৈব্যার কাছ থেকেও সব এনে দিয়ে দিলেন বিশ্বামিত্রকে। নিজে, শৈব্যাকে সাধারণ পোশাক পরিয়ে, এমনকি শিশু রাজপুত্র রোহিতকেও সাদা-মাটা পোশাক পরিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এবার চলে যেতে উদ্যত হলেন হরিশ্চন্দ্র। নীরবে হায়...হায় করে উঠল প্রজারা। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারল না।

প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কি হরিশ্চন্দ্র, পথ আগলালেন বিশ্বামিত্র। ঝাঁঝালো কণ্ঠে তিরস্কার করে উঠলেন—এই তোমার ধর্মজ্ঞান? দান করলে দক্ষিণা দিতে হয়, জান না? দক্ষিণা কোথায়? আর তা না দিয়ে যাচ্ছই-বা কোথায়?

প্রমাদ গুণলেন হরিশ্চন্দ্র। বললেন—ঋষিবর, আমাদের এই তিনজনের দেহ ছাড়া, আর তো কিছুই আমার নেই, যা দিয়ে আপনাকে দক্ষিণা দেব।

—দক্ষিণা না হলে দানই মিথ্যে। সরোষে বলে উঠলেন বিশ্বামিত্র—হয় এখনি দক্ষিণা দাও, নচেৎ আমি শাপ দেব।

হরিশ্চন্দ্র তখন নিরুপায় হয়ে বললেন—অনুগ্রহ আমাকে এক মাস সময় দিন। তার মধ্যে আপনাকে সন্তুষ্ট করব।

নিজেকে সামলে নিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন—ঠিক আছে। এক মাস সময়ই তোমায় দিলাম। যাও, আমার রাজ্যে কিন্তু তোমার স্থান নেই।

মাথা হেঁট করে শৈব্যা আর রোহিতের হাত ধরে সাধারণ পোশাক পরে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে অযোধ্যা ছেড়ে ভিখারিবেশে হরিশ্চন্দ্র চলেছেন দেখে প্রজারা ডুকরে কেঁদে উঠল। তাই দেখে থমকে দাঁড়ালেন হরিশ্চন্দ্রও। সকলকে ছেড়ে যেতে তাঁর নিজেরই কি কিছু কম কষ্ট হচ্ছে।

হঠাৎ কোথা থেকে বিদ্যুৎবেগে সেখানে এসে হাজির হলেন বিশ্বামিত্র। রাগে চোখ-মুখ যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে। কঠিন সুরে তিরস্কার করে উঠলেন রাজাকে—দাঁড়িয়ে পড়লে যে? প্রজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছ, দুর্বিনীত হরিশ্চন্দ্র! ভাল চাও তো এখনি এখান থেকে চলে যাও। আর মনে রেখো, একমাসের মধ্যে যেভাবেই হোক দক্ষিণা দিয়ে তোমার কথা রাখবে। নচেৎ—



রুক্ষ বিশ্বামিত্রকে দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল রাজার বুক। বললেন—এখনি যাচ্ছি।...নিশ্চয়ই দেব।

পথ চলেছেন পায়ে হেঁটে রাজা হরিশ্চন্দ্র, শিশুপুত্রের হাত ধরে রানী শৈব্যা। এভাবে পথ চলার অভ্যাস তো তাঁদের কখনো ছিল না। তাই কাতর হয়ে পড়েন খুবই। খিদে পেলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে খান গাছের ফল-মূল, তেষ্টা পেলে পুকুরের জল। পথের মাঝে গাছের নীচে ঘাসের বিছানায় শুয়ে রাত কাটান। কোথায় যাবেন এখন তার কোন স্থিরতা নেই।

দিনের পর দিন প্রায় অনাহারে, না ঘুমিয়ে, এমন সব চেহারা হয়ে গেছে তাঁদের, আর সাধ্য কার যে তাঁদের চিনতে পারে। গায়ের রং ঢাকা পড়ে গেছে একপুরু ময়লায়, পোশাকও হয়ে গেছে জীর্ণ, মাথার চুল সব রুক্ষ। তবুও চলার বিরাম নেই।

চলতে চলতে একদিন সবে মাত্র এসে ঢুকেছেন বারাণসীতে (কাশী)। হঠাৎ যেন আকাশ ফুঁড়ে সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন বিশ্বামিত্র। বললেন—হরিশ্চন্দ্র, রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা দানের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। আজ এক মাস পূর্ণ হচ্ছে। কই দাও।

থমকে দাঁড়ালেন হরিশ্চন্দ্র। প্রণাম জানালেন বিশ্বামিত্রকে, যেমন প্রণাম জানাতেন আগে। তারপর সসম্ভ্রমে বললেন—ঋষিবর, মনে আমার আছে। আপনি তো সবই জানেন, এখন আমাদের এই তিনজনের শরীর ছাড়া আর তো কোন ধনসম্পদ নেই। আমাদের তিনজনের মধ্যে থেকে যাকে হোক নিয়ে আপনি কি আমাকে দক্ষিণার দায় থেকে উদ্ধার করতে পারেন না?

—না, তা হয় না। যে নিয়মে দক্ষিণা দেয়, সেই নিয়মের বাইরে যেতে আমি চাই না। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বিশ্বামিত্র।

—তাহলে ঋষিবর, একমাস পূর্ণ হতে আর অর্ধেক দিন বাকি আছে। এই সময়টুকু আমায় দিন। অনুরোধ জানালেন হরিশ্চন্দ্র।

—হ্যাঁ, সেটুকু সময় তুমি নিতে পার, তার বেশি নয়। ঠিক আছে, এখন চললাম। আবার ঠিক সময়ে আসব। বলেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন বিশ্বামিত্র।

এবার মহা চিন্তায় পড়লেন হরিশ্চন্দ্র। কিভাবে এখন তিনি সত্যরক্ষা করবেন?

রাজাকে খুবই চিন্তাকুল দেখে শৈব্যা বললেন—এত ভাবছেন কেন, রাজা? আপনার রোহিত রইল। আমাকে আপনি কোথাও বিক্রি করে, সেই মূল্য দক্ষিণা হিসেবে ঋষিকে দিন।

শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন হরিশ্চন্দ্র—কি বলছ তুমি শৈব্যা! তোমাকে...আর কিছু বলতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন।

তাই দেখে শৈব্যাও কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারালেন।

বালক রোহিত। কি আর বুঝবে। পড়ে আছে মা-বাবা। তার পেয়েছে দুরন্ত খিদে। বসে সে একবার মাকে, একবার বাবাকে ধাক্কা দেয় আর বলে—ও মা, ওঠো না। আমার যে বড় খিদে পেয়েছে!...ও বাবা, ওঠো না। আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়েই আবার বিশ্বামিত্র এসে হাজির সেখানে। কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরালেন হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার। চোখ মেলেই বিশ্বামিত্রকে দেখে হরিশ্চন্দ্র আবার বুঝি জ্ঞান হারান। ঠিক সেই সময়ই প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন বিশ্বামিত্র—তুমি কি ভেবেছ, এভাবে তুমি পার পাবে? কথা দিয়ে যারা কথা না রাখে, আমি বিশ্বামিত্র তাদের ক্ষমা করি না। যদি আমার ব্রহ্মশাপ থেকে বাঁচতে চাও তাহলে সন্ধের আগেই আমাকে দক্ষিণা মিটিয়ে দেবে। বলে আবার তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

ব্রহ্মশাপকে ভয় করে না, এমন কেউ নেই। অথচ নিঃসহায়, নিঃসম্বল এখন রাজা হরিশ্চন্দ্র।

আবার অনুরোধ জানায় শৈব্যা—মিথ্যাবাদী হয়ে ব্রহ্মশাপ কুড়োবেন না, রাজা। কপালে যা লেখা আছে, তা কি কেউ খণ্ডাতে পারে। আপনি আমাকে কারো কাছে বিক্রি করুন। এতে আপনার কোন অধর্ম হবে না।

শৈব্যার বারবার অনুরোধে কি আর করেন হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যাকে নিয়ে গেলেন নগরের বাজারে।

তারপর—

তারপর স্ত্রী আর পুত্র রোহিতকে পাশে নিয়ে, নিজের মনকে সংযত করে হাঁকলেন—শুনছেন, আপনারা শুনছেন। এখানে কি এমন কেউ আছেন যাঁর দাসীর দরকার?

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মানুষের ডাক শুনে কাছে এগিয়ে এল কয়েকজন মানুষ—কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? কি বলছ তুমি?

—আমি আমি...। আমতা-আমতা করে বললেন হরিশ্চন্দ্র—আমি মানুষ নই, নরাধম।—পাশের শৈব্যাকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার স্ত্রী। আমি একে বিক্রি করতে এসেছি। যদি কারো দাসীর দরকার থাকে, ন্যায্য মূল্য দিয়ে দয়া করে একে নিয়ে যান।

এমন সময় এগিয়ে এল এক ব্রাহ্মণ। দেখেই মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন। ভাল করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল শৈব্যাকে। নিজের মনেই মন্তব্য করল, 'না, ঠিক আছে। বয়সও কম, স্বাস্থ্যও আছে। খাটতেও পারবে।' এই বলে সে মূল্য দিয়ে কিনে নিল শৈব্যাকে।

তারপর তার চুলের মুঠি ধরে টান দিয়ে বলল—তাড়াতাড়ি চল্। একটা ঝি-এর জন্য স্ত্রী আমার অস্থির হয়ে উঠেছে।

অপর এক লোক মাকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, রোহিত কাঁদতে কাঁদতে শৈব্যার আঁচল চেপে ধরল। বিরক্ত হল ব্রাহ্মণ—ওটা আবার কে?

শৈব্যা বলল—প্রভু, ও আমার একমাত্র ছেলে। আমাকে ছেড়ে তো কখনো থাকে নি! একটা অনুরোধ, ওকেও আমার সঙ্গে কিনে নিন।

অগত্যা ব্রাহ্মণ তাকেও কিনে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে শৈব্যা আর রোহিতকে নিয়ে চলে গেল।

বাজার ফাঁকা। দাঁড়িয়ে একা হরিশ্চন্দ্র! হঠাৎ এসে হাজির হলেন বিশ্বামিত্র—কই হরিশ্চন্দ্র, আমার দক্ষিণা?

সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের খুঁট খুলে যা পেয়েছিলেন সব তুলে দিলেন ঋষির হাতে। বিশ্বামিত্র মুদ্রা হাতে নিয়েই জ্বলে উঠলেন—অতবড় রাজসূয় যজ্ঞের এই সামান্য দক্ষিণা? কি মনে করেছ তুমি হরিশ্চন্দ্র!

—আর তো কিছু পেলাম না ঋষিবর। তেমনি বিনীত ভাবেই বললেন হরিশ্চন্দ্র—স্ত্রী, পুত্র দু-জনকেই বিক্রি করে যা পেয়েছিলাম সবই আপনাকে দিয়েছি।

—অত কথা আমি শুনতে চাই না। একটা রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণার পরিমাণ কি হওয়া উচিত, সে জ্ঞান তোমার যথেষ্টই আছে। সূর্যাস্তের আগেই আমার তা চাই। নচেৎ, আমার অভিশাপের হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে না। বলেই আবার অন্তর্হিত হলেন বিশ্বামিত্র।

এখন কি করবেন হরিশ্চন্দ্র? স্ত্রী গেছে, পুত্র গেছে, এখন শুধু আছেন তিনি নিজে। ওদিকে দিনও শেষ হয়ে এল বলে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে।

নিরুপায় রাজা। চলেছেন ভাবতে ভাবতে বারাণসীর পথ দিয়ে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে কিছু কিছু মানুষ।

হঠাৎ হরিশ্চন্দ্র বলতে শুরু করলেন—আপনারা কেউ চাকর রাখবেন? দয়া করে আমাকে কেউ কিনে নিয়ে চাকর রাখবেন?

কেউ না শুনেই চলে যায়। কেউ শুনে তাকায়, তবু চলে যায়। একটানা সকলকে অনুরোধ করে চলেন হরিশ্চন্দ্র।

একমুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, এক মাথা রুখুসুখু চুল, ঠিক কপালের ওপর দিয়ে চুলের গোড়ায় ফেট্টি বাঁধা, ভাটার মত গোলগোল চোখ দুটো লাল, যেন নেশা করেই আছে, মিশমিশে কালো একটা মানুষ হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনে দাঁড়াল। ভাল করে এক চোখ দেখে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, আমার চাকরের দরকার। আমি তোমায় কিনতে রাজি।

মানুষটিকে দেখে কেমন যেন মনে হল হরিশ্চন্দ্রের। তাই জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

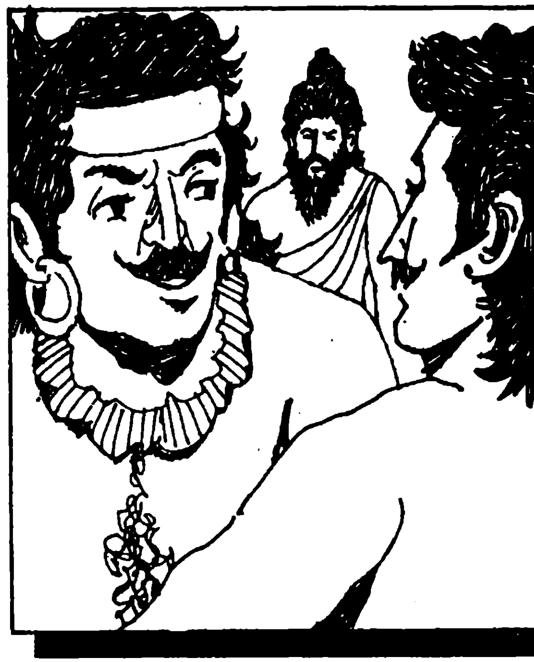
—আমি? মিশমিশে কালো দাঁতগুলো বের করে হেসে বলল—আমি এখানকার চণ্ডাল। মড়া পোড়াই। মাশুল আদায় করি। মড়ার কাপড়-চোপড়, জিনিস-পত্তর রাখি। আমার নাম প্রবীর। যদিও আমার লোকজন আছে, তবুও, তোমাকে বেশ মন্দ-সন্দ দেখে ভালই লাগছে। কাজ আমার আরো ভাল হবে।

শুনে মনে মনে দারুণ ভেঙে পড়লেন হরিশ্চন্দ্র। যদিও-বা একজন কিনতে এল, সে কিনা আবার চণ্ডাল। তাঁকে তার দাসত্ব করতে হবে। কেড়ে নিতে হবে মড়ার কাপড়-চোপড় তার কথামত, আদায় করতে হবে মাশুল। বলতে হবে, 'আগে মাশুল দাও, তারপর মড়া পোড়াও।' না। সম্ভব নয়। তাঁর পক্ষে এই নীচ কাজ কেমন করে সম্ভব? এদিকে সন্ধেও হয়ে এল বলে।

এমনি যখন চণ্ডালের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, হঠাৎ এসে হাজির হলেন বিশ্বামিত্র।

—কই, আমার দক্ষিণা? সন্ধে যে হয়ে এল।

হরিশ্চন্দ্র বললেন—ঋষিবর, নিজেকেই বিক্রি করতে গিয়ে ক্রেতা এল চণ্ডাল। কেমন করে ঐ কাজ আমি করব?



—আমি তার কি জানি। সন্ধের আগেই দক্ষিণা দিয়ে আমায় সন্তুষ্ট করবে, কথা দিয়েছ। কথার খেলাপ কিন্তু আমি কোন মতে সহ্য করব না। বললেন বিশ্বামিত্র।

পশ্চিম আকাশ লাল করে সূর্যদেব পাটে বসেছেন। এক পলক পরেই চলে যাবেন চোখের আড়ালে। সন্ধ্যা নামবে। আর কোন ক্রেতাও নেই। ভাববার সময়ও নেই। এদিকে বিশ্বামিত্রের তাড়া।

অগত্যা চণ্ডাল প্রবীরের হাতেই হরিশ্চন্দ্র বিক্রি করলেন নিজেকে। প্রবীরও খুশি মনে দিল আশাতীত মুদ্রা। হরিশ্চন্দ্রও বিশ্বামিত্রের হাতে তুলে দিলেন তা।

এবার খুশি বিশ্বামিত্র। বললেন, এতক্ষণে যজ্ঞের ঠিক দক্ষিণা পেলাম, যাও। বলে তিনি চলে গেলেন। প্রবীরও হরিশ্চন্দ্রকে নিয়ে চলে গেল তার ডেরায়।

মাথায় ফেট্টি, হাতে লাঠি, চোখে দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই, দিনে-রাতে বাজের মত চোখ নিয়ে শ্মশানের দিকে চেয়ে বসে আছে এক মন্দ পুরুষ। কোন শব এলেই হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—কে? আগে মাশুল গুণে যা, তারপর...। জোর করে আদায় করে মাশুল। কেড়ে নেয় মরার কাপড়-চোপড়, জিনিস-পত্তর। জমা দিয়ে আসে মোড়ল চণ্ডাল প্রবীরকে। এই কাজ যখন সে করে, তখন ভুলেই

যায় সে কে? কি ছিল সে?

যখন থাকে না কোন শ্মশানযাত্রী, আসে না কোন শব, একেবারে বসে থাকে ফাঁকা, তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ করে বুকটা তাঁর কেঁদে ওঠে। কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র! আর আজ সে কোথায় নিষ্ঠুর চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র! না জানি কোথায়, কেমন করে আছে শৈব্যা, ছেলে রোহিত। সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজেকে সামলে নেন হরিশ্চন্দ্র। সান্ত্বনা দেন নিজেকে এই বলে, কপালে যার যা লেখা আছে, তা করতেই হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজ করে যাওয়াই হল ধর্ম। মন থেকে দূর করে দেন সব দুর্বলতা। শব এলেই আবার চোখ পাকিয়ে গিয়ে দাঁড়ান—আগে মাশুল ছাড়; তারপর ও মড়া চিতেয় উঠবে।

কেটে গেল বারোটা বছর। প্রবীরও খুশি চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রের কাজে। খুব ভাল হচ্ছে আদায়। হরিশ্চন্দ্রের দিনও কাটে মোটামুটি। যা আদায় হয় তার ছ-ভাগ রাজাকে, পাঁচ ভাগ প্রবীরকে দিয়ে, বেতন হিসেবে বাকি দু-ভাগ রাখতে রাখতে কিছু জমেওছে এখন তাঁর।

শ্মশানের দিকে চোখ রেখে একদিন বসে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র। দেখলেন, মৃত এক বালককে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর নানা বিলাপ করতে করতে শ্মশানে এলেন এক মহিলা। মাশুল আদায় করতে উঠলেন হরিশ্চন্দ্র। বেশি নজর পড়েছিল তাঁর মৃত ছেলেটিকে জড়িয়ে আনা কম্বলের ওপর। মাশুল চাইতেই চণ্ডালের দিকে তাকিয়ে মহিলা কেঁদে আকুল হয়ে উঠল রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম করে। তার বিলাপ শুনে চমকে উঠলেন হরিশ্চন্দ্র। ভাল করে মৃত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন—এ যেন ঠিক তার রোহিতের মত! আরো ভাল করে দেখলেন—ঠিক কেন? এ তো তার রোহিতই। মাশুল আর আদায় করা হল না, কম্বলের আকর্ষণও কোথায় উবে গেল। মৃত ছেলেকে দেখে, শৈব্যাকেও চিনতে পেরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি। জ্ঞান ফিরতে শৈব্যাও চণ্ডালবেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

সাপের বিষে মারা গেছে রোহিত—তাদের একমাত্র বংশধর। কি দরকার আর বেঁচে থাকার। শৈব্যা ব্রাহ্মণের দাসী, নিজে চণ্ডালের দাস, চণ্ডাল! কি হবে এই পরাধীন জঘন্য জীবন নিয়ে। জীবনে কখনো অধর্ম তিনি করেন নি। সত্য পথেই থেকেছেন। সকলে যাতে ভাল থাকে, সুখে-শান্তিতে থাকে, এতদিন তিনি তাই করে এসেছেন। বলে, ধর্মপথে থাকলে, তাকে কষ্ট ভোগ করতে হয় না। তাহলে?

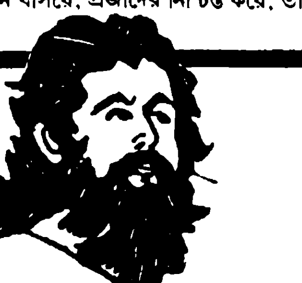
শৈব্যাকে বললেন—শোন শৈব্যা, যদি কখনো কোন অধর্ম করে না থাকি, হয় আমাদের ছেলে বেঁচে উঠবে, নয়তো ছেলের সঙ্গে চিতার আগুনে আমরাও প্রাণ বিসর্জন দেব।

এই বলে হরিশ্চন্দ্র চিতা সাজালেন।ছেলেকে আদর করে শোয়ালেন চিতায়। নিজেরাও প্রস্তুত হয়ে নিলেন। শেষবারের মত প্রাণ ভরে ডাকলেন নারায়ণকে। এবার চিতায় আগুন দিতে যাবেন, এসে বাধা দিল সেই মোড়ল প্রবীর—থামো থামো, এ কি করছ?

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন হরিশ্চন্দ্র, প্রবীর নয়, ধর্মরাজ নিজে, পাশে আবার ঋষি বিশ্বামিত্র। শুধু তাই নয়, দেবরাজ থেকে শুরু করে সব দেবতারাই এসেছেন সেখানে।

সকলের অনুগ্রহে রোহিত বেঁচে উঠল। শৈব্যার সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রকে দেবরাজ নিয়ে যেতে চাইলেন স্বর্গে। কিন্তু গেলেন না হরিশ্চন্দ্র। বললেন—সারা অযোধ্যাকে কাঁদিয়ে চলে এসেছি, দেবরাজ। তাদের মুখে হাসি না ফুটিয়ে স্বর্গে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।

কিন্তু নাছোড় দেবরাজ। অযোধ্যায় ফিরে হরিশ্চন্দ্র প্রজাদের সুখী করে রোহিতকে সিংহাসনে বসিয়ে, প্রজাদের নিশ্চিন্ত করে, তারপর গিয়েছিলেন স্বর্গে।



আড়ি-বকের লড়াই

হরিশ্চন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজা, তার আগে থেকেই বশিষ্ঠদেব ছিলেন তাঁদের বংশের কুলগুরু। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সব সময় তিনি থাকতেন তাঁদের পাশে-পাশে। রাজারাও চলতেন তাঁকে সম্মান করে, চলতেন তাঁর পরামর্শমত।

জ্ঞানে-গুণে বশিষ্ঠদেবের মত ঋষি তখন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। অত বড় জ্ঞানী হয়েও, ছিল না কোন দম্ভ বা অহঙ্কার, না ছিল মনে কোন রাগ, লোভ বা হিংসা। কাউকে শাপ দেব, সর্বনাশ করব এমন চিন্তাও তিনি করতেন না। যদি কেউ তাঁর কোন ক্ষতিও করে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করতেন। তাই সে সময় মুনি-ঋষিরা তাঁকে মেনেই চলতেন! আর তিনি যাঁকে খাতির করতেন, মুনি-ঋষিরা সকলে তাঁকেও খাতির করতেন।

বিশ্বামিত্র দীর্ঘদিন ধরে তপস্যা করছেন আপ্রাণ। তপস্যার ফলে অনেক শক্তিও তিনি অর্জন করেছেন। তবুও বশিষ্ঠদেব কোন মতেই তাঁকেই ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নিতে পারতেন না। যার জন্য বিশ্বামিত্র একবার রেগে-মেগে বশিষ্টদেবের একশ ছেলেকেই মেরে ফেললেন। ছেলেদের মেরে ফেলেছেন বলে যে বশিষ্ঠদেব রেগে বিশ্বামিত্রকে কোন অভিসম্পাত দিয়েছেন, তা নয়। আবার ভয় পেয়ে যে তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাও করেন নি।

একবার বশিষ্ঠদেব বারো বছরের জন্য কোন কারণে জলের নীচে গিয়ে বসবাস করছিলেন। বিশ্বামিত্র সেই সুযোগে দখল করলেন অযোধ্যার রাজ-সিংহাসন। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কৌশলে নিজের ফাঁদে ফেলে রাজ্যচ্যুত করলেন, নিষ্ঠুর ভাবে আদায় করলেন রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা। যার জন্য রানীকে বিক্রি করে দাসীর কাজ করতে হল। রাজপুত্রকে বিক্রি করতে হল। এমন কি হরিশ্চন্দ্রকেও চণ্ডাল হতে হল।

এসব কিছুই জানতেন না বশিষ্ঠদেব। বারো বছর পর জল থেকে উঠে অযোধ্যায় এসেই দেখেন, এ কি ছিরি হয়েছে রাজ্যের! সে আনন্দ নেই, সে হাসি-খুশি ভাব নেই। সব কেমন মনমরা। ব্যাপার কি?

খবর নিতে গিয়ে যখন সব শুনলেন, তখন সেই শান্ত বশিষ্ঠের মূর্তি হয়ে উঠল ভীষণ। রেগে আগুন হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর

একশটা ছেলেকে মেরেছেন বিশ্বামিত্র, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে নি। কিন্তু, ছেলের বড়, হরিশ্চন্দ্র যে তাঁর আপন জন। নিরভিমান, নিরহঙ্কার, ধার্মিক, সত্যবাদী সে। কি অপরাধ সে করেছে যে, বিশ্বামিত্র তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়ালেন, তাঁকে দিয়ে চণ্ডালের কাজ করালেন?

থাকতে না পেরে বশিষ্ঠদেব শাপ দিলেন বিশ্বামিত্রকে—যে কাজ তুমি করেছ, তা কোন মানুষের কাজ নয়, বকের কাজ। যাও, তুমি বক হয়ে থাক গে।

বিশ্বামিত্রও কম যান না। তাঁর ব্রহ্মর্ষি হবার পথের প্রধান শত্রু বশিষ্ঠ। তিনিও তাই বশিষ্ঠদেবকে দিলেন পালটা অভিশাপ—আমি যদি বক হই, তাহলে তুমি আড়ি (আইড় নামে এক জাতের মাছ) হবে।

দু-জনেই সত্যবাক তপস্বী। দু-জনেরই কথা অমোঘ।

দেখতে দেখতে বিশ্বামিত্র হয়ে গেলেন পেল্লায় এক বড় বক। প্রায় তিন হাজার উনসত্তর যোজন উঁচু শরীর। সেই অনুপাতে লম্বা গলা, আর ধারালো ঠোঁট।

আর বশিষ্ঠদেবও হয়ে গেলেন বিশালকায় আড়ি মাছ। প্রায় দু-হাজার যোজন উঁচু। সেই অনুপাতে লম্বা লেজ। পুরানো শত্রুতা থেকেই গেল।

ডাঙায় বক, জলে মাছ। বিশাল বিশাল ডানা দুলিয়ে বক এসে ঠোক্কর দিতে যায় আড়িকে, আর আড়িও জলে তুফান তুলে লেজের ঝাপট দেয় বকের মুখে। বকের ডানার ধাক্কায় পাহাড় ধসে পড়ে; ঝড় বয়। মাছের আলোড়নে জল ফুঁসে ওঠে, শহরে-নগরে ঢুকে পড়ে। ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে মানুষ। কেউ পাথর চাপা পড়ে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, কেউ জলের তোড়ে ভেসে যায়। কে কাকে সামলাবে? প্রাণ নিয়ে যে যার পালাতে শুরু করে ঘর বাড়ি ছেড়ে।

চারদিকে প্রলয় কাণ্ড। গোটা সৃষ্টিটাই বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়!

দেখে-শুনে থাকতে পারলেন না ব্রহ্মা। একদিন যখন প্রায় উত্তাল ব্যাপার, হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললেন—এ কি করছ, তোমরা? থামো থামো।

কিন্তু কে শোনে ব্রহ্মার কথা?

চলে যেতেই আবার যেমন লড়াই ছিল দু-জনের মধ্যে, শুরু হয়ে গেল ঠিক সেই রকম।

শেষ পর্যন্ত খুবই অসহনীয় অবস্থা এসে দাঁড়াল।

ভাবলেন ব্রহ্মা—আশ্চর্য! দুজনেই তো কম বড় তপস্বী নন, অথচ এ কি কাণ্ড করছেন তাঁরা। মোহ বা রাগ যে দারুণ সর্বনাশ করে, একথা কি দুজনে বেমালুম ভুলে গেলেন? বশিষ্ঠদেব অন্তত ভুললেন কিভাবে! যাই হোক এখন দেখছি, ওঁদের চৈতন্যোদয় না ঘটালে ওঁরা এ লড়াই থামাবেন না।

মনে মনে ঠিক করে এসে ব্রহ্মা মন্ত্রশক্তির বলে যেই ওঁদের মন থেকে রাগ দূর করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল সেই বকের চেহারা, কোথায় হারিয়ে গেল আড়ি মাছের চেহারা। যেমন দু-জনে দেখতে ছিলেন আগে, ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানালেন ব্রহ্মাকে।

ব্রহ্মা বললেন—দেখ তো, রাগের বশে তোমরা দু-জনে কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়েছিলে? আমার এমন সৃষ্টিকে কিভাবে তোমরা দু-জনে নষ্ট করলে বল তো? ছিঃ ছিঃ, ঋষি হয়ে কোথায় তোমরা মানুষের মঙ্গল করবে, তা না করে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করলে! কত মানুষের সর্বনাশ করলে দেখ দিকি?

লজ্জায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন দুজনেই।

—বশিষ্ঠ, বললেন ব্রহ্মা—কেন যে তুমি বিশ্বামিত্রের ওপর রেগে উঠলে জানি না। হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যচ্যুত করেছে ঠিকই, তাকে দিয়ে চণ্ডালের কাজও করিয়েছে ঠিক। কিন্তু রাজার তাড়াতাড়ি স্বর্গে গিয়ে সুখভোগ করার পথটা তো পরিষ্কার করে দিয়েছে। এটা কি তুমি অস্বীকার করতে পার?

এবার আরও লজ্জায় পড়লেন বশিষ্ঠদেব।

বললেন—না প্রভু। তবু হঠাৎ যে আমি কিভাবে মোহে পড়লাম তা নিজেই বুঝতে পারছি না। কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে, ভগবন।

তারপর বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুমি কিছু মনে কোরো না। আমায় ক্ষমা করে নিও, ভাই।

মিটমাট করে দিয়ে ব্রহ্মা চলে গেলেন। আবার শান্ত হল পৃথিবী।



পাতালকেতু ঋতধ্বজ ও তারপর

রাজা শত্রুজিৎ তখন পৃথিবীর প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট। নিজে তিনি অসাধু তো ছিলেনই না, অসাধুতাও সহ্য করতেন না। ফলে প্রজারাও ছিল নিশ্চিন্ত, আর শ্রদ্ধাও করত সকলে। ভাগ্যবলে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল, তেমনি গুণবান। ছেলের নাম রেখেছিলেন ঋতধ্বজ।

অল্প বয়সেই জ্ঞানে-গুণে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে যেমন সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিল ঋতধ্বজ, যুদ্ধবিদ্যাতেও হয়ে উঠেছিল তেমনি পারদর্শী। অর মন? তুলনা ছিল না তার। খুব সহজ, সরল। এতটুকু দম্ভ বা অহঙ্কার ছিল না। আর ছিল খুবই বন্ধুবৎসল। মনের মত বন্ধু-বান্ধবও তার জুটেছিল অনেক। ব্রাহ্মণ, বণিক বন্ধু তো ছিলই, এমন কি নাগরাজ অশ্বতরের দুই ছেলেও ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধু। তারা যখন সকালে ঋতধ্বজের কাছে আসত—আসত ব্রাহ্মণ বালকের ছদ্মবেশে। সারাদিন বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে রাত হলে ফিরে যেত পাতালে, তাদের বাড়িতে। তখন তারা নাগবালক। বহুকাল পর্যন্ত ঋতধ্বজ জানতেও পারে নি, যে এই দুই বন্ধু তার আসলে মানুষ নয়। নাগ।

যাই হোক, হঠাৎ একদিন মহর্ষি গালব এলেন রাজা শত্রুজিতের

কাছে। সঙ্গে তাঁর সুন্দর একটি ঘোড়া।

এসেই বললেন—মহারাজ, এক অসুর প্রতিদিনই আমার আশ্রমে এসে নানা উৎপাত করে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। সেই মায়াবী কোন দিন আসছে সিংহের বেশে, কোন দিন হাতি, কোন দিন ভালুকের বেশে। উৎপাতের তার আর শেষ নেই। মহারাজ। ইচ্ছে করলে তাকে আমি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারতাম। কিন্তু তপস্যার শক্তি এভাবে নষ্ট করতে চাই না। উৎপাতে অস্থির হয়ে একদিন যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, দেখলাম, কোথা থেকে যেন এই অশ্বটি এসে হাজির হল। দৈববাণী শুনলাম, দেবতারাই পাঠিয়েছেন এই অশ্বকে। এর নাম কুবল। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে এর অবাধ গতি। আপনার ছেলে ঋতধ্বজ এই ঘোড়া নিয়ে সেই দানবকে মারতে পারবে। আমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য আপনার ছেলেকে তা দিন, মহারাজ।

শুনে শত্রুজিৎ বললেন—ঋষিবর, এ তো খুবই সুখের কথা। নিশ্চয়ই যাবে আমার ছেলে।

এই বলে রাজা তাঁর ছেলেকে তুলে দিলেন গালবের হাতে। ঋতধ্বজও গালবের আশ্রমে এসে সজাগ পাহারা দিতে শুরু করল। সঙ্গে সেই কুবল নামে ঘোড়া। সেইজন্য ঋতধ্বজের নামই হয়ে গেল কুবলয়াশ্ব।

সন্ধ্যা হয়েছে। প্রতিদিনের মত সেদিনও গালব মুনি আর আশ্রমবাসীরা সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় সেই অসুর পাতালকেতু এসে হাজির। সেদিন সে আবার ধরেছিল শূকরের বেশ। সে জানতেও পারে নি, সে আজ আর স্বচ্ছন্দে উপদ্রব করার কোন সুযোগই পাবে না। গর্জন করতে করতে বিশাল দেহ নিয়ে যেই না আশ্রমে আসা, অমনি ঋতধ্বজ ধনুক তুলে সজোরে এমন এক তীর ছুঁড়ল যে, সোজা গিয়ে তাকে বিঁধে গেল। হঠাৎ এই আক্রমণে থমকে দাঁড়িয়েই পাতালকেতু পিছু ফিরে দিল উর্ধ্বশ্বাস ছুট। ছুট বলে ছুট—বন জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে এক দমে প্রায় হাজার যোজন! ঋতধ্বজও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল কুবল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াও কম যায় না। হাওয়ার বেগে সে-ও আসতে লাগল পিছু ধাওয়া করে।

হাজার যোজন পথ নিমেষে অতিক্রম করে সেই অসুর তীরবিদ্ধ অবস্থাতেই হঠাৎ একটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঋতধ্বজও কুবলাশ্বের পিঠে চেপে নেমে পড়ল সেই গর্তে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে অসুরকে কোথাও দেখতে পেল না। দেখল, বিশাল এক প্রাসাদ। ধনুক-বাণ হাতে নিয়ে ঋতধ্বজ অসুরের সন্ধানে ঘুরতে লাগল চারদিক। কিন্তু আশ্চর্য! গেল কোথায়? এমন কি অত বড় একটা প্রাসাদে কোন জনপ্রাণীও দেখতে পেল না। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা মেয়ে যেন এক ঝলক তাকে দেখেই প্রাসাদের কোন এক ঘরে ঢুকে গেল।

ঋতধ্বজও তাকে অনুসরণ করে এল সেই ঘরে। দেখল, অপূর্ব সুন্দরী আর এক মেয়ে। তাকে দেখেই সুন্দরী মেয়েটি যেন দারুণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেল। আর অপর মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

—তোমরা কে? কি তোমাদের পরিচয়? জিজ্ঞেস করে ঋতধ্বজ।

পালটা প্রশ্ন করে অপর মেয়েটি—আপনি কে? দেবতা, গন্ধর্ব, না কিন্নর?

হাসতে হাসতে বলে ঋতধ্বজ—না, ওসবের কোনটাই নই আমি। আমার নাম ঋতধ্বজ। আমি মানুষ। মর্ত্যের রাজা শত্রুজিতের ছেলে। আমার তীর খেয়ে এক অসুর এখানে এসে লুকিয়েছে। আমি তারই পিছু ধাওয়া করে এসেছি।

শুনে দুটি মেয়েরই সেই ভয়-ভয় ভাব মুহূর্তে কেটে গেল। প্রফুল্ল হয়ে উঠল তাদের মুখ।

অপর মেয়েটি মুখ খুলল এবার। বলল—আমার নাম কুণ্ডলা। আমি বিন্ধ্যবানের মেয়ে, আর পুষ্কর মালীর স্ত্রী। শুম্ভ নামে এক অসুর অন্যায়ভাবে আমার স্বামীকে মেরে ফেলার পর আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। আর এ আমার সখী, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর মেয়ে মদালসা।

—তা এখানে তোমরা কেন?

—এই প্রাসাদ হল দুরন্ত এক মায়াবী অসুরের। নাম পাতালকেতু। দারুণ অত্যাচারী। আমার সখীকে লুকিয়ে চুরি করে



এনে আটকে রেখেছে বিয়ে করবে বলে। এখন আপনি এসেছেন। আপনিই আমার সখীর স্বামী হবার যোগ্য। দয়া করে আপনি মদালসাকে বিয়ে করে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করুন।

শরণাগতকে রক্ষা করাও ধর্ম। রাজি হল ঋতধ্বজ। মদালসা স্মরণ করল তার কুলগুরু তুম্বুরুকে। স্মরণ মাত্রেই গুরুদেব এসে হাজির হলেন। দাঁড়িয়ে থেকে বিয়েও দিয়ে দিলেন।

চলে গেলেন তুম্বুরু। চলে গেল কুণ্ডলা। কুবলাশ্বের পিঠে মদালসাকে তুলে যেই ঋতধ্বজ প্রাসাদ থেকে বের হতে যাবে, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'মার মার' করে ছুটে এল হাজার অসুর। বিকট হাঁ করে এল সেই সঙ্গে দুরন্ত পাতালকেতুও।

মদালসাকে পিছনে রেখে ঋতধ্বজও তুলে নিল ধনুক-বাণ। একদিকে হাজার হাজার তীর ছুটে আসছে, আর একদিকে একা ঋতধ্বজ তা ঠেকিয়ে চলেছে। অসুরদের রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠল পাতাল। সমানে সমানে না হলেও লড়াই তখন তুঙ্গে। পাতালকেতুর আক্রোশে, তর্জন-গর্জনে প্রাসাদপুরীর সে এক বীভৎস চেহারা! শেষ পর্যন্ত ঋতধ্বজ ছাড়ল তার সেই মোক্ষম বাণ। দাবানল জ্বলে উঠল। আর সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল অসুরের দল, কপিল মুনির ক্রোধানলে যেমনভাবে ছাই হয়ে গিয়েছিল সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে।

এবার নিশ্চিন্ত মনে মদালসাকে নিয়ে ঋতধ্বজ ফিরে এল মর্ত্যে

বাবা শত্রুজিতের কাছে। সব শুনে রাজার সে আনন্দ আর দেখে কে। সাদরে পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিলেন প্রাসাদে। প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন পুত্রকে।

[এই কাহিনীটির সঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের 'ধুন্ধুমার কাহিনীর' যথেষ্ট মিল আছে। সেখানে গালব মুনির পরিবর্তে আছেন ঋষি উত্তঙ্ক। কিন্তু এর পরে কি ঘটেছিল ব্রহ্মপুরাণে তা নেই।]

পিতার আদেশে এরপর থেকে ঋতধ্বজের কাজই হল, রোজ সকালে কুবলাশ্ব নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, পৃথিবীর চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখা, কোথাও কোন মুনি-ঋষির ওপর কেউ অযথা অত্যাচার করছে কিনা। দেখে, ঋতধ্বজ ফিরে আসত দুপুরে।

এমনিভাবে বেশ কিছুকাল চলার পর, একদিন যমুনার তীরে এক মুনির আশ্রমে এসে দাঁড়াল ঋতধ্বজ।

ঋতধ্বজকে দেখেই মুনি তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলল—শুনেছি, আপনার কাছে প্রার্থনা জানালে বিফল হয় না।

ঋতধ্বজ জিজ্ঞেস করল—কি আপনার প্রার্থনা বলুন।

—আমি যজ্ঞ করতে চাই। কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই। আপনার গলায় ঐ যে মণিরত্নের হারটা রয়েছে, ওটা যদি দেন, তাহলে আমার ইচ্ছে পূরণ হয়।

—এ আর কি এমন বড় কথা। আপনি যজ্ঞ করবেন, আমার এই হার যদি সেই কাজে লাগে, সে তো আমার সৌভাগ্য। এই বলে সরল মনে গলার হারটা খুলে ঋতধ্বজ দিয়ে দিল মুনিকে।

মুনি সেটা নিয়ে, ঋতধ্বজকে বলল—যজ্ঞ শুরু করার আগে আমাকে বরুণদেবের পূজা আগে সেরে আসার জন্য একবার নদীতে যেতে হবে। যতক্ষণ না আসি দয়া করে আমার আশ্রমটা একটু আগলান। আমি যাব আর আসব।

সরল বিশ্বাসেই রাজি হল ঋতধ্বজ। কেমন করে জানবে সে, এই মুনি সত্যিকারের কোন মুনি নয়, পাতালকেতুর ছেলে তালকেতু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে মুনির ছদ্মবেশ ধরে তাকে প্রতারণা করেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মুনি। ধন্যবাদ জানাল ঋতধ্বজকে এতক্ষণ তার আশ্রম আগলে রাখার জন্যে। ইতিমধ্যেই তালকেতু যা করবার করে এসেছে।

কুবলাশ্বর পিঠে চেপে বাড়ি ফিরল ঋতধ্বজ।

প্রাসাদে ঢুকতে গিয়েই সে দেখে কেমন যেন থমথমে ভাব চারদিকে। সবাই যেন মনমরা। অনেকে আবার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে তাকে—যেন অস্বাভাবিক কিছু দেখছে।

সিংহাসনে বসে বাবা শত্রুজিৎ। তাঁর মুখও যেন থমথম করছে। ঋতধ্বজ গিয়ে প্রণাম জানাতেই তিনি যেন লাফিয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। মহারানীও খবর পেয়ে ছুটে এলেন অন্দরমহল থেকে।

অবাক ঋতধ্বজ জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে? তোমরা আজ এ রকম করছ কেন? চারদিক এমন থমথমে দেখছি কেন?

তারপর যা শুনল ঋতধ্বজ, তাতে মনে যত দুঃখ পেল, আবার তত বেশি কঠিনও হয়ে উঠল।

শুনল : কিছুক্ষণ আগেই এক মুনি এসেছিল রাজা শত্রুজিতের কাছে। জানিয়ে গেল—সে নাকি তার আশ্রমকে অসুরদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে প্রাণ হারিয়েছে। তার কুবলাশ্বও অসুররা কেড়ে নিয়ে গেছে। প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। কিন্তু মুনি যখন গলার হারটা নিয়ে এসেছে,—তখন আর কেউ অবিশ্বাস করতে পারে নি। মদালসা শোক সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করেছে।

এবার বুঝতে পারল ঋতধ্বজ। মুনির বেশে অসুর তালকেতু তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এত বড় সর্বনাশ করে গেছে।

মদালসা নেই। ঋতধ্বজের মন গেল ভেঙে। কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসল, জীবনে আর সে বিয়েই করবে না। আর যদি করতে হয় তবে মদালসাকেই করবে।

সেই থেকে সেইভাবেই জীবন কাটাতে লাগল ঋতধ্বজ। কুবলাশ্ব নিয়ে ঘুরে ঘুরে অসুরদের হাত থেকে মুনিদের বাঁচানো, অসুরদের মারা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ওঠা-বসা, আলাপ-আলোচনা—এইসব নিয়েই নিজের মনে দিন কাটাচ্ছিল ঋতধ্বজ। রাজা-রানী অনেকবার চেষ্টা করলেন ছেলেকে সংসারী করতে। কিন্তু পারলেন না। ছেলের সেই এক গোঁ। মদালসা ছাড়া আর কাউকে সে বিয়েই করবে না। তা কি সম্ভব?

একদিন রাতে ছেলেরা ফিরতে নাগরাজ অশ্বতর তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করল—সারাটা দিন তোমাদের এখানে দেখতে পাই না, কোথায় থাক তোমরা?

কিচ্ছু লুকালো না ছেলেরা।

শুনে নাগরাজ বলল—তোমরা নাগ হয়েও এভাবে যে সাধু-সঙ্গ করছ, এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। তা তোমরাই তার আদর আপ্যায়ন খেয়ে আসছ, পরিবর্তে তার জন্য কিছু করেছ কি?

—বাবা, সে বলে, তার অভাব কি? বাবা তাকে যে ধন-সম্পত্তি দিয়েছেন, তা যদি তার সঙ্গে আমরাও নিজেদের মনে করে ব্যবহার না করি, সে আবার মনে ভীষণ দুঃখ পায় বাবা। তাই তাকে কিছু দিয়ে মনে কষ্ট দিতে যায় না। বলল নাগছেলেরা।

—বাঃ! ভারি সুন্দর ছেলে তো! নিজের ধন-সম্পত্তিকে যে নিজের ভাবে আগলে না রেখে, সকলের বলে ভাবে, সে ছেলের কি কারো সঙ্গে তুলনা চলে? তবুও, তোমরা যখন তার বন্ধু, তোমাদের চেষ্টা করা উচিত, তার কোন কিছু উপকারে আসা।

—যা করলে তার উপকার করা হবে, সে সামর্থ্য আমাদের কারোর নেই।

—কি রকম উপকার।

—নাগছেলেরা তখন বাবা নাগরাজ অশ্বতরকে তাদের বন্ধু ঋতধ্বজের প্রতিজ্ঞার কথা শোনাল।

মন দিয়ে সব শুনে নাগরাজ বলল—এই পৃথিবীতে অসাধ্য কিছু নেই। সামর্থ্য নেই বলে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে বসে থাকাই হবে। সামর্থ্য অর্জন করতে হয়। ঠিক আছে, একদিন তোমাদের বন্ধুকে আমার নাম করে এখানে নিয়ে এস।

ছেলেরা চলে গেলে, ভাই কম্বলের সঙ্গে যুক্তি করে নাগরাজ অশ্বতর একদিন পাতাল ছেড়ে চলে গেল হিমালয়ে। সেখানে বসে প্রথমে দারুণ তপস্যা করল দেবী সরস্বতীর। সন্তুষ্ট হলেন দেবী। তাঁর অনুগ্রহে তারা লয়-তাল-মান-নাচ-গান থেকে শুরু করে সব রকম বিদ্যে আয়ত্ত করল। তারপর শুরু করল শিবের [illegible]। সন্তুষ্ট শিব এলেন বর দিতে। নাগরাজ বলল—প্রভু, যে রূপ, যে গুণ, নিয়ে যে বয়সে মদালসা মারা গিয়েছিল, সেই বয়সের সঙ্গে সেই

রূপ-গুণ নিয়ে সে যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মায়। আর প্রভু, আগের জন্মের স্মৃতি তার যেন ঠিক থাকে।

মহাদেব খুশি মনে নাগরাজকে সেই বর দিয়ে চলে গেলেন। নিজের প্রাসাদে ফিরে এল অশ্বতর। যথাসময়ে অশ্বতরের ঘরে মদালসারও হল নতুন জন্ম।

বাবার কথামত ব্রাহ্মণবেশী নাগবালকরা একদিন ঋতধ্বজকে গিয়ে বলল—বন্ধু, আমাদের বাবা তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। যাবে?

—সে কি কথা বন্ধু। বাবা যখন ডেকেছেন তখন কি না গিয়ে



থাকা যায়? আমার বাবা আর তোমাদের বাবার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? চল, এখনি যাব।

বলেই ঋতধ্বজ চলল তাদের সঙ্গে। মর্ত্যলোক ছেড়ে তারা ঢুকল পাতালে, তারপর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ছেড়ে বন্ধুরা যখন ফণা নিয়ে তাদের আসল রূপ ধরল, তখন ঋতধ্বজ জানতে পারল—এরা নাগ। কিন্তু তার জন্য কোন বিরক্তি বোধ করল না সে।

নাগরাজের কাছে আসতেই অশ্বতর নিজের ছেলের মতই স্নেহ-আদর করল তাকে। রাজপ্রাসাদে পড়ে গেল মহা ধুমধাম। একসঙ্গে বসে সব খানাপিনা হল। তারপর ফিরে যাবার আগে নাগরাজ বলল—পুত্র, কি পেলে তুমি খুশি হবে বল?

ঋতধ্বজ সবিনয়ে জানাল—আপনার স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি, এই তো আমার যথেষ্ট।

—বাবা ছেলেকে স্নেহ-ভালবাসা দেবে, এ আর নতুন কি পুত্র। এর ওপরেও আমি তোমায় কিছু দিতে চাই। বল কি নেবে? বলল নাগরাজ।

যা পেলে ঋতধ্বজ সব থেকে খুশি হতে পারত তা দেবার সামর্থ্য তো কারো নেই। তাই মনের কথা মনে চেপেই চুপ করে রইল সে।

ইতিমধ্যে চোখের ইশারায় নাগমেয়েরা অন্দর মহল থেকে মদালসাকে নিয়ে আসতেই নাগরাজ বলল—পুত্র, আমার এই মেয়েটিকে তোমায় দিলাম, তুমি নাও।

ঋতধ্বজ চোখ তুলেই দেখে, মেয়েটি তারই স্ত্রী সেই মদালসা, যে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। আর মদালসাও দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে তারই স্বামী বীর ঋতধ্বজ। নাগ-বালকেরা এসবের বিন্দুবিসর্গও জানত না। তারাও দেখে অবাক।

এবার সত্যি সত্যিই খুশি হল ঋতধ্বজ। মদালসাকে নিয়ে ফিরে এল রাজ্যে। শত্রুজিতের সে কি আনন্দ!

ওরা নাগরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময়, নাগরাজা বিশেষ করে তার ছেলেদের শুনিয়ে বললে—পৃথিবীতে সামর্থ্যের বাইরে বলে কোন কিছু নেই বাবা। নিষ্ঠা নিয়ে চেষ্টা করলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।



অলর্কের আত্মজ্ঞান

রাজা ঋতধ্বজের মহিষী মদালসার চতুর্থ পুত্র অলর্ক।

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর মেয়ে মদালসা সে সময়কার একজন বিদুষী মহিলা। সব শাস্ত্রেই তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। রাজা ঋতধ্বজও অবশ্য জ্ঞানে গুণে কম ছিলেন না। তবুও, সে সময়ে মদালসার সঙ্গে যেন কারো কোন তুলনাই ছিল না।

এঁদের ছিল চার ছেলে—বিক্রান্ত, সুবাহু, অরিমর্দন আর অলর্ক। প্রথম তিন ছেলের নাম রেখেছিলেন রাজা নিজে। আর শেষ ছেলেটির নাম রেখেছিলেন মদালসা।

বড় ছেলে বিক্রান্ত ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেই কেঁদে উঠল, কোলে তুলে নিয়ে ভোলাতে ভোলাতে বললেন—কাঁদছ কেন? কাঁদছ কেন খোকা? মোহে পড়েছ নিশ্চয়ই। তা নইলে কাঁদবে কেন? কে বলেছে তুমি বিক্রান্ত? তোমার তো কোন নামই নেই। শরীরের খাঁচায় আটকে পড়েছ বলে, কাঁদছ বুঝি? ভয় নেই।

রাজা শোনেন চুপ করে। ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে বিক্রান্ত। কি বুঝল কে জানে?

ছেলে বড় হয়। থাকে সবসময়ই মায়ের কাছে। আর শোনে কত কথা—দেখ বাছা, মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, বউ, বন্ধু জানবে সব মায়া। এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ, কি মরেছ। তাহলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না। মোহ খুবই সর্বনেশে। খুব সাবধান বাছা।

আরো একটু বড় যেই হল, সংসার ছেড়ে চলে গেল বনে তপস্যা করতে।

এর পরের ছেলে ভূমিষ্ঠ হতেই রাজা তার নাম রাখলেন সুবাহু। নাম শুনে মুচকি মুচকি হাসলেন মদালসা। সুবাহুও মায়ের কাছে থেকে আর ঐসব কথা শুনে শুনে যখন একটু বড় হল, বুঝল,

মমতায় পড়লে আর রক্ষে নেই। তাই তার আগেই বড় ভাই-এর মত সে-ও পালাল সংসার ছেড়ে।

ভূমিষ্ঠ হল তৃতীয় পুত্র। রাজা তার নাম রাখলেন অরিমর্দন। এবারেও মদালসা মুখ টিপে হাসলেন। সে-ও মদালসার কাছ থেকে আত্মার কথা শুনতে শুনতে আগের দু-ভাইয়ের মতই চলে গেল বনে।

রাজা ঋতধ্বজ দেখেন আর ভাবেন। তিন-তিনটে ছেলে হল অমন সুন্দর, ফুটফুটে। কিন্তু কেউ ঘরে থাকল না।

চতুর্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হতেই রাজা ঋতধ্বজ বললেন—মদালসা, আগে যখনই আমি ছেলেদের নাম রাখতে গিয়েছিলাম, তুমি হেসেছ। এবার, এর নাম আমি রাখব না, তুমিই রাখো।

শুনে মদালসা বললেন—আমি হেসেছিলাম বলে, আপনি যদি মনে দুঃখ পেয়ে থাকেন, ক্ষমা করবেন। আর আদেশ যখন করছেন, তখন আমিই না হয় এর নাম রাখলাম—অলর্ক।

রাজা বললেন—দুঃখের কথা নয় মদালসা। হেসেছিলে কেন, সেটাই আমার জানার ইচ্ছে।

—ওঃ, এই কথা? বললেন মদালসা—আচ্ছা রাজা, আপনি ছেলেদের যে ঐরকম সব নাম রেখেছিলেন, ওগুলোর কি মানে হয়।

—আমরা ক্ষত্রিয়। ঐ নামগুলোর মধ্যে তবু ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয় গন্ধ ছিল। আর তোমার দেওয়া এই অলর্ক! মেজাজের সঙ্গে বললেন রাজা।

শুনে একচোট খুব হাসলেন মদালসা। তারপর বললেন—আচ্ছা রাজা, আত্মার কোন মূর্তি আছে? আত্মার কোন শত্রু আছে?

—না, তা তো নেই। আত্মা ছাড়া আমাদের কারো দেহ দেহ-ই নয়। বললেন রাজা।

—তাহলে ঐসব নামের কি মানে হয়? নাম রাখলেই সেই



বিশাল আত্মাকে কি ছোট করে দেওয়া হয় না রাজা? বললেন মদালসা—আপনি যখন ছোট ছেলের নাম রাখতে বললেন—আমিও তাই নাম রাখলাম অলর্ক। জানি, এরও কোন মানে হয় না।

এর ওপর আর কি কোন কথা আছে। মদালসা যা বলেছেন তা যে দারুণ সত্য। তাই ঐদিকে আর না গিয়ে রাজা ঋতধ্বজ বললেন—মদালসা, তিনটি ছেলে আমাদের তোমার শিক্ষায় সন্ন্যাসী হয়ে গেল। আমাদেরও বানপ্রস্থে যাবার দিন এগিয়ে আসছে। সময় থাকতে কোন ছেলেকে যদি এই সিংহাসনে বসিয়ে না যাই তাহলে যে অধর্ম করা হবে।

কথাটা বুঝলেন মদালসা। তাই ছেলেকে তিনি সেভাবেই জ্ঞান দিলেন যাতে সে একজন সত্যিকারের গৃহী আর আদর্শ রাজা হতে পারে।

বয়স হলে ভাল একটা মেয়ে দেখে অলর্কের বিয়েও দিয়ে দিলেন রাজা।

এগিয়ে এল বানপ্রস্থের দিন।

অলর্ককে সিংহাসনে বসিয়ে মদালসাকে নিয়ে ঋতধ্বজ চলে গেলেন বনে বাকি জীবন তপস্যায় কাটাতে। যাবার সময় মদালসা আবার মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন ছেলেকে—বাবা, সব সময় মনে রেখো, রাজা হবে পদ্মফুলের মত, তবেই সে হবে প্রজাদের প্রিয়। শত্রুর কাছে হবে নির্মম। ভুলো না বাবা, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ চেয়ে থাকবে তোমার মুখ চেয়ে। এমন কিছু করবে না, যাতে তারা কষ্ট পায়। মন থেকে কাম, ক্রোধ, মোহ, দম্ভ, উচ্ছ্বাস, একেবারে দূর করে দিও। ওগুলো থাকলে, কখনই সুখী হবে না, বাবা। ধর্মপথে, ধর্মের অনুশীলন করবে। মিথ্যা কথা কখনো বলবে না, মিথ্যার আশ্রয় নেবে না। মনে রেখো, সংসারে বিপদ পদে পদে। একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ হবে। এইসব বলে ছেলেকে একটা সোনার আংটি দিয়ে বললেন—অলর্ক, এই আংটিটা রেখে দাও। যখন কোন বিপদে পড়ে কূল-কিনারা পাবে না, এই আংটির ভেতর খুব ছোট ছোট অক্ষরে কিছু লেখা আছে, মন দিয়ে পড়বে।

আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন ঋতধ্বজ-মদালসা। সিংহাসনে বসল অলর্ক।

মদালসার শিক্ষা সবটা বিফলে গেল না বটে, কিন্তু লোভ পেয়ে বসল অলর্ককে। সেই সঙ্গে মোহ। সে ভাবতে শুরু করল, এই বিশাল রাজ্য, এর যাবতীয় ধন-সম্পদ সবই তার। সে তার ইচ্ছেমত তা ভোগ করবে।

এমনি যখন অলর্কের মনের অবস্থা এসে দাঁড়াল, তখন একদিন তার মেজদাদা সুবাহু গিয়ে হাজির হলেন কাশীরাজের কাছে। বললেন—রাজা, অলর্ক যে সিংহাসনে বসে আছে, ন্যায্যত ঐ সিংহাসন আমার। কারণ আমিই বড়। আপনি অনুগ্রহ করে আমার রাজ্য আমাকে উদ্ধার করে দিন।

খুবই দাপট কাশীরাজের। সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠালেন অলর্কের কাছে। বলে পাঠালেন—অলর্ক যেন এখনই রাজ সিংহাসন তার দাদা সুবাহুকে ছেড়ে দেয়।

শুনে খুবই রেগে উঠল অলর্ক। জেগে উঠল ক্ষত্রিয়ের রক্ত। বলল দূতকে—গিয়ে তোমাদের রাজাকে বল গে, রাজা ঋতধ্বজ আমাকেই সিংহাসন দিয়ে গেছেন, সুবাহুকে নয়। তবে দিতে পারি, যদি সুবাহু এসে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানায়।

দূত ঠিক সেই কথাই গিয়ে শোনাল সুবাহুকে আর কাশীরাজকে। প্রার্থনা জানানো বা দান চাওয়া তো ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। জ্ঞানী হয়েও সুবাহু সেদিকে না গিয়ে কাশীরাজকে উত্তেজিত করে তুলল।

কাশীরাজও সামন্ত-রাজা আর সেনাদের নিয়ে অবরোধ করল অলর্কের রাজ্য। যারা ছিল অলর্কের স্বপক্ষে, তাদের কাউকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে প্রচুর ধন-দৌলত দিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নিলেন কাশীরাজ।

অলর্ক দেখল এরপর আর সম্মান বজায় রাখা আদৌ সম্ভব নয়। কি করবে সে। খুবই দিশেহারা হয়ে পড়ল। এমন সময় মনে পড়ে

গেল তার সেই আংটির কথা। চলে যাবার আগে মা মদালসা যে আংটিটা তাকে দিয়ে বলেছিল 'যখন কোন বিপদে পড়ে কূল-কিনারা পাবে না, এই আংটির ভেতর খুব ছোট ছোট অক্ষরে কিছু লেখা আছে। মন দিয়ে পড়বে।' সঙ্গে সঙ্গেই আংটিটা খুলে ফেলল অলর্ক। দেখল, সত্যি সত্যিই কি যেন সব লেখা রয়েছে। ভালভাবে দেখতে দেখতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল লেখাগুলো চোখের সামনে। দেখল, লেখা আছে :

'ত্যাগ করবে সব সঙ্গ, চাও যদি মঙ্গল।
শক্ত হলে সঙ্গ নেবে সাধুর চরণতল।।
তুমি মন থেকে দূর করবে কাম।
শক্ত হলে স্মরণ কর মুক্তিকাম।।'

লেখাটা পড়েই অলর্কের সেই ঝিমঝিম ভাবটা যেন মুহূর্তে কেটে গেল। নিজের মনেই বলে উঠল—মা! মাগো, মাগো, তুমি আমায় বাঁচালে।

এই সময় সহ্য পর্বতের এক গুহায় থাকতেন মহর্ষি দত্তাত্রেয়।

দত্তাত্রেয় ছিলেন মস্ত বড় একজন যোগী পুরুষ। এঁর জন্ম যেমন রহস্যময়, কাজও ছিল সেইরকম।

ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রিমুনির স্ত্রী অনুসূয়া। সতী-সাধ্বী রমণী। একবার অনুসূয়া দেবতাদের প্রিয় আর পৃথিবীর মঙ্গলজনক এক কাজ করলে ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এসেছিলেন তাঁকে বর দিতে। অনুসূয়া দুম করে বলে বসেছিল—আমার ইচ্ছে, তোমরা আমার ছেলে হও।

যিনি নিজে জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে ভগবান, তিনি তো আর নতুন করে জন্মাতে পারেন না। আবার অনুসূয়ার প্রার্থনা পূরণ না করাটাও ঠিক হবে না। বললেন—বেশ, তাই হবে।

এরপর অনুসূয়ার তিনটি ছেলে হয়েছিল—ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র, নারায়ণের অংশে দত্তাত্রেয়, আর মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা। এঁদের মধ্যে মহাযোগী সেজে দত্তাত্রেয় থেকে গিয়েছিলেন সবার মাঝে। আবার সবার মাঝে থেকেও এমনভাবে থাকতেন, সবাই কাছে ঘেঁষতেও পারত না। কখনো-বা ভয়ে, কখনো-বা ঘেন্নায় দূরে পালিয়ে যেত। যার মনের জোর খুব বেশি, সে-ই একমাত্র পারত তাঁর কাছে যেতে। আর গিয়ে গুছিয়ে ধরতে পারলেই সেই অবতার পুরুষ দত্তাত্রেয় তাঁর মনের সব দুঃখ-কষ্ট মুহূর্তে দূর করে দিতেন।

অলর্ক জানত তাঁকে। তাই কোন দিকে আর না তাকিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল সেই যোগীবরের পায়ে।

যোগীবরের অজানা কিছুই ছিল না। তবু জিজ্ঞেস করলেন—তোমার আবার কি হল? এমন করে পায়ে পড়লে কেন। ওঠ...ওঠ।

অলর্ক তখন আদ্যোপান্ত সব বলল যোগীবরকে।

শুনে দত্তাত্রেয় হো...হো করে হেসে উঠলেন—ঠিকই তো হয়েছে। তোমার যা পাওনা ছিল ঠিক মতই পেয়েছ।

—আমার পাওনা বলেছেন কেন প্রভু? একটু অবাক হয় অলর্ক।

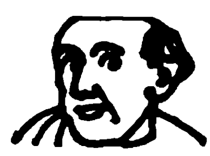
—কেন পাওনা হবে না অলর্ক। বিষয়-সম্পত্তিতে তোমার যদি লোভ জন্মায়, তাহলে তো দুঃখ পেতেই হবে।লোভ থেকে আসে মোহ, মোহ এলেই জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তখন সে আর কাউকেই নিজের মত করে ভাবতে পারে না। অহঙ্কার আসবে। ভাবতে শুরু করবে 'আমি বড়', 'আমার বাড়ি', 'আমি বীর।' আরে, কে বড়? কার বাড়ি? কে বীর? অলর্ক, তোমার ঘরের জানালা থেকে যখন আকাশকে দেখবে, তখন তার কতটুকু দেখবে? একটুখানি। ছাদে দাঁড়িয়ে তার চেয়ে নিশ্চয় আরো অনেক বড় দেখবে। তাই না? নিজেকে তেমনি ছাদের ওপর তুলে এনে দেখছ না কেন অলর্ক? বিষয়-সম্পত্তির জানালা দিয়ে কতটুকু দেখতে পাবে? কে তুমি অলর্ক, কে তোমার ভাই সুবাহু, আর কে-ই বা কাশীরাজ? সকলেই সে-ই আত্মা। অহঙ্কার হলেই আলাদা আলাদা। দেখবে। নইলে...

শুনতে শুনতে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে অলর্কের মুখ। সে মুখে আর সেই দুঃখ বা কষ্টের কোন ছাপই নেই।

দত্তাত্রেয়কে প্রণাম করে যোগশাস্ত্রের সারটুকু মনে গেঁথে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই অলর্ক ফিরে এল। গেল সোজা কাশীরাজ আর সুবাহুর কাছে। বলল—কাশীরাজ, তোমরা আমার যে কি উপকার করেছ, তা আর কি বলব? আমার পরম সৌভাগ্য যে শত্রুর-বেশে এসে তুমি আমার মোহ নাশ করেছ। এই রাজ্য, এই বিষয়-সম্পদ তুমি ভোগ কর ভাই। অথবা সুবাহুকেও দিতে পার। তোমাদের মত বন্ধু আমার আর দ্বিতীয় নেই।

অলর্কের কথা শেষ হতেই সুবাহু বুকে জড়িয়ে ধরল ভাইকে। বলল—যাক, আমি শান্তি পেলাম। জন্মসূত্রে আমরা সহোদর ভাই হয়ে জন্মেছিলাম। মায়ের শিক্ষায় আমরা সঠিক পথেই চলেছিলাম। তোমাকে বিপথগামী হতে দেখে কষ্ট হচ্ছিল, তাই কাশীরাজকে দিয়ে এ কাজ করতে হয়েছে। এখন আমি নিশ্চিন্ত। চললাম। ব্যাপারটা বুঝে কাশীরাজও অলর্ককে সম্মান দেখিয়ে চলে গেলেন।

আর অলর্ক! ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেও চলে গেলেন বনে যোগ-সাধনায়।



এক মনুর কাহিনী

প্রায় শেষ হয়ে এল স্বায়ম্ভুব মনুর কাল। স্বয়ং ব্রহ্মাই তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন, পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। স্বায়ম্ভুবও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন সে সব কাজ। ব্রহ্মার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে, যা কিছুর অভাব ছিল, তিনি তা পূরণ করে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকে যাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে তার জন্য গোটা পৃথিবীটাকে সাতটা ভাগে ভাগ করে, প্রতিটি ভাগকে আবার নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। ব্রহ্মার মনে মনে যেসব পরিকল্পনা ছিল, স্বায়ম্ভুব মনু হয়ে প্রত্যেককে নিজের শাসনের মধ্যে রেখে, বলতে গেলে, তা সবই করে গেলেন।

করতে করতেই কেটে গেল তাঁর প্রায় বারো হাজার দিব্য বছর, আমাদের পৃথিবীর বছরের হিসেবে প্রায় তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার

বছর। পৃথিবীতে জন্মালেই ভগবান তার একটা পরমায়ু ঠিক করে দেন। আর তাকে দিয়ে যা কিছু করাবার সেই সময়ের মধ্যেই করিয়ে নেন। মনুদের তাই তিনি পরমায়ু ঠিক করে দিয়েছিলেন বারো হাজার দিব্য বর্ষ। সেই মনু চলে যান। যাবার সময় প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে তাঁর সব সৃষ্টিকেই প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে যান। আসেন আর এক মনু ব্রহ্মার নির্দেশেই। তিনিই আবার চারদিকের অরাজকতা দমন করেন। নতুন করে আবার পৃথিবীকে সাজান। মানুষের জন্য আবার নতুন করে অনুশাসন তৈরি করেন, যা প্রত্যেকে মেনে চলতে বাধ্য হয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই এইভাবে চলে আসছে মনুর শাসন।

পৃথিবীর প্রথম মনু ছিলেন স্বায়ম্ভুব। তাঁর পরমায়ু প্রায় ফুরিয়ে এল বলে।

সেই সময়ে বরুণা নদীর তীরে অরুণাস্পদ নগরে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন অগ্নিদেবের উপাসক। যেমন দেখতে ছিলেন তিনি অপূর্ব সুন্দর, তেমনি মিষ্টি ছিল তাঁর স্বভাব। অতিথিসেবার মত তৃপ্তি যেন তাঁর আর কিছুতে ছিল না। অতিথিসেবা না করে তিনি জলগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না। কোনদিন স্বেচ্ছায় কোন অতিথি না এলে ডেকে ডেকে নিয়ে আসতেন, তার সেবার পরিচর্যা করতেন। তবে তৃপ্তি পেতেন।

এমনিভাবে যখন কাটছিল ব্রাহ্মণের দিন, এলেন এক অতিথি একেবারে হঠাৎ, সম্পূর্ণ অপরিচিত। তা হোক, অতিথি এসেছেন। ব্রাহ্মণের আনন্দ দেখে কে? সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে, কি করলে তাঁর তৃপ্তি হবে সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে পড়লেন। রাত হয়েছে। অতিথিও পরিশ্রান্ত। ব্রাহ্মণের সেবা-যত্নে মনে মনে খুব খুশি হলেন।

অতিথি সুস্থ হলে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন—মশাইয়ের বাড়ি কোথা? কোথা থেকে আসছেন এখন?

অতিথি বলল—আমার কোন ঘর-বাড়ি নেই। বলতে পারেন, গোটা পৃথিবীটাই আমার বাড়ি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

—গোটা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়ান! শুনে অবাক হন ব্রাহ্মণ।

—হ্যাঁ, সবই প্রায় আমার দেখা হয়ে গেছে। কত দেশ, পাহাড়, নদ-নদী যে দেখলাম, তার ইয়ত্তা নেই।

শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণের চোখের সামনেই যেন ভেসে উঠতে লাগল নানা দেশের, পাহাড়ের, নদ-নদীর ছবি। কেননা, পৃথিবী ঘুরে কোথায় কি আছে, তা দেখার প্রবল ইচ্ছে মনে মনে পোষণ করতেন ব্রাহ্মণ।

—আপনার বয়স তো দেখে মনে হচ্ছে খুবই অল্প—বললেন ব্রাহ্মণ—তা এরই মধ্যে এত জায়গা ঘুরলেনই-বা কিভাবে?

মৃদু হাসলেন অতিথি।

তারপর বললেন—যা দেখেছি তা এই বয়সের মধ্যে কারো দেখা সম্ভব নয় ঠিকই। তবে, আমি ঘুরেছি। সে আমার এক কৌশল আছে। ছ-ঘণ্টায় হাজার যোজন ঘুরি।

উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ—বলুন না, কি কৌশল? পৃথিবীটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। দয়া করে যদি বলেন, তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতাম।

—কৌশলটা আর কিছু নয়—বললেন অতিথি—গাছ-গাছড়ার মলম। পায়ে সেই মলম লাগালেই চলার গতি হাওয়ার মত বেড়ে যায়।

ব্রাহ্মণ এতদিন শুধু অতিথিসেবা করেই খুশি ছিলেন। কারো কাছ থেকে কিছু চান নি। এবার কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। অতিথিকে বললেন—দয়া করে ঐ মলম যদি আমাকে একটু দেন।

—কেন দেব না, নিশ্চয়ই দেব। বললেন অতিথি।

এই বলে ব্রাহ্মণকে মলম দিলেন, আর তা লাগানো এবং ঘুরে বেড়ানোর কৌশলও বলে দিলেন।

সকাল হল। অতিথি চলে গেলেন।

ব্রাহ্মণ ভাবলেন, মলম পায়ে লাগিয়ে ছ-ঘণ্টায় যখন হাজার যোজন (চার হাজার ক্রোশ) যেতে পারব, আর দিন থাকতে থাকতে বাকি ছ-ঘণ্টায় যখন নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে পারব, তখন আজ হিমালয় পর্বতটাই একবার ঘুরে আসা যাক।

এই ভেবে ব্রাহ্মণ পায়ে মলম লাগিয়ে চলতে শুরু করলেন। আর সত্যি সত্যিই দুপুরের মধ্যে পৌঁছে গেলেন হিমালয়ে।

এতদিন ব্রাহ্মণ শুধু হিমালয় সম্বন্ধে নানা কথা শুনেই এসেছিলেন—সিদ্ধ গন্ধর্ব কিন্নরেরা থাকে সেখানে। দিন রাত কত মিষ্টি সুরের গান ঘুরে ঘুরে বেড়ায় হিমালয়ে। কত রকমের সব গাছপালা, ঝরনা-নদী। এবার কিন্তু ব্রাহ্মণ সত্যি সত্যিই সব নিজের চোখে দেখলেন। যত দেখেন, ততই বাড়ে দেখার আগ্রহ। যত শোনেন কিন্নরদের মিষ্টি সুরের গান, ততই বেশি করে শুনতে ইচ্ছে জাগে মনে। প্রায় পাগলের মত ঘুরতে থাকেন এদিক-ওদিক, দেখতে থাকেন বড় বড় চোখে। কোথাও-বা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন, খেয়ালই থাকে না, দাঁড়িয়ে আছেন বরফের ওপর।

দেখার সাধ আর কিছুতেই মিটতে চায় না। এদিকে বেলাও পড়ে আসছে। সন্ধের আগেই আবার ফিরতে হবে বাড়িতে। সন্ধ্যা উপাসনা আছে, অগ্নিদেবের পূজা আছে, অতিথি সৎকার আছে।

কোন রকমে দেখার লোভকে দমন করে এবার বাড়িমুখো হতে গিয়েই দেখেন পায়ে সেই মলমটা আর নেই। বরফের জলে কখন যে সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে, তা খেয়ালই করেন নি।

এবার মহা সঙ্কটে পড়লেন ব্রাহ্মণ। মলমের দৌলতে এতখানি পথ তো অল্প সময়ের মধ্যে চলে এসেছিলেন, এখন সেই মলম নেই। সন্ধের আগে আবার এতখানি পথ পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছবেন কি করে? সন্ধের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে সন্ধ্যা উপাসনা হবে না, অগ্নিদেবের পূজা হবে না। নিত্যদিনের কাজ ঠিকমত করতে না পারলে যে দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

উপায় চিন্তা করতে করতে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলেন ব্রাহ্মণ।

এমন সময় বরূথিনী নামে এক অপ্সরা সেখান দিয়ে যেতে যেতে সুপুরুষ ব্রাহ্মণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণও ঘুরতে ঘুরতে তাকে দেখেই এগিয়ে এলেন তার কাছে। ভাবলেন—অগ্নিদেব নিশ্চয় আমার অপরিচিত এই জায়গায় মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

বললেন—ওগো মেয়ে, আমাকে সন্ধের আগে আমার বাড়ি পৌঁছে দাও না? এখানে এসেছিলাম আমি পায়ে এক মলম লাগিয়ে। মলমটা বরফের জলে ধুয়ে গেছে। পথও ঘুলিয়ে গেছে। অথচ সন্ধের আগে বাড়ি পৌঁছোতে না পারলে আমার সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমার বাড়ি অরুণাস্পদে। তুমি পারবে, দয়া করে আমাকে পথ দেখিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল না।

অপ্সরা বরূমিনীর মনে তখন অন্য চিন্তা।

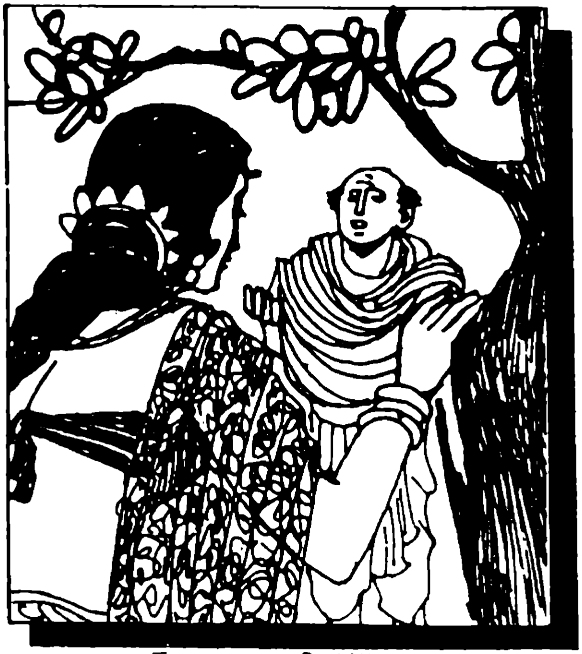
বরূমিনী বলল—তা অবশ্য আমি পারি। কিন্তু, বাড়ি নাই-বা গেলেন। এখানেও তো আপনার নিত্য কাজের কোন অসুবিধে হবে না। এটা হিমালয়—দেবভূমি। থাকতে আপনার ভাল লাগছে না?

—ভাল লাগলেও থাকতে পারব না, মেয়ে। অগ্নিদেব হলেন আমার গৃহদেবতা। না গেলে তাঁর পূজা হবে না। অতিথিরা ফিরে যাবে। আমার মহাপাপ হবে। দয়া করে তুমি আমায় নিয়ে চল।

সরল ব্রাহ্মণ বুঝতেই পারলেন না অপ্সরার চালাকি।

তাই দেখে, অপ্সরা এবার সরাসরি বলেই ফেললে—দেখ, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কিছুদিন তোমাতে-আমাতে এখানে ঘর বেঁধে থাকি। তারপর না হয়, তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

একথা শুনেই ব্রাহ্মণের ভুল গেল ভেঙে। দারুণ রেগে উঠলেন অপ্সরার ওপর—দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। তুই আমার চরিত্র নষ্ট করতে এসেছিস।



বলে সেখানে বসেই ব্রাহ্মণ কাঠ-কুঠো যোগাড় করে জ্বাললেন আগুন। একমনে ডাকলেন অগ্নিদেবকে—প্রভু, সত্যিই যদি আমার মনে কোন পাপ না থাকে, আমি যদি সব সময়ে সত্যপথেই চলে থাকি, তাহলে, দয়া করে আপনি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করুন। সূর্যদেব অস্ত যাওয়ার আগেই আমি যেন বাড়ি পৌঁছোতে পারি। অতিথিরা আমার মনোকষ্ট নিয়ে যেন ফিরে যেতে না পারেন।

দেখতে দেখতে সেই ব্রাহ্মণের শরীর যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়েই চলতে আরম্ভ করলেন। আর চলার সে কি গতি! বরূমিনী দেখল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চোখের আড়ালে চলে গেছেন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণকে না পেয়ে মনের দুঃখে অপ্সরা বসে পড়ল সেখানে। সব সময়ই তার চোখের সামনে যেন ভাসতে থাকল ব্রাহ্মণের ছবি। আর তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঠিক সেই সময়েই গন্ধর্ব কলি যাচ্ছিল আকাশ পথে সেখান দিয়ে। নীচে বরূমিনীকে দেখে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে নামল সে। অবাক হল তাকে সেই অবস্থায় সেখানে দেখে।

এক সময় কলি বিয়ে করতে চেয়েছিল অপ্সরা বরূমিনীকে। কিন্তু অপ্সরা মোটেই রাজি হয় নি। মুহ্যমান হয়ে বরূমিনীকে ওখানে ঐভাবে বসে থাকার কারণ বুঝতে পেরে, গন্ধর্ব কলিও নিল সুযোগ।

ইচ্ছে করলেই তো যে কোন রূপ ধরতে পারে এরা। তাই কলি করল কি, ঠিক সেই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে দাঁড়াল তার সামনে।

ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে দেখেই অপ্সরা খুব খুশি হয়ে উঠল।

ব্রাহ্মণবেশী কলি বলল—দেখ, যেতে যেতে ভাবলাম, কারো মনে কষ্ট দেওয়াটাও অধর্ম। তাই ফিরে এলাম।

আর কি? মনের ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। সুখে ব্রাহ্মণকে নিয়ে বিহার করে বেড়াতে লাগল চারদিকে। বিহার করত বটে তার সঙ্গে, কিন্তু চোখের সামনে অপ্সরার সব সময়ই ভাসত ব্রাহ্মণের সেই সূর্যের আলোর মত জ্বলজ্বলে শরীরটা।

বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর বরূমিনী হল সন্তান-সম্ভবা। ব্রাহ্মণবেশী গন্ধর্ব কলি এবার অপ্সরাকে ছেড়ে চলে গেল।

যথাসময়ে অপ্সরার যখন ছেলে হল, দেখতে হল ব্রাহ্মণের ঠিক সেই তেজের মত। টকটকে রং। শরীর দিয়ে চারদিকে যেন ঠিকরে পড়ছে সূর্যের কিরণ। ছুটে দেখতে এল গন্ধর্ব, কিন্নর—যে যেখানে ছিল, সবাই। অপ্সরা তার নাম রাখল স্বরোচ (স্ব=নিজের; রোচ=কিরণ)।

দিন যায়, বড় হয় স্বরোচ। যত বড় হয়, ততই দেখতে যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধিতেও প্রখর হয়ে ওঠে।

স্বরোচ এখন যুবক। শাস্ত্র আর অস্ত্র, দুটোতেই এখন সে সমান দক্ষ। হিমালয়ের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্তে। ভয়-ডর কি জিনিস, তা জানেই না।

মন্দর পর্বতে একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বরোচ। এমন সময় শুনতে পেল, একটা মেয়ে যেন প্রাণভয়ে চীৎকার করছে—'কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও'। শুনেই সেই আর্তনাদ লক্ষ্য করে ছুটল স্বরোচ। গিয়ে দেখল, ভয়ে ফ্যাকাশে মুখ, ঠকঠক্ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে একটা মেয়ে।

স্বরোচকে দেখেই যেন একটু সাহস পেল মেয়েটি। বলল—দয়া করে আপনি আমাকে রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচান। ঐ শুনুন, গর্জন করতে করতে রাক্ষসটা এসে পড়ল বলে।

—কে তুমি? রাক্ষসই বা তোমার পিছু নিল কেন? জিজ্ঞেস করে স্বরোচ।

মেয়েটি বলল—আমার নাম মনোরমা। আমি বিদ্যাধর ইন্দীবরের মেয়ে। বিভাবরী আর কলাবতী নামে আমার দুই সখীকে নিয়ে একদিন কৈলাস পর্বতে বেড়াতে গিয়ে এক মুনিকে দেখলাম বসে আছেন। হাড়-ডিগডিগে চেহারা, চোখ দুটো ঢোকা। দেখে আমি তাকে উপহাস করেছিলুম। তিনিও রেগে উঠে আমাকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, 'তোকে রাক্ষসে খাক্'। দুই সখী আমার তখন মুনিকে বলে উঠেছিল, 'তুমি কিরকম মুনি, রাগ দমন করতে পার না।' তাই শুনে তিনি আরও রেগে তাদেরও অভিশাপ দিয়ে বসলেন। বিভাবরীকে বললেন, 'তোর সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ হোক' আর কলাবতীকে

বললেন, 'তোর ক্ষয় রোগ হোক'। প্রথমে ভেবেছিলাম, সব বাজে। তা সত্যি সত্যিই বিভাবরীর সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল কুষ্ঠতে। আর কলাবতীরও হয়ে গেল ক্ষয় রোগ। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা রাক্ষস হাঁ করে এল আমায় খেতে। প্রাণভয়ে কৈলাস থেকে ছুটতে ছুটতে এসেছি এই মন্দরে। তিন দিন হল। আর কত ছুটব।

ইতিমধ্যে খুব কাছাকাছি এসে গেছে রাক্ষসের গর্জন।

—ঐ এল বলে, বলল মনোরমা—আমার কাছে মারাত্মক একটা অস্ত্র আছে। আমি দিচ্ছি। মোক্ষম অস্ত্র। রাক্ষসটাকে লক্ষ্য করে আপনি মারুন। আমায় বাঁচান।

এই বলে লুকানো জায়গা থেকে ভারি সুন্দর দেখতে একটা অস্ত্র বের করে দিল সে।

স্বরোচ জিজ্ঞেস করলে—এ অস্ত্র তুমি পেলে কোথা থেকে?

মনোরমা বলল—ভগবান রুদ্রদেব স্বায়ম্ভুব মনুকে এই অস্ত্র দিয়েছিলেন। মনু এটি আবার দিয়েছিলেন বশিষ্টদেবকে। বশিষ্টদেবের কাছ থেকে আমার দাদু চিত্রায়ুধ এটি পেয়েছিলেন বিয়ের যৌতুক হিসেবে। অস্ত্রবিদ্যা শেখবার সময় সেখান থেকেই আমি এটি পেয়েছি।

সেই দারুণ অস্ত্রের সব কলা-কৌশল জেনেও মনোরমা তা কিন্তু ছাড়তে না পেরে তুলে দিল স্বরোচের হাতে।

ইতিমধ্যে রাক্ষস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মনোরমার ওপর। বিকট হাসিতে পাহাড় কাঁপিয়ে বলল—এবার পালাবি কোথায়? আমি যাকে খেতে চাইব, সে কি পালাতে পারে?

মেয়েটি স্বরোচের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত আর্তনাদ করে উঠল—বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।

স্বরোচ কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। ঠিক করল আগে থেকে বাধা দিলে মুনির অভিশাপ ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেটা ঠিক হবে না। তবে প্রাণে মরতে নিশ্চয়ই দেব না।

রাক্ষস এবার যখন হাঁ করে খেতে উদ্যত হল, সঙ্গে সঙ্গে স্বরোচ সেই মারাত্মক অস্ত্র তুলে ধরল তাকে মারবে বলে। অস্ত্র দেখে রাক্ষসও সঙ্গে সঙ্গে মনোরমাকে ছেড়ে দিয়ে স্বরোচকে বলল—দয়া করে ঐ অস্ত্র ছাড়বেন না। আমায় মারবেন না। আমি ঠিক রাক্ষস নই। আপনি ঐ অস্ত্র দেখিয়ে আমাকে আজ শাপমুক্ত করলেন।

রাক্ষসের কথা শুনে মনোরমাও যেমন অবাক, তেমনি কৌতূহল জাগল স্বরোচের।

—আমিই এই মনোরমার বাবা, বিদ্যাধর ইন্দীবর। বলল রাক্ষস।

মনোরমা শুনে তো আরও অবাক।

—ব্রহ্মমিত্র মুনিকে আপনি জানেন কিনা জানি না। অথর্ববেদে সুপণ্ডিত। আর আয়ুর্বেদে অসাধারণ জ্ঞান। আমি মুনিবরের কাছে গিয়েছিলাম আয়ুর্বেদ শিখতে। যতবার গেলাম, ততবারই তিনি ফিরিয়ে দিলেন। আমারও জেদ চাপল, শিখবই। তাই তিনি যখন তাঁর শিষ্যদের শেখাতেন, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেও তা শুনে শুনে শিখে ফেললাম। একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে মনে কৌতুক জাগল, হেসেও ফেললাম। হাসতেই ধরা পড়ে গেলাম মুনির কাছে। মুনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়ে বসলেন 'রাক্ষসের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বিদ্যে চুরি করছিস আবার আমাকে হেসে উপহাস করছিস? যা, তুই রাক্ষস হয়ে থাকবি। যা শিখেছিস, তা সব ভুলে যাবি'। বলল রাক্ষসরূপী ইন্দিবর—আমি তখন ভয়ে মুনির পা জড়িয়ে ধরেছিলুম। রাগ কমতে মুনি বলেছিলেন, মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা হবেই। সাত দিনের মধ্যে রাক্ষস তোমাকে হতেই হবে। তবে যেদিন নিজের ছেলে মেয়েকে খাবার ইচ্ছে তোমার জাগবে, সেই সময় যদি কোন দিব্য অস্ত্র দেখ, তাহলে তুমি যেমন ছিলে, আবার তেমনিই হবে। যা শিখেছ তাও তোমার মনে থাকবে।

ইতিমধ্যে এত যে কাণ্ড ঘটে গেছে, মনোরমা এসবের কিছুই জানত না। এখন বাবাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরল।

ইন্দীবর বলল—আপনি আমায় শাপমুক্ত করলেন তাই আমি আপনাকে যৌতুক দিতে চাই। আমার মেয়েকে আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি আর যৌতুক হিসেবে যে আয়ুর্বেদ আমি শিখেছি, সেই জ্ঞান আপনাকে দান করছি।

এই বলে বিদ্যাধর, ইন্দীবর স্বরোচকে আয়ুর্বেদের জ্ঞান দিয়ে মেয়েকে যেই সম্প্রদান করতে যাবে বেঁকে বসল মেয়ে। বলল—আমারই জন্য আমার দুই সখী অভিশাপে মরছে। তাদের ছেড়ে নিজের সুখ আমি চাই না।

শুনে স্বরোচ বলল—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, যে বিদ্যে আমি আয়ত্ত করেছি, তা দিয়ে তোমার সখীদের ভাল আমি করে তুলবই।

বিয়ে হয়ে গেল স্বরোচের সঙ্গে মনোরমার। তারপর দুজনে এল সেখানে, কুষ্ঠ আর ক্ষয়রোগে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিল তার দুই সখী। আয়ুর্বেদে অসাধারণ তখন জ্ঞান হয়ে গেছে স্বরোচের। অল্প দিনের মধ্যেই দুজনকে নীরোগ করে তুলল।

সুস্থ হয়ে উঠে বিভাবরী বলল—সখীকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব। আমাকেও আপনি মনোরমার সঙ্গেই থাকতে দিন। পশু-পাখিরা নানারকম স্বরে নিজেদের মধ্যে কি যে বলে, সে বিদ্যে আমি জানি। আমি আপনাকে সেই বিদ্যে দান করছি।

স্বরোচও রাজি হয়ে বিভাবরীকেও বিয়ে করে ফেলল। আর স্বরোচ রহস্যও শিখে নিল।

কলাবতী তখন বললে—দুজন সখীই আমার থেকে গেল আপনার সঙ্গে। আমি একা কোথায় যাব? তাছাড়া আমি বুঝতেই পারছি, আমার আর কোথাও যাবার দরকার নেই। আপনিই আমার স্বামী স্বরোচ। বলুন, আপনি স্বরোচ কিনা?

মনে মনে খানিকটা অবাক হলেও স্বরোচ বেশ কৌতুক বোধ করল। বলল—আমার নাম স্বরোচ ঠিকই। কিন্তু ঐ যে বললে, আমি তোমার স্বামী হব, সেটা কিরকম।

—তাহলে শুনুন। বলল কলাবতী। আমার বাবা হলেন ব্রহ্মর্ষি পর। আর মা ছিলেন অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলা। আমার জন্মের পর মা আমায় ফেলে রেখে চলে গেলে এক গন্ধর্ব আমাকে লালনপালন করেছিল। যখন বড় হয়ে উঠলাম, অলি নামে এক অসুর আমাকে বিয়ে করতে চাইলে গন্ধর্ব 'না' করে দিয়েছিল। তাতে সেই রাক্ষস গন্ধর্বকে মেরে ফেলে। আমি দুঃখে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, তখন মহাদেবের স্ত্রী সতী আমাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন, ও কাজ কোরো না। অষ্টনিধির জ্ঞান আমার কাছ থেকে নিয়ে রাখো। স্বরোচ হবে তোমার স্বামী। তার ছেলে হবে মনু।

মহাদেবীর আদেশ। এর ওপর তো আর কথা চলে না। মনোরমা আর বিভাবরী, দুজনেই সম্মতি জানিয়ে দিল। স্বরোচ তাকেও বিয়ে



করে ফেলল।

তিন স্ত্রী নিয়ে স্বরোচের দিন কাটে এখানে-ওখানে-সেখানে, মহা আনন্দে। কেটে গেল একশটা বছর। ঘুরতে ঘুরতে কখনো কোন সরোবরের জলে ভেসে বেড়ানো বালি হাঁসের মুখে, কখনোও কোন হরিণের মুখে শোনে অনেক কথা। তারা বলে—একজন পুরুষমানুষের আবার তিন স্ত্রী কি? স্বরোচ স্ত্রীদের বিদ্যের কাছে নিজেকে বিক্রি করে তাদের চাকর বনে আছে। মনে মনে ধিক্কার আসে। কিন্তু তাদের ছেড়ে থাকতেও পারে না। এইভাবে কেটে গেল আরো একশ দু-বছর। মনোরমার এক ছেলে হল, নাম বিজয়। বিভাবরীর ছেলে হল মেরুনন্দ। আর কলাবতীর হল প্রভাব নামে ছেলে। বড় হলে তাদের সকলকে স্বাবলম্বী করে দিয়ে স্বরোচ আবার স্ত্রীদের নিয়ে মেতে উঠল, ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একদিন হাতে ধনুক নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বরোচ। কোথা থেকে হঠাৎ ছুটে এল এক হরিণী। বলল—তীর দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুন। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

স্বরোচ তো অবাক। তাকে দেখে কোথায় সব শিকার পালায়। আর এই হরিণী...! ব্যাপার কি?

—কেন? তোমাকে মারব কেন?

—হয় আপনি আমাকে বিয়ে করুন, নয় মারুন। বলে হরিণী।

—তুমি হরিণ, আমি মানুষ। বিয়ে হয় নাকি?

—আমাকে আপনি স্পর্শ করুন। বলে হরিণী।

কৌতূহলের বশে তার গায়ে হাত ঠেকাতেই দেখে স্বরোচ হরিণী কোথায়, অপরূপা এক রমণী।

—কে তুমি? বিস্মিত হয় স্বরোচ।

—আমি বনদেবী। এই বনের দেবতা আর দেবগণ আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে, আমি যেন পৃথিবীর ভাবী অধিপতি মনুকে তুলে দিই তাঁদের হাতে। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। বলল সেই রমণী।

এরপর আর কি বলবে স্বরোচ!

যথাসময়ে বনদেবীর গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হল এক শিশু—যেমন সোনার রং, তেমনি তেজ। স্বরোচ তার নাম রাখলেন দ্যুতিমান। আকাশে দেবতারা সানন্দে বাজাল নানা বাজনা।

স্বরোচ এরপর তার তিন স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল তপস্যায়।

পৃথিবীতে শুরু হল দ্বিতীয় মনুর আধিপত্য। স্বরোচের ছেলে বলে দ্যুতিমান সকলের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন স্বারোচিষ নামে।



আর এক মনুর কাহিনী

স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে উত্তানপাদ।

এই উত্তানপাদের ছিল দু-ছেলে—ধ্রুব আর উত্তম।

ধ্রুব ছিলেন মস্ত বড় একজন তপস্বী। যার ফলে তিনি হয়েছিলেন ধ্রুবলোকের অধিপতি। শৌর্যে, বীর্যে উত্তমও কিছু কম ছিলেন না।

উত্তানপাদের পর উত্তম হয়েছেন পৃথিবীর রাজা। প্রজাদের সুশাসনেই রেখেছেন তিনি। সকলে তাঁকে ভালও বাসেন। কিন্তু উত্তমের মনে খুব একটা শান্তি ছিল না।

উত্তম বিয়ে করেছিলেন বভ্রুর মেয়ে বহুলাকে। তাকে রানীর যথাযোগ্য মর্যাদাও দিতেন উত্তম। কিন্তু বহুলা ছিল যেন কেমন কেমন। কোন মতেই সে রাজাকে সহ্য করতে পারত না। মুখে কিছু বলত না বটে। কিন্তু, আচারে-আচরণে, হাবে-ভাবে বেশ ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিত যে রাজা উত্তমকে সে একরকম ঘেন্নাই করে।

প্রথম প্রথম উত্তম এসব গায়ে মাখতেন না। রানী যাই করুক, সহ্য করে চলতেন। কিন্তু একদিন আর সহ্য করতে পারলেন না।

অতিথি রাজাদের নিয়ে মজলিশে বসেছেন উত্তম। অনেক ডাকাডাকির পর অতিথি রমণীদের মাঝে যদিও বহুলা এল, কিন্তু এমন হাবভাব দেখাল যে অতিথিদের কাছে তা খারাপ দেখাল। তাই উত্তম রাজা আর থাকতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন প্রহরীকে। বললেন—যাও, আমার হুকুম এই মহিলাকে কোন গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসো।

মহিষী বলে একটু ইতস্তত করলেও, কি আর করে প্রহরীরা। রাজার আদেশ, বাধ্য হয়েই বহুলাকে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল বনে।

উত্তমের মনে কষ্ট হলেও করার কি আছে? নিত্য অশান্তি ভোগ করার চেয়ে স্বস্তি ভাল। তিনি তো আর ইচ্ছে করে তাকে তাড়িয়ে দেন নি। সে স্ত্রী হয়ে যদি ভাল ভাবে ঘর করতে না চায়, মনটাকে যদি সব সময় কুটিল করে রাখে, তবে কি করতে পারেন তিনি?

রানী নেই। মনটা একটু খারাপ হলেও রাজকার্যে কিন্তু কোন অবহেলা ছিল না রাজা উত্তমের।

একদিন রাজসভায় বসে উত্তম, এমন সময় এলেন এক ব্রাহ্মণ।

এসেই বললেন—গতকাল রাতে আমার ঘর থেকে আমার স্ত্রীকে কে চুরি করে নিয়ে গেছে। আপনি আমার স্ত্রীকে খুঁজে এনে দিন।

ব্রাহ্মণের আর্জি শুনে রাজা পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। বললেন—কে নিয়ে গেছে বা যেতে পারে, না বললে কোথায় খুঁজব বলুন। তাছাড়া আপনার স্ত্রীকে আমি কখনো দেখি নি, দেখতে কেমন তাও জানি না। চিনব কেমন করে?

ব্রাহ্মণ বললেন—কে নিয়ে গেছে, চুরি করেছে, তা যদি

জানতেই পারব, তাহলে আগে আপনার কাছে আসব কেন? আপনি রাজা। আমাদের রক্ষক। তার জন্য আপনি রাজস্ব নেন। তাই আমরা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি। তা সত্ত্বেও যদি চোরে চুরি করে, তাহলে আপনি কি রকম রাজা? আমরা যদি নিরাপদেই থাকতে না পারলাম, রাজস্ব দেব কেন? ঘরের দরজা খুলে যে চোরে নিয়ে গেছে, তাও নয়। দরজায় যেমন খিল দেওয়া ছিল, সকালে দেখি, তেমনিই আছে, অথচ আমার স্ত্রী নেই। আপনি যখন রাজা, তখন এভাবে কে চুরি করতে পারে তা আপনিই জানেন।

কথাগুলো কাঠখোট্টার মত শোনালেও একেবারে সত্যি কথা। প্রতিবাদ করা যায় না। তাই রাজা উত্তম চুপ করেই রইলেন।

—জিজ্ঞেস করলেন না, আমার স্ত্রীকে কেমন দেখতে। এরপর বলল ব্রাহ্মণ—একেবারে কুৎসিত দেখতে। বিশাল লম্বা, ডিগডিগে, মুখখানা একখামচা, কোটরে চোখ। আর কথা যখন বলে, তখন মনে হয় যেন কাক ডাকছে। মেজাজও তেমনি চড়া। আর বয়স? বড় জোর ষোল-সতেরো হবে।

চেহারার আর স্বভাবের বর্ণনা শুনে রাজা উত্তম বললেন—একটা কথা বলব, ব্রাহ্মণ?

—বলুন।

—আপনার স্ত্রীকে যেমন দেখতে আর তার স্বভাব যেমন বললেন, তাতে তো মনে হয় না, আপনি খুব সুখে আছেন। স্ত্রী যদি সুন্দরী আর স্বভাব যদি মিষ্টি না হয়, তাহলে কি সংসারে শান্তি থাকে? অমন মেয়ে যে চুরি গেছে, ভালই হয়েছে। আপনি বরং ভাল সুলক্ষণা মেয়ে দেখে আবার একটা বিয়ে করুন।

শুনেই ব্রাহ্মণ গেলেন রেগে। বললেন—হোক সে কুলক্ষণা। আমি যখন তাকে বিয়ে করে এনেছি, তখন সে আমার স্ত্রী। আমি ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র মেনে চলি। শাস্ত্রে আছে, স্ত্রীকে সব সময়ই রক্ষা



করবে। তার যেন অসম্মান কখনো না হয়। তাহলে অধর্ম হবে। আপনি বিচক্ষণ রাজা হয়ে এমন কথা বলেন কি করে? আপনি আমার ঐ স্ত্রীকেই খুঁজে এনে দিন।

এরপর রাজার আর কিছু বলার নেই। বাধ্য হয়েই রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যাবেন, কোথায় খুঁজবেন, কিছুই জানেন না। তবু বেরোতে হল।

এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে রথ নিয়ে উত্তম এলেন এক বনের মধ্যে। এসেই দেখলেন সুন্দর এক আশ্রম। একজন মহামুনির পাশে বসে আর একজন মুনি।

রথ থেকে নামতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন মহামুনি। পাশের মুনিকে ফিসফিস করে বললেন—রাজা আসছেন, অর্ঘ্য নিয়ে এসো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের মুনিও তেমনি ভাবেই মহামুনিকে বললেন—রাজা কি অর্ঘ্য পাবার যোগ্য? ভেবে দেখুন। সঙ্গে সঙ্গে মহামুনিও বলে উঠলেন—না, ঠিক আছে।

দু-জনের মধ্যে এই ফিসফিস কথাবার্তা কিন্তু রাজার নজর এড়াল না। এগিয়ে যেতেই মহামুনি তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে বসতে বললেন। বিশেষ কোন কিছুই যে করলেন না, তা-ও দেখলেন।

রাজাও প্রণাম জানিয়ে বললেন—মুনিবর, আপনার কাছে এক বিশেষ কারণে আমি এসেছি।

মহামুনি বললেন—বলুন।

—আমার রাজত্বে এক ব্রাহ্মণ-পত্নী চুরি গেছে। তাকে খুঁজে খুঁজতেই এখানে এসে আপনার দর্শন পেলাম। আমি জানি মুনি-ঋষিরা রাজা এলে তাঁকে অর্ঘ্য দেন, যথাযোগ্য মর্যাদা দেন। আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আপনিও যেন উৎসুক হয়েও চুপ করে গেলেন। দয়া করে বলুন, এমন কি অপরাধ আমি করেছি যে এই প্রথম আপনার আশ্রমে এসে আমি তা পেলাম না।

মহামুনি বললেন—আমরা ত্রিকালজ্ঞ। চোখ না বুজেও আমরা সকলেরই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। তবুও প্রথমে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তা আমার যে এই সঙ্গী, ইনিও আমারই মত। আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তাই আমি চুপ করে গেলাম। আপনি উত্তানপাদের ছেলে। অবশ্যই অর্ঘ্য পাবার যোগ্য। কিন্তু, রাজা ধর্মের রক্ষক হয়ে যদি অধর্ম করেন, তাহলে কেমন করে তিনি অর্ঘ্য পাবেন?

—কি অধর্ম আমি করেছি, মহামুনি?

—ধর্ম সাক্ষী রেখে যাকে আপনি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করে এনেছিলেন, তাকে পরিত্যাগ করে অধর্ম করেন নি? বলবেন, সে আপনার অবাধ্য ছিল। তবুও সে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী। যে ব্রাহ্মণ পত্নীর খোঁজে আপনি বেরিয়েছিলেন, তার স্বভাবও তো ভালো নয়। তবু ব্রাহ্মণ তো তাকে ত্যাগ করেন নি।

রাজা উত্তম এই প্রথম ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেলেন।

এবার জিজ্ঞেস করলেন—দয়া করে বলবেন, কোথায় গেলে আমি সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীকে পেতে পারি? কে তাকে চুরি করেছে?

মহামুনি বললেন—উৎপলাবত বনে তাকে দেখতে পাবেন। অদ্রির ছেলে রাক্ষস বলাক তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ওখানে আটকে রেখেছে।

মুনিকে প্রণাম জানিয়ে রাজা উত্তম তক্ষুণি রথ ছুটিয়ে দিলেন উৎপলাবত বনের দিকে।

অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গিয়ে দেখলেন, কুৎসিত দেখতে একটা মেয়ে বসে বসে বেল খাচ্ছে। ব্রাহ্মণ যেমন যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন রাজা মিলিয়ে দেখলেন, এই সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী। তারপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাগো মেয়ে, তোমার পরিচয় কি? এখানে কেমন করে এলে? তুমি কি বিশালের ছেলে ব্রাহ্মণ সুশর্মার স্ত্রী?

হঠাৎ মেয়েটি রাজাকে দেখে চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল, বুঝি আবার কোন উৎপাত এল।

তার হাবভাব দেখে রাজা তাকে অভয় দিয়ে বললেন—আমি রাজা উত্তম। তোমার কোন ভয় নেই।

এবার মুখ খুলল ব্রাহ্মণী। বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিই সেই মেয়ে। রাতে ঘুমোচ্ছিলাম। রাক্ষসটা চুরি করে এনে এখানে আটকে রেখেছে। আমার কোন অনিষ্টও করছে না, আবার খেয়েও যে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে, তা-ও দিচ্ছে না।

—রাক্ষসটা এখন কোথায় আছে, বলতে পার?

—এই বনের ভেতরেই, শেষ দিকে আছে। গেলেই দেখতে পাবেন। এই বলে ব্রাহ্মণী রাজাকে বনে ঢোকার পথ দেখিয়ে দিল।

রাজা গিয়ে দেখেন, সত্যি-সত্যিই রাক্ষস বসে আছে সপরিবারে।

রাজাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রাক্ষস। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। অর্ঘ্য এনে দিল। আসন পেতে দিয়ে বলল—আমার কি সৌভাগ্য যে রাজা নিজে এসেছেন আমার ডেরায়। দয়া করে বসুন। আমি আপনার চাকর। আদেশ করুন, আমায় কি করতে হবে।

রাজা বললেন—অতিথি সৎকার তো ভালভাবেই করলে, সেদিকে দেখছি তোমার জ্ঞান টনটনে। তা বলাক, ঐ ব্রাহ্মণ-পত্নীকে চুরি করে এনে আটকে রেখেছ কেন? তোমার এমন সুন্দরী স্ত্রী থাকতে তুমি যে কুৎসিত ব্রাহ্মণ-পত্নীকে বিয়ে করবে না, সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাদের জাত-ধর্মও তো পালন কর নি দেখছি। ব্যাপার কি?

শুনে রাক্ষস বলাক বলল—রাজা, আমরা মাংসখাদক রাক্ষস নই। সে জাতের রাক্ষস আলাদা। আমরা মানুষের স্বভাব খাই। আর তাই খেয়েই আমরা বেঁচে থাকি। ব্রাহ্মণ বড় শাস্ত্র মেনে চলেছেন। যেখানেই আমরা যাই না কেন, ব্রাহ্মণ যাগ-যজ্ঞ করে, মন্ত্র পড়ে আমাদের খালি বাধা দেন। তাই ইচ্ছে করেই তাঁর স্ত্রীকে আমি চুরি করে এনেছি। এতে মন তাঁর চঞ্চল হবে। আর ধর্মপত্নী না থাকার জন্য যে কাজই করুন, তার সুফল পাবেন না।

রাক্ষসের মুখেও ঘুরে-ফিরে সেই একই কথা শুনলেন রাজা উত্তম। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনও বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে বললেন—শোন বলাক, ঐ ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভেতরটা বড় কর্কশ। তুমি ঐ কর্কশ স্বভাবটা খেয়ে, ওকে নিরাপদে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বলাক বলল—বেশ, তাই হবে। আর কি আদেশ বলুন?

—এখন আর কিছু নয়। এরপর আমি যখনই তোমাকে মনে মনে ডাকব, তুমি অবশ্যই আমার কাছে আসবে। বললেন রাজা।

—নিশ্চয়ই।

দেখতে দেখতে রাজার চোখের সামনেই খুবই সুন্দর স্বভাবের হয়ে উঠল ব্রাহ্মণ-পত্নী। বলাক তাঁকে নিয়ে রেখে আসতে চলেও গেল।

রানীর জন্যে এবার রাজার মনও খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। তাই রাজধানীতে না ফিরে রাজা উত্তম আবার এসে হাজির হলেন মহামুনির আশ্রমে। প্রণাম জানিয়ে বললেন—মুনিবর, বুঝতে পেরেছি, কত বড় অধর্ম আমি করেছি। স্ব-ইচ্ছায় অবশ্য করি নি। করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন দয়া করে বলুন। রানী আমার বেঁচে আছে তো? বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম। বাঘ-সিংহে খেয়ে ফেলে নি তো? কোথায় গেলে তাকে পাব।

মহামুনি বললেন—তুমি নিশ্চিন্তে থাক রাজা, রানী তোমার বেঁচেই আছেন। বাঘে-সিংহে খায় নি। বনে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখে নাগরাজ কপোতক তাকে লোভ দেখিয়ে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল তাকে বিয়ে করবে, যদিও মনোরমা নামে তার এক স্ত্রী আছে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল তারই মেয়ে নন্দা। বাপের মতলব বুঝতে পেরে সে রানীকে লুকিয়ে রাখল নিজের ঘরে এমন ভাবে যে, কেউ খুঁজে পেল না। নাগরা রেগে অভিশাপ দিয়ে মেয়েকে বোবা করে দিয়েছে। রানী এখনো সেখানে সেভাবেই আছে। যাও, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে এনে নিজের ধর্ম রক্ষা কর।

রাজা উত্তম মুনিকে প্রণাম করে রাজধানীতে ফিরে গেলেন সুশর্মা ব্রাহ্মণের কাছে। পত্নীকে রাজার দৌলতে ফিরে পেয়ে ধর্ম রক্ষা হয়েছে বলে ব্রাহ্মণ খুব কৃতার্থ। খাতিরও করলেন খুব।

তখন রাজা বললেন—আপনার ধর্ম না হয় রক্ষা হল। এখন আমার ধর্ম আমি কেমন করে রাখি।

—কেন?

—আপনি তো জানেন না, মনের মিল হত না বলে আমি রানীকে পরিত্যাগ করেছি।

—খুব অন্যায় করেছেন। বলল ব্রাহ্মণ।—জানেন কি তিনি এখনও সুস্থ এবং জীবিত আছেন কিনা?

—সম্প্রতি জেনেছি, সুস্থ এবং জীবিত অবস্থায় পাতালে আছে। কিন্তু উদ্ধার করে নিয়ে এলে আবার তো সেই মনোমালিন্য হবে। আমরা কেউই শান্তি পাব না।

—ও সব গ্রহের ফের। আপনি যান, নিয়ে আসুন, নিজের ধর্ম রাখুন। আমি যাগ-যজ্ঞ করে সব ঠিক করে দেব।

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে এবার রাজা মনে মনে ডাকলেন বলাককে। সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষস এসে হাজির—বলুন রাজা, কি করতে হবে?

—পাতালে নাগরাজ কপোতকের ঘরে তোমাদের রানী বন্দিনী



হয়ে আছে। তাঁকে উদ্ধার করে আন।

যেমন কথা, তেমন কাজ।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাজা উত্তম দেখলেন রানী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। দু-চোখে জল। বলছে—আমায় ক্ষমা করুন।

এ যেন আর সে রানীই নয়।

রাজা বললেন—ও কথা বোলো না রানী।

রানী বলল—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

—কি বল।

—নাগরাজ কপোতকের মেয়ে নন্দা, আমার সখী, আমারই জন্য তার বাবার শাপে বাক্‌-রুদ্ধ হয়ে আছে। দয়া করে সে যাতে কথা বলতে পারে, তার একটা বিহিত করুন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা ব্রাহ্মণ সুশর্মাকে ডেকে বলতেই ব্রাহ্মণ মহাসমারোহে এখানে করলেন সরস্বতী পূজা। আর ওখানে নন্দার মুখে কথা ফুটে উঠল হঠাৎ। দেখে নন্দা অবাক।

রহস্য ভেঙে দিলেন নন্দার কাছে গর্গ মুনি—তোমার সখীর স্বামীর দৌলতেই তুমি শাপমুক্ত হলে।

কৃতজ্ঞ নাগকন্যা তক্ষুণি ছুটে এল উত্তমের রাজপ্রাসাদে। বর দিয়ে আবার চলে গেল পাতালে।

যথাসময়ে রাজা উত্তমের একটি ছেলে হল। দেখতে যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর, তেমনি পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। তার নাম হল ঔত্তম।

বারো হাজার দিব্য বছর স্বারোচিষ মনু হয়ে থাকার পর তাঁর কাল যখন শেষ হল, তখন পরের বারো হাজার দিব্য বছরের জন্য পৃথিবীর মনু হলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই উত্তমের ছেলে ঔত্তম।



তামস মনুর কাহিনী

ঔত্তম মুনির কাল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। জগৎস্রষ্টা বিধাতাও চিন্তিত হয়ে উঠছেন। মনু না থাকলে তাঁর এই পৃথিবী শাসন করবে কে?

সেই সময়ে পৃথিবীতে স্বরাষ্ট্র নামে এক দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। খুবই পরাক্রমশালী রাজা। অধর্ম বা অন্যায় করলে তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তার নামে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত। তাঁর সাম্রাজ্যে তাই প্রজারাও থাকত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে।

রাজার ছিল একশ রানী। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য রাজার, ছেলে তো একটাও হল না, তার ওপর আবার একে একে সব কজন মহিষীও মারা গেলেন। রাজার মন গেল ভেঙে। তেমন ভাবে আর রাজ্যশাসন করতে পারেন না। সেই দোর্দণ্ড প্রতাপও যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে গেল।

প্রতিবেশী আর একজন রাজা ছিলেন। নাম তার বিমর্দ। যতদিন রাজা স্বরাষ্ট্রের প্রতাপ ছিল, ততদিন কেঁচো হয়ে ছিলেন তিনি। এখন যেই দেখলেন স্বরাষ্ট্র মনে মনে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সেই সুযোগে সাপের মত ফোঁস করে উঠে আক্রমণ করে বসলেন তাঁকে। তাঁকে ঠেকাবার সাধ্য আর নেই স্বরাষ্ট্রের। রাজ্য হারালেন। মনের দুঃখে চলে গেলেন বিতস্তা নদীর ধারে তপস্যা করতে।

সেখানে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন স্বরাষ্ট্র। দারুণ গরমে চারদিকে আগুন জ্বেলে তার মাঝে দাঁড়িয়ে, অবিশ্রান্ত বর্ষায় ফাঁকা জায়গায় মাথার ওপর আকাশের জল নিয়ে, শীতকালে জল যখন ঠাণ্ডা কনকনে তখন তার মধ্যে শুয়ে, না-খেয়ে, না-ঘুমিয়ে দিনরাত চলল স্বরাষ্ট্রের সেই কঠোর তপস্যা।

এভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। এক দিন বর্ষাকাল। কালো জমাট মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। শুরু হল মেঘের ঘন ঘন তর্জন গর্জন। মুষলধারে নামল বৃষ্টি। বৃষ্টি বলে বৃষ্টি, থামতে আর চায় না। পলকে পলকে বেড়ে উঠতে লাগল বিতস্তার জল। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে জল। তার ওপর এগিয়ে আসছে বিতস্তার জল। নির্বিকার স্বরাষ্ট্র।

একটানা বেশ কয়েকদিন ধরে চলল দুর্যোগ। ভেসে গেল বন-বাদাড়; ভেসে গেল গ্রাম-নগর। চারদিক থই-থই করছে জলে। দাঁড়িয়ে থাকার মত মাটি আর পায়ের নীচে নেই। রীতিমত প্রলয়। স্বরাষ্ট্র দেখলেন, বিতস্তার স্রোতে যে যেখানে ছিল সবাই ভেসে চলেছে। বাঁচার জন্যে হাঁক-পাঁক করছে।

জলের তোড়ে স্বরাষ্ট্রও ভেসে গেলেন।

ভাসতে ভাসতে হঠাৎ স্বরাষ্ট্রের চোখে পড়ল, তাঁরই সামনে এক মৃগী (হরিণী) ভেসে চলেছে। ভারি সুন্দর মুখ তার, কিন্তু করুণ চাউনি।

কাছাকাছি যেতেই স্বরাষ্ট্রের মনে হল মৃগী যেন তার লেজটা বাড়িয়ে দিল তাঁর দিকে। তিনিও ধরলেন তার লেজ। তারপর মনে হল, যেন মৃগী তাকে যেন স্রোতের তোড় কাটিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে।

দেখে মৃগীকে ভারি অদ্ভুত লাগল স্বরাষ্ট্রের। হাজার হোক, এতদিন তপস্যা করার ফলে কিছু শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। তাতেই বুঝতে পারলেন, এ কোন সাধারণ মৃগী নয়। সেই সঙ্গে মৃগীকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেল।

মৃগীও তাঁকে নিয়ে স্রোত কাটিয়ে মাটির খোঁজে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ বলে উঠল—আমাকে আপনার খুবই ভাল লেগেছে, তাই না রাজা?

হঠাৎ মৃগীর মুখে মানুষের মত কথা শুনে চমকে উঠলেন স্বরাষ্ট্র। বললেন—মৃগী হয়ে মানুষের মত কথা বলছ, কে তুমি? আর, তোমাকে যে আমার ভাল লেগেছে, তাই-বা বুঝলে কিভাবে? আর, জানলে কেমন করে যে আমি রাজা ছিলুম?

মুখ ফিরিয়ে মৃগী একবার স্বরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে আবার এগিয়ে যেতে যেতে বলল—আপনি যেভাবে আমার লেজ ধরেছেন, তাতেই বুঝতে পারলাম, আমাকে আপনার ভাল লেগেছে। চলুন, সামনেই ঐ মাটি দেখা যাচ্ছে। আগে ওখানে উঠি, তারপর আপনার সব কথার জবাব দেব।

স্বরাষ্ট্রকে নিয়ে মৃগী এসে উঠল ডাঙায়। পাশেই ছোট্ট একটা বন। কেমন ভাবে যেন অত বড় প্লাবনেও সেখানটা ভেসে যায় নি।

বনের ভেতর এসে ঢুকল মৃগী। পিছনে দারুণ কৌতূহল নিয়ে স্বরাষ্ট্র।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মৃগী বলল—আচ্ছা রাজা, আপনার কি উৎপলাবতী নামে কোন রানী ছিল? মনে আছে?

অবাক স্বরাষ্ট্র বললেন—তুমি জানলে কি করে? রাজা দৃঢ়ধনুর মেয়ে উৎপলাবতী। সে ছিল আমার মহিষী। আরো অনেক মহিষী আমার ছিল বটে, কিন্তু তাকে যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতুম। দুর্ভাগা আমার। অকালে সে মারা গেল।

—রাজা, আমিই আপনার সেই উৎপলাবতী। বলল মৃগী।

—তুমি...তুমি সেই উৎপলাবতী? বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই রাজার—কিন্তু তোমার এ-দশা হল কেমন করে?

মৃগী বলল—অভিশাপে।

—কি রকম?

মৃগী বলল—তাহলে শুনুন। তখনো আমার বিয়ে হয় নি। সখীদের নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, একটা মৃগ একটা মৃগীর গা চাটছে। দেখে তাড়া দিতেই মৃগী পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃগ রেগে বলে উঠল, 'তোর এত বড় সাহস যে আমাদের ভালবাসায় ব্যাঘাত ঘটাস?' মৃগকে মানুষের মত কথা বলতে দেখে রাজা আমি রীতিমত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃগের বেশ ধরে কে আপনি?' তাতে মৃগ বললে, 'আমি নির্বৃতিচক্ষু মুনির ছেলে সুতপা। মৃগীকে ভালবাসি বলেই আমি মৃগরূপ ধরে আছি।' এই বলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃগ বললে, 'ব্যাঘাত যখন ঘটালি, তখন তুই-ই আমাকে বিয়ে কর।' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'আমি তো মৃগী নই যে মৃগকে বিয়ে করব। তাছাড়া আমার বাবা যখন আছেন, সময় হলে আমার বিয়ে তিনিই দেবেন। আমি তো নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করতে পারি না।' শুনে সেই মুনি অভিশাপ দিয়ে বললেন, 'কি, মৃগী বলে বিদ্রূপ করলি? পরের জন্মে তুইও মৃগী হবি।' দারুণ ভয় পেয়ে আমি তখন মুনির পায়ে পড়ে খুব কান্নাকাটি শুরু করলাম—'আমায় ক্ষমা করুন। কি বলতে কি বলেছি। বিশ্বাস করুন, আমি বিদ্রূপ করি নি। আমায় ক্ষমা করুন। পশুজন্ম থেকে আমায় মুক্তি দিন।' অনেক কান্নাকাটির পর মুনির একটু দয়া হল। বললেন, 'মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে গেছে, তখন পরজন্মে মৃগী তোমায় হতেই হবে। তবে মুক্তি পাবে। তোমার স্বামীর স্পর্শে তোমার গর্ভে এক সন্তান জন্মাবে। তার নাম হবে লোল। সেই শিশু জন্মালেই তোমার শাপমুক্তি হবে, আগের জন্মের সব কথা মনে আসবে, মানুষের মত কথা বলতে পারবে। সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তুমি স্বর্গে যাবে। আর সেই ছেলে হবে বিশ্ববিজয়ী মনু।'

মৃগী এই কাহিনী শুনিয়ে রাজা স্বরাষ্ট্রকে বললেন—আপনার স্পর্শে সেই সন্তান আমার গর্ভে। আমি অভিশাপমুক্ত হলাম।

শুনে রাজা স্বরাষ্ট্রের সে কি আনন্দ! তাঁর ছেলে হবে মনু।

তারপর, যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হল লোল। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মৃগীও স্বর্গে চলে গেল। রাজা স্বরাষ্ট্র বুকে তুলে নিলেন লোলকে। মনে হল আকাশ যেন হেসে উঠল, বাতাস যেন আনন্দে নেচে উঠল।

একটু বড় হতেই লোল জিজ্ঞেস করল স্বরাষ্ট্রকে—আপনি কে? কিভাবেই-বা আমি আপনার ছেলে হলাম? আমার মা-ই-বা কোথায়?



রাজা স্বরাষ্ট্র অকপটে সব কথা খুলে বললেন লোলকে।

সব শুনে লোল প্রথমে সূর্যদেবের উপাসনা করল। উপাসনা করতেই যেন আকাশ থেকে তার হাতে নেমে এল নানা দিব্য অস্ত্রশস্ত্র।

উত্তম মনুর কাল প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল অরাজকতা।

দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিভৃত বন থেকে বেরিয়ে এল লোল। প্রথমে বিমর্দকে শেষ করে উদ্ধার করল পিতার রাজ্য। তারপর...

তারপর সেই লোলই প্রবল প্রতাপে সব অরাজকতা দূর করে আবার পৃথিবীকে শান্তি দিয়ে হল মনু।

অন্ধকারে জন্ম হয়েছিল তার। তাই পৃথিবীতে সে 'তামস' মনু নামেই অমর হয়ে রইল সকলের কাছে।

চাক্ষুষ মনুর কাহিনী

তামস মন্বন্তরের পর কেটে গেছে এক মন্বন্তর। তার নাম ছিল রৈবতক মন্বন্তর।

দেখতে দেখতে রৈবতক মন্বন্তরের কালও শেষ হয়ে এল। পৃথিবীতে কেটে গেল ষাট হাজার দিব্য বছর অর্থাৎ পঁচিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ বছর। শুরু হল আর এক প্রলয়। অরাজক হয়ে পড়ল গোটা পৃথিবী। লোপ পেত শুরু করল ধর্ম-কর্ম।

এমন সময়ে পৃথিবীর শাসনভার নিয়ে এলেন ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ।

অদ্ভুত তাঁর জন্মকাহিনী। রাজর্ষি অনমিত্রের স্ত্রী ভদ্রা। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। নির্লোভ, নিরহঙ্কার। তুলনা হয় না তাঁদের।

ভদ্রার ছেলে হল একটি। সুন্দর, ফুটফুটে ছেলে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। জন্মাবার পর শিশু যেমন কাঁদে, এ ছেলেটি কিন্তু

কাঁদল না।

ভদ্রা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে নানাভাবে তাকে আদর করতে লাগলেন। গালে গাল ঘষে, মুখে হালকা চুমু খেয়ে, বুকে চেপে ধরে আদর যেন আর ফুরোতে চায় না, আশও মেটে না।

এদিকে ছেলেটি আদর খায় আর হাসে।

মায়ের চোখ পড়তেই আদর থামিয়ে খানিকটা অবাক হলেন। অমনভাবে হাসে কেন ছেলে? যেন কোন এক বিজ্ঞের হাসি!

কেমন করে ভদ্রা জানবেন যে, নবজাত শিশুটি তাঁর কোন সাধারণ ছেলে নয়। জাতিস্মর।

—আমি তোমায় আদর করছি, আর তুমি অমন করে হাসছ কেন?

—হাসছি কি আর সাধে। অমনি বলে উঠল সেই সদ্যোজাত শিশু—হাসছি আপনার রকমসকম দেখে! আপনি তো আর দেখতে পাচ্ছেন না, আমি দেখতে পাচ্ছি, এক রাক্ষসী বেড়াল ওৎ পেতে বসে আছে আড়ালে! আমায় খেয়ে ওর পেট ভরাবে, সাধ মিটবে। আপনি আদর করছেন আর মনে মনে ভাবছেন, বড় হয়ে আমিও আপনার কত আশা মেটাব। এ সব দেখেই আমার হাসি পাচ্ছে। আপনি তো আর জানেন না, যে বড় জোর পাঁচ থেকে সাত দিন, এরপর আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধই যে থাকবে না।

ভদ্রা বললেন, সত্যিই ছেলেটি তার সাধারণ নয়। রাজর্ষি অনমিত্রের স্ত্রী তিনি। মনকে কি ভাবে স্বার্থ থেকে মুক্ত রাখতে হয়, তা তিনি বিলক্ষণ জানেন। সেদিক থেকে তিনি খুবই নির্মম।

বললেন—আদর-যত্ন করার পরও যদি তুমি আমায় ছেড়ে যাও, তাহলে আমার কোন দরকার নেই তোমাকে। তুমি থাকো, আমি চললাম।

এই বলে ভদ্রা প্রসূতি-ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে গেলেন। পিছু ফিরে একবারও তাকালেন না।

যেদিন রাজর্ষির ঘরে ভদ্রার ছেলে হয়েছিল, সেদিনই ক্ষত্রিয় রাজা বিক্রান্তের এবং বোধ নামে এক ব্রাহ্মণেরও ছেলে হয়েছিল।

নবজাত শিশুটিকে একা রেখে ভদ্রা চলে যেতেই রাক্ষসী বেড়াল জাতহারিণী তাকে নিয়ে গেল রাজা বিক্রান্তের প্রাসাদে। অন্দরমহলে যেখানে রানী হৈমনী তাঁর শিশুটিকে পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেখানে গিয়ে সেই জায়গায় এই শিশুটিকে রেখে হৈমনীর নবজাতককে নিয়ে চলে গেল বোধ ব্রাহ্মণের বাড়ি। সেখানে গিয়ে চুপি চুপি বিক্রান্তের ছেলেকে ব্রাহ্মণীর পাশে শুইয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণীর ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল নিজের ডেরায়। তারপর মনের সুখে তাকে খেয়ে ফেলল। কিন্তু এত যে পালটাপালটি হয়ে গেল, তা বুঝতে না পারলেন রানী হৈমনী; না পারলেন ব্রাহ্মণী। ভদ্রা শিশুকে মন থেকেই পরিত্যাগ করে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু রানী আর ব্রাহ্মণী ঘুম ভাঙতেই যে যার পাশে শুয়ে থাকা শিশুকে নিজেরই ছেলে মনে করে আদর-যত্ন, সেবা-পরিচর্যা করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে রাজা বিক্রান্তের ঘরে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। এতদিন শিশুটি সকলের কাছেই ছিল খোকা। কিন্তু 'খোকা' তো আর চিরকাল থাকতে পারে না। ক্ষত্রিয় রাজার ছেলে, পৈতে দিতে হবে, একটা নামকরণও করতে হবে।

শুভদিন দেখে রাজা বিক্রান্ত ছেলের সংস্কারের সব আয়োজন করলেন। হাজার হোক, রাজার ছেলে বলে কথা। কোন কিছুর ত্রুটি রাখলেন না রাজা। প্রজাদের মধ্যে পড়ে গেল উৎসব। প্রাসাদে মহা ধুমধাম।

গুরুদেব এলেন। নির্বিঘ্নে সব কাজও শেষ হল। ছেলেকে পেয়ে সবার মনে মহা আনন্দ দেখে, গুরুদেব ছেলের নাম রাখলেন 'আনন্দ'।

কাজ সব শেষ হলে, গুরুদেব বললেন—আনন্দ, আগে মাকে প্রণাম কর।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল আনন্দ—কুলগুরু আপনি, আমারও গুরু। গুরুর আদেশ পালন অবশ্যই করব। কিন্তু বলে দিন, কোন্ মাকে প্রণাম করব—আমার গর্ভধারিণী জননীকে, না যিনি আমায় পালন করেছেন, তাঁকে!

হঠাৎ এই রকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে প্রথমে বেশ থতমত খেয়ে গেলেন গুরুদেব, রাজা-রানীও কম অবাক হলেন না।

গুরুদেব বললেন—একথা কেন জিজ্ঞেস করলে আনন্দ? এই রানী হৈমিনী কি তোমার জননী নন?

—না গুরুদেব। এঁর ছেলের নাম চৈত্র। সে এখন আছে বিশালগ্রামে ব্রাহ্মণ বোধের ছেলে হয়ে। সেখানে তার সংস্কারও হয়েছে ব্রাহ্মণ হিসেবে। বলল আনন্দ।

শুনে সকলেরই মাথা গেল ঘুলিয়ে।

—এসব কি বলছ, আনন্দ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তাহলে তুমি এলে কোথা থেকে? জিজ্ঞেস করলেন গুরুদেব।

—শুনুন তাহলে, আমি জন্মেছিলাম ব্রহ্মর্ষি ক্ষত্রিয় অনমিত্রের ঘরে। আমার গর্ভধারিণী জননী হলেন গিরিভদ্রা। রাক্ষসী জাতহারিণী আমাকে সেখান থেকে চুরি করে এনে এখানে রেখে হৈমিনীর ছেলে চৈত্রকে নিয়ে গিয়ে রেখেছে ব্রাহ্মণ বোধের ঘরে। আর তার ছেলেটিকে সে খেয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, আমি কোন মাকে প্রণাম করব। বলল আনন্দ।

এই কাহিনী শোনার পর সকলে রীতিমত অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন—এ ছেলে নিশ্চয়ই কোন দেবপুরুষ। তার ওপর এই কঠিন প্রশ্ন। কি উত্তর দেবেন এরপর গুরুদেব?

—বাবা। বললেন গুরুদেব—এবার তুমি আমায় মহা সঙ্কটে ফেললে।

হাসতে হাসতে বলে আনন্দ—এতে সঙ্কটের কি পেলেন গুরুদেব? এই জন্মেই আমি পেলাম দুই মা, দুই বাবা। এরপরেও আবার যে এরকম হবে না কে বলতে পারে। জন্মালেই মৃত্যু আছে। মৃত্যুর পর আবার জন্ম আছে। আবার আছে মা, বাবা, বন্ধু। পৃথিবীতে কে যে কার মা, বাবা, বন্ধু হচ্ছে না, তা কে বলতে পারে? জন্মগ্রহণ করলেই এসব সংশয় আসবে। তাই আমি বলি কি, চৈত্রকে আপনারা এখানে আনুন। আমাকে ত্যাগ করুন। যাতে এরকম নানা সম্বন্ধের সংশয়ে আর না পড়তে হয় তার জন্য আমি তপস্যা করতে যাব।

বুঝতে পারলেন সবাই এ ছেলেকে আটকে রাখা যাবে না। বাধ্য হয়ে অনুমতি দিলেন। আনন্দও নির্বিকারচিত্তে চলে গেল তপস্যা করতে।

দারুণ তপস্যায় ডুবে আছে আনন্দ। হঠাৎ এক দিন স্বয়ং ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন তার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন—বৎস! তুমি

এমন কঠোর তপস্যা করছ কেন?

আনন্দ বলল—মুক্তির জন্য।

—তোমার কি নতুন করে মুক্তির দরকার আছে বৎস? বললেন ব্রহ্মা—জ্ঞান তোমার যখন সবই রয়েছে, তখন তুমি তো মুক্তই। জ্ঞানের আর এক নামই তো মুক্তি। শোন, তপস্যার জন্য জ্ঞান নিয়ে তুমি পৃথিবীতে আস নি। এসেছ পৃথিবী শাসন করতে। যাও, মনু হয়ে পৃথিবীকে এই অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাও। তুমি সর্বপ্রথম জন্মেছিলে আমার চক্ষু (চোখ) থেকে। তাই এখন থেকে তোমার নাম হল চাক্ষুষ। বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ব্রহ্মা।

ফিরে এল আবার চাক্ষুষ। দেবতা, ঋষি থেকে মানুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর সবাই আনন্দের সঙ্গে তাকে বসাল মনুর আসনে। মেনে নিল তাঁর আধিপত্য। এমন কি দেবরাজ ইন্দ্র মনোজব-ও।



বৈবস্বত মনুর প্রসঙ্গকথা

আমাদের এখন মনু মহারাজ হলেন বৈবস্বত। ইনি হলেন সপ্তম মনু। আমরা এখন চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে, আচারে-আচরণে তাঁরই বিধি-বিধান মেনে চলি।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই আমাদের আগের আগের পুরুষরাও এমনিভাবে তাঁদের মনু মহারাজদের বিধি-বিধান মেনে গেছেন। স্রষ্টার নির্দেশে দেবতা থেকে দেবরাজ ইন্দ্র (ইন্দ্র হল একটা পদ। প্রতি মন্বন্তরে এক একজন সৌভাগ্যশালী পুরুষ এই পদে বসেন। যেমন, স্বায়ম্ভুব মনুর সময় বামদেব, স্বারোচিষের সময় বিপশ্চিৎ, উত্তম মনুর সময় সুশান্তি, রৈবত যখন মনু তখন বিভু, চাক্ষুষ মনুর সময় মনোজব, আর এখন বৈবস্বত মনু মহারাজের সময় ঊর্জস্বী নামে মহাপুরুষরা দেবরাজ হয়েছিলেন। এঁদের সকলকেই আমরা এক কথায় বলে থাকি ইন্দ্র।) মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ত, এমন কি গ্রহরাও শাসনকাজে সব সময় মনু মহারাজদের সাহায্য করে যান।

যাই হোক, আমাদের এই বৈবস্বত হলেন সূর্যদেবের ছেলে। সূর্যদেবের আর এক নাম হল বিবস্বত।

দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার মেয়ে সংজ্ঞা। ভারি ধীর, স্থির, বিনয়ী। ফোটা পদ্মফুলের মত তার মুখ। যেখান দিয়ে যেত, মনে হত, সেখানে কে ছড়িয়ে দিয়ে গেল চাঁদের কিরণ। ভারি মিষ্টি মেয়ে। বিশ্বকর্মাও তাকে খুব ভালবাসতেন।

বিয়ের সময় হল সংজ্ঞার। অনেকেই অনেক সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। কিন্তু কোনটাই মনে ধরে না বিশ্বকর্মার। অমন মেয়ে কি যার-তার হাতে দেওয়া যায়? তাঁর মেয়ের যোগ্য পাত্র যদি থাকে তো একজনই আছেন—তিনি হলেন বিবস্বত। অমন তেজী পুরুষ আর কে আছেন? অনেক সাধনা করে বিবস্বতকে রাজি করিয়ে বেশ ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। বিশ্বকর্মা এখন নিশ্চিন্ত।

কিন্তু স্বামীর ঘর করতে গিয়ে সংজ্ঞা পড়ল মহা সঙ্কটে। অমন স্বামীর তুলনা চলে না কারো সঙ্গে। মনে-প্রাণে সংজ্ঞা ভালও বাসেন স্বামীকে, কিন্তু যা তেজ! ভালভাবে তাকানোই যায় না তার দিকে: যা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে সব সময়। বাপ্! তাকিয়ে একবার ভাল করে দেখবে, তা কোন মতেই পারে না সংজ্ঞা। কম কষ্ট সংজ্ঞার? পর পর দুটো ছেলে হল তার। বড়টির নাম বৈবস্বত, পরেরটির নাম যম। তারপর একটা মেয়েও হল, নাম যমুনা। তবুও স্বামীর তেজ খুবই বিব্রত করে তুলল সংজ্ঞাকে। দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল।

শেষে একদিন আর সহ্য করতে না পেরে ঠিক করল সংজ্ঞা, এই স্বামীর সঙ্গে এভাবে সে আর বাস করতে পারবে না। অথচ ছেড়ে যেতেও মন-প্রাণ চায় না। না বলে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আবার চলে গেলে স্বামীর খুবই কষ্ট হবে। তবুও এভাবে সে কিছুতেই থাকতে পারবে না।

সাত-পাঁচ ভেবে শেষে যাতে দু-দিকই বজায় থাকে, সে রকম একটা উপায় বের করল সংজ্ঞা। বিশ্বকর্মার মেয়ে সে। তারও তো অসাধ্য কিছু ছিল না।

গোপনে একদিন নিজের শরীর থেকে ঠিক তারই মত দেখতে এক ছায়ামূর্তি তৈরি করল সে। ছায়া তো ছায়াই। চুল থেকে চোখ, মুখ, নাক, কান, দেহের গড়ন, একেবারে এক। এমন কি কথায়-বার্তায়, আচারে-আচরণেও কোথাও এতটুকু তফাত ছিল না। পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে, সাধ্য কার বলে দেয় কে আসল আর কে নকল।

ছায়ামূর্তি গড়া শেষ হলে সংজ্ঞা তাকে বলল—তুমি হলে সবর্ণা, আমার বোন। তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।

—কি বল? জানতে চাইল সবর্ণা।

—আমি কিছুকালের জন্য বাপের বাড়ি যাব। কিন্তু স্বামী আমায় কিছুতেই যেতে দেবেন না। আমি ভাই যাব বলে ঠিকই করে ফেলেছি। তুমি এখানে থাক। এমনভাবে থাকবে, যাতে উনি কোন রকমেই বুঝতে না পারেন যে, তুমি সংজ্ঞা নও। আর আমার দুটি ছেলে, একটি মেয়ে রইল। নিজের ছেলেমেয়ের মত যত্ন কোরো। বুঝিয়ে বলল সংজ্ঞা সবর্ণাকে—হ্যাঁ, আর একটা কথা। যদি কোনদিন ধরাও পড়ে যাও, তাহলেও খবরদার কিন্তু বলবে না, আমি কোথায় আছি।

সবেতেই সবর্ণা রাজি হল বটে, কিন্তু এখানে এসেই আপত্তি জানাল। বলল—দেখ, ওসব আমি ঠিক করে নিতে পারব, কিন্তু যদি কোন কারণে অভিশাপ দিতে আসে, তাহলে কিন্তু বাপু আমি সত্যি কথা বলে দিতে বাধ্য হব।

সংজ্ঞার এখন মনের যা অবস্থা—তাই সই।

সবর্ণা থেকে গেল সূর্যদেবের ঘরে সংজ্ঞা-ঘরনী হয়ে, আর সংজ্ঞা চলে গেল বাবা বিশ্বকর্মার কাছে।

অনেক দিন পর মেয়ে এসেছে, বাবার সে কি আনন্দ! বিশ্বকর্মার বাড়ি রোজই ধুমধাম। নাতি-নাতনিকে সঙ্গে আনে নি এই যা একটু দুঃখ। বড্ড রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। আহা, নির্ঝঞ্ঝাটে দুদিন থাকুক, শরীরটা সামলে নিক। ভেতরের এত কথা বুঝবেন কেমন

করে বিশ্বকর্মা।

দিন গেল, মাস গেল, বছরও ঘুরতে চলল। সংজ্ঞা কিন্তু স্বামীর ঘরে যাবার নামটি পর্যন্ত করে না। মনে একদিন খুব খটকা জাগল বিশ্বকর্মার। থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ মা, সত্যি কথা বল তো, জামাই-এর সঙ্গে কি ঝগড়া করেছিস?

সংজ্ঞা বলে—কি যে বল বাবা? ঝগড়া করতে যাব কেন?

—তবে যে ও-মুখো হবার নামই করছিস না? ছেলেদের জন্যও কি তোর মন কেমন করছে না?

—তা যে একেবারে করছে না, তা নয়। তবে আরও কিছুদিন থাকি না বাবা তোমার কাছে। বলল সংজ্ঞা।

—বাপের কাছে মেয়ে থাকবে, এতে কি বাপ না বলবে মা। তবে আমার যেন কেমন লাগছে। এতদিন আছিস। জামাইও তো একদিনের জন্যও এল না। তুই বরং এখন যা মা। আবার না হয় পরে আসবি। বিয়ের পর স্বামীর ঘর ছেড়ে এভাবে থাকলে আর পাঁচজনেই-বা কি বলবে? বললেন বিশ্বকর্মা।

সংজ্ঞা বলল—বেশ, তাই যাচ্ছি বাবা।বলে সংজ্ঞা সেজেগুজে নিয়ে বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু বলে গেল—তোমার জামাই-এর যা তেজ, বাবা!

পথে যেতে যেতে সংজ্ঞা ঠিক করল, এখনই সে স্বামীর কাছে যাবে না। বিয়ে যখন হয়েছে, স্বামীর ঘর করতেই হবে। তার আগে ঐ তেজী স্বামীর যাতে যোগ্য হতে পারি, তার জন্য আগে নিজেকে তৈরি করি।

মনস্থ করে সংজ্ঞা চলে গেল উত্তর কুরুতে তপস্যা করতে। সেখানে গিয়ে ঘোটকীর বেশ ধরে শুকনো ঘাস-পাতা খেয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে দিল।

এদিকে সবর্ণা এমন গুছিয়ে ঘর করতে লাগল যে সূর্যদেব ধরতেই পারলেন না। একবারের জন্যও তাঁর মনে কোন সন্দেহ জাগল না।

দেখতে দেখতে সবর্ণারও হল দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেদুটোর নাম হল সাবর্ণি আর শনি। মেয়েটির নাম হল ভদ্রা।

বৈবস্বত আর যমও ইতিমধ্যে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। তারাও কিছু বুঝতে পারে নি। ধরতেও পারে নি এতদিন যে, এই মহিলা তাদের আসল মা নয়। বড় হতে আস্তে আস্তে যখন চোখ ফুটল দেখল, যত ভাল ভাল খাবার সবর্ণা খাওয়াচ্ছে সাবর্ণি, শনি আর ভদ্রাকে। আর, তারা চাইলেই বলে, নেই।

বৈবস্বত বরাবরই ছিল একটু ঠাণ্ডা মেজাজের। সে দেখে শুনেও চুপ করে থাকত। কিন্তু যমের মেজাজ ছিল একটু চড়া। দেখতে দেখতে তার মেজাজ এমন চড়ে গেল একদিন যে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে বলে বসল সবর্ণাকে—মারব এক লাথি!

যম এ কথা বলতে পারে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি কোন দিন সবর্ণা। তাই প্রথমটা হকচকিয়ে গেল। তারপর রেগে আগুন হয়ে অভিশাপ দিল—লাথি মারবি? তোর পায়ে কুষ্ঠ হবে, পা খসে পড়বে।

রাগ পড়ে গেছে ইতিমধ্যে যমের। মাথা ঠাণ্ডা হতেই বুঝল কাজটা সে ভাল করে নি। এদিকে মা আবার অভিশাপ দিয়ে বসল।

সবর্ণাকে আর কিছু না বলে যম এবার সোজা চলে গেল বাবার কাছে। সূর্যদেব ছেলে যমকে খুবই ভালবাসতেন। শুকনো মুখে কাছে এসে দাঁড়াতেই আদর করে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে বাবা? মুখ এমন শুকনো শুকনো কেন?

যম তখন যা যা করেছিল সবই বলল বাবাকে। সেই সঙ্গে মায়ের দেওয়া অভিশাপের কথা শোনাল বাবাকে।

সব শুনে সূর্যদেবের কপাল গেল কুঁচকে। ভাল খাবার এক ছেলেকে দিল, আরেক ছেলেকে দিল না। এটা যদিও মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ঐ অভিশাপ! ছেলে হাজার অপরাধ করলেও মা তাকে ক্ষমা করে। সহ্যশক্তিই তো মায়েদের মস্ত বড় গুণ। সেই জন্যই তারা জননী। কিন্তু মা হয়ে ছেলেকে অভিশাপ দেয়, এটা কি রকম? মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠল সূর্যদেবের।

কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে যমকে বললেন—মাকে ও কথা বলে কাজটা মোটেই ভাল কর নি, বাবা। মা-এর মত গুরু কি আর কেউ আছে? তাকে কি কখনো অপমান করতে আছে। মায়ের শাপ যে দারুণ শাপ। ও শাপ কেউ রোধ করতে পারবে না। পায়ে তোমার ঘা হবেই। ঘায়ে পোকা হবে। সেই পোকা কুচি-কুচি করে দেবে তোমার পায়ের মাংস। পা তোমার খসে নিশ্চয়ই যাবে, উপায় নেই। এখানে আমি কিছুই করতে পারব না।

মনের দুঃখে যম চলে গেল বাবার কাছ থেকে।

সূর্যদেবের মনে কিন্তু উঁকি দিতে শুরু করল সন্দেহ।

সুযোগ বুঝে একদিন সবর্ণাকে কাছে ডেকে কথার ফাঁদে ফেলে রহস্যটা কি জানার চেষ্টা করলেন তিনি। মা হয়ে যমকে কেন সে সহ্য করতে পারল না। যখন কোন মতেই সবর্ণার পেট থেকে কথা বের করতে পারলেন না, তখন ধরলেন অগ্নিমূর্তি। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—বেশ বুঝতে পারছি, একটা কিছু গোপন করে যাচ্ছ তুমি। হয় এখনই সত্যি কথা বল, নইলে অভিশাপ দেব।

অভিশাপকে বড় ভয় সবর্ণার। তাছাড়া সংজ্ঞাকে সে প্রথমেই বলে রেখেছিল—অভিশাপ দিতে এলে কিন্তু সব কথা বলে দিতে সে বাধ্য হবে।

এরপর সবর্ণা কোন কথা গোপন না করে আদ্যোপান্ত সব খুলে বলল। শুনে সূর্যদেব খুব মুষড়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হল শ্বশুর বিশ্বকর্মার ওপর। তিনিই-বা তাঁকে এতদিন কোন খবর দেন নি কেন?

ছুটলেন সূর্যদেব বিশ্বকর্মার কাছে—সংজ্ঞা কোথায়?

—কেন, সে তোমার বাড়ি যায় নি? অবাক হলেন বিশ্বকর্মা—সে তো যাচ্ছি বলেই বেরিয়ে গেল? কি সর্বনাশ? গেল কোথায়?

—আপনাকে আর কিছু বলে গেছে কি সে? জিজ্ঞেস করলেন সূর্যদেব।

—শুধু একটা কথাই বলল, তোমার তেজ সে সহ্য করতে পারছে না।

বুঝলেন সূর্যদেব। মনে পড়ল, কোন দিনই তাঁর স্ত্রী ভাল ভাবে তাঁর দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে নি। এবার একটু লজ্জাই পেলেন তিনি। বললেন বিশ্বকর্মাকে—দয়া করে আমার তেজ একটু কমিয়ে দিন।

বিশ্বকর্মাও তখনি তাঁকে চেঁছে-ছুলে তাঁর অনেকখানি তেজ কমিয়ে দিলেন। যাতে অন্তত যে কেউ তাঁর দিকে তাকাতে পারে।

এরপর সূর্যদেব চোখ বুজতেই দেখলেন, শুকনো ঘাসে বসে

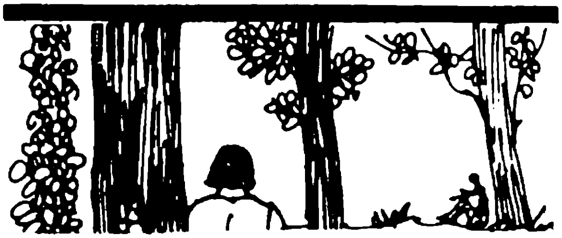
ঘোটকীর বেশে উত্তর কুরুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর সংজ্ঞা। তিনিও ঘোড়ার রূপ ধরে গিয়ে হাজির হলেন সেখানে। কাছে যেতেই সরে গেল ঘোটকী। তবুও ঘোড়ার বেশে সঙ্গ ছাড়লেন না সূর্যদেব। নিজের মুখ দিয়ে মুখ ঘষল ঘোড়া তাঁর। ঘোটকীও সিটকে উঠে ফোঁস করে নাক ঝাড়ল। ঘোটকী হলেও আসলে সে সংজ্ঞা, সূর্যদেবের স্ত্রী। কোথা থেকে এই ঘোড়া এল তার ধর্ম নষ্ট করতে? তাই ঘোড়ার আদর নাক দিয়ে বাইরে ফেনার আকারে বের করে দিয়ে ভয়ে সরে যেতেই দেখে, ঘোড়া কোথায়, সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই স্বামী সূর্যদেব। সেই প্রখর তেজ আর নেই, বরং দেখতে হয়েছেন অপূর্ব সুন্দর। আনন্দে ঘোটকীও পরিত্যাগ করল তার ছদ্মবেশ।

বহুদিন পর আবার মিলন হল স্বামী-স্ত্রীর। ইতিমধ্যে ঘোড়াবেশী স্বামীর যে আদর, ভালবাসা ঘোটকী নাক দিয়ে বের করে ঘাসের ওপর ফেলে দিয়েছিল সেখানে উঠে দাঁড়াল দুই যমজ ছেলে—একজনের নাম নাসত্য, আর একজন দস্র। সকলের কাছে তারা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় হিসেবে সম্মান পেল।

খুশি এখন সংজ্ঞা। স্বামী বিবস্বতের সঙ্গে ফিরে এল নিজের ঘরে। সূর্যদেব সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বৈবস্বতকে করে দিলেন মনু। শাপমুক্ত হবার পর যমকে দিলেন মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করার ভার, শনিকে করে দিলেন দুরন্ত গ্রহ। আর সাবর্ণিকে বললেন—বৈবস্বতের কাল শেষ হলে তুমি হবে মনু।

সেই থেকে এখনও পর্যন্ত বৈবস্বতই হয়ে আছেন আমাদের মনু মহারাজ।

কর্তব্যকর্ম শেষ করে পিতা সূর্যদেব হলেন নিশ্চিন্ত।



কেন এমন হয়

এমন কোন কিছুই করেন নি রাজা সুরথ যে তাঁকে রাজ্য হারাতে হবে, প্রায় ভিখিরি হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে বনে বনে লুকিয়ে লুকিয়ে।

অসুখী ছিল না কোন প্রজা। অভাব ছিল না কারো ঘরে। ঘরের দরজা জানালা খুলে ঘুমোতে পারত নিশ্চিন্তে। স্বভাব যাদের চুরি করার, চুরি তো তারা করবেই। কিন্তু ভাবতে হতো তাদের, ধরা পড়লে যে সাজা পাবে, তাতে চুরির আনন্দ তো থাকবেই না, এমন কি, কারো কাছে মুখও আর দেখাতে পারবে না।

যেমন সৎ, তেমনি ধার্মিক, তেমনি নির্ভীক রাজা সুরথকে যেমন সমীহ করে চলত সকলেই, রাজাও তেমনি যার যা সম্মান তা দিতেন ঠিকমত। খেয়াল-খুশির বালাই মাত্র ছিল না তাঁর। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এক পা-ও চলতেন না। আবার খুঁটিয়ে বিচারও করে নিতেন, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক।

এমন যে রাজা তাঁকেও একদিন পড়তে হল চক্রান্তে।

স্বারোচিষ মনুর কাল। যে সে মনু নন। কঠোর তাঁর বিধি-বিধান। রাজা সুরথ কিন্তু তা মেনে চলতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তবুও তাঁকে পড়তে হল শত্রুতার জালে।

প্রতিবেশী কিছু রাজা, কোন মতেই রাজা সুরথের এই আধিপত্য যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। একা একা যে বিদ্রোহ করবেন সুরথের বিরুদ্ধে, সে সাহসও ছিল না। লুকিয়ে লুকিয়ে এক সময় তারা এক জোট হল। তারপর হঠাৎ একদিন আক্রমণ করে বসল রাজা সুরথকে। অপ্রস্তুত থাকলেও, শক্তি-সামর্থ্য আর সৈন্যবল যা ছিল তাঁর, অমন হাজার গণ্ডা শত্রুকে তিনি হাসতে হাসতে ঠেকাতে পারতেন। কিন্তু, আশ্চর্য! দারুণভাবে হেরে গেলেন। শত্রু রাজাদের বিজয়োল্লাস সহ্য করতে না পেরে ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে।

কিন্তু সেখান থেকেও একদিন প্রাণের ভয়ে পালাতে বাধ্য হলেন। যে সব মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি এক পা-ও চলতেন না, নিজের জীবনের চেয়েও তিনি যাদের বেশি বিশ্বাস করতেন, দেখলেন, তলে তলে তারাই কখন শত্রু হয়ে গেছে তাঁর। যে সেনাপতিদের ওপর নির্ভর করে প্রজাদের সুখে রেখেছিলেন, দেখলেন, তারাও কখন শত্রুরাজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছে। মনে মনে ভাবেন রাজা—মন্ত্রী বা সেনাপতি, এমন কি সৈন্যসামন্তদের কোন অভাবই তো তিনি রাখেন নি। তবে কেমন করে তারা বিশ্বাসঘাতক হতে পারে! প্রাণের ভালবাসার চেয়ে শত্রুতা বড় হল!

শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী আর সেনাপতিদের চক্রান্ত এমন চরমে উঠল যে, রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে যেতে পথ পেলেন না তিনি। মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায় সুরথের এই ভেবে, কেন এমন হল। ঘুরে বেড়ান বনে বনে। আহার গাছের ফলমূল। তেষ্টা মেটে নদীর জলে।

এক সময় মনে মনে ঠিকই করে ফেললেন যে, ওসব আর ভাববেন না। চুলোয় যাক রাজ্য-রাজত্ব, আত্মীয়-স্বজন। ঘুরে বেড়াবেন বনে বনে। কাটিয়ে দেবেন নিশ্চিন্তে বাকি জীবন।

কিন্তু ভাবলে কি হবে? মাঝে মাঝেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিজের বাড়ি-ঘর, স্ত্রী-পুত্রের মুখ। প্রজাদের জন্য হঠাৎ মুচড়ে ওঠে মন —আহা! কেমন সব আছে কে জানে? রাজকোষ থেকে তাঁর মন্ত্রীরা আগের মত সব গরিবদের সাহায্য দিচ্ছেন তো? না, নিজেরাই ফাঁক করছেন? রাজকোষ আগের মত আছে, না তা-ও শেষ হয়ে গেল? তাঁর স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজনরাই-বা কেমন আছে।

মাঝে মাঝে যখনই এই ভাবনাগুলো আসে, তখনই অস্থির হয়ে ওঠেন রাজা। হাজার চেষ্টা করেও মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারেন না চিন্তাগুলো। কেউ যখন তাঁর বন্ধু নয়, তখন কেন এসব চিন্তা করবেন? কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার চিন্তা আসে, আবার অস্থির হন। বনের একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে বেড়ান এখন প্রায় পাগলের মত। কেন এমন হবে? কারো সঙ্গে এখন তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই, তবু তাদেরই জন্য কেন এমন করে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে?

বনের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন রাজা সুরথ

এক মনোরম আশ্রম। আশ্রমটি ছিল মেধা মুনির। দেখে খুবই ভাল লাগল রাজার। সেখানেই থেকে যাবেন মনস্থ করে, চারপাশ ঘুরে, ঘুরে ঘুরে আর একবার দেখতে গিয়েই দেখলেন, একজন মানুষ বসে আছে। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, উদাস চাউনি। মাঝে মাঝে ফেলছে দীর্ঘশ্বাস। দেখেই মনে হয়, কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবছে, আর খুব কষ্ট পাচ্ছে।

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন রাজা। কিন্তু মানুষটি এমনি অন্যমনস্ক যে, সামনে একজন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

চমক ভাঙল তার, যখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি ভাই? শুকনো মুখে এখাসে বসে বসে কি এত ভাবছ?

নিজের পরিচয় দিল মানুষটি—আমি একজন বণিক। আমার নাম সমাধি। ভাবছি বসে বসে বাড়ির কথা।

—তুমি এখানেই বা কেন? কি হয়েছে তোমার বাড়িতে?

—আমার ভাগ্য। বাণিজ্য করতাম। ধন-সম্পত্তিও আমার ছিল অনেক। কিন্তু আজ আমি ভিখারি।

—কি রকম?

—কুলাঙ্গার ছেলেরা আমার, তাদের মায়ের সঙ্গে জোট বেঁধে আমার যা কিছু ছিল কেড়ে নিয়ে, অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। বলল সমাধি।

শুনে অবাক হলেন রাজা। সংসারে তাহলে এমন ঘটনাও ঘটে?

—তুমি কি তারই জন্য এত মনমরা? জিজ্ঞেস করেন সুরথ।

—না। আমি বাড়িতে থাকতে তাদের কাউকে কখনো কষ্টের মুখ দেখতে দিই নি ভাই। কোন অভাব রাখি নি। এখন সবই তাদের হাতে আছে ঠিকই, কিন্তু কেমন আছে কে জানে? বলল সমাধি।

—যে কুলাঙ্গার ছেলেরা তোমাকে সম্মান দিল না, যে স্ত্রী হয়ে ধনের লোভে স্বামীকেও দূর করে দিল, তাদের জন্য তোমার ভেবে লাভ?

—ঠিকই বলেছ ভাই। আমিও বুঝতে পারি, কোন লাভ নেই। তবু কেন যে মাঝে মাঝে মনটা এমন দুর্বল হয়ে ওঠে, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না। এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমাধি বলল—তা তুমি কে ভাই? এখানেই-বা কেন?

রাজা সুরথ এবার নিজের পরিচয় দিয়ে সব বললেন সমাধিকে।

তারপর বললেন—কেন মন এমন হয়, বলতে পার সমাধি?

—সে তো আমিও বুঝতে পারি না রাজা, কেন এমন হয়।

এরপর দু-জনেই বসে বসে যুক্তি করলেন, জানতে হবে এর রহস্য কি। কেন এমন হয়!

কিন্তু, কিভাবে?

—চল, আমরা মুনিবরের কাছে যাই। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন। বললেন রাজা সুরথ।

আপন মনে বসে আছেন মেধা মুনি তাঁর আশ্রমে।

দু-জনে এসে প্রণাম করে দাঁড়ালেন মুনির সামনে।

মেধা মুনির চোখে প্রশ্ন—বল, কি তোমাদের বলার আছে?

একে একে দু-জনেই মুনিবরকে শোনালেন তাঁদের কাহিনী। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তাদের জন্য মন এমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, কেঁদে ওঠে কেন? কেন এমন হয়?

শুনে হাসলেন মেধা মুনি। তারপর বললেন—সবই সেই মহামায়ার খেলা, বাবা। তিনিই সব করাচ্ছেন।

মহামায়া? শুনে দু-জনের মুখে এক প্রশ্ন—কে তিনি? কি ভাবে করাচ্ছেন?

—হ্যাঁ বাবা, সবই সেই মহামায়া—

মেধামুনি বললেন—তোমরা তো মানুষ। নিজেদের অনেক বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান বলে মনে কর, তাই না? যত্ন করে ছেলেপুলেদের মানুষ কর। কেন, ভবিষ্যতে তোমায় দেখবে বলে, তাই না? কি বোকা দেখ তোমরা! তোমাদের কথা ছেড়েই দিলাম না হয়। দেখ, পাখি-মা এত কষ্ট করে এখান-ওখান থেকে মুখে করে খাবার এনে ছেলের মুখে গুঁজে দেয়। তারপর তারা যখন বড় হয়, কোথায় মা, কোথায় বাবা? এ সবই সেই মহামায়ার খেলা। মোহ দিয়ে ঘিরে রেখে তিনি সকলকে কেমন সংসারে ঘানি টানান, নাচান, কাঁদান, হাসান। তাই নিয়ে কত গর্ব, কত অহঙ্কার মানুষের। যেটা আশা করে মানুষ, সেটা না পেলে, উলটোপালটা কিছু ঘটলে, মনে তো কষ্ট হবেই বাবা। আর যারা কোন প্রত্যাশাই করে না, তাদের কোন কষ্টই নেই। সে-ও সেই মহামায়ার দয়া।

ভারি ভাল লাগল মেধা মুনির কথাগুলো সুরথ আর সমাধির। খুবই সত্যি কথা বলেছেন মুনিবর—মহামায়ার মহামায়া। তা নইলে এত আপন হয়েও সবাই এত পর হবে কেন? কিন্তু, কে তিনি? কোথায় থাকেন?

সুরথ আর সমাধি সেই মহামায়াকে জেনেছিলেন অনেক পরে।

দেবী মাহাত্ম্য

মধু-কৈটভ ও মহামায়া

ব্রহ্মার একটা কল্প শেষ হয়ে গেছে। মানে, ব্রহ্মার একটা দিন গেল (পৃথিবীতে মানুষের কিন্তু কাটল চারশ বত্রিশ কোটি বছর)।

ব্রহ্মার একটা দিন শেষ হয়, পৃথিবীতেও নামে প্রলয়। কোথা থেকে যে এই সময় আসে ঝড়-জল-ভূমিকম্প, কে জানে! পৃথিবীর আকাশ ঢেকে যায় মেঘে। নামে মুষলধারায় বৃষ্টি। চলে একটানা। থামবার নাম করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নদী-নালা উপচে, সাগর-সমুদ্র বাড়িয়ে, পাহাড়-পর্বত গাছপালা সমেত মানুষজন যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা জলের তলায় তলিয়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ চলতে থাকে এরকম। যা কিছু ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন নিজে, তাও শেষ হল—সব ধ্বংস হয়ে গেল। এই সময়ে আবার যোগনিদ্রা এসে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন ভগবান বিষ্ণুকে।

এমন ভাবেই শেষ হয়ে গেছে ব্রহ্মার একটা কল্প। চারদিকে থই

থই করছে জল। যোগনিদ্রায় ঘুমোচ্ছেন ভগবান সেই জলের ওপরেই।

বহুদিন ধরে শুয়ে আছেন ভগবান বিষ্ণু। সৃষ্টি আর নেই, সুতরাং তাকে রক্ষা করা বা পালন করার কাজও নেই। যোগনিদ্রায় তিনি নিশ্চিন্ত। ইতিমধ্যে তাঁর দু-কানে যে জমে গেছে ময়লার পাহাড়, আর সেই ময়লা থেকে বেরিয়ে এসেছে দুটো বিকটাকার অসুর মূর্তি, তা তিনি টেরও পান নি। সে দুটো অসুরের মধ্যে একটার নাম হল মধু, আর একটার নাম হল কৈটভ।

বেরিয়ে এসেই তারা শুরু করল তর্জন-গর্জন—কাকে মারি? কাকে খাই?

চারদিকে তাকিয়ে দেখে তারা শুধু জল আর জল। কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল, জলে কে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাসছে, আর তার নাভির ওপর চুপ করে বসে আছে একজন।

প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মাই আশ্রয় নিয়েছিলেন ওখানে, কেমন করে তা জানবে মধু-কৈটভ? যাই হোক, খাদ্য তো একটা পাওয়া গেছে! আপাতত ওকেই মেরে খাওয়া যাক।

এই ভেবে তারা দু-জন তেড়ে গেল ব্রহ্মার দিকে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখলেন মহা বিপদ। ঐ অসুর-দুটোকে রোখার মত শক্তি তাঁর কোথায়? এদিকে চোখ বুজে এমন ঘুম ঘুমোচ্ছেন বিষ্ণু যে কোন সাড়া-শব্দই নেই। ওদের রুখতে যদি কেউ পারেন তবে একমাত্র উনিই পারবেন। এখন যে ভাবেই হোক, ভগবান বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগাতে হবে। কাটাতে হবে তাঁর এই মহাঘোর ঘুম।

ঘুমোলে কি কারো জ্ঞান থাকে? আর জ্ঞান না থাকলে ন্যায়-অন্যায় বোঝার ক্ষমতাই-বা কোথা থেকে আসবে? আর অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে রুখেই-বা দাঁড়াবে কে, কোন শক্তি?

অমন যে ভগবান, অনন্ত যাঁর শক্তি, এমনভাবে মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যদি তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে তো আর সর্বনাশের শেষ থাকবে না!



ব্রহ্মা তাই ভগবান বিষ্ণুকে জাগাবার জন্য শুরু করলেন যোগনিদ্রার স্তব-স্তুতি।

বলতে শুরু করলেন নিদ্রা দেবীকে—দেবি! আমি জানি অসীম তোমার শক্তি। তোমার গুণেরও শেষ নেই। তোমার শক্তিই তো ভগবানের শক্তি। আমি জানি, তুমিই জাগিয়ে রাখো, আবার তুমিই ঘুম পাড়িয়ে দাও।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।।

তুমি মহাবিদ্যা, যে বিদ্যা অজ্ঞানতা দূর করে। তুমি মহামায়া, যার ফলে একে অপরের মায়ায় পড়ে যায়। তুমিই বিশ্বের বুদ্ধি, স্মৃতি, মহাশক্তি। আবার তুমিই মহামোহ। যার ফলে প্রাণী তার বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। দেবী, তুমিই সব। দেখ, মহাসুর মধু-কৈটভ আমাকে বধ করতে আসছে। তুমি যদি এখন ভগবানকে না জাগিয়ে তোল, অসুরদের যদি মোহগ্রস্ত করে না ফেল, তাহলে যে সব যাবে। সকলের মা হয়ে তুমি কি তাই চাও? দয়া কর মা, ভগবানকে ছেড়ে তুমি ঐ অসুরদের মোহাচ্ছন্ন কর। আমাকে বাঁচাও, যাতে আবার সব কিছু সৃষ্টি হতে পারে।

যোগনিদ্রা মহামায়া ব্রহ্মার স্তব শুনে ভাবলেন, তাই তো। ব্রহ্মা হলেন একমাত্র প্রজাপতি, যিনি আবার সৃষ্টি করবেন বলে বিষ্ণুর আশ্রয়ে রয়েছেন। ব্রহ্মাকে অসুররা মেরে ফেললে সত্যি সত্যিই তো সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে। এই ভেবে ভগবান বিষ্ণুকে ছেড়ে যেতেই চোখ মেলে তাকালেন তিনি। কেটে গেল বিষ্ণুর ঘুমের ঘোর।

চেয়েই দেখেন, শুকনো মুখে ব্রহ্মা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। আর বিকটাকার দুটো অসুর নখ-ভরতি হাতের দুটো থাবা তুলে, হাঁ করে এগিয়ে আসছে তাঁদের দিকে—মিশমিশে কালো যেন দুটো যম!

সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন ভগবান বিষ্ণু। মধু-কৈটভও এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর—কে তো কে? কতক্ষণই-বা লাগবে ওকে শেষ করতে, এমন একটা ভাব।

কিন্তু দেখল, যতটা সহজ হবে ভেবেছিল, ঠিক ততটা সহজ হল না। দু-জনে মিলেও কিছুতেই তাঁকে আর কায়দা করতে পারছে না।

হাতে-হাতে লড়াই, যাকে বলে বাহুযুদ্ধ, চলতে লাগল তো চলতেই লাগল। দেখতে দেখতে লড়াইয়ের মধ্যেই কেটে গেল পাঁচ হাজার বছর। কেউই হারে না, আবার কেউই জেতে না।

হঠাৎ অসুররা লড়াই থামিয়ে ভগবান বিষ্ণুকে বলে বসল—বাহাদুর বটে তুমি। আমরা খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমাদের কাছে বর চাও। যা চাইবে তাই দেব।

ভগবান বিষ্ণু বললেন—তোমরা আমাকে বর দিতে চাও, খুব ভাল কথা। তবে বাপুরা, তোমাদের কাছে আমার একটাই মাত্র চাইবার আছে। তা যদি দাও, তাহলে বলি।

—অবশ্যই দেব। কথা যখন দিয়েছি, তখন নিশ্চয়ই দেব। বল, কি চাই?

—তোমরা দু-জনেই আমার হাতে মরবে। এ ছাড়া তোমাদের কাছে আমার আর কিছু চাইবার নেই। বললেন ভগবান বিষ্ণু।

অসুররা বলল—এই কথা! বলে চারদিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে বলল—বেশ, মারবে। তোমার হাতেই আমরা মরতে রাজি। তবে জলে নয়, ডাঙায় মারতে হবে।

ওরা ভাবল, যে চালাকি ওরা খাটিয়েছে, সাধ্য কি বিষ্ণুর যে তাদের মারে? মহামায়ার কৌশলে বুদ্ধির মাথা খেয়েছিল ঐ বোকার দল। তাই কল্পনাও করতে পারে নি, রেহাই তারা পাবে না।

এদিকে ভগবান বিষ্ণু এবার ধরলেন নিজের রূপ। চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে সেই সুবিশাল জলরাশির ওপর এমন

ভাবে বসলেন যে, জলের ওপর শুকনো জায়গা নেই। এরপর নিজের দাবনার ওপর তাদের শুইয়ে নিজের চক্র দিয়ে তাদের গলা কেটে দিলেন।

জলে লুটিয়ে পড়ল মধু আর কৈটভের মৃতদেহ।

মধু-কৈটভকে মেরে সৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখার জন্য এভাবে এলেন মহামায়া, ব্রহ্মার স্তবে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যখনই প্রয়োজন পড়েছে, মহামায়া এসেছেন রূপ ধরে। বিনাশ করেছেন শত্রুদের মোহাচ্ছন্ন করে।

[অনেকের মতে, অসুর মধু-কৈটভের সেই বিশাল দেহ একদিন জল সরিয়ে মাটি হয়ে জেগে উঠেছিল। তাই পৃথিবীর এক নামই হয়ে গেল 'মেদিনী'।]



মহিষাসুর ও মহামায়া

ভগবান বিষ্ণুর চক্রে মধু-কৈটভ নিহত হয়েছে। শেষ হয়ে গেছে ব্রহ্মার রাত। সকাল হতে না হতেই আবার শুরু করেছেন সৃষ্টি। মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, দেবতারা দেবলোকে, মানুষরা পৃথিবীতে, পাতালে অসুররাও সৃষ্টি হল।

শুরু করে দিয়েছে যে যার কাজ। নিশ্চিন্ত দেবলোক।

ওদিকে অসুররা দেখতে দেখতে এমন বলশালী হয়ে উঠল যে এক সময় তারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবরাজ্য আক্রমণ করে বসল। প্রতিটি অসুরই এক একটা মহাবল। তার ওপর আবার শিবের বলে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর হয়ে বসেছে তাদের নেতা, তাদের রাজা।

[সিন্ধুদ্বীপ নামে এক রাজা নির্জনে বসে তপস্যা করছিলেন। তখন মাহিষ্মতী পুরীর দৈত্য বিপ্রচিত্তির মেয়ে তাঁকে দারুণ ভয় দেখিয়েছিল। ঋষির তাতে ধ্যান ভেঙে গিয়েছিল বলে রেগে তিনি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন 'মহিষী হও' বলে। মহিষাসুর তারই ছেলে। অনেকে আবার বলেন, দু-ভাই ছিল, রম্ভ আর করম্ভ। দু-জনেই নিজেদের শক্তি বাড়ানোর জন্য তপস্যা শুরু করেছিল। করম্ভ যখন নদীর জলে দাঁড়িয়ে দারুণ তপস্যা করছিল, দেবরাজ ইন্দ্র তখন কুমীরের রূপ ধরে তাঁকে টেনে নিয়ে মেরে ফেলেন। রম্ভ তখন মনের দুঃখে এমন তপস্যা করল যে, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 'অমর হও' বর দিলেন। সে খুশি মনে যেতে যেতে পথে দেখল এক মহিষীকে। তাকেই বিয়ে করে যখন বাড়ি যাচ্ছিল, তখন আর এক অসুর তাদের আক্রমণ করে রম্ভকে মেরে ফেলে। মহিষাসুর এই রম্ভরই ছেলে, আর ব্রহ্মার বলে বলীয়ান।]

যুদ্ধ বাধল দেবতাদের সঙ্গে। সে এক দারুণ যুদ্ধ। একশ বছর ধরে চলল সেই যুদ্ধ। শেষে দেবতারা গেলেন হেরে। দেবরাজ ইন্দ্র তখন পুরন্দর। স্বর্গরাজ্য ছেড়ে ভয়ে পালালেন তিনি। পালালেন দেবতারাও। মহিষাসুর হয়ে বসল ইন্দ্র। দেবতরা প্রাণভয়ে মানুষের বেশে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান আর ভাবেন, কিভাবে আবার তাঁরা নিজেদের রাজ্যে ফিরে যাবেন। এদিকে মহিষাসুর একাই এমন দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে চলেছে যে, কাউকে কোন অভাব বুঝতে দিচ্ছে না।

ভাবতে ভাবতে দেবতারা একদিন গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা আবার তাঁদের নিয়ে গেলেন বিষ্ণু আর শিবের কাছে। কেননা, মহিষাসুরকে বাগে আনার ক্ষমতা তাঁর নেই। যদি থাকে তো আছে—একমাত্র বিষ্ণু আর শিবেরই আছে।

মহিষাসুরের দম্ভ আর দেবগণের নিগ্রহের কথা শুনে রাগে লাল হয়ে উঠল বিষ্ণু আর শিবের মুখ। সেই সঙ্গে ব্রহ্মার নিজেরও। বুক কাঁপিয়ে তাঁদের নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল ঘনশ্বাস, যেন



আগুনের হল্কা। দেবতারা দেখলেন, তাঁদের তিন জনেরই সেই তেজ জমতে জমতে যেন পাহাড় হয়ে গেল। বিরাট সেই পাহাড়টা যেন জ্বলছে। তারপরই দেখলেন, পাহাড় কোথায়? এ যে দারুণ এক নারীমূর্তি।

দেখেই দেবতারা সজাগ হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, নিশ্চয়ই এবার পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। শিবের তেজ থেকে হল তাঁর মুখ, যমের তেজে কেশরাশি, বিষ্ণুর তেজে হাত। অপূর্ব সেই নারীমূর্তিকে দেখে, দেবতারাও যার যা শক্তি ছিল, তাই দিতে শুরু করলেন তাঁকে। চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পৃথিবী, ব্রহ্মা, সূর্য, অষ্টবসু (ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনল, প্রত্যূষ, আর প্রভাস—এঁরাই তখন ছিলেন বসু), কুবের, দক্ষ প্রভৃতি যাঁর যা তেজ ছিল, তাই দিয়ে গড়ে তুললেন সেই নারীমূর্তিকে। জ্বলজ্বল করে এমন জ্বলে উঠল সেই নারীমূর্তি যে, দেবতাদেরও চোখ গেল ধাঁধিয়ে। সেই নারীর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে শক্তি যেন ফেটে পড়ছে। এবার যদি ওঁর হাতগুলিতে হাতিয়ার পড়ে, তাহলে অসুরদের সাধ্য কি যে সামনে এসে দাঁড়ায়!

সব দেবতার হাতেই ছিল নানা রকমের হাতিয়ার। তাঁরা ঠিক করলেন, তা থেকেই হাতিয়ার তৈরি করে তুলে দেবেন ঐ নারীর হাতে। ভাবা মাত্রই কাজ।

শিব তাঁর ত্রিশূল থেকে, আর বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র থেকে ত্রিশূল আর চক্র তৈরি করে দিলেন দেবীকে। বরুণদেব দিলেন

বিশাল শাঁখ, অগ্নিদেব আরো শক্তি, পবনদেব দিলেন ধনুকের সঙ্গে দুটো তূণীর। দেবরাজ পুরন্দর তাঁর বজ্র আর বাহন ঐরাবতের গলার ঘণ্টা থেকে আর এক বজ্র ও ঘণ্টা তৈরি করে দিলেন দেবীর হাতে। যম দিলেন দণ্ড, বরুণ দিলেন পাশ অস্ত্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা দিলেন রুদ্রাক্ষের মালা আর কমণ্ডলু। ক্ষীরসমুদ্র থেকে শুরু করে আর সব সমুদ্র দেবীকে সাজিয়ে দিল নানা আভরণে, মণি-মুক্তায়। বিশ্বকর্মা দিলেন কুড়ুল থেকে শুরু করে নানারকম অস্ত্র, সেই সঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। গিরিরাজ হিমালয় দিলেন বাহন সিংহকে, আর এক কলসী মধু, যা খেলে কখনো কলসী ফুরোবে না।

নানা অস্ত্রশস্ত্র হাতে সিংহবাহিনী দেবী ভগবতীর সে কি মূর্তি তখন! তাঁর বিকট হাসিতে কেঁপে উঠল বিশ্ব-চরাচর। দেবী ছাড়তে শুরু করলেন ঘন ঘন হুঙ্কার। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল গমগম করে উঠল সেই শব্দে।

দেখে-শুনে দেবতাদের আনন্দ দেখে কে? সেই নারীমূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে দেবতারা একসঙ্গে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—জয়, দেবী ভগবতীর জয়! দেবী ভগবতীর জয়!

দেবীর সেই অট্টহাসি আর হুঙ্কার গিয়ে পৌঁছল মহিষাসুরের কানে।

হঠাৎ এমন হুঙ্কার তোলে কে? মহিষাসুর তার সেনাপতি আর সেনাদের নিয়ে ছুটল সেই শব্দ লক্ষ্য করে। গিয়েই দেখে, এক নারী। আগুনের মত টকটক করছে তাঁর রং। চোখ দুটো যেন পলাশের মত লাল। দশ হাতে নানা অস্ত্র। সিংহের পিঠে বসে তিনি ছাড়ছেন রণহুঙ্কার।

মহিষাসুর দেখে একটু অবাকই হল। এ আবার উৎপাত করতে কোথা থেকে এল? অমন মন্দ মন্দ দেবতারা কোথায় তলিয়ে গেল, শেষে কিনা লড়াই করতে এল এক নারী! শখটা এসেছে যখন, তখন ভাল করেই মিটিয়ে দেওয়া যাক। রাজার নির্দেশে মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর আর চামর চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল দেবীকে।

সেনাপতিদের সঙ্গে এসে যোগ দিল মহিষাসুরের মহাবল অনুচররা তাদের সুবিশাল বাহিনী নিয়ে। অসুর উদগ্র ছ-অযুত (ষাট হাজার), মহাহনু এক হাজার অযুত (এক কোটি), অসিলোম, পঞ্চাশ নিযুত (পাঁচ কোটি), বাস্কলাসুর ছ-শ অযুত (ষাট লক্ষ) রথ নিয়ে, আর পারিবারিষ, বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি অসুররা যে যেখানে ছিল কোটি কোটি রথ-হাতি-ঘোড়া নিয়ে ঘিরে ফেলল দেবী দুর্গাকে। ছুঁড়তে শুরু করল তাদের হাতের মারাত্মক সব অস্ত্র। দেবতারা সে সব অস্ত্রের তেজ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তফাতে দাঁড়িয়ে মহিষাসুর হাসছে মিটিমিটি। একে মেয়েছেলে, তায় আবার যুদ্ধের শখ! দেখ, এবার মজা!

মদমত্ত অহঙ্কারী মহিষাসুর তখনো ধারণাই করতে পারে নি যে, মজা দেখাতে এসে নিজেদেরই মজা দেখতে হবে। লক্ষ লক্ষ তীর চারদিক থেকে নানা রঙের ঝিলিক তুলে আকাশ-পথে উড়ে চলেছে দেবীর দিকে। পরমুহূর্তেই মহিষাসুর শুনল ধনুকের টঙ্কারের শব্দ, আর এক সঙ্গে হাজার হাজার তীর ছুটে এসে মাঝপথেই কেটে টুকরো টুকরো করে দিল তার সেনাদের তীরগুলোকে। সেই সঙ্গে চতুরঙ্গ বাহিনীর হাতি, ঘোড়া, পদাতিকরাও যে যার অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিল তাঁকে। মহিষাসুর দেখল, কেউ একটা অস্ত্রের আঘাত তাঁর শরীরে বসাতে তো পারলই না, তার ওপর দেবীর হাতের খাঁড়ায়, শূলে, চক্রে বীর অসুর সেনাদের প্রাণ লুটিয়ে পড়তে লাগল। কারো শরীর হল ছিন্ন-ভিন্ন। রক্তের নদী বয়ে গেল; আর্তনাদে আর চিৎকারে ভরে গেল রণাঙ্গন। মহিষাসুর আরো দেখল, সিংহবাহিনী সেই নারী এক হাতে শাঁখের বুক-কাঁপানো শব্দ তুলে, আর সব হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেপরোয়া ভাবে মারতে শুরু করে দিয়েছেন। ঝলসে ঝলসে উঠছে তাঁর হাতের ত্রিশূল, খাঁড়া, গদা, শূল, ভিন্দিপাল, পট্টিশ। মাংসের তাল হয়ে অসুর সেনারা লুটিয়ে পড়ছে। কেউ-বা কবন্ধ হয়ে খাঁড়া তুলে ছুটে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে। মহিলা হয়েও অত সেনার মধ্যে তিনি বাধিয়ে তুলেছেন তুলকালাম কাণ্ড। উদগ্র, করাল, উদ্ধত, তাম, অন্ধক, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য, মহাহনু, বিড়ালাক্ষ, এমনকি মহিষাসুরের দুই দুর্ধর্ষ সেনাপতি চিক্ষুর, চামরও মারা পড়ল। মহিষাসুর দেখল, বাহন সিংহও ছিন্নভিন্ন করছে তার সেনা। আবার কোথা থেকে দেবীর সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে হাজার হাজার সেনা। দুর্বুদ্ধি মহিষাসুর কেমন করে জানবে যে, শিবের অনুচররা এসে যোগ দিয়েছে তাঁর সঙ্গে।

দেখতে দেখতে মহিষাসুরের মাথা গেল গরম হয়ে। ত্রিলোকবিজয়ী মহিষাসুর সে। সকলকে হারিয়ে দাপটের সঙ্গে যে রাজত্ব করেছে, তাকে হার স্বীকার করতে হবে সামান্য এক নারীর কাছে! অসুর সে। যেমন জানত অনেক রকমের বিদ্যে, তেমনি খুশি মত ধরতে পারত যে কোন শরীর।

আর স্থির থাকতে না পেরে মহিষাসুর বিকটাকার মহিষের রূপ ধরে শিং উঁচিয়ে, খুরের দাপটে মাটি কাঁপিয়ে, নিঃশ্বাসে ঝড় তুলে ফুঁসে গেল দেবীর সৈন্যের দিকে। তার বাকি সেনারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাউকে শিং দিয়ে, কাউকে লেজ দিয়ে, কাউকে খুর দিয়ে আঘাত করে মহিষাসুর উন্মত্তের মত মেরে চলল দেবীর সৈন্যদের। তার পায়ের দাপটে পৃথিবী উঠল কেঁপে, সাগরের জল উঠল দুলে। শিং দিয়ে পাহাড়ের বুক থেকে বড় বড় পাথর তুলে ঘন ঘন ছুঁড়তে শুরু করল সে দেবীর দিকে।

একে তো দেবীর চোখই লাল, তার ওপর রাগে আরো লাল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। দেবীর সেনাদের মারতে মারতে ইতিমধ্যে অনেক কাছে এসে গেছে মহিষাসুর।

কাছাকাছি আসতেই দেবী চণ্ডী ছুঁড়লেন পাশ। মহিষাসুর পাশে আটকে যেতেই মহিষ রূপ ছেড়ে পাশ মুক্ত হয়ে ধরল সিংহের রূপ; তর্জনে-গর্জনে বিকট দাঁত বের করে যেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে দেবীর ঘাড়ে, দেবী চণ্ডীর খাঁড়ার আঘাতে শরীর থেকে তার মাথাটা গেল ছেড়ে। মহিষাসুরও সঙ্গে সঙ্গে ধরল পুরুষবেশ। বিকটাকার পুরুষ। গায়ে কঠিন বর্ম, হাতে ঢাল। দেবীর হাতের মারাত্মক বাণ এসে বিঁধল তার বুকে। সহ্য করতে না পেরে মহিষাসুর এবার ধরল প্রকাণ্ড এক হাতির আকার। বিশাল শুঁড় দিয়ে দেবীর বাহন সিংহকে জড়িয়ে ধরে যেই টানতে যাবে, সজোরে তাঁর শুঁড়ের ওপর নেমে এল দেবীর হাতের খাঁড়া। কেটে গেল শুঁড়। শুঁড় না থাকলে হাতির আর শক্তি কোথায়? আবার ধরল মহিষের রূপ। শুরু করল আবার আগের মত উৎপাত। পাহাড় ভেঙে ছুঁড়তে শুরু করল পাথর। দাপাদাপিতে আবার দুলে উঠতে লাগল সমুদ্রের জল।

দেববরে বলীয়ান মহিষাসুরকে যে সহজে কায়দা করা যাবে না,

তা জানতেন দেবী। মহিষের রূপ ধরে আবার যখন উৎপাত শুরু করল সে, দেবী চণ্ডী তখন গিরিরাজ হিমালয়ের দেওয়া মধুর কলসী থেকে মধু খেতে খেতে বললেন, 'নে, খুব ভাল করে নেচে-কুঁদে নে। মধু খাওয়াটা শেষ করি। তারপর এখানে দেবতারা নাচবেন, দাঁড়া।'

হলও ঠিক তাই। মধু পান শেষ করে দেবী চণ্ডী এক লাফে গিয়ে চেপে বসলেন মহিষাসুরের পিঠে। নিজের পা দুটো দিয়ে তার গলা এমনভাবে রগড়াতে লাগলেন যে, গলাটাই বুঝি থেঁতলে যায়। আর কি ভার! সেই সঙ্গে দেবী সজোরে তার বুকে বসিয়ে দিলেন শূল।

হতভম্ব মহিষাসুর। তবুও মহিষরূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে গেল আবার মহিষাসুরের চেহারা নিয়ে। অর্ধেক শরীরটা মাত্র বেরিয়েছে। দেবীর মুখের দিকে তাকাতে গিয়েই তার চোখ গেল আটকে। তার মনে হল, শরীরের সব শক্তি যেন কোথায় উবে গেল। আর সেই সুযোগে দেবী তার গলায় বসিয়ে দিলেন খাঁড়া।

মারা গেল ত্রিলোকবিজয়ী মহিষাসুর দেবী চণ্ডীর হাতে। দেখে অসুর সেনারা যে যেদিকে পারল, প্রাণ নিয়ে পালাল।

স্বর্গে বেজে উঠল দুন্দুভি। নেমে এলেন দেবতারা, জানালেন প্রণাম। শুরু করলেন স্তব-স্তুতি। গন্ধর্বরা সেই সঙ্গে শুরু করল গান। দেবতাদের বিজয় উৎসব।

দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হলেন দেবী চণ্ডী। অভয় দিলেন—বিপদে পড়ে তোমরা যখনই মন-প্রাণ দিয়ে ডাকবে, আমি আসব, আবার আমার দেখা পাবে।

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কাহিনী



মোহের ফাঁদে শুম্ভ-নিশুম্ভ

মহামায়া মহাশক্তি দেবী চণ্ডী (দেবতারা তাঁকে অবশ্য আরো অনেক নামে স্তব-স্তুতি করেছিলেন। যেমন, অম্বিকা, কাত্যায়নী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি) মহিষাসুরকে বধ করার পর চারদিকে আবার শান্তি ফিরে এসেছিল। দেবতারা দেবলোকে, মানুষরা পৃথিবীতে আবার যে যার কাজ নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু বেশি দিন থাকল না কপালে সুখ-শান্তি।

ইতিমধ্যে শুম্ভ আর নিশুম্ভ নামে দুই অসুর দারুণ বলশালী হয়ে পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল। তাদের মদতে অসুরকুলও হয়ে উঠল বেপরোয়া। এক-আধটা নয়—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে অসুর। নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পৃথিবীতে আবার তারা শুরু করে দিল অত্যাচার। কিন্তু, পৃথিবী তো নাম-মাত্র। তাদের লক্ষ্য সব সময় স্বর্গরাজ্যের দিকে।

তাই সুযোগ বুঝে তারা আক্রমণ করল স্বর্গরাজ্য। হেরে গেলেন দেবরাজ, পালিয়ে গেলেন স্বর্গরাজ্য ছেড়ে। সেই সঙ্গে বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য যিনি যেখানে ছিলেন, সবাই পালালেন। কেউই দাঁড়াতে পারলেন না শুম্ভ-নিশুম্ভের সামনে। স্বর্গরাজ্যে অমরাবতীর ইন্দ্রের সিংহাসনে বসেছে দু-ভাই। এতই দাপট তাদের যে, নিজেরাই সূর্য-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ হয়ে কাজ চালাতে লাগল। কাউকে বুঝতেই দিল না কোন অভাব।

নিরাশ্রয় দেবকুল। নিরুপায় হয়ে আবার মনে-প্রাণে ডাকতে শুরু করলেন সেই মহাশক্তি মহামায়াকে—মাগো, মহিষাসুর বধের পর তুমি আমাদের কথা দিয়েছিলে, বিপদে পড়ে আবার তোমাকে ডাকলে, তুমি আসবে। মাগো, শুম্ভ-নিশুম্ভের হাতে সব খুইয়ে বিনা অপরাধে আমরা ভিখিরি হয়ে গেছি। আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। মা, তুমিই সব। তুমি ছাড়া কে আছে আমাদের?

হিমালয়ে গিয়ে দেবতারা যখন অম্বিকাকে এ ভাবে ডাকছিলেন, তখন জাহ্নবীতে স্নান করতে যাবার জন্য আসছিলেন পার্বতী। দেবতাদের ঐভাবে স্তব করতে দেখে দাঁড়ালেন তাঁদের সামনে। জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁগো, তোমরা কাকে অমন করে ডাকছ? কি হয়েছে তোমাদের?

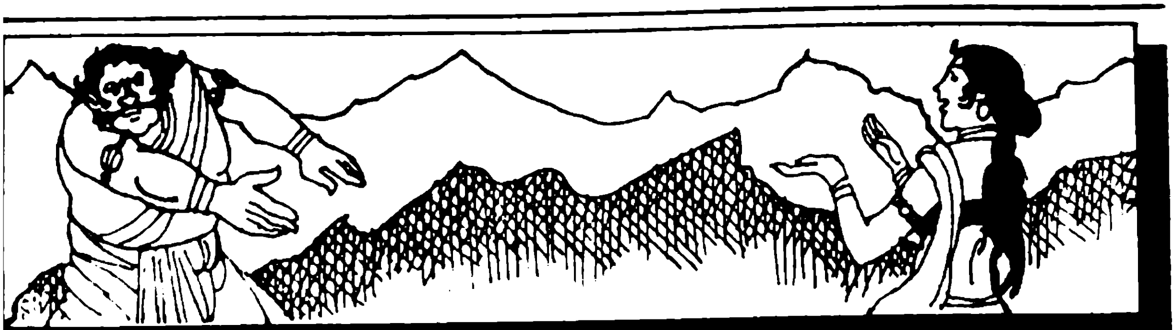
উত্তর দিতে হল না দেবতাদের। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই পার্বতীর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন এক নারীমূর্তি। অপরূপা—যেমন তাঁর দেহের গড়ন, তেমনি গায়ের রং। পার্বতীর শরীর থেকে বেরিয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল 'কৌষিকী'। আবার অনেকে অম্বিকাও বলতেন। কৌষিকী আবির্ভূতা হতেই পার্বতীর দেহের সেই লাবণ্য আর রইল না। তিনি হয়ে গেলেন কালিবর্ণ। তাই পার্বতীর নাম হয়ে গেল কালী। কালীর অপর মূর্তি সেই নারী কৌষিকী বললেন পার্বতীকে—তুমি জানতে চাইছ ওরা কারা স্তব করছে? ওরা কি বলবে? আমার কাছে শোন। ওরা সবাই দেবতা। অসুর নিশুম্ভ যুদ্ধ করে ওদের হারায়। আর, নিশুম্ভর ভাই অসুর শুম্ভ স্বর্গরাজ্য থেকে ওদের দূর করেছে। তারা নিজেরাই এখন দেবতা সেজে বসেছে। ওরা তাই আমাকেই মন-প্রাণ দিয়ে ডাকছে, ওদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। আমি ওদের কথা দিয়েছিলাম, বিপদে পড়ে মন-প্রাণ দিয়ে ডাকলেই আমি আসব।

সেই সময় শুম্ভ-নিশুম্ভর দুই অনুচর চণ্ড আর মুণ্ড ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছিল হিমালয়ের ঐ পথ ধরেই। তারা দেখল কৌষিকী (অম্বিকা)-কে। দেখল, কি অপরূপ দেখতে সেই নারীকে। এমন সুন্দরী কোন নারী আজ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি তাদের। তাদের রাজাদের অনেক মহিষী আছে ঠিকই, কিন্তু এই নারীর সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে [illegible] রাজার কাছে। গিয়ে বলল—হিমালয়ে দেখে এলাম [illegible] না নেই তার। একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে [illegible] হবার যোগ্য। এ নারী [illegible] কোন [illegible]

[illegible]

সবা[illegible] ছিল নেই[illegible] তো এক



বলল—তুমি এখনই হিমালয়ে যাও। যে সুন্দরী রমণী সেখানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে গিয়ে আমাদের ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের কথা শোনাবে। এমনভাবে শোনাবে যাতে সেই রমণীর মনে লোভ জাগে, আর আমাদের বিয়ে করে রানী হতে রাজি হয়।

রাজার আদেশ। সুগ্রীব এল হিমালয়ে। দেখল, সত্যিই ঘুরে বেড়াচ্ছে এক অপরূপ রমণী। একা একা। কাছে গিয়ে বলল—আমার নাম সুগ্রীব। এখন যাঁরা বাহুবলে দেবতাদের হারিয়ে হয়ে আছেন ইন্দ্র, আমি তাদের দূত। এসেছি আপনার কাছে কটি কথা বলতে।

অম্বিকা জানতে চাইলেন—কি কথা?

—কেন এভাবে জীবনটাকে নষ্ট করছেন? যেখানে যত ঐশ্বর্য আছে, সবই এখন আমার রাজাদের। আপনি রানী হয়ে সেই সব ঐশ্বর্য ভোগ করুন। এই রকম কষ্ট করে থাকা কি আপনার সাজে?

শুনে অম্বিকা বললেন—তোমার কথায় রাজি হতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু পারছি না যে—

—কেন? জিজ্ঞেস করে সুগ্রীব।

—দেখ, আমি যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে যে আমাকে হারাতে পারবে, সে-ই হবে আমার স্বামী।

—ও প্রতিজ্ঞা এখন মনে ঠাই দিও না। শুম্ভ-নিশুম্ভের মত বীর এই তিন জগতে আর কেউ নেই। দেখছ না, দেবতারাও তাদের সঙ্গে পারে নি। আর তুমি একজন নারী হয়ে...! খবরদার...খবরদার, ও কথা মুখেও এনো না।

হাসি হাসি মুখ অম্বিকার। বললেন—বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করব? প্রতিজ্ঞা যখন করে ফেলেছি, তখন তো আর উপায় নেই। তুমি বরং ফিরে গিয়ে তাদের এ কথা বল। শুম্ভ বা নিশুম্ভ, যে কেউ আসুক। যুদ্ধ করে হারিয়ে আমাকে নিয়ে যাক। তাহলে দু-দিকই বজায় থাকবে।

সুগ্রীব বলল—নারী, এখনও বলছি, ও কথা মুখে এনো না। যাদের ভয়ে দেবতারা পালায়, তুমি করতে চাও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ। মান-সম্মান দুই-ই খোয়াবে। ও-আশা ছেড়ে দাও।

দেবীর তবু সেই একই কথা—প্রতিজ্ঞা কেমন করে ভাঙি, বল?

শুনে সুগ্রীব গেল রেগে—ঠিক আছে, আমি এই কথাই গিয়ে বলব। তখন রগড়টা দেখবে।

চলে গেল সুগ্রীব। মুচকি মুচকি হাসলেন অম্বিকা।

হাঁফাতে হাঁফাতে সুগ্রীব এসে শুম্ভ-নিশুম্ভকে বলল সব কথা। শুনেই তো অসুর-রক্ত উঠল চনমন করে। কি! সামান্য এক নারী, তার এত দম্ভ।

হুঙ্কার ছাড়ল অসুররাজ শুম্ভ—ধূম্রলোচন...ধূম্রলোচন!

সেনাপতি ধূম্রলোচন ছুটে এল ডাক শুনেই।

—বলুন, কি করতে হবে?

—তোমার যত সৈন্য-সামন্ত আছে, তা নিয়ে এখুনি হিমালয়ে যাও। চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে এসো মেয়েটাকে। যদি কেউ বাধা দিতে আসে, সে দেবতা, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব এমন কি গন্ধর্বদের গুরু তুম্বুরুও যদি হয়, একেবারে খতম করে দেবে। যাও। যেভাবেই হোক চুলের মুঠি ধরে তাকে এখানে আনা চাই-ই।



ধূম্রলোচনের আস্ফালন

রাজাদেশে সঙ্গে সঙ্গে ধূম্রলোচন বেশ কিছু সেনা নিয়ে ছুটল হিমালয়ে। গিয়ে দেখলেন দাঁড়িয়ে আছেন অম্বিকা।

ধূম্রলোচন বলল—এত অহঙ্কার তোমার কিসের? ঐটুকু মেয়ে, চাইছ আমাদের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে? তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তোমাকে হারিয়ে তবে তোমায় নিয়ে যেতে হবে?

মৃদু হাসতে হাসতেই দেবী বললেন—কি আর করব বল। প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, এখন তো আর কিছু করার নেই।

শুনে খুবই রেগে উঠল ধূম্রলোচন—প্রতিজ্ঞা করেছি! এখুনি যদি গিয়ে তোর চুলের মুঠিটা ধরি, থাকবি কোথায়? কে বাঁচাবে তোকে? ওসব ছাড়, ভাল চাস তো ভালো মানুষের মত চলে আয়।

দেবী বললেন—অনেক অস্ত্রশস্ত্র, অনেক সেনা নিয়ে এসেছ তুমি। জোর করে যদি ধরে নিয়ে যাও, অবলা নারী আমি কি করতে পারি?

—হ্যাঁ, তাই নিয়ে যাব। বলেই ধূম্রলোচন এগিয়ে যেতে লাগল অম্বিকার দিকে।

কাছাকাছি যেতেই অম্বিকা দেবী ছাড়লেন এক হুঙ্কার।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ দিয়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত আগুন ধকধক করতে করতে।

সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ধূম্রলোচন।

অত যে আস্ফালন, নিমেষে শেষ।

দেবীর বাহন সিংহ যে এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে, দেখতেও পায় নি কেউ।

ধূম্রলোচনের ঐ অবস্থা দেখে যে যার অস্ত্র তুলে মার...মার করতে করতে ছুটে আসবে কি, সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাউকে থাবায়, কাউকে দাঁতে, কাউকে নখে, কাউকে লেজে শুরু করে দিল মার। মার তো মার, এমন মার যে, কোন অস্ত্রশস্ত্রও কেউ কাজে লাগাবার সুযোগ পেল না। প্রাণ গেল সকলের। নদী বইয়ে দিল রক্তের ধূম্রলোচনের সেনাদের মধ্যে।

খবর এল শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে।

অসুর-রাজদের রাগ তখন দেখে কে?

ডাক দিল চণ্ড আর মুণ্ডকে।

ছুটে দু-জনে এসে দাঁড়াতেই অসুর-রাজ আদেশ দিল—যাও, তোমরা যাও। খবর এনে তো তোমরাই দিয়েছ। যেমন করে পার, চুলের মুঠি ধরে, বেঁধে, যেভাবে হোক, তুলে নিয়ে এসো মেয়েটাকে।



চণ্ড-মুণ্ডের দম্ভ

অসুর-রাজ শুম্ভের আদেশে সঙ্গে সঙ্গে হাতি-ঘোড়া-রথ-পদাতিক সৈন্য নিয়ে শিঙা বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ল চণ্ড আর মুণ্ড।

অসুরদের মধ্যে যারা মহাবীর হিসেবে অসুর-রাজের সুনজরে ছিল, তাদের মধ্যে এরা হল দু-জন।

যাবার সময় ওরা অসুর-রাজকে এমন ভান দেখিয়ে গেল যেন—খবর এনে আমরাই দিয়েছিলাম, আপনি আনতে পারলেন না। ঠিক আছে, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরাই এনে দিচ্ছি।

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে চণ্ড-মুণ্ড গেল হিমালয়ের সেখানে, যেখানে তারা দেখে এসেছিল অম্বিকাকে। গিয়ে দেখে সেখানেই সে একটা সিংহের পিঠে বসে রয়েছে।

—গিয়েই চণ্ড-মুণ্ড হুকুম দিল সেনাদের যাও, ঘিরে ফেল।মেরে ফেল সিংহটাকে। তুলে নিয়ে এসো মেয়েটাকে।

দুরন্ত অসুরসেনাদল শুরু করল এগোতে।

ওদিকে চণ্ড-মুণ্ডর কথা শুনেই দেবীর কপাল গেল কুঁচকে, রাগে ভুরু গেল বেঁকে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে এল কদাকার দেখতে বিকট এক নারীমূর্তি। ঘোর কালো তার গায়ের রং। গায়ে মাংস নেই বললেই হয়। শুধু হাড় আর চামড়া। গলায় একটা মালা। মালাটা আবার মানুষের মুণ্ডু দিয়ে তৈরি। পরনে বাঘের ছাল। লকলক করছে জিভ। চোখ দুটো কোটরের ভেতর। তা থেকে ঠিকরে পড়ছে আগুন। তাঁর নাম হল চামুণ্ডা। [দুর্গা পূজার সময়ে যে সন্ধিপূজা হয়, যাকে কথায় বলে 'খ্যানের পুজো', সেই সময় এই চামুণ্ডা দেবীরই পূজা হয়।]

দেবীর কোঁচকানো কপাল, কুটিল ভ্রূকুটি আর রাগে কালো মুখ থেকে চামুণ্ডা বেরিয়েই হাত বাড়িয়ে লকলকে জিভ নিয়ে তেড়ে এল অসুর সেনাদের দিকে। চোখের পলকে এক একটাকে ধরে, আর মুখে পুরতে শুরু করে। দেখতে দেখতে পদাতিকরা হাড়-মাংস নিয়ে চলে গেল তার পেটে। তারপর হাতির সঙ্গে মাহুত-সমেত অসুর যোদ্ধা, ঘোড়া-সমেত অশ্বারোহী সেনা—অস্ত্র ছোঁড়ার সুযোগ আর কেউ পায় না। একেবারে সব চলে যেতে থাকে তার মুখের ভেতর, আর কড়মড় শব্দ ওঠে বাতাস কাঁপিয়ে। একদিকে চিবিয়ে চলেছে তো চলেছেই, আর একদিকে আবার কাউকে চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে আছাড় মারছে। কাউকে পায়ের তলায় থেঁতলে দিচ্ছে, কাউকে-বা বুকে জোরে মেরে কুপোকাত করে দিচ্ছে চামুণ্ডা।

এতক্ষণ তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল চণ্ড-মুণ্ড।

যখন দেখল তার চতুরঙ্গ সেনা শেষ, তখন আর স্থির থাকতে না পেরে দুজনেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে চামুণ্ডাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল অসংখ্য তীর। তীরে তীরে ঢেকে গেল সূর্যের আলো। যেন চারদিকে নেমে এল অন্ধকার। চণ্ড-মুণ্ড ভাবল, এবার...!

কিন্তু পরমুহূর্তে—কোথায় অত তীর, আর কোথায়ই-বা অন্ধকার! চণ্ড-মুণ্ড দেখল, সব তীরগুলো ঢুকে গেছে তার মুখে। আর মনের সুখে হাড় চিবোনোর মত করে সেগুলো চিবোচ্ছে চামুণ্ডা। সেই সঙ্গে তার সে কি বিকট হাসি!

সিংহের পিঠে বসে দেবী অম্বিকা দেখছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন।

চামুণ্ডা এরপর বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে বিশাল এক খাঁড়া নিয়ে ছুটে গেল চণ্ডের দিকে। লুটিয়ে পড়ল চণ্ডের মাথা।

চণ্ডকে মারা যেতে দেখে মুণ্ড এগিয়ে আসবে কি, তারও ধড় থেকে মাথা গেল নেমে। কবন্ধ হয়ে সেও লুটিয়ে পড়ল পাহাড়ে। বীরের দম্ভ শেষ।

দুই অসুরের মুণ্ডদুটি এনে চামুণ্ডা দেবীর পায়ে দিয়ে আবার যে কোথায় মিলিয়ে গেল, কেউ দেখতেও পেল না।

চণ্ড-মুণ্ডের মত তাদের দুই বীর যোদ্ধাও সৈন্য-সামন্ত সমেত মারা গেল শুনে রাগে অধৈর্য হয়ে উঠল শুম্ভ-নিশুম্ভ।

পাগলের মত প্রাসাদের ঘণ্টা দিল বাজিয়ে। ছুটে এল অসুর বীররা, যে যেখানে ছিল।

হুকুম হল অসুর-রাজের—যার যা সেনা আছে সব নিয়ে তোমরা বেরিয়ে পড়। ধূম্র গেল, মুণ্ড গেল, চণ্ড গেল। আমাদের এত বড় বড় বীর সেনাপতিরা কি এতই কাপুরুষ যে, একটা মেয়েকে ধরে আনতে গিয়ে প্রাণ দেয়?

বেজে উঠল ডঙ্কা। পড়ে গেল সাজ-সাজ রব। মহাসুরেরা জড়ো হল চতুরঙ্গ বাহিনীদের নিয়ে। কম্বুকুল, কোটিবীর্য, কাসক, মৌর্য, কালকেয়—যে যেখানে ছিল কোটি কোটি সেনা নিয়ে এসে হাজির হল। অসুর-রাজ শুম্ভ-নিশুম্ভও তৈরি হয়ে নিল।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তারা চলল হিমালয়ে, সেই সুরূপা মেয়েটিকে ধরতে।



রক্তবীজের রক্তপান

সুবিশাল বাহিনী নিয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ হিমালয়ে আসতেই অম্বিকার (দেবী চণ্ডী) হাতের বিশাল ঘন্টা উঠল বেজে, সেই সঙ্গে সিংহ ছাড়ল হুঙ্কার। ঘন্টার শব্দ আর হুঙ্কারে পাহাড় উঠল গমগম করে। অসুরদের বুকও ছমছম করে উঠল। তবুও আতঙ্ক কাটিয়ে রণহুঙ্কার উঠতেই অসুররা চাঙ্গা হয়ে আক্রমণ করতে গেল দেবীকে। পাহাড় দুলে উঠল তাদের পায়ের দাপটে, কেঁপে উঠল তাদের হুঙ্কারে।

এগোতেই হা-হা করে ছুটে এল দেবীর কপাল থেকে জন্ম হয়েছিল যার, সেই চামুণ্ডা। অস্থিসার দেহ, গলায় নরমুণ্ডের মালা, পরনে বাঘের ছাল, কোটর চোখে আগুনের হল্কা। ঝড়ের মত দেবী চামুণ্ডা দু-হাত বাড়িয়ে বিকট হুঙ্কার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সুবিশাল বাহিনীর ওপর। চোখের পলকে অসুরের দল চলে যেতে লাগল তার পেটে।

কোটি কোটি সেনা নিয়ে এসেছে বীরদের সঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভ। একা যখন চামুণ্ডা লড়ে চলেছে তাদের সঙ্গে, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে ইন্দ্র পর্যন্ত দেবতারা দেবী চণ্ডীকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন তাঁদের নিজ নিজ শক্তিকে।

জপমালা আর জল-ভরতি কমণ্ডলু হাতে ব্রহ্মাণী; ত্রিশূল হাতে মাহেশ্বরী; তীর-ধনুক হাতে ঠিক কার্তিকের মত দেখতে দেবী কৌমারী; শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে বৈষ্ণবী; বরাহের মূর্তি ধরে দেবী বারাহী; নরসিংহের মূর্তি ধরে দেবী নারসিংহী; বজ্র হাতে ইন্দ্রের মূর্তি ধরে দেবী ঐন্দ্রী এলেন। এঁরা আসামাত্রই অম্বিকা ধরলেন চণ্ডীর রূপ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যেন ডেকে উঠল হাজার হাজার শেয়াল।

এমন সময় মহাদেব শিব এলেন চণ্ডীর কাছে। বললেন—আর কেন, এবার শেষ কর অসুরদের।

চণ্ডী বললেন—তার আগে শিব, তোমাকে এক বার শুম্ভ-নিশুম্ভর কাছে যেতে হবে। গিয়ে তাদের সকলকে বলবে, আমি বলে পাঠিয়েছি, যদি তারা ভাল চায় স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে পাতালে যাক। আর যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধই করতে চায় বলবে, তারা যেন আমার শিয়ালদের খোরাক হবার জন্য তৈরি হয়।

চণ্ডীর ইচ্ছানুযায়ী দূত হয়ে শিব গেলেন শুম্ভ-নিশুম্ভ আর অসুর বীরদের কাছে। শোনালেন দেবীর কথা।

শোনা মাত্রই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সবাই।

দূতকে অগ্রাহ্য করে তুলল রণহুঙ্কার। দেবী চণ্ডীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে শুরু করল ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ। চামুণ্ডাও ধরল করাল মূর্তি। অসুরদের সব বাণ বিফল তো হলই, এমন কি যেন ঘূর্ণীঝড়ের মত ঘুরে ঘুরে কাউকে মুখে পুরতে লাগল, কাউকে চুলে ধরে আছাড় দিতে শুরু করল। আর প্রাণভয়ে যারা এদিক ওদিক পালাতে চেষ্টা করল, তারা হয় ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নয়তো বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রীর হাতে প্রাণ দিতে লাগল।

এভাবে অনেক, অনেক সেনা যখন প্রাণ হারাল, যখন অসুররা দেখল ক্রমশ হীনবল হয়ে আসছে, তখন রক্তবীজ অসুর আর স্থির থাকতে পারল না। সরোষে গদার সঙ্গে আর সব হাতিয়ার নিয়ে এক এক করে আক্রমণ করতে শুরু করল দেবীশক্তিদের। ঐন্দ্রীর গদা, বৈষ্ণবীর চক্র, কৌমারীর তীর নির্মমভাবে এসে আঘাত হানতে শুরু করল তাকে। রক্তবীজের শরীর ক্ষতবিক্ষত হল। যত রক্ত পড়ে মাটিতে, আর যেখানে যেখানে পড়ে সেখান থেকেই মাটি ফুঁড়ে যেন উঠে আসতে শুরু করে অসুর দল। রক্তবীজ যেন মরেও মরে না।

দেখে দেবতারা পড়লেন মহা চিন্তায়।

কিন্তু দেবী হেসে উঠলেন। ডাকলেন চামুণ্ডাকে। বললেন—শোন চামুণ্ডা, রক্তবীজের একফোঁটা রক্তও যেন আর মাটিতে না পড়ে।

চামুণ্ডা সঙ্গে সঙ্গে দেবীর আদেশে মুখ হাঁ করে গিলতে আরম্ভ করল রক্তবীজের রক্ত। একটা ফোঁটাও আর পড়ে না মাটিতে। গজিয়ে ওঠে না অসুরের দল। একদিকে দেবীশক্তিদের অস্ত্রের নির্মম আঘাত, অপরদিকে চামুণ্ডার রক্তপান—ক্রমে ক্রমে এমন হীনবল হয়ে পড়ল রক্তবীজ যে, আর দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত রইল না। রক্তশূন্য হয়ে মরে গেল।

দেবতারা ছাড়লেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

কিন্তু শুম্ভ আর নিশুম্ভ? যার ওপর তাদের ছিল সবচেয়ে বেশি ভরসা, তাকে ঐভাবে মরে যেতে দেখে প্রথমে খানিকটা হতোদ্যম হল বটে, কিন্তু পর মুহূর্তেই দাবানলের মত জ্বলে উঠল তারা। তখনও পর্যন্ত যে সেনারা বেঁচে ছিল, তাদের নিয়ে এবার নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধক্ষেত্রে।



শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ

ঝকমক করা চামড়ার বর্ম গায়ে, হাতে ধারালো খাঁড়া নিয়ে উন্মত্তের মত নিশুম্ভ এগিয়ে এসে প্রথমেই দেবীর বাহন সিংহকে হানল এক প্রচণ্ড আঘাত। দেবী চণ্ডীও সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাঁড়া দিয়ে নিশুম্ভের খাঁড়াকে দিলেন টুকরো টুকরো করে, তার বর্মকেও দিলেন ছিন্নভিন্ন করে।

শুরু হয়ে গেল নিশুম্ভের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর দারুণ লড়াই। গদা, শূল, পাশ, যে অস্ত্রই ছোঁড়ে নিশুম্ভ, দেবীর অস্ত্রের কাছে আসামাত্রই



তা পুড়ে হয়ে যায় ছাই। তবুও বীর বিক্রমে লড়াই করে চলে নিশুম্ভ। হঠাৎ দেবীর এক তীর এসে বিঁধতেই জ্ঞান হারিয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল।

ভাই নিশুম্ভকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে দেখে রথ নিয়ে শুম্ভ এগিয়ে আসতে লাগল দেবীর দিকে সসৈন্যে।

দেবী চণ্ডী তাকে আসতে দেখে একবার বাজালেন সেই শাঁখ আর ঘণ্টা, যার আওয়াজ বুকের রক্ত জল করে দেয়। সিংহও তুলল হুঙ্কার, দেবী চামুণ্ডা বিকট হাসি হেসে দিল এক তুড়ি লাফ। সসৈন্যে শুম্ভও বিকট আওয়াজ তুলতে তুলতে দেবীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল দারুণ তেজী এক শক্তি (অস্ত্র)। শুম্ভের হাতে এমন সব অস্ত্র ছিল, আর এত উন্নত ধরনের সে সব হাতিয়ার, কারো সাধ্য ছিল না তা রোখার। আগুনের হল্কা তুলে শক্তিকে ছুটে অসতে দেখে দেবী এমন এক অস্ত্র ছুঁড়লেন, যাতে তা ছিটকে পড়ে গেল অন্য জায়গায়। শুম্ভ এবার ধনুক তুলে ছুঁড়তে শুরু করল মারাত্মক সব তীর। হাসতে হাসতে দেবী তা তো কেটে দিলেনই, শেষে হানলেন শূলের আঘাত। প্রচণ্ড সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে নিশুম্ভের মতই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল শুম্ভ।

ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে নিশুম্ভ। চোখ মেলে চেয়ে উঠেই দেখে, পড়ে আছে শুম্ভ। হাতে তুলে নিল ধনুক। দেবীকে লক্ষ্য করে শুরু করল অস্ত্র ছুঁড়তে। একের পর এক সব ভয়ঙ্কর অস্ত্র। কিন্তু দেবী চণ্ডীর হাতের আরো সব ভয়ঙ্কর অস্ত্রের কাছে সব বিফল হয়ে গেল।

আর নয়। দেবী চণ্ডী এবার এগিয়ে এসে নিশুম্ভের বুকে সজোরে বিঁধিয়ে দিলেন তাঁর হাতের মারাত্মক শূল। বুক গেল এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে। নিশুম্ভ লুটিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু তার ক্ষতস্থান থেকে উঠে এল আর দুই অসুর—মহাবল আর মহাবীর্য। দেবীকে তারা আক্রমণ করার আগেই তলোয়ারের কোপে দেবী দিলেন তাদের মাথা নামিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভীত অসুর সেনাদলের মধ্যে দেবী চামুণ্ডা শুরু করল নৃত্য। নির্বিবাদে চিবিয়ে খেতে লাগল তাদের হাড়-মাংস, পান করতে লাগল রক্ত। ওদিকে দেবীশক্তিরা নিধন করে চললেন পালিয়ে যাওয়া অসুরদের।

জেগে উঠল শুম্ভ। ক্ষত-বিক্ষত ভাই নিশুম্ভকে মরে পড়ে থাকতে দেখে আক্রোশে ফুলে উঠল সে।

ক্রোধে রক্তলোচন শুম্ভ দেবীকে লক্ষ্য করে বলে উঠল—তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। প্রতিজ্ঞা করেছিলে, একা যুদ্ধ করবে। নির্লজ্জ! এখন এতগুলো শক্তির সাহায্য নিয়ে লড়াই করে বড়াই করছ?

শুনে হাসলেন দেবী। বললেন—মূর্খ। তোর যদি বোঝার ক্ষমতা থাকত এরা কারা, তাহলে তো তুই অসুর হতিস না। এরা আমাকে সাহায্য করছে ঠিকই, তবে কেউ বাইরে থেকে আসে নি। তোর ভাড়া করা সেনাদের মত নয় এরা। এরা কেউ পর নয়, আমার আপন, আমার এক একটা রূপ। শোন—

> একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
> পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।

—আমি ছাড়া এ জগতে দ্বিতীয় কে আর আছে? সব বিভূতি আমার এরা, আমার মাঝেই রাজে।।—বলেই সকলকে নিলেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে।

শুম্ভ দেখল, সত্যিই তো। কোথায় কে? এই যে চোখের সামনে এতক্ষণ ধরে যে সব মহিলারা উদ্দাম নৃত্য করছিল, বিনাশ করছিল তার সেনাদের, কোথায় গেল তারা। সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র তো এক

জনই মহিলা।

শুম্ভের সঙ্গে দেবী চণ্ডীর এবার বাধল ঘোর সংগ্রাম। তীরে-তীরে, শূলে, গদায়-গদায়, খাঁড়ায়-খাঁড়ায়—শুম্ভ বলে আমায় দেখ, তো দেবী বলেন আমায় দেখ।

লড়াই চলল এভাবে বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য শুম্ভের। দেবীর অবিরাম প্রহারে শুম্ভের ধনুক গেল, পাশাস্ত্র গেল, শূল গেল, গদা গেল। এমন কি, রথটা পর্যন্ত অকেজো হয়ে গেল।

দেবীর সঙ্গে শুম্ভ এবার শুরু করল বাহুযুদ্ধ। হঠাৎ দেবীকে প্রচণ্ড এক মুঠির আঘাত হেনে বসল শুম্ভ। দেবীও সঙ্গে সঙ্গে এমন এক চড় মারলেন শুম্ভকে যে, ছিটকে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

আবার উঠে এল অসুর শুম্ভ। মারবিদ্যায় ওস্তাদ ওরা।

আচম্বিতে দেবীকে ধরে তুলে নিয়ে গেল শূন্যে। সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রহার করতে শুরু করল দেবীকে। দেব, গন্ধর্ব সকলে হায়-হায় করে উঠলেন। এখন কি হবে। কিন্তু সকলেই দেখে রুদ্ধশ্বাসে। সেই মহাশূন্যেও দেবী সমানে বাহুযুদ্ধ করে চলেছেন শুম্ভের সঙ্গে। আকাশ বুঝি তোলপাড় হয়ে যায়।

মহাশূন্যে সেই বাহুযুদ্ধ চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

হঠাৎ এরই এক ফাঁকে অম্বিকা সুকৌশলে শুম্ভকে ধরে লাটুর মত ঘুরিয়ে সজোরে ফেলে দিলেন নীচে।

মাটি কাঁপিয়ে নীচে এসে আছড়ে পড়ল শুম্ভ, আর মারা গেল। অম্বিকাকে ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে রানী করে নিয়ে যাবার শখ মিটে গেল।

স্বর্গরাজ্য আবার ফিরে পেলেন দেবতারা। ত্রিভুবনে আবার শান্তি ফিরে এল।

দেবতারা নানারকমে স্তুতি করলেন দেবী অম্বিকার। প্রার্থনা জানালেন—দেবী, তুমিই আমাদের বল, তুমিই আমাদের ভরসা। জগতের জননী তুমি মা নারায়ণী, আমরা তোমারই শরণাগত। তুমি আমাদের ওপর প্রসন্ন থেকে আমাদের রক্ষা করো।

সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন—তোমরা আমার কাছে বর চাও, আমি দেব।

দেবতারা বললেন—বিশ্বে যাতে অশান্তি না থাকে, অসুররা যেন নিধন হয়, মাগো, এই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

দেবী বললেন—শোন দেবগণ, বৈবস্বত মনুর কালে দ্বাপর আর কলির মাঝে এই শুম্ভ-নিশুম্ভ অন্য অসুর হয়ে জন্ম নেবে। তখন নন্দগোপের ঘরে যশোদার গর্ভে জন্মে বিন্ধ্যাচলে থেকে আমি এদের বিনাশ করব। আবার একশ বছর ধরে যখন অনাবৃষ্টিতে জল শুকিয়ে যাবে, আমি পার্বতীর দেহ থেকে শতাক্ষী নামে আবির্ভূতা হব। আর যতদিন বৃষ্টি না হবে আমি শাক খাইয়ে প্রাণিকুলকে বাঁচিয়ে রাখব, তখন সবাই আমাকে বলবে 'শাকম্ভরী'। এই সময়ে আবার এক অসুর আসবে। তার নাম 'দুর্গম'। তাকে আমি বধ করে হব 'দুর্গা'। আবার হিমালয়ে ভীমাদেবী নামে আবির্ভূতা হয়ে রাক্ষসদের নিধন করব। অরুণাসুর নামে এক অসুর আবার এক সময়ে প্রবল হয়ে উঠে অত্যাচার শুরু করবে। তখন ভ্রমরের বেশে আবার আমি আসব 'ভ্রামরী' নামে।

জগতের কল্যাণের জন্য তোমরা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাও। জেনো, আমি আছি, আমি থাকব।

আদর্শ গুরুসেবা

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অঙ্গিরার ভূতি নামে একটি ছেলে ছিলেন।

মহর্ষির ছেলে হলে কি হবে, ভূতি নিজেও ছিলেন বেশ শক্তিধর ঋষি। কঠোর তপস্যা করে এত শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন যে সকলেই তাঁকে রীতিমত সমীহ করে চলতেন। ছিলেন দারুণ রাগী। কথায় কথায় দারুণ রেগে উঠতেন। হারিয়ে ফেলতেন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান। যাকে পেতেন, তাকেই অভিশাপ দিয়ে বসতেন। কোন কটু কথা তাঁর মুখে আটকাতই না।

মুনি ভূতিকে তাই সকলেরই ভয়। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ু—সব দেবতারাও থাকতেন তটস্থ হয়ে। ভয়ে তাঁর আশ্রমে সূর্য এমন তাপ দিতেন না যাতে মুনির গরম লাগে। বায়ুও বইতেন শিরশির করে, যাতে তাঁর ভাল লাগে। ভূতি যজ্ঞের জন্য যজ্ঞকুণ্ডে যে আগুন জ্বেলেছিলেন, কাঠ (সমিধ) ঠিক-ঠিকমত এসে না পড়লেও ভয়ে অগ্নিদেব কুণ্ড-মধ্যে জ্বলতেই থাকতেন।

একদিকে এই দারুণ খিটখিটে মেজাজ, আর একদিকে বহুদিন কোন ছেলেপুলেও হয় নি তাঁর। সেজন্য মুনির মনে একটা দুঃখও ছিল। তাই যাতে তাঁর ছেলে হয়, বংশরক্ষা হয়, তার জন্য তিনি নিজেকে একবার সংযত করে, প্রাণধারণের জন্য নামমাত্র খেয়ে শুরু করেছিলেন তপস্যা। বহুদিন ধরে করলেন তপস্যা। কিন্তু কোন ফল না পেয়ে রেগে-মেগে তপস্যাই দিলেন ছেড়ে। আর তাঁর মেজাজ হয়ে গেল আরও খিটখিটে।

শান্তি নামে তাঁর এক শিষ্য ছিল। মনটা ছিল সরল। প্রাণ ছিল উদার। অত রাগী গুরু তাঁর। তবুও গুরু ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন না। গুরুই ছিল তাঁর জ্ঞান, গুরুই তাঁর ধ্যান। যা বলতেন গুরু, যত কঠিনই হোক সে কাজ, হাসিমুখে করতেন।

সুবর্চা নামে ভূতির এক ভাই ছিলেন। একবার তিনি ঠিক করলেন, একটা যজ্ঞ করবেন। আর সেই যজ্ঞে কাজ করার জন্য নিয়ে যাবেন দাদা ভূতিকে।

সুবর্চা এসে দাদাকে অনুরোধ জানাতে ভূতিও রাজি হয়ে গেলেন।

শিষ্য শান্তিকে ডাকলেন ভূতি। বললেন—শোন, আমি ভাই-এর যজ্ঞে যাচ্ছি। যতদিন না ফিরি, আমার এই যজ্ঞকুণ্ডকে তুমি জাগিয়ে রাখবে। দেখো, যেন আগুন নিভে না যায়।

গুরুর আদেশ—যথা আজ্ঞা।

ভাই-এর যজ্ঞে চলে গেলেন ভূতি। আর যজ্ঞকুণ্ড রক্ষা করতে লাগলেন শান্তি।

একদিন শান্তিকে আশ্রম ছেড়ে যেতে হল বনে। কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, সমিধও চাই। বনে ঘুরে ঘুরে সেসব যোগাড় করলেন শান্তি। তারপর মাথায় নিয়ে পিঠে বেঁধে আশ্রমে ফিরে দেখেন, যজ্ঞ-কুণ্ডের আগুন গেছে নিভে। পড়ে আছে শুধু ছাই।

ভয়ে শুকিয়ে গেল শান্তির মুখ। কেঁপে উঠল বুক। গুরুদেব যে আগুন নিজের হাতে জ্বেলে রেখে গেছেন, তাকে জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তাঁকে। কিন্তু এ কি হল? গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়েও পারলেন না। এসে যদি গুরু এই অবস্থা দেখেন, রেগে উঠবেন। আর গুরু যদি রেগে অভিশাপ দিয়ে বসেন, তাহলে কারো সাধ্য নেই যে তাঁকে বাঁচাবে।

খুবই চিন্তায় পড়লেন শান্তি। এখন কি করা যায়। নতুন করে আগুন জ্বেলে রাখবেন কুণ্ডে? কাজটা তো শক্ত নয়। কিন্তু গুরু



হলেন প্রত্যক্ষদর্শী মুনি। গুরুর চোখকে ফাঁকি দেবেন সে সাধ্য তাঁর কোথায়? বুঝতে পেরে তিনি নিশ্চয়ই আরো রেগে উঠবেন। তখন সর্বনাশের আর শেষ থাকবে না।

অনেক ভেবে-চিন্তে শিষ্য শান্তি একটা পথই বেছে নিলেন—অগ্নিদেবের স্তুতি। এক মনে অগ্নিদেবকে স্মরণ করে তিনি তাঁর গুণাবলী কীর্তন করে চললেন—অগ্নিদেব, তুমি ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে, যার আশ্রয়ে আছে তাবৎ প্রাণী। তুমি সৃষ্টি করছ, তুমি পালন করছ, আবার তুমিই সংহার করছ। দেব, তোমার কাছে যদি আমি কোন অপরাধ করে থাকি, আমায় ক্ষমা কর। গুরুর অভিশাপের হাত থেকে তুমি আমায় রক্ষা কর,দেব।

যখন এমনভাবে শান্তি অগ্নিদেবের কাছে আকুলি-বিকুলি করছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আবির্ভূত হলেন শান্তির সামনে। আলোয় আলো হয়ে উঠল চারদিক। দেখে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল শান্তির। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন তাঁকে। তাঁর ডাকে যে অগ্নিদেব সাড়া দিয়ে দেখা দিয়েছেন, এতেই যেন কৃতার্থ হয়ে গেছেন শান্তি।

অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে বললেন—শান্তি, খুব ভাল লেগেছে তোমার স্তব। খুব খুশি আমি। বল, কি চাই তোমার? যা চাইবে, তাই দেব।

শান্তি হাতজোড় করে বললেন—দেব, আমার গুরুদেব তাঁর জালানো আগুন-সমেত যজ্ঞকুণ্ড রক্ষা করার ভার দিয়ে গিয়েছেন ভাই-এর যজ্ঞে। আমি সেই আগুনকে জাগিয়ে রাখতে পারি নি দেব। আমারই অপরাধে তা নিভে গেছে। আমার প্রার্থনা, সেই যজ্ঞকুণ্ডকে আবার আপনি জাগিয়ে দিন। গুরুদেব এসে যেন দেখেন, যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

—বেশ, তাই হবে। তোমার গুরুর যজ্ঞকুণ্ড যেমন ছিল তেমনি থাকবে। বললেন অগ্নিদেব—আর কি প্রার্থনা তোমার,বল?

শান্তি বললেন—দেব! আমার গুরুদেবের কোন ছেলে নেই। সে জন্য তাঁর বড় মনোকষ্ট। আপনি যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে বরই দিতে চান তাহলে আমার প্রার্থনা, আমার গুরুদেবের যেন এমন একটি ছেলে হয়,যার গুণে পৃথিবী মুগ্ধ হয়ে যাবে।

শুনে অগ্নিদেব বললেন—খুব ভাল লাগল শান্তি। তুমি দুটো বর চাইলে, দুটোই তোমার মহাশক্তিধর গুরুদেবের জন্য। নিজের জন্য একটা বরও চাইলে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো শান্তি, তোমার গুরু ভূতির এমন এক ছেলে হবে যে হবে মনু। সকলের কাছে সে সম্মানিত হবে 'ভৌত্য মনু' নামে।

অগ্নিদেব বিভাবসু এ কথা বলেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

মনে খুব আনন্দ এখন শান্তির। আশ্রমে ফিরেই দেখলেন, যজ্ঞকুণ্ডে যেমন আগুন জ্বলছিল তেমনভাবেই জ্বলছে আগুন। গুরুর আদেশ যে শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছেন, এই ভেবেই শিষ্য শান্তির মন ভরে উঠল আনন্দে।

ইতিমধ্যে ভাই-এর যজ্ঞ সেরে গুরুদেব ভূতি-মুনি আশ্রমে ফিরতেই জল নিয়ে ছুটে গেলেন শিষ্য শান্তি। বেশ ভাল করে পা ধুইয়ে-মুছিয়ে প্রণাম জানালেন। আসন পেতে দিলেন। ভূতি-মুনি এসে বসলেন আসনে।

বসেই মুনি একবার চারদিক দেখে নিলেন। যজ্ঞকুণ্ডে আগুন যেমনভাবে জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন দেখলেন, ঠিক সেই ভাবেই জ্বলছে। মনে হল, তাঁর মনের ভেতর কেমন যেন একটা ভাব জেগে উঠছে। অমন যে খিটখিটে মেজাজ, কথায় কথায় কটু বাক্য বলা—সেই মনটাই যেন হারিয়ে গেছে। তার জায়গায় ইচ্ছে জাগছে সকলকে ভালবাসতে—তা সে মানুষ থেকে পশু যা-ই হোক। নিজেই ভেবে এর কোন কূল-কিনারা করতে না পেরে শিষ্য শান্তিকে বললেন—কেন আমার মনে এমন ভাব আসছে বলতে পার?

গুরুদেবের কাছে কোন কিছু লুকিয়ে যাওয়া, গোপন রাখা অপরাধ। শিষ্য শান্তি তা ভালই জানতেন। তাই বললেন—গুরুদেব, তা আমি কেমন করে বলব? তবে ওখানে আপনি যাওয়ার পর...

যা যা ঘটেছিল সব কিছু শান্তি শোনালেন গুরুদেবকে।

শুনে, শিষ্য শান্তির গুরুশ্রদ্ধায় ভূতি-মুনির দু-চোখ গেল জলে ভরে। বুকে জড়িয়ে ধরলেন শিষ্যকে। প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন।

গুরুর আশীর্বাদে শান্তি পরে হয়ে উঠেছিলেন মহাজ্ঞানী।



রাজ্যবর্ধনের কাহিনী

দমরাজার ছেলে রাজ্যবর্ধন। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয়পাত্র। জ্ঞানে-গুণে-ক্ষমতায় দ্বিতীয় এমন কেউ ছিল না যার সঙ্গে তুলনা চলত তাঁর। যেমন ভালবাসত তাঁকে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সব প্রজারা; তেমনি ভালবাসতেন সামন্ত রাজারাও। সকলের কাছেই তিনি যেন ছিলেন আপনজন। দরবার থেকে অন্দরমহল পর্যন্ত দ্বার খোলা থাকত সকলের জন্য। দাক্ষিণাত্যের রাজা বিদুরথের মেয়ে মানিনী ছিলেন তাঁর রানী। তাঁরও গুণের তুলনা ছিল না। যেমন রাজা, তেমনি রানী।

একদিন অন্দরমহলের দেউড়িতে বসে রাজা রাজ্যবর্ধন। স্নান করতে যাবেন। রানী মানিনী সযত্নে নিজের হাতে তাঁর মাথায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলেন, আর রাজাও খোশ মেজাজে বসে বসে গল্প করছিলেন সামন্ত রাজা, বয়স্ক প্রজা আর অনুরাগীদের সঙ্গে।

মাথায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছিলেন রানী মানিনী—যেন প্রতিটি চুলের ওপর বুলিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর তেলমাখা হাত। দিতে দিতে হঠাৎ একসময় তাঁর ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। সামনে বসে অতগুলো রাজা-রাজড়া থেকে মানী পুরুষ, তাই কান্না পেলেও কেঁদে উঠতে পারছেন না কিছুতেই। তাই কান্না চাপবার চেষ্টা করেন। আর যত কান্না চাপবার চেষ্টা করেন, ততই চোখ ফেটে জল পড়তে থাকে ফোঁটা ফোঁটা করে। কয়েক ফোঁটা জল রাজার গায়ে এসে পড়তেই মুখ তুলে রাজা দেখেন, রানীর চোখে জল। এমন কি ঘটল হঠাৎ যে, রানী কাঁদতে শুরু করলেন?

—কি হল রানী, তোমার চোখে জল? কাঁদছ, কি হল? উদগ্রীব হয়ে ওঠেন রাজা।

কোন জবাব দেন না রানী। ভেতরে ভেতরে কান্না আরও ফুঁপিয়ে ওঠে তাঁর। যারা ছিল সামনে বসে, তারাও তা দেখে চুপ।

আবার জিজ্ঞেস করেন রাজা—কোন সঙ্কোচের কারণ নেই তোমার, রানী। বল, তোমার চোখে জল কেন?

কোনরকমে রানী বললেন—না, কিছু না।

—কিছু না ঘটলে কেউ কি কাঁদে? বললেন রাজা—তোমার চোখে জল তো এতদিন দেখি নি। আজ কেন?

রাজার অনুরোধের ওপর অনুরোধ—আর এড়াতে পারলেন না রানী। বললেন—এই দেখুন। এটা দেখেই আমার কান্না পেয়ে গেছে রাজা। কেন এমন হল? বলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের গোছার ভেতর থেকে কয়েক গাছা পাকা চুল টেনে এনে দেখালেন তিনি রাজাকে।

এতক্ষণ রাজা ভাবছিলেন, হয়ত-বা অন্য কোন কারণে রানী কাঁদছেন। এখন, কান্নার কারণ জেনে হেসে উঠলেন হো হো করে।

তারপর বললেন—রানী, এর জন্য কি কেউ কাঁদে? বয়স তো আর কম হল না, চুল পাকার আর দোষ কি বল?

শুনে রানী উঠলেন আরো ফুঁপিয়ে।

—ছিঃ রানী, অমন করে কেঁদো না। বলেন রাজা—তুমি তো আর অবুঝ নও। বয়স কি কারো এক জায়গায় থেমে থাকে? বয়স বাড়ে। মৃত্যুর দিন ক্রমশ এগিয়ে আসে। তারপর একদিন চলে যেতে হয়। এটাই নিয়ম। আর মৃত্যু যে এগিয়ে আসছে চুল পাকা, দাঁত পড়া, গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে যাওয়া, অল্পতেই হাঁফিয়ে পড়া—এসবই তার লক্ষণ। তারপর একটু থেমে এবার বললেন রাজা তাঁর মনের কথা—কদিন ধরেই ভাবছি, আর কেন? অনেকদিন তো হল। এবার ছেলেদের হাতে রাজ্য দিয়ে বাকি জীবনটা বনে গিয়ে বানপ্রস্থে কাটাব।

এতক্ষণ সামন্ত রাজা থেকে প্রজার দল চুপ করে শুনছিলেন সব। রাজার শেষ কথাটা শুনে তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না।

—না-না। ও কথা বলবেন না। সকলেই প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল—আপনি যদি বানপ্রস্থে তপস্যায় যান, তাহলে আমরাও যাব।

শুনে রাজা বললেন—সে কি কথা?

—হ্যাঁ মহারাজ। আপনি চলে গেলে এই পৃথিবী থেকে সুখ-শান্তি সব চলে যাবে। আপনি আমাদের রাজা হবার পর থেকে যেভাবে ধর্মকর্ম করতে পারছি, যেভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে আছি, সেভাবে আর থাকতে পারব না। আমরা তা কোন মতেই সহ্য করতে পারব না, মহারাজ।

মহারাজ বললেন—মানুষ কি চিরকাল বাঁচে? একদিন তো তাকে মরতেই হবে। তাছাড়া সাত হাজার বছর তো রাজত্ব করলাম।

—মহারাজ, আমাদের এইভাবে প্রতিপালন করে যে পুণ্য আপনি সঞ্চয় করেছেন, বানপ্রস্থে তপস্যায় গিয়ে আপনি তার কতটুকু পাবেন। বলল কিছু বৃদ্ধ প্রজা—বরং বানপ্রস্থে আপনার বদলে আমরা গিয়ে তপস্যা করি। আপনি সুস্থ শরীরে পৃথিবী শাসন করুন। নইলে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাজাবর্ধন শুনে একটু মুচকি হাসলেন। শুধু বললেন—তা কি হয়?

অন্দরমহলের দেউড়ি থেকে সবাই চলে গেল। রাজার স্নান-আহার শেষ হল। এবার বিশ্রামের পালা।

রানী মানিনীর মন কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে গেল।

নগর-শহর-গ্রাম-গঞ্জে, এমন কি রাজ্যে রাজ্যে রটে গেল, মহারাজ রাজ্যবর্ধনের আয়ু ফুরিয়ে আসছে, তিনি ঠিক করেছেন বানপ্রস্থে যাবেন।

শুনে তো হাহাকার উঠল চারদিকে।

যে যেমন ভাবে পারল যুক্তি-পরামর্শ করে শুরু করে দিল মহারাজের দীর্ঘ আয়ু কামনা করে যাগ-যজ্ঞ -দান-হোম। ব্রাহ্মণরা আবার বিশেষ করে শুরু করে দিলেন সূর্যের পূজা আর স্তব।

এভাবে যখন বেদপাঠ, স্তব-স্তোত্র চলেছে দিনে-রাতে সমানে, সেই সময় একদিন সুদামা নামে এক গন্ধর্ব আকাশ-পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখে নেমে এল। জানতে চাইল। তারপর যখন সব শুনল, গন্ধর্ব বলল—দেব বিভাবসু যদি খুশি হন, তাহলে তোমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করা তাঁর কাছে তো কিছুই নয়। তা একটা কথা বলি

শোন, এখানে ঐ দেবের আরাধনা না করে বরং আমি যেখানে যেতে বলছি সেখানে যাও।

—কোথায়? জানতে চাইলেন ব্রাহ্মণরা।

—কামরূপ পাহাড়ে গুরুবিশাল নামে এক অরণ্য আছে। দেখবে, সেখানে সিদ্ধগণের বাস। তোমরা সেখানে গিয়ে বরং এক মনে সূর্যদেবের তপস্যা কর। চট করে ফল পাবে। বলেই আবার আকাশ-পথে চলে গেল গন্ধর্ব।

ব্রাহ্মণরাও গেলেন সেই কামরূপের গুরুবিশাল অরণ্যে। শুরু করলেন নতুন করে আবার সূর্যদেবের স্তবস্তুতি।

সত্যি সত্যিই হঠাৎ একদিন ব্রাহ্মণদের সামনে আবির্ভূত হলেন সূর্যদেব।

জিজ্ঞেস করলেন—এমন ভাবে তোমরা আমার স্তব-স্তুতি করছ কেন? ভারি ভাল লাগল তোমাদের স্তব। তা কি চাই তোমাদের, বল।

ব্রাহ্মণরা প্রার্থনা জানালেন—দেব, আপনার কাছে আমাদের শুধু একটাই প্রার্থনা। আমাদের রাজা রাজ্যবর্ধন যেন দশ হাজার বছর নীরোগ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকেন। বার্ধক্য যেন তাঁর কোন দিন না আসে।

হাসলেন সূর্যদেব। বললেন—বেশ, তাই হবে।

খুশি হয়ে ব্রাহ্মণরা এসে খবর দিলেন রানীকে।

রানীর আনন্দও আর ধরে না।

রাজা রাজ্যবর্ধন দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন, খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যে রাজ্যে শুরু হয়ে গেল মহোৎসব।

রানী এসে বললেন রাজাকে।

শুনে কিন্তু রাজা পড়লেন মুষড়ে।

রানীর মুখের হাসি গেল হারিয়ে। কি হল? রাজা অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?

প্রজারাও দেখল, শুনে অবধি রাজা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন।

—কি হল রাজা? আপনি কি খুশি হতে পারলেন না? কেউ যখন কাছে নেই, সেই ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন রানী মানিনী।

—কি করে খুশি হতে পারি রানী? আমি বেঁচে থাকব দীর্ঘ জীবন নিয়ে। আমার চোখের সামনে দিয়ে তুমি একদিন চলে যাবে। আমার ছেলে, নাতি নাতনিরাও একে একে চলে যাবে। যারা আমার দীর্ঘ জীবন কামনা করে নিয়ে এল, তারাও অনেকে আর বেঁচে থাকবে না, মারা যাবে আমারই চোখের সামনে। রানী, এ সবই আমাকে দেখতে হবে। আর মুখ বুজে সব কষ্ট সহ্য করতে হবে।

শুনলেন রানী। সত্যিই তো, এ দিকটা তো কেউই ভেবে দেখে নি। মহারাজ থাকবেন একা পড়ে, আমরা সবাই চলে যাব ওঁরই চোখের সামনে দিয়ে—কষ্টের কথা তো নিশ্চয়ই। এখন উপায়? সূর্যদেবের দেওয়া বর তো আর বিফলে যাবে না।

মহারাজ রাজ্যবর্ধন বললেন—শোন রানী, এভাবে আমি একা বেঁচে থাকতে পারব না। চল, আমরাও কামরূপের সেই গুরুবিশাল অরণ্যে গিয়ে দেব বিভাবসুর তপস্যা করব। হয় তাঁকে সন্তুষ্ট করে আমারই মত দীর্ঘ পরমায়ু লাভের বর সকলের জন্য চেয়ে আনব, নয়ত প্রাণ দেব।

রাজি হলেন রানী।

দু-জনেই চলে গেলেন সেই অরণ্যে। শুরু করলেন তপস্যা—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে।

গেল দিনের পর দিন। যায় মাসের পর মাস। অনাহারে, অনিদ্রায় মহারাজ রাজ্যবর্ধনের অমন যে সুন্দর স্বাস্থ্য, তা যায় এখন শুকিয়ে। রানীরও প্রায় সেই অবস্থা।

এমনিভাবে যখন কেটে গেল একটা বছর, তখন হঠাৎ একদিন দেব বিভাবসু এসে দেখা দিলেন রাজাকে।

—তোমার নিষ্ঠায় আমি খুশি রাজা। বল, কি তোমার অভিলাষ। বললেন সূর্যদেব।

মহারাজ বললেন—দেব, যদি সন্তুষ্টই হয়ে থাকেন, তাহলে আমার একটাই মাত্র অভিলাষ আপনি পূরণ করুন। আমার রানী, সামন্ত রাজা, প্রজা, অনুরাগী, যারা যেখানে আছে আমায় ভালবাসে, তারাও যেন আমারই মত দশ হাজার বছর পরমায়ু পায়, নীরোগ থাকে, বার্ধক্য যেন তাদেরও গ্রাস না করে।

মহারাজের এই আবেদন শুনে খুবই প্রীত হলেন সূর্যদেব। বললেন—বেশ, তাই হবে।

তপস্যা-শেষে রাজা ফিরে এলেন রাজ্যে।

খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দেখতে দেখতে প্রাসাদ হয়ে গেল মেলা। সকলেই অর্ঘ্য নিয়ে আসতে শুরু করল মহারাজের কাছে।

দশ হাজার বছর...নীরোগ নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীতে বাস করবে মহারাজের প্রজারা। এ কি কম কথা।

ছিলও তাই।

এ তো আর আজকের কথা নয়, বহু বহু যুগ আগের কথা। সে রাজ্যও আর নেই, রাজাও নেই। এখনও কিন্তু তাঁর কথা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় লোকের মুখে মুখে—

রাজ্যবর্ধন রাজা।
প্রাণের চেয়েও আপন ছিল তাঁর রাজ্যের প্রজা।।
সবাই ছিল আপন তাঁর, কেউ ছিল না পর।
দেউড়ি তাঁর থাকত খোলা, থাকত খোলা ঘর।।



নাভাগা ও ভনন্দনের কাহিনী

কারূষ বংশীয় ক্ষত্রিয়রা ছিলেন মহাবীর।

নাভাগা এই বংশেরই রাজা দিষ্টের ছেলে। বীরের বংশ, ছেলেও বীর। ছেলেকে নিয়ে বাবা দিষ্টের তাই অনেক গর্ব।

একদিন নাভাগা বেড়াতে বেরিয়ে দেখল এক বণিকের মেয়েকে।

মেয়েটি দেখতে ছিল ভারি মিষ্টি। যুবক নাভাগার ভারি ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। সোজা মেয়ের বাবার কাছে গিয়ে বলল—আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব!

শুনে বণিক বললেন—সে কি কথা! আপনি ক্ষত্রিয়, আমাদের ভাবী রাজা। আমরা বৈশ্য, আপনার প্রজা।

নাভাগার কিন্তু এক জেদ। ওসব কোন কথা শুনতে সে রাজি নয়।

বণিক দেখলেন, মহা বিপদ। বললেন—মহারাজ দিষ্ট যদি জানতে পারেন, তাহলে তিনি আমার ওপর খুবই রাগ করবেন। তিনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে অবশ্যই আমার 'না' করার কিছু নেই।

—আমি ওসব কথা জানি না। বললেন নাভাগা—যদি তাই মনে হয় আপনার, তাহলে আপনি যান মহারাজের কাছে। আমি ওসব ঝামেলায় নেই।

বণিক এলেন মহারাজ দিষ্টের কাছে। শোনালেন তাঁর ছেলে নাভাগার কথা।

মহারাজ দিষ্ট পড়লেন মহা মুশকিলে। ক্ষত্রিয় হয়ে প্রথমেই বৈশ্যকন্যাকে বিয়ে? তাকালেন তাঁর সভাপণ্ডিতদের দিকে। বাভ্রব্যের মত মহা মহা পণ্ডিত ঋষিরা তাঁর সভায়।

তাঁরা বললেন, আগে নিজের কুলের কোন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিন ছেলের। তারপর বৈশ্যকন্যাকে বিয়ে করুক, আপত্তি নেই। তাতে বংশের মর্যাদা থাকবে।

কথাগুলো ভাল লাগল না নাভাগার। তিনি একদিন বণিকের বাড়ি গিয়ে জোর করে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে বললেন—এই আমি একে বিয়ে করলুম। যদি কারো ক্ষমতা থাকে আমায় বাধা দিক।

বণিক পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। ছুটতে ছুটতে তিনি এলেন মহারাজের কাছে—মহারাজ, বাঁচান...বাঁচান। আমার জাত-মান দুই-ই নষ্ট করছে আপনার ছেলে।

শুনে তো রাজা রেগে তখুনি সেনাপতিকে ডেকে বললেন—সেনাপতি, আমার ঐ কুলাঙ্গার ছেলেকে উপযুক্ত সাজা দিয়ে এসো। তেমন বুঝলে হত্যা করবে, আমার আপত্তি নেই।

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলেন সেনাপতি। নাভাগাও রুখে দাঁড়ালেন। পর্যুদস্ত হল সেনারা। সেনাবল হারিয়ে মুখ নিচু করে চলে গেলেন সেনাপতি।

দেখে রাজা দিষ্ট আর স্থির থাকতে না পেরে কুলাঙ্গার ছেলেকে বধ করতে নিজেই এলেন। পিতা-পুত্রে বাধল দারুণ লড়াই। কেউই কম যান না।

যখন দু-জনের মধ্যে চলেছে এই রকম তুমুল সংগ্রাম, মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন নারদ মুনি।

মহারাজ দিষ্টকে বাধা দিয়ে মুনি বললেন—থামুন, থামুন। এ কি করছেন আপনি। নাভাগা আপনার ছেলে হলেও এখন তো ও বৈশ্য। আর আপনি? আপনি না ক্ষত্রিয়? একজন ক্ষত্রিয় বীর হয়ে সামান্য একজন বণিকের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি আপনার মানায়, না, উচিত?

নারদ মুনি তো ঠিকই বলেছেন।

অগত্যা যুদ্ধ থামালেন রাজা দিষ্ট।

অস্ত্র নামালেন নাভাগাও।



—এরপর আপনার কি আদেশ বলুন। নাভাগা বললেন রাজাকে।

নারদ ইতিমধ্যে যে কখন সেখান থেকে চলে গেছেন, কেউ খেয়ালই করেন নি।

—তুমি বৈশ্য। সিংহাসনে তোমার আর কোন অধিকার নেই এখন থেকে বৈশ্যের যা কাজ—পশুপালন, চাষবাস, বাণিজ্য, তাই করবে।

—বেশ, তাই হবে। রাজ সিংহাসন ছেড়ে নাভাগা পত্নী সুপ্রভাকে নিয়ে সেই কাজেই থেকে গেলেন।

যথাসময়ে নাভাগার একটি ছেলে হল। নাম—ভনন্দন।

একটু বড় হতে ভনন্দন তার মাকে জিজ্ঞেস করল—মা, আমি কি করব?

মা সুপ্রভা বলল—বাবা, তুমি গোপাল হও।

ভনন্দন তাই শুনে সোজা চলে গেল হিমালয়ে রাজর্ষি নীপের কাছে। প্রণাম জানিয়ে বলল—রাজর্ষি, মা আমাকে গোপাল হতে বলেছেন, কিন্তু কিভাবে আমি পৃথিবী পালন করব?

শুনে নীপের খুব ভাল লাগল ভনন্দনকে। অল্পদিনের মধ্যেই তাকে তিনি শিখিয়ে দিলেন সব রকমের যুদ্ধকৌশল।

এদিকে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। নাভাগার বাবা মারা গেছেন। তাঁর ভাইপো বসুরাত এখন রাজা হয়েছেন।

ভনন্দন সোজা এল বসুরাতের কাছে। বলল—দাদু আপনাকে সিংহাসনে বসিয়ে গেছেন, আমার বলার কিছু নেই। তবে অর্ধেক রাজত্ব আমায় দিন।

অল্পবয়সী ছোকরা ভনন্দনের কথায় পাত্তা দিলেন না বসুরাত। বললেন—বণিকের ছেলে চাষবাস, বাণিজ্য কর। রাজত্ব চাস কোন মুখে?

ভনন্দন কাকার এই দুর্বাক্য সহ্য করতে পারল না। বাধল লড়াই। বসুরাত হেরে গেলেন। ভনন্দনের জয় হল।

ভনন্দন কিন্তু সিংহাসনে নিজে না বসে, এসে বাবা নাভাগাকে বলল—বাবা, আপনি সিংহাসনে বসে পৃথিবীটা শাসন করুন।

নাভাগা বললেন—তা হয় না। কথার খেলাপ করলে অধর্ম হবে। আমি বৈশ্য। বাবা আমার কাজ ঠিক করে দিয়ে গেছেন। ইচ্ছে হয়

..ামার, তুমি বোস। বসলে আমি তোমাকে কর দেব। না হয় যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দাও।

এতক্ষণ চুপ করেই ছিল নাভাগা-পত্নী সুপ্রভা। এবার সে বলে উঠল নাভাগকে—আপনার কুণ্ঠা করার কিছু নেই। আপনি সত্যি-সত্যিই আমাকে বিয়ে করে বৈশ্য হয়ে যান নি। আমি বৈশ্যকুলে জন্মালেও বৈশ্য নই।

শুনে নাভাগা অবাক হয়ে তাকালেন সুপ্রভার দিকে। বললেন—এসব কি বলছ তুমি?

—তাহলে শুনুন। এখন আমার পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে এসেছে। বলল সুপ্রভা।

—পূর্বজন্মের স্মৃতি? আরও অবাক হন নাভাগা।

—হ্যাঁ। আমি ক্ষত্রিয়াণী। আমার বংশও ক্ষত্রিয়। আমার বাবা ক্ষত্রিয়। গত জন্মে আমার বাবা ছিলেন সুদেব নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা। নল নামে বাবার এক বন্ধু ছিল। একবার বৈশাখ মাসে বাবা, রাজা ধূম্রাশ্বের ছেলে বন্ধু নলকে নিয়ে বনে বেড়াতে গিয়ে প্রমতি মুনির কোপে পড়েছিলেন। প্রমতি মুনির পত্নী এসেছিলেন সেখানে সরোবরে স্নান করতে। নলের হল মতিচ্ছন্ন। সে সেই মুনি-পত্নীকে হরণ করল। মুনিবর তখন বাবাকে ক্ষত্রিয় রাজা জেনে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বাবা নলকে এতই ভালবাসতেন যে, নল অন্যায় করেছে জেনেও তার প্রতিকার তো করলেনই না, তার ওপর আবার মুনিবরের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলেছিলেন, 'মুনিবর, কে বললে আমি ক্ষত্রিয় রাজা? আমি সামান্য একজন বণিক, জাতিতে বৈশ্য। আমি কি করতে পারি, বলুন।' অমন মুনির চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? রেগে গিয়ে মুনিবর বলেছিলেন, 'আমাকে মিথ্যে কথা বললে? তুমি বৈশ্য? বেশ তাই হোক, তুমি বৈশ্যই হও।' এই বলে তিনি যেই কটমট করে তাকালেন নলের দিকে, নল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাবা সুদেব তখন মুনিবরের ক্ষমতা বুঝতে পেরে পায়ে আছড়ে পড়েছিলেন। ততক্ষণে অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন প্রমতি। বাবাকে বলেছিলেন, 'মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে, তার ফল তোমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তবে তোমার মেয়েকে যখন কোন ক্ষত্রিয় বীর জোর করে বিয়ে করবে তখনই তোমার শাপমুক্তি ঘটবে। আবার তুমি ক্ষত্রিয় হবে।'

চুপ করে শুনতে লাগলেন নাভাগা।

—এইবার আমার কথা বলি শুনুন। বলতে লাগল সুপ্রভা—পূর্বজন্মে আমার নাম ছিল কৃপাবতী। আমার জন্ম হয়েছিল গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি সুরথের আশ্রমে। তিনি তখন সেখানেই তপস্যা করতেন। আমার কৃপাবতী নাম তিনিই রেখেছিলেন। সেখানেই আমি বড় হই। একদিন আমার বন্ধুদের নিয়ে বনে বেড়াচ্ছিলাম। বেড়াতে এবড়াতে হঠাৎ দেখলাম, অগস্ত্য মুনির ভাই ফুল তুলছেন। আমার বন্ধুরা তাঁকে দেখে নানারকম টিটকিরি দিতে শুরু করল। বারণ করলেও শোনে না বন্ধুরা। শেষে তারা বলেই বসল, 'মুনি হয়ে ফুলের ব্যবসা করছ নাকি? তুমি কি বৈশ্য?' শোনামাত্রই খুব রেগে গেলেন মুনিবর। আমি ছিলাম সামনেই। তিনি আমাকেই অভিশাপ দিয়ে বসলেন, 'কি বললি, আমি বৈশ্য? যা, তুই বৈশ্যের ঘরে গিয়ে জন্মা গে।' আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, 'মুনিবর, আমি তো আপনাকে কিছু বলি নি। অপর জনে অপরাধ করল, আর আমাকে দিলেন অভিশাপ?' মুনিবর বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু দুষ্টের দলে থাকলে তাদের মতই ফলভোগ করতে হয়। তবে, একটা কথা বলতে পারি, বৈশ্যের ঘরে জন্মে যখন তোমার ছেলে হবে, আর সেই ছেলে বাহুবলে রাজ্য জয় করবে, তখন তুমি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষত্রিয়াণীর মর্যাদা পাবে। সেই সঙ্গে পূর্বজন্মের সব স্মৃতিও তোমার ভেসে উঠবে।' এই কথা বলে সুপ্রভা বলল, 'তাই বলছিলাম, আপনি বৈশ্য নন, আমিও নই, ক্ষত্রিয়। সুতরাং নিশ্চিন্তে সিংহাসনে বসতে পারেন।'

সব শুনলেন নাভাগা। তারপর বললেন—সুপ্রভা, হয়ত তোমার সব কথাই সত্য। কিন্তু আমার বাবার আদেশ আমার কাছে আরো সত্য। ভনন্দন সিংহাসনে বসুক। পৃথিবী শাসন করুক। তুমি যদি রাজমাতার আনন্দ উপভোগ করতে চাও, করতে পার। আমি কিন্তু যা করছি, সেই বৈশ্যের কাজই করে যাব।



বৎসপ্রী ও সৌনন্দার কাহিনী

মৃগয়ায় বেরিয়েছেন রাজা বিদূরথ।

চমৎকার এক কৃষ্ণসার। পিছু ধাওয়া করে রাজা এসে ঘোড়া নিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন নির্বিন্ধ্যা নদীর পাড়ে এসে। লক্ষ্য থেকে বনের ভেতর কোথায় হারিয়ে গেল কৃষ্ণসার। রাজা দেখলেন, নদী থেকে খানিক দূরে বিশাল এক গর্ত। মাটির ওপর গর্ত অনেকেই দেখেছেন রাজা। কিন্তু এই গর্তটা কেমন যেন অস্বাভাবিক।

ঘোড়া থেকে নেমে রাজা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন আর ভাবছেন। যত দেখছেন আর ভাবছেন ততই যেন তাঁর মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই এখানে কেউ পাতালে যাবার গর্ত করেছে। নইলে এমন বিশাল আর নিটোল গর্ত আসবে কোথা থেকে?

ঠিক সেই সময়েই সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন সুব্রত নামে এক মুনি।

মুনিকে দেখে রাজা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা মুনিবর, এখানে এমন একটা গর্ত কোথা থেকে এল? এ তো কোন স্বাভাবিক গর্ত বলে মনে হচ্ছে না। আপনি কি এর সম্বন্ধে কিছু জানেন?

মুনি বললেন—তা জানব না কেন? আমরা প্রতিদিনই এর ফল ভোগ করছি, আর জানব না? কিন্তু, আপনি দেশের রাজা। আপনার প্রাসাদ থেকে বেশি দূরেও নয়, অথচ আপনি জানেন না, এতেই তো অবাক লাগছে।

রাজা বিদূরথ তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন—সত্যিই মুনিবর, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। কেউ জানায়ও নি। দয়া করে বলুন, কেমন করে এ রকম গর্ত হল? কিসের গর্ত এটা?



সুব্রত মুনি বললেন—তাহলে শুনুন। এই গর্ত গেছে পাতাল পর্যন্ত। কুজুম্ভ নামে এক দৈত্য থাকে সেখানে, তার পরিবার-পরিজন নিয়ে। দেবতাদের ও দেবরাজ ইন্দ্রের সে দারুণ শত্রু। আর সুযোগ পেলে আমাদের ওপরও তার অত্যাচারের শেষ নেই। অস্ত্রশস্ত্র যদিও তার অনেক, কিন্তু গদাযুদ্ধেই সে ওস্তাদ। আর তার গদাটাও যা-তা গদা নয়। বিশ্বকর্মা সুনন্দ নামে যে গদা তৈরি করেছিলেন, যাকে সবাই বলে সৌনন্দ গদা, কুজুম্ভ কায়দা করে সেই গদা হস্তগত করে তা দিয়েই সকলকে জয় করে চলেছে। আর এই যে গর্ত, তা-ও সে করেছে সেই সৌনন্দ গদার ঘায়ে।

রাজা বিদূরথ যত শোনেন, ততই অবাক হয়ে যান। এত বড় এক অসুর তাঁর রাজ্যসীমার মধ্যে, অথচ তিনি তার কিছুই জানেন না!

সুব্রত মুনি বলেন—আপনার উচিত সেই অসুরের হাত থেকে সকলকে রক্ষা করা। তাহলে আপনি দেবতাদের আশীর্বাদ পাবেন, সম্রাটও হতে পারবেন। আর হ্যাঁ, গদা সম্বন্ধে বিচিত্র একটা ব্যাপার আছে। যা শুনেছি, তাও আপনাকে শুনিয়ে রাখি। সেই গদা যদি কোন নারী একবার ছোঁয় সেদিনের মত সেই গদার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না। পরদিন নাকি আবার ঠিক হয়ে যায়। এই বলে সুব্রত বললেন—আপনি যখন আমাদের রাজা, আশা করব, আপনি নিশ্চয়ই এবার এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা-ভাবনা করবেন।

সুব্রত মুনি চলে গেলেন। রাজাও ফিরলেন নিজের রাজপ্রাসাদে। রাজা যখন তিনি, তখন নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করতে হয়। ডাকলেন সভা। সেনাপতি থেকে মন্ত্রী সকলেই হাজির।

রাজা বিদূরথের ছিল দু-ছেলে, এক মেয়ে—সুনীতি ও সুমতি, আর মেয়ে হল মুদাবতী। মেয়েটি রাজার খুবই প্রিয়। বেশ কিছুদিন ধরে রাজা মুদাবতীর জন্য এক যোগ্য পাত্রের সন্ধানও করছিলেন। সভায় এসেছে তারাও।

রাজা সবাইকে খুলে বললেন মৃগয়ায় গিয়ে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন সব কিছু। তারপর জিজ্ঞেস করলেন মন্ত্রীদের—এখন বলুন, এই অসুরকে কিভাবে জয় করা যায়। জয় আমাদের করতেই হবে। আমার রাজ্যে এ অনাচার আর চলতে দিলে রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

সভা শেষ করলেন রাজা। সবাই সময় নিলেন শক্তিশালী মায়াবী অসুরকে বধ করার কৌশল আবিষ্কারের জন্য।

ইতিমধ্যে একদিন মুদাবতী তার বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। মনের আনন্দে একটা উপবনে ঢুকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মুদাবতী আপন মনে। এমন সময় কোথা থেকে কুজুম্ভ এসে তাকে চুরি করে নিয়ে গেল পাতালে।

খবর পেয়েই রাজা বিদূরথ আর কিছুমাত্র ভাবনা-চিন্তা না করে ডাকলেন তাঁর দুই বীর ছেলেকে। বললেন—সুনীতি, সুমতি! সৈন্যসামন্ত নিয়ে এখনই যাও নির্বিন্ধ্যা নদীর পাড়ে। গেলেই দেখতে পাবে বিশাল এক গর্ত চলে গেছে পাতাল পর্যন্ত। যেভাবেই হোক, কুজুম্ভকে বধ করে তোমাদের বোনকে উদ্ধার করে আন।

দু-ভাই সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে হাজির হল সেখানে। বাধল সেই মায়াবী অসুরের সঙ্গে লড়াই। কিন্তু কি অদ্ভুত! একা কুজুম্ভ তাদের সৈন্যকে নিমেষে শেষ করে ফেলল। আর দু-ভাইকে না মেরে তাদের বেঁধে রেখে দিল নিজের প্রাসাদে।

সময় পেরিয়ে গেছে। না ফিরল ছেলেরা, না সৈন্য-সামন্ত। খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাজা বিদূরথ। নিশ্চয়ই সেই অসুর তাঁর ছেলেদুটিকে কয়েদ করেছে।

নিরুপায় রাজা তখন চারদিকে ঘোষণা করলেন, কুজুম্ভের হাত থেকে যে তাঁর ছেলেদের আর মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে পারবে, তারই সঙ্গে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে মুদাবতীর বিয়ে দেবেন।

শুনে রাজা বিদূরথের বন্ধু রাজা ভনন্দনের ছেলে বৎসপ্রী একদিন এলেন রাজার কাছে। বললেন—যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বৎসপ্রীর বয়স অল্প। হলে কি হবে, ইতিমধ্যে বীর হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। রাজা বিদূরথ বন্ধুর ছেলেকে বললেন—যাও। যদি পার জানব যথার্থ বীরের কাজ করেছ।

ধনুক, তরোয়াল, খাঁড়া, আরও সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সসৈন্যে বৎসপ্রী সেই গর্তের মুখে গিয়ে আগেই নিজের ধনুকে এমন টঙ্কার তুললেন যে, তার শব্দে যেন পাতাল কেঁপে উঠল। কুজুম্ভ সঙ্গে সঙ্গে তার সেনাদের নিয়ে নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল সসৈন্যে। শুরু হল মানুষের সঙ্গে বলশালী দেবত্রাস অসুরের দারুণ যুদ্ধ।

অসুরের প্রাসাদেরই এক কোণে রাখা থাকত সেই সৌনন্দ গদা। অসুর রোজ তাকে ধূপ-ধুনো-ফুল দিয়ে পুজো করত। মুদাবতী বাবার মুখে আগেই শুনেছিল, কোন নারী ছুঁলে গদার আর শক্তি থাকে না। সে-ও কৌশলে কুজুম্ভের শত্রুতাচরণ না করে অসুরের দেখাদেখি গদা ছুঁতো, আর লোক দেখানো পুজোও করত। নতুন করে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে শুনে গদার কাছ থেকে মুদাবতী আর নড়ে না বললেই হয়।

যুদ্ধ চলল সমানে-সমানে তিন দিন। কুজুম্ভ যখন দেখল এমনিতে এদের বাগে আনা যাচ্ছে না, তখন সে ছুটল প্রাসাদে রথ নিয়ে সেই সৌনন্দ গদা আনতে। পুজো করল যথারীতি। অসুরের সামনেই মুদাবতীও বারবার ছুঁয়ে তার পুজো করল, আর শুনিয়ে শুনিয়ে এমন সব কথা বলতে লাগল যে অসুর ভাবল, মেয়েটি তারই মঙ্গল চাইছে।

গদা নিয়ে গর্জন করতে করতে আবার রথ হাঁকিয়ে কুজুম্ভ এল যুদ্ধক্ষেত্রে। ছুঁড়তে শুরু করল গদা। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। হতাশ হয়ে অসুর শেষে গদা ছেড়ে হাতের কাছে যে অস্ত্র পেল তা দিয়েই রুখতে গেল বৎসপ্রীকে। কিন্তু পারল না। পারবেই বা কেমন করে? মন্ত্রঃপূত গদাই তার বল, তা-ই যখন আর নেই, তখন পারবে কি

করে। তখন বৎসপ্রী তাকে রথ থেকে নামিয়ে তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল।

এতদিন কুজ্বুম্ভের ভয়ে পাতালের আর সব বাসিন্দা, যারা মুখ খুলতে পারত না, তারা আনন্দে এসে জড়িয়ে ধরল বৎসপ্রীকে। অনন্তনাগও তাকে প্রচুর উপঢৌকন দিল।

সকলকেই উদ্ধার করে নিয়ে এল বৎসপ্রী। রাজা বিদূরথের সে কি আনন্দ!

সারা রাজ্যে পড়ে গেল মহোৎসব। বৎসপ্রীর সঙ্গে রাজা বিদূরথ মেয়ে মুদাবতীর বিয়ে দিলেন মহা ধুমধামের সঙ্গে। কিন্তু মুদাবতী আর মুদাবতী রইল না—অমন সৌনন্দ গদাকে জব্দ করে দিয়েছিল বলে শেষ পর্যন্ত তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'সৌনন্দা'।



মরুত্ত রাজার কাহিনী

পৃথিবীতে অনেকেই রাজত্ব করেছেন, কিন্তু মরুত্তের মত রাজা, প্রায় আঙুলে গোনা যায়। যাঁকে সত্যিকারের রাজা বলে, মরুত্ত ছিলেন ঠিক তাই। তাঁর ঐশ্বর্য যেমন ছিল অতুলনীয়, বীরত্বেও তাঁর সমান ছিল না কেউ। শুধু কি ঐশ্বর্য আর বীরত্ব! বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান, সবদিক থেকেই সমান। তাই প্রজা থেকে সামন্ত রাজারা যেমন তাঁর দাদু করন্ধমকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত, আবার ভয়ও পেত, মরুত্তকেও তারা দেখত সেভাবে।

কেনই-বা হবে না? রাজা মরুত্তের বাবা অবীক্ষিতও তো কম বড় বীর ছিলেন না। আর মা বিশাল রাজার মেয়ে।

সে এক অদ্ভুত কাহিনী।

বিশালরাজ মেয়ের জন্য আয়োজন করেছিলেন বিশাল এক স্বয়ম্বর সভার। দেশ-বিদেশ থেকে এসেছেন সব রাজারা। প্রত্যেকেই মহা-মহাবীর। অবীক্ষিত তখনও রাজপুত্র। তিনিও এসেছেন। বিশাল রাজের মেয়ে কারো দিকে না তাকিয়ে মালা এনে সোজা পরিয়ে দিল তাঁর গলায়। সুদতী তো আর জানত না যে এর ফলে কি ভীষণ কাণ্ড ঘটে যাবে!

ঘটেও গেল।

এত বড় বড় সব বীর ক্ষত্রিয় রাজারা থাকতে সুদতী কিনা বরণ করল অবীক্ষিতকে! এত বড় অপমান কি সহ্য করা যায়। বিশালরাজেরও মেয়ের এই আচরণ ঠিক মনে ধরে নি। খেপে গিয়ে তারা একে একে যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একে একে আক্রমণ করল অবীক্ষিতকে। অবীক্ষিত বীর। তিনিও কি কিছু কম যান? যখন সবাই প্রায় তাঁর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে গেল, তখন মান বাঁচাতে দারুণ অন্যায় করে বসল সবাই। এবার আর একে একে নয়, সবাই একজোটে আক্রমণ করল তাঁকে। একা অবীক্ষিত, শত্রু অনেক। তবুও তাঁর সে কি বিক্রম! কিন্তু শেষ রক্ষা করতে তিনি করতে পারলেন না। সবাই মিলে ধরে, তাঁর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে বেঁধে নিয়ে এল বিশালরাজের কাছে। ভণ্ডুল স্বয়ম্বর সভা। বিশালরাজ মেয়েকে বলল—'ঐ কাপুরুষটাকে ছেড়ে অন্য কোন বীরকে বরণ কর মা।' কিন্তু মেয়ে বসল বেঁকে। কে বলে অবীক্ষিত কাপুরুষ? অন্যায় যুদ্ধে যারা তাঁকে বেঁধেছে তারা বীর ক্ষত্রিয়! অবীক্ষিতই তার স্বামী, আর কেউ নয়।

খবর গেল রাজা করন্ধমের কাছে—ক্ষত্রিয় রাজারা অন্যায় যুদ্ধে তাঁর ছেলে অবীক্ষিতকে স্বয়ম্বর সভায় বেঁধে ফেলে রেখেছে বিশালরাজের কাছে। রাগে জ্বলে উঠলেন করন্ধম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কি এই? উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

একদিকে বিশাল ক্ষত্রিয় বাহিনী, আর একদিকে রাজা করন্ধম। যুদ্ধ চলল তিন দিন। কিন্তু করন্ধম, আঙুল কাঁপালে যাঁর হাজার হাজার সৈন্য জন্ম নেয়, তাঁর কাছে এসব ক্ষত্রিয়রা নির্মূল হয়ে গেল সবাই। মাথা হেঁট করে চলে গেল অনেকে। বিশালরাজও চুপ হয়ে গেলেন। আর কোন বাধা কোথাও নেই বিয়ে করে সুদতীকে ঘরে আনতে।

এবার কিন্তু অবীক্ষিত বসলেন বেঁকে। ক্ষত্রিয় হয়ে নিজে যখন তিনি বন্ধনমুক্ত হতে পারেন নি, বাবা হলেও অপরের সাহায্য নিয়ে তাঁকে যখন মুক্ত হতে হল, তখন কোন মুখে তিনি বলবেন যে 'আমি বীর। স্বয়ম্বর সভায় নিজের বীরত্ব দেখিয়ে আমি এই কন্যাকে লাভ করেছি।' অনেক বোঝালেন, অনুরোধ করলেন রাজা করন্ধম। কিন্তু অবীক্ষিত সেই যে বেঁকে বসলেন, আর তাঁকে নোয়ায় কে?

মালা দিয়ে বরণ করা সত্ত্বেও অবীক্ষিত তাকে বিয়ে করবে না শুনে বিশালরাজের মেয়ে সুদতীও মনস্থ করল, এ জীবন আর রাখবে না, আত্মহত্যা করবে।

সব ঠিক। কিন্তু আত্মহত্যা আর করা হল না সুদতীর। বাধা দিলেন এসে এক দেবদূত—না মা, অমন কাজ করো না। অমূল্য জীবন কি এভাবে নষ্ট করতে আছে?

সুদতী জিজ্ঞেস করেছিল—বেঁচে থেকে আমার লাভ?

দেবদূত বলেছিলেন—আছে বৈকি মা। অপেক্ষা কর।

সুদতী তাই ঐভাবে আত্মহত্যা না করে ঠিক করল, বনে গিয়ে অনাহারে থেকে তপস্যা করে জীবনটাকে শেষ করে দেবে।

প্রাসাদ ছেড়ে সুখ-ঐশ্বর্য ছেড়ে তাই সে চলে গিয়েছিল বনে।

এদিকে রাজা করন্ধম পড়লেন মহা চিন্তায়। শান্তি নেই রানী বীরারও। একমাত্র ছেলে। বিয়ে করল না, সংসার হল না। নিজেরও বয়স হয়ে আসছে! বংশটাই লোপ পেয়ে যাবে।

দু-জনে মিলে যুক্তি করে একদিন একটা উপায় বের করলেন।

রানী বীরা ছেলে অবীক্ষিতকে ডেকে বললেন—আমি আর কদিনই-বা আছি। ঠিক করেছি তোমাকে নিয়ে একটা ব্রত করব। তুমি তো আর সংসারী হলে না। এত ঐশ্বর্য নিয়ে তাই কিই-বা হবে। তাই ভাবছি, যে যা চাইবে, তাকে তুমি তা দিয়ে দাও। এভাবে যা যাবে, তার অর্ধেকটা অবশ্য তোমার বাবা দেবেন।

এক কথাতেই রাজি অবীক্ষিত।

আসতে শুরু করলেন অনেক প্রার্থী। দিলেন সকলকে প্রার্থনা-মত অনেক ধন-দৌলত।

সবশেষে প্রার্থী হয়ে এলেন রাজা করন্ধম।

—তুমি আজ মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। বললেন রাজা—আমি যে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

—কি বলুন? জানতে চাইল অবীক্ষিত।

—আমার একটা ভাল নাতি চাই

শুনে অবীক্ষিত মাথায় হাত দিয়ে বসল। এ কি চেয়ে বসলেন রাজা আজকের এই বিশেষ দিনে! কোন প্রার্থী যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় আজ, তাহলে ব্রতই যে নষ্ট হয়ে যাবে।

—বাবা, আপনি তো সবই জানেন। বলল অবীক্ষিত—আপনি অন্য কিছু চান!

—না, আমার ঐ একটাই প্রার্থনা। জানিয়ে চলে গেলেন করন্ধম।

এবারে মহা বিপদে পড়লেন অবীক্ষিত। খবর নিয়ে জানলেন, সুদতীও মনের দুঃখে কোন বনে চলে গেছে কেউ জানে না। বেঁচে আছে কি নেই, তা-ও কেউ বলতে পারে না।

ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হয়ে অবীক্ষিত ঘুরে ঘুরে বেড়ান এদিক-ওদিক।

একদিন যাচ্ছিলেন এক বনের পথ ধরে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, বনের ভেতর থেকে একটা মেয়ে যেন আর্তনাদ করছে—'বাঁচাও...বাঁচাও'। ঘোড়া থেকে নেমে তক্ষুণি অবীক্ষিত শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে দেখেন, দনুর ছেলে অসুর দৃঢ়কেশ টানাটানি করছে একটা মেয়েকে। আর মেয়েটি তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পরিত্রাহি চিৎকার করছে।

দেখে কি স্থির থাকা যায়? অবলা নারীর ওপর অসুর অত্যাচার করবে একজন ক্ষত্রিয় বীরের সামনে! সঙ্গে সঙ্গে অবীক্ষিত দৃঢ়কেশকে নিধন করে মুক্ত করল মেয়েটিকে। তারপর জানতে চাইল তার পরিচয়।

সুদতী হাঁফ ছেড়ে স্থির হবার আগেই অবীক্ষিতের জয়ধ্বনি দিতে দিতে সেখানে হাজির হলেন দেবতারা।

দৃঢ়কেশের অত্যাচারে তাঁরাও খুবই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এখন অসুরটাকে রাজপুত্রের হাতে মরতে দেখে তাঁরাও খুব খুশি।

যে দেবতাদের দেখা মেলে অনেক কষ্টে, এই বনের মাঝে হঠাৎ তাঁদের সকলকে দেখে কি যে করবেন অবীক্ষিত। কিন্তু, দেবতারা সেদিকে না তাকিয়ে প্রাণভরে অবীক্ষিতকে আশীর্বাদ করে বললেন—রাজপুত্র, এই হল সুদতী যাকে তুমি স্বয়ম্বর সভায় গ্রহণ করেছিলে। আমরা বলছি, তুমি একে বিয়ে করে নিয়ে যাও। তোমার মুখোজ্জ্বল হবে।

দেবতারা চলে যেতে অবীক্ষিত এবার তাকিয়ে দেখলেন। এই যে সেই বিশালরাজের মেয়ে, বলে না দিলে, চেনে কার সাধ্য।

অবীক্ষিত ভাবেন—কি করবেন তিনি এখন? বিয়ে করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। ব্রত পালন করতে গিয়ে বাবার অভিলাষ, নাতির মুখ দেখবেন, সুদতীকেও ঘটনাক্রমে পেলেন এখানে। আবার দেবতারাও এসে অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। এখন কি করা যায়!

যখন অবীক্ষিত ভাবছেন এভাবে, হঠাৎ অপ্সরাদের নিয়ে গন্ধর্ব তৃণর আরো অনেক গন্ধর্বকে নিয়ে সেই বনে এসে হাজির হল।

কাউকেই চেনেন না অবীক্ষিত। হঠাৎ এইসব দেখে-শুনে, রাজপুত্র গেলেন দারুণ ঘাবড়ে। ব্যাপার কি?

তৃণর নিজের পরিচয় দিয়ে অবীক্ষিতকে তারপর যা বলল, সে আর এক অবাক করা কাণ্ড।



তৃণর বলল—রাজপুত্র, ঐ মেয়ে এ-জন্মে বিশালরাজের মেয়ে সুদতী হয়েছে বটে, কিন্তু গতজন্মে ও ছিল আমারই মেয়ে ভামিনী সামান্য একটা কারণে অগস্ত্য মুনি ওকে শাপ দিয়েছিলেন, মানুষের ঘরে জন্মে, মানুষের মত কষ্টভোগ কর গে যা। তারই ফলে আমার ভামিনী আজ বিশালরাজের মেয়ে আর সেই মহামুনির দয়ায় বনে এসে মেয়ে আমার এত কষ্ট ভোগ করে আজ শাপমুক্ত হল। আর তুমিই দৃঢ়কেশকে মেরে তা করলে। আমার অনুরোধ, তুমি একে বিয়ে কর। তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে।

কি দেবতা, কি গন্ধর্ব, সকলেরই এক কথা। অবীক্ষিত বিয়ে করলেন মেয়েটিকে। গন্ধর্বরাও তাদের নিয়ে গিয়েছিল গন্ধর্বলোকে সেখানেই এই মরুত্তের জন্ম। প্রাণভরে গন্ধর্ব তৃণর আর গন্ধর্বগুরু তুম্বুরু তাদের যাবতীয় বিদ্যে শিখিয়ে দিয়েছিল মরুত্তকে। আবার ক্ষত্রিয় বীরের ছেলে, বীর তো হবেই।

বেশ কিছুকাল গন্ধর্বলোকে কাটিয়ে মরুত্ত আর সুদতীকে নিয়ে অবীক্ষিত রাজ্যে ফিরে আসতেই রাজা করন্ধম, রানী বীরার সে কি আনন্দ! বিশালরাজও ফিরে পেলেন তাঁর মেয়েকে। এদিকে নাতির মুখ দেখে, আর ওদিকে মেয়ের মুখ দেখে দু-রাজ্যেই বেশ কিছুদিন ধরে চলল উৎসব।

এরপর রাজা করন্ধম তখন ঠিক করলেন, ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে বানপ্রস্থে যাবেন। অবীক্ষিত কিন্তু সিংহাসনে বসলেন না নিজে ক্ষত্রিয় হয়েও যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের হাতে বাঁধা পড়েছিলেন, আর তাঁর বাবা তাঁকে উদ্ধার করে এনেছিলেন, সেই দুঃখ তিনি তখনও ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁরই অনুরোধে নাতি মরুত্তকে বসিয়ে একদিকে দাদু-দিদিমা, আবার বাবা-মাও চলে গিয়েছিলেন বনে তপস্যা করে বাকি জীবনটা কাটাতে।

দাদুর মত মরুত্ত-ও শুরু করল রাজত্ব। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন—রাজার যা ধর্ম, তার থেকে এক চুলও নড়তেন না রাজা মরুত্ত। বিশাল বিশাল যাগযজ্ঞ করলেন। প্রজাদের যাতে কোন কষ্ট

কোথাও না থাকে মহীপাল মরুত্তের সেদিকে ছিল সজাগ দৃষ্টি। সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বেশ সুখে-শান্তিতে চলেছে রাজত্ব। কোথাও কোন অশান্তি নেই। দাদু করন্ধম আর দিদিমা বীরা ভার্গবের আশ্রমে এসে আশ্রমবাসী হয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। একদিন করন্ধম বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। বীরা তখনও সংযত জীবনযাপন করে চলেছেন আশ্রমে।

হঠাৎ একদিন সেই আশ্রমে শুরু হল নাগের উৎপাত। এতদিন যে নাগরা পাতালেই থাকত, করন্ধমের ভয়ে কোন দিনই কারো অনিষ্ট করবার সাহস পেত না, হঠাৎ সেই নাগরা এসে চড়াও করল ঔর্বের আশ্রম। তাদের বিষে প্রাণ হারালেন সাত জন তাপস। নাগরা চারদিকে বিষ নিয়ে এমন উৎপাত শুরু করল যে আশ্রমের শান্তি গেল নষ্ট হয়ে।

দেখে দিদিমা বীরা খবর পাঠালেন রাজা মরুত্তকে। বলে পাঠালেন, এতদিন যা হয় নি, এখন এসব অত্যাচার শুরু হল কেন? নিরীহ তাপসরা কি অপরাধ করেছেন নাগদের কাছে, যে নাগদের হাতে তাঁদের প্রাণ দিতে হচ্ছে? আমরা শান্তিতে তপস্যায় রয়েছি আশ্রমে, যুদ্ধ করা আমাদের কাজ নয়। নাগদের জব্দ করার শক্তি যে আমাদের নেই, তা নয়। কিন্তু তুমি যখন রাজা, আমাদের রক্ষাকর্তা, তখন আমাদের শক্তি আমরা কেন প্রয়োগ করতে যাব? তাহলে তুমি রাজা হয়ে আছ কেন?

দিদিমা বীরা ঠিকই বলেছেন—সকলকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব রাজার, আর তিনি নিজে এখন রাজা। সুতরাং দায়িত্ব তাঁর। মনে মনে নাগদের ওপর খুব খেপে উঠলেন মরুত্ত। এত সাহস কোথা থেকে এল এদের?

মরুত্ত তুলে নিলেন তাঁর সংবর্তক নামে এক অস্ত্র। ছুঁড়লেন নাগলোককে লক্ষ্য করে। হু...হু... করে সেই অস্ত্র ছুটে গিয়ে নাগলোকে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। নাগদের কারো লেজ পুড়ল, কারো গায়ের চামড়া গেল ঝলসে, কারো মাথায় জ্বলতে শুরু করল আগুন। প্রাণভয়ে ছুটোপাটি শুরু হয়ে গেল নাগলোকে, পরিত্রাহি চিৎকার।

মহীপালের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখে নাগরা গিয়ে পা জড়িয়ে ধরল বনবাসিনী মা ভামিনীর কাছে—মাগো, আমাদের বাঁচাও। তোমার ছেলে যে আমাদের সবংশে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ভামিনী বললেন—নিরীহ তাপসদের তোমরা ওভাবে মারতে শুরু করলে কেন? আশ্রমে অত্যাচার করলে কেন? রাজার কাজ তো রাজা করবেনই। আমি কি করব, বল?

—মা, আপনি কিন্তু আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলল নাগরা—আপনি যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, রাজা অনন্তনাগ তখন আপনাকে পাতালে নিয়ে গিয়ে আপনার কাছ থেকে কিন্তু এই আশ্বাসবাক্যই আদায় করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর বংশধররা যদি কোন অন্যায় করে, আপনার ছেলে যেন তাদের ক্ষমা করে। আপনি কিন্তু কথা দিয়েছিলেন!

মনে পড়ে যায় ভামিনীর। তাই তো—কথা দিয়েছিলেন বটে। কথা দিয়ে কথা না রাখার মত অপরাধ আর নেই। বাধ্য হয়েই স্বামী অবীক্ষিতকে সব কথা বললেন ভামিনী। মন দিয়ে অবীক্ষিতও সব শুনে বললেন—কথা যখন দিয়েছ, নিশ্চয়ই রাখতে হবে। ওরা যখন তোমার আশ্রয় চেয়েছে, তখন আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা অন্যায় হবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক ভামিনী। আমি দেখছি।

এই বলে বীর অবীক্ষিত হাতে তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সোজা এসে হাজির হলেন ভার্গবের আশ্রমে। এসেই দেখেন, ছেলে মরুত্ত আর এক মারাত্মক বাণ ছোঁড়বার তোড়জোড় করছে।

হঠাৎ বাবা অবীক্ষিতকে ঐখানে ঐ অবস্থায় দেখে একটু অবাক হলেন মরুত্ত। ধনুক-বাণ নামিয়ে প্রণাম জানালেন।

অবীক্ষিত বললেন—পুত্র, তোমার অস্ত্র সংবরণ কর। নাগদের এভাবে নিধন করা চলবে না।

শুনে রাজা মরুত্ত তো আরো অবাক—সে কি কথা বাবা। ওরা অযথা অত্যাচার করবে? আমি রাজা হয়ে আমার কর্তব্য করছি।

অবীক্ষিত বললেন—মুনি-ঋষিদের মেরে এরা যে পাপ করেছে, তার জন্য তারা নরকে যাবে। তুমি এদের হত্যা করতে যাচ্ছ কেন?

মরুত্ত বললেন—অন্যায়কারীর সমুচিত সাজা দেওয়াই রাজার কাজ। আমি যদি সে কাজ ঠিকমত না করি, তাহলে আমাকেও তো নরক ভোগ করতে হবে।

—শোন মরুত্ত। বললেন অবীক্ষিত—এরা আমার শরণাগত হয়েছে। তাই বলি, ওদের ওপর রাগ না করে শান্ত হও।

মরুত্ত বললেন—আপনি আশ্রমবাসী। আমি রাজা। আমার কাজ যদি আমি না করি, তাহলে যে রাজধর্ম পতিত হবে। সুতরাং, ও অনুরোধ আপনি করবেন না বাবা। দুষ্টকে নির্মূল আমি করবই।

এবার ক্রুদ্ধ হলেন অবীক্ষিত—শরণাগতকে রক্ষা করা আমারও ধর্ম। তুমি যদি মনে কর, পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র বীর, তাহলে অস্ত্রমুখেই তার পরিচয় হয়ে যাক। কোন মতেই আমি তোমাকে আমার আশ্রমের ক্ষতি করতে দেব না।

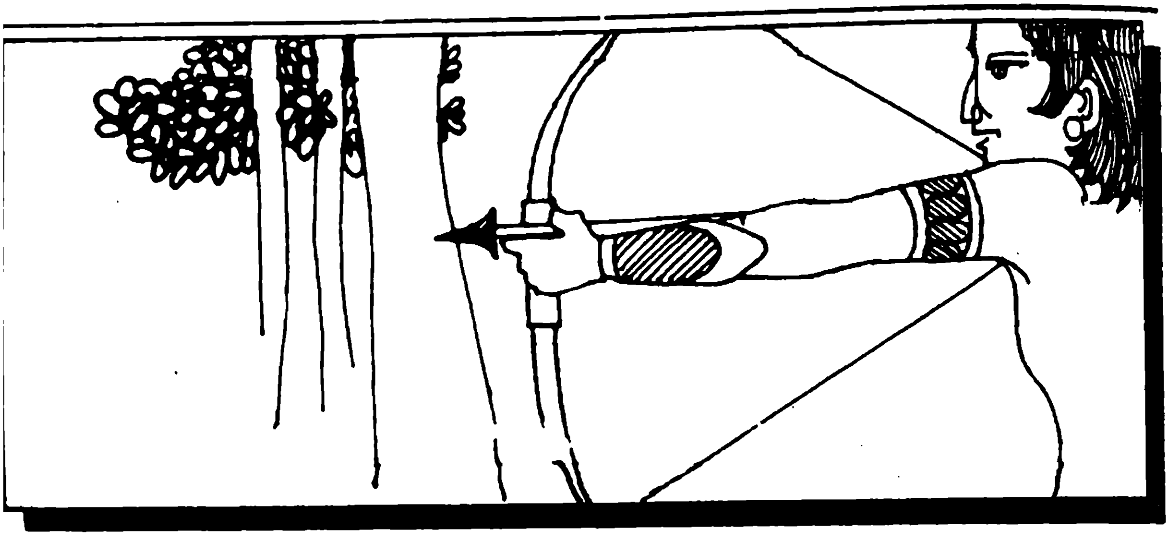
শুনে মরুত্ত বললেন—আপনি আমাকে নিরুপায় অবস্থার মধ্যে ফেললেন বাবা। রাজা হিসেবে আমার ধর্ম পালনে যে বাধার সৃষ্টি করবে, সে আমার যত আপনই হোক, তাকে ক্ষমা করা যায় না। আপনি যদি বাধা দেন, বাধ্য হয়েই আপনার ওপর আমাকে অস্ত্রপ্রয়োগ করতে হবে। তার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। এই বলে মরুত্ত-ও তুলে নিলেন মারাত্মক হাতিয়ার।

পিতা-পুত্রে লড়াই প্রায় বাধে এমন অবস্থা, মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন ভার্গব থেকে শুরু করে আরো বেশ কিছু মুনি। বাধা দিলেন মরুত্তকে—এ কি করছ রাজন্? বাবা গুরুজন; তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ! আবার অবীক্ষিতকেও বললেন—এমন বীর যাঁর ছেলে, তিনি তো ধন্য। আপনি তার জন্য গর্ববোধ করবেন। তা না করে মারতে উদ্যত হলেন? অবশ্য আপনাদের দু-জনের যুক্তিই ঠিক। বলার কিছু নেই। রাজার ধর্ম দুষ্টের দমন। আবার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম শরণাগতের রক্ষা। কিন্তু তা নিয়ে পিতা-পুত্রের এই লড়াই তো কাম্য নয়।

—কিন্তু এ ছাড়া আর তো কোন পথ নেই মুনিবর। দু-জনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন।

—শোন, নাগরা এখন দুঃখিত। যে দু-জন নাগ তাপসদের মেরেছে, তারাও এখন তাদের বিষ তুলে নিয়ে তাপসদের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। সুতরাং আর কি কোন সমস্যা আছে? বললেন ভার্গব।

—না। তাহলে তো আর কোন সমস্যাই নেই।



হলও ঠিক তাই। তাপসরা বেঁচে উঠলেন।

দিদিমা বীরা এসে আশীর্বাদ জানালেন নাতিকে। বাবা অবীক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ধার্মিক বীর ছেলে মরুত্তকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আবেগে।

রাজা দম-এর কাহিনী

রাজা হয়েও সত্যিকারের রাজর্ষি ছিলেন নরিষ্যন্তি। আর তাঁর স্ত্রী রাজা বভ্রুর মেয়ে ইন্দ্রসেনাও ছিলেন তেমনি মহীয়সী।

দম তাঁদেরই একমাত্র ছেলে। জন্ম হয়েছিল তাঁর অনেক সাধ্য-সাধনার পর। তাঁকে দেখে ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিরা নাকি বলেছিলেন—এ ছেলে বংশের একটি রত্ন।

সত্যি যে অসাধারণ ছেলে, তার প্রমাণ পেতে শুরু করলেন নরিষ্যন্তি অল্প বয়স থেকেই।

ক্ষত্রিয় বীরদের মধ্যে ধনুর্বিদ্যায় তখন সবার সেরা ছিলেন রাজা বৃষপর্বা। দম তাঁর কাছ থেকে অল্পদিনের মধ্যেই শিখে নিলেন সব কিছু। দৈত্যরাজ দুন্দুভির কাছে ছিল অন্যান্য অস্ত্রের বিদ্যে। কিভাবে সেসব অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে, মারাত্মক কোন অস্ত্র ছুটে এলে কিভাবে তা কব্জা করতে হবে, সেই গুপ্তবিদ্যে জানত একমাত্র দুন্দুভি। দম তার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সে বিদ্যেও আয়ত্ত করে নিল। অস্ত্রশস্ত্রের বিদ্যে শেখা হয়ে গেল অল্প বয়সেই। এবার দমের ইচ্ছে জাগল শাস্ত্র জানতে। বেদ-বেদাঙ্গের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তা যদি জানা না গেল, তাহলে একটা অসুরের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? দম গিয়ে পড়ল শকত্রি মুনির কাছে। গুরু শকত্রি, শিষ্য দম। গুরু দেখেন, কি আশ্চর্য দমের মেধা। প্রাণ-মন উজাড় করে মুনিবর তাঁকে বেদ-বেদাঙ্গে সুপণ্ডিত করে তুললেন। আর যোগীশ্রেষ্ঠ আষ্টিষেণ তাঁকে যোগশাস্ত্রে করে তুললেন সুপণ্ডিত।

সব দিক থেকেই দম হয়ে উঠলেন অতুলনীয়, সেই কিশোর বয়সেই। বাবা-মার নয়নের মণি। যৌবনে যখন পা দিলেন দম, তখন কে বলবে, আর পাঁচ জন রাজপুত্রের-মত তিনিও এক জন রাজপুত্র মাত্র।

স্বয়ম্বর সভা করে মেয়ে সুমনার বিয়ে দিচ্ছেন দশার্ণের রাজা মহাবীর চারুকর্মা। মেয়েটি ছিল যেমন রূপে, তেমনি গুণে অতুলনীয়।

সেই মেয়ে সুমনার স্বয়ম্বর হবে শুনে দেশ-বিদেশ থেকে যেখানে যত ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন, সবাই এসে জড়ো হতে শুরু করলেন চারুকর্মার রাজপ্রাসাদে। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এসেছেন মদ্ররাজের ছেলে মহাবীর মহানন্দ, বিদর্ভরাজ সংক্রন্দনের ছেলে বপুষ্মান, মহাধনু। এঁরা বীরত্বে কেউ কম যান না। আর বাবার বন্ধু হিসেবে সুমনাকে এঁরা আগেও দেখেছিলেন। ধারণা ছিল, তাঁদের মধ্যে থেকেই সুমনা কাউকে না কাউকে বেছে নেবে।

নির্দিষ্ট দিনে বসল স্বয়ম্বর সভা। রাজপুত্ররা গিয়ে বসলেন যে যাঁর নিজের জায়গায়। তারই মাঝে এক জায়গায় দম-ও এসে বসেছেন। সুমনাকে নিয়ে রাজা চারুকর্মা এলেন সভায়। সখীরা সুমনার হাতে তুলে দিল মালা। রাজা বললেন—মা, বীর সব রাজপুত্ররা এসেছেন। এঁদের মধ্যে যিনি তোমার মনোমত হবেন, তাঁকে বেছে নাও।

মালা হাতে সুমনা একে একে সব রাজপুত্রদের পেরিয়ে শেষে এসে মালা পরিয়ে দিল দম-এর গলায়।

আর যায় কোথা? মহানন্দ, বপুষ্মান আর মহাধনু উঠলেন গর্জন করে। তাঁদের মত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী যোগ্য সব রাজপুত্র থাকতে কোথাকার কে দম—তাঁর সঙ্গে সুমনার বিয়ে হতেই পারে না।

রাজা চারুকর্মা পড়লেন বিপদে। ভেবেছিলেন, কোথায় ভালয় ভালয় কাজ মিটে যাবে, তা না হয়ে শেষে আবার এ কি বিপর্যয়!

সুপণ্ডিত মন্ত্রীবরের শরণাপন্ন হলেন তিনি।

মন্ত্রীবর বললেন—স্বয়ম্বর সভার নিয়ম অনুযায়ী মেয়ে যাকে বরণ করেছে, সে-ই তার স্বামী। রাজপুত্ররা, তোমরা ক্ষত্রিয় হয়ে এ কি করছ?

কিন্তু কে শোনে মন্ত্রীবরের কথা।

তিন জনে মিলে যুক্তি করল, যেভাবেই হোক, দম-এর হাত থেকে সুমনাকে ছিনিয়ে আনতেই হবে।

ওদের রকম-সকম দেখে এবার রুখে দাঁড়ালেন দম।

—শোন, সুমনা এখন আমার স্ত্রী। স্বামীর ধর্ম স্ত্রীকে রক্ষা করা। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে, তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পার।

দম-এর কথা শুনে যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিন রাজপুত্র।

বাছা বাছা অস্ত্র নিয়ে ছুঁড়তে শুরু করলেন দম-এর দিকে। আর দম-ও সমানে প্রতিরোধ করে চলেছেন তাঁদের।

লড়াই যখন তুঙ্গে, সেই ফাঁকে মহাধনু খাঁড়া নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দম-এর ওপর। একদিকে মহানন্দ, বপুষ্মান, আবার তার মাঝে মহাধনু। কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না দম।

কুশলী দম অল্পক্ষণের মধ্যেই মারলেন মহানন্দ আর মহাধনুকে। যুদ্ধক্ষেত্রে একা এখন বপুষ্মান। অনেক সহজ হয়ে গেছে এখন জটিলতা। ধনুক-তীর-গদা—যা কিছুই ছুড়ুক না কেন বপুষ্মান, নিমেষে তা কেটে এমন অবস্থা করে তুললেন দম যে, কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালাল সে।

যুদ্ধ শেষ। খুবই খুশি চারুকর্মা। মহা ধুমধামের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন দম-এর সঙ্গে। তারপর কিছুদিন শ্বশুর বাড়িতে থেকে সুমনাকে নিয়ে ফিরে দম এলেন বাবার কাছে।

রাজা নরিষ্যন্তি স্বয়ম্বর সভার কাহিনী শুনে আর ছেলের বীরত্বের কথা জেনে, কি যে বলবেন!

এরপর—

বৃদ্ধ হয়েছেন রাজা নরিষ্যন্তি। সময় এসেছে বানপ্রস্থে যাবার।

একটা শুভ দিন দেখে ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা রানী ইন্দ্রসেনাকে নিয়ে চলে গেলেন বনে নির্লিপ্ত জীবন কাটাতে।

এদিকে দম-ও বাবার মতই সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। কোথাও কোন অশান্তি নেই।

একদিন রাজসভায় বসে দম। পাশে রানী সুমনা।

হঠাৎ এলেন সভায় এক মহিলা। তাঁর পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা। দেখলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, একজন মহিলা তাপস।

রাজা দম দেখামাত্রই তাঁকে সম্মান জানালেন। জানতে চাইলেন, কোথা থেকে আসছেন। কি প্রয়োজন।

মহিলা বললেন—মহারাজ, আমি আপনার মায়ের কাছ থেকেই আসছি!

শুনেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে দম-এর বুক—বানপ্রস্থে মা কেমন আছেন? কোন অসুবিধায় পড়েন নি তো? বাবার খবর কি?

—মহারাজ, আপনার মা আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। বললেন তিনি।

—সে কি? সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন দম।

—হ্যাঁ মহারাজ, বললেন মহিলা—প্রাণবিসর্জন দেবার আগে যে কথাগুলো তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন, আমি এখানে সে কথাগুলোই বলতে এসেছি।

মা ইন্দ্রসেনা নেই শুনে মনে দারুণ আঘাত পেলেন দম। বললেন—বলুন, তিনি কি বলে পাঠিয়েছেন?

—রাজার ধর্ম প্রজাদের রক্ষা করা। যাঁরা তপস্যা করছেন বনে, করছেন ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁরা যাতে তা নির্বিঘ্নে করতে পারেন; সেদিকে নজর রাখা। রাজর্ষি নরিষ্যন্তির ছেলে দম-কে তিনিও সেভাবেই জানতেন। কিন্তু, এখন ভেবে অবাক হচ্ছি, রাজা হয়ে তিনি কি কর্তব্য ভুলে গেলেন? বললেন মহিলা।

বেশ একটু ধাঁধার মধ্যে পড়লেন দম। বললেন—আপনি পরিষ্কার করে বলুন, আমার মা আত্মহত্যা করলেন কেন?

—তবে শুনুন মহারাজ। তাপসী ইন্দ্রসেনা আপনাকে বলার জন্য যা বলে গেছেন। আপনার বাবা নরিষ্যন্তি মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করছিলেন, পাশে ছিলেন তাপসী ইন্দ্রসেনা। সেই সময় একদিন দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষত্রিয় যুবক, নাম বপুষ্মান, শিকার করতে করতে এঁদের কাছে হাজির হয়ে পরিচয় জানতে চাইলেন। নরিষ্যন্তি ছিলেন মৌন। ইন্দ্রসেনাই বাধ্য হয়ে যুবককে তাঁদের পরিচয় দিলেন। শোনা মাত্রই বপুষ্মান, যেন কোন হারানো মানিক পেয়েছে, এইভাবে —লাফিয়ে উঠে বলতে লাগল, 'পেয়েছি! এতদিন বাদে পেয়েছি! এবার যাবে কোথায়? তোমাদের ছেলে দম যে মস্ত বড় বীর। ডাকো দেখি তাকে, সে কেমন এসে তোমাদের বাঁচাতে পারে!' বলেই নরিষ্যন্তির চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে, তুলে দাঁড় করিয়ে, ডান হাতে তুলল তরবারি। ইন্দ্রসেনা তার পায়ে লুটিয়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। দুর্বৃত্ত কিন্তু গ্রাহ্যই করল না। হাসতে হাসতে নরিষ্যন্তিকে মেরে চলে গেল। যাবার সময় বলতে বলতে গেল, 'এতদিনে গায়ের জ্বালা একটু মিটল।' মহারাজ, ইন্দ্রসেনা তাই শোকে-দুঃখে স্বামীর সঙ্গে চিতায় প্রাণ দিয়েছেন।

শোনামাত্রই দম-এর চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। ক্ষত্রিয়ের রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। তাঁরই জন্য বানপ্রস্থে অসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হল তাঁরই বাবাকে, যাঁর নামে একদিন বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত।

চলে গেছেন মহিলা।

উন্মাদের মত দম ডাক দিলেন সেনাপতিদের। বললেন—সাজো...সাজো...। সবাই রণসাজে সাজো। বপুষ্মানের কলজে আমার চাই—ওর মাংসে করব পিতৃশ্রাদ্ধ, ওর রক্তে করব পিতৃতর্পণ।

দম-এর আদেশ।

অক্ষৌহিণী প্রস্তুত হয়ে আক্রমণ করল বপুষ্মানকে।

বপুষ্মানও অবশ্য কম বীর ছিল না। শুরু হল লড়াই—হাতির সঙ্গে হাতির, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়ার, রথের সঙ্গে রথের।

বয়ে গেল রক্তের নদী। দম-এর তীরে একসময়ে বপুষ্মানের সেনাপতি মারা যেতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শত্রুদল। পালাবার চেষ্টা করল বপুষ্মান। কিন্তু সে সুযোগ আর সে পেল না।

ধরা পড়ে গেল দম-এর চোখে।

— পালাস কোথা কাপুরুষের মত? আমার বাবাকে তুই যেভাবে অসহায় অবস্থায় মেরেছিস, আমি তোকে সেভাবে মারব না। ধর অস্ত্র। ধিক্কার দিয়ে উঠলেন দম।

নিরুপায় এখন বপুষ্মান। আবার শুরু করল যুদ্ধ। কিন্তু অস্ত্রবিশারদ দম-এর কাছে কতক্ষণ? দম-এর তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল বপুষ্মান।

দম-ও অক্ষরে অক্ষরে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন, বপুষ্মানের রক্তে করলেন পিতৃতর্পণ, মাংসে শ্রাদ্ধ।

তারপর চোখের জলে আকুল হয়ে বললেন—মা-বাবা, রাজা হয়েও আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কোরো।



ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

বিষ্ণু এবং শিব, অর্থাৎ হরি এবং হর এঁরা কি দু-জন আলাদা কেউ? নামে আলাদা, আসলে কিন্তু এক। যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, যিনি হরি তিনিই হর—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অসংখ্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে বারবার সেই কথাই বলেছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান ভগবান, তিনিই প্রথমে এই তত্ত্বকথা গোলোকে বসে ব্রহ্মাকে শুনিয়েছিলেন। ব্রহ্মা সেই কথা শুনিয়েছিলেন ধর্মকে। ধর্ম তাঁর ছেলে নারায়ণকে এই রহস্যকথা জানিয়েছিলেন। নারায়ণ আবার তা বলেছিলেন ভক্ত নারদকে। নারদমুনি গঙ্গার ধারে বসে সেই পুরাণ-কথা বলেছিলেন ব্যাসদেবকে। ব্যাসদেবের শিষ্য পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ সূত এই পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কাছে। এই পুরাণে চারটি খণ্ড : ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড আর শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। বেশ কিছু বিচিত্র কাহিনী যেমন এতে আছে, তেমনি একমাত্র এই পুরাণেই রাধার কাহিনী পাওয়া যায়।



নারদের ইতিকথা



সুবিশাল জলরাশি সরিয়ে প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন স্থাবর জঙ্গম। জেগে উঠল মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত। মহাপ্লাবনের পর আবার সব কিছু নিয়ে জেগে উঠল পৃথিবী। এবার প্রজাসৃষ্টির পালা। এই বিপুল সম্পদ দিয়ে পৃথিবী পালন করবে কাকে।

অনেক ভেবেচিন্তে ব্রহ্মা তখন প্রথমে নিজেই সৃষ্টি করলেন কয়েকজন মানস-পুত্র। বললেন তাঁদের—এই দিব্য দেহ নিয়ে তোমরা আমার এই পৃথিবীকে প্রজা দিয়ে সাজিয়ে তোল। তোমরা এক-একজন প্রজাপতি হও।

এই মানস-পুত্রদের মধ্যে কয়েকজন রাজি হলেন বটে, কিন্তু কয়েকজন আবার বেঁকে বসলেন। যাঁরা বেঁকে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নারদ।

ব্রহ্মার মুখের ওপর তিনি সোজা বলে বসলেন—ঘর-সংসার করার কাজ আমার দ্বারা হবে না।

—আমি তোমার স্রষ্টা, তোমার বাবা, তোমায় বলছি। তুমি তা অবজ্ঞা করবে? মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন ব্রহ্মা।

—বললে কি হবে। যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তা কি জোর করে করা যায় নাকি? তুমি আমাকে নামগান করতে বল, রাজি আছি। কিন্তু ওসব আমার দ্বারা হবে না, সাফ কথা। বললেন নারদ।

শুনে ব্রহ্মা গেলেন রেগে—কি, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা? যা, তুই গন্ধর্বকুলে জন্মা গে। রাগের চোটে ব্রহ্মা নিজের ছেলেকেই দিয়ে বসলেন অভিশাপ।

নারদও কিছু কম ছিলেন না। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখের ওপরই বাবাকে দিয়ে বসলেন অভিশাপ—বিনা অপরাধে তুমি আমায় অভিশাপ দিলে? তাহলে তুমিও শুনে রাখ, পৃথিবীতে তোমার পুজো কেউ করবে না।

[প্রায় সব দেবতারই পুজো হয় মূর্তি করে। কিন্তু ব্রহ্মার পুজো নেই বললেই হয়]।

অভিশাপের তীর গিয়ে বিঁধল দু-জনকেই। ব্রহ্মার না হয় পুজো হবে না, কিন্তু নারদের?

সব কিছু থাকতেও গন্ধর্বরাজের মনে কোন শান্তি ছিল না। কেননা, তাঁর কোন ছেলেপুলে ছিল না। এই বিশাল রাজত্ব ভোগ করবে কে?

রাজাকে বিমর্ষ দেখে গুরুদেব বললেন—গন্ধর্বরাজ, তুমি বরং পুষ্কর তীর্থে গিয়ে তপস্যা কর। আমার বিশ্বাস, তাহলে এই অভাব তোমার আর থাকবে না।

পুষ্কর তীর্থে গেলেন গন্ধর্বরাজ। দেখা বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে। মুনিবর তাঁকে বললেন, শিবের তপস্যা করতে।

পুত্র চাই। সুতরাং যে কোন তপস্যাই হোক, আর যত কষ্টেরই হোক, তিনি তা করতে রাজি।

নিশ্চল হয়ে গন্ধর্বরাজ বসলেন পুষ্কর তীর্থে শিবের আরাধনায়।

প্রায় যখন একশটা বছর কেটে গেল, মহাদেব এসে দেখা দিলেন তাঁকে। বললেন—গন্ধর্বরাজ, আমি সন্তুষ্ট তোমার তপস্যায়। বল, কি তোমার প্রার্থনা।

প্রণাম জানিয়ে গন্ধর্বরাজ বললেন—ভগবান, আমার দুটি মাত্র প্রার্থনা। অপুত্রক আমি, মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি। একটি পুত্র আমায় দিয়ে আমার দুঃখ দূর করুন। আর একটি প্রার্থনা। আপনি তো জানেন, শ্রীহরি আমাদের কত প্রিয়। আমার পুত্রও যেন তাঁর দাস হয়ে তাঁরই নামগান করে!

মহাদেব বললেন—পুত্র চেয়েছ। আমার বরে নিশ্চয়ই তোমার রূপবান, গুণবান পুত্র হবে। কিন্তু শ্রীহরির দাস হবে সে, এ যে দারুণ প্রার্থনা। যদি বল, তোমার ছেলে ইন্দ্র হবে, ব্রহ্মা হবে, সেটা পূরণ করা যেতে পারে, কিন্তু...

গন্ধর্বরাজের কিন্তু ঐ এক কথা। হরিভক্ত ছেলে না হলে তিনি প্রাণ দেবেন।

অগত্যা মহাদেব মঞ্জুর করে গেলেন গন্ধর্বরাজের প্রার্থনা।

মহাখুশি গন্ধর্বরাজ ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

যথাসময়ে একটি পুত্রও হল। যেমনটি বলেছিলেন মহাদেব, ঠিক তেমনটি। যেমন রূপবান, তেমনি গুণবান—যেন এক দেবদূত।

গন্ধর্বলোকে মহা ধুমধাম। রাজার ছেলে হয়েছে শিবের বরে, এ কি কম কথা? বশিষ্ঠদেব তার নাম রাখলেন উপবরহণ।

শিশু উপবরহণ দেখতে দেখতে হলেন শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক। তাঁর রূপে-গুণে-গানে গন্ধর্বলোক যেন পেল নতুন প্রাণ। হরির গুণগানে গন্ধর্বলোক যেন পাগল হয়ে উঠল।

চিত্ররথ নামে ছিলেন আর এক গন্ধর্বরাজ। গণ্ডকী নদীর জলে একদিন স্নান করতে গিয়ে তার মেয়েরা যুবক উপবরহণকে দেখে

সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করে বসল তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তারা।

প্রস্তাব পাঠালেন চিত্ররথ গন্ধর্বরাজের কাছে। পঞ্চাশটি মেয়ে তাঁর। বিয়েও হয়ে গেল। হরিভক্ত ছেলে তাঁর পত্নীদের নিয়ে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

একসময় গন্ধর্বরাজ ছেলেকে রাজত্ব দিয়ে নিজে অবসর নিলেন। গন্ধর্বলোকের রাজা এখন উপবরহণ।

গন্ধর্ব হয়ে জন্মালেও উপবরহণ কিন্তু জন্মান্তরের কথা ভুলতে পারেন নি। বিয়ে করে সংসারী হয়েও কিন্তু সংসারে একেবারে জড়িয়ে না পড়ে, কাঁধে তিনতারের বীণা আর গলায় স্ফটিকের মালা পরে সর্বত্র শ্রীহরির গুণগান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন এমনিভাবে গান গাইতে গাইতে পত্নী মালাবতীকে নিয়ে উপবরহণ গিয়ে হাজির পুষ্করতীর্থে।

সেখানে গিয়ে দেখেন রাজ্যের দেবতারা বসে আছেন এক আসর আলো করে। স্বয়ং ব্রহ্মাও বসে আছেন সেখানে একটা উঁচু আসনে। আর অপ্সরা রম্ভা এমন নাচ নাচছে, যে দেবতারা মোহিত, আর ব্রহ্মাও বেশ মেজাজে তা উপভোগ করছেন।

উপবরহণ এসে ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে একপাশে দেবতাদের কাছে গিয়ে বসলেন। অপ্সরী রম্ভার সেদিকে খেয়ালই নেই।

নাচ দেখতে দেখতে একসময় যুবক উপবরহণ নিজেকে আর সংযমের মধ্যে রাখতে না পেরে এমন এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসলেন যা দেখে দেবতারা হেসে উঠলেন, আর দারুণ রেগে উঠলেন ব্রহ্মা নিজে।

এমন নাচের আসর উপবরহণের জন্য ভেঙে গেল। রাগ তো তাঁর হবারই কথা। উপবরহণও কিন্তু কম লজ্জায় পড়লেন না। কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গেছে—উপায় কি?

ব্রহ্মা আবার অভিশাপ দিলেন—শ্রীহরির নাম-গান করছ অথচ কামনাকে জয় করতে পারলে না। আমার অভিশাপে জন্ম নিয়েছিলে গন্ধর্বের ঘরে। এখন যে কাজ করলে এর জন্য তুমি শূদ্রের ঘরে গিয়ে জন্মাবে, যাও।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন উপবরহণ।

—দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও—ধমক দিয়ে ওঠেন ব্রহ্মা। তুমি ছিলে আমার মানস-পুত্র। দেখছি তুমি আমার কলঙ্ক। আবার তুমি যদি কোন বিষ্ণু-ভক্তের সঙ্গ পাও, তবেই শাপমুক্ত হবে।

অপমানে লজ্জায় গন্ধর্ব উপবরহণ ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে, এ মুখ তিনি আর কাকে দেখাবেন। সোজা চলে এলেন নির্জন এক উপবনে। বীণাটিকে পাশে রেখে, বাঁ হাতে স্ফটিকের মালা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে যোগাসনে বসলেন তিনি। দেহত্যাগ করবেন। করলেনও তাই। এক সময় যোগবলে দেহত্যাগ করে চলে গেলেন তিনি।

মালাবতী খুঁজতে খুঁজতে সেই উপবনে এসে স্বামীর মৃত্যু দেখে তো কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর সব রানীরাও কাঁদতে কাঁদতে এসে আছড়ে পড়ল। গন্ধর্বরাজ শুনে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন। হবারই কথা। অনেক তপস্যায় পাওয়া অমন গুণী ছেলে তাঁর—অকালে চলে গেল!

অকালে অমন স্বামীর মৃত্যু কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে? সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল মালাবতী। আকুল হয়ে সে ডাকতে লাগল শ্রীকৃষ্ণকে। ডাকতে লাগল ধর্ম, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সব দেবতাদের—কি অপরাধ আমার স্বামী করেছে ভগবান যে, অকালে তোমরা তাঁর প্রাণ নিলে? দয়া করে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে দাও।

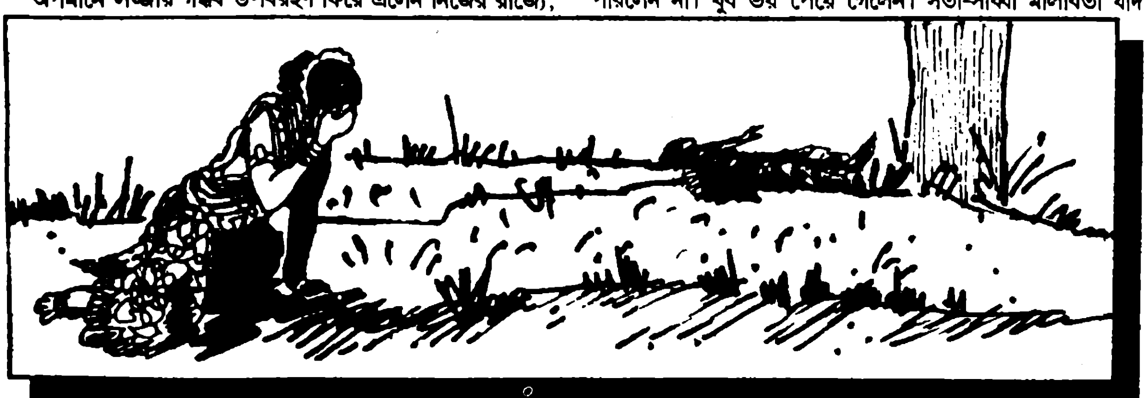
মৃত স্বামী উপবরহণের মাথা কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর প্রার্থনা জানাতে জানাতে কেটে গেল গোটা দিন-রাত।

এল পরের সকাল। এত প্রার্থনা তার বিফল হল দেখে মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল সে।

দেবতাদের উদ্দেশ করে এবার মালাবতী প্রায় গর্জন করে উঠল—শোন দেবগণ, আমি যদি সতী-সাধ্বী হই, যদি আমি আমার স্বামীকেই একমাত্র দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে থাকি, তাহলে আমি তোমাদের অভিশাপ দেব। আমার অভিশাপে তোমরা দেবতারা, আমার কাছ থেকে বিনা অপরাধে অসময়ে আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে যে অপরাধ করেছ, তার ফল তোমাদের ভোগ করতেই হবে। যদি দেখতাম, স্বামী আমার বৃদ্ধ হয়েছেন, রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছেন, তাহলে অবশ্যই আমার বলার কিছু থাকত না। কিন্তু কেন তোমরা অকালে আমার এই বিপর্যয় ঘটালে! আমার প্রার্থনাও তোমরা শুনলে না। দেখ, আমিও তোমাদের কি করতে পারি।

এই বলে মালাবতী মৃত স্বামীকে রেখে চলে গেল কৌশিকী নদীতে।

এদিকে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে দেবতারা যখন মালাবতীকে রেগে-মেগে নদীর জল হাতে নিয়ে তাঁদের অভিশাপ দেবার জন্য কৌশিকীর দিকে যেতে দেখলেন, তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। খুব ভয় পেয়ে গেলেন। সতী-সাধ্বী মালাবতী যদি



একবার অভিশাপ দিয়ে বসে, তাঁদের সাধ্য নেই যে তা রোধ করেন। আবার এদিকে যে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে মান বাঁচাবেন, তাও না পেরে সকলে মিলে যুক্তি করে ছুটলেন ক্ষীরসাগরে ভগবান বিষ্ণুর কাছে।

বিষ্ণু তো আর সহজে দেখা দেন না কাউকে। অথচ এই ঘোর বিপদ থেকে একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া তাঁদের রক্ষা করার আর কে আছেন? ক্ষীরসাগরে স্নান সেরে তাই ব্রহ্মা, শিব, ধর্ম থেকে শুরু করে দেবতারা আরম্ভ করলেন তাঁর স্তব-স্তুতি।

অনেকক্ষণ স্তব-স্তুতি করার পর একসময় শুনলেন তাঁরা দৈববাণী—দেবগণ, তোমরা মালাবতীর কাছে যাও। উপায় একটা অবশ্যই হবে।

দৈববাণী শুনে দেবতারা তো তাড়াতাড়ি চলে এলেন উপবনের ধারে সেই কৌশিকী নদীতে।

সবেমাত্র স্নান সেরে হাতে জল নিয়ে দেবতাদের অভিশাপ দিতে যাবে মালাবতী, এমন সময় হঠাৎ দেবগণকে দেখে উঠে এল জল থেকে। বলল—তাহলে এতক্ষণে আপনারা এলেন? বলুন...বলুন, আপনারা আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন কিনা।

মালাবতীর এক চোখে জল, এক চোখে আগুন। মুখে পরিষ্কার দাবি। কি জবাব দেবেন তাঁরা মালাবতীকে! ভগবান বিষ্ণু আড়াল থেকে বলেছেন এখানে তাঁদের আসতে। উপায় তিনি করে দেবেন। কিন্তু কোথায় তিনি? মালাবতীর সামনে থেকে সরে যাবারও তো কোন উপায় নেই এখন। বেশ বিব্রত বোধ করতে শুরু করলেন দেবতারা। এদিকে মালাবতীর সেই একই কথা—বলুন, আপনারা আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন কিনা। বলুন...বলুন...।

ঠিক সেই সময়ে কপালে চন্দনের তিলক, বগলে পুঁথি নিয়ে সেখানে এলেন এক ব্রাহ্মণ যুবক। যেমন সুদর্শন, তেমনি সৌম্যকান্তি। তাঁকে দেখলেই মনে জাগে শ্রদ্ধা।

—কি ব্যাপার, এখানে? ব্রহ্মা, শিব, ধর্মরাজ! কি হল! সব এখানে কেন? বলতে বলতে সেই ব্রাহ্মণ যুবক একেবারে এসে দাঁড়ালেন মালাবতীর সামনে।

মৃত স্বামীকে সামনে কোলে নিয়ে মালাবতী তখনো দেবতাদের কাছে তার আবেদন পেশ করে চলেছে।

—কে তুমি? কাকে কোলে নিয়ে এভাবে কাঁদছ? মৃত বলে মনে হচ্ছে? তোমার স্বামী বুঝি? কি হয়েছিল? একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করে বসলেন সেই ব্রাহ্মণ যুবক মালাবতীকে।

অবাক চোখে তাকায় মালাবতী ব্রাহ্মণ যুবকের দিকে। দেবতারাও তাঁকে দেখলেন বিস্ময়ের চোখে।

মালাবতীকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে ব্রাহ্মণ যুবক বললেন—শোন মেয়ে, আমার কাছে কিছু গোপন করো না। খুলে বল কি হয়েছে? আমি একজন কবিরাজ। আমি মরাকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারি। সে চিকিৎসাবিদ্যা আমার জানা আছে। কি রোগে মরেছে তোমার স্বামী? তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

শুনে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল মালাবতী।

বলল—ইনি আমার স্বামী গন্ধর্বরাজ উপবরহণ। আমি মালাবতী, চিত্ররথ গন্ধর্বের মেয়ে। আমার পঞ্চাশ বোনের ইনি স্বামী। কোন রোগে ইনি মারা যান নি। দেহত্যাগ করেছেন অকালে ব্রহ্মার অভিশাপে।

—তা ব্রহ্মা হঠাৎ তোমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন কেন?

মালাবতী তখন সবই খুলে বলল ব্রাহ্মণ যুবককে।

শুনলেন তিনি। তারপর তাকালেন ব্রহ্মার দিকে।

ব্রহ্মা বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে মালাবতী। ও ছিল আমার মানস-পুত্র নারদ। আমার আদেশ অমান্য করেছিল বলে আমারই অভিশাপে গন্ধর্বকুলে জন্ম নিয়েছিল। হরিভক্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু কামনা জয় করতে পারে নি বলেই অভিশাপ দিয়েছিলাম শূদ্রকুলে জন্ম নেবার। সেই দুঃখেই উপবরহণ দেহত্যাগ করেছে। তবে একথা ঠিক যে, এখনও ওর মৃত্যুর সময় আসে নি। আয়ু এখনও আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মালাবতী ব্রাহ্মণ যুবককে বলে উঠল—আয়ু থাকতেও আমার স্বামী দেহত্যাগ করল মনের দুঃখে, অকালে। তা জেনেও কোন অধিকারে যমরাজ আমাদের অনাথ করে তাঁর প্রাণকে নিয়ে গেল?

—খুব খাঁটি কথা, বললেন ব্রাহ্মণ যুবক—দারুণ দামি কথা বলেছে মালাবতী। ধর্মরাজ, তুমি এর কি জবাব দেবে? যমকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন ব্রাহ্মণ যুবক।

—আমি তো নিজের ইচ্ছেয় নিয়ে যাই নি। নিয়তি এনে দিয়েছে, আমি আমার অধিকারে তবে তাকে পেয়েছি। আমার কি অপরাধ, বল ব্রাহ্মণ? বললেন যমরাজ।

—নিয়তি? মানে, মৃত্যুকন্যা? বলল মালাবতী—ব্রাহ্মণ, দেখছি আপনি অনেক শক্তি ধরেন। আমার সামনে একবার সেই মৃত্যুকন্যাকে হাজির করতে পারেন? তাকে জিজ্ঞেস করব, মেয়ে হয়ে সে কি মেয়ের কষ্ট বোঝে না?

ব্রাহ্মণ যুবক মালাবতীর অনুরোধমত ডাকলেন মৃত্যুকন্যাকে।

মৃত্যুকন্যা আসতেই মালাবতীর কথা শুনে শুধু বলল—ব্যথা আমি বুঝি মেয়ে, কিন্তু আমি যে নিরুপায়। কালের আদেশ উপেক্ষা করার ক্ষমতা যে আমার নেই, মেয়ে।

ডাক পড়ল কালের। তিনি বললেন—দেখ মেয়ে, আমি আমার ইচ্ছেয় চলি না। ভগবান বিষ্ণুই আমাদের প্রভু। তিনি যা করান, আমরা তাই করি।

—কিন্তু আমার স্বামীর আয়ুষ্কাল তো শেষ হয় নি, কাল? তবু তুমি তাকে নিয়ে যাও কোন্ অধিকারে? ফুঁসে ওঠে মালাবতী।

কাল কি উত্তর দেবে এর?

মুখ শুকিয়ে গেল দেবতাদের। দৈববাণীতে ভগবান বিষ্ণু বলেছিলেন, 'উপায় একটা হবে।' এখন কি উপায়? কোথায় তিনি?

মুখ আড়াল করে মুচকি হাসলেন ব্রাহ্মণ যুবক। মনে মনে আরও মজা পেলেন এই ভেবে যে, এমন দারুণ ছদ্মবেশ ধরেছেন তিনি, যে দেবতাদেরও সাধ্য হল না তাঁকে চেনবার।

ব্রাহ্মণ যুবক তখন দেবতাদের ডেকে বললেন—মালাবতী তো খুব খারাপ কথা বলে নি, দেবগণ। কি ভাবছেন এখন? সতী-সাধ্বী রমণীর অভিশাপ তো বিফলে যাবে না। রোগ-বালাইয়ে মরলে না হয় দেখতাম। কিন্তু, এখানে আমারও যে আর কিছু করার নেই।

মালাবতীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভগবান এ কি পরীক্ষায় ফেললেন তাঁদের। মাথা চুলকোতে লাগলেন ব্রহ্মা থেকে সব দেবতা।

ব্রহ্মা শেষে বললেন—কি আর করব, জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছি। এই বলে কমণ্ডলুর জল গায়ে ছিটিয়ে দিতেই চোখ মেলে

তাকাল উপবরহণ।

শিব, পবন, আদিত্যও তাঁদের যেটুকু যা দেবার দিতে উঠে বসলেন তিনি। দাঁড়ালেন। তাকালেন চারদিকে। মালাবতীর মনও খুশিতে ভরে উঠল।

সবই ফিরে পেলেন বটে গন্ধর্ব উপবরহণ। কিন্তু কাউকে চিনতে পারছেন না কেন? সেই স্বাস্থ্য, সেই সৌন্দর্য—তবু এমন জড়ভরতের মত অবস্থা কেন হল?

আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল মালাবতী। আহ্বান জানাল ব্রহ্মাকে।

ব্রহ্মা বললেন—আমাদের যার যা করার, সবই তো করেছি মালাবতী। তোমার স্বামীর জীবন আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন এমন হল? তুমি বরং ঐ কবিরাজ ব্রাহ্মণ যুবককে ডেকে দেখাও।

কিন্তু কোথায় সেই কবিরাজ! তন্ন তন্ন করেও তাঁকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

চোখ খুলে গেল দেবতাদের। বুঝতে পারলেন, সেই ব্রাহ্মণ যুবক আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। মালাবতীকে বললেন ব্রহ্মা—ভগবান বিষ্ণুকে ডাক মালাবতী। তিনি না দিলে, আমাদের দেওয়াটা এরকমই থেকে যাবে।

মালাবতী তখন একমনে শুরু করল ভগবান কৃষ্ণের স্তব। ফিরিয়ে আনল উপবরহণের প্রাণ। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন গন্ধর্বরাজ। গন্ধর্বনগরীতে আবার উঠল আনন্দের রোল।

মনের আনন্দে হরিভক্ত গন্ধর্ব উপবরহণ এরপর কাটালেন তার বাকি জীবন নাম-গান করে।

তারপর একদিন নেমে এল স্বাভাবিক মৃত্যু। মারা গেলেন উপবরহণ। জ্বলে উঠল চিতার আগুন। স্বামীর চিতায় মালাবতীও প্রাণ দিল।

ব্রহ্মার অভিশাপ কিন্তু বৃথা যাবার নয়।

কান্যকুব্জে ছিলেন গোপরাজ দ্রুমিল। তাঁর স্ত্রী কলাবতী। সংসারে তাঁর সবই ছিল। ছিল না শুধু ছেলে। তাই দুঃখ অনেক।

বহু সাধ্য-সাধনা করেও দ্রুমিলের যখন কোন ছেলে হল না, তখন পুত্র কামনায় কলাবতী স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন গেল কাছেই কাশ্যপ মুনির আশ্রমে। ব্রহ্মতেজে জ্বলজ্বল করছে মুনির সারা অঙ্গ। ধ্যানমগ্ন।

কলাবতী প্রণাম করে বসল তাঁর সামনে।

ধ্যান শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই মুনিবরের চোখে পড়ল কলাবতীকে।

সুন্দরী সুবেশা কলাবতী কাশ্যপের দিকে তাকিয়ে এমন একটা হাসি হাসল, আর এমনভাবে চাইল যে, মুনিবর চমকে উঠলেন।

মাথায় সিঁদুর—নিশ্চয়ই কারো স্ত্রী। কিন্তু এ কি হাবভাব?

দেখে খুবই রেগে উঠলেন কাশ্যপ।

—কি চাই তোমার এখানে? কি করতে এসেছ? যাও, এখান থেকে।

কলাবতী কোন সঙ্কোচ না করে সরাসরি বলে বসল—মুনিবর! আপনার কাছে এসেছি মাত্র একটি পুত্রের জন্য।

শুনে কাশ্যপ তো উঠলেন আরো রেগে। তার আশ্রম কি কোন অনাচারের জায়গা? এত সাহস পেল কোথা থেকে এই মেয়ে!

ঠিক সেই সময়েই স্বর্গের অপ্সরা মেনকা যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। যাকে দেখলে দেবতারা সংযম হারান, সেখানে মুনি তো কোন ছার!

কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে। মনের আনন্দে কলাবতী ফিরে এল বাড়িতে। স্বামী দ্রুমিলও শুনে মহা খুশি। এতদিনে তার দুঃখ অবশ্যই ঘুচবে। তার কুলে যে সন্তান জন্মাবে, তার কোন তুলনা থাকবে না।

দ্রুমিল মনের আনন্দে চলে গেল বদরিকা আশ্রমে। তার ইচ্ছা, তপস্যায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কলাবতীকে বলল—তুমি কোন ব্রাহ্মণের ঘরে থেকে তোমার ভাবী সন্তানকে দেখো, কলাবতী। আমার কাজ শেষ। আমি এবার আমার এ জীবন ত্যাগ করব।

করলও তাই।

কলাবতীও স্বামীর মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবে কি, এক ব্রাহ্মণ এসে কোথা থেকে হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে বসলেন।

বললেন—মা, এ তুমি কি করছ? তোমার পেটে ছেলে রয়েছে।

কলাবতী বলল—জানি তা, তুমি কে বাবা? বলতে পার আমার কি উপায়? আমার স্বামী তপস্যায় প্রাণ দিলেন। কার কাছে আমি থাকব? কি হবে আমার ছেলের পরিচয়?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমার ঘরে চলুন। সেখানে আপনি আমার মা হয়ে থাকবেন। ছেলেটি হবে আমার ভাই।

এড়াতে না পেরে কলাবতী অগত্যা গিয়ে উঠল সেই ব্রাহ্মণের ঘরে।

সেখানেই একদিন জন্ম হল এক শিশুর।

ব্রাহ্মণ ছিলেন খুবই সদাচারী। দারুণ কৃষ্ণভক্ত। বৈষ্ণবরা প্রায়ই আসতেন তাঁর বাড়িতে। নাম-গান হত। ভগবানের আলোচনা হত। কলাবতী তাঁদের সাধ্যমত সেবা-পরিচর্যা করত।

ছেলেটির নাম রাখল ব্রাহ্মণ নারদ। কারণ যেদিন ছেলেটি জন্মেছিল সেদিন নাকি খুব বৃষ্টি হয়েছিল দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর।

শিশুটি কিন্তু ছিল জাতিস্মর। পূর্বজন্মের সব কথাই তার মনে ছিল। তাই প্রথম থেকেই এমন আচার-আচরণ করতে শুরু করল যে, ব্রাহ্মণ দেখে অবাকই হন। পাঁচ বছর যখন তার বয়স হল, তখন নারদ যেন আর এক 'নারদ'। সাধু-সন্ত এলে কিছুতেই তাদের কাছছাড়া হত না। যেখানে কৃষ্ণের নাম-গান বা পুরাণ পাঠ হত, সেখান থেকে তুলে আনে সাধ্য কার? নিজের মনেই মাটি দিয়ে মনের মত করে কৃষ্ণের মূর্তি গড়ে ধুলোর নৈবেদ্য সাজিয়ে গান গেয়ে তার পুজো করত। মা কলাবতী খেতে ডাকলে বলত—দাঁড়াও মা, পুজোটা শেষ করি।

একদিন চারজন ব্রাহ্মণ এলেন সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি। যথোচিত সমাদর জানালেন ব্রাহ্মণ। নারদ নিল তাঁদের সেবার ভার। দিনরাত পড়ে থাকে তাঁদের কাছে। শোনে ভগবানের কত কথা। ব্রাহ্মণরা খান ফলমূল। নারদ খায় তার প্রসাদ। দেখতে দেখতে নারদের মনও কেমন উদাসীন হয়ে উঠতে থাকে। ইচ্ছে জাগে, চলে যায় এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। কিন্তু পারে না মায়ের জন্য।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। সর্পাঘাতে মারা গেল কলাবতী। যেটুকু বন্ধন ছিল নারদের, তাও কেটে গেল।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণরা চলে যাবার আগে নারদকে দিয়ে গেল বিষ্ণুনাম।

নারদও গঙ্গার তীরে গিয়ে বসল সেই নাম জপ করতে।

কত বছর যে জপ করতে করতে কেটে গেছে তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন ধ্যানমগ্ন নারদ দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রাণের ঠাকুর। শ্যাম কলেবর, হাতে মোহন বাঁশি। দেখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার।

কিন্তু পরক্ষণেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেই মূর্তি।

হাহাকার করে উঠল নারদ।

এমন সময় হল দৈববাণী—আর তুমি এখন আমায় দেখতে পাবে না।

কেঁদে আকুল নারদ। বলল—আর যদি দেখা না দেবে, তবে এলে কেন?

—তোমার তৃষ্ণা বাড়াবার জন্য। হল দৈববাণী—শীঘ্রই তোমার মুক্ত হবে, অপেক্ষা কর। স্থির চিত্তে তপস্যা কর নারদ। তোমার এ জীবন শেষ হলে দিব্য জীবন পাবে। তখন তুমি থাকবে আমারই কাছে।

তপস্যায় শূদ্র জীবন শেষ করে নারদ আবার ফিরে পেলেন তাঁর প্রথম সেই দিব্য জীবন। ফিরে এলেন তিনি আবার ব্রহ্মলোকে। খুব আনন্দ তাঁর মনে। নারদ তো আর জানতেন না, এরপরেও তাঁর জন্য আরও কি অপেক্ষা করে আছে!

পিতাকে এসে প্রণাম করতেই ব্রহ্মা বললেন—নারদ তোমার শাপমুক্তি ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু কর্মফল যে তোমাকে এখনও ভোগ করতে হবে।

—তার মানে? চমকে ওঠেন নারদ।

—গন্ধর্ব জীবনে যে মালাবতীকে তুমি বিয়ে করেছিলে সে এখন জন্ম নিয়েছে সঞ্জয়রাজের ঘরে। রূপগুণশালিনী মেয়ে। মালাবতী চিতায় আত্মাহুতি দেবার সময় একটাই মাত্র কামনা নিয়ে প্রাণ দিয়েছিল, পরজন্মে সে যেন তোমাকেই স্বামী হিসেবে পায়। এখনও সে তোমারই অপেক্ষায় রয়েছে। বললেন ব্রহ্মা।

—এত কাণ্ড করে ফিরে এলাম, আবার তুমি আমাকে বিয়ের কথা বলছ? তুমি তো জান, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। বললেন নারদ।

—তাই বলে তুমি সেই মেয়ের তপস্যাকে উপেক্ষা করতে পার না। বললেন ব্রহ্মা।

রাগ করে নারদ সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন বদরিকা আশ্রমে, যেখানে ভগবানের অংশে নারায়ণ ঋষি তপস্যা করছিলেন।

অনেক আলাপ-আলোচনা, অনেক জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে সঞ্চয় করলেন বটে নারদ, কিন্তু শেষে সেই ফাঁদে পড়লেন।

নারায়ণ বললেন—নারদ, সঞ্জয়রাজের কন্যাকে বিয়ে কর গে। শিবের তপস্যা করে, সে তোমাকেই পেয়েছে স্বামী হিসেবে।

নারায়ণ ঋষির কথা উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না নারদের। বাধ্য হয়েই একদিন ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে মহা ধুমধামে তাকে বিয়ে করতে হল।

বিয়ের পর কিছুকাল কেটেছে।

হঠাৎ দেখা ব্রহ্মার আর এক বিবাগী ছেলে সনৎকুমারের সঙ্গে।

সনৎকুমার বলল—নারদ, এ কি করছ? বিয়ে করে কি কৃষ্ণনাম ভুলে গেলে? এখনও সময় আছে। যদি বাঁচতে চাও তো কৃষ্ণনাম নিয়ে সংসার থেকে পালাও।

চৈতন্য এল নারদের, সত্যিই তো। সংসার করার জন্য তো তিনি আসেন নি। এ কি দুর্বিপাক!

তারপর হঠাৎ একদিন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সব মায়ামোহ কাটিয়ে কৃষ্ণনামে এমন মজে গেলেন নারদ যে, তার আর তুলনা নেই।

তিনতারের বীণা হাতে নারদ চলে গেলেন নাম-গান গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে। হয়ে গেলেন ভগবান বিষ্ণুর একান্ত আপনজন।



বেদবতীর কাহিনী

শিবভক্ত রাজা হংসধ্বজের দুই ছেলে ধর্মধ্বজ আর কুশধ্বজ। সূর্যদেবের অযথা অভিশাপে শ্রীহীন হয়ে মারা গেলেন হংসধ্বজ।

বাবার মৃত্যুর পর দু-ভাই ধর্মধ্বজ আর কুশধ্বজ হলেন রাজা। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলে কি হবে, দু-জনেই ছিলেন মহা তাপস। আর রানীরাও ছিলেন সেই রকম।

সূর্যদেবের অভিশাপে কিছুই তাঁদের থাকার কথা নয়। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করে, তাঁরা আবার সব ফিরে পেয়েছিলেন। কুশধ্বজের স্ত্রী মালাবতী ছিলেন দারুণ পতিব্রতা।

যথাসময়ে কুশধ্বজের একটি মেয়ে হল। ফুটফুটে মেয়ে। একবার দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়, সাধ্য কার। যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। আদর করে সবাই তার নাম রাখলেন বেদবতী।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার কাণ্ড দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারদিকের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, কারোর দিকে না তাকিয়ে বেদবতী হঠাৎ উঠে গুট...গুট করে চলতে শুরু করে দিল। শুধু চলা নয়, সবাই দেখল, বাড়ি থেকে সটান বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

হাঁ...হাঁ... করে উঠলেন সবাই। ছুটে এলেন তাকে ধরতে।

সকলেই অবাক হয়ে শুনলেন, অতটুকু শিশু বেদবতীর মুখে স্পষ্ট কথা—আমাকে আটকে রেখো না, ছেড়ে দাও।

—কোথায় যাবে তুমি? এতক্ষণে রাজা-রানী এবং আর সবাই বুঝে নিয়েছেন, এ কোন সাধারণ মেয়ে নয়।

—আমি তপস্যায় যাব।

—এখনই কেন মা? একটু বড় হও, বয়স হোক। তখন না হয় যেয়ো। তবুও বাধা দেবার চেষ্টা করলেন সকলে।

কিন্তু কোন অনুরোধ-উপরোধেই টলল না বেদবতীর মন। বেদবতী সোজা চলে গেল পুষ্করতীর্থে। সেখানে বসল তপস্যায়।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। তপস্যায় অটল বেদবতী। শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে এখন। কিন্তু না নিয়মিত আহার, না শরীরের প্রতি কোন যত্ন। অমন যে সোনার মত গায়ের রং, তা

মলিন হয়ে গেল। স্বাস্থ্যও গেল। সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তার।

একদিন হঠাৎ সে শুনল আকাশবাণী। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—মেয়ে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে কিসের জন্য তুমি এমন কঠোর তপস্যা করছ? কি তোমার অভিলাষ?

বেদবতী বললেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীহরিকে আমার স্বামীরূপে পাওয়ার বাসনাতেই আমার এই তপস্যা।

আকাশবাণী বলল—বেদবতী, এ জন্মে নয়। পরজন্মে তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হবে।

শুনে মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হল বেদবতী। কেন পরজন্মে? এ জন্মে নয় কেন?

পুষ্কর থেকে উঠে এবার বেদবতী সোজা চলে গেল গন্ধমাদন পর্বতে। আরো কঠোর তপস্যা করবে সে, যাতে এ জন্মেই তার আশা মেটে।

গন্ধমাদনে নিরালা জায়গা দেখে, নিজের মনের মত তৈরি করে নিল একটা আশ্রম। বেদবতী বসল সুকঠোর তপস্যায়। ভগবান নারায়ণ ছাড়া আর কোন চিন্তাই নেই তার মনে।

কেটে গেল এভাবে আরো কয়েক বছর।

হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাক্ষসরাজ রাবণ অতিথির বেশে হাজির সেখানে।

আশ্রমবাসী তপস্বিনী বেদবতী। তার মনে নেই কোন সঙ্কোচ, ভয় বা আশঙ্কা।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাকে আহ্বান জানিয়ে বসার আসন দিল বেদবতী। পা-ধোওয়ার জল দিল। যে-ই হোক, অতিথি। অতিথি যে নারায়ণ। তার সেবা সবার আগে।

হাত-পা ধুয়ে রাবণ বসল আসনে। চকিতে বেদবতী ফল-মূল এনে দিল অতিথির আহারের জন্য। রাবণ মুখ বুজে সবই খেল। অতিথিসেবায় দারুণ খুশি রাবণ আশ্রমে বসে বিশ্রাম করল।

স্বভাবে রাক্ষস। পাপ মন তার যাবে কোথায়? চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বেদবতীকে। আর ভাবে, কতই-বা বয়স? এই বয়সে তপস্বিনী!

নিজেকে আর চেপে রাখতে না পেরে বলেই বসল রাবণ—দেখ, এই বয়সে তোমাকে এরকম তপস্বিনীর বেশে মানায় না। এখন কি এভাবে তপস্যা করার সময় তোমার? না, এমন নির্জন স্থানে একা একা থাকা শোভা পায়?

অতিথির কথা শুনে চমকে ওঠে বেদবতী। রাবণের কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই।

—তাছাড়া তুমি এখানে বসে কার তপস্যা করছ? বলল রাবণ—আমি ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ। সব দেবতারা চলে আমার আদেশে। তোমার উচিত, আমারই তপস্যা করা। চল, আমার সঙ্গে আমার প্রাসাদে। হাজার হাজার দাসী আমার, তোমার পদসেবা করবে। কেন এখানে এভাবে জীবন নষ্ট করছ?

বেদবতী শুনে আরও অবাক হল। এমন কথা যে কখনও শুনতে হবে, স্বপ্নেও ভাবে নি সে। আর বুঝতেও পারে নি, অতিথির ছদ্মবেশে এসেছে পাপচারী অসুর রাবণ।

ভগবান নারায়ণ ছাড়া সে তো আর কাউকে জানে না। শৈশব থেকে সে যে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন, তাঁকে পাবার আশাতেই যে তাঁর এত সাধনা। এ কি পাপ তাকে শোনাতে এল রাবণ?

বেদবতী যখন এমন ভাবে তন্ময়, রাবণ আর ধৈর্য রাখতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বেদবতীর হাত ধরে টান দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদবতীও রুখে দাঁড়াল। এক ঝটকায় নিজেকে তার হাত থেকে মুক্ত করে এমন কটমট করে তাকাল রাবণের দিকে যেন ঝলকে ঝলকে ছুটে আসতে লাগল আগুন।

সরোষে গর্জন করে উঠল সে—অতিথি-জ্ঞানে তোমার সেবা করলাম। তার বিনিময়ে এই প্রতিদান? জীবনে আমি কখনো কুচিন্তা করি নি। ভগবান নারায়ণ ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না। অবলা পেয়ে তুমি এলে অত্যাচার করতে? শোন রাবণ, আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, সবংশে তোমাকে ধ্বংস হতে হবে। তোমার ঐ পাপ-হাত দিয়ে তুমি আমাকে ছুঁয়েছ। অপবিত্র আমার এই শরীর আমি রাখব না।

বেদবতীর সেই চোখ, আর গম্ভীর গলায় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল রাবণ। কিন্তু যদিও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে, তবু কিছুই আর করার সুযোগ পেল না। যোগবলে বেদবতী ইতিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করে বসে আছে।

মনের বাসনা পূর্ণ হল না দেখে রাবণ রেগে বেদবতীর মৃত শরীরটা টেনে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে চলে গেল।

আকাশবাণী কিন্তু মিথ্যা হয় নি। মিথ্যা হয় নি বেদবতীর অভিশাপও।

পরজন্মে এই বেদবতীই জনককন্যা সীতারূপে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রকে লাভ করেছিল। আর রাবণ এই সীতাকে হরণ করেই রামচন্দ্রের হাতে সবংশে নিধন হয়েছিল।





তুলসী ও শঙ্খচূড়ের ইতিকথা

গন্ধমাদনে মনোরম প্রাসাদে রাজা ধর্মধ্বজ মহাসুখে থাকতেন রানী মাধবীকে নিয়ে।

মনোমত পত্নীকে নিয়ে রাজর্ষি ধর্মধ্বজ এভাবে দিন কাটাতে কাটাতে একদিন রানী হলেন সন্তান-সম্ভবা।

বহুদিন পরে দেখবেন সন্তানের মুখ, রাজা-রানীর সে কি আনন্দ!

সময় পেরিয়ে গেল, সন্তান আর ভূমিষ্ঠ হয় না। দেখে বেশ চিন্তায় পড়লেন রাজা। কোন বিপর্যয় ঘটল না তো? ভালভাবে দেখেন ধর্মধ্বজ রানীকে। সেরকম কিছুই কিন্তু দেখতে পেলেন না। পেটে সন্তানের ভার, অথচ মাধবীর তার জন্য কোন কষ্টই নেই। বেশ হাসি-খুশিতেই আছেন।

দিব্য পরিমাণে যখন একশ বছর কেটে গেল, তখন এক শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে মাতৃজঠর থেকে বের হয়ে এল সন্তান—একটি কন্যারত্ন। কি অপূর্ব সে মেয়ের মুখ! দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায় রাজা-রানীর। পুরবাসীরা অনেক ভেবে-চিন্তে তার নাম রাখল তুলসী।

জাতিস্মর তুলসী। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল তার পূর্বজন্মের কথা। সে ছিল গোলোকে, আর সব গোপরমণীদের মত কৃষ্ণের সেবিকা হয়ে। যদিও রাধা ছিলেন গোপী-প্রধান, আর শ্রীকৃষ্ণ তাকে বেশ সমীহও করে চলতেন, তবুও সকলকেই তিনি সমান ভালবাসতেন। তুলসীও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকেই জানত না।

হঠাৎ একদিন রাসমণ্ডলে তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করতে দেখে রাধা উঠলেন দারুণ রেগে। তাঁর ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁরই স্বামী। আর কোন গোপনারী নয়। তাই নিরালায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীকে দেখে তাঁর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। অভিশাপ দিয়ে বসলেন, পাপাচারী তুই। তোর স্থান গোলোকে নয়। যা মর্ত্যে, গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মা গে।

রাধাকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভয় করতেন, গোপীরাও তেমনি। তাই তাঁর মুখের ওপর কোন কথা বলার সাহস পেত না।

অভিশাপ পেয়ে তুলসীর মন গেল ভেঙে। মনে মনে তার স্বামীই যে শ্রীকৃষ্ণ—তাঁকে ছেড়ে মর্ত্যে কি করে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে তুলসীকে ভালবাসতেন। কিন্তু ঐ যে রাধার ওপর কোন কথাই তিনি বলতে পারতেন না। তাঁরও মনে ব্যথা লাগল।

ছলছল চোখে তুলসী তাঁর দিকে তাকালে তিনি বললেন—এখানে যে আমার কিছু করার নেই তুলসী। রাধার অভিশাপ তোমায় ভোগ করতেই হবে। তুমি মর্ত্যে গিয়ে নারায়ণের তপস্যা কোরো। আমাতে আর নারায়ণে কোন ভেদ নেই, তুলসী। ওটা আমারই আর এক রূপ। ব্রহ্মার বরে নিশ্চয়ই তুমি শাপমুক্ত হবে। তোমাকে ছেড়ে থাকা কি আমারও কিছু কম কষ্টের?

সেই অভিশাপেই এ জন্মে সে রাজর্ষি ধর্মধ্বজের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে বেদবতীর মতই সে চলে গেল বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মার তপস্যায়।

সে কি তপস্যা! বেশ কয়েক বছর কাটল কেবলমাত্র ফলমূল খেয়ে। আরো বেশ কয়েক বছর কাটাল শুধু মাত্র জল খেয়ে। তারপর কেবল মাত্র বায়ু। একটা মেয়েকে এমন তপস্যা করতে আগে কেউ দেখে নি। একমাত্র ইন্দ্রপদ পাবার জন্যই অসুররা এ রকম তপস্যা করত। কিন্তু তুলসী? ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, যমলোক—ওসব কিছুই তার চাই না। তুলসীর শুধু একটাই কামনা—যেমনটি ছিল সে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের আপনজন হয়ে, এজন্মেও সে হতে চায় তেমনি নারায়ণের আপনজন।

এমনভাবে সুদীর্ঘকাল যখন তপস্যায় কেটে চলেছে তুলসীর দিন, ব্রহ্মা আর স্থির থাকতে না পেরে একদিন এলেন তার কাছে। বললেন—তোমার এই কঠোর তপস্যা থামাও তুলসী। বল, কি তোমার অভিলাষ? কি চাই?

ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে তুলসী বলল—ভগবান, আপনার তো কিছু অজানা নেই। রাধার শাপে আমার এই পরিণতি। এ থেকে



আমি মুক্তি পেতে চাই। ফিরে যেতে চাই গোলোকে নারায়ণের সেবিকা হয়ে। আর রাধার ভয় যেন দূর হয় আমার মন থেকে।

ব্রহ্মা বললেন—তোমার অভিলাষ এ জন্মে তো আমি পূরণ করতে পারব না। পরজন্মে অবশ্যই তুমি নারায়ণকে স্বামী হিসেবে পাবে। এজন্মে যে তোমাকে অসুররাজ শঙ্খচূড়ের পত্নী হয়ে থাকতে হবে, তুলসী। আমি যে আগেভাগেই তাকে সে বর দিয়ে বসে আছি।

শুনে অবাক হয় তুলসী। জিজ্ঞেস করে—শঙ্খচূড়...অসুর! কে সে? তাকে তো আমি চাই নি।

ব্রহ্মা বললেন—সময় এলেই তার পরিচয় পাবে। তবে তাতে তোমার কোন অমঙ্গল হবে না। তারপর নারায়ণকে অবশ্যই তুমি পাবে।

—কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ।

—দৈব-দুর্বিপাকে তোমার ওপর আসবে এক অভিশাপ। যার ফলে তুমি গাছ হয়ে থাকবে পৃথিবীতে। আর তোমার পাতা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাই হবে না। এ ছাড়াও আমার বরে তোমার মন থেকে রাধার ভয় নিশ্চয়ই দূর হয়ে যাবে। বলে চলে গেলেন ব্রহ্মা।

এ জন্মে নারায়ণকে পাবে না জেনেও তুলসী কিন্তু নারায়ণের পায়েই মন-প্রাণ দিয়ে রইল। শঙ্খচূড় অসুরের কথা যেন সে ভুলেই গেল। তপস্বিনী বেশে মনের আনন্দে আপন মনে শ্রীকৃষ্ণ আর নারায়ণের সঙ্গেই খেলা করে দিনরাত কাটাতে লাগল।

এমনভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর।

ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপের স্ত্রী দনুর বংশে জন্ম অসুররাজ শঙ্খচূড়ের। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, দানব,—সব তার শাসনাধীনে।

দেববরে বলীয়ান সে। কঠোর তপস্যায় সে বিষ্ণুর কাছ থেকে আদায় করেছিল রক্ষাকবচ। যতক্ষণ সেটি থাকবে তার গায়ে, ততক্ষণ কোন অস্ত্রই তাকে আঘাত হানতে পারবে না। ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছিলেন—মনের মত স্ত্রী-রত্ন শঙ্খচূড় অবশ্যই পাবে। স্ত্রীও পতিব্রতা হবে। কিন্তু যেদিন স্ত্রীর মর্যাদা সে রাখতে পারবে না, সেদিন কিন্তু শঙ্খচূড়কে মরতে হবে।

বর পেয়ে শঙ্খচূড়কে আর পায় কে?

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের জন্মাবধি শত্রুতা। তাই শঙ্খচূড় আগেই দেবরাজ্য আক্রমণ করে দিল দেবতাদের তাড়িয়ে, কেড়ে নিল অধিকার। হয়ে বসল ত্রিভুবনের রাজা।

একদিন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শঙ্খচূড় এসে হাজির হল বদরিকাশ্রমে। সেখানে তুলসীকে দেখেই মনে পড়ে গেল তার পূর্বজন্মের কথা। অমন যে বীর, তুলসীকে দেখেই তার মন হয়ে উঠল দারুণ চঞ্চল।

তুলসীও দেখল তাকে। কিন্তু তার মনে কোন আশঙ্কা জাগল না। অসুর বংশে জন্ম হলে কি হবে, দেখতে তো কদাকার ছিল না শঙ্খচূড়কে। বেশ সুদর্শন আর সুপুরুষ চেহারা।

নির্ভয়ে শঙ্খচূড় তুলসীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সরাসরি বলে বসল—তুলসী, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। তুমি অমত কোরো না। আমি অসুররাজ শঙ্খচূড়।

তুলসী কিন্তু বাধা দেয়। বলে—না, তা হতে পারে না। আমি আমার স্বামী হিসেবে একমাত্র নারায়ণকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। তুমি ঐ প্রস্তাব আমার কাছে আর কখনও রেখো না, যাও।

শঙ্খচূড় বলল—তুলসী, তুমি জাতিস্মর। আমিও আমার পূর্বজন্মের কথা ভুলি নি। অসুরজন্মে আমি ব্রহ্মার কাছে তোমাকেই স্ত্রী হিসেবে পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনিও আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। আজ তোমার দেখা পেলাম।

দু-জনের মধ্যে যখন এমনি কথাবার্তা চলছিল ঠিক সেই সময়েই ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন সেখানে।

বললেন—শঙ্খচূড় ঠিক কথাই বলেছে। ও তোমাকেই স্ত্রীরূপে পেতে চেয়েছিল আমার কাছে। আর আমিও তা মঞ্জুর করেছি।

ব্রহ্মার আদেশ। তুলসী আর এড়াতে পারল না। চোখ বুজে একবার দেখে নিল তার পূর্বজন্মের দিনগুলো। শঙ্খচূড়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল বৈকুণ্ঠের দিনগুলো। অপলক দৃষ্টিতে সে তখন শুধু তাকিয়ে থাকত তুলসীর দিকে। মনে মনে গুমরে মরত। কাছে যেতে পারত না রাধার ভয়ে। আর আজ!

বিয়ে হয়ে গেল তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের।

শঙ্খচূড়ও মনের আনন্দে তুলসীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল পৃথিবীর যেখানে যত রমণীয় স্থান আছে, সেখানে। তার প্রাণ-ঢালা ভালবাসায় তুলসীও প্রায় ভুলে গেল সব কিছু।

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা মন্বন্তর। না হয় শঙ্খচূড়ের পতন, না দেবতারা ফিরে পান তাঁদের স্বর্গরাজ্য।

আর স্থির থাকতে না পেয়ে দেবতারা গিয়ে ধরলেন ব্রহ্মাকে—পিতামহ, আর কতদিন আমাদের ভিখিরি হয়ে থাকতে হবে? আপনি কি আমাদের কথা একটুও ভাববেন না?

ব্রহ্মা বললেন—দেখ, আমি একা নিরুপায়। শঙ্খচূড় আমারই বরে বলীয়ান। কি করি বল তো? অথচ তোমাদের কষ্টও আমি দেখতে পাচ্ছি। চল, বরং শঙ্করের কাছে যাই। ও যদি কোন উপায় বের করতে পারে।

সবাই মিলে এলেন তখন কৈলাসে শিবের কাছে। শিব শুনে বললেন—দেখ, আমার মাথায় কিছু আসছে না। চল, বরং আমরা যাই শ্রীহরির কাছে। উনি যদি কোন উপায় বাতলে দিতে পারেন।

দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা আর শিব হাজির হলেন বৈকুণ্ঠে।

সুখাসনে বসে ভগবান শ্রীহরি। দেব-দেবতারা আসতেই সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—কি ব্যাপার? সকলে যে আজ হঠাৎ এখানে!

ব্রহ্মা বললেন—না এসে আর উপায় কি বলুন। এখন আপনি রাখলে সব থাকবে, আর মারলে সব যাবে।

—এমন কথা কেন বলছ ব্রহ্মা? পৃথিবীতে এমন কি হল, যা তোমদের শাসনের বাইরে? সব জেনেও মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন ভগবান।

—আজ্ঞে, এক মন্বন্তর তো হল। দেবতারা বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন। অসুর শঙ্খচূড় যে সৃষ্টিটা গ্রাস করে ফেলল, ভগবান। এখন আপনি যদি দয়া না করেন, দেবরাজ্য যে আর থাকে না। বললেন ব্রহ্মা।

—শঙ্খচূড়! একটু যেন বিস্ময়ের ভান করলেন শ্রীহরি। তারপর বললেন—ঐঃ, হ্যাঁ...হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তা মন্বন্তর হয়ে গেল নাকি? তাহলে তো ওকে এবার ফিরিয়ে আনতেই হয়।

—সে জন্যই তো আমরা আপনার কাছে এসেছি ভগবান। বললেন দেবতারা।

—দেখ দেবগণ, শিব ছাড়া ও কারো হাতেই বধ্য নয়। আর আমার এই ত্রিশূল ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রেই ও মরবে না। এই বলে শ্রীহরি শঙ্খচূড়ের প্রাণঘাতী ত্রিশূলটি তুলে দিলেন শিবের হাতে। আরও একটা কথা, সেটা হল ওর কবচ। ওটা আমিই দিয়েছিলুম। যতক্ষণ ওটা থাকবে ওর গায়ে, ততক্ষণ কোন অস্ত্রই ওকে কাবু করতে পারবে না।

তাহলে?

মৃদু হেসে শ্রীহরি বললেন—ঠিক আছে, ওটার ভার আমার হাতেই থাক। এ ছাড়াও আরো একটা রহস্য আছে। সেটাও না হয়,

আমিই দেখব।

নিশ্চিন্ত হলেন স্বর্গভ্রষ্ট দুঃখী দেবতারা। স্বয়ং ভগবান যখন ভার নিয়েছেন, তখন আর চিন্তা কি? নিশ্চিন্তে আয়োজন করা যেতে পারে।

ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে চলে আসবেন দেবতারা, এমন সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীহরি বললেন—আমার জন্যই বেচারাকে এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, জান? গোলোকে ও ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় সখা। বলতে পার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ওর নাম ছিল সুদামা। আমার সব কাজে, সব সময় ও আমার সঙ্গে থাকত ছায়ার মত। একদিন রাধার চোখ এড়িয়ে রাসমণ্ডলে গিয়েছিলাম সখী বিরজার ঘরে। সুদামা বাইরে ছিল পাহারায়। হঠাৎ খুঁজতে খুঁজতে রাধা সেখানে এসে হাজির। বিরজা তো রাধার ভয়ে লজ্জায় জলের আকার নিয়ে নদী হয়ে গেল। আমি পালিয়ে এসেছিলাম আমার ঘরে। রাগে রাধা আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে যথেচ্ছ অপমান করল আমায়। রাধার সব অপমান আমি গায়ে মেখে নিলাম হাসিমুখে। কিন্তু বন্ধু সুদামা সহ্য করতে পারল না। সে রাধার মুখের ওপর যা হোক দুটো কথা বলে বসল। আর যায় কোথা? রাধাও তাকে অভিশাপ দিয়ে বসল, 'তুই অসুরকুলে অসুর হয়ে জন্মা গে।' রাধার অভিশাপে সুদামা কেঁদে আকুল। মাথা ঠাণ্ডা হলে অবশ্য রাধা বলেছিল, 'ঠিক সময়ে আবার তুমি বৈকুণ্ঠেই ফিরে আসবে।' বলে একটু থেমে শ্রীহরি বললেন—তাই বলছিলাম, ওর জন্য আমারও কষ্ট কিছু কম নয়।

শ্রীহরির কাছ থেকে শূল নিয়ে শ্রীহরির আদেশে শিব এসে ছাউনি ফেললেন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে। দূত করে প্রথমে পাঠালেন তাঁরই এক অনুচর পুষ্পদন্তকে।

দৈত্যপুরের বিশাল প্রাসাদে সুবিশাল জাঁকজমকের মধ্যে তখনো মনের আনন্দে শঙ্খচূড় দিন কাটাচ্ছিল তুলসীর সঙ্গে। জানতও না, ইতিমধ্যে দেবগণ প্রস্তুত; আবার যুদ্ধে যেতে হবে তাকে।

পুষ্পদন্ত এসে শিবের আদেশ শোনাল শঙ্খচূড়কে।

দেবতাদের রাজ্য হয় সে ফিরিয়ে দিক, নয়তো শিব বাধ্য হবেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

দূতের কথা শুনে শঙ্খচূড় বলল—তোমার মনিবকে গিয়ে বল, এর জবাব দিতে আমি নিজেই যাব চন্দ্রভাগার তীরে।

খবর পেয়ে শিবের কাছে একে একে এসে জড়ো হলেন কার্তিক, গণেশ, বীরভদ্র থেকে তাঁর বাকি গণেরা, কালী, এমন কি শত হাত নিয়ে ভদ্রকালী পর্যন্ত। সঙ্গে নানা অস্ত্রশস্ত্র।

গমগম করে উঠল চন্দ্রভাগার তীর।

শঙ্খচূড়ও প্রস্তুত। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সে তখন অনুভব করতে শুরু করেছে মুক্তির আনন্দ। এতদিনে তাহলে তাকে মনে পড়েছে সখা কৃষ্ণের। কিন্তু বাইরের ভাব দেখলে কে তা বুঝবে।

দৈত্যপুরে বেজে উঠল যুদ্ধের ডঙ্কা। রণসাজে সেজে চলল দানবরা। বহুদিন পর আবার হবে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ। কি উল্লাস তাদের!

তুলসীর সঙ্গে দেখা করে, তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শঙ্খচূড়ও বের হল দৈত্যপুর থেকে। যাবার আগে শুধু ইঙ্গিতে তুলসীকে বলে গেল—আমাদের পূর্বজন্মের কথা আমরা কেউই ভুলি নি তুলসী।

সবার আগে শঙ্খচূড়ের রথ। নানা অস্ত্রে সজ্জিত সে। পিছনে অগণিত দানবসেনা।

চন্দ্রভাগার তীরে পৌঁছে শিবকে দেখেই শঙ্খচূড় প্রথমে তাঁকে প্রণাম জানাল। তারপর বলল—এভাবে যে আপনার দেখা পাব, তা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি। আমরা অসুর, যুদ্ধ করি দেবতাদের সঙ্গে। করে আসছি, আসবও। কিন্তু এর মধ্যে আপনি কেন দেবাদিদেব?

শিব বললেন—বাধ্য হয়েই আসতে হল আমাকে। আচ্ছা শঙ্খচূড়, তুমি তো মূর্খ নও। যথেষ্ট জ্ঞানী। তাছাড়া আমি জানি, পূর্বজন্মে তুমি ছিলে কৃষ্ণের সখা, পরম বৈষ্ণব। যে কোন কারণেই হোক, অসুর হয়ে জন্মেছ বলে, তোমার আচার-আচরণ সবই কি অসুরের মত হবে। এ তো আমি ভাবতেই পারি না।

—আমার অন্যায় আচার-আচরণ কি দেখলেন, দেবাদিদেব?

—কোন অপরাধে তুমি তোমার ভাই দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের অধিকার কেড়ে নিলে? এই জ্ঞাতিবিরোধ কি তোমার করা উচিত হয়েছে?

—যদি ও কথাই বলেন, দেবাদিদেব, কি অপরাধ করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপু, বলি, যে আপনারা কৌশলে তাকে বধ করলেন? শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করালেন দুর্গাকে দিয়ে? জ্ঞাতি-ভাই হয়েও দেবতারা কি সত্যিই কোন দিন কোন উদারতা দেখিয়েছেন আমাদের ওপর? বলেই শঙ্খচূড় বলল—ও কথা থাক। আমি শুধু এই ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনি স্বয়ং এসেছেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অবশ্য নিঃসন্দেহে এটা আমার সৌভাগ্য যে, আজ এই যুদ্ধে শিব নিজে আমার হাতে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

শুনে শিব বললেন—একান্তই যদি তাই হয়, তাহলেও আমার কিছু লজ্জা নেই শঙ্খচূড়। প্রকৃত একজন ভক্ত বীরের কাছে পরাজয়ে কি কোন ক্ষোভ থাকে?

কথা যা ছিল শেষ হয়ে গেছে। আবেদনে কোন ফলই হল না। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া আর কোন গতি নেই।

একদিকে শিবপুত্র কার্তিক থেকে শিবানুচররা একদিকে, আর একদিকে শঙ্খচূড় নিজে আর তার দানবসেনারা।

ধনুকের টঙ্কারে, উল্লাসে চন্দ্রভাগার তীর তখন রীতিমত এক যুদ্ধক্ষেত্র।

শঙ্খচূড়ের ধনুক থেকে বাণের পর বাণ ছুটে আসে আগুনের হল্কার মত। আছড়ে পড়ে কার্তিকের গায়ে। মহাবীর কার্তিক। প্রতিরোধের হাজার চেষ্টা করেও সবাই যখন প্রায় বিফল হয়ে পড়ছেন, তখন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন নানা অস্ত্র নিয়ে কালী নিজে।

শিবের বীরগণ আর কালী মিলে প্রায় শেষ করে ফেললেন অসুর-সেনা। কিন্তু শঙ্খচূড় তখনো অটল। যে অস্ত্রই নিক্ষেপ করেন কালী অসুরকে লক্ষ্য করে, শঙ্খচূড় নিজের অস্ত্র দিয়ে তা শুধু প্রতিরোধই করে চলে। নারায়ণী অস্ত্র পর্যন্ত কালীর যখন বিফল হয়ে গেল, তখন শঙ্খচূড়কে বধ করার জন্য তিনি তুলে নিলেন পাশুপত। কিন্তু ছুঁড়তে আর পারলেন না। ছুঁড়তে যাবেন কি, শুনলেন দৈববাণী, 'কালী থামো। পাশুপত বৃথা যাবে। শঙ্খচূড় তোমার হাতে বধ্য নয়।' একটু থেমে আবার কালী তুললেন পাশুপত। আবার সেই

দেববাণী। বাধ্য হয়ে কালী তখন অস্ত্র ছেড়ে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শঙ্খচূড়ের ওপর। শঙ্খচূড়ের রথ গেল, ধ্বজা গেল, কালীর প্রচণ্ড প্রহারে সে হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরতে আবার উঠল। কিন্তু কালীর বিরুদ্ধে কোন অস্ত্রই সে প্রয়োগ করল না। বারবার শুধু তাঁকে নমস্কারই করে গেল।

নিরুপায় হয়ে কালী শিবের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন সব কিছু—আশ্চর্য! সে শুধু আমার অস্ত্র প্রতিরোধ করল, মারল না আমাকে এক ঘা-ও। বদলে মাকে যেমন ছেলে প্রণাম করে, আমার মার খেয়েও তেমনি ভাবে বারবার প্রণামই করে গেল। পাশুপত তুললাম। তাও দৈববাণী, আমার হাতে নাকি সে বধ্য নয়।

শুনে মৃদু হাসলেন শিব। বললেন—ঠিকই তাই, কালী। অসীম শক্তিধর শঙ্খচূড় তোমার বধ্য নয়। ঠিক আছে। আজ আমিই যুদ্ধে যাব—এই শূল হাতে। দেখব, কত বড় বীর সে।

পরদিন আবার শুরু হল যুদ্ধ। এবার দেবসেনাদের নিয়ে শিব এলেন নিজে।

শিবকে দেখেই রথ থেকে নেমে শঙ্খচূড় আগে তাঁকে প্রণাম করে নিয়ে শুধু বলল—কোন অপরাধ নেবেন না দেবাদিদেব।

তারপরই রথে উঠে হাতে ধনুক তুলে নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল রণহুঙ্কার।

গর্জন করে উঠলেন শিবের সঙ্গে শিবসেনারাও।

শুরু হল সংগ্রাম। প্রায় সমানে সমানে। কে হারে, কে জেতে! দিন নেই, রাত নেই—চলেছে তুমুল সংগ্রাম। দেবসেনাদের হাতে প্রায় একে একে মারা গেল অসুরসেনারা। বাকি আছে আর সামান্যই। কিন্তু শঙ্খচূড় যে একাই অনেক। তাদের হাতে যেসব দেবসেনা মারা পড়ল, শিব তাঁদের আবার বাঁচিয়ে তুললেন।

দেখে দারুণ আক্রোশে শঙ্খচূড় আবার শত শত শরের জাল বিস্তার করে মারতে উদ্যত হল দেবসেনাদের।

শিবও আর ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে হাতে তুলে নিলেন শ্রীহরির দেওয়া শঙ্খচূড়ের প্রাণঘাতী সেই ত্রিশূল। কিন্তু শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাবেন কি, শুনলেন আকাশবাণী—'অপেক্ষা কর শিব। এখনই তুমি ওকে বধ করতে পারবে না। আমার দেওয়া



রক্ষাকবচ আছে ওর শরীরে। তা ছাড়াও আছে ব্রহ্মার বর। একটু সময় কাটাও। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে তোমায় যখন জানাব, তখন শঙ্খচূড়কে বধ কোরো তুমি।'

বাধ্য হয়েই কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘটাতে হল শিবকে।

একদিকে শিবের সঙ্গে দেবসেনা, আর একদিকে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে সামান্য অসুরসেনা।

এমন সময় হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন শঙ্খচূড়ের কাছে। বললেন—শুনেছি, আপনি একজন দানবীর। জীবন থাকতে কোন প্রার্থীর প্রার্থনা আপনি অপূর্ণ রাখেন নি। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বড় অসহায় হয়ে আপনার কাছে এক প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, যদিও আপনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে।

—তা হোক। বলুন, আপনার কি প্রার্থনা। নিশ্চয়ই আমি তা পূরণ করব। বলল শঙ্খচূড়।

—আগে কথা দিন, যা চাইব তাই দেবেন। ফেরাবেন না। জানি, আপনি কখনো কথার খেলাপ করেন না। বললেন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নারায়ণ।

—কথা দিলাম।

—আপনার গায়ে যে সোনার কবচটা আছে, ওটা আমায় দিন। প্রার্থনা জানালেন ব্রাহ্মণ।

—এই মাত্র? বলেই ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এই ভাবে নিজের গা থেকে খুলে দিলেন ব্রাহ্মণকে সেই রক্ষাকবচ। একটুও দুঃখ পেল না তাতে শঙ্খচূড়, বরং মনে মনে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কবচ নিয়েই ব্রাহ্মণ গেলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা দৈত্যপুরীতে। এরপর আছে আর একটু ছোট কাজ। সেটুকু শেষ করতে পারলেই শঙ্খচূড়ের মুক্তি।

কতদিন হল যুদ্ধে গেছে শঙ্খচূড়। কোন খবরই পাচ্ছে না তুলসী। মনটা দিন রাত তার ছটফট করছে।

হঠাৎ প্রাসাদে সেনাদের উল্লাসধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখে, ফিরে এসেছে তার স্বামী শঙ্খচূড়।

উদ্‌গ্রীব তুলসী সাদরে স্বামীকে সম্ভাষণ জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে বসাল। সেবা পরিচর্যা করল। তারপর জানতে চাইল, যুদ্ধের কি হল।

হাসতে হাসতে শঙ্খচূড় বলল—দেবাদিদেব অনেক করে অনুরোধ করলেন, তাই মিটমাট করে এলাম। দেবতাদের রাজ্য দেবতাদের ফিরিয়ে দিয়ে এলাম। আর ভাল লাগছে না তুলসী। যুদ্ধেটুদ্ধে গেলেই তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে—এ আমার মন সায় দেয় না।

শুনে খুবই খুশি তুলসী।

দিন গেল, রাত এল।

স্বামী যাতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে তার আয়োজন করে তুলসী তার সেবা করতে বসল।

সতী-সাধ্বী তুলসী। তার চোখকে কি সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়?

কিছুটা রাত হতেই ধরা পড়ে গেলেন শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে নারায়ণ।

ইতিমধ্যে আকাশবাণী চলে গিয়েছিল শিবের কাছে—সব কাজ শেষ হয়েছে। এবার তুমি শূল দিয়ে নিশ্চিন্তে শঙ্খচূড়কে বধ কর।

শোনামাত্র শিবও আর কালক্ষেপ না করে শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করে

যেই শূল ছুড়লেন, অমনি তা তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আবার ফিরে এল শিবের হাতে। থেকেও গেল তাঁরই কাছে। তাই শিবের আর এক নামই হয়ে গেল 'শূলপাণি।'

মনে প্রথমে খুবই ব্যথা পেল তুলসী। ছলনা করে তার স্বামী শঙ্খচূড়কে এইভাবে নিধন করা! কি নিষ্ঠুর হৃদয় নারায়ণের! যদিও আশৈশব তুলসী এই নারায়ণকেই স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করে এসেছিল, তবুও এই মুহূর্তে শঙ্খচূড়ের মৃত্যুতে এতই কাতর হয়ে পড়ল তুলসী যে নারায়ণকে লক্ষ্য করে বলে বসল—এতই যখন পাষাণ-হৃদয় তোমার, তুমি পাথর হয়ে থাক।

নারায়ণ বললেন—তাই থাকব তুলসী। গণ্ডকীর ধারে আমি নানা আকারের, নানা রূপের শিলা হয়ে থাকব। পৃথিবীতে তা হবে আমারই প্রতিনিধি শালগ্রাম শিলা। আর তুমিও এবার তোমার তপস্যার ফল লাভ করে নির্ভয়ে থাকবে আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে। পৃথিবীতে থাকবে তোমার স্মৃতি। তোমার দেহ হবে গণ্ডকী নদী। তোমার কেশ হবে তুলসীবৃক্ষ। যে কোন শুভ কাজই হোক পৃথিবীতে, তোমাকে বাদ দিয়ে হবে না। আর তোমার নামের যে গাছ জন্মাবে, তার পাতা ছাড়া আমারও যদি কেউ পূজা করে, সে পূজা বিফল হবে।

মনের ক্ষোভ দূর হল তুলসীর। যেটুকু অশান্তি ছিল নারায়ণের মনে, তাও দূর হয়ে গেল।

কৃষ্ণ-সখা সুদামা আবার ফিরে গেল বৈকুণ্ঠে। নারায়ণের ইচ্ছায় তারও স্মৃতি রয়ে গেল পৃথিবীতে শাঁখের মধ্যে। নারায়ণও ফিরে পেলেন হরিপ্রিয়া তুলসীকে।

রাধাকে আর তাঁদের কারো ভয় নেই।



সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী

মদ্ররাজ অশ্বপতি, রানী মালতী। যেমন রাজা তেমনি রানী। দান-ধ্যান, যাগ-কর্ম—সারা রাজ্য জুড়ে যজ্ঞ যেন লেগেই আছে। রাজ্যের কোথাও কোন অভাব নেই। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। প্রজারা যেন বাস করত সুখের রাজত্বে।

অভাব নেই রাজা-রানীরও। প্রজাদের সকলের কাছেই তাঁরা পান মা-বাবার সম্মান। কিন্তু পেলে কি হবে? যখনই মনে হত, নিজেদের কোন ছেলেপুলে নেই, তখনি মনটা খারাপ হয়ে যেত। পরক্ষণেই অবশ্য তা আবার সামলে নিতেন। বুঝতে দিতেন না কাউকে তাঁদের মনের কষ্ট।

একদিন কিন্তু রানী মালতী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না।

রাজকার্য সেরে অশ্বপতি অন্দরমহলে এসে দেখেন, শুকনো মুখে বসে আছেন রানী। চোখের কোণে জল। আলুথালু বেশ। রাজা তো দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। এরই মধ্যে কি এমন ঘটে গেল? কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন রানীকে।

বার বার, অনেকবার জিজ্ঞেস করে বুঝলেন, সন্তান না থাকার জন্যই রানীর মনে অত কষ্ট। সে কষ্ট তো রাজারও। কিন্তু উপায় কি? ভাগ্যে যদি তাঁদের ছেলেপুলে না থাকে, কি করার আছে?

অশ্বপতি অনেক চেষ্টা করেও এবার যখন রানীকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারলেন না, তখন ঠিক করলেন, একবার গুরুদেবের পরামর্শই নেওয়া যাক।

গুরুদেব হলেন মহামুনি বশিষ্ঠ। থাকতেন কাছেই এক তপোবনে তপস্যা নিয়ে।

হঠাৎ রানীকে নিয়ে রাজা অশ্বপতি একদিন এলেন সেখানে। প্রণাম জানিয়ে বসলেন।

বশিষ্ঠদেবও সাদরে তাঁদের বসিয়ে জানতে চাইলেন তপোবনে আসার কারণ। রাজাও অকপটে সবই বললেন গুরুদেবকে।

শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন—একটাই মাত্র পথ আছে। তা হল, ভগবতী সাবিত্রীর আরাধনা। স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মাও তাঁর পূজা করেন। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তোমরা যদি তাঁকে তুষ্ট করতে পার, তাহলে তোমাদের আর এই মনোকষ্ট থাকবে না।

এমনিতেই রাজা-রানী দু-জনেই ছিলেন খুবই ধার্মিক। একটা পথের নিশানা পেয়ে রানী মহিষী আর কালবিলম্ব না করে বসে গেলেন সাবিত্রীর আরাধনায়। অশ্বপতি ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে।

শুদ্ধাচারে থেকে এক মনে মহিষী দিনরাত ডাকেন সাবিত্রীকে—দেবী, কৃপা কর। আমার বন্ধ্যা অপবাদ দূর করে দাও।

এমনি ভাবে ডাকতে ডাকতে মহিষীর কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। কিন্তু সাবিত্রীর দেখা আর মিলল না।

খুবই ভেঙে গেল মহিষীর মন। মুখ শুকনো করে তিনি ফিরে গেলেন প্রাসাদে।

অশ্বপতি দেখে ঠিক করলেন, এবার তিনি নিজেই সাবিত্রীর আরাধনায় যাবেন। দেখবেন, দেখা পান কিনা।

রাজকার্য থেকে কিছুকালের অবসর নিয়ে অশ্বপতি সোজা চলে গেলেন পুষ্কর তীর্থে। স্নান সেরে নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করলেন ভগবতী সাবিত্রীর পূজা-আরাধনা।

দিন-মাস-বছর গেল। আবার বছর এল, আবার গেল। কিন্তু ভগবতীর দর্শন আর পান না রাজা। দেখতে দেখতে কেটে গেল একগোটা বছর। রাজাকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। চেষ্টার অসাধ্য কি কিছু আছে পৃথিবীতে? তা যদি না থাকে, তবে অভীষ্ট লাভ তাঁর হবেই।

এমনি যখন তাঁর মনের জেদ, হঠাৎ শুনলেন আকাশবাণী—'অশ্বপতি, সাবিত্রীর দর্শন যদি পেতে চাও, তবে দশ লক্ষ বার গায়ত্রী জপ কর।' শুনেই চমকে চোখ মেলে তাকাতেই অশ্বপতি সামনেই দেখলেন মহামুনি পরাশরকে। মুনিবরকে প্রণাম জানাতে তিনিও দিলেন সেই একই পরামর্শ—রাজা, সাবিত্রী-দর্শন



খুব সহজে হয় না। চাই শুদ্ধাচার আর দারুণ নিষ্ঠা। সকাল, দুপুর, সন্ধে—একে বলে ত্রিসন্ধ্যা। এই ত্রিসন্ধ্যা যদি এক মনে বসে দশ লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করতে পার, অবশ্যই তাঁর দর্শন পাবে, আর তোমার অভিলাষও পূরণ হবে। শুনে রাখ রাজা, সেই বেদমাতা, জগৎজননী সাবিত্রীকে দেখতে কেমন। দেখবে, সূর্যের মত জ্বলজ্বল করছে তাঁর শরীর, কাঁচা সোনার রং যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গায়ে নানা রত্নের অলঙ্কার। হাসি হাসি মুখ। অপরূপ! দেখলে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায় রাজা। তুমি এই ভেবে জপ কর, নিশ্চয়ই দেখা পাবে।

অশ্বপতিকে সাবিত্রীর সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে চলে গেলেন পরাশর। আর অশ্বপতিও তাঁরই নির্দেশ মত আবার শুরু করলেন আরাধনা।

স্থির চিত্তে অশ্বপতির আরাধনা চলে।

একদিন সত্যিই সত্যিই সেই অপরূপা জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূতা হলেন তাঁর সামনে। মুখে সেই মধুর হাসি। বললেন—অশ্বপতি, আমি জানি, তোমার তপস্যার কারণ। তুমি চাও পুত্র, আর তোমার রানী চায় মেয়ে। নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও অশ্বপতি। অবশ্যই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে।

ভগবতী সাবিত্রীর বর পেয়ে মনের আনন্দে অশ্বপতি ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে। আবার শুরু করে দিলেন রাজকার্য।

যথাসময়ে প্রাসাদ আলো করে মহিষীর একটি মেয়ে হল। অপরূপ দেখতে সেই মেয়ে। চোখ-নাক-মুখ-কান সব যেন ছাঁচে গড়া—যেন ঠিক একটি লক্ষ্মী প্রতিমা।

দীর্ঘকাল পর রাজা অশ্বপতির মেয়ে হয়েছে। আনন্দে দু হাতে রাজা ধনভাণ্ডার উজাড় করে করলেন ধর্ম-বিতরণ। মেয়ের চাঁদপানা মুখ দেখে সকলেই প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গেলেন। ভগবতী সাবিত্রীর কৃপায় এই মেয়ে। তাই রাজা তারও নাম রাখলেন সাবিত্রী।

দিনে দিনে যত বড় হয় সাবিত্রী, ততই যেন সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে ওঠে আরও।

কৈশোর পেরিয়ে এল যৌবন। অশ্বপতি এবার চিন্তিত হয়ে উঠলেন মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য। রূপে-গুণে ইতিমধ্যেই অতুলনীয়া হয়ে উঠেছে সাবিত্রী। কোথায় আছে এমন মেয়ের যোগ্য পাত্র।

খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এলেনও অনেকে। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না রাজার। এদিকে বারো বছর বয়স হয়ে গেল। বিয়ে দিতেই হয়।

রাজাকে খুব চিন্তিত দেখে সাবিত্রী একদিন তাঁকে বলল—বাবা, একটা কথা বলব, শুনবে?

—কি কথা মা? বললেন রাজা—মায়ের কথা ছেলে শুনবে না, তা কি হয়?

—তুমি আমার বিয়ের জন্য বড় বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছ, দেখছি। কেন বল তো, বাবা?

—মেয়ে বড় হলে বাপকে যে চিন্তা করতে হয় মা। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন অশ্বপতি।

—আচ্ছা বাবা, আমি যদি স্বয়ংবরা হই, তোমার আপত্তি আছে? জিজ্ঞেস করে সাবিত্রী।

—আপত্তি কেন থাকবে মা? তুমি তো আমার অবুঝ মেয়ে নও। বললেন অশ্বপতি—তোমার মনোমত বর যে তুমি নিজে বেছে নিতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

—তাহলে তুমি আর ও নিয়ে চিন্তা করতে পারবে না কিন্তু।

—বেশ মা, তাই হবে।

এরপর একদিন মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সখীদের সঙ্গে সাবিত্রী বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে শুরু করল দেশ থেকে দেশে, নগর থেকে নগরে। দেখল কত সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক। কতজন যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একটাকেও মনে ধরল না সাবিত্রীর। সাবিত্রীর বিচার দেখে সখীরাও অবাক। সাবিত্রীও মনে মনে একটুও দুঃখিতই হল। পৃথিবীতে এত মানুষ, কিন্তু তার মনের মত মানুষ একটাও মিলল না কেন?

ঘুরতে ঘুরতে সাবিত্রী এবার এল এক তপোবনে। কত মুনি, ঋষি, যোগী আপন ধ্যানে মগ্ন। দেখতে দেখতে বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে এক তাপস যুবককে দেখে থমকে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে পড়ল সখীরাও।

সাবিত্রী সেই নবীন তাপসকে দেখিয়ে বলল—সখি, যদি বিয়ে করতে হয় তবে ওকেই করব।

সাবিত্রীর কথা শুনে সখীরা পড়ল মহা বিপদে। রাজার মেয়ে সাবিত্রী। এত রাজপুত্র ছেড়ে শেষে তার পছন্দ হল এই তাপসকে! মাথায় জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা।

সখীরা তখন অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল এমন আচরণ মানায় না, সাবিত্রী। এতে যে রাজারই মাথা হেঁট হবে।

কিন্তু সাবিত্রীর ঐ এক কথা। বলল—জানি না, উনি আমাকে বিয়ে করবেন কিনা। তবু ঐ তাপসকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

অগত্যা সখীরা এগিয়ে গেল তাপসের কাছে সাবিত্রীকে নিয়ে। জানতে চাইল তাঁর পরিচয়।

মিষ্টি মধুর কথায় তুষ্ট তাপস বললেন—আমার নাম সত্যবান। একসময় ছিলাম রাজপুত্র, থাকতাম রাজপ্রাসাদে। আজও আমি রাজপুত্র, কিন্তু তাপস। থাকি এই বনে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে।

—রাজপুত্র আপনি? সখীরা এবার যেন একটু খুশিই হল—কে আপনার পিতা? কিভাবেই-বা বনবাসী হলেন?

—আমার পিতা রাজা দ্যুমৎসেন। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে আমার বাবা রাজ্য হারিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনবাসে আছেন পর্ণকুটিরে। অন্ধ। বললেন সত্যবান—কিন্তু আপনাদের পরিচয় তো পেলাম না। এখানেই বা আপনারা কেন?

সখীরা সাবিত্রীকে দেখিয়ে বলল—এরই জন্য আমরা এসেছি

এখানে। ইনি আমাদের সখী সাবিত্রী। মদ্ররাজ অশ্বপতির মেয়ে। স্বয়ংবরা হয়ে বেরিয়েছিলেন দেশে দেশে যোগ্য পতির সন্ধানে।

চুপ করে শুনলেন সত্যবান। দেখলেন মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী

দেশে ফিরে সখীরা রাজা অশ্বপতিকে জানাল সব কথা। শুনিয়েও দিল সাবিত্রীর সব কথা যে, সত্যবানকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না।

শুনে কিন্তু রাজা কিছুমাত্র দুঃখ পেলেন না। হোক বনবাসী রাজপুত্র সত্যবান, তবু তাঁর মেয়ের যখন পছন্দ, তখন আর কোন কথাই চলবে না। সত্যবানকে এনে ধুমধামের সঙ্গে অশ্বপতি বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের।

স্বামীর সঙ্গে সাবিত্রীও হল বনবাসিনী।

মহানন্দে কেটে গেল সাবিত্রীর এভাবে এক বছর।

দ্যুমৎসেন যজ্ঞ করেন আর সত্যবান বন থেকে সংগ্রহ করে এনে দেয় কাঠ (সমিধ)।

একদিন এমনিভাবেই সত্যবান বনে গিয়েছে কাঠ সংগ্রহ করতে, সঙ্গে সাবিত্রী। কাছে-পিঠে তেমন কাঠ না পেয়ে সে উঠল একটা গাছে। ডাল কাটে আর ফেলে দেয় নীচে। জড়ো করে সাবিত্রী। হঠাৎ সত্যবান কেমন করে যেন পা পিছলে পড়ে গেল গাছ থেকে। সজোরে এসে আছড়ে পড়ল মাটিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাল।

একটু সেবা করা বা দুটো কথা বলার সুযোগও পেল না সাবিত্রী।

একেবারে আকস্মিক এই দুর্ঘটনা।

তার ওপর সাবিত্রী দেখল নির্দয় যমরাজ এসে তার স্বামীর দেহ থেকে প্রাণপুরুষটাকে টেনে বের করে নিয়ে চললেন।

বিদ্রোহ করে উঠল সাবিত্রীর মন। সে বেঁচে থাকতে যমরাজ তার স্বামীকে নিয়ে যাবেন? যদি সত্যিই সে সতী-সাধ্বী হয়, যেভাবেই হোক, স্বামীর প্রাণ সে ফিরিয়ে আনবেই।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সাবিত্রী অনুসরণ করল যমরাজের।

এঁকে-বেঁকে পথ চলছেন যমরাজ। চলেছে সাবিত্রী তাঁর পিছু পিছু ঠিক সেভাবেই।

চলে এসেছে ইতিমধ্যে অনেকখানি পথ। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন যমরাজ। বললেন—তুমি আমার পিছু পিছু কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানে আপনি আমার স্বামীকে নিয়ে চলেছেন, আমিও সেখানেই যাচ্ছি। বলল সাবিত্রী।

—তোমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছি আমি আমার রাজ্যে, যমপুরীতে। তোমার যদি যেতে একান্তই ইচ্ছে থাকে তাহলে এই দেহে তো সেখানে যেতে পারবে না। বললেন যমরাজ—তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে। তাই মারা গেছে। এবার যাবে আমার রাজ্যে তার কর্মফল ভোগ করতে।

—এটাই কি নিয়ম যমরাজ? জিজ্ঞেস করে সাবিত্রী।

—হ্যাঁ, এটাই নির্দিষ্ট নিয়ম। জীবনে যে যা কাজ করবে, মৃত্যুর পর তাকে তার ফলভোগ করতেই হবে। ভোগ করতে হবে জন্মান্তরেও। দেখ না, পৃথিবীতে কত বৈচিত্র্য। কেউ গাছ, কেউ পশু, কেউ পাখি, কেউ পোকা, কেউ কীট। কেউ-বা মানুষ হয়েও পামর, করে দুর্বৃত্তের আচরণ, কেউ বা সাধু। কেউ মরে অল্প দিনে। কেউ কেউ ভোগ করে দীর্ঘ সুখী জীবন। সাবিত্রী, সবই কর্মফল। প্রত্যেকেই যে যার কর্মফল ভোগ করছে।

—সবই ঠিক। কিন্তু দেব, কি এমন কর্ম আমি করেছি যে আমাকে বৈধব্য ভোগ করতে হবে? আপনার তো অজানা কিছু নেই। বলুন, স্ত্রীর কাছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের চেয়েও বড় দেবতা হলেন স্বামী। স্বামীসেবাই স্ত্রীর পরম ধর্ম। তাতে তো আমার কোন ত্রুটি ছিল না। ধর্মপথে থেকেও বলুন ধর্মরাজ, আমাকে কেন এই কষ্টভোগ করতে হবে?

সাবিত্রীর প্রশ্ন শুনে বেশ একটু থতমত খেয়ে যান যমরাজ। এমন প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো যে হতে হবে, এ যেন তিনি ভাবতেও পারেন নি। অথচ ঐটুকু মেয়ের মুখে এই প্রশ্ন, খুবই ভাল লাগল তাঁর।

বললেন—তোমার সব পরিচয়ই আমি জানি সাবিত্রী। খুব ভাল লাগল তোমার কথা। একশ পুত্র নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সুখে হাজার বছর ঘর-সংসার কর। আমি তোমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিলাম। নিয়ে যাও।

সাবিত্রী বলল—এতই যদি দয়া করলেন, তাহলে আমার আর একটা প্রার্থনা পূরণ করুন, দেব।

—বল। আমার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন যেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান, আমার স্বামী যেন ফিরে পান তাঁর অপহৃত রাজ্য।

—তাই হবে সাবিত্রী। নিশ্চিন্তে ফিরে যাও স্বামীকে নিয়ে।

জীবন ফিরে পেল সত্যবান। দ্যুমৎসেন শুধু দৃষ্টিশক্তিই ফিরে পেলেন না, যা ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অগোচরে, শত্রুপক্ষ অযাচিতভাবে এসে বনবাস থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিল সিংহাসন, রাজ্য।

সতী-সাধ্বী সাবিত্রীর এই অলৌকিক কীর্তি চিরকালের জন্য অমর হয়ে রইল।



সুযজ্ঞের গোলোক প্রাপ্তি

ভক্ত ধ্রুব-র পুত্র রাজা উৎকল তখন পৃথিবীর রাজা।

যেমন বাবা, তেমনি ছেলে। ভক্ত তো বটেই, তার ওপর দান-যজ্ঞের যেন শেষ নেই তাঁর। প্রতিদিন করে চলেছেন ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষি থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণকে ভাঁড়ার উজাড় করে দান—সোনা-দানা থেকে পেট ভরতি খাবার পর্যন্ত। সব অতিথির আপ্যায়ন শেষ হয়ে গেলে, তবে রাজা নিজে খেতেন, বসতেন সভায়। মনে কোন বিরক্তি নেই। সদাই হাসিমুখ।

রাজাকে ভালবেসে তাই তাঁর রাজসভা আলো করে থাকতেন অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, লোমশ, দুর্বাসা, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি বড় বড় মুনি-ঋষিরা। আর ব্রহ্মা রাজার এই রাজসূয় যজ্ঞ

দেখে আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'সুযজ্ঞ' বলে।

সেই থেকে রাজা উৎকল-এর নামই হয়ে গিয়েছিল, সুযজ্ঞ। এমন যে দানবীর, তাঁকেও পড়তে হল একদিন মহা দুর্বিপাকে।

বেলা প্রায় শেষ। যজ্ঞকর্ম শেষ করে সুযজ্ঞ রাজা নিশ্চিন্ত মনে এসে বসেছেন তাঁর রত্ন-সিংহাসনে। সভা আলো করে মুনি ঋষিরা যে যাঁর আসনে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এলেন রাজসভায়। কঙ্কালসার দেহ, পরনে কৌপীন, মাথায় একমাথা রুক্ষ চুলের জটা।

সভায় ঢুকেই ব্রাহ্মণ নিয়মমত রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। রাজা সুযজ্ঞ কিন্তু যথারীতি আপ্যায়ন জানালেন না তাঁকে। ব্রাহ্মণ-অতিথিকে দেখে রাজার যা করার উচিত ছিল—সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো, এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানানো, সেবার উদ্যোগ নেওয়া—সেসব কিছুই করলেন না। শুধু দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতি-নমস্কার করলেন মাত্র।

দেখে ব্রাহ্মণ গেলেন দারুণ রেগে।

—শোন রাজা। শুকনো গলায় যেন গর্জন করে উঠলেন ব্রাহ্মণ—শিব আমার গুরু, ভগবান মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ আমার ঈশ্বর। আমি তাঁর দাস। তোমার সভায় আমি প্রার্থী হয়ে আসি নি। এসেছিলাম সাধুদর্শনে। যজ্ঞ করে এতই দম্ভ হয়েছে তোমার যে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করলে। আমার অভিশাপে রোগ-ব্যাধি তোমায় গ্রাস করবে, তুমি শ্রীহীন হবে। তোমার দম্ভ চূর্ণ হবে। বলেই পেছন ফিরেই ঠক্ ঠক্ করে বেরিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ।

রাজার তো মাথায় হাত—এ কি সর্বনাশ হল!

পুলস্ত্য, পুলহ থেকে যেসব মুনি-ঋষি সেখানে ছিলেন, তাঁরাও চমকে উঠে আসন ছেড়ে পিছু নিলেন ব্রাহ্মণের। তাঁরা থাকতে তাঁদেরই সামনে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে রাজা কষ্ট পাবেন, তা তো হতে পারে না।

সবাই মিলে গিয়ে ধরলেন ব্রাহ্মণকে। পরিচয় নিয়ে জানলেন, ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, দৈত্যনিধনের জন্য দেবরাজ যে বিশ্বরূপকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছিলেন, ইনি তাঁরই নাতি সুতপা। তপস্যা করে সঞ্চয় করেছেন অনন্ত শক্তি।

ব্রাহ্মণকে ঘিরে ধরে সবাই মিলে করতে শুরু করলেন অনুরোধ—ব্রাহ্মণ, রাজা অন্যায় করেছেন ঠিকই। তাই বলে কি তাঁর কোন ক্ষমা নেই? তাঁর এত পুণ্যকর্ম কি সব বিফলে যাবে?

বারবার মুনি-ঋষিদের ঐ কথা শুনতে শুনতে একসময় স্থির হলেন ব্রাহ্মণ সুতপা। তপস্বীদের ধর্মই তাই—কোথাও অনাচার দেখলে যেমন রাগে দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, আবার শান্তও হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।

সুতপাকে শান্ত হতে দেখে মুনিরা রাজা সুযজ্ঞকে ডাকলেন। বললেন—ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে যথোচিত সৎকার করুন।

অভিশাপের ফলে ইতিমধ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে রাজার। তবুও, সমাদরে তাঁকে নিয়ে গেলেন প্রাসাদে। সাধ্যমত সেবা করলেন।

সন্তুষ্টও হলেন সুতপা।

কিন্তু অভিশাপ-মুক্ত হবার উপায়?

সুতপা বললেন—আমার এই অভিশাপ তোমার ক্ষতি করার জন্য নয়। তোমার মধ্যে অহঙ্কার জন্মাচ্ছিল। যত ভাল কাজই তুমি কর না কেন, মনে অহঙ্কার জন্মালে, তার সব সুফল নষ্ট হয়ে যায়। তোমাকে অহঙ্কার-মুক্ত করার জন্যই আমার এই অভিশাপ।

—কিভাবে, এ থেকে আমি মুক্ত হব, ব্রাহ্মণ?

—শোন, রাধানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও। তোমার এই যজ্ঞে ব্রহ্মাদি-দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে অনেক কিছুই দিতে পারেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ কৃপা না করলে, তুমি যা পাবে, তা সব মিথ্যে হয়ে যাবে। রাজা, আমার কথা শোন। তোমার ছেলের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দাও। তুমি বনে গিয়ে সেই রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর। তাহলে অবশ্যই শাপমুক্ত হবে। কিন্তু রাজা, তোমাকে একা যেতে হবে। রানীকে রেখে যাবে তোমার ছেলের কাছে।

—আপনার অভিশাপে আমি যে ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কেমন করে বনে যাব?

ব্রাহ্মণ সুতপা বললেন—তুমি রাধার নাম জপ কর। রাধাকে ডাকো মন-প্রাণ দিয়ে। তাহলেই পারবে। জান, কে এই রাধা? ইনি হলেন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। বৈকুণ্ঠে যেমন চতুর্ভুজ নারায়ণের শক্তি হলেন লক্ষ্মী। তারও ওপরের গোলোকে সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হলেন রাধা। এই গোলোকেই আছে শতশৃঙ্গ পর্বত। তাকে ঘিরে বয়ে চলেছে বিরজা নদী। কচি ঘাসের মত গায়ের রং পরনে পীতবসন, মুরলীধর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ সব সময় সেখানেই থাকেন রাধার সঙ্গে, রাসমণ্ডপে। শত শত গোপিনীদের নিয়ে তিনি সেখানে সর্বদা করে চলেছেন রাসলীলা।

চুপ করে রাজা সুযজ্ঞ সুতপার মুখে শোনেন রাধাকৃষ্ণের কথা।

—গোলোকে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও রাধাকে একবার সুদামার অভিশাপে পৃথিবীতে মানুষের ঘরে গোপিনী হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল।

—কেন? কি অপরাধ ছিল রাধার? জিজ্ঞেস করেন রাজা।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা ছাড়া আর কাউকে জানতেন না ঠিকই, তবুও ভালবাসতেন রাধারই আর এক সাথী বিরজাকে। মনে মনে সন্দেহ হয়েছিল রাধার। তাই তাঁকে নজরে রাখার জন্য জনকয়েক গোপীকে রেখেছিলেন গুপ্তচরী করে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিরজার কাছে গেছেন, খবর পেয়ে রাধা গোপিনীদের নিয়ে আসছেন শুনে শ্রীকৃষ্ণ পালালেন। বিরজাও ভয়ে নদী হয়ে বইতে শুরু করল বৃন্দাবনে। সেখানে দেখতে না পেয়ে রাধা শ্রীকৃষ্ণের আবাসে এসে তাঁকে যাচ্ছেতাই করতে শুরু করলেন। শুনে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন বটে কিন্তু কৃষ্ণসখা সুদামা খুব রেগে গিয়ে রাধাকে যা-তা বলে বসল। রাধা তখন কৃষ্ণকে ছেড়ে পড়লেন সুদামাকে নিয়ে। তাকে দিলেন অভিশাপ—'মর্ত্যে গিয়ে দৈত্যকুলে জন্ম নাও।' সুদামাও দিল



পালটা অভিশাপ, 'তুমি মর্ত্যে গিয়ে মানুষের ঘরে জন্মাও।' সুদামা হয়েছিল শঙ্খচূড়। পরে মহাদেব তাকে উদ্ধার করেছিলেন। আর দ্বাপরে বৃন্দাবনে গোপ বৃষভানুর ঘরে রাধা জন্ম নিলেন, রাধা নামেই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে তাঁর অন্তরের সম্পর্ক, তাঁকে ছেড়ে কি রাধা থাকতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাঁকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। তিনিও মর্ত্যে অসুরদের দমন করার জন্য বাসুদেব নামে এলেন গোপ নন্দের ঘরে। এদিকে বৃষভানুর ঘরে যখন রাধা বড় হয়ে উঠলেন তখন এল তাঁর বিয়ে দেবার সময়। আয়ান নামে এক গোপের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। সবাই দেখল রাধার সঙ্গেই তার বিয়ে হল, আসলে কিন্তু রাধা গোপনে চলে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে, বিয়ে হল রাধার আয়ানের ছায়ার সঙ্গে। যেমন রাবণ যে সীতাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে আসল সীতা ছিল না, ছিল নকল সীতা—ঠিক সেইরকম। অনন্ত শক্তি রাধা—সর্বেশ্বরী। সনাতন ভগবান দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ—সর্বেশ্বর। যাও রাজা, যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে যা বললাম, তাই করো। বলে চলে গেলেন সুতপা।

রাজা সুযজ্ঞ যে দোনামনায় ছিলেন, এখন আর তা নেই। চলে গেলেন পুষ্কর তীর্থে। বসলেন রাধার আরাধনায়।

কেটে গেল এক হাজার বছর নিথর, নিশ্চল তপস্যায়।

হঠাৎ একদিন ধ্যাননেত্রে রাধা দেখলেন—অপূর্ব এক বিমানে কে এক দিব্য রমণী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। এগিয়ে আসছেন খুব দ্রুতবেগে। কাছাকাছি আসতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন রাজা—এই তো, এই তো আমার আরাধ্যা দেবী রাধা।

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা সুযজ্ঞের মাটির দেহ রইল মাটিতে পড়ে। ধারণ করলেন দিব্য এক রূপ। রাধা এসে তাঁকে সাদরে বিমানে তুলে নিয়ে চলে গেলেন গোলোকে। সুযজ্ঞ দেখলেন—অপরূপ এক ধাম/দাঁড়ায়ে সেখানে মুরলীধারী শ্যাম। নবঘন শ্যাম।

আনন্দ...আনন্দ...অপার আনন্দের জোয়ারে যেন ভেসে গেলেন সুযজ্ঞ।



গণেশের ইতিকথা

পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল শিবের। বহু তপস্যার পর মনের মত স্বামী পেয়ে পার্বতীও মহা খুশি। মনের আনন্দে ঘর বেঁধেছেন দুজনে কৈলাসে। পার্বতী ঘুরে বেড়ান যেখানে-সেখানে স্বামীর সঙ্গে। মহাযোগী, মহাশক্তিধর শিব যাঁর স্বামী, তাঁর আবার ভয় কি?

বহু বছর কেটে গেল বিয়ের পর, কিন্তু ছেলেপুলে হল না। ছেলেপুলে না থাকলে কি সংসার মানায়?

প্রথম একটি ছেলের মুখ যা-ও-বা দেখার আশা ছিল পার্বতীর, দেবতাদের চক্রান্তে তা-ও নষ্ট হয়ে গেল। তাই তাঁর মনে খুব দুঃখ। পর্বতরাজ হিমালয় আর পার্বতীর মা মেনকারও দুঃখও কম নয়।

যাই হোক, কিছুতেই আর ছেলেপুলে হয় না দেখে স্বামীর পরামর্শ নিয়ে পার্বতী ঠিক করলেন, পুত্র-কামনায় পুণ্যক ব্রত করবেন।

শিবের ঘরনী করবেন ব্রত—এ কি যা-তা ব্যাপার?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যেখানে ছিলেন, খবর পেয়েই নানারকম খাবার-দাবার থেকে শুরু করে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী আনতে শুরু করলেন। খাদ্যদ্রব্যের পাহাড় জমে গেল কৈলাসে। স্বয়ং কুবের হলেন ভাঁড়ারী। স্বর্গলোকে যত দেবতা ছিলেন এসে হাজির হলেন। গন্ধর্বলোক, কিন্নরলোক থেকেও আসতে লাগলেন দলে দলে। এলেন সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, নর, নারায়ণ—সব খ্যাতিমান মুনি-ঋষিরা। বড় বড় উনানে জ্বলল আগুন। ভাল ভাল তরিতরকারি থেকে ভাত-পায়েস-পিঠে তৈরি হতে শুরু হল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর তত্ত্বাবধানে। এল যজ্ঞের জন্য কাঠের ওপর কাঠ, ঘিয়ের ওপর ঘি। শিবের নির্দেশে পার্বতী সনৎকুমারকে করলেন যজ্ঞের পুরোহিত।

একদিকে চলেছে সমানে শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি। থালির পর থালি ঘি পুড়তে লাগল আগুনে, আর একদিকে চলল 'দাও দাও, নাও নাও, খাও খাও'—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আর এদিকে পার্বতী শুদ্ধাচারে বসে, দিনরাত শিবের কথামত শুধু ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে চললেন কুশের আসনে বসে।

এক বছর ধরে চলল সেই মহাযজ্ঞ। পার্বতী ব্রতের নিয়ম মেনে এক বছরের মধ্যে ছ-মাস করলেন হবিষ্যি (আতপ চালের ফ্যান ভাত আর সেদ্ধ), তার পর পাঁচ মাস খেলেন ফল-মূল। তারপর এক মাসের মধ্যে পনের দিন শুধু ঘি, বাকি পনের দিন খেলেন শুধু জল!

ব্রতের শেষ দিন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সনৎকুমার যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ শেষ করে পার্বতীকে সনৎকুমার বললেন—পুরোহিতের দক্ষিণা দাও, পার্বতী!

—কি দক্ষিণা পেলে আপনি খুশি হবেন? জানতে চাইলেন পার্বতী।

—তোমার স্বামী শিবকে আমায় দক্ষিণা দাও। নিঃসঙ্কোচে বললেন সনৎকুমার। শুনেই পার্বতীর চোখের সামনেটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। মাথা ঘুরে গেল। দক্ষিণা হিসেবে এ কি চেয়ে বসলেন ব্রাহ্মণ! স্বামীকে দক্ষিণা হিসেবে দেওয়া কি কখনও কোন স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব?



ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে দেবগুরু বৃহস্পতি পর্যন্ত পার্বতীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ব্রতের যা নিয়ম তা তো পালন করতে হবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পেয়ে যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে যে ব্রতের ফল পাবেন না পার্বতী। সবাই মিলে বলতে শুরু করলেন, ব্রাহ্মণ দক্ষিণা হিসেবে যা চেয়েছেন, পার্বতী যেন তা হাসিমুখে দেন। তাতে তাঁর কোন অমঙ্গল হবে না।

পার্বতীও সমানে করে চললেন তাঁদের বিরোধিতা। আগের জন্মে এই স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের ঘরে প্রাণ দিয়ে এ জন্মে অনেক তপস্যায় তাঁকে পেয়েছেন। না, সেই স্বামীকে ছেড়ে তিনি কোন মতেই থাকতে পারবেন না। এদিকে পুরোহিত সনৎকুমারও নাছোড়—দেরি কোরো না, পার্বতী। যা চেয়েছি দিয়ে দাও। নিয়ে হাসিমুখে চলে যাই।

ঠিক এই সময় বৈকুণ্ঠ থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণ এসে হাজির হলেন সেখানে। তাঁকে দেখে তো সকলেই তটস্থ হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা-মহেশ্বর থেকে যত দেবতা উপস্থিত ছিলেন তাঁকে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর স্তব-স্তুতি করলেন।

একটু জিরিয়ে নিয়ে দেবগণকে বললেন নারায়ণ—ছি, ছি! পার্বতীকে নিয়ে তোমরা এ কি কাণ্ড শুরু করলে বল তো। স্ত্রী ছাড়া কি স্বামী থাকতে পারে? না, স্বামী ছাড়া স্ত্রী থাকতে পারে? দু-জনে এক সঙ্গে না থাকলে কি আমি সৃষ্টি করতে পারি? আর তোমরা তাতেই বাধা দিয়ে বসলে? আবার ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট না হলে যজ্ঞের ফলও পাওয়া যায় না।

তারপর পার্বতীকে বললেন—পার্বতী, উনি যা চাইছেন, দিয়ে দাও। ভয়ের কিছু নেই। আমি তো আছি।

বলে চলে গেলেন নারায়ণ

অগত্যা কি আর করেন পার্বতী। স্বামীকে দক্ষিণা হিসেবে তুলে দিলেন পুরোহিত সনৎকুমারের হাতে।

সনৎকুমারও বগলদাবা করলেন শিবকে। দেবতারাও সন্তুষ্ট হলেন।

কিন্তু পার্বতীর মনে সে কি কষ্ট!

অনেক ভেবে-চিন্তে পার্বতী বললেন—দেখুন, আমি মেয়ে মানুষ, মুখ্যু-সুখ্যু। আপনাদের মত জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য আমার নেই। তবে শুনেছি, শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণকে গাভী দানের তুল্য শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নেই। আমি এক লক্ষ গাভী দিচ্ছি। দয়া করে তাঁর বিনিময়ে আপনি আমার স্বামীকে মুক্তি দিন।

শুনে যেন খাই খাই করে উঠলেন সনৎকুমার—এ কি কথা! একবার দিয়ে আবার বদল করতে চাইছ? এর নাম তোমার ব্রত? আমি গরিব ব্রাহ্মণ, অত গাভী নিয়ে কি করব? তার চেয়ে বরং এ ভাল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব।

পার্বতীও স্থির করলেন, এ জীবন তিনি আর রাখবেন না। কি হবে তাঁর বেঁচে থেকে?

এক মনে ডাকতে লাগলেন শ্রীহরিকে। ডাকছেন তো ডাকছেন। চোখের জলে মনে মনে ডেকেই চলেছেন—কোন অপরাধ তো করি নি ভগবান। তবে কেন এমন হল? ছেলের জন্য তোমাকে তুষ্ট করার ব্রত করলাম, বিনিময়ে স্বামীও গেলেন। কি আর করব এ জীবন রেখে?

ঠিক এমন সময় মাঘ মাসের শীতের কুয়াশা ভেদ করে আকাশ যেন দুলে উঠল আলোর বন্যায়। সচকিত হয়ে উঠলেন দেবতারা। পার্বতী দেখলেন—সর্বাঙ্গে শ্বেত-চন্দন, গলায় বনমালা, হাতে বাঁশি, কিশোর শ্রীহরি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। মুখে তাঁর সুন্দর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর মন যেন বলে উঠল—আহা! ঠিক ঐরকম যদি একটা ছেলে হয় তাঁর!

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি। মিটিমিটি হেসে বললেন—মনে কোন সঙ্কোচ রেখো না পার্বতী। তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমারই মত ছেলে হবে তোমার।

দেবতারাও শুনলেন সে কথা। তখন সবাই মিলে সনৎকুমারকে ডেকে বললেন—সনৎকুমার, শিবকে পার্বতীর কাছে ফিরিয়ে দাও। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

আবার স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন পার্বতী। মনে আর কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। আবার দিন কাটে মহানন্দে।

ব্রতের ফলে যথাসময়ে সন্তান পেলেন পার্বতী। এতদিন বাদে মা হতে পেরেছেন পার্বতী। আনন্দ আর ধরে না। যদিও জানেন, তাঁর এই সন্তান আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীহরি! তবু ছেলে তো বটে। কোলে তুলে নিয়ে সে কি আদর!

অযোনিসম্ভব (মায়ের গর্ভ থেকে যে ভূমিষ্ঠ নয়) সন্তান, দেখতে অপরূপ সুন্দর। জন্মেই সে কিশোর।

খবর পেয়েই দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, মুনি, ঋষি যে যেখানে ছিলেন সকলেই ছুটে এলেন ছেলের জন্য মঙ্গলকামনা নিয়ে আশীর্বাদ করতে। এলেন দাদু-দিদিমাও। পার্বতীও সকলকে আসতে দেখে মহা খুশি। আপ্যায়নেরও ত্রুটি রাখলেন না একটুও।

ব্রহ্মা জানালেন আশীর্বাদ। বললেন—চারদিকে তোমার যশ ছড়িয়ে পড়ুক। সবার আগে তুমিই হবে পূজ্য।

বিষ্ণু আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—তুমি জ্ঞানী হও। শিবের মত তোমার পরমায়ু হোক। আমার মত তুমি পরাক্রমশালী হও।

ধর্মরাজ বললেন—তুমি ধার্মিক, নির্ভীক, দয়ালু হও। শ্রীহরির প্রতি তোমার যেন অবিচল নিষ্ঠা থাকে।

এলেন দাদু হিমালয়। আদর করলেন। আশীর্বাদ জানালেন—সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবে।

বাবা মহাদেব আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—আমার মত তুমি দাতা হও। ধীর, স্থির, পুণ্যবান, বিদ্বান আর হরিভক্ত হও।

লক্ষ্মীদেবী প্রাণ খুলে আশীর্বাদ জানালেন—আমার মত সতী-সাধ্বী বউ হোক তোমার। কোন দিন যেন তুমি অভাবের মুখ না দেখ।

সরস্বতী গণেশের গালে চুমো দিয়ে বললেন—তুমি কবি হবে। তোমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হোক।

দিদিমা মেনকা আশীর্বাদ জানালেন—রূপে-গুণে অতুলনীয় হও ভাই। বীর হও, গম্ভীর হও।

মা পার্বতী আশীর্বাদ জানালেন—বাছা আমার, তুমি তোমার বাবার মত মহাযোগী, মৃত্যুঞ্জয় হও। কেউ যেন তোমার কাছ থেকে মনে কোন কষ্ট না পায়।

আরও যাঁরা ছিলেন, প্রত্যেকেই পার্বতীর ছেলে গণেশকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ জানালেন। তারপর শিবের সভা আলো করে এসে বসলেন সব দেবতা, মুনি-ঋষিরা। পার্বতীর ছেলে হয়েছে শুনে

গন্ধর্ব, কিন্নরদের মনে এত আনন্দ যে তারা অবিরাম নাচ-গান করে চলেছে। ভূরিভোজও কিছু কম হচ্ছে না সভায়।

অন্দরমহলে গণেশকে কোলে নিয়ে পার্বতী। দ্বারে রক্ষী শিবের অনুচর বিশালাক্ষ।

কৈলাসে শিবের প্রাসাদে দেবসভায় যখন চলেছে এমন আমোদ-প্রমোদ, তখন এলেন সূর্যপুত্র শনি। কুচকুচে কালো গায়ের রং, মুখে সব সময় কৃষ্ণ নাম।

শনিকে এত পরে আসতে দেখে মহাদেব বললেন—ছিঃ ছিঃ! তুমি কেমন গো শনি? আমার ছেলে হয়েছে, কত দূর দূর থেকে সবাই ছুটে দেখতে এসেছেন কত আগে। আর তুমি এলে এখন? আমার ওপর অভিমান হয়েছে বুঝি?

—না না, তা নয়। আপনার ওপর আবার অভিমান কিসের? বললেন শনি—যদি অনুমতি দেন তাহলে ছেলের মুখ দেখে আসি।

—অনুমতি? যেন আকাশ থেকে পড়লেন মহাদেব—আমার ছেলের মুখ দেখবে তুমি, আর তার জন্য অনুমতি চাইতে হবে তোমাকে আমার কাছে? যাও, যাও।

অন্দরমহলের দ্বারে যেতেই পথরোধ করে দাঁড়াল বিশালাক্ষ।

—দাঁড়াও এখানে। এখন আমি শিবের হুকুম-টুকুম মানি না। ভেতরে মা-কে জিজ্ঞেস করে আসি তিনি যদি অনুমতি দেন তবেই যেতে পাবে।

অগত্যা চুপ করে শনিকে দাঁড়াতে হল দ্বারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ফিরে এল বিশালাক্ষ। মায়ের অনুমতি মিলেছে। শনি যেতে পারেন ভেতরে গণেশকে দেখতে।

ভেতরে ঢুকলেন বটে শনি, গেলেনও কাছাকাছি। কিন্তু গিয়েই মাথা নিচু করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দেখে পার্বতী তো অবাক।

—হঠাৎ কি হল তোমার শনি, মুখ তুলে আমার ছেলের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

আমতা আমতা করে ওঠেন শনি।

—আরে, কি হল তোমার তাই বলবে তো! অত আমতা আমতা করছ কেন?

অনেকক্ষণ পর ঘাড় নিচু রেখে, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন শনি—আমার আসাটা ঠিক হয় নি।

—কেন? শুনে অবাক হলেন পার্বতী।

—আমি দেখলে যদি আপনার ছেলের কোন ক্ষতি হয়।

—কি রকম? এ কথা বলছ কেন? জিজ্ঞেস করেন পার্বতী।

—দুর্ভাগ্য আমার। শ্রীকৃষ্ণের জপে মগ্ন ছিলুম, আমার স্ত্রী কি যেন একটা অনুরোধ করেছিল। শুনতে পাই নি। রেগে গিয়ে তাই সে অভিশাপ দিয়ে বসেছিল, যার দিকে আমি তাকাব তারই সমূহ ক্ষতি হবে। সেই থেকে ঐ অভিশাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। এখানে আসার আগে সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বলে শনি বললেন—আপনার ছেলের মঙ্গল হোক। আমি যাই।

সব শুনেও কিন্তু বাধা দিলেন পার্বতী।

—দাঁড়াও শনি। এক ভগবান শ্রীহরি নারায়ণ ছাড়া আর কে ক্ষতি করতে পারে? আমার ছেলের ভাগ্যে যদি কোন ক্ষতি লেখা থাকে তাহলে তার ক্ষতি হবেই। আমি বলছি, আমার ছেলের মুখের দিকে তাকাও। তাকে আশীর্বাদ কর।

এবার শনি পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। তাকালেও সর্বনাশ, আবার না তাকিয়ে ফিরে গেলেও পার্বতীর হবে রাগ। আর সেই রাগের বশে যদি আবার কোন অভিশাপ দিয়ে বসেন।

ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে একটা চোখ বুজে অপর চোখ একটু খুলে যেই না শনি তাকালেন পার্বতীর কোলে গণেশের দিকে অমনি মুহূর্তে ঘটে গেল সর্বনাশ। অমন টলটলে চাঁদের মত মুখ গণেশের, কে যেন খুর দিয়ে গলা থেকে কেটে উধাও করে দিল সেখান থেকে। প্রাণ হারিয়ে ছেলে ঢলে পড়ল মায়ের কোলে। বয়ে গেল রক্তের নদী। সঙ্গে সঙ্গে শনিও ভয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। না জানি এবার তাঁর কপালে আবার কি আছে।

ছেলের অবস্থা দেখে পার্বতী তো হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন...এ কি করলে নারায়ণ? এত কষ্টে ছেলেই যদি দিলে, তবে এ সর্বনাশ কেন করলে তুমি?

অন্দরমহল থেকে পার্বতীর কান্না এসে পৌঁছল দেবসভায়। থেমে গেল গন্ধর্ব কিন্নরের নাচগান। রত্ন-সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে দেবতা থেকে মুনি-ঋষিরা উঠে ছুটে আসতে লাগলেন সেখানে,—কি হল, কি হল?

এসে তাঁরাও ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক। পার্বতীর কোলে আছে পড়ে প্রাণহীন গণেশ। ঘরে যেন রক্তের সমুদ্র। অদূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শনি। আকুলি-বিকুলি করছেন পার্বতী।

গণেশের অমন সুন্দর মুখটা কোথায় গেল? ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখলেন দেবতারা। কোথাও তো নেই।

কেউ জানতেও পারেন নি যে গণেশের মুণ্ড ইতিমধ্যে চলে গিয়েছিল গোলোকে। আর ভগবান শ্রীহরিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন গোলোক ছেড়ে।

কাঁদতে কাঁদতে মনের দুঃখে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলেন পার্বতী। মাথার ঠিক রাখতে না পেরে কটমট করে তাকালেন তিনি শনির দিকে। দু-চোখের জল এখন শুকিয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে আগুন।

—তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ করলে শনি। পার্বতীর গলা যেন গর্জন করে উঠল—আমি তোমায় অভিশাপ দিলাম, তুমি সারা জীবন খোঁড়া হয়ে থাক।

যেই পার্বতী শনিকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন দেবতারা—এ কি করলেন পার্বতী।

শনির বাবা সূর্যদেবও সেখানে দাঁড়িয়ে। ছেলের ওপর পার্বতীর অভিশাপ শুনে তিনিও গেলেন দারুণ রেগে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন—আমার ছেলে কি অপরাধ করেছে পার্বতী যে তুমি ওকে অভিশাপ দিলে? তুমি অনুমতি দিয়েছিলে তাই ও তোমার ছেলের মুখ দেখতে গিয়েছিল, নচেৎ তো ও দেখতে চায় নি। বিনা অপরাধে তোমার অভিশাপে আমার ছেলে খোঁড়া হল। শোনো, আমিও তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তোমার ছেলে বেঁচে উঠবে বটে, কিন্তু বিকলাঙ্গ হবে।

অভিশাপ দেবার পরেই কিন্তু পার্বতীর রাগ পড়ে গিয়েছিল। মনে মনে অনুশোচনাও হয়েছিল, তিনি কাজটা ঠিক করেন নি। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় নেই। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ছেলে তোমার খোঁড়া হলেও গ্রহরাজ হবে।

এদিকে কৈলাসে যখন চলেছে এই কাণ্ড ওদিকে ভগবান

নারায়ণও বিমান নিয়ে হু হু করে উড়ে আসছেন গোলোক থেকে কৈলাসের দিকে। আসছেন চারদিক তাকাতে তাকাতে। জ্ঞান-বুদ্ধি-নিরহঙ্কার দয়া-মায়া প্রভৃতি যেসব গুণ নিয়ে জন্মেছিল গণেশ, ঠিক তার উপযোগী একটা মাথা এখনই যে তাঁকে জুড়ে দিতে হবে গণেশের শরীরের সঙ্গে। আর অবিকল সেই ধরনের মাথা কোথায় আছে, তাও অজানা নেই সর্বজ্ঞ ভগবানের। এদিকে লক্ষ্যও রাখতে হবে ভগবানকে—যে যেমন কাজ করেছে, তাকে সেই রকম ফল দিতে হবে। সূর্যশাপে পার্বতীর ছেলে বেঁচে উঠবে কিন্তু বিকলাঙ্গ হবে, তাও যেমন অজানা নেই শ্রীহরির, তেমনি অজানা নেই শিবের ওপর মহামুনি কশ্যপের অভিশাপ।

বহুকাল আগে মালী আর সুমালী নামে দু-জন শিবভক্তের ওপর হঠাৎ সূর্যদেব খেপে গিয়ে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে তাঁদের একেবারে মেরে ফেলতে গিয়েছিলেন। শিবভক্ত অসুর দুই ভাই মনে-প্রাণে শঙ্করকে ডাকলেন। শিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। রেগে গিয়ে ছুঁড়ে শূল মেরেছিলেন সূর্যদেবকে। শূলের আঘাতে সূর্যদেব এমনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে প্রাণ যায় অবস্থা। সূর্যদেবের বাবা কশ্যপ মাথা ঠিক রাখতে না পেরে শিবকে দিয়ে বসেছিলেন নিদারুণ অভিশাপ—তোমার ছেলে মুণ্ডহীন হবে।

যদিও স্বয়ং নারায়ণের অংশে জন্ম হয়েছে গণেশের, তবুও পাছে ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হয়, তাই সবই করতে দিতে হচ্ছে ভগবানকে। এবার সূর্যের অভিশাপ—বিকলাঙ্গ সন্তান।

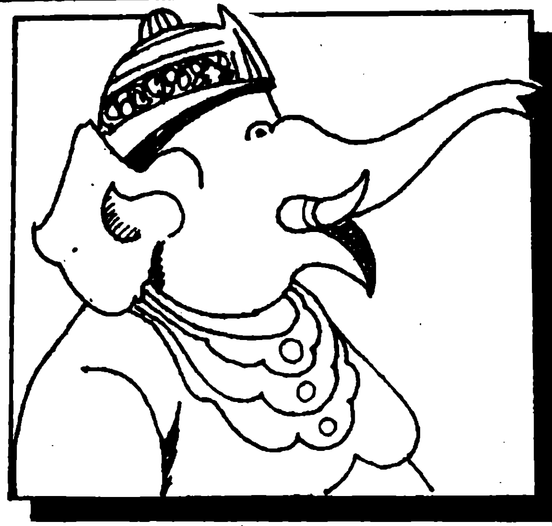
যাই হোক, সর্বজ্ঞ নারায়ণ গরুড়ের পিঠে চেপে এসে হাজির হলেন পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে। দেখলেন শুয়ে আছে গজরাজ, একমাত্র তার মাথাই হতে পারে গণেশের। উত্তরদিকে মাথা রেখে চিৎপাত হয়ে গজরাজ ঘুমোচ্ছে।

গজরাজের কুতকুতে দুটো চোখ, বিরাটকায় ধবধবে সাদা দুটো দাঁতের মাঝে বেশ মোটা সোটা বলিষ্ঠ একটা শুঁড়। দু-পাশে বিশালকায় দুটো কুলোর মত কান। জাতে হাতি, এমনিতেই বোকা। তাই বলে, হস্তিমূর্খ! কিন্তু এই গজরাজ ছিল একটু অন্য জাতের। সে ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন—ঐরাবত।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র আসছিলেন ঐরাবতে। পথের মাঝে মহামুনি দুর্বাসা ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন একটা পারিজাতের মালা। দিয়ে বলেছিলেন—দুর্লভ এই মালা গলায় রাখলে জ্ঞানে-গুণে-ঐশ্বর্যে—সবদিক থেকে সে হবে সবার সেরা। সকলের কাছ থেকেই সে সম্মান পাবে, পুজো পাবে। দেবরাজ সেটি নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাহন ঐরাবতের গলায়। দেখে দুর্বাসা মুনি রেগে গিয়ে যেই ইন্দ্রকে বলেছিলেন, 'লক্ষ্মীছাড়া হও'—সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের শুরু হয়ে গিয়েছিল চরম দুর্দশা। অমন অমরাবতী হয়ে গিয়েছিল শ্মশান। এমন কি, ঐরাবতও চলে গিয়েছিল তাঁকে ছেড়ে।

ঐরাবতকে দেখা মাত্রই নারায়ণ ঝপ করে তার সেই দুর্লভ মাথাটা কেটে নিয়ে অন্য একটা মাথা সেখানে বসিয়ে সাঁ করে চলে এলেন কৈলাসে। সোজা অন্তঃপুরে গিয়ে যেই গণেশের শরীরের সঙ্গে মাথাটা লাগিয়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন অমনি উঠে বসল গণেশ।

মুখটা হাতির মত হয়ে গেল দেখে পার্বতীর মনে যে একটু দুঃখ হল না তা নয়, কিন্তু আর উপায়ই-বা কি আছে। হাজার হোক



ছেলে। স্বয়ং ভগবান তো এসে তাকে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

পার্বতীর মনের দুঃখ বুঝতে পেরে নারায়ণ বললেন—এর জন্য মনে কোন ক্ষোভ রেখো না পার্বতী। আমি বলছি, তোমার ছেলে গণেশ যেমনটি চেয়েছিলে ঠিক তেমনটি হবে। তোমার ছেলে শুধু গণেশ নামেই পরিচিত হবে না—লম্বোদর, গজানন, একদন্ত, শূর্পকর্ণ, হেরম্ব, বিঘ্নেশ, বিনায়ক—এসব নামেও সকলের কাছ থেকে সবার আগে পুজো পাবে।

ভাগ্যকে মেনে নিয়ে পার্বতী মনের আনন্দে ছেলেকে তুলে নিলেন কোলে। দেবতারাও একবাক্যে তা স্বীকার করে নিলেন। আর যাবার আগে নিজেদের যা সবচেয়ে প্রিয় সেই জিনিসটি দিয়ে গেলেন তাঁকে।

সেই থেকে গজানন হয়েও গণেশ যেমন মা-বাবার কাছে রইল, অতি প্রিয় ছেলে হয়ে, তেমনি পৃথিবীতেও সিদ্ধিদাতা গণেশ হিসেবে পুজো পেতে শুরু করলেন।

গজানন হলেন একদন্ত

ভগবান শ্রীহরি যখন গজরাজ ঐরাবতের মুণ্ড কেটে এনে গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তখন শুঁড়ের দু-পাশে তার দুটো সেই বিরাটকায় দাঁতই ছিল। ঝকঝকে ধবধবে সাদা দাঁত দুটো যেন মুক্তোর তরোয়াল।

তাই নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিল গজানন গণেশ। দেখে দেখে একটা ভাল মেয়ের সন্ধান পেলেন পার্বতী, নাম তার পুষ্টি। মহা

ধুমধামে ছেলের বিয়েও দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে গজাননের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে সত্যিই তার তুল্য মেলা ছিল দুষ্কর। তেমনি যার যা অসুবিধে হতো, গণেশের কাছে একবার প্রার্থনা জানালেই হল। যত দুঃসাধ্যই হোক না, গজানন তা করে দিতেন সহজেই। শক্তিতেও কিছু কম যেতেন না। কিন্তু ছিলেন দারুণ সংযমী। তাঁকে বড় একটা লড়াই-টড়াই করতে কেউ দেখে নি। কাজ করতেন ঠাণ্ডা মাথায়। তাই সকলের ভালবাসাও পেতেন।

কৈলাসে একদিন গণেশ ভাই কার্তিকের সঙ্গে প্রাসাদ-দ্বারে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ পরশুরাম এসে হাজির। ঋষি জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, টানা-টানা দুটো চোখ লাল। দুই বাহুতে দুই কবচ। কাঁধে কুঠার। মাংসপেশীগুলো এত ফুলে উঠেছে, মনে হবে স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়বে এখনই।

দু-ভাইকে উপেক্ষা করে প্রাসাদের ভেতর ঢুকতে যাবেন পরশুরাম, বাধা দিলেন যুবক গজানন—কোথায় যাচ্ছ?

কটমট করে পরশুরাম তাঁর দিকে তাকালেন একবার। এর আগে এতগুলো দেউড়ি পেরিয়ে এলেন। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করারও সাহস পায় নি, এখন কোথাকার এক ডেঁপো ছোকরা, তাও হাতির মাথা, তাঁকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে কিনা, কোথায় যাচ্ছ? রাগে যেন পিত্তি জ্বলে গেল পরশুরামের। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে একটু বিদ্রূপ করেই বললেন—তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে নাকি? আমি যাচ্ছি আমার গুরুদেব শিবের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম জানাতে।

গণেশ বলল—এখন ভেতরে যাওয়া হবে না।

—কেন?

—মা-বাবা এখন বিশ্রাম করছেন। বিশ্রাম সেরে উঠলে আমরাও যাব, তুমিও যাবে। বেশ শান্ত কণ্ঠে বলল গণেশ।

—বিশ্রাম! গুরুদেব আর গুরু-মা বিশ্রাম করছেন? হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে পরশুরাম বললেন—বিশ্রাম আবার কি? আর যদি বিশ্রামই নেন, তাতেই বা কি হয়েছে? পথ ছাড়ো।

—না। এখন কোন মতেই যাওয়া হবে না। গণেশের সেই এক কথা।

পরশুরাম ভাবলেন, এ তো আচ্ছা ঝামেলা শুরু করল! কোথায় একবার গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়েই চলে যাবেন ঠিক করেছিলেন, আর এ ছোকরা কি ঝঞ্ঝাট আরম্ভ করল।

—শোন, আমি পরশুরাম। আমার কাঁধে এই যে কুঠারটা দেখছ, গুরুদেবের আশীর্বাদে এই কুঠার দিয়েই আমি একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে এসেছি গুরুদেবকে প্রণাম জানাতে। উনি আমাকে বিলক্ষণ চেনেন। যখনই যাই না কেন, কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হবেন না। বেশ গম্ভীর ভাবে পরশুরাম আত্মপরিচয়টা দিয়ে দিলেন গণেশকে।

ঠিকই তাই। ঋষি জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম প্রথমে হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুনকে খতম করেছিলেন তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য। বাবাকে অপমান করে তাঁর কামধেনু জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অর্জুন। প্রথমে পরশুরাম তাই তাঁকে হত্যা করেছিলেন। তারপর থেকে ক্ষত্রিয়কুলের ওপর এমন রেগে গিয়েছিলেন যে, সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যত ক্ষত্রিয় ছিল, একুশবার তাদের সবংশে নিধন করেছিলেন একাই গুরুদেব শঙ্করের আশীর্বাদে এই কুঠার নিয়ে। তাঁর কাছে তো গণেশ নাবালক।

পরশুরামের চোখে গণেশকে দেখতে নাবালক হলে কি হবে, একদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে মহাদেবের ছেলে, তার ওপর সব কটি গুণে অতুলনীয়। সেই মুহূর্তে বোধ হয় পরশুরাম তা বুঝতে পারেন নি।

—সবই বুঝলাম। তবুও, এখন তোমায় ভেতরে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। অপেক্ষা কর। উঠলে আমরা একসঙ্গেই যাব। গণেশের মনে তাঁর পরিচয় কোন দাগই কাটল না।

রাগে সারা শরীর চনমন করে উঠল পরশুরামের। মাথায় জ্বলে উঠল আগুন। কাঁধ থেকে ঝট্ করে কুঠারটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। হাতের মুঠোয় সেটা বাগিয়ে ধরে বললেন—আমি যাবই। দেখি তোমার কেমন সাধ্য আমাকে আটকাও।

তখনো শান্ত গণেশ। বললেন—কেন মিছামিছি মাথা গরম করছ পরশুরাম। এটা কি ঠিক হচ্ছে? তুমি ব্রাহ্মণ। আমরাও গুরুভাই। আমার ওপর রেগে গিয়ে তোমার ঐ অব্যর্থ কুঠার নিয়ে ছুটে আসা কি উচিত হচ্ছে? একটুও ধৈর্য ধরতে পারছ না?

কিন্তু তখন পরশুরামের মাথা এতই গরম যে, ভাল কথা শোনার মত মেজাজ কোথায়? তাঁর কুঠার হেনে গণেশকে তিনি খতম করবেনই। সুচন্দ্র, পুষ্করাক্ষ, কার্তবীর্যদের মত দেববরে বলীয়ান ক্ষত্রিয়রা যাঁর কাছে কুটোর মত ভেসে গেল, সেখানে এই হাতিমুখো, পেটমোটা গণেশ!

কুঠার প্রায় ছোঁড়েন পরশুরাম, গণেশ বলে ওঠেন—পরশুরাম, এখনও বলছি শান্ত হও। তুমিও ক্ষত্রিয় নও, আমিও ক্ষত্রিয় নই। মহাদেবের ছেলে আমি, তোমার গুরুভাই! একুশবার তুমি ক্ষত্রিয় নিধন করেছ বলে ভেবো না যে, তোমার মত বীর আর কেউ নেই। ব্রাহ্মণ আমরা। আমাদের কি অত রাগ শোভা পায়?

গণেশের কথা শুনে বিকট হাসি হেসে পরশুরাম সজোরে কুঠার ছুঁড়লেন গণেশকে লক্ষ্য করে। কোন রকমে গণেশ তাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন—নিষেধ করলাম, তবু তুমি আমার কথা শুনলে না। তবে দেখ।

বলেই তাঁর গোটানো শুঁড়টা দিলেন খুলে। দেখতে দেখতে শুঁড় নিল বিশাল আকার। যেমন মোটা, তেমন লম্বা।

সেই শুঁড় দিয়ে গণেশ ঝপ্ করে পরশুরামের কোমর জড়িয়ে ধরে সটান তুলে ফেললেন শূন্যে। হঠাৎ যে এমন ভাবে আক্রান্ত হতে পারেন, পরশুরাম তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। ভয়ে তাঁর চুল খাড়া হয়ে গেল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে গেল। রেহাই পাবার জন্য শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলেন।

শক্ত করে শুঁড় জড়িয়ে গণেশ ইতিমধ্যে তাঁকে চরকি ঘোরানোর মত ঘোরাতে শুরু করলেন চারদিকে। সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর ঘুরিয়ে আনে তাঁকে গণেশের শুঁড়। ঘুরিয়ে আনল গোলোক। ভয়ে অক্ষ পরশুরাম, খেলার পুতুলের মত চারদিক ঘুরতে ঘুরতে সোজা এসে পড়লেন সমুদ্রের জলে। শুঁড়ে ধরে গণেশ আচ্ছা করে তাঁকে চোবালেন সমুদ্রের জলে। নাক-মুখ দিয়ে তাঁর পেটে ঢুকে গেল এক গাদা নোনা জল। তারপর একসময় আবার দুম্ করে সামনে আছড়ে নামিয়ে দিয়ে গণেশ গুটিয়ে নিলেন নিজের শুঁড়।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে মাটিতে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ মরার মত পড়ে

রইলেন ভার্গব-নন্দন। তারপর আবার জ্বলে উঠল মাথায় আগুন। একুশবার যিনি পৃথিবীকে করেছেন ক্ষত্রিয়শূন্য, সামান্য এই নাবালক গণেশের হাতে এমন অপমান!

ক্রোধে অধীর হয়ে গুরুদেব শিবের কাছ থেকে পাওয়া পাশুপত অস্ত্র তুলে নিলেন তিনি গণেশকে মারবার জন্য। যেমন মারাত্মক, তেমনি ভীষণ এই অস্ত্র পাশুপত। শিব এই একটিমাত্র অস্ত্র দিয়েই অমর ত্রিপুরাসুরকে বধ করতে পেরেছিলেন। যেখানে গিয়ে পড়বে এই অস্ত্র, সেখানটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পরশুরামকে পাশুপত তুলতে দেখে এতক্ষণে কার্তিক এলেন একটু এগিয়ে। এতক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন। এবার বাধা দিয়ে উঠলেন তিনি—ও কি করছ পরশুরাম। থামো...থামো। ও অস্ত্র ছুঁড়ো না। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা! ক্রোধে পরশুরাম ছুঁড়লেন পাশুপত বাণ।

বাবার অমোঘ অস্ত্র পরশুরামের হাত থেকে ছুটে আসতে দেখে নিরুপায় হয়ে গণেশ তার বাঁ দাঁত দিয়ে আটকালেন তাকে। বীর গজানন ইচ্ছে করলেই পাশুপতকে সহজেই কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা করলে যে বাবার অপমান করা হবে। তাই বিনা প্রতিবাদেই তিনি মেনে নিলেন আঘাত। ফলে মুখ থেকে তাঁর বাঁ দাঁতটা সমূলে কেটে গেল। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। আর গোটা কৈলাস কাঁপিয়ে সেই দাঁত সশব্দে পড়ে হয়ে গেল এক স্ফটিক পাহাড়।

একদিকে পাশুপতের গর্জন, গণেশের আর্তনাদ, কার্তিকের হাহাকার, আর একদিকে সশব্দে গজদন্তের পতন—কেঁপে উঠল ত্রিলোক, যেন প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল। ভয়ে দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিন্নর, মুনি-ঋষি যে যেখানে ছিলেন ছুটে আসতে শুরু করলেন কৈলাসের দিকে। ঘুম ভেঙে গেল শিব-পার্বতীর। ধড়মড় করে দু-জনেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

এসে গণেশকে ঐ অবস্থায় দেখেই তো কান্নায় ভেঙে পড়লেন পার্বতী।

অজ্ঞান-অচৈতন্য ছেলের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বারবার দেখলেন। দেখলেন মহাদেবও। দেখেও তিনি কিন্তু চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পার্বতী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না। আহা! অতি কষ্টে পাওয়া তাঁর ঐ ছেলে। একে তো গজানন, তার ওপর আবার এই আঘাত—এ কি কোন মা সহ্য করতে পারেন?

—কে? কে আমার ছেলের এমন দশা করলে? কাঁদতে কাঁদতে আকুলি-বিকুলি করেন পার্বতী—কার্তিক! কার্তিক! চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? বল...বল! তুমি থাকতে কে আমার গণেশের এমন দশা করল?

মা যখন জানতে চাইছেন, কার্তিক কি আর চুপ করে থাকতে পারেন? আদ্যোপান্ত সবই শোনালেন মা-কে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কটমট করে পার্বতী তাকালেন পরশুরামের দিকে।

কোল থেকে গণেশের মাথাটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি পরশুরামের সামনে। বললেন—পরশুরাম, গণেশ না তোমার গুরুভাই, এই তোমার গুরুদক্ষিণা? মহাদেবের অনুগ্রহে তুমি একুশবার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছ বলে তোমার এত অহঙ্কার, এত দম্ভ হয়ে গেল, যে ভেবে নিলে, তোমার মত বীর আর ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই? জান, তোমার মত হাজার গণ্ডা পরশুরামকে ও এক নিমেষে রসাতলে পাঠাতে পারে? শুধু আমাদের ছেলে, আর সংযমী বলে কিছু করে নি। তুমি...তুমি, সেই সুযোগে তাকে এত বড় আঘাত হানলে!

বলতে বলতে পার্বতীর চেহারাই যেন বদলে যেতে লাগল। লাল হয়ে উঠতে লাগল মুখ। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হতে লাগল। দেখে তো পরশুরামের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। এখন বুঝতে পারছেন তিনি রাগের মাথায় কি অন্যায়টাই না করে ফেলেছেন! গুরুদেব চুপ করে দাঁড়িয়ে। গুরু-মা জ্বলে যেন আগুন।

—প্রতিদান যখন এভাবেই দিলি তুই পরশুরাম, তখন তোকেও এর ফল ভোগ করতে হবে। বলেই পার্বতী উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নিয়ে এলেন ভীমকায় এক ত্রিশূল—আজ এই ত্রিশূলেই তোকে এফোঁড়-ওফোঁড় করব। তোর মত কুলাঙ্গার শিষ্য আমাদের থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই দেখে পরশুরাম এক মনে ডাকতে লাগলেন শ্রীহরিকে—স্বয়ং জননী শঙ্করী আসছেন ত্রিশূল হাতে আমাকে মারতে। ভগবান, এখন তুমি ছাড়া এ অভাগাকে আর কে আছে বাঁচাবার?

পরশুরামের অন্তরের ডাক শ্বেতদ্বীপে বসে নারায়ণ শুনতে পেয়েই উঠলেন বিমানে। পার্বতী ত্রিশূল হাতে মারতে যাবেন পরশুরামকে, এমন সময় ঝপ্ করে এসে তিনি নামলেন সেখানে। হঠাৎ নারায়ণকে দেখে সবাই থতমত খেয়ে গেলেন। এমন কি পার্বতীও।

হাসিমুখে নারায়ণ এসে সামনে দাঁড়াতেই দেবতারা প্রণাম জানালেন। ত্রিশূল ফেলে পার্বতীও প্রণাম জানালেন তাঁকে।

শঙ্করীর ত্রিশূলের হাত থেকে বেঁচে গেলেন পরশুরাম। নারায়ণ গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন গণেশ।



তারপর পরশুরামকে একটু হালকা ধমক দিয়ে নারায়ণ বললেন—ছি...ছি রাম, এটা তোমার ভারি অন্যায়। গণেশ তোমার ভাই। তার ওপর এত রাগ কি ভাল? ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করা কি কখনো উচিত? যাও, মিলে-জুলে থাক গে।

আর পার্বতীকে বললেন—তুমি না মা? জগতের মা তুমি, রাম তো তোমারও ছেলে। ও অন্যায় করেছে ঠিকই, কিন্তু এবার তোমার ছেলের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ তো? আগের চেয়ে একটা দাঁতে এখন তোমার গণেশকে আরো ভাল দেখাচ্ছে না?

অস্বীকার করতে পারেন না পার্বতী। সত্যিই এখন আগের তুলনায় অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। মন থেকে রাগ চলে গেল পার্বতীর। আবার ঝরে পড়ল মাতৃস্নেহ।

এখন পরিস্থিতি দেখলে কে বলবে কিছুক্ষণ আগে কৈলাসে ঘটতে যাচ্ছিল এক তুলকালাম কাণ্ড।



কার্তিকের জন্মরহস্য

পার্বতীর প্রথম ছেলেটি কোথা দিয়ে যে কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল জন্ম-মুহূর্তেই, তা কোন মতেই বুঝে উঠতে পারেন না দেবী পার্বতী। দেবাদিদেব শিবের ঘরনী তিনি। তাঁর আর সেই শিবের চোখকে ধুলো দিয়ে কে নিয়ে গেল? কোথায়ই-বা গেল? কতবার যে একথা আকুল হয়ে শিব যোগীকে জিজ্ঞেস করেছেন পার্বতী, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোন উত্তরই তিনি পান নি। যদিও অনেক কষ্ট করে পরে গণেশকে পেয়েছিলেন তিনি, তবুও তার কথা ভুলতে পারেন নি পার্বতী।

গণেশ হওয়ার পরে পরেই যে সমস্ত কাণ্ড-কারখানা ঘটতে লাগল, তার জন্য বেশ কয়েকবার ভগবানকে কখনো বৈকুণ্ঠ থেকে কখনো-বা শ্বেতদ্বীপ থেকে ছুটে আসতে হয়েছিল ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা মিটিয়ে দেবার জন্য।

সেই রকম ভাবেই একদিন ভগবান এসেছেন কৈলাসে। রাজ্যের দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, গন্ধর্ব-কিন্নররা তখন সেখানে। মহাদেবের রত্নময় প্রাসাদে মশগুল।

সকলের মাঝেই হঠাৎ দুর্গা দেবী জিজ্ঞেস করে বসলেন নারায়ণকে—আচ্ছা ভগবান, আপনার তো অজানা কিছুই নেই। বলুন না, আমার প্রথম ছেলেটি হতে না হতেই কোথায় গেল?

শুনে নারায়ণ প্রথমে মুখ টিপে একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—সে কি কথা পার্বতী! তোমার প্রথম ছেলে উধাও? মানে, শিবের প্রথম ছেলে বেপাত্তা। তার মানে?

—সে মানে তো আপনিই জানেন ভগবান। শুধু এটুকু মনে আছে ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি—এরকম কয়েকজন দেবতা একবার উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলেন। ওদেরই কোন চক্রান্ত কিনা, তা আপনিই বলতে পারেন—বললেন পার্বতী।

—সে কি কথা! এতগুলো দেবতা থাকতে শিবপুত্র উধাও হয়ে যায়? সত্যিই পার্বতী, এ তো যা-তা ব্যাপার নয়। সন্ধান অবশ্যই নিতে হয়। নারায়ণ এমন ভাবে বললেন যেন তিনিও কিছুই জানেন না।

আসলে এই সব কিছুর মূলে কিন্তু ছিলেন তিনিই। বিয়ের পর পার্বতী যখন শিবের সঙ্গে ঘর করছিলেন মনের আনন্দে, তিনিই তখন দেবতাদের ডেকে বলেছিলেন—দেবগণ, শিবের প্রথম যে ছেলেটি হবে সে যদি পার্বতীর কোলে জন্মায়, আর তাঁর স্তনদুগ্ধ খায় তবে সে ছেলেকে বাগে আনা খুবই শক্ত হবে। সুতরাং খুব সাবধান।

নারায়ণের কথা শুনে দেবতারাও বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন। নর্মদার তীরে বসে বহুক্ষণ ধরে আলোচনাও করেছিলেন। উপায়ও বের করেছিলেন। আবার ভয়ও ছিল, শিবের হাতে ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। ধরা অবশ্য পড়তে হয় নি। কাজও হাসিল হয়ে গিয়েছিল। আজ এতদিন পর আবার যে পার্বতী তাঁদের সকলের সামনে নারায়ণের কাছে এই প্রশ্ন রাখতে পারেন তা ভাবতেও পারেন নি কেউ।

নারায়ণ একবার তাকালেন গম্ভীর মুখে দেবতাদের দিকে। তখন যাঁরা যাঁরা সেখানে ছিলেন, ভয়ে সকলেরই বুক দুরু দুরু করে উঠল। এ দিকে নারায়ণ, আর একদিকে শিব। মানে একদিকে হরি, আর অন্যদিকে হর। দেবতারা তো জানেন, দু-জনে আলাদা হলেও দু-জনের মধ্যে হরিহর-আত্মার সম্পর্ক।

—দেবগণ, পার্বতীও যা বলল তা তো খুব লজ্জার কথা। তোমরা থাকতে শিবের ছেলে বেপাত্তা হল, এটা কি আমায় মেনে নিতে হবে? যদি কেউ কিছু জানো সত্যি করে বল। গোপন করার চেষ্টা কোরো না। বললেন নারায়ণ।

ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের, অশ্বিনীকুমার দুই ভাই আর প্রধান প্রধান যেসব দেবতারা সেখানে ছিলেন, সকলেই এক এক করে বলে উঠলেন, তাঁরা এর কিছুই জানেন না। আজ গণেশের জন্মোৎসবে আনন্দ করতে এসেছেন তাঁরা। আগে যে একটা ছেলে হয়েছিল পার্বতীর, এই প্রথম শুনছেন। ছি...ছি... এ ঘোর অন্যায়। এ অন্যায় যে করেছে তাকে ফলভোগ করতেই হবে।

শুনে ভগবান বিষ্ণু এবার কাছে ডাকলেন সূর্য, ধর্ম, পৃথিবী, পবন আর চন্দ্রকে। কাছে ডেকে এনে সকলের অসাক্ষাতে একবার চোখ টিপে বললেন—কি গো, তোমরা কিছু জানো নাকি? যদি জানো তো খোলাখুলি বল বাপু'। তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কারো কিছু করার সাধ্য নেই। বলেই ভগবান বিষ্ণু এমনভাবে তাকালেন তাদের দিকে যে ভয়ে তাঁদের বুক দুরু-দুরু করে উঠল।

ধর্ম বললেন—না না, মিথ্যে কথা বলব কেন, আর গোপনই-বা করব কেন! আমি শুধু এটুকু জানি যে শিবের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তা মিথ্যে নয়। পার্বতী ঠিক কথাই বলেছেন।

—তাহলে পৃথিবী, সন্তান যখন তোমার কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তখন সে কোথায় গেল, তা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়। বললেন নারায়ণ।

—ঠিক কথা ভগবান।' বললেন দেবী পৃথিবী—অমন সন্তানকে ধরে রেখে যে মায়ের হাতে তুলে দেব, সে অবকাশ আমি পাই নি ভগবান। এমন দাপাদাপি শুরু করেছিল যে ভয়ে আমি তাকে তুলে দিয়েছিলাম অগ্নিদেবের হাতে।

অগ্নিদেব বললেন—তার তেজ আমি সহ্য করতে না পেরে ফেলে দিয়েছিলাম শরবনে।

পবনদেব বললেন—অগ্নিদেব ঠিকই বলেছেন, ভগবান। তখন আমি সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ছিলাম, সব দেখেছি।

এরপর সূর্যদেব বললেন—মিথ্যে নয় ভগবান। আমি তখন অস্তাচলে যাচ্ছিলাম। শরবনের ভেতর একটা ফুটফুট ছেলেকে কাঁদতে শুনে চেয়ে দেখলাম ছ-জন ধাইমা। ছ-জনই কৃত্তিকা। তাকে স্তন-দুধ খাইয়ে ভোলাচ্ছে। আমার মনে হয়, সেই শিশুটি এখন বোধ হয় কৃত্তিকাদের কাছেই আছে।

শুনতে শুনতে পার্বতীর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

সূর্যদেবের কাছ থেকে শেষ সংবাদটুকু পেয়েই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন পার্বতী। এতদিন পরে তাহলে সন্ধান মিলেছে? আহা, কত বড় হয়েছে, কেমন আছে? দেখার জন্য ছটফট করে ওঠে তাঁর মন। তাকান তিনি শিবের দিকে।

তারপর মহাদেবকে শুনিয়েই বলে ওঠেন—আমার ছেলে থাকবে কৃত্তিকাদের কাছে? না না। তা হতে পারে না। আমি এখুনি আনাব।

বলেই ডাকলেন নন্দীকে। বললেন—নন্দী, তুমি এখনই কৃত্তিকাদের কাছে গিয়ে আমার ছেলেকে এনে দাও।

মায়ের হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে নন্দী ছুটল কৃত্তিকাদের কাছে। তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখে, সাদা-মাটা ঘর, উঠোন। আর উঠোনে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ছেলে। কিশোর বটে। দারুণ স্বাস্থ্য। কিন্তু ছটি মুখ।

নন্দী কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—ছেলে, তুমি এখানে কেন?

চেনেও না ছেলেটি নন্দীকে। হঠাৎ তাকে দেখে আর ঐরকম প্রশ্ন শুনে ছেলে তাকাল তার দিকে। বলল—তার মানে? আমি কৃত্তিকাদের ছেলে কার্তিক। আমার ছয় মায়ের স্তনদুধ আমি একসঙ্গে খাই, তাই আমি ষড়ানন। আমি আমার মায়েদের কাছে থাকব না তো, কোথায় থাকব? কিন্তু আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

নন্দী বলল—আমি মহাদেবের অনুচর নন্দী। পার্বতী আমার মা। আসছি কৈলাস থেকে। মায়ের আদেশে তোমাকে এখান থেকে কৈলাসে নিয়ে যেতে এলাম।

—কেন? কৈলাসে কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কার্তিক।

—বারে? এটা কি তোমার বাড়ি নাকি? এ বাড়িতে কি তোমার থাকা মানায়? তুমি হলে দেবাদিদেব মহাদেবের ছেলে। আমাদের মা পার্বতী হলেন তোমার মা।

নন্দীর কথা শুনে কার্তিক তো অবাক। কেই-বা মহাদেব? আর কেই-বা পার্বতী? জ্ঞান হয়ে অবধি সে দেখেছে তার এই ছয় মাকে।

এরপর নন্দী সবই খুলে বলল কার্তিককে। ইতিমধ্যে ছয় কৃত্তিকাও এসে হাজির হয়েছে সেখানে। শুনল তারাও। বলল—কার্তিক, উনি ঠিকই বলেছেন। ব্রহ্মার আদেশে আমরাই তোমাকে শরবন থেকে তুলে এনে বড় করেছি, বাবা। এখন তোমার মা তোমাকে নিতে পাঠিয়েছেন। তোমার বাবা নিশ্চয়ই তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। দেরি কোরো না বাবা। তোমার বাড়িতে তুমি ফিরে যাও।

নিজের পরিচয় পেয়েও প্রথমে কার্তিকের খুবই কষ্ট হল কৃত্তিকাদের ছেড়ে যেতে। তবুও নন্দীর সঙ্গে কার্তিক দিব্য বিমানে চেপে কৈলাসে গেল।

শিবপুত্র কার্তিক আসছেন। একে তো গণেশের জন্মোৎসবের ধুমধাম। তার ওপর আবার এতদিন পর আসছে হারানো ছেলে কার্তিক। কৈলাস যেন আনন্দে ফেটে পড়তে লাগল।

আকাশ থেকে কার্তিককে নিয়ে বিমান এসে নামতেই পার্বতী তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। নবীন কিশোর। হাতে ধনুক-বাণ। পাশে দাঁড়িয়ে শিব। একে একে মা-বাবাকে প্রণাম করে প্রাসাদে ঢুকেই দেখেন রত্ন-সিংহাসন আলো করে বসে স্বয়ং বিষ্ণু। তাঁকেও প্রণাম জানাল কার্তিক। প্রণাম জানাল এক এক করে সব দেবতাদের। প্রত্যেকেই প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন তাকে। গণেশও বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর ভাইকে।

আনন্দের বন্যা বইতে লাগল কৈলাসে।



দুর্বাসার দুর্বিপাক

অত্রি মুনির ছেলে দুর্বাসা। সতী-সাধ্বী অনসূয়ার মহা তপস্যার বলে দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁদের ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন দুর্বাসা নামে।

মহা তপস্বী, মহাযোগী দুর্বাসা। তাঁর সবই ভাল। শুধু একটা কারণে সকলেই তাঁকে ভয় করে চলতেন, সেটা হল তাঁর রাগ। একবার রেগে গেলে তাঁর আর কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মুখে যা আসত, তাই বলে অভিশাপ দিয়ে বসতেন। মহাযোগীর মুখের কোন কথা বিফল হবার নয়। অবশ্যই ফলে যেত। তাঁর এই ক্রোধের জন্য আর সামান্য কারণে যাকে-তাকে শাপ-শাপান্ত করার জন্য অত্রি মুনি আর অনসূয়ার মনেও কষ্ট কিছু কম হত না। কিন্তু, কি আর শাসন করবেন ছেলেকে। ছেলে তো আর অবুঝ নয়।

গন্ধমাদন পর্বতের এক গুহায় যুবক দুর্বাসা একবার এক মনে ধ্যানে বসেছিলেন। কেউ তা জানতও না।

দৈত্যরাজ বলির ছেলে সাহসিক আর অপ্সরা তিলোত্তমা সেখানে মনের আনন্দে এমনভাবে হই-হুল্লোড় আর বিহার করে বেড়াচ্ছিল যে, কোন দিকেই আর তাদের চোখ-কান ছিল না। তাদের হুল্লোড়ে কয়েকবার ধ্যান ভেঙে গেল দুর্বাসার। শেষে নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে গুহা থেকে বেরিয়েই ওদের দেখতে পেলেন।

তখন রাগে তাঁর চোখের তারা বনবন করে ঘুরছে।

সাহসিককে বললেন—বলির ছেলে হয়ে তুই এমন নির্লজ্জ, বেহায়া যে একটা অপ্সরার সঙ্গে পাহাড় কাঁপিয়ে হই-হুল্লোড় করছিস? ও-কাজ তো গাধারা করে। যা, তুই অসুরকুলে গর্দভ হয়ে জন্মাগে।

তারপর তিলোত্তমাকে বললেন—অপ্সরা হয়ে ভেবেছ যা খুশি তাই করে বেড়াবে? স্বর্গ জয় করে নিয়েছ নাকি? যাও, তুমিও অসুরকুলে গিয়ে জন্মাও গে।

দুর্বাসাকে হঠাৎ ওখানে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এমনিতেই দু-জনে যথেষ্ট ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তার ওপর এই অভিশাপ! দু-জনেই এসে লুটিয়ে পড়ল মুনির পায়ে—অপরাধ হয়ে গেছে আমাদের। ক্ষমা করুন।

মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়ে গেছে, আর কি তা ফেরে। হাতের ঢেলা কাউকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে তা কি আর হাতে ফিরে

আসে? মাথা তার ফাটবেই। সাহসিক আর তিলোত্তমারও এখন সেই অবস্থা।

অনেক অনুরোধ-উপরোধ করল দু-জনে।

দুর্বাসা বললেন—এখন আমার আর কিছু করার নেই। তবে একটা কথা বলতে পারি। গর্দভ হয়ে জন্মালেও, সাহসিক, তোমাদের বংশটাই হরিভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন।

—মুনিবর, স্বর্গের অপ্সরা আমি। স্বর্গসুখ ছেড়ে আমাকে কতদিন এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। দয়া করে বলুন আমি কিভাবে মুক্তি পাব। দুর্বাসার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তিলোত্তমা কাঁদে আর বলে।

দুর্বাসা বললেন—শোন, তুমি গিয়ে জন্মাবে বাণাসুরের ঘরে তার মেয়ে হয়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ যেদিন তোমাকে বিয়ে করবে, সেদিন তোমার শাপমুক্তি হবে। যাও, এখানে আর বিরক্ত কোরো না।

চলে গেল ওরা দু-জনেই। দুর্বাসার কথামত ভবিষ্যতে অবশ্য তাই হয়েছিল। গর্দভাসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে প্রাণ দিয়ে উদ্ধার পেল। আর বাণরাজার মেয়ে ঊষা হয়ে তিলোত্তমাকেও উদ্ধার করেছিল শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ।

ব্যাপারটা ওখানেই মিটে যেতে পারত। কিন্তু মিটল না।

চঞ্চল হয়ে উঠল দুর্বাসার মন। ধ্যানে তপস্যায় আর কিছুতেই মন বসাতে পারেন না তিনি। মনের কোণে খালি ভেসে ওঠে নারী মূর্তি। প্রবল বাসনা জাগে বিয়ে করার। কিন্তু তাঁর মত সংসার অনভিজ্ঞ মুনিকে কে দেবে মেয়ে?

—এমন সময় মহাতপা ঔর্ব ঋষি এলেন তাঁর কাছে, মেয়ে কন্দলীকে নিয়ে। অপরূপা কন্দলী। রূপে যেন লক্ষ্মী। একমাথা ঘন কালো চুল, টানা টানা চোখ। মেয়েটিকে দেখে দুর্বাসার মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে এইরকম একটি মেয়ে হলেই ভাল হয়।

যাই হোক ঔর্ব ঋষি এসেছেন তাঁর কাছে। সম্ভাষণ জানিয়ে দুর্বাসা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন।

ঔর্ব ঋষি বললেন—আমার এই মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। এর নাম কন্দলী।

—আপনার মেয়ে? জিজ্ঞেস করেন দুর্বাসা—আমি বিয়ে করব? আপনি কি বলছেন? বিয়ে করে যদি সংসারই করব, তবে এভাবে তপস্যা করে বেড়াব কেন? মনের ভাবটা এই মুহূর্তে গোপন করলেন দুর্বাসা।

ঔর্ব ঋষি বললেন—দেখ দুর্বাসা, তুমি তো জান, আমি নিজে কোন সংসারধর্ম করি নি। অথচ আমারই জানু থেকে জন্ম নিল এই মেয়ে। তাই মেয়ে আমার অযোনিসম্ভবা। একদিকে বাবা আর একদিকে মা—দুটো ভালবাসা দিয়ে ওকে আমি এত বড় করে তুলেছি। প্রথম মেয়ে আমার, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে গোঁ ধরে বসেছে। তাই কি আর করি, অনেক খুঁজতে খুঁজতে তোমার সন্ধান পেলাম এখানে। তোমাকে যে আমার দায় উদ্ধার করতেই হবে, দুর্বাসা।

সব শুনে দুর্বাসা তবুও 'কিন্তু...কিন্তু' করতে লাগলেন দেখে মহাতপা ঔর্ব বললেন—শোন দুর্বাসা, আমার মেয়ের গুণের তুলনা নেই। আমি ওকে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান সব দিক থেকে তৈরি করেছি। শুধু দোষের মধ্যে একটা, তা হল, হঠাৎ হঠাৎ রেগে গিয়ে মুখে যা আসে, তাই বলে বসে। ওর এই দোষটা আমি কিছুতেই শোধরাতে পারি নি।

মনে মনে তো রাজি হয়েই গিয়েছিলেন দুর্বাসা।

তবুও এবার মুখ ফুটে সম্মতি জানালেন। বললেন—আপনার মেয়ের একান্ত ইচ্ছে আর আপনার অনুরোধ ঠেলি কেমন করে। তবে একটা কথা ঋষিবর, ঐ কটু-কাটব্য আমি বড় একটা সহ্য করতে পারি না। বিয়ে আমি করছি বটে, কিন্তু ওর একশটা কটু কথা আমি সহ্য করব। তারপর কিন্তু আর নয়।

যাই হোক, কন্দলীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দুর্বাসার। ঔর্ব ঋষিও বিয়ে দিয়ে দুর্বাসার কাছে মেয়েকে রেখে চলে গেলেন আবার সরস্বতী নদীর তীরে, তাঁর আশ্রমে তপস্যা করতে।

এদিকে রূপসী বউ পেয়ে দুর্বাসাও শুরু করে দিলেন রীতিমত ঘর সংসার। আর এমনি মজে গেলেন যে, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা সব উঠল মাথায়। জপ করতে বসবেন কি, স্ত্রী কন্দলী দাঁড়িয়ে সামনে। সব সময়ই একটা চিন্তা পেয়ে বসল দুর্বাসাকে, কি করলে বউ তার খুশি হবে, সুখে থাকবে।

এভাবে যত দিন যেতে লাগল, দুর্বাসাও পুরনো হতে লাগলেন কন্দলীর কাছে। ততই আস্তে আস্তে ফুটে বেরতে লাগল কন্দলীর দুর্মুখ স্বভাব। কারণে-অকারণে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠতে শুরু করল। শুনে মাথা গরম হয়ে ওঠে দুর্বাসার। তবুও কোন রকমে সামলে নেন নিজেকে। যাঁর মুখের ওপর কেউ কথা বলার সাহস পায় না, সামান্য একটা মেয়ে, তাঁকে এভাবে যা নয় তাই বলতে শুরু করল! আর তাঁকে কিনা তা হজম করে চলতে হচ্ছে? মনে মনে ভাবেন দুর্বাসা, হায় রে, বিয়ে করে এ কি দুর্বিপাক! তবুও উপায় নেই। শ্বশুরকে কথা দিয়েছেন, একশটা কটু-কাটব্য তাঁকে সহ্য করতেই হবে। তাই শুধু গুণে রাখেন, কটা হল কন্দলীর কুকথা।

দেখতে দেখতে একদিন পূর্ণ হল কন্দলীর একশটা কটু কথা। প্রতিজ্ঞার শেষ দিন। শাপ দিতে গিয়েও দুর্বাসা দিতে পারলেন না। ভাবলেন, এবারটাও ক্ষমা করে দিই। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভাবেন—বিয়ে করে তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লেন তিনি। কোন অসুবিধেই তিনি রাখেন নি তাঁর স্ত্রীর। অথচ এ কি দুর্ব্যবহার! মেয়েমানুষের এ কি রাগ! আর পুরুষ হয়েও যেহেতু বিয়ে করেছেন, হজম করে যেতে হচ্ছে! এ কি জ্বালায় পড়লেন তিনি—যে বোঝালেও বোঝে না।

তবুও একদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। আগুনের মত জ্বলে উঠলেন দুর্বাসা।

—কি! এত বড় স্পর্ধা তোমার, যে পূজনীয় স্বামীকে কটু কথা বল? কিসের এত ক্রোধ? কেন এত কটুকথা! দিন-দিন যে আগুন তুমি জ্বেলেছ, তাতেই তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাও।

যোগীরাজ দুর্বাসার অভিশাপ। বৃথা যাবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে অমন সুন্দর কন্দলী পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

যে মুহূর্তে কন্দলী পুড়ে ছাই হয়ে গেল, অমনি দুর্বাসারও মনে জাগল অনুতাপ। মানুষ হয়ে জন্মালে রাগ-ক্ষোভ-দুঃখ, এসব তো থাকবেই। নিজে অত বড় যোগী হয়েও যখন রাগ সামলাতে পারেন না, তখন মেয়েমানুষ কন্দলী তো কোন ছার! শেষে রাগের বশে নিজেই নিজের স্ত্রীকে মেরে ফেললেন? নারীঘাতী হলেন! ছি...ছি.

এতদিন জপতপ করে শেষে তাঁর এই হাল? এ জীবন না রাখাই ভাল।

মনের দুঃখে এরকম সাত-পাঁচ ভেবে দুর্বাসা আত্মহত্যা করতে যাবেন, দেখলেন কোথা থেকে হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন অপূর্ব সুন্দর এক ব্রাহ্মণ যুবক। চাঁদের মত মুখ, কপালে তিলক, পরনে লাল কাপড়, হাতে ছাতা-লাঠি। দেখলেই ভক্তি আসে। নতজানু হয়ে প্রণাম জানাতে ইচ্ছে যায়। দেখে দুর্বাসা প্রণাম করলেন।

ব্রাহ্মণ যুবক বললেন—এ কি করতে যাচ্ছ মুনি? তুমি না জ্ঞানী, যোগী? সব ছেড়ে ছুড়ে শেষে মায়ায় পড়ে হাবুডুবু খেতে যাচ্ছ? ওসব বুদ্ধি ছাড়। যাঁর ধ্যান করছিলে সেই ভগবান শ্রীহরির ধ্যান কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুবকের কথায় যেন চৈতন্য ফিরে এল দুর্বাসার। এত অল্প বয়স, অথচ এমন কথা মুখে। কে এই ব্রাহ্মণ যুবক? মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন মুনি, কোথায় কে? হাজার হোক দুর্বাসা যোগী। বুঝতে অসুবিধে হল না যে শ্রীহরি নিজেই তাঁকে ছলনা করে গেলেন। মনকে ঠিক করে নিয়ে দুর্বাসা আবার আগের মতই মজে গেলেন ধ্যানে।

ইতিমধ্যে মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ঔর্ব ঋষি সরস্বতী নদীর আশ্রম থেকে ছুটে এলেন। শ্বশুরকে প্রণাম জানিয়ে সব বললেন দুর্বাসা। শুনে ঔর্ব বললেন—মেয়ে আমার এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছিল দুর্বাসা যে তুমি তাকে মেরে ফেললে? একজন যোগী হয়ে তোমার রাগও তো কিছু কম নয়!

শুধু মুখ বুজে শুনলেন দুর্বাসা। সত্যিই তো, এর কোন জবাবই নেই।

যাবার সময় ঔর্ব ঋষি শুধু বলে গেলেন—এর সাজা আমি আর তোমায় দেবো না। সাজা আর শিক্ষা তুমি ঠিক সময়েই পাবে।

[সত্যিই দুর্বাসা তা পেয়েছিলেন রাজা অম্বরীষের কাছ থেকে। আর কিভাবে পেয়েছিলেন তা 'ভাগবত পুরাণ'-এর 'দুর্বাসার দর্পনাশ' পড়লেই জানতে পারা যায়]।



ব্রহ্মার দর্পনাশ

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ছড়িয়ে আছে এই বিশ্বচরাচরে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হলেন এক একজন ব্রহ্মা। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি এই সব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি করছেন বিধাতাদের, সেইসব ব্রহ্মাণ্ডকে পাহাড়, নদী, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ দিয়ে ভরিয়ে তোলার জন্য। তাঁর ইচ্ছায় এসব ব্রহ্মারা নানা ভাবে পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টি করছেন। আবার তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে প্রলয়, ধ্বংস। আবার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার সব ব্রহ্মা যে দেখতে একরকম তা নয়। কেউ হলেন চতুর্মুখ, কেউ-বা দশানন, কেউ-বা আবার শতমুখ—হাজার মুখ ব্রহ্মাও আছেন।

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হলেন চতুর্মুখ। বেদের স্রষ্টা। বেদ হল সুবিশাল জ্ঞানসমুদ্র—যা পড়লে সব কিছুই জানা যায়। কিছুই আর অজানা থাকে না।

আমাদের চতুর্মুখ ব্রহ্মার মনে মনে একবার খুব অহঙ্কার হয়েছিল। যদিও বিষ্ণু আর মহেশ্বর নামে আরও দু-জনে আছেন দু-রকমের কাজে, কিন্তু ব্রহ্মার ধারণা হয়েছিল, তিনি নিজে যদি কিছু না করেন, তাহলে এঁরা আবার কে? তাছাড়া, বয়সের দিক থেকেও এঁরা তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। তিনিই সকলের পূজনীয়। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। পদে পদে ব্রহ্মা চলতেন কতকটা এরকম মেজাজ নিয়েই।

ভগবান শ্রীহরির তো আর কিছু অজানা থাকার কথা নয়। তিনি সবই জানতেন, বুঝতেও পারতেন। আর নিজেরই মনেই বলতেন, 'হায় রে।'

বহুকাল আগের কথা।

সুচন্দ্র তখন পৃথিবীর রাজা। অসাধারণ হরিভক্ত।

বেশ কিছুকাল রাজকাজ করার পর সব ছেড়ে রাজা চলে গেলেন মলয় পাহাড়ে শ্রীহরির তপস্যা করতে।

একমনে সেই তপস্যায় রাজার কেটে গেল হাজারটা বছর। খাদ্যের মধ্যে কেবল বায়ু। উইপোকা একটু একটু করে তাঁর শরীরের মাংস খেতে খেতে সবটাই খেয়ে মাটি করে ফেলল। আর সেই মাটিতে ঢাকা পড়ে রইল শুধু হাড় কখানা। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না রাজার। উইঢিবির ভেতরে শুধু দুটো চোখ ছাড়া আর এমন কিছু ছিল না, যে দেখলে ওখানে কোন মানুষ আছে বলে কেউ মনে করবে।

রাজার সেই কঠোর তপস্যা দেখে বিধাতা ব্রহ্মার টনক নড়ল।

সময় করে হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হলেন সেখানে। কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন সেই ঢিবির ওপর। দিতেই কোথায় চলে গেল উই-এর ঢিবি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই আগের চেহারা।

সামনে ব্রহ্মাকে দেখে প্রণাম জানালেন রাজা।

ব্রহ্মা বললেন—বল, কিসের জন্য তুমি এত কঠোর তপস্যা করছ? কি তোমার অভিলাষ? আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।

রাজা বললেন—পিতামহ, আমার শুধু একটাই বাসনা। শ্রীহরির পায়ে যেন আমার মতি থাকে। আমি যেন সব সময়ের জন্য তাঁর দাস হয়ে থাকতে পারি।

—এই মাত্র! বললেন ব্রহ্মা—বেশ, তাই হবে, তুমি তাঁর দাস হয়েই থাকতে পাবে।

বর দিয়ে ব্রহ্মা যেই পেছন ফিরেছেন, রাজা দেখলেন আকাশপথ ধরে নেমে আসছে দিব্য এক বিমান। ফুলে ফুলে সাজানো। বিমানে কয়েক জন আরোহী। তাঁদের প্রত্যেকেরই গায়ে চন্দন মাখা, মাথায় মুকুট, পরনে পীতবাস, কানে কুণ্ডল।

বিমান এসে নামল তাঁর সামনে। তারপর সমাদরে সেই আরোহীরা তাঁকে সেই বিমানে তুলে নিয়ে চলে গেলেন গোলোকে।

সুমেরুতে নিজের থাকবার জায়গায় আপন মনে ফিরে চলেছেন

ব্রহ্মা। গলায় অক্ষমালা। হাতে কমণ্ডলু! কোন দিকে খেয়াল নেই তাঁর।

পথের মাঝে এক ফুলের বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মানিনী নামে এক অপ্সরা। হঠাৎ ব্রহ্মাকে দেখেই তার বেড়ানো গেল ঘুচে। ঠিক করে ফেলল, যেভাবেই হোক ব্রহ্মার মন জয় করতে হবে।

যথেষ্ট বয়স হয়েছে ব্রহ্মার। চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। তবুও স্বাস্থ্য ছিল যেমন অটুট, তেমনি সুদর্শন। থাকতেনও তিনি খুব সংযমের মধ্যে। তার তুলনা ও মানিনী এত ছোট, যে ব্রহ্মার নাতনিও বুঝি তার চেয়ে বড় হবে। তবু মানিনী পিছু নিল তাঁর।

ব্রহ্মা যেন দেখেও দেখলেন না, এমনি ভাবে তাকে উপেক্ষা করেই চলে গেলেন।

দেখে মানিনীরও মনে জেদ চেপে গেল। অপ্সরাদের উপেক্ষা কোন দেবতাই করতে পারেন না। কিন্তু, ব্রহ্মা তা করে গেলেন দেখে, মানিনীর দুঃখ হয়েছিল খুব। এখন চিন্তায় পড়ল মানিনী, কি ভাবে কাজ উদ্ধার করা যায়।

এমন সময় আর এক অপ্সরা রম্ভা এসে হাজির হল সেখানে। শুকনো মুখে মানিনীকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে যখন সব জানল, তখন বলল—একটা বুদ্ধি তোমায় দিতে পারি মানিনী। সেভাবে চেষ্টা করলে, আমার বিশ্বাস তোমার আশা অবশ্যই মিটবে।

—কি? জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল মানিনী।

—কামদেবকে সঙ্গে নিয়ে যাও না। দেখি, ব্রহ্মা কেমন ভাবে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন? বলল রম্ভা।

—বাঃ, বেশ চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছ তো বোন! বলেই মানিনী একমনে ভাবতে লাগল কামদেবকে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কামদেবের অসাধ্য বলে কিছুই নেই। অমন যে যোগীরাজ মহাদেব, তাঁরও মন টলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর ব্রহ্মা!

মানিনীর ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে কামদেব এসে হাজির হলেন সেখানে।

ব্রহ্মার তপোবন-এর চেহারাটাই হঠাৎ যেন পালটে গেল। গাছে গাছে এল নতুন কচি কচি সবুজ পাতা। ফুলের বাগান জুড়ে কত রকমের ফুল উঠল ফুটে, গাছের ডালে ডালে ডাকতে শুরু করল কোকিল, দক্ষিণ দিকে ফুরফুরে বাতাস। যেন অসময়ে এসে গেল বসন্তকাল।

বসন্তকালে নিজের মনকে বশে রাখা দারুণ শক্ত। অমন যে যোগী ব্রহ্মা, সব সময় যিনি থাকেন ধ্যান-জপের মধ্যে, তাঁরও মন উঠল চনমন করে। কোন মতেই আর মন বসাতে পারেন না। কেন এমন হল? চোখ খুলতেই দেখেন, সামনে কামদেব, সঙ্গে সেই মানিনী।

ব্রহ্মাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই কামদেব লুকিয়ে পড়ল আড়ালে, আর অপ্সরা মানিনী পায়ে নূপুরের আওয়াজ তুলে প্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে এল ব্রহ্মার কাছে।

মনে মনে প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন ব্রহ্মা। সর্বনাশ! এই জগতের স্রষ্টা তিনি। তিনিই বিধাতা হয়ে সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। আবার এই বুড়ো বয়সে তাঁরই ভাগ্যে এ কি বিপর্যয় এল। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখনও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে?

মন চঞ্চল হয়ে উঠলেও ব্রহ্মা কিন্তু ঠিকই করে নিয়েছিলেন কামদেব চালাকি করে যে ফাঁদ পেতেছেন তাতে তিনি কোন মতেই পা দেবেন না। এদিকে মানিনীরও এক জেদ, বিধাতা ব্রহ্মার মন জয় করতেই হবে।

কত ভাবে বোঝান ব্রহ্মা মানিনীকে—বয়স হয়েছে আমার। আমার না আছে ধনসম্পদ, না আছে ঐশ্বর্য। সারাটা জীবন কাটালাম ধ্যান যোগ করে। সকলে আমায় কত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট তুমি। এই বয়সে কি তোমাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সাজে? কেন মিছামিছি আমায় এভাবে বিব্রত করছ বল তো।

তবুও মানিনীর সেই এক কথা—ব্রহ্মার ঘরনী সে হবেই।

ব্রহ্মার খুব রাগ হল কামদেবের ওপর। তারই জন্য যত ঝামেলা। কামদেবকে অভিশাপ দিয়ে ব্রহ্মা এবার গুম হয়ে বসলেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন শ্রীহরিকে। আর মানিনীও সামনে বসে অনুনয়-বিনয় করে চলল।

এমন সময় কোথা থেকে পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অত্রি, কণ্ব, সনক, সনন্দ সব ব্রহ্মতেজী মুনিরা এসে হাজির হলেন ব্রহ্মার কাছে। তাঁদের দেখেই মানিনী গেল কুঁচকে। তাড়াতাড়ি ব্রহ্মার কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল একপাশে।

সকলকে দেখে ব্রহ্মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রণাম সেরে মুনিরা জিজ্ঞেস করলেন ব্রহ্মাকে—এই মেয়েটি কে? এখানে কেন?

হাসতে হাসতে ব্রহ্মা বললেন—আমার মেয়ে।

সর্বজ্ঞ সব মুনি। ব্রহ্মা যাই বলুন, তাঁদের কিন্তু জানতে বাকি রইল না মেয়েটি কে? ব্রহ্মার কথা শুনে সকলেই তাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

আর যায় কোথা। রাগে অভিমানে ফুলে উঠল মানিনী—ভগবান আমাকে অপ্সরা করে পাঠিয়েছেন পুরুষ মানুষদের মন জয় করতে। তা জেনেও ব্রহ্মা আপনি আমায় উপহাস করলেন? আমিও বলছি শুনুন, পৃথিবীতে কেউ আপনাকে পুজো করবে না। যে করবে, তাকে বিপদে পড়তে হবে। এই বলে মানিনী সেখান থেকে চলে গেল।

মানিনীর কথা শুনে ব্রহ্মার তো গেল মাথা ঘুরে। বিষধর সাপের ছোবলে যেমন বিষ, মনের কষ্টে কোন মেয়ে যদি হঠাৎ কোন শাপ-শাপান্ত করে বসে, তাহলেও তা তেমনি বিষ। লাগবেই লাগবে। ব্রহ্মার মন খারাপ হয়ে গেল।

মুনিরাও ব্রহ্মার ওপর মানিনীর অভিশাপ শুনে খুব দুঃখ পেলেন। বললেন—ভগবান, আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে যান। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে অভিশাপমুক্ত করবেন। মুনিরা এই বলে চলে গেলেন!

মুনিদের কথা তো আর ঠেলতে পারেন না ব্রহ্মা। রোগ হলে বৈদ্যর কাছে যেতেই হয়। সবাই বললেন—অভিশাপমুক্ত করতে নাকি একমাত্র বিষ্ণুই পারবেন। মনে মনে ক্ষোভ জাগল ব্রহ্মার। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা তিনি নিজে। আর এখন কিনা তাঁকে যেতে হবে বিষ্ণুর কাছে—যে তাঁর থেকে অনেক ছোট। এখন মাথা নিচু করতে হবে তাঁর কাছে!

কিন্তু উপায় নেই। সকলেই যখন বলছেন তখন যেতেই হয়।

পায়ে পায়ে বৈকুণ্ঠে এসে হাজির হলেন ব্রহ্মা। দেখলেন লক্ষ্মী দেবীকে পাশে নিয়ে রত্ন-সিংহাসনে বসে আছেন বিষ্ণু। দাসীরা চামরের বাতাস করছে।

চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে দেখেই সিংহাসন ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে হাত ধরে নিয়ে গেলেন বিষ্ণু। বসালেন তাঁকে একটা সিংহাসনে।

সবই জানেন বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি ঘটছে, কিছুই অজানা নেই তাঁর। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার বিধাতা? হঠাৎ এখানে? অমন শুকনো মুখ কেন? কি হয়েছে?

চতুর্মুখ ব্রহ্মা অকপটে সব বললেন। যে মুহূর্তে জিজ্ঞেস করতে যাবেন, এখন কি উপায়, ঠিক সেই সময় দ্বারী এসে বিষ্ণুকে খবর দিল—অন্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশানন ব্রহ্মা এসেছেন। আপনার সঙ্গে তাঁর নাকি খুব জরুরি প্রয়োজন। একবার দেখা হওয়া দরকার।

—তাই নাকি? বিষ্ণু বললেন—আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

সেই সঙ্গে ইশারায় বিধাতাকেও বলে দিলেন একটু অপেক্ষা করতে।

দশানন ব্রহ্মা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাজ মিটিয়ে বাইরে গেলেন তো আর এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে শতমুখ ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন। তাঁর কাজ মিটল তো কোথা থেকে অসম্ভব প্রবীণ হাজারমুখ আর এক ব্রহ্মা এসে তেমন ভাবেই প্রণাম জানিয়ে বিষ্ণুর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে চলে গেলেন।

বসে বসে সবই দেখেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। আর লজ্জায় নিজের মাথা নিজেই কুটে মরেন। এসব দেখে-শুনে, বিধাতার মনে হতে লাগল ছিঃ ছিঃ, চারটে মুখ নিয়ে মনে মনে এত অহঙ্কার কিভাবে তিনি পোষণ করতেন! এখানে আসার আগে পর্যন্ত যেটুকু দম্ভ, অহঙ্কার ছিল, তা মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যাই হোক, নারায়ণ অবশ্য ব্রহ্মার সমস্যার সব সমাধান করে দিয়েছিলেন ঠিকই—তবে, তাঁর মনের দম্ভকে ভেঙে দিয়ে।



অষ্টাবক্র কাহিনী

বৃন্দাবনে চলেছে রাস-উৎসব। ষোলশ গোপিনীর সঙ্গে রাধা রসামঞ্চকে ঝলমল করে রেখেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে সমান ভাবে খেলা করলেও, সকলের প্রার্থনা সমান ভাবে পূরণ করলেও, রাধার ব্যাপারটাই ছিল আলাদা। তিনি কোন সময়ই কিন্তু রাধার কাছছাড় হন নি।

উত্তাল বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে যখন এভাবে চলেছে কৃষ্ণের রাসলীলা, হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন এক মুনি। একেবারে উলঙ্গ, আবলুস কাঠের মত গায়ের রং, হাড্ডিসার, কোথাও একটু মাংসের নাম-গন্ধ নেই। হাতের নখ থেকে পায়ের নখ বড় হতে হতে যে কত লম্বা হয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ধকধক করে জ্বলছে চোখ দুটো। যেন জোনাকির মত আলো। আর সারা দেহটাই বাঁকা-বাঁকা। দেখলেই মনে হবে, তাঁকে সাপটে ধরে তাঁর দেহটা কে যেন চারদিক থেকে দুমড়ে-চুমড়ে দিয়েছে। আর বয়সের বোধ হয় গাছ-পাথর নেই।

তাঁকে আসতে দেখেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা বন্ধ করে রাধাকে ছেড়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চলন দেখে মুখে কাপড় চেপে যেই ফিকফিক করে হেসে উঠল রাধা, অমনি শ্রীকৃষ্ণ ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন—উ...হু...হেসো না রাধা। রাধাও চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে প্রায় মুখোমুখি আসতেই শ্রীকৃষ্ণ সব ভুলে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিজের বুকে সজোরে চেপে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

অতবড় একজন পুরুষ, যাঁকে সবাই নরদেহধারী ভগবান বলে জানে, সামান্য একজন মানুষের মত তাঁকে ঐভাবে একজন মুনিকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে দেখে রাধা তো গেল ভ্যাবাচাকা খেয়ে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল রাধা। দেখল, যত কাঁদেন শ্রীকৃষ্ণ, তত কাঁদেন সেই সর্বাঙ্গ-বাঁকা মুনি। তাঁর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পিঠ।

তারপর রাধা একসময় দেখল, শ্রীকৃষ্ণের বুকের ওপরই ঢলে পড়লেন মুনি। বেরিয়ে গেল তাঁর প্রাণবায়ু—শেষ নিঃশ্বাস। আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এত ছাই যে, চারদিক যেন ঢেকে গেল তাতে।

আস্তে আস্তে তাঁর মৃতদেহটা শুইয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে সেই মুনির সৎকার করলেন।

সব যখন মিটে গেল, আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ।

কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছে না রাধা।

জিজ্ঞেস করল—কৃষ্ণ, কে এই মুনি? দেখলাম, বিকৃত ঐ মুনিকে দেখে তোমার চোখে জল? কি ব্যাপার, বল না! আর মুনি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন অত ছাই বের হল কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জান রাধা, সে এক কাহিনী।

বহু, বহুকাল আগে প্রলয় হয়ে যাবার পর পৃথিবীতে দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে আবার যখন নতুন করে প্রজাসৃষ্টি করছিলেন, তখন অসিত নামে একজন ভক্তিমান রাজা ছিল। শিবের তপস্যা করে সে পেয়েছিল শিবের মতই এক ছেলে। নাম দেবল। ছেলে যখন বড় হয়ে উঠল অসিত জাঁকজমক করে তার বিয়ে দিল। দেবলও স্ত্রীকে নিয়ে একশ বছর পরমানন্দে ঘর-সংসার করল বটে, কিন্তু সংসারে ঠিক মন বসত না। খুবই ভালবাসত দেবল তার স্ত্রীকে। তবুও একদিন এমন হল, গভীর রাতে স্ত্রী যখন ঘুমিয়ে, বাড়ির আর সব মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে, চুপি চুপি বাড়ি ছেড়ে, সংসারের মায়া কাটিয়ে দেবল চলে গেল একেবারে নিরালা, নির্জন গন্ধমাদন পর্বতে। সেখানে একটা গুহায় বসে শুরু করে দিল তপস্যা। ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী রত্নমালা স্বামীকে দেখতে না পেয়ে শোকে-দুঃখে প্রাণ দিল।

প্রায় হাজার বছর ধরে চলল দেবলের তপস্যা।

একদিন স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা ঘুরতে ঘুরতে এল গন্ধমাদনে।

সুপুরুষ, সুদর্শন দেবলকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। যেমন সুপুরুষ, তপস্যার তেজও তেমনি ফুটে বের হচ্ছে তার দেহ থেকে।

স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা। যারা শুধু দেবতাদেরই আসরে নাচগান করে, মনে ফূর্তি আনে, সামান্য একজন তাপস দেবলকে দেখে, সেই রম্ভা ভুলে গেল স্বর্গের কথা। আপ্রাণ চেষ্টা করল তাঁর তপস্যা ভাঙিয়ে তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধতে।

কিন্তু যখন দেখল, দেবল তাকে উপেক্ষা করে আবার তপস্যায় ডুবে গেল, তখন রম্ভা অপমানে, দুঃখে-রাগে আগুন হয়ে উঠে অভিশাপ দিয়ে বসল দেবলকে। বলল—এত অহঙ্কার তোমার? দেবতারা আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে সাহস পায় না। আর তুমি সামান্য একজন তাপস হয়ে আমাকে অপমান করলে? শোন মুনি, তোমার এই রূপ-যৌবনের অহঙ্কার ধ্বংস হয়ে যাবে। বিকৃত কদাকার হবে তোমার চেহারা, যা দেখলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তপস্যা করে অনেক শক্তি অর্জন করেছ, না? আমি বলছি, ও শক্তি আর তোমার একটুও থাকবে না। বলে রম্ভা চলে গেল।

—সে কি কৃষ্ণ? শুনে চমকে ওঠে রাধা!

—হ্যাঁ, তাই। মৃদু হেসে বললেন শ্রীকৃষ্ণ—মেয়েরা যা চায়, তা যদি না পায়, এই রকমই রেগে যায়। আর তখন মুখে যা আসে, তাই বলে বসে। বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যাই হোক, তারপর শোন।

দেবল যেন ওসব কথা শুনেও শুনতে পেল না। যেমন তপস্যায় শ্রীহরির ধ্যান করছিল, তেমনি করতেই থাকল।

কিছুদিন পর থেকেই দেবলের কিন্তু শুরু হল অস্বস্তি। ধ্যানে যেমন আগে শ্রীহরির সঙ্গে প্রায় মিশে যেত, সে রকমটি যেন আর হচ্ছে না। চোখের সামনে সব সময় পাদপদ্ম ভাসত, তাও আর ভাসে না। তারপর দেখল, অল্পদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য গেল, রূপের সেই জৌলুস গেল। কালো হয়ে গেল চেহারা। সেই সঙ্গে সারা দেহটার আটটা জায়গা গেল তাঁর বেঁকে। এত বছর ধরে তপস্যা করে যে শক্তি সে অর্জন করেছিল তার এতটুকুও আর তখন ছিল না তার মধ্যে।

—এমন কি হয় কৃষ্ণ? বাধা দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে রাধা।

—হয় বৈকি রাধা। মনে যদি কারো খুব কষ্ট হয়, আর সেই কষ্ট থেকে কেউ যদি কোন অভিশাপ দিয়ে বসে, জানবে, তা লাগবেই লাগবে। সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। সেজন্যই তো সকলকেই চেষ্টা করতে হয়, কেউ যেন মনে কোন কষ্ট না পায়, দীর্ঘশ্বাস না ফেলে।

শুনে চুপ করে যায় রাধা। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলতে লাগলেন।—

এতদিনের সাধনা সব গেল দেখে, তার ওপর এই কুরূপ, কদাকার চেহারা—দেবল আর সহ্য করতে না পেরে একদিন উদ্যত হল আত্মহত্যা করতে। কাঠ যোগাড় করে, চিতা সাজিয়ে, আগুন জ্বেলে প্রাণ বিসর্জন দিতে যাবে, সনাতন ভগবান আমি শ্রীকৃষ্ণই সেদিন ওকে বাধা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আজ থেকে তুমি প্রসিদ্ধ হবে অষ্টাবক্র মুনি নামে। এভাবে জীবন নষ্ট করবে কেন? তুমি আমার ভক্ত। আমার ভক্ত কখনো এভাবে মরতে পারে না। তুমি গন্ধমাদন ছেড়ে মলয় পাহাড়ে যাও। সেখানে আবার নতুন করে তপস্যা কর। সময় এলে, আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমার কথা শুনে অষ্টাবক্র মুনি চলে গিয়েছিল মলয় পাহাড়ে। অনাহারে থেকে সুদীর্ঘ ছ হাজার বছর তপস্যা করে, আজ আমারই ইচ্ছায় আমারই কাছে এসেছিল মুনি। আজ যে ছিল ওর মুক্তির দিন। এত বড় ভক্ত কোন ভগবান পায় রাধা? জানি, আজ আমার ভক্ত আমারই গোলোকধামে চলে গেল, তবু ছেড়ে দিতে কি কষ্ট হয় না রাধা? আর ওর শেষ নিঃশ্বাস থেকে অত ছাই কেন বের হল জান? মানুষের শরীর যখন, তখন খিদে থাকে, তেষ্টা থাকে। পেটের আগুন কি নিভে যায়? বাইরের খাবার না পেয়ে সেই আগুন অষ্টাবক্রের ভেতরটাই খেয়ে ছাই করে ফেলেছিল—হাড়ের লেশমাত্রও ছিল না ওর ভেতরে। তাই তো ওর প্রাণবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল অত ছাই।

শুনতে শুনতে রাধার চোখও অষ্টাবক্রের জন্য ছলছল করে উঠল।

অষ্টাবক্রের আর এক কাহিনী

মহামুনি উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতুকে আজ কে না জানে? অমর হয়ে আছেন তিনি আজও তাঁর জ্ঞানের জন্য। অষ্টাবক্র হলেন এই শ্বেতকেতুরই ভাগনে।

মহর্ষি উদ্দালক তাঁর আশ্রমে অনেক ছেলেপুলেকেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন। কত যে শিষ্য ছাত্র সারা জীবন ধরে নাড়াচাড়া করেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কাহোড়ের মত শিষ্য এতদিনে একটাও চোখে পড়ে নি তাঁর। অল্প বয়সেই এমন মেধাবী, বিচক্ষণ—তার ওপর এমন সেবা শুশ্রূষা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উদ্দালক।

তাই যেদিন ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তাঁর থাকার দিন শেষ হল, গুরুদেব উদ্দালক তার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা নেওয়া তো দূরের কথা, নিজের মেয়ে সুজাতার সঙ্গে ঘটা করে বিয়ে দিয়ে কাহোড়কে জামাই করে নিলেন।

গৃহস্থাশ্রমে এসে সুজাতাকে নিয়ে ঘর-সংসার পাতলেন কাহোড়। কিছু শিষ্য ছাত্র জুটল। মনের আনন্দে কাহোড় তাদের বেদ থেকে শুরু করে শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়াতেন। আর সুজাতা থাকতেন গেরস্থালি নিয়ে।

কোন রকমে চলে যাচ্ছিল কাহোড়-সুজাতার সংসার। কিন্তু একদিন সেই সুখের সংসারেও ঘটল বিভ্রাট।

সুজাতা হয়েছেন সন্তান-সম্ভবা। সুন্দর একটি ফুটফুটে ছেলে আসবে ঘরে তাদের। কাহোড়ও মনে মনে খুব খুশি। ছাত্রদের

পড়াশুনা করিয়ে যতটা সম্ভব নজর রাখতেন তিনি সুজাতার দিকে। চেষ্টা করতেন এই সময় কোন কারণে সুজাতার মনে যেন কোন দুঃখ বা কষ্ট না আসে।

দিন ক্রমশই এগিয়ে আসে। তবে তার জন্য খুব একটা চিন্তিত নন কাহোড়। দিনরাত বেদপাঠ, বেদচর্চা, শাস্ত্র অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা নিয়েই কাটান।

একদিন সকালে বসে আছেন কাহোড়। তাঁর চারদিক ঘিরে শিষ্যের দল। একটু তফাতে বসে সুজাতা। হঠাৎ আকাশবাণীর মত শোনালেও সকলেই দেখলেন সুজাতার গর্ভস্থ শিশু, কাহোড়ের ভাবী ছেলে, বলে উঠলেন—'বাবা, আপনি সারারাত বেদপাঠ করেন, আমি শুনেছি। আপনার আশীর্বাদে ইতিমধ্যেই আমার সব বেদ শেখা হয়ে গেছে। আমি লক্ষ্য করছি আপনার বেদপাঠ ঠিক হচ্ছে না, ভুল হচ্ছে।'

শুনে সুজাতা তো অবাক হলেনই, আর সকলেও অবাক। জন্মাতে না জন্মাতেই এত বড় পণ্ডিত, সে কাহোড়ের ভুল ধরছে। জন্মালে না জানি কি হবে। কাহোড়ের কিন্তু সেই মুহূর্তে সে চিন্তা আসে নি। অত ছেলেপুলের সামনে ভুল ধরেছে তাঁর, এমন একটা ছেলে যে, এখনও জন্মায় নি। খুব রেগে গিয়ে দিয়ে বসলেন অভিশাপ—'জন্মাবার আগে যখন মনে মনে তুমি এত বাঁকা, তখন শরীরের আট জায়গায় বাঁকা নিয়ে তুমি জন্মাও।'

রাগের মাথায় অভিশাপ তো দিয়ে বসলেন। তার পরেই মনস্তাপ। কিন্তু মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে গেছে একবার, তখন আর তো কিছু করার নেই

দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, কাহোড়ের সংসারে ততই অনটন বাড়তে লাগল। খুব কষ্টে পড়লেন তিনি। অথচ, এই সময় তাঁর অর্থের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

বিদর্ভরাজ রাজর্ষি জনক। যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি ধার্মিক, আবার তেমনি তাঁর দান-ধ্যান। সুখ্যাতি তাঁর চারদিকে। কাহোড় প্রার্থী হয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলেন জনকরাজের সভায়।

জনকরাজার সভায় ছিলেন এক সভাপণ্ডিত। যিনিই রাজার কাছে প্রার্থী হয়ে যেতেন, তাঁকেই তিনি তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাতেন। আর কুটিল কুটিল প্রশ্নে তাঁদের হারিয়ে দিতেন। তারপর জনকরাজ জানতেন না যে, হেরে যাওয়া পণ্ডিতরা কোথায় যেতেন। সভাপণ্ডিত গোপনে লোক দিয়ে তাঁদের ফেলে দিতেন সমুদ্রের জলে। কাহোড় এসব কিছুই জানতেন না। রাজসভায় প্রার্থী হয়ে যেতেই সভাপণ্ডিতের সঙ্গে হল তাঁর তর্কযুদ্ধ। যথারীতি কূট প্রশ্ন করে সভাপণ্ডিত কাহোড়কে হারিয়ে লোক দিয়ে ফেলে দিলেন সমুদ্রে। কাহোড়ের মৃত্যু হল।

খবর এল সুজাতার কাছে যে তাঁর স্বামী আর ইহজগতে নেই। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে এসে উঠলেন আবার বাবা উদ্দালকের কাছে।

শুনে মহর্ষি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কি আর করার আছে মা? সবই ভাগ্য। তুই আমার কাছে থাক। বলে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন উদ্দালক। তারপর বললেন—আর একটা কথা মা, তোর ছেলেকে যেন কোন দিন এসব কথা শোনাস নি।

যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হল সুজাতার ছেলে। কাহোড়ের সেই অভিশাপ বৃথা যায় নি। সত্যি সত্যিই শরীরের আটটা জায়গা তার বাঁকা। কেমন যেন বিশ্রী। দাদু উদ্দালক তার নামই রাখলেন তাই অষ্টাবক্র। কোলে তুলে নিলেন। সেই থেকে অষ্টাবক্র বড় হয়ে উঠতে লাগলেন উদ্দালকের কোলে-পিঠে। তাঁকেই তিনি মনে করতেন তাঁর বাবা আর শ্বেতকেতুকে তাঁর ভাই। সুজাতাও কোন দিনই অষ্টাবক্রের এই ভুল ভাঙিয়েও দেন নি। কেননা, বাবা উদ্দালকের কাছে কথা দিয়েছিলেন, ছেলের কাছে কোন দিন তিনি কাহোড়ের প্রসঙ্গ তুলবেন না।

দেখতে দেখতে অষ্টাবক্রের বয়স হল বারো বছর। মামা শ্বেতকেতুও প্রায় সমবয়সী। দু-জনের মধ্যে ভাব-ভালবাসাও খুবই।

একদিন অষ্টাবক্র বসে আছেন উদ্দালকের কোলে। তাই দেখে শ্বেতকেতু দৌড়ে এসে তাকে টেনে নামিয়ে দিল উদ্দালকের কোল থেকে। বলল—সব সময় আমার বাবার কোলে বসে থাকিস কেন রে? নিজের বাবার কোলে গিয়ে বসতে পারিস না?

অষ্টাবক্র তো শুনে হতভম্ব। বলে কি শ্বেতকেতু? উদ্দালক তাহলে তাঁর বাবা নন! জন্মে অবধি জেনে আসছেন ইনিই তাঁর বাবা। এমন হঠাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা যে, উদ্দালকও সামাল দেবার সময় পেলেন না।

মুখ ভার করে অষ্টাবক্র মা সুজাতার কাছে এসে বললেন—মা, তুমি এতদিন বল নি কেন যে উনি আমার বাবা নন? আমার বাবা



কোথায়? উনিই-বা আমার কে?

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না সুজাতা। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—বাবা, উনি তোমার দাদু মহর্ষি উদ্দালক, শ্বেতকেতু তোমার মামা।

এই প্রথম অষ্টাবক্র পেলেন তাঁদের আসল পরিচয়।

—আর তোমার বাবা...। বলতে গিয়ে চোখ ছলছল করে উঠল সুজাতার। গলা ভারী হয়ে এল—তোমার বাবা কাহোড়কে জনক রাজার সভাপণ্ডিত তর্কযুদ্ধে হারিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে মেরে ফেলেছেন।

—অ্যাঁ? শুনে চমকে উঠেন অষ্টাবক্র—তর্কযুদ্ধে হারিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মেরেছে!

—হ্যাঁ, বাবা। দুর্ভাগ্য আমাদের। এ ছাড়া আর কি বল। নিজের মনেই নিজের সঙ্গে ছেলেকেও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন সুজাতা।

অষ্টাবক্রও চুপ করে গেলেন।

পরদিনই অষ্টাবক্র নিরালায় ডাকলেন মামা শ্বেতকেতুকে। বললেন—মামা, শুনলাম জনকরাজা নাকি বিশাল শাস্ত্রযজ্ঞ করছেন। চল না। সেখানে যাই, কত দেশ-দেশান্তর থেকে মহা-মহা পণ্ডিতেরা আসেন, তাঁদের দেখাও হবে, আবার আলোচনা শুনে খানিক জ্ঞানও লাভ করা যাবে। চাই কি কিছু রোজগারও যে হবে না, তাই-বা কে বলতে পারে?

অষ্টাবক্রের কথাটা খুবই মনে ধরে গেল শ্বেতকেতুর। বললেন—মন্দ বল নি ভাগ্নে। চল, যাওয়াই যাক।

কাউকে কিছু না বলে মামা-ভাগ্নে দু-জনে এসে হাজির জনক রাজার সভায়।

সভায় ঢুকতে যাবেন কি পথ আটকাল দ্বারী—কোথা যাও।

—সভায়। স্পষ্ট জবাব অষ্টাবক্রের।

—এটা শাস্ত্রবিচারের সভা। ছোটদের ঢোকার অনুমতি নেই।

—কার হুকুম? রাজার? জিজ্ঞেস করেন অষ্টাবক্র।

—না। সভাপণ্ডিতের। বলল দ্বারী।

—ছোটদের কথা কি বললে? আমাদের দেখে? হ্যাঁ, বয়সে আমরা ছোটছেলে ঠিকই তবে তোমাদের সভাপণ্ডিতকে গিয়ে বলতে পার, শাস্ত্রবুদ্ধিতে আমরা ছেলেমানুষ নই।

জনকরাজা সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে গিয়ে বিকৃতদর্শন অষ্টাবক্রের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। একটু অবাকও হলেন এঁটুকু ছেলের মুখে অমন কথা শুনে।

—কি চাও তোমরা? জিজ্ঞেস করলেন জনক।

—শুনলাম আপনি শাস্ত্রযজ্ঞ করছেন। আর আপনার সভাপণ্ডিতও নাকি দারুণ পণ্ডিত। তাই এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে। বললেন অষ্টাবক্র।

—ও চেষ্টা কোরো না বালক। এটা ছেলেমানুষির জায়গা নয়। ফিরে যাও।

—ফিরে যেতে তো আসি নি রাজা। আর ছেলেমানুষিও করতে আসি নি। আপনি নিজে তো একজন শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ। যাচাই করে দেখুন না, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারি কিনা।

শুনে খুবই কৌতূহল জাগল রাজার। বারো বছরের ছেলে। বলে কি? ঠিক করলেন একটু বাজিয়েই দেখবেন। বেশ কয়েকটা প্রশ্নও করলেন। অষ্টাবক্র সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও দিয়ে দিলেন।

জনক বললেন—আর একটা প্রশ্ন করব, যদি ঠিক জবাব দিতে পার, তাহলে আমি বলছি, দ্বারী তোমাদের পথ ছেড়ে দেবে।

—জিজ্ঞেস করুন। অষ্টাবক্র নির্ভীক।

—বল তো, কে চোখ না বুজে ঘুমোয়? জন্মাবার পরেও কেউ টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না? বল তো কার হৃদয় বলে কোন বস্তু নেই? কে দারুণ বেগে বেড়ে ওঠে?

প্রশ্ন শুনে হাসলেন অষ্টাবক্র। বললেন—রাজা, এর প্রত্যেকটারই জবাব দিচ্ছি শুনুন। মাছ চোখ না বুজেই ঘুমোয়। ডিম ভূমিষ্ঠ হয়েও কোন শব্দ তোলে না। পাষাণের কোন হৃদয় নেই। আর নদীর মত এত বেগে কেউ বাড়তে পারে না।

উত্তর শুনে খুবই খুশি হলেন জনক। বললেন—না, একেবারে বালক বলে তোমাদের উপেক্ষা করা যায় না। যাও ভেতরে।

বীরদর্পে মামা-ভাগ্নে সভায় ঢুকলেন। ঢুকেই তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন সভাপণ্ডিতকে।

অষ্টাবক্র সরাসরি বললেন—এই শাস্ত্রবিচারে আমার একটা শর্ত আছে। যে হারবে, তাকে সমুদ্রের জলে ডুবে মরতে হবে।

শর্তে রাজি সভাপণ্ডিত।

শুরু হল তর্কযুদ্ধ। বিশাল সভায় মহা মহা সব পণ্ডিতের দল চুপচাপ বসে।

সভাপণ্ডিত একটা করে কূট প্রশ্ন রাখেন। তাও আ[illegible] অসমাপ্ত। অষ্টাবক্র মুহূর্তে প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ করে তার উত্তর দিয়ে দেন। যত এই রকম ফাঁদে ফেলা প্রশ্ন রাখেন সভাপণ্ডিত, তার সব কটিরই জবাব মুহূর্তে দেন অষ্টাবক্র। দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান পণ্ডিতের দল। হতবাক হয়ে নিজের আসনে বসে থাকেন রাজা জনক।

দেখতে দেখতে মুখ কালো হয়ে যায় সভাপণ্ডিতের। মাথা নিচু হয়ে যায়। সভায় ওঠে অষ্টাবক্রের জয়ধ্বনি।

—তাহলে পণ্ডিত, এবার শর্ত পালন করুন। বলেন অষ্টাবক্র—রাজা আপনার এই পণ্ডিত, প্রার্থী হয়ে যে পণ্ডিতই আপনার কাছে এসেছেন, তাঁদেরই শাস্ত্রের কূট ফাঁদে ফেলে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন। এমন কি আমার বাবা কাহোড়কেও।

শুনে চমকে ওঠেন জনক রাজা—সে কি?

মাথা না তুলেই সভাপণ্ডিত বললেন—আমি বরুণ রাজার ছেলে। সমুদ্রতলে আমার বাবাও রাজা জনকের মত বারো বছর ধরে শাস্ত্রযজ্ঞ করছেন। তা দেখবার জন্যই পণ্ডিতদের সেখানে পাঠিয়েছি।

—তাই নাকি? বিদ্রূপ করে বললেন অষ্টাবক্র—তাহলে রাজা, উনি যখন বরুণ রাজারই ছেলে, তখন বাপের কাছে ফিরে যেতে কোন অসুবিধেই নেই।

বিচক্ষণ রাজা অষ্টাবক্রের কথা অনুমোদন করলেন। সভাপণ্ডিতকে জীবন্ত ফেলে দেওয়া হল সমুদ্রের জলে।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

জনক রাজা দেখলেন, দিব্যদেহধারী হাজার হাজার পণ্ডিত যেন সমুদ্রজল থেকে উঠে এলেন। তাঁর মধ্যে অষ্টাবক্রের বাবা কাহোড়ও। তিনি এগিয়ে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজাও প্রাণ ভরে মঙ্গল কামনা করলেন—অপমৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

অষ্টাবক্রকে বললেন—বাবা, আমারই অভিশাপে তুমি অষ্টাবক্র

হয়ে জন্মেছ। রাগের মাথায় যেদিন তোমাকে আমি অভিসম্পাত দিয়েছিলাম, সেদিন থেকেই আমার মনে একটা কষ্ট ছিল। এখন শোন বাবা, তুমি সমঙ্গা নদীতে গিয়ে স্নান-কর। আবার তোমার দেহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

জনক রাজার কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে মামা-ভাগ্নে আবার ফিরে এলেন নিজেদের আশ্রমে। তারপর বাবা কাহোড়ের পরামর্শ অনুযায়ী অষ্টাবক্র যেই সমঙ্গার জলে স্নান সেরে উঠলেন, অমনি কোথায় গেল সেই বাঁক-চুর!

এখন দেখলে কে বলবে এই সেই অষ্টাবক্র ছেলে।

নামটা কিন্তু তাঁর অষ্টাবক্রই থেকে গেল।

[পাঠকের জানার সুবিধের জন্য অষ্টাবক্র মুনি সম্বন্ধে এই কাহিনীটি 'মহাভারত' থেকে এখানে তুলে দেওয়া হল, 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' বর্ণিত কাহিনীর অনুপূরক হিসেবে]।



ইন্দ্রের বোধোদয়

দেবরাজ ইন্দ্র পুরন্দর। স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের রাজা তিনি। ক্ষমতা অর্জন না করলে কি আর স্বর্গরাজ্যের রাজা হওয়া যায়?

বহু যাগযজ্ঞ করে সত্যি সত্যিই পুরন্দর সে ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির আশীর্বাদ নিয়ে অমরাবতীর প্রাসাদে রত্ন সিংহাসনে বসে ত্রিলোকের ওপর আধিপত্যও শুরু করেছিলেন। কত ক্ষমতা তাঁর! তাঁর কথায় চলছেন দেবতারা। গন্ধর্ব কিন্নররা আলো করে থাকে তাঁর সভা। অপ্সরারা নাচ-গান করে। শচীদেবীকে নিয়ে পুরন্দরের সে বড় সুখের রাজত্ব।

যেখানে সুখ-ভোগ-বিলাসিতা, সেখানেই আসে বিভ্রম।

পুরন্দরেরও হল সেই অবস্থা। রাজপদে বসে আগের সব কথাই তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন .

একদিন দেবসভায় দেবতাদের সঙ্গে বসে আছেন গুরুদেব বৃহস্পতি। প্রতিদিনই থাকেন। দেবতারা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশেষ একটা আসনে বসিয়ে রাখেন। দেবরাজ আসেন। আগে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তারপর গিয়ে বসেন তাঁর সিংহাসনে। দেবসভায় এই নিয়মটাই চলে আসছিল আবহমান কাল।

পুরন্দর সেদিন কিন্তু মনে মনে এমন মদমত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, দেবগুরুকে উপেক্ষা করে গিয়ে বসলেন নিজের সিংহাসনে। শুরু করে দিলেন রাজকাজ। যেন গুরুদেবকে দেখতেই পেলেন না।

মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন দেবগুরু শিষ্যের এই ঔদ্ধত্য দেখে। সেদিন কিছু না বলে সভা ভাঙার পর ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। মনে মনে কিন্তু ঠিক করলেন একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে তাঁকে। পরদিন ভোর হতে না হতেই বৃহস্পতি বাড়ি ছেড়ে এক বনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন।

রাতে বিশ্রাম করতে গিয়ে হঠাৎ পুরন্দরের মনে হল, কাজটা ভাল হয় নি। গুরুকে এভাবে অবহেলা করাটা মোটেই উচিত হয় নি। সকাল হলেই আগে গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

সকাল হতেই ছুটে এলেন পুরন্দর। কিন্তু কোথায় গুরুদেব? বৃহস্পতির স্ত্রী গুরু-মা তারা দেবী বলে দিলেন—কি জানি বাবা, কোথায় যে উনি চলে গেলেন, তা তো বলতে পারব না। শুধু বলে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন পুরন্দর। এবার কি হবে। তিনি রাজা হতে পারেন, কিন্তু সব কিছুর মন্ত্রণাদাতা যে উনি। গুরু স্বর্গরাজ্যে আছেন বলেই তো অসুররা চট করে কিছু করতে সাহস করে না। লক্ষ্মী তাঁর প্রাসাদে অচলা হয়ে আছেন।

মা-বাবা রাগ করলে তবু রক্ষে আছে। কিন্তু শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, প্রাণদাতা গুরু যদি বিরূপ হন তাহলে দুর্গতির আর শেষ থাকে না।

হলও তাই। দেবরাজ্য গেল। ইন্দ্র পালালেন প্রাণভয়ে। দেবতারা নহুষকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন ইন্দ্রের সিংহাসনে, অসুরদের ঠেকাবার জন্য। সিংহাসনে বসে নহুষেরও গেল মাথা ঘুরে। দেবরাজ হিসেবে স্বর্গের সব কিছু ভোগ করার অধিকার যখন তাঁর, তখন শচী কেন তাঁর স্ত্রী হবেন না? ভয়ে শচীদেবী প্রাসাদ ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গুরু-মা তারা দেবীর কাছে। নহুষকেও অবশ্য এর জন্য দারুণ সাজা পেতে হয়েছিল। সে আর এক কাহিনী।

যাই হোক, এদিকে রাজ্য হারিয়ে পুরন্দর উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন যাচ্ছিলেন মন্দাকিনী নদীর পাশ দিয়ে। যেতে যেতে দেখলেন গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যাকে। নদীতে স্নান সেরে নিজের কুটিরে ফিরছিলেন তিনি। তাঁকে দেখে ইন্দ্রের মাথা গেল ঘুরে। মুনি-পত্নী ছিলেন সতী-সাধ্বী। ইন্দ্র করলেন কি, গৌতম যখন বাড়িতে ছিলেন না, সেই সুযোগে গৌতমের ছদ্মবেশ ধরে তার কুটিরে গিয়ে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করলেন। কিন্তু পালাতে না পেরে ধরা পড়ে গেলেন গৌতমের কাছে। গৌতম যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান তো করলেনই ইন্দ্রকে, সেই সঙ্গে তাঁর অভিশাপে ইন্দ্রের সারা দেহে সৃষ্টি হয়ে গেল এক হাজার চোখের মত ঘা। দীর্ঘকাল ইন্দ্র সেই ঘায়ের জ্বালা আর দুর্গন্ধ ভোগ করলেন। তারপর সেই ঘাগুলো তাঁর দেহে চোখ হয়ে রইল। সেই থেকে ইন্দ্র হয়ে গেলেন সহস্রলোচন।

এখানেই কিন্তু থামল না ইন্দ্রের কুকাজ।

দেবরাজ্য ফিরে পাবার জন্য ত্বষ্টার ছেলে মহাযোগী বিশ্বরূপকে দিয়ে সকলের পরামর্শে যজ্ঞ করালেন। আবার সেই বিশ্বরূপকেই প্রাণে মেরে বসলেন। ত্বষ্টা গেলেন দারুণ রেগে। তিনিও ঠিক করলেন পুরন্দরকে খতম করবেন। মনস্থ করে তিনি ব্রহ্মহত্যা নামে এক পিশাচ সৃষ্টি করে পাঠিয়ে দিলেন ইন্দ্রকে চিবিয়ে খাবার জন্য।

পিশাচ ব্রহ্মহত্যা—মিশমিশে কালো, বিকট আকার। পাহাড়ের চুড়োর মত দাঁত বের করা, শিরা ফোলা, হাড়সর্বস্ব, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে ছুটে আসতে লাগল ইন্দ্রকে ধরবার জন্য। দেখেই তো ইন্দ্রের প্রাণ খাঁচাছাড়া। পরিত্রাণ পাবার জন্য দিলেন ছুট। ইন্দ্রও ছোটেন, পেছনে ছোটে ব্রহ্মহত্যা। কত ক্রোশ পথ যে ইন্দ্র ছুটলেন, কত পাহাড় যে ডিঙোলেন, তার ইয়ত্তা নেই। পিছনে ঠিক সেই

ভাবেই তেড়ে আসছে ব্রহ্মহত্যা। ছুটছেন ইন্দ্র, আর মনে মনে ডাকেন গুরুদেবকে—গুরুদেব, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন। বারবার আকুল হয়ে তাঁকে ডাকেন আর ছোটেন। ছুটতে ছুটতে এলেন মানস সরোবরে। খুবই হাঁফিয়ে পড়েছেন তিনি তখন। পেছন ফিরে দেখেন, ব্রহ্মহত্যা এই বুঝি এসে পড়ল তাঁর ঘাড়ের ওপর। আর কোন উপায় নেই দেখে ইন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানস সরোবরে। কাঁপতে কাঁপতে শালুক ফুলের মৃণালের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। এক মনে ডাকতে লাগলেন গুরুদেবকে। ব্রহ্মহত্যাও সরোবরের তীরে একটা গাছে উঠে অপেক্ষা করে রইল সকলের চোখের আড়ালে।

গুরুকে অপমান করার যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন ইন্দ্র, এই ভেবে এবার গুরুদেব বৃহস্পতি বেরিয়ে এলেন তাঁর গোপন স্থান থেকে। মানস সরোবরের তীরে এসে ডাকলেন—পুরন্দর, তুমি কোথায়?

গুরুদেবের গলার স্বর শুনে খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন ইন্দ্র। বললেন—গুরুদেব, আমি মৃণালের ভেতর।

—বেরিয়ে এস, পুরন্দর। ফিরে যাও তোমার রাজ্যে।

মনে মনে ইন্দ্র খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গুরুদেবের কৃপা তাহলে মিলেছে। এই ভেবে মৃণাল থেকে বেরিয়ে যেই এসেছেন পাড়ে, অমনি গাছ থেকে নেমে এল ব্রহ্মহত্যা।

তাকে দেখেই তো ইন্দ্রের মুখ আবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন গুরুদেবের পা—গুরুদেব, বাঁচান। ব্রহ্মহত্যার হাত থেকে আমাকে বাঁচান গুরুদেব।

গুরুদেব যখন দয়া করেছেন, তখন আর কেউই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ব্রহ্মহত্যাও আর কিছু করতে না পেরে নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে মরল।

এবার নিশ্চিন্তে দেবরাজ পুরন্দর ফিরে গেলেন স্বর্গরাজ্যে। গিয়ে দেখেন, অমন যে অমরাবতী, অমন যে প্রাসাদ, তার কি বিশ্রী দশা হয়েছে। অসুররা যা নয় তাই করে সব সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়ে গেছে। সেই প্রাসাদ, সেই বাগান, সেই কুঞ্জবন, সেই উপবন একেবারে তছনছ। এরকম পরিবেশে কি থাকা যায়? দেবরাজ বলে কথা। তাঁর উপযোগী প্রাসাদ, আমোদ-প্রমোদের উদ্যান, এসব না থাকলে কি দেবরাজের মর্যাদা থাকে?

ডেকে পাঠালেন দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মাকে। আদেশ হল—মনোমত প্রাসাদ তৈরি করে দাও, যাতে আমি থাকতে পারি।

ইন্দ্রের আদেশ। বিশ্বকর্মাও লেগে পড়লেন কাজে। দিন-রাত পরিশ্রম করে সুন্দর এক প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন। যেখানে যা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে তা সবই বানিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখে পুরন্দরের মন ভরল না। বিশ্বকর্মাকে ডেকে খুব তিরস্কার করলেন তিনি। বললেন—এই তোমার কাজ? যা-তা একটা করে দিলেই হল? শোন, বিশ্বকর্মা, যতদিন সব কিছু আমার ঠিক মনের মত না হবে, ততদিন আমি প্রাসাদেই ঢুকব না।

মহা-মুস্কিলে পড়লেন বিশ্বকর্মা। দেব-স্থপতি তিনি। যথেষ্ট সুনাম তাঁর। তাঁর যা বিদ্যে-বুদ্ধি ছিল, তাই দিয়ে আবার নতুন করে বনালেন সব কিছু। এবারও পুরন্দরের মনোমত হল না। তার পর থেকে যতবারই করেন, ততবারই পুরন্দর দেন বাতিল করে। বিশ্বকর্মারও ছুটি মেলে না, আবার দেবরাজের মনও পান না।

শেষে খুবই চিন্তায় পড়লেন বিশ্বকর্মা। আর কি ভাবে তিনি প্রাসাদকে সাজাবেন, যাতে পুরন্দরের মনে ধরে। আহার গেল, নিদ্রা গেল, বিশ্রাম গেল—চিন্তায় চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন বিশ্বকর্মা। এ দিকে নিয়ত পুরন্দরের হুমকি। মনে মনে বিশ্বকর্মা ডাকেন ব্রহ্মাকে—ভগবান, আমার ছুটি কি মিলবে না?

দেখে-শুনে ব্রহ্মারও মনে কষ্ট হল। বৈকুণ্ঠে গিয়ে ব্রহ্মা বসলেন শ্রীহরির সঙ্গে যুক্তি করতে—বিশ্বকর্মা যে পুরন্দরের পাল্লায় পড়ে মরতে বসল। একটা উপায় তো করতে হয়।

শুনে শ্রীহরি বললেন—নিশ্চয়ই। দেবরাজ হয়ে এই ধরনের আবদার তো ঠিক নয়। আচ্ছা ব্রহ্মা, আমি দেখছি, তুমি যাও।

পুরন্দর স্বর্গলোকে দাঁড়িয়ে তদ্বির তদারক করছেন বিশ্বকর্মার কাজ। হঠাৎ দেখলেন সুন্দর দেখতে অল্পবয়সী এক কিশোর ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন সেখানে। পরনে সাদা পোশাক। কপালে চন্দনের তিলক, হাতে ছাতা-লাঠি।

কিশোর হলেও ব্রাহ্মণ দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম জানালেন ইন্দ্র। যথোচিত সমাদরও করলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন—বলুন ব্রাহ্মণ, কি মনে করে এখানে এসেছেন?

ব্রাহ্মণ কিশোর বললেন—শুনলাম বিশ্বকর্মা নাকি এক অত্যাশ্চর্য পুরী বানাচ্ছেন আপনার জন্য, তাই দেখার বড় ইচ্ছে হল। দেখতে এলাম।

—ওঃ, এই কথা। বেশ তো চলুন, ঘুরে ঘুরে দেখবেন। বলে পুরন্দর তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন।

দেখার পর ব্রাহ্মণ বললেন—সত্যিই অপরূপ। আশ্চর্য। কোন ইন্দ্র যা পারে নি, তা তুমি করছ! তা পুরন্দর, কবে শেষ হবে?

ব্রাহ্মণ কিশোরের কথা শুনে মুচকি হাসলেন পুরন্দর। বললেন—ব্রাহ্মণ, তোমার বয়স তো দেখছি খুবই কম। তুমি যে বললে, কোন ইন্দ্র যা পারে নি, আমি তাই করছি—তা কজন ইন্দ্রকে তুমি দেখেছ?

পুরন্দরের কথায় মিটিমিটি হাসতে হাসতে ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন—পুরন্দর, তোমার বাবা তো কশ্যপ, তাই না? আর মরীচি? তিনি তো তোমার ঠাকুরদা, তাই না? তোমার ঠাকুরদার বাবা তো ব্রহ্মা, তাই তো? পুরন্দর, এঁদের সকলকেই আমি জানি। ব্রহ্মাকে যিনি রক্ষা করেন, সেই বিষ্ণু নারায়ণ, যাঁকে দেখবার জন্য তোমরা ছটফট কর, তাঁর সঙ্গে আবার আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

শুনতে শুনতে পুরন্দরের চোখ বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসে। মনে মনে ভাবেন, কেউ আবার ছলনা করতে এলেন না তো।

—তুমি প্রলয় দেখেছ পুরন্দর? আমি দেখেছি। প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি দেখেছ? দেখ নি তো! আমি কিন্তু দেখেছি। কতগুলো ব্রহ্মাণ্ড আছে জানো? জান না তো। আমি কিন্তু বিলক্ষণ জানি।

বলতে বলতে ব্রাহ্মণ হঠাৎ মুখ নিচু করে কি যেন দেখে হো…হো করে হেসে উঠলেন। পুরন্দরও মুখ নিচু করে দেখলেন এক সার পিঁপড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন—ব্রাহ্মণ, অমন করে হঠাৎ হেসে উঠলেন কেন ঐ পিঁপড়ের সারি দেখে?

—ঠিক ধরেছ পুরন্দর। বললেন ব্রাহ্মণ—ঐ পিঁপড়ের সার দেখেই হাসি এল। জান, ওরা কারা? ওরা সকলেই এক সময় তোমারই মত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্র ছিল। যেমন কর্ম করেছে, এখন তেমনি তার ফল ভোগ করছে।

এবার আর পুরন্দর ঠিক থাকতে পারলেন না। দু-হাতজোড় করে

হাঁটু মুড়ে কিশোর ব্রাহ্মণের সামনে বসে বলতে শুরু করলেন—আমাকে ছলনা করবেন না। দয়া করে বলুন আপনি কে। আপনিই কি সেই...

পুরন্দরের কথা শেষ হতে না হতেই সেখানে এসে হাজির হলেন এক বৃদ্ধ। নিঃসন্দেহে এক মহাযোগী। বুকে এক বুক লোম। তারই মাঝে আবার কিছু কিছু লোম টেনে তোলা।

ব্রাহ্মণবেশী ভগবান জিজ্ঞেস করলেন—কে আপনি? কি আপনার পরিচয়?

মহাযোগী বললেন—আমি লোমশ মুনি। শ্রীহরির দাস। জন্মাবধি জানি, আমাদের পরমায়ু খুবই অল্প। তাই সংসার করি নি, ভিক্ষে করে দিন কাটাই। বিষয়-আশয় নিয়ে আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই নি। এখানে এসেছি একবার ইন্দ্রকে দেখতে। এই যে ছেঁড়া লোম দেখছেন, যখনই এক জন করে ইন্দ্রের পতন হয়েছে, তখনই বুক থেকে আমার একটা করে লোম ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

বলে লোমশ মুনি আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন কৈলাসের দিকে।

লোমশ মুনির কথা শুনতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন পুরন্দর। তারপর আবার সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখেন, ব্রাহ্মণ কিশোরও আর নেই সেখানে।

জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল পুরন্দরের। বিশ্বকর্মাকে ডেকে তাঁকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে ছুটি দিলেন। সেই সঙ্গে নিজের ছেলেকে ডেকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেও ছুটি নিয়ে নিলেন।

মনে তাঁর তখন প্রচণ্ড ধিক্কার। ধিক্কার বিষয়-লালসার জন্য। ছিঃ ছিঃ, এতদিন কেন তিনি এটা বুঝতে পারেন নি যে, বিষয় কেবল লালসা বাড়ায়। লালসা থেকেই যত কিছু অপকর্ম। জীবনটা হয়ত সুখে কাটল, কিন্তু তারপর? ভেবে শিউরে উঠলেন পুরন্দর, পরের জন্মে পিঁপড়ে বা শূকর হয়ে জন্মাবেন না তো!

শ্রীকৃষ্ণ ও শৃগাল সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে বহাল তবিয়তে প্রায় রাজা হয়ে বসেছেন।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজসভার নাম হল সুধর্মা।

একদিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বসে সুধর্মায়। এলেন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে দেখলেই মনে হয়, বেশ তেজস্বী।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যথোচিত সমাদর জানিয়ে বললেন—কোথা থেকে কি কারণে এখানে আসা হয়েছে ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ নর-রূপী সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেখিয়ে বললেন—আমার নিজের কোন কথা বলতে আসি নি। এক শৃগাল যা বলেছে, সেই কথাগুলোই আপনাকে শোনাতে এসেছি।

—শৃগাল? শৃগাল বলেছে? কৌতূহল দেখালেন শ্রীকৃষ্ণ।

—হ্যাঁ। এক শৃগালরাজ। সে বলছে, দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে যে বসুদেব-পুত্র বাসুদেব রয়েছেন, তিনি ভণ্ড, প্রতারক। সকলে তাঁকে ভগবান-জ্ঞানে পুজো করে ভুল করে। গোপের ছেলে সে, ভারি কুটিল। শঠতা করে দুর্বল রাজাদের মেরেছে, শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, নরককে মেরেছে। সে কি যুদ্ধ করেছে কারো সঙ্গে? কৌশলে খুন করেছে মাত্র। আর সেই খুনীকে কিনা সকলে পুজো করে! এই বলে একটু থেমে ব্রাহ্মণ আরও বললেন—শৃগালরাজা বলে বেড়াচ্ছে, সে-ই হল আসল বৈকুণ্ঠের অধিপতি স্বয়ং ভগবান। ত্রিভুবনে তার সমান আর কেউ নেই! সেই জালিয়াত শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রমাণ নিতে আসে, আচ্ছা করে টের পাইয়ে দেবে। বলে থামলেন ব্রাহ্মণ।

শুনে সভায় যাঁরা ছিলেন, সকলেই তো প্রায় হই-হই করে উঠলেন। মুচকি মুচকি হাসলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বললেন—চল ব্রাহ্মণ, ঐ শৃগালরাজের সঙ্গে একটু মোলাকাত করে আসা যাক।

সকাল হতেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন শুনে শৃগালরাজও তার দলবল নিয়ে দাঁড়াল পথরোধ করে।

শ্রীকৃষ্ণ এসেই প্রথমে নিলেন তার কুশল-বার্তা। খুব কাছে এগিয়ে এল শৃগালরাজ। চুপি চুপি বলল—প্রভু, আপনি কি আমায় চিনতে পেরেছেন? আমি বৈকুণ্ঠে আপনার দ্বারী সুভদ্র। মা লক্ষ্মীর অভিশাপে শৃগাল হয়ে বড় কষ্টে রয়েছি। আপনার সুদর্শন চক্রে আমার এ জীবন শেষ করে দিন যাতে আমি আবার বৈকুণ্ঠে যেতে পারি।

শুনে কৃষ্ণের মনে দুঃখ হল। বললেন—তা সুভদ্র, তুমি আমার সম্বন্ধে অত সব কটূক্তি করেছ কেন?

শৃগালরাজ বলল—আপনার দেখা পাব বলে। যোগীরা সাধ্য-সাধনা করেও আপনার দেখা পায় না প্রভু। কটু কথা বলে রাগিয়ে তুলতে পেরেছে বলেই তো আপনি এলেন। এখন আমাকে দয়া করুন।

—আমি যে যুদ্ধ করতে এসেছি। আগে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখাও।

বাধ্য হয়েই শৃগালরাজকে অস্ত্র ধরতে হল। শুরু করতে হল সংগ্রাম। যে অস্ত্রই ছোঁড়ে শৃগালরাজ, সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। মুষল, পরশুবাণ—শৃগালরাজার সব অস্ত্র শেষ।

শেষে বলল—প্রভু, স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে কি অস্ত্র-যুদ্ধ সম্ভব? আপনি করুণাবতার। আমায় কৃপা করুন। আমার এই জন্ম থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। বৈকুণ্ঠে আবার আমি যে আপনার দ্বারী সুভদ্র হয়ে থাকতে চাই।

শুনে শ্রীকৃষ্ণের বুক দুলে উঠল। চোখে এল ফোঁটা ফোঁটা জল। আহা, ভক্তের কি আকুতি!

মুক্তি পেল শৃগাল। দিব্যদেহ ধারণ করে সে আবার চলে গেল বৈকুণ্ঠে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু জলে তৈরি হয়ে গেল পবিত্র এক সরোবর—নাম বিন্দু-সরোবর।

দর্পহারী

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আর এক নাম হল—দর্পহারী ভগবান। তাঁর প্রিয়জন যাঁরা, তাঁদের সকলেরই মনের অভিলাষ তিনি পূরণ করেন। অতুল শক্তি আর ঐশ্বর্য দিয়ে ভরিয়ে দেন তাঁদের। কিন্তু একটা জিনিস তিনি কোন মতেই সহ্য করতে পারেন না—তা হল অহঙ্কার, দর্প। শক্তি আছে বলেই যে তা নিয়ে অহঙ্কার করতে হবে, যাকে তাকে ক্ষমতা দেখিয়ে বাহবা কুড়োতে হবে, দর্পহারী ভগবান এটা কিন্তু আদৌ পছন্দ করেন না। শক্তিমান যদি সংযত হয়ে না রইল, যেখানে-সেখানে শক্তি ফলাতে লাগল, তাহলে কি বিশ্বের মঙ্গল হয়? না, নিজের ভাল হয়? তা কখনই হতে পারে না। তাই যখনই কেউ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেকেই সর্বশক্তিমান ভেবে কিছু করে বসে, দর্পহারী অলক্ষ্যে থেকে তাকে ঠিক উচিত শিক্ষা দিয়ে দেন।

ব্রহ্মা এবং শিব দু-জনেই তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান। দিন-রাত তাঁরই স্তব-স্তুতি, আরাধনা করে পেয়েছেন সেই অতুল শক্তি। ব্রহ্মা পেয়েছিলেন সৃষ্টির ক্ষমতা আর শিব পেয়েছিলেন সকলের মঙ্গল, সেই সঙ্গে সকলকে সংহার করার ক্ষমতা। এ কি কোন সামান্য ক্ষমতা? এই ক্ষমতা শিব পেয়েছিলেন বলেই সবাই তাঁকে পূজা করে, শ্রদ্ধা জানায়।

কিন্তু ক্ষমতার এমন মজা যে, তার স্রষ্টাকেই সে ভুলে যায়। আপনা থেকে কখন যে সে মত্ত হয়ে ওঠে, নিজেও টের পায় না। তা নইলে শিবের মত অত বড় মহাযোগীর এমন দুরবস্থা হবে কেন।

মহাযোগী শিব। এমনিতে তাঁর কোন অহঙ্কার নেই। কারো কাছে অযথা তিনি কখনো ক্ষমতা দেখিয়ে আস্ফালনও করেন না। কিন্তু ঐ যে বললাম, কোন সুড়ঙ্গপথ ধরে ক্ষমতা যে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, তার টের পাওয়া ভারি কঠিন। তার ফলে, এক সময় অমন যে শ্রীহরিভক্ত শিব, তিনিই-বা কেমন করে ভুলে গেলেন সব কিছু? নিজেকেই মনে করতে শুরু করলেন ঈশ্বর?

দর্পহারী ভগবানের চোখ তো আর এড়াবার নয়। লক্ষ্য তাঁর ঠিকই পড়েছে। শুধু অপেক্ষা করে আছেন, সুযোগ একবার আসুক, তারপর তাঁর প্রিয় ভক্ত পঞ্চাননকে আবার ঠিক করে দেবেন।

সেই সুযোগের জন্য দর্পহারীকে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না।

স্বর্গরাজ্যের অধিকার নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের তখন টুকটাক যুদ্ধ লেগেই থাকত। দেবতারা এমনিতেই ভগবানের প্রিয়পাত্র। তাই তাঁদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হতো না অসুরদের। তাছাড়া দেবতারা আবার অমর।

অসুররাও কিন্তু কম যেত না। মাঝে মাঝে তারাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের আরাধনা করে, তাদের তোয়াজ করে আদায় করে নিত মনের মত বর। আর সেই বরে বলীয়ান হয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ত স্বর্গরাজ্যে। ছারখার করে দিত সব কিছু। এমন আশ্চর্য যে, অসুররা যে বরই চাইত, তাদের তোয়াজে ভুলে গিয়ে, নিজেদের জাহির করার জন্য একেবারে অসম্ভব না হলে, দেবতারা তা দিয়ে দিতেন। তার জন্য পরে তাঁদের কম খেসারত দিতে হতো না। তবু ঐ যে, ক্ষমতা দেখানোর লোভ!

বৃক নামে এক অসুর একবার নির্জনে বসে শিবের আরাধনা শুরু করল। সে জানত, সবচেয়ে শিবের শক্তি বেশি। ইচ্ছে করলে তিনি অনেক কিছুই দিতে পারেন।

বৃকাসুরের খুব ইচ্ছা অমরত্ব বর আদায় করার। যদিও সে জানত ও বর মহাদেব তাকে কোন মতেই দেবেন না। যদি অমরত্ব একান্তই না দেন, তবে কিভাবে ঐ একই জিনিস আদায় করবে, মনে মনে বৃক তাও ঠিক করে শিবের আরাধনা করতে বসল।

পুরো এক বছর বৃক কঠোর তপস্যা করল।

কৈলাসে শিব আর চুপ করে থাকতে না পেরে সোজা এলেন বৃকাসুরের কাছে। বললেন—বৃক তোমার তপস্যায় আমি খুব খুশি হয়েছি। বল তোমার কি চাই? আমি দেব।

শিব এসেছেন। বর দিতে চাইছেন। শুনেও বৃক যেন শুনতে পেল না। আগের মতই চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল।

শিব আবার বললেন—বাবা বৃক, ওঠ। বর নাও

এবার চোখ খুলল বৃক। ভক্ত চোখ মেলে তাকিয়েছে দেখে মনে মনে খুবই খুশি হলেন শিব। আবার বললেন—বৃক, তোমার পুজোয় সত্যিই আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, কি তোমার চাই?

বৃক বলল—ঠাকুর, আমি যা চাইব, তা কি তুমি দিতে পারবে?

—কেন, পারব না কেন? বললেন শিব—শুধু অমরত্বটাই দিতে পারি না। তাছাড়া ত্রিভুবনে এমন কি আছে যে ঈশ্বর হয়ে আমি তা দিতে পারব না।

বৃক ভাল মানুষের মত বলল—না, না ঠাকুর। অমরত্ব নামে ঐ বাজে জিনিস আমি চাই না। আর তার জন্য আমি তপস্যাও করছি না।

—তাহলে তুমি কি চাইছ, বল?

—যা চইব, তা ঠিক দেবে তো ঠাকুর।

—তুমি চাও। আমি নিশ্চয়ই দেব।

—তাহলে ঠাকুর, বলল বৃক—আমাকে এই বর দাও যে, আমি যার মাথায় হাত দেব, সে সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে যাবে।

—ওঃ! এই বর। তার জন্য এত তপস্যা? বললেন শিব—বেশ, আমি তোমাকে এই বরই দিলুম। তুমি যার মাথায় হাত দেবে সে তক্ষুণি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

দর্পহারী ভগবান শিবের কাণ্ড দেখে মনে মনে একচোট খুব হেসে নিলেন।

বর পেয়ে বৃক এবার দাঁড়িয়ে উঠল। নিজের বুদ্ধিকে নিজেই একবার তারিফ করে নিল। অমরত্ব দেবে না? দেখ, ঘুরিয়ে কেমন ওটাই আদায় করলাম।

শিবও বর দিয়ে পিছু ফিরলেন খুশি মনে।

বৃকাসুর ডাকল—ও ঠাকুর।

ডাক শুনে থামলেন শিব। বললেন—কি বলছ বৃক? আর কিছু চাও নাকি?

বৃকাসুর বলল—না না, আর কিছু চাই না। শুধু জিজ্ঞেস করছি, বরটা ঠিক দিয়েছ তো?

—কেন? ও কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? সন্দেহ হচ্ছে।

—সন্দেহ একটু হয় বৈকি। ভুলিয়ে দিয়ে চলে যাও। তারপর মরি আমরা।

—না বৃক, তুমি আমার ভক্ত। তোমাকে কি আমি ঠকাতে পারি? পরীক্ষা করে দেখো।

—এখানে এখন কার ওপর পরীক্ষা করে যাচাই করব ঠাকুর? আছ তো একমাত্র তুমি। তাহলে দাঁড়াও, তোমার ওপরেই যাচাইটা করে নিই। বলে শিবের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল বৃক।

ভয়ে দুরুদুরু করে উঠল শিবের বুক। সর্বনাশ!

—বৃক, আমি তোমাকে ঠকাই নি, বিশ্বাস কর। বলতে বলতে পিছু হাঁটেন শিব।

কিন্তু বৃক মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল, বর পেয়ে প্রথমেই এক হাত নেবে শিবের ওপর। তারপর একে একে সব কটাকে মেরে বসবে স্বর্গ-সিংহাসনে। তাই শিব যত পেছোন, বৃক তত এগিয়ে আসতে থাকে। বলে—পালাচ্ছ কেন, দাঁড়াও।

বেগতিক দেখে শিব এবার উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ে দেন। বিশাল শরীর নিয়ে দৌড়তে গিয়ে, শিবের কোমরের বাগছাল গেল খুলে। হাতের ডমরু, ত্রিশূল গেল হাত থেকে খসে। মাথার ওপর ভাল ভাবে জড়ানো জটা খুলে এলিয়ে পড়ল। কোন দিকে আর খেয়াল নেই তখন শিবের। প্রাণভয়ে পরিত্রাহি ছোটেন শিব, পেছনে ছুটে আসে বৃকাসুর।

ছুটতে ছুটতে প্রায় উলঙ্গ শিব ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে হাজির হলেন বৈকুণ্ঠে। সিংহাসনে বসে তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীহরি নারায়ণ। শিব গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন সেখানে—ঠাকুর, বাঁচাও।

যদিও তিনি সবই জানেন, তবুও শিবের কাছ থেকে সব জেনে নিলেন। তারপর বললেন—থাক এখানে, দেখি কি করা যায়।

এই বলে, শ্রীহরি নারায়ণ নিলেন এক কৌশল।

বৈকুণ্ঠে ঢোকার মুখেই, এক বৃদ্ধার বেশ ধরে বসে রইলেন। বৃকাসুর কাছাকাছি আসতেই তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—অমন করে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ গো তুমি?

বৃকাসুর বলল—শিব আমায় বর দিয়েছে, যার মাথায় হাত দেব, সে-ই ছাই হয়ে যাবে। তাই আগেই শিবকে ছাই করতে গেলাম, সে পালিয়ে এল এখানে।

শুনে হো হো হেসে উঠল বৃদ্ধা।

—তুমিও বিশ্বাস করে নিলে, মাথায় হাত দিলেই ছাই হয়ে যাবে? তা কখনো হয় নাকি?

—কেন হয় না? শিব বলে কথা। তার বর কখনো মিথ্যে হয় নাকি? বলল বৃক।

—সাধে কি তোমাদের বলে মাথামোটা অসুর? ওদের ছলচাতুরি যদি তোমরা বুঝতেই পারতে, তাহলে তোমরাই তো দেবতা হয়ে ত্রিলোক শাসন করতে। একেবারে ঠকিয়েছে তোমাকে। বিশ্বাস না হয়, নিজের মাথাতেই হাত দিয়ে দেখ না, কেমন ছাই হয়ে যাও। এতই সোজা!

বৃদ্ধার কথাগুলো শুনে এবার সত্যি সত্যিই বৃকাসুরের মনে কেমন সন্দেহ জাগল—সত্যি বলছ, আমায় ঠকিয়েছে? এ রকম হয় না?

—বললাম তো। মাথায় হাত দিলেই ছাই হয়ে যাওয়া এতই সোজা? কখনো তা হয় না। হাত দাও না নিজের মাথায়। তাহলেই বুঝতে পারবে, তোমায় শিব কেমন ঠকিয়েছে।

বৃকাসুরও আর আগুপিছু না ভেবে নিজের মাথাতেই নিজে হাত দিয়ে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে গেল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শিব। মনে মনে খুব লজ্জাও পেলেন। বৈকুণ্ঠ থেকে কৈলাসে ফেরার পথে নিজের মনেই আওড়াতে লাগলেন—আর যদি কাউকে কখনো বর দিই! ভগবান শ্রীহরি দয়া না করলে আজ প্রাণটাই যেতে বসেছিল!

দর্পহারীর কাজও শেষ হল।



ধন্বন্তরি-মনসা সংবাদ

দেবতা ধন্বন্তরির অসীম দক্ষতা। হেন মন্ত্র-তন্ত্র নেই যা তাঁর অজানা। অশ্বিনীকুমার দু-ভাই দেববৈদ্য, সুচিকিৎসক বলে সকলের কাছেই পরিচিত, সমাদরও তাঁর যথেষ্ট। ধন্বন্তরিও সেদিক থেকে আবার কিছু কম যান না।

স্বর্গরাজ্য ফিরে পাবার জন্য বিষ্ণুর নির্দেশে অসুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অমৃত খাইয়ে তাদেরও অমর করে দেবার লোভ দেখিয়ে দেবতারা যখন ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন এই ধন্বন্তরিই সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন অমৃতের হাঁড়ি নিয়ে। ফলে দেব-সমাজে তাঁর কদরই আলাদা। কথায় বলে, ধন্বন্তরি। যত কঠিন আর দুরারোগ্য ব্যাধিই আসুক না কেন 'মার...মার' করে, একবার যদি ধন্বন্তরি তাকান তার দিকে, তখনই তার হাঁক-ডাক থেমে যাবে।

এহেন বেদবিদ্, চিকিৎসক, বৈদ্য ধন্বন্তরি। সুতরাং তাঁর মর্যাদা একটু আলাদা হবে বৈকি। অবশ্য এই গাছগাছড়া আর আয়ুর্বেদ বিদ্যেটা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বিনতার ছেলে, বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের কাছ থেকে। হাজার হাজার শিষ্য তাঁর।

একদিন শিষ্যদের নিয়ে ধন্বন্তরি চলেছেন মহা-সমারোহে কৈলাসের দিকে শিবের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ পথের মাঝে, তক্ষক সাপ কোথায় ছিল, তেড়ে এল ফোঁস...ফোঁস করে ফণা তুলে। তক্ষকের আস্ফালন দেখে থমকে দাঁড়ালেন ধন্বন্তরি। দাঁড়াল তাঁর শিষ্যরাও। তক্ষক কাছে আসতেই শিষ্যরা উঠল বিদ্রূপ করে—একে তো হিলহিলে সাপ, তার ওপর আবার তর্জন-গর্জন দেখ।

শুনে, রেগে তক্ষক ছোবল মেরে বিষ ঢালতে যাবে আর কি, একজন মাত্র শিষ্য খপ করে তাকে ধরে দিল বিষ দাঁত ভেঙে। তারপর হাট্টা করে বলল—বড় আস্ফালন, না? এবার? যা। বলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

মাথা হেঁট করে তক্ষক ফিরে এল। নাগরাজ বাসুকির কানে খবর যেতেই সে তো গেল দারুণ রেগে। কি, এত বড় স্পর্ধা! তার দিগ্বিজয়ী ছেলের এই দুরবস্থা যারা করেছে, কোন মতেই তাদের ক্ষমা করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল আর সব বীর নাগদের। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা।

ছুটে এল পুণ্ডরীক, দ্রোণ, ধনঞ্জয়, কর্কট, কালিয়া। সেই সঙ্গে এসে জড়ো হল হাজার হাজার বিষধর সাপ।

নাগরাজ হুকুম দিল—তক্ষকের এই অবস্থা যারা করেছে, তাদের কোন রেহাই নেই। যাও, তাদের সব খতম করে এস।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল নাগের দল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে। নিশ্বাসে তাদের বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাসে। বাতাস হয়ে উঠতে লাগল মেঘের মত কালো আর ভারী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে ঘিরে ধরল ধন্বন্তরির শিষ্যদের।

পরিস্থিতি যে এখানে এসে দাঁড়াতে পারে, শিষ্যরা তা ভাবতেও পারে নি। সাপদের বিষ-নিশ্বাসে শিষ্যের দল লুটিয়ে পড়তে লাগল জ্ঞান হারিয়ে। ধন্বন্তরি দেখলেন, এ তো বেশ হল। কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া মাথায় উঠল। গুরুদেব গরুড়কে স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরি করে কোন রকমে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন শিষ্যদের। তারপর, যত সাপ এসেছিল ফুস-মন্তর দিয়ে নিমেষে তাদের সব বিষহীন করে দিলেন। বিষ হারিয়ে মরে পড়ে রইল তারা যে যেখানে ছিল, সেভাবেই।

খবর গেল বাসুকির কাছে। মহা চিন্তায় পড়ল বাসুকি। শেষে কি ধন্বন্তরির হাতে নির্বংশ হতে হবে? এখন উপায়?

সর্বশাস্ত্রবিদ আস্তিক হল বাসুকির ভাগ্নে। জরৎকারু মুনির ছেলে। বাসুকির বোন মনসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। মনসাকে ছেড়ে জরৎকারু তপস্যা করতে চলে গেলে আস্তিককে দাদা বাসুকির কাছে রেখে মনসাও জপ-তপ করে খুবই শক্তিময়ী হয়ে উঠেছিল। মামাদের অবস্থা দেখে আস্তিকের মনে খুব কষ্ট হল। মামা বাসুকিকে বলল—মামা, তুমি মাকে ডাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাসুকিও সঙ্গে সঙ্গে মনসাকে স্মরণ করতেই এসে হাজির হলেন মনসা। তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, বাঁচিয়ে তুললেন নিজের শক্তি দিয়ে ভাইদের আর তাদের ছেলেদের। তারপর এমন এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলেন, যে শিষ্যরা আবার সবাই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর ধন্বন্তরিকে উপহাস করে মনসা বললেন—আমি জানি তুমি গরুড়ের শিষ্য। বড় দম্ভ তোমার। মনে করেছ তুমি সব কিছু শিখে ফেলেছ, জেনে ফেলেছ। আমাদের গুরু হলেন শিব। তোমার কত জারিজুরি আছে, এবার দেখাও।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন ধন্বন্তরি।

মনসাদেবী ইতিমধ্যে সরোবর থেকে একটা পদ্ম তুলে, তাতে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিলেন ধন্বন্তরির দিকে। ধন্বন্তরি দেখলেন, যেন একটা হিলহিলে আগুন ছুটে আসছে তাঁর দিকে। মুহূর্তে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে ঠেকালেন তিনি। তারপর মনসাদেবী বিষধর এক সাপকে আরো বিষধর করে ছুঁড়ে দিলেন ধন্বন্তরির দিকে, তাকেও আটকালেন তিনি। এরপর মনসা ধন্বন্তরিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে বসলেন হঠাৎ এক শক্তি (অস্ত্র)। জ্বলন্ত সেই শক্তিকে ছুটে আসতে দেখে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ধন্বন্তরিও তাকে দুর্বল করে দিলেন বিষ্ণুশক্তি দিয়ে। অমন শক্তিকে নিষ্ফল হতে দেখে মনসাদেবী ছুঁড়লেন নাগপাশ। হাজার হাজার নাগ এসে তখন ধন্বন্তরিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, একেবারে অসহায় করে দিল। দেখে হো হো করে মনসাদেবী হেসে উঠে বললেন—কি হল ধন্বন্তরি? এবার বাঁচাও নিজেকে।

মৃত্যু অবধারিত জেনে ধন্বন্তরি তখন একমনে স্মরণ করতে লাগলেন গুরুদেব গরুড়কে। ডাক শুনে নিমেষের মধ্যে বাতাসে ঝড় তুলে গরুড় এসে হাজির হলেন সেখানে। তাঁকে দেখামাত্রই ভয়ে সাপেরা ধন্বন্তরির বাঁধন আলগা করে প্রাণ নিয়ে পালাতে উদ্যত হল, আর গরুড়ও মহানন্দে টপাটপ করে ধরে মুখে পুরতে লাগলেন তাদের। কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় গেল পাশ, কোথায় গেল নাগের দল।

দেখে মনসার মাথা গেল গরম হয়ে।

আর যুদ্ধ-টুদ্ধ নয়, ধন্বন্তরিকে এবার উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

মনসাদেবী হাতে তুলে নিলেন শিবের অব্যর্থ শূল।

ধন্বন্তরির দিকে শূল তুলতে দেখেই সেখানে ছুটে এলেন স্বয়ং ব্রহ্মা আর শিব।

এতক্ষণ তাঁরা আড়ালেই ছিলেন। দেখছিলেন রগড়। এবার দেখলেন মনসা যদি ঐ শূল একবার ছোঁড়েন, ধন্বন্তরি কেন, ত্রিভুবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হঠাৎ শিব আর ব্রহ্মাকে দেখে শূল ছোঁড়া বন্ধ রেখে মনসা তাঁদের প্রণাম জানালেন। ধন্বন্তরিও স্তব-স্তুতি করলেন তাঁদের।

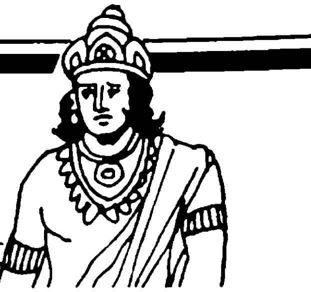
ব্রহ্মা দু-জনকেই আশীর্বাদ জানিয়ে ধন্বন্তরিকে বললেন—ধন্বন্তরি, কেন মিছিমিছি মনসার সাথে বিবাদ করে নিজের শক্তি ক্ষয় করছ? তুমিও যেমন শক্তিমান, আমাদের মা মনসাও তেমন শক্তিময়ী। জরৎকারু মুনির পত্নী মনসা তপস্যা করে যে শক্তি অর্জন করেছে, তুমি ওকে সন্তুষ্ট রাখলে উপকারই পাবে। তাতে সকলের মঙ্গল হবে। মিছিমিছি এই ঝগড়া থামিয়ে, মনসাকে মা-এর মত মনে কর, পুজো কর। তাতে তোমার মঙ্গলই হবে।

ব্রহ্মার নির্দেশ অবশ্য ধন্বন্তরি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। মনসাদেবীও সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। নাগলোকের সঙ্গে বাসুকিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।



পদ্ম পুরাণ

এমন কিছু নেই যা 'পদ্ম-পুরাণে' নেই। ব্যাসদেব স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের সব কিছু রহস্য এই পুরাণ-গ্রন্থের মধ্যে এমনভাবে রেখে গেছেন, যা পড়লে, প্রাচীন ভূগোল, ইতিহাস সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান জন্মায়। আবার নানারকম পুরাকাহিনীতেও ভরিয়ে রেখেছেন এই গ্রন্থখানিকে, যদিও এর অনেক কাহিনী আবার ভিন্নরূপে অন্যান্য পুরাণেও আছে। ব্যাসদেব এই পুরাণটিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন : (১) সৃষ্টিখণ্ড—এই খণ্ডে ভীষ্মের প্রশ্নের উত্তরে পুলস্ত্য ঋষি ধর্ম, তীর্থ, দান, ব্রতপালন ইত্যাদির মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন! (২) ভূমিখণ্ড—পৃথু, যযাতি ইত্যাদির সঙ্গে কিছু মুনি-ঋষির পরিচয়, কিছু দৈত্যবধের কথা ছাড়া ভূগোল আর পুরাতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। (৩) স্বর্গখণ্ড—এই খণ্ডেও সৃষ্টিখণ্ডের মতই ধর্ম, ব্রত, যুধিষ্ঠির প্রমুখ কিছু রাজ-রাজড়ার কথা। (৪) পাতালখণ্ড—এই খণ্ডটি রামচন্দ্রের কাহিনীতে ভরা। রামচন্দ্রের বনবাস থেকে শুরু করে ফিরে এসে অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্যন্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন—যেন রামায়ণের একটি অংশ। (৫) উত্তরখণ্ড—এতে সগর রাজার কাহিনী, ভাগবত, গীতা ইত্যাদির মধ্যে কি কথা বলা হয়েছে তারই আলোচনা করেছেন।



রামচন্দ্র-অগস্ত্য সংবাদ



ত্রিকূট পাহাড়ে অসুররাজ রাবণের সুরক্ষিত সোনার রাজধানী ছারখার।

বন থেকে কৌশলে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য সাজা পেয়েছে রাবণ। রাজা দশরথের দুই ছেলে রাম আর লক্ষ্মণ বানরসেনা নিয়ে চূর্ণ করেছেন রাবণের দর্প। বিভীষণ ছাড়া রাবণ সবংশে নিহত হয়েছে দুই ভাইয়ের হাতে নিজেদের পাপ কাজের জন্যে।

মহা-অত্যাচারী রাজা রাবণ আর তার চেলাচামুণ্ডারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে জেনে পৃথিবীর তাবৎ মানুষ খুব খুশি। কি ভয়ে ভয়েই না কাটত তাদের দিন! এবার বউ-ছেলে নিয়ে নিশ্চন্তে ঘর করতে পারবে, ঘুরে বেড়াতে পারবে—এ কি কম শান্তি!

সীতাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র আবার ফিরে এসেছেন অযোধ্যায়। রানী কৈকেয়ীর কাছে সত্যে আবদ্ধ রাজা দশরথের সত্যরক্ষা করার জন্য চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন রামচন্দ্র, পত্নী সীতাকে নিয়ে। সঙ্গে নিজের ইচ্ছেয় গিয়েছিলেন ছোট ভাই লক্ষ্মণ। কৈকেয়ীর ইচ্ছেয় তাঁর ছেলে ভরতের রাজা হয়ে বসার কথা ছিল অযোধ্যার সিংহাসনে। কিন্তু ভরত বসেন নি। দাদার খড়ম-জোড়া এনে সিংহাসনে বসিয়ে এতদিন দাদারই প্রতিনিধি হিসেবে রাজকার্য চালাচ্ছিলেন। আর দিন গুণছিলেন—কবে শেষ হবে সেই চোদ্দটা বছর, কবে ফিরে আসবেন তাঁর দাদা।

রাবণ-বধের পরেই সেই চোদ্দটা বছর শেষ হয়েছে। দাদা ফিরে আসছেন শুনে মনের আনন্দে সাজিয়েছেন অযোধ্যা পুরী। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন কখন আসেন তিনি। পুষ্পক বিমান এসে অযোধ্যায় নামতেই ভরতের সে কি আনন্দ। আনন্দে কাঁদছেন ভরত। রামচন্দ্রের চোখেও জল। দু-ভাইয়ের সে এক অপূর্ব মিলন। চোখের জলে প্রাণ ভরে দেখলেন সবাই। রামচন্দ্র আসছেন শুনে সারা অযোধ্যা যেন ভেঙে পড়েছে রাজধানীতে।

রামচন্দ্রকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকলেন ভরত। প্রাসাদে ঢুকেই রামচন্দ্র প্রথমে নিজের মা কৌশল্যার কাছে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন বিমাতা কৈকেয়ীর কাছে। দেখলেন, মাথা হেঁট করে খাটের এক কোণে বসে আছেন তিনি। রামচন্দ্র যে এতদিন পর এলেন, তাকিয়ে তাঁর মুখটা পর্যন্ত দেখতে পারলেন না কৈকেয়ী।

বিমাতাকে প্রণাম করলেন রামচন্দ্র। বললেন—মা, মাগো, আমি এতদিন বাদে ফিরে এলাম, তুমি মুখ তুলে দেখছ না কেন? আমাকে আশীর্বাদ করছ না কেন? বনবাসে গিয়ে তোমার যে যে কাজ ছিল, তা তো শেষ করেছি, মা। কিছুই তো বাকি রাখি নি। তবে? তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন? কোন কাজ কি আমি ফেলে রেখে এসেছি মা? বল, আমি নিশ্চয়ই করে আসব।

কি বলবেন কৈকেয়ী? সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানোর পর ছেলে ভরতের কাছ থেকে যে তিরস্কার পেয়েছিলেন তিনি, তার ওপর রাজা দশরথের প্রাণত্যাগ—মরমে যেন মরে যাচ্ছিলেন কৈকেয়ী। মুখ দেখাতে পারছেন না কাউকে। আজ সেই রাম এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে।

খুব আস্তে আস্তে শেষ পর্যন্ত কৈকেয়ী বললেন—তুমি সুখী হও বাবা।

এরপর রামচন্দ্র নিজের মা কৌশল্যা আর বিমাতা লক্ষ্মণের মা সুচিত্রার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে এলেন রাজসভায়।

গুরুদেব বশিষ্ঠ থেকে রাজ্যের প্রধান প্রধান মানুষরা সবাই অপেক্ষা করছিলেন রাজসভায়। রামচন্দ্র আসতেই সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

ভরত বললেন—দাদা, এবার তোমার দায়িত্ব তুমি নাও। আমাকে শুধু তোমার সেবা করতে দাও। বলে রামচন্দ্রকে ধরে সকলের সামনে বসিয়ে দিলেন রাজ সিংহাসনে। আর নিজে বসলেন তাঁর পায়ের কাছে।

আর একবার উঠল জয়ধ্বনি। উল্লাসে ফেটে পড়ল রাজসভা। কুলগুরু বশিষ্ঠ জানালেন আশীর্বাদ। আশীর্বাদ জানালেন আরও সব মুনি-ঋষিরা, অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারাও।

অযোধ্যার রাজা এখন রামচন্দ্র। সব প্রজার মনের আশা পূর্ণ হয়েছে। সকলেই খুশি। নিজেদের পরিবার আর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রজারা যে যার কাজ আনন্দে করে চলেছে আপন মনে। রাজা দশরথ মারা যাবার পর থেকে মনে মনে যে অশান্তি ভোগ করছিল প্রজারা, সে অশান্তি আর নেই। নেই আর কোন ক্লান্তি। যে অভাব-অনটন দেখা দিয়েছিল রাজ্যে, তা মিটে গেছে। মানুষ ক্রমশ দেখতে শুরু করে দিয়েছে সুখের দিন। মাঠে-মাঠে সবুজ ফসল, গোয়ালে-গোয়ালে গরুর পাল, ঘরে-ঘরে অতিথির সেবা, নির্বিঘ্নে মুনি-ঋষিদের তপস্যা—সব যেন মাখামাখি হয়ে গেল পৃথিবীর সঙ্গে। বিশ্রাম নেই রামচন্দ্রেরও। ঘুরে ঘুরে সব দেখেন। কারো কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা দূর করে দেন। অনাচার, অত্যাচারের লেশমাত্র কোথাও রইল না। পৃথিবীতে যাকে বলে সত্যিকারের রাম-রাজত্ব শুরু হল।

বেশ কিছুদিন চলল এভাবে। ভরত থেকে শত্রুঘ্ন—ভাইয়েরা সব সময় তাকিয়ে আছেন দাদার মুখের দিকে। জানকীও আছেন অন্দরমহলে শাশুড়ীদের সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে। তবুও, তাঁর নজর ঘুরছে চারদিকে। বীর হনুমান যেমন থাকেন রামের আজ্ঞার অপেক্ষায়, তেমনি তাকিয়ে থাকেন জানকীর দিকে—মা একবার মুখ ফুটে কিছু বললেই হল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটতেন সেটি করার জন্য।

এমনভাবে যখন দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন রামচন্দ্রের কানে এল, জানকীকে নিয়ে রাজ্যে কানা-ঘুষা শুরু হয়েছে—রাক্ষসরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল সীতাকে পাপের রাজ্য লঙ্কায়। এতদিন ধরে আটকে রেখেছিল। তারা কি আর সীতার কোন অনিষ্ট না করে ছেড়েছে? রামচন্দ্রের মত রাজা কিভাবে আবার সেই সীতাকে ঘরে নিলেন?

কথাটা কানে এল রামচন্দ্রের। খোঁজখবর নিয়ে জানলেন, কথাটা প্রথম উঠেছে এক রজকের ঘরে। তারপর, সেই থেকেই কানা-ঘুষা, ফিসফাস। কিন্তু মুখ খুলে কেউ সরাসরি সে কথা বলতে পারছে না তাঁকে। রামচন্দ্র ঠিক করলেন, এই আলোচনা বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রজাদের মনে অসন্তোষ জাগলে রাজ্যেরই ক্ষতি। কারোর কোন আপত্তি শুনলেন না, এমনকি ভাইয়েদেরও—সীতাকে পরিত্যাগ করলেন রামচন্দ্র। যে জানকী ছাড়া রামচন্দ্র আর কাউকে জানতেন না, তাঁকে ত্যাগ করায় নিজের মনেই যে রামচন্দ্রের কম কষ্ট হচ্ছে, তা নয়। তবুও একজনের জন্য সারা রাজ্যে অশান্তি হবে, রাজা হয়ে তিনি কি তা হতে দিতে পারেন?

বিয়ের পর-পরই চোদ্দ বছর বনবাস। বনের কষ্ট সহ্য করে যদিও-বা সীতা রাজরানী হয়ে দেখতে শুরু করেছিলেন একটু শান্তির মুখ, তাও আর তাঁর সইল না কপালে। স্বামী, শাশুড়ী, দেওর, রাজপ্রাসাদ—সব ছেড়ে আবার চলে যেতে হল বনে।

রাজ্যে আর কোথাও গুজগুজ, ফিসফাস নেই।

রামচন্দ্রের রাজসভায় প্রতিদিন কত যে আসে মানুষ তার ইয়ত্তা নেই। আসেন মুনি-ঋষিরাও। প্রত্যেককেই তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেন রামচন্দ্র। শাস্ত্র, ধর্ম, রাজনীতি নিয়ে কত আলোচনা হয় দিন-রাত। বিশ্রাম নেই রামচন্দ্রের। পরম আগ্রহে শোনেন সকলের কথা, এতটুকু বিরক্তি নেই মনে।

একদিন এমন ভাবে রাজসভায় বসে রামচন্দ্র। এলেন অগস্ত্য মুনি।

সিংহাসন ছেড়ে রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উঠে মহাতপা মুনিকে মর্যাদা দেখিয়ে আহ্বান জানালেন। বসালেন। তারপর জানতে চাইলেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন তিনি। বললেন—মুনিবর বলুন, আপনার কি উপকারে আমি লাগতে পারি? কোন রাক্ষস কি আপনার তপোবনের শান্তি নষ্ট করছে? আপনার তপস্যায় কি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

অগস্ত্য বললেন—না রামচন্দ্র, ওসব কিছু না। কোথাও কোন অশান্তি নেই। আমি এলাম তোমার এখানে সেই রামচন্দ্রকে দেখতে, যে রাবণের মত অসুরকে মেরে মানুষ থেকে দেবতা পর্যন্ত সকলের ভয় দূর করেছে। যাঁর কৃপায় ধার্মিক বিভীষণ আজ লঙ্কার রাজা। এখানে এসেছি সেই রামচন্দ্রকেই দেখতে। দেখে নিজেকে কৃতার্থ করতে।

বলতে বলতে মুনিবর যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অগস্ত্য মুনির তপস্যার এত ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বর্তমান তো দূরের কথা, অতীত এমন কি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত খুব স্বাভাবিকভাবে দেখতে পেতেন।

বিনয়ের সঙ্গে রামচন্দ্র বললেন—এ আর এমন কি মহৎ কাজ মুনিবর। অত্যাচারী একটা অসুরকে মেরেছি মাত্র। আপনি ত্রিকালজ্ঞ। তাই আপনার কাছেই আমার জানতে ইচ্ছে করছে—এই রাবণ, এই কুম্ভকর্ণ, এরা কারা? কি এদের পরিচয়? শক্তিশালী দেবতারাও কেন এদের এত ভয় পেতেন?

শুনে অগস্ত্য একবার তাকালেন রামচন্দ্রের উজ্জ্বল নিটোল মুখের দিকে। তারপর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন—সর্বজ্ঞ তুমি। তবুও আমার কাছ থেকেই শুনতে চাও? বেশ, শোন।

পৃথিবী সৃষ্টির পর প্রজা সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা যে পাঁচজন মানসপুত্রকে আদেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন পুলস্ত্য। মহাতপা পুলস্ত্যের ছিল মহাজ্ঞানী এক ছেলে—নাম বিশ্রবা। বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশ্রবার ছিল দুই স্ত্রী—মন্দাকিনী আর কৈকসী। মন্দাকিনীর ছেলে হল কুবের। আর রাক্ষস বিদ্যুন্মালীর মেয়ে কৈকসীর ছিল তিন ছেলে—রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। কুবের ছিল মনে-প্রাণে ধর্মভীরু, ধার্মিক। একমনে মহাদেবের তপস্যা করে সে পেয়েছিল অতুল ঐশ্বর্য, পেয়েছিল পুষ্পক নামে অপূর্ব এক বিমান। তাতে চেপে কোথায় যাবে মনে মনে জানালে বিমান তাকে ঠিক সেখানে এনেই নামিয়ে দিত। মহাদেবের আশীর্বাদে এই কুবেরই হয়েছিল লঙ্কার রাজা। মনের মত করে সে সাজিয়েছিল লঙ্কাকে। কিন্তু কৈকসীর তিন ছেলের মধ্যে বিভীষণ যদিও বা একটু ধর্মভীরু ছিল, আর দু-ভাই ছিল একেবারে উলটো। দারুণ নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী। রাবণ আর কুম্ভকর্ণ কখন যে কি অন্যায় করে বসে, এই ভয়ে সকলেই থাকত তটস্থ। কিন্তু করারও কিছু ছিল না। বড় বেপরোয়া।

একদিন বিশ্রবা বসে আছেন মন্দাকিনীকে নিয়ে।

হঠাৎ আকাশপথে তাঁদের সামনে এসে নামল একটা বিমান। হইহই করে ভিড় জমে গেল চারদিকে। বিমান থেকে নেমে এলেন কুবের। সঙ্গে অনেক অনুচর। কুবেরকে দেখতে ছিল ভারি সুন্দর। তার ওপর গায়ে ঝলমল করছে পোশাক। পোশাকও আবার সেই রকম। ঝকঝক করছে তাতে নানা মণি-মাণিক্য—যেন হাজার হাজার সূর্য আর চন্দ্র ঝকঝক করছে।

এসে কুবের এগিয়ে গেল মা-বাবার কাছে। দু-চারটে কথা সেরে প্রণাম জানিয়ে আবার চলে গেল।

রাবণ আগে কখনো কুবেরকে দেখে নি, চিনতও না। তাই মা কৈকসীকে জিজ্ঞেস করল—মা, ও কে বল তো? চোখ ধাঁধিয়ে এল, আবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে চলে গেল! বাবা অত আদর করল!

শুনে কৈকসী বলল—ওর নাম কুবের। সম্পর্কে তোমার দাদা।

—দাদা!

—হ্যাঁ, তোমাদের ঐ সৎমা মন্দাকিনীর ছেলে। বলে কৈকসী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

তারপর কৈকসী হঠাৎ যেন দারুণ খেপে উঠল—দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। আমার ছেলে তোরা?...তোরা আমার ছেলে? ছেলে হয়ে কি করেছিস মায়ের জন্য?

—এমন কথা কেন বলছ মা ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে রাবণ।

—বলছি কি আর সাধে ? একটা ছেলে মন্দাকিনীর। সে আজ দেবতাদের আশীর্বাদে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, লঙ্কার রাজা। ছেলের গর্বে মন্দাকিনীর বুক ভরে আছে। আর তোরা ? তোরা আমার তিন-তিনটে ছেলে, দিন-রাত শুধু মায়ের মুখে চুনকালি দিচ্ছিস ? কি করতে পেরেছিস তোরা যে আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, ওরা আমার ছেলে। যা…চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা। তিনটে ছেলের মা হয়েও আমি মনে করি, আমার কোন ছেলে নেই। কেন, মনে করব না ? যে ছেলে কুলাঙ্গার, সে কি ছেলে ? দূর হয়ে যা। ফুঁসে উঠল কৈকসী।

চুপ করে শুনল রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণ। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল দু-ভাই। কিন্তু রাবণ ! সোজা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তিরস্কার করে ভালই করলে মা। চলেই যাচ্ছি। শুধু লঙ্কা কেন, যেদিন ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যের মালিক আমি হতে পারব, সেদিন ফিরে আসব।

বিভীষণ এবং কুম্ভকর্ণেরও ঐ এক কথা।

তারপর তিন ভাই গিরিকাননে গিয়ে শুরু করল সে এক কঠোর তপস্যা—একদৃষ্টে সূর্যের দিকে তাকিয়ে একটানা দশ হাজার বছর—যা কেউ কখনো পারেন নি।

তাদের এই কঠোর তপস্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন। ফলও পেল তিন ভাই। দেখতে ছিল কদাকার। সুন্দর চেহারা হল, সুদর্শন হল। অর্জন করল প্রভূত শক্তি। দেববরে হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের অধিপতি।

সদর্পে ফিরে এল রাবণ। এসে প্রথমেই আক্রমণ করল কুবেরকে। লঙ্কার সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজে বসল রাজা হয়ে। ধন সম্পদ যা ছিল কুবেরের, এমন কি পুষ্পক বিমান পর্যন্ত, সব কেড়ে নিয়ে তাকে দূর করে দিল।

এরপর শুরু করল চতুর্দিকে নিদারুণ অত্যাচার। দশ হাজার বছরের তপস্যার শক্তি তার, কে পেরে উঠবে তার সঙ্গে। তার ওপর বিশাল বংশ আর বংশধর। দর্পে মাটিতেই পা পড়ে না রাবণের। কত ব্রাহ্মণ যে মারা পড়ল, কত মুনির আশ্রম যে তছনছ হল, কত মহিলা যে লাঞ্ছিতা হল, তার কোন হিসেব নেই। শুধু মর্ত্যলোকে নয়, দেবলোকে তার সে কি দুর্ধর্ষ হানা ! দেবরাজ থেকে শুরু করে অত বড় বড় সব দিকপাল দেবতারা পালালেন স্বর্গ ছেড়ে। চারদিকে শুরু হল অরাজকতা। গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ডভণ্ড করে বেড়াতে লাগল রাবণ।

অস্ত্র দিয়ে রাবণ বা কুম্ভকর্ণকে বধ করার মত আর কোন অস্ত্রই নেই দেবতাদের হাতে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান দেবতারা প্রাণের ভয়ে, লাঞ্ছনার ভয়ে। কিন্তু কতদিন এভাবে থাকা যায় ? দেবতারা তাই সকলে মিলে যুক্তি করে এলেন ব্রহ্মার কাছে, যদি কোন প্রতিকার হয়। ব্রহ্মা শুনে তাঁদের নিয়ে গেলেন কৈলাসে শিবের কাছে। পারলে কিছু শিবই পারবেন। সব শুনে শিব বললেন—জানি আমি। আমার প্রিয় ভক্ত কুবের যেদিন লাঞ্ছিত হয়েছে, সেদিনই জানি। কিন্তু, আমার তো এখানে করার কিছু নেই। চল, আমরা বরং সবাই মিলে একবার বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুকে ধরি। ভাল করে ধরলে নিশ্চয়ই তিনি একটা উপায় করে দেবেন।

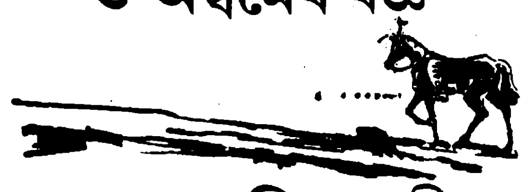
এবার সবাই মিলে মহেশ্বরকে সামনে রেখে এলেন বৈকুণ্ঠে। সবাই মিলে অনেক স্তব-স্তুতি করলেন বিষ্ণুর। আকুল হয়ে জানাতে লাগলেন তাঁদের আবেদন—প্রভু, রাবণের অত্যাচার যে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, ব্রহ্মাণ্ড থেকে যে ধর্ম লোপ পেতে বসল। অসহায় হয়ে সবাই যে মুখ বুজে কাঁদছে। আপনি কি এখনও দয়া করবেন না।

সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণু তখন দেবতাদের বললেন—রাবণকে বধ করার জন্য আমাকেই যেতে হবে মর্ত্যধামে। সেই সঙ্গে তোমাদেরও যেতে হবে। রাবণ একজন দেববরে বলীয়ান সামান্য অসুর নয়—একজন মহাসুর। শোন, অযোধ্যায় সম্প্রতি রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে পুত্র-কামনায় যজ্ঞ করছে। আমি নিজেকে চার ভাগে ভাগ করে রাজা দশরথের ঘরে গিয়ে জন্মগ্রহণ করব। রাজার তিন রানী কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রার গর্ভে আমিই জন্মাব রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে। তোমরাও যে যার নিজের শক্তি নিয়ে ভাল্লুক আর বানর হয়ে পৃথিবীতে যাও। সেখানেই কাজের সময় তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। তোমরাই সেখানে হবে আমার শক্তি। তোমাদের সাহায্য নিয়েই আমি সেখানে রাবণকে সবংশে বধ করব।

শুনে দেবতারা চলে গেলেন নিশ্চিন্ত হয়ে।

কথা শেষ করে অগস্ত্য একটু থামলেন। তারপর বললেন—ভাগ্যবান আমি যে আজ চাক্ষুষ দেখলাম নরদেহধারী ভগবান রামচন্দ্রকে। সফল হল আমার সাধনা।

রামচন্দ্রের আক্ষেপ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ



বিদ্যুন্মালী বধ

মুনিবর অগস্ত্যের সব কথাই মন দিয়ে শুনলেন রামচন্দ্র শুনলেন বশিষ্ঠ মুনি থেকে সভায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নও শুনলেন। পৃথিবীর সকলেরই ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে স্বয়ং বিষ্ণু এসেছেন চার ভাইয়ের মূর্তি ধরে পৃথিবীকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু অবাক লাগে সকলেরই এঁদের আচার-আচরণ দেখে। সাধারণ একজন জ্ঞানী ব বীরপুরুষের সঙ্গে তফাৎ কোথায় ? তা নইলে, অগস্ত্যের কথা শু রামচন্দ্র অমন 'হায়…হায়' করে উঠলেন কেন ?

সকলেই চমকে উঠলেন, এমন কি অগস্ত্যও—কি হল ? আপনি হঠাৎ 'হায়…হায়' করে উঠলেন কেন ? বিমর্ষ হয়ে গেলেন কেন

রামচন্দ্র নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন—মুনিবর, এ আমি কি করলাম ? অত্যাচারীকে মারতে গিয়ে আমি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করলাম। ব্রহ্মহত্যার মত জঘন্য পাপ কাজ করে বসলাম ? ছি… ছি…আমার কি গতি হবে ?

একেবারে সাধারণ মানুষের মত কথা। শুনে সকলেই বেশ হকচকিয়ে গেলেন। ভগবানের আবার পাপ কি।

আকুল হয়ে ওঠেন রামচন্দ্র—আপনি অভিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, বলুন, কি করলে আমি এই মহাপাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি ?

অগত্যা অগস্ত্য বললেন—আপনাকে আর কি বলব ? শাস্ত্রের মতে, আপনি যখন রাজা, সামর্থ্য আছে, কোন কিছুর অভাব আপনার নেই, তখন অশ্বমেধ-যজ্ঞই একমাত্র আপনার পাপ মুক্তির উপায় !

সম্মতি জানালেন কুলগুরু বশিষ্ঠদেবও।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি রামচন্দ্র। ডাকলেন ভাই লক্ষ্মণকে—লক্ষ্মণ, আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

রাজা রামচন্দ্রের ইচ্ছা।

সরযূ নদীর ধারে সুন্দর বিশাল এক প্রান্তর সোনার লাঙল দিয়ে চষে ঝুরঝুরে, নরম করা হল কঠিন মাটি, তৈরি হল যজ্ঞবেদি। পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর তৈরি হল নিমন্ত্রিত অতিথিদের এসে থাকার জন্য। শুরু হল সে এক হইহই-রইরই ব্যাপার। বিশাল যজ্ঞ। মণ্ডপও তৈরি হল তার সেইরকম। মণ্ডপের হল সেইরকম আটটি দ্বার। রামচন্দ্রের নির্দেশে মর্ত্যের দেবরাজ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকাজে যোগ দেবার জন্য আসতে লাগলেন ভাল ভাল ব্রাহ্মণেরা। এলেন অসিত, নারদ, জাতুকর্ণ, ব্যাস, কপিল, পর্বত, অত্রি, গৌতম, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, সংবর্ত—সব খ্যাতিমান মুনি-ঋষিরা। প্রায় ষোল ক্রোশ জুড়ে সেই যজ্ঞক্ষেত্র গমগম করে উঠল। বশিষ্ঠদেব হলেন আচার্য, বাল্মিকী মুনি হলেন হোতা, ব্রতী হলেন অগস্ত্যদেবও। মণ্ডপের আটটা দ্বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা। পূর্বদিকের দু-দ্বারে দেবল আর অসিত, দক্ষিণের দু-দ্বারে কশ্যপ আর অত্রি, পশ্চিমের দ্বার দুটোয় জাতুকর্ণ ও জজানি, আর উত্তরের দু-দ্বারে দ্বিতীক আর একক। কার সাধ্য চোখে ধুলো দিয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে ঢুকে অনিষ্ট করে !

অশ্বশালা থেকে সেনাপতি কালজিৎ-কে নিয়ে সব থেকে ভাল ঘোড়া বাছাই করে যজ্ঞশালায় নিয়ে এলেন লক্ষ্মণ। অপূর্বসুন্দর সে ঘোড়া—ছোট ছোট দুটো কান, শ্যামবর্ণ। গায়ের রঙ চকচক করছে, ছোট ছোট অপূর্ব পুচ্ছ—যেমন তেজী, তেমনি দ্রুতগামী। সর্বাঙ্গ তার সাজানো হয়েছে মণি-মুক্তার অলঙ্কারে। পিঠে মণি-মুক্তার ঝালর।

নিয়মানুসারে বশিষ্ঠ আর অগস্ত্য মুনি পূজা করলেন সেই ঘোড়ার। সীতা নেই, লোকলজ্জার ভয়ে রামচন্দ্র তাঁকে দিয়েছেন নির্বাসন। কিন্তু যজ্ঞে অভিষিক্ত হতে গেলে তো রানীকে দরকার। মুনিদের নির্দেশে সোনার সীতা তৈরি করিয়ে, নিজের সিংহাসনের বাঁদিকে বসিয়ে রামচন্দ্র অভিষিক্ত হয়েছেন। যজ্ঞের অশ্বও অভিষিক্ত হল। কপালে তার চন্দন লেপে তার ওপর গলা জড়িয়ে পরিয়ে দেওয়া হল জয়-পাতাকা। বড় বড় অক্ষরে সেই জয় পতাকায় লিখে দেওয়া হল—সূর্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, ধনুর্বিদ্যায় অদ্বিতীয়, দেব-দানব যাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানায়, অযোধ্যার রাজা দশরথের সেই পুত্র রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ রাবণকে বধ করে যে ব্রহ্মহত্যা পাপ করেছেন, তা স্খালন করার জন্য এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অশ্ব ছেড়েছেন। এই অশ্বকে রক্ষার করার জন্য সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরই ভাই বীর শত্রুঘ্ন। যদি কেউ নিজেকে রামচন্দ্রের চেয়েও বড় ধনুর্বীর বলে মনে করে এই অশ্ব আটকান, নিশ্চত জানবেন, বীর শত্রুঘ্নর হাতে তাঁর নিস্তার নেই।

যজ্ঞ-মণ্ডপ থেকে এবার বের হবে অশ্ব। রামচন্দ্র ডাকলেন ভাই শত্রুঘ্নকে। ডেকে বললেন—শত্রুঘ্ন এই অশ্বরক্ষার দায়িত্ব তোমার। তুমি তো এই ঘোড়ার স্বভাব জান। চলেও আপন ইচ্ছামত। ওকে ওর ইচ্ছেমতই যেতে দিও। যেদিকেই যাক, তুমি পেছন দিক থেকে একে শুধু রক্ষা করে যেও। আর সব সময়ই মনে রেখো, তুমি ক্ষত্রিয় বীর, শুভকাজে যাচ্ছ। ক্ষত্রিয়ের যা ধর্ম আর যুদ্ধের যা নীতি, তা থেকে একটুও বিচ্যুত হবে না।

শত্রুঘ্ন তো উন্মুখ হয়েই ছিলেন। দাদার আদেশে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত।

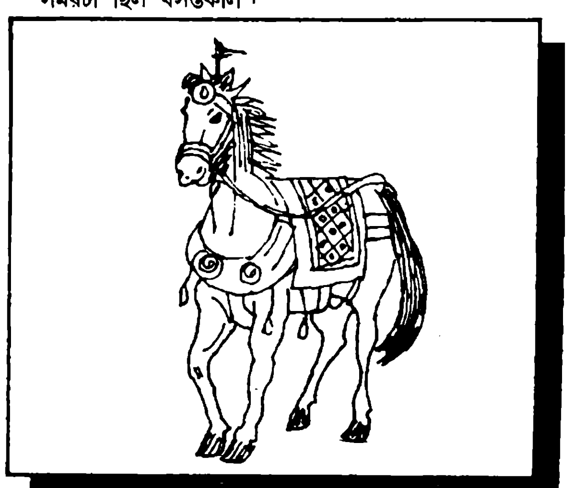
ভরতের ছেলে যুবক পুস্কল ইতিমধ্যেই বীরত্বে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে এগিয়ে এসে বলল—জ্যাঠামণি, আমি কাকার পিছনে থাকব। আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

পুস্কলের সাহস খুবই ভাল লাগল রামচন্দ্রের। প্রাণভরে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই যাবে জেঠু, নিশ্চয়ই যাবে। এই তো বীরের ধর্ম।

এরপর রামচন্দ্র হনুমানকে ডাকলেন। বললেন—কপিবর, আমার সব কিছুর পেছনে তোমারই মদত। শত্রুঘ্নর পেছনে তুমিও যাও। সব সময় ওর পেছনে থেকো, প্রয়োজন হলে ওকে বুদ্ধি যুগিয়ে পরিচালনা কোরো, যেমন করতে আমাকে।

প্রস্তুত হয়ে নিল হনুমান। সেই সঙ্গে জাম্ববান, অঙ্গদ, গবয়, দধিমুখ, সুগ্রীব, নল, নীল যে যেখানে ছিল, সবাই প্রস্তুত হয়ে নিল শত্রুঘ্নের পেছনে যাবার জন্য। সেই সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, পদাতিক, রথী—চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে চললেন শত্রুঘ্নের নেতৃত্বে মহাবীর নীলরত্নর মত অসাধারণ রথী, লক্ষ্মীনিধির মত সবরকম অস্ত্রযুদ্ধে পারদর্শী মহাযোদ্ধা, আর রাজা উগ্রাশ্ব।

সময়টা ছিল বসন্তকাল।



একদিকে ফুরফুরে বাতাস। আর একদিকে রণসাজে সজ্জিত সব সৈন্যের উল্লাস।

যজ্ঞ-মণ্ডপ থেকে বের হল যজ্ঞের ঘোড়া, কপালে জয়পতাকা নিয়ে। এগিয়ে চলল সে তার খুশিমত পথে। পেছনে বানর সেনা আর ক্ষত্রিয়বীরদের নিয়ে শত্রুঘ্ন চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে তার পিছু পিছু। রামচন্দ্রের আদেশে সুমতি নামে তাঁর এক মন্ত্রীও চললেন শত্রুঘ্নের সঙ্গে সঙ্গে।

যজ্ঞের ঘোড়া একে একে পেরিয়ে চলল এক এক জনপদ, এক এক রাজ্য। পেরিয়ে গেল পাঞ্চাল, কুরু, উত্তরকুরু, দশার্ণ, উজ্জয়িনী। সকলেই রামচন্দ্রের কাছে নতি স্বীকার করে প্রচুর উপঢৌকন দিল শত্রুঘ্নকে। এরপর ঘোড়া এসে হাজির হল অপরূপ এক সমৃদ্ধশালী নগরীতে। নগরীটির নাম অহিচ্ছত্র। সেখানকার রাজা ছিলেন মহা তপস্বী ক্ষত্রিয় বীর সুমদ। অশ্ব নিয়ে শত্রুঘ্ন যেই এসে পৌঁছলেন তাঁর রাজধানীতে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন তিনি—যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিলেন। যথাসাধ্য আপ্যায়ন করলেন শত্রুঘ্নকে। তারপর নিজেও সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন শত্রুঘ্নের সঙ্গে।

চলেছে যজ্ঞের ঘোড়া। পেছনে চলেছে মহাসেনার দল।

রেবা নদীর ধারে মনোরম এক আশ্রম। যেমন ফল-ফুল, তেমনি সবুজ ঘাস। ঘোড়া এসে সোজা ঢুকে পড়ল আশ্রমে। খেতে শুরু করে দিল নধর ঘাস।

মন্ত্রী সুমতির কাছ থেকে জানলেন, এটি মহাতপা চ্যবন মুনির আশ্রম।

শত্রুঘ্ন এসে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রণাম জানালেন মুনিকে। রামচন্দ্র যজ্ঞ করছেন শুনে খুশিতে যেন উথলে উঠলেন। রামচন্দ্রের হয়ে তাঁকে যজ্ঞে যাবার কথা যেই বললেন শত্রুঘ্ন, অমনি তল্পিতল্পা বেঁধে যাত্রা শুরু করলেন মুনিবর অযোধ্যার দিকে। পরিশ্রম হবে খুবই, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন মুনিবর, এই ভয়ে হনুমান শত্রুঘ্নের আদেশে তাঁদের সকলকে পিঠে নিয়ে নিমেষে পৌঁছে দিলেন অযোধ্যায়। চ্যবন মুনি আসায় রামচন্দ্রও হলেন দারুণ খুশি।

রামচন্দ্রের ঘোড়া এরপর নীলগিরিতে কিছুটা সময় কাটিয়ে মনের আনন্দে ঘাস-টাস খেয়ে এল চক্রাঙ্কা পুরীতে। এখানকার রাজা তখন সুবাহু। মহাবীর। তাঁর ছেলে দমনও কিছু কম যায় না ধনুক-বাণের যুদ্ধে। মৃগয়ায় যাচ্ছিল তখন দমন। হইহই করে ঘোড়া এসে ঢুকতেই মৃগয়ায় না গিয়ে দমন ঘোড়ার কপালে জয়পতাকার লেখাগুলো পড়ল।

শত্রুঘ্নের আদেশে প্রতাপাগ্র নামে এক বীর তখন ছিল অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণে।

এই প্রথম জয় পতাকা পড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল দমন। বলল—রামচন্দ্র কি মনে করেন, তিনি একাই ক্ষত্রিয় বীর? মনে করেন, তাঁর মত ধনুর্ধারী এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই?

দমন ঘোড়াটা ধরে পাঠিয়ে দিল রাজধানীতে। সেনাপতিকে ডেকে বলল—অসহ্য এই ক্ষত্রিয়রাজ রামচন্দ্রের দম্ভ। সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। এই বলে দমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হল।

একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন প্রতাপাগ্র। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কোথাও ঘোড়া দেখতে না পেয়ে বেশ চিন্তায় পড়লেন। সামনেই আবার দেখলেন সসৈন্যে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে দমন।

দূতেরা বলল—আমাদের মনে হয় ঐ দমনই ঘোড়া ধরে কোথাও সরিয়ে রেখেছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরা বরং নিশ্চিত হয়ে আসি।

এগিয়ে গিয়ে দূতরা জিজ্ঞেস করতেই খুব মেজাজ দেখিয়ে দমন বলল—আমিই ধরে রেখেছি ঘোড়াকে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ



বীর থাকে, তাকে গিয়ে বল, সে যেন যুদ্ধ করে আমার কাছ থেকে ঘোড়া নিয়ে যায়।

শুনে ক্ষত্রিয়বীর প্রতাপাগ্রের রক্তে লাগল আগুন। তবুও যতটা সম্ভব সংযত রেখে নিজে এগিয়ে গিয়ে দমনকে বললেন—বালক এসব নিয়ে ছেলেমানুষী কোরো না। বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করার বয়স তোমার এখনও হয়নি। ঘোড়া ছেড়ে দাও। বাড়ি যাও।

দমনের উত্তর সোজা—সাপের বাচ্চা সাপের বিষ দাঁতটাই একবার দেখুক না কেন, অবশ্য যদি সাহস থাকে।

—বালক, বিষধর সাপ নিয়ে খেলবার শখ যখন তোমার এতই বেশি, তখন অবশ্যই জবাব দিতে হবে। বলে মহাবীর প্রতাপাগ্র তুললেন ধনুক-বাণ। উঠল টঙ্কার। দমনও ধরল রুদ্রমূর্তি। বাণে-বাণে আকাশ গেল ঢেকে।

যতখানি সোজা হবে ভেবেছিলেন প্রতাপাগ্র, ততখানি সহজ কিন্তু হল না।

বাধল দু-দলে তুমুল লড়াই। আর এমন হল, তাকে কায়দা করতে গিয়ে প্রতাপাগ্র নিজেই হলেন নাজেহাল। সেনা গেল, সারথি গেল, শেষে অব্যর্থ বাণে মহাবীরের প্রাণও গেল।

শত্রুঘ্নের কানে খবর যেতেই তিনি নিজেই যখন দমনকে দমন করার জন্য এগিয়ে আসছিলেন, বাধা দিল ভাইপো পুষ্কল।

পুষ্কল বলল—কাকা, আপনার মত বীরের কি ঐ রাম ভেড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা সাজে? আপনি অপেক্ষা করুন, আমিই ওকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে অশ্ব নিয়ে আসছি।

এই বলে দমনের মুখোমুখি হল পুষ্কল। শুরু হল সংগ্রাম। শুরু হল অস্ত্রের ভোজবাজি। পুষ্কলের শরে আগুন। আগুনের শিখায় যখন জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল দমনের সেনাদলের সঙ্গে হাতি ঘোড়ার দল, দমন তখন তার এক বাণে নামাল প্রবল বর্ষণ, জলের প্রলয়। পুষ্কল সেই বিশাল জলধারাকে প্রতিহত করতে বাণে নিয়ে এল ঝড়। তারপর বজ্রের মত কঠিন এক শরে দমনকে ফেলে দিল মাটিতে। দমনের সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল রাজধানীতে। সকলেরই প্রায় পোশাক ছেঁড়া, সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরছে রক্ত। দেখে

দমনের বাবা ক্ষত্রিয়বীর সুবাহু আর স্থির থাকতে পারলেন না। ডাকলেন সেনাপতিকে। রাজার আদেশে তিনি সাজালেন অজস্র বীর যমের মত সেনাদের। প্রতিজ্ঞা করলেন রাজা—তাঁর ছেলেকে যে মেরেছে, সে যেই হোক, মরার যন্ত্রণা কি, তাকেও আজ তিনি ভালভাবেই বুঝিয়ে দেবেন। সুবাহু কত শক্তি ধরেন, একবার দেখিয়ে দেবেন রামচন্দ্রকে।

সসৈন্যে সুবাহু এলেন দমনের কাছে। ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ দমন দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—আমার ধনুক কোথায়?

আসলে পুষ্কলের বজ্রে দমন মূর্চ্ছা গিয়েছিল মাত্র। পুত্র জীবিত—সুবাহুর মনোবল যেন অনেক গুণ বেড়ে গেল। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সুবাহু তৈরি করল এমন এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ, যে ব্যূহ ভেদ করার কৌশল জানতেন একমাত্র ভার্গব। সেই ব্যূহের ভেতর তিনি সাজালেন চতুরঙ্গ সেনা। আর নিজেরা রইলেন ব্যূহমুখে।

মন্ত্রী সুমতির সঙ্গে পরামর্শ করে মহাবীর লক্ষ্মীনিধিকে নিয়ে এগিয়ে এলেন শত্রুঘ্ন। ব্যূহের যে মুখে ছিল রাজা সুবাহুর ভাই সুকেতু, জনক-রাজপুত্র লক্ষ্মীনিধি সেদিকে গিয়ে আক্রমণ করল তাকে। যেদিকে ছিল চিত্রাঙ্গ, পুষ্কল সসৈন্যে এগিয়ে গেল সেদিকে। শুরু হল তুমুল সংগ্রাম। সকলেই সমান বীর। চলল লড়াই দু-দলে প্রায় সমানে সমানে। তারপর এক সময় সুকেতু আর লক্ষ্মীনিধি সব অস্ত্রশেষে বাহুযুদ্ধে নামল। রক্তাক্ত দেহে পড়ে গেল—অচৈতন্য। আর পুষ্কলের বাণে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাল সুবাহুর বীর ছেলে চিত্রাঙ্গ। সসৈন্যে এরপর ব্যূহ ভেদ করে ঢুকল সে। বীর পুত্রের মৃত্যুতে খুবই কাতর হয়ে পড়লেন সুবাহু। এমনটি তো হবার কথা নয়। ঠিক সেই সময়েই সুবাহুর আর দুই বীর ছেলে বিচিত্র আর দমন এসে দাঁড়াল বাবার পাশে। পুত্রকে হারিয়ে সুবাহুও জ্বলে উঠলেন দাবানলের মত। আক্রমণের ওপর আক্রমণ, বাণের ওপর বাণ ছুঁড়ে শত্রুঘ্নর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে রুখে দাঁড়ালেন হনুমান। এবার একদিকে রথে সুবাহু অব্যর্থ ধনুক-তীর নিয়ে, আর একদিকে মহাবীর কপিবর হনুমান। বাধল তুমুল সংগ্রাম। সুবাহুকে নানা ভাবে নাজেহাল করেও যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারলেন না, তখন এগিয়ে গিয়ে হনুমান সজোরে তাঁর বুকে এমন এক লাথি বসালেন যে, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। ওদিকে সুকেতু আর লক্ষ্মীনিধিও আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ আর হল না। মূর্ছা যখন ভাঙল সুবাহুর, কে বলবে ইনিই সেই ক্ষত্রিয় বীর, মহাযোদ্ধা। উঠেই সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন —থামাও যুদ্ধ। ফিরিয়ে দাও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অশ্ব। আমার ছেলে-নাতি, ধন-সম্পদ, আমি-আমার রাজ্য আজ থেকে রামচন্দ্রের। বলে, সবাই গেলেন শত্রুঘ্নের কাছে।

ছাড়া পেল যজ্ঞের ঘোড়া। শত্রুঘ্নের সেনাদলে যুক্ত হল সুবাহুর সেনা।

যজ্ঞের ঘোড়া বিনা আয়াসেই জয় করল তেজপুর। রাজা সত্যবান যেন এই অপেক্ষাই ছিলেন। ছেলের হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে মনে মনে রামচন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে সসৈন্যে সঙ্গী হলেন শত্রুঘ্নের।

এরপর পথের মাঝে এক দারুণ সঙ্কটে পড়তে হল সবাইকে।

বেশ নিশ্চিন্ত মনে চলেছিলেন সবাই। আগে আগে চলেছিল ঘোড়া। হঠাৎ শুরু হল মাংস-মজ্জা-পুঁজ-রক্তের অনর্গল বৃষ্টি। পড়তে লাগল গায়ে, মাথায়, পথের সামনে। সকলের গা ঘৃণায় রি-রি করে উঠল। সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এ কি। কোথা থেকে আবার এই উৎপাত শুরু হল? কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে ওপরদিকে তাকিয়ে দেখার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই কারোর।

তা যখন থামল, সামলে নিতে পারল নিজেদের, তখন দেখে ঘোড়া নেই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখল, আকাশপথে উড়ে চলেছে লোহার তৈরি এক বিমান আর তাতে যজ্ঞের অশ্ব চলেছে।

বুঝতে বাকি থাকল না, নিশ্চয়ই এ কোন মায়াবী অসুরের কাজ।

মন্ত্রী সুমতির সঙ্গে পরামর্শ করে শত্রুঘ্ন সেই বিপুল সেনা আর বীরদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিলেন কেবলমাত্র তাদেরই, যারা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন পুষ্কল আর হনুমান।

বিমান চলেছে শূন্যে। আর নীচে পুষ্কল, হনুমান, লক্ষ্মীনিধি চলেছে হাতি, ঘোড়া, রথ আর সৈন্য-সমস্ত নিয়ে।

তাই দেখে প্রধান রাক্ষস বিমান থেকে মুখ বাড়াল। বিদ্রূপ করে বলল—ভীরুর দল, মিছিমিছি কেন আসছ? মরতে? তোমাদের মেরে আমার কোন লাভ নেই। পাঠিয়ে দাও তোমাদের খোদ মনিব রাম আর লক্ষ্মণকে।

নীচ থেকে উত্তর দিল পুষ্কল—কে তুমি, এত দম্ভ তোমার? রামচন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব চুরি করে নিয়ে যাবে, আবার চাইছ রামচন্দ্রকে? তোমার বীরত্ব আমাদের কাছেই আগে দেখাও, তারপর....

পুষ্কলের কথা শুনে প্রথমে বিমান থেকে ভেসে এল কিছু অদ্ভুত আওয়াজ। সেগুলো আর সব রাক্ষসদের বিদ্রূপ ছিল। তারপর শোনা গেল সেই রাক্ষস-প্রধানের কথা—আমি রাবণের বন্ধু বিদ্যুন্মালী। নরাধম রাম আর তার ভাই লক্ষ্মণ চক্রান্ত করে তাকে মেরেছে। আজ যখন সুযোগ আমি পেয়েছি, তখন তাদের দুজনের রক্তপান না করে থামছি না।

শুনে গর্জন করে উঠল হনুমান—কার রক্ত পান করতে চাস রে মূর্খের দল? রামের পরিচয় নেবার আগে আমাদের সঙ্গে পরিচয় কর।

হনুমানের কথা শেষ হতে না হতেই রাক্ষসরা যুদ্ধ শুরু করে দিল। ওরা শূন্যপথে, আর এরা নীচ থেকে। বাণের ওপর বাণ, তার ওপর বাণ। ছোঁড়াছুঁড়ি চলল দু-পক্ষেই। কিছুক্ষণ এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ লক্ষ্মীনিধির হাতে মারা পড়ল বিদ্যুন্মালীর ভাই উগ্রদংষ্ট্রা।

মহাবীর ভাইকে মারা যেতে দেখে বিদ্যুন্মালী উঠল এবার খেপে। রাগে সিকট-সিকট হয়ে গেল তার মুখ। মরিয়া হয়ে সে এবার মোক্ষম-মোক্ষম অস্ত্র ছাড়তে লাগল। যদিও পুষ্কলবাহিনীও কিছু কম যায় না, তবুও যখন নাজেহাল হয়ে পড়েছে, তখন রুখে দাঁড়াল হনুমান। তড়াক করে শূন্যপথে লাফিয়ে উঠে লেজে আর পায়ের আঘাতে বিদ্যুন্মালীর সেই মজবুত বিমান ভাঙতে ভাঙতে যখন স্তূপ করে নীচে ফেলে দিল, বিদ্যুন্মালী তখন খানিকটা অসহায় বোধ করলেও তা কিন্তু প্রকাশ করল না। বিমানটার ছিল এমনি গুণ যে তাতে বসে, মনে মনে যে অস্ত্রই চাওয়া যেত, তা-ই পাওয়া যেত। এখন রাক্ষসের সে সুযোগটা গেল বটে, কিন্তু ওদের নিজস্ব

মোক্ষম হাতিয়ার মায়া।

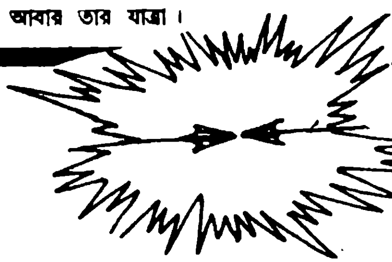
বিদ্যুন্মালী এবার চারদিকে এমন মায়াজাল সৃষ্টি করল, যে সবাই ভীত-ত্রস্ত হয়ে উঠল।

শত্রুঘ্ন এবার নিজে কিন্তু আর পুষ্কলের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারলেন না। শরাসন থেকে নিজেই একটি শর বেছে নিয়ে ছিন্নভিন্ন করলেন সেই মায়াজাল। আরও নানারকম মায়া-কৌশল অবলম্বন করে বিদ্যুন্মালী যখন দেখল সব ব্যর্থ হল, তখন সাংঘাতিক পাশুপত অস্ত্র ছুঁড়ল রাক্ষস। শত্রুঘ্ন সেনাদের দলিত-মথিত করে যখন ছুটে চলেছে পাশুপত, আর রাক্ষসেরা উল্লাসে করে চলেছে রক্তপান, শত্রুঘ্ন তখন নারায়ণাস্ত্র দিয়ে তা নিবারণ করেন। এক সুযোগে প্রথমে বিদ্যুন্মালীর দুটো হাত কেটে দিলেন। তাতেও যখন তার বিক্রম কমল না, তখন এক অমোঘ অস্ত্রে দিলেন তার মাথা কেটে।

শেষ হয়ে গেল এক মহা-উপদ্রব। তা দেখে দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সকলে আকাশবাণী শুনলেন : 'শত্রুঘ্ন, তুমি এক মহা উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচালে, নিশ্চিন্ত করলে আমাদের।'

মুক্ত হল যজ্ঞের ঘোড়া।

শুরু হল আবার তার যাত্রা।



শিবের মুখোমুখি শত্রুঘ্ন

রাক্ষস বিদ্যুন্মালীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে রামচন্দ্রের যজ্ঞের ঘোড়া নিজের মনোমত পথে আবার এগিয়ে চলেছে। রামচন্দ্রের নির্দেশ—কোন বাধা নয়, জোর করে ঘোড়াকে অন্য কোন পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, তাকে শুধু অনুসরণ করে যেতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে। সসৈন্য শত্রুঘ্ন, মহাবীর ভাইপো পুষ্কল, কপিবর হনুমান, সুগ্রীব থেকে সবাই তাই নিশ্চিন্ত মনে চলেছেন তার পিছু-পিছু।

রেবা নদীর কোল ঘেঁষে চলেছে ঘোড়া, চলেছেন সবাই। যেমন নদী, তেমনি তার পাড়ের সৌন্দর্য। যত মুনি-ঋষিদের তপোবন। নিরালা, নির্জন পরিবেশ। বেদধ্বনি আর মন্ত্র পাঠ।

দেখতে দেখতে ঘোড়া এসে ঢুকল অপূর্ব এক নগরীতে। যেন এক নগর-বাগান। মনে হবে বুঝি-বা মর্ত্যের কোন ইন্দ্রপুরী।

মন্ত্রী সুমতির কিছু অজানা নেই। কোথায় কার রাজ্য, কোথায় কে থাকেন, কার শক্তি কতখানি, সবই তাঁর জানা।

তাই শত্রুঘ্ন জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীবর তাঁকে জানিয়ে দিলেন—এটা হল দেবপুর। এ রাজ্যের রাজা হলেন বীরমণি। মহাবলশালী। শিববরে বলীয়ান। স্বয়ং শিব তাঁর অনুচরদের নিয়ে আবার সব সময়ই বাঁধা পড়ে আছেন এই রাজার কাজে। তবে এটুকু জানা আছে, রামচন্দ্রকেও তিনি মনে মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। তবুও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

—কেন ? রামচন্দ্রকে যদি শ্রদ্ধাই করেন, তবে তাঁর যজ্ঞের ঘোড়া আটকাবেন কেন ? জিজ্ঞেস করেন শত্রুঘ্ন।

—বিশ্বাস নেই। একটু সাবধানে থাকাই ভাল। বললেন মন্ত্রীবর।

ইতিমধ্যে কিন্তু ঘটনা ঘটেও গেল।

ঘুরতে ঘুরতে জয়পতাকা নিয়ে ঘোড়া ঢুকল এক উপবনে। ফুলে ফুলে ভরা সেই উপবনে রাজকুমার রুক্মাঙ্গদের স্ত্রীরা তখন মনের আনন্দে ফুল তোলা, ফুলের মালা গাঁথা, ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা—এইসব করছিল।

হঠাৎ অপূর্ব সেই ঘোড়াটাকে সেখানে দেখেই রমণীরা খেলা ফেলে রুক্মাঙ্গদকে গিয়ে বলল—রাজকুমার। আসুন, সুন্দর একটা ঘোড়া এসে ঢুকেছে বাগানে। ভারি ভালো ঘোড়া। ছাড়বেন না, ধরে রাখুন।

শুনেই তাড়াতাড়ি রুক্মাঙ্গদ এসে দেখলেন—সত্যিই তো, ভারি অপূর্ব। সুন্দর ভাবে সাজানো। আরো কাছে এগিয়ে এসে পড়লেন জয়পতাকা। পড়েই কিন্তু রাজকুমারের মেজাজ গেল চড়ে। কি ! রামচন্দ্রের মত ধনুর্বীর আর পৃথিবীতে নেই, তার বাবা বীরমণি এখনও বেঁচে থাকতে মেনে নিতে হবে ?

আর কোন কথা নয়। ঘোড়াটিকে বেঁধে রাজকুমার নিয়ে গেল রাজপ্রাসাদে তার বাবার কাছে।

রাজা বীরমণি তো দেখেই চমকে উঠলেন—এ কি করেছ ? এ যে রামচন্দ্রের ঘোড়া ! তারপর একটু ভেবে বললেন—খুবই অন্যায় করেছ। যাও, মহাদেবের কাছে গিয়ে বলে এসো।

রুক্মাঙ্গদ একটু ঘাবড়ে গিয়ে অবশ্য তাই করে এল। শুনিয়ে এল প্রাসাদের যেদিকে মহাদেব থাকেন, সেদিকে গিয়ে মহাদেবকে।

রুক্মাঙ্গদ চলে আসার পর পরই শিবের কাছে গেলেন রাজা বীরমণি নিজে। বললেন—ছেলে তো যা করে বসল, এ তো ভাল বলে মনে হচ্ছে না। এখন কি করার আছে ?

শিব বললেন—দেখ, রামচন্দ্রকে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমিও করি যথেষ্ট। তিনি এখন এই পৃথিবীর রক্ষক। অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন নামেমাত্র। ঘোড়া তাঁর ফিরিয়ে না দিলে, সেনারা তাঁর এসে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে।

বীরমণি শুনে বললেন—সবই ঠিক। কিন্তু একটা কথা, সমস্ত ক্ষত্রিয় সমাজকে এত ছোট করে দেখলেন কেন রামচন্দ্র ? অবশ্যই তিনি একজন বড় বীর। তাই বলে কি জয়পতাকায় এটা তাঁর লেখা ঠিক হয়েছে যে 'যদি কেউ আটকায় সৈন্যরা তার দর্প চূর্ণ করে ঘোড়া নিয়ে আসবে ?' আমি নিজে একজন ক্ষত্রিয় হয়ে কিন্তু এ অহঙ্কার মেনে নিতে পারছি না।

শুনে মৃদু হাসলেন শিব। বললেন—তাহলেই যুদ্ধ হবে।

—হ্যাঁ, তা হবে। তবে আপনি থাকতে কোন যুদ্ধকেই আমি ভয় পাই না।

শিব বললেন—শোন বীরমণি। যুদ্ধ বাধলে তোমাকে হেনস্থা করার চেষ্টা কেউ করলে অবশ্যই আমি চুপ করে থাকব না। তুমি আমার ভক্ত। তোমাকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।



বেরিয়ে এলেন বীরমণি শিবের সঙ্গে আলোচনা সেরে। মনস্থ করলেন, রাম সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধই হোক। যে রামকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করেন, দেখি তিনি কি করেন।

এদিকে হঠাৎ যখন খেয়াল পড়ল অশ্বরক্ষক বীরদের, তখনই তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খুবই দ্রুতগামী অশ্ব। একেবারে পিছু পিছু ছুটে আসাও সম্ভব নয়। তার গতিপথটা মাত্র লক্ষ্য রাখত তারা। এই নগরে উপবনের মধ্যে ঢুকতে দেখেছে তারা ঘোড়াটিকে। কিন্তু এরই মধ্যে গেল কোথায়, যদি কেউ তাকে ধরে চুরি করে না নিয়ে যায় ?

শুরু হল খোঁজ····খোঁজ। খবর গেল শত্রুঘ্নর কানে। শুনেই তো তিনি চমকে উঠলেন—সে কি ? ঘোড়া তো আর কর্পূর নয় যে উবে যাবে !

মন্ত্রী সুমতির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন—উবে অবশ্যই যায় নি। এখানে যদি না পাওয়া যায়, বুঝতে হবে, রাজাই ঘোড়া আটকেছেন। আর যদি তা হয় দারুণ যুদ্ধ অনিবার্য। আমার মতে, আপাতত, এইখানেই ব্যূহ রচনা করে অপেক্ষা করুন। দেখাই যাক।

শত্রুঘ্ন জানতেন মন্ত্রীবর দারুণ বিচক্ষণ। তাই সঙ্গে সঙ্গে বীরদের ডেকে ব্যূহ রচনা করতে বললেন।

ঠিক সেই সময় কোথা থেকে ঢেঁকিবাহন নারদ এসে হাজির হলেন রামনাম গাইতে গাইতে। নারদ আসতেই শত্রুঘ্ন যথারীতি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন—আপনি তো ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই চোখের সামনে দেখতে পান। বলুন তো, রামচন্দ্রের ঘোড়া কে চুরি করে নিয়ে গেল।

নারদ বললেন—এই দেবপুরের রাজা বীরমণির ছেলে রুক্মাঙ্গদ। রাজার সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কিন্তু অনিবার্য। অনেকদিন পর আবার একটা দেখার মত যুদ্ধ হবে। সাবধান ! বলেই নারদ চলে গেলেন।

সাবধান করে গেলেন নারদ। শুনলেন সবাই। মনে মনে বললেন, স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র যাঁদের সহায়, তাঁদের আবার ভয় কিসের ? হোক না দারুণ যুদ্ধ। উসখুস করে উঠলেন শত্রুঘ্নের যোদ্ধারা।

এমন সময় ওঁদের কানে ভেসে আসে ঢাকের শব্দ। সেই সঙ্গে ঘোষণাবাণী—বিপুল সেনা নিয়ে রামের ভাই শত্রুঘ্ন এসেছে, আক্রমণ করেছে তাদের রাজ্য। যেখানে যত বীর আছ, তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-সাজে বেরিয়ে এস।

এবার নিশ্চিত হলেন শত্রুঘ্ন। তাহলে বীরমণির সঙ্গে যুদ্ধ তাঁদের করতেই হবে।

আবার কানে এল ভেরী-শিঙার আওয়াজ, সেই সঙ্গে অগণিত সেনার কোলাহল। নিজের ব্যূহ থেকেই বসে বসে দেখলেন শত্রুঘ্ন, যোদ্ধার সাজে একের পর এক বীর বেরিয়ে আসছেন নগর প্রান্তে চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে। বেরিয়ে এলেন প্রায় সবাই। তুরী-ভেরী-শিঙার আওয়াজে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। মন্ত্রী সুমতির কাছ থেকে একে একে সকলেরই পরিচয় পেলেন শত্রুঘ্ন—দুই রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, রাজা বীরমণির ভাই বীরসিংহ, ভাগনে বলমিত্র, আর সবচেয়ে উঁচু রথে রাজা বীরমণি।

অনিবার্য এই যুদ্ধ এখন কোন কৌশলে করা যাবে, শত্রুঘ্ন পরামর্শ করলেন সুমতির সঙ্গে। ঠিক হয়ে গেল কৌশল। দু-দলেই শুরু হয়ে গেল নিদারুণ সংগ্রাম।

বীরমণির বেশ কিছু সেনা শত্রুর হাতে মারা যেতেই রথ নিয়ে সামনে এগিয়ে এল রাজকুমার রুক্মাঙ্গদ। হুঙ্কার ছেড়ে ডাকল পুস্কলকে—দেখে তো মনে হচ্ছে মহাবীর। সেজেছও তো সেইরকম। তা ঐ নিরীহদের ওপর বীরত্ব না দেখিয়ে একটু আমার সঙ্গেই দেখাও না।

শুনে হাসল পুস্কল। বলল—তা তোমার নিজের যদি যমপুরী দেখার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমার আপত্তি কি ? সে তো খুব ভাল কথা।

কথা শেষ হতে না হতেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুটে এল পুস্কলের দিকে। এমন তীব্র গতি সে বাণের যে সারথির পক্ষে পুস্কলের রথকে নিজের আয়ত্তে রাখা সম্ভব হল না। প্রলয় তুলল যেন বাণ। পুস্কল সমেত রথকে প্রায় এক যোজন দূরে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। সেই গতির টাল সামলানো কি যা-তা কথা !

যাই হোক, পুস্কল কোন রকমে সামলে নিয়ে ছুঁড়ল বিদ্রূপ বাণ—বাঃ, তুমি তো দেখছি মহাবীর ! তা তোমার মত মহাবীর এখনো এখানে কেন ? তোমার স্থান হওয়া উচিত দেবলোকে। দেবরাজ ইন্দ্রের সেনাপতি হওয়া উচিত তোমার। তা তিনি যখন নিজে নিয়ে যান নি, তখন আমিই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও।

এই বলে নিজের তূণীর থেকে একটা শর বের করে যেই ছুঁড়লেন, রুক্মাঙ্গদ সমেত তার সোনার রথ সোজা উঠে গেল আকাশের এত উঁচুতে যে প্রায় সূর্যের কাছাকাছি। সূর্যের তাপে পুড়ে গলে তাল পাকিয়ে গেল রথ, আর সর্বাঙ্গ পুড়ে শূন্য থেকে এসে নিচে আছড়ে পড়ে রুক্মাঙ্গদ জ্ঞান হারাল।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীনিধির সঙ্গে শুভাঙ্গদের, আর সুমদের সঙ্গে বলমিত্রের তখনও চলেছে তুমুল সংগ্রাম।

রুক্মাঙ্গদ জর্জরিত হয়েছে শুনে রাজা বীরমণি দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রথ নিয়ে তর্জন গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলেন—কে ? কে আমার ছেলের এই অবস্থা করল ? আজ তাকে যমপুরী দেখিয়ে তবে আমার ছুটি।

বীরমণিকে এগিয়ে আসতে দেখে হনুমান আস্ফালন করে উঠলেন।

তেড়ে হনুমান যেই বীরমণির দিকে যেতে যাবেন, বাধা দিল

পুষ্কল—এ কি, আমি এখনও এখানে থাকতে রাবণ-বিজয়ী মহাবীর আপনি যাচ্ছেন ঐ সামান্য একজন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ?

হনুমান বললেন—পুষ্কল, বীরমণিকে অত সামান্য ভেবো না। ওর বাড়িতে মহাদেব বাঁধা।

শুনে মৃদু হেসে পুষ্কল বলল—মহাদেব বীরমণির ঘরে, আর রামচন্দ্র যে আমার বুকে।

এরপর হনুমানের আর কিছু বলার নেই। সত্যিই তো, রামচন্দ্র যার বুকে, তার আবার ভয় কি ?

রথ নিয়ে পুষ্কল গিয়ে দাঁড়াল বীরমণির সামনে।

পুষ্কলকে দেখে রাজা বীরমণি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—তুমি ? তুমি আমার ছেলের এই অবস্থা করেছ ? আমি ভেবেছিলাম বুঝি বা অন্য কোন প্রবীণ বীর। নাবালক তুমি, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমাকে ?

বীরমণির বিদ্রূপে উত্তেজিত হয়ে উঠল পুষ্কল। বলল—হ্যাঁ, বয়সে আমি আপনার তুলনায় নাবালক বটে, তবে অস্ত্রমুখেই পরিচয় হয়ে যাক কে নাবালক, আর কে সাবালক।

শুনে বীরমণি বললেন—যদিও এটা আমার লজ্জা, তবে তাই হোক।

শুরু হল পুষ্কল আর বীরমণির দ্বৈরথ যুদ্ধ

দেখতে দেখতে যুদ্ধ নিল এক ঘোরতর রূপ। বীরমণির বাণে পুষ্কল, আর পুষ্কলের বাণে বীরমণি —দু'জনেই নাস্তানাবুদ, ক্ষতবিক্ষত। দুজনেরই সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্ত, তবুও বিরাম নেই। কে হারে, কে জেতে ঠিক নেই।

শেষে বীরমণি নিজের ধনুকে এমন কতকগুলো বাণ ছুঁড়লেন, যা ছুটে এসে প্রায় খাঁচার মত ঘিরে ফেলল পুষ্কলকে। না পারে পুষ্কল আর হাতে তুলে তূণীর থেকে বাণ নিতে, না পারে নড়াচড়া করতে।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন বীরমণি। বিদ্রূপ করে উঠলেন—কি হে বীর ! এবার জীবন্ত বন্দী হয়ে থাকো। প্রাণে আর মারলাম না তোমাকে।

নিজের অসহায় অবস্থা দেখে, মনে মনে পুষ্কল রামচন্দ্রকে স্মরণ করে একটা একটা করে বাণের সেই ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গর্জন করে উঠল—রাজা, এবার তুমি নিজেকে সামলাও। অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ। বলেই এমন এক বাণ ছুঁড়ল সে, যার আঘাত বীরমণির পক্ষে সহ্য করা মোটেই সম্ভব হল না। জ্ঞান হারালেন বীরমণি। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সেনারা।

কো বীরসিংহ এখন। তাঁকে আটকেছেন আবার হনুমান নিজে। পারবেন কেন বীরসিংহ কপিবরের সঙ্গে ? অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারালেন তিনি।

ইতিমধ্যে রুক্মাঙ্গদের জ্ঞান আবার ফিরে এসেছিল। কাকা বীরসিংহকে পড়ে যেতে দেখে শুভাঙ্গদকে নিয়ে দু-ভাই যেই এগিয়ে এল কপিবরের কাছে, হনুমান লেজে তাদের দু-জনের রথ জড়িয়ে শূন্যে তুলে এমন আছাড় দিলেন যে, রথও গেল, ওরা জ্ঞানও হারাল।

বাকি ছিল আর রাজার ভাগনে বলমিত্র। সুমদকে তিনি ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসতে যাবেন কি, রুখে দাঁড়াল পুষ্কল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পুষ্কলের বাণে সে-ও জ্ঞান হারাল।

যুদ্ধ প্রায় শেষ। শত্রুঘ্ন-শিবিরে সবেমাত্র শুরু হয়েছে একটু একটু বিজয়োল্লাস, এমন সময় মার···মার··· শব্দে যেন কেঁপে উঠল ত্রিভুবন।

কি ব্যাপার ! হঠাৎ এমন প্রলয়ঙ্কর শব্দ কিসের ?

শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন শত্রুঘ্ন থেকে সবাই। এসে দেখলেন—স্বয়ং জটাজুটধারী মহাদেব তাঁর অনুচরদের নিয়ে দিব্যরথে, দিব্য অস্ত্র হাতে এসে হাজির হয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে।

শত্রুঘ্ন এবার নিজে এগিয়ে এলেন শিবকে প্রতিরোধ করতে।

ত্রিনেত্র শিবের চোখ জ্বলছে ধকধক করে—কোথায় ? কোথায় সেই পুষ্কল যে আমার ভক্তকে নিগ্রহ করে। ভক্তের অবমাননার প্রতিফল তোমাদের পেতেই হবে শত্রুঘ্ন, যত বড় বীরই তোমরা হও। তার জন্য প্রস্তুত হও। বলেই ডাকলেন বীরভদ্রকে।

মহাদেবের অনুচরদের মধ্যে সে অসীম শক্তিধর, একাই দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিল।

—আদেশ করুন, প্রভু।

—যাও, উচিত শিক্ষা দাও পুষ্কলকে। নন্দী, তুমি···তুমি ঐ রামভক্ত কপিবরকে বেশ করে একটু জ্ঞান দিয়ে দাও। বলে এরপর শিব ভৃঙ্গীকে সুবাহুর কাছে, প্রচণ্ডকে কুশধ্বজের কাছে, আর চণ্ডকে পাঠালেন সুমদের কাছে।

শুরু হল আর এক অভিনব সংগ্রাম।

সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠল বীরভদ্রের সঙ্গে পুষ্কলের যুদ্ধ।

বীরভদ্র ভেবেছিল, সামান্য এক বালককে জব্দ করতে কতক্ষণই-বা লাগবে ? কিন্তু, সমরে নেমে দেখল, দেখতে বালক হলে কি হবে, যেমন সাহসী তেমনি নিপুণ যোদ্ধা।

যেভাবেই আক্রমণ করুক বীরভদ্র, সুকৌশলে পুষ্কল তা কাটিয়ে বীরভদ্রকে হানতে লাগল মোক্ষম মোক্ষম বাণ।

বাণের ওপর বাণ, তার ওপর বাণ। দু-জনেই হানে দু-জনকে। বর্মভেদ করে রক্ত ঝরে পুষ্কলের সর্বাঙ্গে। কিন্তু, কোন দিকেই তার জন্য কাতর নয় পুষ্কল। বরং বীরভদ্রের এক একটা আঘাত বাড়িয়ে দেয় ক্ষত্রিয়-তেজ।

কোথায় শিবের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুচর বীরভদ্র, আর কোথায় সামান্য একজন ক্ষত্রিয় বালক ভরতের ছেলে পুষ্কল ! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁদের যুদ্ধ দেখেন দেবতারা।

সমানে কেটে গেল চারদিন। না হারে বীরভদ্র, না পরাজিত হয় পুষ্কল।

পঞ্চম দিন। নিদারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবার বীরভদ্র, সেই সঙ্গে লজ্জা। একটা সামান্য নাবালকের সঙ্গে কেটে গেল তার চারটে দিন ! আজ যেভাবেই হোক একটা নিষ্পত্তি করতেই হবে।

মনে মনে শিবকে স্মরণ করে বীরভদ্র হঠাৎ কৌশলে পুষ্কলকে তুলে নিয়ে গেল শূন্যে। দু-জনের রথ আগেই গিয়েছিল, চলছিল হাতাহাতি। বীরভদ্র ভেবেছিল শূন্যে তুললে পুষ্কল নিশ্চয়ই অসহায় হয়ে পড়বে। কিন্তু হল ঠিক উল্টো। মাটিতে দাঁড়িয়েও পুষ্কল যে বীরত্ব নিয়ে বীরভদ্রের সঙ্গে লড়াই করছিল, সেভাবে শূন্যেও লড়াই করতে করতে হঠাৎ টেনে মাটিতে নামিয়ে, শুইয়ে দিয়ে সে চেপে ধরল বীরভদ্রের গলা। বরীভদ্র একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই দারুণ আক্রোশে নিজেকে কোন রকমে মুক্ত করে, পুষ্কলকে ফেলে, ত্রিশূল দিয়ে দিল তার মুণ্ড কেটে। একদিকে ধড় আর একদিকে মুণ্ড নিয়ে নিষ্প্রাণ দেহে বীর পুষ্কলের পতন ঘটল

যুদ্ধক্ষেত্রে।

শত্রুঘ্ন শিবিরে উঠল হাহাকার। স্তম্ভিত দেবকুল।

মর্মাহত শত্রুঘ্ন যখন আপন মনে বিলাপ করছেন 'পুস্কল' 'পুস্কল' বলে, যোদ্ধার বেশে স্বয়ং শিব ষাঁড়ের পিঠে চেপে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

বললেন—তোমার বীর ভাইপো যুদ্ধে বীরের মতই প্রাণ দিয়েছে, তার জন্য তোমার শোক সাজে না। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অস্ত্র ধর। আমার ভক্তকে নিপীড়নের সাজা তোমাকেও পেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে শোক তাপ ভুলে উঠে দাঁড়ালেন মহাবীর শত্রুঘ্ন।

—ঠিক বটে। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। বলেই হাতে তুলে নিলেন তাঁর মহাধনু। তূণীর থেকে সংগ্রহ করলেন মহা-মহা বাণ। আর চোখের পলকে তা ছুঁড়লেন শিবকে লক্ষ্য করে।

শিবও সেই দুরন্ত শরগুলোকে প্রতিহত করার জন্য ছুঁড়লেন অসংখ্য বাণ। বাণে বাণে ছেয়ে গেল আকাশ, প্রায় ঢেকে গেল সূর্যের আলো।

একদিকে মহারুদ্র আর একদিকে রামের ভাই শত্রুঘ্ন। ওদিকে রণক্ষেত্রে বীরভদ্র, নন্দী, চণ্ড নামে অনুচররা ঘটিয়ে চলল তাণ্ডব কাণ্ড। শরে শরে ঢেকে গেল মাটি।

শিব আর শত্রুঘ্নের মধ্যে এগারো দিন ধরে সমানে চলল বাণ-যুদ্ধ।

বারো দিনের দিন। অধৈর্য শত্রুঘ্ন শিবকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন ব্রহ্মশির নামে এক মহা অস্ত্র। ছোঁড়ার আগে পর্যন্ত তিনি জানতেন, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই, সে যত বড় শক্তিধরই হোক না হোক, এই অস্ত্রকে ঠেকায়। শিবকে এবার ধারাশায়ী হতেই হবে। কিন্তু অবাক হলেন, আগুনের হল্কা তুলে ব্রহ্মশির শিবের কাছে যাওয়ামাত্র কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেল।

হতচকিত শত্রুঘ্ন যখন ভাবছেন, এরপর কি করবেন, কানে এল তাঁর রুদ্রের অট্টহাসি—শত্রুঘ্ন, ব্রহ্মশির ছুঁড়লে তো, কিছু করতে পারলে? এবার আমার বাণ সামলাও।

নিজেকে সামাল দেবার আগেই একটা যেন আগুনের গোলা এসে পড়ল শত্রুঘ্নের বুকে। সামলাতে পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মহাবীর শত্রুঘ্ন।

হাহাকার করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শত্রুঘ্নের সেনাবাহিনী। লক্ষ্মীনিধি নেই, সুবাহু নেই, সুমদ নেই। ওদিকে তখনো চলেছে প্রমত্ত সৈন্যের উল্লাস। এরই মধ্যে কপিবর কোনক্রমে পুস্কলের মৃতদেহ একটা রথে রেখে গোপনে তার পাহারা রাখার বন্দোবস্ত করেছিলেন, কেননা ইতিমধ্যেই শিবের ডাকিনী-যোগিনীরা এসে খেতে শুরু করে দিয়েছিল শবদেহ।

ছত্রকার রামসেনা। মৃত, আহত, মূর্ছিত বীরের দল। যজ্ঞের ঘোড়া এখনও বন্দী।

কপিবর এবার রুখে দাঁড়ালেন।

—শিব, তুমি না রামভক্ত? এই তোমার রামভক্তির নমুনা? আমি এখনও আছি শিব, রামভক্ত হনুমান। ভক্তির শেষ পরিচয় আজ তোমার সঙ্গে আমার হয়ে যাক। বলেই তিনি বিশাল এক পাথর তুলে শিবের রথ লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন।

সজোরে পাথর গিয়ে পড়ল শিবের রথে। রথ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। নন্দী তা দেখে শিবকে তুলে নিল নিজের পিঠে। তাই দেখে কপিবর বিশাল একটা গাছ টেনে তুলে হানলেন প্রচণ্ড আঘাত।

শিব আর সহ্য করতে না পেরে হনুমানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন এক মোক্ষম শূল। মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করে হনুমান হাত দিয়ে সেই শূল ধরে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন, তাই দেখে শিব মারলেন লোহার তৈরি এক মহা অস্ত্র। বুকে এসে সজোরে তা যখন লাগল, হনুমান কিছুক্ষণের জন্য বেশ একটা ব্যথা বোধ করলেন। পরমুহূর্তেই আবার চাঙ্গা হয়ে শুরু করে দিলেন গাছ আর পাথর নিয়ে তুমুল লড়াই।

বেশ কিছুক্ষণ তুমুল লড়াই চলার পর একসময় থামলেন শিব, থামালেন কপিবরকে। বললেন—তোমার সঙ্গে যুদ্ধে তুমি আমায় যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছ। আমি তোমায় বর দিতে চাই। বল, কি তোমার অভিলাষ।

হনুমান বললেন—যদি সন্তুষ্টই হয়ে থাকেন, তবে যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি, আপনি সবকটি মৃত, মূর্ছিত, অচৈতন্য দেহকে আগলে রাখুন, যেন কোন ডাকিনী বা রাক্ষসী ক্ষতি করতে না পারে।

শিব বললেন—বেশ, তাই হবে।

শিব রইলেন পাহারায়, এদিকে হনুমান চলে গেলেন সোজা দ্রোণপর্বতে।

গাছ-গাছড়ায় ভরা এই দ্রোণপর্বতে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র সব দেবতাদের নিয়ে থাকতেন। খুবই সুরক্ষিত।

হনুমান গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ ধরে এমন সজোরে নাড়া দিলেন যে এই বুঝি উল্টে পড়ে পাহাড়। দেবরাজ ইন্দ্র থেকে সবাই চমকে উঠলেন—কি হল? কি হল? হঠাৎ এ কি হল? ইন্দ্র খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখেন হনুমান পাহাড় নাড়া দিচ্ছে।

—এ কি করছ তুমি? তোমার এত বড় সাহস যে আমার পাহাড় তোলার চেষ্টা কর তুমি? গর্জন করে ওঠেন ইন্দ্র।

—হ্যাঁ, সাহস আছে বলেই তো এসেছি। এসেছি মৃত-সঞ্জবনী নিতে। ভালয়-ভালয় যদি দিয়ে দাও, তাহলে পাহাড় তোলার কোন দরকারই নেই আমার। বললেন হনুমান।

—না, তুমি পাবে না।

—তাহলে চেষ্টা করে দেখ, পাহাড় আটকে রাখতে পার কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের সঙ্গে বেধে গেল হনুমানের এক খণ্ড যুদ্ধ। ইন্দ্রের বজ্রও যখন বিফল হল, দেবরাজ তখন হনুমানকে মৃত-সঞ্জীবনী লতা দিতে বাধ্য হলেন।

নিমেষের মধ্যে মৃত-সঞ্জীবনী এনে হনুমান প্রথমে পুস্কলের মাথাটা দেহের সঙ্গে জোড়া দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর শত্রুঘ্ন থেকে সব্বাইকে বাঁচিয়ে তুলতেই আবার শুরু হয়ে গেল লড়াই। যেন কয়েক ঘণ্টার মত ঘুমিয়ে, বিশ্রাম নিয়ে আবার তাঁরা নতুন উদ্দীপনায় লড়াইয়ে নামলেন। যে যার সঙ্গে লড়াই করছিল, সে তারই সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়াই করে চলল। দেখতে দেখতে যুদ্ধ এমন আকার ধারণ করল, যে লড়াইয়ে বুঝি-বা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়!

শিব আর শত্রুঘ্ন—দু-জনেই দু-জনকে সমান ভাবে অস্ত্র দিয়ে প্রহার করে চলছিলেন। কিন্তু শেষে শত্রুঘ্নর এমন অবস্থা এসে

ভাল, যে তিনি শিব পাশে আবদ্ধ হয়ে প্রায় অসহায় হয়ে হনুমানের দিকে তাকালেন। যদিও ওদিকে তাঁর বীরদের হাতে, রাজা বীরমণি থেকে অনেকেই লুটিয়ে পড়েছেন।

হনুমান তখন শুধু বললেন—আপনি মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করুন।

যদিও দাদার ওপর তাঁর ভক্তি অপরিসীম, আর মনেও করেন যে তিনি সব সময়েই তাঁর সঙ্গে আছেন, তবুও মন-প্রাণ দিয়ে রামচন্দ্রকে ডাকতে লাগলেন।

আর এমনি আশ্চর্য, দেখলেন সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্র।

বিস্মিত হলেন শত্রুঘ্ন। ভুল দেখছেন না তো? না। যজ্ঞমণ্ডপ থেকে বের হবার সময় যে বেশে তিনি রামচন্দ্রকে দেখে এসেছিলেন, ঠিক সেই বেশেই তো তিনি সামনে দাঁড়িয়ে।

হনুমান প্রভুকে দেখামাত্রই সাষ্টাঙ্গে এসে প্রণাম জানালেন। শিব এগিয়ে এসে করলেন আলিঙ্গন।

বললেন—অপরাধ নেবেন না। যদিও খুবই অন্যায় করেছে, তবু বীরমণি আমার ভক্ত, আমি ওকে কথা দিয়েছি, সব সময়ই আমি ওর পাশে থাকব। বীরমণি আপনারাও ভক্ত। তবে এখন একটু মোহে পড়েই এত কাণ্ড ঘটিয়ে বসল।

হাসিমুখে রামচন্দ্র বললেন—আচ্ছা হর, তোমার যারা ভক্ত, তারা কি আমার ভক্ত নয়? ভক্তকে সব সময় রক্ষা করাই তো ধর্ম। তুমি ধর্মরক্ষাই করেছ।

এরপর শিব-পাশ থেকে মুক্ত হলেন শত্রুঘ্ন।

রামচন্দ্রের করস্পর্শে বীরমণি তাঁর মূর্চ্ছিত আত্মীয়-পরিজন নিয়ে আবার চোখ মেলেই সামনে রামচন্দ্রকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

সকলকে সুস্থ করে হঠাৎ যেমন ভাবে এসেছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই চলে গেলেন রামচন্দ্র।

শিব বীরমণিকে বললেন—আমার কাজও মিটেছে, তোমার আশাও মিটেছে। তুমি এবার রামচন্দ্রকে অনুসরণ কর। আমি কৈলাসে চললাম—এই বলে শিবও অন্তর্হিত হলেন।

বীরমণি যজ্ঞের ঘোড়া তো ছেড়ে দিলেনই, সেই সঙ্গে সপরিবারে শত্রুঘ্নের অনুগামীও হলেন।

রামভক্ত সুরথের মুখোমুখি শত্রুঘ্ন

হেমকূট পর্বত পেরিয়ে রামচন্দ্রের অশ্ব এসে প্রবেশ করল কুণ্ডল নগরে।

এখানে নাকি কোন এক সময় সূর্যদেবের কানের একটা কুণ্ডল খসে পড়েছিল। তাই এর নামই হয়ে গিয়েছিল কুণ্ডলনগর।

এখানকার রাজা সুরথ, রানী বীরবতী আর তাঁদের দশ ছেলে চম্পক, মোহক, রিপুঞ্জয়, দুর্বার, প্রতাপী, বলমোদক, হর্য্যক্ষ, সহদেব, ভূরিদেব আর সুতাপন প্রত্যেকেই যেমন ক্ষত্রিয় বীর, তেমনি ছিলেন রামচন্দ্রের একান্ত ভক্ত। তাঁদের ভক্তি ছিল অতুলনীয়। যদিও তাঁকে তাঁরা কখনো চোখে দেখেন নি, শুধু শুনেছিলেন নাম আর গুণ। তাতেই এমন মজে গিয়েছিলেন যে, নিজের প্রাসাদে তো বটেই, কি রাজ্যের সর্বত্র অবিরাম চলত রামনাম।

এ হেন রাজা সুরথের রাজ্যে যখন রামচন্দ্রের ঘোড়া ঘুরতে ঘুরতে এল, সকলকে ডেকে রাজা পরামর্শ করে ঠিক করে ফেললেন, এই ঘোড়াকে তিনি বেঁধে রাখবেন। স্বয়ং রামচন্দ্র নিজে না এলে কোন মতেই তা ছাড়বেন না। অনর্থ হবে ঠিকই। তবুও, যদি সত্যিই তিনি ভক্ত হন—তাহলে, ভক্তের আবেদনে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে।

মনস্থ করে সুরথ ঘোড়াটিকে বেঁধে ফেললেন।

এদিকে ঘোড়া আবার বাঁধা পড়েছে সুরথের হাতে। আর সুরথ নিজেও রামভক্ত, শুনে মন্ত্রী সুমতির সঙ্গে পরামর্শ করে শত্রুঘ্ন ডাকলেন অঙ্গদকে।

অঙ্গদ আসতেই শত্রুঘ্ন তাঁকে বললেন—অঙ্গদ, স্বয়ং রামচন্দ্রের নির্দেশে তুমিই রাবণের কাছে গিয়েছিলে দূত হয়ে। আর একবার তোমায় যেতে হবে রাজা সুরথের কাছে আমার দূত হয়ে। তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে, কাজটা তিনি ঠিক করছেন না। অবিলম্বে যেন ঘোড়া ফিরিয়ে দেন। নচেৎ যুদ্ধ অনিবার্য। রাজা কোনটি চান, তা ঠিক করে তোমাকেই জেনে আসতে হবে।

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে অঙ্গদ গিয়ে হাজির হল রাজা সুরথের রাজসভায়। সভায় শুনল রামের গুণগান। আর রামনাম ছাড়া অন্য কিছু নেই বললেই হয়। প্রথমে দেখে সে বেশ ভাবনায় পড়ল। রামের এমন ভক্ত, অথচ তাঁরই বিরুদ্ধে এ কি আচরণ!

সভায় হতবাক্ অঙ্গদকে দেখামাত্রই রাজা সুরথ তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—বলুন, কি বার্তা আপনার।

অঙ্গদ নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—রাজা, আমি শুধু শত্রুঘ্নের কাছ থেকে এইটুকু বলতে এসেছি যে, রামচন্দ্রের যজ্ঞের ঘোড়া আটকে ভাল কাজ করেন নি। এখুনি ছেড়ে দিন। সেই সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করুন। নচেৎ শত্রুঘ্নের হাতে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।

শুনে সুরথ বললেন—দূত, তাহলে শুনুন আমার প্রতিজ্ঞা। শত্রুঘ্নের ভয়ে আমি ঘোড়া ছেড়ে দেব না। স্বয়ং রামচন্দ্র যদি এখানে আসেন, তাঁর দর্শন যদি আমি এখানে পাই, তবে এ ঘোড়া আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে। আপনি আমার এই কথা নিশ্চিন্ত মনে আপনাদের রাজা শত্রুঘ্নকে গিয়ে বলতে পারেন।

অঙ্গদ বলল—আমি দূত মাত্র। তবুও বলি, রাজা, এমন ঔদ্ধত্য দেখাবেন না। আপনি যত বড় বীরই হোন, শত্রুঘ্ন, রামসেবক হনুমান, সুগ্রীব প্রমুখ বানররাজরা, ভরতপুত্র পুষ্কল, এছাড়াও কুশধ্বজ, নীলরত্ন, রিপুঞ্জয়, প্রতাপাগ্র, সুবাহু, সুমদ, বীরমণি, সত্যবান-দের মত ক্ষত্রিয় বীর যেখানে সমবেত, সেখানে এই ঔদ্ধত্য

কি আপনার শোভা পায় ? বরং অশ্ব ফিরিয়ে দিন, শত্রুঘ্নের শামিল হয়ে অযোধ্যায় চলুন। সেখানেই দর্শন পাবেন রামচন্দ্রের। তার জন্য এই শত্রুর মত আচরণ কেন করছেন ?

—দূত, অযোধ্যার কথা পরে। আমি যা করেছি ভেবে-চিন্তেই করেছি। গিয়ে আপনার রাজাকে বলুন, তিনি যেন সকলকে নিয়ে রণসাজে এসে চেষ্টা করতে পারেন। আমার একটাই কথা আর শেষ কথা—আমি যদি যথার্থ ভক্ত হই, তাহলে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে এখানে দর্শন দেবেন।

বার্তা নিয়ে ফিরে এল অঙ্গদ। সৃষ্টি হল অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রণসাজে সজ্জিত হলেন শত্রুঘ্ন-শিবিরের ক্ষত্রিয় বীররা।

ইতিমধ্যে সুবিপুল বাহিনী নিয়ে সমর-প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়েছেন সুরথ। দেখলেন শত্রুঘ্ন অগণিত সেনা, রথ, হাতি, ঘোড়া, পদাতিক নিয়ে হাজির চতুরঙ্গ বাহিনী—শুনলেন ঘন ঘন তূরী-ভেরীর হুঙ্কার। বুঝলেন যুদ্ধ অনিবার্য।

পুষ্কল থেকে শুরু করে সবাই রণসজ্জা নিয়ে নিজের নিজের রথে উঠে বসলেন।

তারপর রণক্ষেত্রে এগিয়ে যেতেই শুরু হয়ে গেল দ্বৈরথ যুদ্ধ।

চম্পকের সঙ্গে পুষ্কল, মোহকের সঙ্গে কুশধ্বজ, রিপুঞ্জয়ের সঙ্গে বিমল, দুর্বারের সঙ্গে সুবাহু, প্রতাপীর সঙ্গে প্রতাপাগ্র্য, বলমোদকের সঙ্গে অঙ্গদ, হর্য্যক্ষের সঙ্গে নীলরত্ন, সহদেবের সঙ্গে সত্যবান, ভূরিদেবের সঙ্গে বীরমণি, অসুতাপনের সঙ্গে উগ্রাশ্ব—শুরু হল মহা সংগ্রাম।

দ্বৈরথ সমর—মুখোমুখি যুদ্ধ। একদিকে মহা মহা ক্ষত্রিয় বীর, অপরদিকে সুরথের দশ ছেলে।

রথের চাকার ঘর্ষণে মাটি উঠল কেঁপে, হাজার হাজার বাণের আনাগোনায় আর বিকট বিকট শব্দে চারদিক যেন ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু যুদ্ধ সবচেয়ে মারাত্মক আকার নিল চম্পকের সঙ্গে পুষ্কলের। পুষ্কল যে বাণই ছোঁড়ে অবলীলায় চম্পক তা কেটে দেয়। আবার চম্পকও যে বাণই ছোঁড়ে পুষ্কল কাটে। কেউ কম যায় না। বাণে বাণে ঘর্ষণে আকাশে জ্বলে ওঠে কখনো দাবানল, কখনো বৃষ্টি।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে যুদ্ধ চলার পর অধৈর্য পুষ্কল ছুঁড়ল ব্রহ্মাস্ত্র। এল যেন প্রলয়কাল। বীর চম্পকের বুক কিন্তু একটুও কাঁপল না। স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মাস্ত্রকে নিস্তেজ করে এবার সে ছুঁড়ল তার মোক্ষম রামাস্ত্র।

পুষ্কলও সঙ্গে সঙ্গে রামাস্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য বাণ সংগ্রহ করতে যাবে কি, একেবারে বেকুব বনে গেল। মুহূর্তে রামাস্ত্র এসে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। অসহায় হয়ে পড়ল পুষ্কল।

কিছুক্ষণ আগেও চম্পকের অমন যে ক্রোধ, এখন আর তা নেই। নিজের সৈন্যদের হাসতে হাসতে শুধু বলল—যাও, রথ-সমেত পুষ্কলকে সম্মানের সঙ্গে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখ।

পুষ্কল বাঁধা পড়েছে চম্পকের হাতে, খবর পেয়েই শত্রুঘ্ন উতলা হয়ে উঠলেন। হনুমানকে বললেন—কপিবর, এখুনি যান, পুষ্কলকে বন্ধনমুক্ত করুন। আপনি থাকতে পুষ্কলকে বেঁধে নিয়ে যাবে সামান্য এক চম্পক ?

হনুমান এলেন, পথরোধ করে দাঁড়ালেন। কিছুমাত্র ভীত নয় চম্পক। হনুমানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলেন বাণের ওপর বাণ। তাতে কিছুই হল না হনুমানের। বরং হনুমানের ছোঁড়া পাথরে ভেঙে গেল চম্পকের রথ। তবুও, দেখে কে চম্পককে। গাছ-পাথর, যা দিয়েই হনুমান আঘাত হানুন না কেন, কোনমতেই তিনি পারেন না চম্পককে কায়দা করতে। শেষে হঠাৎ চম্পককে বগলদাবা করে এক লাফে উঠে গেলেন শূন্যে। সেখানেও যেন চম্পক দারুণ। ঝটপট করতে করতে দু-জনেই যেই নেমে এলেন নীচে, অমনি চকিতে চম্পক হনুমানের লেজ ধরে সবলে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল। বেশ কিছু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লেন হনুমান। একটু অবাকও হলেন। সেই সঙ্গে মনে মনে বীরের প্রশংসাও করলেন। তবুও যুদ্ধ যুদ্ধই। হার-জিত না হওয়া পর্যন্ত বিরাম নেই। এগিয়ে এসে হনুমান এবার চোখের পলকে চম্পককে ধরে ঠিক তেমনি ভাবেই ঘুরপাক খাইয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বেশ কিছু তফাতে ছিটকে পড়ে চম্পক জ্ঞান হারাল। চম্পকের অনুগামীরা হাহাকার করে উঠল, ভেঙে গেল তাদের মনোবল। সেই সুযোগে পুষ্কলকে বন্ধনমুক্ত করে হনুমান যেই নিয়ে আসতে যাবেন, তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন রাজা সুরথ।

—আপনিই রামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত। তবুও তাঁর ওপর আমার যদি কিছুমাত্র ভক্তি থাকে, তাহলে, শুনে রাখুন বীরবর, আমার হাতে আপনাকে বাঁধা পড়তেই হবে।

শুনে হনুমান হেসে বললেন —যদি পড়তেই হয়, তাহলে আমি যাঁর ভক্ত, তিনিই আমায় উদ্ধার করবেন।

আর কোন কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে সুরথের ধনুক থেকে এক ঝাঁক বাণ ছুটে এল হনুমানের দিকে। নির্বিবাদে হনুমান সেগুলো তেজহীন করে দিয়ে প্রকাণ্ড এক পাথর তুলে এমন ছুঁড়লেন যে, রাজা সুরথের রথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছিটকে পড়লেন রাজা, ছিটকে গেল শরাসন।

তবে তা মুহূর্তের জন্য। সুরথ আবার নিলেন এক নতুন রথ। নতুন শরাসন। হনুমানকে লক্ষ্য করে আবার ছুটে এল ঝাঁক ঝাঁক বাণ। ঠিক সেই ভাবেই হনুমান সেগুলোকে অকেজো করে দিলেন। ভেঙে দিলেন রথ। এভাবে, একান্নটা রথ বদল করলেন রাজা সুরথ। হনুমানের সঙ্গে পাশুপত, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই আর কায়দা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা, হনুমানকে তিনি বাঁধবেনই। শেষে নতুন শরাসন থেকে তুলে নিলেন রামাস্ত্র, ছুঁড়লেন হনুমানকে লক্ষ্য করে। রামাস্ত্রকে ছুটে আসতে দেখে হনুমান কিন্তু এবার নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। বাঁধা পড়লেন সুরথের হাতে।

হনুমান বাঁধা পড়তে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ছুটে এল পুষ্কল। কিন্তু সাধ্য কি পুষ্কলের যে, রাজা সুরথের মারাত্মক প্রহার সহ্য করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-ও জ্ঞান হারাল।

ওদিকে সুরথের ছেলেদের হাতেও নাস্তানাবুদ মহা মহা বীরেরা।

এবার স্থির থাকতে পারলেন না শত্রুঘ্ন। তিনি দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান জানালেন সুরথকে।

মহা অসুর-বিজয়ী শত্রুঘ্ন মহাবীর। কিন্তু কিছুমাত্র ভীত নন সুরথ। মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে অটল পাহাড়ের মত

তিনি দাঁড়ালেন শত্রুঘ্নের সামনে।

মোহনাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র থেকে শুরু করে শত্রুঘ্নের সব শরই বিফল হল। অবাক হলেন শত্রুঘ্ন। তাঁর অস্ত্রের ভয়ে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, কেমন করে এমন ভাবে নিষ্ফল হল সে সব! এমন সময় দেখলেন, সুরথের ধনুক থেকে তাঁরই দিকে ছুটে আসছে জ্বলন্ত আগুনের মত এক বাণ। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুঘ্ন তা প্রতিরোধ করলেন বটে, কিন্তু ফলার তীক্ষ্ণ ডগাটুকু এসে বিঁধে গেল তাঁর বুকে। তিনি জ্ঞান হারালেন।

সুরথ-শিবিরে উঠল জয়োল্লাস। কিন্তু চকিতে তা থামিয়ে দিয়ে গর্জন তুলে এগিয়ে এল সুগ্রীব।

মুচকি হাসলেন রাজা সুরথ। বললেন—সুগ্রীব, জানি তুমি মহাবীর, তবু তোমার লম্ফঝম্প থামাও। এখুনি তোমার দশাও ঐ কপিবরের মতই হবে।

আর মুহূর্ত মধ্যে হলও তাই। রামাস্ত্রে হনুমানের মতই বাঁধা পড়লেন সুগ্রীবও।

যুদ্ধ শেষ। কুণ্ডলনগরে মহোৎসব।

সবাইকে নিয়ে রাজা সুরথ ফিরে এলেন প্রাসাদে। সঙ্গে রামাস্ত্রে বাঁধা হনুমান-সুগ্রীব।

একটু জিরিয়ে নিয়ে রাজা বললেন—কপিবর, তুমি তো রামচন্দ্রের বড় ভক্ত। কই রামচন্দ্র? ডাকো তাঁকে। তিনি এসে তোমার বাঁধন খুলে দিন।

—হ্যাঁ, ডাকতে হবে বৈকি। ভক্তবৎসল রাম কি ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? এই বলে হনুমান এক মনে স্মরণ করলেন রামচন্দ্রকে।

হঠাৎ রাজসভা যেন হাজার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকলেই অবাক হয়ে দেখলেন চতুর্ভুজ শ্রীহরি রামচন্দ্রকে।

বন্ধন-মোচন হল হনুমান-সুগ্রীবের। জ্ঞান ফিরে পেলেন পুস্কল, শত্রুঘ্ন আর সব বীররা।

সুরথ লুটিয়ে পড়লেন রামচন্দ্রের পায়ে—প্রভু! আমার সব অপরাধ ক্ষমতা করুন। প্রভু! শুধু একবার আপনাকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম মাত্র।

রামচন্দ্র সুরথকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—সন্দেহ নেই হনুমান আমার প্রধান ভক্ত। সুরথ, তুমি আমার সেই ভক্তকেও বেঁধেছ—বেঁধেছ আমাকেও। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার আন্তরিকতা।

সুরথের প্রার্থনা শেষ। শত্রুঘ্ন-শিবিরও আবার সজাগ হয়ে উঠেছে। সামনে স্বয়ং রামচন্দ্রকে দেখে সকলেই রীতিমত অবাক।

মুক্ত হল যজ্ঞের ঘোড়া। সেই সঙ্গে মুক্ত হলেন রাজা সুরথ নিজেও। চম্পককে সিংহাসনে বসিয়ে, তাঁর সর্বস্ব দিয়ে, তিনি এবার হলেন রাম-সেবক। হলেন শত্রুঘ্নের অনুগামী।

রামচন্দ্র আবার সবার অলক্ষ্যেই ফিরে গেছেন অযোধ্যায়।

ঘোড়া মুক্ত হয়ে আবার যাত্রা শুরু করেছে তার ইচ্ছামত পথে। তাকে অনুসরণ করে চলেছেন সবাই।

ঘোড়া পেরিয়ে গেল কত দেশ, কত নগর, কত রাজধানী। নিশ্চিন্তে। কোথাও আর তার কেউ কোন গতিরোধ করল না।

ঘোড়া চলেছে জাহ্নবীর কোল ঘেঁষে। চলেছে মনের আনন্দে। অশ্বরক্ষক কোটি সেনা নিয়ে দুর্মদ বীর রাজাদের সঙ্গে পুস্কল, শত্রুঘ্ন, মন্ত্রীবর সুমতি। চলেছেন নল, নীল, সুগ্রীব আর পবন-নন্দন হনুমানও।



লব-কুশ ও শত্রুঘ্ন

জাহ্নবীর তীরে মনোরম আশ্রম। গাছে-গাছে, ফুলে-ফুলে অপরূপ। সেই আশ্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকজন মুনি-বালক।

ঘোড়া গিয়ে ঢুকল সেই আশ্রমে। ঢুকেই আশ্রমের নধর ঘাস খেতে শুরু করে দিল।

মুনি-বালকদের মধ্যে একজন তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ডাকল সঙ্গীদের—দেখবে এসো, দেখবে এসো, কি সুন্দর একটা ঘোড়া কোথা থেকে এসে ঢুকেছে আমাদের আশ্রমে।

দেখতে ছুটে এল সকলেই। সত্যিই ভারি সুন্দর। তারপর চোখ পড়ল তাদের ঘোড়ার কপালের জয়-পতাকার লেখার দিকে। সঙ্গীরা তা পড়ে বলল—কে এক অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের ঘোড়া। যজ্ঞ করছেন। এটা সেই যজ্ঞের ঘোড়া। যাক, ঘাস খেয়ে চলে যাক।

কিন্তু প্রথম যে বালকটি দেখেছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জয়পত্রটা পড়তে পড়তে তার মুখ-চোখ কুঁচকে গেল। নিজে নিজেই বলে উঠল—কে এই রাম? শত্রুঘ্ন? সে আবার কে? লিখেছে কিনা, তাদের মত বীর আর নেই। স্পর্ধা তো কম নয়!

সঙ্গীদের বলল—এই ঘোড়া আমি বেঁধে রাখব। দেখব, তারা কত বড় বীর!

সবাই একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাল—এটা আশ্রম। শান্তির জায়গা। কেন এখানে অনর্থ ঘটাতে যাচ্ছ?

—তাই বলে এই ঔদ্ধত্য মেনে নিতে হবে? তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমরা পার। কিন্তু আমি জানকীর ছেলে, ক্ষত্রিয়। মুনিবর আমাদের ক্ষত্রিয়ের শিক্ষাই দিয়েছেন। তোমরা যাও, আমি দেখি কে কত বড় বীর। বলে ঘোড়াটিকে ধরে বেঁধে রাখল।

—লব, তুমি দেখছি একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না। বলে তারা বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে ঘোড়ার পেছন পেছন প্রথম যারা আসছিল, তারা এসে দেখল, ঘোড়াটিকে বেঁধে তাকে আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বালক। পরনে বল্কল, মাথায় চূড়া করে বাঁধা চুল, হাতে ধনুক। প্রথমে দেখলেই মনে হবে, হয় স্বয়ং রামচন্দ্র বালক-বেশে এখানে এসেছেন, নয়তো ইন্দ্র কিংবা শিব ছদ্মবেশ ধরে এসেছেন। ভারি সুন্দর দেখতে লাগছিল বালককে।

অনুচররা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—এই ঘোড়া কে বেঁধেছে?

বীরদর্পে উত্তর দিল বালক লব—আমি। সাহস থাকে তো বাঁধন খুলে নিয়ে যাও।

শুনে অবাক হয় অনুচররা। এতটুকু একটা ছেলে, এ কি বলে? বলল—কার ঘোড়া জান? পেছনে কারা আসছেন জান? ছেলেমানুষি না করে ঘোড়া ছেড়ে দাও।

—ছেলেমানুষ বটে। তবে ছেলেমানুষি আমি করি নি। বলেছি তো, আমি তোমাদের রামকেও জানি না, শত্রুঘ্নকেও জানি না। ক্ষমতা থাকে তো আমার কাছ থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে যাও।

অনুচররা রেগে গিয়ে যেই জোর করে ঘোড়া খুলতে গেল, অমনি লবের ধনুক থেকে ছুটে আসতে লাগল বাণের পর বাণ। অনেকের দুটো করে হাতই কাটা পড়ল। কেউ কেউ আঘাত সহ্য করতে না পেরে মূর্চ্ছা গেল। সামান্য কজন সেখান থেকে অক্ষত অবস্থায় প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছিল।

হাঁফাতে হাঁফাতে তারা গিয়ে সব শত্রুঘ্নকে জানাল।

শুনে তো শত্রুঘ্ন অবাক। সামান্য একটা বালকের হাতে মার খেল এতগুলো অনুচর? মন্ত্রী সুমতির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন—মন্ত্রীবর, হোমের ধোঁয়া উঠছে, এটা তো আশ্রম বলে মনে হচ্ছে। এটা তো কোন রাজার রাজধানী নয়। তাহলে কি হতে পারে?

সুমতি বললেন—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। ভালভাবে একটু দেখা দরকার।

শত্রুঘ্ন পাঠালেন সেনপাতি কালজিতকে। যাঁর নামে মহা মহা বীরেরও বুক কাঁপে। বললেন—দেখ তো কালজিত, কে এই বালক। কি তার উদ্দেশ্য।

কিছু সেনা নিয়ে কালজিত সেখানে গেলেন। গিয়ে বালককে দেখে ঠিক সেভাবেই প্রথমটায় চমকে উঠলেন। দেখলেন, ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে আপন মনে সে তার পাশে বসে খেলা করছে।

শত্রুঘ্ন নিশ্চিন্ত না হয়ে কিন্তু কালজিতের পেছন পেছন চতুরঙ্গ বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সেনাপতি কালজিত এসে বলল—বালক, তুমি এই ঘোড়া বেঁধেছ?

—হ্যাঁ। কেন?

—জান, কার ঘোড়া? ছেড়ে দাও, ছেলেমানুষি কোরো না।

—ছেলেমানুষি করব কেন? ঠিকই করেছি। ক্ষমতা থাকে তো খুলে নিয়ে নাও।

—ক্ষমতার পরিচয়! বালক, ও কথা পরে। তোমাকে দেখে আমার রামচন্দ্রের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই বললাম। আমি তাঁরই সেনাপতি কালজিত। তোমার পরিচয় কি?

—আমার পরিচয় জেনে তোমার লাভ? আমি ক্ষত্রিয়। আমার নাম লব। তা তোমার নামটি তো বেশ। কেমন জয় করতে পার, একটু দেখাও না।

বালকের মুখে বিদ্রূপ শুনে রুষ্ট হলেন কালজিত। তবু তারই মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন—তোমার না আছে রথ, না আছে কোন বাহন। রথে চড়ে তোমাকে শিক্ষা দিতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

শুনে লব বলল—অত কথার কোন দরকার নেই। তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকেই একবার চেষ্টা করে দেখ।

এবার সত্যি সত্যিই কালজিত অব্যর্থ শর ছুঁড়লেন লবকে লক্ষ্য করে। দেখলেন, অবলীলাক্রমে লব তার সেই শর কেটে দিয়ে এমন কতকগুলো বাণ ছুঁড়ল যে সারথি গেল, রথও গেল। দেখলেন, যতটা সহজ মনে করেছিলেন, তত সহজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে কালজিত চেপে বসলেন মদমত্ত এক হাতির পিঠে। লবও সঙ্গে সঙ্গে বাণ ফেলে তুলে নিল এক খাঁড়া। বায়ুর মত ছুটে এসে সেই খাঁড়া দিয়ে হাতির শুঁড় কেটে, হাত দিয়ে তার দাঁত টেনে তুলে লাফিয়ে উঠল তার পিঠে। তারপর চুলের মুঠি ধরে হাতির পিঠ থেকে টেনে নামিয়ে আনল কালজিতকে।

সমূহ বিপদ দেখে রাগে কালজিত যেই কুড়ুল তুলে মারতে যাবেন লবকে, খাঁড়ার কোপে কুড়ুল সমেত তার সে হাত কেটে খসে পড়ল। অপর হাত দিয়ে কালজিত আক্রমণ করতে, সে হাতটাও গেল। পা দিয়ে আক্রমণ করতে গিয়ে পা দুটোও হারাল, শেষে মাথাটাও কাটা পড়ল।

অমন দুর্জয় সেনাপতিকে ঐভাবে মারা পড়তে দেখে অনেকে পালাল, আর যারা মদগর্বে গর্বিত হয়ে ছুটে এল তার দিকে, সকলেই নাস্তানাবুদ হল।

খবর পেয়ে যেমন মর্মাহত হলেন শত্রুঘ্ন, তেমনি ক্রুদ্ধও হলেন—কে সেই বালক? কে এমন সে মহাবীর। সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, একা কালজিতের মত সেনাপতিকে নিধন করে এতগুলো সৈন্যকে নাজেহাল করে? যেন বিশ্বাসই হয় না শত্রুঘ্নের।

ডাকলেন পুষ্কলকে—পুষ্কল, দেখ তো, কে সে? এত সাহস ধরে?

মন্ত্রী বললেন—রাজা, পুষ্কল একা নয়। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আপনিও যান। নিশ্চয়ই বাল্মীকির এই আশ্রমে ঐ বালক কোন ছদ্মবেশী। চেষ্টা করুন ওকে জীবন্ত ধরার। রামচন্দ্র দেখলে খুশি হবেন।

খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা।

সজ্জিত হল সুবিশাল সেনাবাহিনী—হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক। গিয়ে গোল করে সাতটা থাকে ঘিরে ফেলল তাকে। প্রথম থাকে হাজার, দ্বিতীয় থাকে অযুত, তৃতীয় থাকে দু-অযুত, চতুর্থ থাকে পাঁচ অযুত, ষষ্ঠ থাকে লক্ষ, আর সপ্তম থাকে দু-লক্ষ সেনা।

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল লব। তারপর নিজের শরাসন আর ধনুক তুলে নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ছাড়ল সিংহগর্জন। একা লব একদিকে, অপরদিকে লক্ষ লক্ষ সেনা। কিন্তু দেখে মনে হল প্রলয়ঙ্কর একটা ঝড়ের শেষে পড়ে আছে যেন অসংখ্য গাছ—কেউ মস্তকহীন, কেউ ছিন্নদেহ, কেউ ক্ষত-বিক্ষত। আর বেশ কিছু প্রাণ বাঁচাবার জন্য তৎপর।

দূর থেকে পুষ্কল দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রীতিমত অবাকও হল। সঙ্গে ছিলেন হনুমান।

এবার রথ নিয়ে এগিয়ে এল পুষ্কল।

—থামো থামো। নিরীহ সেনাদের ওপর যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছ। এখন থামো। বলল পুষ্কল—তোমার পরিচয় কি?

রথে পুষ্কলকে সামনে দেখে মার থামিয়ে লব চোখ তুলে তাকাল পুষ্কলের দিকে—তুমি আবার কে হে বাপু, আমার পরিচয় জানতে এসেছ? আমি সীতার ছেলে লব। কেন?

—সন্দেহ নেই তুমি একজন বীর। তা এই আশ্রমে এসব অনর্থ ঘটাচ্ছ কেন ?

—বাজে কথা রাখ। যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছে থাকে এসো। পার তো, আমার হাত থেকে ঘোড়া নিয়ে যাও। গেলেও পরিত্রাণ পাবে না কিন্তু আমার ভাই কুশের হাত থেকে।

—তোমার তো রথ নেই। কিসে চেপে যুদ্ধ করবে আমার সঙ্গে ?

—কেন বাজে বকে সময় নষ্ট করছ ? হাতি-ঘোড়া তলিয়ে গেল, কোথাকার ভেড়া এল জল মাপতে !

না, আর নয়। পুষ্কল হাতে তুলে নিল ধনুক। শর চাপাতে যাবে কি লবের বাণ এসে কেটে দিল তার ধনুক লহমার মধ্যে। বিস্মিত পুষ্কল বাণ তুলে মারতে যাবে কি, লব চকিতে এসে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিল তার রথ।

এবার পদাতিক পুষ্কল, পদাতিক লব। দুই মহাবীর, দুই মহা ধনুর্ধর মুখোমুখি হল।

শুরু হল এমন এক লড়াই যা বোধ হয় আগে কেউ কখনো দেখে নি। ঠিক যেন ইন্দ্র আর শম্বরের লড়াই। আকাশ-পথে দু-জনেরই বাণ ছোটে হুল্কা তুলে। বর্ম ভেদ করে পুষ্কলের সর্বাঙ্গে যত রক্ত ঝরে, ততই উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে। রক্ত ঝরে লবের সর্বাঙ্গেও। তবুও লড়াই করছে দু-জনে মরিয়া হয়ে।

হঠাৎ ওরই মাঝে আচম্বিতে এক তীর এসে বিঁধল পুষ্কলের বুকে। দারুণ সে বাণের আঘাত সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারাল পুষ্কল।

লব আর কিছু করার আগেই হনুমান পুষ্কলের জ্ঞানহীন দেহ তুলে এনে রাখল শত্রুঘ্নের কাছে।

দেখে ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন শত্রুঘ্ন—হনুমান, এত দেখেও তুমি এখনও চুপ করে আছ ? যাও, যেভাবে হোক, ঐ বালককে বধ কর। ঘোড়া আন।

মহাক্রোধে কপিবর এবার গিয়ে সরোষে আক্রমণ করলেন লবকে।

হনুমানের অজানা তো কিছুই নেই। লবের পরিচয় পেয়ে সব পুরোনো ছবিই তাঁর ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। জানকীর ছেলে লব আর কুশ। রামের স্ত্রী জানকী যে তাঁরও মা। মিথ্যা অপবাদে রামচন্দ্র নির্বাসন দিয়েছিলেন জানকীকে। লক্ষ্মণ তাঁকে রেখে এসেছিলেন বনবাসে। আজ এভাবে যে রামপুত্রদের মুখোমুখি হতে হবে, এ ছিল স্বপ্নেরও বাইরে। ভেতরে তাঁর স্নেহ দুর্বার হয়ে উঠলেও উপায় নেই। ঘোড়া না পেলে প্রভুর অশ্বমেধ যজ্ঞ যে সম্পন্ন হবে না। অপরদিকে সীতা দেবী ! তাঁকে দেখার জন্য, প্রণাম জানাবার জন্যও উতলা হয়ে ওঠে মন। মনে মনে ডাকেন হনুমান রামচন্দ্রকে—এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে প্রভু !

মনের ভেতর তুফান উঠলেও বাইরে তার কিছুমাত্র প্রকাশ না করে রোষভরে সমূল গাছ তুলে নিয়ে কপিবর আক্রমণ করলেন লবকে। মুহূর্তে লব তা বাণে কেটে টুকরো করল। এবার হনুমান লবকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন বিশাল এক পাথর। তাও চুর-চুর হয়ে গেল, ধুলোর মত গুঁড়িয়ে পড়ল। এরপর যেভাবেই চেষ্টা নেন হনুমান সবই বিফল হচ্ছে দেখে, তিনি বিরাট লেজকে আরো বিরাট করে সাপটে ধরলেন লবকে। হনুমানের লেজে বাঁধা পড়ে লব মনে মনে জননী জানকীকে স্মরণ করতে করতে প্রচণ্ড রেগে ঘুসি মারতে লাগল। বেশ ব্যথা পেয়ে শেষে হনুমান বাধ্য হলেন তাকে ছেড়ে দিতে। ছাড়া পেয়েই লব হনুমানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল দুঃসহ সব বাণ ! হনুমান দেখলেন, পালালে শত্রুঘ্ন রাগ করবেন, অথচ বাণের এই মার সহ্য করাও দুঃসাধ্য যেমন, তেমনি দুঃসাধ্য লবকে জয় করা। বাধ্য হয়ে মূর্ছা যাবার ভান করে পড়ে গেলেন তিনি।

মহাবীর কপিবর মূর্ছা গেলে বিভ্রান্ত হলেন সুমদ, বীরমণি প্রমুখ বীরেরাও। লবের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তাঁরা শত্রুঘ্নের কাছে ফিরে গিয়ে সব কিছুই বললেন।

শুনে শত্রুঘ্ন কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে রইলেন।

তারপর ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে এলেন রণাঙ্গনে রথে চড়ে। এসে দেখলেন, সত্যিই নিতান্ত এক বালক। এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তাঁর মত মহাবীরকে ! স্বপ্নেও তা ভাবেন নি।

বললেন—বালক, কে তোমার বাবা ? কে তোমার মা ? রামচন্দ্রের এই যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে কি করবে তুমি। বরং ওটা ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় অনেক ভাল ভাল ঘোড়া দেব।

বিদ্রূপ করে বলল লব—ও, তুমিই বুঝি রামের ভাই শত্রুঘ্ন ? জয়পতাকায় লেখা রয়েছে দেখলাম, তুমি নাকি মহাবীর। আমার পরিচয় জানার কি দরকার ? বীরের পরিচয় তো অস্ত্রে। ক্ষমতা থাকে আমাকে মেরে ঘোড়া নিয়ে যাও। না পার আমার ভাই কুশের বশ্যতা স্বীকার করে ঘরে ফিরে যাও।

—ঘোড়া না নিয়ে ফিরে যাবার জন্য তো আসি নি বালক। তাহলে প্রস্তুত হও।

—আমি তো প্রস্তুতই আছি। দেখি না তুমি কত বড় বীর।

বাণে বাণে আবার ছেয়ে গেল আকাশ। কখনো তুমুল ঝড়, কখনো বৃষ্টি, কিন্তু দুর্জয় লব নির্বিবাদে সব প্রতিহত করে চলেছে দেখে অবাক হলেন শত্রুঘ্ন। এতটুকু একটা ছেলে এমন যুদ্ধ-কৌশল শিখল কোথা থেকে ?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন শত্রুঘ্ন। হঠাৎ লবের এক তীর এসে আঘাত হানল তাঁকে এত জোরে যে রথের ওপরই তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

দেখে লবকে এক জোটে আক্রমণ করলেন যত বীর রাজারা।

প্রতিবাদ জানাল লব—অন্যায়…অন্যায় এ যুদ্ধ। তোমরা না ক্ষত্রিয় রাজা ? এই কি দ্বৈরথ যুদ্ধের নিয়ম ?

কিন্তু সকলেই তখন লবকে মারার জন্য প্রায় উন্মাদ। আর লব একা সবদিক রক্ষা করে তাদেরও নাস্তানাবুদ করে চলেছে।

এই অসমান যুদ্ধ যখন চলছে, জ্ঞান ফিরে এল শত্রুঘ্নের। থামলেন রাজারা।

রথের ওপর আবার ধনুক-শরাসন নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শত্রুঘ্ন। লবকে বললেন—বালক হলেও সত্যিই তুমি বীর। আজ পর্যন্ত আমাকে আহত করে অচেতন করতে কেউ পারে নি। তুমি পারলে। এই প্রথম। তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব ঠিকই, কিন্তু রেহাই দেব না। এবার সামলাও নিজেকে।

বলেই শত্রুঘ্ন এবার ছুঁড়লেন এক মারাত্মক বাণ, যা সচরাচর তিনি ছাড়েন না। হাজার হাজার আগুনের ফুলকি ছড়াতে-ছড়াতে ছুটে এসে সেই বাণ সজোরে আঘাত হানল লবকে। সহ্য করতে না

পেরে অচেতন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়ল বালক লব।

মুনি বালকরা এতক্ষণ পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। লবকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে দেখে তারা পরিত্রাহি ছুটে গেল আশ্রমে। সীতাকে ডেকে সব কিছু বলল।

শুনে সীতাদেবী খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। শুরু করলেন বিলাপ। কুশ নেই। সে গেছে মহর্ষিদের সঙ্গে উজ্জয়িনীতে মহাদেবের পূজা দিতে। পিতৃসম মুনি বাল্মীকিও এখন আশ্রমে নেই। কে তাঁকে যুক্তি দেবেন? কে তাঁকে সাহস দেবেন? পুত্র লবকে কে ফিরিয়ে এনে দেবেন?

ঠিক সেই সময়েই কুশ এসে দাঁড়াল মায়ের সামনে।

—মা, তোমার চোখে জল? লব কোথায়?

সীতা দেবী বললেন—তুই এসেছিস বাবা। এইমাত্র শুনলাম, কোন রাজার যজ্ঞাশ্ব ধরেছিল লব। রাজার সেনাদের সঙ্গে কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। যুদ্ধও করেছে খুব।

—সে কি মা? আমি থাকতে লব পড়বে বাঁধা? তোমার চোখে পড়বে জল? মাগো, আমার সেই দিব্য ধনু, দিব্য শরাসন, শিরস্ত্রাণ দাও মা। প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, ত্রিভুবন এক হলেও, আজ আমার হাতে কারোর পরিত্রাণ নেই।

সীতাদেবী তার হাতে তুলে দিলেন অস্ত্র। জানালেন আশীর্বাদ।

তীরবেগে রণস্থলে যখন ছুটে এল কুশ, সকলের মনে হল যেন একটা উল্কা ছুটে এল। ভাই আসামাত্র লবও যেন জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল।

পুবে কুশ, পশ্চিমে লব—ধনুক-বাণ হাতে দাঁড়াল যমের মত। বাণে-বাণে ছত্রাকার করে দিল মুহূর্তে সব সেনাদের।

সোনার রথ নিয়ে এবার শত্রুঘ্ন এগিয়ে এলেন কুশের দিকে।

—দেখে মনে হয় তোমরা যমজ ভাই। কি তোমাদের পরিচয়? কে তোমাদের বাবা? কে তোমাদের মা?

কুশ বলল—শুধু একটা পরিচয়ই জানি, সীতা আমাদের জননী, আর আমরা পিতৃস্নেহ ও যাবতীয় শিক্ষা পেয়েছি মহামুনি বাল্মীকির কাছ থেকে। বলে কুশ বলল—আমার নাম কুশ, আর আমার ভাই-এর নাম লব। তা কে আপনি যে যজ্ঞাশ্ব ছেড়ে আমার ভাইকে পরাজিত করেছেন। যদি বীর হন, তাহলে আপনার বীরত্বের পরিচয়টা আমার সঙ্গেই দিন।

এই প্রথম পরিচয় পেলেন শত্রুঘ্ন। সামনে তাঁরই আদরের দুই ভাইপো, দাদা রামচন্দ্রের ছেলে। কিন্তু পিছিয়ে আসার এখন আর কোন উপায় নেই।

শত্রুঘ্নের মনের অবস্থা ঠিক তখন হনুমানের মতই, তবুও রণহুঙ্কার ছাড়তে বাধ্য হলেন।

নতুন করে আবার শুরু হল ঘোরতর সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে জ্ঞান আবার ফিরে এসেছিল পুষ্কলের। কুশকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে, আবার লেজ তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন হনুমান।

কুশের বাণে-বাণে জর্জর হয়ে ওঠেন শত্রুঘ্ন। আশ্চর্য! অমন সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রও কি অপূর্ব কৌশলে বিফল করে দিল কুশ। মোক্ষম সব বাণ শত্রুঘ্নের, অপরাজেয় বীর। তবুও এক সময় কুশের প্রহার আর সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারালেন শত্রুঘ্ন।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, বিশাল বিশাল শালগাছ, পাথরের টুকরো তুলে আক্রমণ করলেন কপিবর। কুশের আঘাতও এল নির্মম হয়ে। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে হনুমান শেষে আগের পথই বেছে নিলেন।

পুষ্কল এল। তারও সেই একই অবস্থা করল কুশ। মৃতপ্রায়, অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভরত-পুত্র।

ওদিকে লব একাই হাজার হাতে বীর-রাজাদের সঙ্গে হাজার সেনাকে খতম করতে করতে এগিয়ে এল কুশের কাছে। ইতিমধ্যে কুশ বীরবর সুগ্রীবকেও ফেলে দিয়েছে হনুমানের পাশে। ওরই মধ্যে যারা পারল, প্রাণ নিয়ে পালাল তারা এদিক-ওদিক।

দু-ভাই দু-জনকে জড়িয়ে ধরল অসীম আনন্দে।

একটু মস্করাও করে নিল দুজনে—অদ্বিতীয় ধনুর্ধর বীর রামচন্দ্র! আর অপরাজেয় তাঁর ঘোড়ার রক্ষক এই শত্রুঘ্ন! চল ভাই, একবার দেখে আসি কেমন সব পড়ে আছে।

হনুমান ও সুগ্রীব চুপ করে পড়ে থেকে সবই শুনলেন। সত্যিকারের অচেতন তো তাঁরা হন নি। রামের ছেলেদের কথায় ফুলে ওঠে তাঁদের বুক।

ঘুরতে ঘুরতে কুশ এল শত্রুঘ্নের কাছে। খুলে নিল তাঁর মাথা থেকে সোনার মুকুট। তারপর পুষ্কলের বাহু থেকে নিল অপূর্ব সুন্দর দুটি সোনার বালা।

এরপর এগিয়ে এল হনুমান আর সুগ্রীবের কাছে। লব বলল—দাদা, এ দুটোকে চল বেঁধে নিয়ে যাই। আশ্রমে রেখে দেব, কেমন?

—খুব ভাল বলেছিস ভাই। চল নিয়ে গিয়ে মাকে দেখাব। খুব খুশি হবে মা। তারপর আশ্রমে রেখে ওদের সঙ্গে খেলা করা যাবে।

বলে, হনুমান আর সুগ্রীবের লেজ দুটো এক সঙ্গে বেঁধে, দু-ভাই মিলে টানতে টানতে নিয়ে চলল মায়ের কাছে।

ফিসফিস করে হনুমান সুগ্রীবকে বলল—মাকে গিয়ে কি মুখ দেখাব? কেমন করে দাঁড়াব গিয়ে তাঁর সামনে?

—আমরাও তো সেই একই চিন্তা কপিবর—সুগ্রীব বলল—জানকীকে কি মুখ দেখাব। সব জেনেও তাদের আমরা নির্মমভাবে প্রহার করেছি।

বলতে বলতে ওরা এসে গেল আশ্রমের কাছে। দেখেই সীতা দেবী ছুটে এলেন, যেন অপেক্ষাই করছিলেন। দুই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে।

কুশ বলল—মা, তোমাকে ছাড়া আমরা যে আর কাউকে জানি না। তোমার আশীর্বাদে আমরা ত্রিলোক জয় করতে পারি। তুমি যে আমাদের মা, কার সাধ্য, আমরা থাকতে তোমার চোখে জল আনে? মুখ তোল মা, চেয়ে দেখ, কি অপূর্ব দুটো জীব এনেছি। আমাদের আশ্রমে বেশ মানাবে।

আবেশ কাটিয়ে মুখ তুলে সীতা তাদের দেখেই চমকে উঠলেন। এ কি কুশ! এমন ভাবে এ তুমি কাদের নিয়ে এলে?

—কেন মা? ওদের দেখে অমন করে চমকে উঠলে যে? বানর-দুটোর আবার তেজ দেখানোর ঘটা কি? দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, গাছ পাথর নিয়ে, সে কি বীরত্ব দেখানো! ভেবেছিল, আমরা ভয়ে পালাব। আরো দেখ মা, কি এনেছি। এই দেখ একটা সোনার মুকুট। কে এক শত্রুঘ্ন, এটা ছিল তার মাথায়। ঘোড়ার কপালে জয়পতাকায় আবার এর সম্বন্ধে কত বীরত্বের কথা লেখা! আরো দেখ, কেমন সুন্দর দুটো সোনার বালা। পুষ্কল বলে কে একটা

ছেলে, তার হাতে ছিল।

শুনতে শুনতে সারা শরীর ঝিমঝিম করে ওঠে সীতার। মনে মনে ডাকেন স্বামী রামচন্দ্রকে —না জেনে তোমার ছেলেরা যে অপরাধ করেছে, তুমি তা ক্ষমা কোরো প্রভু। ছলছল করে ওঠে সীতার দুই চোখ।

এতক্ষণ কথা বলছিল দুভাই মনের আনন্দে। মা কিছু বলছে না দেখে মুখ তুলে তাকাতেই দেখে, মায়ের দু-চোখে জল টলটল করছে।

—মা...মা...কি হল মা ? আবার তোমার চোখে জল কেন ? আকুল হয়ে ওঠে কুশ।

নিজেকে সামলে নিয়ে সীতা দেবী বললেন—ওদের আগে ছেড়ে দাও, বাবা। তুমি তো জান না ওদের। তোমাদের মত ওরাও যে আমার ছেলে, হনুমান আর সুগ্রীব। শ্রীরামচন্দ্র যাদের সাহায্যে রাক্ষসরাজ রাবণকে নিধন করে আমাকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সোনার এই মুকুট, তোমার কাকা মহাবীর শত্রুঘ্নের,....এই বালা, তোমারই খুড়তুতো ভাই পুষ্কলের। কুশ ! লব ! এ কি করেছ ? অশ্বমেধের ঘোড়া যে তোমার বাবার, অযোধ্যাপতি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের।

শুনতে শুনতে অবাক লাগে কুশ আর লবের। মনের মধ্যে তাদের গুঞ্জন করে মহর্ষি বাল্মীকির শেখানো রামায়ণ-গান।

হনুমান আর সুগ্রীবের বাঁধন মুক্ত করে দিতেই দুই মহাবীর উঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন সীতা দেবীকে। চোখের জলে প্রাণ ভরে তাঁদের আশীর্বাদ জানালেন সীতা।

তারপর কুশ আর লবকে বললেন—ঘোড়া ছেড়ে দাও লব-কুশ। এদের সঙ্গে তোমরা তোমাদের বাবার কাছে যাও। এতদিন তোমরা ছিলে পিতৃ-পরিচয়হীন। আজ তোমরা গিয়ে তোমাদের বাবাকে প্রণাম কর।

মাকে ছেড়ে যেতে মন সায় দেয় না কুশ-লবের। তবু মায়ের আদেশ। বাঁধন খুলে দিল তারা ঘোড়ার।

চোখ বুজে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে সীতা প্রার্থনা জানালেন—আমি যদি সতী হই, স্বামী রামচন্দ্র ছাড়া আর কারো চিন্তা যদি আমার মধ্যে কখনো না জেগে থাকে, তাহলে যুদ্ধে যারা আহত, নিহত বা মূর্ছিত হয়েছে, সবাই যেন সুস্থ দেহে বেঁচে ওঠে।

মুহূর্তে ঘটে গেল সেই অলৌকিক কাণ্ড। যে যেখানে পড়েছিল, সে সেখানেই উঠে দাঁড়াল সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে—যেন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠল সবাই।

সামনে হনুমান আর সুগ্রীবের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে কুশ আর লব। সাদরে তাদের আহ্বান জানালেন শত্রুঘ্ন।

পরিক্রমা শেষ। এবার ফেরার পালা। অশ্ব ফিরে গেলে শেষ হবে অশ্বমেধ যজ্ঞ।

উত্তাল অযোধ্যা নগরী। দিগ্বিজয় সেরে ফিরে এসেছে অশ্বমেধের ঘোড়া। সঙ্গে মহা মহা রাজার দল, সুপ্রচুর উপঢৌকন।

রামচন্দ্র এসে আলিঙ্গন করলেন শত্রুঘ্নকে। মন্ত্রী সুমতির কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন পরিক্রমার বিবরণ। পরিচিত হলেন অনুগত বীর রাজাদের সঙ্গে।

তারপর যখন বাল্মীকির আশ্রমের কাহিনী শুনলেন উতলা হয়ে উঠলেন রামচন্দ্র।

—কোথায় ? কোথায় আমার সেই দুই ছেলে ? সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেই প্রচণ্ড আবেগে তিনি তাদেরকে জড়িয়ে ধরলেন নিজের সুবিশাল বুকে। সেই সঙ্গে আকুল হয়ে উঠলেন জানকীর নাম করে।

এগিয়ে এলেন বাল্মীকি। শান্ত করলেন রামচন্দ্রকে। বললেন—জানকী আমার আশ্রমেই আছেন, আমারই মেয়ের মত। লক্ষ্মণ আপনার আদেশে বনে ছেড়ে দিয়ে আসার পর, উনি এসে উঠেছিলেন আমারই আশ্রমে। আপনার এই দুই ছেলেকে আমার যথাসাধ্য বিদ্যাই দান করেছি। কি শাস্ত্রে, কি অস্ত্রে—সুপণ্ডিত এরা। বরুণদেবের কৃপাও এরা লাভ করে ধন্য হয়েছে। শুধু তাই নয় রামচন্দ্র, সঙ্গীতেও এরা অতুলনীয়। আমারই লেখা রামায়ণ-গান সুমধুর স্বরে গাইতে পারে এরা। শুনুন না। এই বলেই বাল্মীকি কুশ-লবকে বললেন রামায়ণ গান শোনাতে।



শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত সেই রামায়ণ-গান, সভা মোহিত হয়ে শুনল লব-কুশের মুখে। শুনতে শুনতে সভা কখনো ওঠে ফুঁসে, কখনো ওঠে কেঁদে ! অভিভূত রামচন্দ্র। কখন যে শেষ হয়ে গেছে গান, তা টেরও পান নি। তারপর সম্বিত ফিরতে ডাকলেন লক্ষ্মণকে—ভাই লক্ষ্মণ, রথ নিয়ে তুমি এখুনি যাও বাল্মীকির আশ্রমে। সেখান থেকে নিয়ে এসো সীতা দেবীকে।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণও ছুটলেন রথ নিয়ে। বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে সীতাকে প্রণাম জানিয়ে রাখলেন রামচন্দ্রের আবেদন। বললেন—মাতৃজ্ঞানে আপনাকে পূজা করে এসেছি এতদিন, আজও করি। রামচন্দ্রের আদেশেই এই অধম আপনাকে রেখে গিয়েছিল নির্জন বনে। আজ এই অধমই এসেছে আপনাকে নিয়ে যেতে। মাগো, অপরাধ আমার নিও না। চল মা, অযোধ্যায় ফিরে চল। খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন রামচন্দ্র।

সীতাকে নিয়ে রথ এসে থামল অযোধ্যায়। সিংহাসনের সোনার সীতা হল জীবন্ত। যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি দিলেন আচার্যদেব। শেষ হল অশ্বমেধ যজ্ঞ।

অযোধ্যার সঙ্গে স্বর্গে মর্ত্যে উঠল অপরিসীম আনন্দ কোলাহল।

রাজা সুমদের তপস্যা



পুরাকালে অহিচ্ছত্র নামে এক সুবিশাল সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। সেই নগরের রাজা ছিলেন সুমদ। পরহিতৈষী, পরম ধার্মিক। কারো কোন কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই প্রজারাও তাঁর রাজত্বে ছিল মহা সুখে।

এমন একজন রাজাকেও রাজ্য হারাতে হল। প্রবলতর এক শত্রু এসে আক্রমণ করল, বিধ্বস্ত করল নগরী। প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালালেন রাজা সুমদ।

মনে দারুণ ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা। ভাল কাজ করা, ভাল ভাবে প্রজাপালন, ভাল ভাবে থাকার এই পরিণাম?

আত্মগোপন করে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি নির্জন একটি জায়গা দেখে বসলেন। তারপর ভাবতে ভাবতে একসময় মনে হল, সর্বশক্তিময়ী জননী দেবী ভগবতীর আশীর্বাদ না পেলে, সবই বৃথা হয়ে যায় এইরকম ভাবেই।

এই ভেবে, তিনি বসলেন গভীর তপস্যায়। বনটিও ছিল তপস্যা করার মতই। আর বনটি ছিল যে পাহাড়ে সেই হেমকূট পাহাড়ও ছিল দেবতা থেকে মুনি-ঋষিদের ভারি মনোরম পাহাড়।

সমুদ রাজার তপস্যাও ছিল দেখার মত। দেবী ভগবতীর উদ্দেশ্যে মন স্থির করে নাকের ডগায় দু-চোখ স্থির রেখে তিনি কাটালেন তিন বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তারপর তিন বছর গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা খেয়ে থেকে সব সময়ই মনকে স্থির রেখে দিলেন ভগবতীর উদ্দেশ্যে। তারপর শীতকালে হিম-কনকনে পাহাড়ী জলে গলা ডুবিয়ে, গরমকালে চারদিকে আগুন জ্বেলে, বর্ষায় ঠায় ভিজে—যতরকম ভাবে শরীরকে কষ্ট দেওয়া যায়, ততরকম ভাবে কষ্ট দিয়ে, শুকিয়ে তিনি মগ্ন হয়ে থাকলেন দেবীর ধ্যানে।

এভাবে যখন বারোটা বছর কেটে গেল দেবরাজ ইন্দ্র পেলেন দারুণ ভয়। মর্ত্যের সামান্য একজন রাজার এ কি কঠোর তপস্যা! কি চায়—ইন্দ্রত্ব? যে রকম তপস্যা, যদি বিধাতার কাছে তা চেয়ে বসেন, এখুনি পেয়ে যাবেন। তখন তাঁর এই সুখ-ঐশ্বর্য থাকবে কোথায়?

মনে মনে ঠিক করলেন ইন্দ্র, যেভাবেই হোক সুমদের এই তপস্যা ভাঙতেই হবে।

কিভাবে কাকে দিয়ে সুমদকে অন্যমনস্ক করা যায়, ওঁর ধ্যান ভাঙানো যায় এ নিয়ে অনেক ভেবে ডাকলেন কামদেবকে।

কামদেবের স্ত্রী হলেন রতি। দু-জনকেই দেখতে যেমন অপূর্ব, তেমনি মনের চাঞ্চল্য ঘটাতে এঁদের মত জুড়ি ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই।

দেবরাজের আহ্বান—সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন দু-জনেই।

—তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।

—দেবরাজের কাজ করব, এ তো আমাদের সৌভাগ্য। বলুন, কি করতে হবে।

—মর্ত্যের সামান্য একজন রাজা সুমদ হেমকূট পাহাড়ে তপস্যা করছে, বোধহয় আমাকে হটাবার জন্য। আমার বিপদ-আপদে তোমরা ছাড়া আর কে আছে বল? এর একটা বন্দোবস্ত যে তোমাদের করতেই হয় কন্দর্প—বললেন দেবরাজ।

—এই কথা? তার জন্য আপনি এত উতলা হবেন না দেবরাজ। অমন যোগীবর শিবকে টলিয়ে দিয়ে যদি পার্বতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে দিতে পারি, এ তো সামান্য এক মানুষ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখনই সব ঠিক করে আসছি। বলে রতিকে নিয়ে চলে গেলেন কামদেব।

ডাকলেন বেছে বেছে সুন্দরী অপ্সরাদের। রূপে-নাচে-গানে সবাই প্রায় সমান, তবুও ওরই মধ্যে অপ্সরা রম্ভার ছিল কতকগুলো বিশেষ গুণ।

কামদেব নিজের ফুলের ধনুক, ফুলের শর আর অপ্সরা রম্ভার সঙ্গে বাছাই করা কয়েকজন অপ্সরাকে নিয়ে হাজির হলেন হেমকূট পাহাড়ে।

গরমকাল। চারদিকে যেন আগুন। তারই মাঝে দেখলেন চোখ বুজে একমনে ধ্যান করছেন সুমদ। বয়স বেশি না হলেও যেন বয়স হয়ে গেছে অনেক বেশি। হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। পরনের দিকে খেয়ালই নেই। একমাথা জটাজুট লুটিয়ে পড়েছে।

কামদেব যেখানে, সেখানেই তাঁর প্রাণের বন্ধু বসন্ত। দুটিতে মিলে একজোট।

হেমকূটে কামদেব আসতেই পালিয়ে গেল গ্রীষ্ম। গরম হয়ে গেল এমন নরম যে, আর হল্কা হাওয়া ছোটাতে পারল না। গ্রীষ্মের গরম নিঃশ্বাসে গাছ-গাছালির সব পাতা শুকিয়ে ঝরে গিয়েছিল। দেখতে দেখতে সবুজ পাতায় ভরে গেল গাছ-গাছালি। ফুটে উঠল নানা রকম ফুল। বইতে লাগল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস। সেই বাতাসে ফুলের গন্ধে ভরে উঠল চারদিক।

হেমকূট পাহাড়ে দেবলোকের বাসিন্দারাও বেড়াতে আসেন। হঠাৎ বসন্ত এসেছে সেই পাহাড়ে। বাজনা-বাদ্যি নিয়ে বন্দোবস্ত মত এসে গেল অপ্সরারা রম্ভাকে নিয়ে। শুরু করে দিল গান-বাজনা। চারদিক থেকে ডাকতে শুরু করল কোকিলরা। ফুলের গন্ধে, কোকিলের ডাকে, মৃদু-মন্দ বাতাসে, মিষ্টি বাজনার সঙ্গে মিষ্টি গানে গোটা পাহাড়টাই যেন পাগল হয়ে উঠল।

হঠাৎ বসন্ত এসে ধাক্কা দিল সুমদকেও। চোখ বুজে এতদিন ছিলেন ধ্যানমগ্ন। চোখ খুললেন। খুলতেই দেখলেন—এ কি? কারা এরা? এমন সুন্দর, এমন মনোহর রূপ তো তিনি কখনো দেখেন নি। এমন মিষ্টি সুর, এমন মিষ্টি গান তো কখনো শোনেন নি।

চোখ খুলে অবাক হয়ে সুমদকে তাদের দিকে তাকাতে দেখে, প্রায় নাচতে নাচতে রম্ভার সঙ্গে অপ্সরারা এসে হাজির হল তার সামনে। আড়াল থেকে কামদেব তাঁর ফুলের ধনুকে ফুলের শর জুড়ে ছুঁড়লেন। এবার বাজিমাৎ নিশ্চিত। বুক ফুলিয়ে এবার তিনি গিয়ে দাঁড়াবেন দেবরাজের সামনে।

অপ্সরা কাছাকাছি এসে বলল—কি গো, এখনো বসে থাকবে? আমরা এলাম তোমাকে আনন্দ দেব বলে ওঠো!

কথা তো নয়, যেন সুর।

কিন্তু যেমন বসেছিলেন রাজা সুমদ, সেভাবেই বসে বললেন—কে আপনারা? কোথা থেকে আসছেন?

—ও মা! আমাদের দেখেও বুঝতে পারছ না? আমরা অপ্সরা। দেবরাজের সভায় আমরা দেবরাজকে আনন্দ দিই। কোন মানুষের সাধ্য কি যে আমাদের পায়? তপস্যা করে তুমি অনেক ভাগ্যবান হয়েছ, তাই তো আমাদের দেখা পেলে। ওঠো, ওঠো! আর কেন মিছিমিছি বসে কষ্ট করছ? রম্ভা বলল নানা অঙ্গভঙ্গী করে—এই যে তিলোত্তমা, দেখছ না, তোমার সামনে কেমন করে দাঁড়িয়ে?

বারো বছরের কঠিন তপস্যায় সুমদের মন এখন পুরো বশে। কামদেবের সাধ্য কি সে মন টলায়!

সুমদ বললেন স্থিরধীর ভাবে—আপনারা দিব্যাঙ্গনা। বহু ভাগ্য না করলে আপনাদের দর্শন কি কেউ পায়, মা? আপনারা আমার মায়ের মত। আপনাদের আমি প্রণাম জানাই। মায়েরা আমার, আমি যে আমার একটি মায়ের ধ্যান করছি। তাঁকেও দেখতে ঠিক আপনাদেরই মত। কিন্তু তিনি যে আপনারা নন। আমার সেই জগন্মাতা না এসে আপনাদের পাঠালেন কেন? ছেলেকে কি তিনি দেখা দেবেন না?

অপ্সরাদের 'মা' বলে যেই ডাকলেন সুমদ, কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল। মুহূর্তে চলে গেল বসন্ত। চলে গেল সেই মৃদু-মন্দ বাতাস, থেমে গেল কোকিলের ডাক। লজ্জায় মুখ লুকিয়ে পালালেন কামদেব, পালাল অপ্সরারা।

আবার নিশ্চল ধ্যানে বসলেন রাজা সুমদ। কিছুক্ষণ কেটেছে। কানে এসে বাজল নূপুরের আওয়াজ। চোখ মেললেন। চোখ মেলে যা দেখলেন, তাতে আর স্থির থাকতে পারলেন না। অপরূপ এক মাতৃমূর্তি। করুণা যেন ঝরে পড়ছে চোখ দিয়ে। লুটিয়ে পড়লেন রাজা সুমদ 'মা-মা' বলে তাঁর পায়ে। আর অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন —মা-মাগো····তুমি এসেছ?

জগন্মাতা বললেন—সুমদ ওঠো। ছেলে যদি এমনভাবে ডাকে, মা কি চুপ করে থাকতে পারে বাবা? তোমার সাধনা সার্থক হয়েছে। যাও বাবা, সুখী হও। আমার আশীর্বাদে আবার তুমি তোমার সব কিছু ফিরে পাবে। যাও।

সুমদ বললেন—মাগো, তোমার কাছে যে আমার আর একটা প্রার্থনা। কোন-দিনই যেন তোমার পা-ছাড়া অন্যদিকে আমার মন না যায়।

—বেশ। মনকে জয় করেছ তুমি। আবার ভয় কি? বলে জগন্মাতা দেবী কামাখ্যা অন্তর্হিতা হলেন।

রাজা সুমদ এরপর কামাখ্যার আশীর্বাদে সবই ফিরে পেয়েছিলেন। সারাটা জীবন এরপর রাজত্বের সঙ্গে কামাখ্যার পুজো করেই কাটিয়ে গেলেন।



জনক রাজার নরক দর্শন

রাজর্ষি জনক। সুদীর্ঘ কাল কাটালেন যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান, আর রাজত্ব করে। তাঁর রাজ্যে অভাব ছিল না কোন প্রজার, অযথা মনে দুঃখ পেত না কেউ। সকলেই তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করত। আর রাজর্ষি জনক! শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত ভক্ত তিনি। তাঁর পূজা-আরাধনা না করে কিছুই করতেন না তিনি। সারা জীবন শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কাউকে যেন তিনি জানতেনও না।

সব আশা, সব সাধ মিটে গেছে। পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে একদিন তিনি যোগাসনে বসে দেহত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ থেকে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য এল দিব্য বিমান। বিমানে চারজন—ঠিক যেন রামচন্দ্রের মত দেখতে—নীল নীল রং, চতুর্ভুজ। পুণ্যাত্মা জনককে নিয়ে বিমান চলল বৈকুণ্ঠের পথে।

যেতে যেতে হঠাৎ বিমান এসে থেমে গেল যমরাজের সংযমনী পুরীতে।

জনককে দেখেই পুরী থেকে বেরিয়ে এলেন যমরাজ। অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। প্রণাম জানাল যম-কিঙ্করেরা।

প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন জনক। বিমান তাঁর পথ ঘুরে যমপুরে এল কেন? পাপ কাজ না করলে তো যমপুরী দেখতে হয় না? এমন পাপ কাজ কি তিনি করেছেন যে তার জন্য এখানে আসতে হল তাঁকে? এসেছেনই যখন, তখন একবার ঘুরেই দেখবেন যমপুরী।

—অবশ্যই। আপনাদের মত পুণ্যাত্মাদের এখানে আসা আমার

সৌভাগ্য। বললেন যমরাজ—বিধাতা আমাকে এমন কাজ দিয়েছেন যে চোর-জোচ্চোর, ঠকবাজ, কুটিল, লম্পট ছাড়া একটাও ভাল সৎ মানুষের মুখ আমরা দেখতে পাই না। আপনি এসেছেন এ কি আমার কম ভাগ্য ? চলুন, আপনাকে আমার রাজত্ব দেখিয়ে আনি।

যমরাজ রাজর্ষি জনককে নিয়ে বের হলেন তাঁর রাজত্ব দেখাতে।

প্রাসাদ থেকে বের হতেই জনকরাজার কানে এল আর্তনাদ, চিৎকার, কান্না, হুঙ্কার নানা রকমের সব আওয়াজ।

—এসব কি শুনছি ধর্মরাজ ? জিজ্ঞেস করলেন জনক।

—ঐ যে বললাম, যত রাজ্যের বাজে মানুষ নিয়ে আমার রাজত্ব। মর্ত্যে যে যেমন কুকাজ, অন্যায় করেছে এখানে আমার অনুচররা তাকে সেইরকম সাজা দিচ্ছে। যারা অবাধ্যতা করছে, তাদের মারছে। বলতে বলতে জনককে নিয়ে এগিয়ে চললেন যমরাজ।

যেতে যেতে জনক হঠাৎ দেখলেন, প্রায় অন্ধকার একটা জায়গা। ছটফট করছে একটা মানুষ। তাকে চারদিক থেকে ছুটে এসে বড় বড় বোলতারা বার বার হুল ফোটাচ্ছে। গোঙাচ্ছে মানুষটা। পড়ে পড়ে বোলতার কামড় খাচ্ছে, কিন্তু পালাতে পারছে না। যেই চেষ্টা করছে অমনি শাসিয়ে উঠছে যমকিঙ্করেরা।

দেখে খুবই কষ্ট হল জনকের। আহা ! চোখ মুখ ফুলে উঠেছে মানুষটার।

—এ কি ধর্মরাজ ? ওকে এখানে এমন ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কেন ?

—দিতে কি ইচ্ছে যায় ? তবু যে দিতে হয়। আপনি যখন রাজা ছিলেন, যে যেরকম অপরাধ করত, তাকে তো সেই রকম সাজাই দিতেন। এই লোকটা জীবনভর কোন অতিথির সেবা করে নি। শুধু তাই নয়। জানেন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দ্বারে অতিথি বসে থাকলেও ফিরে তাকাত না, এত বড় বর্বর। তাদের মনের জ্বালা এখন ওকে ভোগ করতে হচ্ছে। বললেন যমরাজ।

—আর ঐ যে দেখছেন দুটো হাত একেবারে গোড়া থেকে কাটা, গা দিয়ে রক্ত ঝরছে, তার সঙ্গে গায়ের সর্বাঙ্গে থুতু, ঐ লোকটা···হ্যাঁ, ঐ লোকটা, জীবনে কখনও কষ্ট ভোগ করে নি। নিজের ছিল ধর্মত অঢেল ধন-সম্পদ। কিন্তু সে এত লোভী যে তাতে সন্তুষ্ট থাকা তো দূরের কথা, সব সময়ই ফন্দী ফিকির করে অপরের সম্পত্তি লুট করত। এখানে এসে সে তার সাজা এখন ভোগ করছে।

জনকরাজ ধর্মরাজের সঙ্গে যতই এগিয়ে চলেন, তত দেখেন সব বিচিত্র ব্যাপার। কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে গনগনে লোহার পাতের ওপর। কেউ শূলে বিদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করছে, কেউ লুটোপুটি খাচ্ছে লালার কুয়োয়।

দেখতে দেখতে জনকরাজের মনটা খুবই ভারি হয়ে উঠল। আহা ! কি কষ্টই না ভোগ করছে এরা !

এক সময় জনক রাজা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন যমরাজকে—আচ্ছা ধর্মরাজ, একমাত্র পাপী ছাড়া তো এখানে কেউ আসে না। কিছুক্ষণ আগে সেই রকমই কি একটা বললেন না ?

—হ্যাঁ। পাপী ছাড়া আর কে এখানে আসবে ? আর কাউকে শাসন করার কোন অধিকারই আমার নেই। —বললেন যমরাজ।

—আচ্ছা ধর্মরাজ, আমি তো যাচ্ছিলাম বৈকুণ্ঠের পথে। তা বিমান ঘুর পথে আপনার এখানে কেন নিয়ে এল ?

—কেন ? কেন নিয়ে এল সে চিন্তা তো আমারও মাথায় পাক খাচ্ছে। আপনার পুণ্যের সীমা-পরিসীমা নেই। বলে একটু থামলেন যমরাজ। তারপর বললেন—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অজান্তে সামান্য একটু অন্যায় কাজ করেছিলেন আপনি একদিন। বোধহয়, সেজন্যই আপনার এই নরক-দর্শন, এই কষ্ট ভোগ।

—কি সে অপরাধ ছিল ধর্মরাজ ?

—আপনার গোচারণে একটা গাভী মনের সুখে ঘাস খাচ্ছিল। যদিও গাভীর সেবা যত্ন ছিল আপনার অতুলনীয়, তবুও, সেদিন আপনি সেই গাভীকে ঘাস খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার নধর ঘাস খাবার বাসনায় বাধা দিয়েছিলেন রাজা। তার মনে একটু কষ্ট দিয়েছিলেন, এটুকুই ছিল আপনার সারা জীবনের মধ্যে একটি অপরাধ। —বললেন ধর্মরাজ। তারপর অনুরোধ জানালেন—এবার আপনি বৈকুণ্ঠে গমন করুন, রাজর্ষি। বিমান আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটু স্থির হয়ে দাঁড়ালেন জনক। তারপর বললেন—ধর্মরাজ, আমার আর বৈকুণ্ঠে যাওয়া হল না।

শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন যমরাজ। বলেন কি জনক ? যেখানে যাবার জন্য মানুষ থেকে সবাই দিনরাত সাধ্য-সাধনা করছে, হাতের মুঠোয় পেয়েও কেউ কি তাকে ছাড়ে ?

—কিন্তু আপনাকে তো আমি রাখতে পারি না রাজর্ষি।

—যদি আমি যাই, তাহলে ধর্মরাজ, আপনার এখানে যারা এত কষ্টভোগ করছে, এরাও যাবে আমার সঙ্গে।

—তা কেমন করে সম্ভব রাজর্ষি ? এখনও এদের শাস্তির মেয়াদ ফুরোয় নি।

—কোন উপায়ই কি নেই এদের মুক্তি দেবার ?

—মাত্র একটা উপায় আছে। বললেন ধর্মরাজ—শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করে সারা জীবন ধরে যে পুণ্য আপনি সঞ্চয় করেছেন, যার বলে আজ আপনি বৈকুণ্ঠবাসী হতে যাচ্ছেন, সেই পুণ্য যদি আপনি এদের দান করতে পারেন, তাহলে এদের আমি মুক্তি দিতে বাধ্য হব।

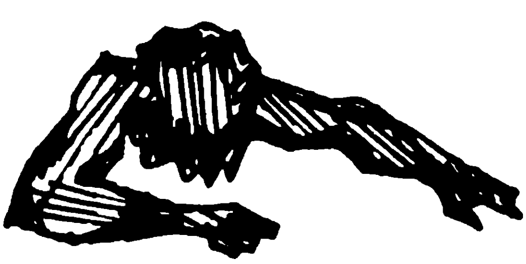
—এই কথা ? বললেন রাজর্ষি জনক—তাই দিলাম। শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহে আমার যে পুণ্য সারাজীবন ধরে সঞ্চয় হয়েছে, আমি তা এদের সব দিলাম। এরা মুক্ত হোক, শান্তি পাক। এদের এই কষ্ট দেখে আমি বৈকুণ্ঠে গিয়েও শান্তি পাব না।

পুণ্য দানের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যে শাস্তিভোগ করছিল, সব মুক্তি পেয়ে গেল। আর শোনা গেল না তাদের আর্তনাদ। সকলেই সৌম্যদর্শন, সৌম্যকান্ত হয়ে রাজর্ষিকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল দিব্যলোকে।

দেখে জনকের সে কি আনন্দ।

যমরাজ বললেন—ধন্য আপনি রাজর্ষি। সমস্ত পুণ্য দান করে যে পুণ্য আপনি সঞ্চয় করলেন, তা দেবতারাও পারেন না। আপনি নিশ্চিন্তে বৈকুণ্ঠে যাত্রা করুন।

খুশি মনে জনকরাজাও আবার উঠে বসলেন দিব্য বিমানে। পাড়ি দিলেন বৈকুণ্ঠের পথে।



তিন প্রেত ও বৈশাখ মাস

আমাদের এই পৃথিবীতে বারো মাসে এক বছর। তার মধ্যে প্রথম মাস হল বৈশাখ। সূর্যের খর তাপ, গনগনে গরম। বিকেলে আবার কালবৈশাখীর ঝড়। সব মিলে এই মাসটাকে যে আমাদের খুব একটা ভাল লাগে তা নয়। অথচ বছর শুরু হয় এই মাসটা দিয়েই।

কেন ?

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বিধাতার অর্থাৎ নারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় মাস এটি।

মহাপ্রলয়ে পৃথিবী গিয়েছিল ডুবে। শুধু জল আর জল ছাড়া কিছু ছিল না। সেই জলে শুয়েছিলেন নারায়ণ। তাঁর নাভিপথে ব্রহ্মা ভাবছেন কিভাবে আবার সব সৃষ্টি হবে, তখন নারায়ণের কানের ময়লা থেকে মধু নামে এক দৈত্য এসেছিল বেরিয়ে। মহাবীর মধুর সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল ভগবানের বহু দিন। তারপর মধু মরল ভগবানের হাতে। সময়টা ছিল তখন বৈশাখ মাস।

আবার এক মহাপ্রলয়ে পৃথিবী ডুবে গেলে শূকর রূপ ধরে ভগবান দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করে পৃথিবীকে ফের যখন উদ্ধার করেছিলেন, সে সময়টাও ছিল বৈশাখ মাস।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি থেকে শুরু হয়েছিল ত্রেতা যুগ। আজও যাকে মনে রাখবার জন্য আমরা করি অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব।

তাই দেবতাদের কাছে সব দিক থেকেই প্রিয় হল এই বৈশাখ মাস। এই মাসটা পুরো যারা ভাল ভাবে রোজ সকালে গঙ্গায় স্নান, তুলসী দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পুজো, আর নিজেদের ধীর-স্থির করে রাখতে পারে, তারা কখনও কষ্ট পায় না।

বহু, বহুকাল আগের কাহিনী।

মধ্যপ্রদেশে ধনশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর জ্ঞান, তেমনি তিনি ছিলেন ধার্মিক। সব সময়ই তিনি থাকতেন যাগ-যজ্ঞ নিয়ে।

একদিন হোমের জন্য যজ্ঞ-ডুমুরের ডাল সংগ্রহ করতে তিনি গেলেন বনে। সবেমাত্র শুরু করেছেন ডাল সংগ্রহ করতে, হঠাৎ দেখলেন মিশমিশে কালো, কুৎসিত আকার, লম্বা-লম্বা প্রেতের মত দেখতে তিন জন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপিসারে কি যেন বলছে। খোঁচা খোঁচা সব মাথা-ভরতি চুল, পেট প্রায়ই দেখাই যায় না. চোখগুলো সব টকটকে লাল।

দেখেই ব্রাহ্মণ এত ভয় পেয়ে গেলেন যে ডাল যোগাড় উঠল মাথায়, আর্তনাদ করে বন থেকে দিলেন বাড়ির দিকে চোঁ-চাঁ দৌড়। খানিকটা দৌড়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, সেই তিন প্রেত প্রায় এসে পড়েছে ঘাড়ের ওপর তাঁকে অনুসরণ করে। ব্রাহ্মণ দেখলেন, পালাবার পথ নেই। বাধ্য হয়েই সাহসে ভর করে দাঁড়ালেন পিছু ফিরে। তারপর যাতে চটে না ওঠে, তাই হাত কচলে মিষ্টি মুখে বললেন—কেন আমার পিছু নিয়েছ বাবারা ? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্ট করি নি। আমি ছাপোষা বামুন। যাগযজ্ঞ করে কোন রকমে দিন কাটাই। আমাকে ছেড়ে দাও বাবারা। ভগবান নারায়ণ তোমাদের মঙ্গল করবেন।

নারায়ণের নাম উচ্চারণ করতেই ব্রাহ্মণ দেখলেন, প্রেতগুলোর সেই খাই খাই ভাব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চোখের সেই ধকধকে আগুনও যেন অনেক কমে গেল।

প্রেতরা বলল—ব্রাহ্মণ, দেখছি আপনি খুবই বিষ্ণুভক্ত। আপনার কোন ভয় নেই। আপনার কাছে আমাদের কিছু কথা আছে। যদি দয়া করে শোনেন।



প্রেতদের কথা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ব্রাহ্মণ। যেন ধড়ে প্রাণ এল। সাহস এল বুকে।

—কি কথা ? তোমরা কারা ?

ওদের মধ্যে একজন বলল—ব্রাহ্মণ, আপনাকে আমি সকলের পরিচয় দিচ্ছি, শুনুন। আমার পাশে এই যে দাঁড়িয়ে, এর নাম এখন কৃতঘ্ন। নামেও যা, কাজেও তাই। এতটুকু কৃতজ্ঞতা-বোধ এর নেই। আগে ওর নাম ছিল সুদাস। সারাটা জীবন বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ করছে এখন প্রেত হয়ে। ওর পাশে যাকে দেখছেন, ওর নাম হল বিদৈবত। মনুষ্যজন্মে ভাগ্যবলে ও ছিল দশ হাজার গ্রামের রাজা, বিখ্যাত হরিবীর। কিন্তু রাজা হলে কি হবে, ছিল দারুণ দাম্ভিক, ক্রোধী আর অহঙ্কারী। নিজের সুখটা খুব ভালই বুঝত। অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা—এ সবের ধারও ধারত না। উল্টে অপমান করত যখন তখন। আর দেবতার পুজো ? ওর ধারণা, ও সবে কিছু নেই। দেবতা আবার কি ? এখন তার সমুচিত সাজা ভোগ করছে।

এ পর্যন্ত বলে প্রেত একটু থামল। ফস করে ছাড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস। তারপর নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—আর আমি ? আমার নাম অবৈশাখ। ব্রাহ্মণ, আমার পাপের

সীমা-পরিসীমা নেই। আমার তুলনায় এই দু-জনের পাপও কম।

—কেন? তুমি কি এমন পাপ করেছ?

—বলছি তো ব্রাহ্মণ, আমি সব জেনে-শুনেও যা করেছি, তার কোন ক্ষমা নেই। তাই আমার এই অসহ্য যন্ত্রণা। আমার বাড়ি ছিল বাসপুর গ্রামে। ব্রাহ্মণ আমি। কুলে-শীলে আমি সব দিক থেকেই ছিলাম শ্রেষ্ঠ। তখন আমার নাম ছিল গৌতম। সকলে আমাকে শ্রদ্ধাও করত। কিন্তু আমি? ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের কর্তব্য করি নি। বিশেষ করে মহাপুণ্য মাস, বৈশাখ মাসে আমাদের যা করা উচিত, করি নি।

প্রেত অবৈশাখের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন ধকধক করে ওঠে ব্রাহ্মণ ধনশর্মার বুক।

—জানেন ব্রাহ্মণ, এত বড় কুলাঙ্গার আমি যে, বৈশাখ মাসের যা নিত্যকর্ম—সকালে স্নান, তুলসী দিয়ে বিষ্ণুর পূজা, দান, এমন কি বৈশাখী পূর্ণিমার মত পুণ্য দিনেও আমি কোন পুণ্য কাজই করি নি। তাই জীবন-ভোর যাগ-যজ্ঞ যা করেছিলুম সব বিফল হয়ে গেছে। আজ প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বলে, একটু থেমে অবৈশাখ বলল—আপনাকে দেখে মনে হল, আপনি একজন নিষ্ঠাবান সদাশয় ব্রাহ্মণ। তাই আপনার কাছে আমরা এসেছি। দয়া করে আমাদের এই প্রেত-জীবন থেকে উদ্ধার করুন।

ব্রাহ্মণ ধনশর্মার বুক যেন আরো তোলপাড় করতে শুরু করল। এ কি শুনছেন তিনি। মুখ দিয়ে যেন আর তাঁর কথা বের হচ্ছে না। বোবা হয়ে গেছেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন কিম্ভূতকিমাকার অবৈশাখের দিকে।

ব্রাহ্মণকে চুপ করে থাকতে দেখে অবৈশাখ বলল—আপনি কথা বলছেন না কেন? আপনি কি দয়া করবেন না? বেশ, আপনার যদি একান্তই অসুবিধে হয়, তাহলে দয়া করে আমার একটা উপকার করে দিন। ধনশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ আছে। সে আমার ছেলে। অনুগ্রহ করে যদি তাকে একটু বলেন, আর সে যদি শোনে, তাহলে আমাকে এই কষ্ট থেকে অবশ্যই মুক্তি দেবে।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ব্রাহ্মণ। ভেঙে পড়লেন সেই প্রেতের দিকে তাকিয়ে আকুল কান্নায়।

অবাক হয়ে প্রেত অবৈশাখ জিজ্ঞেস করে—এত কাঁদছেন কেন ব্রাহ্মণ?

—ছিঃ ছিঃ··· আমি না নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ···ছেলে হয়ে যে বাবাকে শান্তি দিতে পারে না, ধিক সে ছেলের জীবনে। আমিই সে ধনশর্মা। কোন দিন ভাবি নি বাবা, আপনাকে আমি আজ এই অবস্থায় দেখব। বলুন, কি করলে আপনাকে আমি এই প্রেত যোনি থেকে মুক্ত করতে পারি?

অবৈশাখ বলল—আমার গুরুদেব আমাকে বারবার বলেছিলেন, বৈশাখী পূর্ণিমার আগের দুটো দিন আর ঐ দিন সব দিক থেকে নিজেকে সংযত রেখে দানযজ্ঞ থেকে শুরু করে মৃত পিতার উদ্দেশ্যে তিল-জল দিলে তাতে পিতৃপুরুষ তৃপ্তি পায়। কিন্তু শুনি নি·গুরুর সেই কথা। তর্ক করেছি, অবজ্ঞা করেছি। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, অবজ্ঞা করেছি। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি বেদে তো কোথাও এমন কথা বলা নেই। আজ তারই ফল ভোগ করছি, পুত্র। বৈশাখ মাসের নিত্যকাজ, বিশেষ করে ভগবান মধুসূদনের অতি প্রিয় বৈশাখী পূর্ণিমার মর্যাদা আমি রাখি নি। পুত্র, তুমি এগুলি কর। করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হবে, তা আমাদের দিলেই আমরা মুক্ত হব।

ধনশর্মা বললেন—বেশ, তাই করব।

অবৈশাখ বলল—পুত্র, এরা আমার সঙ্গী। এদের ফেলে রেখে আমি কিন্তু একা মুক্তি চাই না। আমার সঙ্গে তুমি এদেরও মুক্ত কর, পুত্র।

ধনশর্মা বলল—আপনার আদেশ, অবশ্যই করব।

আর ধনশর্মা তা করেও ছিলেন দারুণ নিষ্ঠা নিয়ে।



বিভীষণের সাজা

রাবণকে বধ করে রামভক্ত ধার্মিক বিভীষণকে সিংহাসনে বসিয়ে রামচন্দ্র ফিরে এসেছিলেন অযোধ্যায়। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে বিভীষণ আবার মৃত্যুঞ্জয়ীও হয়েছিলেন।

শেষ হয়ে গেছে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ। সুখের অযোধ্যায় সকলেই সুখী। অভাব নেই কিছুরই রাম-রাজত্বে।

যত মুনি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণীদের আসা-যাওয়া রামচন্দ্রের সভায় নিত্য দিন। ধর্ম-আলোচনা, শাস্ত্র আলোচনার বিরাম নেই।

এমনি যখন চলেছে অযোধ্যায়, সরযূর জলে স্নান করে কশ্যপ প্রভৃতি মুনিরা একদিন উঠেই দেখেন এক মুনি আর তাঁর পত্নীকে। দেখেই বুঝলেন, একেবারে এড়িয়ে যাবার মত ঋষি এঁরা নন।

সৌম্য, সুদর্শন, গম্ভীর। মুখ-চোখের ভাবও যেন অন্য একরকম। দেখলেই মনে হবে যথেষ্ট সাধনা করেছেন দুজনেই। জ্ঞানীও বটে।

কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কশ্যপ—কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন?

মৃদু হেসে মুনি বললেন—আমি শম্ভু মুনি। ইনি আমার পত্নী। আমরা থাকি হিমালয় পাহাড়ে। যাব রাজা রামচন্দ্রের সভায়। আমার কাছ থেকে তিনি পুরাণ শুনতে চেয়েছেন।

রামচন্দ্রের সভায় যাচ্ছেন শুনে খুবই খুশি হয়ে উঠলেন কশ্যপ। কিন্তু এতটুকুও বুঝতে পারলেন না কোন ঋষিই যে মুনি নিজের আসল পরিচয় রাখলেন গোপন করে। জানতেই পারলেন না স্বয়ং ভোলানাথ শিব চলেছেন পার্বতীকে নিয়ে।

কশ্যপ থেকে সবাই তাঁকে আহ্বান জানিয়ে এলেন রামচন্দ্রের সভায়। রামচন্দ্রও যথারীতি তাঁদের পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে বসালেন। পুরাণকথা শোনাতে এসেছেন মুনি, শুনে আরও খুশি হয়ে উঠলেন।

তারপর সবে আলোচনা করতে যাবেন এমন সময় প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে জনা চারেক মানুষ এসে রামচন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে হাতে তাঁর তুলে দিলেন একটি চিরকুট।

চিরকুটটি পড়েই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রামচন্দ্র। ফুটে উঠল কপালে চিন্তার রেখা। চুপ করে কি যেন ভাবতে বসলেন।

হঠাৎ রামচন্দ্রকে অমন গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে অবাক হন মুনি-ঋষিরা। তাকান এ-ওর মুখের দিকে।

জিজ্ঞেস করলেন শম্ভু—কি এমন হল যে আমরা এখানে থাকতে আপনাকে এত ভাবতে হচ্ছে? কোন দুঃসংবাদ এসেছে কি?

রামচন্দ্র বললেন—দুঃসংবাদই। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রা আমাদের বিভীষণকে অকথ্য নির্যাতন করে বেঁধে রেখেছে।

—কেন? কোথায়?

—রামেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করতে গিয়েছিলেন বিভীষণ। সেখানেই তাঁকে কয়েকজন ধরে বেঁধে রেখেছে। কেন রেখেছে, তা তো বুঝতে পারছি না। শুনে সকলেই বলে উঠলেন—সে কি? অপরাধ?

—তা তো জানি না। তবে খবর যখন এসেছে, এখানে তো আর চুপ করে বসে থাকা চলে না। —বললেন রামচন্দ্র।

—অবশ্যই। বলে সকলের সঙ্গে ছদ্মবেশী শিব শম্ভু মুনিও উঠে পড়লেন।

কুলগুরু বশিষ্ঠ প্রমুখ মুনিদের সঙ্গে বানর বাহিনী নিয়ে রামচন্দ্র এলেন শ্রীরঙ্গ নগরে।

রামচন্দ্র এসেছেন খবর পেয়েই যে যেখানে ছিল সবাই এসে হাজির হল। অর্চনা করল রামচন্দ্রকে।

জিজ্ঞেস করলেন রামচন্দ্র—বিভীষণ কোথায়?

—শুনেছি বিভীষণ বাঁধা পড়েছেন। বললেন সমাগত ব্রাহ্মণরা—তবে কোথায় আছেন তা তো বলতে পারব না।

রামচন্দ্র তখন বানরদের বললেন—খুঁজে বের কর। কোথায় বাঁধা পড়ে আছে বিভীষণ?

বানরদের গতিবিধি ছিল দুর্বার। সারা দক্ষিণ দেশ তোলপাড় করে ফেলল তারা, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান করতে পারল না। ফিরে এল শুকনো মুখ নিয়ে।

—এখন উপায়? বেশ চিন্তায় পড়লেন রামচন্দ্র।

গুরুদেব বশিষ্ঠকে বললেন রামচন্দ্র—গুরুদেব, আপনার তো অজানা কিছু নেই। আপনিও কি বলতে পারবেন না, কোথায় বাঁধা পড়ে আছে বিভীষণ। কোথায় গেলে তাঁকে পাব।

স্থির হয়ে বসলেন বশিষ্ঠদেব কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—না রামচন্দ্র, আমি ঠিক বলতে পারছি না কোথায় সে।

কশ্যপ প্রভৃতি আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বললেন—আমরা জানি শম্ভু মুনি মহাযোগী, অনেক রকমের বিদ্যা ওঁর জানা আছে। চেষ্টা করলে আমাদের বিশ্বাস, বিভীষণকে বেঁধে কারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন উনি তা বলে দিতে পারেন।

রামচন্দ্র তখন শম্ভুমুনিকে বললেন—শম্ভু মুনি, বিভীষণ আমার প্রিয়। বলুন, কোথায় গেলে তাকে পাব।

এই শম্ভু মুনির মহাবিদ্যে জানা ছিল। ঐ বিদ্যের নাম শকুন বিদ্যে। সে বিদ্যের কাজই হল, যেখানে যা কিছু গোপন থাক না কেন, এই বিদ্যের বলে সব কিছু জানা যায়।

স্থির হয়ে বসে শম্ভু মুনি কিছুক্ষণ বাদে উঠে বসলেন। তারপর বললেন—চলুন, আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে শম্ভু মুনি সকলকে নিয়ে এলেন পাশেই বিপ্রঘোষ নামে একটা গ্রামে।

সেখানে এসেই দেখেন রামচন্দ্র আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন বিভীষণ—একেবারে অসহায়ের মত।

রামচন্দ্র এসেছেন। শ্রদ্ধা করেন তাঁকে সবাই।

আসা মাত্রই সবাই প্রণাম জানিয়ে বললেন—রামচন্দ্র, এই অনাচারী রাক্ষসের একটা বিহিত করুন।

—কি করেছে ও?

—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নামে প্রাচীন ধার্মিক ব্রাহ্মণ এখানকার উপবনে তপস্যা করতেন। এই রাক্ষস অযথা গিয়ে লাথি দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। এ কি অনাচার! এখন আপনি এসেছেন। এর বিচার করুন। বলল সবাই।

শুনে রামচন্দ্র পড়লেন মহা চিন্তায়। একদিকে বিভীষণ তাঁর অতি প্রিয়। তার ওপর রাবণের পর তাঁকেই তিনি করেছেন লঙ্কার রাজা। দিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী আশীর্বাদ। সেই বিভীষণকে এখন তিনি কি সাজা দেবেন? অথচ অপরাধটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

চেষ্টা করলেন সেখানকার ব্রাহ্মণদের বোঝাতে যে, বিভীষণের এমন কাজ করা কোন মতেই উচিত হয় নি। বিভীষণ তো তাঁরই প্রিয়জন, তাঁরই প্রতিনিধি। রাজকর্মচারী যদি কিছু অন্যায় করে, সে অন্যায় রাজারই। শুনে তো আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। তোমরা বল, কি করলে ও মুক্তি পাবে।

ব্রাহ্মণরা বলল—তা আমরা কি করে বলব? আপনার সঙ্গে পণ্ডিত ব্যক্তিরা রয়েছেন। এই ব্রহ্মহত্যা পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, তা ওঁরাই বলুন। বিভীষণ সেই প্রায়শ্চিত্ত করলেই আমরা ছেড়ে দেব।

মুনিরা সকলে জানালেন, বিভীষণকে তিনশ ষাটটা গাভী দান করতে হবে।

—বেশ, তাই যদি হয় বিভীষণ তাই করুক। আমরা ছেড়ে দেব।

রামচন্দ্রের নির্দেশে বিভীষণ তাই করলেন। বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়ে রামচন্দ্রের কাছে ফিরে আসতে রামচন্দ্র বললেন—বিভীষণ, ভুলে যেও না, তুমি আমার প্রতিনিধি। এমন কিছু কি তোমার করা উচিত, যাতে আমার অপমান হয়, প্রজারা কষ্ট পায়?

মাথা হেঁট করে রইল বিভীষণ।

ছাই প্রসঙ্গ ও কাহিনী

সর্বাঙ্গে ছাইভস্ম মেখে শিবের পুজো করলে, অবশ্য যদি মনে-প্রাণে তাঁকে ডাকা যায়, পুজো করা যায়, তাহলে খুব সহজেই অসাধ্য সাধন হয়। ভোলানাথ আশুতোষ শিব যদি একবার তুষ্ট হন, তাঁর কাছে তখন যে যা চাইবে, তাই পাবে। সকলেই তা জানে।

তাই শিব-পুজোর এত ঘটা। কিন্তু অনেকেই জানে না, যে তাঁর গায়ের ভস্ম বা ঘুঁটের ছাই, তার শক্তি কতখানি। ঐ ঘুঁটের ছাই আদৌ ছাইভস্ম বলে উড়িয়ে দেবার নয়—সব রকম রোগের এক অব্যর্থ মহৌষধ। এমন কি, সাপের বিষও নষ্ট হয়ে যায় যদি ঐ ছাই ঠিক ঠিক মত ব্যবহার করা হয়। শিবের যেমন ক্ষমতা, তাঁর ছাই-এরও তেমনি ক্ষমতা। ওঁর সেই ক্ষমতা জানতেন মুনি-ঋষিরা। তাই শিব তো বটেই, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু পর্যন্ত গোবর সংগ্রহ করে, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে, সারা দেহে মেখে থাকতেন। আর প্রয়োজন পড়লে তা কাজেও লাগাতেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর, বিভীষণ মুক্ত হয়ে এলে, সভায় বসে রামচন্দ্র শিবের সঙ্গে অর্থাৎ ছদ্মবেশী শম্ভু মুনির সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে ছাই-এর যে কি গুণ, তাই নিয়ে কয়েকটা পুরোনো কাহিনী বলেছিলেন। সভায় রামচন্দ্রের সঙ্গে সবাই তা শুনে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।



করুণের করুণ কাহিনী

বহুকাল আগের কথা। ধনঞ্জয় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। তার ছিল একশ বউ। সকলেই দেখতে শুনতে ভাল। ব্রাহ্মণের অবস্থাও ছিল খুবই ভাল। একশ বউ-এর একশ ছেলে। যখন সকলেই বড় হয়ে উঠল, তাদের বিয়ে-থা দিল ব্রাহ্মণ।

ছেলেগুলো মোটামুটি ভালই ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে—পূজার্চনা, জপ-তপ নিয়ে যেমন থাকা উচিত তেমনই থাকত। সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের এক স্ত্রী শাভাকার ছেলে করুণ ছিল একটু বেশি ধার্মিক।

ব্রাহ্মণের যথেষ্ট বয়স হল। দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে দেখে ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয় তার সব ধন-সম্পত্তি যা ছিল, সব ছেলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে চোখ বুজল।

ব্রাহ্মণ বাঁচল। কিন্তু ঝামেলা শুরু হল ছেলেদের মধ্যে। বিষয় পেয়ে এত যে জপ-তপ, ধর্ম-কর্ম, সব উঠল মাথায়। পেয়ে বসল লোভ। ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যেই চেষ্টা শুরু করে দিল কিভাবে অপর ভাইকে ঠকিয়ে, নিজের সম্পত্তি বাড়ানো যায়।

কি পরিমাণ কুটিল যে হয়ে উঠল তাদের মন, সে কথা আর বলার নয়। শুধু ঠকানো নয়, গুপ্তহত্যাও শুরু করে দিল।

এমনি যখন চলেছে অবস্থা, করুণ ভবনাশিনিকা নামে এক নদীর ধারে নরসিংহদেবের এক মন্দিরে গিয়েছিল দেব-দর্শনে।

সেই সময়ে আর এক ব্রাহ্মণও সেখানে এসেছিল দেব-দর্শনে। তার সঙ্গে ছিল পুজো দেবার জন্য কিছু টাটকা জাম ফল। বেশ কুচকুচে কালো, রসে টুকটুকে। করুণ করল কি, ফলগুলো হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে তুলল নাকের ডগায়। মিষ্টি গন্ধ শোঁকার লোভ সামলাতে পারে নি। আর যায় কোথা? ব্রাহ্মণ উঠলেন দারুণ রেগে।

—কি এত বড় স্পর্ধা তোর যে, পুজোর আগেই উচ্ছিষ্ট করলি?

ধমক শুনে করুণ গেল কুঁচকে।

—এঁটো করলাম কোথায়? মিষ্টি গন্ধটা তো শুঁকছিলাম মাত্র।

—মূর্খ, জানো না, শোঁকা মনেই অর্ধেক খাওয়া! এই কি তুমি লেখাপড়া-জানা ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে? ধমক দিয়েও কিন্তু ব্রাহ্মণের রাগ মিটল না—ঐ ফলে তো আর পুজো দেওয়া যাবে না। তুমি কি মৌমাছি যে গন্ধ খাবে! তাহলে মৌমাছিই হও।

পুজো আর দেওয়া হল না ব্রাহ্মণের। অভিশাপ দিয়ে চলে গেল।

করুণের মনটাও গেল খারাপ হয়ে। ব্রাহ্মণের অভিশাপ কি আর বৃথা যাবে? কে জানে?

ভাবতে ভাবতেই করুণ দেখল তার দুটো পা গেল। অত বড় শরীরটাও গেল। সত্যি সত্যিই সে হয়ে গেল একটা মৌমাছি।

ঘরে করুণের স্ত্রী একমনে বসে বসে করছিল গেরস্থালির কাজ। আর ভাবছিল দেবদর্শন সেরে স্বামী কখন ফিরবে। হঠাৎ একটা মৌমাছি এসে তার কানের কাছে, মুখের কাছে, চোখের কাছে চার দিকে বন্‌বন্ করে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিল।

মনে মনে খুবই বিরক্ত হল করুণের স্ত্রী। এ তো বেশ জ্বালা! দেখ দেখি, কোথা থেকে এ উৎপাত এল। তাড়ালেও যায় না।

হঠাৎ মৌমাছি বলল—আমাকে ওভাবে তাড়াচ্ছ কেন? আমিই তোমার স্বামী করুণ।

শুনে করুণের স্ত্রী গেল হকচকিয়ে। কে বলল এ কথা? তখনও বন্‌বন্ করে তার চারদিকে ঘুরছে মৌমাছি। আবার কানে এল সেই একই কথা—আমি তোমার স্বামী। ব্রাহ্মণের শাপে মৌমাছি হয়ে গেছি। আমাকে অমন করে তাড়িয়ে দিও না।

এরপর আর কি তাড়াতে পারে? সযত্নে তাকে ঘরে রেখে দিল। কখনো কখনো বাইরে ঘুরে এলেও সে বাড়ির ভেতরেই থাকত।

বহুদিন হল করুণের খোঁজ নেই। করুণ কোথায়? ভাইয়েরা খোঁজ-খবর নিতে শুরু করল।

—কোথায় গেল করুণ। দেখি না কেন? খবর নিতে আসে ভাইয়েরা, তাদের বউয়েরা। করুণের স্ত্রী কিন্তু এটা-সেটা বলে কাটিয়ে দেয়, আর ভগবানকে ডাকে।

এমনি ভাবে বেশ কিছুদিন চলে যাবার পর ভাইয়েরা তকে-তকে থেকে একদিন সব জানতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে ফন্দী আঁটতে শুরু করে দিল, কিভাবে ভাইকে মেরে, তার স্ত্রীকে অনাথা করে, ভাগের সম্পত্তিটা বাগানো যায়।

মৌমাছি তাই বুঝতে পেরে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। একদিন কিন্তু আর বাঁচাতে পারল না নিজেকে। পড়ল গিয়ে তাদেরই এক তেলের ফাঁদে। স্ত্রী-ও কাছে নেই যে উদ্ধার করে আনবে। প্রাণ গেল ছটফট করতে করতে।

অনেকক্ষণ পরে করুণের স্ত্রী যখন জানতে পারল, মৃত স্বামীকে তেল থেকে তুলে এনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

স্ত্রীর অমন আকুলি-বিকুলি কান্না দেখে মুনি-পত্নী দেবী অরুন্ধতীর খুবই মায়া হল—আহা! মেয়েটা তো কোন অপরাধ করে নি। স্বামী-সেবা ছাড়া ও আর কিছুই জানত না। মেয়েটির

জন্য একটা কিছু করা উচিত।

অরুন্ধতী কাছে আসতেই করুণের স্ত্রী গিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। বলল—মা, তোমার তো অনেক শক্তি। পার না আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে?

অরুন্ধতী বললেন—তুমি যদি হোমের একটু ছাই এনে দিতে পার, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখি।

করুণের স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে যোগাড় করে এনে দিল একটু হোমের ছাই। অরুন্ধতী সেটুকু নিয়ে মন্ত্র পেড়ে মৌমাছির ওপরই যেই ছড়িয়ে দিল, অমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ ফিরে পেল মৌমাছি। আবার বোঁ⋯বোঁ করে ওড়া শুরু করে দিল।

ভাইয়েরা তো দেখে একেবারে থ। এত কৌশল করে যদিও-বা ভাইকে মারল, তাও আবার গেল বেঁচে! ফলে তাদের আক্রোশ গেল আরো বেড়ে। আবার শুরু হল ফন্দীর পর ফন্দী।

শেষে আবার একদিন ফাঁদে পড়ল করুণ। একেবারে মোক্ষম ফাঁদ। কোনমতেই আর এড়াতে পারল না মৌমাছি করুণ।

ব্রাহ্মণের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়ে এবার তার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন ব্রাহ্মণ—একশ বছর পর দধীচ মুনি যদি দয়া করেন, তবেই সে মৌমাছি জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।

পূর্ণ হয়েছে একশ বছর। মৃত স্বামী মৌমাছিকে আগলে রেখে খুব কাঁদছে তার স্ত্রী। আর মনে মনে ডাকছে—কোথায় মুনি! দয়া করুন।

আশ্চর্য, শিষ্যদের নিয়ে দধীচ মুনিও সে সময় যাচ্ছিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে।

তাঁর নাম ধরে এক মহিলা কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন শুনে শিষ্যদের বললেন—তোমরা আশ্রমে যাও। আমি আসছি। দেখি, কি ব্যাপার হল।

দধীচ মুনি আসতেই করুণের স্ত্রী তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সব খুলে বলল।

—মুনিবর, দয়া করুন। দয়া করে আমার স্বামীকে বাঁচান।

মেয়েটির কান্না দেখে মনে মনে খুবই কষ্ট পেলেন দধীচ মুনি।

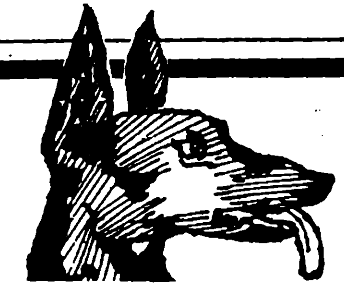
বললেন—কেঁদো না মা। শিবের দয়ায় যে ওষুধ আমার কাছে আছে, তা দিয়ে অবশ্যই আমি বাঁচিয়ে দেব। তোমার স্বামী আর মৌমাছি হয়ে থাকবে না। মানুষেরই শরীর পাবে, এটাও জেনো।

এই বলে দধীচ মুনি একমুঠো ছাই নিয়ে মনে মনে শিবকে স্মরণ করে, যেই সেই মরা মৌমাছির সারা গায়ে লেপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে যেন ভেলকি খেলে গেল। কোথায় মৌমাছি? সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে করুণ।

দীর্ঘদিন পর আবার স্বামীকে ফিরে পেয়ে করুণের স্ত্রীর সে কি আনন্দ। দু-জনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাল মুনিবরকে। তারপর ফল-মূল এনে সেবা করাল। শুধু মুনিবরকে নয়, সব শিষ্যদেরও ডেকে আনল করুণ। বাড়িতে এক হইহই ব্যাপার।

ভাইয়েরা দেখে-শুনে পালাল।

আর এদিকে খবর পেয়ে আশেপাশে যেখানে যত মুনি ছিলেন, এসে জড়ো হলেন ব্রাহ্মণের বাড়ি। শুরু হয়ে গেল ভস্মের গোপন রহস্য নিয়ে নানা আলোচনা।



একটি কুকুরের কাহিনী

খুবই সৎ এক ব্রাহ্মণ। বেদ আর শাস্ত্রে ছিল তার অগাধ জ্ঞান। যুবক, কিন্তু ধীর স্থির।

একদিন গঙ্গায় স্নান করতে গেছে ব্রাহ্মণ। স্নান সেরে পিতামাতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করে বেলা এমন পড়ে গেল যে, বাড়ি আর ফেরা হল না। কোথায় আর রাত কাটায়। নগরে একটা বাড়ি দেখে সেখানেই গিয়ে আশ্রয় নিল। ঘরে তার ব্রাহ্মণী রইল একা।

সেই বাড়ির যে কর্ত্রী, ব্রাহ্মণকে খাইয়ে-দাইয়ে একটা ঘর ছেড়ে দিল। যুবক ব্রাহ্মণও নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল সেই ঘরে।

বাড়ির সেই মহিলাটির স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। মাঝ-রাতে সে ব্রাহ্মণ যুবককে হাত করার জন্য এমন ফাঁদ পাতল যে, হাজার চেষ্টা করেও ব্রাহ্মণ তার পাশ কাটিয়ে যেতে পারল না। বাড়ি ভুলে, নিজের স্ত্রীকে ভুলে, সেখানেই থেকে গেল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল অনেক দিন। বয়স হল ব্রাহ্মণের। আর সে যুবক নয়।

এমন এক সময়ে তার নিজের মনের মধ্যে এল দারুণ ধিক্কার। ছি⋯ছি⋯সারাটা জীবন এ কি ভাবে কাটল তার। বেদবিদ্, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েও এ কি মহাপাপ করে বসল সে?

গঙ্গার ধারে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখল, এক জায়গায় বসেছে এক ধর্মসভা। ব্রাহ্মণ সেখানে বসে পড়ল। মন দিয়ে সব শুনল। জানল, শিব পুজো করলে আর কোন পাপ থাকে না। মনে পড়ে যায়, শাস্ত্রেও তাই লেখা আছে।

সেখান থেকে ব্রাহ্মণ সোজা এল শিব মন্দিরে। নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে, আর বাড়িতে না ফিরে একেবারে বিবাগী হয়ে গেল। নিজের বাড়িতেও আর ফিরতে পারল না। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, রাত কাটায় দেবালয়ে। নিজের হাতে ভিক্ষে করে আনা আতপ চাল ফুটিয়ে খেয়ে, কোন রকমে দিন কাটায়।

সে শক্তিও নেই, সে সামর্থ্যও নেই। দিন দিন দুর্বলও হয়ে আসছে। তবুও আতপ চাল ফুটিয়ে খেতে বসে কিছুতেই আর খেতে পারল না। পাশেই শিব মন্দিরে জ্বলছিল ঘিয়ের প্রদীপ। ব্রাহ্মণ গিয়ে সেই প্রদীপ থেকে ঘি ঢেলে এনে নিজের ভাতের সঙ্গে মেখে যা হোক করে শেষে খেল।

আরও কিছুদিন এ ভাবে কাটবার পর ব্রাহ্মণের হল যক্ষ্মা রোগ। মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এল যমদূতরা। তাকে নিয়ে গেল যমরাজের কাছে। মৃত দেহটা পড়ে রইল সেখানেই, সেই নির্জন স্থানে। কোথাকার এক পথের বুড়ো ভিখিরি মরে পড়ে আছে দেখে

অনেকেই উপেক্ষা করে চলে গেল।

মৃত ব্রাহ্মণ গিয়ে দাঁড়াল যমরাজার সামনে। যমরাজা ডাকলেন তাঁর খাজাঞ্চী চিত্রগুপ্তকে, কি পাপে ব্রাহ্মণ এখানে এল, তার উপযুক্ত সাজা কি হবে আলোচনা করার জন্য।

চিত্রগুপ্ত এসে দেখে-শুনে বলল—ধর্মরাজ, ব্রাহ্মণ হলেও এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণ বংশের কলঙ্ক। বলে, একটা একটা করে তার সব অপরাধ যমরাজকে শোনাল।

সব শুনে যমরাজ বিধান দিলেন—এমন পাপাচারী দশ বছর কুম্ভীপাক নগরে গিয়ে থাকবে। সেখানে গিয়ে গাছ হয়ে জন্মাবে, আর পুড়ে মরবে দশ বছর ধরে। তারপর দশ বছর কৃমি খেয়ে থাকবে। তার পর দশ বছর তোমার জন্ম হবে প্রদীপের আকার নিয়ে। ভেসে ডুবে বেড়াবে মল-মূত্র-নোংরার মধ্যে। শিবপ্রদীপের ঘি চুরি করে খাওয়ার মত মহাপাপ আর নেই। এসব নরক ভোগ করার পর একশ বছর কুকুর হয়ে জন্ম নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। যাও।

বহুদিন স্বামী ফেরেন নি ঘরে। ব্রাহ্মণীর চোখে ঘুম নেই, খাওয়া নেই। খোঁজ করে কোথাও কোন সন্ধানও করতে পারে নি। তবু পথ চেয়ে আছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

এমনি ভাবে কাটে ব্রাহ্মণীর দিন। দেখে অনেকেরই কষ্ট হয়। কিন্তু করার কি আছে। ওদিকে এই অবস্থায় যে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে, যমরাজ দিয়েছেন কঠোর শাস্তি, কিছু জানে না ব্রাহ্মণী।

বসে বসে একদিন ব্রাহ্মণী নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে ভাবছে, হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন নারদ মুনি।

—কি গো মেয়ে? বসে কি এত ভাবছ?

ব্রাহ্মণীর নাম ছিল অব্যয়া। অব্যয়া সব বলতে মুনি বললেন—শোন মেয়ে, আমি ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই, সব খবর জানি। মথুরা নগরীর কাছে এক জায়গায় তোমার স্বামী নোংরা জীবন কাটিয়ে মারা গেছে।

শুনে অব্যয়া তো কান্নায় ভেঙে পড়ল। স্বামী ছাড়া অব্যয়া তো আর কাউকে জানে না।

নারদ মুনি বললেন—কি আর করবে মা, সে তার কাজের-ফল ভোগ করছে। যমালয়ে গিয়ে আরও করবে। যমালয়ে যদি তোমার স্বামীর অশেষ যন্ত্রণা না চাও, তাহলে একটাই মাত্র পথ আছে।

—বলুন, কি সে পথ। আমার স্বামী কষ্টভোগ করবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না।

—তাহলে স্বামীর চিতার আগুনে তোমাকেও যে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, মা।

—মুনিবর, তার জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য আপনি যা বলবেন, আমি তাই করতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় তিনি? জানি না। আর জানলেও কি ভাবেই-বা যাব। —বলল অব্যয়া।

নারদ মুনি বললেন—যদি একান্ত ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

—আমি যাবার আগেই যদি সেখানে চিতা জ্বলে ওঠে?

—সে ভয় তোমার নেই মা। এমন কেউ সেখানে নেই যে, তার মৃতদেহ সৎকার করে। বলে নারদ মুনি বললেন—তুমি স্থির হয়ে চোখ বুজে স্বামীর চিন্তায় বসো, আমি তোমায় এখুনি সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।

অব্যয়া চোখ বুজে বসল স্বামীর ধ্যানে। বসতেই নারদ মুনি যোগবলে অব্যয়াকে নিয়ে এলেন সেখানে।

চোখ খুলতে মৃত স্বামীকে দেখে অব্যয়ার সে কি কান্না।

যাই হোক, নারদ মুনি কোনরকমে তাকে শান্ত করলেন। নিজের হাতেই চিতা সাজিয়ে দিলেন।

অব্যয়াকে বললেন—মা, তুমি তাহলে স্বামীর সঙ্গে চিতার আগুনে মরবে তো?

—এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন মুনিবর। আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি। স্বামী ছাড়া এই দুঃখের জীবন নিয়ে আমি কি করব?

চিতায় জ্বলে উঠল আগুন। পোড়াতে শুরু করল ব্রাহ্মণকে।

তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে ব্রাহ্মণী অব্যয়া যামরাজকে প্রণাম জানিয়ে বলল—জীবনে আমি যদি কোন অধর্ম না করে থাকি, কোন পাপ না করে থাকি, তাহলে আমার স্বামী যেন নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান।

এই বলে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে ব্রাহ্মণী প্রাণ দিল।

সতী-সাধ্বীদের ওপর যমরাজের খুব শ্রদ্ধা। তিনি অব্যয়াকে বললেন—তোমার স্বামী সব নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে, কিন্তু তাকে একশ বছর কুকুর জন্ম ভোগ করতেই হবে।

—কেন?

—শিবপূজার জন্য দেওয়া দীপের ঘি চুরি করে খেলে, এ সাজা তাকে ভোগ করতে হবেই। এ হল একেবারে শিবের আদেশ। এখানে আমার যে কিছু করার নেই।—বললেন যমরাজ। অগত্যা কি আর করে অব্যয়া। চুপ করেই রইল।

মিথিলা নগরী। বেশ জমজমাট।

একই রঙের, একই স্বভাবের একটা কুকুরকে নগরের প্রায় সবাই দেখত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। কেউ কিছু খেতে দিলে খেত। নচেৎ নদীর জল খেয়ে থাকত। অন্য কুকুর তেড়ে এলে পালাত।

কুকুরটা রাস্তার হলেও অনেকেরই তাকে দেখলে মায়া হতো। অন্য কুকুর তার দিকে তেড়ে এলে, তারাই তাড়িয়ে দিত, ডেকে খেতেও দিত।

এমনি ভাবে সে একশ বার মরল আর একশ বার জন্মাল কুকুর হয়ে। একদিন ঘুরতে ঘুরতে কুকুর এল দধীচ মুনির বাড়িতে।

দধীচ মুনি সবেমাত্র হোম সেরে গেছেন। কুকুর এসে পড়ল সেই হোমের আগুনে। গরম ছাই। তাতেই পুড়ে মারা গেল।

মৃত্যুর পর আবার যমপুরী।

এবার কিন্তু যমরাজ একেবারে অন্য। কোথায় সেই রক্তচোখ। আসতেই প্রণাম জানাল ব্রাহ্মণকে। বলল—ব্রাহ্মণ, আমার এই পুরী পাপীদের জন্য। আপনি মহা পুণ্যবান। আপনাকে আমার পুরীতে ঢুকতে দিতে পারি না।

সর্বাঙ্গে ছাই-ভস্ম মাখা সেই কুকুর বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় যাবে সে এখন?

এমন সময় শিবের অনুচর বীরভদ্র যেতে যেতে যমপুরীর বাইরে সেই ভস্মমাখা অথচ আগুনের মত জ্বলন্ত কুকুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৈলাসে শিবের কাছে ছুটে গিয়ে সব জানাল।

শিব বললেন—বীরভদ্র, আমারই ভস্ম ওর সর্বাঙ্গে। তুমি ওকে এখানে নিয়ে এসো।

বীরভদ্র সঙ্গে সঙ্গে এসে তাকে নিয়ে গেল শিবের কাছে। আর শিবও তাকে করে নিলেন নিজের অনুচর।



বীরভদ্র, সাপ ও রাক্ষস

গাছ-গাছালি ভরা, মাঝে মাঝে অনুপম সব তপোবন নিয়ে অপরূপ একটা পাহাড় ছিল। নাম তার শৌকর। এত সুন্দর আর এত মনোরম যে, দেবরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু করে দেবতারা, কশ্যপ থেকে শুরু করে দধীচি পর্যন্ত, যত মুনি-ঋষিরা, সবাই সেই পাহাড়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন।

একবার সবাই মিলে এমনি বেড়াচ্ছেন মনের আনন্দে, হঠাৎ জ্বলে উঠল আগুন। দেখতে দেখতে সেই আগুন লকলকে জিভ নিয়ে এমন ভাবে চারদিক ঘিরে ছুটে এল যে, কেউ পালাতে পারলেন না। আগুন সবাইকে গ্রাস করে ফেলল। যে যেখানে ছিলেন, পড়ে রইলেন পুরো ছাই হয়ে।

সেই সময় শিবের প্রিয় অনুচর বীরভদ্রও এলেন সেখানে। তখনও লকলক করছে আগুন। পাহাড়ে আগুন প্রায়ই লাগে, খুব একটা আশ্চর্যের নয়। কিন্তু চমকে উঠলেন বীরভদ্র অনেকগুলো গোঙানির আওয়াজ শুনে। সেই সঙ্গে নাকে এল মড়া পোড়ার গন্ধ।

কি ব্যাপার ? চমকে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বীরভদ্র দেখলেন, আগুন, দেবতা থেকে শুরু করে মুনি-ঋষিদের বেশ গ্রাস করে ফেলেছে। আবারও গ্রাস করছে। এত বড় ঔদ্ধত্য সামান্য একটা অগ্নির, সহ্য হয় কি বীরভদ্রের ? দক্ষের মত প্রজাপতির ঔদ্ধত্য সহ্য করেন নি তিনি, এ সামান্য তো আগুন।

—দাঁড়া, অগস্ত্য সমুদ্র শুষেছিলেন, আমি তোকে শুষে নেব। দেখি, তোর তেজ কত—এই বলে বীরভদ্র যেই তাঁর সুবিশাল মুখ হাঁ করে আগুনকে শুষতে যাবেন, অমনি শুনলেন আকাশবাণী—বীরভদ্র, অমন কাজ কোরো না।

—কে তুমি ? আমাকে বাধা দিচ্ছ ? খিঁচিয়ে ওঠেন বীরভদ্র।

—আমি সরস্বতী, ভারতী। তোমার ভালর জন্যই তোমায় নিষেধ করছি। অমন দুঃসাহসিকতা দেখিও না। ওটা জল নয়।

—জল যে নয়, তা জানি। সে জ্ঞান তোমায় দিতে হবে না। জানো, আমি শিবের অনুচর বীরভদ্র। শিব ছাড়া আমি আর কাউকে পরোয়া করি না। বাধা দিতে এলে তোমাকে সুদ্ধ গ্রাস করব। বলেই তেড়ে গেলেন বীরভদ্র।

বেগতিক দেখে সরস্বতী পালালেন। আর বীরভদ্র বিশাল হাঁ করে শোঁ-শোঁ করে শুষে নিলেন আগুন।

নিভে গেছে আগুন, আর কোথাও কিছু নেই। বীরভদ্র পোড়া, আধপোড়া মৃত দেবতা আর মুনি-ঋষিদের কাছে গিয়ে একে একে নাম ধরে ডেকে যখন কারোরই সাড়া পেলেন না, তখন খানিকটা চিন্তা করে নিজের গায়ের ছাই নিয়ে, তাতে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিতেই, যিনি যেভাবে ছিলেন, সেভাবেই উঠে দাঁড়ালেন।

মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন বীরভদ্র।

এদিকে দেবতা থেকে মুনি-ঋষিরা জীবন ফিরে পেয়ে শৌকর পাহাড়েই যেই খানিকটা গেছেন, অমনি কোথা থেকে বিরাটকায় এক সাপ এসে সকলকেই গিলে ফেলল।

দেখামাত্রই বীরভদ্র এগিয়ে গিয়ে সাপকে আক্রমণ করল।

প্রায় সমানে সমানে শুরু হল দারুণ লড়াই। সাপ হারে, কি বীরভদ্র যায় সাপের পেটে—এমনি অবস্থা। বেশ কয়েক বছর ধরে চলল সেই যুদ্ধ। শেষে, এক সুযোগে বীরভদ্র খপ্ করে দু-হাতের মুঠোয় সাপের হাঁ-করা মুখটা ধরে বাঁশ-চেরার মত করে চিরে ফেলল। বেরিয়ে এলেন সবাই। গেলার পরেই সাপকে বাধ্য হয়ে লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল, তাই তাদের আর সে তখনো জীর্ণ করে ফেলতে পারে নি। শুধু একটু মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন মাত্র সকলে।

যাই হোক, আবার সবাই উঠে বীরভদ্রকে প্রণাম করে সবেমাত্র কিছুটা গেছেন, দেখেন, আট মাথা, পাঁচ পা, দশ হাত মহাকায় এক রাক্ষসের সঙ্গে বানররাজ বালীর দারুণ লড়াই হচ্ছে। পাশে সুগ্রীব। রাক্ষস অনবরত চেষ্টা করছে বালীকে খেতে। কিন্তু কিছুতেই কায়দা করতে পারছে না। যুদ্ধ দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন সবাই।

এই রাক্ষস ছিল রাক্ষসরাজ হিরণ্যকশিপুরই এক অনুচর। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে যতবারই মারা গিয়েছিল, ততবারই বেঁচে উঠেছিল গুরু শুক্রাচার্যের কৃপায়। শেষে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে সে একবার কঠোর তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে আদায় করেছিল কয়েকটা বর—তার ক্ষমতা যেন অসীম হয়। দ্বিতীয়ত, সে যাকে খাবে, সে-ই যেন তার পেটে গিয়ে মারা যায়। সেই বর পেয়ে সে সবাইকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে চলছিল।

বালীর অবস্থা দেখে সুগ্রীবও যোগ দিল যুদ্ধে। একদিকে বালী-সুগ্রীব, আর একদিকে সেই রাক্ষস। লড়াই চলতে চলতে এক ফাঁকে হাত বাড়িয়ে সুগ্রীবকে ধরে মুখের মধ্যে পুরে দিল। বালী গেল আরও রেগে। আরো প্রচণ্ড বেগে সে এবার শুরু করে দিল লড়াই। কিন্তু শিববরে বলীয়ান রাক্ষসের সঙ্গে কোন রকমেই পেরে উঠতে পারল না।

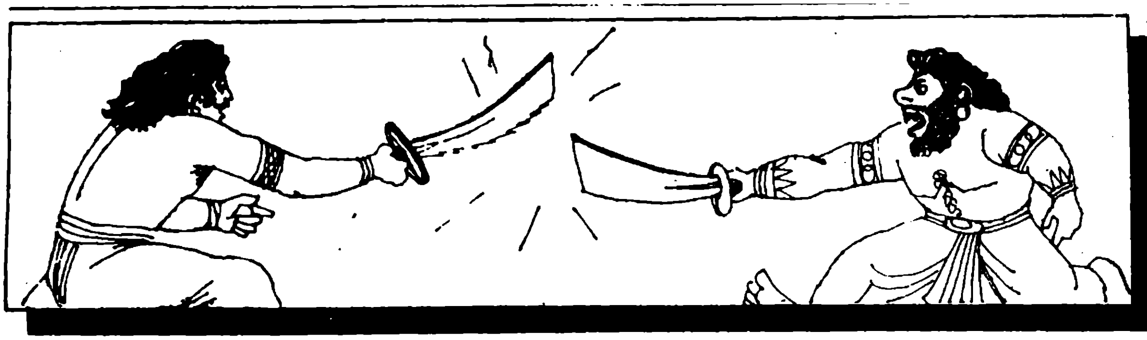
দেবতা থেকে মুনি-ঋষিরাও, তাকে রাক্ষসের পেটে যেতে দেখে যেই পালাতে যাবেন, হাত বাড়িয়ে রাক্ষস একে একে সকলকেই গ্রাস করে ফেলল।

ঠিক সেই সময়ে বীরভদ্রও এসে হাজির হলেন সেখানে।

রাক্ষসের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারলেন না বীরভদ্র। দ্রুতবেগে গিয়ে আক্রমণ করলেন তাকে। তিনি বিশালকায় একটা পাথর তুলে দারুণ জোরে যেই রাক্ষসের দিকে ছুঁড়ে মারলেন, অমনি তার মাঝখানের একটা মাথা গেল খসে, গড়িয়ে পড়ল রক্ত।

বহুদিন পর মনের মত একজন বীরকে পেয়ে রাক্ষস মার খেয়েও বলল—সাবাস ! দেখছি তোমার গায়ে বেশ ক্ষমতা। এসো, তোমার সঙ্গে একটু লড়াই করা যাক।

এই বলে রাক্ষস দু-খানা তলোয়ার বের করে ধরল বীরভদ্রের



সামনে। দু-খানাই ছিল যেমন লম্বা-চওড়া আর তেমন ভারী। বের করে রাক্ষস বীরভদ্রকে বলল—তোমার যেটা পছন্দ, সেটা তুলে নাও। তারপর তোমাকে একবার দেখছি।

বীরভদ্র বললেন—তুই আবার আমাকে তলোয়ার দেখাচ্ছিস ? বেশ, ভালই হল। দেখ এবার। বলে তলোয়ার তুলে নিতেই শুরু হল তুমুল যুদ্ধ।

অভূতপূর্ব যুদ্ধ। বীরভদ্রের শরীর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল রক্ত। এক হাতে রাক্ষস তেষ্টা মেটাবার জন্যে পান করতে লাগল সেই রক্ত, আর এক হাতে লড়াই। এভাবে দুজনের মধ্যে তলোয়ার-যুদ্ধ চলতে চলতে তার দুটো মাথাই গেল কেটে। পাহাড়, বন কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল রাক্ষস, তবুও থামল না যুদ্ধ। চলল প্রায় এক বছর। দুজনেরই গা দিয়ে ঝরে পড়ছে রক্ত, কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। শেষে, যুদ্ধ এমন আকার নিল যে রীতিমত ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। রাক্ষস কিছুতেই আর জব্দ করতে পারে না বীরভদ্রকে, বরং মনে হতে থাকে, এই বুঝি প্রাণটা গেল।

সত্যি সত্যিই একসময় বীরভদ্রের তলোয়ারে রাক্ষসের সব কটা মাথাই গেল খসে। লুটিয়ে পড়ল মুণ্ডবিহীন বিশাল শরীরটা পাহাড় কাঁপিয়ে। মাথাগুলো বীরভদ্র কিন্তু আস্ত রাখলেন না। রসগোল্লা খাওয়ার মত টপ্ টপ্ করে মুখে পুরে নিলেন। তারপর হিরণ্যকশিপু বধের মত তার বুকের ওপর বসে দু হাত দিয়ে তার বুকটা দিলেন চিরে।

দু-ফাঁক হয়ে গেল রাক্ষসের বুক। দেবতা থেকে শুরু করে মুনি-ঋষিরা সবাই বেরিয়ে পড়লেন। তখন তো মরে গেছেন সবাই।

মুনি-ঋষিদের পত্নীরা এসে কাতর অনুরোধ জানাতে লাগলেন বীরভদ্রকে—দয়া করে ওঁদের বাঁচান····দয়া করুন।

লুকিয়ে লুকিয়ে নারদ মুনি সব কিছু দেখেছিলেন। রাক্ষস মারা পড়তেই তিনি গিয়ে খবর দিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিবকে।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু শুনে খুশি তো হলেনই, শিবও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরই বরে তো অমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল রাক্ষসটা। যাক, তাঁরই অনুচর বীরভদ্র শেষে মুখ রেখেছে। তাই তিনজনেই এসে প্রাণভরে আশীর্বাদ জানালেন বীরভদ্রকে।

তারপর বললেন—ঋষি-পত্নীদের প্রার্থনা পূরণ কর বীরভদ্র। ওদের বাঁচিয়ে তোল।

—আপনারাই সকলকে বাঁচাতে পারেন। আমি কেমন করে বাঁচাব ? সে ক্ষমতা আমার কোথায় ? বীরভদ্র বললেন।

—সে কি বীরভদ্র ? ভুলে গেলে যে তোমার কাছেই ওঁদের বেঁচে ওঠার মোক্ষম ওষুধ রয়েছে। যে ওষুধে আমরাও বেঁচে আছি। বলে শিব বললেন—ছাই দিয়ে সকলকে স্নান করিয়ে দাও বীরভদ্র। তোমার কাছেই তো রয়েছে সেই ছাই। বলেই দেবতাদের সঙ্গে চলে গেলেন।

—সত্যিই তো। বলে বীরভদ্র যেই সকলের গায়ে ছাই মাখিয়ে দিলেন, অমনি সবাই প্রাণ পেলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

বীরভদ্রের স্তব-স্তুতি করে যাঁর যেখানে যাবার সবাই চলে গেলেন।

বহ্নিমুখের কাহিনী

বীরভদ্র যেমন শিবের এক প্রধান অনুচর, তেমনি তাঁর আর এক অনুচর ছিল—নাম বহ্নিমুখ। হাত-পা-বুক সবই তার ছিল বটে, কিন্তু ছিল না স্বাভাবিক মুখ বা মাথা। ছিল না চোখ, মুখ, কান। তার জায়গায় সব সময়ই ছিল জ্বলন্ত আগুনের শিখা। আর এমন আশ্চর্য যে, তা দিয়েই দেখতে, শুনতে এমন কি খেতেও পারত বহ্নিমুখ। আর ক্ষমতা ? বীরভদ্রের তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না।

এই বহ্নিমুখ কিন্তু পূর্বজন্মে ছিল এক ক্ষত্রিয় রাজা। যেমন বীর, সাহসী, তেমনি দুর্দান্ত। তার ওপর ছিল প্রচণ্ড রাগী। ফলে, অকালে তার সবই গেল। রানী গেল, সেনা গেল, রাজ্য গেল, হল ভিখিরি। রাজার তিনটি ছেলে ছিল। এক জোড়া মোষ কিনে, তিন ছেলেকে নিয়ে শুরু করল চাষবাস। বাঁচতে তো হবে। এ ছাড়া আর উপায় কি ? ইতিমধ্যে এক ছেলেকে একদিন সাপে কাটল।

মনের বল ইতিমধ্যেই অনেকটা কমে গিয়েছিল রাজার। এখন অপঘাতে ছেলেটিকে মরতে দেখে দারুণ মন-মরা হয়ে পড়ল। চাষবাসে তো লোকসান হচ্ছিলই, তার ওপর ছেলেটি মারা গেল। শোক সামলাতে পারল না। অকালেই চোখ দুটি প্রায় গেল কাঁদতে কাঁদতে। না খেয়ে খেয়ে শরীর হল জরাজীর্ণ।

আরো যে দুই ছেলে তার, অনেক করে রাজাকে বোঝাল—যে গেছে, শোক করলেও সে তো আর ফিরবে না। তার ওপর নিজের যে অবস্থা করে তুলেছেন তা যে আর আমরা দেখতে পারি না। আমরাও তো আপনারই ছেলে। তাহলে অত ভাবছেন কেন?

ছেলেদের কথা শুনে রাজা ভাবল, সত্যিই তো। এই দুই ছেলেকে কেন কষ্ট দিই। বরং গুরুদেবের কাছে গিয়ে কিসে মঙ্গল হয়, তার চেষ্টা করি।

এই ভেবে, ছেলেদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে হাজির হল তার কুলগুরু বশিষ্ঠ মুনির কাছে।

বশিষ্ঠদেব তখন বারাণসীতে আশ্রম করে ছিলেন।

রাজা গিয়ে প্রণাম জানাতেই বশিষ্ঠ মুনি বললেন—কি ব্যাপার! হঠাৎ এতদিন বাদে এখানে কেন?

রাজা বলল—এতদিন বুঝি নি গুরুদেব। বয়সকালে যা করা উচিত ছিল, তা তো করিনি। অহঙ্কার নিয়েই ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন তার ফল ভোগ করছি। দয়া করে বলুন, কি করলে এখন শান্তি পাই। অন্তত এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাই।

বশিষ্ঠ বললেন—এখন আর কি করবে? তোমার যে রকম সামর্থ্য এখন হয়েছে, তাতে একমাত্র শিবের পুজো করতে পার।

—শিবপূজা করলে কি সত্যিই আমি মুক্তি পাব গুরুদেব?

বশিষ্ঠ বললেন—সন্দেহ জাগছে? এখানে বস। সামনে চেয়ে দেখ, বুড়ো এক ব্যাধ শিবলিঙ্গের পুজো করছে না?

—হ্যাঁ।

—ঐখানে এখুনি এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে। দেখলেই তোমার মনের সব সংশয় দূর হয়ে যাবে। বললেন বশিষ্ঠ মুনি।

রাজা তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

ব্যাধের দিন ফুরিয়ে এসেছে, আর বাঁচবে না। বুঝতে পেরে গরিব ব্যাধ সেদিন এসেছিল সেই শিবলিঙ্গের কাছে। শিকার করে এনে রোজ শিবের পূজা করে যেত। শিকার করতে পারে নি, সামর্থ্যও ফুরিয়ে গেছে, অথচ শেষ সময়ে শিবকে একটা কিছু দেবার তার বড় ইচ্ছে। সামান্য কিছু ফলমূল সংগ্রহ করে এনেছিল মাত্র। কিন্তু ফুল, বেলপাতা? এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে দেখে, পাশে একটা ডাব-সমেত আমের শাখা। সেটা নিতে গিয়ে দেখল বড় নোংরা। এ কি শিবকে দেওয়া যায়? আর কোথাও কোন ফুল চোখে পড়ল না তার। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ঠিক এমন সময় কোথা থেকে এক পাগল ছুটে এসে পুজোর জন্য আনা ব্যাধের ফল-মূল কেড়ে খেয়ে শেষে শিবলিঙ্গের ওপরই হুড়মুড় করে একগাদা বমি করে বসল। তাই দেখে ব্যাধের হল দারুণ রাগ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলটাকে ধরে দেবে উত্তম-মধ্যম। কিন্তু পরক্ষণেই নির্জীব হয়ে গেল।

রাজা দেখল—চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাধ কোমর থেকে বের করল তার ধারালো ছুরি। তারপর খানিকটা করে গায়ের চামড়া নিজের হাতে কেটে দেহ থেকে ছাল ছাড়ায়, আর শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে জড়াতে থাকে। এভাবে খানিকটা খানিকটা করে গায়ের সব চামড়া ছাড়িয়ে জড়িয়ে দিল শিবের গায়ে। তারপর আঙুলগুলো কেটে ফুল দেওয়ার মত করে দিল শিবকে।

সব দেওয়া যেই শেষ হল, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ব্যাধ, মারাও গেল।

ঠিক সেই সময়েই বশিষ্ঠের দেওয়া দিব্যদৃষ্টির বলে রাজা দেখল, আকাশ জুড়ে উড়ে এল হাজার হাজার দিব্য বিমান। বিমানের আরোহীরাও সবাই ত্রিশূল হাতে দিব্য দেহধারী। তারা এসে ডাকতে লাগল ব্যাধকে। বলতে লাগল—শিবলোক থেকে সবচেয়ে ভাল বিমান এনেছি আমরা, শিবদূতরা এসেছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। এসো, উঠে এসো।

রাজা শুনল—ব্যাধ বলে উঠল, আমি তো একা যাব না। সঙ্গে আমার স্ত্রী-পুত্রও যাবে।

শিবদূতরা বলছে—তা তো হয় না ব্যাধ। তোমার কাজের ফল তুমি ভোগ করবে। ওরা তো আর তোমার মত কিছু করে নি যে একই বিমানে যেতে পারে।

ব্যাধ বলল—তারা তো আমার ওপরই নির্ভরশীল। আমি যদি পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি, তাহলে তারাও তার সমান অংশীদার। আমি যদি যেতে পারি, তারাও যাবে।

শিবদূতরা পড়ল মহা ফ্যাসাদে। এখন উপায়?

ঠিক এমনি সময়ে বিমান নিয়ে এল বীরভদ্র। বলল—ব্যাধ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। এসো, তোমরা সবাই এসো।

রাজা দেখল, চতুর্ভুজ মূর্তি ধরে সপরিবারে ব্যাধ গিয়ে উঠল সেই দিব্য বিমানে। চলে গেল শিবলোকে।

হতবাক রাজা।

বশিষ্ঠ মুনি রাজার গায়ে হাত দিয়ে বললেন—দেখলে তো? যাও, মন দিয়ে শিবপূজা কর। এ জন্মে আর কিছু হবে না অবশ্য। তবে পরজন্মে ভাল হবে।

রাজার মনে আর কোন সংশয় নেই। শিবের পূজা করতে করতেই একসময় প্রাণত্যাগ করল।

এরপরে আবার রাজ পরিবারেই জন্ম হল তার। শিবভক্ত প্রথম থেকেই। রাজা হয়ে সিংহাসনে বসল। কিন্তু শিবপূজা ভুলল না। বরং সারা রাজ্যে শিবের পুজো জোরদার করে তুলল। কিন্তু রাগটা পুরোপুরি দমন করতে পারল না। রাগের বশে শিবের প্রতি ভক্তিমতী একটি নিরপরাধ মেয়েকে তার মাথাটা জল্লাদকে দিয়ে কেটে দিয়েছিল।

যাই হোক, তবু শিবভক্ত রাজা। প্রজারাও সুখী। রাজ্যেও কোন অভাব নেই।

একদিন সেনাদল নিয়ে রাজা বেরিয়েছে নগর ভ্রমণে। দেখল, অপূর্ব সুন্দর এক শিবমন্দির। তার চারদিকে জ্বলছে বড় বড় প্রদীপের আলো। রাজা এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। ঠেলাঠেলিতে হল কি, জ্বলন্ত একটা প্রদীপ এসে ছিটকে পড়ল রাজার গায়ে। রাজাও রেগে গিয়ে প্রদীপটা নিয়ে দিল ছুঁড়ে। আর, সেটা গিয়ে পড়ল একেবারে মন্দিরের ভেতরে। আগুন লেগে পুড়ে গেল মন্দির।

তখন রাজার সে কি অনুশোচনা!

রাজ-ভাণ্ডারে যা ছিল, সব দিয়ে আবার নতুন করে সাজাল মন্দির। রাজকাজে আর তেমন মন রইল না। মন চলে গেল শিবের দিকে। দিন-রাত তাঁর কাটতে লাগল পূজা করে। আর ক্ষমা প্রার্থনায়—দেবাদিদেব, মহাপাপী আমি। অপরাধ ক্ষমা কর।

এইভাবে পূজা করতে করতে ফুরিয়ে এল রাজার দিন। মারা



গেল।

কিন্তু ঐ যে অনুশোচনা—ফলে সে গেল শিবলোকে। বীরভদ্র নিজে এসে তাকে নিয়ে গেল শিবের কাছে। আর শিবের কাছে থেকেই সে তাঁর অন্যতম অনুচর হয়ে গেল। মুণ্ডহীন—নাম হল তার বহ্নিমুখ।

রাজা থাকার সময় বিনা অপরাধে একটি মেয়ের মাথা কেটে দেওয়ায় অপরাধ শিব কিন্তু ক্ষমা করতে পারেন নি—যদিও বহ্নিমুখ তাঁর অন্যতম পারিষদ।



বিধৃত রাজার কাহিনী

অকালে রাজা মারা গেল, অল্পবয়সেই বিধৃত বসল সিংহাসনে, হল রাজ্যের রাজা।

সবে যৌবনকাল, উঠতি বয়স। মন্ত্রীদের ভরসা ছিল, বিধৃতকে তাঁরা ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে যাবেন। যেমন সুনামের সঙ্গে চলছিল রাজ্য, তেমনিই চলবে।

কিন্তু, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। বিধৃত রাজা হয়ে ভাবল, আমি কি-না একটা হয়ে গেলুম। রাজা হয়ে, ঐ বুড়ো-বুড়ো মন্ত্রীদের কথা শুনে আমাকে চলতে হবে? অসম্ভব। আমি রাজা। আমি যা হুকুম করব, ওরা তা তামিল করবে। আমার মাইনে করা চাকর, আমার ওপর খবরদারি করবে? আমাকে তা সহ্য করতে হবে?

মন্ত্রীরা প্রমাদ গুণলেন—সর্বনাশ! এ কি হল।

প্রবীণ আর রাজকার্যে অভিজ্ঞ মন্ত্রীরা সম্মান বাঁচাতে, সরে গেলেন তার কাছ থেকে। তার জায়গায় বিধৃতকে ঘিরে বসল, রাজ্যের যত তোষামুদে বদমায়েসের দল। একে তো বিধৃতের অল্প বয়স। জ্ঞানগম্যি, বিচারবুদ্ধি তখনো জন্মায় নি, তার ওপর এইসব বদলোকেরা তাকে দিতে শুরু করল যত রাজ্যের কু-মন্ত্রণা। বিধৃতও মেতে উঠল তাতে। একেবারে পড়ল গিয়ে কব্জায়। ফলে, যেটুকুও-বা ভাল ছিল তার মধ্যে, সেটুকুও গেল। নেশা থেকে যত রকমের বদ জিনিস, তাতেই আসক্ত হয়ে পড়ল। রাজ্য থেকে শাসন গেল উঠে। চোর-ডাকাতদের হল পোয়া বারো। একদিকে তাদের বেপরোয়া চুরি ডাকাতি, তার ওপর রাজকর্মচারীদের অত্যাচার। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল প্রজারা। ধন গেল, সম্পদ গেল, বন্ধ হয়ে গেল চাষবাস। তবুও বিধৃতের অত্যাচার আর থামে না। সর্বস্বান্ত হল প্রজারা। বিধৃতের বিলাসিতা তখন চরমে। বিশেষ করে, তার ইয়ার-বকশীদের তো আর কথাই নেই। রাজ ভাঁড়ার শূন্য হল।

প্রজাদের অসন্তোষ, রাজ-ভাণ্ডার খালি, সেনা সামন্তরাও খুশি নয়, এই সুযোগ নিল পাশের রাজ্যের রাজা। হঠাৎ একদিন আক্রমণ করে বসল রাজ্য। বিধৃতের ক্ষমতা কি, প্রতিরোধ করে। প্রাণ নিয়ে পালাল রাজ্য ছেড়ে।

সামান্য কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে বিধৃত রাজ্য ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল বনের শেষে পাহাড়-দুর্গে। সুরাপ নামে এক নরপিশাচ তখন তার একমাত্র প্রধান সহায়।

রাজ্য হারিয়েও বিধৃতের কিন্তু চৈতন্যোদয় হল না।

আগে যেমন ছিল, এখানে এসেও তেমনি ভাবেই জীবন কাটাতে লাগল।

অনুচরদের ডেকে হুকুম করত—যাও, যেখান থেকে পার, আমার খোরাক যোগাও।

বিধৃতের হুকুম। রাতের অন্ধকারে তারা বের হত। আশেপাশের গ্রাম-নগরে গিয়ে শুরু করে দিল বেপরোয়া চুরি-ডাকাতি আর রাহাজানি। ধন-সম্পদ থেকে শুরু করে গরু, মোষ এমন কি মানুষদেরও তারা ধরে এনে, অত্যাচার করে ভিড়িয়ে নিতে লাগল নিজেদের দলে।

রাজ্য গেছে তাতে কি হয়েছে? বরং বিধৃতের এখন দিন কাটে আরও বেশি রাজসুখে। যেখানে ওরা থাকত, তার চারদিকে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ হয়ে গেল শ্মশান।

সময় তো আর এক জায়গায় থেমে থাকে না—গড়ায়। তার সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। বিধৃতের দিন চলছিল রাজার হালে, একদিন তাতে পড়ল ভাঁটার টান। ভাল ভাল খাবার যখন আর জোটে না, শুরু হল পশুর মাংস খাওয়া। গরু গেল, মোষ গেল, ঘোড়া গেল। শেষে শুরু হল মানুষের মাংস খাওয়া।

সুরাপ তার দলবল নিয়ে ওৎ পেতে থাকত পথে। বণিকদল গেলেই লুট করে আনত তাদের। সময়ে সময়ে চলে যেত দূর-দূরান্তে। ছলে-বলে-কৌশলে যোগাড় করত মানুষ। ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসত। বেশ কিছুদিন ধরে তাদের ওপর চালাত নিদারুণ অত্যাচার। তারপর খতম করে বিধৃতকে নিয়ে বসাত মহাভোজ।

এমনি ভাবে চলতে চলতে একদিন ফুরিয়ে এল বিধৃতের দিন।

শুরু হয়ে গেছে নাভিশ্বাস। আর হয়ত কয়েক ঘণ্টা বাদেই মারা যাবে।

সুরাপ এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—রাজা আদেশ করুন, কি করতে হবে।

খাবি খেতে খেতে তখনও বিধৃত বলল—'আহর, প্রহর।' অর্থাৎ আহরণ কর, যোগাড় করে আন, আর প্রহার কর।

রাজা বিধৃতের আদেশ, ছুটল সুরাপ দলবল নিয়ে।

এদিকে বিধৃতও মারা গেল।

মহাপাপী, একজন অত্যাচারী মারা গেছে। মৃত্যুদূতেরা এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

সবেমাত্র তারা তোড়জোড় শুরু করেছে, এমন সময় বোঁ-বোঁ করে শিবের অনুচর বহ্নিমুখ এসে হাজির।

—এ কি, তুমি এখানে কেন? জিজ্ঞেস করে মৃত্যুদূত বহ্নিমুখকে।

বহ্নিমুখ বলল—তুমি এখানে কেন এসেছ?

—মহাপাপী এই বিধৃতকে নিয়ে গিয়ে নরক ভোগ করাব।

—মহাপাপী! বিধৃত মহাপাপী! চোর। দেখাচ্ছি মজা। বলে বহ্নিমুখ ত্রিশূল দিয়ে বিঁধল মৃত্যুদূতকে। তারপর দূতের সঙ্গে বিধৃতকে সুদ্ধ নিয়ে গিয়ে হাজির হল শিবের কাছে।

শিব তো দেখে অবাক।

—এ কি বহ্নিমুখ? এ কি করেছ?

—কেন প্রভু?

—জান, মৃত্যুদূতের ক্ষমতা কত?

—ও, তাই বলে আপনার ভক্তকে চুরি করবে? এ সাহস ও পায় কোথায়?

—কি রকম?

—প্রভু, মরার আগে ও যে আপনাকে দু-বার ডেকেছে। একবার বলেছে প্র-হর, আর একবার বলেছে আ-হর। মৃত্যুদূত কি জানে না, যে হর মানে শিব।

—তাই নাকি?

এমনি সময়ে এল বীরভদ্র। বলল—হ্যাঁ প্রভু। যেভাবেই হোক, মরার আগে যখন আপনাকে স্মরণ করেছে, তখন বিধৃত যত অন্যায় কাজই করে থাক, কিভাবে যমলোকে যাবে? এ তো আপনারাই আদেশ পালন করেছে বহ্নিমুখ।

শুনে শিব বললেন—তা বটে।

তারপর মৃত্যুদূতকে ত্রিশূলমুক্ত করে ছেড়ে দিলেন।



শৌন-কলার কাহিনী

ধনঞ্জয়ের ছেলে শৌন আর দেবরাজের মেয়ে কলা। রাজযোটক মিল দেখে, দু-জনের বিয়ে হল মহা-ধুমধামে।

এখন শৌন হল স্বামী আর কলা হল তার স্ত্রী। স্নান-দান, পূজা-অর্চনা, ধর্ম-কর্ম নিয়ে দু-জনেই সমান ভাবে মেতে থাকত।

একদিন দু-জনে গঙ্গায় স্নানে গেছে। হঠাৎ দেখল, একপাশে একটা রুপোর কলসী।

দেখে শৌন বলল কলাকে—দেখ, দেখ কলা, কি সুন্দর কলসী একটা পড়ে রয়েছে। কার বলতো? আশেপাশে তো কাউকে দেখছি না।

দেখল কলা। তারপর বলল—সত্যি তো? কোথা থেকে এল কে জানে?

শৌন বলল—কলসীটা বরং নিয়েই আসি। মনে হচ্ছে ওতে কিছু আছে।

কলা বলল—আমায় যদি জিজ্ঞেস কর, বলব, কি দরকার? মিছিমিছি ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি আমাদের?

—ঝামেলা বলছ কেন, কলা?

—ধর, যদি বদ মতলবে কেউ কলসীটা ওখানে রেখে গিয়ে থাকে? হয়ত আড়ালে লুকিয়ে আছে, এ রকমও তো হতে পারে। কিংবা হয়ত কোন বদমাস কলসীটা ওখানে রেখে ওৎ পেতে আছে, নিতে গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শৌন বলল— তা ঠিক, কিন্তু চেয়ে দেখ, আশেপাশে কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

কলা বলল—না থাক, কি দরকার ঐ উটকো কলসী নিয়ে। যদি মোহর-ভরাই হয়, তুমিই বল, মালিক যার নেই; সে সম্পত্তি হয় রাজার।

—এখানে তো আর রাজা নেই। রাজার কোন অনুচরকেই তো দেখছি না।

—কিন্তু তাঁর জানতে কতক্ষণ?

—কি করে জানবে?

—আমরা মেয়েমানুষ। এ রকমও তো হতে পারে যে কথায় কথায় আমিই হয়ত কাউকে বলে ফেললাম। তারপর এ-কান ও-কান হতে হতে রাজার কানে গেল। তখন আমরা হব চোর। তাই বলি, কি দরকার ঝামেলায়। দিন তো আমাদের কেটে যাচ্ছে।

শৌন আর কিছু না বলে শুধু বলল—কলা, তুমি এখন অন্য ঘাটে স্নান কর গে। আমি এখানেই বাহ্যে-টাহ্যে সেরে স্নান-জপ করে যাচ্ছি।

কলা চলে গেল।

শৌন কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে কলসীর কাছে গিয়ে দেখে কলসীভরা মোহর। সে তাড়াতাড়ি নিজের চাদর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে সাত টুকরো করে মোহরের সাতটা পুঁটলি করল, আর কলসীটাকে ফেলে দিল।

নদীর ধারে প্রায় হাঁটু-সমান বালি খুঁড়ে গর্ত করল সাত জায়গায়। এক-একটা পুঁটলি এক একটা গর্তে রেখে বেশ ভাল করে মাটি চাপা দিয়ে প্রত্যেকটার ওপরই একবার করে বসে খানিকটা করে বাহ্যে করল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে নামল গঙ্গায়।

ওদিকে, অপর ঘাটে স্নান, পার্বতীর পূজা কখন সারা হয়ে গেছে কলার। খানিকটা অপেক্ষা করে একাই পা বাড়ালে বাড়ির দিকে। গেরস্থালির কাজকর্ম আছে, রান্নাবান্না আছে। শৌন তখন এদিকে সবেমাত্র স্নান সেরেছে, এবার জপে বসবে।

পথ দিয়ে কলা যাচ্ছে একা। আড়াল থেকে তাকে দেখল রাক্ষস মারীচ।

রাবণের পরম আত্মীয় মারীচ ধরতে পারত যখন-তখন যেমন-তেমন নিখুঁত বেশভূষা। একা কলাকে দেখে তার মনে



ইচ্ছে জাগল, তাকে চুরি করে নিয়ে যাবার। তাই সে তার স্বামী শৌনর বেশ ধরল।

তাড়তাড়ি কাছে এসে বলল—কলা, গোদাবরীর তীরে খানিকটা দূরে একটা আঙুরের বন আছে, সুন্দর একটা পাহাড় আছে। ভীম, শিব স্বয়ং থাকেন। চল না, যাই।

শুনে কলা বলল—কই, এ কথা তো আগে কখনো বল নি। এমন কি স্নান করার আগে পর্যন্ত না। হঠাৎ এভাবে বললে কি যাওয়া যায়?

—কেন, যাওয়া যায় না কেন? বিশেষ করে আমি যখন বলছি।

কি আর বলে কলা? স্বামীর অবাধ্য হওয়া মহাপাপ। কিন্তু একবারের জন্যও কলার মনে জাগল না কণামাত্র সন্দেহ।

শৌনর ছদ্মবেশী রাক্ষসের সঙ্গে কলা এল পাহাড়ে। সত্যিই সুন্দর পাহাড়। পাহাড়ের কোলেই বন। এদিকে মাথার ওপর দুপুর।

মারীচ বলল—এসো কলা, আপাতত এখানেই হবে আমাদের বিশ্রাম। ফল-মূল খাও। বলে মারীচ কলাকে দিল গাছ থেকে পেড়ে আনা টাটকা ফল, নিজেও খেল।

এতক্ষণ পর কলার মনে জাগল সন্দেহ। দুপুরে খাবার আগে তার স্বামী নিত্য সারে জপ-তপ! তারপর খাবার খায়। আজ ব্যতিক্রম কেন?

একটু সুযোগ পেয়ে দেবী পার্বতীকে স্মরণ করে ধ্যানে বসল কলা। দেখল, এ তার স্বামী শৌন নয়। রাক্ষস মারীচ তাকে ঠকিয়ে এনেছে।

এখন উপায়?

দারুণ কান্না পেয়ে গেল কলার। খুব কাঁদতে শুরু করল।

মারীচ দেখল, সে ধরা পড়ে গেছে। স্থির করল, একে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ভেবেই নিজ মূর্তি ধরে তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে এল তার দিকে।

কলা কাতর অনুরোধ জানাল—আমাকে ছেড়ে দাও। আমার স্বামী শৌন জানতে পারলে তোমার সর্বনাশ হবে। আমাকে 'মা হর'—হরণ করো না।

মারীচ কিন্তু কোন অনুরোধই রাখল না। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে তার মুণ্ড কেটে ফেলল।

শিবলোক থেকে এল দিব্য বিমান। কলাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলো পার্বতীর কাছে।

পার্বতী বললেন—কলা, তোমার স্বামীভক্তি দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমায় বর দেবো। তোমার ইচ্ছেমত বর চাও।

পার্বতীকে কাছে পেয়ে কলা তখন ভুলে গেছে স্বামীর কথা। বলল—আমাকে তোমার দাসী করে রাখ। যেন কখনো তোমার কাছ-ছাড়া না হই।

পার্বতীও তাতে সম্মতি জানাল। অনসূয়া, অরুন্ধতীর মত সেও থেকে গেল পার্বতীর কাছে তাদের সঙ্গে।

স্নান সেরে শৌন বাড়ি ফিরে কোথাও দেখতে পেল না কলাকে। চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও যখন তার সন্ধান মিলল না, বসল ধ্যানে। ধ্যানে বসতেই সব দেখতে পেল সে। দেখতে পেল, কলা এখন তার অপমৃত্যু বরণ করে রয়েছে পার্বতীর কাছে শিবলোকে।

শৌন গেল দেবরাজের কাছে। দেবরাজ সব শুনে, এলেন বিশ্বামিত্র মুনির কাছে। বিশ্বামিত্র শুনে তাঁদের নিয়ে গেলেন বশিষ্ঠ মুনির কাছে। দেখতে দেখতে খবর পেলেন অন্যান্য মুনিরাও। ঠিক হল, সবাই যাবেন কৈলাসে শিবের কাছে। তাঁকে সব জানিয়ে ফিরিয়ে আনবেন কলাকে।

কৈলাসে সদাশিব বসে আছেন আপন মনে। এমন সময়ে শৌনকে নিয়ে মুনিরা গিয়ে হাজির হল সেখানে। প্রণাম জানাল। তারপর কলার কথা খুলে বলল—প্রভু, শৌন আমাদের কাছে এসেছে তার স্ত্রীকে ফিরে পেতে।

শুনে শিব বললেন—আমি সবই জানি। কলার আয়ু ছিল, দশ-ছেলের মা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন তো আমি আর কোন উপায় দেখি না। মারা যাবার আগে আমার 'হর' নাম উচ্চারণ করে শিবলোকে এসে আছে পার্বতীর কাছে। মুনিগণ, আপনারা তো জানেন, যমলোক থেকে মর্ত্যলোকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানে যে একবার আসে, সে তো আর ফিরে যায় না। তবে তোমরা একবার পার্বতীর কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার।

সকলে এল পার্বতীর কাছে।

পার্বতী সব শুনে শৌনকে বললেন—শৌন, কলা তো আর যেতে পারে না। তবে একটা কাজ করতে পারি। আমি তোমাকে তোমার মনের মত আর এক স্ত্রী দিতে পারি।

শৌন বলল—কলাই আমার একমাত্র মনের মত স্ত্রী।

—না শৌন। কলা যে তোমার ঠিক মনের মত নয়, তা আমার জানা হয়ে গেছে, যেদিন তোমরা দুজনে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলে। বললেন পার্বতী।

এরপর শৌন লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল। খানিকটা ভেবে বলল—বেশ, তাহলে তাই দিন, সেই সঙ্গে রাজ্যও।

পার্বতী হেসে বললেন—বেশ তাই হবে।

সেদিন ছিল সোমবার। শিবের অত্যন্ত প্রিয় দিন। ব্রাহ্মণদের বললেন—আপনারা আজ আমার অতিথি। সেবা করে তবে যাবেন।

তাই হল। শেষ পর্যন্ত ভূরিভোজ সেরে আবার সবাই ফিরে এল।



রামচন্দ্র-সুগ্রীব-বালী সংবাদ

সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ এসে হাজির হয়েছেন ঋষ্যমূক পাহাড়ে। দু-জনেই বড় ক্লান্ত। এসে বসলেন এক আমগাছের নীচে। ধনুক-বাণ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে, রামচন্দ্র আর বসে থাকতে না পেরে, লক্ষ্মণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।

শুয়ে শুয়ে রামচন্দ্র দেখলেন, গাছের ডালে একটা বানর। তাঁদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কিচির-মিচির করে মিষ্টি মধুর সুরে গান গাইছে। মাঝে মাঝে আবার পাকা আম, আমগাছের শাখা, ভেঙে ফেলে দিচ্ছে তাঁদের দিকে। বানরদের সাধারণত যে স্বভাব, এ যেন ঠিক তার উলটো।

লক্ষ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন রাম—লক্ষ্মণ, এই বানর কে বলতো?

—জানি না তো! বললেন লক্ষ্মণ—জিজ্ঞেস করি।

জিজ্ঞেস করতে বানর বলল—আমার নাম হনুমান। আমি এখানকার রাজা সুগ্রীবের বন্ধু।

বলেই হনুমান সেখান থেকে চলে গেল সোজা সুগ্রীবের কাছে। গিয়ে বলল—দু-জন অপরূপ সুন্দর মানুষ দেখে এলাম। কচি ঘাসের মত গায়ের রং। মাথায় জটা। আজানুলম্বিত বাহু। মনে হয় কোন রাজপুরুষ।

শুনেই ছুটে এল সুগ্রীব। চেয়ে দেখল, সত্যিই অপূর্ব। দেখলেই মাথা নুয়ে আসে।

প্রণাম জানিয়ে বলল সুগ্রীব—আপনাদের পরিচয়?

লক্ষ্মণ বললেন—আমরা দু-ভাই রাজা দশরথের ছেলে। ঘুরে বেড়াচ্ছি, যারা দুষ্ট তাদের দমন করতে।

—তা আপনাদের সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত তো দেখছি না। নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

লক্ষ্মণ বললেন—হ্যাঁ, তা আছে, আমার এই দাদা রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাদেবী, আমার মায়ের মত। তাঁকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শুনেই সুগ্রীব বলল—দাঁড়ান...দাঁড়ান। কিছুক্ষণ আগেই লঙ্কার রাজা রাবণ, আকাশপথে এক মহিলাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাঁর কান্না শুনেছি। তিনি যাবার সময় তাঁর গায়ের কয়েকটা অলঙ্কার ছুঁড়ে দিয়ে গেছেন।

—কোথায় সেগুলো?

—আমার বাড়িতে। চলুন দেখবেন, সেগুলো সীতা দেবীর কিনা?

রাম আর লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে এলেন সুগ্রীবের বাড়িতে। অলঙ্কারগুলি দেখেই চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন—কোন দিকে গেছে সুগ্রীব?

—দক্ষিণ দিকে! ভয়ানক অত্যাচারী। আপনারা বললে আমি যথাসাধ্য আপনাদের সাহায্য করতে পারি।

গয়নাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—সুগ্রীব, তোমার ঘর ফাঁকা দেখছি কেন? তোমার পত্নী কোথায়?

—বড় দুঃখের কথা রামচন্দ্র। আমার এক দাদা আছে। তার



নাম বালী। তার এক স্ত্রী আছে, নাম তারা। তবুও সে জোর করে আমার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে নিজের কাছে। বড় বলশালী। আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি তাকে উদ্ধার করে আনা।

—সে কি? কোথায় থাকে সে।

—রামচন্দ্র, তার রাজধানী হল কিষ্কিন্ধ্যা। আগে ওটাই ছিল আমার রাজত্ব। বালী মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন সেখানেই রাজত্ব করছে।

শুনে রামচন্দ্র বললেন—এ তো ভারি অন্যায়। তুমি এক কাজ কর, সুগ্রীব। বালীকে আক্রমণ কর। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

—সত্যিই বলছেন?

—রামচন্দ্র মিথ্যা বলে না।

সুগ্রীব সত্যি সত্যিই লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে একদিন কিষ্কিন্ধ্যা গিয়ে যুদ্ধে আহ্বান জানাল বালীকে। হাসতে-হাসতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল বালী।

—কি হে, হঠাৎ এত বীর সাহসী হয়ে উঠলে কবে থেকে? এসো তোমার দম্ভ মেটাই। বালী বিদ্রূপ করে আক্রমণ করল সুগ্রীবকে।

ত্রিভুবন কাঁপিয়ে দুই বানররাজ বালী আর সুগ্রীবের শুরু হল লড়াই, আর কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে রামচন্দ্র ধনুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়।

যুদ্ধ উঠল চরমে। দু-জনেই দু-জনকে প্রায় সমান প্রহার করছে। রামচন্দ্র তীর ছুঁড়তে গিয়েও বারবার থেমে যান। সন্দেহ জাগে, কে বালী আর কে সুগ্রীব। দু-জনকে দেখতে তো একই রকম। শেষকালে বালীকে মারতে গিয়ে সুগ্রীবকে না মেরে বসেন।

এদিকে সুগ্রীব প্রচণ্ড মার খেতে শুরু করল বালীর হাতে। খেতে খেতে এমন অবস্থা হল, যে আর সহ্য করতে না পেরে পালাতে বাধ্য হল। খুব রাগও হল তার রাম-লক্ষ্মণের ওপর।

—এ কি রকম হল রামচন্দ্র? আপনার ওপর বিশ্বাস করেই গিয়েছিলাম বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

রামচন্দ্র বললেন—কি করব সুগ্রীব? তোমরা দুই ভাই দেখতে এমনি এক রকম যে, তীর ছুঁড়তে সাহস হল না। শেষে কাকে মারতে কাকে মেরে বসব। তুমি বরং আর একবার যাও, যুদ্ধ কর



গে। হাতে একটা নিশানা বেঁধে যাবে এবার, যাতে তোমাকেই আমি সুগ্রীব বলে চিনতে পারি।

—বেশ, তাই যাব। এই বলে সুগ্রীব দিনকয়েক বাদে আবার তৈরি হয়ে গেল কিষ্কিন্ধ্যায়।

এত মার খাবার পর আবার সুগ্রীবকে আসতে দেখে কিষ্কিন্ধ্যার সবাই বেশ কিছুটা অবাক হল। ব্যাপার কি? সুগ্রীব ভাল রকমই জানে, বালীর কাছে তাকে মার খেতেই হবে। আবার যেচে কেন মার খেতে এল?

বানররাজ বালী। তার অনুচরের সংখ্যাও কম নয়। গোপনে তারা খবর নিয়ে এল বালীর কাছে, দশরথের ছেলে রামচন্দ্র সাহায্য করছেন সুগ্রীবকে।

শুনে বালী বলল—এ তো অতি উত্তম কথা। শুনেছি তিনি নাকি নারায়ণের অংশ—ভগবান। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বিচক্ষণ হবেন। সুগ্রীব আমার চেয়ে অনেক, অনেক দুর্বল, এটা যখন তিনি জানতে পারবেন, তখন অবশ্যই তিনি সুগ্রীবকে ত্যাগ করে আমার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করবেন। আর তা না করে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন, তাহলে আমিও নিশ্চয় তাঁকে ছেড়ে দেব না।

মনকে স্থির করে, স্ত্রী তারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বালী এল সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। মনে ইচ্ছে, সুগ্রীবের যুদ্ধের আশ সে এবার মিটিয়ে দেবে।

সত্যি সত্যিই প্রচণ্ড আক্রোশে এবার সে সাপটে ধরল সুগ্রীবকে। ফেলে মারে আর কি, ঠিক সেই সময় একটা তীর উড়ে এসে সজোরে বিঁধল তার বুকে। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে কুঁকড়ে গেল সে।

—কে? কে আমাকে আড়াল থেকে এমন ভাবে তীর মারল? যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে আক্ষেপ শুরু করল বালী।

তীরের আঘাতে বালীর অবস্থা সঙ্গীন, খবর পেতেই ছুটে এল তারা। ছুটে এল তার যত অনুচর। কান্নার তুফান উঠল।

ধনুক-বাণ হাতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন রামচন্দ্র। তাঁকে দেখেই তারা বলল—তাহলে তুমিই আমার স্বামীকে তীর ছুঁড়ে মারলে আড়াল থেকে?

—হ্যাঁ, আমিই মেরেছি। বললেন রামচন্দ্র।

—রামচন্দ্র, আপনি না ক্ষত্রিয়? আপনি না বীর যোদ্ধা? এই কি যুদ্ধের নিয়ম? আমার স্বামী আপনার কি ক্ষতি করেছিল? যদি কিছু করে থাকে, আপনি সামনাসামনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ না করে আড়াল থেকে চোরের মত মারলেন কেন? হচ্ছিল ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াই, আপনি তার মাঝখানে কেন এলেন? অভিযোগের পর অভিযোগ রাখতে শুরু করল তারা।

শুনে রামচন্দ্র বললেন—তারা, আমরা ক্ষত্রিয় রাজা। আমাদের কাজই হল, যারা নিরীহ ও নিরপরাধ তাদের রক্ষা করা, তা ছলে-বলে-কৌশলে যে-ভাবেই হোক। তোমার স্বামী অন্যায় ভাবে ভাই সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি তার স্ত্রী রুমাকে পর্যন্ত জোর করে আটকে রেখেছে। এই অন্যায়ের প্রতিফল তাকে অবশ্যই পেতে হবে।

—তাই যদি হয় রাজা রামচন্দ্র—বলল তারা—তাহলে আমার স্বামীকে মারার আগে আপনার সাজা দেওয়া উচিত ছিল সুগ্রীবকে।

—কেন?

—রাক্ষস দুন্দুভির সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার স্বামী গিয়েছিল পাতালে। সেখানে যুদ্ধের জন্য তাঁকে থাকতে হয়েছিল এক বছর। সেই সুযোগে ঐ সুগ্রীব এই সিংহাসনে বসে নিজেকে রাজা বলে প্রচার করেছিল, সেই সঙ্গে আমাকে সুদ্ধু আটকে রেখেছিল তার স্ত্রী রুমার সঙ্গে। এটা কি তার দুষ্ট স্বভাবের পরিচয় নয়?

—অবশ্যই। কিন্তু তারা, এ ঘটনা কতদিন আগের?

—ষাট হাজার বছর আগের।

রামচন্দ্র বললেন—তারা, তখন তো আমি রাজা ছিলাম না। থাকলে সুগ্রীবকে এর সাজা অবশ্যই পেতে হত। তখন যিনি রাজা ছিলেন, তিনি যদি উপেক্ষা করে থাকেন, তার জন্য আমি দায়ী নই।

এরপর তারার আর কিছুই বলার নেই।

যন্ত্রণায় তখনো ছটফট করছিল বালী। কাতর অনুরোধ জানাল রামচন্দ্রকে—দয়া করে তীরটা তুলে নিন। আমাকে নিশ্চিন্তে মরতে দিন।

রামচন্দ্র তীর তুলে নিতেই, মারা গেল বালী। ছেলে অঙ্গদকে সিংহাসনে বসিয়ে ঋষ্যমুকে আবার ফিরে এলেন রামচন্দ্র। সুগ্রীবও ফিরে এল হাসিমুখে বহুদিন পর স্ত্রী রুমাকে নিয়ে।

সেদিন থেকে সুগ্রীব আমৃত্যু হয়ে রইল রামচন্দ্রের দাস। তার সঙ্গে রাজ্যের হনুমান থেকে ভাল্লুক পর্যন্ত সবাই হল রামের অনুচর।



শিব পুরাণ

ব্যাসদেবের রচিত এই শিব পুরাণ এক সুবিশাল গ্রন্থ। এই পুরাণে ছটি ভাগ : জ্ঞান সংহিতা, বিদ্যেশ্বর সংহিতা, কৈলাস সংহিতা, বায়বীয় (পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ) আর ধর্ম সংহিতা। এই পুরাণ নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে বলেছে— দেবাদিদেব হলেন শিব। তিনিই বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করছেন। তাঁর কৃপা লাভই হল সবার সেরা লাভ। অন্যান্য পুরাণের মত এতেও কি ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল, কত তীর্থক্ষেত্র আছে, তেমনি আবার প্রাচীন রাজ-রাজড়ার কাহিনী থেকে শুরু করে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে কেমন করে হল, কি ভাবে গণেশের বিয়ে হল, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে সুদর্শন চক্র লাভ করলেন, নন্দী, ভৃঙ্গি, সোমনন্দী—এঁরা প্রকৃতপক্ষে কারা প্রভৃতি বহু কাহিনীও লিপিবদ্ধ আছে। এসব থেকে আমরা অনেক রহস্য কথা জানতে পারি।



পার্বতীর তপস্যা ও শিবের বিয়ে

পর্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে পার্বতীর কঠোর পণ যে, মহাদেব শঙ্করকে ছাড়া তিনি আর কাউকে বিয়ে করবেন না। মনে মনে পার্বতী তাঁরই চিন্তা করতেন।

ওদিকে দক্ষযজ্ঞে সতী স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেছিলেন। সতীকে হারিয়ে শিবেরও প্রতিজ্ঞা যে, তিনি আর বিয়ে করবেন না—যোগ সাধনা আর তপস্যা করেই দিন কাটাবেন। তার জন্য তিনি সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে ঘুরতে লাগলেন পাহাড়-পর্বতে।

দেহত্যাগের আগে সতীর ছিল একটাই মাত্র প্রার্থনা—পরের জন্মে যেন শিবই তাঁর স্বামী হন। সেই সতীই যে হিমালয়ের ঘরে তাঁদেরই মেয়ে হয়ে জন্মেছেন, এ কথা না জানতেন হিমালয়, না মা মেনকা। তাই পার্বতীকে খালি শিব···শিব···করতে দেখে, আর খেলাধুলো, হাসি-ঠাট্টা ছেড়ে সব সময়েই শিবের চিন্তা করতে দেখে, একটু অবাকও হতেন, আবার বিরক্তও হতেন। কিন্তু ওঁদের একটি মাত্র মেয়ে। সেই মেয়েটিকে আবার পেয়েছেন বহু সাধনায়, তাই তাঁর কোন কাজেই তাঁরা বাধা দিতে পারতেন না।

এদিকে যখন চলেছে এই অবস্থা, তখন 'তার' নামে এক অসুর মহাবলশালী হয়ে উঠে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে ত্রিলোকের রাজা হয়ে বসেছিল। তার শুরু করেছিল তার ছেলে আর অনুচরদের নিয়ে দারুণ অত্যাচার। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সকলেই, কিন্তু কারো সামর্থ্য ছিল না তাকে দমন করার। দেবরাজ থেকে শুরু করে অসহায় দেবতারা সবাই শরণাপন্ন হয়েছে ব্রহ্মার। অনেক ভেবে-চিন্তে ব্রহ্মা বলেছিলেন—তোমাদের রক্ষা করতে পারে একমাত্র শিবের ছেলে। দেবরাজ শুনে বলেছিলেন—শিব যেভাবে বিয়ে আর করবেন না সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাতে তা কি সম্ভব? উত্তরে ব্রহ্মা বলেছিলেন—সকলকে চেষ্টা করে দেখতে হবে, যাতে শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে হয়। তাঁদের ছেলে যতক্ষণ দেবতাদের সেনাপতি না হচ্ছেন, ততক্ষণ ঐ তারকাসুরের অত্যাচার তোমাদের সহ্য করতেই হবে।

দেবরাজ ইন্দ্র দেখলেন, এছাড়া যখন কোন পথ নেই, তখন একটা চেষ্টা অবশ্যই নিতে হবে। ডাকলেন তাঁর বন্ধু কামদেবকে। সব শুনিয়ে বললেন—বন্ধু, আমাদের জন্য এই উপকারটুকু তোমায় করতেই হবে। শিবের ধ্যান ভাঙিয়ে, পার্বতীর সঙ্গে যাতে তাঁর বিয়ে হয়, সে ব্যবস্থা এক তুমি ছাড়া আর কে করতে পারে বল। ইন্দ্রের অনুরোধে রাজি হলেন কামদেব। স্ত্রী রতিকে নিয়ে রওনা হলেন শিবের উদ্দেশে।

শিব ঘুরতে ঘুরতে সে সময় চলে এসেছেন হিমালয়ে। নির্জন এক জায়গায় বসে চোখ বুজে করে চলেছেন ধ্যান। সখীদের নিয়ে পার্বতী সেখানে রোজ আসেন। ধ্যানমগ্ন শিবকে ফুল দিয়ে পুজো করে চলে যান।

একদিন পার্বতী এমনি ভাবে ফুল দিয়ে ধ্যানমগ্ন শিবের পুজো করছেন, ঘুরতে ঘুরতে রতিকে নিয়ে কামদেব মদন সেখানে এসে হাজির। মজার ব্যাপার, উনি যে সময় যেখানে বসে চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন, সেখানকার পরিবেশও মুহূর্তে যাচ্ছিল বদলে। ছিল গনগনে গরম। চারদিক যেন জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ বইতে শুরু করল ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস। সব গাছ ভরে গেল কচিপাতায়। মুকুলের মিষ্টি গন্ধ বাতাসকে ম···ম··· করে তুলল। ডালে ডালে মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল কোকিল। চঞ্চল হয়ে উঠল



শিবের মন। ধ্যান গেল ভেঙে। চোখ খুলতেই সামনে অপূর্ব সুন্দরী পার্বতীকে দেখে প্রায় মোহিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু, শিব হলেন মস্ত বড় যোগী। ভাল ভাবে যাঁরা যোগ-সাধনা করেন, সহজেই তাঁরা নিজের মনকে বশে আনতে পারেন। শিবও সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে বশে এনে ভাবলেন, এমন তো অন্তত তাঁর হওয়ার কথা নয়। তবে কেন হল? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন রহস্য আছে। এই ভেবে তিনি যেই পার্বতীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন, অমনি চোখ পড়ে গেল কামদেবের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত রাগে ধক্ করে জ্বলে উঠল তাঁর তৃতীয় নয়ন। কামদেব পালাবার আগেই বিদ্যুৎবেগে আগুনের হল্কা গিয়ে সেখানেই মদনকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। আর কারো দিকে না তাকিয়ে শিবও সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেলেন কৈলাসে তপস্যা করতে।

পার্বতীর মন গেল খারাপ হয়ে। যাঁকে বিয়ে করবেন মনস্থ করে চুপি চুপি পুজো করছিলেন কাছে পেয়ে, তাঁকে উপেক্ষা করে তিনি চলে গেলেন। মন তো খারাপ হবারই কথা।

মন গুমরে বসে আছেন পার্বতী। হঠাৎ এলেন নারদ মুনি। পার্বতীকে বললেন—শিবকে স্বামী হিসাবে পেতে গেলে



তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে মা। তপস্যা কর····তপস্যা কর।

তারপর পর্বতরাজকে ডেকে বললেন—পর্বতরাজ, তোমার সৌভাগ্য যে, পার্বতী তোমার মেয়ে। স্বয়ং শিব হবেন তোমার জামাই, যাঁকে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও পাওয়া যায় না। পার্বতীকে তপস্যা করতে যাবার অনুমতি দাও।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন হিমালয়। কিন্তু বেঁকে বসলেন মা মেনকা—তা কি করে হয়? যোগিনীর বেশে মেয়েকে দেখতে হবে শিবের জন্য? তাঁর অমন সুন্দর কচি মেয়ের জন্য এমন কি সুপাত্র সে? না, আমার মেয়েকে অত কষ্ট করতে যেতে দেব না। শিব ছাড়া ত্রিভুবনে এমন কি কোন ভাল পাত্র নেই যে আমার পার্বতীর স্বামী হবার যোগ্য।

পর্বতরাজ আর নারদ দু-জনেই অনেক করে বোঝালেন মেনকাকে। শেষে জেদ ধরলেন পার্বতী নিজে। বললেন—মা, তোমরা জোর করে আর কারো সাথে আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না। শিব ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না। তুমি আমাকে তপস্যায় যাবার অনুমতি দাও মা।

মেনকা এবার নিরুপায়।

নারদের কথামত পার্বতী চলে গেলেন তপস্যায়, হিমালয়ে সেই মনোরম শৃঙ্গে, পরে যার নাম হয়েছিল গৌরীশৃঙ্গ। পর্বতরাজের মেয়ে তিনি, আর একমাত্র মেয়ে, অত্যন্ত আদরের। দেখতে যেমন ছিলেন অপরূপ, তেমনি ছিল তাঁর সাজপোশাক, অলঙ্কার। সব খুলে রেখে, গাছের ছাল (বল্কল) পড়ে, হাতে হরিণের ছাল নিয়ে একেবারে যোগিনী হয়ে, গৌরীশৃঙ্গে পার্বতী শুরু করলেন এমন কঠোর তপস্যা, যা কোন দেবতা এর আগে দেখেন নি। নেই সেই রূপ, সেই সৌন্দর্য—শিবের তপস্যায় অটল পার্বতী।

আর স্থির থাকতে না পেরে দেবতারা নারদকে নিয়ে গেলেন কৈলাসে শিবের কাছে। অনেক স্তব-স্তুতি করে তাঁর ধ্যান ভাঙিয়ে বললেন—আপনি তো দয়ালু। তবে পার্বতীকে এমন কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

শুনে মৃদু হেসে শিব বললেন—যাতে আর কষ্ট না পায়, তার ব্যবস্থা আমি করছি। তোমরা নিশ্চিন্তে যেতে পার।

শিব যখন নিজ মুখে আশ্বাস দিয়েছেন, তখন আর চিন্তার কিছু নেই। চলে গেলেন দেবতারা।

গৌরীশৃঙ্গে পার্বতীর তপোবন। শিবের সেই সুন্দর রূপের চিন্তায় সব সময়ই বিভোর পার্বতী। কারোর সঙ্গে কোন কথা বলতেন না। সখীরা থাকত পাহারায়। সব কাজ চলত ইঙ্গিতে।

একদিন হঠাৎ এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন তাঁর তপোবনে।

ব্রাহ্মণ এসেছেন। অতিথি। পার্বতী সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে আহ্বান জানিয়ে জল দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে বসার আসন দিলেন। গাছ থেকে টাটকা ফল এনে সামনে বসে সযত্নে তাঁকে খাওয়ালেন। খুবই তৃপ্ত হলেন ব্রাহ্মণ। একটু বিশ্রাম করে ঘুরে ঘুরে দেখলেন তপোবন। গাছ-গাছালি, ফল-ফুলে বড় মনোরম।

পার্বতীকে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে তুমি একা কার তপস্যা করছ?

কথা বলবেন না পার্বতী। উত্তর দেবার জন্য ইঙ্গিত করলেন সখীকে। সখী বললেন—উনি আমাদের সখী পর্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী। শিবের জন্য তপস্যা করছেন।

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন—আমার নাম জটিল। এখানে এমন এক তপোবন তৈরি করে একটি মেয়ে এমন কষ্টসাধ্য তপস্যা করছে দেখে জানতে কৌতূহল হল, তাই এলাম জানতে। তা মেয়ে নিজ মুখে আমায় কিছু বলছে না কেন?

এরপর পার্বতীর পক্ষে আর চুপ করে থাকা গেল না। মুখ খুললেন—সখী আমার ঠিকই বলেছে ব্রাহ্মণ। মনে মনে আমি শিবকেই স্বামী হিসেবে বরণ করেছি। যতদিন আমার ইচ্ছা পূরণ না হয়, ততদিন আমার এই তপস্যা চলবে।

—তাই নাকি? তাহলে আমার তো আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলে না। আমি চললাম। বলেই পিছু ফিরলেন জটিল।

—কেন? এক মুহূর্তও আর থাকা যায় না কেন? জিজ্ঞেস করেন পার্বতী।

—তোমার আতিথেয়তা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম, তোমার তপস্যার জন্য তোমাকে একটু আশীর্বাদ করে যাব।

—এখন করা যায় না?

—না।

—কেন?

—সোনা ফেলে কাচে, চন্দন ফেলে কাদায়, হাতি ফেলে ষাঁড়ের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করছ তুমি! ছি····ছি! রাজার মেয়ে হয়ে ভূত-প্রেতের সর্দারের ভজনা করছ তুমি? এমন জানলে আমি এখানে আসতামই না। বললেন জটিল।

—আপনি এসব কথা কেন বলছেন ব্রাহ্মণ? আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? তাঁকে চেনেন?

—দেখি নি? চিনি না? তিনচোখো, পাঁচমুখো কিম্ভূত তো দেখতে। কোমরে কোন রকমে জড়িয়ে রাখে একটা বাঘের চামড়া। হেন নেশা নেই যা করে না। সারা গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা। তার ওপর সাপ জড়ানো। দেখলেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে-শ্মশানে যত রাজ্যের ভূত-প্রেতদের নিয়ে। ওদেরই তো সর্দার ও। না আছে ঘর-দোর, না আছে ধন দৌলত। আমি

চিনি না ? এমন এক হতচ্ছাড়ার জন্য তুমি এই রকম সাধনা করছ ! আমি ভেবেছিলাম বুঝি দেবরাজ ইন্দ্রের মত কারো জন্য তোমার এই তপস্যা। বললেন জটিল—তাছাড়া, বয়সেরও তো শিবের কোন গাছ-পাথর নেই।

—আপনি এসব কি বলছেন ব্রাহ্মণ ? হয় আপনি তাঁকে দেখেন নি, চেনেন না, নয়ত মিথ্যে কথা বলছেন। না, আপনি তাঁকে চেনেন না। সে সদাশিব মহাদেব, শিবকে অত সহজে চেনা যায় না। অযথা কেন আপনি এসে আমার কাছে তাঁর সম্বন্ধে অকথা-কুকথা বলছেন ? এসব শোনাও আমার পাপ। আর আপনার মত শিব-নিন্দুকের সেবা করে আমি কি পাপ কাজই না করলাম !

পার্বতী সখীকে বললেন—সখী, মহাপাপী ঐ ব্রাহ্মণকে এখান থেকে চলে যেতে বল। নইলে আবার নিন্দা শুরু করবে, আমি সহ্য করতে পারব না। শিব যে রকমই হোন, তিনিই আমার স্বামী। তাঁকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না।

এই বলে যেই তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে যাবেন, দেখেন, কোথায় সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জটিল ? সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই আরাধ্য সেই অপরূপ সুন্দর চিরযুবা শিব।

পার্বতীর তখন আর লজ্জার শেষ নেই।

হাসিমুখে পার্বতীর কাছে এগিয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন মহাদেব—পার্বতী, সার্থক তোমার তপস্যা। সত্যিই আমি খুব তুষ্ট হয়েছি। চল, আমার সঙ্গে আমার বাড়ি কৈলাসে।

পার্বতীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। সখীই তখন পার্বতীর হয়ে মহাদেবকে বললেন—প্রভু, সংসারে যে ভাবে বিয়ে হয়, আপনি ওঁকে ওঁর বাপের বাড়ি থেকে সেই ভাবে বিয়ে করে আনুন, যাতে সকলেরই মর্যাদা সমান থাকে।

—বেশ, পার্বতীর যখন ইচ্ছে, তখন তাই হবে। এই বলে শিব মুহূর্ত মধ্যে অন্তর্হিত হলেন।

তপস্যা সফল হয়েছে। মনের আনন্দে পার্বতীও সখীদের নিয়ে আবার ফিরে এলেন মা-বাবার কাছে। শুনে মা-বাবাও খুশি। তাঁদের মেয়ের কি সৌভাগ্য !

শিব সোজা চলে এলেন কাশীতে। ভাবতে লাগলেন, কিভাবে কি করা যায়। হিমবানকে ডাকতে হবে। তাঁর অনুমতি নিতে হবে সর্বপ্রথম। তার পরেও অনেক কাজ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সপ্তর্ষিদের। ডাক দিলেন তাঁদের। সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন তাঁরা। আসতে বাধ্য। কেননা তাঁরই অনুগ্রহে তাঁরা সপ্ত ঋষি।

—আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে।

—পর্বতরাজ হিমবানের কন্যা পার্বতীকে আমি বিয়ে করব বলে বর দিয়েছি। আমারই জন্য সে কঠোর তপস্যা করছিল। বিয়ে করতে হচ্ছে আমাকে শুধু দেবতাদের জন্য। তারকাসুরের অত্যাচারে বড় বিব্রত তাঁরা। ব্রহ্মার বরে একমাত্র পার্বতীর ছেলে ছাড়া আর কারো হাতে সে মরবে না। তোমরা হিমবানের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সব কিছু বলে রাজি করিয়ে অনুমতি নিয়ে এসো।

মহাদেবের আদেশ। সপ্তর্ষি গিয়ে হাজির হলেন হিমবানের কাছে। শোনা মাত্রই রাজি। যেন এরই জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

কাশীতে ফিরে এলেন সপ্তর্ষি দিন-ক্ষণ ঠিক করে। মহাদেবকে জানিয়ে চলে গেলেন তাঁরা যে যাঁর জায়গায়। ঠিক হল, তাঁরা আবার এসে বিয়ের দিন বিয়ে দেওয়াবেন।

কাশী থেকে মহাদেব সোজা এবার চলে এলেন কৈলাসে। ডেকে পাঠালেন নারদকে—তুমি আমার বিয়েতে বরযাত্রী যাবার জন্য সব দেবগণকে নেমন্তন্ন করে এসো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু থেকে শুরু করে যক্ষ, গন্ধর্ব, মুনি-ঋষি, যে যেখানে আছেন—সকলকে। যেন কেউ বাদ না যায়।

ঢেঁকিবাহন নারদও স্বর্গ-মর্ত্যে, গন্ধর্বলোকে, কিন্নরলোকে যে যেখানে ছিল, বোঁ বোঁ করে সেখানে গিয়ে সব নেমন্তন্ন সেরে আবার ফিরে এলেন।

বিয়ের দিন—যেমন হইহই কৈলাসে, তেমনি হইহই হিমবানের রাজ্যে। এখানে যখন ঠাট্টা-মস্করা করতে করতে সখীরা সাজাচ্ছে পার্বতীকে, কৈলাসে তখন শিবকে বরের বেশে সাজিয়ে দিচ্ছেন দেবীরা। শিবের আবার বেশভূষা ! একটু সাজাতে হয়, তাই। ছাই হয়ে গেছে চন্দন, সাপেরা যেন সব নানা রকম মণি-মুক্তোর মালা। কি অপূর্বই না তখন দেখতে লাগছিল শিবকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য প্রভৃতি দেবতারা, গন্ধর্ব, কিন্নর, নাগ সবাই ইতিমধ্যে এসে হাজির হয়ে গেছেন। গন্ধর্ব আর অপ্সরারা নাচ-গান শুরু করে দিয়েছে। বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে আনন্দে নাচ গান শুরু করে দিয়েছে শিবের অনুচরেরা।

বিশাল বরযাত্রী। কোলাহল করতে করতে এসে, দলে দলে হাজির হতে লাগলেন। হিমবানও সদলবলে যাঁর যা সম্মান, তাঁকে তাই দিয়ে আপ্যায়ন জানিয়ে নিয়ে গিয়ে বসাতে লাগলেন বিয়ের মণ্ডপে। অপূর্ব সে মণ্ডপ। সব শেষে বর-বেশে শিব।

নারদ, বরের ঘরের পিসি আর কানের ঘরের মাসির মত, আগেই এসে গিয়েছিলেন হিমবানের একেবারে অন্দরমহলে। পার্বতীর মা মেনকা তাঁকে ধরে বসেছেন, মেয়ে তাঁর যাঁর জন্য এত তপস্যা করল, কেমন দেখতে সেই শিবকে, একবার দেখাবেন। নিশ্চয়ই দেখতে খুবই সুন্দর হবেন, —হবেন তাঁর অমন চাঁদপনা মেয়ের যোগ্য। নারদ আশ্বাস দিয়ে তাঁকে কাছে বসিয়ে রেখেছেন—দেখিয়ে দেবেন।

বরযাত্রীদের প্রথমেই আসছিলেন নাচ-গান করতে করতে গন্ধর্বরা। মাঝে তাদের রাজা—বিশ্বাবসু। মেনকা তাঁকে দেখে ভাবলেন—এই বুঝি জামাই। ভুল ভাঙিয়ে দিলেন নারদ। বললেন—তাঁকে দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবেন না। অপেক্ষা করুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।

একে একে আসেন যক্ষ মণিগ্রীব, তার চেয়েও অপূর্ব দেখতে কুবের। তাঁর পিছনে আরও অপূর্ব বরুণদেব, আরও অপূর্ব দেখতে ধর্মরাজ, তারপর অপরূপ দেবরাজ ইন্দ্র। যিনি যখনই আসেন মুগ্ধ হয়ে লাফিয়ে ওঠেন মেনকা, আর নারদ বলেন—না, না, অপেক্ষা করুন। তিনি এঁদের চেয়েও অপূর্ব। এলেই আপনাকে দেখিয়ে দেব। মনে মনে অধীর হয়ে ওঠেন মেনকা, যাঁর সঙ্গীরা সব এত অপূর্ব আর তেজস্বী, সে নিশ্চয়ই এদের চেয়ে আরো অপূর্ব হবেই। মেয়ে নিশ্চয়ই তাঁর কোন ভুল করে নি।

একে একে গেলেন সূর্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা প্রধান প্রধান ঋষিদের নিয়ে। প্রত্যেককেই দেখেন আর জামাই ভেবে লাফিয়ে ওঠেন মেনকা।

আর প্রতিবারই নারদ তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দেন। এলেন বিষ্ণু, মহাতাপস ভৃগু। তারপরই দেবগুরু বৃহস্পতি।

বৃহস্পতিকে দেখে মেনকা ভাবলেন—এত তেজস্বী যখন, তখন নিশ্চয় ইনিই শিব।

নারদ বললেন—অপেক্ষা করুন। বৃহস্পতির থেকেও তিনি দেখতে দারুণ।

শুনে আরো খুশি হয়ে উঠলেন মেনকা।

এদিকে শিব—তাঁর তো আর অজানা কিছু নেই। মেনকাকে না দেখলেও তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে, তিনি করে বসলেন এক মজার কাণ্ড।

বাজনা-বাদ্যির পরিচিত আওয়াজ কানে আসতেই নারদ মেনকাকে বললেন—এইবার শিব আসছেন। লক্ষ্য রাখুন।



মেনকা দেখলেন একগাদা কিম্ভূতকিমাকার ভূত-প্রেত-পিশাচ আসছে নাচতে নাচতে। তার মাঝে ষাঁড়ের পিঠে গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা পাঁচ মাথা, তিন চোখ একজন, গায়ে সব হিল হিল করছে সাপ। আঙুল তুলে নারদ তাঁকে দেখিয়ে বললেন—ঐ যে আপনার জামাই শিব।

—অ্যাঁ, বলেই আঁতকে উঠলেন মেনকা। এরই জন্য আমার মেয়ের এত তপস্যা ? আর তোমরা এরই হাতে তুলে দিতে যাচ্ছ আমার মেয়েকে ? বলেই, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ধরলেন গিয়ে স্বামী হিমবানকে—তোমরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে মেয়েটাকে আমার মারতে বসলে ?

হিমবান তো শুনে অবাক। ইতিমধ্যে শিবও এসে হাজির হয়েছেন। মেনকার তখন সে কি রুদ্র মূর্তি। শিবকে তো যা নয় তাই বলে অপমান করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মুনি-ঋষির দল, যিনি কিছু বলতেন আসছেন, প্রচণ্ড তাড়া খেতে লাগলেন মেনকার কাছে। মেয়েকেও কটুকথা বলতে কসুর করলেন না—এমন সব সুন্দর সুন্দর দেব-দুর্লভ দেবপুরুষ থাকতে, মেয়ে কিনা তাঁর শেষে বেছে নিল এই কদাকারকে। বিয়ের আগেই মেয়ের কেন মরণ হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে, বিষ খাইয়ে মারেন !

এরই মধ্যে সুযোগ করে নিয়ে বিষ্ণু, নিরালায় মেনকাকে ডেকে শিবের সম্বন্ধে অনেক গুণগান গাইলেন। অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তাঁর মেয়ে পার্বতী ঠিকই করেছেন, মেনকা কেন অনর্থক ভুল বুঝছেন। শুনতে শুনতে মনটা একটু নরম হয়ে এল মেনকার।

নারদ আড়ালে শিবকে বললেন—জল তো অনেক দূর গড়ালেন, আর কেন ? এবার ভেকটা ছেড়ে আপনার শাশুড়ীকে একটু ঠাণ্ডা করুন, যাতে ভালয় ভালয় অন্তত কাজটা মেটে। লগ্ন যে বয়ে যায়।

শুনে, মুচকি হেসে সেই অপরূপ সুন্দর মূর্তি ধরলেন শিব।

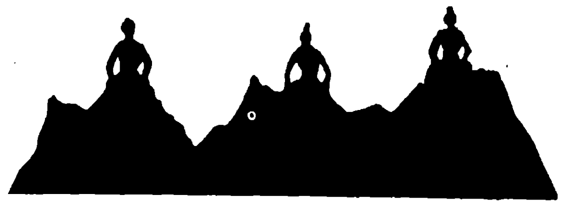
মেনকার তো চক্ষুস্থির। লজ্জায়, অনুশোচনায় আর মুখ তুলতে পারেন না, এমন অবস্থা।

আর কোথাও কোন বাধা নেই। সুন্দর পবিবেশে পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়ে গেল মহা ধুমধামের সঙ্গে। মেনকার অমন আচরণকে আর কেউ মনেও রাখলেন না।

জামাই দেখে সকলেই খুশি। সবাই বলতে বলতে গেল—তপস্যা না করলে কি ভাগ্যে এমন স্বামী মেলে ?

হিমবানের ঘরের উৎসব শেষ হয়ে গেল। পার্বতী আর শিবকে এনে কৈলাসে রেখে চলে গেলেন সবাই। পার্বতীরও দুঃখের সাধনা শেষ হল।

[এঁদেরই ছেলে কার্তিক পরে দেব সেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে বধ করে, স্বর্গরাজ্য আবার দেবতাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কার্তিকে জন্ম ।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ]



ত্রিপুর দহন কাহিনী

শোণিতপুরের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। শিবের ছেলে, দেব সেনাপতি কার্তিকের হাতে নিহত তারকাসুর। স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছেন দেবতারা। কোথাও আর কোন অশান্তি নেই। বেশ চলছিল ব্রহ্মাণ্ডের দিনগুলো। হঠাৎ ঘটল আবার এক বিপর্যয়।

তারকাসুরের তিন ছেলে—তারকাক্ষ, কমলাক্ষ আর বিদ্যুন্মালী। তিনজনই মহাবীর, বুদ্ধিমানও বটে। তারা দেখে-শুনে ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর, বিশেষ করে ব্রহ্মা আর মহেশ্বর এমনি যে, ভালমত একটু পুজো পেলে বা তাঁদের উদ্দেশ্যে তপস্যা করলেই খুশি হয়ে যান। আর এত বেশি খুশি হন যে, কে কি চাইল, তা খতিয়ে না দেখেই বলে বসেন 'তথাস্তু'—তাই হবে।

তিন ভাই মিলে যুক্তি করল, তপস্যা করে ওঁদের কাছ থেকে এমন বর আদায় করতে হবে যে, দেবতারা যেন একেবারে কোণঠাসা হয়ে যান।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। তিন ভাই মিলে শুরু করল কঠোর তপস্যা। রোদ-ঝড়-জল-শিলাবৃষ্টি দাবানল, কত কি বয়ে গেল ! তিন ভাই তবু তপস্যায় অটল। তিন অসুরের যে তপস্যা,

দেবতারাও অমন তপস্যা কখনো করতে পারেন নি।

প্রায় এইভাবে কেটে গেছে হাজার বছর। ব্রহ্মা আর থাকতে না পেরে, এসে বললেন—থামো... থামো। তোমরা কি চাও বল।

—কেউ যেন কখনো আমাদের মারতে না পারে। একসঙ্গে বলে উঠল তিন ভাই।

ব্রহ্মা বললেন—তোমরা তো বাপু জান যে, ঐ অমরত্ব বর দেবার ক্ষমতাটা আমার নেই। ওটা ছাড়া যা চাইবে, তাই দিতে পারব।

তিন ভাই তখন নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে নিয়ে বলল—তাহলে ময়দানবকে বলুন, আমাদের তিন ভাই-এর জন্য একটা স্বর্গে, একটা অন্তরীক্ষে আর একটা মর্ত্যে, তিনটে দুর্গবাড়ি তৈরি করে দিক। স্বর্গে সোনার, অন্তরীক্ষে রুপোর আর মর্ত্যে লোহার। এই ত্রিপুর নিয়ে আমরা হাজার বছর ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াব। তারপর, একসময় আমরা একবার আসব এক সরলরেখার মধ্যে। সেই সময়, এক-বাণে যদি কেউ ত্রিপুর ধ্বংস করতে পারে, তবেই আমরা মরব।

ব্রহ্মা কথার কোন মারপ্যাচের দিকে না গিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন 'তথাস্তু'। তারপর ময়দানবকে ডেকে বলে দিলেন—দাও হে, ওদের মনের মত তিন জায়গায় তিনটে দুর্গবাড়ি তৈরি করে দাও।

বলে চলে গেলেন ব্রহ্মা। আনন্দে তিন ভাইও লাফিয়ে উঠল—কেমন ঘুরিয়ে সেই বরটা আদায় করে নিলাম, বোকা ব্রহ্মা বুঝতেও পারলেন না।

দেখতে দেখতে ময়দানবও দিন-রাত পরিশ্রম করে তিন জায়গায় তিনটে দুর্গবাড়িও তৈরি করে ফেলল। দুর্গ তো নয়, এক একটা বিরাট নগর। বড় বড় প্রাসাদ থেকে শুরু করে বন-উপবন-তপোবন সব কিছু দিয়ে পরিপাটি সাজানো। হাজার হাজার অসুর নিয়ে যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠতে লাগল এক একটা নগরী, তেমনি ভাবে চলল অবাধ যাগ-যজ্ঞ। দেবতারা শক্তিমান বেদশাস্ত্রের বলে, সনাতন ধর্মের অনুসরণ করে চলেন। তিন অসুরও সেদিক থেকেও হয়ে গেল একেবারে উদার। হোমের আগুন আর নেভে না। মুনি-ঋষিরাও দেখলেন, বাধা যখন নেই বরং সহায়তা রয়েছে, তাঁরাও থেকে গেলেন তাঁদের পুরে।

এভাবে যখন রমরমা হয়ে উঠল ত্রিপুর, সবাই যখন থাকতে শুরু করলেন সেখানে, দেবতারা প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারা গেলেন ব্রহ্মার কাছে। সবই যদি ঐ তিন অসুরের আয়ত্তে চলে যায়, কি করবেন এখন তাঁরা? কেউ যে আর তাঁদের কাছে আসেনও না, তাঁদের ডাকেন না।

—কিছু একটা উপায় করুন, পিতামহ। দেবতারা সবাই মিলে গিয়ে ধরলেন ব্রহ্মাকে।

ব্রহ্মা বললেন—কি করি বল তো? আমিই ওদের অত বড় করে তুলেছি। ওরা এমন কিছু এখনও করে নি, যাতে ধর্মের হানি হয়েছে। আবার, তোমরা হীনবল হয়ে যাও, এটাও আমি চাই না। কি করি? তোমরা বরং একবার শিবের কাছে যাও দেখ, তিনি যদি কোন উপায় করতে পারেন।

সবাই এলেন কৈলাসে শিবের কাছে। পেশ করলেন সব দুঃখের কথা।

শুনে শিব বললেন—অধর্ম তো ওরা এখনও কিছু করে নি। ধর্মপথেই আছে। বেদের নিয়ম-কানুন সব মেনে চলছে। আমার তো এক্ষেত্রে করার কিছু দেখছি না। তবে তোমাদের এই দুরবস্থা ঘটাও ঠিক নয়। বরং একবার বিষ্ণুর কাছে গিয়ে দেখ, তিনি যদি কোন কিছু করতে পারেন।

আবার সবাই মিলে এলেন বৈকুণ্ঠে। বিষ্ণুকে বললেন। পেলেন কিন্তু সেই একই জবাব।

—তাহলে কি প্রভু, আপনি চান, দেবতা হয়েও আমরা এই রকম ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াই?

—না, সেটাও ঠিক নয়। এই বলে বিষ্ণু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—মারতে গেলে ওদের একমাত্র রুদ্রই মারতে পারেন। কিন্তু ধর্মের পথ থেকে ওদের সরিয়ে আনতে না পারলে তো কিছুই করা যাবে না।

—আমরা তো আপনাদের আদেশের চাকর মাত্র। প্রভু, যা করবার আপনিই করুন। আমাদের অবজ্ঞা মানে তো আপনাদেরও অবজ্ঞা।

—তা বটে। আচ্ছা দেখি। তোমরা এখন যাও। যদিও করা উচিত নয়, তবুও দেখছি তোমাদের জন্য আমাকে সেই কাজই করতে হবে। বললেন বিষ্ণু।

অনেক ভেবে-চিন্তে মায়াধর বিষ্ণু নিজের মায়াশক্তি বলে সৃষ্টি করলেন এক পুরুষ। সৌম্য, সুদর্শন। মাথা কামানো। হাতে কাপড়ের টুকরো। তা দিয়ে ঘন ঘন মুখ ঢাকছেন। এসে দাঁড়ালেন—আদেশ করুন, কি করতে হবে আমাকে।

—শোন, মনের মত কয়েকজন সঙ্গী কর। তুমি আমারই মানসপুত্র, সুতরাং তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তোমার সঙ্গীদের শিখিয়ে নাও, যে বিদ্যে আমি তোমায় শেখাব। তারপর তোমরা সবাই মিলে ত্রিপুরে যাবে, আর ঐ বিদ্যে প্রচার করে সকলের মন জয় করবে। বিষ্ণু বললেন—ত্রিপুরে গিয়ে তোমরা প্রচার করতে থাকবে, বেদে যে সব লেখা আছে, তা সব সত্যি নয়। যাগ যজ্ঞ হোম করে কোন লাভ নেই, প্রাণীহিংসা মহাপাপ। এখন ত্রিপুরে গিয়ে তোমরা এই কাজ কর। তারপর সৃষ্টি যখন করেছি তোমাদের, একেবারে যাতে মারা না পড়, তার ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাব।

সেই মানসপুত্র মুণ্ডন, বেশ কিছু শিষ্য, আবার তাদেরও শিষ্যদের ভালমত শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে হাজির হল ত্রিপুরে। শুরু করল



প্রচার। সকলেই ভাবতে শুরু করল, বেশ তো সহজ সরল পথ, অত কষ্ট করতে হবে না। মুনি-ঋষিদের ছেড়ে দলে দলে এসে ভিড়তে লাগল তাদের দলে। যাগযজ্ঞে ভাঁটা পড়তে শুরু করল।

নারদ চাললেন আর এক চাল। মুণ্ডনের মত তিনিও মাথা মুড়িয়ে মুখে কাপড় এঁটে সোজা গিয়ে হাজির হলেন বিদ্যুন্মালীর কাছে।

এ অবস্থায় নারদকে দেখে অসুর বিদ্যুন্মালী তো অবাক—কি ব্যাপার ! আপনি এভাবে কেন ?

নারদ বললেন—এতদিন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ালাম। ধুর...ধুর, ওখানে কিচ্ছু নেই...কিচ্ছু নেই। তোমার পুরে আসতে গিয়ে দেখলাম মুণ্ডনকে। আলাপ করে বুঝলাম—সার কথা, যাগ-যজ্ঞ সব বাজে। তাই বাপু আমি এখন থেকে মুণ্ডনেরই শিষ্য হয়ে গেলাম।

—তাই নাকি ? সত্যি ?

—বিশ্বাস না হয়, চল মুণ্ডনের কাছে। আলাপ-আলোচনা করলেই দেখতে পাবে।

মনে মনে ভাবল বিদ্যুন্মালী—নারদ যখন নিজে এমন হয়ে গেলেন, তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন ভুল নেই। তারপর এসে মুণ্ডনকে দেখে বিদ্যুন্মালী গেল আরো মোহিত হয়ে। দেখতে দেখতে মোহিত হল ত্রিপুর।

সনাতন ধর্ম-বিরোধী কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে ত্রিপুরে। আর তো কোন বাধা নেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে নিয়ে দেবতারা আবার এলেন কৈলাসে শিবের কাছে।

শিব বললেন—আমার সব জানা হয়ে গেছে। খুব ভাল খেলাই খেলেছে বিষ্ণু। ভেবেছিলাম বিয়ে-থা করেছি, পার্বতীকে নিয়ে এবার চুপচাপই থেকে যাব। এখন দেখছি, তোমরা আর থাকতে দেবে না। ধর্মের জন্য ত্রিপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাকে যেতেই হবে। বলে, দেবতাদের বললেন—দেখ বাপু, যুদ্ধে তো যাব। তা আমার এই ষাঁড়ের পিঠে চেপে তো যাওয়া যাবে না। ভাল একটা রথ তো চাই। সব দিক থেকে বেশ মজবুত রথ।

রথটা কেমন হবে, তা জেনে নিয়ে দেবতারা বিশ্বকর্মাকে ডেকে তাড়াতাড়ি তৈরি করিয়ে আনলেন সেই রথ। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে সাজানো হয় নি সেই রথ। যেমন অপূর্ব, তেমনি বিশাল—যেন আর এক ব্রহ্মাণ্ড। ইচ্ছেমত ছুটতে পারে সে রথ—কি মর্ত্যে, কি আকাশে।

রথ দেখে খুব খুশি হলেন শিব—বাঃ, সুন্দর হয়েছে। তা, এ রথ একমাত্র ব্রহ্মা ছাড়া আর তো কেউ চালাতে পারবে না বাপু। বলে ব্রহ্মাকে বললেন—ব্রহ্মা, নাও, সারথি হও। আমিও আমার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে উঠি। চল, যাওয়া যাক, ত্রিপুরের দিকে।

ধনুক-বাণ, পাশুপত প্রভৃতি অস্ত্রে সেজেগুজে পার্বতীকে নিয়ে শিব উঠলেন রথে। বিকট গর্জন করে চালু হল রথ। সে কি গর্জন। তাতে কেঁপে উঠল ত্রিভুবন। শিব এসে হাজির হলেন ত্রিপুরে। লক্ষ্য করে প্রথমে ছাড়লেন এক হুঙ্কার। তাতেই ত্রিপুরের প্রায় অর্ধেক অসুর প্রাণ হারাল। শুরু হয়ে গেল সেখানে হুড়োমুড়ি।

ঠিক এই সময়ই স্বর্গ, অন্তরীক্ষ আর মর্ত্যের সোনা, রুপো আর লোহার তিনটে পুর ঘুরতে ঘুরতে এল এক সরলরেখায়। দেখেই ব্রহ্মা বলে উঠলেন—শিব, আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। জানি, তুমি তাকালেই সব ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে বর দিয়েছি বাণে মরবে। তাড়াতাড়ি তোমার বাণ ছোঁড়, শিব। সুযোগ ফসকে যেতে দিও না।

শিব প্রস্তুত। হানলেন পাশুপত। পুড়ে ছাই হল ত্রিপুর। অসুররাও গেল সেই সঙ্গে। তারই মধ্যে যারা পালাতে পেরেছিল, শিব অবশ্য তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কাজ শেষ। শিষ্যদের নিয়ে মুণ্ডন এসে দাঁড়ালেন শিবের সামনে। শিব বললেন—এখন আর তোমাদের কোন কাজ নেই। যখন কলিযুগ আসবে, বিষ্ণু আর আমার আশীর্বাদে আবার তোমরা 'জৈন' নামে প্রতিষ্ঠা পাবে। এখন যাও।

দেবতারাও হলেন নিশ্চিন্ত। শিবও হলেন শান্ত।



কেতকী ও চাঁপার দুর্ভাগ্য

শিবের আর এক নাম—ভোলানাথ, ভোলা মহেশ্বর।

ভোলানাথ তো সত্যিই ভোলানাথ। যে যে-ফুল দিয়েই পুজো করুক না তাঁর, তিনি তাতেই খুশি। আর, যে যে-বরই চাক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রার্থনা মঞ্জুর। একবার তাঁর নেকনজরে পড়লে, যে যত অপরাধই করুক না কেন, নাম মাত্র একটু সাজা না দিলে নয়, নচেৎ বেমালুম ক্ষমা। একেবারে যদি কেউ বে-কায়দায় পড়ে যায়, তখন আর কি করবেন। চুপচাপ।

এমন বেকায়দায় পড়েছিলেন শিব, তাঁর দুটি প্রিয় ফুল কেতকী আর চাঁপার বেলায়। কোন মতেই এ দুটো ফুলকে আর তিনি কাছে পেলেন না। একেবারে অচ্ছুত হয়ে গেল।

রামচন্দ্র তখন বনবাসে। লক্ষ্মণ আর সীতাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য কুটো-কাঁটার কুঁড়ে বেধে আছেন ফল্গু নদীর ধারে।

হঠাৎ এসে গেল পিতা দশরথের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। ছেলের হাত থেকে পিণ্ড-জল নেবার জন্য বছরের নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বাপ-ঠাকুর্দাদের আত্মারা অলক্ষ্যে কাছাকাছি এসে থাকেন খিদের জ্বালা নিয়ে। আমাদের চোখে ওঁরা কাছে আসেন বছরে একদিন বটে, কিন্তু ওঁদের কাছে, প্রতিদিন। পিতৃলোকের নিয়মই তাই। আমাদের এক বছর মানে ওঁদের একদিন। তাই বছরে বছরে তাঁদের উদ্দেশ্যে অন্ন-জল দেওয়ার মানেই হল, আমাদেরই মত ওঁরা প্রতিদিন খেতে পান; খিদে মেটান। তৃপ্তি পান।

খেয়াল পড়তেই রামচন্দ্র ডাকলেন লক্ষ্মণকে—ভাই, আজ যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন। পিতা এসে অপেক্ষা করছেন অলক্ষ্যে। ঘরে তো কিছুই নেই। এখুনি একবার নগরে যাও। যে ভাবেই

হোক কিছু অংপ চাল, ফল-মূল যোগাড় করে আন।

দাদার হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ ছুটলেন নগরে। এদিকে কুশ-টুশ যোগাড় করতে লাগলেন রামচন্দ্র।

অনেক সময় কেটে গেল, তবু লক্ষ্মণ ফিরলেন না দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন রামচন্দ্র—তাই তো, কি হল ? ভাই এখনও ফিরল না কেন ? সময় পেরিয়ে গেলে বাবা যে আমার অভুক্ত থেকে ফিরে যাবেন।

সীতাকে বললেন—সীতা, আমি নিজে গিয়ে একবার দেখি, কি হল। বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণের খোঁজে।

অপেক্ষা করতে করতে সীতা দেখলেন, পিণ্ডদানের সময় আর খানিকটা বাদেই পেরিয়ে যাবে। এখনও না ফিরলেন লক্ষ্মণ, না তাঁর স্বামী রামচন্দ্র। মনে মনে খুবই অস্থির হয়ে উঠলেন সীতা—ছি, ছি, খিদে নিয়ে শ্বশুর তাঁর ফিরে যাবেন। ফিরে যাবেন রাজা দশরথ না খেতে পেয়ে ! কি করেন ?



ফল্গু নদীতে স্নান সেরে প্রদীপ জ্বেলে আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করলেন সীতা—যদি এসে যান, তাড়াতাড়ি চাল ফুটিয়ে পিণ্ড করে দেবেন। কিন্তু কোথায় ? এদিকে সূর্য চলেছে ছুটে, সময়ও যাচ্ছে পেরিয়ে। তাই আর থাকতে না পেরে হাতের কাছে যেটুকু ফল-মূল যোগাড় করতে পারলেন, করে নিয়ে মনে মনে শ্বশুরকে স্মরণ করে বললেন—আপনি তো আমারও বাবা। এত বেলা পর্যন্ত এখনও অভুক্ত আছেন, এ যে আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার দেওয়া এই সামান্য খাদ্য আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সীতাদেবী দেখলেন অলঙ্কারে ভরা দুটো বলিষ্ঠ হাত এসে থেমে গেল তাঁর সামনে। শুনলেন আকাশবাণীর মত—দাও মা, কি দেবে দাও।

সীতা দেবী সেই হাতে তুলে দিলেন তাঁর অর্ঘ্য। জিজ্ঞেস করলেন—এ হাত কার ? কে আপনি ! অদৃশ্য হল হাত। শুনলেন—আমিই রাজা দশরথ। তোমার দেওয়া খাদ্যে আমি খুব তৃপ্তি পেলাম মা। সুখী হও।

—বাবা, আপনার ছেলে তো এসব বিশ্বাস করবে না, আমার মুখ থেকে শুনে। বললেন সীতা।

—সাক্ষী রাখ। ফল্গু নদী বলবে, তোমার প্রদীপের আগুন বলবে, যে কেতকী ফুল দিলে সে বলবে, পাড়ে গরু রয়েছে, সে বলবে। তখন রামচন্দ্র নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে যে, আমি হাত বাড়িয়ে তোমার কাছ থেকে পিণ্ড নিয়ে তৃপ্ত হয়ে ফিরে গেছি। থেমে গেল আকাশবাণী। আর কোথাও কিছু নেই।

হতবাক বসে সীতা। মনে তাঁর দারুণ তৃপ্তি।

এই সময় প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ এসে হাজির।

—সীতা, সীতা, আর একটুও সময় নেই। তাড়াতাড়ি পাক চাপিয়ে দাও।

সীতা তখন সব কথা বললেন রামচন্দ্রকে।

শুনে রামচন্দ্র ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ সীতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল সীতা ? যা আমরা আজও দেখতে পেলাম না, তুমি তাই দেখলে, এটা আমায় মেনে নিতে হবে ? দেরি করো না, তাড়াতাড়ি ওঠো।

—বিশ্বাস ? এই ফল্গু নদী, আগুন, কেতকী ফুল, গরু তার সাক্ষী। এদের জিজ্ঞেস কর।

সকলকে রামচন্দ্র একে একে তখন জিজ্ঞেস করলেন। আর এমনি আশ্চর্য, কেন যেন তারা সব দেখা সত্ত্বেও সত্য গোপন করে গেল। বলল—কই, আমরা তো সে রকম কিছু দেখি নি।

হাসলেন রামচন্দ্র সীতার দিকে তাকিয়ে। বললেন—দেখ তো, তোমার স্বপ্ন দেখার ফলে কতটা সময় নষ্ট হল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পাক চাপাও। আর খুব অল্প সময় আছে মাত্র, বাবা অন্তরালে অপেক্ষা করছেন।

মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ সীতা। তবু উপায় নেই। পিণ্ড তৈরি হল। শাস্ত্রের নিয়মমত রামচন্দ্র আহ্বান জানালেন পিতৃদেবকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন আকাশবাণী—আবার আমায় ডাকছ কেন? জানকী তো আমাদের তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়েছে। আবার কি খেতে পারি ?

—এ আপনি কি বলছেন, পিতা ? জানকী আপনার সেবা করেছে ? বিস্মিত রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করেন।

—বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস কর সূর্যদেবকে। ও তো সবই দেখেছে।

সূর্যদেব বললেন—হ্যাঁ রামচন্দ্র। রাজা দশরথ ঠিকই বলেছেন।

উঠে পড়লেন রামচন্দ্র। জানকীর জন্য খুব গর্ব অনুভব করলেন। মনে মনে বললেন—ভক্তি কি অসাধ্যই না সাধন করতে পারে !

এবার সীতা কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। মিথ্যে কথা বলার জন্য চারজনকেই দিয়ে বসলেন অভিশাপ। ফল্গুকে বললেন—আজ থেকে তোমার মুখ যেন আর বাইরে কেউ দেখতে না পায়। আগুনকে বললেন—তুমি সর্বভুক হও। গরুকে বললেন—যে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলেছ, তোমার সেই মুখ যেন অপবিত্র হয়। আর কেতকীকে বললেন—মহাদেবের কাছে তুমি খুব প্রিয় ফুল, না ? মিথ্যাচারী, আজ থেকে তোমার ফুলে শিবের কোন পূজা হবে না।

সেই থেকে মহাদেবের পুজোয় আজ পর্যন্ত কেতকী অচ্ছুৎ।

চাঁপাফুল।

যেমন দেখতে মিষ্টি, মিষ্টি তেমনি গায়ের রং। আবার তার চেয়েও মিষ্টি তার গন্ধ। কার না মন মাতায় চাঁপা ? কার না মন ভোলায় ? সে মানুষই হোক, আর দেবতাই হোক, চাঁপার কাছে সবাই কাৎ। এক সময় দেবাদিদেব শিবও চাঁপার গন্ধে বিভোর হয়ে

থাকতেন। আর চাঁপা দিয়ে যে তাঁর পুজো করত, তার মনের সব আশা-আকাঙক্ষা তিনি মিটিয়ে দিতেন।

একবার এমন এক ঘটনা ঘটল যে, শিবকে সেই চাঁপাও ত্যাগ করতে হল।

দাক্ষিণাত্যে গোকর্ণ। সেখানে আছে গোকর্ণেশ্বর শিব। নারদ মুনি একদিন সেই শিব দর্শন করতে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন এক চাঁপা গাছের নীচে। হাতে বীণা। মুখে নাম। গাছ ভরতি চাঁপা। ভুর ভুর করছে সুবাস। মুনিবর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

এমন সময় চুপড়ি হাতে এক ব্রাহ্মণ এল সেখানে। ফুল তুলতে যাবে কি; মুনিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল, এর সামনে যদি ফুল তুলি, এখুনি নানা প্রশ্ন করে বসতে পারে। সুতরাং, যাক। চলে যাক। তারপর তুলব।

চুপড়ি হাতে ব্রাহ্মণকে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে নারদ মুনি জিজ্ঞেস করলেন—কি হল ব্রাহ্মণ? ফুল তুলবেন নাকি? তা দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?

ব্রাহ্মণ বলল—না-না। আমি ফুল তুলতে আসি নি। ভিক্ষে করতে যাচ্ছিলাম। আপনাকে হঠাৎ এখানে দেখে একটু দাঁড়ালাম মাত্র।

—ওঃ! বলে, নারদ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সোজা চলে গেলেন শিবের মন্দিরে। গিয়ে শিবকে গান-বাজনা শুনিয়ে সন্তুষ্ট করে আবার ফেরার পথ ধরলেন।

পথের মাঝে আবার সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। ব্রাহ্মণ আঁচল চাপা দিয়ে চুপড়ি নিয়ে যাচ্ছিল।

—কি হল ব্রাহ্মণ? ফিরে পড়লেন? জিজ্ঞেস করলেন নারদ।

—হ্যাঁ। কোথাও কিছু পেলাম না। বলতে বলতে চুপড়িটা আরো একটু আড়াল করে এত তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে যে, নারদের মনে বেশ সন্দেহ জাগল।

সোজা সেই চাঁপা গাছের কাছে এসে নারদ মুনি গাছকে জিজ্ঞেস করলেন—গাছ, সত্যি করে বল তো, ঐ ব্রাহ্মণ কে? তোমার কতগুলো ফুল তুলে নিয়ে গেছে?

ব্রাহ্মণ গাছকে কোন কথা কাউকে বলতে বারণ করে গিয়েছেন। তাই একেবারে ন্যাকা সেজে গাছ বলল—ব্রাহ্মণ? এখানে তো কেউ আসে নি। ফুলও তো কেউ তোলে নি। তুমি কে?

নারদ গাছকে আর কোন কথা না বলে আবার ফিরে গেলেন শিব মন্দিরে। গিয়ে দেখেন, এক ব্রাহ্মণ শিবের পুজো করছে। আর শিবের মাথায় শোভা পাচ্ছে একশ-এক চাঁপা।

নারদ জিজ্ঞেস করলেন—এই চাঁপা কি তুমি দিয়েছ?

ব্রাহ্মণ বলল—না মুনিবর। আমাদের রাজা যার নির্দেশে, যার মারফৎ দ্যান-ধ্যান করেন, চাঁপা দিয়ে পুজো সেই ব্রাহ্মণই কিছুক্ষণ আগে করে গেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মুনিবর। আমি কতদিন ধরে বাবাকে ডাকছি—বাবা, আমায় মুক্তি দাও। বাবা আমার সে কথা যেন কানেও নেন না। আর এই ব্রাহ্মণ···! বলেই থেমে গেলেন।

—ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? থামলে কেন? বল। কোন ভয় নেই তোমার।

—বাবা, ওকে দু-হাত উপুড় করে দিচ্ছেন। ছিল ভিখিরি। এখন প্রায় রাজা। আমাদের রাজাকে অন্ধ করে নিজের বশে রাখল। দানের নাম করে কোষাগার তো প্রায় ফাঁক করল। তার ওপর জোর-জুলুম করে আদায়। ব্রাহ্মণরাও নিস্তার পায় না মুনিবর ওর হাত থেকে।

—সে কি? বলে, নারদ সরাসরি শিবকে বললেন—শুনলেন ব্রাহ্মণের কথা?

শিব বললেন—নারদ, আমি কি করব বল, ও যে রোজ আমায় চাঁপা দিয়ে পুজো করে। চাঁপার কাছে কে বশীভূত নয়, বল? যখনই ওর গন্ধ আমার নাকে আসে, আমি সব ভুলে যাই।

ঠিক এই সময়েই এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে আছড়ে পড়ল শিব মন্দিরে। মাথা খুঁড়ে বিলাপ করতে লাগল—এ তুমি আমার কি সর্বনাশ করছ, ঠাকুর?

নারদ তাকে কোন রকমে তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মা? তুমি অমন করছ কেন?

—আমার সর্বনাশের কথা আর কি বলব ঠাকুর। আমার স্বামী পঙ্গু। আমার মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক। আমার স্বামী রাজার কাছে প্রার্থনা জানাতে তিনি আমাদের কিছু সাহায্য করেছেন। তা যে ব্রাহ্মণের মারফৎ তিনি সাহায্য করেন, তিনি এখন বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছেন, আমরা নাকি তাঁরই দৌলতে সাহায্য পেয়েছি। যা পেয়েছি তার অর্ধেক তাঁকে দিতে হবে। নইলে আমাদের সব কেড়ে নিয়ে যাবেন।

—তা রাজার কাছে গিয়ে না জানিয়ে এখানে এসে মাথা খুঁড়ছ কেন?

—ঠাকুর, নালিশ করলেও রাজা আমাদের কথা বিশ্বাসই করবেন না। বামুন গুণ তুক করে রাজাকে একেবারে বোকা বানিয়ে রেখেছেন।

—রাজা তোমাদের কি সাহায্য করেছেন?

—প্রচুর অর্থ আর একটা গাই গরু। গাই গরুটার আবার শিগগির বাচ্চাও হবে। ব্রাহ্মণকে বললাম—বেশ, টাকার না হয় অর্ধেকটা নিয়ে যান। বলে কি টাকার অর্ধেক তো নেবেই, ঐ গরুরও অর্ধেক চাই। আমি এ কি পিশাচের পাল্লায় পড়লাম, ঠাকুর। এখন কি করি?

—এ কি বলছেন আপনি? ব্রাহ্মণ সে। চায় গরুর ভাগ? ছি···ছি···ছি···! বলে শিবকে বললেন—এমন নিষ্ঠুর, অসাধু ঠকবাজের হাতেও আপনি পুজো নেন? আপনার মনে একটুও কুণ্ঠা জাগে না?



শিব বললেন—সবই বুঝতে পারছি নারদ। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে সে। তবু ঐ যে বললাম—চাঁপার গন্ধে আমি সব ভুলে যাই। তা নারদ, শাস্তি ওর পাওয়া উচিত। তুমিই ওকে সাজা দাও। তবে নারদ, ও আমার একজন ভক্ত, এটা যেন ভুলে যেও না।

নারদ মুনি সেখান থেকে সোজা চলে এলেন সেই চাঁপা গাছের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন—এখনো সত্যি করে বল, কে তোমার ফুল নিয়ে গিয়ে রোজ শিবের পুজো করে?

গাছ এবারেও উলটোপালটা জবাব দিল।

নারদ গেলেন রেগে— তবে রে, মিথ্যাচারী! আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, আজ থেকে তোর ফুলে আর শিবের পুজো হবে না।

ঠিক সেই সময়ই সেখানে এসে হাজির সেই ব্রাহ্মণ।

চিনতে পেরেই নারদ বললেন—তুমি তো সেই ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দানের গরুর ভাগ নিয়েছ? আবার ঐ হাতে পুজো কর? পিশাচ! যাও, রাক্ষস হয়ে জন্মাও গে।

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ব্রাহ্মণ নারদের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। নারদেরও মনে পড়ে গেল শিবের সেই কথা—ও আমার একজন ভক্ত। মনে পড়তেই তিনি ব্রাহ্মণের সদগতির একটা উপায় অবশ্য করে দিলেন—রাক্ষস তোমাকে হতেই হবে। আর রামচন্দ্র তোমাকে উদ্ধার করবেন।

নারদ চলে গেলেন। ব্রাহ্মণও চলে গেল রাক্ষসকুলে।

কিন্তু চাঁপার দুর্ভাগ্য। তার আর সদগতি হল না। শিবের কাছে সেই থেকে সে আজও অচ্ছুত হয়েই থেকে গেল অত সৌন্দর্য সত্ত্বেও।

গণেশের বিয়ে

হর-পার্বতীর দুই ছেলে—গণেশ আর কার্তিক।

যদিও এক-দাঁত হাতির মুখ গণেশের, আর ষড়ানন কার্তিক, তবুও দু-জনেই যে মহাবীর, তার প্রমাণ সকলেই পেয়ে গেছেন। কার্তিক দেব সেনাপতি না হলে, সাধ্য কি ছিল দেবতাদের যে তারকাসুরকে বধ করে আবার স্বর্গরাজ্য পান? আর গণেশ! সকলের আগে হয় তাঁর পুজো। নন্দী-ভৃঙ্গীর মত ভয়ানক সব অনুচর, এমন কি শিবকেও পার্বতীর আদেশে একবার টের পাইয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর ক্ষমতা কতখানি।

দু-ছেলের জন্য মা-বাবার গর্বও যেমন, আনন্দও তেমনি।

বড়-সড় হয়েছে দু-ছেলে। বিয়ে দেবার সময়ও হয়েছে। খবর আসে মা-বাবার কানে, দু-ভাইয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়, কে আগে বিয়ে করবে, তা নিয়ে। তা নিয়ে মা-বাবার চিন্তাও বড় কম নয়।

একদিন দু-ভাইয়ের মধ্যে এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে। খবরটা কানে যেতেই হর-পার্বতী নিজেদের মধ্যে একটা যুক্তি করে ডেকে পাঠালেন দু-জনকেই।

দু-ভাই আসতেই শিব বললেন—শোন আমরা ঠিক করেছি, তোমাদের মধ্যে যে আগে গোটা পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারবে, আমরা আগে তারই বিয়ে দেব।

শোনামাত্রই কার্তিক চেপে বসল ময়ূরের পিঠে।

মূষিক-বাহন হাতিমুখো গণেশ মা-বাবার সামনে থেকে সরে এসে চুপ করে বসল এক জায়গায়। ভাবতে লাগল, কি করা যায়। একে তো তার এই শরীর, বাহনও তেমন সুবিধের নয়, তার ওপর পৃথিবীটাও খুব ছোট নয়। ক্রোশ খানেক গেলেই তো হাঁফিয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে কার্তিক ঘুরে এসে বাজিমাৎ করবে। কিন্তু তা হতে দেওয়া হবে না।

ভাবতে ভাবতে গণেশের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল।

স্নান সেরে নিয়ে এল দুটো আসন আর কিছু ফুল। হর-পার্বতীর কাছে গিয়ে বলল—মা-বাবা, তোমরা আসন-দুটোয় বসো। আমি তোমাদের পুজো করব।

ছেলের আবদার। দু-জনেই গিয়ে বসলেন দুটো আসনে। গণেশও, শাস্ত্রে যেভাবে মা-বাবার পুজো করার নিয়ম দেওয়া আছে, সেভাবে পুজো করল। তারপর উঠে একবার…দুবার…তিনবার করে সাতবার গোল হয়ে মা-বাবার চারদিক ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াল।

তারপর বলল—মা-বাবা, এবার তোমরা আমার বিয়ে দাও।

শিব বললেন—কি রকম? বলেছি তো, যে পৃথিবী আগে ঘুরে আসতে পারবে, তারই বিয়ে দেব আগে। কার্তিক গেছে, তুমিও যাও।

গণেশ বলল—আমার ঘোরা হয়ে গেছে। আমার বিয়ে এখনি দেবে কিনা, বল।

—বাড়ি থেকে না বেরিয়েই পৃথিবী ঘোরা হয়ে গেল? এ কি রকম কথা গণেশ?

—হ্যাঁ, এটাই ঠিক কথা। পৃথিবী আমার ঘোরা হয়ে গেছে। একবার নয়, সাতবার। তা যদি না হয়, তাহলে তোমরাও মিথ্যে, তোমাদের বেদশাস্ত্রও মিথ্যে। বেদেই তো লেখা আছে, মা-বাবার পুজো করলেই সব তীর্থের ফল পাওয়া যায়। পুজো করে তাঁদের প্রদক্ষিণ করলেই পৃথিবী প্রদক্ষিণের কাজ হয়ে যায়। লেখা নেই? তা যদি হয়, তাহলে আমার পৃথিবী ঘুরে আসা হল না কেমন করে? বলল গণেশ।

কথা শুনে চমকে উঠলেন শিব, তাই তো! বললেন—গণেশ, সত্যিই তুমি আমার গর্ব। তুমি যা করেছ, তা শাস্ত্রেরই কথা। অপূর্ব তোমার শাস্ত্রজ্ঞান। সার্থক তোমার পৃথিবী ঘোরা। স্থির হও আমরা এখনই আমাদের কথা রাখব। তোমার বিয়ে দেব।

এমন সময় বিশ্বরূপের দুই মেয়ে সিদ্ধি আর বুদ্ধি সেখানে এসে হাজির।

যেমন অপূর্ব দেখতে, তেমনি গুণে ভরা।

শিব তাদেরই সঙ্গে বেশ ঘটা করে গণেশের বিয়ে দিয়ে দিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি যিনি যেখানে ছিলেন, পরমানন্দে বিয়ের ভোজ খেয়ে গেলেন।

কার্তিক এ সবের কিছু জানতেও পারল না। সে তখনও ঘুরছে বোঁ বোঁ করে।

তারপর ঘোরা শেষ করে সবেমাত্র এসেছে কৈলাসে ; ঝুপ করে নারদ এসে হাজির।

—শোন কার্তিক, একটা জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—কি কথা ?

—তুমি যে এত বোকা, তা আমি জানতুম না। মা-বাবা বলল, আর তুমিও টুপ করে বেরিয়ে পড়লে ?

—কেন, কি হয়েছে ?

—মা-বাবা তোমার সঙ্গে স্রেফ চালাকি খেলে, তোমাকে সরিয়ে দিয়ে আদরের ছেলে গণেশের বিয়ে দিয়েছে। তার আবার দুটো ছেলেও হয়ে গেছে।

—অ্যাঁ, কি বললে ? আমার সঙ্গে চালাকি করল আমারই মা-বাবা ?

—হ্যাঁ। বলেই নারদ চট করে সরে পড়লেন। কার্তিক তো রেগে আগুন।

ছেলে ফিরে এসেছে। কথা রাখতে হবে। হর-পার্বতী গেলেন ছেলেকে আদর করে কাছে টানতে। দু-জনে কার্তিকের কাছে যেতেই প্রচণ্ড ধমক খেলেন—তোমরা আমার মা-বাবা, না আমার শত্রু ? ইচ্ছে করলে সুযোগ বুঝে তোমরা আমাকে বিষও খাওয়াতে পার। তোমাদের আমি আর মুখ দর্শন করব না। বলে রেগে বেরিয়ে গেল কৈলাস থেকে।

কত ডাকাডাকি করলেন দু-জনে। কানেও নিল না কার্তিক। সোজা চলে গিয়ে নিজের ডেরা বানিয়ে নিল দ্রোণ পাহাড়ে। আর সেখানেই থেকে গেল। মা-বাবার প্রাণ যে কতটা ছটফট করে উঠল সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপও করল না। থেকে গেল 'কুমার' হয়ে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আর দুই ছেলে নিয়ে ছোট্ট সংসার। অভাব নেই কিছুরই। দু-জনেই খুব ধর্মভীরু।

ব্রাহ্মণের মনে একদিন বাসনা জাগল কাশীধামে যাবার। চলেও গেলেন। এদিকে ব্রাহ্মণী মানুষ করে তুলতে লাগলেন ছেলেদের।

ছেলে-দুটিও বড় ভাল। লেখাপড়া শিখল। বড় হয়ে উঠল।

এমন সময় কাশী থেকে খবর এল, সেখানে তাদের বাবা মারা গেছে। কি আর করবার আছে ? এখানেই বাবার শ্রাদ্ধাদি সারল।

বয়স হয়ে আসছে ব্রাহ্মণীর। ছেলেদের বিয়ে-থা দিয়ে দিল সুযোগ বুঝে। বিষয়-আশয় যা ছিল সমান দু-ভাগে ভাগ করে ছেলেদের বুঝিয়েও দিল, যাতে পরে অশান্তি না হয়। তারপর একদিন ব্রাহ্মণীও মারা গেল।

মায়ের ইচ্ছে ছিল, কাশীতে বাস করার। তা আর হয়ে ওঠে নি। মরার আগে বড় ছেলের কাছে তাই শেষ ইচ্ছে রেখে গিয়েছিল, তার অস্থি যেন সে গঙ্গায় দেয়।

দাহ কাজ, তার সঙ্গে আরও টুকটাক কাজ সেরে মায়ের অস্থি নিয়ে রওনা দিল গঙ্গার দিকে। অনেক দূর। হাঁটা পথে যেতে হবে। সঙ্গে একজন সঙ্গীও মিলল।

সেদিন প্রায় চার ক্রোশ পথ হেঁটে সন্ধে হয়ে আসছে দেখে শুভগ্রাম নামে এক গ্রামে এসে উঠল এক ব্রাহ্মণের বাড়ি।

রাতের জন্য অতিথি এসেছে। ব্রাহ্মণও তার থাকার বন্দোবস্ত করে দিল।

তার উঠোনে ছিল গরু বাঁধা। ব্রাহ্মণীকে ডেকে বলল—হ্যাঁগো, এখনও যে গাই দোয়া হয় নি। তাড়াতাড়ি এসো। আমি বাছুর ধরছি।

সঙ্গে সঙ্গে এল ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণও বাছুরের গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল মায়ের কাছ থেকে দূরে। দুরন্ত বাছুর। খুব ছটফটানি শুরু করে দিল। অনেক চেষ্টা করেও ব্রাহ্মণ যখন তাকে চুপ করে দাঁড় করাতে পারল না, তখন একটা লাঠি নিয়ে তাকে দিল উত্তম-মধ্যম। মার খেয়ে চুপ করে গেল বাছুর। ব্রাহ্মণ তাকে বেশ করে তার মায়ের সামনে খোঁটায় বাঁধল। ব্রাহ্মণী গাই দুয়ে চলে গেল। সঙ্গে চলে গেল ব্রাহ্মণও। বাছুর এক পেট খিদে নিয়ে খোঁটায় বাঁধা রইল।

অতিথি সব দেখল ঘর থেকে। রাত হয়েছে। অপরিচিত জায়গা। চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ চমকে উঠল চাপা কান্নার শব্দ শুনে—তাই তো, কে এ সময় এমন করে কাঁদে ? সঙ্গে সঙ্গে কানে এল করুণ গলার আওয়াজ—কাঁদছ কেন মা ? কেঁদে আর কি করবে ?

শব্দ আর কথা অনুসরণ করে ব্রাহ্মণের চোখ গেল সেই গরু আর বাছুরের দিকে। দেখল দু-জনেই দাঁড়িয়ে মুখোমুখি। কান খাড়া হয়ে উঠল অতিথির।

—কান্না পাচ্ছে কি আর সাধে ? মায়ের সামনে ছেলেকে অমন করে মারলে কোন্ মায়ের না কষ্ট হয় ? তার ওপর তোকে এমন ভাবে আটকে রেখে গেল যে, একটু দুধও তোকে খেতে দিতে পারব না।

—এ তোমার আর আমার ভাগ্য, মা। তা নইলে এমন হবে কেন ?

—সবই বুঝি বাবা। তবু কি মন মানে ? আমার ছেলে তুই, তোকে মারল, ব্যথায় আমি হাত বোলাতে পারলাম না। পেট তোর ঢক্ ঢক্ করছে দেখে কি করে সহ্য করে থাকি বল ?

—সহ্য যে করতেই হবে মা। এমন কিছু গত জন্মে আমরা করেছিলাম যে মানুষের কাছে বোবা গরু হয়ে জন্মেছি। হয়ত আরো অনেক অন্যায় করেছিলাম, নইলে এমন সাজাই-বা পাব কেন ?

—সবই ঠিক। তবু মন মানে না। ঐ পাষণ্ড বামুনকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ছেলের মায়া যে কি, ব্রাহ্মণ হলে কি হবে, বোঝে না বাবা।

—মাগো, ও কাজ করো না, মা। সাজা যিনি দেবার তিনি দেবেন। তুমি কেন সে ভার নিজের হাতে নেবে মা ?

—তুই যাই বল, ওর ছেলেকে আমি কাল মারবই, দেখিস।

থেমে গেল ওদের আলাপ। অবাক হয়ে সব শুনল অতিথি। মনে মনে ঠিকও করে নিল, কাল ব্যাপারটা কি হয় দেখতে হবে।

সকাল হল দেখেও অতিথি চুপ করে পড়ে রইল নিজের ঘরে।

ব্রাহ্মণ ডাকল অতিথিকে—ও অতিথি, ও অতিথি, সকাল হয়ে গেছে। তুমি যে মায়ের অস্থি দিতে যাবে গঙ্গায়।

অতিথি বলল—হ্যাঁ, একটু পরে বের হব। আমার সঙ্গী একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ব্রাহ্মণ সকালবেলা বেরিয়ে গেল কি এক কাজে। বলে গেল—ব্রাহ্মণী, একটু জরুরি কাজে যাচ্ছি। ছেলেকে নিয়ে সকাল সকাল গাইটা দুয়ে নিও।

চলে গেল ব্রাহ্মণ। ঘরে শুয়ে শুয়ে দেখল অতিথি। অপেক্ষা করে আছে, কখন যাবে ব্রাহ্মণী ছেলেকে নিয়ে গাই দুইতে।

সময় হতেই ব্রাহ্মণী ডাকল ছেলেকে—বাবা, আয়। বাছুরকে দিয়ে গাইটা ঝালিয়ে নিয়ে ধরবি আয়। দুধটা দুয়ে নিই।

ডাকা মাত্রই ছেলে এল। খোঁটা থেকে বাছুরকে খুলে নিয়ে গেল তার মায়ের কাছে। চোখ বুজে বাছুর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল দুধ খেতে। ঠিক সময় হতেই ব্রাহ্মণী বলল—বাবা, টেনে ধর।

সবেমাত্র হিড়হিড় করে টেনে ছেলে তার বাছুরকে নিয়ে গিয়ে ধরেছে তার মায়ের সামনে, অমনি গাই উঠল লাফিয়ে। ব্রাহ্মণীর হাত থেকে দুধের ভাঁড় ছিটকে পড়ে গেল। ফোঁস ফোঁস করতে করতে একটানে দড়ি ছিঁড়ে, ব্রাহ্মণের ছেলেকে দুটো শিঙে গেঁথে ওপরে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

দেখে ব্রাহ্মণী তো হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। কান্না শুনে ছুটে এল পাড়া-প্রতিবেশী—কি হয়েছে? কি হয়েছে?

—গরুতে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

—সে কি? অমন ঠাণ্ডা, লক্ষ্মীকান্ত গরু!

তখন কোন জ্ঞান নেই ছেলের। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আর অঝোরে কাঁদছে ব্রাহ্মণী—এ কি সর্বনাশ হল!

ইতিমধ্যে বাড়ি ভরে গেল মানুষজনে। ধরাধরি করে ছেলেকে তুলে নিয়ে এল ঘরে। ছুটে এল কবিরাজ। শুরু হল চিকিৎসা।

ব্রাহ্মণ পাশের গ্রামেই ছিল। খবর পেয়েই দৌড়োতে দৌড়তে এসে হাজির। একমাত্র ছেলে তার। এ কি হল?

—কবরেজ মশাই, যেমন করেই হোক, আমার ছেলেকে ভাল করে তুলুন। কাতর প্রার্থনা জানায় ব্রাহ্মণ।

—চেষ্টা তো করছি। একেবারে ফুটো করে দিয়েছে। হাড়-গোড়ও ভেঙে গেছে। এখন ভগবানের হাত।

সত্যিই কবরেজ মশাই অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না।

আছড়ে পড়ল ব্রাহ্মণ। মূর্ছা গেলেন ব্রাহ্মণী।

সব দেখে, একটু বেলা হতে সঙ্গীর সঙ্গে অস্থি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অতিথি।

গত রাতের মা-বেটার আলাপ তার মনে তোড়পাড় করতে লাগল।

ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী না জানলেও, এই অতিথি ব্রাহ্মণ নিজের চোখেই দেখে গেল, অসহায় জীবের ওপর অত্যাচার করলে কি নিদারুণ ফল ভোগ করতে হয়।



মহাকালেশ্বর শিবের কথা

অবন্তী-নগরীর কোল বেয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে শিপ্রা নদী। তার টলটলে জল কাচের মত স্বচ্ছ। তার দু-পাশে রাজ্যের তপোবন আর উপবন। গাছ-গাছালি, লতা-পাতা, ফুলে-ফলে ভারি মনোরম। ছোট ছোট সব কুটির। সেই সব কুটিরে থাকেন মুনি-ঋষিরা, আর থাকেন তাঁদের পত্নীরা ছেলেপুলে নিয়ে। ছেলেমেয়েরা খেলা করে বনে, মুনিরা ছাত্র-শিষ্যদের পাঠ দেন, বেদ শেখান, যাগযজ্ঞ করেন।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় অবন্তী নগরীর যশ চারদিকে। নিষ্ঠা আর সততার সঙ্গে এমন ভাবে সেই নগরীর ব্রাহ্মণরা ধর্ম মেনে চলতেন, যাগ-যজ্ঞ করতেন, যে স্বর্গ থেকে দেবতারা প্রায়ই নেমে আসতেন।

অবন্তী নগরীতে কিছুরই অভাব ছিল না।

এখানকারই এক ব্রাহ্মণকে নিয়ে একবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল।

খুবই নিষ্ঠাবান, ধার্মিক এক সৎ ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। দেবব্রত, প্রিয়মেধ, সুবৃত আর সুব্রত নামে তাঁর চার ছেলে ছিল। বাবার মত তারাও খুব সৎ, ধার্মিক। যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান ছাড়া তারাও আর কিছু জানত না। নগরীর সব ব্রাহ্মণ তাদের ভালও বাসত, কথাও শুনত।

মুনি-ঋষিরা, ব্রাহ্মণরা পৃথিবীতে হোম-যাগ-যজ্ঞ নিয়ে শান্তিতে থাকতে ইচ্ছে করলে কি হবে, অসুর-রাক্ষসদের অত্যাচারে প্রায়ই অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। তাদের শত্রুতা দেবতাদের সঙ্গে। যুদ্ধ তো তাঁদের সঙ্গে অনবরত লেগেই আছে। আর ঐ দেবতাদের জব্দ করতে গিয়ে, তাঁদের উদ্দেশ্যে যাঁরাই যাগ-যজ্ঞ করতেন, তাঁদেরও তারা রেহাই দিত না। হুড়মুড় দুড়দুড় করে এসে পড়ত আশ্রমে। তপোবন উপবন সব তছনছ করে দিত। গরু তো চুরি করে নিয়ে যেতই, যজ্ঞের কুণ্ড ভেঙে যাগ-যজ্ঞ সব প্রায়ই নষ্ট করে দিত। এই অত্যাচার তারা সমানে চালাত, যতক্ষণ পর্যন্ত না মারা যেত।

কাছেই রত্নমাল পর্বত। সেই পর্বতে দূষণ নামে এক অসুর থাকত। মহা বলশালী। তার অনুচরও ছিল অনেক। দূষণ যা বলত, তারা নির্বিচারে তা-ই করত। হুকুম হল, দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। চলল অনুচররা। তুমুল লড়াই হল। দেবতারা হটে গেলেন। এরপর হুকুম হল, পৃথিবীতে যত রাজা আছে, সকলকে জয় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তা-ও হয়ে গেল।

এবার দূষণের নজর পড়ল ব্রাহ্মণদের দিকে। সে দেখল, অবন্তী নগরের ব্রাহ্মণরা এত তেজী আর এত বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মকর্ম

করছেন যে, দেবতারা হেরে গিয়েও যেন পুরোপুরি হারছেন না। তাই ঐ ব্রাহ্মণদের কব্জা করে যাগ-যজ্ঞ, বেদপাঠ এসব বন্ধ করতে না পারলে, কিছু করা যাচ্ছে না।

অনেক ভেবে-চিন্তে অনুচরদের ডেকে হুকুম দিল দূষণ—অবরোধ কর অবন্তী নগরী। যেখানে যা কিছু আছে সব ভেঙে তছনছ কর। ব্রাহ্মণদের প্রহার কর। যেভাবেই হোক, তাদের বশে আনতেই হবে।

অসুরের অনুচররা আদেশ পাওয়া মাত্রই ছুটল সবাই অবন্তী নগরীর দিকে। ঘিরে ফেলল সারা নগরী। শুরু করল মারধোর। লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করল সারা নগরী। প্রজারা ভয়ে আকুল হয়ে উঠল। সবাই ছুটে এল ব্রাহ্মণদের কাছে—আমাদের বাঁচান···আমাদের বাঁচান।····এখন, অবন্তী নগরে সব ব্রাহ্মণই করতেন শিবের পুজো। শিবের উদ্দেশ্যেই তাঁদের যত যাগ-যজ্ঞ। নগরবাসীদের আর্তনাদ শুনে মনে খুব কষ্ট পেলেন তাঁরা।

সবাই এসে জড়ো হল সেই চার ব্রাহ্মণ পুত্রের কাছে—কি করা যায়? একটা উপায় তো করতে হবে? নিরীহ মানুষগুলো এভাবে মার খাচ্ছে, এ তো দেখা যায় না।

ব্রাহ্মণ-পুত্রেরা বললেন—দেখ, ওরা নামেও অসুর, কাজেও অসুর। ওদের লোকবলও যেমন, ক্ষমতাও তেমনি। তারই জোরে ওরা সকলকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে সব সময়। আমাদের সে ক্ষমতা কোথায়, আর সে অস্ত্রই-বা কোথায়? তাছাড়া আমরা ব্রাহ্মণ। যুদ্ধ-টুদ্ধ তো আর আমাদের কাজ নয়। শিবকেই দিন-রাত ডাকি, তাঁকেই জানি। রাখেন তো তিনিই রাখবেন। আর যদি মারেন তো তিনিই মারবেন।

খুবই খাঁটি কথা। সত্যিই তো। কোন অন্যায়, কোন অনিষ্ট তো তাঁরা কখনো কারো করেন নি। ধর্মপথেই থেকে এসেছেন। সকলের ভালই চেয়ে এসেছেন মহাদেবের কাছে। রাখতে হয় তিনিই রাখবেন। আর কোন কিছু না ভেবে, সবাই যেমন পূজায় মেতেছিলেন, তেমনি আবার মেতে গেলেন।

হুমকি পাঠাল দূষণ—এখনো বলছি বন্ধ কর। আমার আদেশ অমান্য করলে কিন্তু এমন সাজা দেব যে, ধনে-প্রাণে সব মারা যাবে।

ব্রাহ্মণরা যেন শুনেও শুনলেন না।

দূষণ খবর নিয়ে জানল, ঐ চার ব্রাহ্মণ নাটের গুরু।

—কোথায় তারা?

—আজ্ঞে, শিবের এক মূর্তি গড়ে, তপোবনে তার সামনে চোখ বুজে বসে আছে। আমাদের এত চেঁচামেচি যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

তাই নাকি? চল সব আমার সঙ্গে। দেখি, তাদের কত তেজ!

বাতাস কাঁপিয়ে নগর কাঁপিয়ে, সসৈন্যে দূষণ এল সেই তপোবনে। দেখল, বেশ কিছু ব্রাহ্মণ বসে আছে চোখ বুজে। আশ্চর্য! বুকে কি ওদের একটুও ভয়-ডর নেই?

কাছে গিয়ে দূষণ হুঙ্কার ছাড়ল—এই, তোমরা এসব বন্ধ করবে কিনা?

কানেও গেল না তাদের।

রেগে আগুন দূষণ হুকুম দিল তার বাছাই করা বিকটকায় অনুচরদের—ওদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধ। ভেঙে দাও ঐ লম্বা লম্বা ঢেলাগুলোকে।

দূষণের আদেশে যেই এগোতে যাবে ওরা, হঠাৎ শুনল—সাবধান, ওদের গায়ে হাত দেবার একটুও চেষ্টা করো না।

কে বললে? কি বললে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিক-ওদিক দেখতে লাগল তারা। বিকট গম্ভীর গলার আওয়াজ। কে এল এমন বীর? কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না কিছু।

—দূর হও সব! খুব রেগে উঠল দূষণ—দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? আমার আদেশ শুনতে পাও নি?

আবার মার···মার করে কিছুটা এগিয়ে এসেছে অসুরের দল, ঠিক সেই সময়ই ঘটে গেল অলৌকিক কাণ্ডটা।

সবাই দেখল, ব্রাহ্মণরা যেখানে মাটির শিবলিঙ্গ বসিয়ে পূজা করছিল, সেখানে হঠাৎ হয়ে গেল বিরাট এক গর্ত। আর সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে এল যেন জ্বলন্ত আগুন। সেই আগুনের ঝলকেই অন্ধ হয়ে গেল অনেক অসুর।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দূষণ দেখল, সে কি বিকট এক মূর্তি। মাথায় জটা, গায়ে সাপের মালা, হাতে ত্রিশূল। দুটো চোখ তো চোখ নয়, যেন আগুনের গোলা। তার ওপর আবার কপালে একটা চোখ। তা থেকে ছুটে আসছে আগুনের তীব্র ঝলক।

বিকট হুঙ্কার ছাড়ল সেই মূর্তি। তাতেই জ্ঞান হারিয়ে মারা গেল আরো অনেক অসুর। আবার আর এক হুঙ্কার—বড় বেড়েছিস তুই দূষণ। ভেবেছিস, তুই-ই সব? আমি মহাকাল। বাঁচা এবার নিজেকে।

কথা শেষ হতে না হতেই আগুনের ঝলক এসে পুড়িয়ে ছাই করে দিল দূষণকে। ছাই হয়ে গেল আর সবাই।

চোখের জলে ব্রাহ্মণরা তখন সবাই মিলে করলেন তাঁর স্তব—মহাকালেশ্বর, মহাকালেশ্বর! তুমি আছ। তুমি আছ। তুমি আছ।



ভীম রাক্ষসের কাহিনী

বর্তমান মহারাষ্ট্রের যেটি সহ্যাদ্রি পাহাড়, তখন এর নাম ছিল সহ্যপর্বত। সেই পর্বতে কর্কটী নামে এক রাক্ষসী থাকত, তার একমাত্র ছেলে ভীমকে নিয়ে। নামে ভীম তো কাজেও ভীম।

একটু বড় আর জ্ঞানগম্যি হয়েছে তখন ভীমের। দেখল সে আর তার মা ছাড়া কোথাও আর কেউ নেই। মা-ও কোথাও যায় না। কেউ আসেও না। দেখতে দেখতে একদিন ভাবল, কি ব্যাপার? একদিনের জন্য, এতদিন হয়ে গেল, বাবাকেও দেখলাম না। কোন আত্মীয়-স্বজনকেও আসতে দেখি না? তিন কুলে আমাদের কি কেউ নেই নাকি?

সুযোগ বুঝে একদিন মাকে জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল। বেশ অবস্থাপন্ন ছিল তার মামার বংশ। তার দাদু কর্কট আর দিদিমা পুষ্কলী থাকত এই পাহাড়েই। বিরাধ নামে এক রাক্ষস বীর ছিল তাদের প্রতিবেশী। ('কেতকী ও চাঁপার দুর্ভাগ্য' কাহিনীতে নারদ মুনি যে দুষ্ট ব্রাহ্মণকে 'রাক্ষস হও' বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন, এই বিরাধ রাক্ষস ছিল সেই ব্রাহ্মণ।) কর্কট তার মেয়ে কর্কটীর বিয়ে দিয়েছিল সেই বিরাধ রাক্ষসের সঙ্গে। রামচন্দ্র তখন বনবাসে। সীতাকে হারিয়েছেন। সন্ধান পেয়ে লঙ্কা থেকে উদ্ধার করে আনতে যাবার পথে, যেখানে যত রাক্ষস পেয়েছেন, তাদের মারতে মারতে গেছেন। একমাত্র কর্কটী ছাড়া সহ্যপর্বতের তাদের সব প্রতিবেশীর সঙ্গে, তার দাদু, দিদিমা এমন কি বিরাধ পর্যন্ত রামচন্দ্রের হাতে মারা গিয়েছিল। কর্কটী একা। লঙ্কার রাজা রাবণের ছোট ভাই কুম্ভকর্ণ সেই সময় ঘুরতে ঘুরতে একবার সহ্যপর্বতে এসেছিল। কর্কটীকে দেখে তার খুব ভাল লেগেছিল। তাকে বিয়ে করে কুম্ভকর্ণ সেখানেই কিছুকাল থেকে গিয়েছিল। লঙ্কায় যখন যুদ্ধ বাধল, রামচন্দ্র শুধু অসুরসেনা নয়, রাবণ আর কুম্ভকর্ণকেও মারলেন। সেই থেকে প্রায় অনাথ হয়েই তারা মা-ছেলেতে এই পর্বতেই আছে।

শুনে, ভীম প্রতিজ্ঞা করে বসল—সে যদি বীর কুম্ভকর্ণের ছেলে হয়, তাহলে এর প্রতিশোধ সে সুদে-আসলে নেবে। রামচন্দ্র কত বলশালী ছিল, যে তাদের বংশ ধ্বংস করে দিল ? তার চেয়েও সে আরো বলশালী হবে। সকলকে একবার দেখিয়ে দেবে।

এইরকম প্রতিজ্ঞা করে সে তখন কঠোর তপস্যা শুরু করে দিল। প্রায় যখন হাজার বছর কেটে গেল, তখন দেবরাজ থেকে শুরু করে দেবতারা গিয়ে ধরলেন ব্রহ্মাকে। বললেন—ঠাকুর্দা, ভীমের এই তপস্যা তো আর দেখা যায় না। আপনি একবার যান। ও যা চায়, তাই দিয়ে ওকে একটু ঠাণ্ডা করুন।

নাতিদের আবদার। ঠাকুর্দা ব্রহ্মা ভীমের কাছে এলেন। বললেন—বাবা ভীম, অনেকদিন ধরে তুমি কষ্ট করছ। কি পেলে তুমি খুশি হবে বল।

ভীম বলল—আমি মহাবলশালী হতে চাই। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে যে যতই বলশালী থাক, আমার সঙ্গে যেন কেউ এঁটে উঠতে না পারে।

—এইটুকু পেলে যদি খুশি হও, তবে তা-ই হবে। যাও।

ব্রহ্মার বর পেয়ে গেল ভীম। সে এখন মহাবলশালী। মাকে গিয়ে বলল—মা, এতদিন যে কষ্ট করেছ, তোমায় তা আর করতে হবে না। এবার দেখ, আমি কি করি। আমি হব ত্রিভুবনের রাজা। আর তুমি হবে রাজার মা।

তখন, কামরূপের (আসাম) রাজা ছিল বিশুদ্ধ আর রানী দক্ষিণা। দু-জনেই ভারি চমৎকার। প্রজারা তাদের কাছে ছেলের মত। সুন্দর ভাবে রাজকার্য চলত। কোথাও অশান্তি ছিল না। রাজা-রানী দু-জনেই শিবের ভক্ত ছিল। প্রজারাও রাজার দেখাদেখি শিবপূজা করত। দিনগুলো বেশ কাটছিল।

ভীমের প্রথমেই নজর পড়ল কামরূপের দিকে। বেশ সুন্দর দেশ। রাজাও শক্তিশালী। রাজার অধীনে আবার অনেক সামন্ত রাজা। সুতরাং বিশুদ্ধকে তাড়িয়ে কামরূপের সিংহাসনে বসলে, পৃথিবীতে অন্তত একটা দেশের রাজাও হওয়া যাবে। সেই সঙ্গে বেশ কিছু রাজাও তার অধীনে আসবে।

যেমন ভাবা কাজ তেমনি। রাজত্ব হারাল কামরূপের রাজা বিশুদ্ধ। রাক্ষস ভীমের হাতে খুব লাঞ্ছিতও হল। রাজ্য ছেড়ে, রানী দক্ষিণাকে নিয়ে বিশুদ্ধ রাজা চলে এল পঞ্চকোশী নদীর ধারে। সেখানে একটা নির্জন জায়গা দেখে, পাথরের একটা শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করতে লাগল। আর কাতর প্রার্থনা জানাত—তোমার যারা ভক্ত, তাদের তো তুমি সব আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা কর প্রভু। আমি কি এখনও তোমার ভক্ত হয়ে উঠতে পারি নি ?

ওদিকে ভীম এবার পৃথিবী চরে বেড়াতে শুরু করল। ব্রহ্মার বরে মহাবলশালী সে। তার সঙ্গে কে এঁটে উঠবে ? পৃথিবী এল তার হাতের মুঠোয়। চারদিকে হুকুম জারি হল—কোন দেবতার পুজো চলবে না। বেদের মন্ত্র যেন কখনো কোথাও উচ্চারণ করা না হয়। যাগ-যজ্ঞের ধোঁয়া যেন কোথাও দেখতে পাওয়া না যায়। হুকুম যে অমান্য করবে, তার কপালে কিন্তু দুর্ভোগ আছে।

ভীমের ভয়ে, সব বন্ধ হয়ে গেল। যাগ-যজ্ঞ, বেদপাঠ, পূজা-অর্চনা আর কিছুই হয় না। দেবতারা প্রমাদ গুণলেন। সর্বনাশ, এ কি হল ? ভীম সব যদি বন্ধই করে দিল, তাঁরা বাঁচবেন কিভাবে ? খেতে না পেয়ে তাঁদেরও যে হাঁড়ির হাল হবে। মুনি-ঋষিরাও দেখলেন, ভীম সবই যে ধ্বংস করে দিতে বসল।

উপায় ? ঠাকুর্দাকে বলে ভীমকে তুষ্ট করতে গিয়ে, এখন তো তার বেশ ফলভোগ করতে হচ্ছে। ঠাকুর্দাকে বললেও, এখন আর তিনি কিছুই করবেন না, করতে পারবেনও না।

অবশেষে, তাঁরা অনেক ভেবে-চিন্তে গেলেন মহাদেবের কাছে। তাঁরা সকলে মিলে অনেক স্তব-স্তুতি করলেন। দেবাদিদেব বলে কথা। সম্রাটেরও সম্রাট। চট্ করে কি আর তাঁর দেখা মেলে ? অনেক ডাকাডাকির পর তিনি এলেন।

—এ কি দেবগণ তোমরা ? সব শুকনো মুখ কেন ? আবার কোথায় কি হল ?

—প্রভু, আপনার কি কিছু অজানা আছে। তবু যখন জিজ্ঞেস করছেন, বলি—ভীম নামে এক রাক্ষস ব্রহ্মার বরে বলশালী হয়ে, পৃথিবী থেকে ধর্মকে তো প্রায় লোপই করে দিল। এমনকি আমাদেরও অনবরত চোখ রাঙাচ্ছে। প্রভু, আপনি ছাড়া ওকে শাসন করার আর যে কেউ নেই।

—হ্যাঁ। আমার ভক্ত কামরূপ-রাজ বিশুদ্ধর ওপরও সে অকথ্য অত্যাচার করেছে। এবার তোমাদের ওপরও। একটা বিহিত তাহলে করতেই হয়। ঠিক আছে। তোমরা যাও, আমি দেখছি। এই বলে শিবও অন্তর্হিত হলেন। দেবতারাও আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এলেন।

ভীমের অনুচরেরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। রাজ্যের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে, তার খবর ভীমকে এনে দেয়।

একদিন ভীম বসে আছে। হাঁফাতে-হাঁফাতে তার জনকয় অনুচর এল—রাজা, রাজা বিশুদ্ধ বোধ হয় আপনার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে।

—কি রকম ? আমার সর্বনাশ !

—পঞ্চকোশী নদীর ধারে, শিবের একটা মূর্তি বসিয়ে, ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে দিন-রাত কি যেন বিড়বিড় করে বলছে। কদিন ধরেই ওৎ পেতে দেখলাম। কি বলছে, তা কিন্তু বুঝতে পারলাম

না। মনে হল, আপনার অনিষ্ট কামনাই করছে।

—তাই নাকি? পূজা-টুজা সব বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও পুজো করছে বিশুদ্ধ! এত সাহস তার। চল তো সব দেখি।

সদলবলে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভীম সেখানে এল। সত্যিই তাই।

—এত সাহস তোমার কোথা থেকে এল বিশুদ্ধ, যে আমার আদেশ অমান্য কর? হুমকি দিয়ে ওঠে ভীম।

—আমার কি আর সাহস? যাঁর পূজা করছি, তিনি যা করাচ্ছেন তাই করছি। বলে বিশুদ্ধ।

—কে সে?

—শিব।

শুনে হো...হো করে হেসে ওঠে ভীম।

—শিব! যে ছিল আমার জ্যাঠা, বাবার বাড়ির দারোয়ান? ওসব বুজরুকি রাখ। নইলে এবার কিন্তু প্রাণ যাবে, বলে দিচ্ছি।

—তুমি এখন রাজা। রাখতেও পার, মারতেও পার। যিনি রাখবার, তিনি যদি রাখেন, তাহলে তুমি আর আমার কি করবে? এই বলে, রাজা-রানী দু-জনেই শিবের উদ্দেশ্যে চোখ বুজে ধ্যানে বসল।



—তবে রে? ভীমের হুঙ্কারে আকাশ থেকে যেন বাজ পড়ল—নেহাতই তোর পালক গজিয়েছে! সর। দেখি, আমাদের দারোয়ান তোকে কেমন করে বাঁচায়?

এই বলে, দু-দিকেই ক্ষুরের মত ধার, এক বিরাট তলোয়ার নিয়ে যেই কাটতে এল, অমনি পাথরের সেই মূর্তি ভেদ করে বেরিয়ে এলেন ত্রিশূল হাতে শিব। তলোয়ার ত্রিশূলে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ভীম প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শিবকে বলল—এই যে দারোয়ান, এসে গেছ। ভালই হয়েছে।

শুরু হল একদিকে ভীমের হুঙ্কার, আর একদিকে শিবের হুঙ্কার। রাক্ষস-সেনাদের ঠেকাবার জন্য, দেখতে দেখতে এসে গেল একগাদা শিব-সেনা। সে এক দারুণ লড়াই। মোক্ষম মোক্ষম অস্ত্র ছোঁড়ে ভীম, যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কারোরই সাধ্য নয়। কিন্তু সব বিফল হল। শিব-সেনাদের হাতে রাক্ষস-সেনারা দেদার মরতে লাগল। তখনও ভীমের তর্জন-গর্জন! এবার, শিবের ত্রিনেত্র ধকধক করে জ্বলে উঠতে লাগল। ছুটে আসতে লাগল আগুনের বাণ। আর পুড়ে মরতে লাগল রাক্ষস-সেনারা। ভীমও সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নিমেষের মধ্যে দ্বিতীয় লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে, চলে গেলেন শিব। অতি বলের দম্ভ শেষ হল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।

রাবণ-নারদ সংবাদ

রাবণের জেদ, তাকে ত্রিলোকের অধিপতি হতেই হবে। দেবদেবীদের তুষ্ট করে দেবতারাই সব ভোগ করবে আর চোখ রাঙাবে, আবার নাকের ডগায় তাদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবে—এ সহ্য করা যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আর শিব, এঁদের হাতেই সব কিছু। সন্তুষ্ট হলে, এঁরাই ভিখারিকে রাজা করেন আবার অসন্তুষ্ট হলে, রাজাকে করে দেন ভিখারিরও অধম। অন্য দেবতাদের মত এঁরা অমন হিংসুটেও নন; মনটাও এঁদের ছোট নয়। এঁদের কাছে সবাই সমান। শুধু কার ভেতরে কতটা নিষ্ঠা আছে, সেটাই শুধু ভাল ভাবে একবার দেখে নেন।

রাবণ এই রহস্য জানত। তাই সে ঠিক করল, মহা বলশালী ঐ দেবতাদের হটিয়ে সর্বেশ্বর হতে গেলে ওঁদেরই একজনকে তুষ্ট করতে হবে। বেছে বেছে রাবণ ঠিক করল, শিবেরই তপস্যা করবে। ভোলানাথ শিব—অল্পেই সন্তুষ্ট। লঙ্কা থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এল হিমালয়ের দক্ষিণে, এখন যেখানে বৈদ্যনাথ, সেখানে। এসে ভাল ভাবে একটা শিবের মূর্তি তৈরি করে বসাল, মাটি খুঁড়ে বিরাট এক যজ্ঞকুণ্ড তৈরি করল। যোগাড় করল রাজ্যের বেলপাতা, সমিধ (যজ্ঞের কাঠ)। কুণ্ডে আগুন জ্বালাল। লকলকে আগুনে শিবের উদ্দেশ্যে একের পর এক আহুতি দিতে লাগল। রাজ্যের বেলপাতা, সমিধ (কাঠ) পুড়ল কিন্তু শিবের মন ভুলল না। রাবণও নাছোড়। যতক্ষণ সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাকে বর না দিচ্ছেন, ততক্ষণ দশানন রাবণও তাঁকে ছাড়বে না। তার জেদ, সেও দেখবে, কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন।

এত করেও রাবণ যখন শিবের মন পেল না, ঠিক করল, এ জীবন আর রাখবে না। এক-একটা করে মাথা কেটে, ঐ যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেবে। একবার শেষ দেখা দেখবে।

এই ভেবে নিজের হাতেই রাবণ একটা করে নিজের মাথা কাটতে লাগল, আর যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিয়ে বলতে লাগল—এই নাও শিব, তোমায় দিলাম।

একটা করে মাথা কাটে আর এই ভাবে দিতে দিতে নটা মাথা আগুনে দেওয়া হয়ে গেল। বাকি, আর মাত্র একটা। সেটাও কাটতে যাবে কি, মূর্তি ভেদ করে বেরিয়ে এলেন শিব। বাধা দিয়ে বললেন—থামো....থামো। আমি তোমার নিষ্ঠা আর সাহস দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, কি চাই।

রাবণ বলল—যদি সন্তুষ্টই হয়ে থাকো আর আমি যা চাইব, তা

যদি দেবার ইচ্ছে থাকে, তাহলে আমাকে দুটো জিনিস দিতে হবে।

—বল।

—আমি মহাবলশালী হতে চাই। আমার সমান বল, ত্রিভুবনে যেন আর কারো না থাকে। বলল রাবণ।

শিব বললেন—তথাস্তু। তুমি মহাবলশালী হবে।

—আর যে নটা মাথা তোমায় দিয়েছি, সেই মাথাগুলোও আমি ফিরে পেতে চাই।

—নাও। যেমন দশানন ছিলে, তেমনি দশাননই থাকবে।

বর দিয়ে শিব অন্তর্হিত হলেন। রাবণও দশটা মাথা নিয়ে মনের আনন্দে বুক ফুলিয়ে ফিরে চলল লঙ্কায়।

ওদিকে দেবতারা প্রমাদ গুণলেন। শিব এ কি সর্বনাশ করে বসলেন তাঁদের।

সৎ ভাই হলে কি হবে, অসুরদের বিলক্ষণ চিনতেন দেবতারা। ভক্তি দেখিয়ে তোয়াজ করে প্রথমে তারা তাদের কাজটি হাসিল করে নেয়। তারপরেই একেবারে উলটো কাজ শুরু করে দেয়! উপকারীদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে, রুদ্র মূর্তি ধরে তাঁদেরই নাস্তানাবুদ করে।

শিব কিছু না ভেবে-চিন্তেই রাবণকে মহাশক্তিশালী করে দিলেন। সাহায্য করে বসলেন। এরপর রাবণ কি আর তাঁদের ছেড়ে দেবে? অসুরের জাতধর্ম কি আর রাবণ ত্যাগ করবে?

মন-মরা হয়ে এক জায়গায় বসে দেবতারা সব জল্পনা-কল্পনা করছেন, হঠাৎ সেখানে নারদ মুনি এসে হাজির। নারদকে দেখেই দেবতারা সকলেই উঠে দাঁড়ালেন।

—কি হল? এমন সব মুখ শুকনো কেন? জিজ্ঞেস করলেন নারদ।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে, দেবর্ষি। বললেন দেবতারা—রাবণকে শিব এমন বর দিয়ে বসলেন, যে এবার আমাদের উৎখাত হতেই হবে। ওর মতলব, শিব না জানলেও, আমরা তো জানি।

—কি বর দিয়েছেন শিব, রাবণকে?

—ওর সমান শক্তিশালী ত্রিভুবনে আর কেউ থাকবে না। বললেন দেবতারা—বুঝতেই পারছেন দেবর্ষি, এবার আমাদের অবস্থা কি হবে? আপনি তো সব সময়ই আমাদের ভাল চিন্তা করেন, মুনিবর। এখন একটা কিছু করুন।

—হুঁ। বলে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ভেবে নিলেন নারদ। তারপর বললেন—দেখি কি করা যায়। বলেই আবার চলে গেলেন।

মনের আনন্দে পথে অনেক কথা ভাবতে ভাবতে রাবণ চলেছে। গিয়েই, আগে কুবেরকে জব্দ করে তার পুষ্পক বিমান, ধন-সম্পদ নিতে হবে। সিংহাসন থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে নিজে বসবে সিংহাসনে। তারপর এক-এক করে গোটা মর্ত্য, পাতাল, স্বর্গরাজ্য। দেবতাদের করবে চাকর। যত ভাবে, খুশিতে ততই ঝলমল হয়ে ওঠে তার দশটা মুখ।

ঠিক সেই সময়েই বীণা বাজিয়ে নাম-গান করতে করতে নারদ মুনি উলটোদিক থেকে রাবণের সামনে এসে, এমন ভাবে দাঁড়ালেন, যেন হঠাৎ দেখা পেয়ে দারুণ খুশি তিনি।

—আরে রাবণ যে! কি ভাগ্য, তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল? নারায়ণ-নারায়ণ। খুব খুশি দেখছি, ব্যাপার কি?

নারদ মুনিকে কেউ কখনো পর ভাবতে পারত না। দেবতাদের আপনজন তো বটেই। অসুররাও ভাবত, মুনি তাদেরও আত্মীয় আর হিতাকাঙ্ক্ষী।

রাবণ মুনিকে প্রণাম জানিয়ে বলল—তপস্যা করে শঙ্করকে সন্তুষ্ট করে, তাঁর বর পেয়েছি। তাই মনটা আমার খুশি।

—শিবের তপস্যা করছিলে? কোথায়? কিভাবে বর পেলে?

—আর বলবেন না মুনি। বর পেতে বড্ড বেগ দিয়েছেন।

—কি রকম, শুনি নারায়ণ-নারায়ণ।

—প্রথমে গেলাম কৈলাসে। বেশ কয়েক বছর সেখানে কঠোর তপস্যা করেও কোন ফল পেলাম না। চলে গেলাম হিমালয়ে। বহু যাগ-যজ্ঞ করলাম। শিব আর সন্তুষ্ট হন না দেখে নিজের মাথা নিজেই একটা করে কেটে আহুতি দিতে দিতে যখন আর একটা মাত্র মাথা ছিল, তখনই তিনি দেখা দিয়ে বর দিলেন।

—বাব্বা! এ যে দারুণ তপস্যা করেছিলে, রাবণ। নারায়ণ...নারায়ণ। তা কি বর পেলে?

—বরে হলাম মহাবলশালী। আমার সমান বল, ত্রিলোকে কারো থাকবে না।

—বলো কি? তোমায় এই বর দিলেন শিব?—বলেই, রাবণের দিকে চেয়ে একেবারে মুখ বুজে রইলেন।

—কি হল? হঠাৎ এমন চুপ করে গেলেন কেন? জিজ্ঞেস করে রাবণ।

—রাবণ, সত্যি বলতে কি, তুমি আমার আত্মীয়। তোমাকে আমার বলতে আপত্তি নেই। কথায় আছে জান তো,'ছাগলে কি না



খায়, পাগলে কি না বলে'। এত তপস্যার পর, তুমি শিবের কথায় খুশি হয়ে ফিরে যাচ্ছ, তাই শুনে আমার একটু দুঃখ হচ্ছে। শিব তো একে নেশাখোর, তার ওপর বদ্ধ পাগল। নারায়ণ···নারায়ণ।

—তাহলে কি আমার বরলাভ হয় নি বলছেন, মুনি ?

—আমার তো তাই মনে হয়। ওকে বিশ্বাস করাই মুশকিল। বলে, একটু থেমে নারদ বললেন—যদি সত্যিই তোমাকে তিনি মহাবলশালী করে থাকেন, তাহলে একটু পরখ করে দেখে নেওয়া ভাল। আমার আত্মীয় তুমি। তাই বলছি।

—কিভাবে পরখ করব বলুন তো ?

—কৈলাসে যাও। গোটা পাহাড়টাকে তুলে, আবার ঠিক জায়গায় বসাতে পার কিনা দেখ। নারায়ণ····নারায়ণ। যদি পার, তাহলে বোঝা যাবে শঙ্কর তোমার সঙ্গে পাগলামি করেন নি। বললেন নারদ।

—ঠিক আছে। দেখাই যাক। বলেই, রাবণ সোজা চলে এল কৈলাসে।

এই পাহাড়েরই চূড়ায় শিব থাকেন দুর্গাকে নিয়ে। থাকে তার অনুচরেরা। যেন গাছের সারি চলে গেছে আকাশপানে। পাহাড়ের ধাপে-ধাপে কত না মুনি-ঋষিদের আশ্রম !

নারদ ইতিমধ্যে কখন যে শিবের কাছে কৈলাসে চলে এসেছেন, রাবণ তা টেরও পায় নি।

কৈলাসে এসেই, রাবণ কুড়ি হাতে কৈলাসকে ধরে জোরে ঝাঁকানি দিলে। হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে, পাহাড় টাল-মাটাল করে উঠল। অনেক গাছ-গাছালি উপড়ে পড়ে গেল। মুনি-ঋষিদের আশ্রম গেল ভেঙে। আর দুর্গার সঙ্গে গল্প করতে করতে শিবের অবস্থা বেসামাল। দুর্গা ধরে না ফেললে, কোথায় যে গিয়ে ছিটকে পড়তেন !

—কি হল।···· কি হল ? গর্জন করে উঠলেন শিব।

ইতিমধ্যে রাবণ পাহাড় তুলে আবার বসিয়ে দিয়েছে ঠিক জায়গায়।

—হবে আবার কি ? যেমন শিষ্য করেছ ? হাসতে হাসতে বললেন দুর্গা।

—তার মানে ?

—তোমার শিষ্য রাবণকে কি বর দিয়েছ ? শিষ্য তারই একটু নমুনা তোমায় দেখিয়ে গেল। হাজার হোক, তুমিও ওর গুরু তো। বললেন দুর্গা।

—রাবণ ! বর পেতে-না-পেতেই এত অহঙ্কার। চাপা গর্জন করলেন শিব—আমার যে আর কিছু করার নেই। নইলে আমিই দেখতাম। ওর দর্প চূর্ণ করার জন্য বিষ্ণু অচিরেই যাচ্ছেন। শয়তান, তাঁরই হাতে তুই মরবি।

ব্যস। নারদ শুনে নিলেন। জানিয়ে দিলেন দেবতাদের, কাজ হাসিল।

রাবণ কিন্তু চালাকির কিছুই ধরতে পারল না। যেমন খুশি মনে এসেছিল, তেমনিই ফিরে গেল। অভিশাপের কথা জানতেও পারল না।

শেষ পর্যন্ত সত্য হল দুটোই। রাবণও হয়েছিল মহা বলশালী। আবার রামচন্দ্রের হাতে প্রাণও দিতে হয়েছিল ঔদ্ধত্যের জন্য।



সমুদ্র মাঝে রাক্ষস বন

এক রাক্ষসী আর এক রাক্ষস। নাম তাদের দারুকা আর দারুক। তারা যে বনে থাকত, তার নামই ছিল রাক্ষস-বন। তাদের সঙ্গে অনেক রাক্ষসও বাস করত। যদিও গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়, নদী-পুকুর সবই ছিল সেখানে, মুনি-ঋষিদের আশ্রম তপোবনও ছিল, তবুও সেটাকে ঠিক বন বললে ভুল বলা হবে। বলা যেতে পারে রাক্ষস-নগরী। রানী রাক্ষসী দারুকাই ছিল তার সর্বেসর্বা। স্বামী দারুক, রাজা হলেও, স্ত্রী যা বলত, তাই মেনে চলত।

দারুকা পার্বতীর উপাসনা করেছিল। বেশ কিছুকাল ধরে উপাসনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাঁর কাছ থেকে দারুণ এক বর আদায়ও করেছিল।

পার্বতী তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে যখন বর দিতে এসেছিলেন, দারুকা বলেছিল—যদি বর দেন, তবে আমার একটাই প্রার্থনা, আমার এই বন চলবে আমার ইচ্ছেয়। এখানকার সবাই থাকবে আমার বশে।

পার্বতীও সেই বরই দিয়ে গিয়েছিলেন। দারুকাও বর পেয়ে সকলকে দেখিয়ে দিয়েছিল, তার ক্ষমতা কতখানি। বনকে যখন তখন বলত—চল এখান থেকে অমুক জায়গায়। গাছ-পালা, নদী-পুকুর, এমন কি মুনি-ঋষিদের তপোবন সুদ্ধ নিয়ে, চোখের নিমেষে বন চলে যেত সেখানে। আবার যখনই বলত, ফিরে চল, অমনি আবার যেখানে ছিল বন, সেখানেই ফিরে আসত। ফলে, আর কি কেউ কথা বলতে পারে দারুকার মুখের ওপর ?

রানী আর রাজা দু-জনেই হুকুম দিল—যাগ-যজ্ঞ চলবে না। অনুচররা অমনি বেরিয়ে পড়ল, জানিয়ে দিল মুনি-ঋষিদের, যাগ-যজ্ঞ চলবে না। মন্ত্র-তন্ত্র পড়া চলবে না।—এ আবার কি রকম কথা ? ধর্ম-কর্মের ওপর হাত ? কথা না শুনে যাঁরা করতে গেলেন যাগ-যজ্ঞ, রানী-রাজার হুকুমে সব কিছু তাঁদের তছনছ করে দেওয়া হল।

এরপর মহা চিন্তায় পড়লেন মুনি-ঋষিরা। কি করা যায় ? বাধা না দিলে, যেভাবে সব বেড়ে উঠছে, তাতে তো আর কিছুই থাকে না। প্রতিকারের জন্য কার কাছেই-বা যাওয়া যায় ?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল ঔর্ব ঋষির কথা। শিবের উপাসক তিনি। অসীম ক্ষমতা তাঁর। অন্যায় দেখলে কাউকেই তিনি ছেড়ে কথা বলেন না। সবাই গিয়ে তখন তাঁকে ধরলেন তাঁর আশ্রমে। রাক্ষসদের অত্যাচারের কথা শুনেই রেগে অভিশাপ দিয়ে

বসলেন—নিশ্চিন্তে গিয়ে তোমরা তোমাদের কাজ কর। যত বলশালী রাক্ষসই হোক, অত্যাচার করতে এলেই এবার থেকে মরবে ! যাও।

সবাই জানেন, ঔর্ব ঋষির কথা বিফলে যায় না। সবাই আবার রাক্ষস-বনে ফিরে এলেন। যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা শুরু করে দিলেন। বাধা দিতে এসে রাক্ষস-রাক্ষসীরা দেখল, সর্বনাশ, কোথা থেকে দলে দলে সব দেবসেনা এসে হাজির হয়ে গেল নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে। যুদ্ধ বাধলে, নির্ঘাৎ মৃত্যু। সবারই মুখ শুকিয়ে গেল। মিছামিছি কেন বেঘোরে সব প্রাণ যায় ?

দারুকা বলল—না···না। আমরা কেউ এভাবে প্রাণ দিতে রাজি নই।

—কি করবে ? দারুকার সঙ্গে প্রশ্ন করে অন্য রাক্ষসরাও।

—এই বন নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাব।

—কোথায় যাবে ? মাটির ওপর যেখানেই যাবে, ওরা তাড়া করবে।

শুনে দারুকা হেসে বলল—মাটিতে যাব কেন ? বন নিয়ে জলে যাব। জলের মাঝখানে গিয়ে বাস করব। কেউ আর আমাদের নাগালও পাবে না।

রাক্ষস-রাক্ষসীর দল লাফিয়ে উঠে দারুকার বুদ্ধির খুব তারিফ করল। এই না হলে রানী ?

ইতিমধ্যে দেবসেনারা রাক্ষস-রাক্ষসীদের খুব মারধোর করা শুরু করে দিয়েছে দেখে, দারুকা বন, তাকে তুলে নিয়ে চলে এল সমুদ্রে। এবার আর তাদের পায় কে ?

সাগরের মাঝে যেন বিশাল এক দ্বীপের মত হয়ে গেল রাক্ষস-বন। মনোরম। হুকুম দিলে দারুকা—এখানে ঔর্ব ঋষিরও কিছু করার ক্ষমতা নেই, আর দেব-সেনারাও আসতে পারবে না। সুতরাং চালাও লুটতরাজ। এখান দিয়ে যেই যাক, রেহাই যেন কেউ না পায়।

রানীর হুকুম পেয়ে সবাই মেতে উঠল। বাণিজ্যতরী নিয়ে যে বণিকই যাক, তার আর ফেরা হতো না।

এইভাবে কত বণিক যে সমুদ্রজলে হারিয়ে গেল, কত দ্রব্য-সামগ্রী বোঝাই নৌকো যে নষ্ট হয়ে গেল, তার আর কে খবর রাখবে ?

দারুকার বুদ্ধিবলে, সমুদ্র-মধ্যে সেই রাক্ষস-বনে রাক্ষসদের দিন কাটে মহা আনন্দে।

একদিন, রাক্ষস-বনে উঠল দুরন্ত হুল্লোড়।

—কি ব্যাপার ? ছুটে এল দারুকা।

—ঐ দেখো, রানীমা। বলে, আঙুল বাড়িয়ে ওরা সমুদ্রের জল দেখিয়ে দিল। দারুকা দেখল, দুটো-একটা নয়, একসঙ্গে অনেকগুলো নৌকো আসছে। বাণিজ্য নৌকো।

বলল—ভালই হয়েছে। বেশ কিছুদিন চলে যাবে। সব্বাইকে ধরা চাই।

হইহই করে উঠল রাক্ষসেরা—ধরা চাই মানে রানীমা ? যাবে কোথায় ? জ্যান্ত ধরে এনে পুষে রাখব।

নৌকোগুলো কাছাকাছি আসতেই, ঘিরে ফেলল রাক্ষসেরা। জিনিস-পত্তর যা ছিল, সবই লুট করল। একটা মানুষও বাদ গেল না। ধরে নিয়ে গেল সবাইকে।

সেদিন, সারা দিন-রাত ধরে চলল রাক্ষসদের মহোৎসব। আর নাবিকরা মুখ শুকিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল।

এদের মধ্যে একজন ছিল শিবভক্ত। সে কখনই শিবপুজো না করে জলে যেত না। সেই, সকলকে বলল—ক্ষমতা নেই যে লড়াই করে এদের হাত থেকে উদ্ধার পাব। এসো, আমরা সবাই শিবকে ডাকি। তিনি তো মঙ্গলময়। আমাদের কি তিনি মঙ্গল করবেন না ?

তার নাম সুপ্রিয়। যেভাবে পারল, শিবকে মনে-প্রাণে ডাকতে লাগল। —ঠাকুর, আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

আর, সুপ্রিয় নিজে করল কি, মাটির একটা শিবলিঙ্গ তৈরি করে, যেভাবে পুজো করার বিধি আছে, ঠিক সেই ভাবে তার পুজো শুরু করল।

দারুকের কানে খবর যেতেই, রাক্ষস-রাজ সুপ্রিয়র সামনে এসে হাজির হল—এই, এসব কি করছ।

—শিবের পুজো করছি। সুপ্রিয় বলল।

—পুজো করে কি হবে ? শিব এখানে এসে তোমাদের বাঁচাবে ?

—ঠিক ঠিক মত ডাকলে, আর মন-প্রাণ দিয়ে জানালে, তিনি শোনেন বৈকি।

—শোনে ? আচ্ছা, দেখি কেমন শোনে। বলেই, হুকুম দিল রাক্ষসদের—একটা করে ধর আর শেষ কর। দেখি, ওদের কোন বাবা এসে এখানে বাঁচায়।

রাজার হুকুম শোনা মাত্রই হুড়মুড় করে ছুটে আসে রাক্ষসরা। বণিকরা 'প্রভু রক্ষা কর' বলে শিবকে ডাকে।

প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে রাক্ষসরা। হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সুপ্রিয় যেখানে বসে শিবকে ডাকছিল, সেখানকার মাটি ফুঁড়ে উঠে এল চারকোনা এক মন্দির। আর সেই মন্দিরে, সপরিবারে শঙ্কর এসেই ছাড়লেন হুঙ্কার—সাবধান।

ভয়ে রাক্ষসরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শিবকে দেখে, সুপ্রিয়র সে কি আনন্দ।—রাক্ষস ব্যাটারা দেখুক এবার। বাঁচাক নিজেদের।

এদিকে দারুকা পার্বতীকে দেখে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে—তুমিই আমাকে বর দিয়েছিলে, অভয় দিয়েছিল। এখন, শিব এ কি করতে এল ? আমার বংশই যে লোপ পেয়ে যাবে।

টনক নড়ে উঠল পার্বতীর। সত্যিই তো ? দারুকা তাঁরই আশ্রিতা।

শিব শুনে খুব রেগে উঠলেন—এ তুমি কি বলছ পার্বতী ? তুমি যাকে-তাকে এইরকম করে বর দেবে ? তারা অন্যায় করলে মারবার উপায় নেই ? তাই বলে এই নিরীহগুলো মারা পড়বে নাকি ?

পার্বতী বলল—তা তো বটেই। তবে, তুমি যখন খেলতে নামবে, সেটা তো হবে শেষ খেলা। তার আগে খেলাগুলোকে ভাল ভাবে খেলতে সুযোগ দাও। দেখ, তোমার এখন যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু কর। আমার দারুকার ছেলেরা একটু বাড়-বাড়ন্ত হোক। তারপর তোমার যা করবার করবে।

—বলছ। বেশ। বলে, মহাদেব নাবিকদের আশ্বাস দিয়ে, মুচকি হেসে পার্বতীকে নিয়ে তখনকার মত চলে গেলেন। নাবিকরাও সে যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেল।



নল-দময়ন্তী জন্ম রহস্য

রাজা বীরসেনের ছেলে নল, আর বিদর্ভরাজ ভীমের মেয়ে দময়ন্তী। কে না জানে এদের বিয়ের কাহিনী। কত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা যে তাদের বিয়ে নিয়ে হয়েছিল, সে এক ইতিহাস।

ইতিহাসের পিছনেও ইতিহাস থাকে, তাই তা হয় ইতিহাস। নল-দময়ন্তীর পেছনেও তেমনি ছিল রহস্যময় এক ইতিহাস।

অর্বুদাচল পাহাড়। ঘন বনে ঢাকা। যেমন ঘন তেমনি ভয়ানক। বাঘ, ভাল্লুক থেকে হেন জন্তু নেই, যা সেই পাহাড়ী বনে ছিল না।

আহুক আর আহুকি স্বামী-স্ত্রী—সেই বনে ছোট্ট একটা কুঁড়েতে থাকত। শিবের পুজো করত। শিকার করত। আর সুখে দিন কাটাত।

সন্ধে হয় হয়। এমন সময় একদিন হঠাৎ এক সন্ন্যাসী, ব্যাধের সেই কুঁড়ের সামনে এসে হাজির। ঘুরছিলেন পাহাড়ে। রাত হয়ে আসছে দেখেই খুঁজছিলেন একটু আশ্রয়। কেননা, রাতের বন যে ভীষণ। কুঁড়ের সামনে এসে, সন্ন্যাসী দেখলেন এক রমণীকে। দেখেই বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সন্ন্যাসী মানুষ তিনি। কোন মহিলার কাছে যাওয়া তাঁদের নিষেধ।

কুঁড়েতে তখন একমাত্র আহুকিই ছিল। স্বামী আহুক তখনো শিকার থেকে ফেরে নি।

সকালে এক দফা শিবের পুজো সেরে আহুক শিকারে বের হয়। শিকার শেষে স্নান করে আবার শিবলিঙ্গের পুজো করে রাতের আগেই কুঁড়েতে ফেরে। এটা তার নিত্যদিনের কাজ।

সন্ন্যাসীকে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে, কুঁড়ে থেকে আহুকি বেরিয়ে এল। বলল—এ কি বাবা, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? ভেতরে আসুন।

আহুকির এই 'বাবা' বলে ডাকটি ভারি ভাল লাগল সন্ন্যাসীর। কুঁড়েতে গিয়ে ঢুকলেন। ব্যাধের স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা ধুইয়ে আপ্যায়ন জানাল।

ইতিমধ্যে ব্যাধ আহুক এসে হাজির। সন্ন্যাসীকে অতিথি হিসেবে পেয়ে সেও খুব খুশি হল।

সন্ন্যাসী বলল—রাতটুকু এখানে কাটাব বাবা। আর তো কোন ডেরা এখানে দেখতে পেলাম না। কাল সকালেই চলে যাব।

—খুবই আনন্দের কথা তো বাবা। যদিও এই একখানা কুঁড়েতে আমরা দুজনে মাথা গুঁজে থাকি, তবুও আমরা ঠিক করে নিচ্ছি। আপনি থাকুন।

সন্ন্যাসীর যে রকম সেবা-পরিচর্যা করা উচিত, দু-জনেই ভক্তির সঙ্গে তা করল। সন্ন্যাসীও খুবই তৃপ্ত হলেন।

রাত হল।

আহুকি স্বামীকে বলল—তুমি বাবাকে নিয়ে ঘরে শোও। আমি বাইরে দাওয়ায় থাকি।

আহুক বলল—তা কখনো হয় নাকি? বুনো জানোয়ারদের কি তুমি ঠেকাতে পারো? সন্ন্যাসী বাবাকে নিয়ে তুমি বরং ঘরে খিল দিয়ে শোও। আমি বাইরে পাহারায় থাকি।

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। আহুক রইল বাইরে। সন্ন্যাসীকে নিয়ে আহুকি খিল দিল ঘরে। ঘরে যা ছিল তাই পেতে, ঘরের এক কোণে সন্ন্যাসীর শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে, নিজে শুয়ে পড়ল আর এক পাশে।

শোবার একটু পরেই আহুকি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সন্ন্যাসীর চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না। তাই চুপ করে বসে রইল নিজের বিছানায়।

রাত আরো গভীর হয়েছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে সব হিংস্র জন্তুদের ডাক। এক সময় তার মনে হল, একটা হিংস্র জন্তু যেন এসে আছড়ে পড়ল একবারে ব্যাধের কুঁড়ের সামনে। তারপরই দুরন্ত এক ধস্তাধস্তি। চমকে ওঠে সন্ন্যাসী। কিন্তু বেরিয়ে আসতে সাহস হয় না। আহুকি কিন্তু তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

কান খাড়া করে সন্ন্যাসী শোনে, একসময় থেমে গেল কুঁড়ের সামনে ধস্তাধস্তি। কিন্তু অন্য কোন একদিক থেকে আবার ভেসে এল বিকট এক গর্জন।

রাত কেটে গেল। বাইরে ভোরের আলো। রাতের অত তর্জন-গর্জন আর কোথাও নেই। সব শান্ত।

সন্ন্যাসী খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। এসেই যা দেখল, তাতে তার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। হিংস্র জন্তু আহুককে মেরে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেছে। তার রক্তহীন দেহ প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিকে।

আহুকিও ইতিমধ্যে উঠে এসেছে।

সন্ন্যাসীকে দুঃখে কাতর দেখে বলল—বাবা, আপনি এর জন্য মনে মনে এত কষ্টভোগ করছেন কেন? অতিথির জন্য আমার স্বামী প্রাণ দিয়েছে, এ কি তার কম সৌভাগ্য? এতে আমিও গর্ববোধ করছি, বাবা।

সামান্য একজন ব্যাধ রমণীর মুখে, এইরকম কথা শুনে সন্ন্যাসী তো একেবারে অবাক।

আহুকি বলল—না বাবা, আপনি এর জন্য কিছু দুঃখ করবেন না। আমি নিজের হাতে স্বামীর সৎকার করে, ঐ চিতার আগুনে নিজেকেও সমর্পণ করব। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পরজন্মেও এমন স্বামী পাই।

কি বলবে সন্ন্যাসী!

চিতা সাজাল আহুকি। টুকরো টুকরো দেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করে চিতায় তুলে দিল। আগুন জ্বালাল। আহুকের দেহ যখন পুড়তে শুরু করেছে, দু-হাত তুলে তাদের আরাধ্য দেবতা শিবকে প্রণাম জানিয়ে হাসিমুখে যখন আগুনে ঢুকে পড়ল, ঠিক সেই সময়ই দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর সৌম্য মূর্তি নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হলেন। আহুকিকে বললেন—এ জন্ম, তোমাদের এই বনে কষ্টেই কেটে গেল। আমার বরে, পর জন্মে তোমাদের উচ্চবংশে জন্ম হবে। আবার তোমরা স্বামী-স্ত্রীই হবে। এই

সন্ন্যাসীই তোমাদের বিয়ের ঘটকালি করবে।

বীরসেনের ছেলে নলই ছিল সেই ব্যাধ আহুক। দময়ন্তী ছিল সেই আহুকি। আর সত্যি সত্যিই সেই সন্ন্যাসীই হাঁসের রূপ ধরে তাঁদের বিয়ের ঘটকালিও করেছিলেন।



শিব-অর্জুন সংবাদ

জ্ঞাতিশত্রুদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে মহারণ অনিবার্য। হস্তিনাপুরে থাকার মত একটু মাটিও দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের দেবে না। সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে। শক্তিশালী শত্রুদল। দুর্যোধন পৃথিবীর তাবৎ রাজাদের কব্জা করে ভিড়িয়েছে নিজের দলে। এমন কি কর্ণের মত মহাবীরও দুর্যোধনের পক্ষে। শুধু তাই নয়, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য, দ্রোণর মত মহা-মহারথী যাঁদের কাছে পাণ্ডবরাও কৈশোরে অস্ত্র শিক্ষা করেছেন, তাঁরাও সবাই দুর্যোধনের পক্ষে। তার ওপর আবার অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী সেনা।

পাণ্ডবদের পক্ষে মাত্র পাঁচ ভাই আর তাঁদের ছেলেরা। এ ছাড়া একমাত্র সহায় শ্রীকৃষ্ণ।

হস্তিনাপুরের সত্যিকারের দাবিদার কিন্তু পাণ্ডবরা। দুর্যোধন তাঁদের দাবি মেনে নেন নি। কাজটা খুব অন্যায়। তবুও সকলেই দুর্যোধনের পক্ষে। এটাই নিয়ম। সত্যকে কেউ চট করে স্বীকার করতে চায় না। অন্যায়, অসত্য তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। শক্তিশালীও হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক, অন্যায় শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। ধর্মপথে ঠিক ঠিক থাকলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার সহায় হন। তাকে কেউ মারতে পারে না। তবুও অশান্তির শেষ থাকে না।

দেখে-শুনে ব্যাসদেব পাণ্ডবদের ডেকে বলেছিলেন, অর্জুনকে শিবের আরাধনা করতে পাঠাও। শিবের কাছে মারাত্মক মারাত্মক সব অস্ত্র। তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন যদি তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে আনতে পারে, তাহলে জ্ঞাতিশত্রুরা যত ক্ষতিই করুক, সর্বনাশ করতে পারবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের সহায় হতে পারেন, তবুও অস্ত্র তো চাই।

কথাটা ঠিক।

কিভাবে কোথায় গিয়ে শিবের পুজো বা আরাধনা করতে হবে তা জেনে নিয়ে অর্জুন চলে গেলেন ইন্দ্রনীল পাহাড়ে। যেভাবে ব্যাসদেব বলেছিলেন, অর্জুন সেভাবেই পুজো, তপস্যা আরম্ভ করলেন।

কঠোর সে তপস্যা। হাতে ধনুক, কাঁধে বাণে-ভরা তূণীর। অর্জুন শিবের উদ্দেশে তপস্যা করে চলেছেন।

অর্জুনের সেই তপস্যা দেখে দেবতারা বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। সবাই মিলে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—দেবরাজ, কে একজন মানুষ ইন্দ্রনীল পাহাড়ে যে রকম তপস্যা করছে, জানি না আমাদের শেষ পর্যন্ত কি দুর্গতি হবে।

—তাই নাকি ? বললেন দেবরাজ। তিনিও যে জানেন না, তা নয়। তবুও দেবতাদের কাছে গোপন রেখে বললেন—ঠিক আছে, তোমরা যাও, আমি দেখছি।

অর্জুন যেখানে তপস্যা করছিলেন, একদিন এলেন সেখানে লাঠি হাতে থুরথুরে এক ব্রাহ্মণ। লাঠিতে ভর দিয়ে এলেও যেন আর তিনি চলতে পারছেন না। টলে টলে পড়ে যাচ্ছেন। অর্জুন দেখেই তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে এনে বসালেন নিজের কাছে। ব্রাহ্মণ তখন খুব হাঁফাচ্ছিলেন।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, একটু স্বাভাবিক হলেন ব্রাহ্মণ। তারপর অর্জুনকে বললেন—দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমি কোন রাজার ছেলে। তা এখানে এমন কষ্ট করে কিসের তপস্যা করছ।

অর্জুন বলল—আমি শিবের তপস্যা করছি।

ব্রাহ্মণ—কেন ?

—অস্ত্র চাই। মহাশক্তিশালী অস্ত্র চাই।

—কি হবে তা দিয়ে ?

—জ্ঞাতিশত্রুদের বিনাশ আর আমাদের আধিপত্য।

গলা কাঁপাতে কাঁপাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন—হায় ! হায় ! এই কঠোর তপস্যা করছ, শিবের কাছ থেকে অস্ত্র পাবার জন্য ? আরে, ওসব তো তুচ্ছ জিনিস। মানুষ এই রকম তপস্যা করে মুক্তির জন্য—যাতে পৃথিবীতে আর জন্মাতে না হয়, কষ্ট ভোগ করতে না হয়। শিবের কাছে সেই প্রার্থনা না জানিয়ে, চাইছ অস্ত্র। এ কি দুর্বুদ্ধি তোমার। ছি-ছি।

—দুর্বুদ্ধি আমার কোথায় দেখলেন ব্রাহ্মণ ? বললেন অর্জুন—আপনি যে-ই হোন, মতিচ্ছন্ন আপনার। আমরা ক্ষত্রিয় বীর। অন্যায়কে এড়িয়ে গিয়ে মুক্তির সাধনা আমরা করি না। অন্যায়ের প্রতিকার করাই আমাদের ধর্ম। সেখানেই আমাদের মুক্তি। বলে, বেশ রেগে উঠেই অর্জুন বললেন—আপনি যান। আমার তপস্যায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না !

বলে, মুখটা ব্রাহ্মণের দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকাতেই দেখেন, কোথায় সেই থুরথুরে লাঠি হাতে জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণ ! সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দেবরাজ ইন্দ্র।

অর্জুনকে বললেন—তোমাকে শুধু একটু পরীক্ষা করতে এসেছিলাম পুত্র। আমি আশীর্বাদ করছি, নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট লাভ হবে। তপস্যা কর।

ইন্দ্র অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। অর্জুন আবার তপস্যা শুরু করলেন। সেই কঠোর তপস্যা।

বেশ কিছুকাল কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন অর্জুন দেখলেন, বিকটাকার দাঁতালো একটা বুনো শুয়োর আগুনের ভাঁটার মত চোখ নিয়ে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে তাঁর দিকে তেড়ে আসছে।

অর্জুনের মনে পড়ে গেল ব্যাসদেবের কথা—তপস্যা করতে গেলে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসে। দুষ্ট প্রকৃতির যারা, তারা তো বটেই, এমন কি দেবতারাও ছল-চাতুরি করেন তপস্যা নষ্ট করার জন্য।

শুয়োরটাকে দূর থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আসতে দেখে। সত্যিই

বুনো শুয়োর, না অন্য রকম কিছু। যাই হোক, ক্ষতি যখন করতে আসছে, তখন তাকে রুখতেই হবে।

আসলে, শুয়োরটা কিন্তু সত্যিকারের শুয়োর ছিল না। এক মহাবল অসুর। দুর্যোধনের বন্ধু।

এদিকে তখন ঘটল আর এক কাণ্ড।

অর্জুনের তপস্যায় ইতিমধ্যেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন শিব। কিন্তু একবারে ধরা দিতে চান নি। ঠিক করেছিলেন, একবার বাজিয়ে দেখে নেবেন তাঁর ভক্তের ভক্তি আর অস্ত্র নেবার ক্ষমতা কতখানি।

অনুচরদের নিয়ে শিব ব্যাধের বেশ ধরে এলেন ইন্দ্রনীল পাহাড়ে। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেয় সাধ্য কি শুয়োরের? তিনি শুয়োরকে দেখে ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন, দুর্যোধন অসুর পাঠিয়েছে তাঁর ভক্তকে মারতে। অর্জুনের যাতে সে কোন ক্ষতি করতে না পারে, তাঁকে অবশ্যই তা দেখতে হবে।

ইতিমধ্যে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে আর বিকট গর্জন করতে করতে শুয়োর প্রায় এসে পড়েছে অর্জুনের কাছে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে শিবকে স্মরণ করে, তূণীর থেকে মোক্ষম এক বাণ তুলে নিয়ে জুড়লেন ধনুকে। ওদিকে ঝোপের আড়াল থেকে ব্যাধের বেশে শিবও আর এক বাণ জুড়লেন তাঁর ধনুকে। শুয়োরকে লক্ষ্য করে একই সঙ্গে ছুঁড়লেন বাণ দু-জনেই। অর্জুনের বাণ শুয়োরের হাঁ-মুখ দিয়ে ঢুকে, বেরিয়ে গেল পিছন দিক দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে। ওদিকে শিবের বাণও শুয়োরের পেছন দিয়ে ঢুকে, বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। শুয়োর তখুনি মারা গেল।

এবার সমস্যা বাধল বাণ নিয়ে। অর্জুন যেই নিজের বাণ কুড়িয়ে আনতে গেলেন, বাধা দিল জনকয় ব্যাধ—কার বাণ তুমি চুরি করছ? জান, ও বাণ আমাদের সেনাপতির।

কথাটা শুনে অর্জুনের আত্মসম্মানে খুব লাগল। কোথাকার সামান্য ব্যাধ, তাঁকে বলে চোর! তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—কি সব উলটোপালটা বলছ তোমরা? এ বাণ তো আমার। আমার নাম পর্যন্ত এতে লেখা রয়েছে। কে তোমাদের সেনাপতি? তোমরা আবার কোথা থেকে এলে?

অনুচরেরা বলল—কেন আজে-বাজে বকছ তুমি, মানুষ? তুমি যে কতবড় বীর তা আমাদের জানা আছে। আমাদের সেনাপতি শুয়োরকে বাণ দিয়ে না মারলে, তোমাকে ঐ অসুরের পেটেই যেতে হত! সাধে বলে, মানুষ বড় বেইমান। যে উপকার করল, তারই বাণ তুমি চুরি করছ। আশ্চর্য!

—আবার কেন ওসব কথা বলছ তোমরা? চুরি কি জিনিস, আমি তা জানি না। বরং কেউ চুরি করলে, আমিই তাকে সাজা দিই। আর তোমরা এসব কি বলছ? বাণের দরকার থাকে, তোমাদের সেনাপতিকে এসে চাইতে বল, আমি দিচ্ছি। কিন্তু ওসব বাজে কথা বোলো না।

অনুচরেরা বলল—চুরি করছ, তবু বলব না? কি দরকার ঐ বাণ চুরি করে নেবার? দরকার থাকে আমাদের সেনাপতির কাছে চাও না কেন? তাঁর কাছেও অনেক বাণ আছে। চাইলেই দেবেন।

কথায় গেল কথা বেড়ে। ইতিমধ্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ব্যাধবেশী শিব। অর্জুনও উঠলেন দারুণ রেগে।

সামান্য এক বাণ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল অর্জুনের সঙ্গে শিবের।

একের পর এক মোক্ষম-মোক্ষম বাণ ছোঁড়েন অর্জুন। আর আশ্চর্য! টুকটুক করে ব্যাধ তা কেটে দেন। দেখে অবাক লাগে বটে অর্জুনের। কিন্তু যুদ্ধ যখন বেধেছে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, শেষ না দেখা পর্যন্ত বিরাম নেই।

ব্যাধের তীর থেকে ছুটে আসে এক একটা বাণ। অর্জুনের বর্ম কাটে, পোশাক-আশাক ফালা-ফালা হয়ে খসে পড়ে। তবে, শরীরে আঘাত করে না।

নিরুপায় হয়ে অর্জুন এবার ধনুক-বাণ ফেলে শুরু করলেন হাতাহাতি লড়াই। মনে মনে শিবকে ডাকেন অর্জুন আর এক একটা করে প্রচণ্ড আঘাত হানেন। ব্যাধ যেমন মার খায়, তেমনি পালটা মারও কিন্তু কম দেয় না।

একসময় অর্জুন করলেন কি, ঝপ করে ব্যাধের পা দুটো ধরে শূন্যে বোঁ-বোঁ করে ঘুরিয়ে দূরে ফেলে দিলেন। ব্যাধ কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে না পড়ে, দাঁড়িয়ে পড়লেন তফাতে গিয়ে নিজের পায়ে!

অর্জুন আবার প্রস্তুত হচ্ছিলেন। উঠে এলেই আবার তাঁকে আক্রমণ করবেন।

কিন্তু আক্রমণ আর করা হল না।

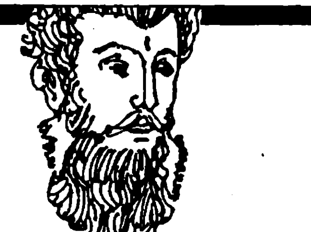
অর্জুন দেখলেন—কোথায় ব্যাধ। সামনে দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর গোল করে জটা, কপালে ত্রিনেত্র, পরনে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল, সদাহাস্যময় দেবাদিদেব মহাদেব।

অর্জুনের তখন আর লজ্জার শেষ নেই। ছি-ছি, যাঁর উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যা করছেন এতদিন ধরে, শেষে কিনা বুঝতে না পেরে তাঁকেই এমন ভাবে নিগ্রহ করলেন?

আর থাকতে না পেরে, অর্জুন লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের ওপর—আমায় ক্ষমা করুন।

শিব তাঁকে দু-হাতে তুলে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—এতে তো তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই অর্জুন। আমি ছলনা করছিলাম তোমার সঙ্গে। দেখতে এসেছিলাম, তুমি কত বড় ক্ষত্রিয় বীর, কতখানি ধর্ম মেনে চল। খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি অর্জুন। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র, এই পাশুপত তোমায় দিলাম। প্রয়োজনে ব্যবহার কোরো।

বলে, শিব অনুচরদের নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। অর্জুন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পাশুপত অস্ত্র নিয়ে ফিরে এলেন দাদাদের কাছে।



শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন লাভ

সেই কৈশোরেই কংসকে নিধন করে, শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে কারাগার থেকে মুক্ত করে সিংহাসনে বসিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ রেগে গিয়ে যত বলশালী অসুর-রাজ ছিল,

তাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে মারবার জন্য বারবার মথুরা আক্রমণ করতে লাগল। যতবারই সামাল দেন শ্রীকৃষ্ণ, ততবারই অসুররা তছনছ করে যায় মথুরা। ভয়ে অস্থির সবাই। শ্রীকৃষ্ণও দেখলেন, শক্ত একটা ঘাঁটি না করলে, মানুষজনকে একটু আশ্বস্ত করতে না পারলে, সবই যাবে। তিনি তাই সমুদ্রের তলায় চল্লিশ ক্রোশ জুড়ে একটা নগরী তৈরি করিয়েছিলেন। তার নাম দ্বারকা।

আপাতত খানিকটা নিরাপদ। কিন্তু অসুররা যে পরিমাণ বেড়ে উঠছে, তাতে তাদের দমন না করলেই আর চলে না।

—সবাই এসে অনুরোধ জানাতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণকে—সব যে যায়। একটা কিছু কর কৃষ্ণ, যাতে এই অত্যাচার বন্ধ হয়।

সন্দীপন মুনির কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ দেবশাস্ত্র থেকে অস্ত্রশাস্ত্র, সব বিদ্যেই আয়ত্ত করেছিলেন। মুনিবর, এর ওপরেও আবার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন শিবের মন্ত্র। বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি শিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন, তাহলে, কোথাও তাঁর কোন পরাভব হবে না।

সে কথা অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ কখনো ভোলেন নি।

অসুররা কিন্তু যখন বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করল, শ্রীকৃষ্ণ, তখন উপায় ভাবতে ভাবতে এক সময় হঠাৎ রৈবত পাহাড়ে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হল প্রাচীন জ্ঞানী ঋষি উপমন্যুর।

উপমন্যু বললেন—এত চিন্তার কি আছে কৃষ্ণ। তুমি নিজে কিছু কম যাও না একথা ঠিক। তবুও বলি কি, শিবের পুজো, শিবের ধ্যান করে শিবকে সন্তুষ্ট করো না কেন? দেখবে, তোমার সব সমস্যা চোখের নিমেষে মিটে যাবে।

ঠিকই বলেছেন উপমন্যু।

একটা শিবের মূর্তি বসিয়ে, যজ্ঞকুণ্ড তৈরি করে, ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি সবকিছু যোগাড় করে, শ্রীকৃষ্ণ বিধিমত হোম-পুজো শুরু করলেন। সাত বৎসর ধ্যান করে কাটাবার পর, শিবের হাজার নাম, প্রতিদিন এক-একটা নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের পুজো করে এক হাজার করে পদ্মফুল দিতে শুরু করলেন। হোমের ধোঁয়ায়, মন্ত্রের উচ্চারণে রৈবত পাহাড় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল।

কথাতেই আছে, 'কষ্ট করলেই ইষ্ট মেলে' অর্থাৎ ফল পাওয়া যায়। সকলেই তপস্যা করেছেন, কষ্ট করেছেন, ফলও পেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের তপস্যায় হর-পার্বতীর আসনও টলে উঠেছিল। তবুও মহাদেব একেবারে এসে সরাসরি ধরা দিলেন না শ্রীকৃষ্ণকে।

হাজারটা পদ্মের এক একটা পদ্ম হাতে তুলে নিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে চলেছেন শিবকে। দিতে দিতে এসে দেখলেন, একটা পদ্ম কম পড়ে গেল। কি হল? গুণে গুণে একহাজার পদ্ম তো তিনি তুলে এনেছিলেন। কম পড়ার কথা তো মোটেই নয়? তাহলে? অথচ হাজারটা পদ্ম না দিলে যে সংকল্প শেষ হবে না? উপায়? এখন তো আসন ছেড়ে উঠে পদ্ম তুলতে যাওয়া সম্ভব নয়! শেষ পর্যন্ত পদ্মের মত দেখতে নিজেরই একটা চোখ উপড়ে নিয়ে তিনি মহাদেবকে অঞ্জলি দিলেন।

মহাদেব তা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। আবির্ভূত হয়ে বললেন—কৃষ্ণ, তোমার পদ্ম আমিই গোপনে সরিয়ে রেখে, তোমার ভক্তির পরীক্ষা করছিলুম। দেখলাম, অসাধারণ তোমার ভক্তি। তোমার চোখ তুমি ফিরে পাবে। বল, কিসের জন্য তুমি এখন তপস্যা করছ?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আপনি তো সবই জানেন, তবু কেন জিজ্ঞেস করছেন? পৃথিবীতে অসুররা মহাপ্রবল হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে সব মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র। আমাদের হাতে এমন কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে ঐ অসুরদের বধ করা যায়।

শুনে শিব বললেন—এই কথা? তার জন্য তোমার এই তপস্যা?—বলে, শ্রীকৃষ্ণের হাতে তুলে দিলেন আগুনের মত ঝাঁঝালো আর চোখ ধাঁধানো এক চাকা। বললেন—কৃষ্ণ, এটি আমার সুদর্শন চক্র। ব্রহ্মাণ্ডে এখনও পর্যন্ত এমন কোন অস্ত্র নেই, যে এর গতি ঠেকায়। তুমিই এই চক্র ধারণ করার উপযুক্ত। তাই তোমাকে দিলাম। তুমি গিয়ে নির্ভাবনায় এটি দিয়ে অসুরদের নিধন কর।

শিবকে প্রণাম জানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেটি গ্রহণ করে চলে এলেন। তারপর কত অসুর সেই চক্রে প্রাণ হারিয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ইন্দ্রের বজ্র, শিবের ত্রিশূল যেমন দুরন্ত, তেমনি অমোঘ অস্ত্র এই সুদর্শন চক্র।

শ্রীকৃষ্ণও সেই থেকে হয়ে রইলেন চক্রধারী।



ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

ব্রহ্মা আর বিষ্ণু, দু-জনের মধ্যে কে বড়, তাই নিয়ে বহুকাল আগে দু-জনের মধ্যে দারুণ এক বিবাদ শুরু হয়েছিল।

ব্রহ্মা দেবতাদের ঠাকুর্দা। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। তিনি হলেন সকলের বিধাতা। সকলের কাছে পূজ্য। সকলের কাছেই সম্মানীয়। খাতির সম্মান, আর যত্ন পেতে পেতে তাঁর ধারণাই হয়ে গিয়েছিল, তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই কমণ্ডলু হাতে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা বেশ দম্ভ আর অহঙ্কার নিয়ে ঘুরে বেড়ান চারদিকে।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ব্রহ্মা এসে দেখলেন, বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন। পাশে গরুড়। ব্রহ্মা এলেন, দাঁড়ালেন। বিষ্ণু কিন্তু শুয়েই রইলেন।

তাই দেখে, ব্রহ্মা গেলেন ভীষণ রেগে। বলে উঠলেন—তোমার স্পর্ধা তো কম নয়? এত ঔদ্ধত্য তোমার কোথা থেকে এল যে, আমি গুরুজন এসে দাঁড়ালাম তোমার সামনে, তুমি শুয়েই রইলে? শিষ্টাচারটুকুও ভুলে গেলে?

বিষ্ণু শুনলেন বটে কিন্তু উঠলেন না। যেমন শুয়ে ছিলেন, তেমনি ভাবেই শুয়ে থাকলেন।

—কি ব্যাপার? আমার কথা কানে গেল না? আরো রেগে উঠলেন ব্রহ্মা—আমি জগতের বিধাতা, তোমারও বাবা, এলাম,

আর তোমার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ? জান, গুরুজনকে অপমান করলে সাজা পেতে হয় ?

শুনে বিষ্ণুর মনে-মনে খুবই রাগ হল। কিন্তু তা প্রকাশ না করে হাসি মুখে বললেন—বৎস এসেছ ? এসো, এসো। অনেক দিন পরে এলে ! আসতে কোন কষ্ট হয় নি তো ? কেমন আছ ?

ব্রহ্মা গেলেন আরো রেগে। —'বৎস' 'বৎস' কাকে বলছ তুমি ? আমি তোমার ছেলে ? না, তুমি আমার ছেলে ? তোমার ঔদ্ধত্য তো কম নয় ?

বিষ্ণু তখনও নিজেকে সামলে রেখে বললেন—বৎস, তুমি হয়ত ভুলে গেছ যে, তুমি জগতের স্রষ্টা নামে মাত্র। তোমার জন্ম হয়েছে আমার নাভি থেকে। ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্টি, সবই আমার। তুমি নামে মাত্র বিধাতা।

দু-জনের মধ্যে এই নিয়ে শুরু হয়ে গেল বাগ্‌বিতণ্ডা—কে বড় ? কে কার বাবা ? শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা এসে দাঁড়াল যে, মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি। বিষ্ণু উঠে বসলেন গরুড়ের পিঠে। ব্রহ্মাও উঠে বসলেন হাঁসের পিঠে। বিষ্ণুও তুলে নিলেন অস্ত্র। ব্রহ্মাও তুলে নিলেন অস্ত্র। বিষ্ণুর সেনা বৈষ্ণবরা আর ব্রহ্মার সেনা ব্রাহ্মণেরা লেগে পড়লেন যুদ্ধে।

যেখানে যত দেবতা ছিলেন, সবাই ছুটে এলেন দেখতে—এ কি ব্যাপার ? দু-জনেই তাঁদের কাছে সম্মানের। অথচ, দু-জনে এ কি শুরু করে দিলেন ?

শেষ পর্যন্ত মারামারি উঠল চরমে। দু-জনেরই অস্ত্র ছোটে দু-জনের দিকে। ভীষণ গর্জন আর আগুনের জ্বালায় কেঁপে ওঠে পৃথিবী। দেবতাদেরও হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়।

বিষ্ণু আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ছুঁড়লেন মহেশ্বরাস্ত্র। ব্রহ্মাও দারুণ রেগে বিষ্ণুর বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন পাশুপত। অস্ত্র দুটোই ছিল এমন অমোঘ যে, প্রতিরোধ করতে না পারলেই সর্বনাশ। দুটো অস্ত্রই গিয়ে শূন্যে মুখোমুখি হল। হাজারটা সূর্য যেন আকাশে জ্বলে উঠল। তার প্রচণ্ড তাপে, সৃষ্টি বুঝি ছারখার হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে উঠল আবার দারুণ ঝড়। ঝোড়ো বাতাস সেই আগুন যেন হু-হু করে ছড়িয়ে দিতে লাগল চারদিকে। সবাই প্রমাদ গুণতে শুরু করল—হায় ! রাজায় রাজায় যুদ্ধ শুরু করল, আর উলু খাগড়াদের প্রাণ যেতে বসল ! কেউ কি কোথাও নেই যে রক্ষে করেন ?

ঠিক এই সময় মাটি ফুঁড়ে বিশাল এক স্তম্ভ উঠে এল দু-জনের সামনে। আগুনের মত রং। উঠতে উঠতে যে কোথায় উঠে গেল, সেটা আর চোখেই পড়ে না। প্রচণ্ড যে আগুনের ঝড় বইছিল এতক্ষণ, তাও মুহূর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল।

যুদ্ধ থামিয়ে দু-জনেই অবাক। এ আবার কি ? কোথা থেকে এল ? দু-জনকেই এমন ভাবে টেক্কা দিল কে ? দেখতে হয় তো।

বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন—তুমি ওপর দিকে যাও। দেখ তো, কোথায় গিয়ে এর মাথাটা ঠেকেছে। আমি নীচে যাচ্ছি। দেখি কোথা থেকে উঠে এল।

দু-জনে আপাতত তাই করতে গেলেন। ব্রহ্মা হাঁসে চেপে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। আর বিষ্ণু শূকরের রূপ ধরে, মাটি খুঁড়ে নীচে নামতে শুরু করলেন।

ধাপের পর ধাপ, মাটি কাটতে-কাটতে বিষ্ণু যে কত নীচে নেমে এলেন, তার আর শেষ নেই। তবুও গোড়ায় আর গিয়ে পৌঁছোতে পারলেন না। অবাক হয়ে ফিরে এসে, যেখানে ব্রহ্মার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন, সেখানেই আবার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মা ফিরে এলেন। খুব হাসি-খুশি মুখ।

—কি হল ব্রহ্মা ? ওপরে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, পাত্তা করতে পারলে ?

—তার আগে, তোমাকেই জিজ্ঞেস করি। বড়াই করে নীচে যে গেলে, গোড়া খুঁজে পেলে ?

বিষ্ণু বললেন—না ব্রহ্মা। পেলাম না। অনেক নীচে নেমেছিলাম, তবু পাত্তা করতে পারলাম না, গোড়া কোথায় ? আমার বড় অবাক লাগছে !

বিদ্রূপ করলেন ব্রহ্মা—এই নিয়ে তুমি বড়াই কর যে, তুমি আমার চেয়ে বড় ! অ্যাঁ ! এই মুরদ নিয়ে আবার আসো আমার সঙ্গে লড়াই করতে।

—কেন ? তুমি কি এর শেষ মাথা দেখতে পেয়েছ ?

—আমি বিধাতা। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা আমি। পাব না মানে ? এই দেখ, মাথা থেকে নিয়ে এলাম কেতকীকে (কেতকী ফুল)। জিজ্ঞেস কর একে। কেতকীকে দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে বললেন ব্রহ্মা।

কেতকীও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী দিল।

বিষ্ণুর মন এত সরল, যে মনে তাঁর কণামাত্র সন্দেহ জাগল না। ভাবতে পারলেন না, মহা শক্তিধর হয়েও তিনি নিজে যার গোড়া খুঁজে পেলেন না, ব্রহ্মা কেমন ভাবে তার আগা খুঁজে পেলেন।

ভাবলেন, ব্রহ্মা তাহলে নিশ্চয় তাঁর থেকেও শক্তিধর। এই ভেবে তিনি ব্রহ্মার কাছে নতি স্বীকার করলেন সরল মনে।

চালাকিটা ধরতে পারেন নি দেখে, ব্রহ্মা মনে মনে খুব খুশি হলেন।

ঘটনাটা হয়েছিল—ওপরে উঠতে-উঠতে অনেকখানি ওঠার পর, কিছুতেই যখন আগা খুঁজে পাচ্ছিলেন না ব্রহ্মা, হঠাৎ চোখ পড়েছিল, টাটকা একটা কেতকীর দিকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন কেতকীকে, কিভাবে সে এখানে এল ? কেতকী কিছু না লুকিয়ে সবই বলেছিল ব্রহ্মাকে। এই স্তম্ভ হল শিবলিঙ্গ—অনাদি, অনন্ত। ইনি স্বয়ম্ভু। দু-জনে যুদ্ধ করছিলেন দেখে, ইনি নিজের রূপকে বিকৃত করে স্তম্ভ হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওপরে উঠছিলেন, তখন তাঁর কান থেকে সে খসে গিয়ে এখানে পড়ে আছে।—এই পর্যন্ত শুনেই ব্রহ্মার মাথায় খেলে গেল দুর্বুদ্ধি। এই তো সুযোগ বিষ্ণুর ওপর এক হাত নেবার। কেতকীকে বললেন—তুমি আমার সঙ্গে চল। বিষ্ণুকে আমি যা বলব, তুমি কিন্তু তাতে সায় দেবে। ব্রহ্মার আদেশ, কেতকী তাই অমান্য করতে পারে নি।

কিন্তু, সত্য কি আর চাপা থাকে ? না, অন্যায় চিরকাল বেঁচে থাকে ?

চালাকি করে ব্রহ্মা যেই বিষ্ণুর পুজো নিতে যাবেন, অমনি সেই স্তম্ভ থেকে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন মহাদেব।

বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট পুরুষকে দেখে প্রণাম জানালেন। আর ব্রহ্মা ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন।

সর্বনাশ ! আর বুঝি রেহাই নেই।

মহাদেব বুকে জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুকে—সত্যিই তুমি সৎ। তুমি মহান। অনাদি, অনন্ত যে, তার কি কেউ আগা-গোড়া খুঁজে পায় ? তুমি সত্যি কথাই বলেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। তারপর ব্রহ্মার

দিকে তাকালেন লাল চোখে—ছি⋯ছি ! যাঁর দৌলতে তুমি বিধাতা, তুমি তাঁকেই অপমান কর। বিধাতা হয়েও আবার মিথ্যে কথা, মিথ্যাচার। তোমার যোগ্য সাজা হওয়া উচিত। —এই বলে রুদ্রদেব, যে মুখ দিয়ে ব্রহ্মা মিথ্যে কথা বলেছিলেন, সেই মুখটা মুণ্ড-সমেত ছিঁড়ে নিলেন। বললেন—আগে আমার প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ ছিলে। এখন থেকে তুমি হলে চতুর্মুখ। আর⋯আর আজ থেকে তোমার কেউ পুজো করবে না।

নিরুপায় ব্রহ্মার সঙ্গে অভিশপ্ত হল কেতকীও। আমার প্রিয়া তুমি। তুমি হলে কি না মিথ্যের সঙ্গী ? আজ থেকে তুমি আর আমার ছায়া মাড়াবে না।

থেমে গেল ব্রহ্মা-বিষ্ণুর লড়াই। মিটে গেল এক জটিল সমস্যা।



পর্ণাদের তপস্যা

ভৃগু মুনির বংশ ছিল দারুণ তেজী বংশ। এমনি তাঁদের তপস্যার বল ছিল যে, কাউকে তোয়াক্কা করেও চলতেন না, পরোয়াও করতেন না।

এই বংশেরই এক ব্রাহ্মণ বহুকাল মাত্র শাক-পাতা খেয়ে শিবের তপস্যা করেছিলেন বলে, তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল পর্ণাদ।

তপস্যা বলে তপস্যা—নিদারুণ তপস্যা ! একেবারে কথা না বলে, কিছুমাত্র না খেয়ে, একমনে তপস্যা শুরু করেছিলেন শিবের।

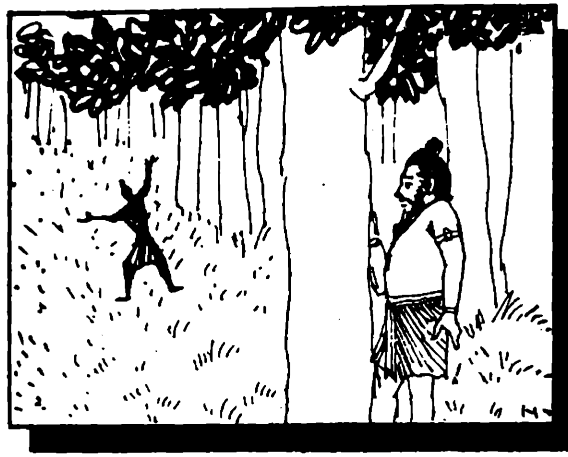
শরীর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ খিদেও থাকে। তাকে একেবারে দমিয়ে রাখে, সাধ্য কার ? মাঝে মাঝে পর্ণাদেরও পেটে যখন খিদের আগুন জ্বলে উঠত, তখন নামমাত্র শাক-পাতা খেয়ে তাকে ধামা চাপা দিতেন।

যে বনে বসে পর্ণাদ তপস্যা করতেন, সেই বনটায় আবার ছিল যতসব হিংস্র জন্তুর বাস। কিন্তু আশ্চর্য ; পর্ণাদের তারা কোন ক্ষতি করত না। বরং ভাবত, বুঝি-বা তাদেরই কেউ একজন হবে। শুধু তাই নয়, পর্ণাদের কাছাকাছি থাকার ফলে তারা হিংসে করতেও ভুলে গিয়েছিল। আরো আশ্চর্য, পর্ণাদের খুব খিদে পেলে, তারাই বন থেকে ফল যোগাড় করে এনে তাঁকে দিত।

মাঝে মাঝে প্রাণধারণের জন্য ঐটুকু খাওয়া আর তপস্যা। তপস্যায় শরীর রোগা হয়ে যায় বটে, কিন্তু সারা শরীর দিয়ে এমনি এক জ্যোতি বের হয়, যে বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না।

পর্ণাদের শরীর থেকে সেই রকম জ্যোতি বের হতে লাগল।

একদিন যজ্ঞের জন্য কুশ সংগ্রহ করছিলেন পর্ণাদ। কুশ এমনিতেই খুবই ধারালো। একটু অসাবধান হয়েছিলেন পর্ণাদ।



কুশের ঘায়ে মাঝের আঙুলটা তাঁর কেটে গেল, রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

তপস্বী দেখলেন, রক্ত যা বের হল, তার রং মোটেই লাল নয়। একেবারে শাক-পাতার মত সবুজ। দেখামাত্রই, পর্ণাদের সে কি আনন্দ !

তাঁর ধারণা ছিল, রক্তের রং যেদিন শাক-পাতার রং হবে, সেদিনই তপস্যা সফল হয়েছে জানতে হবে।

পর্ণাদ দারুণ আনন্দে ভীষণ ভাবে নাচতে শুরু করে দিলেন। তাঁর হাসি আর নাচে বন উঠল কেঁপে। হিংস্র জন্তু সব, যারা হিংসা ভুলে থাকত তাঁর আশে-পাশে, তারা প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল।

কোন দিকে কোন খেয়ালই নেই পর্ণাদের। হাসেন আর নাচেন আপন মনে।

সারা বন যখন এই ভাবে তোলপাড় করছেন, হঠাৎ আর একজন তপস্বী এলেন সেখানে। পর্ণাদকে কোন রকমে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার, এমন নাচা-কোঁদা করছেন কেন হঠাৎ ? আপনার মত তপস্বীর এ কি আচরণ ?

—তপস্যায় ফল লাভ করেছি, তাই আনন্দে নাচছি।

—কি ফল লাভ করলেন, ব্রাহ্মণ ?

—লাল রক্তকে সবুজ করে ফেলেছি, আর কি চাই ?

—তা ফল বুঝি এই ভাবে জাহির করতে হয় ? বললেন আগন্তুক—ভৃগু মুনির বংশধর তুমি, জান না, যে অহঙ্কার কখনো করতে নেই। অহঙ্কারে তপস্যার ফল নষ্ট হয়।

রেগে ওঠেন পর্ণাদ—কে হে তুমি, জ্ঞান দিতে এলে ? ফলের কথা জানালে ফল নষ্ট হয়ে যায় ? গেলেই হল ? আমি ভৃগুবংশের পর্ণাদ, যাক তো দেখি ফল আমার কাছ থেকে।

আগন্তুক বললেন—পর্ণাদ, তোমাকে দেখে আমার বড় মায়া হচ্ছে। চন্দ্র যে কিরণ দেয়, সূর্য যে আলো দেয়, আগুন যে পুড়িয়ে সব ছারখার করে, কেউ কি বলে, দেখ সবাই, আমি সত সুন্দর, কত তেজস্বী ! সত্যিকারের তপস্বী যাঁরা, তাঁরা কখনও নিজেদের জাহির করেন না, চুপচাপ থাকেন। ভেবো না রক্তকে শাক-রং করে ফেলেছ বলে তুমি একজন বড় তপস্বী হয়ে গেছ। তোমার চেয়েও অনেক বড় বড় তপস্বী আছেন, ভুলে যেও না। তপস্যার জোরে ভেতরে

রসকে পর্যন্ত শুকিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন তাঁরা—তাঁদের কখনও কি দেখেছ ? না, তাঁরা তোমার মত এমন করে জাহির করে বেড়িয়েছেন ?

আগন্তুকের কথা শুনে মনে মনে একটু দমে যান পর্ণাদ। তবু রোখ ছাড়েন না। বলেন—দেখাতে পার ?

হাসিমুখে বললেন আগন্তুক—তোমার মত আমিও একজন তপস্বী। ফল লাভ আমিও করেছি। কিন্তু কখনো তোমার মত জাহির করি না। আমার তপস্যার জোর দেখতে চাও, দেখ। —বলে তিনিও তাঁর মাঝের আঙুলটা কেটে ফেললেন।

পর্ণাদ দেখলেন, কাটা আঙুল দিয়ে তাঁর এক ফোঁটা রক্ত বের হল না, রস বের হল না। শুধু একগাদা ভস্ম (ছাই) বেরিয়ে এল। শুধু তাই নয়, কাটা আঙুল যত নাড়েন, ততই ছাই বেরিয়ে আসে। পর্ণাদ তো দেখে অবাক। মুখ দিয়ে আর কোন কথাই তাঁর বের হয় না।

বেশ কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পর্ণাদ বললেন—অপরাধ নেবেন না। আপনি আমায় জ্ঞানচক্ষু দিলেন। কে আপনি ? কি আপনার পরিচয় ? অনুগ্রহ করে আমায় ধন্য করুন।

আগন্তুক তপস্বী হলেন স্বয়ং শিব। ভস্মই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। পর্ণাদকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। বহুদিন ধরে তিনি তাঁরই তপস্যা করছেন। তাই যাতে বিভ্রান্তির বশে পর্ণাদের সাধনা নষ্ট হয়ে না যায়, তপস্বীর ছদ্মবেশে তিনিই এসেছিলেন তাঁকে সামাল দিতে।

পর্ণাদ যখন সব দম্ভ, অহঙ্কার পরিত্যাগ করে বারবার কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন তাঁর পরিচয় জানার জন্য, তখন তপস্বীর বেশ পরিত্যাগ করে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি।

পর্ণাদ নিজের সামনে তাঁরই আরাধ্যকে দেখে লুটিয়ে পড়লেন পায়ে।

মহাদেব তাঁকে আশ্বাস দিলেন—সাধনা কর। মন থেকে দম্ভ, অহঙ্কার দূর কর। বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

এরপর পর্ণাদ তপস্যা করে মহা-তাপস হয়ে উঠেছিলেন।

বীরক হলেন নন্দী

অড়ি নামে এক দৈত্য বহুকাল তপস্যার পর ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে অমরত্ব বর চেয়ে বসল। ব্রহ্মার সাধ্য কি এই বর দেন ? এই বর দেওয়ার অধিকারও তাঁর নেই। ব্রহ্মা তাঁর অক্ষমতা জানালেন। আবার এত তুষ্ট হয়েছেন যে, বর না দিয়ে যেতেও পারছেন না। অড়ি তা বুঝে কথার প্যাঁচে এমন বর চেয়ে বসল যে, তাকে আর মারে কে ? ব্রহ্মারও বুদ্ধি-শুদ্ধি এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে, তিনিও বলে বসলেন 'তথাস্তু।' অড়ি ভাবল, এবার আর তাকে পায় কে ?

বীরদর্পে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অড়ি একদিন এল হিমালয়ে, যেখানে শঙ্কর আর পার্বতী থাকতেন।

একটা বিশাল গুহা, সেখানে থাকতেন শিব। তার নামই ছিল শঙ্কর গুহা। আর পার্বতী তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে থাকতেন তারই পাশে। যদিও সেটাও দুর্গ, দেখতে ছিল খানিকটা প্রাসাদের মত। তাই সেটা ছিল প্রাসাদ-দুর্গ। দুর্গদ্বারের দুটো মুখই ছিল পাশাপাশি। আর তার পাহারায় থাকত পার্বতীর এক সখী আর বীরক নামে তাঁদেরই ছেলের মত এক অনুচর। পাহারার কারণ, যাতে গুহায় গিয়ে শঙ্করকে কেউ অন্যমনস্ক করে না দেয়। আর শঙ্করও যেন খেয়ালের বশে তপস্যা ছেড়ে পার্বতীর সতীনদের কাছে না যেতে পারেন।

নিষ্ঠার সঙ্গে বীরক পার্বতীর নির্দেশ মেনে পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় অড়ি দৈত্য ব্রহ্মার বর পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এল সেখানে। বীরক তাকে বিলক্ষণ চিনত। তাই আসতেই সে রুখে দাঁড়াল।

অড়ি দৈত্য মনে মনে ঠিক করেই এসেছিল, শিবের সঙ্গে একবার সে মোকাবিলা করবে। মতলবও সব ঠিক করেই এসেছিল। বীরক বাধা দিল তো কি হয়েছে ? বাধা পেয়ে মুখ টিপে হেসে অড়ি নিজের মনেই বলল, ব্যাটা শিবের অনুচর, দৈত্যদের ক্ষমতা কি বুঝবে ? বীরক দেখল দৈত্য চলে গেল। আসলে কিন্তু একটু আড়ালে গিয়ে ভেক বদলে সাপের রূপ ধরে ঢুকল এসে শঙ্করের গুহায়। দেখেও সাপকে কিন্তু বীরক বাধা দিল না। কেননা, হয়ত সাপটা প্রভুরই কোন অনুচর, এই ভেবে তাকে ছেড়ে দিল।

মুচকি হেসে বীরককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অড়ি দৈত্য গুহায় ঢুকেই পার্বতীর রূপ ধরল। সে বিলক্ষণ জানত, শিব পার্বতীকে কাছে পেলে আর কিছুই চান না। শিব পার্বতীকে দেখে, তপস্যা ছেড়ে যেই তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন, দৈত্য অড়ি অমনি তার নিজের রূপ ধরে আক্রমণ করে বসল শিবকে। শিবও সঙ্গে সঙ্গে ধরলেন রুদ্র মূর্তি। দু-জনের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। গুহা কেঁপে উঠল তর্জনে-গর্জনে। বীরক বেকুব। দুরন্ত লড়াই। কেউই কমতি যায় না। কি হয়···কি হয় ! অড়িকে কোন রকমেই কায়দা করতে না পেরে শেষে শিব তাকে পাশুপত অস্ত্র দিয়ে মারলেন।

পার্বতীর কানে খবরটা যেতেই তিনি রেগে উঠলেন। তাঁর ছেলের মত বীরক, শেষে এমন বেইমানি করল ! আগু-পিছু কোন খোঁজ না নিয়েই তিনি বীরককে অভিশাপ দিয়ে বসলেন—বেইমান, তোর মুখ দেখব না। তুই নরলোকে যা। এখানে আর তোর জায়গা হবে না।

অভিশাপ শুনে বীরক কেঁদে আকুল। সে তো জেনে-শুনে কিছু করে নি। মায়ের আদেশ তো সে লঙ্ঘন করে নি। তবে মা এই অভিশাপ দিলেন কেন ? অভিশাপ দিয়ে অবশ্য পার্বতীর মনটাও এমনিতে একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হওয়াই স্বাভাবিক। ছেলে অন্যায় করলে শাসন করতে হবে ঠিকই, কিন্তু মা কি কখনো একেবারে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন ? তাই বীরক যখন পার্বতীর পায়ে আছড়ে পড়ে প্রকৃত ঘটনা জানাল, তখন পার্বতীর খুবই অনুতাপ হল। বললেন—বাবা, যা বলে ফেলেছি, তার তো আর নড়চড় হবে না। তবে, আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, তপস্যার জোরে তুমি খুব শিগ্গিরই আবার এখানে ফিরে আসবে, আমার

আরও প্রিয়পাত্র হবে।

ঋষি শিলাদ। মস্ত বড় একজন যোগী। যোগশক্তির জোরে তিনি ইচ্ছে করলেই যেখানে সেখানে যেতে পারতেন।

একবার তিনি শিবলোক ঘুরে যমলোকের পথ ধরে যখন ফিরছিলেন, দেখলেন, নরকে তাঁর বাবা ঠাকুর্দা বড় কষ্টে রয়েছেন। দেখে, শিলাদ খুবই অবাক হলেন। কি ব্যাপার ? তাঁর চেয়েও বড় যোগী ছিলেন তাঁরা। সুতরাং নরকে এই অবস্থায় তো তাঁদের থাকার কথা নয়। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, একমাত্র শিলাদের ছেলেই তাঁদের এই দুরবস্থা দূর করতে পারে।

শুনে শিলাদ পড়লেন মহা মুস্কিলে। তিনি বিয়ে-থা করেন নি, তাঁর আবার ছেলে ! পিতৃপুরুষরা বললেন, এ ছাড়া কোন উপায় নেই। শুধু একটা কথা বলতে পারি, শিলাদ, তুমি শিবকে ডাকো, তিনিই সব কিছু ঠিক করে দেবেন।

অগত্যা শিলাদ শিবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলেন। সহজে কি তুষ্ট হন শিব ! কত কাল যে শিলাদের লাগল শিবকে সন্তুষ্ট করতে, তার আর ইয়ত্তা নেই। অবশেষে একদিন সন্তুষ্ট হয়ে শিব এলেন। বর দিলেন—ঠিক আছে শিলাদ। তোমার একটি দিব্য ছেলেই হবে।

ব্যস। বর পেয়ে গেছেন। তপস্যা শেষ। আবার নিজের আশ্রমে ফিরে এসে যাগ-যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন।

একদিন ভাল একটা জায়গা দেখে যজ্ঞের জন্য লাঙ্গল দিয়ে মাটি চষছেন শিলাদ—যেমন করে লাঙ্গল দিয়ে কিষান জমি চষে। খানিকটা চষেছেন, হঠাৎ ঝুরঝুরে মাটির ভেতর থেকে উঠে এল ছোট্ট একটি ছেলে। উঠেই কিন্তু সে শিলাদের দিকে তাকিয়ে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকতে শুরু করে দিল। শিলাদ তো হকচকিয়ে গেলেন। এতদিন এত যজ্ঞভূমি চষেছেন এমন ঘটনা তো ঘটে নি। কোন অপদেবতা আবার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এল না তো ? তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে আসলে একদিন ছেলের জন্য শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেছিলেন এবং শিবের মতই এক ছেলে পাবেন বলে বর পেয়েছিলেন। শিলাদকে হতভম্ব দেখে সঙ্গী ঋষিরাই তা মনে করিয়ে দিলেন। সত্যিই তো। তখন তিনি আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। আর আশ্চর্য, শিশুও মাটি থেকে উঠে পা-পা করে চলে এল একেবারে ঋষির কোলে।

মহাদেবের বরে দিব্য এক ছেলে পেয়েছেন শিলাদ। এবার তাঁর পিতৃপুরুষ নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবেন। মহা আনন্দ তাঁর। দেশ-দেশান্ত থেকে নানা মুনি-ঋষিরাও আসতে শুরু করলেন ছেলেকে দেখতে। সকলেই মহা খুশি। সকলেই প্রাণ খুলে আশীর্বাদ জানান।

কি নাম রাখা হবে ছেলের ?

আনন্দ····আনন্দ। ছেলেকে দেখে সকলেরই মহা আনন্দ। সবার যখন আনন্দই হয়েছে, তখন নাম নন্দীই হোক। সেই থেকে ছেলের নামই হয়ে গেল নন্দী।

ছেলেটি আর কেউ নয়—সেই বীরক। শিব আর পার্বতী যাকে ছেলের মত স্নেহ করতেন। পার্বতীর অভিশাপে সে নরজন্ম ভোগ করতে এসেছে শিলাদের ঘরে।

যাই হোক, ঋষির কুটিরে বড় হতে থাকে নন্দী। যত্নের কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। দারুণ বুদ্ধিমান ছেলে। যা শোনে, সঙ্গে সঙ্গে তা সবই আয়ত্ত করে নেয়। খুব বেশি হলে পাঁচ কি ছয় বছর বয়স। ইতিমধ্যেই অনেক শাস্ত্র তার শেখা হয়ে গেল। শিলাদও ছেলের খুবই মায়ায় পড়ে গেলেন।

নন্দীর তখন সাত বছর বয়স। মিত্রাবরুণ নামে মহাতেজা দুই ঋষি একদিন এলেন। সাধারণত, এঁদের দর্শন পাওয়াই ভার। শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন শিলাদ। যথোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন। নন্দীর সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর নিলেন মিত্রাবরুণ। ছেলে পেয়ে শিলাদের মন ভরেছে কিনা, জ্ঞানার্জন কেমন করছে ইত্যাদি। বেশ ভরা মন নিয়ে শিলাদও তাঁদের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। দারুণ খুশি তিনি। এমন ছেলে শিবের কৃপা ছাড়া মেলে না। বংশের গৌরব। বলে, নিজেও তাঁদের প্রণাম করলেন, নন্দীকেও প্রণাম করালেন। দুই ঋষিও নন্দীকে আশীর্বাদ করলেন। —সুখে থাকুক, গুরুর সেবায় মতি হোক।

শিলাদ তাঁদের আশীর্বাদ লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা আমার ছেলের দীর্ঘ পরমায়ু তো কামনা করলেন না ! কেন ?

মিত্রাবরুণ বললেন—বাপু, কি করে করি। তোমার পুত্রের পরমায়ু যে মাত্র আট বছর। এই বলে ঋষি দু-জন চলে গেলেন।

শিলাদের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। সে কি ! আট বছর বয়সেই তাঁর এমন গুণী ছেলে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে ? হায় ঈশ্বর ! ছেলেই যদি দিলে, তবে এমন ভাবে দিলে কেন ? আর এমন মায়ার বাঁধনেই-বা বাঁধলে কেন ?

শিলাদকে এমন ভাবে ভেঙে পড়তে দেখে নন্দী বলল—আপনি এত দুঃখ করছেন কেন, বাবা ?

—দুঃখ হবে না বাবা ? সত্যদ্রষ্টা দুই ঋষির কথা তো আর মিথ্যা হবার নয়। আর এক বছর বাদে মৃত্যু এসে তোমাকে গ্রাস করবে, তুমি আর আমার কাছে থাকবে না—একথা জানার পর, কোন বাবা সুস্থির থাকতে পারে নন্দী।

—আপনি এর জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না, বাবা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যমের মৃত্যুপাশ আমাকে ছুঁতে পারবে না। তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মৃত্যুকে আমি জয় করব। আমার মৃত্যুও হবে না, জন্মও হবে না। বলল নন্দী।

—কি করে তা করবে, বাবা ? তা কি সম্ভব ?

—কেন সম্ভব নয় বাবা ? তপস্যায় কি না সম্ভব হয় ?

—তা ঠিক। কিন্তু এইটুকু ছেলে তুমি। তপস্যার কতটুকু জান বাবা যে, তপস্যা করবে ? আর কার তপস্যাই-বা করবে, বাবা ?

—কেন, রুদ্রদেবের তপস্যা করব। তাঁর অনুগ্রহ পেলে মৃত্যুর সাধ্য কি যে আমার কাছে আসে ?

—বাবা, হাজার হাজার বছর তপস্যা করে তবে আমি মহাদেবের দর্শন পেয়েছি। তারপর পেয়েছি তোমাকে। মাত্র এক বছরের মধ্যে তুমি কি করে তাঁর দর্শন পাবে ?

—আর কিছু জানি না বাবা, এটুকু জেনেছি নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিভরে ডাকলে, সাধ্য কি তাঁর তিনি দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন। আপনি আমার তপস্যায় যাবার অনুমতি দিন, শুধু দেখি, তাঁর দর্শন পাই কি না। আর মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারি কি না ? বলল নন্দী।

শিলাদ মহাযোগী হয়েও ছেলের মায়ায় এমনি পড়েছেন যে ছেড়ে দিতেও কষ্ট হচ্ছে। তবুও অনুমতি না দিয়ে থাকতে পারলেন

না। চোখের সামনে দিয়ে তাঁর ঐটুকু ছেলেকে যমে টেনে নিয়ে যাবে—বাবা হয়ে তিনি দেখবেন কেমন করে ?

বাবার অনুমতি পেয়ে নন্দী চলে গেল সোজা ভুবনা নদীতে। সেখানে গিয়ে নদীতে স্নান করে জলে দাঁড়িয়েই রুদ্রদেবের নাম-জপে তন্ময় হয়ে গেল। নদীতে কত মানুষ এল, কত মানুষ গেল, কত কোলাহল উঠল, সেদিকে কোন খেয়ালই তাঁর নেই। এমনি ভাবে যখন এক কোটি জপ শেষ করল নন্দী, হঠাৎ একসময় মহাদেব আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। বললেন—নন্দী, বর নাও।

নন্দী বলল—প্রভু, আমাকে আর এক কোটি জপ করার সময় দিন।

—বেশ। বলে মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

আবার এক কোটি নাম-জপ একসময় শেষ হল নন্দীর। মহাদেব এলেন।

—নন্দী, বর নাও।

—প্রভু, আরও এক কোটি নাম-জপ করার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

—বেশ কর। বলে মহাদেব আবার চলে গেলেন।

আরও এক কোটি জপ শেষ হল নন্দীর। জপের প্রভাবে জ্বলজ্বল করে উঠল তার শরীর। মহাদেব এলেন।

—নন্দী, বর নাও।

নন্দী আবার বলল—প্রভু, আরও এক কোটি জপ করার ইচ্ছে হচ্ছে।

মহাদেব বললেন—তিন কোটি জপ ইতিমধ্যেই করে ফেলেছ নন্দী, যা সাধারণত কেউ পারে না। তোমার জপে আমি সত্যিই তুষ্ট। আর জপের কোন প্রয়োজন তোমার নেই। বল, কি তোমার অভিলাষ। তুমি যা চাইবে, আমি তোমায় তাই দেব।

নন্দী তখন আকুল হয়ে মহাদেবকে প্রণাম করল বলল—প্রভু, আপনিই তো সব। আপনিই জগতের স্রষ্টা, পালক। আপনিই ধ্বংস করেন। আবার আপনিই যম। জানি, আপনার স্মরণ নিলে মৃত্যুও তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। যদি কৃপা করার ইচ্ছেই থাকে, তাহলে আমি যেন জন্ম-ব্যাধি-মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি।

মহাদেব বললেন—জপের প্রভাবে যে শক্তি ইতিমধ্যে অর্জন করেছ তার কোন তুলনা নেই। তোমার ক্ষমতা এখন আমারই মত।

এই বলে মহাদেব তাকালেন পার্বতীর দিকে। বললেন—পার্বতী, তুমি কি কিছু বলবে ?

পার্বতী বললেন—আমি কি বলব ? আপনি তো জানেন,



আপনার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। নন্দী তো আমাদেরই ছেলে। আপনি ওকে আশ্রয় দিন।

—ভাবছি পার্বতী, নন্দীকে আমি আমার প্রধান অনুচর করব। তোমার কি মত ?

—এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি থাকতে পারে প্রভু। বললেন পার্বতী।

মহাদেব তখন নন্দীকে বললেন—আমি তোমাকে ক্ষীরোদ সাগর দিচ্ছি। তোমার বাবা, আত্মীয় যে যেখানে আছে তাদের নিয়ে তুমি সেখানে বসবাস কর। সেখানেই রাজত্ব কর। জন্ম-ব্যাধি-জরাহীন হও। আর আজ থেকে তুমি হবে আমার গণাধিপতি। আমার যত অনুচর আছে, সবাই থাকবে তোমার অধীনে।

এই বলে ঈশারা করতেই রুদ্রদেবের যেখানে যত গণপতি ছিল, অনুচরদের নিয়ে এসে হাজির হলেন সেখানে। সবাইকে দেখতে প্রায় শিবেরই মত। সকলেই বিকট বিকট অনুচর। এলেন ভারভূতি, অশ্বাশিব, হর, সোম, অজৈকপাদ, অপাদ, নিকুম্ভ, শঙ্কুকর্ণ, নন্দিক, পিঙ্গাক্ষ, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, ধূম্রকেশ, কুম্ভকর্ণ, বিশ্ববল, ককুদ, কুম্ভ, সপ্তশিরা, অপস্মার থেকে শুরু করে সবাই। সেই সঙ্গে কোটি কোটি বিকটাকার অনুচর।

এসেই প্রভুকে প্রণাম করে তারা বলল—প্রভু, আদেশ করুন, কি করতে হবে। কার মুণ্ড ছিঁড়ে আনতে হবে ? কার যজ্ঞ ধ্বংস করতে হবে ? বলুন প্রভু, কোন সমুদ্রকে শোষণ করে কোন দুরাত্মাকে ধরে আনতে হবে ?

শিব বললেন—থামো....থামো। ওসব কিছু নয়। কেন তোমাদের ডেকেছি শোন। এই যে মহাতেজা নন্দীকে দেখছ, এ আমারই ছেলে। আমারই মত এর ক্ষমতা, এর শক্তি। আমি একে তোমাদের সকলের ওপর শাসন করার অধিকার দিতে চাই।

—আপনার ইচ্ছাই আমাদের কাছে আদেশ।

ইতিমধ্যে লোক-লোকান্তর থেকে দেবতারাও এসে হাজির হয়েছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য—সকলেই এসেছেন। এমন কি নারায়ণও এসেছেন।

সকলের সামনেই গণপতিরা নন্দীর অভিষেক করল। তার আধিপত্য স্বীকার করে নিল। সকলেই প্রণাম জানাল নন্দীকে, যেমন ভাবে প্রণাম জানায় তারা মহাদেবকে।

এরপর মহাদেব দিব্যরূপা, সুলক্ষণা সুষা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে নন্দীর বিয়ে দিয়ে বললেন—আমার অতি প্রিয় বৈভ্রাজ পর্বত তোমাকে দিলাম। তোমার স্ত্রী, পিতা, পিতামহদের নিয়ে ঐ পর্বতে গিয়ে বসবাস কর। মৃত্যুঞ্জয়ী হও।

নারায়ণ আর ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন—বলতে পার, নন্দী আমার আর এক ছেলে। তোমরা যেমন আমায় শ্রদ্ধা কর, পূজা কর, আজ থেকে তোমাদের কাছে এই নন্দীও হবে তাই। মনে রেখো, নন্দী আমার দ্বাররক্ষক। এর অনুমতি ছাড়া আজ থেকে আমার দর্শন আর কেউ পাবে না।

শিবের এত অনুগ্রহ যার ওপর, অন্য দেবতারা কি তার ওপর কিছু বলতে পারেন ? সবাই মেনে নিলেন শিবের আদেশ। নন্দীও সকলকে প্রণাম জানিয়ে বলল—দেবগণ, আপনাদের ওপর আমার যেন ভক্তি থাকে। আমি যেন আপনাদের ভালবাসা পাই।

মহাদেব আর পার্বতীকেও প্রণাম জানাল নন্দী আর সুষা।

বলল—কোন সময়ের জন্যই আপনাদের সেবা থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই।

'তথাস্তু' বলে হর-পার্বতী চলে গেলেন। দেবতারাও চলে গেলেন। খুশি হলেন শিলাদ, তাঁর ছেলের এই অসাধ্য সাধন দেখে। নরকে যে পিতামহরা কষ্ট ভোগ করছিলেন, তাঁরাও শিবলোকে চলে গেলেন।

বাবা শিলাদ আর স্ত্রী সুযাকে নিয়ে পূর্বজন্মের বীরক এ জন্মে নন্দীশ্বর হয়ে চলে এল বৈভ্রাজ পাহাড়ে। শিবের প্রধান পার্শ্বচর আর গণাধ্যক্ষ হয়ে জপশক্তির জোরে আজও নন্দী শিবলোক নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

সোমনন্দীর কাহিনী

দেবী দুর্গা বিন্ধ্যাচলে গিয়ে কৃষ্ণবর্ণা কালীর রূপ ধরে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে মহা অত্যাচারী দুই দৈত্যকে বধ করলেন। এই দুই অসুরকে বধ করতে কালীকে কম কসরৎ করতে হয় নি। সেই যুদ্ধে দেবীর বাহন ছিল এক সিংহ। দেবী তাঁর শক্তি-সাথীদের নিয়ে নিয়ে যেভাবে লড়াই করেছিলেন তাদের সঙ্গে, সিংহও কিন্তু তার থাবা, নখ দিয়ে তেমনি ভাবেই অসুরদের ঘায়েল করেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। দেবতারাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কোথাও আর কোন অশান্তি নেই। দুর্গা তাঁর মানস-কন্যা কালীকে বিন্ধ্যাচলে রেখে ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন—এবার আমি মন্দরে আমার স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছি। আমার মেয়ে রইল, তুমি দেখো। আর আমার এই বাহন সিংহকে কিন্তু আমি নিয়ে চললাম।

ব্রহ্মা শুনে বললেন—সে কি দেবী? আপনি ঐ চতুষ্পদ জন্তুটাকে নিয়ে যাবেন কেন, অমন পবিত্র স্থানে?

—সে কি ব্রহ্মা! বললেন দেবী—যে আমার আপদে বিপদে এমন ভাবে সাহায্য করল, তাকে তুমি চতুষ্পদ জন্তু বলে তুচ্ছ জ্ঞান করছ কেন? ও আমার আশ্রিত, আমাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। তাকে কি আমি আমার কাজ মিটে গেল বলে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি?

ব্রহ্মা বললেন—এর ওপর আমার কিছু বলার না থাকলেও বলতে হচ্ছে। আপনি শুনুন। তারপর আপনার যা অভিরুচি করবেন।

—বল, শুনি।

—দেবী, এই সিংহ কিন্তু সত্যিকারের কোন সিংহ নয়। নিষ্ঠুর এক মায়াবী রাক্ষস। সিংহের ভেক ধরেছে মাত্র। এই নিশাচর কত তপোবন যে বিনষ্ট করেছে, কত ঋষিকে যে প্রাণে মেরেছে, আর কি পরিমাণ খল, আপনাকে আর কি বলব? আপনার অনুগ্রহ পাবার যোগ্যতা এর বিন্দুমাত্র নেই।

—তুমি কোন বেঠিক কথা বল নি ব্রহ্মা। এটা আমারও অজানা নয়। কিন্তু বর্তমানে এ আমার আশ্রিত। আশ্রিতকে কি পরিত্যাগ করা উচিত, তুমিই বল।

ব্রহ্মা বুঝলেন, এর ওপর আর কোন যুক্তি নাই। আশ্রিতকে রক্ষা করাই তো পরম ধর্ম।

ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে বিন্ধ্যাচল ছেড়ে দুর্গা দেবী এবার যাত্রা শুরু করলেন মন্দর পর্বতে। আগে আগে চলেছে সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের মত।

শিব এতদিন একাই ছিলেন মন্দর পর্বতে। দেবী দুর্গা আসতে আবার তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সিংহকে দেখে একটু অবাক হলেন।

—একে আবার কি করতে নিয়ে এলে পার্বতী? এ কি কাজে লাগবে আমাদের?

দেবী বললেন—প্রভু, আমার আপদ-বিপদের একমাত্র সঙ্গী। অত বড় যুদ্ধে কখনও ও আমার কাছ-ছাড়া হয় নি। বরং কত রকম ভাবে যে সাহায্য করেছে, তা আর কি বলব। পুরোপুরি ও এখন আমার আশ্রিত। আমি চাই, আপনি ওর একটা গতি-মুক্তি করুন।

পার্বতীর ইচ্ছে এড়িয়ে যান সাধ্য কি শিবের। ডাকলেন নন্দীকে। বললেন—নন্দী, শোন তোমার মা কি বলছেন। বলছেন, ঐ সিংহকে আমাদের রুদ্র অনুচরের মর্যাদা দিতে হবে। তুমি কি বল?

—মায়ের যখন ইচ্ছে, তখন কি আর কোন কথা চলে প্রভু। অবশ্যই আপনি ওকে রুদ্রমন্ত্র দিন। আমি অবশ্যই ওকে আমাদের অনুচর করে নিচ্ছি।

শিব সিংহকে স্পর্শ করে রুদ্রমন্ত্র দিতেই ঘটে গেল এক অলৌকিক কাণ্ড। কোথায় সেই বিকটাকার চতুষ্পদ সিংহ। সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ সুন্দর পুরুষ। তার গায়ের রং চাঁদের আলোকেও যেন হার মানিয়ে দেয়।

নাম হল তার সোমনন্দী। নন্দীশ্বরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে থেকে গেল মন্দরেই অনুচর হয়ে।

অন্ধক হলেন ভৃঙ্গি

শেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে রাজকার্য থেকে অবসর নিলেন বিষ্ণুভক্ত ধার্মিকাসুর প্রহ্লাদ। সিংহাসনে বসালেন তাঁরই ভাই অন্ধককে।

শিব-প্রসাদে বলীয়ান দানবাধিপতি অন্ধক কিন্তু পরিত্যাগ করলেন না দাদা প্রহ্লাদকে। বসিয়ে রাখলেন সম্মানের উচ্চশিখরে। চলতেন প্রায় তাঁরই পরামর্শমত। হিরণ্যকশিপুর ভাই

হিরণ্যাক্ষ-তনয় অন্ধক ভাল ভাবেই জানতেন বংশের কুলতিলক দাদা প্রহ্লাদকে—তাই উপেক্ষা তাঁকে করতে পারেন নি।

বেশ কিছুকাল কেটে গেল। কোথাও নেই কোন অশান্তি—যেমন পাতালে, মর্ত্যে, তেমনি স্বর্গরাজ্যেও। অমরাবতীতে দেবরাজ্য ইন্দ্রের দিনও কেটে যাচ্ছিল মহা আনন্দে।

হঠাৎ একদিন দেবতাদের ওপর বিজাতীয় ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন অন্ধক। শুধু পাতাল নয়, ত্রিভুবনের ওপর আধিপত্যের প্রবল বাসনা জাগল তাঁর মনে। কি অভাব আছে তাঁর ? ইন্দ্রের তুলনায় কোন দিক থেকে তিনি হীনবল ? কেন তিনি পাবেন না যজ্ঞ ভাগের অধিকার ?

দিতির পুত্র দানবরা আর অদিতির পুত্র দেবতারা যদিও একই পিতা কশ্যপের সন্তান, তবুও দু-জনের মধ্যে বৈরীভাব ছিল চিরকালের। বিশেষ করে দানবরা আদৌ সহ্য করতে পারত না দেবতাদের লোকপ্রিয়তা, তাঁদের সুখ-ঐশ্বর্য। সুযোগ পেলে তো বটেই, তাছাড়াও, যখন-তখন তারা আক্রমণ করে বসত দেবরাজ্য। ফলে যুদ্ধ হতো অনিবার্য, সর্বত্র দেখা দিত চরম বিশৃঙ্খলা।

যুদ্ধ করেছেন প্রহ্লাদও। পরাজিতও করেছেন তাঁদের। কিন্তু একেবারে নির্মূল করতে পারেন নি।

দেবগণের শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে শেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিস্মিত প্রহ্লাদও।

অন্ধকের এসব অজানা ছিল না। তবুও মদমত্ত হয়ে উঠলেন জাতিগত স্বভাবের কুটিল তাড়নাতেই।

দানবপুরে বেজে উঠল ভেরী। ছুটে এল সব বীর যোদ্ধারা। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তর্জনে-গর্জনে প্রমত্ত হয়ে উঠল দানবকুল। রাজা অন্ধকের আদেশ, স্বর্গবিজয়। পাতালে উঠল রণহুঙ্কার। লক্ষ লক্ষ দানব সেনার হুঙ্কারের সঙ্গে হাতির বৃংহতি, ঘোড়ার হ্রেষারব আর বিশালকায় সব রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দে কেঁপে উঠল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।

সুরক্ষিত অমরাবতীর সুরম্য প্রসাদে সুখাসীন দেবরাজ ইন্দ্রের হল সুখাবসান। আক্রান্ত দেবরাজ্য। বিশ্রামের আর নেই অবসর। স্থির থাকতে পারলেন না দেবগণও। দিতির পুত্রদের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকার মত অপমান তাঁদের কাছে আর নেই। ইন্দ্রও জানেন তা বিলক্ষণ। ওদের প্রতিরোধ করতে না পারলে রাজ্য হারিয়ে শ্রীভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে প্রাণভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হবে—তার মত জ্বালা আর নেই।

সসৈন্যে উন্মত্ত অন্ধক তাঁর বিশাল রথে চেপে এগিয়ে আসছেন অমরাবতীর দিকে। আর নেই তিলার্ধ সময়। মোষের পিঠে যমরাজ। শ্যামবর্ণ শিশুমার (শুশুক)-এর পিঠে বরুণ। প্রস্তুত হয়ে এলেন দণ্ড, পাশ নিয়ে। এক এক সাদা ষাঁড়ের পিঠে আয়ুধ নিয়ে ছুটে এলেন একাদশ রুদ্র। অষ্টবসু, দুই অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, কিন্নর, মরুৎ যে যেখানে ছিলেন, সকলেই ছুটে এলেন অমরাবতীতে দিব্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। সমবেত হল অগণিত সুরসেনা। দেবরাজ ইন্দ্র একবার দেখে নিলেন সব কিছু। তারপর নানা রকম আয়ুধের সঙ্গে তাঁর অমোঘ অস্ত্র বজ্র নিয়ে উঠে বসলেন বাহন ঐরাবতের পিঠে। অমরাবতীর আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল দেবরাজের জয়ধ্বনিতে। প্রাসাদ সুরক্ষিত রেখে নিষ্ক্রান্ত হলেন দেবজরাজ স্থির প্রত্যয় নিয়ে।

কিছুটা এগোতেই মুখোমুখি হলেন ওঁরা দানব সেনাদের। দেখলেন রথারোহণে স্বয়ং প্রহ্লাদও এসেছেন সুসজ্জিত হয়ে সংগ্রামে। ভাইয়ের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি প্রহ্লাদ।

মুহূর্ত মধ্যে শুরু হয়ে গেল মহারণ। গজারোহীর সঙ্গে গজারোহীর, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের। একদিকে রণহুঙ্কার, আর একদিকে রণাহত সৈনিকদের মৃত্যুকাতর আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল রণক্ষেত্রের বাতাস। আকাশে শকুনের উল্লাস।

দানবাধিপ অন্ধককে আক্রমণ করেছেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। ধর্মরাজ যম দণ্ড হাতে প্রতিহত করেছেন ধর্মপ্রাণ প্রহ্লাদকে। প্রহ্লাদ-পুত্র দানব সেনাপতি বিরোচনকে আক্রমণ করছেন পাশহস্তে বরুণ। দানব-স্থপতি ময়কে প্রতিহত করছেন দেব বৈশ্বানর। এক এক দিকপাল দেবতা অবতীর্ণ হয়েছেন এক দানব বীরের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে।

দেবাদিদেবের প্রসাদ-পুষ্ট অন্ধককে প্রতিহত করার সামর্থ্য কোথায় ইন্দ্রের। একে একে নিষ্ফল হয়ে গেল তাঁর সব অস্ত্র। তুলে নিলেন এবার অমোঘ আয়ুধ বজ্র। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত সেই বজ্রকে ছুটে আসতে দেখে চকিতে অন্ধক নেমে পড়লেন তাঁর রথ থেকে। সুকৌশলে বজ্রকে এড়িয়ে আয়ুধ হাতে ছুটে গেলেন ইন্দ্রের দিকে। তারপর সবলে এমন ভাবে আকর্ষণ করলেন ইন্দ্র-বাহন বিভীষণ ঐরাবতের দাঁত যে তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেল। ভূমিকম্পের আন্দোলন নিয়ে যেন কেঁপে উঠল ঐরাবত। তার পিঠে কেঁপে উঠলেন ইন্দ্র। নিষ্ফল অমোঘ আয়ুধ, যন্ত্রণাকাতর ঐরাবত—পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মাথা হেঁট করে ফিরে এলেন তিনি



নিজ প্রাসাদে।

ইন্দ্রের সঙ্গে অন্ধকের চলেছে যখন এই নিদারুণ সংগ্রাম, ওদিকে তখন ধর্মরাজের সঙ্গে দুর্ধর্ষ সংগ্রামে মেতে উঠেছেন ধর্মবীর প্রহ্লাদ। প্রায় যখন পর্যুদস্ত যমরাজ, নিক্ষেপ করলেন তাঁর শেষ অস্ত্র—দণ্ড। ভীষণ গর্জনে দণ্ডকে ছুটে আসতে দেখে প্রহ্লাদ সেনার মধ্যে উঠল হাহাকার। সচকিত হয়ে ওঠেন অন্ধক। কালবিলম্ব না করে দ্রুত এগিয়ে এলেন প্রহ্লাদের কাছে। নিতান্ত অবহেলার সঙ্গেই যেন লুফে নিলেন অন্ধক সেই মারাত্মক দণ্ড। তারপর যমরাজকে লক্ষ্য করেই যখন সবেগে সেই দণ্ড ঘোরাতে শুরু করলেন অন্ধক, বিস্মিত হলেন যমরাজ। চকিতে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে নিজেকে বাঁচালেন ধর্মরাজ।

বীর বিক্রমে লড়াই করতে করতে একসময় যখন দানব-সেনাপতি বিরোচন বরুণের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলল, তাঁর সাহায্যে ছুটে এলেন দেববীর অংশুমান। হস্তিপৃষ্ঠে আসীন বিরোচনকে শূন্যে তুলে এমন ভাবে ফেলে দিলেন অংশুমান যে, আঘাতে হত চৈতন্য হয়ে পড়লেন বিরোচন। তাই দেখে দানবকুলের বীর যোদ্ধা জম্ভ, কুজম্ভ, তারক, বৃত্র সরোষে একসঙ্গে আক্রমণ করলেন বরুণকে। বরুণদেব তাঁদেরও পর্যুদস্ত করে ফেললেন দেখে অন্ধক আর স্থির থাকতে পারলেন না। বরুণেরই নিক্ষিপ্ত পাশ, গদা লুফে নিয়ে সজোরে এমন ভাবে ছুঁড়লেন তাঁর দিকে যে নিরস্ত্র বরুণ নিরুপায় হয়ে বাধ্য হলেন চকিতে সাগরগর্ভে আত্মগোপন করতে।

দেব বৈশ্বানরের সঙ্গে তখন ময়ের চলেছে ঘোরতর সংগ্রাম। অগ্নিদেবের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পবনদেব। ময়ের সঙ্গে বীর শম্বর। সব প্রচেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল, দেব বৈশ্বানর নিক্ষেপ করলেন তাঁর শেষ অস্ত্র—হুতাশন-জ্বালা। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন ময় আর শম্বর—যেন দাবদাহে মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন তাঁরা। সবেমাত্র বরুণের সঙ্গে সংগ্রাম শেষ হয়েছে অন্ধকের, কানে এসে বাজল তাঁদের আর্তনাদ। ছুটে এলেন অন্ধক। রুখে দাঁড়ালেন অগ্নিদেব আর পবনকে। শত চেষ্টা করেও অন্ধকের বর্ম ভেদ করে দাবদাহের জ্বালা নিক্ষেপ করতে পারলেন না দেখে স্বীকার করে নিলেন পরাজয়। বাধ্য হলেন রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে।

যুদ্ধ শেষ। দানব-সেনার জয়োল্লাসে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। অধিকৃত হল ভূলোক থেকে স্বর্গলোক। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, অষ্টবসু সকলকেই আজ্ঞাবহ করে দানবাধিপ অন্ধক ফিরে এলেন পাতালে। মহা-সমারোহে তাঁর অশ্মক প্রাসাদে উদ্‌যাপন করলেন বিজয়োৎসব।

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেল নিশ্চিন্তে। সর্বেশ্বর অন্ধক। দেবতারা তাঁর আজ্ঞাবহ। সুতরাং দানবদের আর পায় কে? বিশেষ করে দানব বংশধর তারক, মহিষ আর বাণ চারদিক ঘুরে ঘুরে যা ইচ্ছে তাই করতে শুরু করে দিল। মদমত্ত এই দানবদের অত্যাচারে কেঁপে উঠল পৃথিবীর বুক। নিঃসঙ্গ রাত্রিযাপন হয়ে উঠল অসম্ভব। নিঃশেষ প্রতিরোধের সামর্থ্য। যদিও আজ্ঞাবহ, তবুও স্থির থাকতে পারলেন না দেবতারা। আকুল আর্তি জানাতে লাগলেন তাঁরা পরম ঈশ্বরের কাছে—দুষ্কৃতির দমনের সময় কি এখনও তোমার আসে নি দেব? এখনও কি মানবকুল এমনি ভাবে হতে থাকবে নিগৃহীত? এমনি ভাবেই কি লোপ পেয়ে যাবে তোমার সৃষ্টির সৌন্দর্য?

সেই আকুল আবেদন বুঝি তরঙ্গ তুলেছিল পরমেশ্বরের মনে।



হিমবান-কন্যা শিবের-ঘরনী পার্বতী পুত্র কার্তিক রূপে একদিন আবির্ভূত হলেন সেই পরম শক্তি। তারক আর মহিষের ভবলীলা সাঙ্গ হল।

দুই বংশধরের নিহত হবার সংবাদ কানে আসতেই ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলেন অন্ধক। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি দুরাত্মার সন্ধানে।

ঘুরতে ঘুরতে অন্ধক এলেন এক পার্বত্য-অরণ্যে। ইতস্তত পরিভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পেলেন তরুলতা সমাচ্ছাদিত এক মনোরম স্থান—যেন তপোবন। গাছের ডালে ডালে বিচিত্র ফুলের সমারোহ, আর তারই ভিতর পরিভ্রমণ করছেন এক রমণী। অপরূপা, প্রস্ফুটিত অপরাজিতা যেন। তাঁকে দেখে উদ্দেশ্য ভুলে বিমোহিত হয়ে গেলেন অন্ধক। ফিরে এলেন নিজ প্রাসাদে। ডাকলেন সকলকে। বললেন, জানি না কে সেই রমণী। জানতেও চাই না। আমি সর্বেশ্বর। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের যা কিছু সুন্দর, মনোরম, সব কিছুর ওপর একমাত্র আমারই অধিকার। আমি চাই ঐ রমণীর স্থান হবে আমার অন্তঃপুরে। তোমাদের মধ্যে যে আমার এই ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে, আমি জানব, সে-ই আমার আপনজন।

চুপ করে শুনলেন প্রহ্লাদ। চোখের সামনে মুহূর্তের জন্যে যেন তাঁর ভেসে উঠল পূর্বস্মৃতি। ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তাঁর বুক। উচ্চারণ করলেন অন্ধকের প্রতি সাবধান-বাণী—নিরস্ত হও অন্ধক। অমন চিন্তাও কোরো না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। জানো উনি কে? তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের ঘরনী!'

কামান্ধ অন্ধক। বুঝল না প্রহ্লাদের ইঙ্গিত। তাকে ধিক্কার দিয়ে নিজেই বেরিয়ে গেল পার্বতীর সন্ধানে।

কিছুকাল হল মহাদেব বেরিয়েছেন পৃথিবী পর্যটনে। সখীদের সঙ্গে পার্বতী-রক্ষক মহাদেবের সহচর একমাত্র নন্দী।

উন্মত্তের মত অন্ধককে এগিয়ে আসতে দেখে রুখে দাঁড়ালেন নন্দী। মহাবীর তিনি। তবুও পারলেন না অন্ধকের গতি রোধ করতে। অন্ধকের প্রবল আঘাতে জ্ঞান হারালেন তিনি। আর অন্ধককে পায় কে? রক্ষীহীনা অবলা এবার মুহূর্ত মধ্যে হবে তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। এ কি! একই রমণী যে শত-শত—যেন রণরঙ্গিনী ঘিরে ফেলেছে তাঁকে। দারুণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লেন অন্ধক। এদের মধ্যে কে সেই রমণী, যার জন্য ছুটে এসেছেন তিনি প্রাসাদ ছেড়ে। ইতিমধ্যে অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে চেতনা হারালেন অন্ধক। তারপর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলেন কেউ কোথাও নেই। মনের

গ্লানি চেপে ফিরে এলেন অন্ধক নিজের প্রাসাদে।

আবার সাবধান করলেন প্রহ্লাদ—এ অন্যায়, এ পাপ, এ অধর্ম। ও চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না অন্ধক। ভুলে যেও না, তুমি সর্বেশ্বর, তুমি ধর্মের রক্ষক। ইনি জগৎ-জননী, তোমারও জননী। হিরণ্যাক্ষ তোমার পিতা হলেও তোমার যথার্থ পিতা হলেন স্বয়ং মহাদেব।

লোভের যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই কামনারও।

প্রহ্লাদকে প্রচণ্ড ধমক লাগালেন অন্ধক—'থামো তুমি। রাখো তোমার ঐসব আজগুবি কথা। ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম! থাকো তুমি তোমার ধর্ম-কর্ম নিয়ে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমায় মাথা ঘামাতে



হবে না।'

ডাক দিলেন শম্বরকে। বললেন—এখনই তুমি মন্দর পাহাড়ে যাও। শিবকে বলবে, কে তাকে সেখানে থাকার অনুমতি দিয়েছে। যদি মন্দরেই সে থাকতে চায়, তাহলে একটা শর্তেই মাত্র থাকতে পাবে। তা হল, তার ঘরনীকে পাঠাতে হবে আমার অন্তঃপুরে। কারণ, আমি সর্বেশ্বর।

যথারীতি শম্বর গিয়ে নিবেদন করল মহাদেবকে অন্ধকের কথা। পাশে পার্বতী। চুপ করে সব শুনলেন মহাদেব। তারপর বললেন—দেখ, ইন্দ্র আমাকে এখানে থাকার অধিকার দিয়েছে। তার অনুমতি না নিয়ে তো আমি মন্দর ছাড়তে পারি না। আর পার্বতীর কথা? ওঁকে আটকে রাখার সাধ্য কি আমার। উনি যদি ইচ্ছা করেন, যাবেন।

পার্বতী বললেন—যেতে পারি একটা শর্তে। সম্মুখ-যুদ্ধে তোমার রাজা অন্ধক যদি মহাদেবকে নিহত করতে পারেন, তবে।

শম্বরের মুখে সামান্য এ নারীর দম্ভোক্তি শুনে পৌরুষে আঘাত লাগল অন্ধকের। কোথায় ছাই-ভস্ম মাখা সর্প-বিভূষণ এক ষাঁড়-বাহন! তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তাঁকে? সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেল যেন অন্ধকের। হাঁক দিলেন—দুর্যোধন, বাজাও ভেরী। ডাকো সকলকে। ঐ ভিক্ষুকের দম্ভ আজই চূর্ণ করতে হবে।

বেজে উঠল ভেরী। রণসাজে সজ্জিত হয়ে সদলবলে ছুটে এলেন জম্ভ, কুজম্ভ, কালনেমি, কালনাশন, তুণ্ড, তুহুণ্ড, পাক, বিপাক, বলি, শম্বর। প্রস্তুত হয়ে নিল দুর্যোধনও। আকাশ-বাতাসে তুফান তুলে রথারোহণে বিশালকায় অন্ধকের সঙ্গে মন্দর পর্বতে বাহিনী চলল রণে।

দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রহ্লাদ। ভাবে, বুঝি-বা আর একবার প্রমাণিত হতে চলেছে, নিয়তি কারো বাধ্য নয়। নিয়তি শোনে না কারও কথা। অন্ধক তো তাঁর অবাধ্য নয়, তাহলে? ভেসে ওঠে প্রহ্লাদের চোখের সামনে আর একবার সেই পূর্বস্মৃতি।

অপুত্রক খুল্লতাত হিরণ্যাক্ষ। দিন কাটাচ্ছিলেন অসীম যন্ত্রণায়। বংশ কি তাঁর লোপ পেয়ে যাবে? তাঁরই পরামর্শে তাঁর খুল্লতাত করেছিলেন মহাদেবের উদ্দেশ্যে মহাযজ্ঞ। সন্তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেব। বরদাতা মহাদেবের চোখ কৌতুকে টিপে ধরেছিলেন তাঁরই কন্যা। সেই বদ্ধ দৃষ্টিপথে মূর্ত হয়েছিল যে ঘোর অন্ধকার, তাকেই মহাদেব তুলে দিয়েছিল হিরণ্যাক্ষের হাতে। বলেছিলেন—পুত্রের মত একে লালন পালন কর হিরণ্যাক্ষ। আজ থেকে এই হল তোমার পুত্র অন্ধক। আমার প্রসাদে এই পুত্র হবে অজেয়। কিন্তু যেদিন সে বিস্মৃত হবে শিষ্টাচার, সেদিন ওকে আমি সংহার করব।

আজ সেই শিষ্টাচার বিস্মৃত হয়েছে অন্ধক। এই সেই নিয়তিরই খেলা। তবুও প্রহ্লাদের মনে জাগে বংশধরের প্রতি মায়া। কিন্তু কি করার আছে আর তাঁর?

অন্ধকের রণভেরী প্রতিহত হল মন্দার পর্বতে। ওদিকে নন্দীকে ডাকলেন মহাদেব। বললেন—এবার সামাল দাও। ডাকো তোমার অনুচরদের।

মৃদু হাসলেন নন্দী। তারপর ডাক পাঠাতেই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাজির হল কোটি-কোটি অনুচর। সবাই শিবের অনুগামী। সুবিশাল ব্যূহ রচনা করল তারা মন্দর পর্বতের কন্দর ঘিরে।

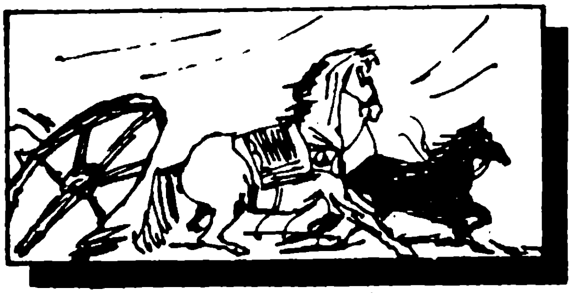
অন্ধক সেনারা এগিয়ে আসতেই 'মার' 'মার' শব্দে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রমথ সেনারা। বেধে গেল তুমুল সংগ্রাম। কখনো দানব-সেনার উল্লাসধ্বনি, কখনো প্রমথ সেনার। সতর্ক দৃষ্টি রেখে এবার বীর বিক্রমে লড়াই করে চলেছেন নন্দী। বয়ে চলেছে রক্তের নদী। থরে থরে লুটিয়ে পড়তে থাকে দানব-সেনা, প্রাণহীন দেহ নিয়ে। প্রাণ হারাল জম্ভ থেকে শুরু করে বলি পর্যন্ত বীর যোদ্ধারা। ছত্রভঙ্গ দানব-সেনা। আঘাতে আঘাতে জর্জর হয়েছে দানবাধিপ অন্ধক নিজেও। বিঘ্ননাথ বিনায়ককে নিয়ে মহাদেব শুধু পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন তখনও।

ত্রিলোকের অধিপতি হয়ে সামান্য এক ভিক্ষুকের কাছে এই পরাজয়! শুধু পরাজয় নয়, প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল দানবকুল। কেমন করে সম্ভব হল এমন এক অসম্ভব ব্যাপার? তবু বাস্তব। চিন্তান্বিত হন অন্ধক। এই গ্লানি নিয়ে কেমন করে তিনি ফিরে যাবেন প্রাসাদে? ঠিক সেই সময়েই অন্ধকের মনে পড়ে যায় দানব-কুলগুরু ভার্গবকে। রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে লহমার মধ্যে অন্ধক এসে উপস্থিত তখন ভার্গবের কাছে—প্রায় নির্মূল আমাদের কুলকে একমাত্র বাঁচাতে পারেন আপনি। রক্ষা করুন আমাদের। গুরুদেব, রক্ষা করুন।

স্বয়ং মহাদেব ছাড়া একমাত্র ভার্গবই জানতেন সঞ্জীবনী বিদ্যা, যা প্রাণহীন দেহে করতে পারত প্রাণ-সঞ্চার।

দানবাধিপের প্রার্থনায় ভার্গব এলেন রণক্ষেত্রে। তাঁকে নিরালা এক জায়গায় সুরক্ষিত করলেন দানব কুলের তখনো জীবিত মহাবল যোদ্ধারা। প্রয়োগ করলেন ভার্গব তাঁর অধীত বিদ্যা। সঙ্গে সঙ্গে থরে থরে পড়ে থাকা নিষ্প্রাণ দানবসেনারা সপ্রাণ হয়ে উঠল—যেন সদ্য বিশ্রাম-শেষে আবার অবতীর্ণ হল যুদ্ধক্ষেত্রে।

আর একটিও দানবসেনার প্রাণ লুটিয়ে পড়ে না। যদিও বা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে শুরু করে যুদ্ধ। প্রমাদ গুনল প্রমথ



সেনারা। শুক্রাচার্য যদি এভাবে সকলকে বাঁচাতে থাকেন তাহলে সর্বনাশের আর শেষ থাকবে না।

সব শুনলেন মহাদেব। তারপর নন্দীকে ডেকে বললেন—যাও নন্দী, যেমন করে পার ভার্গবকে বৃাহ থেকে তুলে নিয়ে এসো।

মহাদেবের আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন নন্দী। নন্দীকে আসতে দেখে আরও সজাগ হয়ে উঠল মহাবল দানবরা। প্রতিহত করার চেষ্টা করল নন্দীকে। প্রচণ্ড আঘাতে আহত হলেন নন্দী। তবুও প্রায় ছোঁ দিয়ে শূন্য পথে ভার্গবকে তুলে নিলেন নন্দী। বিস্রস্ত হয়ে গেল ভার্গবের কটিবসন, বিশৃঙ্খল হয়ে গেল জটাভার। সেই অবস্থায় নন্দী তাঁকে আনা মাত্রই মহাদেব নিজের উদর মধ্যে তাঁকে বন্দী করলেন।

শুরুদেব নেই। নেই আর সঞ্জীবনীর দুর্জয় সাহস। প্রমথ সেনার হুঙ্কারে এবার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল দানবসেনা। উদভ্রান্ত, প্রায় উন্মাদ অন্ধক এবার রথ থেকে একের পর এক বাণ ছুঁড়তে লাগলেন মহাদেবকে লক্ষ্য করে। আঘাতের পর আঘাত এসে আছড়ে পড়তে লাগল মহাদেবের সর্বাঙ্গে। দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। জনার্দনের গদার আঘাতে প্রাণ হারাল অন্ধকের রথের ঘোড়া; ষড়ানন কার্তিক ভূমিসাৎ করলেন রথের সারথিকে; বিনায়ক চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন অন্ধকের সুবিশাল রথ।

আর রথ নেই অন্ধকের। নেই সেই দুর্জয় ধনুক-বাণ। তবু গদা হাতেই সক্রোধে ছুটে এলেন তিনি মহাদেবকে লক্ষ্য করে। কিন্তু পেলেন না আঘাত হানার সুযোগ। কাছাকাছি আসতেই মহাদেব ত্রিশূলে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে তুলে ধরলেন শূন্যে—যেন আতপ-প্রতিরোধক বিশালকায় কালো ছাতা। রক্তের ধারা নদীর মত বয়ে গেল মহাদেবের সর্বাঙ্গ সিক্ত করে মন্দরের ধাপে ধাপে। সোল্লাসে তা আকণ্ঠ পান করল শিবার দল।

ভীষণ রুদ্র মূর্তি তখন মহাদেবের। ঊর্ধ্বমুখ তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে ধকধক করে জ্বলছে আগুন অন্ধকের দিকে। ওপর থেকে তাঁর পিঠে এসে পড়ছে মার্তণ্ডের উত্তাপ। সেই অবস্থাতেই মহাদেব তাঁকে নিয়ে ভীমবেগে ঘুরলেন সারা ভুবন।

ত্রিশূলের ডগায় তখনো ধুকধুক করছে অন্ধকের প্রাণ। ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছেন তিনি। তাপদাহে ক্রমশ শুকিয়ে আসছে তাঁর মেদবহুল শরীর।

তারপর যখন নামালেন, কে বলবে, এই সেই বিশালদেহী দুর্ধর্ষ দানবাধিপ অন্ধক। মাত্র অস্থি চর্মসার। কোটরাগত দুটি চোখে নীরব করুণ আবেদন। অনুশোচনাতেও ইতিমধ্যে দগ্ধ হয়ে গেছে অন্ধকের হৃদয়।

সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবার মহাদেব অন্ধকের দিকে। সেই দৃষ্টির প্রসাদেই আবার নতুন সৌম্য কলেবরে উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধক প্রণতি জানালেন মহাদেবকে।

বাৎসল্যের স্নেহ যেন ঝরে পড়ল মহাদেবের কণ্ঠ হতে—আজ থেকে তুমি আর দানবরাজ অন্ধক নও। তুমি আমার পুত্র, আমার অনুচর, নন্দীর দোসর গণাধিপ। তুমি হলে আমার ভৃঙ্গী।

রাজা শতানীকের মুক্তি

জম্বু দ্বীপের রাজা শতানীক। অত বড় রাজা, বুঝি-বা সে সময় পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন না। তাঁর ছিল শত শত চতুরঙ্গ বাহিনী। স্বভাবতই অন্যান্য রাজারা তাঁকে ভয় করেই চলতেন। বিদ্রোহ করার সাহস কেউ পেতেন না। তাঁর রাজ্যে প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধির সীমা-পরিসীমা ছিল না।

কোথাও কোন অশান্তি নেই, বিদ্রোহ নেই, প্রজাদের মধ্যে কোন ক্ষোভ নেই, তাই রাজার মনেও কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। নিজে শাস্ত্রাদি পড়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, ধর্মপথে থাকতেন, অতিথি কেউ এলে তাঁর সেবার ত্রুটি রাখতেন না, যাগ-যজ্ঞ-হোম যাতে ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্ত মনে করতে পারেন, তার জন্য ইচ্ছেমত দান-ধ্যান করে তাঁদের উৎসাহ দিতেন।

সকলেরই মুখে এক কথা—এমন রাজা ভাগ্যে মেলে।

সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর একদিন রাজা শতানীক মারা গেলেন। রাজা হলেন তাঁর ছেলে সহস্রানীক। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সব প্রজারই দৃঢ় বিশ্বাস, যে রাজার এত দান, যে রাজা ধর্মপথে থেকে সব প্রজাকেই ছেলের মত পালন করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গে গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করছেন। সহস্রানীকের কাছেও সেই একই প্রত্যাশা সকলের। রাজা শতানীকের মত তিনিও দেখবেন সকলকেই। দান-ধ্যান, যাগ-যজ্ঞ অব্যাহত রাখবেন।

কিন্তু রাজা সহস্রানীক হয়ে গেলেন একটু অন্য প্রকৃতির। হাত গুটিয়ে নিলেন প্রায় সব কিছু থেকে। ব্রাহ্মণরা আসেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যান। প্রতিদিন হোমকুণ্ড জ্বেলে যাগ-যজ্ঞ করার সামর্থ্য কোথায় গরিব ব্রাহ্মণদের, যদি রাজার সাহায্য না থাকে।

সহস্রানীক যে এমন হবেন, কেউ ভাবতেও পারেন নি। বারবার বিফল হয়ে প্রায় অনেক ব্রাহ্মণই জম্বুদ্বীপ ছেড়ে অন্য রাজার আশ্রয়ে গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। প্রজারাও তেমন সুখে আর থাকতে পারে না। হোম হয় না যে ধোঁয়া উঠবে, ধোঁয়া আর ওঠে না যে আকাশে মেঘ জমবে, হবে বৃষ্টি। ফলে সর্বত্রই শুরু হয়ে গেল এক অনাসৃষ্টি। বৃষ্টি নেই যে চাষ-বাস হবে, অভাব মিটবে মানুষের।

দান নেই রাজার যে তার দৌলতে কোন রকমে জীবন ধারণ করবে সকলে। ফলে, যা হবার তাই হল। সুসমৃদ্ধ জম্বু দ্বীপ ক্রমশ শ্মশান হতে লাগল। প্রজারাও চলে যেতে শুরু করল অন্য রাজ্যে জীবিকার জন্য। সর্বত্রই কেমন যেন এক বিশৃঙ্খলা। সহস্রানীক দেখে-শুনেও চুপচাপ।

মাত্র কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ তখনও ছিল রাজ্যে।

একদিন সবাই মিলে জোট বেঁধে এল রাজার কাছে আবেদন নিয়ে।

—রাজা দান করুন, যাতে আমরা যাগ-যজ্ঞ করতে পারি। আপনার মঙ্গল হবে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—আমার কি রকম মঙ্গল হবে।

—রাজা, দান হল বড় ধর্ম। আপনি সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন না। দানে স্বর্গলাভ।

রাজা সহস্রানীক বললেন—আপনারা তো সব তেজস্বী ব্রাহ্মণ। বলতে পারেন, আমার বাবা তো মস্ত বড় দানবীর রাজা ছিলেন। তিনি এখন কোথায় কিভাবে আছেন?

রাজার কথায় ব্রাহ্মণরা পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। নিজের চোখে কিছু না দেখে বলা, মানে মিথ্যা বল। ব্রাহ্মণ হয়ে মিথ্যা বলা তো উচিত হবে না। আর নিজেদের মধ্যে কেই বা এমন আছেন যে, ঠিক ঠিক ভাবে খবর নিয়ে আসতে পারেন? কেউ নেই। মুষড়ে পড়লেন ব্রাহ্মণরা। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন যে যাঁর ঘরে।

এরপর কি করবেন তা বসে বসে ভাবছেন ব্রাহ্মণরা, এমন সময় কোথা থেকে এসে হাজির হলেন আর এক ব্রাহ্মণ।

অতিথি এসেছেন দ্বারে। কিন্তু, এমন সামর্থ্য নেই ব্রাহ্মণদের যে তাঁকে সমাদর করেন। তারই মধ্যে যেটুকু ছিল, তাই দিয়েই কোন রকমে অতিথি সৎকার করলেন তাঁরা।

তারপর কথায় কথায় ব্রাহ্মণদের বিমর্ষ হয়ে থাকার কারণ জানতে পেরে আগন্তুক ব্রাহ্মণ বললেন—আপনারা এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে না। এখানেই একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি ইচ্ছে করলে ত্রিভুবন ঘুরে সব খবর এনে দিতে পারবেন। আপনারা তাঁকে গিয়ে ধরুন।

এই বলে ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। কে তিনি? কেউ তাঁর পরিচয় নেবারও সুযোগ পেলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং সূর্যদেব। যাগ-যজ্ঞ বন্ধ আর ব্রাহ্মণদের কষ্ট দেখে তিনিই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে এসেছিলেন তাঁদের কাছে।

ব্রাহ্মণরা এবার সন্ধান নিতে শুরু করলেন, কোথায় সেই মহাযোগী। রাজ্য ছেড়ে, তাঁরা কয়েক জন ছাড়া, সবাই তো চলে গেছেন।

খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এক সময় সেই ব্রাহ্মণের দেখা পেলেন। নদীর ধারে তপোবনের মত ছোট্ট একটু জায়গায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক শীর্ণকায় যোগী প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে মগ্ন। কোন বাহ্যজ্ঞান তাঁর নেই। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন দেখে ব্রাহ্মণরা তো অবাক। কে জানে, কতদিন তিনি এখানে এভাবে আছেন! ইনি হলেন ঋষি ভার্গব।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন ব্রাহ্মণরা তাঁকে ঘিরে। যোগীর ধ্যানও ভাঙে না, ব্রাহ্মণরাও আবেদন রাখতে পারেন না।

প্রায় সূর্যাস্ত। ঋষির ধ্যান ভাঙল। সামনেই ব্রাহ্মণদের দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাধ্যমত ফল মূল দিয়ে আপ্যায়ন জানালেন। তারপর জানতে চাইলেন, তাঁদের এখানে আসার কারণ।

রাজা সহস্রানীক তাঁদের যে কথা বলেছিলেন, তাঁরাও তা ভার্গবকে শুনিয়ে বললেন—যেভাবেই হোক, আপনি এই উপকারটুকু আমাদের করুন। রাজা শতানীক কোথায় কিভাবে আছেন, তা দেখে এসে রাজাকে বলুন, যাতে আমাদের মর্যাদা থাকে।

ব্রাহ্মণদের আবেদন শুনে ভার্গব প্রথমে একটু চিন্তায় পড়লেন। নিজের কাজ, জপ-তপ ছেড়ে এদিকে গেলে যে তাঁর অনেকখানি সময় নষ্ট হয়ে যাবে। আবার পরের উপকার করা—সে-ও এক বড় ধর্ম।



অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন ভার্গব। ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—ঠিক আছে, আপনারা যান। রাজা শতানীককে আমিও জানি। ধার্মিক, দানী। স্বর্গলোকে তিনি কোথায়, কিভাবে আছেন, তা দেখে আপনাদের নিয়ে সহস্রানীককে তা আমি জানাচ্ছি।

ব্রাহ্মণরা নিশ্চিন্ত মনে চলে গেলেন। ভার্গবও সূর্যদেবকে স্মরণ করে যোগবলে চললেন আকাশ-পথে। ক্রোশের পর ক্রোশ শূন্য পথ পেরিয়ে ঘুরে বেড়ালেন স্বর্গলোকের দ্বারে দ্বারে। কিন্তু কোথায় রাজা শতানীক?

হতাশ হয়ে ভার্গব এবার চললেন নরকের পথে। আবার সেই ক্রোশের পর ক্রোশ পথ। সামনে সূর্যদেব। যেন তিনিই সামনে থেকে ভার্গবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিছুটা যেতে অশরীরী এক ব্রাহ্মণ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন।

—প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা না রেখে এখন যাচ্ছ কোথায় ভার্গব?

—কে তুমি? কিসের প্রতিশ্রুতি? জিজ্ঞেস করেন ভার্গব।

—বা রে! এরই মধ্যে ভুলে গেলে? মনে করে দেখ তো, কাউকে কি কখনো কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি তুমি দাও নি।

ভার্গবের মনে পড়ে গেল। সত্যিই তো, এক ব্রাহ্মণকে একবার কিছু অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাখতে পারেন নি। বারবার ঘুরিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ভার্গব বললেন—কিন্তু এখন এখানে কিভাবে তোমার প্রতিশ্রুতি রাখব। পথ ছাড়, পরে দেব।

—ওসব কথা মর্ত্যধামেই চলে ভার্গব, এখানে নয়। প্রতিশ্রুতি না রাখা মহাপাপ। তখন যা চেয়েছিলাম আর তুমি দেবে বলেছিলে, তা এখানে দিতে পারবে না ঠিকই, তার বিনিময়ে তোমার তপস্যার

সিকি ভাগ আমায় দাও, তাহলে আমার আর কোন দাবি থাকবে না। তুমিও মুক্ত হবে। বলল অশরীরী।

এ তো বেশ দাবি ! তা সম্ভব নাকি ? অনেক কষ্টের ফসল। দিতে থাকলে যে নিজেকেই ফোঁপরা হয়ে যেতে হবে। আর কতটুকুই-বা অর্জন করেছেন যে, তা থেকে দেবেন। ভার্গব রাজি নন, অশরীরীও নাছোড়। আবার অপর এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সূর্যদেব এসে মধ্যস্থতা করে ভার্গবকে মুক্ত করলেন। বললেন—না ভার্গব, যার যা প্রাপ্য, তাকে তা না দেওয়া মহাপাপ। দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলে যাওয়ায় ঘোরতর পাপ। এই পাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে তোমার তপস্যা তোমাকে কোন ফলই দেবে না।

আবার কিছুটা পথ যেতেই, পথ আগলে দাঁড়াল এক রাখাল।

—বলি, ও ঠাকুর, আমার পাওনা মিটিয়ে না দিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?

থমকে দাঁড়ান ভার্গব—কিসের পাওনা ?

—বারে ? আমি তোমার মাঠে গরু চরাতুম। মজুরি দেবে বলেছিলে, অথচ দিলে না। ভুলে গেলে এরই মধ্যে ? দেখা যখন পেয়েছি এখানে আদায় না করে আর ছাড়ছি না। বলে রাখাল।

—কিন্তু এখানে তা তোমায় কোথা থেকে দেবো ?

—না পার, তোমার পুণ্যের ভাগ দাও।

নিরুপায় ভার্গব। রাখালকেও তাঁর অর্জিত পুণ্যের কিছুটা ভাগ দিয়ে তবে পথ পেলেন।

এরপর যত এগোন ততই আসে অবরোধ। পৃথিবীতে অর্থের বিনিময়ে যারা তাঁর কাজ করেছিল একে একে সকলেই তাঁকে আটকায়, আর দাবি জানায় পাওনার। ভার্গব পড়েন এমন বিপদে যে না পারেন পিছিয়ে আসতে, না পারেন এগিয়ে যেতে। প্রত্যেকেই তাঁর সঞ্চিত পুণ্যের ভাগ নিয়ে তবে পথ ছাড়ে।

শেষে ভার্গবের এমন অবস্থা হল যে সব শক্তি শেষ। একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন, এগিয়ে যাবার ক্ষমতাটুকুও প্রায় লোপ পেয়ে গেল।

ভার্গবের দুরবস্থা দেখে আবার ব্রাহ্মণের বেশে এগিয়ে এলেন সূর্যদেব। শক্তি যুগিয়ে তাঁকে নিয়ে চললেন নরকের ওপর দিয়ে।

ভার্গব দেখেন—কত শত আত্মা যে কি কষ্ট করছে, বিকট যন্ত্রণায় যে কি পরিমাণ আর্তনাদ করছে। দেখতে দেখতে যেতে যেতে হঠাৎ ভার্গবের চোখ আটকে গেল একটা নোংরা ভরতি বিরাট জালার মত একটা বস্তুর দিকে। সেই নোংরার ভেতরও কে হাবুডুবু খাচ্ছে। খুব যেন চেনা মুখ। কাছে এগিয়ে আসতেই ভার্গব দেখেন, রাজা শতানীক।

বিস্ময়ে হতবাক ভার্গব। এই অবস্থায় যে অমন ভাবে রাজাকে দেখবেন, এ তিনি ভাবতেই পারেন নি।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ভার্গব—এ কি রাজা, এত বড় ধার্মিক, এত বড় দানবীর আপনি। পৃথিবীতে আপনার এত যশ, এত সুনাম। কিন্তু আপনার এ অবস্থা কেন ?

শতানীক বললেন—দানের চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই, সত্যি ; কিন্তু আমার সবই বিফল হয়ে গেছে। এখানে এসে বুঝতে পারছি, দানের নামে আমি যা করেছি, তা প্রজাদের কাছ থেকে নানাভাবে আদায় করে তাদের মধ্যেই বিলিয়েছি। তাতেই আমার যশ, সুখ্যাতি। আসলে কিন্তু যাকে দান বলে, আমি তা করি নি। নিজে গায়ে-গতরে পরিশ্রমও করি নি, অর্থও রোজগার করি নি। অন্যের অর্থ নিয়ে নিজের নাম কিনেছি। একে ধর্ম বলে না, ঋষি। আজ এখানে তারই ফলভোগ করছি। আমার ছেলেকে গিয়ে বল, সে যেন আমাকে এই নরক যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে।

ভার্গব ব্রাহ্মণদের কাছে ফিরে এসে তাঁদের নিয়ে গেলেন রাজা সহস্রানীকের কাছে। তাঁর বাবা রাজা শতানীককে কোথায় কি অবস্থায় তিনি দেখে এসেছেন, সেই সঙ্গে রাজা শতানীক তাঁকে যা বলতে বলেছিলেন, সবই ভার্গব রাজাকে শোনালেন।

শুনে সহস্রানীক চমকে উঠলেন। সর্বনাশ ! তিনিও যে সেই একইভাবে প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছেন, সাধুসঙ্গ করছেন না। তাহলে মৃত্যুর পর তাঁর পরিণতিও কি শতানীকের মত হবে ? ভেবে এক সময় ভার্গব আর ব্রাহ্মণদের রাজ্যে রেখে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন। কোথায় যে যাচ্ছেন, তা মন্ত্রীদেরও বললেন না।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় অন্য এক রাজার রাজ্যে এসে দেখেন এক জায়গায় বিরাট একটা পুকুর কাটানো হচ্ছে। বহু জনমজুর লেগেছে তাতে। পথে পথে রোদে-জলে ঘোরার ফলে এমনিতেই রাজার দেহে আর সেই জৌলুস ছিল না। মুখটাও ঢেকে গিয়েছিল দাড়ি-গোঁফে। মজুরদের দলে গিয়ে সহজেই নাম লেখালেন তিনি। সকলের সঙ্গে মাটি কাটতে শুরু করলেন। পুকুর-কাটা যখন শেষ হয়ে হল, ছুটি হয়ে গেল মজুরদের ; তখন সহস্রানীকের ছুটি হল। পরিশ্রম করে মজুরি হিসেবে যথেষ্ট সোনাদানা রোজগার তিনি করেছিলেন। সেগুলি নিয়ে এক সময় আবার নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

রাজা ফিরে এসেছেন। অমাত্যরা খুশি। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে রাজার ! ভার্গবও ছুটি পেলেন। নিজের রোজগার করে আনা অর্থ এবার রাজা দু-হাতে দান করতে শুরু করলেন ব্রাহ্মণদের। ফলে, যা হবার তা-ই হল। নরক-কুণ্ড থেকে মুক্তি পেলেন শতানীক।

একমাত্র ভার্গব ছাড়া কিন্তু কেউই বুঝতে পারেন নি রাজা সহস্রানীকের এই রকম অজ্ঞাতবাসের কারণ।

সত্যের প্রতিশ্রুতি

খুবই শান্ত তপোবন। নিশ্চিন্তে চলেছে যজ্ঞ কাজ। মহামুনি ভরদ্বাজ ছেলেকে নিয়ে একসঙ্গে বসে বেদপাঠ করছেন। কি মধুর সেই বেদধ্বনি ! যজ্ঞভূমিতে এসে রয়েছেন রাজার অনুরোধে বড় বড় সব মুনিরা, তাঁদের ছেলে, ছেলের বউ সকলকে নিয়ে।

এঁদেরই মধ্যে ছিলেন রৈভ্য নামে এক মুনি। মহাতেজা, মহাগুণী। তাঁর দুই ছেলে। একজন প্রায় বাবার সঙ্গে সঙ্গেই থেকে সব সময় যাগ-যজ্ঞ করত। আর একজন, নাম তার পরাবসু, বেশির ভাগ সময় শিকার করেই কাটাত। যুবক পরাবসু। তার স্ত্রীও ছিল তেমনি সুন্দরী।

রৈভ্য মুনির বন্ধু ভরদ্বাজ। তাঁরই ছেলে, নাম তার যবক্রীত। মুনিপুত্র হলে কি হবে, তার মতি ছিল দারুণ চঞ্চল। পরাবসুর পত্নী একদিন একা একা বনে বেড়াচ্ছে, দেখে যবক্রীত হঠাৎ তাকে কিছু কটূ মন্তব্য করে বসল। সে-ও গিয়ে তার শ্বশুর রৈভ্যকে বলতেই মুনি তো রেগে আগুন। কি , এতবড় স্পর্ধা যবক্রীতের যে তাঁর পুত্রবধূর অপমান করে! যজ্ঞ তো চলছিলই, রৈভ্য নিজের মাথা থেকে জটা কেটে আগুনে আহুতি দিতেই, আগুন ভেদ করে উঠে এল এক পিশাচ। কি ভয়ঙ্কর তার মূর্তি। উঠেই রৈভ্যকে বলল—প্রভু, আদেশ করুন। রৈভ্যও সঙ্গে সঙ্গে বললেন—'যাও, দুরাত্মা ঐ যবক্রীতকে বধ কর।' আরকোন কথা নয়। সেই পিশাচ ত্রিশূল হাতে যবক্রীতকে ধরে মেরে ফেলে চলে গেল।

রৈভ্য পিশাচ দিয়ে যবক্রীতকে মেরেছেন শুনে বাবা ভরদ্বাজ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন ছেলের মৃতদেহের কাছে। একমাত্র ছেলে তাঁর, মুনির কোপে পড়ে মারা গেল। দুঃখ কি তাঁর কম! বন্ধু হয়ে রৈভ্য তাঁর এই সর্বনাশ করল! মৃতদেহ ফেলে তিনি গেলেন রৈভ্যের কাছে। বললেন—বন্ধু হয়ে তুমি আমার যে সর্বনাশ করেছ, এর ফল তোমাকেও ভোগ করতে হবে রৈভ্য। আমিও বলছি, তুমি তোমারই ছেলের হাতে মরবে।

এই বলে চিতা সাজিয়ে ছেলে যবক্রীতের সঙ্গে তিনিও একই চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হলেন।

শুনে রৈভ্য মুনির মন দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। যজ্ঞের কাজ-কর্ম সেরে নিজের ঘরে ফিরছেন তিনি, প্রচণ্ড শীত। কৃষ্ণসার এক হরিণের ছাল দিয়ে মাথা পর্যন্ত ঢেকে থুপ থুপ করে বনের বন ধরে তিনি আসছেন এক মনে। পরাবসু তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়েছিল শিকারে। কোথাও কোন শিকার না পেয়ে ফিরতে যাবে, দেখে, আসছে এক কৃষ্ণসার হরিণ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের আড়াল থেকে লক্ষ্য করে মোক্ষম বাণ ছুঁড়ল। বাণ গিয়ে বিঁধল সোজা রৈভ্য মুনির বুকে। তিনি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন।

পরাবসু দেখে খুব ঘাবড়ে গেল। এক ভাই তখনও রাজার যজ্ঞশালায়। বাবা যখন মারা গেলেন, তখন সৎকার করতেই হবে। কাঠ-কুটো যোগাড় করে চিতা সাজিয়ে সেখানেই দাহ কাজ সেরে সকাল হতেই পরাবসু গেল ভাইয়ের কাছে। ভাইকে সব বলল। চুপ করে শুধু শুনল ভাই। কোন মন্তব্য করল না।

পরাবসু বলল—ভাই, আমি পিতৃহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে বনে যাব।

শুনে ভাই বলল—দাদা, তুমি থাক। আমি যাই।

পরাবসু কোন আপত্তি জানাল না। ভাই বনে চলে গেল, প্রায়শ্চিত্ত করে সকলকে পাপমুক্ত করতে।

গভীর বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করে ভাই সকলকে পাপমুক্ত করে একদিন আবার ফিরে এল রাজার যজ্ঞশালায়।

তাকে ফিরে আসতে দেখেই পরাবসু চোখ-মুখ পাকিয়ে তেড়ে গেল তার দিকে—শয়তান, বাবাকে মেরে পালিয়ে গিয়েছিলি। আবার কোন সাহসে ফিরে এলি?

দাদার কথা শুনে ভাই তো অবাক। কি জবাব দেবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চেঁচামেচিতে যেখানে যত মুনি আর মুনিপুত্র ছিল, সবাই এসে হাজির হল সেখানে। পরাবসু তখনও তাকে শাসিয়ে চলেছে—ভাল চাস তো এখান থেকে চলে যা। নইলে....

কোথায় ছিল রাজপুরুষেরা। তারা এসে পরাবসুর ভাইকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা সব শুনে বিধান দিলেন মৃত্যুদণ্ড। খাঁড়া নিয়ে ঘাতক এল সঙ্গে সঙ্গে। ভাই কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ, নির্বিকার ছিল। ঘাতকের হাতে মৃত্যু অবধারিত দেখে, রাজাকে এবার বলল—আমাকে প্রার্থনা জানাবার জন্য একটু সময় দিন। প্রার্থনা শেষ হলে আমাকে হত্যা করবেন।

রাজাও সময় দিলেন।

ভাই তখন হাতজোড় করে অগ্নি, ইন্দ্র আর যমের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি করে অনুরোধ জানাল—দেবগণ, আমি যদি আমার বাবাকে হত্যা করে থাকি, তাহলে ঘাতকের হাতে আমার যেন অবশ্যই প্রাণ যায়। আর তা যদি না করে থাকি, হোম-যাগ-যজ্ঞ যদি সব কিছু আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করে আপনাদের তুষ্ট করে থাকি, তাহলে আপনারা মৃতদেহে প্রাণ দান করুন।

প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে পুড়ে ছাই হয়ে ছিল, সবাই যে যার শরীর নিয়ে এল যজ্ঞভূমিতে। এলেন যবক্রীতকে নিয়ে ভরদ্বাজ, এলেন রৈভ্য মুনি।

রাজার এবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়ল পরাবসুর দিকে। পরাবসু তখন সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

চিত্ররথ রাজার কাহিনী

রাজার নাম ছিল চিত্ররথ। যেমন রাজা, তেমনি রানী। সকলেই শ্রদ্ধা করত রাজাকে আর রাজাও সকলকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। এমন কি, দেবরাজ ইন্দ্রও রাজা চিত্ররথের খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের রাজা চিত্ররথ। অফুরন্ত তাঁর ঐশ্বর্য। দান-ধ্যানও তাঁর যথেষ্ট।

একদিন হঠাৎ রাজার মনে হল, পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে তিনিই-বা কেমন করে এত সম্পদের অধিকারী হলেন। ত্রিভুবনের রাজাই-বা হলেন কিভাবে? পৃথিবীতে তো তাঁর তুলনায় ভাল মানুষ

কম নেই। তিনি কি এমন করেছেন যে জন্মেই রাজা হলেন, মনের মত রানী পেলেন। এত ঐশ্বর্য আর সম্মান পেলেন। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন রহস্য আছে। কিভাবে জানা যায়?

ভাবতে ভাবতে একদিন কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে জানালেন মনের কথা। বললেন—আপনারা তো সব সত্যদ্রষ্টা ঋষি। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই দেখতে পান। দয়া করে বলবেন, কোন পুণ্যবলে পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতেও আমি আপনাদের প্রিয় রাজা হলাম।

প্রশ্ন শুনে বশিষ্ঠদেব কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে বসে রইলেন। চোখ কুঁচকে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন।

তারপর বললেন—জানবার যখন এতই আগ্রহ হয়েছে আপনার, তাহলে শুনুন— পূর্বজন্মে আপনাদের দু-জনেরই জন্ম হয়েছিল চণ্ডালের ঘরে। থাকতেন অবন্তী নগরে। সে-সময় সেখানকার রাজা ছিলেন ধর্মপাল। খুব ধার্মিক রাজা হলেও কোন কারণে তাঁর সেই রাজ্যে প্রচণ্ড খরা দেখা দিল। বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। সূর্যের সে কি দুরন্ত তাপ! রাজ্যে নদী-পুকুর যা ছিল সব শুকিয়ে গেল। ক্ষেত্রে ফসল সব জ্বলে গেল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজা ধর্মপাল কিছুই করতে পারলেন না। একটু জল, এক মুঠো খাবারের জন্য মানুষের সে কি আর্তনাদ! সবাই শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করল বনে-জঙ্গলে, অন্য শহরে। অনেকে মারাও গেল। আপনারা তখন এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন বনে। ফল-মূল খেয়ে থাকতেন। আরও মানুষ যখন বনে এসে ফল-মূল খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে শুরু করল, তাও ফুরোলো। মুখ বুজে আপনারা খিদের জ্বালা সহ্য করে ভাবতে লাগলেন—এরপর কি করা যায়। ঠিক করলেন, কাঠ কেটে অন্য শহরে যাবেন বিক্রি করতে। বিক্রি করে যা পাবেন, তা দিয়ে যাহোক করে চালাবেন। সেই মত কাঠ-কুটোর বোঝা নিয়ে দুজনে গেলেন শহরে। শীতকাল। দ্বারে দ্বারে ফেরি করে বেড়ালেন। কেউ আপনাদের কাঠ কিনল না দেখে খুবই হতাশ হলেন। একদিকে দুরন্ত খিদের। তার ওপর কনকনে শীত। প্রাণ যেন যায়-যায়, এমনি অবস্থা।

সেই অবস্থায় আপনারা এলেন এক বিষ্ণু মন্দিরের কাছে। বিক্রি হল না দেখে সেই কাঠগুলো জ্বেলে আগুন পোহাতে শুরু করলেন।

এমনি সময়ে আপনারা দেখলেন, কোথা থেকে এক বণিক এসে বিষ্ণুর পুজো করল আর সোনার তৈরি ছোট্ট একটা পৃথিবী বিষ্ণুকে দান করল। তাই দেখে, আপনার মনে দারুণ ক্ষোভ জন্মেছিল। ভেবেছিলেন, এরকম ভাগ্য আপনার কেন হল না!

সেইদিন থেকেই আপনার মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খিদের জ্বালা ভুলে, মনে মনে ভগবান বিষ্ণুকে ডাকতেন আর বলতেন, এ রকম ভাগ্য কি কোনদিন হবে না?

বশিষ্ঠদেব চিত্ররথকে এই কাহিনী বলে একটু থামলেন। তারপর বললেন—সেই অবস্থার মধ্য থেকেই আপনাদের দু-জনেরই একদিন মৃত্যু হল। এ জন্মে ভগবান আপনার সেই আশা মিটিয়েছেন। ভূমিদানের তুল্য দান আর নেই। যে দান করে তাঁর যেমন পুণ্য, যে দেখে তাঁরও তেমনি পুণ্য।

অবাক হয়ে রাজা চিত্ররথ সব শুনলেন।

এরপর থেকে চিত্ররথ এত ভূমি দান করেছিলেন যে, পৃথিবীতে কেউ আর ভূমিহীন ছিল না।



বামন পুরাণ

পুলস্ত্য ঋষি দেবর্ষি নারদকে প্রথমে শুনিয়েছিলেন এই কাহিনী। ব্যাসদেব পরে এটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর তাঁর শিষ্য সূত এই পুরাণ কাহিনী নৈমিষ্যারণ্যে বসে শৌনক প্রমুখ ঋষিদের শুনিয়েছিলেন। এই পুরাণ গ্রন্থেও অনেক মহর্ষি বিশেষ করে ঋষি নর, ঋষি নারায়ণ ইত্যাদির অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা কাহিনী থাকলেও, বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের নাতি দৈত্যরাজ বলির আধিপত্য ভগবান বিষ্ণু বামন রূপে অবতীর্ণ হয়ে কিভাবে খর্ব করেছিলেন, তা-ই বিশদভাবে বলা হয়েছে। সেইজন্য এই পুরাণের নাম হয়েছে বামন পুরাণ।



নারায়ণ ঋষি ও উর্বশী

হিমালয়ে বদরিকাশ্রম। বয়ে চলেছে সরস্বতী নদী।

গাছে গাছে ঢাকা বদরিকাশ্রমের স্নিগ্ধ-শান্ত তপোবন। এই তপোবনে তপস্যা করতেন দুই ঋষি—নর ও নারায়ণ।

বহুচ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। খুবই ধার্মিক আর পরোপকারী ছিলেন তিনি। ধর্মকর্ম ছাড়া, আর মানুষের কিসে মঙ্গল হয়, তাছাড়া তিনি এই সংসারে আর কিছু জানতেন না। তাঁর চার ছেলে—হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ আর নর।

এই চারটি ছেলে তো শুধু ছেলে নয়, চারটি রত্ন। মহামূল্যবান রত্ন। যেমন বাবা, তেমনি ছেলে। বাবা বহুচের মতই তাঁরাও যাগ-যজ্ঞ-তপস্যা নিয়ে থেকে গেলেন।

হরি আর কৃষ্ণ ঋষি সব সময় যোগ-সাধনাতেই মেতে থাকতেন। তাঁরা এ ছাড়া আর কিছু জানতে না। কিন্তু বাকি দুই ভাই নর আর নারায়ণের চিন্তা, জগতের কিসে মঙ্গল হবে। কি করলে পৃথিবীতে কোথাও কোন অশান্তি থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, কষ্ট থাকবে না। ভাবতে ভাবতে তাঁরা ঘর ছেড়ে বদরিকাশ্রমে এলেন। জায়গা আর পরিবেশ দেখে তাঁরা সেখানেই তপোবন তৈরি করে কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলেন।

তপস্যা করলেই আত্মশক্তি বাড়ে। শক্তি বাড়লে তেজ বাড়ে। তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবকি ভাবেই যা বাড়ে তা হল দম্ভ-অহঙ্কার। এই দুটিকে যে প্রশ্রয় দেবে তারই সর্বনাশ। কোন রকমে মন যাতে চঞ্চল হয়ে না ওঠে, কোন লোভের ফাঁদে না পড়ে, তপস্যা করে যিনি সেই শক্তি অর্জন করতে পারেন, তিনিই বড় তপস্বী। তাঁরাই পৃথিবীর মঙ্গল করতে পারেন। নর আর নারায়ণ ছিলেন সেই দলের। তপস্যা করে তাঁরা প্রভূত শক্তি অর্জন করলেও মনের কোণে এতটুকু লোভ ছিল না, কোন মোহ ছিল না, কারো ওপর কোন রাগ ছিল না। ভয়ে অন্যায় তাঁদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারত না। সব সময়েই এক চিন্তা—সকলের মঙ্গল হোক, সকলে সুখে থাক।

মর্ত্যে যখনই কাউকে তপস্যা করতে দেখেন, তখনই দেবরাজ ইন্দ্রের বুক দুরু দুরু করে ওঠে। ভয়—এই বুঝি অমরাবতী তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল। তাঁর যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর-অপ্সরাদের নিয়ে সুখে থাকার দিন বুঝি ফুরিয়ে এল। একবার যে সুখ দেখে, সে কি কখনো দুঃখের মুখ দেখতে চায়? ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকার অভ্যাস যে একবার করেছে, সে কি আর কষ্ট পেতে চায়? কখনই চায় না। আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিভাবে তার ঠাট-বাট বজায় থাকবে। দেবতাদের রাজা হলে কি হবে, ইন্দ্রের মনে সব সময় সেই ভয়। তাই কেউ তপস্যা করতে বসলেই যেই দেখেন বেশ শক্তি সঞ্চয় করেছেন, অমনি কিভাবে তার তপস্যা ভণ্ডুল করে দেবেন, সেই চেষ্টা শুরু করেন। যেহেতু তিনি দেবরাজ, অনেক শক্তিমানই আছে তাঁর আদেশমত কাজ করে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ—অনঙ্গ মদনদেব, যাঁর আর এক নাম হল কন্দর্প। তাঁর স্ত্রী রতি, আর অপ্সরাদের মধ্যে রম্ভা। দেবরাজ এঁদের ডেকে পাঠিয়ে দেন সেখানে। এঁদের কাজই হল মনকে চঞ্চল করে তোলা। যাতে মন একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে না পারে। কাম আর লোভ দিয়ে এরা নিষ্ঠার শক্তিকে পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়। নানা রকম লোভনীয় বস্তু কেউ যদি এনে সামনে তুলে ধরে, কজন আছেন যে লোভ সামলে থাকতে পারেন? আর লোভ সামলে থাকার মত শক্তি অর্জন তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। যাই হোক, বদরিকাশ্রমে নারায়ণের কঠোর তপস্যা দেখে খুবই বিচলিত দেবরাজ কন্দর্পকে ডেকে বললেন—কন্দর্প, নারায়ণের তপস্যায় এবার বুঝি আমার সব যায়। তোমার মত বন্ধু থাকতে আমায় ভিখিরি হতে হবে?

কন্দর্প সাহস দিয়ে বললেন—আমার শক্তি তো আপনার অজানা নয়, দেবরাজ। তবে এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? অমন ব্রহ্মা-শিবকে যদি টলিয়ে দিতে পারি, নারায়ণ তো সামান্য একজন মানুষ। আপনি চিন্তিত থাকুন।



গ্রীষ্মকাল। আকাশ যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে গাছ-গাছালি ভরা তপোবন। তাই ওরই মধ্যে একটু ঠাণ্ডা। নারায়ণ ঋষি তপস্যায় মগ্ন। গরমের একটু-আধটু ঝাঁঝ গায়ে এসে লাগলেও তাঁর কোন গ্রাহ্যই নেই।

কিন্তু হঠাৎ বসন্তের হাওয়া গায়ে এসে লাগতেই নারায়ণ ঋষির চমক ভাঙল। কি হল? গ্রীষ্মকালে হঠাৎ এমন ফুরফুরে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করল কেন? চোখ খুলে দেখলেন ঋষি—গাছে গাছে সব কচি পাতা, কোকিল ডাকছে গাছের ডালে ডালে, নাচছে ময়ূর-ময়ূরী—ব্যাপার কি? এই সময় ঠিক এমনটি তো হওয়ার কথা নয়।

অবাক হয়ে যখন এই সব ভাবছেন নারায়ণ ঋষি, দেখলেন ফুল-বনের ভেতর থেকে নাচতে নাচতে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসে ফুলপরীর মতই অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী। আশ্চর্য, তপোবনে আশেপাশে এমন কোন রমণীকে তো কখনো তিনি দেখেন নি

তবে এ আবার কোথা থেকে এল ? কেমন কেমন যেন আবার ঠেকছে চোখে—অভদ্রের মত নাচ। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েই নারায়ণ ঋষির চোখে পড়ল, গাছের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনুক হাতে। ভাল করে দেখতেই সব রহস্য ধরা পড়ে গেল ঋষির কাছে। মুচকি মুচকি হাসলেন তিনি।

—আরে, কন্দর্প যে ? তা গাছের আড়ালে কেন ? এসো⋯এসো। নারায়ণ ঋষি অমন ভাবে ডাকতেই কন্দর্পের মাথা গেল ঘুরে। গাছের আড়াল থেকে এক পা এক পা করে বেরিয়ে এল।

নারায়ণ ঋষি তেমন ভাবেই বললেন—তুমি আমার তপোবনে আসবে, তার জন্য এত আয়োজনই-বা কিসের, আর এত সঙ্কোচই-বা কেন ? এসো, আমার পাশে এসে বোসো।

কন্দর্পের মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বের হল না। এমনটি যে হবে, তা সে কখনো ভাবতেও পারে নি। দেখে-শুনে রম্ভা এমনি হতবাক হয়ে গেল যে নাচতেও ভুলে গেল। রম্ভার সঙ্গে ছিল আরো কয়েকজন নামকরা অপ্সরা, যারা দেবরাজের সভায় নাচ-গান করে বেশ সুখ্যাতি পেয়েছিল। রম্ভার দেখাদেখি তারাও সব দাঁড়িয়ে পড়ল—যেন এক একটা পুতুল। নারায়ণ-ঋষি তাদেরও ডেকে কাছে বসালেন। অতগুলি সুন্দরী রমণী দেখেও সামান্য একজন মানুষের মন এতটুকু চঞ্চল হল না—মদনদেব এই প্রথম তা দেখে একেবারে হতবাক।

নারায়ণ-ঋষির ডাকে কন্দর্প কাছে এসে বসতেই ঋষিবর তার কুশল সংবাদ নিলেন। তারপর বললেন—তুমি যে এভাবে আমার আশ্রমে আমার কাছে আসবে, তা ভাবতেই পারি নি। যাই হোক, এসে কিন্তু ভালই করেছ।

এই বলে নারায়ণ ঋষি এক গোছা ফুল তুলে নিজের উরুতে আঘাত করতেই সেখান থেকে আবির্ভূত হল এক রমণী।

কন্দর্প হঠাৎ সেই রমণীকে সামনে দেখেই দারুণ ভাবে চমকে উঠল—এ কি, নিজের স্ত্রী রতিকে তো সঙ্গে আনে নি। তা এখানে হঠাৎ এভাবে রতি কোথা থেকে এল ? ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় রমণীর মধ্যে সেরা সুন্দরী হলেন রতি দেবী। কন্দর্পের স্ত্রী।

আরো ভাল ভাবে সেই রমণীকে দেখল কন্দর্প। অবিকল তার স্ত্রী রতির মত দেখতে। রতিই তো !

চঞ্চল হয়ে উঠে কন্দর্প যেই তার দিকে এগিয়ে যেতে গেল, নারায়ণ ঋষি তেমনি ভাবেই বললেন—কন্দর্প, ওর নাম উর্বশী। আমার উরু থেকে ফুলের ঘায়ে ওর জন্ম। তাই আমি ওর 'উর্বশী' নামই দিলাম। আমি আশ্রমবাসী তপস্বী, এ সবে আমার কোন প্রয়োজনই নেই। তোমাদের দেবরাজ এমন একটি রমণীরত্ন পেলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন, আর তোমাকেও বেশি করে খাতির করবেন। তুমি বরং একে নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দিও।

কন্দর্প আর কি করে। মুখ বুজে উর্বশীকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে এল অমরাবতীতে। অমন দেবতাদের মন যে টলাতে পারে, সামান্য একজন মানুষের মন সে টলাতে পারল না ! এত বড় পরাজয় তার জীবনে এই প্রথম।

আর ইন্দ্র ! ভাবতেও পারেন নি, ব্রহ্মাণ্ডে এমন রমণী-রত্ন থাকতে পারে। উর্বশীকে পেয়ে তিনি সবই ভুলে গেলেন, এমন কি নারায়ণ-নর ঋষির কঠোর তপস্যার কথাও।



নর-নারায়ণ ও প্রহ্লাদ

দুরাচার দৈত্য হিরণ্যকশিপু নিহত হবার পর পাতালে দানবপুরে রাজা হয়েছেন প্রহ্লাদ। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে, যেখানে যত অশান্তি ছিল, সব দূর হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—পৃথিবীতে যার যা কাজ, সবাই নিশ্চিন্ত মনে করতে পারছে। হিরণ্যকশিপুর সময়ে স্বর্গের দেবতারা সবাই অধিকার হারিয়েছিলেন। প্রহ্লাদ আবার তাঁদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই দেবতারাও খুশি।

সদলবলে প্রহ্লাদ একদিন তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোন কোন তীর্থে গেলে ঠিক ঠিক ধর্ম-কর্ম হবে, চ্যবন মুনির কাছ থেকে তা জেনে নিয়েছেন। বেরিয়ে প্রহ্লাদ প্রথমেই এলেন নৈমিষারণ্যে। স্নান-দান ইত্যাদি যা কিছু করার ছিল, সেরে নিয়ে মৃগয়ায় বের হলেন। সরস্বতী নদী। তারই তীর ধরে প্রহ্লাদ চলেছেন। যেতে যেতে অদ্ভুত একটা শাল গাছ চোখে পড়ল। গোড়া থেকে সোজা সরল হয়ে ওপরে উঠেছে, ডাল-পালায় সুন্দর হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রহ্লাদ আশ্চর্য হলেন এই দেখে যে, গাছের সরল অংশটায় গেঁথে আছে অগণিত তীর। ঠিক সাজানো মালার মত। কেউ যেন নিরীহ গাছটার ওপর নিজের তীরন্দাজগিরি ফলিয়েছে। দেখে প্রহ্লাদের মনে খুব কষ্ট হল। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর একটু এগোতেই দেখলেন, পাশাপাশি দুটো গাছের নীচে বসে দুই জটাজুটধারী। পরনে হরিণের ছাল, ঋষির মত দেখতে, বসে বসে ধ্যান করছেন। ভাল ভাবে দু-জনকে দেখে আরও অবাক হলেন প্রহ্লাদ। দেখলেন প্রহ্লাদ, দু-জনের পেছনে গাছের শাখায় ঝুলছে দুটো ধনুক। নিচে পড়ে আছে দুটো তূণীর। ওগুলো দেখেই প্রহ্লাদ আরো চমকে উঠেছিলেন। ধনুক দুটোর মধ্যে একটা ছিল শার্ঙ্গ, অপরটি আজগব। মহাবীর ছাড়া অমন ধনুক তোলে, সাধ্য কার ? আর, দুটি তূণীরই ছিল অক্ষয়। কিছুতেই মেলাতে পারেন না ধর্মজ্ঞ প্রহ্লাদ, এ কি ধরনের তপস্যা। যদি এঁরা ঋষিই হন তাহলে ধ্যান-ধারণা, তপস্যাই এঁদের ধর্ম হওয়া উচিত। অস্ত্র-শস্ত্র রাখবে ক্ষত্রিয়রা। তপস্বীদের তপস্যায় যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায়, সে দায়িত্ব তাদের। ঋষি বা তপস্বীরা তো নিজের হাতে সে দায়িত্ব কখনো নিতে পারেন না। মনে মনে খুব রাগ হল প্রহ্লাদের।

—তোমাদের বেশভূষা দেখে তো মনে হচ্ছে তপস্বী। তা হাতে ধনুক-তীর কেন ? রাগে গরগর করে বলে উঠলেন প্রহ্লাদ।

ধ্যান ভেঙে গেল তপস্বীদের। এঁরা দু-জন হলেন নর আর নারায়ণ ঋষি।

কটমট করে নর ঋষি তাকালেন প্রহ্লাদের দিকে। বললেন—সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?

প্রহ্লাদও রেগে উঠে বললেন—আছে বৈকি। আমি প্রহ্লাদ। ত্রিভুবনে সবাই জানে, অধর্ম আমি কখনো সহ্য করি না।

—তুমি কি সহ্য করতে পার, আর কি সহ্য করতে না পার না, ওসব নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। ধর্ম-অধর্ম কাকে বলে আমরা তা বিলক্ষণ জানি। বিরক্ত কোরো না, যাও। বললেন ঋষি।

—তোমার তো খুব দম্ভ দেখছি! একজন তপস্বীর এত অহঙ্কার! জানো, এই মুহূর্তে আমি কি করতে পারি? বললেন প্রহ্লাদ।

—দৈত্যরাজ তুমি। হয়ত ইচ্ছে করলে অনেকের অনেক কিছুই করতে পার। তবে নর-নারায়ণের যে কিছুই করতে পারবে না, এটা বিলক্ষণ জেনে যেতে পার।



নর-ঋষির কথা শুনে প্রহ্লাদ গেলেন দারুণ রেগে।

কি, এত বড় স্পর্ধা! বেশ, শক্তির পরীক্ষা হয়ে যাক। আমার শপথ, আমি তোমাদের দু-জনকেই নিধন করব। দেখ, পারি কিনা।

চটপট জবাব নর-ঋষির—চেষ্টা করে দেখতে পার।

আর যায় কোথা? প্রহ্লাদ ফিরে এলেন বন প্রান্তে। সেখানে সৈন্য-সামন্ত, রথ, অস্ত্র-শস্ত্র রেখে বনে ঢুকেছিলেন মৃগয়া করতে। সঙ্গে সঙ্গে রণ সাজে সেজে রথ নিয়ে ছুটলেন নর-ঋষির দিকে রণ হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে। দু-জনে মুখোমুখি হলেন। রথে প্রহ্লাদ, হাতে ধনুক-বাণ। আর, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে জটাজুটধারী নর-ঋষি, হাতে আজগব ধনুক আর পিঠে অক্ষয় তূণীর।

শুরু হল দু-জনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ। দু-জনের ধনুকে উঠল টঙ্কার। সশব্দে ছুঁড়লেন বাণ একে অপরকে লক্ষ্য করে। কিন্তু অত বড় বীরযোদ্ধা দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের একটা বাণও গিয়ে যেমন নর-ঋষিকে বিঁধতে পারল না, তেমনি নর-ঋষিরও অমন দিব্য ধনুক আর বাণ এসে ছুঁতেও পারল না প্রহ্লাদকে। একের বাণ অপরে মাঝপথেই কেটে টুকরো করে দিতে লাগলেন।

যখন বাণ-ছোড়াছুড়ি করেও প্রহ্লাদ কিছুই করতে পারলেন না, তখন ভীমকায় গদা নিয়ে চকিতে রথ থেকে নেমে ছুটে আসতে লাগলেন নর-ঋষির দিকে। আসবারই কথা। কেননা তাঁর বাণের মধ্যে সেরা দুটো বাণ ব্রহ্মাস্ত্র আর আগ্নেয়াস্ত্রও নর- ঋষি বিফল করে দিয়েছেন নারায়ণাস্ত্র দিয়ে।

এতক্ষণ নারায়ণ ঋষি চুপচাপই ছিলেন। প্রহ্লাদকে গদা নিয়ে ছুটে আসতে দেখে এবার তিনি তাঁর ধনুক আর তূণীর নিয়ে চোখের পলকে এসে দাঁড়ালেন প্রহ্লাদের সামনে। প্রহ্লাদের সেই ভীম গদা এসে পড়ল তাঁর মাথায়। প্রহ্লাদ নিশ্চিত যে নারায়ণকে আর উঠতে হবে না। কিন্তু দেখে অবাক হলেন, গদা মাথার আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর নারায়ণের চোখ দিয়ে দরদর করে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল মাত্র।

প্রহ্লাদ এবার রথে ফিরে গিয়ে তুলে নিলেন ধনুক-বাণ। এদিকে নারায়ণ ঋষির হাতেও টঙ্কার তুলল শার্ঙ্গ ধনু। বাণে-বাণে ছেয়ে গেল বনের আকাশ। তর্জনে-গর্জনে আর বাণের সঙ্গে বাণের ঘর্ষণ-শব্দে কেঁপে উঠল বন।

এমনি ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্য থমকে গেলেন প্রহ্লাদ। নারায়ণ ঋষির একটা বাণ এসে কেটে দিয়েছে তাঁর হাতের ধনুক। অথচ তা আঘাত করল না প্রহ্লাদকে। বাঃ! বাহাদুর যোদ্ধা বটে! মনে মনে তারিফ করলেও, চোখ-মুখ পাকিয়ে প্রহ্লাদ তুলে নিলেন আর একটা ধনুক। নারায়ণ ঋষির বাণে সেটাও গেল। তুলে নিলেন আর একটা। সেটাও গেল। প্রহ্লাদ এবার ছুঁড়লেন লোহার এক ভীম মুগুর। বন বন করে মুগুর ছুটে আসছে, দেখে, নারায়ণ ঋষি এক সঙ্গে মোক্ষম দশটা বাণ ছুঁড়ে তা টুকরো টুকরো করে দিলেন। প্রহ্লাদ তাই দেখে আবার বিশালকায় এক ধনুক তুলে নিতেই নারায়ণ ঋষির এক বাণ এসে প্রহ্লাদকে এমন আঘাত হানল যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে রথের ওপরই লুটিয়ে পড়লেন। সারথি তা দেখে তাড়াতাড়ি রথ সরিয়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরতে আবার রথ নিয়ে যেই প্রহ্লাদ এসে দাঁড়ালেন, অমনি নারায়ণ ঋষি বলে উঠলেন—দৈত্যরাজ, এখন সন্ধ্যা। এখন আহ্নিক সেরে নিতে হবে। যুদ্ধ করার ইচ্ছে হলে পরে আবার এসো।

ঠিকই বলেছেন নারায়ণ ঋষি।

রথ নিয়ে প্রহ্লাদ ফিরে গেলেন নদীতীরে। প্রাত্যহিক কাজ সারলেন। তারপর আবার এলেন রণ-হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে। আবার যুদ্ধ চলল সুদীর্ঘ কাল। কিন্তু নর বা নারায়ণ, কোন ঋষির গায়ে আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারলেন না। ভেবে অবাক হলেন প্রহ্লাদ, সামান্য তপস্বী হয়ে এমন যুদ্ধকৌশল এঁরা আয়ত্ত করলেন কিভাবে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি চিন্তায় পড়লেন প্রহ্লাদ, কি ভাবে তিনি প্রতিজ্ঞা রাখবেন। রাজার শপথ—যুদ্ধে দুই ঋষিকে তিনি জয় করবেনই। এখন যদি কথা না রাখতে পারেন.তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না। উপায় কি? অনেক ভেবে-চিন্তে বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ এবার মনে-প্রাণে ডাকতে শুরু করলেন বিষ্ণুকে—ভগবান বলুন, আপনার অনুগ্রহে আমার অজেয় কেউ নয়, কিন্তু নারায়ণ-ঋষিকে আমি কিছুতেই যুদ্ধে জয় করতে পারছি না কেন?

বিষ্ণু বললেন—প্রহ্লাদ, তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমায় বলি, যাঁর সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছ, তাকে কোন দিনই অস্ত্রযুদ্ধে জয় করতে পারবে না।

—কেন প্রভু?

—আমাকে জয় করেছ অস্ত্রবলে, না ভক্তিবলে প্রহ্লাদ?

—আপনাকে কি অস্ত্রবলে জয় করা যায়?

—ঐ নারায়ণ ঋষি যে আমারই অংশ। পৃথিবীকে ধর্মপথে রাখবার জন্য ওটা আমারই আর এক রূপ।

শুনেই চমকে ওঠেন প্রহ্লাদ—সে কি? প্রভু, এটা আমি আগে বুঝলাম না কেন? ছি···ছি। সিংহাসনে বসে আমার এমন মতিভ্রম

ঘটল !

এরপর একেবারে বদলে গেলেন প্রহ্লাদ।

যুদ্ধ তখনো চলছে। বিশ্রাম শুধু রাতটুকু। সকাল হতেই প্রহ্লাদ পায়ে হেঁটে এসে হাজির হলেন বদরিকাশ্রমে। হাতে নেই তীর-ধনুক, সেই গর্জন। চুপ করে বসে আছেন নারায়ণ ঋষি। প্রহ্লাদ সোজা এসে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। তার আগে নিজেই নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছিলেন। সিংহাসনে বসলেই যে মোহ আসে, দম্ভ আসে, সে কথা বুঝতে পেরে তিনি সেখানেই তাঁর সৈন্য-সামন্ত, মন্ত্রী-পরিষদ সকলকে ডেকে ভাই অন্ধককে সিংহাসনের অধিকার ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন।

প্রহ্লাদের রকম দেখে মুচকি হাসলেন নারায়ণ ঋষি। বললেন—কি ব্যাপার প্রহ্লাদ, যুদ্ধ না করে হঠাৎ প্রণাম করতে এলে যে ?

প্রহ্লাদ বললেন—প্রভু, রাজা হয়ে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। তাই এতদিন বুঝতে পারি নি, আপনিই আমার সেই আরাধ্য পুরুষ—শ্রেষ্ঠ পুরুষ নারায়ণ। আপনার সঙ্গে আর নর-ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ করার অপরাধ থেকে আমায় মুক্তি দিন। আমাকে পাপমুক্ত করুন।

প্রহ্লাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নারায়ণ ঋষি বললেন—ওঠ, ওঠ প্রহ্লাদ। মন থেকে ও-কথা মুছে ফেল। তুমি এতদিনে যে মোহমুক্ত হয়েছ এতেই আমি খুশি হয়েছি। যাও, রাজ্যে ফিরে গিয়ে প্রজাদের ধর্মানুসারে পালন কর।

প্রহ্লাদ বললেন—প্রভু, ঐ সর্বনাশা সিংহাসন আমি ত্যাগ করেছি। আমার ভাই অন্ধককে বসিয়েছি সিংহাসনে। ওখানে আর আমি বসতে পারি না।

নারায়ণ ঋষি বললেন—তাহলে রাজ্যে গিয়ে তোমার দানব প্রজাদের সদুপদেশ দিয়ে তাদের চরিত্র গঠন কর। এই কাজই সবচেয়ে বড় কাজ।

নর এবং নারায়ণ ঋষির আশীর্বাদ আর আদেশ নিয়ে প্রহ্লাদ আবার ফিরে এলেন দৈত্যপুরে। অন্ধক থেকে শুরু করে সবাই তাঁকে ধরে বসল সিংহাসনে বসার জন্য। কিন্তু না। একবার যা প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর কি তা গ্রহণ করা যায় ? সিংহাসনে বসলেন না বটে প্রহ্লাদ, কিন্তু সেই থেকে দৈত্যপুরে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে সদুপদেশ দান করতে লাগলেন।



সুকেশীর কাহিনী

বিদ্যুৎকেশী নামে এক দানব ছিল। সুকেশী তারই ছেলে। জাতে দানব হলে কি হবে, স্বভাবটি ছিল তার খুব মিষ্টি। ধীর-স্থির, গুণবান। যাঁরা বয়স্ক তাদের সম্মান দিত, যাঁরা জ্ঞানী তাদের কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করত। মুনি-ঋষিদের শ্রদ্ধা করত। তাই সকলে তাকে ভালও বাসত।

সুকেশী ছিল দেবাদিদেব শঙ্করের খুবই ভক্ত। সুকেশী দীর্ঘদিন ধরে শিবের তপস্যা করে এমন এক বর পেয়েছিল, যা বড় একটা সে-সময় কেউ পায় নি। শঙ্করের বরে সে আকাশে একটা পুরী তৈরি করে নিয়েছিল। সব কিছুই ছিল সেই পুরীর মধ্যে। যেমন ছিল নদ-নদী, গাছ-পালা, তেমনি ছিল দানব-প্রজাদের বসবাস করার জায়গা। আকাশমণ্ডলে পুরীটা আবার একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকত না। সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। তার নামই ছিল 'সুকেশীপুরী'। সুকেশী সেই পুরীর মধ্যে আকাশ পথে থেকেই রাজত্ব করত। তাকে জয় করার মত শক্তি সে সময় কারো ছিল না। (বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশে উপগ্রহে বসবাস করা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। সুকেশী পুরী সেইরকম বসবাসকারী উপগ্রহ ছিল কিনা কে জানে। দানব সুকেশী মহাকাশে সেই রকমই কোন দানব উপনিবেশ নির্মাণ করেছিল কিনা কে বলতে পারে ?)

সুকেশী পুরীতে রাক্ষসরাজ সুকেশীর শাসনে সবাই সুখী। সব সময় ধর্মপথে থাকলেও, আর এমন অতুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও, সুকেশীর জ্ঞানস্পৃহা কিন্তু একটুও কম ছিল না। তাই সব সময়ই সে আকাশ পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াত আর দেখত, কোথায় মুনি-ঋষিরা আছেন, আর ধর্ম-আলোচনা হচ্ছে।

এভাবে দেখতে দেখতে সুকেশী একদিন এসে নামল মগধ দেশের এক মহা অরণ্যে। সেই বনে থাকতেন অনেক জ্ঞানী-গুণী মুনি-ঋষি।

তাঁদের কাছে গিয়ে সুকেশী মুনিদের প্রণাম জানিয়ে বসল তাঁদের সামনে। সকলেই চেনেন সুকেশীকে। তাই পরিচয় জানার প্রয়োজন হল না। ঋষিরা বললেন—এস সুকেশী। হঠাৎ এখানে কি মনে করে ?

সুকেশী বলল—দেখুন, আমরা সবাই ধর্ম-ধর্ম করি বটে, কিন্তু কেমন করে বুঝব যে আমরা সকলে ঠিক ধর্মপথেই আছি ? মাঝে মাঝেই এই প্রশ্নটা আমার মনে জাগে। উত্তর খুঁজে পাই না। আপনারা যদি আমার সংশয় দূর করতে পারেন সেই ভেবেই এলাম।

শুনে মুনিরা বললেন—ঠিক প্রশ্নই তোমার মনে জেগেছে সুকেশী। সত্যিই, ধর্ম কি, ধর্ম কাকে বলে, কোন কোন নিয়ম মেনে চললে ধর্মকে ঠিক ঠিক মেনে চলা হল, তার ধারণা যদি ভাল না থাকে, তাহলে ধর্মপথে আছি কিনা, সন্দেহ জাগে বৈকি। উত্তম কথা। সাতটা দ্বীপে ভরা এই ভূমণ্ডলে অগণিত মানুষের বসবাস। মানুষের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য আছে, ধর্মের অনুশীলনেও তেমনি অনেক রকম বৈচিত্র্যই দেখবে। তবে একটা কথা, যে আচার-বিচার মেনে চলে, সেই সোজা কথায় ধর্ম মেনে চলে। এই আচার কিন্তু সদাচার, অন্যায় আচরণ নয়। যে আচরণ মেনে চললে নিজের উন্নতি হবে, সকলের মঙ্গলের জন্য ভাবনা-চিন্তা আসবে, সেটিই হল সদাচার। যারা অপরের জন্য না ভেবে শুধু নিজেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবে, তারা অসদাচারী। সকলের যাতে ভাল হয়, সেরকম কাজ করলে জানতে হবে ঠিক ধর্মপথে আছ। পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে যেসব সদুপদেশ আছে যারা তা শোনে না,



আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা খেয়োখেয়ি লাগায়, সাধু-সজ্জনদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে, বাবা-মা বা গুরুজনদের অবজ্ঞা করে যারা উদ্ধত আচরণ করে, সকলের জন্য যার সমান সহানুভূতি না থাকে, জানবে, তারা ধর্মপথে চলছে না। তারা পাপী।

চুপ করে শোনে সুকেশী। শুনতে তার বেশ ভাল লাগছে।

মুনিরা বললেন—জান সুকেশী, পৃথিবীতে আমাদের চারটে বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। প্রত্যেকের কাজও ঠিক করা আছে। যারা ঠিক ঠিক মত সেই সব কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে আর সদাচারী হয়ে সব সময় নিজেকে উন্নত করে তোলার চেষ্টা করে, জানতে হবে, তারাই ধর্মপথে আছে। মোদ্দা কথায়, মোটামুটি দশটি জিনিস আছে, যা মেনে চললে ধর্মকেই মেনে চলা হয়। তা হল, অহিংসা (কারো ওপর রাগ বা হিংসা নিয়ে ক্ষতি করবে না), সততা (যে কাজ করবে তাতে কোন ফাঁকি থাকবে না), অস্তেয় (চুরি বা পরের দ্রব্যে লোভ না করা), মনকে নিজের বশে রাখা, ইন্দ্রিয়কে সংযমের মধ্যে রাখা, দান করা, ক্ষমাশীল হওয়া, সামর্থ্য থাকলে কার্পণ্য না করা, অশৌচ (সব সময় নিজেকে শুচিতার মধ্যে রাখা) আর তপস্যা করা। মানুষ মাত্রেরই এই দশটি জিনিস মেনে চলা উচিত। তা হলেই ধর্ম-কর্ম করা হবে।

ধর্ম সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই সুকেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল মুনিদের কাছ থেকে। তারপর নিজের সুকেশীপুরীতে ফিরে গিয়ে সমস্ত রাক্ষস প্রজাদের ডেকে বলল—যদি ইহকাল-পরকালে মঙ্গল চাও, তবে ধর্ম পালন কর, ধর্ম আচরণ কর। কারো ওপর অত্যাচার করবে না, অন্যায় করবে না, লোভ করবে না, স্ত্রীজাতিকে মায়ের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, তাদের কখনও অসম্মান করবে না। এই বলে মুনিদের কাছ থেকে যা জেনে এসেছিল সব কিছু তাদের বলল।

সুকেশীপুরীতে সুকেশীর কথা সবাই মেনে চলত। এবারেও সুকেশীর আদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে মানতে শুরু করল। এমন কি, তাদের নাতিপুতিরা পর্যন্ত।

আচার-অনুষ্ঠান মেনে ধর্মপথে থাকলে আত্মশক্তি দারুণ ভাবে জেগে ওঠে। রাক্ষসদের তেজও গেল অসম্ভব বেড়ে। সুকেশীপুরীও আকাশমণ্ডলে আরও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। দিনের বেলায় তাকে দেখতে ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মত, আর রাতে সূর্যের মত। ফলে আসল যে সূর্য আর চন্দ্র, তাদের প্রভাব গেল ম্লান হয়ে, মর্যাদাও গেল কমে। সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের কাজের ধারাও গেল বদলে। এত দিন সবাই দেখে এসেছে মাসের মধ্যে পনের দিন রাতের আকাশে চাঁদ একটু একটু করে কমতে কমতে শেষে একেবারে হারিয়ে যায়, সেটা হল কৃষ্ণপক্ষ। আবার ক্ষয়রোগ থেকে মুক্তি পেলে একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে বিরাট একটা জ্বলজ্বলে থালার মত হয়ে ওঠে, সেটা হল শুক্লপক্ষ। সেই সময় তাকে যেমন দেখায় সুন্দর, তেমনি তার আলো লাগে ভারি মিষ্টি। মন-প্রাণ ভরে ওঠে। এখন চাঁদকে আর ক্ষয়ে যেতে বা একেবারে হারিয়ে যেতে না দেখে, তার ওপর সূর্যকেও উপেক্ষা করে ভাস্বর হয়ে উঠতে দেখে, পৃথিবীর মানুষরা কত কি বলাবলি শুরু করে দিল। দিনরাত তারই দিকে তাকিয়ে থাকত। আসল সূর্য আর চন্দ্রকে ছেড়ে এটিকে লক্ষ্য করেই তাদের জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করল।

সব দেখে-শুনে সূর্যদেব বেশ অবাক হলেন। —ব্যাপার কি? সকলেই তাঁকে দেখে স্নান করত, তাঁর স্তবগান গাইত, পুজো করত—এখন আর তা করছে না কেন? তাঁকে ভুলে যাওয়ার তো কোন কারণ থাকতে পারে না। পৃথিবী তো বেঁচে আছে তাঁরই তেজে। তবে সবাই মিলে তাঁকে এমন উপেক্ষা করছে কেন?

ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল দানবরাজ সুকেশীর সুকেশীপুরী। তাঁর তেজ এবং চাঁদের মহিমাকেও যে টেক্কা দিয়ে চলেছে রাক্ষসরা! সর্বনাশ! শেষে রাক্ষস হয়ে উঠল পৃথিবীর আপনজন?

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হল?

সূর্যদেব ধ্যানস্থ হতেই রহস্যটা দেখতে পেলেন। রাক্ষসরা আর হিংসা করছে না, বন্য ক্রোধ জয় করেছে, লোভ দমন করেছে, সৎপথে জীবন-যাপন করছে, সদাচার পালন করছে—সকলেই রীতিমত ধার্মিক হয়ে উঠেছে। আর এই কারণেই বিশ্বের ওপর তারা আধিপত্য করতে শুরু করেছে।

ধার্মিক হয়ে উঠুক, আপত্তি নেই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের ওপর আধিপত্য করবে, এটা কেমন ভাবে মেনে নেওয়া যায়? সৃষ্টির শুরু থেকে সূর্যদেব যে অধিকার অর্জন করে আছেন, সামান্য রাক্ষস তা ধর্ম-বলে কেড়ে নেবে? আর মুখ বুজে তা মেনে নিতে হবে, নতি স্বীকার করতে হবে? কখনই না।

দারুণ রেগে সূর্যদেব আরও প্রখর হয়ে উঠলেন। জ্বলন্ত আগুনের মত লাল চোখে কটমট করে তাকাতেই সুকেশীর রাক্ষসপুরী কুটোর মত পুড়ে গেল। আর আকাশ থেকে যেমন ভাবে তারা খসে পড়ে, তেমনি ভাবে পৃথিবীতে তা খসে পড়ল। যেন একটা উল্কাপাত হল।

নিদারুণ সাধনার অমন সুন্দর পুরীকে পুড়ে যেতে, নষ্ট হয়ে যেতে দেখে রাক্ষসরাজ সুকেশী কাঁদতে কাঁদতে শিবকে ডাকতে লাগল—ধর্মপথে থেকে কি অপরাধ করেছি শঙ্কর যে আমার সঙ্গে

আমার প্রজাদের, আমার এই পুরীর এমন সর্বনাশ হল ? মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে আমি তো এটাই শিখেছিলাম যে, সৎপথে থাকলে, সদাচার মেনে চললে কখনো কারো ক্ষতি হয় না। তবে আমার এমন হল কেন ?

সুকেশীর কাতর আর্তনাদ শিবের কানে পৌঁছতেই তাঁর টনক নড়ে উঠল। সত্যিই তো, সুকেশী কোন অপরাধেই অপরাধী নয়। কেবল রাক্ষসকুলে জন্মেছে মাত্র। ধর্ম আচরণ করে সেও বড় হয়েছে, প্রজাদেরও মানসিক উন্নতি ঘটিয়েছে। তাহলে ? কে তার এমন ক্ষতি করল ? ধ্যানস্থ হতেই শিব দেখলেন সূর্যদেবকে। শঙ্করের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। কি, এত বড় স্পর্ধা সূর্যের যে, নিজের শক্তি এমন ভাবে জাহির করে পৃথিবীর মানুষের পুজো পাবার জন্য ? রেগে তিনিও ছুটে গিয়ে কটমট করে তাকালেন সূর্যের দিকে। তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের তেজ কমে গেল। আধ-পাকা তালফলের মত খসে পড়ল আকাশ থেকে।

সূর্যদেব অসহায় হয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে দেখে পৃথিবী থেকে রব উঠল—সূর্যদেব, এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে পড়লে তোমার সর্বনাশ, আমদেরও সর্বনাশ। যেভাবেই হোক তুমি গিয়ে বারাণসীতে পড়। সেখানে নদীতে স্নান কর, যদি জ্বালা কমে।

সূর্যদেব তাই করলেন। বারাণসীতে বরণী আর অসি নদীর সংযোগস্থল মহা পুণ্যক্ষেত্র। সেখানে গিয়ে স্নান শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই জ্বালা মিটল না। তখন তাঁর অস্থিরতা দেখে ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, বিদ্যাধর, সূর্যের রথের যত ভূত-প্রেত ছিল, সবাই মিলে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ধরে পড়ল। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন—বাব্বা ! এ শিবের ব্যাপার। এখানে কি আমি মাথা গলাতে পারি ? বরং চল, তোমাদের নিয়ে যাই শিবের কাছে। সব বলি তাঁকে।

অগত্যা তাই। সবাইকে নিয়ে ব্রহ্মা মন্দর পর্বতে শিবের কাছে গিয়ে সব বললেন। তারপর অনুরোধ রাখলেন—শঙ্কর, সূর্যের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর কেন ? এবার ওকে মুক্তি দাও। আগের মত ও আবার কাজে ফিরে যাক।

শঙ্কর তো ভোলানাথ আশুতোষ। রাগলেন তো আগুন, আর ঠাণ্ডা হলেন তো বরফ। ব্রহ্মার আবেদনে আবার গলে জল হয়ে গেলেন। বললেন—সত্যিই তো, সূর্য বারাণসীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে, না ? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি বল ব্রহ্মা, সুকেশীর কি অপরাধ ? আহা, বেচারা বড় ভাল।

ব্রহ্মা বললেন—সে দায়িত্ব আমার শঙ্কর। সুকেশীর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না।

বারাণসীর জলে তখনও জ্বালা মেটাবার জন্য হাবুডুবু খাচ্ছিলেন সূর্যদেব। শঙ্কর এসে তাঁকে ডাকলেন। বললেন—লোল, এস আমার রথে। বলে শঙ্কর তাঁকে তুলে নিলেন। সেই থেকে সূর্যদেবের আর এক নামই হয়ে গেল 'লোল'।

এদিকে ব্রহ্মাও সুকেশীর সাধনার ধন সুকেশীপুরীকে আবার যেমনটি ছিল তেমনটি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আকাশ পথে।

সেই থেকে আবার এক উপগ্রহের মতই মহাকাশে থেকে গেল সুকেশীপুরী।

কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র

হঠাৎ একদিন কথাপ্রসঙ্গে নারদ মুনি পুলস্ত্য ঋষিকে জিজ্ঞেস করে বসলেন—আচ্ছা ঋষিবর, কুরুক্ষেত্র নামে ধর্মক্ষেত্রে কৌরব আর পাণ্ডবরা মুখোমুখি মহাসমরে নেমেছিল। কোথায় এই কুরুক্ষেত্র ? কেন এর নাম হল কুরুক্ষেত্র ? ধর্মক্ষেত্রই-বা হল কেন ?

প্রশ্ন শুনে পুলস্ত্য ঋষির মনে পড়ে গেল ইতিহাসের সেই পুরনো কাহিনী। তাঁর মন ভরে উঠল আনন্দে। বললেন—কি অপূর্ব প্রশ্নই না করেছ। ভাবতেও ভাল লাগে যে, এমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ একদিন আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। শোন, তাহলে বলি ঃ

সত্যযুগের কথা। সে সময় সোম বংশ ছিল খুব প্রসিদ্ধ বংশ। এই বংশের রাজা ঋক্ষ। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনাই চলত না। অত বড় ধার্মিক রাজা, সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। তাঁর পুরোহিত বশিষ্ঠদেবও ছিলেন তেমনি সত্যদ্রষ্টা। সেই ঋক্ষ রাজার ছেলে সংবরণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সূর্যের মেয়ে তপতীর। বশিষ্ঠদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, বলতে গেলে নিজেই সূর্যদেবের কাছ থেকে মেয়ে তপতীকে চেয়ে এনে নিজের আশ্রমেই তাঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই রাজা সংবরণের যথাসময়ে একটি ছেলে হল। যেমন রূপবান, তেমনি গুণবান। অল্প বয়সেই ছেলেটি বেদশাস্ত্র পড়ে ফেলল। সেই সঙ্গে যেহেতু রাজার ছেলে, তাই যুদ্ধবিদ্যা থেকে শুরু করে কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে হবে, সবই শিখে ফেলল। এমন ছেলে কজনের হয় ? রাজা সংবরণ মহাখুশি। চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগলেন মেয়েদের বাবারা।



রাজা সংবরণ দেখলেন, ছেলে কুরু-র বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। তিনিও মেয়ে দেখা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে সুদাম-রাজার মেয়ে সৌদামিনীকে ভাল লেগে গেল। বংশটি ভাল, মেয়েটি আরও ভাল। যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। ছেলের যোগ্য মেয়ে সুদাম। রাজা ভাবতেও পারেন নি, কুরু-র মত ছেলে তাঁর জামাই হবে। বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এর পরের কাহিনী·····

বয়স হয়েছে রাজা সংবরণের। ছেলে কুরু-ও ইতিমধ্যে সিংহাসনে বসার মত যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করেছেন। দেখে, মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সব নাগরিকদের ডেকে, তাঁকে রাজা করে সংবরণ নিজে চলে গেলেন বনে তপস্যা করতে।

এখন কুরু রাজা। রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজত্ব যেন আরো সুজলাসুফলা হয়ে উঠল। নিয়মিত বৃষ্টি হতো। চাষবাস হতো খুব ভাল ভাবে। রাজা কুরু-র সেদিকে ছিল সজাগ দৃষ্টি। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের খেত-খামার যদি ভরেই না থাকল, তাহলে শান্তি থাকবে কেন ? পেটে খিদে নিয়ে কি ধর্ম-কর্ম হয় ? তাই রাজা কুরু সারা রাজ্য ঘুরে ঘুরে দেখতেন সব জায়গায় চাষবাস সমান হয়েছে কিনা ? কারো কোথাও কোন অসুবিধে আছে কিনা।

· এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুকাল। কুরুর রাজ্য বুঝি স্বর্গরাজ্যকেও হার মানিয়ে দেয়। কোথাও কোন অভাব নেই, অভিযোগ নেই। রাজ্য চলছে নির্বিবাদে। চুরি নেই, ডাকাতি নেই, পরনিন্দা নেই, পরচর্চা নেই যে শাসন করার জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে। বাইরের কোন শত্রু নেই যে, যুদ্ধ করে তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। সভায় বসে মন্ত্রী-জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে কেবলমাত্র ধর্মালোচনা ছাড়া আর কিছুই তাঁর করার নেই।

ভেবে ভেবে রাজা কুরু ঠিক করলেন, এমন একটা কিছু করে যেতে হবে, এই পৃথিবীতে যেটা তাঁর অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে। কেননা, কীর্তিই একমাত্র অবিনশ্বর। যিনি কীর্তি রেখে যেতে পারেন তিনিই চিরকাল বেঁচে থাকেন।

কিন্তু কোথায় সেই কীর্তি স্থাপন করা হবে ? ঠিক করার জন্য রাজা কুরু একদিন পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি রথ নিয়ে নামলেন দ্বৈতবন নামে এক বনে। ভারি অপূর্ব দেখতে বনটি। বনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে সরস্বতী নদী। নদীতে স্নান-আহ্নিক সেরে জায়গা খুঁজতে খুঁজতে মনের মত একটা জায়গা দেখে ঠিক করলেন, তাঁর কাজ তিনি এখানেই করবেন। জায়গাটা হল ব্রহ্মার উত্তরবেদী স্যমন্তপঞ্চক। খুব পবিত্র জায়গা। ভগবান ব্রহ্মা এক সময় এখানে সুবিশাল এক যজ্ঞ করেছিলেন। তারপর জায়গাটা বনেই ঢেকে গিয়ে ছিল। কুরু রাজা ঠিক করলেন, এই ক্ষেত্রটিকেই তিনি উদ্ধার করবেন। এখানে ধর্ম বলতে যে আটটি জিনিস বোঝায় (অর্থাৎ তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, দয়া, শুচিতা, দান, যোগ আর ব্রহ্মচর্য) তা প্রতিষ্ঠা করবেন, যাতে পৃথিবীর মানুষ তা কখনো ভুলে না যায়।

একদিকে বিশাল বন, অপরদিকে রাজার জেদ। সঙ্কল্প যখন করেছেন, তখন শেষ না করা পর্যন্ত বিশ্রাম নেই।

রাজা কুরু একটা সোনার লাঙ্গল তৈরি করালেন। লাঙ্গলের জোয়ালে জুড়লেন একদিকে শিবের বাহন ষাঁড়কে আর একদিকে যমরাজের বাহন মোষকে। নিজের হাতে লাঙ্গল ধরলেন শক্ত



মুঠোয়। লাঙ্গলের ফলা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু রাজা নাছোড়।

প্রতিদিনই একটু একটু করে চষে চলেছেন রাজা। এমন সময় হঠাৎ একদিন দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে এসে হাজির হলেন।

—ও রাজা, এ তুমি কি করছ ? জিজ্ঞেস করলেন ইন্দ্র।

—আটটা ধর্মের চাষ করছি। লাঙ্গল থামিয়ে বললেন কুরু।

—বীজ কোথায় ?

রাজা কুরু জবাব দিতে গিয়েই দেখলেন, কোথায় উধাও হয়ে গেছেন ইন্দ্র।

আবার জমি চষার কাজে মন দিলেন রাজা কুরু।

ইতিমধ্যে সাত ক্রোশ জায়গা চষা হয়ে গেছে। চষতে চষতে রাজা কুরু প্রায় এসে গেছেন দৃষদ্বতী নদীর কাছ পর্যন্ত। এমন সময় একদিন এসে হাজির হলেন ভগবান বিষ্ণু, হাতে চক্র। রাজা কুরুও লাঙ্গল থামিয়ে প্রণাম জানালেন তাঁকে।

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন—কুরু, এ কি করছ ?

কুরু বললেন—জমি চষছি, ধর্মের বীজ বুনব বলে।

—ধর্মের বীজ ? সে আবার কি জিনিস কুরু ?

—আজ্ঞে, তপস্যা, সত্যাচরণ, ক্ষমা, দয়া, শুচিতা, দান, যোগ, ব্রহ্মচর্য—এই যে আটটা ধর্ম ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রাখে—সবকটাই তো এক একটা মহীরূহ। তার জন্যে জমি তৈরি না করলে, তার বীজ ঠিকমত না বুনলে, তা কি কখনো বড় হয়ে উঠতে পারে ?

—বাঃ ! খুব সুন্দর কথা বলেছ তো, কুরু। বিষ্ণু বললেন—তা এর বীজ তুমি কোথা থেকে পাবে ?

—কেন, আমার শরীর থেকে। কুরু বললেন—এর সব বীজ আমার দেহের মধ্যেই আছে প্রভু।

—কি রকম? দেখাতে পারো? বিষ্ণু বললেন।

—দেখুন। বলেই কুরু তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন বিষ্ণুর দিকে। বিষ্ণুও সঙ্গে সঙ্গে চক্র দিয়ে তাঁর গোটা হাতটাই কেটে ফেলে দিলেন। এরপর কুরু বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলেন। সেটাও কেটে ফেলে দিলেন বিষ্ণু। কুরুর মুখে তার জন্য কষ্টের কোন ছাপ নেই। কুরু এরপর তাঁর দুটো পা বাড়িয়ে দিলেন। বিষ্ণু সে দুটোও কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দিলেন। রক্তের নদী বয়ে চলেছে কিন্তু কুরুর মনে তার জন্য কোন কষ্টই নেই। এরপর, কুরু হাসিমুখে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর মাথা। চক্র তুলেও বিষ্ণু এবার থেমে গেলেন। ধন্য রাজা কুরু। প্রকৃত ধর্মকে না জানলে, কেউ কি এমন কথা বলতে পারে যে, এই শরীরের মধ্যেই আছে ধর্মের বীজ, আর তা প্রমাণ

করার জন্যে হাসিমুখে একটু একটু করে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেও তেমন ভাবেই প্রাণ দিতে যায়।

বিষ্ণু বললেন—থাক কুরু। পরীক্ষা আমার শেষ। বর চাও।

কুরু বললেন—মাধব, একটাই মাত্র প্রার্থনা। যত দূর মাটি আমি চষেছি, ততদূর পর্যন্ত জায়গা যেন ধর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এখান থেকে যাবতীয় পাপ যেন দূর হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রটি যেন মহা পুণ্যক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

বিষ্ণু বললেন—বেশ, তাই হবে। কুরু, এই সাত ক্রোশ জায়গা নিজে হাতে তুমি পরিষ্কার করেছ ধর্মের বীজ বোনার জন্য। তাই ধর্মক্ষেত্র তো এটা হবেই, সেই সঙ্গে আজ থেকে সর্বত্র এটি কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তুমিও দিব্যদেহ লাভ করে অমর হয়ে থাকবে।

সেই থেকে কুরুক্ষেত্র, যার আর এক নাম কুরুজাঙ্গল, আজও ধর্মক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ।

মঙ্কনক ঋষির কথা

মুনি-ঋষিদের রকমই আলাদা। রাগ-দুঃখ-আনন্দ—যাই হোক না কেন, চট করে বাইরে থেকে দেখলে তা বোঝা যাবে না। সব সময় তাঁদের দেখায় ধীর-শান্ত। বাচালতার লেশমাত্র প্রকাশ পায় না। বিশেষ করে যাঁরা বড় যোগী, তাঁদের তো নয়-ই।

মঙ্কনক নামে এক ঋষি ছিলেন। বড় তপস্বী। মুনি-ঋষিদের সমাজে তাঁর কদরও ছিল অনেক। সরস্বতী নদী যতবার কুরুক্ষেত্র থেকে এদিকে-ওদিকে সরে গিয়েছিল, এই ঋষি তপস্যার জোরে আবার তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কুরুক্ষেত্রে।

হঠাৎ একদিন মঙ্কনক ঋষি সব কিছু ভুলে মহানন্দে পাগলের মত নাচতে শুরু করে দিলেন।

কি ব্যাপার?

কুশে একদিন ঋষির আঙুলের ডগা কেটে গিয়ে ছিল। দেখলেন, সেই ক্ষতস্থান থেকে ঝরে পড়ল সবুজ রঙের রস—শাক থেঁতো করে নিংড়ালে যেমন বের হয়, তেমন রঙের রক্ত।

মুনির ধারণা হল, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ না করলে রক্তের রং এমন ভাবে বদলে যায় না। তাই তাঁর মহানন্দ। সেই আনন্দকে মনের ভেতর ধরে রাখতে না পেরে তিনি উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিলেন।

নাচ তো নাচ। সে দারুণ নাচ। নাচের চোটে মাটি কেঁপে উঠল। চমকে উঠল পৃথিবীর সকলেই। শুধু অবাকই হল না, সেই সঙ্গে তারাও নাচতে শুরু করে দিল। ভূমিকম্পের দোলায় যেন সব দুলছে। তাই দেখে দেবতারাও গেলেন ভড়কে। এ আবার কি হল? সকলেই কুরুক্ষেত্রে ছুটে এসে দেখলেন, মঙ্কনক মুনি আনন্দে নাচছেন। তাই এমন কাণ্ড।

অনেকেই অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুনির নাচ কেউ থামাতে পারলেন না। দেবতারা শেষে বাধ্য হয়ে মহাদেবের কাছে গেলেন।

সকলে মিলে শঙ্করকে স্তবে তুষ্ট করে বললেন—মহেশ্বর, মঙ্কনককে থামাতে না পারলে সব যে রসাতলে যায়। আপনি একটা কিছু করুন। নইলে আমরাও যে যেতে বসেছি।

এরপর কি আর মহেশ্বর চুপ করে থাকতে পারেন? তিনি এলেন মঙ্কনক ঋষির কাছে।

—কি হল মঙ্কনক, এত আনন্দ কিসের?

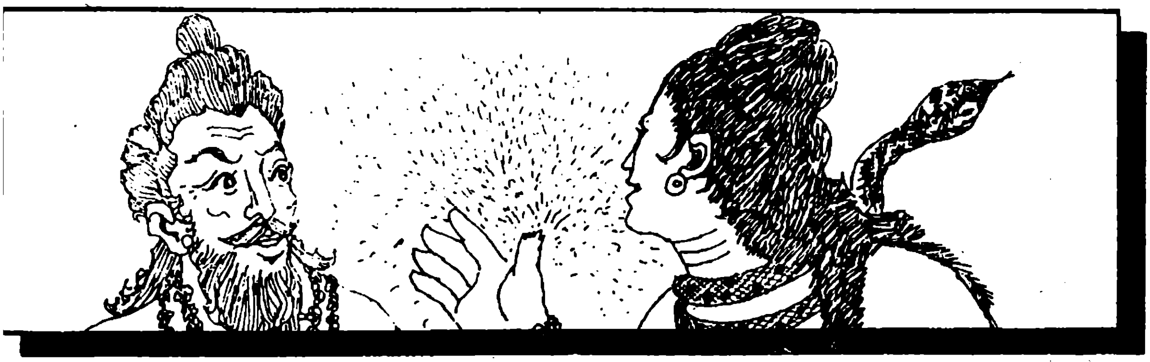
সামনে মহাদেবকে দেখে মঙ্কনকের ধারণা হয়েছিল, তাঁর কঠোর তপস্যার জন্য মহাদেব তাঁকে সাধুবাদ দিতে এসেছেন।

মঙ্কনক তাঁর কুশে-কাটা হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখতে পাচ্ছেন আমার তপস্যার জোর? রক্তের রং বদলে সবুজ করে ফেলেছি।

—তাই নাকি? সবুজ রং দেখে মহাদেব বললেন—সত্যিই, তোমার তপস্যার তুলনা নেই।

বলেই মহেশ্বর হাতের এক আঙুল দিয়ে নিজের অপর হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে দিলেন। কাটার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে যা বেরিয়ে এল তা দেখে মঙ্কনকের চক্ষু স্থির। প্রথমত বিনা অস্ত্রে আঙুল দিয়ে আঙুল কাটা দেখে মঙ্কনক অবাক তো হয়েই ছিলেন, তারপর যখন দেখলেন, ক্ষতস্থান থেকে হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে খালি ঠাণ্ডা ছাই, মঙ্কনক আর স্থির থাকতে পারলেন না। তপস্যার আগুনে মহাদেব ভেতরের সব রসকে শুকিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছেন, অথচ কোন ভাবেই তা কারো কাছে জাহির করেন না। আর তিনি! ছি...ছি।

থেমে গেল মঙ্কনকের নাচ। ভূকম্পন থামল। সেই সঙ্গে দেবতারাও নিশ্চিন্ত হলেন।





সরস্বতীর মুক্তি

তপস্যা নিয়ে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের বিরোধ চলেছিল বহুদিন। মহাতেজী, মহাক্রোধী বিশ্বামিত্রের তপস্যা ব্রাহ্মণ হবার জন্য, মহা-মহা মুনিদের সঙ্গে এক আসনে সমান মর্যাদা নিয়ে বসার জন্য। বশিষ্ঠ যদি একবার মেনে নেন, তাহলে সবাই মেনে নেবেন। কিন্তু বশিষ্ঠদেব কিছুতেই তা মেনে নেবেন না, বিশ্বামিত্রও ছাড়বেন না। বশিষ্ঠ যেমন বড় তপস্বী, বিশ্বামিত্রও কিন্তু তাঁর তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিলেন না। তাই বশিষ্ঠের ওপর তাঁর রাগ ছিল দারুণ। সুযোগ পেলেই তাঁকে হেনস্থা করতেন, অপমান করতেন যদি বশিষ্ঠ তাঁকে ঋষি বলে স্বীকার করে নেন।

কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর পূর্বদিকে স্থাণুতীর্থ। এখানে ছিল বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। এই আশ্রমে বসেই বশিষ্ঠদেব নিশ্চিন্ত মনে কঠোর তপস্যা করতেন। এরই পশ্চিমে ছিল বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বিশ্বামিত্র সেখানে বসে ব্রাহ্মণ হবার জন্য সাধনা করতেন।

বশিষ্ঠদেবের তপস্যার কাছে বিশ্বামিত্রের তপস্যা! কেউ ফিরেও তাকায় না তাঁর দিকে। দেখে বিশ্বামিত্রের মাথায় আগুন জ্বলে গেল। মনে মনে ভাবলেন একেবারে পৃথিবী থেকেই বশিষ্ঠকে সরিয়ে দিতে হবে। আর এমন ভাবে সে কাজ করতে হবে, যাতে কেউ জানতে না পারে যে বিশ্বামিত্রই খুন করেছেন তাঁকে।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা উপায় ঠিক করলেন বিশ্বামিত্র। সরস্বতীকে দিয়েই এ কাজ করাতে হবে।

সরস্বতীকে ডেকে বিশ্বামিত্র বললেন—শোন সরস্বতী, আমার আদেশ, জলের তোড়ে তোমায় বশিষ্ঠের আশ্রয় ভাসিয়ে তছনছ করে দিতে হবে, আর বশিষ্ঠকে নিয়ে আসতে হবে আমার কাছে। আমি তাঁকে খুন করব।

শুনে সরস্বতীর বুক কেঁপে উঠল। এত বড় একজন তপস্বী বলেন কি? বশিষ্ঠের মত মহাঋষিকে খুন করবেন, আর সেই কাজে গোপনে তাঁকে সাহায্য করতে হবে? আবার না করেও উপায় নেই। যা রাগী! অভিশাপ দিয়ে বসলে রক্ষা নেই।

কিন্তু বশিষ্ঠদেবের ক্ষতি মনে প্রাণে কেউই চায় না। সকলেই তাঁকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

অগত্যা একদিন খুব ভয়ে ভয়ে সরস্বতী গেল বশিষ্ঠদেবের কাছে। তাঁকে বিশ্বামিত্রের সব কথা খুলে বলল।

মন দিয়ে সব শুনলেন বশিষ্ঠদেব। তারপর সরস্বতীকে বললেন—বিশ্বামিত্র তোমাকে যেমন আদেশ করেছেন, তুমি তেমনটিই কর সরস্বতী। তা নইলে যে তপস্বীর অপমান করা হবে। মুনি-ঋষিদের আদেশ কখনো অবজ্ঞা করতে নেই।

বশিষ্ঠদেবের কথা শুনে সরস্বতীর মনে মনে খুব কান্না পেয়ে গেল। এত মহৎ, এত উদার! মৃত্যু হবে জেনেও বলছেন—মুনি-ঋষিদের আদেশ কখনো অবজ্ঞা করতে নেই। তার মানে, ওঁকে আমায় নিয়ে যেতে হবে বিশ্বামিত্রের কাছে। এমন একটা প্রাণ আমায় তুলে দিতে হবে খুনীর হাতে।

সরস্বতী ইতস্তত করছেন দেখে বশিষ্ঠদেব বললেন—দেরি করো না সরস্বতী। এতে বিশ্বামিত্র হয়ত তোমার ওপর আরো রেগে যেতে পারেন।

বশিষ্ঠদেব ঠিক কথাই বলেছেন। বাধ্য হয়েই সরস্বতীকে ফুলে-ফেঁপে উঠতে হল। তখন সে কি প্রলয়ঙ্কর রূপ সরস্বতীর! গর্জন করতে করতে ভাসিয়ে দিল বশিষ্ঠদেবের আশ্রম, সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেল বশিষ্ঠদেবকেও।

ওদিকে বিশ্বামিত্র উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন, সরস্বতী কখন আনবে বশিষ্ঠকে।

জলপ্লাবনে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ বশিষ্ঠ এসে হাজির হলেন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। ঢেউ-এর ঢেউ তুলে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে সরস্বতী।

বিশ্বামিত্রের আশ্রম-প্রান্তে বশিষ্ঠ এসে আছড়ে পড়তেই লাফিয়ে উঠলেন বিশ্বামিত্র—এবার! এবার বশিষ্ঠ, তোমায় বাঁচাবে কে? বলেই আশ্রমের ভিতর ঢুকলেন অস্ত্রের সন্ধানে।

ইতিমধ্যে জলের তোড় তো আর এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। সরস্বতী থেকে উঠে এল আর একটা ঢেউ, তারপর আর একটা, তারপরে আরও একটা। আর সেই ঢেউ-এ বশিষ্ঠদেব ভেসে গেলেন।

এদিকে আশ্রমের ভেতর থেকে অস্ত্র এনে বিশ্বামিত্র দেখলেন, সরস্বতী তাঁর শত্রুকে নাগালের বাইরে পাচার করে দিয়েছে। জলে ভেসে এতদূরে চলে গেছেন বশিষ্ঠ যে, ধরে এনে গায়ের জ্বালা মেটানো আদৌ আর সম্ভব নয়।

সরস্বতী কিন্তু মনে মনে মহা খুশি হঠাৎ মাথায় এমন এক বুদ্ধি গজিয়ে ওঠার জন্য। বিশ্বামিত্রের আদেশ সে অমান্য করে নি। বশিষ্ঠকে এনে সে মুনির কাছেই দিয়েছিল। আবার কৌশলে তাঁর জীবনও বাঁচাতে পারল।

বিশ্বামিত্র কিন্তু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। এত দূর স্পর্ধা সরস্বতীর যে, তাঁর শত্রুকে কাছে এনেও আবার সরিয়ে নিয়ে গেল। অভিসম্পাত দিয়ে বসলেন—তোর জল পূঁজ আর রক্তে ভরতি হয়ে যাক।

দুর্ভাগ্য সরস্বতীর। অমন স্বচ্ছ জল, অমন পবিত্র নদী, মুহূর্তে পূঁজ-রক্তের নদী হয়ে গেল। অপবিত্র। কেউ আর তার ধারে-কাছে যায় না। যার জলে স্নান করে পবিত্র হবার জন্য সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মুনি-ঋষি থেকে মানুষদের ভিড় লেগেই থাকত, সবাই তাকে পরিত্যাগ করল। দুর্গন্ধে ভরে গেল আশপাশ। দু-পাড়ে যারা ছিল, সব সরে গেল দূরে দূরে।

এভাবে ভাগ্যহীনা সরস্বতীর কাটল অনেকগুলো দিন—প্রায় একটা বছর। এই সময় তার নিত্যদিনের সঙ্গী হল রাজ্যের ভূত-প্রেত-পিশাচ। ব্রহ্মরাক্ষস হতো তারাই, যারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেও ব্রাহ্মণের যা কাজ তা করত না। ব্রাহ্মণদের অপমান করত। তারাই মৃত্যুর পর হত ব্রহ্মরাক্ষস। আর সুযোগ-সুবিধে করে

ব্রাহ্মণ তপস্বীদের ধরে ধরে খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাত। এমন অজস্র পুঁজ আর রক্তের নদী পেতে তারা সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল। দিন-রাত পড়ে থাকত তার পাশে। আর খিদে পেলে ঐ পুঁজ আর রক্ত খেত মহানন্দে। সরস্বতীর বুকে অফুরন্ত খাদ্য পেয়ে তাদের আনন্দ যেন স্বর্গজয়ের আনন্দ।

ওদিকে দেবতা থেকে গন্ধর্ব, অপ্সরা, ঋষিরা সরস্বতীর এই অবস্থা দেখে সকলেই বেশ দুঃখিত হলেন। ভাবতে লাগলেন, কিভাবে সরস্বতীকে মুক্ত করা যায়। তার আগের পবিত্রতা আবার ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

এমন এক সময়ে প্রায় আটাশ ক্রোশ দূর থেকে কয়েক জন তপস্বী এলেন সরস্বতীর জলে স্নান করতে। তাঁরা জানতেন না এসব। এসেই দেখেন, এ কি, পবিত্র সরস্বতীর জল এমন রক্তের নদী হয়ে গেল কিভাবে? তার চারদিকে এত ভূত-প্রেত-নিশাচরদের মহোৎসবই-বা বসল কিভাবে।

জিজ্ঞেস করলেন সরস্বতীকে—সত্যি করে বলতো সরস্বতী, কেমন করে তোমার এই দুরবস্থা হল।

সরস্বতী তাঁদের আদ্যোপান্ত সব খুলে বললে তাঁরা সকলেই বিশ্বামিত্রকে ছি...ছি করে উঠলেন। বললেন—কিছু ভেবো না সরস্বতী, আমরা এর বিহিত করছি। এই বলে তাঁরা চলে গেলেন কিছু দূরে অরুণা নদীর কাছে। অনেক কষ্টে তাকে তুষ্ট করে এনে মিলিয়ে দিলেন সরস্বতীর সঙ্গে। সরস্বতীও অরুণার সঙ্গে মিশে আবার আগের মত হয়ে গেল।

ভূত-প্রেত থেকে রাক্ষসরা সকলে হায় হায় করে উঠল। এমন সুখের রাজত্ব তাদের চলে গেল। এখন তাদের কি গতি হবে? সকলেই গিয়ে ধরল তপস্বীদের। তপস্বীরা বললেন—তোমরা ঐ সঙ্গমে স্নান কর, মুক্তি পাবে। শেষে সত্যিই তাই হল।

রাজা বেণের মুক্তি

কুরুক্ষেত্রের স্থাণুতীর্থ। রাজা কুরুর চেষ্টায় আর আন্তরিকতায় যদিও সারা কুরুক্ষেত্রটাই ধর্মক্ষেত্র হয়ে গিয়েছিল আর সরস্বতী নদী সব পাপী-তাপীকে উদ্ধার করত, তবুও এরই মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা যেন স্পর্শমণি হয়ে উঠেছিল। সেখানে গেলেই যেমন অফুরন্ত আনন্দ মিলত, তেমনি ভগবানের দয়ায় সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত। কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে এমন একটা জায়গা হল স্থাণুতীর্থ।

রাজা বেণের ছেলে পৃথু তখন পৃথিবীর রাজা। গুণে-শীলে সব দিক থেকেই তিনিই পৃথিবীতে প্রথম সুযোগ্য রাজা হয়েছিলেন। ধর্ম মেনে চলতেন যেমন নিজে, প্রজারাও যাতে ধর্মপথে থাকে তার দিকেও তিনি নজর রাখতেন। কিন্তু তাঁর বাবা রাজা বেণ ছিলেন ঠিক উলটো। ধর্ম-কর্ম মানতেন না, যাগ-যজ্ঞ জানতেন না। বলতেন—আমি রাজা, আমি ভগবান, আমি ঈশ্বর। যদি কারো পুজো করতে হয় তবে আমারই পুজো করবে, আর কারো নয়। রাজার ওপরও যে একজন রাজা আছেন, যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, বেদশাস্ত্র তার প্রমাণ। যাগ-যজ্ঞ না করলে পৃথিবীর রাজার রাজত্ব সুখের হয় না—এ কথা তিনি মোটেই জানতেন না। কেউ বলতে এলে তার আর নিগ্রহের শেষ থাকত না। তাই ব্রাহ্মণরা বিদ্রোহ করে বেণ রাজাকে মেরে তাঁর ছেলে পৃথুকে রাজা করলেন। তাঁর শাসনে পৃথিবীর অরাজকতা দূর হয়ে গেল। আবার বেদপাঠ, যাগ-যজ্ঞ নিয়মিত চলতে লাগল। পৃথিবীও শস্যে ভরে গেল। কোথাও কোন অভাব রইল না। কিন্তু ধার্মিক রাজা পৃথুর মনে একটু অশান্তি থেকে গেল।



বেণ রাজা অত্যাচারী, ধর্মদ্বেষী ছিলেন ঠিকই। তার জন্য তার ফলও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। শাস্ত্রের নিয়মে মহাপাপের ফলে মৃত্যুর পর তাঁকে নিশ্চয়ই নরকযন্ত্রণাও ভোগ করতে হচ্ছে। ছেলে হয়ে বাবাকে সেই নরকযন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে না পারলে, ছেলে হয়েও যে তিনি মহাপাপী হয়ে থাকবেন। কিন্তু কিভাবে? এখন কোন নরকে তিনি কি যন্ত্রণা ভোগ করছেন, কে জানে?

এমন ভাবে পৃথু রাজা যখন বসে বসে ভাবছেন, নারদ মুনি এসে হাজির হলেন। সর্বজ্ঞ নারদ মুনি। রাজা পৃথু জিজ্ঞেস করলেন—আপনার তো অজানা কিছু নেই, মুনিবর। আপনি জানেন, আমার বাবা ধর্মদ্বেষী। স্বধর্ম ত্যাগ করে মহাপাপের ভাগী হয়ে মারা গেছেন। এখন তিনি কোথায়?

নারদ মুনি বললেন—তোমার বাবার এখন নীচ বংশে জন্ম হয়েছে। অচ্ছুৎ-পল্লীতে ক্ষয়রোগ আর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে সে যন্ত্রণা ভোগ করছে।

একথা শোনার পর কোন ছেলে চুপ করে থাকতে পারে?

লোক-লস্কর আর পাল্কি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাজা পৃথু ছুটলেন সেই নীচ পল্লীতে। রাজাকে সবাই চেনে। হঠাৎ তাঁকে সেখানে আসতে দেখে বেশ ভিড় জমে গেল।

রাজা বললেন—তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি। 'যে মানুষটি তোমাদের এখানে ক্ষয়রোগ আর কুষ্ঠরোগে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে আমায় দাও। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তুলব।

অমন রাজার এমন উদার অনুরোধ কি কেউ ঠেলতে পারে? সকলেই এক বাক্যে সায় দিল।

রাজা পৃথু তাকে তুলে নিয়ে এলেন স্থাণুতীর্থে—মহাপাপী-তাপীরা যে তীর্থে অতি সহজেই উদ্ধার পেয়ে যায়। মনে মনে পৃথু এখন খুশি। বাবার জন্য ছেলের যা করণীয় কর্তব্য, এবার তিনি তা করতে পারবেন।

এরপর বাবা বেণকে নিয়ে পৃথু সেই স্থাণুতীর্থের জলে স্নান করাতে যাবেন, এমন সময় হাঁ...হাঁ করে উঠল তীর্থের জলবায়ু—পৃথু, অমন কাজ করো না। ঐ মহাপাপীকে উদ্ধার করার সাধ্য আমার একার নেই। আমি নিজেই অপবিত্র হয়ে যাব। এই মহাতীর্থ নষ্ট হয়ে যাবে।

রাজা পৃথু মুষড়ে পড়লেন—উপায়?

পবনদেব বললেন—একটা কাজ কর। তোমার ঐ ঘোরতর নাস্তিক, মহাপাপী বাবাকে যখন এখানে এনেছ, তখন যেমন এক পাশে আছে, তেমনি একপাশে রেখে দাও। তুমি নিজে প্রতিটি তীর্থে ঘুরে ঘুরে স্নান কর। আর তার জল এনে ওর গায়ে ছিটিয়ে দাও।

অগত্যা রাজা পৃথু আর কি করেন। সেখানেই একটা কুটির তৈরি করে বাবাকে রেখে নিজেই বের হলেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরে স্নান করে বাবার মুক্তির জন্য জল সংগ্রহ করতে লাগলেন। আর রাতে ফিরে প্রতিদিন সেই জল তার গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন।

এমনি ভাবে দিনের পর দিন কেটে চলেছে। রাজা পৃথুও প্রতিদিন একই কাজ করে চলেছেন।

এক সময় এক হৃষ্টপুষ্ট কুকুর এল সেখানে। রাজা পৃথু তখন তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন।

কুকুরটার এটা ছিল দ্বিতীয় জন্ম। প্রথম জন্মেও কুকুর হয়েই জন্মেছিল। থাকত আশ্রমে। মুনি-ঋষিদের খাবার-দাবার পাহারা দিত। তাঁরা যা দিতেন, তাই খেত। একদিন কিন্তু লোভে পড়ে গেল। চুপি চুপি তাঁদের খাবার খেয়ে বসল? তারপর থেকে প্রতিদিনই বাড়তে থাকে তার লোভ। চুরি করে খেতে খেতে যখন সে মারা গেল, যমরাজ তখন আবার তাকে কুকুর-জন্ম দিয়ে দ্বৈতবনে পাঠালেন। এঁটো-কাঁটা খেয়ে কুকুরের দিন কাটে সেখানে। সে তো আর একা নয়। আরো অনেক কুকুর আছে সেখানে। শুরু হল নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, মারামারি। অপরাপর কুকুরদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে নিজের ডেরা ছেড়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে এল স্থাণুতীর্থে, যেখানে পৃথু বেণকে রেখে গিয়েছিলেন। খিদেয় পেট ঢকঢক করছে। তেষ্টায় প্রায় এক হাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কুকুর সোজা গিয়ে নামল সরস্বতীর জলে। গা ডুবিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে শরীরটাকে ঠাণ্ডা করে আকণ্ঠ জল খেয়ে পায়ে পায়ে এসে ঢুকল বেণের কুটিরে।

কুকুরটাকে দেখে বেণের কেমন যেন কি একটা মনে হল। কাছে আসতেই কুকুরটার ভিজে গায়ে যেই হাত বুলিয়ে দিল, অমনি বেণের মনে হল তার সব জ্বালা-যন্ত্রণা যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। কুষ্ঠরোগে খসে যাওয়া আঙুল যেন আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল, যক্ষ্মারোগের কষ্ট যেন কোথায় দূর হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মনটাও যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।

আর যে মুহূর্তে রাজা বেণের মন হল পরিষ্কার, সব দেখতে পেল—ছিঃ ছিঃ, এতদিন কি করেছে সে? অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কেমন করে সে রাজার রাজাকে ভুলে গিয়েছিল? ধিক্কারে ভরে উঠল তার মন। দেবাদিদেবের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুরু করল—হে দেব, আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। আমায় মার্জনা কর।

তার কান্না আর আকুল প্রার্থনায় স্থির থাকতে পারলেন না মহাদেব। তার সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন—তুমি এখন পবিত্র হয়েছ, বিশুদ্ধ হয়েছ। তুমি মুক্ত। শিবধামে যাও।

বেণ বলল—দেব, যে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিল, রাজাধিরাজকে যে আমায় চিনিয়ে দিল, সেই কুকুরকে ফেলে আমি কেমন করে যাব?

বেণের কথা শুনে শিব আরো খুশি হলেন। দু-জনেই দিব্যদেহ ধারণ করল। তৈরি হল শিবলোকে যাবার জন্য। এখন দেখলে কে বলবে এই কুটিরে রোগ-ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট করছিল একটা মানুষ, যে পূর্বজন্মে ছিল রাজা বেণ। নিজেকে ঘোষণা করেছিল সর্বেশ্বর বলে। আর ধুঁকছিল একটা কুকুর।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রাজা পৃথু, প্রতিদিনের মত সেদিনও নানা তীর্থের জল নিয়ে এলেন কুটিরে, বাবার গায়ে ছিটিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই রোগজীর্ণ বাবা? তার জায়গায় ইনি এখানে কে? ঠিক যেন একজন দেবদূত!

দেখে অবাক হলেন পৃথু।

দিব্যদেহধারী বললেন—পৃথু, আমিই তোমার সেই বাবা।যাকে নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য তুমি এত কষ্ট করছ। এই তো প্রকৃত ছেলের কাজ। পৃথু, আমি মুগ্ধ হয়েছি। আর আমার কোথাও কোন যন্ত্রণা নেই। আমি চললাম। তুমি ধর্মপথে থেকে পৃথিবীকে শাসন কর। এই বলে রাজা বেণ শিবলোকে চলে গেলেন।

পিতার জন্য পুত্রের যা করার ছিল, তা শেষ হয়েছে। পৃথু এবার নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এসে আবার রাজকার্যে মন দিলেন।



মুরারির কথা

মুরারি। ভগবান কৃষ্ণ, বাসুদেব বা মধুসূদনের আর এক নাম।

কিন্তু কেন সবাই বাসুদেবের নাম মুরারি দিল? আর দেবতারাও ঐ নামে তাঁর স্তব-স্তুতি করলেন?

সে এক বিচিত্র কাহিনী।

ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপের এক ছেলে ছিল। তার নাম মুর। মহাতেজী, মহা-বলশালী। হলে কি হবে। হঠাৎ তার মনে একদিন দারুণ এক ভয় ঢুকে গেল—মৃত্যুভয়। তার কারণও ছিল।

দেবতাদের সঙ্গে দৈত্য-দানবদের যুদ্ধ সে সময় প্রায়ই লেগে থাকত। আর এমনই মজা, দৈত্যরা খালি লাখে লাখে দেবতাদের

হাতে মারা পড়ত। কোনমতেই তাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। সামনা-সামনি যুদ্ধে তো মারতই, এমন কি কৌশল করেও দেবতারা অসুরদের মারত।

দেখে দেখে মুর ভাবল, হয়ত তারও একদিন ঐ রকম অবস্থা হবে। কিন্তু এই ভাবে মরতে সে রাজি নয়। অনেক সন্ধান নিয়ে মুর জানল, ওদের ঠাকুর্দা ব্রহ্মাই জ্ঞাতি-ভাইদের অমর করে রেখেছে, তাঁদের কাছ থেকে বেশি মাত্রায় তোয়াজ পেয়ে। তাই দেখে মুর ঠিক করল, ঐ ঠাকুর্দাকে যেমন করে হোক, কব্জা করতে হবে।

ব্রহ্মাকে কব্জা করতে গেলে একটাই মাত্র পথ—সে হল তপস্যা।

মুর নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে ঠাকুর্দাকে স্মরণ করে এক মনে তপস্যা করতে বসল। সুকঠোর তপস্যা। কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। চট করে কি আর ধরা দেন ব্রহ্মা? কিন্তু মুরের তপস্যা ছিল এমনি নিখুঁত যে, একদিন তাঁকে ধরা দিতেই হল।

মুরের কাছে এসে ব্রহ্মা বললেন—মুর, বর চাও। তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট।

মুর বলল—বর চাইতে হলে আমি একটাই মাত্র চাইব। আর সেটাই তোমাকে দিতে হবে।

—বেশ, বল। তাই দেব।

—আমি যাকে যখনই ছোঁব, সে তক্ষুণি মারা যাবে।

ব্রহ্মা পড়লেন ফ্যাসাদে। কথা দিয়ে কথা না রাখাও অন্যায়। বললেন—বেশ, তাই হবে। এই বলে তিনি চলে গেলেন।

এবার আর মুরকে পায় কে? ব্রহ্মার বর, মিথ্যে হবার নয়। স্বর্গে-মর্ত্যে সব জায়গায় মুর রটিয়ে দিল বর পাওয়ার কথা। যক্ষ, কিন্নর, দেবতারা যে যেখানে ছিল, শুনে আর তার কাছে যায়?

মুর এবার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গেল দেবরাজ্য অমরাবতীতে। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল দুটো হাত।

অমরাবতীতে যে যেখানে ছিল, হাত বাড়িয়ে মুর দৈত্যকে আসতে দেখে প্রাণ নিয়ে পালাল। সর্বনাশ! ছুঁলেই মৃত্যু। আর কাছে থাকে কেউ!

মুর নির্বিবাদে গিয়ে ঢুকল প্রাসাদে। সিংহাসনে বসে ইন্দ্র। ইন্দ্রকে দেখেই মুর গেল রেগে—তোমার সাহস তো মন্দ নয়। সবাই পালাল, তুমি বসে আছ! যুদ্ধ চাও নাকি? এসো। তা বসে আছ কেন?

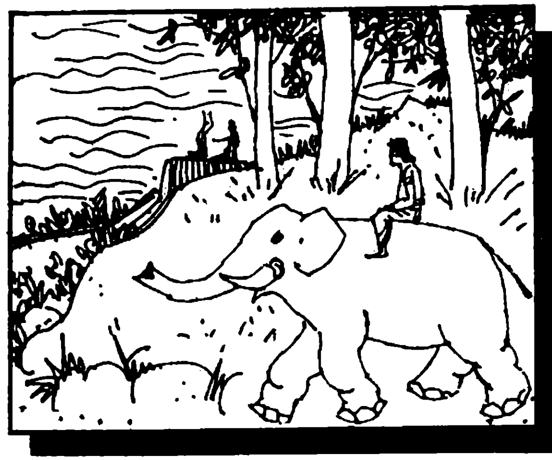
দেবরাজ জানেন, যুদ্ধ করেও মুরকে ঠেকানো যাবে না। ভয়ে ভয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। সেই সঙ্গে নিজের বজ্র আর ঐরাবতও দিতে হল তাকে।

স্বর্গরাজ্য এখন মুরের দখলে। অঢেল ভোগ করার জিনিস। প্রচুর সম্পদ। জ্ঞাতি-কুটুম মুরের যে যেখানে ছিল, সবাই স্বর্গরাজ্যে এসে ফেলে ছড়িয়ে ভোগ করতে লাগল।

একদিন কি খেয়াল গেল মুরের। স্বর্গরাজ্য থেকে নেমে এল পৃথিবীতে। হাতির পিঠে চেপে সরযূ নদীর তীর ধরে আসতে আসতে দেখল, রঘুরাজ নদীর ধারে কাঠ-কুটো (সমিধ) নিয়ে যজ্ঞ করছেন।

মুর এসেই বলল—আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমাকে না হারাতে পারলে যজ্ঞ করা চলবে না।

রঘুরাজ দেখলেন মহা মুশকিল। যুদ্ধ করবেন কি, ছুঁলেই তো



মারা যেতে হবে। এদিকে যজ্ঞের সব আয়োজন শেষ। যজ্ঞ বন্ধও করা যেতে পারে না।

কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ছিলেন সেখানে। তিনি তখন এগিয়ে এসে সবিনয়ে মুরকে বললেন—দৈত্যরাজ, আপনার ক্ষমতা অসীম। কার সাধ্য আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে? মর্ত্যে তো এমন কেউ নেই, যিনি আপনার বশীভূত নয়, এই রঘুরাজ তো কোন ছার। সামান্য একটা যজ্ঞের জন্য এর ওপর বিক্রম দেখানো কি আপনার শোভা পায়? যদি বুঝতাম আপনি যমরাজকে আপনার বশে এনেছেন, তাহলে বুঝতাম, হ্যাঁ, একটা কাজের কাজ করেছেন।

—যমরাজ? সে আবার কে? কোথায় থাকে, কি করে? জিজ্ঞেস করে মুর।

—সে-ই তো সব নাটের গোড়া। পৃথিবীতে যে যেখানে আছে সবাই তারই ভয়ে অস্থির। কখন যে কাকে দূত পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাবে, কে বলতে পারে। থাকে সংযমনী পুরীতে, দারুণ কড়া পাহারা সেখানে, তাকে যদি একবার বশে এনে শাসন করতে পারেন, তাহলে জানবেন, কেউ কোথাও আপনার অবাধ্য হবার সাহস পাবে না। বশিষ্ঠদেব বললেন।

শুনেই তো মুরের রক্ত টগবগ করে উঠল। এত দিন ধারণা ছিল, ইন্দ্রকে জয় করলেই বুঝি সব জয় করা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ত্যাগ করে মুর গিয়ে হাজির হল সংযমনীতে সদলবলে। মুর আসছে খবর পেয়ে যমরাজ ছুটে গেলেন ক্ষীরোদ সাগরে। ভগবান বিষ্ণু তখন সেখানেই শ্বেতদ্বীপে ছিলেন। তাঁকে মুরের সব কথা বলতেই কেশব বললেন—ঠিক আছে, সে এলে কৌশলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

রণসাজে ইতিমধ্যে মুর এসে হাজির হতেই যমরাজ জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই তোমার এখানে?

মুর বলল—ত্রিভুবনের রাজা আমি মুর। আমার আদেশ, প্রজাদের ওপর তোমার শাসন আর চলবে না। যদি শাসন করার চেষ্টা কর, তাহলে তোমার মাথা খসে যাবে।

যমরাজ বললেন—তুমি তো আমায় খুব মুশকিলে ফেললে মুর। আমি যে রাজার আদেশে এই কাজ করি, তোমার কথায় তা বন্ধ করলে যে তাকে অমান্য করা হবে। সেটা কি ঠিক হবে? তবে তুমি যদি আমাকে পুরোপুরি অভয় দিতে পার, তাহলে তোমার কথা

মানতে আমার কোন অসুবিধে নেই।

—কেন? তুমি যার কথা মেনে চলছ, সে কি আমার চেয়েও শক্তিশালী? বেশ, তার সঙ্গেই আগে আমার বোঝাপড়া হয়ে যাক। থাকে কোথায়? কি নাম তার?

—তিনি হলেন ভগবান বিষ্ণু। এখন আছেন ক্ষীরোদ সাগরে। সেখানে গেলেই তুমি তাঁর দেখা পাবে। তাঁর কাছ থেকে ব্যাপারটা ঠিক করে এলে আমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার আদেশ মেনে চলতে পারব।

সংযমনী পুরী থেকে সঙ্গে সঙ্গে দানবরাজ সসৈন্যে এসে হাজির হল ক্ষীরোদ সাগরে। এসেই দেখে, চতুর্ভুজ এক অপূর্ব মূর্তি সামনে। দেখা মাত্রই অমন দৈত্যের বুকও কেমন যেন দুরুদুরু করে উঠল। এমন কোন পুরুষ যে কোথাও থাকতে পারে, তা মুরের কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

বিষ্ণু তাঁকে দেখেই বললেন—কে তুমি? এখানে কি করতে এসেছ? কি চাই?

মুর কোন রকমে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল—আমি দানবরাজ মুর। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই।

—যুদ্ধ করবে আমার সঙ্গে? বিদ্রূপের হাসি হাসলেন বিষ্ণু। তারপর বললেন—যুদ্ধ করতে এসেছ, তা ভাল। বুক অমন দুরুদুরু করে কাঁপছে কেন? ভীতুর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করি না, যাও।

মুর তখন নিজেকে সামলাবার জন্য নিজের দু-হাত দিয়ে নিজের বুক যেই চেপে ধরল, অমনি অজ্ঞান হয়ে গেল। বিষ্ণুও সেই সুযোগে চক্র দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন।

ব্রহ্মাণ্ড থেকে মস্ত বড় একটা আপদ বিদেয় হল। পৃথিবীর শান্তি ফিরে এল। দেবরাজও তাঁর রাজত্ব ফিরে পেলেন।

সেই থেকে বিষ্ণুর আর এক নামই হয়ে গেল মুরারি।



দণ্ডকারণ্যের কাহিনী

দণ্ডকারণ্য নাম এখন আর কারো কাছেই অপরিচিত নয়। বসবাসের একেবারে অযোগ্য এই জায়গা। এখানকার মাটি এমন শুষ্ক যে, কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। যেখানকার মাটি উর্বর নয়, ফসল ফলে না, সেখানে কি কেউ বসবাস করে? ফলে জনশূন্য হতে হতে একেবারে প্রায় মরুভূমি। এমন কি হিংস্র জন্তুরাও থাকে অতি কষ্টে। ইদানীং অবশ্য অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু, একদিন এই জায়গাটা এই রকম ছিল না। গাছ-পালায়, ফুলে-ফলে বিশাল সেই জায়গাটা ভরেই থাকত। বর্ষার সময় ঠিকমত বর্ষা নামত। ফসলও ফলত। সারা বছর ধরে চলত যাগ-যজ্ঞ। কোথাও কোন অভাব ছিল না। মানুষজন থাকত মহাসুখে।

অবশ্য সে অনেক...অনেক বছর আগের কথা।

তখন বিশাল এই ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের মহাবীর রাজা দণ্ডক। সুশাসনে সমৃদ্ধ তাঁর দেশ। তাঁর অর্থবল, সৈন্যবল এত বেশি ছিল যে সামন্ত রাজারাও তাঁকে সমীহ করে চলত।

রাজা দণ্ডকের গুরু ছিলেন ভার্গব শুক্রাচার্য। যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। শুক্রাচার্যও ভালবাসতেন দণ্ডককে। অনেক কিছু শিখিয়েও দিয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের ছিল অসীম জ্ঞান। দানবরা তাই তাঁকে তাঁদের গুরু করে তাঁর পরামর্শ মত চলত। তাতে উন্নতিও করেছিল অনেক।

গুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে প্রায়ই যেতেন রাজা দণ্ডক। তাঁর পদতলে বসে উপদেশ নিতেন। সেই মত রাজকার্য করতেন। তাই তাঁর রাজ্যে উন্নতিও হয়ে ছিল বেশি। ফলে যা হয়, তাই হয়েছিল, দম্ভ আর অহঙ্কারে যেন তাঁর আর মাটিতে পা পড়তে চায় না।

রথ নিয়ে একদিন রাজা দণ্ডক বেরিয়েছেন বেড়াতে। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হল—যাই, একবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ।

রথ ঘুরিয়ে দণ্ডক এসে হাজির হলেন গুরু শুক্রাচার্যের আশ্রমে।

রাজা এসেছেন হঠাৎ। আশ্রমবাসীরা সজাগ হয়ে উঠল। যথাযোগ্য আপ্যায়নও জানাল।

—গুরুদেব কোথায়? দেখছি না কেন? রাজা দণ্ডক জিজ্ঞেস করলেন।

—দৈত্যরাজ বৃষপর্বার বাড়িতে যজ্ঞে গেছেন। আশ্রমবাসীরা বললেন।

—আশ্রমে তাহলে কে আছেন এখন?

—আজ্ঞে, গুরুদেবের মেয়ে অরজা। তিনিই এখন আগুন জ্বালিয়ে আশ্রমের কাজ দেখাশুনো করছেন। বললেন আশ্রমবাসীরা।

—এসেছি যখন, তারই সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। দণ্ডক বললেন।

আশ্রমবাসীরা আশ্রমের ভেতরে নিয়ে এল দণ্ডককে। ভেতর থেকে অরজার পরিচারিকারা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল দণ্ডককে। নিয়ে গেল অরজার কাছে, ভেতরে।

বাবার প্রিয় শিষ্য এসেছেন। আশ্রমবাসিনী অরজা সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁকে বসার জায়গা দিল। কুশল সংবাদ নিল। ফল-মূল যা ছিল, সংগ্রহ করে এনে দিল।

প্রতিদিনই দণ্ডক অরজাকে দেখে আসছেন। কিন্তু কোন দিনই তাঁর মনে অন্য কোন চিন্তা জাগে নি। আজ এই মুহূর্তে মনটা হঠাৎ খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। তাঁর মনে হল—অরজা ভারি সুন্দরী, রাজমহিষী হবার যোগ্য।

কথা শুরু করলেন রাজা দণ্ডক।

—বাবা কখন ফিরবেন?

—আজ সন্ধ্যে না হলেও কাল ফিরবেন। বলল অরজা।

দণ্ডক বললেন—অরজা, তোমায় একটা কথা বলব?

—কেন বলবেন না? অবশ্যই বলবেন। সরল মন অরজার।

দণ্ডক বলেই ফেললেন—অরজা, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। তুমি অমত কোরো না।



শুনেই লজ্জায় সঙ্কোচে চমকে ওঠে অরজা। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বলে—আপনার কি মাথা খারাপ হল নাকি? ভাই-বোনে কি কখনো বিয়ে হয়?

—ভাই-বোন? চোখ কুঁচকে অরজার দিকে তাকান দণ্ডক।

—আমি যেমন আমার বাবার মেয়ে, আপনি তো তাঁরই শিষ্য। ভুলে গেলেন কি, শিষ্য আর ছেলের মধ্যে কোন তফাত নেই। আপনাকে যদি আমি ভাই বলে মনে না করতাম, তাহলে আশ্রমের ভেতরে কি আসতে পেতেন, বাবার অবর্তমানে?

অরজা যে ভুল কথা বলছে না, দণ্ডক তা মনে-প্রাণেই বুঝলেন। কিন্তু সে সময় তাঁর মন এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল যে কোন ওজরই মানতে রাজি নন।

—তুমি যাই বল অরজা, সত্যিকারের ভাই-বোন তো আমরা নই। সুতরাং ও কথা বাদ দাও।

অরজা দেখল, রাজার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তবুও দণ্ডককে নিরস্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল সে।

বলল—দেখ রাজা, আমাকে যদি বিয়ে করার এতই বাসনা জেগেছে, তাহলে অপেক্ষা কর। বাবা ফিরে আসুন। বাবাকে বল। তিনি যদি আমাকে তোমার হাতে তুলে দেন, তাহলে আমার আর বলার কিছু থাকবে না।

দণ্ডক বলল—অরজা, তুমি নাবালিকা নও যে, সব সময় বাবার মত মেনে চলতে হবে!

অরজা বলল—স্বয়ম্বরা হবার রীতি তো আমাদের নেই। তাছাড়া বাবার অমতে আমি কিছু করতে পারি না। অবাধ্য হলে তিনি রেগে যাবেন। তাতে ক্ষতি হবে।

দণ্ডক বলল—তুমি ক্ষতির আশঙ্কা করছ কেন? গুরুদেব তো আশীর্বাদও করতে পারেন।

—রাজা, নিজেকে কি কেউ সম্প্রদান করতে পারে? দেখ নি, মেয়ের বিয়ের সময় বাবা নিজের হাতে সম্প্রদান করেন তাঁর মেয়েকে বরের হাতে? একটু ধৈর্য ধরতে আপত্তি কি তোমার?

কথাতেই আছে, 'চোরা না শোনে ধর্মের কথা'। রাজা দণ্ডকের মনে তখন আর ধর্ম-অধর্মের জ্ঞান নেই। এমন কি, কামনার বশে বিবেক পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে, অরজা সাবধান হবার আগেই অসভ্য, অশালীন আচরণ করে বসলেন।

চলে গেছেন রাজা দণ্ডক। হতবাক অরজা। এমনটি যে হতে পারে সে তা কখনই ভাবতে পারে নি। একজন রাজার যে এমন মতিভ্রম হবে, এ কথা কি ভাবা যায়? যজ্ঞের আগুন প্রায় নিভে গেছে। এক মনে বসে বসে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছে অরজা আর কাঁদছে। এমন সময় হঠাৎ বৃষপর্বার বাড়ি থেকে যজ্ঞ সেরে শুক্রাচার্য এসে হাজির হলেন সেখানে।

মেয়েকে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মা?

কোন কিছুই গোপন করল না অরজা। সবই খুলে বলল। আর শোনার সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্য রেগে লাল হয়ে উঠলেন—কি, এত বড় স্পর্ধা! রাজা হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান! মাতৃজাতির অপমান! তোর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

এই বলে আসনে বসে আচমন করে দণ্ডককে অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তুই শ্রীহীন হবি। তোর সব ক্ষমতা নষ্ট হবে। তোর সারা রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

দণ্ডক তখন নিজের রাজ্যে। এসব কিছুই জানতেন না। কিন্তু সত্যি সত্যিই ক্রমে ক্রমে তিনি হীনবল হয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে অরাজকতা। রাজ্যের সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। গৃহযুদ্ধ করতে করতে প্রজারা মারা গেল। অমন সুজলা-সুফলা দেশ একেবারে শেষ। দেখতে দেখতে দণ্ডকের রাজ্য হয়ে গেল মহা-শ্মশান।

রাজ্য গেল, রাজত্ব গেল। নিজেদের আগুনে নিজেরাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সেই রাজা দণ্ডক আর নেই। কিন্তু মহাপাপের সাক্ষী হিসেবে তাঁরই নামে সেই জায়গা আজও সকলের কাছে পরিচিত হয়ে রইল 'দণ্ডকারণ্য' নামে।



কলির রাজত্ব ও বামনদেবের আবির্ভাব

আমাদের এই পৃথিবীতে চারটে যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি। প্রতিটি যুগেরই এক-একটা বিশেষ বিশেষ ধর্ম। মানুষ সেই সব ধর্ম-কর্ম মেনে চলে। চারটে যুগের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া হল

কলি। কলি হল ভয়ানক স্বার্থপর, দাম্ভিক, অহঙ্কারী। ধর্ম কর্মের ধার-কাছ দিয়েও যায় না। বরং চেষ্টা করে, যদি কোথাও ধর্ম বলে কিছু থাকে, তা কিভাবে লোপ করে দেওয়া যায়। তার জন্য তার ফন্দী-ফিকিরেরও শেষ নেই। চারদিকে সে তৈরি করে এমন সব লোভের বস্তু, মানুষের সাধ্যি কি তাকে উপেক্ষা করে? লোভে পড়ে মানুষের স্বভাব যায় বদলে। চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যা খুশি তাই করতে শুরু করে। তারপর এক সময় আসে চরম অবস্থা। নিজেদের মধ্যেই নিজেরা খেয়োখেয়ি, রক্তারক্তি করে শেষ করে দেয় নিজেদের। তখন কলি যুগের শেষ হয়। আসে সত্য যুগ। যতক্ষণ নাস্তিকতা অধর্মাচার চরমে না ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলে কলির বীরবিক্রম। সৃষ্টির শুরু থেকে এই ভাবেই চাকার মত ঘুরে চলেছে চারটে যুগ।

আমরা এখন যে যুগে বাস করছি এটা হল কলি যুগ। কিন্তু এটাই প্রথম কলি যুগ নয়। এর আগে ছটা কলি যুগ চলে গেছে। আমরা এখন রয়েছি সাত নম্বর কলি যুগে।

পৃথিবীতে যখন পাঁচ নম্বর কলি যুগ শুরু হয়েছিল এই ঘটনা সেই সময়কার। দৈত্য-দানবদের আধিপত্য তখন চরমে। ভক্ত প্রহ্লাদের নীতিধর্ম শিক্ষার ফলে দানবরা যথেষ্ট পরিমাণে সংযত, সৎ হয়ে উঠেছিল। সততাই শক্তি। ফলে, যথেষ্ট শক্তিমানও হয়েছিল তারা। দেবতারা অনেকটা কোণঠাসা। দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অনেকখানি হীনবলও হয়ে পড়েছিলেন।

দেবতাদের সঙ্গে দানবদের যুদ্ধ চলছিল বহুদিন ধরেই। একবার দেবতাদের নাস্তানাবুদ করেছিল অন্ধকাসুর, প্রহ্লাদের ভাই। কিন্তু নিজের দুর্বুদ্ধির জন্য তাকে শুধু শিবের হাতে মরতে হয় নি, তার অনেক পরিজনকেও প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এরপর বেশ কিছুকাল চুপচাপ থেকে প্রহ্লাদের নির্দেশ মেনে দানবরা আবার শক্তি সঞ্চয় করছে খবর পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র চাতুরি করে তাদের এমন এক ক্ষতি করে বসলেন যে, দানবরা রেগে আগুন হয়ে উঠল। তখন প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচন তার জ্ঞাতিদের নিয়ে এমন নিদারুণ যুদ্ধ করেছিল দেবতাদের সঙ্গে যাতে ভগবান বিষ্ণুকেও আসতে হয়েছিল তাঁদের রক্ষা করতে। সেই যুদ্ধে দানবকুলের বীর বীর যোদ্ধারা মারা গিয়েছিল—জম্ভ, কুজম্ভ, কালনেমি নিহত হল। দানব-সেনা বিপর্যস্ত। তাই দেখে ছেলে বাণকে নিয়ে বলি নিজে এল যুদ্ধক্ষেত্রে। বলি হল প্রহ্লাদের ছেলে। বরাবরই ধার্মিক, আবার বাবার মতই ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত। দানবকুলের মধ্যে বলির স্বভাব-চরিত্র ছিল দারুণ ভাল। অযথা কাউকে উৎপীড়ন করা, কারো ধর্ম-কর্মে বাধা দেওয়া, এসব তার ধাতে ছিল না। বরং ঠিক উলটো। কেউ যদি ধর্ম-কর্ম ঠিকমত না করত, বলি তার ওপর রেগে যেত। অপরের কিসে ভাল হবে, সব সময় সে তারই চেষ্টা করত।

বলিকে যুদ্ধে আসতে দেখে বিষ্ণু দেবতাদের ডেকে বললেন—শোন, আমাকে এখনি একবার বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের সব শত্রু তো নাশ হয়েই গেছে। শত্রু বলতে তো ঐ দু-জনই আছে। কোন ভয় নেই, লড়াই করে যাও।

চতুরের শিরোমণি বিষ্ণু গোপন কথা ফাঁস না করে কৌশলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়লেন! গোপন কথাটা হল—বলি যে তাঁরই ভক্ত। ভক্তের গায়ে কি হাত দেওয়া যায়? তাছাড়া বলি সচ্চরিত্র, ধার্মিক। কোন অধর্ম করলে বিষ্ণু অবশ্যই তাকে সাজা দিতেন।

দেবতারা অত-শত বুঝলেন না। নিজেদের ক্ষমতায় নিজেরাই মত্ত। ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, বরুণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বলি-বাণকে ঠেকাতে নেমে পড়লেন। পেছনে দেবগুরু বৃহস্পতি। বিষ্ণু আর না থাকলেও বৃহস্পতি তো আছেন। সুতরাং দেবতারা নিশ্চিন্ত।

বিষ্ণুর এই হঠাৎ চলে যাওয়া কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নজর এড়াল না। অসম্ভব বুদ্ধিমান শুক্রাচার্য মস্ত বড় কূটনীতিবিদ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য দৈত্যদের উসকে দিয়ে বললেন—কোন ভাবনা নেই। নির্ভয়ে যুদ্ধ করে যাও। জয় তোমাদের নিশ্চিত।

শুরুদেবের আশ্বাস মানেই শক্তি। দানবদের মনের সাহস মুহূর্তে যেন বেড়ে গেল অনেক...অনেক গুণ। হুঙ্কারে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে মার...মার করে দানবরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবতাদের ওপর। দানব সৈন্যের সেনাপতি বলির ছেলে বীর বাণাসুর।

শুরু হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে সে এক নিদারুণ যুদ্ধ। আকাশ ছেয়ে গেল বাণে বাণে; গদার আঘাতে আঘাতে বাতাস কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। আর্তনাদে কেঁপে উঠতে লাগল পাহাড়, পর্বত, রক্তের ধারায় নদ-নদী ফেঁপে উঠতে লাগল। এমন যুদ্ধ এর আগে কেউ কখনো দেখে নি। দানবরাজ বলি এত শক্তি কোথা থেকে পেল, দেবতারা তা ভেবেই পেলেন না

ইতিমধ্যে দেবতাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেছে। তাঁরা দেখলেন, বলিকে জয় করা, দানবকুলকে পরাস্ত করা তাঁদের সাধ্যের বাইরে। এখন প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়ে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে দেবতারা সদলবলে পালালেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মলোকে।

স্বর্গরাজ্য জয় করতে পারল পাতালের দানবরাজ প্রহ্লাদের নাতি বলি। আর দেবতারা হলেন রাজ্যহারা। স্বর্গরাজ্য জয় করা মানেই ত্রিভুবন জয়। বলি আপন শক্তিবলে হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের রাজা।

দেবরাজ্য অধিকার করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রের সিংহাসনে বসল না বলি। সসম্মানে দাদু প্রহ্লাদকে ডেকে এনে বলল—বাহুবলে স্বর্গরাজ্য আমি জয় করেছি ঠিকই, কিন্তু এর সব কৃতিত্ব দাদু আপনার। আপনি যদি আমাদের নীতিশিক্ষা না দিতেন, তাহলে এমন অসম্ভব কাজ কি আমরা সহজে করতে পারতাম? ইন্দ্রের এই সিংহাসনে আপনি বসুন। আমাদের যা আদেশ করবেন, আমরা তা তামিল করে যাব।

শুনে প্রহ্লাদ বলল—ভাই, রাজত্বে আমার আর কোন মোহ নেই। ওতে বড় বাধা। ভগবান বিষ্ণুর নাম নিয়ে আমি বেশ সুখে আছি। তুমিই সিংহাসনে বস, রাজত্ব কর। শুধু একটা কথা ভাই, ভগবান বিষ্ণুকে কখনো ভুলো না। আর অধর্ম কখনো কোরো না। তোমার সুশাসনে সকলেই যেন ধর্মপথে থাকে।

এরপর আর কথা চলে না। দেবরাজের সিংহাসনে বসে বলি স্বয়ং হল ইন্দ্র। দিকপাল দেবতারাও নেই যাঁদের নিয়ে বলি রাজ্য চালনা করবে। নিজের আত্মীয়-পরিজনদের মধ্য থেকেই বেছে বেছে এক-একজনকে সব দায়িত্ব বলি ভাগ করে দিল। যমরাজের কাজের দায়িত্ব দিল ছেলে বাণাসুরকে, বরুণদেবের দায়িত্ব ময়দানবকে, রাহুকে দিল চন্দ্রের দায়িত্ব, সূর্যদেব করল স্বর্ভানুকে, আর দেবগুরু বৃহস্পতির আসনে বসাল দানবগুরু শুক্রাচার্যকে। বাধ্য হয়েই গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এসে বন্ধুত্ব করল বলির সঙ্গে। যক্ষ, কিন্নর, বিদ্যাধর এমন কি তিলোত্তমা থেকে শুরু করে অন্যান্য অপ্সরারা,

যারা এতদিন দেবরাজ ইন্দ্রকে নাচ-গানে, আমোদ-প্রমোদে খুশি রাখত, তারাও এখন থেকে বলিকে খুশি রাখতে শুরু করে দিল। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে একদিন সোজা এসে হাজির হলেন বলির কাছে। বললেন—আমরা এবার থেকে তোমার আশ্রয়েই থাকব।

বলি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলল—আপনি আপনার আলয় ছেড়ে এই অধম দানবের আশ্রয়ে থাকতে এসেছেন মা?

উত্তরে লক্ষ্মী বলেছিলেন—বলি, কে বলে তোমায় অধম দানব। তুমি মহা ধার্মিক। ধর্মের শক্তি দিয়ে তুমি জয় করেছ দেবরাজ্য। তুমি বীর। তাই তো আমি আমার সঙ্গিনীদের নিয়ে তোমার কাছে থাকতে এসেছি।

ফলে, সব দিক থেকেই বলির জুড়ি আর দ্বিতীয় কেউ রইল না। ত্রিভুবন বলির সুশাসনে মোহিত হয়ে গেল। কলির দাপটে যাগ-যজ্ঞ-হোম প্রায় সব বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্ররা, সব যে যার কাজ ছেড়ে যা খুশি তাই করতে শুরু করেছিল। সর্বত্র চলতে আরম্ভ করেছিল অনাচারের রাজত্ব, আর তার মজা লুটছিল কলি।

বলির শাসনে আবার একে একে চালু হল সব কিছু। যাগ-যজ্ঞ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষবাস নিয়মিত ভাবে সব হতে লাগল। ওদিকে ময়দানবও বরুণদেব হয়ে পৃথিবীর জলের অভাব একেবারে ঘুচিয়ে দিল। মানুষজনও সব ধার্মিক হয়ে উঠতে লাগল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছুতেই আর কলিরাজ কায়দা করতে পারল না কাউকে। তার কোন প্রভাবই আর খাটল না দেখে সে-ও ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে বলল—ঠাকুর্দা, আমি এখন কি করব? বলি যা আরম্ভ করেছে, আমি সুদ্ধু দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। মানুষজনকে অধার্মিক করে তোলার যত ফন্দি-ফিকির আমার জানা ছিল, সবই যে মাঠে মারা গেল।

ব্রহ্মা বললেন—তুমি আর কি করবে কলি? বলির ওপর তোমার কোন ক্ষমতাই খাটবে না। দেখছ না, দেবতারা সবাই কেমন হীনবল হয়ে এখানে এসে পড়ে আছেন।

কারো কাছ থেকেই কলি কোন সাহায্য পেল না দেখে চলে গেল বিভীতক বনে।

এদিকে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মভবনে সমবেত হয়েছেন দেবতারা। সেখানে কশ্যপও আছেন। কি করে দেবতারা আবার দেবরাজ্য ফিরে পান, ইন্দ্র সিংহাসনে বসতে পারেন, নিজেদের মধ্যে তাই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল।

ব্রহ্মা বললেন—যে অন্যায় কাজ তুমি করেছ, এখন তারই ফলভোগ করছ।

ইন্দ্রের কিন্তু মনেই পড়ে না কি অন্যায় কাজ তিনি করেছেন।

মনে করিয়ে দিলেন ব্রহ্মা—দিতির ভাবী ছেলেকে বজ্র দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও নি? যদিও তারা এখন মরুৎগণ, তবুও কাজটা তুমি ঠিক কর নি।

এবার মনে পড়ে যায় ইন্দ্রের। বললেন—দিতি তো তখন অশুচি ছিল।

কশ্যপ বললেন—দিতি তো তোমাদেরও মা। যে জন্মাত, সে তো তোমাদেরই এক ভাই হতো। মাকে অপমান করে, মায়ের ক্ষতি করে, তুমি কি পাপ কর নি ইন্দ্র?



এরপর ইন্দ্রের আর কিছু বলার নেই। বুঝতে পারলেন, সত্যিই কাজটা ঠিক হয় নি। কিন্তু এখন উপায়?

—যদি বাসুদেবকে সন্তুষ্ট করতে পার, তাহলে তিনি হয়ত তোমাদের একটা হিল্লে করে দিতে পারেন। তিনি ছাড়া আর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। বললেন কাশ্যপ।

ইন্দ্র মনস্থ করলেন, তাই করবেন। যেভাবেই হোক, বিষ্ণুকে তুষ্ট করে নিজেদের মর্যাদা আবার ফিরিয়ে আনবেন। হিমালয়ের মহানদী নদীর ধারে মহামেধ নামে এক পবিত্র জায়গা ছিল। জায়গাটা জনার্দনের খুবই প্রিয়। ইন্দ্র সেখানে এসে এক আশ্রম তৈরি করে কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলেন। তপস্যা বলে তপস্যা—সে এক সুকঠিন সাধনা। কেটে গেল একটা বছর। ইন্দ্রের মনের মতি-গতিও এখন খুব শান্ত। দেখা দিলেন বিষ্ণু। বললেন—ঐ মহানদীতে স্নান করে ফিরে যাও। তোমাদের ব্যাপারটা আমি অবশ্যই দেখব।

বিষ্ণুর আশ্বাস পেয়ে ইন্দ্র খুশি হয়ে চলে এলেন আশ্রম থেকে সোজা তাঁর মা অদিতির কাছে। অদিতি তখন থাকতেন ধর্মাশ্রমে। বহুদিন পর ইন্দ্রকে দেখে যেমন তাঁর মনে ভরে উঠল, সেই সঙ্গে মনে মনে একটা আশঙ্কাও জাগল। তাঁর ছেলে ইন্দ্রের কত কাজ! সব ফেলে সে হঠাৎ এখানে এল কেন? তার মুখই-বা অমন শুকনো শুকনো কেন?

—আমায় কি কিছু বলবে ইন্দ্র?

—হ্যাঁ মা। আমরা, তোমার সব ছেলেরা, এখন সর্বশান্ত হয়েছি। বলি নামে এক দানব আমাদের চরম দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে মা।

ইন্দ্রের কথা শুনে মায়ের মন দুলে উঠল। ওঠাই স্বাভাবিক। কোন্ মা চান তাঁর ছেলেরা কষ্টে থাকুক। কিন্তু অদিতি তো ভগবানকে ডাকা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না! তাই মন-প্রাণ দিয়ে শুধু ভগবান বিষ্ণুকে ডাকতে লাগলেন—ভগবান, তুমি ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে? তুমিই তো সব ঠাকুর। আমার ছেলেদের তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

অদিতি চোখের জল ফেলেন, আর ডাকেন ভগবানকে। এমনি ভাবে ডাকতে ডাকতে এক সময় বিষ্ণু এসে বললেন—তোমায় অত কান্না কাঁদতে হবে না অদিতি। আমি নিজেই তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। দানবের হাত থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে তোমার ছেলেদের ফিরিয়ে দেব; কথা দিচ্ছি।

ভগবান বিষ্ণু এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন বটে, কিন্তু অদিতি

পড়লেন মহা চিন্তায়। অন্তর্হিত হবার আগে বিষ্ণু যতই আশ্বাস দিয়ে যান না কেন, যিনি ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন, তাঁকে তিনি গর্ভে কি করে ধারণ করবেন? আবার ভগবান তাঁরই সন্তান হয়ে জন্মাবেন, এ কি কম আনন্দের কথা!

এদিকে ত্রিভুবনের রাজা বলির রাজত্ব চলছিল বেশ রমরমা করে। সকলেই তাকে সমীহ করে চলছে। সৈন্যবল, মনোবল, অর্থবল—কোন কিছুরই অভাব নেই বলির। একদিকে প্রহ্লাদের আশীর্বাদ সৎপথে ধর্মের মধ্যে থাকার জন্য, আর একদিকে গুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শ। কোথাও কোন সমস্যা নেই। দেবতারা তো কাছে-পিঠে নেই যে, ঝামেলা বাধাবেন। সুতরাং সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত।

বেশ মহানন্দেই কাটছিল বলিরাজের দিন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মন দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। কেন যেন মনে হতে লাগল, দুর্বল দুর্বল লাগছে। শরীর খারাপ? তা তো নয়। ভোগ-সুখ সবই তো ঠিকই আছে। তাহলে হঠাৎ এমন দুর্বল হওয়ার কারণ? মনে এমন ভয় ভয় ভাবই-বা জাগছে কেন?

দাদু প্রহ্লাদকে ডেকে বলি তার মনের কথা তাকে বলল—কেন এমন হয়েছে?

প্রহ্লাদ ছিলেন মহাযোগী। বলির কথা শুনে তিনি যোগাসনে বসলেন। যোগশক্তি এমনই এক মহাশক্তি যে, মনকে একটুও চঞ্চল না করে স্থির হয়ে বসে কাউকে দেখবার বা কোন কিছু জানবার ইচ্ছে হলে সহজেই দেখা বা জানা যায়। প্রহ্লাদের কাছে ভগবান বিষ্ণুই সব। তিনি যোগাসনে বসে মন স্থির করলেন তাঁরই দিকে। দেখতে চেষ্টা করলেন, কোথায় তিনি এখন আছেন। বৈকুণ্ঠ, গোলোক থেকে শুরু করে দেবলোকের সব জায়গা খুঁজে দেখলেন প্রহ্লাদ। দেখতে পেলেন না। পাতালের গহ্বর থেকে পৃথিবীর সর্বত্র খুঁজতে খুঁজতে এসে চোখ পড়ল অদিতির আশ্রমে। এখানে এসে যোগী প্রহ্লাদের চোখ আটকে গেল। দেখতে পেলেন ভগবান বিষ্ণুকে, অদিতির গর্ভে বামন-বেশে। শঙ্খ-চক্র-গদা হাতে না থাকলেও তাঁকে চিনতে যোগী প্রহ্লাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হল না। বুঝতে পারলেন, বামন-বেশে ভগবান আসছেন তাঁদের উদ্ধার করতে। দেবতাদের হাতে আবার দেবরাজ্যকে ফিরিয়ে দিতে। সর্বশক্তিমান ভগবান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে আর সব শক্তি তো দুর্বল হয়ে পড়বেই।

বলিকে বললেন—সর্বেশ্বর শ্রীহরি আসছেন, বলি।

—শ্রীহরি? হরি? সে আবার কে? দুম করে প্রহ্লাদের মুখের ওপর বলি বলে বসল—তাঁর কি এতই শক্তি যে, আমাকে হেনস্থা করবে?

প্রহ্লাদ বলনে—বলি, এসব কি কথা তোমার মুখে?

—কেন, আমি কি বেঠিক কথা বলেছি? আপনার শ্রীহরি মানে তো বাসুদেব। আমার মহাবল দৈত্যসেনাদের চেয়েও কি তাঁর শক্তি বেশি? সূর্যের রথের চাকা যে কেড়ে নিয়েছিল, সেই বিপ্রচিত্তি, দারুণ অস্ত্রবিদ অয়ঃশঙ্কু, শিবি, শঙ্কু, অসিলোমা, বিরূপাক্ষ, ত্রিশিরা, মকরাক্ষ, বৃষপর্বা, অসিতাক্ষী—এদের কাছে বাসুদেব? এদের এক একজনের যে শক্তি, তার ষোল ভাগের একভাগও তাঁর নেই। সুতরাং তাঁকে আমরা ভয় পাই না দাদু, ওঁর ভয় আমাকে দেখিও না।

বলির কথা শুনে প্রহ্লাদ ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। ফেলারই কথা। গর্জন করে উঠলেন—বাচালতা থামাও বলি। তোমার বাবা বিরোচন তোমার গুরু, শ্রদ্ধেয়। তার বাবা আমি তোমার দাদু। তারও ওপরে আর শ্রীহরি ভগবান শুধু আমার নয়, এই জগতের গুরু, সকলের শ্রদ্ধেয়। আমার সামনে তাঁর সম্বন্ধে তোমার ওই উদ্ধত কথা! এই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মবোধ, ভক্তি? এর ফল তোমায় পেতে হবে। আমি আর তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

প্রহ্লাদের ধমক খেয়ে বলির চৈতন্য ফিরে এল, সত্যিই এমন স্পর্ধার কথা বলা উচিত হয় নি। ওদিকে প্রহ্লাদেরও কিন্তু মন দারুণ খারাপ হয়ে গেল। বলিকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তাছাড়া যার ভেতর হরিভক্তি থাকে, তার শরীরে রাগ থাকা উচিত নয়। তাই বলি, দাদুর পা ধরে ক্ষমা চাওয়া মাত্রই প্রহ্লাদ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। শুধু বললেন—ভাই যদি বাঁচতে চাও, তবে তাঁর শরণ নাও। তাঁকে অবজ্ঞা কখনো কোরো না।

এই বলে প্রহ্লাদ চলে গেলেন তীর্থভ্রমণে।

এদিকে প্রহ্লাদ যখন বিভাস তীর্থ, সরস্বতী তীর্থ, কুরুজাঙ্গল তীর্থ, প্রভাস তীর্থ, কামরূপ তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বলি রাজা এলেন কুরুক্ষেত্রে। সঙ্গে শুক্রাচার্য। বলির মনে ইচ্ছা জাগল, এখানে সে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ মানেই বিশাল ব্যাপার। অনেক ভাল ভাল ব্রাহ্মণ চাই, অঢেল অর্থ চাই। বলির অর্থের অভাব নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণ? শুক্রাচার্য তখন ডেকে পাঠালেন ব্রাহ্মণদের। অসুরদের ভয়ে ব্রাহ্মণরা তখন এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে ছিলেন। শুক্রাচার্যকে সবাই সম্মান করতেন। তাই তাঁকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। আত্রেয়, কৌশিক, আঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিরা এসে হাজির হলেন।

ভাল সময় দেখে দানব রাজা-রানী বলি আর বিন্ধ্যাবলী যজ্ঞে ব্রতী হল। বেছে বেছে সর্ব সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়া দেখে শুক্রাচার্য তাকে পৃথিবী পর্যটন করে আসার জন্য ছেড়ে দিলেন। বলি রাজাও দান শুরু করলেন। নিয়ম-মত এই সময় যে এসে যা চাইবে, তাই দিতে হবে। বলিও সকলের বাসনা পূরণ করতে শুরু করল। এ ভাবে কেটে গেল তিনটে মাস। অদিতির গর্ভ থেকে ভগবান শ্রীহরি বামনাকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে দেবতা থেকে মহা-মহা ঋষিদের তো জানাই হয়ে গিয়েছিল, দেবতাদের ভাই হয়ে ভগবান মাধব আসছেন। অমন বিশাল পুরুষ আসছেন বেঁটে-খাটো ছোট্টো একটি মানুষের রূপ ধরে, যাঁকে লোকে দেখলে অবজ্ঞা করবে।

ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন খবর পেয়েই মহর্ষিদের আর দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন। মানুষের শরীর নিয়ে যখন জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন যে কাজগুলো করার আছে, তা তো করতেই হবে। যেমন পৈতে দেওয়া, শাস্ত্র পড়ানো। বৃহস্পতির ছেলে মহর্ষি ভরদ্বাজ অনুষ্ঠান করে বামনদেবের পৈতে দিলেন। পৈতে হলে আমন্ত্রিতরা সব উপহার দিয়ে থাকে। বামনদেবকেও তেমনি সবাই মিলে উপহার দিলেন। পুলহ উপবীত (পৈতে) দিলেন। পুলস্ত্য দুখানা কাপড়, ভরদ্বাজ মেখলা, অগস্ত্য হরিণের ছাল, মরীচি পলাশের লাঠি, বরুণদেবের স্ত্রী জপের মালা, অঙ্গিরা কুশের আসন, দেবরাজ ছাতা, ভৃগু জুতো এবং বৃহস্পতি কমণ্ডলু দিলেন। হাসিমুখে বামনদেব সব নিলেন। এক মাসের মধ্যেই সব

শাস্ত্র আয়ত্ত করে ফেললেন। এমন কি, কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, তাও শেখা হয়ে গেল। যার সব কিছুই জানা থাকে, তার কি আর নতুন করে কিছু জানতে বাকি থাকে?

একদিন বামনদেব ভরদ্বাজকে বললেন—কুরুক্ষেত্রে দৈত্যরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছে। চলুন, আমরা এখনই সেখানে যাব।

ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে যে মুহূর্তে বামনদেব কুরুক্ষেত্রের দিকে চলতে শুরু করলেন, সাগর-সমেত পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল। বলির যজ্ঞেও কেমন যেন সব উলটো-পালটা লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। ঋষিরা আগুন জ্বেলে যে যজ্ঞ করেন, তাতে যে ঘি দেন, সেটাই হল দেবতাদের খাদ্য। ইন্দ্র হয়ে বলি এত দিন তো আর তা দেবতাদের দেয় নি। অগ্নিও বাধ্য হয়েছিলেন অসুরদের ঘি নিতে। আজ অগ্নিদেব যেন আর ঘি নিতেই রাজি হচ্ছেন না। দেখে-শুনে বলির মন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যাপার কি? এমন তো হবার কথা নয়।

শুক্রাচার্যকে বলি জিজ্ঞেস করল—গুরুদেব, এরকম কেন হচ্ছে! এতদিন তো কিছু হয় নি। আজ সব যেন কেমন উলটো-পালটা হচ্ছে।

চুপ করে খানিকটা বসে থেকে ভার্গব বললেন—বলি, বাসুদেব নিজে তোমার যজ্ঞে আসছেন। তাই আজ এই রকম হচ্ছে।

বলি শোনামাত্রই আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল—সে কি? স্বয়ং ভগবান বাসুদেব আসছেন? এ আমার কি সৌভাগ্য। গুরুদেব, কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাব। আমি তো কিছু জানি না, বলে দিন।

ভার্গব বললেন—যদি আমার কথা শোন, তাহলে বলি। বাসুদেব তোমার কাছে আসছেন প্রার্থী হয়ে। তিনি যে দানই তোমার কাছে চান না কেন, তুমি তা চোখ বুজে প্রত্যাখ্যান করবে।

—এ আপনি কি বলছেন গুরুদেব? তা কি করে হয়। দানের আসনে বসে আমি দানে ব্রতী হয়েছি। যে যা চাইবে তাকে তাই দেব এই শপথ নিয়ে। অত্যন্ত সামান্য জনকেও যখন দান করছি, তখন তাঁকে ফিরিয়ে দেব কোন মুখে?

—তুমি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, ভগবান, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে ও আমরা যা কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন কি এই পৃথিবীর মাটি থেকে গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী সবই তো আপনার মধ্যেই আছে। আপনাকে আমি আর কি দান করব?

শুনে বলি বলল—তা ঠিক। তবুও তিনি যখন প্রার্থী হয়ে আসছেন আর আমি দাতা হয়ে বসেছি, তখন তিনি কিছু চাইলে আমার যে তা দিতেই হবে, গুরুদেব। নইলে মিথ্যাবাদী হতে হবে।

শুক্রাচার্য বলির কথা শুনে একটু রেগেই গেলেন। বললেন—পরামর্শ চেয়েছিলে বলেই পরামর্শ দিলাম। তা যখন শুনলে না, নিজেকে একজন বড় দাতা মনে করে বাসুদেবকে দান করবেই, তখন আর আমার কি বলার আছে? যা খুশি তাই কর।

ইতিমধ্যে ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে বেঁটে-খাটো সেই বামনদেব এসে হাজির হলেন বলির যজ্ঞস্থলে। বলিও যথারীতি অর্ঘ্য দিয়ে আপ্যায়ন করল তাঁকে। খর্বাকৃতি এই মানুষের বেশে এলেন বাসুদেব? কে জানে। গুরুদেব শুক্রাচার্য বলেছেন বাসুদেব আসছেন, হতেও পারে তা।

বলি বলল—বলুন, আপনি কি দান গ্রহণ করবেন?

বামনদেব ভরদ্বাজের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন—আমার গুরুপুত্র যজ্ঞ করতে চান। কিন্তু সবই তো আপনার অধিকারে। তাই আমি এসেছি আপনার কাছে। যদি আমায় আমার তিন পা মেপে জায়গা দেন একটু, তাহলে উনি যজ্ঞ করতে পারেন।

বলি, তো শুনে অবাক। ঐটুকু মানুষ। তায় আবার ঐটুকু ছোট ছোট পা। তিন পা মানে কতটুকুই-বা জায়গা? পত্নী বিন্ধ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলি বলল—এতদিন ধরে দান করছি, কত প্রার্থীর কত প্রার্থনা মিটিয়েছি। আর এই প্রার্থীর কতটুকু দাবি দেখ।

তারপর বামনদেবকে বললেন—ব্রাহ্মণ, আমি গোটা পৃথিবীটার অধিপতি। আপনি আমার কাছে চাইছেন মাত্র তিন পা মাটি। এ যে আমার দিতেও লজ্জা লাগছে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, রসাতল, সুতল—যে কোন গোটা একটা দেশ চান, দিচ্ছি। ঐটুকু চেয়ে আমায় কেন লজ্জা দিচ্ছেন?

বামনদেব বললেন—গোটা দেশ, হাতি, সোনা যারা চায়, আপনি তাদের দিন। আমার ওসবে প্রয়োজন নেই। তিন পা মাটি হলেই চলবে। প্রয়োজনের বেশি নিয়ে লাভ কি?

এর ওপর আর কিছু বলার নেই বলির। তাই বলল—বেশ, আপনাকে আপনার পায়ের মাপে তিন পা মাটিই দিলাম। আপনি মেপে নিন।

সঙ্গে সঙ্গে বামনদেব সকলের চোখের সামনেই ধরলেন বিশাল আকার। এক পা স্বর্গে রেখে, এক পায়ে মর্ত্যলোক জয় করে তৃতীয় পা তুলে আর রাখার জায়গা না পেয়ে বলিকে বললেন—আমার আর এক পা এবার কোথায় রাখব বলি? তাড়াতাড়ি জায়গা দিয়ে কথা রাখ, নইলে বন্দী করব।

এই সময় বলির ছেলে বাণ হাসতে হাসতে বলল—এ আপনার কি চাতুরি! এই পৃথিবী তো আপনারই সৃষ্টি। যতটা পরিমাণে আপনি একে সৃষ্টি করেছিলেন, আমার বাবার অধিকার ঠিক ততটার ওপরই। এখন তার বেশি দাবি জানালে বাবা কোথা থেকে দেবেন?

বামনদেব বললেন—আমি যখন আমার দেহের পরিমাণে তিন পা জায়গা চেয়েছিলাম, তোমার বাবা অসঙ্কোচে আমায় দান করে বসল। এখন তোমায় জিজ্ঞেস করি, বাণ—তোমার বাবা আমার দেহের পরিমাণ কত না জেনে দান করে বসল কেন? এখন তা দিতে না পারলে তার ফল তাকে ভোগ করতে হবে বৈকি।

তারপর বলিকে বললেন—আমি তোমাকে রসাতলে বন্দী করলাম। তুমি সেখানে গিয়ে সুখে বসবাস কর। সেখানে তোমার কোন অভাব থাকবে না।

বলি বন্দী হল রসাতলে। দেবরাজ্যে আবার বসলেন দেবতারা। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ আবার যে যাঁর মর্যাদা ফিরে পেলেন। বাসুদেবের কাজও ফুরাল। তিনি অন্তর্হিত হলেন।

বলির মনে অবশ্য ক্ষোভ নেই। বিশ্বকর্মা তার জন্য রসাতলে তৈরি করেছিলেন এক মনোরম প্রাসাদ। স্ত্রী বিন্ধ্যাবলীকে নিয়ে বলি সেখানেই থাকতে লাগল। অসুররাও বসবাস করতে লাগল রসাতলে।

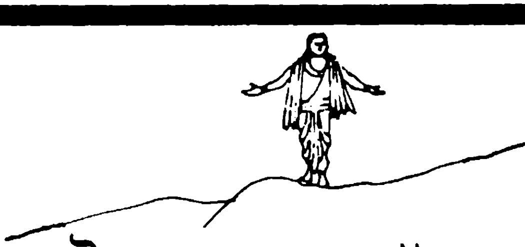
বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর একদিন রসাতলে উঠল দারুণ হা...হা...শব্দ। অসুরদের চিৎকার। বলি শুনেই খাঁড়া হাতে যেই প্রাসাদ থেকে বের হতে যাবে, বিন্ধ্যাবলী তাকে বাধা দিল।

বলল—ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র এসেছে দৈত্যদের বিনাশ করতে। যুদ্ধ নয়, বাঁচতে হলে ঐ চক্রের পূজা কর। বলি তাই করল। চক্র ফিরে গেল বেশ কিছু অত্যাচারী অসুরকে নিধন করে।

বলি বেশ চিন্তায় পড়ল এবার। কি করা যায়? কি করলে আর কোন ভয় থাকবে না। মনে মনে ডাকল দাদুকে। ডাকা মাত্রই প্রহ্লাদ এলেন। বলির কথা শুনে উপদেশ দিলেন—ভাই, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিই, বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু দেখছ, সবই সেই বাসুদেব। ভগবান জনার্দন ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। মনে-প্রাণে তাঁর শরণ নিলে কোন ভয় থাকে না। এমন কি, মরণকালেও শান্তিতে মরতে পারে। যমরাজের সাধ্য হয় না তাকে কষ্ট দেবার। তুমি তাঁর ধ্যান কর, তাঁর পুজো কর। তোমার সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। এই বলে প্রহ্লাদ চলে গেলেন।

বলিও এক দেবশিল্পীকে দিয়ে নিজের নগরে কেশবের একটা মন্দির তৈরি করল। কেশবের বিগ্রহ বসিয়ে বিন্ধ্যাবলীর সঙ্গে নিষ্ঠা নিয়ে তাঁর পুজো করে চলল। একদিনও বাদ গেল না। দেখে কেশব খুবই সন্তুষ্ট হলেন। পাছে অন্য কেউ এসে বলির এই নিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাই তিনি নিজেই এসে দ্বারী হয়ে রইলেন তার মন্দিরে।

দানের দম্ভ খর্ব করতে ভগবান কেশব বামনবেশে বলিকে বন্দী করেছিলেন রসাতলে, বিশেষ করে দেবতাদের মুখ চেয়ে। আবার নিজেই বলির কাছে বন্দী হয়ে রইলেন তার ভক্তির বাঁধনে।



দৈত্য ধুন্ধুর কথা

দৈত্যপুরে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছিল, ঠিক সেই সময়ে কশ্যপের আর এক ছেলে ধুন্ধু পৃথিবীতে দারুণ পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল। তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে সে বর চেয়ে নিয়েছিল যে, কেউ তাকে বধ করতে পারবে না।

দুই দৈত্যই অজেয়। তাদের অনুচররাও সব মহা শক্তিশালী। শিবের ধাম মন্দরাচলে মনের সুখে ঘুরে বেড়ায় দুই দৈত্যরাজ। আর, তাদের অনুচররা নির্বিবাদে অত্যাচার চালায় স্বর্গরাজ্যে গিয়ে, হামলা করে দেবতাদের ওপর। অজেয়, অবধ্য অসুররাজের ভয়ে দেবতারা স্বর্গলোক ছেড়ে পালালেন ব্রহ্মালোকে—বিভ্রাজপুরীতে।

ব্রহ্মলোকে গিয়ে দেবতারা বাস করছেন জেনে ধুন্ধুর ইচ্ছে হল ব্রহ্মলোকও জয় করে নেয়।

একদিন তাই অসুরদের ডেকে বলল—চল, আমরা ব্রহ্মলোক জয় করব।

শুনে অসুররা বলল—সে এখানে কোথায়? অনেক দূর। তাছাড়া বড় দুর্গম।

—কত দূর, যে যাওয়া যাবে না?

—শুনুন বলি তাহলে, আপনি হিসেব করে নিন। বলল দৈত্যরা—এখান থেকে হাজার যোজন (চার হাজার ক্রোশ) ওপরে মহর্লোক। সেখানে এমন সব মুনি-ঋষিরা থাকেন যে তাকালেই ছাই হয়ে যেতে হবে। তার ওপরে এক কোটি যোজন পথ পার হলে জনলোক। সেখানে থাকেন গোমাতারা। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তাঁদের বধ করবে। তারও ওপরে তিরিশ কোটি যোজন পথ পেরলে সত্যলোক। ব্রহ্মা, যিনি আপনাকে বর দিয়েছিলেন, তিনি সেখানে থাকেন।

সব শুনল বটে ধুন্ধু। পথটাও কম নয়, তাও বুঝল। তবুও ব্রহ্মলোকে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছে তার মন থেকে গেল না। তাই জিজ্ঞেস করল—এতই দূর আর দুর্গম হলে দেবতাদের নিয়ে ইন্দ্র সেখানে গেল কেমন করে?

দানবরা বলল—তা আমরা বলতে পারব না। গুরুদেব হয়ত বলতে পারবেন।

শুক্রাচার্যকে জিজ্ঞেস করল ধুন্ধু।

ভার্গব বললেন—দেখ, ইন্দ্র একশ একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যে শক্তি অর্জন করেছিল, তারই ফলে ব্রহ্মলোকে সে যেতে পেরেছে।

ধুন্ধু বলল—অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যদি যাওয়া যায়, তাহলে আমিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করব। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

শুক্রাচার্যও মেতে উঠলেন। গুহ্যকদের ডাকলেন আনুষ্ঠানিক কাজগুলো করার জন্য। নিজের ভৃগু বংশের সেরা সেরা ব্রাহ্মণদের ডেকে যজ্ঞ কাজে লাগালেন। ঐ যজ্ঞ শুরু হল দেবিকাতীর্থে। যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল। মহাসুর অসিলোমাকে দেওয়া হল ঘোড়াকে রক্ষা করার ভার। যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠল। যজ্ঞের ভাগ পেল মহাবল দৈত্য স্বর্ভানু প্রভৃতি।

পুরোদমে জ্বলছে যজ্ঞের আগুন। ঘি-এর পর ঘি পুড়ছে। ধোঁয়া উঠছে কলকল করে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল পৃথিবী। তার গন্ধ বাতাস বয়ে নিয়ে গেল ব্রহ্মলোকে। গন্ধ পেয়েই দেবতারা চমকে উঠলেন। সর্বনাশ! ধুন্ধু যে দেখছি এখানেও তাঁদের রেহাই দেবে না।

আর কোন উপায় না দেখে ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে জনার্দনের শরণাপন্ন হলেন। অনেক স্তব-স্তুতি করার পর বিষ্ণু তাঁদের দর্শন দিয়ে জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার?

দেবতারা ধুন্ধুর যাবতীয় মতলবের কথা বিষ্ণুকে শুনিয়ে বললেন—প্রভু, এ থেকে আমাদের বাঁচান।

বিষ্ণু একটু ধ্যানস্থ হতেই দেখলেন, ব্রহ্মা ইতিমধ্যেই তাকে বর দিয়ে বসে আছেন—অবধ্য। এদিকে দেবতাদের এই অনুরোধ। শেষে বললেন—ঠিক আছে। তোমরা যাও, দেখি আমি কি করতে পারি।

এদিকে একশ এক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়ে ধুন্ধু মহা সমারোহে দেবিকা নদীর তীরে একের পর এক যজ্ঞ করে চলেছে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে দেবিকা নদী। দারুণ স্রোত তার।

একদিন যজ্ঞ চলছে, হঠাৎ সকলের নজর পড়ল নদীর দিকে—কে যেন একজন স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। হাত-পা ছুঁড়ে আপ্রাণ বাঁচার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে তীরে আসার, কিন্তু কিছুতেই পারছে না। দেখে সকলের মায়া হল। তাড়াতাড়ি কয়েকজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন রকমে তাকে উদ্ধার করে এনে তীরে তুলল। দেখল, এক যুবক। কিন্তু বয়সের তুলনায় শরীরটা

বেঁটে-খাটো। যাকে বলে বামন।

পাড়ে উঠে একটু হাঁফ ছাড়লে সকলে জিজ্ঞেস করল—তুমি এভাবে জলে পড়ে গেলে কি ভাবে? কেউ কি তোমায় ফেলে দিয়েছিল? তোমার পরিচয় কি?

বামন কিন্তু তার আসল পরিচয় গোপন রেখে মনে মনে একটা কাহিনী বানিয়ে নিয়ে বলল—আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার বাবা ছিলেন প্রভাস। খুবই সুপণ্ডিত ছিলেন। আমরা দু-ভাই। আমি ছোট। আমার দাদার নাম মৈত্রভাস। আর আমার নাম গতিভাস। বাবা একদিন মারা গেলেন। সৎকার সেরে বাড়ি ফিরে দাদাকে বললাম—দাদা এসো, আমরা বাড়ি ভাগাভাগি করে নিই। দাদা শুনে বলল—তোর ভাগ? এতে তোর কোন ভাগ নেই। আমি বললাম—কেন নেই? আমিও তো ছেলে। দাদা বলল—কানা, খোঁড়া, কুঁজো, কুষ্ঠরোগী, উন্মাদ—এদের নাকি সম্পত্তিতে কোন ভাগ নেই। ইচ্ছে করলে তুই থাকতে পারিস। দু-মুঠো খেতে দিতে পারি। আমি বললাম—আমি বামন হয়েছি বলে তুমি এ ভাবে আমাকে ঠকাচ্ছ? কোন শাস্ত্রে এই বিধান আছে আমায় দেখাও। শুনে দাদা রেগে গিয়ে আমার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এই নদীতে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। আমিও স্রোতের টানে হাবুডুবু খেয়ে ভেসে যাচ্ছিলাম।



শুনে সকলেই 'আহা' 'আহা' করে উঠল।

বামন গতিভাস বলল—আপনারা আমাকে উদ্ধার করলেন। বাঁচলাম। আজ প্রায় এক বছর আমার পেটে কিছু নেই। আপনাদের পরিচয়? আর ঐ যে দেবরাজের মত দেখতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি কে?

যারা উদ্ধার করে এনেছিল, তারা বলল—আমরা ভৃগু বংশের ব্রাহ্মণ। উনি হলেন দানবরাজ ধুন্ধু। উনি এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়ে দান করছেন। গতিভাসকে এই কথা বলে তারা দানবরাজকে বলল—দৈত্যপতি, আপনি এই ব্রাহ্মণকে দান করুন।

ধুন্ধু বলল—বলুন, কি চাই? ভাল বাড়ি, প্রচুর ধনরত্ন, দাস-দাসী, হাতি, ঘোড়া, রথ, জমি, অস্ত্র-শস্ত্র যা চাইবেন, সব দেব। বলুন, কি নেবেন?

বামন গতিভাস যে আসলে কে, তা তো আর ওরা জানে না। কেমন করে জানবে, ভগবান বিষ্ণু তাকে কায়দায় ফেলতে এসেছেন।

ধুন্ধুর কথা শুনে গতিভাস তাই বলল—নিজের পৈত্রিক সম্পত্তি যেখানে নিজের ভাই আত্মসাৎ করে, সেখানে আর কি চাইবার আছে। হাতি, ঘোড়া, দাস-দাসী নিয়ে আমি কি করব? মাথা গোঁজার মত আমার তিন পা জমি হলেই চলবে।

—মাত্র তিন পা জমি? আর কিছু নয়? ধুন্ধু বলল—তা না হয় দিচ্ছি। ও তো খুবই সামান্য। আরও কিছু নিন।

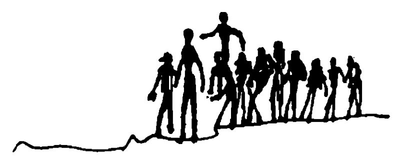
বামন গতিভাস বলল—না, ওর বেশি আমার আর কিছু দরকার নেই।

অনেক অনুরোধ করেও ধুন্ধু যখন তাঁকে আর কিছু নেওয়াতে রাজি করাতে পারল না, তখন বলল—ঠিক আছে, তাই দিলাম।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বেঁটে-খাটো বামন গতিভাস ধরলেন বিরাট মূর্তি। বিশাল হয়ে উঠল তাঁর দেহ। একটা পা ফেললেন স্বর্গে, আর এক পা মর্ত্যে। তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন? জায়গা খুঁজে না পেয়ে রাখলেন ধুন্ধুর পিঠে। গুরুভার পায়ের চাপে ধুন্ধুর পায়ের তলায় প্রায় তিরিশ হাজার যোজন মাটি সরে গিয়ে গর্ত হয়ে গেল। ধুন্ধু গিয়ে পড়ল সেই গর্তে। ত্রিবিক্রম ভগবান বিষ্ণু তখনই পা তুলে নিয়ে বিরাট সেই গর্ত বালি দিয়ে ভরতি করে দিলেন।

ধুন্ধুর আশা ফুরলো। দেবতারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

[ব্রহ্মপুরাণে আছে কিভাবে এই ধুন্ধু অত্যাচার চালাত, আর রাজা কুবলয়াশ্ব কিভাবে তাকে বধ করেছিলেন। 'ধুন্ধুমার কাহিনী' দেখ]।



পুরূরবার ইতিকথা

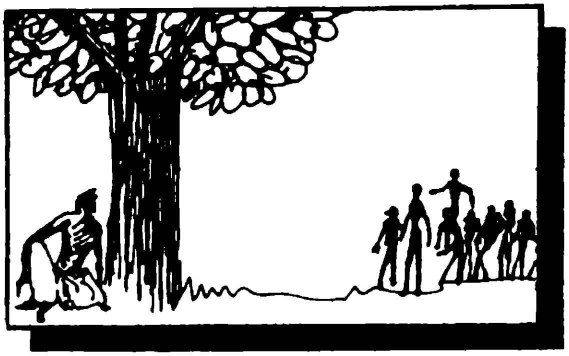
ত্রেতা যুগের কথা।

মদ্রদেশে শাকল গ্রাম। অজস্র ব্রাহ্মণের বাস।

সেখানে ধর্ম নামে এক বণিক থাকত। দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে দেশে দেশে বাণিজ্য করে বেড়াত। নামে ধর্ম, স্বভাবটাও তার ধার্মিক ছিল। কাউকে কখনো ঠকাতো না।

একবার বেশ কয়েকজন বণিকের সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে ধর্ম বাণিজ্য করতে বের হল সৌরাষ্ট্রে। পথে যেতে যেতে যেখানে রাত হল, সেখানটা মরুভূমি। কি আর করে। তাঁবু খাটিয়ে রাতটুকু সেখানেই থাকতে হল। মাঝ রাতে হঠাৎ ডাকাত এসে যা কিছু ছিল সব লুটেপুটে নিয়ে গেল।

মনের দুঃখে বণিক আর বাড়ি না ফিরে পাগলের মত সেখানেই ঘুরতে ঘুরতে এক বনে এল। সবেমাত্র বনের এক জায়গায় বেড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে। খিদের তেষ্টায় কষ্টও হচ্ছে খুব। হঠাৎ দেখল, কোথাও কিছু নেই। সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে এল বিরাট এক



শমীগাছ। ডালপালায় ভরা গাছ। পাখি-পাখালির সাড়াশব্দ নেই। কেবল যেন শিরশির করে বইতে শুরু করল ঠাণ্ডা বাতাস। গাছের তলাতেই বণিক বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুম ভাঙল ঠিক দুপুরে। চোখ চাইতেই বণিক দেখল, প্রেতের এক মিছিল আসছে। মাঝখানে এক প্রেত। সে চেপে আছে অপর এক প্রেতের কাঁধে। তাকে ঘিরে শয়ে শয়ে প্রেত।

বণিক ধর্মের একটু ভয় ভয় লাগলেও এখন আর যাবে কোথায়? মনে সাহস এনে সেখানেই শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল তাদের গতিবিধি। প্রেতের দল এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তারই কাছে সেই শমীগাছের নীচে এল।

প্রেতনায়কের হঠাৎ চোখ পড়ে গেল বণিকের দিকে। গাছের ছায়ায় বসে সে জিজ্ঞেস করল বণিককে—কে তুমি? পশুপাখিহীন এই বনে তুমি কেমন করে এলে? তোমার দেশ কোথায়?

বণিক তখন আদ্যোপান্ত বলল তাকে। তা শুনে প্রেতনায়ক বলল—এর জন্য এত দুঃখ কিসের? ভাগ্য ভাল হলে, যা গেছে আবার তার চারগুণ বেশি রোজগার হবে। তবে আমার ভাগ্য ভাল যে, আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম। তোমার পরিচয় পেয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

—কি রকম? বণিক জিজ্ঞেস করল।

—দেশের মানুষকে বিদেশ বিভুঁইতে দেখতে পেলে আনন্দ হয় না?

—মানে?

—মানে, আমার বাড়ি ছিল তোমারই দেশে। তোমারই গ্রামে, শাকলে। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বড় খিদে পেয়েছে। আগে তোমায় খাওয়াই, তারপর কথা হবে। প্রেতনায়ক বলল।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক থালা দইমাখা ভাত, জলের পাত্র হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হয়ে গেল। প্রেতনায়ক বেশির ভাগটা দিল বণিককে। বাকি যেটুকু ছিল, নিজে তা থেকে কিছুটা খেয়ে বাকিটুকু আর সকলকে ভাগ করে দিল।

বণিকও মুখ বুজে খেয়ে নিল। খাওয়া শেষ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে থালা-গেলাস সব মুহূর্তে উধাও।

বণিক এইসব দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে প্রেতনায়ককে জিজ্ঞেস করল—এই নির্জন জায়গায় এমন থালা ভরতি ভাত, জল কোথা থেকে এল? তোমাকে তো বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে। আর তোমার অনুচররা এমন রুগ্ন কেন? তুমি কে?

প্রেতনায়ক বলল—তাহলে বলি শোন। আমার নাম সেনশর্মা, ব্রাহ্মণ। আমার মায়ের নাম বহুলা। আমার প্রতিবেশী এক বণিক ছিল। খুবই ধনবান, তার নাম ছিল সোমশ্রবা। সে ছিল খুবই ধার্মিক। দান ধ্যান করত, আর আমি? আমারও অভাব কিছুই ছিল না। কিন্তু কাউকে কোন দিন কিছু দান করি নি। মনে করতাম, দান করা মানে অপচয় করা। নিজে ভালভাবে থাকতাম, ভাল ভাল খেতাম। কোন দিন যদি ভুল করে কাউকে দই, ক্ষীর বা ঘি-মেশানো কোন খাবার দিতাম, মনে হতো, রাতে আমায় কে যেন তিন গাছা লাঠি দিয়ে জোরে জোরে মারছে। সেই থেকে আর কাউকে কিছু না দিয়ে নিজেই শুধু খেতাম। খেতে খেতে হল ওলাওঠা। প্রায় যাই যাই অবস্থা। কোন রকমে সামলে উঠলাম। সেই সময় আমাদের এক প্রতিবেশী আরো অনেক যাত্রী নিয়ে ইরাবতী আর নর্মদার সঙ্গমস্থলে তীর্থস্নান করতে চলল। আমিও সঙ্গী হলাম। সেখানে গিয়ে স্নান সেরে কি মনে হল, একটা ভাল দিন দেখে সদাচারী এক ব্রাহ্মণকে নতুন কাপড়, ছাতা, জুতো, দইমাখা ভাত, জল ভরতি গেলাস দান করে বসলাম। সত্তর বছর বেঁচে ছিলাম। সেই আমার একমাত্র স্বেচ্ছায় দান। আমার সঙ্গে আর যারা স্নানে গিয়েছিল, তারা কিন্তু কেউ কিছু দান করল না। আমি মরে প্রেত হলাম। ওরাও হল। কিন্তু ঐ যে দানটুকু করেছিলাম প্রেতজন্মে তার ফলটুকু ভোগ করছি। ভাত-জল তো দেখলে। ছাতার কাজ করে এই শমীগাছ, আর জুতো দানের ফলে আমার জুতোর কাজ করে এই প্রেতরা।

শুনে ভারি মজা লাগল বণিকের। বলল—বল, আমি যদি তোমাদের কোন উপকার করতে পারি।

প্রেতনায়ক বলল—প্রেতজন্ম বড় কষ্টের। তুমি যদি গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে আমাদের উদ্দেশে পিণ্ড দাও, আমরা মুক্তি পাই। তোমারও ভাল হবে।

—বেশ। তাই দেব। বলল বণিক।

আবার সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

বণিক ঘুরতে ঘুরতে শূরসেন দেশে এসে বেশ কিছু রোজগারপাতি করে গয়ায় এল। সকলের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিল। প্রেতাত্মারাও মুক্তি পেল। বণিক ফিরে এল নিজের দেশে।

ক্রমে ক্রমে বয়স বাড়ল। খুব একটা অভাবের মুখ তাকে আর দেখতে হল না। মারা গেল বণিক ধর্ম। মারা যাবার পর গন্ধর্বলোকে কিছুকাল কাটিয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করল মানুষ হয়ে। এবারে সে হল পৃথিবীর সম্রাট। ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করে যখন মারা গেল, এল গুহ্যক লোকে। এখানে প্রচুর ভোগ-সুখ। কিছুকাল মহানন্দে কাটিয়ে আবার মহাবল ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে জন্মাল পৃথিবীতে। এই জীবনটাও তার ভাল ভাবে কেটে গেল। মারা যাবার পর এল ইন্দ্রলোকে।

সেরা লোক ইন্দ্রলোক। অঢেল সুখ। দীর্ঘকাল এখানে কাটিয়ে সে আবার মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করল শাকল গ্রামের এক ব্রাহ্মণের ঘরে। অল্প দিনের মধ্যেই সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠল সে। তা হলে কি হবে, দেখতে সে ছিল ভারি কুৎসিত। যাকে বলে একেবারে কদর্য চেহারা। তার বাবা-মা ঠিক সময়েই এক ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দিলে কি হবে। কুরূপ কদর্য স্বামীকে সে আদৌ ভালবাসত না। তার কথা শুনত না। অবজ্ঞা করে চলত।

দেখতে দেখতে ব্রাহ্মণের মনে খুব দুঃখ হল। দেখতে সুপুরুষ, ভাল না হলেও, গুণেরও কদর নেই। হায় রে! সংসারে বিতৃষ্ণা

জন্মে গেল তার। সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে একদিন সে চলে গেল ইরাবতীর তীরে। সেখানে এক আশ্রম তৈরি করে নক্ষত্রব্রত নামে এক কঠিন ব্রত পালন করতে লাগল। এই ব্রতের নিয়ম হল, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুজো করা। মহর্ষি ভৃগুও নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্য এই ব্রত পালন করেছিলেন।

যাই হোক, সেই ব্রাহ্মণ নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ব্রত পালন আর জগন্নাথের আরাধনা করতে করতে এক দিন সুন্দর চেহারা লাভ করল। এখন সে আর কুৎসিত-কদর্য ব্রাহ্মণ নয়। রীতিমত সুপুরুষ। তার সংসারও সুখের হয়ে উঠল।

জন্মান্তরে এই ব্রাহ্মণই হয়েছিল বিখ্যাত রাজা পুরূরবা।

ক্ষত্র রাক্ষসের কথা

ভয়ানক অত্যাচারী এক রাক্ষস। তার ভয়ে সকলেই ভীত। অত্যাচারে সকলেই অতিষ্ঠ। স্বভাবে এত নিষ্ঠুর যে তা বলা যায় না। হাতের কাছে কাউকে পেলে তার তো রক্ষে নেই-ই, এমন কি দূর দূর জায়গাতে গিয়েও মানুষ, পশু যা পেত ধরে এনে খেত।

এ রকম হওয়ার একটা কারণ ছিল। পূর্বজন্মে এই রাক্ষস ছিল একজন ক্ষত্রিয় বীর। বীর হিসেবে তার সম্মান ছিল ঠিকই, কিন্তু মনে-প্রাণে সকলে তাকে ঘৃণা করত। কেননা, সে ছিল দারুণ নিষ্ঠুর। দয়ামায়া বলে তার কিছুই ছিল না। মানুষকে অত্যাচারে জর্জর করে তুলত। সকলেই ভাবত, এই লোকটার হাত থেকে কবে মুক্তি পাওয়া যাবে। মৃত্যুর পরে সেই জন্যই সে রাক্ষস হয়েছিল, আর নিষ্ঠুর ভাবে মানুষ, জন্তু যা পেত, ধরে মেরে খেত।

এমন ভাবে সেই রাক্ষসের কাটল একশ বছর। যৌবনের তেজ কমে গেল। শরীরে বার্ধক্য দেখা দিল। তবুও প্রাণীহত্যা করায় তার কোন অনিচ্ছাই এল না। এলেই-বা চলবে কেমন করে। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন খেতে তো হবে।

একদিন রাক্ষস একপেট খিদে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক নদীর ধারে এল। দেখল, নধরদেহ এক তাপস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছেন। দেখামাত্রই তার পেটের খিদে যেন দ্বিগুণ চনমন করে উঠল। দু-হাত বাড়িয়ে তাপসের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাত নেমে এল। আর এক পা-ও এগোতে পারল না। তাপস চোখ বুজে নিজের ধ্যানে ডুবে আছেন। তিনি এসব কিছুই জানতে পারেন নি। রাক্ষস আরো কয়েকবার চেষ্টা করল তাঁকে ধরে খাবার। কিন্তু প্রতিবারেই কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কেন এমন হল! এতদিন কত তপস্বী, কত মানুষকে ধরে খেয়েছে। এ রকম অবস্থায় তো কখনো পড়তে হয় নি। হঠাৎ মনে হল রাক্ষসের, ইনি নিশ্চয়ই একজন বেশ বড় তাপস।

বেশ কিছুক্ষণ পর তাপসের ধ্যান ভাঙল। চোখ খুলেই সামনে রাক্ষসকে দেখলেন দাঁড়িয়ে থাকতে। দেখে মনে মনে একটু হাসলেন তাপস। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তুমি এখানে এমন সুবোধ বালকের মত দাঁড়িয়ে কেন?

রাক্ষস বলল—সুবোধ তো আমি ছিলুম না। আপনার কাছে এসেই তো দেখছি আমার এই অবস্থা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আমার মনে অনুতাপও জাগছে।

তাপস বললেন—তাই নাকি?

—হ্যাঁ তাপস, ঠিক তাই। বলল রাক্ষস—জানি না, কোন শক্তির জোরে আপনি আমার হাত থেকে এমন ভাবে রেহাই পেলেন। আর আমার মনকেও টলিয়ে দিলেন। আমি মহাপাপী। দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন। আমাকে বলুন, কার শরণাপন্ন হলে আমি মুক্তি পাব।

তাপস বললেন—দেখ রাক্ষস, ওসব গোপন কথা আমি তোমাকে বলতে পারব না। তুমি কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে যাও। তিনি হয়ত তোমাকে ইচ্ছে করলে বলতে পারেন।

এই বলে তাপস চলে গেলেন।

এদিকে রাক্ষসের মনে তোলপাড় শুরু হল। অতখানি যে নির্দয় আর নিষ্ঠুর ছিল সেই মনোভাবই তার আর রইল না। খিদেয় পেট কাঁদলেও আর ইচ্ছে যায় না শিকার ধরে খাবার। না খেলে চলবে না, তাই দিনের শেষে যে কোন জন্তু-জানোয়ার হাতের কাছে পেত সে, ছোটই হোক আর বড়ই হোক, মেরে খেয়ে খিদে মেটাত। আর খুঁজে বেড়াত যদি কোন ব্রাহ্মণের দেখা মেলে।

এভাবে কেটে গেল রাক্ষসের আরো কয়েক বছর। ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে। কিন্তু দেখা আর মেলে না, আশও মেটে না।

একদিন সন্ধেবেলা। শিকার ধরে খিদে মেটাবার সময়। শিকার খুঁজে চলেছে। হঠাৎ দেখল এক ব্রহ্মচারীকে, ফল হাতে চলেছে। দৌড়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল রাক্ষস।

মুনিবালক দেখল, রাক্ষস যখন ধরেছে তখন তার প্রাণের আশা নেই। তবু নিজেকে সংযত রেখে বলল—তোমার মঙ্গল হোক। আমায় এভাবে কেন ধরলে?

রাক্ষস বলল—কেন ধরলুম, বুঝতে পারলে না? আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোমায় খেয়ে আমার খিদে মেটাব, তাই ধরেছি।

মুনিবালক বলল—বেশ, খেয়ো। তার আগে আমাকে একবার ছেড়ে দাও। আমার গুরুদেবের জন্য আমি ফল জোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তাঁকে এটা দিয়ে ফিরে আসব। তখন খেয়ো। না দিয়ে এলে আমার গুরুদেব যে অভুক্ত থাকবেন।

রাক্ষস বলল—দিনের শেষে আমার হাতে যে পড়বে, সে যে অবস্থাতেই থাকুক, আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না। দেবতা হলেও না। তাকে আমি খাবই। এটা আমার একমাত্র জীবিকা। তবে একটা শর্তে আমি ছেড়ে দিতে পারি, যদি তুমি তা পালন কর।

মুনিবালক বলল—যদি আমার গুরুদেবের আদেশ-বিরুদ্ধ না হয়, তাহলে চেষ্টা করতে পারি।

রাক্ষস বলল—ছোটবেলা থেকেই আমি অনেক পাপ করেছি। আমার পাপের সীমা-পরিসীমা নেই। কিভাবে আমি মুক্তি পাব তা যদি বলে দিতে পার, তাহলে অবশ্যই তোমায় ছেড়ে দেব।

মুনিবালক পড়ল মহা সমস্যায়। এর কি জবাব দেবে সে কিছুই



জানে না। আবার জবাব দিতে না পারলে রাক্ষসের হাতে প্রাণ যাবে, গুরুদেবও অভুক্ত থাকবেন। অনেক ভেবে-চিন্তে কোন উপায় না দেখে অগ্নিদেবকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলতে লাগল—হে অগ্নিদেব, তুমি তো জান, আমি গুরু ছাড়া আর কিছু জানি না। আমাকে এই বিপদ থেকে তুমি রক্ষা কর।

সরল মুনিবালকের প্রার্থনা শুনে অগ্নিদেব দেবী সরস্বতীকে বললেন—সরস্বতী, তুমি গিয়ে ব্রহ্মচারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

অগ্নিদেবের কথায় দেবী সরস্বতী মুনিবালকের কাছে এসে বললেন—তোমার কোন ভয় নেই। আমার আশীর্বাদে তুমি কথা বলতে শুরু করলেই সব কিছু সহজভাবে বলে যেতে পারবে। তুমি ওকে বিষ্ণুর স্তব শুনিয়ে দাও।

নির্ভাবনায় মুনিবালক এবার বিষ্ণুর স্তব বলতে শুরু করে দিল। মিষ্টি সুরে আদি দেব বিষ্ণুর অসীম শক্তির কথা ঝরঝর করে বলে দিয়ে রাক্ষসকে বলল—তুমি এই স্তব দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা কর। তোমার সব পাপ দূর হবে। তুমি মুক্তি পাবে।

এতদিন ধরে রাক্ষস যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল দেখে খিদেও ভুলে গেল। মুনিবালককে ছেড়ে দিল। তারপর থেকে নিজেকে সংযত রেখে দিন-রাত শুধু সে তার স্তব করে গেল।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সেই স্তবপাঠ আর কেশবের আরাধনা করতে করতে মন থেকে তার সব হিংসা, পাপ যা কিছু ছিল, দূর হয়ে গেল। মুক্ত হয়ে সে চলে গেল বৈকুণ্ঠলোকে।

নিশাকরের কথা

পাপ-পুণ্যের ফল সকলকেই ভোগ করতে হয়। এর থেকে নিস্তার পাবার কোন উপায়ই নেই। যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে সংযত করতে পারছে, মনকে পবিত্র করতে পারছে, কামনা-বাসনা-লোভকে জয় করতে পারছে, ততক্ষণ শাস্তিভোগ তাকে করে যেতেই হবে। কোশকারের ছেলেকে জন্মজন্মান্তর ধরে তার অন্যায় কাজের ফল ভোগ করতে হয়েছিল।

কোশকার হল মহর্ষি মুদগলের ছেলে। বাৎস্যায়নের মেয়ে ধর্মিষ্ঠার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। দুজনেই ধার্মিক, নীতিবান, শাস্ত্রজ্ঞানী। কিন্তু তাদের যখন একটা ছেলে হল দেখা গেল, ছেলেটি যেন কেমন। হাসে না, কাঁদে না, চোখ দিয়ে আবার দেখতেও পায় না। মা ধর্মিষ্ঠার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। তখনও আঁতুড়ঘরে। পাঁচ দিন কেটে গেল। ছেলের মুখে কথা ফুটল না দেখে ধর্মিষ্ঠা তাকে ঘর থেকে বের করে বাইরে ফেলে রেখে দিল।

সেই সময় শূর্পাক্ষী নামে এক রাক্ষসী বেরিয়েছিল খাদ্যের সন্ধানে। রোজই বের হতে হতো তাকে, কারণ তার স্বামী ঘটোদর ছিল অন্ধ। খাবার যোগাড় করে এনে তাকে খাওয়াতে হত। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আঁতুড়ঘরের সামনে পড়ে থাকা ছেলেটা তার চোখে পড়ল। তক্ষুণি সে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার ঐ বয়সেরই রোগা ছেলেটাকে এনে সেখানে রেখে ব্রাহ্মণ ছেলেটাকে নিয়ে সোজা হাজির হল স্বামী ঘটোদরের কাছে। বলল—শুনছ আজ খুব ভাল শিকার এনেছি।

—কাকে কোথা থেকে আনলে গো। জিজ্ঞেস করল ঘটোদর।

শূর্পাক্ষী বলল—কোশকারের স্ত্রী তার ছেলেটাকে আঁতুড়ঘরের বাইরে ফেলে রেখেছিল। আমাদের ছেলেটাকে সেখানে রেখে সেই ছেলেটাকে নিয়ে এলাম।

শুনে ঘটোদর বলল—সর্বনাশ ঘটাবে শূর্পাক্ষী। কোশকারকে জান না, ও দারুণ তেজী। যদি ধরে ফেলে, তাহলে আমাদের আর রক্ষে রাখবে না। এক্ষুণি চুপি চুপি সেখানে গিয়ে রেখে এসো।

স্বামীর আদেশ। শূর্পাক্ষী আবার ছেলেটাকে নিয়ে আকাশপথে



ছুটল সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির দিকে।

ইতিমধ্যে সেখানে একটা ঘটনা ঘটে গেল। আঁতুড়ঘরের সামনে শূর্পাক্ষীর ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠতেই চমকে গেল ধর্মিষ্ঠা। সেই সঙ্গে আনন্দও হল এই ভেবে যে,ছেলে তাহলে তার মুখ খুলেছে এতদিন বাদে। স্বামী কোশকারকে ডাকল। কোশকারও দেখল। কিন্তু তার মনে সন্দেহ জাগল। যে ছেলে এতদিন জড় হয়ে ছিল, আজ তাকে দেখে তো আর সে রকম মনে হচ্ছে না। কোন রহস্য নেই তো এর মধ্যে? যাই হোক, অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জানা ছিল তার। ঠিক করল, যা কিছুই হোক, আগে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে তো রাখি, তারপর দেখা যাবে। এই ভেবে, কুশের জল ছিটিয়ে ছেলেটার গায়ে খানিকটা মাটি লেপে দিল। মন্ত্রবলে ছেলেটা সেখানেই বাঁধা পড়ে গেল।

এদিকে সবেমাত্র এই কাজটা শেষ করেছে কোশকার, শূর্পাক্ষী এসে সকলের অলক্ষ্যে ঘরের ভেতর তাদের ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে নিজের ছেলেটাকে দিতে গেল। কোশকার দেখেই ঘরে ঢুকে নিজের ছেলেটাকেও বেঁধে ফেলল। শূর্পাক্ষী অনেকক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করেও কিছুই করতে পারল না।নিজের ছেলেটাকে পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সেখানে ফেলে রেখে চলে গেল। কোশকার সবই বুঝতে পারল, কিন্তু স্ত্রীকে কিছুই বলল না। একটা ছেলে হয়েছিল জড়, বোবা, অন্ধ। এখন আর একটা সুস্থ সবল ছেলে লাভ হল।

দুটো ছেলেকেই ধর্মিষ্ঠা ভাল ভাল খাবার খাইয়ে বড় করে তুলতে লাগল। কোশকার রাক্ষসীর ছেলের নাম রাখল দিবাকর, আর নিজের ছেলের নাম রাখল নিশাকর।

দিবাকর-নিশাকর দু-ভাই দেখতে দেখতে সাত বছরে পড়ল। কোশকার তাদের পৈতে দিয়ে দিল। পণ্ডিত বংশের ছেলে, সুতরাং ভাল ভাবে লেখাপড়া শেখাতে হবে। দু-জনকে পাঠাল গুরুর কাছে বেদ পড়ার জন্য।

দিবাকর গড়গড় করে বেদ পড়ে চলে। গুরু যেমনটি শেখায়, সে তেমনটি শিখে ফেলে। কিন্তু নিশাকর কিচ্ছু পড়ে না। গুরু হাজার চেষ্টা করেও তাকে বেদ পড়াতে পারলেন না। নিশাকরের ওপর সকলেই ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। অমন পণ্ডিতের বংশে এ কি! সকলেই ছিঃ ছিঃ করতে লাগল নিশাকরকে। কোশকারও মনে মনে খুবই বিরক্ত হল। সে তখন কাউকে না জানিয়ে নিশাকরকে নিয়ে কিছু দূরে এক কুয়ার কাছে গিয়ে হঠাৎ তার ভেতর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কুয়ায় জল ছিল না। পাশে ছোট্ট একটা আমলকি গাছ ছিল। গাছটাকেই ফেলে দিয়ে কোশকার একটা পাথর দিয়ে কুয়ার মুখটা ঢেকে দিয়ে চলে এল।

ছেলেকে আর খুঁজে না পেয়ে ধর্মিষ্ঠা ভাবল, জড়-বোবা ছেলে, কে জানে কোথায় চলে গেছে।

দিবাকর ইতিমধ্যে বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠেছে। নিশাকরের কথা সবাই প্রায় ভুলেই গেছে।

কোন এক কারণে ধর্মিষ্ঠা কুয়ার পাশ দিয়ে আসতে গিয়ে তার নজরে পড়ল, মুখটা ভারী পাথর দিয়ে ঢাকা। প্রায়ই পাশ দিয়ে এসেছে-গেছে, ঠিক নজরে পড়ে নি। আজ নজরে পড়তেই একটু অবাক হয়ে কুয়ার পাশে গিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল—তাই তো, কুয়ার মুখটা এমন ভাবে পাথর চাপা দিল কে?

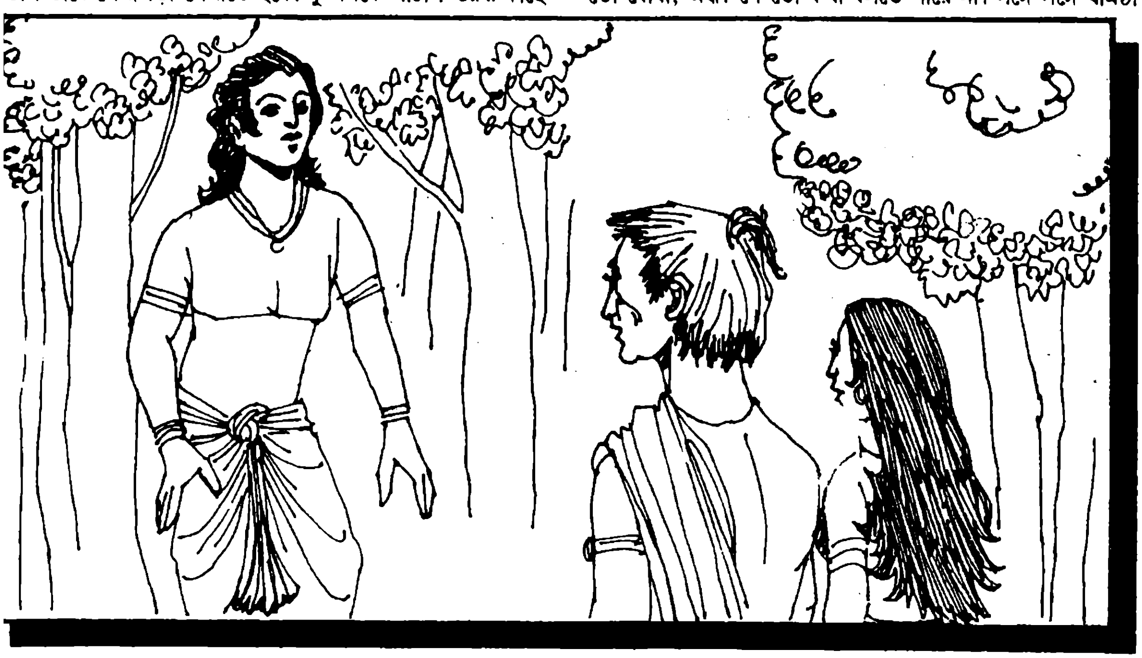
কুয়ার ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বরে স্পষ্ট ভাবে কে যেন বলে উঠল—কোশকার।

কথা শুনেই চমকে উঠল ধর্মিষ্ঠা।

— ভেতর থেকে কে তুমি কথা বলছ?

—আমি আপনাদেরই ছেলে নিশাকর।

ধর্মিষ্ঠা শুনে আরও অবাক হল। তা কেমন করে সম্ভব? নিশাকর তো বোবা, অন্ধ। সে তো কথা বলতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মিষ্ঠা



ছুটল স্বামী কোশকারের কাছে। সব কথা বলল। কোশকার শুনে তক্ষুণি সেই কুয়ার ধারে এসে পাথর সরিয়ে ছেলে নিশাকরকে টেনে তুলল। তারপর জিজ্ঞেস করল—এতদিন তুমি বোবা, অন্ধ, জড়-বুদ্ধি হয়ে ছিলে কেন? আজই-বা তুমি কথা বলছ কিভাবে।

নিশাকর বলল—বাবা, এ আমার জন্ম-জন্মান্তরের পাপের ফল। আপনার ছেলে হয়ে জন্মালেও আমার পূর্বস্মৃতি আমি কিছুই ভুলি নি। একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলাম আমি। কিন্তু শাস্ত্রের কোন কিছুই আমি নিষ্ঠার সঙ্গে মানি নি। ব্রাহ্মণের যা আচার-আচরণ তা আমি কখনো মানি নি। বিশেষ করে স্ত্রীজাতিকে সম্মান, মর্যাদা আমি কখনোই দিই নি। তাই প্রতি জন্মে আমার অকালমৃত্যু হয়েছে। সাজা ভোগ করেছি। প্রতিবার জন্মেছি আর ভেবেছি সৎপথে থাকব; বি কামনা-বাসনা-লোভ আমায় সৎ থাকতে দেয় নি। মানুষ জন্ম থে শুরু করে পশু-পাখির জন্ম-যন্ত্রণা পর্যন্ত ভোগ করেছি। শে এসেছি আপনার ঘরে। আপনি আমাকে কুয়ার ভেতর ফেলে পাথ চাপা দিয়ে গেলেন। কুয়ার ভেতর আমলকি গাছের ফল খে কাটিয়েছি, আর আস্তে আস্তে মনকে সংযত করেছি।

সব মন দিয়ে শুনে কোশকার ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বেঁকে বসল নিশাকর। বাড়িতে না গিয়ে সে সোজা চলে গেল বদরিকাশ্রমে। সেখানে তপস্যা আর নিয়মনিষ্ঠায় কাল কাটাতে লাগল।



কূর্ম পুরাণ

শিব-দুর্গার মাহাত্ম্য, তীর্থ-মাহাত্ম্য, সৃষ্টির কথা, পৃথিবী থেকে শুরু করে চোদ্দ-ভুবনের কথা—এইসব নিয়েই কূর্ম পুরাণ। দেবাসুরে মিলে অমৃত লাভের আশায় মন্দর পর্বত দিয়ে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করার সময় ভগবান বিষ্ণু বিশাল কূর্মরূপ ধারণ করে পিঠে পাহাড়কে রাখতে সাহায্য করেছিলেন। সেই কারণে ভগবান বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে একটি অবতার হল কূর্মাবতার। দেবশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং অসুর শক্তি হীনবল করে দেবার পর নারদ মুনির অনুরোধে কূর্মরূপী ভগবান এই পুরাণ কাহিনী প্রথম বলেছিলেন। তাই এর নাম হয়েছে কূর্ম পুরাণ। পরে নৈমিষারণ্যে রোমহর্ষণ সূত এটি ঋষিদের শুনিয়েছিলেন। এই পুরাণের দুটি ভাগ—পূর্ব ভাগ আর উত্তর ভাগ। উত্তর ভাগে আছে ঈশ্বর গীতা আর ব্যাস গীতা। এই দুটো অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভ করতে হলে কি করতে হবে, তারই উপদেশ দেওয়া আছে।

ব্রহ্মা হলেন পদ্মযোনি

বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা আসলে এক হলেও নামে আলাদা। তাই তাঁরা হলেন দু-জন। ব্রহ্মা বললেই সকলে জানে যে, তিনি হলেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, বিধাতা, দেব-দানবদের ঠাকুর্দা। তাঁর ইচ্ছেই সব। আর বিষ্ণুর কাজ হল, ব্রহ্মা যা সৃষ্টি করলেন, তার লালন-পালন করা, শাসন করা। বাইরে থেকে দেখলে তাই দেখায়। কিন্তু ভেতরে যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই আবার শিব। সেই একজনই তিন নামে সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন এবং ধ্বংস করছেন।

নামের মধ্যে একটা মোহ আছে। তাই সকলেই চায় নিজের নামকে জাহির করতে। নিজের ক্ষমতা সকলের কাছে প্রকাশ করতে।

সুপ্রাচীন কালে নামের মোহে পড়ে নিদারুণ এক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণু।

সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেছে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল একাকার। জল থই থই করছে চারদিকে। মাটি নেই, গাছ-পালা নেই, পাহাড়-পর্বত নেই। ব্রহ্মাণ্ডে পশু-পাখি থেকে মানুষ, এমন কি স্বর্গরাজ্যের দেবতারা, পাতালের অসুর-রাজরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। অথই সমুদ্র একটাই, ঢেউয়ের ওপর ঢেউ তুলছে। তার কোন কূল-কিনারা নেই।

ধ্বংসের পরে সৃষ্টি। সাধারণ ভাবে সৃষ্টির কাজ হল ব্রহ্মার। এটা তাঁরই দায়িত্ব। তাই তিনি দেখতে বেরিয়েছেন, কিভাবে এই জল সরিয়ে আবার পৃথিবীকে উদ্ধার করা যায়।

বেরিয়ে দেখলেন, সেই সমুদ্রের ওপর কে যেন একজন শুয়ে আছেন। বিশাল এক পুরুষ যেন—হাজার পা, হাজার হাত, হাজার মাথা! তাঁর নাভিতে আবার একটা পদ্ম। অপূর্ব সুন্দর সেই পদ্ম। ভোরের সূর্যের মত অরুণ-বর্ণ তাঁর রং, ভুর ভুর করছে সুবাস। হাজার দল, কেশর, কর্ণিকা নিয়ে পদ্মটিও ছিল চওড়ায় প্রায় একশ যোজন।

ব্রহ্মা দেখে এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। দেখলেন, বিশাল সেই পুরুষ ঘুম-ঘোরে যেন আচ্ছন্ন।

যেখানে কেউ কোথাও নেই, সেখানে এই অদ্ভুত বিরাট পুরুষটি কে? খুবই কৌতূহলী হয়ে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? এইভাবে শুয়ে আছেন?

সেই পুরুষ বললেন—আমি নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমি মহাযোগী। বিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংস আমিই করি। বিশ্বজগৎ আমার এই দেহের মধ্যে।

ব্রহ্মা নারায়ণের কথা শুনে একটু হাসলেন।

সব জেনেই মহাযোগী নারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন ব্রহ্মাকে—আপনি কে?

ব্রহ্মা বললেন—আমি বিধাতা। সৃষ্টি থেকে শুরু করে যা কিছু এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সবই আমার পেটের মধ্যে। আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা।

নারায়ণ বললেন—তাই নাকি? আমার বড় দেখার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি অনুমতি করেন, তাহলে আপনার পেটের মধ্যে ঢুকে আমি একবার দেখে আসি।

ব্রহ্মা বেশ গর্বভরে বললেন—কোন আপত্তি নেই। এসো, দেখে যাও।

ভগবান নারায়ণ তখন যোগ শক্তিবলে, প্রায় চোখে দেখা যায় না, এমন এক রূপ নিয়ে ব্রহ্মার পেটে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে দেখলেন, বিশাল সেই উদরে সত্যি সত্যিই সব কিছুই রয়েছে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, দেবতা-মানুষ-অসুর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা সব...সব কিছুই রয়েছে তাঁর পেটের মধ্যে। ঘুরে ঘুরে সব দেখে, একসময় আবার তিনি ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন—হ্যাঁ, দেখলাম বটে। ঠিকই।

তারপর একটু থেমে বললেন—ইচ্ছে করলে এবার আপনি আমার দেহের মধ্যে ঢুকে দেখতে পারেন, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমার ভেতরে আছে কিনা।

ব্রহ্মার তখন অহঙ্কারে বুক ফুলে উঠেছে। নারায়ণকে দেখিয়ে দিয়েছেন—তিনি কে, তাঁর ক্ষমতা কতখানি। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি, তিনিই সকলের স্রষ্টা।

এবার ব্রহ্মা ঢুকলেন নারায়ণের উদরে। ঢুকে দেখেন,এ কি কাণ্ড! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত—এর যে শেষ নেই। ঘুরছেন তো ঘুরেই চলেছেন আর দেখছেন, একটা ব্রহ্মাণ্ড নয়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পেটের মধ্যে। দেখা আর শেষ হয় না।

এরপর, এক সময় বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্রহ্মা পড়লেন মহা মুস্কিলে। দেখলেন—নাক, মুখ, চোখ, কান থেকে শুরু করে যে সব জায়গা দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়, তার সব কটা পথই বন্ধ। অগত্যা পথের সন্ধানে ঘুরতে শুরু করলেন ব্রহ্মা। ঘুরতে ঘুরতে এলেন নাভির কাছে। দেখলেন, একমাত্র ঐ পথটাই খোলা আছে। ব্রহ্মা তখন সেই নাভির পথ ধরে বেরিয়ে এসে বসলেন



বিরাটকায় সেই অপরূপ পদ্মের ওপর। বেরিয়ে এসেই বললেন—হ্যাঁ, আপনি যে একজন বিরাট পুরুষ, তা আমি দেখলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ভেতরে আটকে রাখার অভিপ্রায় জাগল কেন আপনার মনে? পারলেন কি আটকে রাখতে?

নারায়ণ বললেন—না ব্রহ্মা, এ তোমার ভুল ধারণা। আটকে রাখার কোন অভিপ্রায় আমার ছিল না, নেই-ও। তা যদি থাকত, তাহলে কি তুমি বেরিয়ে আসতে পারতে? তুমি বেরিয়ে না এলে সৃষ্টির কাজ করবে কে? শুধু দেখলাম, তুমি নিজেকে যা ভেবেছিলে, তুমি তা নও। তুমি আমারই অংশ, আমার আত্মজ, তুমি আমার পুত্র। যেহেতু আমার উদর থেকে নাভিপদ্ম দিয়ে তুমি বেরিয়ে এলে, সেহেতু আমার পুত্র হিসেবে তোমার নাম হল 'পদ্মযোনি'।

ব্রহ্মার অনেক নাম। তবুও সেই থেকে তাঁর আর এক নাম হল 'পদ্মযোনি'।

এর ওপর ব্রহ্মার আর কিছু বলার ছিল না। নারায়ণের কথা মেনে নিলেন। নিজেকে প্রায় নারায়ণেরই সমান ভেবে নিয়ে গর্ববোধও করলেন। সর্বজ্ঞ নারায়ণ। ব্রহ্মার মন থেকে তখনো মোহ যায় নি দেখে মুচকি হাসলেন।

বসুমনার কাহিনী

রাজা হর্যশ্বের ছেলে বসুমনা—যেমন তেজী, তেমনি উদার। বাবার পর তিনি পৃথিবীর রাজা হয়েছেন। তাঁর সুশাসনে সব প্রজাই খুশি। যেমন রাজা, তেমনি রানী। দু-জনেই খুব ধার্মিক। তাঁদের ছেলে ত্রিধন্বা যৌবনেই ঠিক বাবার মত তেজী, ধার্মিক আর উদার হয়ে উঠেছে।

রাজা বসুমনা একবার অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বড় বড় সব ঋষিরা সেই যজ্ঞে এসেছেন। এসেছেন বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি থেকে শুরু করে ক্রতু (ইন্দ্র) পর্যন্ত। আসবারই কথা। কেননা পৃথিবীর সব রাজাই তাঁকে রাজাধিরাজ ও সম্রাট বলে মেনে নিয়েছেন। যজ্ঞ মানেই তো কাঠের আগুন জ্বালিয়ে ঘি পোড়ানো নয়,দান-ধ্যান, নানা আলোচনাও হয়।

যজ্ঞের শেষে রাজা বসুমনা সেই রকমই মুনি-ঋষিদের সঙ্গে বসেছেন আলোচনা করতে। ধার্মিক রাজার রাজকার্যে কোন অবহেলা ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে একটা প্রশ্ন প্রায়ই জাগত। প্রশ্নটা হল, কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়? পৃথিবীতে আর যেন জন্মগ্রহণ করতে না হয়।

মহা মহা মুনিদের পেয়ে, সেই প্রশ্নই তাঁর মাথায় আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। একদিন রাজসভায় সকলেই যখন বসে, তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করে বসলেন—মুনিবর, আপনারা বলুন, কিভাবে মোক্ষলাভ হয়। আর জন্মগ্রহণ করতে না হয়। যজ্ঞ, তপস্যা আর সন্ন্যাস—এই তিনটির মধ্যে কোনটি অবলম্বন করা উচিত।

শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন—নিষ্ঠার সঙ্গে বেদপ্রমুখ শাস্ত্র অধ্যয়নের পর সংসারী হওয়া উচিত। সংসারে থেকে ঘর-কন্না আর যজ্ঞাদি করার পর বনে যাওয়াই ভাল।

পুলস্ত্য বললেন—প্রথমেই যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ এবং মহাযোগী পরমেশ্বরের আরাধনা করে যেভাবে বানপ্রস্থে যাবার নিয়ম আছে, সেভাবে বনে যাওয়া উচিত।

পুলহ বললেন—আমার কথা হল, তপস্যার দ্বারা পুরাণপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনা করলেই মোক্ষলাভ হয়।

জমদগ্নি বললেন—যিনি এই বিশ্বজগৎ, সেই সনাতন বিষ্ণুর তপস্যা করলে মুক্তি অনিবার্য।

বিশ্বামিত্র বললেন—অত যাগ-যজ্ঞের কি দরকার? স্বয়ম্ভু, সনাতন রুদ্রদেবকে কঠোর তপস্যায় তুষ্ট করতে পারলেই মুক্তি।

ভরদ্বাজ বললেন—সব যজ্ঞের ঈশ্বর হলেন শ্রীহরি বাসুদেব। মনে-প্রাণে তাঁর পুজো করলেই সব কিছুর ফললাভ হয়।

অত্রি বললেন—অনাদি অনন্ত হলেন মহাদেব। তাঁরই উদ্দেশ্যে ঘোরতর তপস্যা করলে মুক্তি অনিবার্য।

গৌতম আর কশ্যপ মুনিও সেই কথা বলার পর ক্রতু বললেন—বেদাদি অধ্যয়নের পর সংসারের দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে তপস্যা হল যথার্থ ধর্ম।

মন দিয়ে মুনিদের সব অভিমত বসুমনা শুনলেন। মুনিরা চলে গেলেন। যজ্ঞকাজ শেষ হল। ভাল একটা দিন দেখে রাজা ছেলে ত্রিধন্বাকে সিংহাসনে বসিয়ে বনের পথে চলে গেলেন তপস্যা করতে।

যেতে যেতে তিনি হিমালয়ের দেবদারু বনে এলেন। জায়গাটা খুবই ভাল লেগে গেল। সেখানেই একটা কুটির তৈরি করে, বসুমনা গাছের ফল-মূল মাত্র খেয়ে, কঠোর তপস্যা শুরু করে দিলেন। এক মনে গায়ত্রী দেবীকে স্মরণ করে তাঁরই জপ করে চললেন। গায়ত্রী দেবী হলেন বেদমাতা, তিনি সন্তুষ্ট হলে সব দেব-দেবীই সন্তুষ্ট হন।

গায়ত্রী জপ করতে করতে বসুমনার কেটে গেল একশ বছর।

যখন একশ বছর পেরিয়ে গেল, তখন হঠাৎ একদিন চারদিক আলো করে স্বয়ং ব্রহ্মা এলেন তাঁর কাছে। তাঁকে দেখে বসুমনার মন আনন্দে ভরে গেল। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর স্তুতি করলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—বর প্রার্থনা কর।

রাজা বললেন—ভগবান, আমি আরো একশ বছর বেঁচে বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করতে চাই। আপনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে এই বর আমাকে দেন, তাহলে আমি খুশি হই।

ব্রহ্মা বললেন—বেশ, তাই হবে।

রাজা বসুমনা আবার এক মনে জপ করে চললেন। যত জপ করেন, মন যেন তত ভরে ওঠে। খোলা চোখে ভেতরে যেমন দেখেন আলো, চোখ বুজে ভেতরেও দেখেন সেই আলো। কোথাও যেন কোন অন্ধকার নেই।

একশ বছর যে কখন কেটে গেল, তা বসুমনা জানতেও পারলেন না।

এক সময় বসুমনা দেখলেন যেন সূর্যমণ্ডল থেকে নেমে এলেন

এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। প্রথমটায় বসুমনা বুঝতে পারেন নি, কে এই পুরুষ। যখন সেই জ্যোতির ধাঁধা কাটল, চতুর্মুখ ব্রহ্মা আট হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই সামনে। কিন্তু দেখা মাত্রই আবার যেন ঘোর লেগে গেল বসুমনার। সত্যিই কি ব্রহ্মাকে দেখলেন তিনি? তাঁকেই কি দেখছেন? এ যে মহাদেব রুদ্র! বিস্ময়ে, পুলকে অধীর হয়ে উঠলেন বসুমনা। অনুরাগভরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রণাম জানালেন তাঁকে। স্তব করলেন সেই ভাষায়, যা আপনা থেকেই উঠে এল তাঁর নিজের মন থেকে—'নমস্তে নীলকণ্ঠায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে। ত্রয়ীময়ায় রুদ্রায় কালরূপায় হেতবে।।'—হে নীলকণ্ঠ, ভাস্বরদ্যুতিময়, পরমেষ্ঠি ভগবান, হে ত্রয়ীময় (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) রুদ্রদেব, জগতের কালরূপ, তোমাকে নমস্কার।

স্তব শুনে মহাদেব খুশি হলেন। দেখলেন, বসুমনার মনে আর কোন সংশয় নেই। যা সত্য, তা তিনি দেখতে পেয়েছেন। বললেন—বসুমনা, বর চাও।

বসুমনা গায়ত্রী জপে এমন মজা পেয়ে গিয়েছিলেন, এমনি আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন যে, আরও একশ বছর জপ করতে চাইলেন।

মহাদেব বললেন—ঠিক আছে, তাই কর। তার সঙ্গে রুদ্রদেবের একশ নামও নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করে যাও। যত জপ করবে, ততই জ্ঞান বাড়বে।

বসুমনা আবার জপে মন দিলেন। জপ করতে করতে যখন একশ বছর পূর্ণ হল, তখন কোথায় সেই রাজা বসুমনা! মনে-প্রাণে সব দিক থেকে মহাদেবের অনুগ্রহে, তিনিও যেন হয়ে গেলেন দ্বিতীয় আর এক মহাদেব।



জয়ধ্বজ ও চার ভাই

মহা পরাক্রমশালী হৈহয়-রাজ কার্তবীর্যার্জুনের অনেক ছেলে-পুলে ছিল। তার মধ্যে পাঁচ জন ছিল ঠিক বাবার মতই—যেমন সাহসী বীর, তেমনি যোদ্ধা। তাদের নাম হল শূর, শূরসেন, কৃষ্ণা, কৃষ্ণ আর জয়ধ্বজ। পাঁচ জনেই আবার যথেষ্ট জ্ঞানী।

সবচেয়ে ছোট, জয়ধ্বজ ছিল বিষ্ণুর ভক্ত। নারায়ণ ছাড়া আর কাউকে জানত না। কিন্তু বড় চার ভাই ছিল শিবের উপাসক। তাদের কাছে শিব বা রুদ্রদেবই হলেন দেবাদিদেব। তিনিই একমাত্র দেবতা, যাঁর আরাধনা করা উচিত। ফলে, যদিও তারা সকলেই ভাই, তবুও সবচেয়ে ছোট জয়ধ্বজ তার চার ভাই থেকে একটু আলাদা।

একদিন বড় ভাইয়েরা জয়ধ্বজকে ডেকে বলল—দেখ, আমাদের বাবা ছিলেন শিবের উপাসক। তাঁর উপাসনা করেই তিনি অমন শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন। আমরাও সেই রুদ্রের ভজনা করি। কিন্তু তুমি আমাদের বংশের ধারাকে অবজ্ঞা করে, বিষ্ণুর আরাধনা করছ কেন? এটা কি ঠিক হচ্ছে?

জয়ধ্বজ বলল—রাজবংশে আমাদের জন্ম। আমরা রাজা। প্রজাদের পালন করা যখন আমাদের ধর্ম, তখন বিষ্ণুই আমাদের উপাস্য দেবতা হওয়া উচিত। আমার তো তাই মনে হয়।

—কি রকম? ভাইয়েরা প্রশ্ন রাখে।

জয়ধ্বজ বলে—অস্বীকার করি না, তিন দেবতা আমাদের প্রধান। এক জন হলেন ব্রহ্মা, দ্বিতীয় জন হলেন বিষ্ণু, আর তৃতীয় জন হলেন রুদ্র বা মহাদেব। তিন জনের তিন গুণ, তিন রকমের কাজ। ব্রহ্মার ভেতর রজোগুণ। তাই তিনি শুধুমাত্র হলেন স্রষ্টা। বিষ্ণু হলেন সত্ত্বর অধিকারী। তাই তাঁর কাজ সৃষ্টিকে লালন-পালন করা, সুখ-শান্তির মধ্যে রাখা। আর মহাদেবের তমোগুণ। তমোগুণের কাজই হল, সকলকে বিভ্রান্ত করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া। এই বলে জয়ধ্বজ একটু থেমে আবার বলল—এবার বল দাদা, প্রজাদের লালন-পালন করাই যখন আমাদের কাজ, তখন আমরা বিষ্ণুর উপাসনা করব না তো কার করব?

বড় ভাইয়েরাও কম যায় না। তারা বলল—মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি? মুক্তি। এই যে জগৎ, এর যেদিকে তাকাবে সেদিকেই দেখবে তমোগুণ। আড়ালে থেকে শিবই এর ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছেন। মহাদেব ছাড়া আর কারো আধিপত্য এখানে নেই। সময় এলে তিনিই সংহার করেন, সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেন। আবার সময় হলে তিনিই সৃষ্টি করেন। যদি মুক্তি পেতে হয়, তাহলে শিবেরই আরাধনা করা উচিত।

জয়ধ্বজ খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল—তমোগুণ কি মুক্তি দিতে পারে দাদা? ঐ গুণ শুধু বিষ ছড়ায়। মনকে ছোট করে দেয়। সকলকে আপন ভাবতে পারে না। যাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে, সে-ই একমাত্র পারে সকলকে আপন ভাবতে, সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। যতক্ষণ তা কেউ করতে না পারছে, ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। ভগবান বিষ্ণুই সেই গুণের অধিকারী। তাঁর উপাসনা করলে মন উদাস হয়ে ওঠে। মুক্তি আপনিই আসে।

ভাইয়েরা দেখল, জয়ধ্বজ যুক্তি রেখেই উত্তর দিয়েছে। তবুও বলল—তুমি অন্যায় বল নি। সত্ত্বগুণ মানুষকে উদার করে। তাহলে মানুষের মধ্যেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ আছে। তুমি যখন সত্ত্বগুণকেই বলছ বড় গুণ, তখন সেই মন নিয়েই মহাদেবের উপাসনা কর, মুক্তি পাবে। ঐ গুণ মহাদেবের ভেতরেও আছে।

জয়ধ্বজ একটু হেসে বলল—মুনিরা বলেছেন, যার যা ধর্ম, তা পালনেই তার মুক্তি। যাঁরা পৃথিবীর রাজা হন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুর শক্তিই প্রধান। সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে হলে তাই বিষ্ণু বা ভগবান মুরারিরই আরাধনা করা রাজাদের উচিত। তাতেই তাদের মুক্তি আসবে।

কৃষ্ণ ছিল সব কটি ভাইয়ের মধ্যে বেশি বুদ্ধিমান। সে তখন বলল—তুমি ঠিকই বলেছ জয়ধ্বজ। যার যা ধর্ম, তাই পালন করা উচিত। সেটাই হল স্বধর্ম। বাবা ছিলেন শিবের উপাসক। আমরা যখন তাঁরই ছেলে, তখন শিবের উপাসনাই করাই আমাদের উচিত। তুমি সেদিক থেকে ঠিক পথে চলছ না।

এভাবে নিজেদের মধ্যে যখন তর্ক-বিতর্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তখন শূরসেন বলল—নিজেদের মধ্যে মিছামিছি এ নিয়ে এত ঝগড়া করে লাভ কি? আমাদের চেয়ে ঋষিরা তো আরও জ্ঞানী। বরং তাঁদের কাছে চল। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কথাটা মন্দ বলে নি শূরসেন। সকলেই রাজি হয়ে গেল।

বশিষ্ঠ-প্রমুখ সপ্ত-ঋষির আশ্রম ছিল কাছেই। সকলেই সেখানে গিয়ে হাজির হতেই ঋষিরা তাঁদের আপ্যায়ন জানালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—দেখে মনে হচ্ছে, কোন সমস্যায় পড়েছ। কি ব্যাপার?

রাজপুত্ররা তখন নিজেদের মধ্যে যা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদ হচ্ছিল, সব খুলে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল—আমাদের বাবা যে দেবতার পুজো করে গেছেন, আমাদেরও সেই দেবতার পুজো করা উচিত কি না? তা না করলে কি ধর্মহানি হয় না? আমাদের বাবা শিবের পুজো করতেন। আমরাও শিবের ভক্ত। কিন্তু আমাদের ভাই জয়ধ্বজ মহাদেবের বদলে বিষ্ণুর আরাধনা করে। ওকে কিছুতে বোঝাতে পারছি না যে, ও ঠিক পথে চলছে না।

সব শুনে সপ্তর্ষি মৃদু হেসে বললেন—যে দেবতাকে যার ভাল লাগে, সে তারই পুজো করুক না, ক্ষতি কি? বরং তাতে ভালই হয়। যারা রাজা হবে, প্রজাপালন করবে, তারা বিষ্ণু আর ইন্দ্রের পুজো করবে। এটাই নিয়ম। তবে তার সঙ্গে হরের পুজোও করবে। হর অর্থাৎ শিবের পুজো করলে রাজার পক্ষে শত্রুজয় সহজ হয়। রাজার কাছে হরি এবং হর কিন্তু আলাদা হবে না। হবে এক ও অভিন্ন। সাধারণ ভাবে দেবতাদের উপাস্য দেবতা হলেন বিষ্ণু, দানবদের মহাদেব, দক্ষ আর গন্ধর্বদের কাছে চন্দ্রদেব। জয়ধ্বজের যে মন, তাতে বিষ্ণুরই পুজো ওর করা উচিত।

সপ্তর্ষির কাছ থেকে সব জেনে নিজেদের মধ্যে সব বিবাদ মিটিয়ে নিয়ে ওরা আবার ফিরে এল নিজের রাজ্যে। সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

এমন সময় একদিন রাজ্যে বিশালকায় এক দানবের মহা উৎপাত শুরু হল। এই দানবের নাম ছিল বিদেহ। তার গর্জনের আতঙ্কেই মারা গেল রাজ্যের অনেক মানুষ, অনেকে রাজ্য ছেড়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। তাই দেখে রাজারা তাকে দমন করার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন। শূর, শূরসেন, মহাবীর কৃষ্ণ, জয়ধ্বজ—যার যা অস্ত্র ছিল, তা-ই ছুঁড়ল তার দিকে তাকে মারতে। মারাত্মক সে সব অস্ত্র। আগ্নেয়াস্ত্র, শূল, গদা—কিন্তু বিদেহ দানবের কিছুই হল না। সে হাসতে হাসতে আরও এগিয়ে আসছে দেখে,



জয়ধ্বজ বিষ্ণুকে স্মরণ করে নিজের মনেই বলতে লাগলেন—ভগবান, আমি জানি, তোমার যারা ভক্ত, বিপদে তুমি তাদের রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি না ভগবান। রক্ষা কর প্রভু। একমনে জয়ধ্বজ যখন বিষ্ণুকে ডাকছে এইভাবে, হঠাৎ সামনে জ্বলজ্বলে আগুনের একটা চাকা যেন এসে হাজির হল জয়ধ্বজের কাছে। সুদর্শন চক্র। জয়ধ্বজ আর কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্র নিয়ে ছুঁড়লেন বিদেহর গলা লক্ষ্য করে। এবার আর বিদেহর সাধ্য কি যে, তা আটকায়। গলা কেটে গিয়ে বিরাট একটা পাহাড়ের চূড়ার মত পড়ল মাটিতে। বিদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটি কাঁপিয়ে।

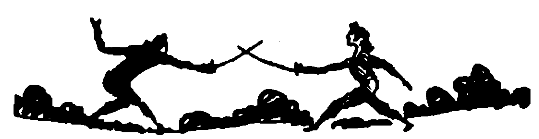
শত্রু নিপাত করেছেন জয়ধ্বজ। চার ভাই-ই খুব খুশি। তাদের কাছে ভাইয়ের কদরও গেল অনেক বেড়ে।

জয়ধ্বজ রাজার পরাক্রম শুনে মহামুনি বিশ্বামিত্র এলেন তাঁকে দেখতে। জয়ধ্বজ তাঁকে যথোচিত সম্মান জানিয়ে বসালেন। পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পুজো করলেন। বললেন—মুনিবর, আপনারই প্রসাদে আমি বিষ্ণুর আরাধনা করে এই পরাক্রমশালী দানবকে জয় করেছি। এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। জানি না, তিনি কে, দেখতে কেমন। শুধু জানি, তিনিই সব। আমি সেই সব-জ্ঞানেই তাঁর পুজো করেছি। তিনিও আমাদের রক্ষা করেছেন।

জয়ধ্বজের কথা শুনে খুবই খুশি হয়েছিলেন বিশ্বামিত্র।

এরপর একসময় শূর প্রমুখ চার ভাই এক বিরাট রুদ্র যজ্ঞ করেছিলেন। তাতে এসেছিলেন বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি মুনিরা।

এদিকে জয়ধ্বজও জনার্দনের যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞ করেছিলেন বিশ্বামিত্র। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হয়েছিল, সেই যজ্ঞে মহাযোগী স্বয়ং হরি আবির্ভূত হয়েছিলেন।



রাজা দুর্জয়ের কাহিনী

রাজা জয়ধ্বজেরই বংশধর দুর্জয় তখন রাজা। শুধু নামেই দুর্জয় নন, কোন দিক থেকেই তাঁকে জয় করার সাধ্য কারো ছিল না। যেমন সুপুরুষ, তেমনি বীর। আবার এক জন মহাপণ্ডিতও বটে। রাজার তুলনায় রানীও কিছু কম নয়। রূপে গুণে অমন রানী খুব ভাগ্যে মেলে। রাজাও খুশি, প্রজারাও খুশি।

একদিন রাজা দুর্জয় কালিন্দী নদীর তীর ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেড়াতে বেড়াতে খানিকটা যেতেই কানে এল ভারি মিষ্টি গানের সুর। এখানে এমন ভাবে গান কে গায়? কান খাড়া করে খানিকটা যেতেই দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে। তাকে দেখেই চিনতে পারলেন রাজা দুর্জয়। এ যে উর্বশী! স্বর্গের অপ্সরা!

দেখে রাজার মাথা গেল ঘুরে। দেবতাদের মন জয় করে যেসব রমণী, তারা তো আর সাধারণ নয়। তাদের দেখলে মানুষের মন তো টলবেই। রাজা দুর্জয়েরও মন দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলেন রাজা, রাজকাজ, এমন কি অমন রূপবতী গুণবতী রানীকে পর্যন্ত। রাজা উর্বশীর সঙ্গে থেকে গেলেন।

কত বছর যে উর্বশীর সঙ্গে কেটে গেল, রাজার তা খেয়ালই নেই। মনের গতি তো চিরকাল একভাবে চলে না, মাঝে মাঝে বদলায়। হঠাৎ একদিন তাই রাজার মনে পড়ে গেল রাজবাড়ির কথা, মনে পড়ে গেল রানীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জাগল দারুণ অনুশোচনা। ছি...ছি! এ কি করেছেন তিনি!

এক ফাঁকে উর্বশীকে বললেন—উর্বশী, আমি একবার আমার রাজপুরীতে ফিরে যেতে চাই।

উর্বশী বলল—নিশ্চয়ই যাবেন রাজা, তবে আর এক বছর বাদে। এই এক বছর আপনার সঙ্গে আমায় থাকতে দিন।

জোর করে চলে আসতে পারলেন না রাজা। স্বর্গের অপ্সরা বলে কথা। না জানি শেষে কি অঘটন ঘটিয়ে বসে। তাই একটু মাথা খাটিয়ে বললেন—উর্বশী, কথা দিচ্ছি থাকব, শুধু প্রাসাদ থেকে একবার ঘুরে আসব মাত্র।

তার কোন বাধা দিল না উর্বশী। শুধু বলল—আমি কিন্তু অপেক্ষায় রইলাম।

বহুদিন পর রাজা দুর্জয় ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে। রাজপ্রাসাদে সকলেরই আনন্দ। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। রানীর কাছে গিয়েও মুখ তুলে ভাল ভাবে কথা বলতে পারলেন না। মনে দারুণ অনুশোচনা।

দেখে-শুনে রানী একদিন জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে আপনার? এমন মন-মরা হয়ে রয়েছেন কেন?

রাজা চুপ করে থাকেন। কিভাবে, কোন মুখে নিজের পাপকাজের কথা বলবেন? তাঁর মনে তখন এক চিন্তা—তিনি পাপী...মহাপাপী। সব কিছু জেনেও রাজা হয়েও যে পাপকাজ তিনি করেছেন, তা থেকে তাঁর মুক্তি নেই। পাপের ফলে তাঁর রাজ্যও নষ্ট হয়ে যাবে। চরিত্রহীন যদি কেউ রাজা হয়, তাকে কি প্রজারা সম্মান করবে, না মেনে চলবে? এসব কথা যত ভাবেন রাজা, ততই আনমনা হয়ে যান।

রানী ছিলেন বুদ্ধিমতী। তিনি কিন্তু একসময় ঠিক ধরে ফেললেন ব্যাপারটা। তারপর রাজাকে বুঝিয়ে বললেন—এমন ভাবে মন খারাপ করে থাকলে কি আপনার চলে? মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, অন্যায় করে বসে। আবার তা ঠিক ঠিক ভাবে শুধরে নেবারও তো পথ আছে।

রাজা এবার মনে যেন অনেকখানি বল পেলেন। এলেন কণ্ব মুনির আশ্রমে। মুনিবরকে প্রণাম জানিয়ে নিজের পাপকাজের কথা অকপটে তাঁকে বলে জানতে চাইলেন, কি করলে এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

কণ্ব মুনি বললেন—রাজা, তুমি হিমালয়ে গিয়ে কিছুদিন দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা কর। তিনিই তোমাকে পাপমুক্ত করে দেবেন।

তপস্যা করতে দুর্জয় রাজা চলেছেন হিমালয়ের দিকে। যেতে যেতে দেখলেন এক গন্ধর্ব যুবককে। যুবকটির হাতে ছিল অপূর্ব সুন্দর এক মালা। মালাটি দেখা মাত্রই দুর্জয়ের মনে পড়ে গেল, এটি উর্বশীরই। এ মালা একমাত্র উর্বশী ছাড়া আর কারো গলায় মানায় না। একদিকে মালা আর একদিকে উর্বশী—রাজা দুর্জয় আবার সব ভুলে গেলেন। রানীর কথা, কণ্ব মুনির কথা, নিজের মান-মর্যাদা—সব ভুলে গিয়ে তিনি তখনই গন্ধর্ব যুবককে আক্রমণ করে বসলেন। যেভাবেই হোক গন্ধর্বের কাছ থেকে মালাটি নিয়ে উর্বশীকে উপহার দিতেই হবে। মালা নিয়ে দু-জনের মধ্যে বেধে গেল দারুণ লড়াই। কিন্তু রাজা দুর্জয়ের কাছে পারবে কেন গন্ধর্ব যুবক?

মালাটি খুইয়ে গন্ধর্ব যুবক চলে গেল। রাজা দুর্জয় আবার এলেন কালিন্দীর তীরে উর্বশীর কাছে। কিন্তু কোথায় উর্বশী? তন্ন তন্ন করে সব জায়গা রাজা খুঁজলেন। কিন্তু কোথাও দেখা পেলেন না। অমন এক মালা নিয়ে এসেছেন উর্বশীর জন্য—যে মালার ফুল কখনো শুকোয় না, সুবাস নষ্ট হয় না—সেই মালা তাকে দিতে না পারলে মন তো খারাপ হবেই। রাজারও মন খুব খারাপ হয়ে গেল। মালা হাতে চারদিকে এবার তিনি তাকে খুঁজতে শুরু করলেন। প্রতিটি পর্বতশৃঙ্গে, বন, উপবন, সুমেরুতে কোথাও দেখতে না পেয়ে এলেন মানস সরোবরে।

মানস সরোবরে এসে রাজা দুর্জয় দেখতে পেলেন উর্বশীকে। মন শান্ত হল। মালাটি তার গলায় পরিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পেলেন। উর্বশীও দেখল রাজা দুর্জয় ফিরে এসেছেন, তখন তার সঙ্গেই আবার বনবাস করতে শুরু করল।

এ ভাবে কেটে গেল এক বছর।

কোন এক কারণে স্বর্গের ইন্দ্রসভা ছেড়ে উর্বশীকে থাকতে হয়েছিল মর্ত্যে। তা নাহলে স্বর্গের অপ্সরা কখনো মর্ত্যে আসতে পারে না। এখন সেই মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। উর্বশীকে এবার স্বর্গে ফিরে যেতে হবে।

এক সময় উর্বশী রাজাকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, আপনি রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে কি করেছিলেন?

রাজা সব বললেন উর্বশীকে—রানীর কথা, কণ্ব মুনির কথা, সব কিছু।

শুনে উর্বশী বলল—রাজা, আপনি ভাল করেন নি। অমন রানীর মনে কষ্ট দেওয়া কি আপনার ঠিক হচ্ছে? তাঁর অভিশাপে আপনার সর্বনাশ হবে। রাজা, আপনি এখনই ফিরে যান।

কিন্তু রাজা দুর্জয় এমনি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, উর্বশীর কথা কানেই নিলেন না।

উর্বশী দেখল, এ তো বেশ হল! এখন দেখছি রাজার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করলে কিছুতেই ইনি ফিরে যাবেন না।



এই স্থির করে উর্বশী রাজার সঙ্গে রীতিমত খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিল। ফলে উর্বশীকে যে চোখে দেখেছিলেন রাজা, সেই চোখ বদলাতে শুরু করল। মনে মনে ক্রমশই বিরক্তি আসতে লাগল তার ওপর। শেষে অপমান সহ্য করতে না পেরে, ফিরে গেলেন প্রাসাদে।

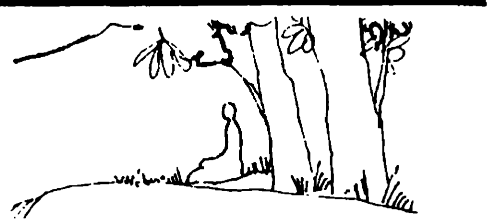
সেই বিষণ্ণ মন। ভাল ভাবে কথা নেই, জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলেন না। রানীর কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না। বলল—মন খারাপ করবেন না রাজা। মানুষ মাত্রেই অন্যায় করে থাকে, পাপ করে। তার প্রায়শ্চিত্তও আছে। আপনি মুনিবরের পরামর্শ নিয়ে তাই করুন। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাজা দুর্জয় আবার গেলেন কণ্ব মুনির কাছে। অকপটে আবার সব কথা বললেন।

কণ্ব মুনি সব শুনে বললেন—রাজা, তুমি বারাণসী ধামে (কাশী) যাও। যে যত পাপই করুক, বারাণসী তাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করে দেন। দেবাদিদেব মহাদেব এখন সেখানে থেকেই জগতের কল্যাণ করছেন।

মুনিবরের পরামর্শ মত রাজা চলে গেলেন সেখানে। সুদীর্ঘকাল সেখানে থেকে, মহাদেবের আরাধনা করে তাঁর মন আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

এরপর নিজ রাজ্যে ফিরে এসে রানীকে নিয়ে বহুকাল ধরে রাজত্ব করেছিলেন রাজা দুর্জয়। তাঁর প্রতিপত্তি, সম্মান যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল।



শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা

রোহিণী, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনেক, অনেক পত্নীর মধ্যে জাম্ববতী এক জন। কৌস্তভ মণি উদ্ধার করতে গিয়ে বীর জাম্ববানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দারুণ লড়াই করতে হয়েছিল। সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে জাম্ববান কৌস্তভ মণি তো ফেরত দিয়েছিলই, একমাত্র মেয়ে জাম্ববতীকে তুলে দিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের হাতে। সেই থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পত্নী হলেন জাম্ববতী। স্বামীকে যেমন সেবা-শুশ্রূষা, যত্ন-শ্রদ্ধা করা উচিত, জাম্ববতী তা সবই ঠিক ঠিক মত করতেন। আর শ্রীকৃষ্ণও আর সব পত্নীদের যে চোখে দেখতেন, জাম্ববতীকেও সেই চোখেই দেখতেন।

শ্রীকৃষ্ণ মানুষের বেশে যে স্বয়ং ভগবান—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অনন্ত শক্তিমান, একথা সকলেই জানত। ইচ্ছে করলে তিনি যে সকলের ইচ্ছাই পূরণ করতে পারেন, তাও কারো অজানা ছিল না। আবার এও সকলে জানত, তিনি যাকে রক্ষা করবেন,তাকে মারার সাধ্য কারো নেই। সকলে তা জানলেও, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কারো কাছে তেমন ভাবে ধরা দিতেন না। কথায়-বার্তায়, আচারে-আচরণে আর সকলের মতই এক জন মানুষ। ব্যতিক্রম, বেশ কিছু জ্ঞান এবং বুদ্ধি ধরেন—এই যা।

শ্রীকৃষ্ণের কোন পুত্রও কোন কিছুতে কম যান না। সকলেই এক এক জন মহাবল। বিশেষ করে রুক্মিণীর ছেলেদের সঙ্গে তো কারো তুলনাই চলে না। জাম্ববতীরও খুব ইচ্ছে, তার এমন একটি ছেলে হোক, যে হবে শিবের সমান।

এক সময় জাম্ববতী তার মনের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানালও।

শ্রীকৃষ্ণ শুনে বললেন—তাই তো জাম্ববতী। এ যে তোমার বড় দারুণ ইচ্ছে। পূরণ করার সাধ্য কি আমার আছে?

জাম্ববতীর কিন্তু ঐ একই আবদার।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তোমার ইচ্ছে পূরণ করতে গেলে আমায় তপস্যায় যেতে হবে। শিবকে আরাধনায় তুষ্ট করতে না পারলে অমন ছেলে পাওয়া কি মুখের কথা?

জাম্ববতী কিন্তু আর কোন কথাই বলল না।

অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পিঠে চেপে এলেন মহাজ্ঞানী মহামুনি উপমন্যুর আশ্রমে।

নামে আশ্রম হলে কি হবে, উপমন্যুর সেই আশ্রমে কয়েকটা মাত্র ছিটে-মাটির ঘর, ফল-ফুলের গাছে ঘেরা, সামান্য একটু জায়গা ছিল না। প্রায় চার ক্রোশ এলাকা জুড়ে বিশাল এক বনস্থলী। অজস্র যেমন ফলের গাছ, রোদের তাপ নিবারণের গাছ, তেমনি নানা জাতের কত না ফুল গাছে ভরা। কুল-কুল করে প্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। আশ্রমের ভেতরে আবার ছোট-বড় সব সরোবর। এখানে ওখানে সব ছোট ছোট কুটির—মুনি-ঋষিদের থাকার জায়গা। সকলেই রুদ্র বা মহাদেবের জপে মগ্ন, কোথাও-বা হোমকুণ্ডে উঠছে হোমের আগুন। গাছ-পালায় যেমন পাখি-পাখালির শেষ ছিল না, তেমনি আবার বাঘ, সিংহ, হাতিও কিছু কম ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের হল, এরা সব হিংস্র জন্তু হলেও মনে হতো যেন সব মুনি-ঋষিদের পোষা।

গরুড়ের পিঠ থেকে নেমে তাকে বিদায় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এইসব দেখতে দেখতে চলেছেন উপমন্যুর কাছে।

মুনিরা, যাঁরা জপ-তপ করছিলেন, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে সব উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা সবাই ছিলেন শিবের উপাসক। জ্ঞান-চোখ দিয়ে তাঁরা জানতেন, কৃষ্ণে আর শিবে কোন পার্থক্যই নেই, শুধু রূপটুকু ছাড়া। তাই তাঁরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে হতচকিত হয়ে গেলেন। অনেকে তাঁর স্তবও করতে শুরু করে দিলেন। অনেকে আবার তাঁর ভুবনমোহন রূপ দেখে, নির্বাক হয়ে শুধু দেখতেই থাকলেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে মহাজ্ঞানী মুনি-ঋষিদের শ্রদ্ধা জানায়, শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু ঠিক সেই ভাবেই সকলকে প্রণাম জানালেন।

সকলকেই এইভাবে শ্রদ্ধা জানাতে জানাতে আর এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণ নদীতে স্নান সারলেন। গঙ্গায় স্নান করলে মানুষ পবিত্র হয়। শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে সকলকে দেখিয়ে পবিত্র হলেন। তারপর মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ মহামুনি উপমন্যুর কুটিরের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

উপমন্যু তাঁকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। আহ্বান জানালেন। ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর—কি সৌভাগ্য আমার যে, এইখানে দেহধারী স্বয়ং বিষ্ণুর দর্শন পেলাম। ভগবান!

আপনার আসার কারণ?

শিষ্য যেভাবে গুরুকে প্রণাম করে, তেমনি ভাবে উপমন্যুকে প্রণাম জানালেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বললেন—কিভাবে সাক্ষাৎ শিবের দেখা পাব, আমাকে সেই উপদেশ দিন।

শুনে বিস্মিত হলেন উপমন্যু। আর এক রূপে যিনি নিজেই সাক্ষাৎ শিব, তিনিই এসেছেন তাঁর কাছে জানতে, কিভাবে শিবের দর্শন পাবেন। যিনি নিজেই এক জন যোগীরাজ, তিনি তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করতে চান? তবুও এই ভেবে নিজেকে শান্ত করে নিলেন—মানুষের দেহ ধরে যখন এসেছেন, তখন এটাই স্বাভাবিক।

এরপর শিষ্যকে যেভাবে গুরুদেব উপদেশ দেন, সেইভাবেই যোগীবর উপমন্যু বললেন—গৌরীর সঙ্গে শিব এখন এখানেই আছেন। যোগ-সাধনা বা তপস্যা না করলে সেই দেবাদিদেব কল্পতরু মহাদেবের দেখা পাওয়া যায় না। এখানে নির্জনে বসে মন-প্রাণ এক করে তাঁকে ডাকো। নিশ্চয়ই তিনি তোমার আশা পূরণ করবেন। এখানেই তপস্যা করে বশিষ্ঠদেব, ব্যাসদেব, সাবর্ণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু সিদ্ধিলাভ করেছেন। তুমিও করবে।

—কিভাবে তাঁর তপস্যা করব, ঋষিবর?

উপমন্যু নির্দেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণও ধরা-চূড়া ছেড়ে পরলেন বল্কল (গাছের ছাল), মাথার চুল কামিয়ে ন্যাড়া হলেন, সারা গায়ে শিবের অতি প্রিয় জিনিস ভস্ম মাখলেন, তারপর মন-প্রাণ এক করে রুদ্রের জপ করতে শুরু করে দিলেন।

বেশ কিছুকাল ধ্যানের মধ্যে নিবিষ্ট মনে কেটে গেল শ্রীকৃষ্ণের। হঠাৎ একদিন দশদিক আলো করে পার্বতীকে নিয়ে শিব এসে নামলেন শ্রীকৃষ্ণের সামনে। চোখ মেললেন শ্রীকৃষ্ণ। দেখলেন, সত্যিই এসেছেন মহাদেব—মাথায় মুকুট। গলায় বিচিত্র সব মালা, পরনে বাঘছাল, গায়ে ভস্ম, বাঁ পাশে পার্বতী। আরও দেখলেন,তাঁরই আদি রূপ বিষ্ণু, হাতে শঙ্খ, অসি, সুদর্শন চক্র নিয়ে বাঁ দিক থেকে তাঁর স্তব করছেন। ডান দিক থেকে স্তব করছেন ব্রহ্মা, সামনে কার্তিক থেকে শুরু করে নন্দী-প্রমুখ গণাধিপতিরা। এ ছাড়াও দেখলেন অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ইন্দ্র, পরাশর, বশিষ্ঠ, এমন কি স্বয়ম্ভুব মনুও এসে হাজির হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণের তখন আনন্দ দেখে কে। মাটিতে শুয়ে সকলকে প্রণাম জানালেন। হাত জোড় করে পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের স্তব করলেন। স্তব শেষ হলে মহাদেব তাঁকে হাতে ধরে তুলে বললেন—এ কি ব্যাপার তোমার কৃষ্ণ নারায়ণ। দেবতাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য তুমি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে শরীর ধারণ করেছ মাত্র। তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার কোন প্রভেদ আছে? তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আর কাউকে দরকার হয় নাকি?

শ্রীকৃষ্ণ সব শুনে একবার মহাদেব আর একবার গৌরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—যে যাই বলুক আর ভাবুক, আমি প্রার্থী। আপনার মত আমার একটি পুত্রের একান্ত প্রয়োজন।

শিব বললেন—বেশ, তাই হবে।

দেবী গৌরীও তাঁকে অনেক অনেক বর দিলেন। দেব মহেশ্বরও শ্রীকৃষ্ণের শুধু একটা কামনা পূরণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, শ্রীকৃষ্ণ নিজেও যে পরমাত্মা, এ কথাও বেশ ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেব এলেন নিজের পুরী কৈলাসে।

অপূর্ব সুন্দর এক পাহাড়ী নগর। সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগদের বাস। মহানন্দে খেলায় আর গানে তারা সেখানে দিন কাটায়। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে দেখে, তারা তো অবাক। এমন সুন্দর দেখতে, এমন অপরূপ কান্তি, যেন তারা আগে কখনো দেখে নি। মহাদেব আর গৌরীরও রূপের তুলনা নেই ঠিকই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেন সকলের চেয়ে আলাদা। মুখে যেন হাসি লেগে আছে, চোখ দিয়ে যেন অনবরত মধু ঝরে পড়ছে, সারা দেহে-মনে যেন আনন্দের বান বইছে। পুরো কৈলাস শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে যেন মেতে উঠল। কে যে কিভাবে তাঁকে খুশি করবে, তাই নিয়েই যেন রেষারেষি। শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলের সঙ্গে সমান ভাবে খেলা আর আনন্দ উপভোগ করে চললেন।

অনেক দিন হল শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ছেড়ে হিমালয়ে গেছেন। দ্বারকায় যাঁরা থাকতেন, তাঁরা কোন রকমেই চাইতেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাদের চোখের আড়ালে এক মুহূর্ত থাকুন। কিন্তু তপস্যা করতে যাচ্ছেন শুনে বাধা দেন নি। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, তপস্যা কি তাঁর এখনও শেষ হল না? তার ওপর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নেই জেনে, রাক্ষস আর দৈত্যেরা, এতদিন যারা কাছেও ঘেঁষতে পারে নি, তারা আবার অত্যাচার শুরু করে দিল। যখন তখন দ্বারকায় এসে দ্বারকাবাসীদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগল।

তাই সকলে মিলে একদিন গরুড়কে পাঠাল উপমন্যুর আশ্রমে। গরুড় হিমালয়ে, মুনিবরের আশ্রমে এসে দেখল, শ্রীকৃষ্ণ নেই। তাই তো, এখান থেকে আবার কোথায় গেলেন? খোঁজ না পেয়ে গরুড় দ্বারকায় ফিরে গেল। দ্বারকাবাসীরাও মহা চিন্তায় পড়ল।

এমন সময় দ্বারকায় নারদ মুনি এসে জানিয়ে গেলেন—শ্রীকৃষ্ণ এখন তোমাদের ভুলে গিয়ে কৈলাসে আনন্দে মেতেছে। এই বেলা যদি পার তো গিয়ে ধরে নিয়ে এসো।

শোনা মাত্রই, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড় এক নিঃশ্বাসে কৈলাসে এসে হাজির। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল—ঠিক তাই। রত্ন-সিংহাসনে শিবের পাশে বসে শ্রীকৃষ্ণ। রাজ্যের সিদ্ধ, যোগী, দেবতা এবং তাঁদের পত্নীরা চারদিক ঘিরে তাঁদের দু-জনের পুজো করছেন।

গরুড় তা দেখে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গিয়ে শঙ্করকে প্রণাম করল। তারপর প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে বলল—আপনি কি দ্বারকার কথা ভুলে গেলেন? আপনি নেই, দ্বারকাতেও আর শান্তি নেই।

শুনেই শ্রীকৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। সত্যিই তো! শঙ্করের অনুমতি নিয়ে, সকলের কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পিঠে চেপে বসলেন। কতক্ষণই-বা লাগল দ্বারকায় আসতে? পুরীতে আসতেই হইহই কাণ্ড পড়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন—ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এমন কি ছেলেরাও যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটে এল। কেউ কেউ প্রণাম জানাল, কেউ কেউ আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম নিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন শুনে,মার্কণ্ডেয় মুনিও তাঁকে দর্শনের জন্য ছুটে এলেন। বড় কৌতূহল তাঁর। জানতে এসেছেন, যিনি নিজেই সব কিছু, তিনি আবার এমন ভাবে কার পুজো করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, সবই আমি ঠিক, তবুও শিবলিঙ্গের পুজো হল শ্রেষ্ঠ পুজো। লিঙ্গের মধ্যেই আছে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। লিঙ্গই হল আদি মহাশক্তি। তাঁরই নির্দেশে তিনটি কাজ ঠিক ঠিক

মত করার জন্য আমাদের তিন রূপ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। মহাজ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনিকে এর বেশি আর বলার কিছু নেই।

রাক্ষস আর দানবরা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নেই দেখে এতদিন যারা নির্বিবাদে অত্যাচার চালাচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এবার তাদের দমন করে দ্বারকাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

শিবের মত এক পুত্র চাই জাম্ববতীর। অধীর আগ্রহ তার। শ্রীকৃষ্ণ তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে বর নিয়ে এসেছেন।

যথাসময়ে জাম্ববতীর একটি শিশু সন্তান হল। যেন দ্বিতীয় এক শিব। আদর করে সকলে তার নাম রাখল 'শাম্ব'।

প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা

প্রবাদেই আছে—"প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা। পাপী যাও যথা তথা।।"

প্রয়াগ ভারতের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এখানে গঙ্গার সঙ্গে যমুনা এসে মিশেছে।

প্রয়াগই শুধু একমাত্র তীর্থক্ষেত্র নয়, এই ভূমণ্ডলে প্রায় সাড়ে তিন কোটি তীর্থস্থান আছে। থাকলেও প্রয়াগের কারো সঙ্গে তুলনা চলে না। যে কোন অন্যায় বা পাপ কাজই করুক না কেন, প্রয়াগে এসে মাথা মুড়িয়ে সঙ্গমে স্নান করলে তার সব অশান্তি, পাপ দূর হয়ে যায়। দেহে-মনে সে পবিত্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, মাঘ মাসে, সব তীর্থের সব পুণ্য এসে প্রয়াগকে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র করে তোলে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেছেন মহাত্মা পাণ্ডুর বড় ছেলে ধার্মিক যুধিষ্ঠির। রাজা হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মনে এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না। যখনই মনে পড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে কত প্রাণীর প্রাণনাশ হয়েছে, যুদ্ধে জেতবার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে কতজনকে মারতে হয়েছে, তখনই রাজা যুধিষ্ঠিরের মন অনুতাপে ভরে ওঠে। ভাবেন, কত পাপ কাজই না তিনি করেছেন। পাপের সিংহাসনে বসে আজ তিনি রাজা। এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে?

যত দিন যায়, মনের মধ্যে অনুতাপ ততই বাড়তে থাকে। অশান্তিতে ছটফট করতে থাকেন। আর ভাবেন, এর থেকে কি মুক্তির কোন উপায় নেই?

এমন ভাবে যখন রাজা যুধিষ্ঠিরের দিন কাছে একদিন হঠাৎ মার্কণ্ডেয় মুনি এলেন। রাজসভায় বসে তখন যুধিষ্ঠির। দ্বারী এসে খবর দিল। যুধিষ্ঠির সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন ছেড়ে উঠে প্রায় দৌড়েই দ্বারে গেলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন। একটা উঁচু আসনে বসিয়ে পা ধুইয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে তাঁর পুজো করলেন। তারপর নিজে বসলেন তার পায়ের নীচে।

মার্কণ্ডেয় বললেন—রাজা, তোমার মানসিক অশান্তির খবর পেয়েই আমি এসেছি। তুমি তো অজ্ঞ নও। তুমি জ্ঞানবান, ধার্মিক। এমন ভাবে মনে মনে অশান্তি ভোগ করা তোমার সাজে না।

যুধিষ্ঠির বললেন—সব জেনেও নিজেকে বড় পাপী বলে মনে হচ্ছে। আপনিই বলুন, এত প্রাণিহত্যা কি পাপ নয়?

মুনিবর বললেন—ক্ষত্রিয়ের যা ধর্ম তুমি তা-ই পালন করেছ। এতে পাপ কোথায়?

যুধিষ্ঠির বললেন—মন যে তা মানতে চায় না। উপায় কি মুনিবর।

—তাহলে একটাই মাত্র উপায়—বললেন মার্কণ্ডেয়—তীর্থযাত্রা। শাস্ত্রমতে যেভাবে তীর্থ করার নিয়ম, সেভাবে তীর্থে গিয়ে স্নানাদি কাজ কর। পাপমুক্ত হবে।

—কোথায় কোন তীর্থ আছে, তা জানি না মুনিবর। কোন তীর্থে গেলে আমি এই পাপবোধ থেকে মুক্তি পাব, আমায় বলুন।

মার্কণ্ডেয় তখন যেখানে যত তীর্থস্থান আছে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে একে একে তার সব পরিচয় দিলেন। তারপর বললেন—সব তীর্থক্ষেত্রই সিদ্ধক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র। সব তীর্থক্ষেত্রই পাপ নাশ করে, কিন্তু প্রয়াগের তুল্য তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম বলেই যে এই স্থান এত পবিত্র, তা নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর থেকে সব দেব-দেবীই এই পবিত্র ক্ষেত্রটি ঘিরে থাকেন। পাপী-তাপীরা এসে যমুনা ছাড়াও, বিশেষ করে গঙ্গায় স্নান করলে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই একান্তই যদি মনে চাঞ্চল্য এসে থাকে, তাহলে প্রয়াগে যাও।

মুনিবরের উপদেশে যুধিষ্ঠির তাই করেছিলেন। বোধ হয় সেই থেকেই চলে আসছে এই প্রবাদ : "প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা। পাপী যাও যথা তথা।।"

লোকালোক কাহিনী

প্রকাণ্ড এক অণ্ড থেকে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ড থেকে বেরিয়েই ব্রহ্মাণ্ড ভাগ হয়ে গেল সাতটা লোকে—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, আর সত্যলোকে। এমনি মজা যে, বেরিয়েই যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেল। ভূর্লোক, ভুবর্লোক আর স্বর্লোক বা স্বর্গলোক—এদের বলা হয় নিম্ন-ত্রিলোক। আর জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোককে বলা হয় উর্ধ্বলোক। এই দুইয়ের মাঝে মহর্লোক।

আমাদের মাথার ওপর সূর্য আর চন্দ্র। এই দুটি গ্রহ-তারার রশ্মি যত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, পুরাণ তাকেই বলেছে ভূর্লোক। পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। মাটি থেকে সূর্যমণ্ডলের দূরত্ব লক্ষ যোজন (চার লক্ষ ক্রোশ)। চন্দ্র আছে সূর্যেরও ওপরে—লক্ষ যোজন দূরে। তার লক্ষ যোজন ওপরে আমাদের নক্ষত্রমণ্ডল।

নক্ষত্রমণ্ডলের দু-লক্ষ যোজন (আট লক্ষ ক্রোশ) দূরে বুধ গ্রহের মণ্ডল। এর ঠিক একই পরিমাণ দূরত্বে শুক্র এবং শুক্রের পর মঙ্গল গ্রহের মণ্ডল। মঙ্গলের দু-লক্ষ যোজন দূরে বৃহস্পতি—পৃথিবী থেকে রাতের আকাশে যাকে বড় জ্বলজ্বলে দেখায়। আবার দু-লক্ষ যোজন দূরে রয়েছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক লক্ষ যোজন উপরে নভোমণ্ডলের কেন্দ্র ধ্রুবতারা। এই ধ্রুবতারাই হল স্বর্লোক বা স্বর্গলোকের শেষ সীমানা। সূর্যের মণ্ডল থেকে যতটা দূরত্বে ভূর্লোক, তার সীমানা ছাড়িয়ে ঠিক ততখানিই ভুবর্লোক। আবার ভুবর্লোক থেকে স্বর্গলোকের সীমানাও ঠিক ততখানি। ধ্রুবলোক হল বায়ুর লোক। এখানে যেন যাদুমন্ত্রে, নীচ থেকে ওপরের দিকে পর পর সাজানো আছে সাতটা বায়ুর চক্র। আর এই বায়ুর চাকা সারা নভোমণ্ডলকে যেন চুম্বকের মত আটকে রেখে,

অবিরাম যার যার গতিপথে ঘুরিয়ে চলেছে। এই সাতটি বায়ুর কিন্তু প্রত্যেকটির একটি করে নাম আছে। তা হল—আবহ, প্রবহ, অনুবহ, সংবহ, বিবহ, পরাবহ আর পরিবহ—একের ওপরে আর এক। অবিরাম ঘুরছে এরা আপন পথে। কারো সঙ্গে কারো কিন্তু ধাক্কা লাগে না।

মহাশূন্যে সূর্য থেকে শুরু করে সব গ্রহ-তারা-নক্ষত্রই এক একটা মণ্ডলের মধ্যে রয়েছে। মণ্ডল অর্থাৎ পরিসর, আয়তন বা বিস্তার।

সূর্যের ব্যাস ন-হাজার যোজন। কিন্তু সূর্যের প্রভা যে পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে, তা হল তার ব্যাসের তিনগুণ। চন্দ্রের মণ্ডল কিন্তু সূর্যমণ্ডলের দ্বিগুণ। সূর্যমণ্ডলের মতই চন্দ্রের রয়েছে রাহুর মণ্ডল। মাঝে মাঝে পৃথিবী তার ছায়া ফেলে ঢেকে দেয় সূর্য এবং চন্দ্রকে। চাঁদের ষোল ভাগের একভাগ হল শুক্রের বিস্তার। শুক্রের চার ভাগের এক ভাগ বিস্তার হল বৃহস্পতির। বৃহস্পতির পর শনি, শনির পর মঙ্গল, মঙ্গলের পর বুধগ্রহ। প্রত্যেকের বিস্তার হল প্রত্যেকের চেয়ে চার ভাগের এক ভাগ করে।

বুধগ্রহের পর তারকার মণ্ডল। অগণিত ছোট ছোট জ্যোতিষ্ক। পৃথিবী থেকে মনে হয় যেন মহাশূন্যে মিটমিট করে জ্বলছে। কিন্তু সবাই যেন একা একা, এক একটা দূরত্ব বজায় করে রয়েছে। তবে এদের এক একটির বিস্তার খুবই কম—কারো চারশ, কারো তিনশ, কারো-বা বিস্তার মাত্র দুশ যোজন। সবচেয়ে ছোট হল এই তারামণ্ডল।

নভোমণ্ডলে কোন গ্রহই কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। সকলেই এক একটা পরিধি নিয়ে ঘুরছে। সকলেই গতিশীল। কারো গতি ধীর, কারো গতি খুব দ্রুত। সূর্য, চন্দ্র, বুধ আর শুক্র হল দ্রুতগতি গ্রহ। তার ওপরে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গলের গতি খুবই ধীর—প্রায় বোঝাই যায় না যে এদেরও গতি আছে, আপন কক্ষপথে এরাও ঘুরছে।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে। আবার সূর্যও ঘুরছে আপন গতিপথে। পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সূর্য যখন দক্ষিণায়নে, তখন পৃথিবীর খুব কাছের প্রথম গ্রহ হল সূর্য—পরিভ্রমণ করে আপন মণ্ডলে। তারও ওপরে বিশাল পরিধি নিয়ে চন্দ্র। তার ওপরে নক্ষত্রমণ্ডল। নক্ষত্রমণ্ডলের ওপরে বুধ, বুধের ওপরে শুক্র, শুক্রের ওপরে মঙ্গল, মঙ্গলের ওপরে বৃহস্পতি। তার ওপর শনি। শনির ওপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। আর তার ওপরে ধ্রুবতারা।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক আর স্বর্গলোকের অধিপতি বা প্রাণদাতা হল সূর্য। সাত-ঘোড়ায় টানা বিশাল এক রথে সূর্য পরিভ্রমণ করে। এই রথ হল যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলি। আবার সাতটা ঘোড়াও কিন্তু চিঁ...হিঁ...হিঁ করে ডাকা চার পা-ওয়ালা কোন প্রাণী নয়। এরা হল সাতটি ছন্দ। সেই সপ্তছন্দ হল—গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ আর ত্রিষ্টুপ। এই সাতটি ছন্দের তালে তালে চলে আমাদের সূর্য তিনটি লোক জুড়ে, আর যুগিয়ে যায় যে লোকের যে দাবি বা অভাব। লোক থেকে লোকে পরিভ্রমণ করে, আনে দিন-রাত। পৃথিবীর প্রাণী থেকে স্বর্গের দেবতা—তাই সকলেই চেয়ে থাকেন সূর্যের দিকে; তাঁকে আবাহন জানান। রবি ছাড়া সূর্যের আর এক নাম 'আদিত্য'। পুষ্টির জন্য যা কিছু দরকার, রবি তা সবই আদান করে (দেয়) বলেই তার নাম 'আদিত্য'। আকাশে এই আদিত্যকে আমরা একটাই দেখি। আসলে কিন্তু প্রকৃতিভেদে তার বারোটা নাম। (বারোমাসই সূর্য আকাশে ওঠে। একই সূর্য—কখনো গরম, দারুণ গনগনে, কখনো ম্লান, কখনো-বা বড় মিষ্টি। এই রকম ভেদের জন্যই বিজ্ঞানী-ঋষিরা তার এক এক নামকরণ করেছেন।) নামগুলি হল—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান, পুষা, পর্জন্য, অংশু, ভগ, ত্বষ্টা আর বিষ্ণু। বৈশাখ মাস থেকে চৈত্র পর্যন্ত যথাক্রমে এক এক নামে সূর্যদেব আমাদের আকাশে ওঠে। কাজ করে নাম অনুসারে।

সূর্যই হল সব কিছুর স্রষ্টা। শুধু ভূর্লোক, ভুবর্লোক, বা স্বর্গলোক নয়, এর ওপরের যে চারটে লোক, সবই তার কিরণ পায়। আকাশে যত গ্রহ-তারা আমরা দেখতে পাই, সবাই সূর্যের আলোকে আলোকিত। অগণিত তার কিরণ—রশ্মি। তার মধ্যে সাতটি রশ্মিই প্রধান। (বর্তমানে গ্রীক বৈজ্ঞানিকরা যেমন সব নামকরণ করেছেন আলফা, বিটা, গামা ইত্যাদি, আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-ঋষিরাও তাদের পর্যবেক্ষণ করে নামকরণও করেছিলেন। আর কোন রশ্মি কি কাজ করছে, তাও জানিয়ে গেছেন।) সেই সাতটি রশ্মির নাম হল—সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্বাবসু আর স্বরক।

চাঁদের আলো সূর্যের সুষুম্ন রশ্মি। নক্ষত্রমণ্ডল আলোকিত হয় হরিকেশ রশ্মিতে। বিশ্বকর্মা রশ্মি বুধকে, বিশ্বশ্রবা রশ্মি শুক্রকে, সংযদ্বসু রশ্মি মঙ্গলকে, অর্বাবসু রশ্মি বৃহস্পতিকে, আর স্বরক রশ্মি শনিকে আলো দেয়, তাদের পুষ্টিসাধন করে।

হাজার হাজার রশ্মি বিকিরণ করে সূর্য স্থাবর, জঙ্গম, সমুদ্র, নদী, পুকুর, ডোবা থেকে সংগ্রহ করে তার সম্পদ আর ঋতুভেদে বিশেষ বিশেষ কিছু রশ্মির মাধ্যমে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক প্রতিপালন করে। গ্রীষ্ম আর বসন্তে আমরা যে গরম অনুভব করি, তা সূর্যের মাত্র ছটি রশ্মির জন্য। বর্ষা আর শরতে যে বৃষ্টি নামে, তা সূর্যের চন্দ্রণ, গাহ, কাঞ্চন আর শাতন রশ্মির কাজ। হেমন্তে আর শীতে যে ঠাণ্ডার আমেজ, তা সূর্যদেবের মাত্র তিনটি রশ্মির জন্য।

বিচিত্র এই বিশ্ব! বিচিত্র এই বিশ্বের কাজ। বিচিত্র নভোমণ্ডলে রহস্যময় সূর্য।

এ তো গেল নিম্ন-ত্রিলোকের রহস্য। এর ওপরেও ব্রহ্মাণ্ডের যে আরো চারটে লোক!

ধ্রুবলোকে গিয়ে শেষ হয়ে গেল পৃথিবীর স্বর্গলোক। তার ওপরেই মহর্লোক। তার পরিধি হল এক কোটি যোজন। এই মহর্লোক থেকে দু-কোটি যোজন ওপরে ব্রহ্মার প্রথম মানসপুত্র সনক-সনন্দ-সনাতনের বাস—জনলোক। জনলোক থেকে তিন কোটি যোজন ওপরে তপোলোক। তারও তিন কোটি যোজন ওপরে সত্যলোক—যার আর এক নাম ব্রহ্মলোক।

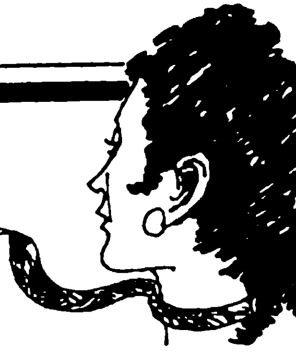
পৃথিবীর ওপর দিকে যেমন রহস্যময় এই সাত জগৎ, নীচেও তেমনি আছে আরও সাত জগৎ। তাদের এক কথায় বলে সপ্ত পাতাল। পৃথিবীর নীচেই সব রকম রত্নে-ভরা মহাতল দানবীর বলির রাজ্য। তারপর পর্বতময় রসাতল, কাঁকরে ভরা তলাতল হল রসাতলের ঠিক নীচে। তার নীচে হলুদ রঙে ভরা সুতল। তার নীচে লাল রঙের নিতল। তার নীচে সাদা রঙের নিতল। তারও নীচে কালো বা ঘোর নীল রঙের তল। পাতালের কোন তলই কিন্তু প্রাণীশূন্য নয়। সর্বত্রই আছে তার বাসিন্দা।

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড তাই চোদ্দ ভুবন-ভরা।



স্কন্দ পুরাণ

অন্যতম সুবৃহৎ পুরাণ। এই পুরাণের ছটা খণ্ড : কাশীখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রভাসখণ্ড, মহেশ্বরখণ্ড, বৈষ্ণবখণ্ড আর ব্রহ্মখণ্ড। সবকটি খণ্ড মিলিয়ে এই স্কন্দ পুরাণ। শিবপুত্র কার্তিক, যাঁর অপর নাম স্কন্দদেব, তিনি এই পুরাণ-কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন বলেই এর নাম হয়েছে স্কন্দ পুরাণ। সবকটি খণ্ডেই স্থান-মাহাত্ম্য, তীর্থ-মাহাত্ম্য, বিশেষ করে শিব এবং বিষ্ণু যে অভিন্ন এই কথাই বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ স্কন্দ পুরাণের মধ্যেই কাশীখণ্ডই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



গৃহপতি হলেন অগ্নি-পতি

স্বর্গলোকে আমাদের পৃথিবীর মতই অনেকগুলি পুরী আছে। যেমন—দেবরাজ ইন্দ্রের পুরী হল অমরাবতী, যমরাজের পুরীর নাম সংযমনী। তেমনি অগ্নিদেবেরও এক বিশাল পুরী আছে—তার নাম অর্চিষ্মতী। অগ্নিদেব এই পুরীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। পৃথিবীতে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্নির উপাসনা করে মারা যায়, তারা মৃত্যুর পর এই অর্চিষ্মতী নগরীতে গিয়ে বসবাস করে।

কে এই অগ্নিদেব? কেমন করেই-বা তিনি এমন এক নগরীর আধিপত্য পেলেন?

নর্মদা নদীর তীরে নর্মপুর নামে এক শহর। সেখানে বিশ্বানর নামে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। দারুণ শিবভক্ত। আবার খুবই সত্যনিষ্ঠ, সুপণ্ডিত। তাঁর স্ত্রীর নাম হল শুচীষ্মতী।

বিয়ে-থা হয়েছে অনেকদিন। গৃহীর যা ধর্ম, সবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। কিন্তু ছেলেপুলে আর হয় না। শুচিষ্মতীর বড় ইচ্ছে, তার একটি ছেলে হোক। আর ছেলেটি যেন মহেশ্বরের মত হয়।

মহেশ্বরের মত ছেলের কামনা—এ কি যা-তা কথা! অনেক তপস্যা করলেও যোগী-ঋষিরা সহজে যাঁর দেখা পান না, দেখা পাওয়ার জন্য কত না কষ্টকর সাধনা করেন—তাঁর মত ছেলে!

স্ত্রীর বাসনা পূরণ করতে বিশ্বানর তাই দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য গেলেন মহাদেবের প্রিয় নগরী বারাণসীতে। তারপর সন্ধান নিয়ে জানলেন, বীরেশ্বর লিঙ্গে শিবের আরাধনা করলে ফল পাওয়া যায়। তারপর খুঁজে খুঁজে গোপন এক জায়গায় বীরেশ্বর লিঙ্গকে আবিষ্কার করে তিনি নিশ্চল হয়ে সেখানে ধ্যানে বসলেন।

কঠোর তপস্যা করতে করতে বিশ্বানরের কেটে গেল তেরটা মাস। এরপর একদিন হঠাৎ দেখলেন, লিঙ্গের ওপর হাসতে হাসতে নাচছে আট বছরের একটি উলঙ্গ ছেলে। টানা টানা চোখ, লাল লাল ঠোঁট, মাথায় জটা। বিশ্বানর দেখেই বুঝলেন—এ আর কেউ নয়, স্বয়ং মহাদেবই এসেছেন শিশুর বেশ ধরে। আবেগে বিশ্বানরের মন ভরে গেল! চোখে জল নিয়ে তাঁর বন্দনা করলেন। শিশুবেশী মহাদেব অন্তর্হিত হবার আগে বিশ্বানরকে বলে গেলেন—ঘরে ফিরে যাও! তোমাদের আশা আমি পূরণ করব।

বর পেয়ে খুশি মনে বিশ্বানর আবার ফিরে এলেন নর্মপুরে নিজের বাড়িতে। সব শুনে শুচিষ্মতীরও আনন্দ আর ধরে না।

তারপর এক সময় বিশ্বানরের ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করল একটি শিশু। খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পাড়া-প্রতিবেশীরা তো দেখতে এলই, এমন কি মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে গন্ধর্ব-যক্ষ-নাগ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সকলেই আসতে লাগলেন বিশ্বানরের বাড়িতে নানা উপহার নিয়ে। বিশ্বানরের বাড়িতে সে যেন এক রীতিমত মেলা বসে গেল।

ব্রহ্মা নিজেই ছেলের ষষ্ঠীপুজো থেকে শুরু করে যা যা করণীয় সবই করলেন। নামকরণও করলেন—গৃহপতি। লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্বও নিলেন।

ছেলেও ছিল অসাধারণ মেধাবী। আট বছরের মধ্যে বেদগ্রন্থ পড়া শেষ করে সুপণ্ডিত হয়ে উঠল। মা-বাবার গর্বের শেষ নেই।

ছেলে গৃহপতি সব দিক থেকেই সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সব চলে গেলেন। গৃহপতি ঘরেই থাকে। এখন তার একমাত্র কাজ, মা-বাবার সেবা করা। সে কাজে কোন ফাঁকি নেই তার।

একদিন এমনিভাবে মা-বাবার সেবা করছে গৃহপতি। তখন তার বয়স মাত্র ন-বছর। হঠাৎ বীণা বাজাতে বাজাতে নারদ মুনি এসে হাজির হলেন বিশ্বানরের বাড়িতে। দেবর্ষি নারদ মুনি এসেছেন, বিশ্বানর আর শুচিষ্মতী কি চুপ করে বসে থাকতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁকে আহ্বান জানালেন, পা ধুইয়ে মুছিয়ে বসার আসন দিলেন। ফল-মূল যা ছিল, তা দিয়ে আপ্যায়ন জানালেন। আপ্যায়নে মুনিবরও খুব তৃপ্ত হলেন।

তারপর গৃহপতিকে দেখে বললেন—বাঃ, বেশ ছেলে তো! দেখি তোমার হাতখানা!

নারদ মুনি ছিলেন একজন বড় জ্যোতিষী।

গৃহপতি হাত বাড়িয়ে দিল। নারদ হাতের রেখা দেখলেন। তাছাড়াও চোখ, মুখ, নাক, কান, ঠোঁট, হাঁটু, পা, পায়ের পাতা, নখ—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বিশ্বানরকে বললেন—তোমার ছেলে অসাধারণ, রাজ-রাজেশ্বর হবে। তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

এমন কথা শুনতে কোন মা-বাবার ভাল না লাগে? শুচিষ্মতী ছেলেকে আদর করে কোলে বসালেন।

নারদ মুনির কথা তখনো শেষ হয় নি। তাই একটু চুপ করে থাকার পর তিনি আবার বললেন—সব ভাল। কিন্তু একটা লক্ষণ দেখলাম বড় খারাপ।

শুনে ধক করে উঠল মা-বাবার বুক—কি দেখলেন? কি খারাপ?

—পরমায়ু খুবই অল্প। তের বছর বয়সে দেখছি মারা যাবে।

—মারা যাবে! মা-বাবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

—হ্যাঁ। মাথায় বাজ পড়ে মারা যাবে।

—বজ্রপাতে! বাজের আগুনে পুড়ে আমাদের এমন ছেলে এই বয়সে মারা যাবে? কি বলছেন মুনিবর? কোন রকমেই কি বাঁচবে না?

—কপালে যা লেখা থাকে, তা কি কেউ কাটাতে পারে? আমি সামান্য একজন জ্যোতিষী। যা দেখলাম, তাই বললাম মাত্র। বলে নারদ মুনি চলে গেলেন।

বিশ্বানর আর শুচিষ্মতীর মন দারুণ খারাপ হয়ে গেল। অত

সাধ্যসাধনার পর এমন এক গুণের ছেলে পেয়েও হারাতে হবে, মন তো খারাপ হবারই কথা।

গৃহপতিও সব শুনল। যতক্ষণ নারদ মুনি ছিলেন একটি কথাও সে বলে নি। এখন তার ভাগ্যের কথা শুনে আর মা-বাবার মন খুব খারাপ হয়ে যেতে দেখে বলল—মা-বাবা! তোমরা এত মন খারাপ করছ কেন? আমি জানি, যে ছেলে মা-বাবার সেবা করে, তাঁদের শ্রদ্ধা করে, তাদের কোন দিন কোন ক্ষতি হয় না। কারো সাধ্য নেই তাদের কেউ কোন ক্ষতি করে। মারতে গেলে মারবেন তো মহাকাল মহেশ্বর। তোমরা আমায় অনুমতি দাও, আমি তাঁর তপস্যা করে দেখি, কপালের লেখা কাটতে পারি কিনা।

জ্ঞানী বিশ্বানর ভেবে চিন্তে দেখলেন, ছেলে গৃহপতি ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তপস্যায় যে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এতটুকু ছেলেকে অত কষ্ট করার অনুমতি কি দেওয়া যায়?

গৃহপতি কিন্তু নাছোড়—তোমরা আমার কষ্টের কথা ভাবছ কেন? তাছাড়া একটু কষ্ট করলে যদি দুর্দৈব কেটে যায়, সেটা কি ভাল নয়?

এরপর আর কি বলবেন মা-বাবা।



শুচিস্মতী আর বিশ্বানরকে প্রণাম করে ন-বছরের ছেলে গৃহপতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা এসে হাজির হল কাশীতে। সেখানে এসে গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিল। জায়গাটা পরিষ্কার করে নিজের হাতে একটা শিবলিঙ্গ তৈরি করে নিয়ম-অনুসারে প্রতিষ্ঠা করল। তারপর প্রতিদিন এক মনে শিবের পূজা-আরাধনা শুরু করল। প্রতিদিনই আঠার-শ ঘট জল গঙ্গা থেকে এনে সেই শিবলিঙ্গকে স্নান করাত, আর এক হাজার আট নীল পদ্ম যোগাড় করে এনে মালা গেঁথে লিঙ্গে পরিয়ে সামনে বসে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করতে লাগল। খাওয়া-দাওয়ার কথা যেন ভুলেই গেল গৃহপতি।

এমন ভাবে কেটে গেল তিন বছর। বারো পূর্ণ হয়ে তের-য় পা দিল গৃহপতি। নারদ মুনির ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বাজের আগুনে পুড়ে মরার দিন এগিয়ে এল। মহাদেবের তপস্যা করতে করতে গৃহপতির কিন্তু সে কথা মনেই ছিল না।

একদিন এভাবে শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে মালা পরিয়ে বসে গৃহপতি ধ্যান করছে,হঠাৎ বজ্রপাণি (যার হাতে বজ্র থাকে) দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে এসে হাজির হলেন।

গৃহপতির ধ্যান ভাঙল।

ইন্দ্র বললেন—গৃহপতি, এই বয়সে তোমার তপস্যার তুলনা হয় না। আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। বর চাও, আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।

গৃহপতি ইন্দ্রকে প্রণাম জানিয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল—আমি দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করছি, দেবরাজের নয়। তবে আপনি কেন এলেন? মহাদেব যদি আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিতে আসেন, তবেই আমি প্রার্থনা রাখব, বর নেব।

শুনে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল ইন্দ্রের—কি, এত বড় স্পর্ধা তোমার যে, তুমি আমাকে দেবরাজ বলে অবজ্ঞা কর? আমি ছাড়া দেবাদিদেব আর কে আছে। মহাদেব—সে আবার কে? গৃহপতি, অমন ঔদ্ধত্য দেখিও না। এখনও বলছি, আমিই একমাত্র বরদাতা। আমার কাছে বর চাও।

গৃহপতি আগেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি ভাবেই বিনয়ের সঙ্গে বলল—দেবরাজ, বৃথা কেন আমার ওপর রাগ করছেন। আমি এই লিঙ্গে মহাদেবের আরাধনা করছি। তাঁর কাছ ছাড়া আমি আর কারো কাছে বরপ্রার্থী নই। দয়া করে আমাকে এমন জোর-জবরদস্তি করবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে আগুনে যেন ঘি পড়ল। রাগে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন ইন্দ্র। তাঁর অস্ত্র বজ্রও তুলে ধরলেন গৃহপতিকে মারবার জন্য। বজ্রের সে কি তেজ! যেন শয়ে শয়ে আগুন দাবানলের মত জ্বলে উঠল। তাকিয়ে থাকার সাধ্য কি? গৃহপতির চোখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময়েই গৃহপতির মনে পড়ে গেল নারদ মুনির ভবিষ্যৎবাণী। সন্দেহ জাগল, তার তপস্যায় কি মহাদেব সন্তুষ্ট হন নি? তাহলে বাজের আগুনে কেন মরতে হবে? ভাবতে ভাবতে গৃহপতি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু গৃহপতির মনে হল, কে যেন খুব আদর করে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর বলছে—গৃহপতি, ওঠ।

গৃহপতি চোখ মেলে উঠেই দেখল, সামনে তারই আরাধ্য দেবতা মহাদেব। পরনে বাঘছাল, গলায় মণিরত্নের মালা, মুখে মৃদু হাসি। তাড়াতাড়ি উঠে গৃহপতি প্রণাম জানাল তাঁকে।

মহাদেব বললেন—অত ভয় পেয়ে গেলে কেন?

গৃহপতি বলল দেবরাজ ইন্দ্রের ঐ বজ্রের আগুন আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল প্রভু। আপনাকে বোধ হয় তুষ্ট করতে পারি নি, এই ভেবেই আমার মনে কষ্ট জেগেছিল।

মহাদেব তেমনি হাসিমুখেই বললেন—গৃহপতি, তোমার তপস্যায় আমি খুবই তুষ্ট। ইন্দ্রের বেশে আমিই এসেছিলাম তোমাকে পরীক্ষা করতে। বজ্র তুলে আমিই তোমাকে দেখালাম অগ্নির তেজ কতখানি। গৃহপতি, ব্রহ্মাণ্ডে আগুনের মত তেজ, শক্তি আর দ্বিতীয় কারো নেই। আমার তপস্যা করে তুমি সেই অগ্নিকেই জয় করেছ। তাই তুমি আজ থেকে হবে অগ্নির অধীশ্বর। ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা থেকে শুরু করে ঘরের মানুষ, বনবাসী মুনি-ঋষিরাও অগ্নিদেব হিসেবে তোমার পূজা করবে। এখন তোমার মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের রাজ্যে যাও।

তপস্যা সফল হয়েছে, মৃত্যুকে জয় করেছে গৃহপতি শিবের প্রসাদে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গৃহপতি মহাদেবকে জিজ্ঞেস করল—কোথায় আমার রাজ্য, প্রভু।

—দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতীর পাশে বিশ্বকর্মা আমারই আদেশে তোমারই জন্য অর্চিষ্মতী নামে এক নগরী তৈরি করে রেখেছে। সমৃদ্ধ

নগরী। সেটাই হল তোমার রাজ্য।

এরপর এক সময় মা-বাবাকে নিয়ে গৃহপতি গিয়ে হাজির হল অর্চিষ্মতীতে। হল রাজ-রাজেশ্বর।

ব্যাধ পিঙ্গাক্ষের কাহিনী

বিন্ধ্য পর্বতে নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে বিশাল এক গভীর বন। নানা রকম জন্তু-জানোয়ারে ভরা। সেই বনে শবর জাতির লোকেরা বাস করত। তাদের কাজ ছিল তীর-ধনুক, কুড়ুল জাতীয় সব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শিকার করা। এটাই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। আর একটা কাজ তারা করত—সেটা ছিল ভারি অন্যায়। বিন্ধ্য পর্বত পেরিয়ে দক্ষিণের দেশে তখন অনেক তীর্থযাত্রীই পায়ে হাঁটা পথে তীর্থ করতে যেত। এরা সুযোগ বুঝে তাদের সব কিছু লুটপাট করে নিত, এমনকি অনেক সময় প্রাণেও মেরে ফেলত। তাই যাত্রীরা খুব ভয়ে ভয়ে চলত। আর, এই রকমের যে সব বনপথ ছিল, দল বেঁধে দিনের বেলা ছাড়া তারা কোন মতেই যেত না। তা-ও যেত প্রাণ হাতে নিয়ে।

নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে এই যে বন, সত্যি বনটা বেশ গহন ছিল। সূর্যের আলো ঢুকত বটে, কিন্তু ছায়া-ছায়া। এখানকার শবররা এক সময় এক সঙ্গেই থাকত, শিকার করত, লুটতরাজ করে ভাগাভাগি করে নিত। এদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ছিল পিঙ্গাক্ষ নামে এক ব্যাধ। তাই সকলেই তার কথা মেনে চলত।

কিন্তু, কেন যেন পিঙ্গাক্ষের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আসতে শুরু করল। অমন দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর ব্যাধ কেমন যেন ক্রমশ ঝিমিয়ে যেতে লাগল। শিকার না করলে পেট চলবে না, তাই শিকার করত। তা-ও আবার বেছে বেছে। আগের মত ইচ্ছে অনুযায়ী যাচ্ছেতাই শিকার করা বন্ধ করে দিল। দলের কেউ উদ্যত হলেও তাকে বাধা দিতে শুরু করল—এই দেখছিস না, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে? কিংবা ঝাঁঝিয়ে উঠত—তেষ্টায় এক মনে নদীতে জল খাচ্ছে, আর মারতে যাচ্ছিস, লজ্জা করে না। তোকে যদি ঐ অবস্থায় কেউ মারে?

সবাই শুনে অবাক হয়। পিঙ্গাক্ষর আবার কি হল?

কিন্তু শবররা সবচেয়ে মুস্কিলে পড়ল পিঙ্গাক্ষের আর এক হুকুম শুনে—কোন তীর্থযাত্রীর ওপর হামলা করা চলবে না। সবাই যেন নির্ভয়ে যেতে পারে। কেউ যদি অমান্য করে পিঙ্গাক্ষ তাকে ক্ষমা করবে না।

শবররা মহা সমস্যায় পড়ল এই কথা শুনে। কিন্তু সাহস করে কেউ প্রতিবাদও করতে পারে না। তাদের আমোদ-ফূর্তি সব মাথায় উঠে গেল।

আস্তে আস্তে সব তীর্থযাত্রীই জেনে গেল যে, ও পথে আর কোন ভয় নেই। খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে—পিঙ্গাক্ষ শিবের ভক্ত হয়ে পড়েছে। যাত্রীদের আর কোন ভয় নেই।

সত্যিই তাই! ঐ বনের পথে হঠাৎ কোন বিপদ-আপদ এলে, যাত্রীরা দেখতে লাগল, কোথা থেকে যেন যমদূতের মত ছুটে আসত পিঙ্গাক্ষ। বিপদ কাটিয়ে যাত্রীদের বনপথ পার করে দিয়ে আসত

যাত্রীরা সন্তুষ্ট হল বটে, কিন্তু বেশির ভাগ শবরই বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। ভেতরে ভেতরে তারা আবার একটা দলও করে ফেলল। তাদের নেতা হল তারাক্ষ। তারাক্ষ যদিও পিঙ্গাক্ষের কাকা, তবুও ভাইপোকে সে কোন মতেই সহ্য করতে পারত না। কিন্তু যেহেতু পিঙ্গাক্ষ ছিল দলের নেতা, সবাই তারই কথা শোনে, তাই তারাক্ষ বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে পিঙ্গাক্ষকে মেরে ফেলার সুযোগ সে সব সময়ই খুঁজে ফিরত। এবার পুরো সুযোগ এসে গেল তার হাতে। দলে ভারি হয়ে উঠল সে। যা খুশি তাই করতে শুরু করে দিল। কোন পশু-পাখিই আর তাদের হাত থেকে নিস্তার পায় না। পিঙ্গাক্ষের নজরে এলে এক হুমকি খেয়ে একটু চুপ করে বটে, কিন্তু সরে গেলে আবার যা-কে তাই।

যাত্রীরা নির্বিবাদে যাতায়াত করতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এমনভাবে দিন যায়।

একদিন এক তীর্থযাত্রীর দল চলেছে কাশীর দিকে। সকলেই শিবভক্ত। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করবে, তারপর বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে দর্শন-পূজা করবে। নিশ্চিন্ত মনেই তারা চলেছে। চলতে চলতে নির্বিন্ধ্যা নদীর সেই বনপথে তারা এসে পড়ল। মুখে তাদের মহাদেব শিবের জয়ধ্বনি ছাড়া আর কিছু ছিল না।

তখনও সূর্যদেব অস্ত যান নি। পরিষ্কার দিনের আলো। কিন্তু গাছ-পালা ঢাকা বনের পথে আবছায়া অন্ধকার। হঠাৎ তারাক্ষ তার দলবল নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল। যাত্রীরা বেশ হতচকিত হয়ে পড়ল। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি পিঙ্গাক্ষ নেই!



তারাক্ষ আর তার দলবল ইতিমধ্যে যাত্রীদের যা কিছু ছিল তা লুটতরাজ শুধু নয়, তাদের মারধোর করতেও শুরু করে দিয়েছে। আর প্রাণভয়ে যাত্রীরা চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

বহুদূরে তখন একলাই শিকারে গিয়েছিল পিঙ্গাক্ষ। চেঁচামেচি শুনে শিকার ফেলে ছুটতে ছুটতে এল শব্দ লক্ষ্য করে। এসেই নিরীহ যাত্রীদের ওপর তারাক্ষ আর তার সঙ্গীদের কাণ্ড দেখে রুখে দাঁড়াল। কি! এত বড় স্পর্ধা! পিঙ্গাক্ষ কি মরে গেছে? ভাল চাও তো ওদের ছেড়ে দাও, যা নিয়েছ ফিরিয়ে দাও।

তারাক্ষ অনেক দিন ধরেই এমন এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই সে-ও হুমকি ছেড়ে বলল—কে হে? কে এল মাতব্বরি করতে? সাধু সেজেছিস? হঠে যা বলছি।

পিঙ্গাক্ষেরও স্পষ্ট জবাব—আমি এখন এখানকার অধিপতি। আমার আদেশ যে মানবে না, তার কোন ক্ষমা নেই।

তারাক্ষ বিদ্রূপ করে উঠল—কে অধিপতি? পিঙ্গাক্ষ, না তারাক্ষ? ভাল চাস তো সরে যা।

পিঙ্গাক্ষ এবার যেন আগুনের মত জ্বলে উঠল—না। কারো ঔদ্ধত্যের কাছে আমি মাথা নোয়াই না।

তারাক্ষ তখন তার অনুচরদের নির্দেশ দিল—পিঙ্গাক্ষকে আগে বধ কর। পরে এদের দেখা যাবে।

অসাধারণ ক্ষমতাশালী পিঙ্গাক্ষ একা, আর একদিকে তারাক্ষ আর তার অনুচররা। যাত্রীদের ছেড়ে সবাই যখন পিঙ্গাক্ষের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই সুযোগে যাত্রীরা পিঙ্গাক্ষের আশ্রয়ে চলে এল।

অত জনের আঘাত এড়ানো কি পিঙ্গাক্ষের পক্ষে সম্ভব? বাধ্য হয়েই ঘা খেতে খেতে পিছু হটতে হল তাকে, কিন্তু যাত্রীদের আগলে রাখল—যাতে ওদের কোন অস্ত্র যাত্রীদের গায়ে না লাগে।

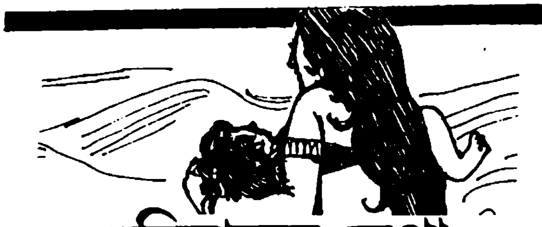
ইতিমধ্যে সূর্যদেব ডুবে গেছে। অন্ধকারও নেমে এসেছে। চারদিক আর ভাল দেখা যায় না। পিঙ্গাক্ষের সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবুও যাত্রীদের বাঁচিয়ে পিছু হটতে হটতে কোন রকমে এসে ঢুকল নিজের খুপরিতে। তারাক্ষের বেশ কিছু অনুচর পিঙ্গাক্ষের আঘাত সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত সে-ও আর পিছু ধাওয়া করে নি।

ভোর হতেই যাত্রীরা কাশীর পথে চলে গেল। পিঙ্গাক্ষ তখন মৃত্যুশয্যায়।

সকাল হবার আগেই পিঙ্গাক্ষ মারা গেল। মারা যাবার মুহূর্তে সে ভাবছিল, আমি যদি ঈশ্বরের মত সর্বশক্তিমান হতে পারতাম, তাহলে এই অন্যায়কারী পাপাচারীদের শেষ করে দিতে পারতাম।

মরার আগে যে-কথা ভাবতে ভাবতে মরে, মরার পর কিন্তু সে তা-ই হয়। মরবার সময় পিঙ্গাক্ষ যা ভাবতে ভাবতে মরেছিল, শেষে সে তা-ই হল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ, যাকে আমরা বলি নৈর্ঋত কোণ, ঈশ্বর মহাদেবের অনুগ্রহে পিঙ্গাক্ষ হল সেই কোণের অধিপতি এবং সর্বশক্তিমান।





শুচিস্মানের কথা

কর্দম নামে এক ঋষি ছিলেন। শিবভক্ত আর মহাযোগী।

তাঁর ছেলে শুচিস্মান একদিন বন্ধু মুনি বালকদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। স্নান তো নয়, রীতিমত জল তোলপাড় করতে লাগল। জল ছোঁড়া, নানা রকম ভাবে সাঁতার কাটা—সে কত রকমেরই না খেলা।

এদিকে শুচিস্মান সাঁতার কাটতে কাটতে চলে গিয়েছিল প্রায় মাঝ-নদীতে। এমন সময় এক শুশুক হঠাৎ তাকে আক্রমণ করে বসল। বেচারা শুচিস্মান। জলের মধ্যে সাধ্য কি, শুশুকের হাত থেকে প্রাণ বাঁচায়। তখন বন্ধুরা অনেক দূরে। দেখল বন্ধু শুচিস্মান টুপ করে যেন ডুবে গেল জলের তলায়! প্রথমে ভেবেছিল হয়ত ডুব সাঁতার দিয়ে বন্ধু এগিয়ে আসছে। তাই তারা পাড়ে উঠে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু বন্ধু আর ফিরে এল না। মন খারাপ করে ফিরে এল তারা। ফিরে এসে কর্দম ঋষিকে জানাল—শুচিস্মান সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ডুবে গেছে।

সব শুনে কর্দম ঋষি ভাবলেন—এমন তো হওয়ার কথা নয়। তিনি বিলক্ষণ জানতেন, ছেলে তাঁর বয়সে ছোট হলেও একজন ভাল সাঁতারু। তাই রহস্য কি জানার জন্য তিনি চোখ বুজে যোগাসনে বসলেন। যোগের এমনি শক্তি যে, খোলা চোখে যা না দেখতে পাওয়া যায়, যোগাসনে বসলে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়।

যোগাসনে বসে কর্দম ঋষি দেখলেন, এক শুশুক এসে ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। এমন সময় এক জলদেবী এসে শুশুকের কাছ থেকে তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিল। বেকুব হয়ে ছেলেকে তাঁর ছেড়ে দিয়ে, শুশুক অন্যত্র চলে গেল।

জলদেবী করল কি—শুচিস্মানকে নিয়ে সোজা এল সমুদ্রের কাছে। বলল—সমুদ্র, ছেলেটিকে তোমার কাছেই রাখ।

সবেমাত্র সমুদ্র জলদেবীর কাছ থেকে শুচিস্মানকে নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ কোথা থেকে ত্রিশূল হাতে রুদ্র এসে দাঁড়ালেন তার সামনে পথ আগলে। রুদ্রকে দেখে সমুদ্র তো অবাক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রণাম জানাল।

রুদ্র জিজ্ঞেস করলেন—সমুদ্র, এই বালককে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—আমার আবাসে, সমুদ্র বলল।

—কোন অধিকারে?

—আজ্ঞে জলদেবী আমার কাছে রাখতে দিয়ে গেছে।

—তুমি জান না যে, কত বড় অন্যায় কাজ তুমি করেছ। যারা শিবের ভক্ত, আমার ভক্ত, তাদের রাখার অধিকার তোমার

নেই। ওর বাবা কর্দম ঋষি আমার একজন প্রধান ভক্ত। নিজের ভাল চাও তো ছেলেটিকে ওর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস। এই বলে রুদ্র চলে গেলেন।

রুদ্রের আদেশ অমান্য করে, সাধ্য কি সমুদ্রের। সেও তক্ষুণি সব খবরাখবর নিয়ে শুশুককে গিয়ে ধরল। ছেলেও শুশুককে বেশ করে জালে বেঁধে নিয়ে সমুদ্র এল কর্দম ঋষির কাছে।

যোগাসনে বসে কর্দম ঋষি সব দেখে, এইবার চোখ খুললেন। দেখলেন, সামনে সত্যিই দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলে শুচিষ্মান, তার পাশে সমুদ্র, পায়ের নীচে জালে বাঁধা শুশুক।

চোখ খুলতেই, সমুদ্র কর্দম ঋষিকে প্রণাম জানিয়ে ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—অপরাধ তার নয়, সব অপরাধ এই শুশুকের। ঋষি যেন তাকে ক্ষমা করেন।

কর্দমকে আর নতুন করে কি বলবে সমুদ্র, তাঁর তো সবই জানা। সমুদ্র আর জালে বাঁধা শুশুককে তিনি ক্ষমা করে দিলেন। কর্দম দেখলেন—ছেলের গা দিয়ে তখনও জল ঝরছে, শ্যাওলায় নীল।

যোগাসনে বসে প্রজাপতি কর্দমের পাঁচ হাজার বছর কেটে গিয়েছিল। তিনি কিন্তু তা জানতেও পারেন নি। ছেলের বয়সও যে ইতিমধ্যে অনেক হয়ে গেছে, কে বলবে?

বাবাকে প্রণাম জানিয়ে শুচিষ্মান বলল—বাবা, আমি তপস্যায় যাবো। আপনি আমায় অনুমতি দিন।

তপস্যার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে, বিশেষ করে কর্দম ঋষির কাছে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুমতি পেয়ে গেল আর বারাণসীতে গিয়ে শুরু করে দিল মহাদেবের আরাধনা।

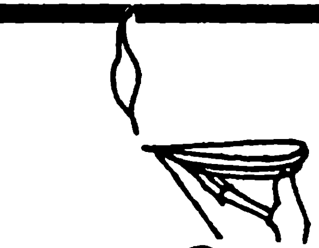
কঠোর সে তপস্যা।

বেশ কিছুকাল তপস্যা করার পর, একদিন মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন শুচিষ্মানকে। বললেন—বর চাও।

শুচিষ্মান বলল—প্রভু, আমাকে যদি বরই দিতে চান তাহলে এই বর দিন, আমি যেন জল আর জল-জন্তুদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারি।

মহাদেব বললেন—তোমার যখন ইচ্ছে তখন তাই হবে।

সেই থেকে জলের অধিপতি হয়ে গেল শুচিষ্মান, সকলের পূজনীয় বরুণ দেব।



অলকাপুরীর রাজা

বহুকাল আগে কাম্পিল্য নামে নগরে, যজ্ঞদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। খুবই পণ্ডিত, খুবই নিষ্ঠাবান। তাই রাজাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে সভাপণ্ডিত করে রেখেছিলেন।

যজ্ঞদত্তের এক ছেলে ছিল। তার নাম ছিল গুণনিধি। একমাত্র ছেলে, চাঁদের মত দেখতে, বাপ-মায়ের যেন নয়নের মণি। দু-জনেই খুব ভালবাসত তাকে। যথা সময়ে তার পৈতে দিয়ে, যজ্ঞদত্ত ছেলেকে লেখাপড়া শিখে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠার জন্য পাঠালেন গুরুগৃহে।

তিনি যান সভায়।ছেলে তল্পি-তল্পা নিয়ে গুরুগৃহে। সভা থেকে যখন বাড়ি ফিরে আসেন, তখন ছেলে ঘুমোয়। তাই খবর নেন তার মায়ের কাছে।

দেখতে দেখতে বয়স বাড়ে ছেলের। সুপণ্ডিতও হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গিয়ে পড়ল খারাপ সংসর্গে। এমন সব বন্ধু-বান্ধব জুটল, যারা জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছু জানত না।

পাশা খেলার মত জুয়াও এক দারুণ নেশা। কাটানো বড় শক্ত। সেইজন্যে বোধ হয় কথাতেই আছে 'জুয়া, তাস, পাশা, তিন সর্বনাশা।'

সর্বনাশা সেই নেশাতেই ক্রমে ক্রমে গুণনিধি মজে যেতে লাগল। লেখাপড়া যা শিখেছিল, চর্চার অভাবে আস্তে আস্তে সবই ভুলে গেল। দিন নেই রাত নেই—পড়ে থাকে জুয়ার আড্ডায়।

বাবা যজ্ঞদত্ত সকালে বেরিয়ে যান সভায়। দুপুরে একবার বাড়ি ফেরেন খেতে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন রাতে। শাস্ত্র আলোচনা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না। বাড়ির কোন খবরই রাখতেন না। দুপুরে ফিরে যখন ছেলের খোঁজ নিতেন, শুনতেন ছেলে গুরুর কাছে গেছে, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখছে। ঐটুকু শুনেই তিনি খুশি। ছেলে যে এদিকে পুরো উলটো পথে চলে যাচ্ছে, তা তিনি জানতেও পারেন নি। পাছে ছেলের কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে যজ্ঞদত্তের স্ত্রীও স্বামীর কাছে কোন কথাই বলতেন না।

দেখতে দেখতে অল্প বয়সেই গুণনিধি দারুণ জুয়াখোর হয়ে উঠল। পণ রেখে জুয়া খেলায় টাকা-পয়সা, ধন-সামগ্রী চাই। তাই সে মায়ের ওপর জোর-জুলুম আরম্ভ করল। বাড়িতে যেখানে যা পেত, তাই নিয়ে যেত জুয়া খেলতে। কোন দিন কিন্তু জিততে পারত না, হেরেই আসত। মায়ের মনে এতটুকু শান্তি নেই। তিনি গুণনিধিকে তিরস্কার করেন, ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু গুণনিধির তখন ভাল কথা শোনার সময় কোথায়? যজ্ঞদত্তের স্ত্রী পড়েন মহা মুস্কিলে। একদিকে একমাত্র ছেলে। স্বামী যজ্ঞদত্ত যদি জানতে পারেন, তাহলে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না।

অনেক ভেবে-চিন্তে মা একটা উপায় বের করলেন। এখন ছেলের একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক। স্থির বিশ্বাস, বিয়ের পর ছেলের মতিগতি নিশ্চয় ফিরবে।

স্ত্রীর ইচ্ছে শুনে যজ্ঞদত্তও রাজি হয়ে গেলেন। অনেক খুঁজে একটি ভাল মেয়ে দেখে, খুব ঘটা করে ছেলে গুণনিধির বিয়েও দিয়ে দিলেন।

কিন্তু ছেলের স্বভাব আর বদলালো না। মায়ের মন আরো খারাপ হয়ে যায়। তবুও মুখ ফুটে স্বামী যজ্ঞদত্তকে কিছু বলতে পারেন না।

এভাবে দিন গেল।

একদিন দুপুরে সভা থেকে যজ্ঞদত্ত বাড়ি ফিরছেন। পথে দেখলেন সবার চেনা এক জুয়াড়ি আর এক জুয়াড়ির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যজ্ঞদত্ত এদের খুবই ঘৃণা করতেন। তাই



দেখা-সাক্ষাৎ হলেও পাশ কাটিয়ে যেতেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে যেন শুনতেই পান নি, এমন ভান করে এড়িয়ে যেতেন। সেদিনও সেভাবেই পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ যজ্ঞদত্তের নজর পড়ল জুয়াড়ির আঙুলের দিকে। জুয়াড়ির আঙুলে ছিল একটা সোনার আংটি, তাতে নানা রত্ন আঁটা। আংটিটা চোখে পড়তেই যজ্ঞদত্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন।

জুয়াড়িকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গো, এই আংটি তুমি কোথা থেকে পেলে?

জুয়াড়ি বলল—কেন, পণ্ডিতমশাই-এর ছেলের কাছ থেকে জুয়ায় জিতে পেয়েছি। কোন জায়গা থেকে চুরি করি নি।

—পণ্ডিতমশাইয়ের ছেলে মানে?

—মানে, আপনারই ছেলে গুণনিধি। জুয়াড়ি বলল।

—গুণনিধি, মানে আমার ছেলে, জুয়া খেলে!

বিস্ময়ে যজ্ঞদত্ত যেন হতবাক।

—কেন, আপনি কি কিছুই জানেন না? জুয়াড়ি বলল—আপনার ছেলে তো একজন জুয়াখোর। কিন্তু দুঃখের কথা আর কি বলব পণ্ডিতমশাই, একবারও সে জিততে পারে নি। কত দামি দামি জিনিস যে পণ রেখে খুইয়েছে তার আর শেষ নেই।

যজ্ঞদত্ত আর এক মুহূর্তেও দাঁড়ালেন না সেখানে। পেটে খিদে, কিন্তু মাথায় তখন আগুন জ্বলতে শুরু করেছে।

বাড়িতে ফিরেই ডাকলেন স্ত্রীকে। স্ত্রী তখন রান্নাবান্না করছিলেন। ডাক শুনেই রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। দেখলেন, যজ্ঞদত্ত আজ যেন বেশ গম্ভীর। কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

—গুণনিধি কোথায়?

—এই তো একটু আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়তে গেল। বললেন তিনি—তরকারি চাপিয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, খেতে দিই।

স্বামীর সামনে থেকে এই মুহূর্তে তিনি যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। কিছুক্ষণ আগেই ছেলে যে তাঁর বউমার গা থেকে জুলুম করে একটা গয়না খুলে নিয়ে জুয়া খেলতে গেছে, সেকথা এখন কি করে স্বামীকে বলবেন।

—দাঁড়াও। বেশ জোর দিয়ে বললেন যজ্ঞদত্ত—আমাদের বিয়ের সময় তোমাকে একটা সোনার আংটি দিয়েছিলাম, যাতে নানা রত্ন বসানো ছিল। সেই আংটিটা কোথায়, দেখি?

—এখন কি তা দেখাবার সময় নাকি? তুমি যে কি বল? স্ত্রীর বুক ধুকধুক করে ওঠে। তবুও সামলে নিয়ে হাসিমুখে বলেন—খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও, তারপর দেখো।

—ব্রাহ্মণী, মিথ্যে কথা বলছ। তুমি দেখাতে পারবে না। গৌড়দেশ থেকে যে মূল্যবান তামার ঘটটা এনেছিলাম, সেটাও দেখাতে পারবে না। যেটাই আমি দেখতে চাইব, সেটাই তুমি আর দেখাতে পারবে না। তোমার গুণনিধি যে এমন গুণের নিধি হয়েছে, সে কথা তো একবারের জন্যও আমার কানে তোল নি।

ব্রাহ্মণীর মুখ এবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—ছিঃ...ছিঃ! আজ বাইরের লোকের মুখে আমায় শুনতে হল যে, আমার ছেলে জুয়াড়ি। দিনরাত জুয়া খেলে বেড়ায়। আর তুমি এতদিন ধরে আমার কাছে তা গোপন করে রেখেছ, মিথ্যে কথা বলে এসেছ। কিন্তু তুমি ভালভাবেই জান যে, আমি কখনো মিথ্যা আর অনাচারকে প্রশ্রয় দিই না।

যজ্ঞদত্ত ঠিক কথাই বলেছেন। ব্রাহ্মণী তা বিলক্ষণ জানতেন। একমাত্র ছেলে তাঁদের, পাছে কোন অঘটন ঘটে বসে, এই ভয়ে তিনি স্বামীর কাছে মুখ খুলতে পারেন নি।

যজ্ঞদত্ত বললেন—শোন, আজ থেকে ও আর আমার ছেলে নয়। আমি জানব, আমার একটা ছেলে ছিল, কিন্তু সে মরে গেছে। আর তোমারও আমি মুখ দর্শন করব না। যাও।

ব্রাহ্মণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু যজ্ঞদত্তের কথা একটাই।

গুণনিধি নিরাশ্রয় হল। সেই সঙ্গে তার মা-ও। এবার দারুণ অনুশোচনা জাগল তার মনে। ছিঃ...ছিঃ! যার বাবা অমন একজন নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত, নিজেও কিছু কম পাণ্ডিত্য অর্জন করে নি, তার তো এমন হওয়ার কথা নয়। এ কেমন ভাবে কি হয়ে গেল? উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গুণনিধি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। খিদে পেলে দু-চারটে বুনো ফল, আর তেষ্টা পেলে পুকুরের জল খেয়ে গুণনিধি ঘুরে বেড়ায়, আর ভাবে, কি অন্যায় কাজই না সে করেছে!

একদিন এমনি দুরন্ত খিদে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখল, একজন ভাত-তরকারির সঙ্গে নানা রকমের খাবার নিয়ে আসছে। দেখে গুণনিধির খিদে যেন আরো বেড়ে গেল। গুণনিধি তাকে দূর থেকে অনুসরণ করল। করতে করতে এল এক শিব মন্দিরের কাছে।

সেদিন ছিল শিবরাত্রি। যে ঐসব নিয়ে আসছিল, সে একজন শিবভক্ত। ব্রত পালন করতে এসেছিল। সে গিয়ে ঢুকল মন্দিরে। গুণনিধি বাইরে অন্ধকারে অপেক্ষা করে রইল, আর দেখতে লাগল মানুষটি কি করে। দেখল, মানুষটি শিবের পুজো করল, অন্ন নিবেদন করল। তারপর শিবলিঙ্গের সামনে নাচ-গান শুরু করে দিল। মন্দিরের ভেতর টিম টিম করে জ্বলছিল একটা প্রদীপ। নাচ-গানে রাতের অনেকখানি কেটে গেল, গুণনিধির খিদের জ্বালাও বেড়ে চলল। এক সময় সেই শিবভক্ত মন্দির-দ্বারেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই সুযোগে গুণনিধি গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরের ভেতর ঢুকে, চুপি চুপি খুঁজতে লাগল খাবারের থালা। অন্ধকার—দেখতে পাচ্ছে না। তাই নিজের কাপড়ের ফালি ছিঁড়ে, তা দিয়ে সলতে-বানিয়ে প্রদীপটা ভাল করে জ্বেলে দিতেই আলো জ্বলে উঠল, খাবারের থালাও দেখতে পেল। পাগলের মত থালাটা

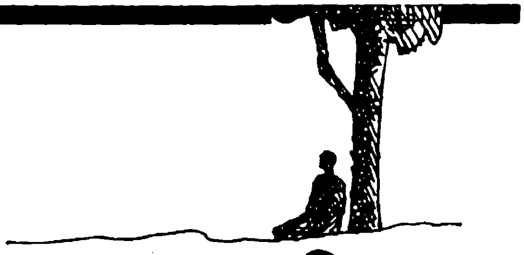
তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবে কি, শিবভক্তের পায়ে আচমকা পা ঠেকে যেতেই ধড়মড় করে ভক্ত উঠে চেঁচাতে শুরু করল—চোর...চো...। আর যায় কোথা? ধরা পড়ে গেল গুণনিধি। মারের চোটে সেখানেই মারা গেল।

মরার আগে যেহেতু সে না খেয়ে উপবাসে থেকে শিবের পুজো দেখেছিল, শিব মন্দিরে আলো জ্বেলে দিয়েছিল, তাই হাজার অপকর্ম সত্ত্বেও গুণনিধি গেল শিবলোকে। সেখানে কিছুকাল থেকে আবার সে ফিরে এল পৃথিবীতে। এবার সে হল কলিঙ্গরাজ অরিন্দমের ছেলে। নাম হল—দম।

অরিন্দমের মৃত্যুর পর দম সিংহাসনে বসল। রাজা হিসেবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করল। খুঁটিয়ে রাজকাজও করত। কিন্তু একটা ব্যাপারে দারুণ নিষ্ঠা ছিল—শিব মন্দিরে দীপদান। নিজে প্রতিদিন শিবের মন্দিরে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে তো আসতই, এমন কি রাজ্যময় ঘোষণা করে দিয়েছিল শিব মন্দিরে সকলকে বাতি দিতে হবেই। যে তার আদেশ পালন করবে না, তার মৃত্যুদণ্ড হবে। ফলে সব শিব মন্দিরে এরপর থেকে বাতি জ্বলতে লাগল।

দীপদান ছাড়া দম আর কিছু জানত না। যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন ঐ একটা কাজ সে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিল। তাই মৃত্যুর পর মহাদেব তাকে কুবেরের রাজধানী অলকাপুরীর রাজা করে দিয়েছিলেন।

জুয়াড়ি গুণনিধি দীপদান করে হল রাজা দম। আবার রাজা দম ঐ দীপদান করে হল দেবতার সমান। পেল অমরাবতীর মত অলকাপুরীর রাজত্ব।



দণ্ডনায়ক হরিকেশ

কাশী হল শিবের ক্ষেত্র—মহা পুণ্যধাম। জগতের বিধাতা দেবাদিদেব মহাদেব এখান থেকেই তাঁর অনুচরদের নিয়ে বিশ্বকে শাসন করছেন—বিশ্বেশ্বর। তাঁর এই কাজে যাঁরা সাহায্য করছেন তাঁদের মধ্যে দণ্ডপাণি হলেন প্রধান। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পুজোর আগে দণ্ডপাণির পুজো করতেই হবে, নইলে দেবাদিদেব তার পুজো নেন না। আবার দণ্ডপাণির ইচ্ছাই হল বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। এক রকম, কাশীতে দণ্ডপাণিই হল সব। এই পদ পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। অনেক কষ্ট স্বীকার করে, অনেক তপস্যা করে সেইভাবে তৈরি না হলে শিব চট করে এই পদে কাউকে বসান না। শিব কিন্তু হরিকেশকে বসিয়েছিলেন। তাই হরিকেশই হয়ে আছেন কাশীর দণ্ডপাণি। বিশ্বেশ্বরের হয়ে তিনিই সব কিছু করে চলেছেন। আবার এর সম্মান ঠিক ঠিক মত না রাখার জন্য মহাদেবের ছেলে হলেও কার্তিককে কাশী ছেড়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতে হয়েছিল।

গন্ধমাদন পর্বতে রত্নভদ্র নামে এক যক্ষ বাস করত। খুব ধার্মিক। পূর্ণভদ্র নামে তার এক ছেলে ছিল। পরিণত বয়সে রত্নভদ্র মারা গেলে ছেলে হলেন যক্ষরাজ। কোন কিছুর অভাব নেই। তবুও যক্ষ পূর্ণভদ্রের মনে শান্তি নেই। অনেক স্ত্রী তাঁর, কিন্তু একটিও ছেলে নেই।

যক্ষ পূর্ণভদ্র মনের দুঃখ আর চেপে রাখতে না পেরে যক্ষিণী কনককুণ্ডলাকে ডেকে একদিন সব বলল। একই দুঃখ কনককুণ্ডলারও।

কনককুণ্ডলা বলল—আপনাকে আর কি বলব? আপনি কি ভুলে গেলেন যে, বিশ্বেশ্বর কৃপা করলে সব কিছুই পাওয়া যায়।

সত্যিই তো! এ কথা পূর্ণভদ্রের এতদিন মনেই আসে নি।

যক্ষরাজ তখুনি ছুটলেন কাশীতে। দিন-রাত শুধু শিবের নাম-গান শুরু করলেন। একমাত্র ঘুমোবার সময়টুকু বাদে সব সময়েই পূর্ণভদ্রের মুখে শিবের নামগান। বিরাম নেই।

এভাবে বহু কাল কেটে গেলে বিশ্বেশ্বর তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিলেন। পুত্রলাভ হল। পুত্রের নাম রাখলেন হরিকেশ।

হরিকেশের তখন আট বছর বয়স। পূর্ণভদ্র দেখলেন, আর সব ছেলেদের মত দৌড়-ঝাঁপ, হুড়োহুড়ি না করে নির্জন জায়গায় চুপ করে বসে থাকে। দেখলেই মনে হবে, কোন এক চিন্তায় যেন বিভোর। কোন কোন দিন দেখেন, মাটির শিবলিঙ্গ গড়ে আপন মনে তাঁর মাথায় ফুল-বেলপাতা চাপিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছে।

পূর্ণভদ্র দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। এসব লক্ষণ তো ভাল নয়। এত কষ্ট করে ছেলে পেলেন। শেষে তাঁর ছেলে কি বিবাগী হয়ে যাবে? আরও ভয় পেয়ে গেলেন, যখন দেখতে আরম্ভ করলেন যে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তাঁর ছেলে শিব-নাম করছে, বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে।

একদিন ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে পূর্ণভদ্র দারুণভাবে তাকে আদর করলেন। বোঝালেন—বাবা, এখন ছেলেমানুষ বয়স। সব সময় কি ঐ শিব-শিব করলে চলবে। লেখাপড়া শিখে নিজেকে তৈরি কর। সংসার কর। ওসব তার পরে। তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে। আমাদের এত ঐশ্বর্য সবই তোমার জন্য।

হরিকেশ শুনল মাত্র। মনের বা আচরণের কিন্তু কোন পরিবর্তনই ঘটল না। বরং তন্ময়তা যেন আরো বেড়ে গেল।

বারবার বুঝিয়েও কিছু হচ্ছে না দেখে একদিন খুবই বকাবকি করলেন ছেলেকে। এবং যেদিন বকাবকি করলেন, তার পরদিন সকালে হরিকেশকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পূর্ণভদ্রের তখন সে কি আক্ষেপ! অমন যক্ষপুরী যেন শ্মশান হয়ে গেল।

হরিকেশ এদিকে সোজা বারাণসীতে এসে আনন্দকাননে নিশ্চিন্তে শিবের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল।

বারাণসীতে আনন্দকাননই হল শিবের প্রিয় স্থান। বিশ্বেশ্বর যেখানেই যান, আর যেখানেই থাকুন, আনন্দকাননে একবার না আসতে পারলে যেন শান্তি পান না।

বহুকাল পরে একদিন পার্বতীকে নিয়ে শিব এসেছেন আনন্দকাননে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পার্বতীকে দেখাচ্ছেন সব কিছু। পার্বতীও দেখছেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ পার্বতীর চোখ পড়ল একটা উই ঢিবির ওপর।

—প্রভু, এখানে এমন সুন্দর স্থানে উই ঢিবি কোথা থেকে এল? জিজ্ঞেস করেন উমা।

শঙ্কর যেন শুনেও শোনেন নি, এমন ভান করে অন্য আর এক কথা বললেন। শিবকে উমা খুব ভালই চিনতেন। বুঝলেন, নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে, নইলে শঙ্কর এভাবে এড়িয়ে যাবেন কেন?

পার্বতী তাই এবার চেপে ধরলেন শঙ্করকে—প্রভু, ঐ উইঢিবি এখানে কোথা থেকে এল, তা তো বললেন না।

যেন ব্যাপারটা কিছুই নয় এমনভাবে শঙ্কর বললেন—ও, পূর্ণভদ্রের ছেলে হরিকেশ। আমার তপস্যা করছে।

—তপস্যা করতে করতে ওর শরীরের মাংস উইপোকায় খেয়ে মাটি করে ফেলেছে দেখেও আপনি নির্বিকার রয়েছেন? পার্বতী অভিযোগ জানান শঙ্করকে।

—তুমি যদি বল, তাহলে ওকে বর দিই।

—সে কি কথা প্রভু? আমি কি কখনো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেছি? আহা, ছেলেটি অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে! বললেন পার্বতী।

শঙ্কর এবার মৃদু হেসে হরিকেশকে ছুঁলেন। ছোঁয়ামাত্রই উই-এর ঢিবি থেকে উঠে এল এক যুবক। কি সুন্দর আর সুপুরুষ!

নতুন শরীর নিয়ে হরিকেশ সামনে পার্বতীর সঙ্গে শঙ্করকে দেখে প্রণাম জানাল, স্তব-স্তুতি করল।

মহাদেব হরিকেশকে বর দিলেন—যে কঠোর তপস্যা তুমি করেছ, তাতে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়েছে। আমার এই কাশীর শাসনভার তোমারই হাতে রইল। আমার কোন অনুচর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে তুমি তাকেও শাসন করবে। তুমি হলের কাশীর দণ্ডপাণি, আমারই প্রতিনিধি।

তপস্যা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে হরিকেশ তার প্রমাণ দিয়ে সেই থেকে কাশীতে সকলের আগে পূজ্য হয়ে থেকে গেল।



বাল্মীকি ও এক পিশাচ

ত্রেতাযুগের কথা।

অঘ্রান মাস, হেমন্তকাল। কাশীতে মহামুনি বাল্মীকি বিমলোদক কুণ্ডে স্নান সেরে, আপাদমস্তক ভস্ম মেখে, কপর্দীশ লিঙ্গ নামে শিবের পুজো সেরে সবে একটু বসেছেন। হঠাৎ এক পিশাচ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বিকট দেখতে। শুকিয়ে খড়ি হয়ে যাওয়া শাঁখের মত কপাল, ফ্যাকাসে চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, নাকের গর্তদুটো বেশ চওড়া, তার ওপর সারা দেহ রোমে ঢাকা। দেখলেই আঁতকে উঠতে হবে।

মুনিবর তাকে দেখে কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না। বরং দেখে একটু অবাকই হলেন। কাশীতে এমন কোন পিশাচের তো ঢোকার কথা নয়।

বাল্মীকি জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কোথা থেকে আসছ? এমন দশাই-বা তোমার কেমন করে হল?

পিশাচ বলল—সে বড় দুঃখের কাহিনী। গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠান নামে যে নগর আছে, আমি সেখানেই থাকতাম। জাতে ব্রাহ্মণ। আমি ব্রাহ্মণের যা কাজ তা না করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতাম। যাত্রীরা যা দান দিত, হাত পেতে তা নিতাম। আর তাই দিয়েই আমার পেট চালাতাম। জানতাম এই ভাবে দান নেওয়া আমাদের মত ব্রাহ্মণের উচিত নয়, তবুও নিতাম। ফলে মরার পর আমাদের যা গতি, তা-ই হয়েছে। পিশাচ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও আমাদের কোন ঠাঁই-কুল নেই। খিদেয়, তেষ্টায় কাতর হয়ে যখনই খেতে গেছি, সামনে থেকেও খাবার যেন হাওয়ায় উবে গেছে। চোখের সামনে জল, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—কিন্তু কাছে গেছি, জলও শুকিয়ে গেছে। ওঃ, সে কি কষ্ট!

—তারপর?

—এভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, পিশাচ আবার বলতে শুরু করল—একদিন হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ যুবককে দেখলাম। গলায় পৈতে আছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের কোন কাজই সে করে না। দারুণ অনাচারী। আমি দেখলাম এই সুযোগ। নিজেকে কষ্টের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি তাকেই আশ্রয় করলাম। ফলে ও যখন খেত তখন আমারও খাওয়া হয়ে যেত। আমার কষ্টও অনেক কমে গেল। সেই ব্রাহ্মণ যুবকের এক বণিক বন্ধু দেশদেশান্তরে ব্যবসা করে বেড়াত। আর আমি যাকে ভর করেছিলাম, সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে সব কিছু আত্মসাৎ করত। বণিক-বন্ধুটি ব্যবসা করার জন্য বারাণসীতে আসছে শুনে ব্রাহ্মণ যুবকও তার সঙ্গ নিল। মহা পুণ্যক্ষেত্র এই বারাণসীতে কি পাপীরা ঢুকতে পারে? ওরা যখন বারাণসীতে ঢুকতে গেল ওদের ভেতরের পাপগুলো সব হা...হা করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ যুবকের দেহ থেকে আমাকেও বেরিয়ে যেতে হল। শিবের অনুচরদের যা কড়া পাহারা, তাতে আমরা এখানে ঢুকব সে সাধ্য কোথায়? যাই হোক, বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম এই ভেবে যে, আবার তো ফিরে আসবে, তখন আবার একটা গতি হবে।

বাইরে অপেক্ষা করে প্রায় তিন-চারদিন কেটে গেল। এদিকে খিদেয়-তেষ্টায় দারুণ কষ্ট। চারদিক ছোটাছুটি করেও খাবার কোথাও মেলে না। অসহ্য। আজ আর থাকতে না পেরে ঠিক করলাম, যাকে সামনে পাব তাকেই খাব। এইরকম ঠিক করে অপেক্ষা করছি, এমন সময় এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে দেখলাম। দেখামাত্রই আমি হাঁ করে তাকে খেতে গেলাম। সে বোধ হয় প্রাণের ভয়ে বারবার ডাকতে লাগল—শিব...শিব...শিব...।

শিবের নাম শুনতে শুনতে কি যে হল, সন্ন্যাসীকে তো খাওয়া হলই না, দেখলাম অনুচরদের চোখে যেন ধুলো দিয়ে আমি সোজা কাশীর ভেতরে ঢুকে পড়েছি। এদিকে সন্ন্যাসীও মন্দিরে চলে গেল।

বাল্মীকির সব প্রশ্নের উত্তর দিল পিশাচ। মুনিরও মন দুলে উঠল—আহা...হা।

পিশাচ বলল—আমার ভাগ্য খুবই ভাল, নইলে আপনার দেখা পেলুম কেমন করে? আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। মুনিবর, এই কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারছি না।

বাল্মীকি বললেন—তুমি আগে ঐ বিমলোদকের জলে স্নান করে এসো।

পিশাচ বলল—আমি মহাপাপী, ঐ জলে স্নান করার সাধ্য আমার নেই। বিশ্বাস করুন, কাছে গেলেই ঐ জল সরে যাবে।

মুনিবর শুনে ভাবলেন, কথাটা মিথ্যে নয়। তিনি তখন শিবের অতি প্রিয় ভস্ম দিয়ে তার কপালে তিলক এঁকে দিয়ে বললেন—এবার যাও, স্নান করে এসো।

পিশাচ এবার নিশ্চিন্ত মনে বিমলোদকরের জলে গিয়ে নামল। আকণ্ঠ জল খেল, স্নান করল প্রাণভরে।

তারপর যখন সেখান থেকে উঠে এল, তখন তার স্বাস্থ্য ও দেহের কান্তি দেখে কে বলবে, এই সেই বিকটাকার পিশাচ।

বাল্মীকি মুনি নিজেও ভাবতে পারেন নি বিমলোদকের জলের এত গুণ। তাই এই দেখে তিনিও কম আশ্চর্য হলেন না।

সেই থেকে বিমলোদক হয়ে গেল পিশাচমোচন তীর্থ।

এরপর কর্পর্দীশ শিবলিঙ্গের আরাধনা করে পিশাচ মুক্তি পেল। বাল্মীকিও শান্তি পেলেন।

মহাদেবের দানব-নিধন

কোন এক সময়ে কাশীতে জ্যেষ্ঠস্থানে মহাদেব উমাকে নিয়ে মনের সুখে ভাঁটা খেলছিলেন। খেলার মধ্যে একেবারে মজে গেছেন দুজনেই। অবিরাম লোফালুফি। উমা খেলায় এত আনন্দ পাচ্ছেন যে, হাসি-খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠেছেন। তাঁর লক্ষ্য শুধু মহাদেবের ছুঁড়ে দেওয়া ভাঁটার দিকে, অন্য কোনদিকে নয়।

এভাবে অনেকক্ষণ ধরেই তাঁরা খেলছেন। এমন সময় বিদল আর উৎপল নামে দুই দৈত্য আকাশপথে বিমানে বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে হাজির। দুই দৈত্যই দেব বরে বলীয়ান। যা খুশি তাই করে বেড়াত। তাই সকলেই তাদের দুজনকে বেশ সমীহ করে চলতেন।

উমাকে দেখে বিদল আর উৎপল ভাবল, যেভাবেই হোক তাকে হরণ করে আনতে হবে। কেননা, তারা জানত, শিব বড় শক্তিমান।

তাই দুজনে পরামর্শ করে দানব-রূপ ত্যাগ করে, গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা শিবেরই এক অনুচরের বেশ ধরল। মতলব—শিবের মনে কোন সন্দেহ জাগবে না, অথচ কাজও হাসিল করা হবে।

নিজেদের বুদ্ধির নিজেরাই খুব তারিফ করে শিব আর উমা যেখানে ভাঁটা খেলছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হল তারা। আর খেলা দেখতে দেখতে খুব তারিফ করতে লাগল।

দৈত্যরা তো আর জানে না যে, শিব শুধু শক্তিমান নন, একজন মহাযোগী। তাঁর চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুবই শক্ত।

খেলতে খেলতে একসময় মহাদেব উমাকে চোখের ইশারা করে দিলেন। উমাও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। আর সুযোগমত দুটো ভাঁটা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—লোফ তো।

ঐ ভাঁটা লুফবে সাধ্য কি দৈত্যদের। হাত বাড়াল বটে লোফবার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে দুটো আগুনের গোলা এসে পড়ল তাদের বুকে। গাছ বা মানুষের ওপর বাজ পড়লে যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবেই প্রাণ হারিয়ে শুকনো খড়ের মত লুটিয়ে পড়ল দু-জনেই।

বিদল-উৎপল খতম হয়েছে শুনে দেবতাদের সে কী আনন্দ!

আর একবার মহাদেবকে নিজের হাতেই উদ্যোগ নিতে হয়েছিল।

প্রহ্লাদের এক মামা ছিল—নাম দুন্দুভি-নির্হ্রাদ। তার বড় ইচ্ছে, দেবতাদেরও সে অধিপতি হবে। দল-বল, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অনেকবার যুদ্ধ করল। কিন্তু দেবতাদের কোনমতেই হারাতে পারল না। দেখল, প্রত্যেক দেবতাই দারুণ বলশালী। তখন অনেক ভেবে-চিন্তে দুন্দুভি-নির্হ্রাদ ঠিক করল, ভাল ভাল খাদ্য খেয়েই দেবতাদের এই বল, সুতরাং হাতে মারার আগে ওদের পেটে মারতে হবে। তাহলেই একসময় দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন ওঁদের জয় করা মোটেই শক্ত হবে না।



ঠিক করে দৈত্য সন্ধান নিতে লাগল, দেবতারা কি খান। সন্ধান নিতে নিতে দেখল, ব্রাহ্মণরা শুদ্ধাচারে থেকে, বেদে যেভাবে লেখা আছে, সেভাবে এক এক দেবতার আহ্বান জানায়। তারপর যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বেলে ভাল ভাল সব জিনিস তাঁদের উদ্দেশে আহুতি দেয়। দেবতারা তা-ই খান, আগুনের মুখ দিয়ে।

সব ব্যাপারটা আরও ভালভাবে তলিয়ে দেখল দৈত্য—ব্রাহ্মণরা বেদের নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ করে। সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণরা নানা পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আহুতি দেয়। আগুনের মুখ দিয়ে দেবতারা তাই খেয়ে এত বলবান। তাহলে দেবতাদের পেটে মারতে হলে আগে ব্রাহ্মণদের হাতে মারতে হবে। ব্রাহ্মণদের যদি মারা যায়, তাহলে বেদের নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যজ্ঞ বন্ধ হলেই দেবতারা না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং দৈত্য ঠিক করল, আগে যেখানে যত ব্রাহ্মণ আছে, তাদের খতম করতে হবে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যের কাজও শুরু হয়ে গেল। যেখানে যত ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করত, তারা মারা পড়তে লাগল। ছুটকো-ছাটকা গোটাকয়েক ব্রাহ্মণকে মেরে দৈত্য ভাবল, এরা তো সব চুনোপুঁটি। আগে রাঘব-বোয়ালদের শেষ করতে পারলে এরা আর কতক্ষণ।

নিয়মিত বেদ পাঠ করে, বেদের নিয়ম অনুযায়ী যাগযজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের এমন শক্ত ঘাঁটি কোথায় আছে খুঁজতে খুঁজতে দৈত্য এসে দেখল সেই জাতের সবকটা ব্রাহ্মণ এসে ঘাঁটি গেড়েছে কাশীতে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল, কি তাদের বেদ পড়ার ঘটা, আর যজ্ঞের কি ধুম! দিনরাত কুণ্ডে আগুন জ্বলছে তো জ্বলছেই, আর হোম হচ্ছে তো হচ্ছেই। দেখে দাঁত কড়মড় করে উঠল দৈত্যের। তাহলে দেবতাদের বেশির ভাগ রসদ যোগাচ্ছে এখানকার এই ব্রাহ্মণরা। তাহলে আগে এদেরই নিকেশ করা যাক।

দৈত্যরা মায়াবী। ইচ্ছেমত তারা রূপ ধরতে পারত। ভেবেচিন্তে দুন্দুভি-নির্হ্রাদ বাঘের রূপ ধরল। ওৎ পেতে বসে রইল বনে। সমিধ আহরণের জন্য ব্রাহ্মণ বালকরা যখন বনে যেত তখন আচমকা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। বালকদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণরা খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পেতেন না, এমন কি বাঘকে দেখতেন না। নদীতে স্নান করছেন ব্রাহ্মণরা, যেমন নিত্য স্নান করেন—হঠাৎ একদিন জলের তলায় তলিয়ে গেলেন। কিভাবে যে তলিয়ে গেলেন তা কেউ বুঝতে পারত না।

বনে-জলে এভাবে প্রতিদিনই বেশ কিছু করে ব্রাহ্মণ হারিয়ে যেতে লাগল। কিছুতেই কিছু বুঝতে পারে না ব্রাহ্মণরা, কিভাবে এই সব ঘটছে। বেশ ভয় জাগল সবার মনে। বন থেকে সমিধ আনা কমে গেল। সমিধ না হলে যজ্ঞ হবে না। তাই যজ্ঞের আহুতিও কমতে শুরু করল। দৈত্যের সাহস আরো বেড়ে চলল। ব্রাহ্মণরা যেসব ঘরে বসে জপ-ধ্যান করত, দুন্দুভি-নির্হ্রাদ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে একে একে সেই সব ঘরে ঢুকে জপের ভান করে বসে দেখে নিত ঢোকবার আর বেরোবার পথ। যেই রাত নামত, বাঘ হয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের ওপর। পরিত্রাহি চিৎকার করেও পরিত্রাণ পেত না ব্রাহ্মণরা। এভাবে কত যে ব্রাহ্মণ মারা গেল, তার আর শেষ নেই। এখনও অনেক ব্রাহ্মণ বাকি। সবাইকে শেষ করে তবে তার ছুটি।

সেদিন ছিল শিবরাত্রি।

এক ব্রাহ্মণ নিজের ঘরে বিশ্বেশ্বরের পুজো-হোম সেরে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন, হঠাৎ দুন্দুভি-নির্হ্রাদ বাঘের রূপ ধরে বন্ধ দরজা ঠেলে হালুম করে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। ব্রাহ্মণের ধ্যান ভেঙে গেল। প্রাণভয়ে তিনি ডাকতে লাগলেন মহাদেবকে।

দৈত্যটা বুঝতেও পারে নি যে, তার ডাকাডাকিতে কেউ আসতে পারে। তাই সে নির্ভয়েই দাঁত বের করে পা-পা করে ব্রাহ্মণকে খাবার জন্য যেই গেল, হঠাৎ দেখল, পেছন থেকে কে যেন এসে তাকে সবলে জাপটে ধরল।

অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখে প্রায় উলঙ্গ জটাজুট এক পুরুষ। চোখ দিয়ে যেন তাঁর আগুন বেরোচ্ছে।

দুন্দুভি-নির্হ্রাদ দেখেই বুঝল, এ আর কেউ নন মহাদেব নিজে। হোন মহাদেব, সেই-বা কম কিসে!

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের রূপ ছেড়ে বিশালাকার দৈত্যের আকার ধরে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে গর্জন করে উঠল—তাহলে আজ আগে তোমার সঙ্গেই হয়ে যাক।

এই বলে দুন্দুভি-নির্হ্রাদ আর একবার সারা কাশী কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল।

ব্রাহ্মণ তখন সরে গেছে ঘরের এক কোণে। এক চোখে তার জল, আর এক চোখে আনন্দ।

মহাদেব মুচকি হেসে বললেন—বেশ তো অসুর, আগে আমাকেই কাত কর, তারপর না হয় ঐ বেচারাকে দেখো।

মহাদেবের কথা শেষ হবার আগেই বিশাল এক পাহাড় যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাদেবের ঘাড়ে। আর মহাদেবও চকিতে তাকে বগলদাবা করে শূন্যে তুলে নিলেন—যেন প্রচণ্ড বলশালী কেউ কাঠের একটা গুঁড়ি তুলে নিল। তারপর তাকে এমন চাপ দিতে লাগলেন যে, এই বুঝি দৈত্যের প্রাণ বেরিয়ে যায়। চাপের চোটে দুন্দুভি চেঁচাতে শুরু করল। আর্তনাদ শুনে কাশীর যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এসে দেখে হতবাক। বুঝতে অসুবিধে হল না এই দৈত্যই এতদিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানকার সব ব্রাহ্মণকে মেরেছে। আর স্বয়ং মহাদেব তাকে নিধন করে তাঁদের রক্ষা করতে এসেছেন। দেখে ভক্তি-শ্রদ্ধায় সকলের মাথা নুয়ে পড়ল।

এদিকে দানব দুন্দুভি-নির্হ্রাদও চাপ আর সহ্য করতে না পেরে মারা গেল। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নতুন করে নির্ভয়ে আবার কাশীতে বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞ শুরু হল।

আরও একবার কাশীতে বসে মহাদেব কাশীর মাহাত্ম্যকথা শোনাচ্ছিলেন পার্বতীকে। হঠাৎ চারদিক থেকে যেন কিসের শব্দ কানে এল।

কি ব্যাপার?

ভালভাবে কান পেতে শুনলেন, প্রাণের ভয়ে সারা কাশী যেন আর্তনাদ করছে—বাঁচান...বাঁচান...।

অবাক হয়ে পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন—প্রভু, কি এমন হল যে, এখানে সবাই এমন আর্তনাদ করে উঠছে?

মহাদেব বললেন—সে কথা তো আমিও ভাবছি। আমার এত সব অনুচর থাকতে কে এমন এখানে এসে উৎপাত আরম্ভ করল?

বলতে না বলতেই দেখলেন, বিশালকায় এক দৈত্য উন্মাদের মত ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। যেমন বিশাল শরীর, তেমনি বিকট দেখতে। অনুচররা আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে আটকাতে। কিন্তু সাধ্য কি যে আটকায়।

মহাদেব এক পলক দেখে নিয়েই বুঝতে পারলেন অসুরটি কে। দেখে একটু মুচকি হাসলেন মাত্র।

পার্বতী কিন্তু বুঝতে পারলেন না। মহাদেবকে তার ওপর মুচকি হাসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—প্রভু, আপনি হাসলেন যে? ঐ অসুরটি কে?

মহাদেব বললেন—মহিষাসুরের ছেলে গজাসুর। জান পার্বতী, কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে ও বর পেয়েছিল, সংসারী কোন মানুষ বা দেবতার হাতে মরবে না। তাই ও সকলের কাছেই অবধ্য থেকে এখন এখানে এসেছে আমার কাশীকে ধ্বংস করতে।

পার্বতী সব শুনে বললেন—সংসারী তো আমরাও। আমরাও তো ছেলেপুলের মা-বাবা। তাহলে এখন উপায়?

পার্বতীর কথা শুনে মহাদেব বললেন—তা যা বলেছ। তবুও দেখি কি করা যায়।

ইতিমধ্যে তর্জনে-গর্জনে চারদিক কাঁপিয়ে গজাসুর খুব কাছাকাছি এসে যেই মহাদেবকে ধরতে যাবে, অমনি মহাদেব ত্রিশূল তুলে তার বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিলেন। তারপর তাকে সোজা শূন্যে

তুলে ফেললেন।

গজাসুর সেই অবস্থাতেই শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে বলল—দেখলাম, ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তুমি ছাড়া আর সবাই কামুক, লোভী। তা নইলে তুমি আমাকে এভাবে বিঁধতে পারতে না। তবুও বলব, তুমিও কিন্তু আমার কাছে হেরে গেছ।

মহাদেব বললেন—কি রকম?

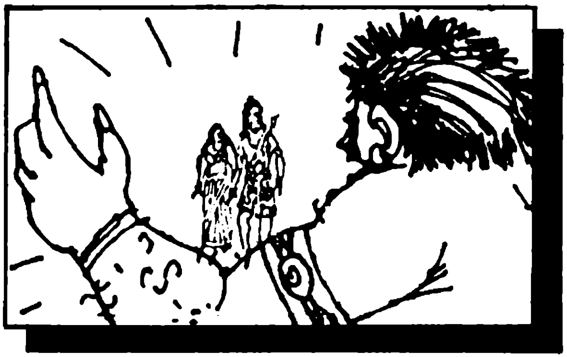
—তোমার মাথার ওপর আমি কেমন ছাতা হয়ে আছি।

—বাঃ, সুন্দর কথা বলেছ গজাসুর। আমি খুব খুশি হয়েছি। বর নাও।

গজাসুর বলল—বর যদি চাও, তাহলে আমার একটাই প্রার্থনা।

—কি প্রার্থনা, বল।

—উলঙ্গ হয়ে তোমার আর থাকা চলবে না। আমার গায়ের ছাল তোমাকে পরতে হবে। গজাসুর বলল।



—না বাপু, ঐ নোংরা চামড়া (শুদ্ধ ভাষা 'কৃত্তি') আমার পক্ষে পরা সম্ভব নয়।

—মহাদেব! গজাসুর বলল—আমার এই গায়ের চামড়া এতদিন নোংরা ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন আর তো নোংরা নয়। তোমার ত্রিশূল একে মহা পবিত্র করে দিয়েছে।

গজাসুরের কথা শুনে মহাদেব খুব খুশি হলেন। বললেন—তোমার প্রার্থনা অবশ্যই আমি পূরণ করব।

এই বলে ত্রিশূল নামিয়ে গজাসুরের দেহ থেকে চামড়া (কৃত্তি) খুলে নিয়ে নিজের কোমরে জড়িয়ে নিলেন।

সেই থেকে মহাদেবের আর এক নামই হয়ে গেল 'কৃত্তিবাস'।



শৈলেশ্বর-লিঙ্গ প্রসঙ্গ

ব্রহ্মার পরামর্শেই পর্বতরাজ হিমালয় তাঁর আদরের মেয়ে উমার সঙ্গে শিবের বিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা বলেছিলেন—শিব হল ঈশ্বর। তোমার মেয়ে খুবই সুখী হবে।

ব্রহ্মা হলেন সর্বজ্ঞ। তাঁর কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। তাই বিনা বিচারেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। জামাইকে দেখে পার্বতীর মা মেনকা কিন্তু একটুও খুশি হতে পারে নি। রূপে-গুণে অতুলনীয় তাঁর অমন মেয়ের ভাগ্যে শেষে জুটল প্রায় ভিখারি এক বর! ভিখারি ছাড়া আর কি! না আছে ধনদৌলত, না আছে মাথা গোঁজার মত চাল-চুলো।

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন ঘর-জামাইয়ের মত ছিলেন শিব। তারপর উমাকে নিয়ে একদিন যে কোথায় চলে গেলেন তা জানতেও পারলেন না শ্বশুর-শাশুড়ী। শুধু শুনলেন, বরণা নদীর ধারে নাকি গিয়ে ঘর বেঁধেছে জামাই।

আগে কাছাকাছি ছিল মেয়ে। বলতে গেলে প্রায় চোখের সামনেই। মা-বাবা তাঁদের ইচ্ছেমত আদরের মেয়েকে দেখতে পেতেন। এখন আর চোখের সামনে নেই তাদের দেখতেও পান না। না জানি কেমন আছে তাঁদের ভিখারি জামাই, কেমনভাবে রেখেছে তাঁদের মেয়েকে। মায়ের মন তো! মাঝে মাঝেই মন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে মেয়ের জন্য। খোঁচা দেন স্বামীকে—যাও না গো। একবার খোঁজ নিয়ে দেখ কোথায় আছে, কেমন আছে।

মেনকার আকুলি-বিকুলি দেখে, পর্বতরাজ হিমালয়েরও মন খারাপ হয়ে যায়। ব্রহ্মার মুখে জামাই-এর নাম ঈশ্বর আর তাঁর অনেক প্রশংসা শুনে বিয়ে দিতে গিয়ে দেখেছিলেন, নামেই সে ঈশ্বর। যত রাজ্যের অপদার্থরা তার অনুচর। ব্যোম-ব্যোম করে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়, কোন কাজ-কর্ম করে না। মনকে সান্ত্বনা দেন—মেয়ের ভাগ্য। মনে মনে ঠিকও করেছিলেন, মেয়েকে যখন অমন এক নিষ্কর্মার হাতে তুলেই দিয়েছেন, তখন যাতে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ভালভাবে থাকতে পারে, তারও একটা বন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু তার আগেই কোথায় যে চলে গেল সব!

সত্যিই মেনকার কথা ফেলা যায় না। একবার দেখা দরকার।

মন স্থির করে ফেললেন হিমালয়। রাশি রাশি হীরে, জহরত, মণি-মুক্তো, নানা রকমের গোমেদ, পলা, নানা রকমের সুগন্ধি দ্রব্য জড়ো করে অসংখ্য দাসদাসীর মাথায় চাপিয়ে পর্বতরাজ একদিন মেয়েকে দেখতে বের হলেন। ইচ্ছে, এগুলি সব তাঁর মেয়েকে দিয়ে আসবেন যাতে তাঁর কোন কষ্ট না থাকে।

যেতে যেতে একদিন পর্বতরাজ এলেন বরণার তীরে। তখন প্রায় বিকেল। সন্ধ্যা নামতে কিছু দেরি। ভাবলেন, আজকের রাতটুকু এখানে কাটিয়ে পরদিন সকালেই মেয়ে-জামাইয়ের খোঁজ নেবেন। পর্বতরাজের কথামত রত্নরাজি সব সেখানে নামিয়ে দাসদাসীরা বিশ্রাম নিতে গেল।

পর্বতরাজ দেখলেন, বরণার তীরে সুবিশাল এক নগরী। নগরীর মাঝে বিরাট এক প্রাসাদ। রাজ্যের যত দামি দামি দুষ্প্রাপ্য মণি-মাণিক্য ঝলমল করছে প্রাসাদের গায়ে। এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

প্রাসাদ দেখে পর্বতরাজের মনে কৌতূহল জাগে, এ কার প্রাসাদ? সবচেয়ে ধনশালী হলেন কুবের। কিন্তু এই প্রাসাদে যা আছে, তা কুবেরকেও হার মানায়। বৈকুণ্ঠেও এমন প্রাসাদ নেই। কার এটি? কে এত বড় ভাগ্যবান, ঐশ্বর্যবান? জানবার জন্য পর্বতরাজের মন ছটফট করে ওঠে।

এমন সময় সেখান দিয়ে গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা এক সন্ন্যাসীকে যেতে দেখে পর্বতরাজ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এই যে শুনছেন, এই নগরীর কি নাম? এই প্রাসাদ কার? কে থাকেন এখানে?

প্রশ্ন শুনে সন্ন্যাসী যেন থ হয়ে পর্বতরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন—আপনি কে, তাও জানতে চাই না। কোথা থেকে আসছেন, তাও জানতে চাই না। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সবাই যা জানে আপনি তা জানেন না দেখে আমার বড় অবাক লাগছে।

বেশ খানিকটা অপ্রস্তুতে পড়েন পর্বতরাজ। বলেন—সত্যিই আমি জানি না। নইলে জিজ্ঞেস করব কেন?

সন্ন্যাসী বললেন—আপনি হর-পার্বতীর নাম শুনেছেন? এই প্রাসাদ তাঁদেরই! স্বয়ং বিশ্বকর্মা এই প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছেন। এর নাম বারাণসী।

হর-পার্বতীর নাম শুনেই পর্বতরাজের গায়ে রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। তাঁর মেয়ে-জামাই—তাঁদের এই প্রাসাদ। এ যেন ভাবতেও অবাক লাগে। কোন রকমে নিজেকে চেপে রেখে পর্বতরাজ জিজ্ঞেস করেন—হর-পার্বতী! আমি তো ঠিক মনে আনতে পারছি না।

সন্ন্যাসী বলেন—গিরিরাজ হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী আর তাঁর জামাই ঈশ্বরকে আপনি মনে আনতে পারছেন না? আপনি কোন দেশের মানুষ?

পর্বতরাজ নিজেকে সংযত রেখেই বলেন—হয়ত আমার ভুল হতে পারে। কোথায় থাকতেন এঁরা? প্রাসাদ তো দেখে মনে হচ্ছে নতুন। কবে এলেন?

সন্ন্যাসী বললেন—এতদিন ছিলেন মন্দিরে। ওখানকার রাজা দিবোদাস মারা যাবার পর সম্প্রতি এসেছেন। ঈশ্বর পার্বতীকে নিয়ে এখানে আসছেন শুনে, আর বিশ্বকর্মা তাঁর থাকার জন্য প্রাসাদ তৈরি করে দিচ্ছেন জেনে, যার যেখানে যা কিছু ছিল, সব এনে উজাড় করে দিয়েছে। এমন কি, লঙ্কার রাজা রাবণ সুমেরু পাহাড় থেকে প্রচুর সোনা আনিয়ে দিয়েছে। তা স্তূপ হয়ে আছে প্রাসাদের ভেতর। নানারকম মণি-মাণিক্যের তো কথাই নেই। বিশ্বকর্মাও সেসব দিয়ে মনের মত করে এমন প্রাসাদ তৈরি করেছেন, ব্রহ্মাণ্ডে যার দ্বিতীয় নেই। আপনি এসব কিছুই জানেন না দেখে সত্যিই আমি অবাক হচ্ছি।

এই বলে সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

তাঁর মুখে মেয়ের সৌভাগ্যের কথা শুনে পর্বতরাজের বুক ফুলে উঠল। সেই সঙ্গে দারুণ লজ্জায় পড়লেন। জামাই ঈশ্বর যে তাঁর শুধুমাত্র নামে ঈশ্বর নন, সত্যিকারের রাজাধিরাজ, বুঝতে পেরে পর্বতরাজ এবার মনে মনে খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেন এই বলে যে, এত দিন ধরে তাঁর জামাইকে তিনি চিনতে পর্যন্ত পারেন নি! মেয়েকে জলে ফেলে দিয়েছেন বলে আক্ষেপ করছিলেন। আবার সাহায্য করার জন্য এই সব নিয়ে আসছিলেন! তাঁর সঙ্গে যা আছে ঐ প্রাসাদের তুলনায় তার দাম যে কিছু নয়। মেয়েকে একবার দেখবার জন্য মন ছটফট করে উঠলেও পর্বতরাজ ঠিক করলেন, এখন নয়। এই সামান্য জিনিস নিয়ে কোন মুখে তিনি মেয়ে-জামাই-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন।

সন্ন্যাসী চোখের আড়ালে চলে যেতেই তিনি দাসদাসীদের ডাকলেন। বললেন—শোন, ভোর হবার আগেই এখানে শিবের মন্দির তৈরি করে ফেল।

পর্বতরাজের আদেশ। দাসদাসীরাও তেমনি চটপটে। রাতের মধ্যেই অপূর্ব এক শিব মন্দির তারা তৈরি করে ফেলল। গিরিরাজ তার ভেতর চন্দ্রকান্ত মণির অতি মনোহর এক অপরূপ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। সঙ্গে যত মণিরত্ন এনেছিলেন, তা মন্দিরের এক পাশে স্তূপ করে ফেলে ভোর হবার আগেই ফিরে গেলেন নিজের প্রাসাদে। কেউ কিছু জানতেও পারল না। পর্বতরাজের মুখে মেয়ের সৌভাগ্যের কথা যখন মেনকা শুনলেন, তখন তাঁর সে কি আনন্দ!

সকাল হয়েছে।

প্রতিদিনের মত শিবের দুই অনুচর হুণ্ড আর মুণ্ড বরণার তীরে এসেছে স্নান করতে। এসে ঐ শিব মন্দির, তার পাশে অঢেল মণিরত্নের স্তূপ ঠিক শিবলিঙ্গের মত সাজানো দেখে তো অবাক। গতকালও তো এখানে এসব ছিল না। আর আজ!

—হুণ্ড, কি ব্যাপার বল তো? জিজ্ঞেস করে মুণ্ড।

—সে তো আমিও বুঝতে পারছি না। বলে হুণ্ড—চল, প্রভুকে বলি গে।

স্নান আর হল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তারা এসে হর-পার্বতীকে সেই অদ্ভুত খবরটা শোনাল।

শুনে মহাদেব বললেন—তাই নাকি? তাহলে তো একবার দেখতে হয়। চল উমা, একবার দেখেই আসি।

পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেব সেখানে এলেন। সত্যিই অপূর্ব এক মন্দির। মন্দিরের মাথায় আবার খোদাই করে কি যেন লেখা। পড়লেন মহাদেব। লেখা রয়েছে শিবের প্রশস্তি।

মন্দির দেখে পার্বতীও খুশি। তার চেয়েও বেশি খুশি হলেন চন্দ্রকান্ত লিঙ্গ দেখে। মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার তো অজানা কিছুই নেই। বলুন না, কে এসে এখানে মন্দির তৈরি করে গেল। এত মণিরত্নই-বা কে রেখে গেল?

পার্বতীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন মহাদেব। বললেন—তোমার বাবা।

—আমার বাবা? পার্বতী শুনে অবাক হলেন—আমার বাবাই যদি হবেন, তাহলে এত কাছে এসেও আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে গেলেন কেন?

—পার্বতী, তোমার বাবা তোমার ঐশ্বর্য দেখে খুবই লজ্জায়



পড়ে, যা কিছু এনেছিলেন তোমাকে দেবেন বলে, সব এখানে রেখে এই মন্দির তৈরি করে চলে গেছেন।

শুনে পার্বতীর মন খারাপ হয়ে গেল। কতদিন যে মা-বাবাকে তিনি দেখেন নি!

মহাদেব বললেন—পার্বতী, বুঝতে পারছি, বাবার জন্য তোমার মন কেমন করে উঠেছে। দেখা হবে। তার আগে তোমাকে যে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ?

—দেখছ তো তোমার বাবার মণিরত্নগুলো খোলা আকাশের নীচে কেমন লিঙ্গের মত পড়ে আছে। ওর সঙ্গে দেখ, সোনাও রয়েছে। ঐগুলো নিয়ে তোমার অনুচরদের দিয়ে একটা মন্দির ওর ওপর তৈরি করে দাও। তাহলে তোমার বাবার অনেকখানি কাজ হবে।

পার্বতীও সঙ্গে সঙ্গে সোমনন্দী প্রমুখ ছেলেদের ডেকে সোনার মন্দির দিয়ে ঢেকে দিলেন সেই অঢেল রত্ন। তারপর ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে।

শৈলেশ্বর লিঙ্গ আর তার পাশে এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ হর-পার্বতীর খুবই প্রিয় হয়ে উঠল।



দমন-গর্গ সংবাদ

বারাণসী হল শিবের ধাম। সেখানে মহাদেব থাকেন লিঙ্গের আকারে। এক এক লিঙ্গের এক এক নাম—কেদারেশ্বর, শৈলেশ্বর, রত্নেশ্বর। এই রকম আরো কত...কত নাম।

এই রকমই এখানে প্রণবেশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছে।

একসময় ব্রহ্মা যখন এখানে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন মাটি ভেদ করে জ্যোতির্ময় এই লিঙ্গ আপনা-আপনি উঠে এসেছিল। আর ব্রহ্মা তার মধ্যে আদিদেব শঙ্করকে দেখে কৃতার্থ হয়েছিলেন।

প্রণবেশ্বর লিঙ্গের অসীম ক্ষমতা। শিবের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে কেউ যদি এই শরীরের মুক্তি চায়, তাহলে মন-প্রাণ দিয়ে এই লিঙ্গের পুজো করলে তা অবশ্যই পায়। একথা যে মিথ্যে নয়, তা একমাত্র জানতেন গর্গ মুনি।

ঋষি ভরদ্বাজের এক ছেলে ছিল। তার নাম দমন।

খুব ছোট বয়সেই সে বুঝে ফেলল এই সংসার অসার। শুধু মায়ায় ভরা। এখানে আদৌ শান্তি নেই। তার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হল নানা ধর্মগ্রন্থ পড়তে পড়তে। সে ঠিক করল, শান্তি পেতে হলে এই সংসারে থাকলে চলবে না।

সংসার ছেড়ে দমন বেরিয়ে পড়ল সন্ন্যাসী হয়ে। ঘুরে বেড়াতে লাগল তীর্থে তীর্থে। কোটি কোটি মন্ত্র জপ করল নির্জন স্থানে বসে, শাস্ত্রে যে রকম নিয়ম আছে। ঠিক ঠিকভাবে সেই সব নিয়ম মেনে তপস্যা করল বহুদিন ধরে। মহা মহা পণ্ডিতদের কাছে গিয়ে নানা উপদেশ নিয়ে সেভাবে চলতে লাগল, কিন্তু শান্তি আর কিছুতেই পায় না।

মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে প্রকৃত শান্তি বলে কি কিছুই নেই? আবার ভাবে, নিশ্চয় আছে। শান্তি আছে, মুক্তি আছে। নইলে সব যে মিথ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় গেলে তা পাওয়া যাবে?

হাল ছাড়ল না দমন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগল, সে যা চায়, তা পাবার জন্য।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন দমন এল অমরকণ্টক তীর্থে।

সেখানে এসে দেখল, অতি বৃদ্ধ এক আচার্যকে ঘিরে বেশ কিছু শিষ্য বসে একমনে ধর্মালোচনা শুনছে। সকলেরই গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা—শিবভক্ত।

কিশোর দমন সেই বৃদ্ধ আচার্যের সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াল। তাঁকে দেখেই দমনের কেন যেন মনে হয়েছিল, প্রকৃত পথের সন্ধান ইনিই ইচ্ছে করলে দিতে পারবেন।

এই বৃদ্ধ আচার্যের নাম গর্গ।

কিশোরকে দেখে গর্গ জিজ্ঞেস করলেন—কি চাই তোমার, বাবা? কি নাম তোমার? দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব বিষণ্ণ।

দমন বলল—আমার নাম দমন। আমি ভরদ্বাজ মুনির ছেলে। প্রকৃত শান্তি আর মুক্তি পেতে চাই।

গর্গ বললেন—কেন, সংসার কি তোমার ভাল লাগছে না? এত অল্প বয়সে সংসারের ওপর এমন বিরাগ কেন?

—কেন তা বলতে পারব না। বলল দমন—আমার কেবলই মনে হচ্ছে এই সংসার মায়ায় গড়া। এই জীবনটাও সেদিক থেকে বড় ঠুনকো। আমি এই দেহেই মুক্তি পেতে চাই। আমাকে দয়া করে তার পথ বলে দিন।

—বাঃ! এত অল্প বয়সে তুমি যে সার-সত্য বুঝেছ, এতে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি দমন। বললেন গর্গ মুনি—দেখ বাছা, এই সংসারে এই দেহে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব। বারাণসীতে তিনি আছেন প্রণবেশ্বর লিঙ্গ নামে। মন-প্রাণ দিয়ে সেই লিঙ্গের অর্চনা করলে তুমি যা চাইছ তাই পাবে।

—পাব? শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে দমন।

—আমার স্থির বিশ্বাস, পাবে। বলে গর্গ মুনি বললেন—তাহলে শোন আমার আচার্যদের মুখে শোনা সেই অপূর্ব কাহিনী। আমার আচার্যরা তা নিজের চোখে দেখেছেন। প্রণবেশ্বর লিঙ্গের কাছে একটা ব্যাঙ থাকত। ভক্তেরা ফুল-মালা আর আতপ চাল দিয়ে লিঙ্গের পুজো করে চলে গেলে সে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে সেই সব খেত। হতভাগা তো জানত না, আতপ চাল খাওয়া গেলেও তাঁর উদ্দেশে দেওয়া ফুলমালা খাওয়া বিষ খাওয়ার সমান। একদিন এই রকম ভাবে ব্যাঙ বেরিয়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, কোথা থেকে এক কাক এসে তাকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল। ব্যাঙ গেল কাকের পেটে। কিছুকাল পরে আচার্যরা দেখলেন, অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে খুব কম বয়সেই এসে হাজির হয়েছে প্রণবেশ্বর লিঙ্গের কাছে। তার সব কিছুই স্বাভাবিক, কেবল মুখটা বাদে। তার মুখটা দেখতে ছিল শকুনের মত। হলে কি হবে, নাচে-গানে অদ্ভুত। কে এই

মেয়ে? কেমন করেই-বা এমন হল, আচার্যরা অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। দেখলেন এই মেয়েটি আর কেউ নয়, সেই ব্যাঙ। এই জন্মে পুষ্পবটু নামে এক ভক্তের ঘরে তার মেয়ে হয়ে জন্মেছে। মুখটা ঐ রকম হয়েছে তার কারণ, ঐ ফুল-মালা আর আতপ চাল খাওয়ার পাপে। পূর্বজন্মের সংস্কার। তাই এ জন্মেও সে অল্প বয়সেই বাড়ি থেকে চলে যাবার পর মন্দির ধুয়ে-মুছে তকতকে করে ফেলত, আর কেউ না থাকলে নাচে-গানে শিবের প্রশস্তি করত। এই রকম করতে করতে এক সময় এমন হয়ে গেল যে, বাইরের সব কিছু ভুলে গেল। এই সংসারে তার ঐ প্রণবেশ্বর লিঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নেই, আর শিবের বিভিন্ন নাম ছাড়া অন্য কিছু সে জানে না। মেয়েটার নাম ছিল মাধবী। বৈশাখ মাস। চতুর্দশী তিথি, মাধবী সেদিন উপবাস করে রাত জেগে নাচে-গানে লিঙ্গের পুজো করল আচার্যদের সামনে। সকাল হয় হয়। আচার্যরা দেখলেন, হঠাৎ লিঙ্গ থেকে উঠে এল এক চোখ-ধাঁধানো আলো। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সাধ্য কার? এক লহমামাত্র। চোখ খুলতেই আচার্যরা আর আশেপাশে কোথাও মাধবীকে দেখতে পেলেন না।

আচার্যদের মুখে শোনা এই ঘটনার কথা গর্গ মুনি দমনকে শুনিয়ে বললেন—দমন, আমার স্থির বিশ্বাস, একমাত্র ঐ লিঙ্গই তোমার আশা পূরণ করতে পারবেন। তুমি বারাণসীতে যাও।

দমন তখনই বারাণসীর পথ ধরল। বাধা দিলেন গর্গ মুনি—দমন দাঁড়াও, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—এই বয়সে এতটা পথ যাবেন কেমন করে? জিজ্ঞেস করে দমন।

—বৃদ্ধ হয়েছি ঠিকই, অতি বৃদ্ধ। তবুও তাঁর কৃপায় এখনও অশক্ত হয়ে পড়ি নি।

যাই হোক, দুজনেই এলেন বারাণসীতে প্রণবেশ্বর লিঙ্গের কাছে।

লিঙ্গ দেখেই দমনের মন-প্রাণ যেন ভরে গেল।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই মাধবী মেয়ের মতই লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসা আলোর সঙ্গে সে মিশে গেল।

অগস্ত্য যাত্রা

বিন্ধ্য পর্বত। যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়। ভূমণ্ডলে যত পাহাড় আছে, বোধ হয় এর কাছে তারা সবাই ছোট। তার ওপর কি বনজ সম্পদ, কি পাথুরে সম্পদ—মণি-মুক্তো, সোনা-দানা! তাও অঢেল।

কি নেই এই পাহাড়ে? তাল, তমাল, হিন্তাল, বট-অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, কদম্ব, ধুতরো থেকে রুদ্রাক্ষ, কি গাছ নেই এই পাহাড়ে? নারকেল, খেজুর, নিম, অর্জুন অঢেল। আর ফুল গাছ? তারও শেষ নেই। হীরে-পান্না-মণির তো কথাই নেই।

মহর্ষি নারদের একবার খুব ইচ্ছে হল বিন্ধ্য পর্বত দেখতে। তিনি এসেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেনও। সত্যিই, বিন্ধ্য পর্বতের সম্পদের শেষ নেই।

নিজের সম্বন্ধে বিন্ধ্যের মনেও খুব গর্ব। সে-ও জানে, তার মত পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আর কোন পর্বত নেই। এক সঙ্গে এত সম্পদ কোন পর্বতেই নেই। পৃথিবীর মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, সে একাই মেটাতে পারে। তবু কেন যে সবাই তাকে পর্বতরাজের সম্মান দেবে না, ভেবে পায় না।

হঠাৎ নারদকে দেখে বিন্ধ্য উল্লসিত হয়ে উঠল। দেবর্ষি নারদ নিজে এসেছেন। বুক তার ফুলে উঠল। যথেষ্ট উপঢৌকন দিয়ে বিন্ধ্য দেবর্ষিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—যাক, আমি যে সত্যিই 'ধরাধর পর্বতরাজ' আপনি আসাতে তা বুঝলাম।

কথাটা নারদের কানে খট করে লাগল। বিন্ধ্য তাঁর সামনে আত্ম-জাহির করছে। কারো অপেক্ষা না রেখে নিজেই নিজেকে পর্বতরাজ ভেবে নিল? না, এই ঔদ্ধত্য মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায় না।

অনেক ভেবে মৃদু হাসতে হাসতে নারদ বললেন—তা কতকটা ঠিক। হিমালয়, উদয়গিরি, নীল পর্বত, রৈবত পর্বত, হেমকূট, শ্রীশৈল—কেউ বোধ হয় তোমার মত নয়। আমার মনে হয়, একমাত্র সুমেরুই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

—কোন দিক থেকে দেবর্ষি? প্রচুর সোনা আছে আর খুব উঁচু চুড়ো আছে বলে?

দেবর্ষি কিন্তু এর কোন উত্তর না দিয়েই বাহন ঢেঁকিতে চেপে চলে গেলেন।

বিন্ধ্যের মাথায় জেদ চেপে গেল। সুমেরুর গর্ব তাঁকে খর্ব করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে? অনেক ভাবতে ভাবতে শেষে ঠিক করল, মাথা খাড়া করে আকাশ ছুঁয়ে সে সূর্যের গতিরোধ করে দাঁড়াবে।

ভেবে মনে মনে খুবই আনন্দ পেল বিন্ধ্য। আর আনন্দের চোটে সে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে সত্যি সত্যিই আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়াল।

সূর্য এ সবের কিছুই জানে না। প্রতিদিন যেমন পুবদিকে সূর্য ওঠে, আকাশপথে সুমেরু পরিক্রমা করে আবার ফিরে আসে, সেদিনও তেমনি পুবদিকে সূর্য উঠে চলতে শুরু করল। আধ পলকে আট ক্রোশ করে পথ পেরোতে পেরোতে হঠাৎ আকাশপথ বন্ধ দেখে সূর্যদেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। না পারেন নিজের পথে এগিয়ে সুমেরু পরিক্রমা শেষ করতে, না পারেন পিছিয়ে আসতে।

নিশ্চল হয়ে সূর্য দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। ফলে পুব আর উত্তর দিক তার তাপে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

ওদিকে বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে রাত শেষ হয়েও হচ্ছে না। সূর্যের দেখা মিলছে না।

ফলে দুদিকের অবস্থাই ক্রমে ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে রোদের অবিরাম উত্তাপেও সব কিছু জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকল। আর একদিকে সূর্য না ওঠার ফলে সকলের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। দুদিকেরই মানুষজন-পশুপাখিরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে

এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

দেবতারা দেখলেন, এ তো বেশ ফ্যাসাদ। বিন্ধ্য যে শেষে এমন কাণ্ড করে বসবে তা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি।

এখন উপায়?

সকলে মিলে ছুটলেন সত্যলোকে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে।

ব্রহ্মাকে দেবতারা আর নতুন করে কি বলবেন। ইতিমধ্যে তাঁর সবই জানা হয়ে গিয়েছিল। দেবতারা যেতেই তিনি বললেন—দেখ, এখানে আমার কিছু করার নেই। তোমরা কাশীতে অগস্ত্য মুনিকে গিয়ে ধর। বিন্ধ্যের গুরু হলেন অগস্ত্য। বিন্ধ্যকে কায়দা করতে একমাত্র তিনিই পারবেন।

সত্যলোক থেকে দেবতারা সঙ্গে সঙ্গে কাশীতে এলেন অগস্ত্য মুনির আশ্রমে। সুন্দর এক তপোবনে মনোরম আশ্রম। অগস্ত্য মুনি পত্নী লোপামুদ্রাকে নিয়ে আশ্রম কুটিরে বসে আছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাদের নিয়ে সেখানে হাজির হতেই দুজনে সকলকে অভ্যর্থনা করলেন।

—কি সৌভাগ্য আমার যে, দেবতারা এসেছেন আমার আশ্রমে। আপনাদের জন্য আমাদের কি করতে হবে বলুন? অগস্ত্য জিজ্ঞেস করলেন।

দেবতাদের হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি বিন্ধ্য পর্বতের কাণ্ডকারখানার বৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন—আমাদের এই বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে। আপনি ছাড়া বিন্ধ্যের এই দম্ভ কেউ ভাঙতে পারবেন না। মুনিবর, সৃষ্টিকে বাঁচান।



কি আর করেন অগস্ত্য। কাশী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে তাঁর আদৌ ছিল না। আবার দেবতাদের অনুরোধ উপেক্ষা করাও যায় না। বাধ্য হয়েই দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে লোপামুদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে কাশী ছাড়লেন। দেবগণও চলে গেলেন।

তপোযানে চেপে লোপামুদ্রাকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অগস্ত্য মুনিকে কাছে আসতে দেখে বিন্ধ্যের বুক কেঁপে উঠল। যদিও গুরু মহাযোগী কিন্তু মহাক্রোধী। তিনি আকাশপথে আসামাত্রই বিন্ধ্য মাথা হেঁট করে প্রণাম জানাল। বলল—গুরুদেব, আদেশ করুন। আমি আপনার দাস মাত্র।

বিন্ধ্য মাথা হেঁট করতেই আকাশপথ ফাঁকা হয়ে গেল।

অগস্ত্য বললেন—শোন, আমি দক্ষিণ দেশে যাচ্ছি। যতদিন না ফিরি, ততদিন ঐভাবে মাথা হেঁট করেই থাকবে। শুধু এইটুকু বলেই অগস্ত্য চলে গেলেন।

বিন্ধ্যও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এই ভেবে যে, রেগে গিয়েও অগস্ত্য বিশেষ কোন ক্ষতি করলেন না।

এদিকে আকাশপথ পরিষ্কার হয়ে যেতেই সূর্যের রথ আবার চলতে শুরু করল। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

অগস্ত্য সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। বিন্ধ্যও অগস্ত্যের আদেশ অবহেলা করে ভয়ে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।



অমিত্রজিৎ রাজার কাহিনী

পৃথিবীতে এক সময় অমিত্রজিৎ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। যুবক। অসাধারণ বলশালী। কিন্তু দারুণ ধার্মিক। তাঁর শাসনে প্রজাদের দিন খুব সুখে শান্তিতে কাটত। চোর ডাকাতরা ভয়ে ভয়ে থাকত। মানুষজন, না খেয়ে মরেছে, এমন ঘটনা তাঁর রাজত্বে কখনো ঘটে নি।

অমিত্রজিৎ ছিলেন অসাধারণ কৃষ্ণভক্ত। তাঁর কাছে কৃষ্ণই সব।

একদিন রাজসভায় অমিত্রজিৎ বসে আছেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজ্যের আরো সুখ-সুবিধে নিয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় সেখানে এলেন নারদ মুনি।

মুনিবরকে দেখেই রাজা তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে উঠে প্রণাম জানিয়ে সসম্মানে এনে বিশেষ এক আসনে বসালেন।

নারদ বললেন—রাজা, তোমার বিষ্ণুভক্তি আমার মন টলিয়ে দিয়েছে। সকলের মধ্যেই যে তোমার মত ভগবান কৃষ্ণকে দেখেন, তার মত ভাগ্যবান আর কে আছে?

মুনির মুখে রাজা নিজের প্রশস্তি শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন—ও কথা থাক। তাঁর কৃপাই সব।

নারদ বললেন—তোমার কথা আরো ভাল লাগল রাজা। সত্যিই, তাঁর কৃপা না পেলে কি ভক্তি আসে? ভাগ্যবান ছাড়া কি তাঁর কৃপা লাভ হয়? এখন একটা কাজের কথা বলি শোন। সেটা বলতেই অনেক ভেবে-চিন্তে তোমার কাছে আসা।

—কি কাজ, মুনিবর?

—মলয়গন্ধিনী নামে এক বিদ্যাধর কন্যাকে কঙ্কালকেতু নামে এক দানব চুরি করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে চম্পকাবতী নগরীতে। তাকে উদ্ধার করে আনতে হবে তোমাকেই।

—এ খবর আপনি কেমন করে পেলেন মুনিবর!

নারদ বললেন—পাতালে হাটকেশ্বর শিবকে দর্শন করে

আসছিলাম, এমন সময় মেয়েটি নিজেই আমায় বলল। গন্ধমাদন পর্বতে সে বেড়াচ্ছিল। দুর্বৃত্ত দানব কপালকেতুর ছেলে কঙ্কালকেতু সেই সময় মায়াবলে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে। আগামী তৃতীয়াতে তাকে সে বিয়ে করবে। মলয়গন্ধিনী দেবী ভগবতীর কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল। তাতে ভগবতী দেবী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, তুমি নিশ্চিন্তে থাক। ঐ দিনই বিষ্ণুভক্ত সুদর্শন এক রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। কঙ্কালকেতু তোমাকে ছুঁতেও পারবে না। মেয়েটি আমাকে অনুরোধ জানাল, অমন বিষ্ণুভক্ত কেউ যেন এসে তাকে উদ্ধার করে। শুনে খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম। অমন খাঁটি বিষ্ণুভক্ত সুদর্শন যুবক রাজা কে থাকতে পারে। ভাবতে ভাবতে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই ছুটে এলাম। রাজা, মাঝে আর মাত্র দুটো দিন। দেবী ভগবতীর আশ্বাস তুমি ছাড়া আর কেউ পূরণ করতে পারবে না, আমার স্থির বিশ্বাস। তুমি যাও, তোমার মঙ্গল হবে।

মন দিয়ে সব শুনলেন অমিত্রজিৎ। কিছুক্ষণ স্থির চিত্তে ভাবলেন। তারপর বললেন—তাঁর যখন ইচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু মুনিবর, চম্পকনগরী কোথায়। কিভাবে যেতে হবে?

—আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে সহজে সেখানে যেতে পারবে। আজই পূর্ণিমা। নৌকো নিয়ে তুমি সমুদ্রে যাও। খানিকটা যাবার পরই দেখবে তোমার সামনেই সমুদ্রজল ভেদ করে উঠবে এক রথ। সেই রথে থাকবে এক দিব্যকন্যা, হাতে বীণা। সে এই বলে গান গাইবে—ভাল হোক আর মন্দই হোক, পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করবে, তাকে ঠিক তেমনি ফলভোগ করতে হবে। এই গান শেষ হবে আর রথও সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে। তোমাকেও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নৌকো থেকে ঐ জলস্তম্ভে ঝাঁপ দিতে হবে। দেখবে, তুমি চম্পক নগরীতে পৌঁছে গেছ। আর সেখানে গেলেই তুমি সেই মেয়েকে দেখতে পাবে।

এই বলে নারদ রাজাকে আশীর্বাদ জানিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

রাজাও নৌকার পাল তুলে সমুদ্রে ভাসলেন।

কিছুটা আসতেই নারদ মুনি যেমনটি বলেছিলেন রাজাও ঠিক সে রকম দেখলেন। তাঁর নৌকোর একটু তফাতেই হঠাৎ উঠল এক জলস্তম্ভ। জলস্তম্ভ ভেদ করে উঠল এক দিব্য রথ। রথের ওপর অপূর্ব এক খাট। সেই খাটে বসে এক দিব্যাঙ্গনা গান গাইল—ভাল হোক আর মন্দই হোক, পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করবে, তাকে ঠিক তেমনি ফলভোগ করতে হবে। নৌকো নামিয়ে রাজা অবাক চোখে দেখলেন, গান শুনলেন।

তারপর জলস্তম্ভটি যেই নেমে যেতে শুরু করল, রাজাও সঙ্গে সঙ্গে তার মাঝখানে নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। মিলিয়ে গেল জলস্তম্ভ। রাজাও এসে থামলেন সমুদ্রের নীচে সুন্দর একপ্রাসাদে। বুঝলেন এটাই তাহলে সেই চম্পক নগরী। এখানেই তাহলে কোথাও আটকে আছে সেই গন্ধর্বকন্যা মলয়গন্ধিনী ।

বিশাল প্রাসাদ। অনেক ঘর। অনেক ধনরত্ন। একের পর এক ঘর রাজা খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলেন, কোথায় সেই মেয়ে। কঙ্কালকেতু তখন প্রাসাদে ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে রাজা একটা ঘরের দরজা খুলতেই দেখলেন, সুন্দর এক খাটে শুয়ে আছে একটি মেয়ে। তাকে দেখেই রাজার বুঝতে অসুবিধে হল না এই সেই মেয়ে। ওদিকে মলয়গন্ধিনীও হঠাৎ আগন্তুককে দেখে ধড়মড় করে খাট থেকে উঠে মেঝেতে এসে দাঁড়াল। দেখল, গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনের তিলক, আজানুলম্বিত বাহু, বলিষ্ঠ-গড়ন এক যুবক। তেজ যেন ঝলমল করছে। গন্ধর্বকন্যাও বুঝল, নিশ্চয়ই ইনিই তার পরিত্রাতা। দেবী ভগবতী যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বোধ হয় তা ফলল।

গন্ধর্বকন্যা আপ্যায়ন জানাল অমিত্রজিৎকে। বলল—অন্য ঘরে আসুন রাজা। কঙ্কালকেতুর আসার সময় হয়ে গেছে। দেখতে পেলে তার ত্রিশূলের হাত থেকে আর পরিত্রাণ পাবেন না।

প্রায় এক রকম টানতে টানতেই মলয়গন্ধিনী রাজাকে নিয়ে গিয়ে দানবের অস্ত্রাগারে লুকিয়ে রাখল। আর বলল—কঙ্কালকেতুর হাতে সব সময়েই একটা ত্রিশূল থাকে। রাজা, সেটাই তার মৃত্যুবাণ। ঐ ত্রিশূলের আঘাত ছাড়া দানব আর কোন অস্ত্রেই মরবে না।

সবেমাত্র রাজাকে লুকিয়ে রেখে নিজের ঘরে ফিরেছে মলয়গন্ধিনী , এমন সময় কঙ্কালকেতু এল। সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন।

সেগুলো এনে মলয়গন্ধিনীর সামনে কঙ্কালকেতু ঢেলে দিতে দিতে বলল—এ সব তোমার। প্রাসাদে যা কিছু সব তোমার। আরো এনে দেব, আরো। এত এনে দেব যা দেখলে কুবেরের চোখও ছানাবড়া হয়ে যাবে। তুমি আমার রানী হবে বলে কথা...দেব না? দেব...আরও কত দেব। দেখে তুমি খুশি না হয়ে থাকতেই পারবে না।

আকণ্ঠ মদ গিলে এসেছিল দানব। তাই আর বেশি কথা বলতে পারল না। খানিকটা আজেবাজে বকে মেঝের ওপরই পাশে ত্রিশূলটা রেখে শুয়ে পড়ল। আর শোওয়ামাত্রই ঘুম। নাক ডাকতে শুরু করে দিল।



দানব অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে মলয়গন্ধিনী আস্তে আস্তে তার পাশ থেকে ত্রিশূলটা তুলে নিয়ে খুব হালকা পায়ে প্রায় দৌড়ে গেল রাজার কাছে। ত্রিশূলটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—রাজা, এই সেই ত্রিশূল, ওর মরণাস্ত্র। দানবটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এইবেলা এই ত্রিশূল দিয়ে ওকে মেরে আমায় রক্ষা করুন।

হাতে ত্রিশূল নিয়ে অমিত্রজিৎ গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে কঙ্কালকেতুকে দেখলেন। সত্যিই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কদাকার, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ।

মলয়গন্ধিনী বলল—রাজা, দেরি করবেন না। এই বেলা মারুন।

কিন্তু রাজা ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে মারলেন না। ভাবলেন, এভাবে মারা অন্যায় হবে। তার চেয়ে ওকে আগে জাগিয়ে তোলা যাক। এই ভেবে ঘুমন্ত কঙ্কালকেতুকে সজোরে এক লাথি মারলেন।

আচমকা লাথি খেয়ে দানবের ঘুম ভেঙে গেল। বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। পাশে রেখে দেওয়া ত্রিশূলটা নিতে গিয়ে দেখল সেখানে সেটি নেই, সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ত্রিশূলটা তারই হাতে।

দেখে রাগে কঙ্কালকেতু যেন আরো ভীষণ হয়ে উঠল।

—কে তুমি? এখানে কেমনভাবে এলে? আগে আমার ত্রিশূলটা দাও, তারপর দেখব তুমি কত বড় বীর।



অমিত্রজিৎ ত্রিশূল হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল তার তর্জন-গর্জন। কিন্তু ত্রিশূল হাতছাড়া করল না। বরং উপেক্ষা করে বলল—অস্ত্র হাতে লড়াই করার যদি এতই সাধ, তবে তোমার অস্ত্রাগারে তো দেখলাম, অনেক ভাল ভাল অস্ত্র রয়েছে। তারই মধ্যে থেকে একটা নাও না কেন? এটার ওপরই-বা এত ঝোঁক কেন?

বারবার চেয়েও দানব যখন ত্রিশূল পেল না, তখন বুঝল মৃত্যু তার নিশ্চিত। কিন্তু আগন্তুক এই রহস্য জানল কি করে? মনে পড়ে গেল কথার ফাঁকে একদিন মলয়গন্ধিনীকে বলে ফেলেছিল। কিন্তু এখন আর কোন উপায়ই নেই।

দানব বলল—ত্রিশূল যখন তোমার হাতে, তখন মরতে আমাকে হবেই। তবে দুঃখের কথা, যাদের আমরা খেয়ে থাকি, সেই মানুষের হাতে মরতে হবে। তবে এটাও ঠিক, বিনা যুদ্ধে নয়।

বলেই দানব আচমকা অমিত্রজিতের বুকে দুরন্ত বেগে এক ঘুসি মারল। ভীমকায় দানবের ভীম ঘুসি। পাহাড় গুঁড়ো হয়ে যায় তো মানুষ কোন ছার! হায় হায় করে উঠল মলয়গন্ধিনী। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল দুজনেই সামান্য একজন যুবক, ঘুসি খেয়েও যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমন ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। একটুও টলে গেল না।

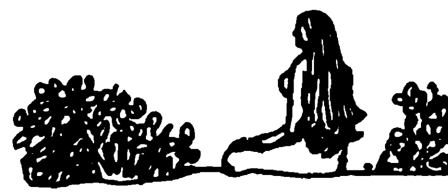
এবার অমিত্রজিৎ বললেন—কি হে দানব, তোমার ক্ষমতা দেখানোর সাধ মিটেছে তো? এবার তাহলে আমার হাতের ক্ষমতাটা দেখ।

এই বলে কঙ্কালকেতুর গালে রাজা সজোরে এক চড় বসালেন। আর আশ্চর্য, সেই এক চড়েই লাটুর মত পাক খেতে খেতে দানব লুটিয়ে পড়ল। আর লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ত্রিশূল রাজা তার বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিলেন। মারা পড়ল কঙ্কালকেতু। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গন্ধর্বকন্যা মলয়গন্ধিনী।

ঠিক সেই সময়েই নারদ মুনি এসে হাজির হলেন সেখানে। বললেন—সাধু, সাধু! আমি জানতাম, এ কাজ তুমি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন দেবীর ইচ্ছেয় আমি এখানে আগে তোমাদের বিয়েটা দিয়ে দিই।

নারদ সেখানেই তাদের বিয়ে দিয়ে চম্পকনগরীর গোলকধাঁধা থেকে বের করে নিয়ে এলেন অমিত্রজিতের রাজ্যে।

কঙ্কালকেতু মারা গেলে স্বর্গ-মর্ত্যের কত দেবতা-মানুষ যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, তার আর ইয়ত্তা নেই।



পার্বতীর অনুকম্পা

কাশীতে প্রিয়ব্রত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শুভব্রতা।

ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী দুজনেই খুবই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আরাধনা, সূর্যের তপস্যা, অতিথির সেবা ছাড়া তাঁরা ধর্ম বলতে যেন আর কিছু জানতেন না। দিন-রাত তাই নিয়েই থাকতেন।

অবস্থা খুব একটা সচ্ছল ছিল না। তবু কোন রকমে চলে যেত। আর তাতেই তাঁরা খুশি থাকতেন।

একদিন ঘর আলো করে তাঁদের একটি মেয়ে হল। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেয়ের মুখ দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মন ভরে ওঠে।

এভাবে দিন যায়, মেয়েও বড় হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে মেয়ের বিয়ে দেবার বয়স হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ ভাল ছেলের সন্ধানে বের হলেন। যেমন রূপ, তেমনি গুণ মেয়ের। যে কোন ছেলের হাতে তো আর তুলে দেওয়া যায় না।

চারদিকে একটি ভাল ছেলের কত না সন্ধান চালালেন ব্রাহ্মণ। ছেলে মেলে বটে, কিন্তু মেয়ের উপযুক্ত আর হয় না। খুঁজতে খুঁজতে কেটে গেল কয়েক বছর। মনোমত ছেলে আর জুটল না। ব্রাহ্মণ মহা চিন্তায় পড়লেন। মেয়ের বয়স যত বাড়ছে, রূপে-গুণে আরো অতুলনীয়া হয়ে উঠছে দেখে ব্রাহ্মণের আহার গেল, নিদ্রা গেল। সময়মত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারা যে মহাপাপ। কিন্তু উপায়?

ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে ব্রাহ্মণ জ্বরে পড়লেন। ক্রমে ক্রমে

সেই জ্বর মারাত্মক হয়ে উঠল। কোন ওষুধই আর কাজ করল না। ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। স্বামীর চিতার আগুনে ব্রাহ্মণী শুভব্রতাও সহমৃতা হলেন।

বাড়ি ফাঁকা। বাড়িতে একা অবিবাহিতা কন্যা। প্রতিবেশী যদিও আশেপাশে আছে, কারও পক্ষে সম্ভব সব সময় নজর রাখা?

এই বয়সে এই ভাবে একা একা বাড়িতে থাকা মেয়ের খুব ভাল বলে মনে হল না। মা নেই, বাবা নেই যে তার ভালমন্দ দেখবে। পাড়া-প্রতিবেশীর ওপর ভরসা কি?

নিঃসহায় হয়ে মেয়ে একদিন বসে বসে ভাবল, কি করা যায়। বিশ্বেশ্বরের এই পুরীতে থেকে ভালভাবে জীবনযাপন করেও কি তাঁর কৃপা লাভ হবে না?

ভাবতে ভাবতে একসময় ঠিক করল—না, এই বাড়িতে সে আর থাকবে না। বাবা-মা এত চেষ্টা করেও যখন তার বিয়ে দিতে পারেন নি, তখন বিয়ে তার হবেই না—নিশ্চয়ই এটা বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। তাই যখন, তখন ব্রহ্মচারিণী থেকে তাঁরই আরাধনা করি না কেন?

এভাবে মন স্থির করে কাউকে কিছু না বলে মেয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। তারপর কাশীতে যেখানে সূর্যদেব উত্তরার্ক নামে আছেন, সেখানে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করে দিল।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়। মাথার ওপর খোলা আকাশ গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত নিয়ে মেয়েটির ওপর অবিরাম আছড়ে পড়ে। মেয়ে কিন্তু নিশ্চল।

যেখানে বসে মেয়েটি তপস্যা করত, প্রতিদিনই সেখানে একটা ছাগল আসত। সারাটা দিন সেখানেই থাকত। গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খেত। সন্ধ্যায় নিজের আস্তানায় ফিরে যাবার আগে পাশের ডোবা থেকে এক পেট জল খেয়ে চলে যেত।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। মেয়ের অমন রূপ ম্লান হয়ে গেল। সংযমের সঙ্গে কঠোর তপস্যার ফলে শরীরও শুকিয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে সেই ছাগলটির কিন্তু একদিনের জন্যও আসারও বিরাম ছিল না। মেয়েটি দেখত, খুঁটে খুঁটে সারাদিন ধরে গাছের শুকনো পাতা খেয়ে তারপর ডোবার জল পেটে পুরে সে চলে যাচ্ছে সন্ধ্যার আগেই।

এমনভাবে আরো কিছুদিন গেল।

একদিন পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেব তাঁর প্রিয় কানন আনন্দকাননে বেড়াতে এসেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর কাননের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন।

ঘুরতে ঘুরতে পার্বতী উত্তরার্কের কাছে ব্রাহ্মণকন্যা যেখানে বসে তপস্যা করছিল, তারই কাছাকাছি এসে যৌবনে যোগিনী মেয়েটিকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মহাদেবকে ডেকে পার্বতী বললেন—দেখুন, দেখুন, এই বয়সে কি কঠোর তপস্যা করছে মেয়েটি। ওর জন্য আপনার মনে কি একটুও করুণা জাগছে না? জানি না, মেয়েটি কে। তবে দেখে মনে হচ্ছে, বড় ভাল।

মহাদেবের তো অজানা কিছুই নেই। তিনি সবই জানেন। পার্বতীর অনুরোধে মেয়েটির পরিচয় আর তপস্যার কথা তখন তাঁকে তিনি বললেন

শুনে পার্বতীর খুব অভিমান হল। বললেন—আপনি সব জেনেও মেয়েটিকে এখনও উপেক্ষা করে আছেন?

মহাদেব বললেন—পার্বতী, অভিমান কোরো না। তুমি যদি ওকে বর দিতে বল, নিশ্চয়ই দেব।

পার্বতী বললেন—কেন, ও কি এখনও আপনার বর পাবার যোগ্যতা অর্জন করে নি?

কি আর এরপর বলবেন মহাদেব?

পার্বতীকে পাশে নিয়ে তিনি তখন মেয়েটির চোখের সামনে এসে দেখা দিয়ে বললেন—কন্যা, বর চাও। আমরা তোমাকে বর দিতে এসেছি।

হর-পার্বতীকে দেখে ব্রাহ্মণকন্যার চোখ যেন গলে গেল। দরদর করে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। তারপর গদগদ স্বরে বলল—এতদিন পরে আপনাদের দর্শন পেলাম। এটাই আমার সৌভাগ্য। আমার নিজের আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই। তবু যদি বর দিতে চান, তাহলে আমার প্রার্থনা একটাই—ঐ ছাগলটিকে মুক্তি দিন। আহা, বেচারা পশু হয়ে কি কষ্টই না ভোগ করছে!

শুনে খুবই চমৎকৃত হলেন মহাদেব। পার্বতীকে বললেন—পার্বতী, যে নিজের জন্য কিছু চায় না, তাকে আমি কি দেব? আমি এই মেয়ের মনের কথা জানতাম। তাই তো কৌশলে তোমাকে এখানে এনেছি। এখন তুমি ওকে কৃপা কর।

পার্বতীও এমনটি এর আগে আর কখনো দেখেন নি। তিনিও তাই খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মহাদেবকে বললেন—দেব, আবাল্য ব্রহ্মচারিণী এই মেয়ে জয়া-বিজয়ার মত আমার সখী হোক। আর এই ছাগল এখনই দেহত্যাগ করে কাশীরাজের মেয়ে হোক, এই আমার ইচ্ছে।

মহাদেব বললেন—তোমার যখন এই ইচ্ছে, তখন তাই হোক। তোমার ইচ্ছের সঙ্গে আমার ইচ্ছের কি কোন তফাত আছে পার্বতী?

কাশীতে বদরীকুণ্ডের কাছে গেলে আজও শোনা যাবে এই কাহিনী। ছাগলটি দিনের শেষে এই কুণ্ডের জল খেত। তাই দেবীর ইচ্ছেয় এর নামই হয়ে আছে পবিত্র কুণ্ড—বদরীকুণ্ড।



কদ্রু-বিনতা সংবাদ

ভাগ্যদোষে পক্ষিরাজ গরুড়ের মা বিনতা সর্পকুলের মা কদ্রুর দাসী হয়েছিল। দুজনেই দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে এবং কশ্যপের স্ত্রী। হলে কি হবে, কদ্রুর মন ছিল বড় কুটিল। বোন হলেও সতীন বিনতাকে সে কোনমতেই সহ্য করতে পারত না। তাই সব সময়েই ফিকির খুঁজত, কিভাবে বিনতাকে জব্দ করা যায়।

কদ্রুর ছিল একশ ছেলে। আর বিনতার ছিল তিনটি, কিন্তু শেষে

ঠেকেছিল একটিতে। তারই নাম হল গরুড়। একদিকে একশ বিষে ভরা সাপ-ছেলের দল, আর একদিকে বিষহীন ডানাওয়ালা শুধু একমাত্র পাখি-ছেলে। কদ্রুর খুব অহঙ্কার, ইচ্ছে—বিনতা তার আজ্ঞায় চলুক, তার দাসী হয়ে থাকুক। কিন্তু হুকুম তো আর প্রথমেই করতে পারে না। ফিকির করে আগে দাসী বানানো যাক, তারপর হুকুম চালানো যাবে।

সুযোগও মিলে গেল।

দেব-দানবে মিলে তখন সমুদ্রমন্থন করছিল। সমুদ্র থেকে দেবদুর্লভ সব জিনিস উঠে উঠে স্বর্গের দিকে চলে যাচ্ছিল। সেই সময় ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা উঠছে।

কদ্রু বিনতাকে ডেকে বলল—বোন, উচ্চৈঃশ্রবার গায়ের রং কি বল তো?

বিনতা খুবই সাদা-মাটা। বলল—কেন, সাদা।

কদ্রু বলল—না, কালো।

দুজনে ছুতো করে শুরু করে দিল তর্কাতর্কি। শেষে কদ্রু বলল—ঠিক আছে, বাজি ধর। যদি সাদা হয়, তাহলে আমি তোমার দাসী হয়ে থাকব। আর যদি কালো হয় তাহলে তুমি আমার দাসী হয়ে থাকবে।

বিনতার এসব বাজি-টাজি ধরা মোটেই ভাল লাগত না। কিন্তু কি করবে, সতীন কদ্রুর চাপে পড়ে বাজি ধরতে বাধ্য হল।

কদ্রু সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে গিয়ে ছেলেদের ডেকে বলল—শোন, আমার আদেশ, তোমরা এখুনি গিয়ে উচ্চৈঃশ্রবার লেজ ঢেকে ফেল। আর বিষ-নিঃশ্বাস দিয়ে ঐ ঘোড়ার গায়ের সাদা রং কালো করে দাও।

শুনে ছেলেরা প্রথমে আপত্তি জানাল। বলল—এ কি কথা বলছ মা? এটা ঠিক হবে না।

কদ্রু ধমকে ওঠে—তোমাদের তো বাদ-বিচার করতে বলি নি। আমার হুকুম তোমরা তামিল করবে। যারা না করবে আমার অভিশাপে তারা নির্বিষ হবে, নিজেদের ছেলেদের নিজেরাই খাবে, গরুড়ে খাবে।

শাপের ভয় বড় ভয়। বাধ্য হয়েই মায়ের আদেশ পালন করল তারা। উচ্চৈঃশ্রবা যখন আকাশে উড়ল, তখন সত্যি সত্যিই দেখা গেল, তার রং কালো। বাজিতে হেরে গেল বিনতা। বাধ্য হল কদ্রুর দাসী হতে।

মনের সুখে কদ্রু কখনো একা, কখনো ছেলেপুলেদের নিয়ে বিনতার পিঠে চেপে এখান-ওখান ঘুরে বেড়ায়।

একদিন এভাবে ছেলেদের নিয়ে কদ্রু বিনতার পিঠে চেপে নতুন জায়গা দেখতে বেরিয়েছে। পরিষ্কার আকাশ। আকাশে ঝকঝক করছে সূর্য। সাপেদের পিঠে নিয়ে বিনতা উড়ে চলেছে। যত ওপরে ওঠে, সূর্যের তাপ তত বাড়ে। কষ্ট হয় কদ্রুর, ছেলেরা ছটফট করে। ঝড়-বৃষ্টি, জল-কাদা এসব সাপেদের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু ওরা একটুও তাপ সহ্য করতে পারে না। খাঁ-খাঁ করছে মাথার ওপর সূর্য। যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে তাদের গায়ের চামড়া।

বিনতাকে কদ্রু বলে—মাথার ওপর উল্কা পড়ছে। তাড়াতাড়ি আমাদের কোন ঠাণ্ডা জায়গায় নামাও।

কিন্তু নামবে কোথায়। নীচে বিশাল সমুদ্র। পেরিয়ে যেতে এখনো বেশ কিছু সময় লাগবে। বিনতারও তো কম কষ্ট হচ্ছিল না। খুবই নরম মন বিনতার। ভাগ্যদোষে দাসী হলেও কদ্রু ওর বোন তো বটে। আর ছেলেরা বোনপো। আবার আর একদিকে স্বামী কশ্যপের ছেলে হিসেবে সতীনের হলেও সাপেরা প্রায় নিজের ছেলের মতই। বড় মায়া জাগল মনে। বিনতার সেজ ছেলে অরুণ সূর্যদেবের সারথি। মনে মনে বিনতা সূর্যদেবকে ডাকতে লাগল—সূর্যদেব, তোমার তেজ একটু কমাও, এদের এত কষ্ট দিও না।

বিনতার আবেদন বোধ হয় সূর্যদেব রাখলেন। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ এসে সূর্যকে ঢেকে দিল। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সবাই।

এভাবে দিন যায়। রোজ সকালে কদ্রু আর সাপেদের পিঠে নিয়ে বিনতা বের হয়। রাত হলে ফেরে। যখন ফিরে আসে, তখন যেন বিনতার আধ মরা অবস্থা।

গরুড় এইসব দেখে আর আদ্যোপান্ত সব শুনে মাকে বলল—মা, ওদের জিজ্ঞেস কর, কি পেলে ওরা তোমাকে মুক্তি দেবে।

বিনতা সুযোগমত একদিন কদ্রুকে সেকথা জিজ্ঞেস করতেই ছেলেদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে বলল—তোমার ছেলে আমাদের জন্য যদি অমৃত এনে দিতে পারে, তাহলে তোমায় মুক্তি দিতে পারি।

শুনে বিনতা সব আশাই ছেড়ে দিল। অমৃত! স্বর্গ থেকে অমৃত আনা অসম্ভব ব্যাপার। সবাই জানে, দেবতারা কত যত্নে,কত সজাগ পাহারা দিয়ে সেই কলস রেখে দিয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে তার ছেলের সাধ্য কি তা নিয়ে আসে।

গরুড় কিন্তু শোনামাত্রই বলল—মা, তুমি কিছু ভেবো না। আমাকে শুধু আশীর্বাদ কর। দেখো, আমি যেমন করে পারি ওদের অমৃত এনে দিয়ে তোমায় মুক্ত করবই।

গরুড় ছুটল দেবলোকের দিকে। সে তো আর জানে না কি ভীষণ অভিযানে সে চলেছে। একে তো দেবতারা অমর, তার ওপর তাঁদের হাতে নানা শক্তিশালী দিব্য অস্ত্র।

ইতিমধ্যে দেবলোকে খবর চলে গেছে যে গরুড় এখান থেকে অমৃতের কলস নিয়ে যেতে আসছে। যাঁর যা অস্ত্র ছিল তাই নিয়ে দেবতারাও রুখে দাঁড়ালেন। অত বড় বড় মহাবল অসুররা যা পারল না, সামান্য একটা পাখি তা নিয়ে যাবে?

বিশাল বিশাল ডানায় ঝড় তুলে গরুড় আসতেই বেধে গেল ভীষণ যুদ্ধ। মার মার করে অস্ত্রশস্ত্র হাতে ছুটে এলেন দেবতারা। বেপরোয়া গরুড়কে লক্ষ্য করে তা ছুঁড়তে শুরু করলেন। গরুড় শুধু মনে মনে মা-কে স্মরণ করে ডানা দিয়ে প্রতিরোধ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

গরুড় যত এগোয়, দেবতারা তত পিছু হটেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবতারা গরুড়ের ঠোঁট, নখ আর ডানার দারুণ দাপট দেখে রণে ভঙ্গ দিলেন। গরুড়ও সেই ফাঁকে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল অমৃতের কলস তুলে আনতে। নিতে যাবে কি, সেখানে আবার দেবতারা আর এক কাণ্ড করে রেখেছেন।

গরুড় দেখল, অমৃতের কলসকে ঘিরে অনবরত ঘুরছে সাপের মত দেখতে দুটো আগুন-চোখ ড্রাগন। তাদের মুখ দিয়ে সব সময়



আগুনের হল্কা ছুটছে। তাদের চোখকে ফাঁকি দেবার তো কোন উপায়ই নেই। তার বাইরে ঝড়ের চেয়েও বেগে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে একটা ঝকঝকে ধারালো চাকা। সাধ্য কি মুণ্ড বাঁচিয়ে তাকে কেউ এড়িয়ে যায়? তারও বাইরে দাউ দাউ করে অবিরাম জ্বলছে একটা আগুনের মালা। তারও পরে আবার মারাত্মক সব যক্ষের দল।

গরুড় মনে মনে আবার মা-কে স্মরণ করে এগিয়ে যেতেই তেড়ে এল যক্ষের দল। দেবতারা যার কাছে হেরে গেলেন, সেখানে যক্ষ! মুহূর্তে তাদের কাৎ করে গরুড় কৌশলে আগুন নিভিয়ে, চাকা এড়িয়ে, ড্রাগনের চোখে ধুলো দিয়ে এমন কৌশলে অমৃতের কলস নিয়ে বেরিয়ে এল যে ভাবাই যায় না।

দেবতারা যখন দেখলেন ওখান থেকেও গরুড় বেরিয়ে এল আর অমৃত কলস চলে যাচ্ছে দেবলোক থেকে, তখন তাঁরাও আর স্থির থাকতে না পেরে স্বয়ং বিষ্ণুকে নিয়ে সবাই মিলে একজোটে আক্রমণ করলেন গরুড়কে।

গরুড়ও মা আর শিবকে স্মরণ করে রুখে দাঁড়াল। তারপর সে কি ভীষণ যুদ্ধ! প্রায় সাড়ে পঁচিশ ঘণ্টা ধরে অবিরাম যুদ্ধ করেও দেবতারা যখন গরুড়কে কিছুমাত্র টলাতে পারলেন না, তখন বিষ্ণুকে এগিয়ে দিলেন একটা আপস করতে।

এখন আর আপস ছাড়া কোন পথ নেই। সাপেরা যদি এই অমৃত একবার খাবার সুযোগ পায় তাহলে দেবলোক তছনছ করে ফেলবে। তা তো আর হতে পারে না।

যুদ্ধ থামিয়ে বিষ্ণু এগিয়ে এসে বললেন—গরুড়, তোমার বীরত্ব দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।

গরুড় বলল—তোমাদের বীরত্ব দেখে আমিও সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমিও আমার কাছে দুটো বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করব।

মৃদু হেসে বিষ্ণু বললেন—বেশ। প্রথম প্রার্থনা, তুমি আমার বাহন হও।

গরুড় সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানাল।

—আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, অমৃতের ঐ কলস দেখিয়ে তোমার মা-কে মুক্ত কর, কিন্তু সাপেদের অমৃত খাবার সুযোগ তুমি দেবে না।

গরুড় বলল—বেশ, তাই হবে। তবে, যাতে ওরা সুযোগ না নিতে পারে সে দায়িত্ব কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে।

এই বলে গরুড় অমৃতের কলস নিয়ে সমুদ্রের ধারে বিশাল এক কাশবনে রাখল। সাপেদের ডেকে বলল—তোমরা যা চেয়েছিলে, সেই অমৃত আমি এনে দিলাম।

শোনামাত্রই যে যেখানে ছিল, কদ্রুসহ কলসের দিকে এগিয়ে যেতেই বাধা দিল গরুড়। বলল—আগে বল, এখন আমার মা তোমাদের দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত কিনা।

সাপেরা চটপট জবাব দিল—মুক্ত, মুক্ত। আমাদের অমৃত খেতে দাও।

গরুড় বলল—শোন, এভাবে অমৃত খেলে কোন ফল পাবে না। পবিত্র জিনিস পবিত্র হয়ে খেতে হয়। আগে সমুদ্রজলে সবাই ভালভাবে স্নান সেরে এসো, তারপর প্রাণভরে খেয়ো।

গরুড়ের কথায় পড়ি-কি-মরি করে সবাই ছুটল সমুদ্রে স্নান করতে। বিনতাকে নিয়ে গরুড় উঠল আকাশে।

স্নান সেরে আবার তেমনভাবেই ছুটে এল কুশ বনে, যেখানে গরুড় কলস নামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কোথায় কলস? তন্ন তন্ন করে চারদিকে খুঁজল সবাই মিলে। কলসের চিহ্নও কোথাও পেল না। না পেয়ে তারা কুশই চাটতে শুরু করে দিল এই ভেবে যে, কলস যখন রেখেছিল, এতটুকু অমৃতও কি এর কোথাও লেগে নেই? কুটিলের দল কেমন করে জানবে যে, ওদের সমুদ্রে স্নান করতে যাবার সুযোগে বিষ্ণু অলক্ষ্যতে এসে কলস নিয়ে চলে গেছেন আবার দেবলোকে। লোভের ফলে যা হবার তাই হল। কুশের পাতায় সাপেদের জিভ চিরে দু-ফালা হয়ে গেল, তা আজ পর্যন্ত আর জোড়া লাগে নি।

আকাশ থেকে শুধু গরুড় দেখল আর মনে মনে হাসল এই ভেবে যে, ওরা উচিত সাজাই পেয়েছে।

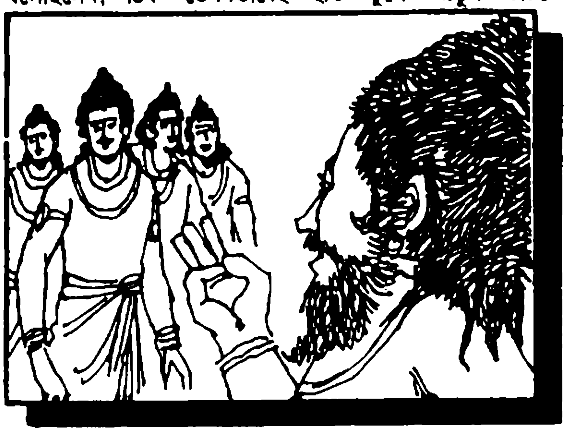
ব্যাসদেবের লাঞ্ছনা

মহামুনি পরাশরের ছেলে ব্যাসদেব তাঁর দশ হাজার শিষ্য নিয়ে পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়ে একবার নৈমিষারণ্যে এলেন। সেখানে এসে দেখলেন অষ্টাশিজন ঋষি গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে শিবের নাম জপছেন। দেখে তক্ষুণি সেখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আঙুল উঁচিয়ে বেশ জোর দিয়ে বললেন—তোমরা শিবের জপ করছ, সে তোমাদের কি দেবে? আমি সব শাস্ত্র ঘেঁটে দেখেছি, একমাত্র অচ্যুতই হলেন পরম দেবতা। জনার্দন বিষ্ণুর নাম-জপ ছাড়া মুক্তি মিলতে পারে না—পারে না—পারে না, একথা আমি তিন সত্যি করে বলছি।

ঋষিরা এই কথা শুনে মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। ব্যাসদেবের মত মহাজ্ঞানী তখন আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। এমন কারো সাধ্য নেই যে, শাস্ত্রতর্কে তাঁকে হারাতে পারেন। তাই আগু-পিছু ভেবে

ঋষিরা বললেন—মুনিবর, বিশ্বেশ্বর মহাদেবের স্থান হল কাশী। সেখানে গিয়ে আপনি যদি ঠিক এভাবে এই কথা বলতে পারেন তাহলে আমরাও মেনে নেব।

এই কথা! সঙ্গে সঙ্গে ব্যাসদেব কাশীতে চলে এলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে কপালে বুকে চন্দনের তিলক-ছাপ এঁকে, খোল-করতাল-শাঁখ নিয়ে বাজাতে বাজাতে, আর বিষ্ণুর নাম কীর্তন করতে করতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে এলেন। তারপর, চারদিকে শিষ্যদের দাঁড় করিয়ে নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে নৈমিষারণ্যে যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক তেমনভাবেই হাত তুলে আঙুল উচিয়ে



বললেন—আমি সব শাস্ত্র ঘেঁটে দেখেছি, একমাত্র অচ্যুতই হলেন পরম দেবতা। জনার্দন বিষ্ণুর নাম-জপ ছাড়া মুক্তি মিলতে পারে না—পারে না—পারে না, এ কথা আমি তিন সত্যি করে বলছি।

এই কথা বলে হাত নামাতে গিয়ে দেখলেন, কোনমতেই আর হাত নামাতে পারছেন না। কে যেন যাদুবলে ঐভাবেই হাতটাকে আটকে দিয়েছে। দেখে ব্যাসদেবের মুখ দিয়ে ভয়ে কথা পর্যন্ত আর বের হল না।

এমন সময় অলক্ষ্যে বিষ্ণু ব্যাসদেবের কানের কাছে মুখে এনে বললেন—ও ব্যাস, এ কি সর্বনাশ করেছ? তুমি জান না, আমার যা কিছু শক্তি, সবই শিবের অনুগ্রহে। তুমি শিবের সামনে এসে এসব কথা কি বলছ? শিবের প্রশস্তি কর।

ব্যাসদেব ইশারায় জানালেন, তাঁর যে বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

বিষ্ণু তেমনি ভাবে অলক্ষ্যেই ব্যাসদেবের কণ্ঠনালীতে হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসদেবের মুখে আবার কথা ফুটল। বলে উঠলেন—আমি মহেশ ছাড়া অন্য কোন দেবকে জানি না। শম্ভু ছাড়া অন্য কোন দেবের স্তব করি না। মহেশ্বর ত্রিলোচন ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে প্রণামও করি না। সত্য-সত্য-সত্য। তিন সত্য—করে বলছি, মিথ্যা নয়।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাসদেবের আটকে থাকা হাত আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ব্যাসদেবও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আর সেই থেকে তীর্থক্ষেত্র কাশীতেই শিষ্যদের নিয়ে থেকে গেলেন। আর নিত্য শিব-অর্চনা করতে লাগলেন।

তীর্থক্ষেত্রে যেভাবে থাকার নিয়ম, ব্যাসদেব শিষ্যদের নিয়ে সেভাবেই ছিলেন। রোজ তিন বেলা তিনবার শিবের পুজো, গায়ে ভস্ম মেখে নগরে ভিক্ষাপাত্র হাতে বের হওয়া। যা জুটল সারা দিনে, রাতে তাই খাওয়া।

এভাবে শিবের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে কাশীতে ব্যাসদেবের বেশ কিছুকাল কেটে গেল।

একদিন শিব পার্বতীকে ডেকে বললেন—দেখ, ব্যাসদেব যখন ভিক্ষায় বের হবে, দেখো যেন সে কোথাও ভিক্ষা না পায়!

পতির আদেশ! তা কি আর অমান্য করা চলে!

ব্যাসদেব প্রতিদিনের মত বের হলেন ভিক্ষে করতে। প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। কিন্তু কোথাও ভিক্ষে মিলল না। সন্ধ্যা হল। যথারীতি শিবপুজো সেরে সে রাত অনাহারেই কাটিয়ে দিলেন।

পরদিন যথারীতি আবার বের হলেন। সারা দিন ঘুরলেন, সেই একই ব্যাপার। ব্যাসদেব দেখে একটু অবাকই হলেন। দুটো দিন ভিক্ষে মিলল না। না খেয়ে কাটাতে হচ্ছে। ব্যাপার কি? কাশীতে কি কোন বিপর্যয় ঘটেছে?

সন্ধ্যায় পুজো-আদি সেরে দুজন ঝানু শিষ্যকে একবার নগরটা ঘুরে দেখে আসতে পাঠালেন।

শিষ্যরা ফিরে এসে জানাল—না, কোথাও তো কোন বিপর্যয় ঘটে নি। আগে যেমন ছিল, যেখানে যা কিছু ধর্মকর্ম হতো, সবই ঠিক আছে। মানুষজনও সব সুখেই আছে।

শুনে ব্যাসদেব খুব রেগে গেলেন। সবই যখন ঠিক চলছে সকলের, তখন সন্ন্যাসীদের ভিক্ষে হচ্ছে না কেন? কাশীর মানুষদের এ কি তাচ্ছিল্য ভাব? সব নিপাত যাক। সব ধ্বংস হয়ে যাক।

সত্যবাক ব্যাসদেব রাগ সামলাতে না পেরে দুম করে কাশীবাসীদের শাপ দিয়ে বসলেন।

রাত কাটল। ভোর হল।

যথারীতি ব্যাসদেব আবার শিবের পুজো-অর্চনা সেরে সব ভুলে ভিক্ষেয় বের হলেন। সঙ্গে জনকয়েক মাত্র শিষ্য।

সারা দিন দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন। আজও সেই এক অবস্থা।

সন্ধে হতে তখনো কিছু সময় বাকি। নিজের ডেরায় ফিরছেন ব্যাসদেব মুখ শুকনো করে। হঠাৎ নগরের ভেতরে এক বাড়ির দরজা খুলে এক মহিলা তাঁকে ডাকলেন। ডেকে বললেন—আমার স্বামী অতিথিসেবা না করিয়ে খান না। সারাদিন পথ চেয়ে আছি। এ পথে আজ একজন অতিথিও আসেন নি। ভাগ্যবলে আপনি এসেছেন। দয়া করে আমার স্বামীর আতিথ্য গ্রহণ করুন।

ব্যাসদেব শুনে থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার স্বামী কোথায়?

মহিলা বললেন—তিনি ভেতরেই আছেন, বয়স হয়েছে। তাই উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন না। দয়া করে তাড়াতাড়ি আসুন। সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমার স্বামীর আর খাওয়া হবে না।

ব্যাসদেব বললেন—সবই ঠিক, কিন্তু আমি তো একা আতিথ্য নিতে পারি না। আমার দশ হাজার শিষ্য অভুক্ত থাকবে আর আমি খেয়ে যাব, তা তো হয় না। যদি সকলকে খাওয়াতে পার, তাহলে তোমার আবেদন আমি রাখতে পারি।

মহিলা বললেন—কোন অসুবিধে হবে না। আপনি এখুনি তাঁদের সকলকে খবর পাঠিয়ে আনান।

শুনে ব্যাসদেব একটু চমকেই উঠলেন। বলেন কি মহিলা? ঠিক আছে, দেখাই যাক।

খবর পাওয়ামাত্রই শিষ্যরা এসে হাজির হল। মহিলা একাই যেন

হাজার হাতে সকলকে পরিবেশন করে খুব ভালভাবে খাওয়ালেন। সন্ধ্যার আগেই মহিলার অতিথিসেবা মিটে গেল।

একটু বিশ্রাম নিতে বসেছেন ব্যাসদেব। এমন সময় ঘরের সব পাট চুকিয়ে মহিলা এসে বসলেন ব্যাসদেবের সামনে।

সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি সর্বজ্ঞ, সুপণ্ডিত, বেদ ভাগ করা থেকে শুরু করে সংহিতা-স্মৃতি-উপনিষদ-পুরাণ সবই আপনার সৃষ্টি। দয়া করে ধর্ম সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিন।

ব্যাসদেব বললেন—তোমার মত ধর্মশীল-কে আমি আর কি ধর্ম উপদেশ দেব মা? পত্নী হয়ে স্বামীর সেবার মত বড় ধর্ম কি আর কিছু আছে?

মহিলা বললেন—ও কথা জিজ্ঞেস করছি না। কি আচার-অনুষ্ঠান করলে ধর্ম অনুষ্ঠান করা হয়, আমি সেটাই জানতে ইচ্ছুক।

ব্যাসদেব বললেন—বাকসংযম, সহিষ্ণুতা, সব সময় বিচার করে কাজ করা, সকলের মঙ্গল চিন্তা—এগুলি যে করতে পারে, সেই ঠিকমত ধর্ম পালন করে মা।

—মুনিবর, তাই যদি সত্যি ধর্ম হয় তাহলে কোন কিছু ঘটলে কেন তা ঘটল, তার বিচার-বিবেচনা না করে যদি কেউ কাউকে



অভিশাপ দেয়, তাহলে শাস্ত্রমতে সে শাপ কার লাগে?

কথাটা শুনেই চমকে উঠলেন ব্যাসদেব। মহিলার মুখে হঠাৎ এমন এক প্রশ্ন কেন? কে ইনি?

—কি হল মুনিবর, বলুন, কার লাগবে?

আমতা আমতা করে ব্যাসদেব বললেন—যে দেয় তার লাগবে।

এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন মহিলার বৃদ্ধ স্বামী। এবার মুখ খুললেন। জিজ্ঞেস করলেন—এতই যদি জ্ঞান মুনি, তাহলে বল তো, দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষে যখন পেলে না, তখন তাকে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে সংযত চিত্তে থাকতে পারলে না কেন? বিচার-বিবেচনা না করে নিরপরাধ এই কাশীবাসীদের ওপর কটূক্তি করলে কেন?

এবার ভয়ে ব্যাসদেবের বুক শুকিয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, এই স্বামী-স্ত্রী আর কেউ নন—স্বয়ং বিশ্বেশ্বর আর ভবানী।

বিশ্বেশ্বর বললেন—শোন মুনি, তোমার শরীর থেকে রাগ-ক্রোধ এখনও যায় নি। আমার এই কাশীতে বাস করার যোগ্যতা তোমার নেই। তুমি তোমার শিষ্যদের নিয়ে আমার কাশী ছেড়ে অন্য কোথাও থাক গে।

জীবনে এত বড় লাঞ্ছনা ব্যাসদেব বোধ হয় আর কখনো ভোগ করেন নি। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পার্বতীর পায়ে পড়ে অনেকবার ক্ষমা চাইলেন। শেষে অনুরোধ রাখলেন—বেশ, আমি অন্য জায়গাতেই গিয়ে বসবাস করব। তবে প্রতি অষ্টমী আর চতুর্দশী তিথিতে একবার করে আসব—এই অনুমতিটুকু দিন।

পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব অবশ্য শেষে সেই অনুমতিটুকু দিয়েছিলেন।

ব্যাসদেব চলে গিয়েছিলেন কাশীর সীমানা ছাড়িয়ে গঙ্গার অপর পাড়ে। আজও যার নাম 'ব্যাস-কাশী।'

বিশ্বকর্মার কাহিনী

প্রজাপতি ত্বষ্টর ছেলের নাম বিশ্বকর্মা।

যথাসময়ে মা-বাবা বিশ্বকর্মার উপনয়ন দিয়ে তাকে লেখাপড়া শেখার জন্য গুরুকুলে রেখে গেলেন।

সে সময়ে এই রকমই নিয়ম ছিল। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচারী হয়ে সংযত থেকে গুরুকুলে বসবাস করে লেখাপড়া, জ্ঞান আহরণ করতে হতো। গুরুর গরু চরানো, মাঠে কিষান খাটা, টুকিটাকি ফাইফরমাস খেটে গুরুকে সন্তুষ্ট রেখে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে হতো। তারপর গুরু অনুমতি দিলে ঘরে ফিরে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে সৎ জীবনযাপন করতে হতো।

বিশ্বকর্মাও তাই গুরুকুলে থেকে পাঠাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য গুরুসেবা করত।

একবার গুরু বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললেন—দেখ, সামনে বর্ষা আসছে। আমাদের জন্য কাঠ পাতা দিয়ে এমন একটা ঘর তৈরি করে দাও যা কখনো ভেঙে পড়বে না বা নষ্ট হবে না।

গুরুপত্নী কাছেই ছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন—দেখ বিশ্বকর্মা, গাছের ছাল দিয়ে যে জামা-ই তৈরি করি না কেন, তা যেন ঠিক গাছের মত হয় না, তাড়াতাড়ি ময়লাও হয়ে যায়। তুমি আমার জন্য এমন একটা জামা তৈরি করে দাও যা আমার গায়ে আঁটসাঁট হবে না, আবার ঢিলেঢালাও হবে না, আবার কোন দিন ময়লাও হবে না।

গুরুপুত্র অমনি এক দাবি জানিয়ে বলল—কাঠ দিয়ে আমার জন্য এমন একটা জুতো তোমায় বানিয়ে দিতে হবে যা পায়ে দিয়ে জলে, কাদায়, ডাঙায় আমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারি। আর তা পায়ে দিয়ে যেন আরাম বোধ করি।

অমনি সঙ্গে সঙ্গে বায়না ধরল গুরুকন্যা—বিশ্বকর্মা, আমার রান্না-রান্না খেলার বড় ইচ্ছে। একখানা কাঠ দিয়ে এক থামওয়ালা একখানা ঘর, যাকে আমি ইচ্ছেমত যেখানে-সেখানে নিয়ে যেতে পারি, পিঁড়ে, হাঁড়ি, থালা, আর হাতির দাঁতের কিছু খেলনা তৈরি করে দাও। আর সেই সঙ্গে দুটো সোনার মাকড়ি।

বালক বিশ্বকর্মার তো এসব শুনতে শুনতে কান ঝাঁ ঝাঁ করে

উঠল।

গুরুদেব থেকে শুরু করে গুরুকন্যা পর্যন্ত যেসব ফরমায়েসি কাজ দিলেন, সবই নিখুঁত কারিগরি আর শিল্পকলার কাজ। এসবের তো সে কিছুই জানে না, শেখেও নি। অথচ গুরুর আদেশ পালন করতেই হবে। ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুরুকুলে থাকার সময়, এইটুকুই শুধু সে জেনেছে, গুরুর আদেশ অমান্য করা মহাপাপ। গুরুর ইচ্ছা পূরণ না করলে গুরু রুষ্ট হন। আর গুরু রুষ্ট হলে যেটুকু শিখেছে, সেটুকু তো নষ্ট হয়ে যাবেই, এমন কি নরকে যেতে হবে।

নিষ্পাপ সরল বালক বিশ্বকর্মা সকলের কাছেই কিছুটা সময় চেয়ে নিয়ে বনে গেল। সেখানে নিরালা একটা জায়গা দেখে বসল। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। কি করবে? কার কাছে গেলে সে এই সব সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবে?

বসে বসে এসব সাত-পাঁচ ভাবছে, এমন সময় বিশ্বকর্মা দেখতে পেল এক তাপসকে। গেরুয়া বসন, কপালে ভস্মের যেন ঢেউ আঁকা, সারা গায়ে ছাই-ভস্ম, তবুও শরীরের কি উজ্জ্বল কান্তি, কি প্রশান্ত মুখ! তাপসকে দেখে বিশ্বকর্মার খুব ভাল লাগল। মনে হঠাৎ আনন্দ এল।

তাড়াতাড়ি নিজের জায়গা থেকে উঠে বিশ্বকর্মা গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাল।

তাপস জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? এখানে এমনভাবে বসে আছ কেন?

বিশ্বকর্মা বলল—আমি প্রজাপতি ত্বষ্টার ছেলে, বিশ্বকর্মা।

নিজের পরিচয়টুকু দিয়ে বিশ্বকর্মা তার সমস্যার কথা বলল।

—আমার বিশ্বাস, আপনি এর একটা উপায় করে দিতে পারবেন। বলুন, কিভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারি। গুরুকুলকে সন্তুষ্ট করতে পারি।

শুনে তাপস বললেন—দেখ, এসব বিদ্যে খুব ভাল জানেন বিশ্বেশ্বর শিব নামে এক দেবতা। তুমি যদি তাঁর কাছে যেতে পার, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তোমায় শিখিয়ে দিতে পারেন, কি ভাবে এসব করতে হবে।

শুনেই বিশ্বকর্মার মন শিবের জন্য আকুলি-বিকুলি করে ওঠে।

—কোথায় থাকেন তিনি? আমি যেভাবেই হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করে জেনে নেব।। গুরুর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে তিনি কি আমায় সাহায্য করবেন না?

—প্রথমে তাঁর দেখা পাওয়া বড় শক্ত। তার ওপর চট করে কাউকে আমলও দেন না। বললেন তাপস।

বালক বিশ্বকর্মা বলল—কোথাও না কোথাও তো তাঁর দেখা পাওয়া যাবেই। আপনি আমাকে সেই জায়গার ঠিকানাটা দিন। আমি সেখানে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করব। একদিন তো দেখা পাবই। তখন আমি নিশ্চয়ই তাঁর মন জয় করতে পারব।

ভারি সহজ সরল মন বালক বিশ্বকর্মার। কথাগুলো ভারি ভাল লাগল তাপসের। বললেন—কাশীতে আনন্দকানন নামে একটা জায়গা আছে, জানো? সেখানে তিনি প্রায়ই আসেন। যাও। হয়ত দেখা পাবে।

—আনন্দকানন কোথায়? আমি তো জানি না। আমাকে দয়া করে একটু পথটা দেখিয়ে দিন। বালক বিশ্বকর্মা তাপসকে অনুরোধ করল।

তাপস বললেন—এখান থেকে অনেকখানি দূর। পথ গোলমেলে। বলে দিলে কি তুমি একা যেতে পারবে? আমিও ঐ আনন্দকাননেই যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে চল।

খুব খুশি বিশ্বকর্মা।

তাপস বললেন—এই হল আনন্দকানন। বলতে গেলে এখানে তিনি রোজই আসেন। তবে বিশ্বকর্মা, যদি তাঁর দেখা পেতে চাও, তাহলে তোমাকে যে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ করতে হবে বলুন?

—এখানে একটা শিবলিঙ্গ বসাও। আর প্রতিদিন তাতে জল ঢালবে। মাথায় ফুল-বেলপাতা চাপাবে। আর অনবরত মনে মনে তাঁকে ডাকবে। তাহলে তিনি তোমায় অবশ্যই দেখা দেবেন। তাপস বললেন।

বিশ্বকর্মাও আশেপাশের শিবলিঙ্গ দেখে অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা লিঙ্গ তৈরি করে তাপসকে দেখতে গিয়ে দেখল, তিনি আর সেখানে নেই।

একটা জায়গায় লিঙ্গটিকে বসিয়ে প্রায় সারা আনন্দকানটাই বিশ্বকর্মা তখুনি চষে ফেলল। অনেককেই দেখতে পেল, কিন্তু কোথায় সেই তাপস? এত অল্প সময়ের মধ্যে এভাবে অদৃশ্য হয়ে



যাওয়া তো সম্ভব নয়। তবে কি শিব নিজে তাপসের বেশ ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এলেন? ভাবতে গিয়ে বিশ্বকর্মার রোমাঞ্চ জাগল। ঈশ্বরের মহিমা বোঝে সাধ্য কার?

যাই হোক, নিজের তৈরি করা লিঙ্গের সামনে বসে তাপস যেমনটি বলে গিয়েছিলেন, সেই ভাবেই বিশ্বকর্মা কাজ করে চলল।

এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন বিশ্বকর্মা দেখল যেন সেই লিঙ্গ ভেদ করে জটাজুটধারী এক পুরুষ উঠে এলেন। পরনে বাঘছাল, গায়ে সাপের মালা, মুখটি কিন্তু দেখতে ঠিক সেই তাপসের মত। কপালে ভস্মের ঢেউ। তারই মাঝে আবার যেন একটা আধ-বোজা চোখ।

বিশ্বকর্মা ধড়মড় করে উঠে তাঁ... প্রণাম জানাল।

মহাদেব বললেন—তোমার সরল... র গুরুভক্তি দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাকে বর দিচ্ছি, তুমি অসাধারণ

নিখুঁত শিল্পী-কারিগর হবে। কার মনের কি অভিলাষ, তা তাদের বলার আগেই তুমি বুঝতে পারবে। তোমার শিল্পকর্ম দেবতাদের কাছেও প্রশংসনীয় হবে।

বিশ্বকর্মা বলল—দেব, আমার বড় ইচ্ছে গুরুর কাজ করে দিয়ে তাঁর সম্মতি নিয়ে আপনার এখানে এসেই আমি থাকি। আপনি আমাকে সেই অনুমতি দিন।

শিব অনুমতি দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

বিশ্বকর্মাও ফিরে গেল গুরুকুলে।

তারপর আর কোন অসুবিধেই হল না বিশ্বকর্মার।

গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, গুরুকন্যা—যার যে রকম আদেশ ছিল তা করে দিল। দেখে, তাঁরাও হতবাক হয়ে গেলেন। বিশ্বকর্মা যে এত সুন্দর ভাবে সব কিছু করে দিতে পারবে, তা তাঁরা ভাবতেও পারেন নি। গুরুদেব স্নেহভরে বিশ্বকর্মাকে প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করলেন।

বিশ্বকর্মাও গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে কাশীতে সেই যে চলে এল, আর কোথাও গেল না। দেবস্থপতি হয়ে সব সময় শিবের আরাধনাতেই কাল কাটাতে লাগল।



রাজা দিবোদাসের কাহিনী

পৃথিবীতে একবার অনাবৃষ্টি শুরু হল। সূর্যের তাপে চারদিকে যেন আগুন লাগল। এক-দু বছর নয়, চলল একটানা ষাট বছর। খাল-বিল-ডোবা-পুকুর—যেখানে যত জলাশয় ছিল, সব শুকিয়ে গেল। সব বন দাবানলে পুড়ে গেল, জলের অভাবে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ফসলের অভাব, অনাহার, মহামারী—পৃথিবীতে চারদিকে এক তাণ্ডব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সব বুঝি লোপ পেয়ে যায়। দেখে ব্রহ্মা খুবই চিন্তায় পড়লেন। এত সাধনার সৃষ্টি তাঁর, চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে?

যা হোক একটা উপায় না করতে পারলে তিনি আর কি বিধাতা হলেন!

পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর ভাবছেন। এমন সময় দেখলেন, মনু বংশেরই রাজর্ষি রিপুঞ্জয় কাশীতে এসে তপস্যা করছেন।

রিপুঞ্জয়কে দেখা মাত্রই ব্রহ্মা মনস্থির করে ফেললেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—রাজর্ষি, তোমাকে পৃথিবীর রাজা হতে হবে।

ব্রহ্মার অনুরোধ শুনে রিপুঞ্জয় তো অবাক—দেখুন, রাজকাজ আমার ভাল লাগে না বলেই আমি তপ্যায় এসেছি। আমায় এ কাজের দায়িত্ব নিতে বলছেন কেন?

ব্রহ্মা বললেন—তুমি তো পৃথিবীর বাইরের কেউ নও। রিপুঞ্জয়, চেয়ে দেখ, অনাচারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। ফলে চারদিকে হাহাকার। তুমি ধার্মিক রাজর্ষি। তুমি রাজা হলে পৃথিবী আবার শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে। প্রজাদের মনে শান্তি আসবে। তাই তোমাকে আমি এই অনুরোধ করছি।

রিপুঞ্জয় কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন রাজা হতে রাজি আছি, তবে একটা শর্তে।

—কি শর্ত?

—আমি পৃথিবীর রাজা হলে এই পৃথিবী ছেড়ে দেবতাদের স্বর্গে চলে যেতে হবে। যক্ষ, নাগ যে যেখানে আছে, তাদের সকলকে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে হবে। পৃথিবীতে শুধু মানুষই থাকবে। অন্য কারো থাকা চলবে না।

ব্রহ্মার কানে রিপুঞ্জয়ের কথাগুলো কেমন যেন খট করে লাগল। তবুও সৃষ্টিকে বাঁচাবার জন্য তাতেই সম্মতি জানালেন।

রিপুঞ্জয় সম্রাট হলেন। তাঁর নতুন নাম হল 'দিবোদাস।'

দিবোদাস সিংহাসনে বসেই তাঁর কিছু মন্ত্রী বেছে নিলেন। তারপর রাজ্যের সর্বত্র ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়ালেন এই বলে যে—'রাজা দিবোদাসের হুকুম...পৃথিবী ছেড়ে দেবতারা দেবলোকে চলে যান। যক্ষরা যক্ষলোকে চলে যান। নাগরা নাগলোকে চলে যান। পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কারো থাকা চলবে না—'

শর্ত মেনে দিবোদাসকে তো ব্রহ্মা সম্রাট করে পৃথিবী শাসনের ভার দিয়ে বসলেন। শর্ত-ও মারাত্মক। দেবাদিদেব কাশীশ্বর মহাদেবের সঙ্গে পরামর্শ করার সুযোগটুকুও পান নি। এখন যা হোক করে মহাদেবকে একটু বোঝাতে হবে। এই ভেবে প্রায় দৌড়ে এলেন মহাদেবের প্রাসাদে।

আসামাত্রই মহাদেব সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন—এসো-এসো, খুব ভালই হল। নন্দী-ভৃঙ্গি-উমাকে নিয়ে এইমাত্র বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।

—কোথায় দেব?

—কুশদ্বীপ (প্রাচীন ওশিয়ানিয়া, আবার কারো মতে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত, কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগরের সন্নিহিত অঞ্চল) থেকে মন্দর পর্বত এখানে এসে আমার জন্য কঠোর তপস্যা করছে। তাকে বর দিয়ে আসি।

ব্রহ্মা যে কথা বলতে এসেছিলেন, তা আর বলা হল না। বাধ্য হয়েই সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন মন্দরের সামনে।



পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবকে, তার ওপর ব্রহ্মাকে দেখে মন্দর তো দারুণ খুশি।

মহাদেব জিজ্ঞেস করলেন—মন্দর, তুমি কিসের জন্য এমন তপস্যা করছ? কি তোমার অভিলাষ?

মন্দর বলল—প্রভু, আমার বড় ইচ্ছে, আপনি সপরিবারে আমার ওখানে গিয়ে থাকুন।

মন্দরের প্রার্থনা শুনে মহাদেব পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। যে কঠোর তপস্যা মন্দর করছে, তাতে তাকে বর দিলে তাঁর নিজের অতি প্রিয় এই কাশী ছেড়ে যেতে হবে। তাই-বা কেমন করে সম্ভব। কাশী যে তাঁর সব কিছু। এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে তিনি এতটুকু শান্তি পাবেন না।

মহাদেব ইতস্তত করছেন দেখে ব্রহ্মা সুযোগ নিলেন। দিবোদাসকে সম্রাট করা, কোন শর্তে সম্রাট করেছেন আদ্যোপান্ত সব বলে অনুরোধ জানালেন, মহাদেব যেন অন্তত তাঁর মুখ চেয়ে আপাতত মন্দরের অভিলাষ পূর্ণ করেন। নইলে দিবোদাসের কাছে তিনি হেয় হয়ে যাবেন।

সব শুনে মহাদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—সত্য রক্ষাই তো আমাদের ধর্ম ব্রহ্মা। তুমি যখন কথা দিয়েছ, তখন এখান থেকে আমাদের চলে যেতেই হবে। বেশ, তাই হোক। মন্দরের ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।

সপরিবারে দেবাদিদেব চলে গেলেন কুশদ্বীপে। দেবতারাও সকলে যেতে বাধ্য হলেন।

যক্ষ-নাগ যে যেখানে ছিল সবাই চলে গেল।

মহাপতি দিবোদাসের সুশাসন চালু হল পৃথিবীতে। যেখানে যত অরাজকতা ছিল, কোথাও তার আর চিহ্ন দেখা গেল না। ফলে-ফুলে-শস্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল পৃথিবী। মানুষজন, যে যার কাজ নিশ্চিন্ত মনে করে চলল। কোথাও কোন অশান্তির চিহ্নও আর নেই।

ওদিকে মন্দরে গিয়ে দেবতারা মন্দরের আতিথেয়তা বেশ দেব-হালেই আছেন। মহাদেবেরও কোথাও কোন অসুবিধে রাখে নি মন্দর। তবুও মহাদেব মনে যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না। সব সুখভোগের মধ্যে থেকেও পৃথিবী ছেড়ে থাকতে হচ্ছে দেখে, দেবতারাও যে খুব একটা শান্তিতে আছেন, তা নয়। কিন্তু করবারই-বা এখন কি আছে? হাজার হলেও দিবোদাস তো মানুষ। একজন মানুষ আর কত বছর বেঁচে থাকবে? তারপর পৃথিবীতে গিয়ে থাকায় তো আর নিষেধ নেই। সবই ঠিক। তবুও যিনি এক মুহূর্তও কখনো কাশীর বাইরে থাকেন নি, সেই মহাদেব কোনমতেই নিজের মনকে ঠিক করতে পারছেন না। আবার ফিরেও যেতে পারছেন না, পাছে ব্রহ্মার কথার খেলাপ হয়।

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। বছরের পর বছর করতে করতে আশি হাজার বছর কেটে গেল। দিবোদাসও মরে না, মহাদেবেরও কাশীতে ফেরা হয় না। দেবতারাও পৃথিবীতে ঢুকতে পান না। আর স্থির থাকতে না পেরে দেবতারা সবাই মিলে দিবোদাসের পতন ঘটানোর জন্য চক্রান্ত করতে শুরু করে দিলেন।

দেবগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রণা দিলেন—আগে দেখ, দিবোদাস ঠিক ঠিক ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করছে কিনা। না করলে তার পতন ঘটাতে কতক্ষণ?

দেবগুরুর কথায় গোপনে দেবতারা সারা পৃথিবী ঘুরে দেখে গিয়ে বললেন—নাঃ, কোথাও তেমন কিছু দেখলাম না। পৃথিবী যেন স্বর্গের চেয়েও মনোরম হয়ে গেছে। কোথাও কোন অধর্ম নেই। একেবারে সুশৃঙ্খল। এখন উপায় কি দেবগুরু? দিবোদাসের কি পতন ঘটবে না?

—একটা পথ আছে। সেদিকে একবার চেষ্টা করলে কিছু ফল হতেও পারে।

—কি পথ, বলুন।

—তোমরা সবাই চলে এসেছ বটে, কিন্তু তোমাদের অনেকেই গোপনে তাকে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছ। যদি সেটা বন্ধ কর তাহলে...

—কি রকম?

—এই যে অগ্নিদেব এখানে চলে এসেছ। কিন্তু পৃথিবীতে কি তুমি কিছুই রেখে আস নি? যদি রেখে না আসতে, তাহলে প্রাণীরা খিদের জ্বালা অনুভব করত। ঘরে ঘরে আগুন জ্বলত না। বরুণদেব যদি তার শক্তি রেখে না আসত, তাহলে পৃথিবীতে কোথাও জল থাকত না। দিবোদাস তোমাদের দূর করে দিলেও, তোমরা কিন্তু মোহ ত্যাগ করতে পার নি। এতে তো দিবোদাসেরই সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে, তাই না? দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন।

—ঠিক...ঠিক বলেছেন দেবগুরু! এ কথা তো একদিনের জন্যও মাথায় আসে নি।

এদিকে কাশীর রাজপ্রাসাদে দুপুরের উপাসনা সেরে রাজা দিবোদাস খাবার ঘরে এলেন খেতে। রাজাকে দেখেই তো পাচকদের বুক দুরুদুরু করে উঠল।.

খাবার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে রাজা হাঁক দিলেন—কি হে, আজ এত দেরি করছ কেন?

হাত কচলাতে কচলাতে পাচক মাথা হেঁট করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমতা আমতা করে বলল—মহারাজ, যদি অভয়



দেন তো বলি।

—কি হয়েছে? বল বল, কোন ভয় নেই।

—আজ্ঞে, অনেক চেষ্টা করেও আজ আগুন জ্বালাতে পারি নি।

—সে কি! শুনে একটু অবাকই হলেন দিবোদাস। তারপর কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে চোখ বুজে বসলেন। দেখে মনে হবে যেন তিনি আর এ জগতে নেই।

কিছুক্ষণ মাত্র। তারপরই উঠে দাঁড়ালেন। পাচককে বললেন—ঠিক আছে, তোমার কিছু করার নেই, যাও।

এই বলে সভায় এসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে। সকলের সেই একই বক্তব্য—কেউ আগুন জ্বালাতে পারে নি। হোম-যাগ করতে পারে নি, রাঁধতে পারে নি।

দিবোদাস সকলকে শান্ত করে বললেন—আমার একটু ভুলের জন্যই তোমাদের এই কষ্ট হল। দেবতাদের চলে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তাদের শক্তিগুলোকে তখন চলে যেতে বলি নি। দেবতারা আজ তারই সুযোগ নিয়ে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করছে, যাতে তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠ। আমি তোমাদের অভয় দিচ্ছি, প্রজাগণ, আমি তোমাদের সব অভাব মিটিয়ে দেব। পৃথিবীকে আরো শস্যশালিনী করে তুলব।

দিবোদাসের রাজত্বে সুখেই আছে প্রজারা। তাঁর ক্ষমতাতেও তাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল সবাই। আর দিবোদাস? মহাযোগী দিবোদাস একমাত্র কুল-দেবতা ভাস্করকে রেখে সকলকে বিদেয় করে দিয়ে নিজেই একাধারে বায়ু, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র হয়ে পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তুললেন।

তা দেখে দেবতারাও প্রমাদ গুণলেন। এখন উপায়? পৃথিবীতে কি তাহলে তাঁরা আর কোন দিনই ঢুকতে পারবেন না? ওদিকে দিনে দিনে মহাদেবের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। মুখে কথা নেই, মনে আনন্দ নেই। দেখে পার্বতীরও খুব কষ্ট হল।

একদিন পার্বতী মহাদেবকে বললেন—ইচ্ছে করলে আপনি তো সবই করতে পারেন। দিবোদাসকে সরিয়ে কাশীতে ফিরে যাওয়া কি আপনার পক্ষে এতই কঠিন?

মহাদেব বললেন—পার্বতী, খুবই কঠিন। শুনছি, দিবোদাস ধর্মানুসারে পৃথিবী শাসন করছে। আমরা ধর্মের রক্ষক। সে যতক্ষণ ধর্মপথে থাকবে, ততক্ষণ আমরা কি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি? না, করা উচিত? সত্যিই সে এখনো ধর্মপথে ঠিক ঠিক আছে কিনা, সময় সময় তার খবর যদি কেউ আমায় এনে দেয়, তখন অন্য কথা ভাবতে পারি। কিন্তু কে তা এনে দেবে?

ঠিক এই সময়েই মহাদেবের চৌষট্টি যোগিনী সেখানে এসে হাজির হল। পার্বতী তাদের দেখিয়ে মহাদেবকে বললেন—এরা তো অসাধ্য সাধন করতে পারে। এরাই যাক না, দেখে আসুক।

মহাদেব সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন—কাশীর সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখে আসবে সবাই ঠিক ঠিক ধর্মপথে আছে কিনা। কোথাও অধর্মের লেশমাত্র দেখলে আমায় এসে বলবে।

যোগিনীরা উড়ল আকাশে। মুহূর্তের মধ্যে কাশীর একটু দূরে নেমে নানা বেশ ধরল তারা। কেউ ভাল ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক জানে, কেউ ভাল নাচতে পারে, কেউ ভাল গান গেয়ে মন ভোলাতে পারে—এই রকম নানা বেশ ধরে কাশীর প্রায় প্রতিটি দ্বারে দ্বারে ঘুরল। দেখল, মানুষগুলোর কি নিষ্ঠা! সবাই কি ধর্মপরায়ণ! কোন ভাবেই তারা কারোর মন টলাতে না পেরে কাশীতেই থেকে গেল। মন্দরে আর ফিরল না। কিছু করতে না পারার জন্য যদি হর-পার্বতী রাগ করেন, এই ভয়ে।

যোগিনীরা ফিরল না দেখে মহাদেব সূর্যকে ডেকে বললেন—মিত্র, তুমি যাও। গিয়ে দেখ। কিন্তু সাবধান, দিবোদাস যদি এখনও ধর্মপথে থাকে, প্রজারা সবাই ধর্ম-অনুশীলন করে, তাহলে তাদের যেন কোন ক্ষতি কোরো না। যদি কোথাও অধর্ম দেখ, আমাকে এসে বলবে।

সূর্যদেব এলেন কাশীতে। কখনো অতিথির বেশে, কখনো গণৎকারের বেশে, কখনো সন্ন্যাসী, কখনো-বা বণিক—নানা বেশে এক বছর ধরে সারা কাশী ঘুরে দেখলেন। না, কোথাও কোন ফাঁক নেই। কি মুখ নিয়ে সূর্যদেব ফিরে যাবেন, কি বলবেন মহাদেবকে? যদি রেগে যান তাহলে স্বয়ং ব্রহ্মার ক্ষমতা হবে না তাঁকে বাঁচানোর। এই সাত-পাঁচ ভেবে সূর্যদেবও কাশীতে থেকে গেলেন।

সূর্যদেবও কাশীর সংবাদ নিয়ে ফিরলেন না দেখে মহাদেব এবার ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন—ব্রহ্মা, কাশী ছেড়ে থাকা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি তো সবই জানো, তোমাকে আর কি বলব। একটু চেষ্টা করে দেখ, যদি কোন উপায় বের করতে পার।

হাঁসের পিঠে চেপে ব্রহ্মা মুহূর্তে কাশীতে এলেন।

তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে তিনি দিবোদাসের কাছে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সিংহাসন থেকে নেমে যেভাবে ব্রাহ্মণকে সম্ভাষণ জানানো উচিত, সেভাবে সম্ভাষণ জানিয়ে সযত্নে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার জন্য আমায় কি করতে হবে বলুন।

ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মা বললেন—শুনেছি, আপনি খুব ধার্মিক। তার ওপর মহাদেবের প্রিয় কাশীর এবং পৃথিবীর অধিপতি। এই পুণ্যক্ষেত্রে যজ্ঞ করতে আমার বড় ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার তো অমন অর্থ-সামর্থ্য নেই। তাই আপনার কাছে এসেছি।

দিবোদাস শুনে বললেন—এ তো বড় আনন্দের কথা। এতদিনের মধ্যে এই ইচ্ছা নিয়ে আপনিই প্রথম এলেন। এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য! আমি রাজা ঠিকই, কিন্তু রাজকোষের এক কপর্দকও আমি বা আমার পরিবার ভোগ করে না। আমার রাজ্যে যা কিছু আছে, যজ্ঞের জন্য সবই আপনাকে দান করলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত যজ্ঞ করুন। আর অনুরোধ, আপনার এই যজ্ঞে আমাকে দাস করুন।

ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে যজ্ঞ শুরু করলেন। একটা-দুটো নয়—দশটা যজ্ঞ। আর তা যতদিন চলেছিল, সপরিবারে রাজা দিবোদাস শুধু তাঁর দাসের মত খেটেই ক্ষান্ত হন নি, ভাঁড়ার উজাড় করে দিয়েছিলেন।

তাই দেখে ব্রহ্মার আর মন্দরে ফিরে যাওয়া হল না। তিনিও কাশীতেই থেকে গেলেন।

মহাদেব এবার তাঁর অনুচরদের মধ্যে সব দিক থেকে সেরা ছত্রিশ জন অনুচরকে (গণকে) দফায় দফায় পাঠালেন সকলের খবর জেনে আসতে। আর, যদি পারে মহাদেব যাতে কাশীতে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে।

শঙ্কুকর্ণ, ঘণ্টাকর্ণ, নন্দী, সোমনন্দী, নন্দীষেণ দফায় দফায় সবাই গেল, চেষ্টাও করল অনেক। কিন্তু কিছুই করতে না পেরে সেখানেই থেকে গেল।

এদিকে মহাদেব রয়েছেন অধীর অপেক্ষা করে। দেখলেন যে যাচ্ছে, সে আর ফিরে আসছে না। ব্যাপারটা কি হল? কাশীর এখন অবস্থা কেমন? কেউ-ই ফিরল না কেন?

আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেন যে, তিনি কাশীতে যেতে না পারলেও যারা গেছে, তারা তো সবাই তাঁরই আপনজন। কাশীতে তাদের থাকা মানে প্রায় নিজেরই থাকা। তবুও তাঁর মন ছটফট করে ওঠে।

এরপর অনেক ভেবে-চিন্তে মহাদেব ছেলে গণেশকে ডাকলেন। বললেন—বাবা, তুমি তো জানো, কাশী আমার কাছে কি। কাশী ছেড়ে কতদিন হল আমি এখানে পড়ে আছি। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। যাকেই কাশীর খবর নিতে পাঠাই, সে আর ফেরে না। বাবা, তুমি একবার নিজে যাও। দেখ, কি ব্যাপার।

বাবার আদেশে গণেশ কাশীতে এসে হাজির হলেন। ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব কিছু। কোথাও কোন অশান্তি নেই। কোথাও এমন কিছু নেই যা ধরে দিবোদাসকে কাৎ করা যেতে পারে। অথচ, কাশীর জন্য বাবার কি কষ্ট! কাশীতে আসার জন্য তাঁর কি আগ্রহ? গণেশ ভাবলেন, যা হোক একটা উপায় না করলে ছেলের কাজ তিনি কি করলেন?

গণেশের আর এক নামই হয়ে গেছে 'বিঘ্নরাজ' বলে। কেননা, বিঘ্ন সৃষ্টি করতে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর জুড়ি আর কেউ নেই।

বারাণসীতে এসে অনেক ভেবেচিন্তে তিনি একটা উপায় বের করলেন। গণৎকার সাজলেন। সংসারী মানুষমাত্রেই ভাগ্যের ফলাফল জানতে খুবই আগ্রহী। আগে সেই গণকের কাজ করে সকলের কাছে পরিচিত হওয়া দরকার।

এই ভেবে তিনি গণৎকার সেজে নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। নাম নিলেন 'গুণবৃদ্ধ।' নগরবাসী প্রথম দিকে বিশেষ একটা আগ্রহ না দেখালেও তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ দেখেই বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব বলতে আরম্ভ করে দিলেন। নগরবাসীরা যখন দেখল মানুষটা ধোঁকা দিচ্ছে না, বরং যা বলছে সবই ঠিক, তখন



অনেকেই তাঁর বিশেষ অনুগত হয়ে পড়ল।।

গণেশ যখন দেখলেন, নগরবাসী সত্যি সত্যিই তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছে, তখন তিনি শুরু করলেন আর এক খেলা।

কাশী ছেড়ে যাবার আগে তিনি যেখানে থাকতেন সেখানেই আস্তানা গাড়লেন। তারপর, রাতে বেছে বেছে কিছু কিছু মানুষকে নানারকম স্বপ্ন দেখাতে লাগলেন। তারপর সকাল হতেই, নগরে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাদেরই কাছে এসে বলতে লাগলেন—এই যে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে, গতকাল রাতে তুমি স্বপ্ন দেখেছ?

শুনে থমকে দাঁড়িয়ে যেত লোকটা।

গুণবৃদ্ধ বলতেন—হ্যাঁ, ঠিক। তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ আমি তোমার মুখ দেখেই বলছি। দেখ তো মেলে কিনা। তুমি দেখেছ যে, গভীর একটা হ্রদে হঠাৎ তুমি পড়ে গেছ। সেখান দিয়ে সাঁতরে উঠে আসতে গেলে। কিন্তু জায়গাটা এত পিছল ছিল যে তুমি পিছলে গেলে। তারপর যেখানে এসে উঠলে সেখানটায় আবার দেখলে, দারুণ কাদা। তাই না?

মানুষটি তো শুনে অবাক।

—সামনে বড় বিপদ আসছে। সাবধানে থাকবে। এই বলে গুণবৃদ্ধ আবার ঘুরতে ঘুরতে এলেন আর একজনের কাছে।

তাকে ডেকে বললেন—এই যে, তোমার মুখ বলছে, গতকাল তুমি ভয়ানক এক স্বপ্ন দেখেছ।

মানুষটি বলল—হ্যাঁ, ঠাকুর। স্বপ্ন যে কখনো এরকম হতে পারে, ভাবতে পারি নি। গুণবৃদ্ধ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—আমি বলছি তুমি কি দেখেছ। দেখ তো, মেলে কিনা। দেখলে, সূর্য উঠল আকাশে পশ্চিম দিক থেকে। সেখানে ছিল চাঁদ। সূর্য তাকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল। তাই না?

—হ্যাঁ ঠাকুর, ঠিক তাই। এর মানে কি?

গুণবৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে বললেন—অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যের দারুণ ক্ষতি হবে। সাবধানে থাকবে।

সে চলে গেলে অপর একজনকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ, তুমিও তো দেখছি খুব বাজে স্বপ্ন দেখেছ। আকাশে দেখেছ দুটো কেতু গ্রহ পরস্পর লড়াই করছে, তাই না? এর মানে জানো? দিবোদাসের রাজ্যে ভাঙন এল বলে।

আবার অপর একজনকে ডেকে বললেন—তুমি স্বপ্নে দেখলে একজোড়া হরিণ নগরের চারদিকে বেড়াচ্ছে, ঠিক তো?

—হ্যাঁ ঠাকুর। দেখে অবধি মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

—যদি বাঁচতে চাও এক মাসের মধ্যে এই রাজ্য ছেড়ে পালাও। রাজার সঙ্গে এই রাজ্যেরও দারুণ ক্ষতি আসছে।

এইভাবে প্রায় জনে জনে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন গণেশ। আর সকালে ঠিক তাদেরই কাছে গিয়ে স্বপ্নের মানে বলে দিতে লাগলেন।

গুণবৃদ্ধের ওপর মানুষের এমনিতেই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। এবার এই সব ভয়ের কথা শুনে, প্রায় সকলেই কাশী ছেড়ে পালাবার উদ্যোগ নিতে লাগল।

খবর গেল রাজার অন্দরমহলে। ভাগ্য জানার জন্য রানীরাও উৎসুক হয়ে উঠলেন। লুকিয়ে গুণবৃদ্ধকে অন্দরমহলে আনিয়ে রানীরা তাঁকে ছেঁকে ধরলেন। হাত না দেখেই গুণবৃদ্ধ তাঁদের মুখ

দেখে এমন সব কথা বলে দিতে লাগলেন, যা একমাত্র রানীদেরই জানা সম্ভব, আর কারো নয়।

এভাবে গুণবৃদ্ধ সুকৌশলে রানীদেরও বিশ্বাস অর্জন করলেন।

একদিন এক ফাঁকে মহিষী লীলাবতী রাজা দিবোদাসের কাছে গণৎকার ব্রাহ্মণ গুণবৃদ্ধের কথা ঘুরিয়ে বললেন—ভারি চমৎকার গণৎকার। আপনি তাঁর পরিচয় পেলে খুশিই হবেন।

রাজা বললেন—রানীর যখন একান্তই ইচ্ছে হচ্ছে, বেশ তো, পরিচিত হওয়া যাক।

রানীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাসীকে পাঠিয়ে গুণবৃদ্ধকে আনালেন। রাজাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সমাদর জানালেন। পরিচয়-আদি নিয়ে সেদিনের মত বিদায় দিলেন।

গুণবৃদ্ধ চলে গেলেন বটে, কিন্তু দেখে অবধি রাজার মন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। পরদিন সকালেই তাই লোক পাঠিয়ে সসম্মানে নিয়ে এসে বসালেন নিজের খাস-কামরায়। তারপর বললেন—আপনাকে দেখে অবধি আমার মনে হয়েছে আপনিই আমাকে সৎ-পরামর্শ দিতে পারবেন। সাধ্যমত এতদিন ধরে যেভাবে রাজ্য শাসন করে আসছি তা আর নিজ মুখে কি বলব। সম্প্রতি আমার আর এসব ভাল লাগছে না। কিভাবে মুক্তি পাব বলতে পারেন?

গুণবৃদ্ধ বললেন—আপনি কে, কি, আর কতখানি শক্তি ধরেন, তা আপনার মুখ দেখেই জানা হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কিসে আপনার মঙ্গল হবে তা-ও আমি জানি। তবে আমি নিজ মুখে তা আপনাকে বলব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, আজ থেকে আঠারো দিনের দিন উত্তর দেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ আসবেন। তিনিই আপনাকে আপনার শান্তির ও মুক্তির পথ বলে দেবেন। এই কদিন আপনাকে অপেক্ষা করে থাকতেই হবে।

এই বলে গুণবৃদ্ধ নিজের আবাসে ফিরে গিয়ে গোপনে যা করবার করে চললেন।

ওদিকে মহাদেব গণেশের পথ চেয়ে থেকে থেকে শেষে আর স্থির থাকতে না পেরে বিষ্ণুকে ডেকে কাশীতে পাঠালেন।

গরুড়-বাহন বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিয়ে কাশীর প্রান্তে নেমেই অন্য বেশ ধরলেন। বিষ্ণু হলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সৌগত পুণ্যকীর্তি, লক্ষ্মী হলেন পরিব্রাজিকা, আর গরুড় সাজলেন পুণ্যকীর্তির শিষ্য বিনয়কীর্তি।

এভাবে তাঁরা নগরে ঢুকে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহজ পথে কিভাবে ধর্মানুশীলন করা যায়, তাই নিয়ে জায়গায় জায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে তাঁদের আশেপাশে মানুষজন জড়ো হতে লাগল। মন দিয়ে শুনতে লাগল। কেউ কেউ প্রশ্নও করতে লাগল। পুণ্যকীর্তিও তাঁদের সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দিলেন পুজো-হোম, যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি করে স্বর্গলাভ হয় না। ও পথে কেউ কখনো মুক্তি পায় নি, পেতেও পারে না। মানুষের এই দেহটা কতদিন থাকবে? ব্যাধি, জরা একে গ্রাস করবে। মুক্তি মানে যদি আনন্দ হয়, যদি কেন—তোমাদের বেদই তো বলেছে, আনন্দই হল ব্রহ্ম। তাহলে মুক্তি মানে আনন্দ। তা যদি পেতে হয়, তাহলে শরীরের সামর্থ্য থাকতে থাকতে তা করা উচিত নয় কি?

মানুষজন শুনে ভাবল—ঠিক তো। শরীরটাই যদি বিকল হয়ে গেল, তাহলে আর আনন্দ নিয়ে লাভ কি? বিভ্রান্তিতে পড়ে মানুষজন চারদিকে ধর্মের নামে নানা অনাচার শুরু করে দিল।

বিষ্ণু অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন, এত সহজে তিনি মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বাজিমাৎ করতে পারলেন নিশ্চয়ই গণেশের দৌলতে। সত্যিই তাই। গণেশ তো ইতিমধ্যে মানুষকে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করেই রেখেছিলেন।

পুণ্যকীর্তি পুরুষদের মধ্যে আর পরিব্রাজিকা নারীদের মধ্যে অতি সহজেই এমন প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন যে, দলে দলে সকলে তাঁদের শিষ্য-শিষ্যা হতে শুরু করে দিল। জাতিভেদ, বর্ণভেদ লোপ পেয়ে যেতে আরম্ভ করল। অধর্ম অনাচার দেশকে গ্রাস করতে লাগল।

এই সব যত বাড়তে লাগল, দিবোদাসের সামর্থ্য তত কমতে লাগল। তিনি হীনবল হয়ে পড়তে লাগলেন।

গণৎকার ঠাকুর বলে গেছেন, আঠারো দিনের দিন এক ব্রাহ্মণ আসবেন। কবে যে সেদিন আসবে তার জন্য দিবোদাসের মন ছটফট করতে থাকে।

রাজ্যের চারদিকে অশান্তি, ধর্মের নামে অনাচার, হীনবল রাজা। দিবোদাস সব শুনতে পাচ্ছেন, তাঁর কাছে সব খবরই আসছে, কিন্তু আর যেন তিনি কিছু করতে পারছেন না। চিন্তায় আকুল হয়ে বসে আছেন সিংহাসনে।

এমন সময়ে সৌম্যকান্তি এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন রাজদ্বারে।

তাঁকে দেখেই চকিতে গুণবৃদ্ধের কথা রাজার মনে পড়ে গেল। মনে মনে হিসেব করে দেখলেন আজই সেই আঠারো দিন।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে নেমে ব্রাহ্মণকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ম-মত তাঁর পা ধুইয়ে সেবা করে নির্দিষ্ট এক সিংহাসনে বসালেন।

তারপর বললেন—আজ নিশ্চয়ই আমার শুভদিন। নইলে আপনি এখানে এই সময়ে আসবেন কেন? ব্রাহ্মণ, বহুদিন রাজকার্য করলাম। কখনো অধর্মাচরণ করি নি, অন্যায় করি নি। সাধ্যমত



পৃথিবীকে শাসন করেছি। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার চেষ্টা করেছি। আমার আর ভাল লাগছে না; খুবই বিরক্ত বোধ করছি। খালি মনে হচ্ছে, আমি নিজে যেন খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি। এই অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি বলুন, কিভাবে আমি মুক্তি পেতে পারি।

ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, ছদ্মবেশে জনার্দন বিষ্ণু নিজে।

রাজার কথা শুনে বুঝতে পারলেন, গণেশ কি সুন্দরভাবে সব পথ পরিষ্কার করে রেখেছেন।

ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু বললেন—আপনি রাজা হলেও রাজর্ষি, মহাযোগী। আপনার মনে এ রকম অশান্তি জাগার কারণ?

—বুঝতে পারছি না ব্রাহ্মণ। পৃথিবী থেকে সব দেবতাদের দূর করে নিজেই সব কিছু হয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছি বলেই বোধ হয়, আমার এই অশান্তি।

—না মহারাজ। ব্রাহ্মণ বললেন—দেবতাদের বিরোধিতা করে আপনি তাঁদের কোন অপকারই করেন নি।

—তাহলে? তাহলে আমি আর নিজেকে এত দুর্বল, এত অসহায় মনে করছি কেন? বলুন ব্রাহ্মণ, আপনি যা বলবেন, শান্তি পাবার জন্য আমি তাই করব।

সুযোগ বুঝে ব্রাহ্মণ বললেন—দেখুন মহারাজ, এই কাশী হল দেবাদিদেব মহাদেবের অতি প্রিয় স্থান। আমার মনে হয়, তাঁকেও এখান থেকে বের করে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেন নি। তাঁর দীর্ঘশ্বাসই, আমার ধারণা, আপনার এই মানসিক অশান্তির কারণ। আপনি বরং এক কাজ করুন। আপনি তাঁর আরাধনা করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাতদিনের মধ্যেই আপনি মুক্তি পাবেন।

রাজা দিবোদাসও ব্রাহ্মণের কথা শিরোধার্য করে নিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গঙ্গার ধারে নতুন এক প্রাসাদ তৈরি করিয়ে চলে গেলেন। সেখানে একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শিবের আরাধনায় মগ্ন হলেন।

ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুও কাশীতেই পঞ্চনদের কাছে কুটির তৈরি করে থেকে গেলেন, আর গরুড়ের মুখে মহাদেবকে মন্দরে সব খবর পাঠিয়ে দিলেন। বলে পাঠালেন—দিবোদাসের হাত থেকে কাশী এখন মুক্ত। দেবাদিদেব যেন সত্বর চলে আসেন।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে খবর নিয়ে গরুড় মন্দরে ছুটল। আর এদিকে ঠিক সাতদিনের দিন দিবোদাসও মহাদেবের আরাধনা করতে করতে সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন।

গরুড়ের মুখে খবর পেয়ে মহাদেবের সে কি উল্লাস!

বহুকাল পরে আবার কাশীতে আসতে পেরে তাঁর যে কি আনন্দ! সারা নগরীতে যেন মহোৎসব পড়ে গেল।

মহাদেব কিন্তু কাশীতে এসে তাঁর পুরনো প্রাসাদে উঠলেন না। কারণ সেই প্রাসাদের সব কিছু ভোগ করছিলেন দিবোদাস। তাই তাঁর আদেশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত সোনাদানা, অমূল্য মণিরত্ন ছিল তা দিয়ে বিশ্বকর্মা তাঁর জন্য নতুন এক প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন। মহাদেব সেই প্রাসাদে গিয়ে সেই যে উঠলেন, আজও সেখানে আছেন বহাল তবিয়তে।



ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

সুপ্রাচীনকালে জিজ্ঞাসু মুনিদের কাছে স্বয়ং বায়ু নৈমিষ্যারণ্যে এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেছিলেন। তারও বহুকাল পরে বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ সূত সেই নৈমিষ্যারণ্যেই শৌনক প্রমুখ ঋষিদের এই পুরাণ-কাহিনী শুনিয়েছিলেন। এই পুরাণের মুখবন্ধে দেখা যায় যে, এটি চার ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে এর একটি ভাগই (প্রক্রিয়া পাদ) মাত্র পাওয়া যায়। এই ভাগটিতে ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হল, যুগের ভাগ, ব্রহ্মার কল্প, মন্বন্তরের ইতিহাস, জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতির ভৌগোলিক বিবরণই বিশেষ করে বিশদভাবে পাওয়া যায়।

নৈমিষারণ্য প্রসঙ্গ

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সবই প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রজাপতি তিনি। তার কারণ বিশ্বের যা কিছু আমরা দেখছি, এমন কি আমরা সকলেই তাঁর প্রজা। তিনি স্রষ্টা। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি। আপনা থেকেই তাঁর সৃষ্টি। তাই তাঁর আর এক নাম 'স্বয়ম্ভু'। তিনিই আমাদের তাঁর সঙ্কল্প আর অধ্যবসায় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পর তিনিই আমাদের যাবতীয় কাজে নিয়োগ করেছেন, ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই তাঁর অপর আর এক নাম বিধাতা।

এই ব্রহ্মা বা বিধাতা মাটি, আকাশ, গাছ-পালা, খাদ্য-শস্যের পর মানুষ সৃষ্টি করবেন বলে মনে মনে ঠিক করতেই কিছু মুনির আবির্ভাব হল। তাঁরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের কি করতে হবে, বলুন। কোথায় আমরা থাকব?

ব্রহ্মা বললেন—আমি চাই তোমরা আমার এই সৃষ্টিকে সব দিক থেকে সুন্দর করে তুলবে। তার জন্য তোমাদের কাজ হবে তপস্যা করা, যজ্ঞ করা।

—কোথায় এই তপস্যা আর যজ্ঞ করব? ব্রহ্মাকে মুনিরা জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রহ্মা হলেন নিজে ঈশ্বর, ধর্মমূর্তি সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁর নানা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। খেয়ালের বশে এমন সব সৃষ্টি তিনি করে ফেলেছিলেন, যেগুলো সৃষ্টি হবার পর স্রষ্টাকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বসেছিল। ধর্মের বদলে অধর্মেই মেতে উঠেছিল। তাই এবারে তিনি খুব সাবধান হয়েই মুনিদের সৃষ্টি করে বলেছিলেন, সকলেরই যাতে ধর্মে মতি থাকে, মুনিরা যেন তার চেষ্টাই করেন, তারই জন্য যজ্ঞ করেন। কিন্তু, সত্যিই তো! কোথায় তাঁরা যজ্ঞ করবেন?

ব্রহ্মার হাতে ছিল এক ধর্মচক্র। মুনিদের কথা শুনে তিনি তখন সেই চাকাটা ছুঁড়ে দিলেন।

ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—শোন, তোমরা এই চাকার দিকে চোখ রেখে পিছু পিছু যাও। এই চাকা যেখানে গিয়ে পড়বে, সেখানটাই জানবে তোমাদের যজ্ঞক্ষেত্র হবে।

মুনিরাও সঙ্গে সঙ্গে চাকার পিছু পিছু ছুটলেন।

ছুটতে ছুটতে এসে দেখলেন, ঘুরতে ঘুরতে সেই চাকার হাল এসে গোমতী নদীর ধারে মনোরম এক জায়গায় পড়ল।

ব্রহ্মার নির্দেশে মুনিরাও তাঁদের বসবাস, তপস্যা আর যজ্ঞ করার সুন্দর জায়গা পেয়ে গেলেন। গাছপালা, বন-উপবন নিয়ে বিশাল জায়গা। পাশ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে গোমতী। গাছের ফল নদীর জল, তার ওপর অবিরাম শিরশিরে বাতাস—মুনিদের মন-প্রাণ ভরে গেল।

যজ্ঞ তো আর শুধু হাতে হয় না, আর শুধু ফলমূল দিয়েও তা সম্ভব নয়। বসবাস করার জন্য মনের মত একটা ঠাঁই পেলেন ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মার আদেশ, যজ্ঞ করতে হবে। বেদগ্রন্থে যেমনভাবে যজ্ঞ করার কথা বলা আছে, ঠিক তেমনি ভাবেই। তাই মুনিরা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকেই যজ্ঞের ব্রহ্ম করলেন। অর্থাৎ তিনিই হলেন যজ্ঞকর্তা।

তখন তো আর এখনকার দিনের মত টাকা-পয়সার প্রচলন ছিল না। সোনা—সোনাই ছিল সব কিছু। কিন্তু সোনা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? সঙ্কল্প আর ইচ্ছামাত্রেই যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, সোনা তিনিই যুগিয়ে দেবেন, মুনিঋষিদের মধ্যে সে বিষয়ে কোন সংশয়ই ছিল না।

সত্যি সত্যিই একদিন তাই হল।

নদীর জল ফুঁড়ে হঠাৎ একদিন এক পাহাড় উঠে এল। পাহাড়টা আবার ছিল এক আগ্নেয়গিরি। তার ভেতরের আগুন পাহাড়ের মুখ দিয়ে বের করে আনল অজস্র সোনা। সোনায় সোনায় ভরে গেল পাহাড়ের চূড়া। বিশ্বকর্মা আর মহাজ্ঞানী বৃহস্পতি সেখান থেকে সোনা আনিয়ে যজ্ঞস্থল ভরিয়ে দিলেন। অভাব মিটে গেল। মুনিরাও মহানন্দে যজ্ঞ শুরু করলেন।

কিন্তু এই যজ্ঞস্থলের নাম কি?

যেহেতু ব্রহ্মার ধর্মচক্রের নেমি (চাকার হাল) সেই জায়গায় এসে পড়েছিল, তাই জায়গাটির নাম হয়ে গেল নৈমিষ, নৈমিষক্ষেত্র বা নৈমিষারণ্য।

আমাদের বর্তমান মহারাজ বৈবস্বত। তিনিই আমাদের রাজাধিরাজ। এই পদে তিনি বহুকাল ধরেই আছেন। কত বছর? প্রায় দুশ কোটি বছর। কেমন করে পাওয়া যাবে এর হিসাব? সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই ভূমণ্ডলে আমরা প্রত্যেকেই চার যুগ করে একাত্তর যুগের বাসিন্দা। যতক্ষণ ব্রহ্মার দিন। তারপর আসে মহাপ্রলয়। সব ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রহ্মার দিন তখন ফুরিয়ে রাত আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। রাত শেষ হলে, আবার দিনের আলো জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সৃষ্টির কাজে লেগে পড়েন। তখন অপর একজন মনু মহারাজ হন। মহাপ্রলয়ের পর আমাদের এই ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ইতিমধ্যে ছ-বার পেরিয়ে সাতবারে চলছে। ছ-জন মনু চলে গেছেন। আমাদের এই বৈবস্বত মনু হলেন সপ্তম। এক একটা যুগ কত বছর, আমাদের পুরাণে তারও হিসেব রয়েছে। সেই হিসেব মিলিয়ে আমাদের এই বৈবস্বত মনুর কালে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর, আর এখন কলিযুগের যতখানি পেরিয়েছি, তা যোগ করলে প্রায় দুশ কোটি বছর দাঁড়ায়। সত্যযুগ দিয়েই ব্রহ্মার সৃষ্টি শুরু। যাগ-যজ্ঞের কাজ কিন্তু এই সত্যযুগে ছিল না। ব্রহ্মার আদেশে বেদের নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ বরাবরই ত্রেতাযুগেই হয়েছে। আর সেই যজ্ঞ অন্য কোথাও না হয়ে এই নৈমিষারণ্যের মুনিঋষিরা করেছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব সৃষ্টিকে নিয়ে।

বর্তমান বিহারের নিমসার জেলাই নাকি সেই প্রাচীন নৈমিষারণ্য। আমাদের এই বৈবস্বত মন্বন্তরে মুনিঋষিরা ঐ ত্রেতাযুগেই সেই প্রাচীন প্রথায় বারো বছর ধরে বিষ্ণুর যাগ যজ্ঞ

শেষ করেছেন। অবসর নিচ্ছেন। ঠিক সেই সময়েই বেদব্যাসের শিষ্য সূত ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গেছেন। প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণে তাঁর মত শ্রুতিধর পণ্ডিত আর কেউ তখন ছিলেন না। সূত এমনভাবে ইতিহাসের সেইসব পুরনো কাহিনী, প্রাচীন ভূগোল, বিজ্ঞানের রহস্য গুছিয়ে বলতেন যে, মুনিঋষিদের মনে জানার কৌতূহল বেড়েই যেত। শুনতে শুনতে তাঁদের গায়ের লোম জানার আনন্দে খাড়া হয়ে উঠত। তাই সূতের নামই হয়ে গিয়েছিল লোমহর্ষণ।

বৈবস্বত মন্বন্তরে লোমহর্ষণ এই নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রমুখ মুনিঋষিদের যেসব কথা শুনিয়েছিলেন, সেই পুরাণ কাহিনী তিনি জেনেছিলেন প্রাচীন ঋষি বেদব্যাসের কাছ থেকে। আমাদের এই মন্বন্তরের আগে যে ছটা মন্বন্তর গেছে (স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত আর চাক্ষুষ—এই সব মনু মহারাজদের আমলে পৃথিবী কিরকম ছিল, কিভাবে তার ইতিহাস গেছে—সঠিকভাবে তার সব বিবরণ পাওয়াই যায় না)। সে সময়েও ত্রেতাযুগে এই নৈমিষারণ্যেই ব্রহ্মার নির্দেশে মুনিঋষিরা যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞের শেষে হয় অগ্নি, নয় বায়ু, নয়তো-বা বরাহ—এঁদের কাছ থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি, রাজা-রাজড়ার কথা, ভূগোল-বিজ্ঞানের কথা শুনে জ্ঞান সঞ্চয় করতেন। এমনভাবেই যজ্ঞ হত নৈমিষারণ্যে। মুনিঋষিরা স্তোত্র পাঠ করতেন, শাস্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। গন্ধর্বলোক থেকে গন্ধর্বরা আসত। অপ্সরালোক থেকে অপ্সরারা আসত। নাচে-গানে যজ্ঞক্ষেত্র ভরিয়ে তুলত। দৈত্য-দানব-রাক্ষসরা কেউ সেখানে এসে কোন উপদ্রব করার সুযোগই পেত না। এখান থেকেই মুনিঋষিরা একজনকে সমস্ত পৃথিবীর রাজা করে সিংহাসনে বসাতেন।

এক সূর্য থেকে যেমন চতুর্দিকে আলো ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি এই নৈমিষারণ্য থেকেই সর্বপ্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত। অধর্ম, অত্যাচার, অনাচার দমন করার শক্তি এই নৈমিষারণ্যই যুগিয়ে দিত।

একবার মুনিঋষিরা নৈমিষারণ্যে সবেমাত্র যজ্ঞ শেষ করেছেন। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে থেকেই শরিদ্বান নামে একজন ঋষি মারা গেলেন। অপরাপর ঋষিরা তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে ভূমণ্ডলের অধীশ্বর করলেন। এই ব্যাপারটা রাহুর একেবারেই ভাল লাগল না। সুযোগ বুঝে তাঁকে চুরি করে কোথায় যে রাহু লুকিয়ে রাখলেন, মুনিঋষিরা অনেক খুঁজেও বের করতে পারলেন না। খুঁজতে খুঁজতে গন্ধর্বলোকে গিয়ে ঐড়কে (আর এক নাম পুরূরবা) দেখে তাঁদের ভাল লেগে গেল। তাঁকেই সেখান থেকে এনে রাজা করলেন ধর্ম রক্ষা করার জন্য। বিশাল ভূমণ্ডলের রাজা, অপরিমিত তাঁর ধনসম্পদ। এমনিতে তিনি ভাল হলে কি হবে, ধনসম্পদের লোভে তিনি ক্রমশই লোভী হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে তাঁর লোভ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। শিকারে বেরিয়ে পুরূরবা একদিন নৈমিষারণ্যে এসে মুনিঋষিদের সোনা দেখে দারুণ লোভী হয়ে তা কেড়ে নিতে গেলেন। এই মুনিঋষিরাই যে তাঁকে রাজা করেছেন প্রজাদের ধনসম্পদ রক্ষা করার জন্য, একথা তিনি ভুলেই গেলেন। তাই দেখে মুনিরা সামান্য কুশ তুলে নিয়ে পুরূরবাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। কুশ বাজের মত গিয়ে পুরূরবার বুকে বিঁধল। তিনি মারা গেলেন। ঋষিরা তাঁর ছেলে আয়ুকে সিংহাসনে বসালেন। ইনি খুবই ধার্মিক আর নির্লোভ ছিলেন। ফলে পৃথিবীও সুশাসিত হল। মুনিরাও নিশ্চিন্ত হলেন।

এভাবেই পুরাকাল থেকে নৈমিষারণ্য পৃথিবীকে স্বনির্ভর আর সুন্দর হয়ে তোলার কাজ করে এসেছে।

সৃষ্টি-প্রসঙ্গ

রাতের পর দিন, দিনের পর রাত, তারপর আবার দিন। রাতে ঘুম, দিনে কাজ। দিনের শেষে কাজের ক্লান্তি ঘুম আনে। রাতের শেষে আকাশ যখন ফরসা হয়, আড়মোড়া দিয়ে ঘুম ভাঙলেও আমরা কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে পড়ে থাকি। তারপর উঠে দিনের কাজ শুরু করে দিই। আবহমানকাল ধরে এভাবেই আমরা পৃথিবীতে জীবন কাটাই, ঘর-সংসার করি, কাজ করি, কাজের ফসল বুনি, ফসল তুলি (একমাত্র নিশাচর প্রাণী ছাড়া। তাদের জীবনধারা আমাদের ঠিক উলটো)। এইসব কিছুই আমাদের তিনটি গুণ করাচ্ছে—এক সত্ত্ব, দুই রজঃ, তিন তমঃ। সত্ত্বগুণ নির্বিকার, উদাসীন। সে সব দেখে, সব শোনে। তবুও নিজের মধ্যেই নিজে বুঁদ হয়ে থাকে। যেমন সব ভাবনাচিন্তা, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে রাতে আমরা ঘুমের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকি। তমোগুণ আমাদের মধ্যে অহঙ্কার আনে। ভোরে ঘুম ভাঙার পর অবসাদ কেটে গেলেই আমরা যখন সজাগ হয়ে উঠি, তখনই আমাদের মধ্যে অহঙ্কার জাগে। রজোগুণ কাজ করায়। কত রকমের কাজ যে সে করায়, তার আর ইয়ত্তা নেই। দিনের শেষে এই তমোগুণ আর রজোগুণ মিলেমিশে যায়। তখন রাত্রি আসে। পৃথিবীর চোখে ঘুম আসে।

আমাদের যিনি স্রষ্টা, তিনিও সেই একই নিয়মে বাঁধা। সেখানে এই তিনটি গুণকে আমরা তিন দেবতার নাম দিয়ে জেনেছি। বিষ্ণু বা নারায়ণ হলেন সত্ত্বগুণ। ব্রহ্মা হলেন রক্তবর্ণ রজোগুণ। আর রুদ্র হলেন তমোগুণ।

রজোগুণ কাজ করে, তাই ব্রহ্মা হলেন আমাদের যাবতীয় কিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টির পর সৃষ্টি করতে করতে তাঁর যখন এক কল্পকাল (কাজ শুরুর আগে তিনি কি কি করবেন তার কল্পনা বা খসড়া করে নেন। যতক্ষণে গিয়ে তা শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কল্পকাল অর্থাৎ দিন। এরপর তাঁর রাত। তারও পরিমাণ এক কল্প)। অর্থাৎ দিন ফুরিয়ে এল, রাত এল, তখন তিনি ঘুমের বিছানা নিলেন। রুদ্রের তমোগুণ, ব্রহ্মার রজোগুণের সঙ্গে ব্রহ্মার দিনের শেষে যখন মিলেমিশে গেল, তখনি এল প্রলয়। আকাশ জুড়ে যখন ঘনঘোর

মেঘের ঘটা। বিরামহীন, বিশ্রামহীন বৃষ্টি। নদ-নদী ও সমুদ্রের জল বেড়ে যায়। প্লাবন আসে। সব কিছু নিয়ে পৃথিবী জলের তলায় তলিয়ে যায়। সেই মহাপ্রলয়ে কোথাও জল ছাড়া আর কিছু নেই দেখে, মানুষ যেমন রাত্রে ঘুমোয়, স্রষ্টাও তেমনি নারায়ণ নাম নিয়ে তারই ওপর ঘুমোতে থাকেন। জলকে শুদ্ধ ভাষায় বলে 'নার'। আর 'অয়ন' মানে আশ্রয়। জলকে আশ্রয় করে থাকেন বলেই স্রষ্টার সেই সত্ত্বগুণকে 'নারায়ণ' বলে। তখন তিনি উদাসীন। আমরা যেমন রাতে উদাসীন হয়ে ঘুমিয়ে থাকি, তিনিও তেমনি জলের ওপর উদাসীন হয়ে ঘুমিয়ে থাকেন। আবার যখন কল্পকাল আসে, নারায়ণরূপী ব্রহ্মা জেগে ওঠেন, তমোগুণ নিয়ে রুদ্রও সজাগ হয়ে ওঠেন। শুরু হয়ে যায় জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধারের কাজ। তারপর পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার কাজ। লেগে পড়েন ভালমন্দ সবকিছু দিয়ে তাকে সাজিয়ে তোলার কাজে। এমনভাবে প্রলয় আর সৃষ্টি যে কতকাল ধরে চলে আসছে, কেউ তার হিসেব জানে না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে,প্রথম যেদিন ব্রহ্মা মহাপ্রলয়ের পর যেভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন, প্রতিবারেই তিনি সেই একইভাবে সৃষ্টি করে আসছেন। একইভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে সব কিছু দিয়ে সাজিয়ে আসছেন। কোথাও তার এতটুকু ব্যতিক্রম করেন নি।

নারায়ণরূপী ব্রহ্মার চোখে যখন দিনের আলো এসে লাগল, অর্থাৎ যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, তখন থেকেই তিনি তাঁর শক্তি আর গুণ নিয়ে কাজে লাগলেন। পৃথিবী বা ভূমণ্ডল তো আর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। আছে, তবে জলের নীচে। তার ওপরে আদিগন্ত জল থইথই করছে। মহাশক্তিবলে তিনি প্রথমে সেই জলের তলা থেকে পৃথিবীকে তুলে আনলেন। তুলে আনার সঙ্গে সঙ্গে মাটি জেগে উঠল। ব্রহ্মা দেখলেন, মাটি আছে বটে, তবে এতদিন ধরে জলের তলায় থাকার ফলে তার আকারটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি, গাছপালা তো নেই-ই। প্রাণিকুলও নির্মূল। হাঁস যেমন সরাসরি বাচ্চা প্রসব না করে ডিম (অণ্ড) প্রসব করে তারপর সেই ডিমের ওপর তা (উত্তাপ) দিয়ে দিয়ে তার ভেতরের জলে ঘেরা সোনার রঙ কুসুম থেকে নিজের সন্তানটিকে বের করে আনে, ব্রহ্মাও ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টি করেন। তাই এর নাম 'ব্রহ্মাণ্ড'।

পৃথিবীকে উদ্ধার করে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবার তাকে শ্যামল, সমৃদ্ধ বসুন্ধরা তৈরি করার কাজে লেগে পড়লেন। পৃথিবীর চতুর্দিকে পৃথিবীর পরিমাণের দশ গুণ বেশি জল, তারও আবার দশ গুণ তেজ। প্রজাপতি ব্রহ্মা একদিকে পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে ভাগ করলেন। সেই জন্য আমাদের এই পৃথিবীকে বলা হতো 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা'। সেই সাতটি দ্বীপের নাম হল : ১। জম্বুদ্বীপ (এশিয়া, মতান্তরে ভারতবর্ষ), ২। প্লক্ষদ্বীপ (দক্ষিণ আমেরিকা, মতান্তরে এশিয়ার উত্তর এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা), ৩। কুশদ্বীপ (ওশিয়ানিয়া, মতান্তরে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি অঞ্চল), ৪। শাল্মলী দ্বীপ (আন্টার্কটিকা বা দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত অঞ্চল, মতান্তরে আড্রিয়াটিক বা বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি অঞ্চল), ৫। পুষ্কর দ্বীপ (উত্তর আমেরিকা, মতান্তরে আয়ার্ল্যান্ড), ৬। শাকদ্বীপ (ইউরোপ, মতান্তরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ), ৭। ক্রৌঞ্চদ্বীপ (আফ্রিকা, মতান্তরে জার্মানি)।

এই সাত দ্বীপে পৃথিবীকে ভাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই একই সঙ্গে তিনি নদী ও সমুদ্রের জল নদীতে সমুদ্রে আটকে পৃথিবী জুড়ে যেমন অনেক নদ-নদী বইয়ে দিলেন, তেমনি তৈরি করে ফেললেন সাতটি সমুদ্র। এই সমুদ্রগুলির নাম হল—লবণ সমুদ্র, ইক্ষু সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, সর্পি সমুদ্র, দধি সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, আর জল সমুদ্র। সাতটি দ্বীপ ঘিরে এই সাত সমুদ্র। প্রতিটি দ্বীপে আবার নানা রকমের পাহাড়-পর্বত-অচল। এগুলিও ব্রহ্মা বেশ সুপরিকল্পনার সঙ্গে তৈরি করলেন। সুবিপুল জলরাশি বাতাসের সংস্পর্শে এসে ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগল, জমাট বাঁধতে লাগল। অচল হয়ে গেল। জলে ভাসমান পৃথিবীও এই সব অচলে নোঙর বেঁধে কিছুটা স্থির হল। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার এখানেও কি অপূর্ব কাজ! এই অচল অর্থাৎ পর্বতকেও আবার তিনি কতভাবেই না তৈরি করলেন। কোথাও-বা জলরাশি শক্ত স্তূপ হল। কোথাও-বা ক্রোশের পর ক্রোশ জমে ওঠা কঠিন মাটি পাথর হয়ে নানা রকমের চূড়া (পর্ব) নিয়ে জেগে উঠল। আবার কোন কোন পর্বতের গা দিয়ে স্রষ্টা নদীর ধারা বইয়ে দিলেন। রূপ হিসেবে একই পাহাড় বা পর্বতের কত নাম। নড়তে চড়তে পারে না, তাই অচল। চূড়ায় চূড়ায় ভাগ, তাই পর্বত। নদী গড়িয়ে পড়ে, তাই গিরি।

ব্রহ্মা পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপ, সাতটি করে পর্বত (ছোটখাটো পাহাড় বাদ দিয়ে) আর সাত-সমুদ্র, সেই সঙ্গে বড় বড় সাত নদ-নদী দিয়ে সাজালেন। সেই সঙ্গে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে মাটি-জল-তেজ-বাতাস-আকাশ প্রভৃতি এমন এক সমতা রেখে পৃথিবীর ভেতর শক্তি যোগাল যে, পৃথিবী প্রকৃতিজাত গাছপালা, ফলমূল নিয়ে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

নিজে যা তৈরি বা সৃষ্টি করা যায়, স্বাভাবিক ভাবেই তার ওপর স্রষ্টার একটু মায়া-মোহ জন্মে যায়। প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টি করার চিন্তা করলেন, তখন মোহগ্রস্ত হয়েই প্রথমে চিন্তা করেছিলেন। তাই প্রথম প্রথম সৃষ্টিগুলো হল নগ, তির্যকস্রোতা। সব থেকেও এদেরও মধ্যে কিছু নেই, নিজের মধ্যেই নিজেরা বুঁদ হয়ে থাকে দেখে ব্রহ্মার আদৌ ভাল লাগল না। ব্রহ্মা এবার তপস্যায় বসলেন। ধ্যান বা তপস্যার কাজই হল মায়া-মোহকে আস্তে আস্তে দূর করে দেয়, মনকে পরিষ্কার করে তোলে। ব্রহ্মারও তপস্যার ফলে তাই হল। মোহ দূর হয়ে গেল। তারপর মহানন্দে মানুষের সৃষ্টি করলেন। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনটি গুণই তিনি মানুষের মধ্যে দিলেন। ব্রহ্মা এই মানুষ সৃষ্টির সময়ে কিন্তু একটা কৌশল নিয়েছিলেন। একদল মানুষ তিনি নিজের মুখ থেকে সৃষ্টি করলেন। তারা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হল। আর একদলকে বাহু থেকে সৃষ্টি করলেন। তারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হল। আর এক দল মানুষ তিনি তাঁর উরুদেশ থেকে সৃষ্টি করলেন। তারা 'বৈশ্য' নামে পরিচিত হল। শেষ দলটিকে তিনি তাঁর পা থেকে সৃষ্টি করলেন। তারা 'শূদ্র' নামে পরিচিত হল। সেই সঙ্গে কার কি কাজ হবে, তাও তিনি ঠিক করে দিলেন।

একই সময়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন নামে তিন মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। তাঁদের বললেন—পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি কর। কিন্তু এই তিন ছেলে তা করতে পারলেন না। ব্রহ্মার মধ্যে তখন সত্ত্বগুণ ছিল। এঁরাও সেই গুণ নিয়ে সৃষ্টির কাজে উদাসীন

হয়ে গেলেন। তাই দেখে ব্রহ্মা আবার কতকগুলি মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন। তাঁদেরও তিনি একই আদেশ দিলেন—প্রজা সৃষ্টি কর। প্রজা সৃষ্টির জন্য যজ্ঞ কর। তাঁরা ব্রহ্মার আদেশ মেনে নিলেন। ধর্মকে আদর্শ করে ধীরে ধীরে পৃথিবীকে প্রজায় প্রজায় ভরিয়ে তুললেন।

প্রজাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, নিখুঁত কারিগর ব্রহ্মা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, দিন-রাত, মাস-ঋতু সব দিয়ে আগে থেকেই পৃথিবীকে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

ব্রহ্মার এই ব্রহ্মাণ্ড ভারি রহস্যে ভরা।

ব্রহ্মার এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া বিচিত্র। যেভাবে ব্রহ্মা নামে নারায়ণরূপী আদিদেব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন তা পরপর সাজালে দেখা যাবে, কি সুন্দরভাবেই না এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল!

প্রলয়ের পর সেই বিশাল জলরাশির ওপর ভাসতে ভাসতে বিধাতা যখন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন, তখন প্রথমেই মহতের সৃষ্টি হয়েছিল। একে বলা হয়েছে 'মহঃতত্ত্ব'। এটি আর কিছুই নয়, পরমাণুর সঙ্গে শক্তি বা তেজ যুক্ত হল। পরমাণুর তো নিজের নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ভেতরে অনেক ক্ষমতা আছে। তাই যেই শক্তি এসে তার সঙ্গে যোগ দিল, সে তখন দুরন্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠল। তখনই তার থেকে সৃষ্টির উপাদানগুলি বেরিয়ে আসতে লাগল। একে বলা হয়েছে 'তন্মাত্র' বা পঞ্চ-মহাভূত।

প্রথম সৃষ্টি মহঃতত্ত্ব। দ্বিতীয় হল, পঞ্চ-মহাভূত বা তন্মাত্র।

তন্মাত্র হল সেই পদার্থ বা বস্তু যা দেখতে বা অনুভব করতে পারা যায়। আবার, সৃষ্টির উপাদান হিসেবে পৃথক পৃথক হলেও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক আছে। এই তন্মাত্র বা পঞ্চ-মহাভূত হল—আকাশ, বাতাস, তেজ, জল আর মাটি। শুদ্ধ ভাষায় যাদের বলা হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

এরই থেকে বিভিন্ন ধারায় সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ঘটল। গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্র, নীহারিকা, জ্যোতিষ্ক নিয়ে সৌরজগৎ সৃষ্টি হল। আবার ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব করা যায়—যেমন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—তা সৃষ্টি হল।

প্রথম এই তিন সৃষ্টিকে বলা হয় বিকারজনিত সৃষ্টি।

এরপরও আবার ছরকম সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলোকে বলা হয় প্রকৃতিজাত সৃষ্টি। কেননা মাটি, জল, বায়ু, আগুন অর্থাৎ সূর্যের তেজ নিয়ে তখন প্রকৃতি সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে আবহাওয়াও গড়ে উঠেছে।

স্থাবর সৃষ্টি হল চতুর্থ। এই সময় সমুদ্র, পর্বত, সমতল প্রদেশ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে পৃথিবী খানিকটা বসবাসের যোগ্য হল।

এরপরই তির্যক স্রোতের সৃষ্টি হল। তির্যক গতির অর্থ হল, এঁকে বেঁকে চলা। জলে সেই সব প্রাণীর উদ্ভব হল, যাদের হাড়-মাংস গজায় নি কিন্তু প্রাণ আছে, আর এঁকে-বেঁকে হিল হিল করে চলে। যেমন সাপ, কেঁচো। অবশ্য এর মধ্যে মাছও পড়ে।

তির্যকস্রোতার পর এল উর্ধ্বস্রোতা প্রাণী। এটি হল সৃষ্টির ষষ্ঠ পর্যায়। এরা জল থেকে ডাঙায় উঠল। পাখি হয়ে আকাশে ডানা মেলাল।

সপ্তম পর্যায়ের সৃষ্টি হল অর্বাকস্রোতা। অর্বাক অর্থাৎ বোবা। এরা কিন্তু নির্বোধ বা বোকা নয়। বানর, বরাহ ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী।

এরপর অনুগ্রহ সৃষ্টি। এই পর্যায়ে যেসব প্রাণীর উদ্ভব হল তারা অপরের অনুগ্রহ ছাড়াই চলতে ফিরতে শুরু করল। যেমন, বনমানুষ।

সর্বশেষ সৃষ্টিকে বলা হয়েছে কৌমার সৃষ্টি। এটি হল নবম পর্যায়। এই যুগেই সব কিছু গুণ নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের সৃষ্টি হল।

এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলেছিল হাজার হাজার বছর ধরে।

যুগ ও যুগের আচার

বর্তমান পৃথিবীর মানুষ আমরা বৈবস্বত মনু থেকেই সৃষ্ট হয়েছি। তিনি আমাদের প্রথম পুরুষ, প্রথম রাজাধিরাজ। পুরাণের ইতিহাসে এই ব্রহ্মাণ্ডের তিনি সপ্তম মনু। এঁর আগে ছিলেন চাক্ষুষ মনু। তাঁর রাজত্বকাল যখন ফুরিয়ে এল, তখনই আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। আমাদের মনু মহারাজের কাল যখন শুরু হল, তখন নারায়ণ বরাহ মূর্তি ধরে জলের তলা থেকে একে উদ্ধার করে এনেছিলেন। নারায়ণ-রূপী ব্রহ্মার কাছে তাই এটি হল বরাহ-কল্প। আমরা ব্রহ্মার বরাহ-কল্পের প্রাণী।

বিধাতা আগে পৃথিবী উদ্ধার হবার পর তাকে যেভাবে সাজিয়েছিলেন, এবারেও ঠিক সেভাবেই তাকে সাজাতে লাগলেন। পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ, প্রতিটি দ্বীপে সাতটি করে পর্বত, সাতটি করে নদী—আকাশ-মাটি-গাছপালা-ফলমূল, নিজের যে তিনগুণ, সেই তিনগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি,জল, বৃক্ষলতার আত্মা, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর—সব কিছু সৃষ্টির পর যুগকেও মনের মত করে তৈরি করলেন। মানুষের বয়স-শরীর-গুণাগুণ-এর মধ্যে তো পার্থক্য থাকবেই। একই কারিগরের হাতের তৈরি জিনিস কি সব সময় একই রকম হয়? এ-ও ঠিক তাই। ব্রহ্মা তাই যুগের ভাগ করলেন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। প্রতি কল্পেই তিনি একইভাবে যুগ ভাগ করে আসছেন।

প্রথমেই তিনি সত্যযুগের প্রজা সৃষ্টি করলেন। আগের কল্পে যে জন্মগ্রহণ করে যেমন কাজ করেছিল, এই যুগে দেবতা থেকে গাছপালা পর্যন্ত তারই ভালমন্দ ফল নিয়ে জন্মাল। সব কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও কাজের ফলাফল নষ্ট হয়ে যায় না। পরে সেটিই তার জন্মের বীজ হয়।

সত্যযুগের পরিমাণ ব্রহ্মার কাল অনুসারে চার হাজার বছর (মানুষের পরমায়ু ধরলে তা চল্লিশ হাজার বছরে দাঁড়ায়।) এই যুগটা ভারি অদ্ভুত ছিল। মানুষের মধ্যে কোন হিংসা, লোভ, রোগ, শোক-দুঃখ কিছুই ছিল না। কিছু পেলেও খুশি, আবার না পেলেও খুশি। শরীর ছিল বেশ লম্বা-চওড়া। জরা-বার্ধক্য যে কি জিনিস, তা তারা জানতই না। প্রজা সৃষ্টি করত তারা মনের ইচ্ছেয়। যৌবন তাদের অটুট ছিল। এক রকমের রস তাদের পানীয় ছিল। সেই রসের গুণ ছিল গায়ের রং তৈরি আর শক্তি যোগানো। সেই সঙ্গে যে কোন রোগই আসুক না কেন, সেই রস খেলেই ভাল হয়ে যেত। প্রত্যেকেরই পরমায়ু যেমন ছিল, রূপও তেমনি ছিল। ফলে, এ ভাল, ও খারাপ, এসব কোন প্রশ্নই সে যুগে ছিল না। তখন ধ্যানই একমাত্র ধর্ম ছিল। আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। মানুষজন থাকত পাহাড়ে, সমুদ্রকূলে।

একসময় এই সত্যযুগের পরমায়ু ফুরিয়ে এল। ত্রেতাযুগ এল। যখন ত্রেতাযুগ এল, তখন সত্যযুগের সব ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে গেলেও বিরাট ঐশ্বর্যের এক অংশের একটুও ছিল। (প্রতি যুগই যখন শেষ হয়, তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এই ভাবেই একটু করে স্মৃতি রেখে যায়)।

ত্রেতাযুগে পৃথিবীর আর এক রূপ। এই যুগ যখন এল, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা থেকে মেঘের সৃষ্টি হল। আকাশ ঘনঘোর মেঘে ঢেকে গেল। মেঘের ঘন ঘন গর্জনে পৃথিবী চমকে উঠতে লাগল। সেই সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি এসে পৃথিবীতে পড়তে লাগল। বৃষ্টির জল পেয়ে পৃথিবীতে নানা রকমের গাছপালা জন্মাল। নানা রকমের ফল-মূল। প্রজারা উপভোগে মেতে উঠল। এই সময় হঠাৎ লোভ, রাগ, ঈর্ষা কোথা থেকে এসে মানুষকে গ্রাস করে ফেলতে লাগল। সুযোগ বুঝে সাধারণ প্রজারা ইচ্ছেমত উপভোগে মেতে উঠল। হাতের কাছে অঢেল প্রাচুর্য এলে, আর মনে লোভ জাগলে লোভীরা তো হাত মুঠো করে নেবেই। এর ওপর নারীদের স্বভাবও বদলে গেল। শরীরের ধর্মও অন্য রকমের হয়ে গেল। সত্যযুগে নারী আর পুরুষ দুজনেই ছিল দারুণ সংযমী। বংশরক্ষার জন্য সারা জীবনের মধ্যে সে যুগের নারীরা একবার মাত্র স্বামী বা পুরুষের মানসিক ইচ্ছেয় জননী হতো। ত্রেতাযুগে নারীরা যখন তখন জননী হতে লাগল। ফলে প্রজার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। আচারনিষ্ঠা প্রায় গোল্লায় গেল। শেষে এমন অবস্থা হল যে অনটন দেখা দিল। গাছপালা থেকে যেসব পদার্থ তারা জীবনধারণের জন্য উপভোগ করত, তাতে দারুণ অভাব এল।

প্রজাদের মধ্যে সবাই তো আর সমান ছিল না। কিছু সৎ ছিল। তাদের বিবেক ছিল, বুদ্ধি ছিল, জ্ঞান ছিল। তাঁরা যখন দেখলেন প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে চারদিকে কাড়াকাড়ি, রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে, সমুদ্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না। সকলকে ব্যাপারটা বোঝালেন। প্রজারাও বুঝল। যে গাছ তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল, তা আবার ফলে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। গাছের ছাল দিয়ে বল্কল তৈরি করে আবার সকলে পরতে লাগল। ফল আর মধুর রস খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

এভাবে কিছুকাল চলল। তারপর আবার লোভ আর পাপের শিকার হল সাধারণ প্রজারা। এতদিন ধরে যে নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। অবস্থা বিপাকে কখনো প্রচণ্ড শীত, কখনো দুরন্ত গরম আবহাওয়াকে বদলে দিল। প্রজারা মহা মুস্কিলে পড়ল। লোভ, পাপ—যা কিছুই তারা করুক, তবুও এ যাবৎ বনে বনে নিশ্চিন্তেই দিন কাটাচ্ছিল। যে রকম শীত আর গরম পড়েছে, তাতে এভাবে আর থাকা যাবে না, তারা সেটা বেশ ভাল বুঝতে পারল। তখন প্রাকৃতিক এই উৎপাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দর সুন্দর সব ঘরবাড়ি তৈরি করল। জোট বাঁধল। পল্লী, গ্রাম, নগর সৃষ্টি হল। দুর্গ-প্রাকার দিয়ে নগর ঘেরা হল। এমন কি সবাই মিলে পয়ঃপ্রণালীও তৈরি করল। প্রত্যেকটা গ্রাম, নগরই ছিল সুরক্ষিত। মাথার ওপর আর তাদের আকাশ থাকল না। ঘরবাড়ি করে যেমন নিশ্চিন্ত হল, তেমনি পতিত জমিতে ধান, গম, যব, তিল, ছোলা, মসুর প্রভৃতি আপনা আপনি হতো, সেগুলো খেয়ে সুখে দিন কাটাত। সবাই তো আর সমান নয়, আর সবাই ধর্মপথে ন্যায়পথে চলত না। প্রজাদের মধ্যে বেশ কিছু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল। তাদের দৌরাত্ম্যে আবার সব নষ্ট হতে লাগল। শীত, গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে ঋতুভেদ আগেই এসেছিল, বিনা চাষে ফল-ফসল ঋতু অনুসারে আপনা হতেই হতো। দৌরাত্ম্য না করলে, যার যা খুশি তা না করলে ভালভাবেই সকলের চলে যেত। কিন্তু আর চলে না।

এই সব দেখে জ্ঞানীগুণীরা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হল। ব্রহ্মা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন, চার রকমের প্রজা তিনি সৃষ্টি করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এদের প্রত্যেকের মধ্যে যদি কাজের কোন ধারা বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে এই বিশৃঙ্খলা হয়ত রোধ করা যেতে পারে। এই ভেবে, তিনি প্রতিটি বর্ণের জন্য কাজের ধারা ঠিক করে দিলেন। ব্রাহ্মণদের বললেন—তোমাদের কাজ হল কেবল ঈশ্বর চিন্তা করা। ক্ষত্রিয়দের বললেন—প্রজাদের অসুবিধে দূর করা, অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা হবে তোমাদের কাজ। বৈশ্যদের বললেন—ফলে-শস্যে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে তোলা, প্রজাদের অভাব মেটানো তোমাদের কাজ। এতদিন তো আপনা আপনি ফসল হচ্ছিল। এবার থেকে জমি চাষ করে তোমরা নানা রকমের ফসল ফলাবে। শূদ্রদের বললেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের সেবা করা, অর্থাৎ তাদের যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করাই তোমাদের কাজ হবে। এভাবে ব্রহ্মা প্রত্যেকের জন্য কাজ এবং জীবিকা ঠিক করে দিয়ে ভাবলেন, এবার সব ঠিক ঠিক মত চলবে। সকলেই তাঁর আদেশ মেনে যে যার কাজ নিয়ে থাকবে। কিন্তু ব্রহ্মার আশা ঠিক মিটল না। তখন তিনি একেবারে শেষ আদেশ জারি করে দিলেন। যজন-যাজন-অধ্যায়ন-অধ্যাপনা-দান-গ্রহণ—ব্রাহ্মণের কাজ হবে। ক্ষত্রিয়রা ক্ষমতা প্রকাশ করবে, যুদ্ধ করবে, অপরাধীদের সাজা দেবে। বৈশ্যরা চাষবাসের সঙ্গে বাণিজ্য করবে। শূদ্রদের জন্য একই কাজ রইল। এ ছাড়াও প্রজাদের মনকে সব দিক থেকে উন্নত করে তোলার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। ব্রহ্মা তাই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকেও অধ্যয়ন দান আর যজনের অধিকার দিলেন।

এই ত্রেতাযুগেই বিধাতা ব্রহ্মা বর্ণ অনুযায়ী ধর্মকর্ম ঠিক করে দিলেন, আবার যাতে সকলে ঠিক ঠিকমত তা মেনে চলে, তারও ব্যবস্থা নিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, প্রজাদের মনকে সংযত আর

চিত্তকে নির্মল করতে না পারলে এই সব ধর্মকর্ম থাকবে না। মানুষের মধ্যে গতিশীলতাও থাকবে না। তাই তিনি আরো কঠোর হয়ে আশ্রমের ব্যবস্থা করে দিলেন। আশ্রম বলতে এখন যা বোঝায়, অর্থাৎ ঠাকুরের জায়গায় বসে খানিকটা ঠাকুরের নাম ধ্যান, খাওয়া, কাঁসি বাজনা বাজানো আর ঘুমানো নয়। রীতিমত চর্চা আর অনুশীলনের কেন্দ্র। এই আশ্রমগুলোর নাম হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য আশ্রম গুরুগৃহে ছিল। সেখানে জ্ঞানীগুণী মুনি ঋষিদের কাছে ছোটবেলা থেকে থাকতে হত। বেদগ্রন্থ থেকে সমস্ত শাস্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করতে হতো। গুরু যে আদেশই করুন, তা মুখ বুজে পালন করতে হতো। আর সবদিক থেকে সংযত হয়ে থাকতে হতো। গুরুও নিজের ছেলের মত তাকে ভালবাসতেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতেন। তারপর শিষ্যকে নিষ্ঠাবান, সংযতচিত্ত, নির্লোভ, নিরহঙ্কার করে মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে এভাবে বেরিয়ে আসার পর তাকে বিয়ে-থা দিয়ে মা-বাবা সংসারী করে দিতেন। তখন সে হল গৃহস্থ। এটি হল দ্বিতীয় আশ্রম। গুরুর কাছে যেভাবে বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞান অর্জন করে এসেছে, তাতে মন অসংযত হতে পারে না, বুদ্ধি-বিবেক অন্যরকম হতে পারে না। একটা চারা অশ্বত্থ গাছকে ভালভাবে বেড়া দিয়ে উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখলে, ডালপালা নিয়ে সে যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন কতজনের কত অভাবই না সে মেটায়। গুরুগৃহের ছাত্রটিও তেমনি ভাবেই সংসারে এসে পরিজন প্রতিপালন, অতিথিসেবা, সকলের সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া প্রভৃতি সংসারধর্ম অবশ্যই পালন করবে। এভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমে একটা বয়সকাল পর্যন্ত থেকে ছেলেদের ঠিক একইভাবে মানুষ করিয়ে এনে, তাদের সংসারী করে দিয়ে নিজেরা বনে চলে যাবে। সেখানে গিয়ে পর্ণকুটির বেঁধে ঈশ্বরে মনোনিবেশ করে সংযতভাবে থাকবে। এটি হল তৃতীয় আশ্রম—বানপ্রস্থ। তারপর বাকি জীবনটুকু সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত হয়ে ধ্যান, যোগ সমাধির মধ্যে থেকে পৃথিবী থেকে ছুটি নেবে। এটি হল চতুর্থ বা শেষ আশ্রম—সন্ন্যাস।

ত্রেতাযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা একদিকে যেমন তাঁর সৃষ্ট চার রকমের (বর্ণের) প্রজাকে জীবিকা দিয়ে বাঁধলেন, তেমনি এভাবে চার আশ্রম তৈরি করে তাদের ধর্মমুখী করলেন এবং সব জটিলতা থেকে মুক্ত করে গতিশীল করে তুললেন। প্রজারাও দারুণভাবে ধর্মনিষ্ঠ আর কর্মনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। ত্রেতাযুগের তখন প্রায় অর্ধেক কেটে গেছে। ব্রহ্মা দেখলেন, বেশির ভাগ প্রজাই আশ্রম ব্যবস্থা ঠিকমত মেনে চলার ফলে মুক্তি পেয়ে যেতে লাগল। তমোগুণ যাদের বেশি তারাই থেকে যেতে লাগল। তাই সমতা আনার জন্য মাঝে মাঝেই তিনি জনলোক থেকে সিদ্ধ পুরুষদের পাঠাতেন। ছত্রিশ হাজার দিব্যবছর অর্থাৎ মানুষের হিসেবে বারো লক্ষ ষোল হাজার বছর কাটিয়ে একদিন এই ত্রেতাযুগের পরমায়ু শেষ হল। এই ত্রেতাযুগ ছিল জ্ঞানের যুগ। এই জ্ঞান দিয়েই তারা জেনেছিল, যাগযজ্ঞই হল সহজ পথ। এই পথে ঠিকভাবে চললে সত্যলোকের প্রজারা যে ফল লাভ করেছিল, সেই ফলই পাওয়া যায়।

তাই ত্রেতা যুগের পর যখন দ্বাপর যুগ এল, তখন যাগযজ্ঞই হল প্রজার প্রধান ধর্ম। এই দ্বাপর যুগ যখন এল, সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বয়স তখন অনেকখানি পেরিয়ে গেছে। সৃষ্টিও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। যাগযজ্ঞকে ধর্ম বলে মেনে নেওয়ার আগে এই যুগের শুরুতেই বেশ ডামাডোল শুরু হয়ে গিয়েছিল। বর্ণ এবং আশ্রমে যেসব বিধি-নিষেধ ছিল, তা নিয়ে মানুষে মানুষে খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে গেল। একেবারে উড়িয়ে দিল না বটে, তবে ধর্মাচরণের রীতিনীতি নিয়ে নিজেদের মধ্যেই বাদ-বিসংবাদে মেতে উঠল। কেউ বলল 'এটা ধর্ম, এটা অধর্ম'। কেউ আবার উলটো সুর ধরল। নিজেরাই প্রধান হয়ে উঠে, নিজেদের পথ নিজেরাই ঠিক করে নিতে লাগল। নিজেদের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই দিকেই বেশি করে নজর দিতে লাগল। তারই জন্য নানা সাধুসন্ত গজিয়ে উঠল। উপাস্য দেব-দেবতার সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সম্প্রদায়ে মানুষজন ভাগ ভাগ হয়ে যেতে লাগল। আর তার গতিও খুবই প্রচণ্ড ছিল।

বিধাতা এসব দেখে মহা সমস্যায় পড়লেন। মানুষজন ধ্বংস হয়ে যাক, এ তো আর তিনি চান না। আবার সকলেই অস্থিরতার মধ্যে থাকুক, এ-ও তাঁর কাম্য নয়। তাই তিনি ব্যাসদেব-রূপে এসে বেদকে চার ভাগে ভাগ করলেন—ঋক্, সাম, যজুঃ আর অথর্ব। মন্ত্র নিয়ে ঋক,যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে যজুঃ, স্তোত্রগান নিয়ে সাম, আর সামান্য ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া রোগ আরোগ্য, ভেষজ, শল্য, তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে অথর্ব বেদ হল। মানুষকে যাগ-যজ্ঞপরায়ণ করার জন্যই ব্যাসদেব এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। আগের আগের প্রতি মন্বন্তরে ব্যাসদেবই এই ভাবে বেদ ভাগ করে প্রজাদের অস্থিরথা দূর করে এসেছেন। আমাদের বৈবস্বত মনু মহারাজের আমলেও সেই দ্বাপর যুগেই তিনি আবার সেই কাজ করলেন। বেদ ভাগ করে তিনি তাঁর তিনজন প্রধান শিষ্যকে তা অনুশীলন করার জন্য দিলেন। ঋক্‌বেদ দিলেন পৈলকে। সামবেদ দিলেন জৈমিনীকে। যজুর্বেদ দিলেন বৈশম্পায়নকে। আর অথর্ববেদ দিলেন সুমন্তকে। ভাগ কিন্তু এখানেই শেষ হল না। এই শিষ্যরা তাকে আরো ভাগ করলেন, তৈরি করলেন নানা সংহিতা। মুনি-ঋষিরা তত্ত্ব নিয়ে কিন্তু কেউ একমত হতে পারলেন না। ফলে ভাগের ওপর ভাগ, আরো ভাগ হয়ে গেল। ভাগাভাগিতে ভরে গেল। ফলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। দু-হাজার দিব্যবর্ষ (মতান্তরে দু-হাজার চারশ দিব্যবর্ষ অর্থাৎ আমাদের বছরের হিসেবে আট লক্ষ চার হাজার বছর) শেষে দ্বাপর যুগের পরমায়ু ফুরিয়ে গেল।

আগের মন্বন্তরের মত আমাদের মনু মহারাজের আমলেও দ্বাপর যুগের পর কলিযুগ এল। আমরা এখন কলিযুগের বাসিন্দা। (কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ যেদিন দেহত্যাগ করলেন আর তাঁর দ্বারকাপুরী সমুদ্রের তলায় তলিয়ে গেল বংশধরদের কলহে, ধরা হয়, সেদিন থেকেই কলিযুগের শুরু।) এই যুগে, ব্রহ্মা প্রজাদের যেসব অনুশাসনে বেঁধে (বর্ণ এবং আশ্রম) প্রত্যেকের ভালভাবে জীবন কাটাবার, সৎভাবে থেকে সকলকে সমান চোখে দেখে, সমান ভাবে ভালবেসে দিন কাটিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কলিযুগ কোনভাবেই সেভাবে থাকতে চায় না। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন বর্ণ বা জাত আর আশ্রম বা কড়া কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে ভোগ না করে চলে যাওয়া, মোটেই যুক্তির কথা নয়। যতদিন জীবন আছে, উপভোগ্য ভোগ করে যেতে হবে, তার জন্য কার কোথায় কি হল, তা দেখার কোন দরকার নেই। কলিযুগে

মানুষ তাই প্রকৃত ধর্মপথ থেকে সরে এসে ভোগসুখকেই ধর্ম বলে মেনে নেয়। তার ফলে কপটতা, চুরি, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতায় মানুষ ছটফট করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যার যা আচার-অনুষ্ঠান, তা গোল্লায় গিয়ে বিশৃঙ্খলা আনে। ব্রাহ্মণরা শূদ্রের কাজ, শূদ্ররা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়র কাজ, তার ওপর সবাই মিলেই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে মেতে ওঠে। যার রাজা হবার কথা, এই যুগের কূটচক্রে সে চোর হয়। আর যে পরের ধন-সম্পদ চুরি করা ছাড়া অন্য কিছু জানে না অর্থাৎ চোর, সে রাজা হয়। পুরুষরা যেমন অধর্মে গা ভাসিয়ে দেয়, অপকর্মে মেতে ওঠে, নারীরাও ঠিক সেই রকমই হয়ে পড়ে। কলিযুগে প্রজার সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে বাসভূমির সমস্যার সঙ্গে খাদ্য সমস্যাও প্রবল হয়ে উঠবে। ফলে স্থান-অস্থান, খাদ্য-অখাদ্য নিয়ে কোন বিচারই থাকবে না। প্রজারা স্ত্রী-বধ, গো বধ, পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে নিজের অভীষ্ট পূরণ করবে। এই যুগে বেদগ্রন্থ পাঠ বন্ধ হয়ে যায়। শূদ্ররা ধর্মবিষয়ে পণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর তারাই ধর্ম প্রচারক হয়। মানুষের জগতে কলিযুগে যখন এমনি বিপর্যয় আসে, তখন প্রকৃতির জগতেও কলিযুগে অনিয়ম ঘটে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি,দুর্ভিক্ষ, মহামারী লেগেই থাকে। এই যুগে মানুষের সাধারণ পরমায়ু হল একশ বছর। কিন্তু অকাল মৃত্যু সকলকে গ্রাস করতে থাকে। তান্ত্রিক, কাপালিকরা এই সময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মুনিঋষিরা কল্পনার মানুষ হয়ে পড়েন। প্রকৃত সাধু ও ধর্মপরায়ণ 'কোটিতে গুটিক' মেলে। এত বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যাঁরা বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি আমাদের সনাতন ধর্মগ্রন্থের অনুশীলন করেন, নির্দিষ্ট কাজ যথাযথভাবে করে যান, হিংসা পরিত্যাগ করে নিজেকে সংযত রাখেন, তাঁরা খুব সহজেই মুক্তিলাভ করেন। দিব্যবর্ষে বারোশ বছর অর্থাৎ মানুষের বছরের হিসেবে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর কলিযুগের পরমায়ু।

কলিযুগ যখন শেষ হয়ে আসবে, আমাদের প্রথম মনু মহারাজ স্বায়ম্ভুব-এর কালে মহাবীর্যশালী চন্দ্রবংশের প্রমিতি নামে যে রাজা ছিলেন, তিনিই আবার রাজা হয়ে আসবেন। ধর্মাশ্রয়ী যেসব ব্রাহ্মণরা এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ছিলেন, তাঁরা সেই রাজার আশ্রয়ে যাবেন। তিনিও কুড়ি বছর ধরে প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে ম্লেচ্ছদের (অধার্মিক) বিনাশ করে কলিযুগের অবসান ঘটাবেন।

কলিযুগ শেষ হলে আবার সত্যযুগ আসবে। কলির সেই মুষ্টিমেয় ধার্মিক ব্রাহ্মণরা সত্যযুগের সূচনা করবেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা আবার তাঁর সাত মানসপুত্র সাত ঋষিকে সত্যযুগকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীতে পাঠাবেন।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—পৃথিবীতে সৃষ্টির পর থেকে ঘড়ির কাঁটার মত অবিরাম একে অপরের পেছনে ঘুরে চলেছে।

সপ্তরহস্য ও প্রসঙ্গ ভারতবর্ষ

আমাদের এই বরাহকল্পে প্রজাপতি ব্রহ্মা জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে পাহাড়-পর্বত-নদনদী দিয়ে তাকে সাতটি ভাগে ভাগ করলেন। সব ভাগকটিই জলবেষ্টিত ছিল, তাই তাদের নাম হল দ্বীপ।

এক এক করে তিনি সাতটা দ্বীপে পৃথিবীকে ভাগ করলেন। তাই তার পরিচয় হয় সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। প্রত্যেকটি দ্বীপই আয়তনে সুবিশাল ছিল।

পৃথিবীকে ধরে রাখার জন্য পর্বতের আর এক নাম হল 'ধরাধর'। ব্রহ্মার সৃষ্ট পর্বতগুলোও সবদিক থেকে সুবিপুল ছিল। ছোটখাটো পাহাড়-পর্বতের সংখ্যা বাদ দিয়ে, পৃথিবীকে ধরে রাখার জন্য ব্রহ্মা সাতটি করে পর্বত সৃষ্টি করেছিলেন।

সপ্তদ্বীপা এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি দ্বীপ স্রষ্টা ব্রহ্মা সমুদ্র দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। সেই সমুদ্রের সংখ্যাও ছিল সাত। অর্থাৎ, সপ্তসমুদ্র।

ব্রহ্মা পৃথিবী সমেত ওপরে-নীচে যে সব জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তারও ওপরদিকে সাত জগৎ, নীচের দিকেও সাত জগৎ। ওপরের সাত জগতের নাম হল : ভূঃ, ভবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য। নীচের জগৎগুলোর নাম হল : তল, অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল আর পাতাল।

এই পৃথিবীতে বা ব্রহ্মাণ্ডে প্রজাসৃষ্টি এবং প্রজাবৃদ্ধি করার জন্য ব্রহ্মা যেসব মানসপুত্র উৎপন্ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সাতজনই ভালভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁদের নাম হল : মরিচী, অঙ্গিরা, ভৃগু, দক্ষ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য আর পুলহ। এঁদের প্রত্যেকেই হলেন ঋষি। অমর। একসঙ্গে এঁরা হলেন সপ্তর্ষি।

আমাদের পৃথিবীর যে সৌরজগৎ সেখানে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা আছে। এগুলোর মধ্যে কিন্তু সাতটি গ্রহই প্রধান। তাদের নাম হল : সূর্য (রবি), চন্দ্র (সোম), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র আর শনি। প্রধানত (রাহু এবং কেতু ছাড়া) এই সপ্তগ্রহই সৌরজগৎকে যেমন পরিচালনা করছে, পৃথিবীর মানুষকেও তেমনি নিয়ন্ত্রণ করছে।

সূর্যের অপর নাম আদিত্য। আকাশে আমরা একটা সূর্যই দেখি।

সারা বছরে এই এক আদিত্যই আমাদের কখনো উত্তাপ, প্রচণ্ড উত্তাপ, বর্ষা, দুরন্ত বর্ষা, শীত, প্রচণ্ড শীত প্রভৃতি নানা রূপে এই পৃথিবীকে লালনপালন করছে। এর থেকেই ছটা ঋতু। প্রত্যেকটা ঋতুই দু-মাস করে থাকে। এই সবের কারণে, আদিত্য এক হলেও কাজের খাতিরে তার বারোটা নাম হয়েছে। তাই বলা হয় দ্বাদশ আদিত্য। দুটি করে আদিত্য অনুচরদের নিয়ে ঋতু অনুযায়ী রশ্মি বিকিরণ করে ঘোড়ায় টানা একচাকা বিশালকায় রথে প্রতিদিন আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটছে।

সূর্যের রথের ঘোড়া হল সাতটা : তাদের এককথায় বলে ছন্দ। সাতটা ঘোড়া বা ছন্দের নাম হল : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী, পংক্তি, বৃহতী আর উষ্ণিক। (জলভরা আকাশে রশ্মির প্রতিফলনে যে রামধনু দেখা যায়, তাতেও সাতটা রং)।

এক এক ঋতুতে দুই আদিত্য যখন আকাশ পরিক্রমা করে তখন নিজেদের সঙ্গে ঋষি, সাপ, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস নিয়ে সপ্তগণ হয়ে চলে।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই সপ্তগণ হল : ধাতা আর অর্যমা নামে দুই আদিত্যদেব, পুলস্ত্য—পুলহ দুই ঋষি, বাসুকি-সঙ্কীর্ণার দুই সাপ, নারদ-তুম্বুরু দুই গায়ক, ক্রতুস্থলা-পুঞ্জিকাস্থলা দুই অপ্সরা, রথকৃচ্ছ্র-তপোর্য দুই যক্ষ, হেতি-প্রহেতি দুই রাক্ষস।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের সপ্তগণ হল : মিত্র আর বরুণ নামে দুই আদিত্য, অত্রি-বশিষ্ঠ দুই ঋষি, তক্ষক-রম্ভ দুই সাপ, হাহা-হুহু দুই গন্ধর্ব, মেনকা-সহজন্যা দুই অপ্সরা, রথস্বন-রথচিত্র দুই যক্ষ, পৌরুষেয়-ধবনামা দুই রাক্ষস।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের সপ্তগণ হল : ইন্দ্র ও বিবস্বান নামে দুই আদিত্য, অঙ্গিরা-ভৃগু দুই ঋষি, এলাপর্ণ-শঙ্খপাল দুই সাপ, বিশ্বাবসু-উগ্রসেন দুই গন্ধর্ব, প্রাত-অরুণ দুই যক্ষ, প্রম্লোচা-নিম্লোচা দুই অপ্সরা, ব্যাঘ্র-শ্বেত দুই রাক্ষস।

আশ্বিন ও কার্তিক মাসে সূর্যরথের সপ্তগণ হল : পর্জন্য ও পূষা নামে দুই আদিত্য, ভরদ্বাজ-গৌতম দুই ঋষি, ঐরাবত-ধনঞ্জয় দুই সাপ, বিশ্বাবসু-সুরভি দুই গন্ধর্ব, বিশ্বাচী-ঘৃতাচী দুই অপ্সরা, সেনজিৎ-সুষেণ সেনানী দুই যক্ষ, আপ ও বাত দুই রাক্ষস।

অঘ্রান ও পৌষ মাসে সপ্তগণ হল : অংশ ও ভগ নামে দুই আদিত্যদেব, কশ্যপ-ঋতু দুই ঋষি, মহাপদ্ম-কর্কোটক দুই সাপ, উর্বশী-বিপ্রচিত্তি দুই অপ্সরা, চিত্রসেন-উর্ণায়ু দুই গন্ধর্ব, তার্ক্ষ-অরিষ্টনেমি দুই যক্ষ, বিদ্যুৎ ও স্ফূর্জ দুই রাক্ষস।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সূর্যরথের সপ্তগণ হল : ত্বষ্টা আর বিষ্ণু নামে দুই আদিত্যদেব, জমদগ্নি-বিশ্বামিত্র নামে দুই ঋষি, কম্বল ও অশ্বতর নামে দুই সাপ, তিলোত্তমা ও রম্ভা দুই অপ্সরা, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্যবর্চা নামে দুই গন্ধর্ব, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামে দুই যক্ষ, আর ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামে দুই রাক্ষস।

আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রলোকের পেছনে যে ছায়াপথ, আমাদের ঋষিরা তাঁকেই গঙ্গা বলেছেন। এই গঙ্গাই স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং পৃথিবীকে ভাসিয়ে চলেছে, তাই এঁর আর এক নাম ত্রিপথগা। সেখান থেকে গঙ্গা যখন ভূমণ্ডলে নেমে আসতে গেল মহাদেবের সুবিশাল জটার মধ্যে আটকে গিয়ে সেখানেই ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপর এক সময় যখন সে সেই জটিল জটা থেকে



মুক্তি পেয়ে ভূমণ্ডলে নামল, তখন গোলাকার ভূপৃষ্ঠের চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, একই গঙ্গা সাতটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আর, তাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। পূর্বদিকে গেল তিনটে ভাগ। তাদের নাম হল : নলিনী, হ্লাদিনী, পাবনী। পশ্চিমদিকে গেল তিনটে ভাগ। তাদের নাম হল : সীতা, চক্ষু আর সিন্ধু। দক্ষিণদিকে গেল একটি ভাগ। তার নাম হল : ভাগীরথী। সৃষ্টির প্রথমযুগে স্বায়ম্ভুব আমাদের মনু মহারাজ ছিলেন। সেই মনুর নামেই আমরা মানব বলে পরিচিত হয়েছি। স্বয়ম্ভুব পুত্র স্বায়ম্ভুব। স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই আর এক নাম স্বয়ম্ভু। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছিলেন বলেই স্বয়ম্ভু নাম। এই স্বায়ম্ভুব মনুর দুটি ছেলে, প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ। প্রিয়ব্রতর দশটি ছেলে ছিল। তাদের নাম হল : অগ্নিধ্র; অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিস্মান, দ্যুতিমান, হব্য, সবন আর পুত্র। এই দশটি ছেলের জন্মাবার আগে তিনিই সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর রাজা-মহারাজা ছিলেন। ছেলেরা জন্মাবার পর তিনি তাদের মধ্যে থেকে সাতটি ছেলেকে বেছে নিয়ে, সাতটি দ্বীপের শাসনভার দিলেন। অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপের রাজা করলেন। মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ দিলেন। বসু-কে শাল্মলী দ্বীপের শাসনকর্তা করলেন। জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপের দায়িত্ব দিলেন। দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, হব্যকে শাকদ্বীপ আর সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজা করে দিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলেরা এক এক দ্বীপের শাসনভার নিলেন। দ্বীপ বলতে যা বোঝায়, এই দ্বীপগুলো তো আর সে রকম ছিল না—ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে এক একটা সুবিশাল ভূখণ্ড। এইসব ছেলেদের যখন ছেলেপুলে হল তাঁরা আবার তাঁদের সাম্রাজ্য তাঁদের ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেকটি ছেলেই এক একটা বর্ষের (দেশের) রাজা হয়ে, নিজেদের নামেই প্রায় সেইসব দেশের নামকরণ করলেন।

শাকদ্বীপের রাজা হব্য-র সাত ছেলে ছিল। প্রত্যেকটি ছেলেই শাকদ্বীপকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে রাজা হয়ে বসল। শাকদ্বীপ সাত বর্ষে (দেশে) ভাগ হল। সাত ছেলের নামেই সেই সাত দেশের নাম হল। নামগুলো হল : জলজবর্ষ, কুমারবর্ষ, সুকুমারবর্ষ, মানীচকবর্ষ, কুসুমোত্তরবর্ষ, মৌদাকবর্ষ, মহাদ্রুমবর্ষ।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজা দ্যুতিমান। তাঁরও সাত ছেলে। ছেলেরাও নিজেদের নামে সম্পূর্ণ দ্বীপকে ভাগ করে নিয়ে রাজা হয়ে বসল। ক্রৌঞ্চদ্বীপও সাতভাগে ভাগ হল : কুশালবর্ষ, মনোনুগবর্ষ, উষ্ণবর্ষ, পাবনবর্ষ, অন্ধকারবর্ষ, মুনিবর্ষ, দুন্দুভিবর্ষ।

কুশদ্বীপের রাজা জ্যোতিষ্মান। তাঁরও ছিল সাত ছেলে। তাঁদের নাম : উদ্ভিদ, বেণুমান, স্বৈরথ, লবণ, ধৃতি, প্রভাকর, কপিল। এই ছেলেরাও কুশদ্বীপকে সাতভাগে করে নিল। নামগুলো হল : উদ্ভিদবর্ষ, বেণুমণ্ডল, স্বৈরথাকারবর্ষ, লবণবর্ষ, ধৃতিমানবর্ষ, প্রভাকরবর্ষ আর কপিলবর্ষ।

শাল্মলী দ্বীপের রাজা ছিলেন বপুষ্মান। তাঁরও সাত ছেলে : শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুৎ, মানস আর সুপ্রভ। শাল্মলী দ্বীপকে এই সাত ছেলে নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে নিলে। আর সেই দেশগুলো নিজেদের নামেই পরিচিত হল।

প্লক্ষদ্বীপের রাজা মেধাতিথি। এই রাজারও ছিল সাত ছেলে। সেই সাত ছেলে গোটা দ্বীপটাকে নিজেদের মধ্যে আবার সাতভাগে ভাগ করে, নিজেদের নামেই দেশগুলোর নাম রাখল। সেই ভাগ করে নেওয়া দেশগুলোর নাম হল : শান্তভয়, শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, ধ্রুবক, ক্ষেমক আর শিববর্ষ।

সপ্তদ্বীপ এই ভূমণ্ডলের মধ্যে কুশদ্বীপ থেকে প্লক্ষদ্বীপ পর্যন্ত, এই পাঁচটি মহাদেশ সাতটি করে দেশে বিভক্ত হয়েছিল। আর দুটি দ্বীপ বা মহাদেশের মধ্যে পুষ্কর দ্বীপের রাজা সবনে-র মাত্র দুটো ছেলে ছিল। সেই মহাদেশ দুটো ভাগে ভাগ হয়েছিল। আর জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্র-র নটা ছেলে ছিল। তাই জম্বুদ্বীপ ন-ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। রাজা অগ্নীধ্র তাঁর ছেলেদের মধ্যে এই মহাদেশকে ভাগ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

বড়ছেলে নাভিকে হিমাহ্বর্ষ (হিমালয়ের দক্ষিণের দেশ)। মেজছেলে কিম্পুরুষকে হেমকূট (অপর নাম কিংপুরুষবর্ষ)। সেজছেলে হরিবর্ষকে নিষধদেশ। তার পরের ছেলেকে সুমেরুর মাঝখানের দেশ ইলাবৃতকে দিলেন। ইলাবৃত তার নাম রেখেছিল ইলাবৃতবর্ষ। (এই বর্ষই হল মেরুপ্রদেশ বা প্রাচীন ব্রহ্মলোক)। তারপরের হিরণ্বানকে দিলেন শ্বেত নামে উত্তরবর্ষ। শৃঙ্গবানের উত্তরদিকের দেশটি দিলেন ছেলে কুরুকে। পরের ছেলে ভদ্রাশ্বকে দিলেন মাল্যবানবর্ষ। আর শেষ ছেলে কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দিয়ে নিজে রাজ-কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিলেন।

সুবিশাল এই জম্বুদ্বীপ হল সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যমণি। এই দ্বীপকে ঘিরেই বাকি ছটা দ্বীপ। বলা যেতে পারে যে, জম্বুদ্বীপই হল গোলার্ধ। মেরুর দক্ষিণের পর্বতে নাকি বিশাল এক জম্বু (গোলাপজামের) গাছ ছিল, সেই গাছের ফলগুলো বিশালাকার ছিল, আর খুব মিষ্টিও ছিল। সেই ফল গাছ থেকে গন্ধমাদন পাহাড়ে পড়ে ফেটে-ফুটে এত বেশি রস গড়িয়ে পড়ত চারদিকে যে তা থেকে একটা নদীই হয়ে গেল। তার নাম হল জাম্বুনদী। এই নদীর জলে অজস্র সোনা মিলত। সেই জন্যই এই দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ হল। আর দ্বীপটিও সব দিক থেকে সমৃদ্ধ হল।

হিমালয়ের দক্ষিণে হিমাহ নামে যে দেশটি, দ্বিতীয় মনু মহারাজ স্বারোচিষের কালে অগ্নীধ্রের বড়ছেলে নাভি শাসন করত, পরে এরই ভারতবর্ষ নাম হয়েছিল। এর আর এক নাম হল 'হৈমবত'।

হিমালয়ের দক্ষিণে আর লবণ সাগরের উত্তরে এই ভারতবর্ষ। এর বিস্তার ন-হাজার যোজন। আকৃতি উত্তর-দক্ষিণে একটু বাঁকা। সব দিক থেকে সমৃদ্ধ দেবতা-দানব-যক্ষ-কিন্নর—সকলের কাছেই অতি প্রিয় দেশ। স্বায়ম্ভুব মনুর কালে এই ভারতবর্ষ সাত ভাগে বিভক্ত ছিল। পরে এই দেশটি ন-ভাগে বিভক্ত হয়। ভারত ছাড়া বাকি আট ভাগের নাম হল : ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব আর বারুণ। এই সবকটা দ্বীপই সাগর-জলে ঘেরা।

এই 'ভারতবর্ষ' নামের পেছনেও এক কাহিনী আছে। মনু মহারাজই আমাদের যাবতীয় ভারবহন করেন। তিনিই আমাদের যাবতীয় অভাব পূরণ করেন। যেহেতু তিনি সবই ভরণ-পূরণ করেন, তাই তাঁকে আর এক কথায় 'ভরত' বলা হয়। তাঁর এই 'ভরত' নাম থেকেই এই ভূখণ্ডের নাম 'ভারতবর্ষ' হয়েছে। আবার, আর একদিকে অগ্নীধ্র রাজারই একজন বংশধর ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ঋষভ। তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম ক্ষত্রিয় বীর এবং রাজর্ষি। তাঁর অনেকগুলো ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে বড়ছেলের নাম ছিল ভরত। তিনিই এই দেশের অধিপতি হয়েছিলেন। আর তাঁরই নামে এই দেশের নামকরণ হয়েছিল 'ভারতবর্ষ'।

এই ভারত-ভূখণ্ডে অগণিত ছোট বড় পাহাড়-পর্বত আছে। তার মধ্যে মূল পর্বত, যাদের এক কথায় বলে 'কুলাচল', তার সংখ্যা হল সাতটা—মহেন্দ্র, মলয়, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য আর পারিপাত্র। এগুলো প্রধান হলেও মন্দর, বৈভার, দর্দুর, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বৈদ্যুৎ, বাতন্ধম, পাণ্ডুর, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণপর্বত, গোধন, পুষ্পগিরি, উজ্জয়ন্ত, রৈবতক, শ্রীপর্বত, কারুপর্বত, কূটশৈল, ভারত-ভূখণ্ডের সাহায্যে কিছু কম যায় না। এই পার্বত্য দেশগুলোতে আর্য এবং অনার্যরা (ম্লেচ্ছ) বাস করেন।

হিমালয় থেকে যেসব নদী বেরিয়ে ভারতকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের নাম হল : গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, তৃতীয়া, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, ইক্ষু আর লোহিত।

পারিপাত্র পর্বত থেকে যেসব নদী বেরিয়েছে তাদের নাম হল : বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মহী, পরা, চর্মন্বতী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা আর অবন্তী।

ঋক্ষ পর্বত থেকে যেসব নদী বেরিয়েছে তা হল : শোণ, মহানদ, নর্মদা, সুবহা, দ্রুমা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, শ্রোণী, করতোয়া, পিশাচিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালুবাহিনী, সিতেরজা, শুক্তিমতী আর মক্ষণা।

মলয় পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে : কৃতমালা, তাম্রবর্ণা, পুষ্পজাতী, উৎপলাবতী।

মহেন্দ্র পর্বত থেকে বেরিয়েছে : ত্রিসামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী, বংশধরা।

শুক্তিমান থেকে বের হয়েছে : সুকুমারী, মন্দগামিনী, মন্দবাহিনী, কৃপা আর পলাশিনী।

বিন্ধ্য পর্বতের পাদমূল থেকে বেরিয়েছে : তাপী, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, মদ্রা, নিষধা, বেণ্বা, বৈতরণী, শিতিবাহু, কুমুদ্বতী, তোয়া,

মহোগৌরী, দুর্গা ও অন্তঃশিলা।

আবার সহ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে বেরিয়ে যেসব নদী দক্ষিণাপথে চলে গেছে তাদের নাম হল : গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণা, বৈণী, বঞ্জুলা তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, কাবেরী।

এইসব নদী থেকে অনেক শাখানদী, উপনদী বেরিয়ে ভারত-ভূখণ্ডকে শস্য-শ্যামল করে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

একদিকে যেমন ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করেছে তার নদ-নদী, অপরদিকে তেমনি এসব নদী-উপনদী ঘিরে জনপদের পর জনপদ গড়ে উঠেছে। উপনিবেশের পর উপনিবেশ নানা মানুষের বসত নিয়ে ভারতকে জনসমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ভারতের মধ্যদেশীয় জনপদগুলো হল : কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, জাঙ্গল, শূরসেন, কাশী, কোশল, কলিঙ্গ, মগধ, ভদ্রাকর, কুন্তল, বৃক প্রভৃতি।

ভারতের পূর্বদেশীয় জনপদগুলো হল : অঙ্গবাক, সুজরক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, মলদ, ভার্গব, প্রাগজ্যোতিষপুর, পৌণ্ড্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মাল, গোনন্দ প্রভৃতি।

দাক্ষিণাত্যের জনপদ বলতে : পাণ্ড্য, কেরল, চৌপ্য, কুল্য, মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ, আভীর, বিদর্ভ, দণ্ডক, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশ।

এছাড়াও নর্মদা নদীর তীরে ভারুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, আনর্ত, অর্বুদ, বিন্ধ্যাচলে মালব, করূষ, মেকল, উৎকল, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যা, হোসল, অবন্তী প্রভৃতি এবং পার্বত্য দেশ হংসমার্গ, কুপথ, হূণ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি কত না দেশ ভারতের জনবসত গড়ে তুলেছে।

অরণ্য-সম্পদ, প্রাকৃতিক-সম্পদ, মনুষ্য-সম্পদ সব দিক থেকে সমৃদ্ধ এই ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে কিরাত আর পশ্চিমে যবনদের বাস। এই ভারতবর্ষ দেবতাদের কাছেও লোভনীয়।

জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান, ধর্মানুশীলনের কেন্দ্র এই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা সব কিছুতেই যত্নশীল। তাই ভারতের আর এক নাম 'ভারতী'। ভারতীর অর্থ হল জ্ঞানী। ভারতবর্ষ জ্ঞানীদের বাসভূমি।

(যেসব দেশ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ভারতবর্ষের মানচিত্রে প্রথমেই রয়েছে, বর্তমানে তার অনেকগুলোরই নামের পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক নদ-নদী-জনপদ হয়ত আজ আর নেই। কালের পরিবর্তনে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক কিছুই বদলায়। বর্তমানে ভারতের মানচিত্রও বদলে গেছে। এখানে যে রূপরেখা দেখি, বর্তমান ভারত তার তুলনায় অনেক ছোট হয়ে গেছে। অনেক কিছুই নেই, নামে অনেক কিছুই হয়ত বদলেছে। তবুও পৌরাণিক এই নাম এখনও তো কিছু আছে।)

দেব-অসুর-যক্ষ কথা

জল থইথই মহাসমুদ্রের ওপর ভাসতে ভাসতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন প্রজা সৃষ্টির চিন্তা করলেন তখনই তাঁর দেহের জঘনদেশ থেকে প্রথমেই কিম্ভূতকিমাকার, কালো, কদাকার প্রাণীর সৃষ্টি হল। প্রাণ থেকে প্রাণীর সৃষ্টি। জঘনদেশ থেকে হঠাৎ এই ধরনের প্রজা বেরিয়ে আসতেই ব্রহ্মা নিজেই মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। কালো অন্ধকার এই প্রাণীরা তো তাঁর কাম্য ছিল না। কোথা থেকে এল? ভেবে দেখলেন, সৃষ্টির মুহূর্তে তমোগুণ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। এরা হল অসুর। প্রাণের সমান অর্থবাচক শব্দ, শুদ্ধ ভাষায় 'অসু'। তাই এরা হল অসুর।

এদের দেখেই ব্রহ্মা নিজের তমোগুণকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। বিধাতা যা-ই পরিত্যাগ করুন, তা কখনো আবর্জনার মত ফেলা যায় না। কুশলী কারিগর যেমন ছেঁড়া টুকরো কাগজ থেকেও জিনিস তৈরি করেন, ব্রহ্মাও তাই। তমোগুণকে যেই তিনি ঝেড়ে ফেললেন, অমনি তা, আমরা যাকে বলি রাত্রি, তাই হয়ে গেল। এই রাত্রি অসুরদের হল। তাই অসুররা রাত্রে বলবান।

ব্রহ্মার মন থেকে তমোগুণ চলে যেতেই মনটা হালকা উদাসীন হয়ে গেল। মন প্রফুল্ল হল। মন যখন এমন প্রফুল্ল এবং উদাসীন হয়, তখন সত্ত্বগুণ আসে। নির্বিকার হলেও কেউ তো আর একেবারে চুপ করে থাকতে পারে না। শিশুরা নির্বিকার, উদাসীন। কোন কাজ না করলেও তারা আপন মনে হাত-পা ছোঁড়ে, খেলা করে। ব্রহ্মাও তেমনি খেলা করতে গিয়ে মনের আনন্দে অপর এক সৃষ্টি করলেন। মনের আনন্দে খেলার মধ্য দিয়ে তাদের সৃষ্টি হল। তাই তারা হল দেবতা। তখন আর রাত ছিল না। দিন ছিল। দিনের আলোয় তাদের সৃষ্টি। তাই দিন হল দেবতাদের। খেলার ছলে তাদের সৃষ্টি। তাই খেলাই তাদের ধর্ম হল। সত্ত্বগুণে আনন্দে তাদের সৃষ্টি। তাই তারা আনন্দময় হল।

অসুর আর দেবতাদের সৃষ্টির পর ব্রহ্মা পিতৃগণকে সৃষ্টি করলেন। যখন তিনি তাঁদের সৃষ্টি করছেন তখন তাঁর আর এক ভাব, সময়টাও অন্য। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত তখন শেষ হচ্ছে, আর শুক্লপক্ষের চাঁদনী রাত শুরু হচ্ছে। আসলে দিনের শেষ, রাতে শুরুর মাঝে সেটা তখন সন্ধ্যাকাল ছিল। তাই সন্ধ্যা হল পিতৃগণের। ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করলে কি হবে, এরা সকলের কাছেই পূজ্য ছিল। দেবতা, মানুষ সকলেই শ্রদ্ধার চোখে এঁদের দেখত।

এভাবে দেবতা-অসুর-পিতৃগণের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দিন-রাত্রি-সন্ধ্যার সৃষ্টি হল।

পিতৃগণের সৃষ্টির পর ব্রহ্মা রজঃ আর তমোগুণের দোলায় দুলে উঠলেন। সে সময় যারা সৃষ্ট হল তাদের মধ্যে কিছু তমঃ-র অন্ধকারের প্রাণী, আর কিছু রজোগুণের মধ্যে। যারা অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হল তারা জন্মানো মাত্রই খিদেয় হাঁ...হাঁ করে, কাছেপিঠে কিছু না পেয়ে জলরাশিকেই পান করতে আরম্ভ করে দিল। যে জলরাশি থেকে ব্রহ্মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব নিয়ে সৃষ্টি করছেন, তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরা তাকেই শেষ করে দিতে শুরু করল দেখে ব্রহ্মা একটু চিন্তায় পড়লেন। অবশ্য তাঁর চিন্তার কোন কারণ ছিল না। কেননা, একই সময়ে রজোগুণ থেকে কিছু প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে, যারা জলরাশি পান করছিল, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। জলরাশিকে রক্ষা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে পড়ল। যারা জলরাশি পান করতে বা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তারা হল গুহ্যক বা যক্ষ। আর যারা রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল তারা হল রাক্ষস।

এই দু-রকমের প্রজাকেই কিন্তু ব্রহ্মার ভাল লাগল না। তাঁর মাথার চুল ক্ষোভে দুঃখে গলে যেতে লাগল, বুকের ভেতর রাগ গজগজ করে উঠতে লাগল। ব্রহ্মার যা কিছুই হোক, তার থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। এই অবস্থা থেকেও সৃষ্টি হল। মাথার চুল গলে গলে সারা গা বেয়ে হিলহিল করতে করতে নীচে পড়ল। নীচে পড়ে তারা হিলহিলে সাপের আকার নিল। আর ব্রহ্মার বুকের রাগ হল সাপেদের বিষ।

এইরকমের জঘন্য সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মার মনে আরও রাগ হল। রাগে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে রাজ্যের মাংসাশী ভূত-প্রেত-পিশাচের সৃষ্টি হল। এভাবে পর পর অপ্সরা, নর, কিন্নর সৃষ্টির পরও ব্রহ্মা দেখলেন, পৃথিবীর বহু স্থান এখনও খালি পড়ে রয়েছে। পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলতে এখনো অনেক সৃষ্টির দরকার।

তখন তিনি পশু-পাখি সৃষ্টির কাজে মন দিলেন। ব্রহ্মার গায়ের ছাল থেকে ছাগল হল। বুক থেকে পাখি হল। পেট আর পাঁজরা থেকে গরু সৃষ্টি হল, আর পা দুটো থেকে ঘোড়া, গাধা, হাতি, উট, হরিণ প্রভৃতির সৃষ্টি হল। আর তাঁর গায়ের যা রোম (বাল) ছিল, তা থেকে নানা জাতের লতা, পাতা, ফল মূল হল।

ব্রহ্মা মানুষ সৃষ্টির বা প্রজা সৃষ্টির প্রথমে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন নামে যেসব মানসপুত্র উৎপন্ন করেছিলেন তাঁরা কেউই ব্রহ্মার আদেশমত প্রজাসৃষ্টি না করে উদাসীন হয়ে গেলেন। তাই দেখে তাঁর খুব রাগ হল। যেই ক্রোধ এল অমনি তার থেকে অদ্ভুত এক মূর্তির সৃষ্টি হল। মূর্তিটির একই দেহে ছিল দুটি রূপ—অর্ধেক পুরুষমূর্তি, অর্ধেক নারীমূর্তি। সেই মূর্তি সূর্যের তেজের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। ব্রহ্মা তাই দেখে বললেন—'তোমরা আলাদা হও'। বলার সঙ্গে সঙ্গেই জোড়া শরীর আলাদা হয়ে গেল। আলাদা এক পুরুষ মূর্তি, আলাদা এক নারী মূর্তি। এই পুরুষ মূর্তির নাম হল রুদ্র। কারণ, আলাদা হয়ে কি নামে সে পরিচিত হবে এই বলে সে 'রোদন' করেছিল (কেঁদেছিল)। তাই ব্রহ্মা তার নাম দিয়েছিলেন রুদ্র। নারীদেহ থেকে আলাদা হয়ে এই রুদ্র নিজেই আবার নিজেকে এগারো ভাগে ভাগ করে ফেলল। তাই আমাদের রুদ্রের সংখ্যা হল একাদশ। এদের কাজই হল প্রজাদের মঙ্গল করা। ওদিকে নারীদেহের রূপটিও ছিল অদ্ভুত। তার ডানদিকের নীচের অর্ধেকটা সাদা, আর ওপরের অর্ধেকটা কালো ছিল। ব্রহ্মা তাঁকেও বললেন, 'তুমি তোমার দেহ ভাগ কর।' সেই নারী তখন নিজেকে স্বাহা, স্বধা, মেধা, মহাবিদ্যা, হৈমবতী, উমা প্রভৃতি বহু বহুরূপে নিজেকে ভাগ করে ফেলল। সেজন্য তার আর এক নাম হল শতরূপা।

প্রথম মানসপুত্ররা প্রজা সৃষ্টি না করায় ব্রহ্মা আরো বারোজন মানসপুত্র উৎপন্ন করলেন : রুচি, দক্ষ, মরীচি, ভৃগু, ঋষি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, ক্রতু আর নীললোহিতভদ্র। (এঁদের মধ্যে অঙ্গিরস, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ—এই নজনই হলেন প্রধান।) এঁরা দেখতেও ঠিক ব্রহ্মার মত ছিলেন। এঁরা ব্রহ্মার আদেশ মেনে নিলেন। প্রজার পর প্রজা সৃষ্টি করলেন, বংশবিস্তার করলেন। সেই সঙ্গে এঁরাই ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন।

ব্রহ্মার মুখ রক্ষা হল, ইচ্ছা পূরণ হল।

জনক যজ্ঞে যাজ্ঞবল্ক্য

মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য। অনন্ত বেদগ্রন্থের একটি একটি শাখায় তিনি ব্যাসদেবের অন্যতম শিষ্যের শিষ্য বাস্কলির কাছে অধ্যয়ন করে মহা পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। পাণ্ডিত্যের বলে বেদের একটি সংহিতাই তিনি রচনা করে ফেলেছিলেন। তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা'।

এদিকে আবার পৈলের আর একজন শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি। তিনি আবার মার্কণ্ডেয় মুনিকে বেদের একটি শাখা পড়িয়েছিলেন। তিনিও বেদ অধ্যয়ন করে আর একটি সংহিতা রচনা করে ফেললেন। তারও নাম হয়ে গেল 'মার্কণ্ডেয় সংহিতা'। মার্কণ্ডেয় মুনিও তাঁর বংশধরদের বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুললেন। মুনিবরের এক নাতি ছিল। তাঁর নাম সত্যশ্রী। তিনি আবার এই শাস্ত্রে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আবার চারজন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম হল শাকল্য।

যে বেদগ্রন্থ প্রায় লোপ পেয়ে যাচ্ছিল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাকে চার ভাগে ভাগ করে এমন চাঙা করে তুললেন যে, ঘরে ঘরে আবার বেদপাঠ, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ দারুণভাবে শুরু হয়ে গেল। শেষে এমন রূপ নিল যে, সত্যিকারের বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ কে,তার বাছাই করাই বেশ শক্ত হয়ে পড়ল।

মিথিলার রাজা তখন জনক। তিনিও সুপণ্ডিত।

দেশ পণ্ডিতে-পণ্ডিতে ছেয়ে গেছে দেখে তিনি ঠিক করলেন যে, এঁদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, তা একবার দেখতে হবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা জনক একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন।

যজ্ঞ বলতে আমরা এখন যা বুঝি, কাঠের আগুন জ্বেলে মন্ত্র পড়ে তাতে ঘি ঢালা, তখনকার দিনে কিন্তু ঠিক ছিল না। যজ্ঞ বলতে তখন বোঝাত, সব গঠনমূলক কাজ। গ্রাম-নগরের পত্তন করা, কিভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়, তার জন্য যাবতীয় কাজ করা, বিদ্যাশিক্ষার মান ঠিক করা। তাই একটু-আধটু জায়গা নিয়ে তখন যজ্ঞ হতো না। রাজারা এমন একটা জায়গা বেছে নিতেন, যেখানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হতে পারত। কাজে অংশ নিতে পারত। রাজারাও তার জন্য অঢেল খরচ করতেন।

রাজা জনকও তেমনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বিশেষ করে দেশের সব ব্রাহ্মণদের ডাকলেন।

রাজার ডাকে যজ্ঞস্থলে মহা মহা জ্ঞানী ব্রাহ্মণরা সবাই এসে হাজির হলেন। জনক রাজা তখন ব্রাহ্মণরা যেখানে সমবেত হয়েছেন, তারই পাশে ফাঁকা এক ঘেরা জায়গায় এক হাজার গরু, সোনা, প্রচুর রত্ন আর অগণিত দাসদাসী এনে জড়ো করলেন।

তারপর ব্রাহ্মণদের ডেকে বললেন—আপনারা সকলেই সৎ ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত। কিন্তু আমার এই গরু, সোনা, মণিমাণিক্য, দাসদাসী মাত্র একজনকেই দিতে চাই, যিনি আপনাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত।

টইটম্বুর পুকুর জলে ঢিল ছুঁড়ে দিলে যেমন গোল হয়ে তার চারদিকে ছোট ছোট ঢেউ উঠে, জনক রাজার কথা শুনে আর ধনরত্ন দেখে ব্রাহ্মণদেরও মন লোভে তোলপাড় করে উঠল। কেউ কি কারো চেয়ে কম? সকলেই বেদগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, সংহিতা রচনা করেছেন। যোগ্য সব শিষ্য তৈরি করেছেন। তাই সবাই কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন।

একজন যেই বললেন 'ও ধন আমার', অপরজন সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বসলেন, 'না, রাজা জ্ঞান এবং বুদ্ধির মর্যাদা দিচ্ছেন। সুতরাং ও ধন আমার।' এপাশ-ওপাশ থেকে আরো অনেকে, একে অপরকে বাধা দিয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে সভা উত্তাল হয়ে উঠল ধনলোভে। একের সঙ্গে অপরে বিবাদ শুরু করে দিলেন। মীমাংসো আর হয় না। জনক রাজা চুপ করে বসে বসে দেখেন।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। শাস্ত্রের কূট-কচালি নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে তর্কেরও শেষ নেই। আর কে যে কম বা বেশি, তাও বোঝা যায় না।

সভার যখন এমন অবস্থা, ঠিক সেই সময় মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়ালেন। শিষ্যকে ডেকে বললেন—শোন, রাজার দেওয়া ঐসব গরু, ধনরত্ন আমারই প্রাপ্য। তোমরা ওগুলো আমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

গুরুর আদেশ শিষ্যরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতে ছুটলেন। তাই দেখে ব্রাহ্মণরা হইহই করে ঘিরে ধরলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহাপণ্ডিত শাকল্যও ছিলেন।

—কি, এত বড় স্পর্ধা যে, আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে তুমি ঐ ধনরত্ন নিয়ে যাবে?

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—ব্রাহ্মণগণ, আমি আপনাদের তুচ্ছ জ্ঞানও করি নি। আর স্বেচ্ছায় লোভের বশেও নিয়ে যাচ্ছি না। রাজা জ্ঞানের সম্মানে এই দান দিচ্ছেন। আমিও আমার প্রয়োজনে এই দান নিচ্ছি।

—তুমি কি বিনা বিচারেই নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবছ নাকি? ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শাকল্যও আক্রমণ করলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—আপনারা সকলেই সত্যবাদী। সকলেই ব্রহ্মবাদী। আমি বেদগ্রন্থ বেশ ভালভাবেই পড়াশুনো করেছি। আমার ওপর যদি আপনাদের সন্দেহ হয়, তাহলে একে একে আমায় প্রশ্ন করুন।

একে একে প্রশ্ন! ব্রাহ্মণরা তখন উত্তেজনায় এমনি ফেটে পড়ছেন যে, সাধারণ রীতিও তাঁরা ভুলে গেছেন। একের ঘাড়ে এক, তার ঘাড়ে আর একজন, একসঙ্গে এক গাদা করে প্রশ্নের বাণ যাজ্ঞবল্ক্যকে এসে বিঁধতে শুরু করল। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ আর সংযমী। কোন রকম উত্তেজনা তাঁর মধ্যে ছিল না। সব প্রশ্নগুলোই এক কানে শুনে নিয়ে যাঁর যা প্রশ্ন, তাঁকে এমনভাবে জবাব দিতে লাগলেন যে, আক্রমণকারী ব্রাহ্মণরা একেবারে চুপ।

এক এক করে সব ব্রাহ্মণই যাজ্ঞবল্ক্যর কাছে হেরে গিয়ে চুপ করে গেলেন। অপরাপর ব্রাহ্মণদের ওপর শাকল্য কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বেশ তম্বিতম্বা করছিলেন। তিনিও চুপ। বরাবরই তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই সবাই চুপ করে গেলে তিনি শাকল্যকে উদ্দেশ করে বললেন—কি পণ্ডিতপ্রবর, আপনারও কি কোন প্রশ্ন নেই?

আত্মসম্মান আহত হলেও শাকল্যের মন থেকে তখনও অহঙ্কার

যায় নি।

শাকল্য বললেন—আমি এখনও তোমাকে বেদবিদ ব্রাহ্মণ বলে মানি না। যে নিজের ভোগের জন্য ধনসম্পদ সংগ্রহ করে, সে কি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত? তুমি লোভী।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—পণ্ডিতপ্রবর, ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রই বল। সে অস্ত্রের জোরে ধন-সম্পদ আহরণ করে। আর ব্রাহ্মণের বল তার বিদ্যা। এই ধনসম্পদ আমি বিদ্যাবলে আহরণ করেছি। কামনা বা লোভের বশে নয়। তাছাড়া রাজার শর্তই তাই ছিল।

অহঙ্কার, দম্ভ যার মনে একবার দানা বেঁধে বসে, সে কি কোন যুক্তি মানে। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর যেন শাকল্যের কানেই গেল না। তিনি বারবার যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন একই কথা বলতে লাগলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন—বেশ, বিদ্যার সঙ্গে কামনার কি সম্পর্ক তা এখানেই স্থির হয়ে যাক। আপনার এ বিষয়ে কি কি প্রশ্ন আছে করুন, দেখি, আমি তার জবাব দিতে পারি কিনা।

শাকল্য সুযোগ বুঝে মনে মনে লাফিয়ে উঠলেন। মহাধুরন্ধর পণ্ডিত তিনি। কিভাবে প্রশ্ন করে বিপক্ষকে কাৎ করা যায়, তা তাঁর ভালই জানা। একের পর এক কূট প্রশ্ন করে চলেন তিনি, আর সঠিক জবাব দিয়ে চললেন যাজ্ঞবল্ক্য। চারদিক নিস্তব্ধ। সমবেত পণ্ডিতরা সবাই নির্বাক। মন দিয়ে কান খাড়া রেখে চুপচাপ বসে আছেন জনক। শাকল্যের প্রশ্ন আর যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর চলেছে সমানে। একের পর এক অনেক প্রশ্ন করলেন শাকল্য। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যকে কিছুতেই ফাঁদে ফেলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে চুপ করে গেলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—পণ্ডিতপ্রবর, আপনার আর কোন প্রশ্ন নেই তো? এবার তাহলে আপনি জবাব দিন। তবে একটা শর্ত। যে প্রশ্ন করব, তার জবাব যদি দিতে না প্যারেন, তাহলে আপনাকে কিন্তু প্রাণ পরিত্যাগ করতে হবে।

তর্কের পণ। শাকল্য বাধ্য হলেন রাজি হতে।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্ন রাখলেন। দুর্ভাগ্য শাকল্যের। অত বড় পণ্ডিত হয়েও তার কোন জবাব দিতে পারলেন না। শেষে প্রাণ ত্যাগ করে শর্ত পালন করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যও বিদ্যার দম্ভকে বিনষ্ট করে সম্পদ নিয়ে সভা ত্যাগ করলেন।



অগ্নি পুরাণ

এই পুরাণটি বেদগ্রন্থের মতই মূল্যবান। বৃহৎ আকারের এই গ্রন্থটিতে খুব অল্পকথায় যাবতীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূজা-পাঠ, প্রতিমা, কোন প্রতিমা কি রকমের হবে, তার মন্দিরই-বা কিভাবে তৈরি হবে, মন্ত্র-তন্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাজার আচরণীয় ধর্ম কি, বসতবাড়ি নির্মাণের পদ্ধতি, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি বিশেষ করে ভেষজ চিকিৎসা, এসব ছাড়াও সম্পত্তি-সংক্রান্ত সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যাবে, এমন কি ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার শাস্ত্রও এই পুরাণে স্থান পেয়েছে। সবই স্বল্প-পরিসরে প্রায় সূত্রের আকারে লেখা। আমাদের সুবিশাল প্রাচীন জ্ঞানসমুদ্র থেকে যেন বেছে বেছে মণিমুক্তো এতে সংগৃহীত হয়েছে।

স্বয়ং অগ্নিদেব পুরাকালে কোন একসময় দেবতা, ঋষি, মুনিদের ও ব্রহ্মাকে এই জ্ঞান-সাগর দান করেছিলেন। ব্রহ্মা পরে বশিষ্ঠদেবকে এই জ্ঞান দান করে তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। পরে বেদব্যাস এই জ্ঞান-ভাণ্ডারটি বশিষ্ঠদেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সূতকে দান করেছিলেন। সূত নৈমিষারণ্যে এলে শৌনকাদি ঋষির অনুরোধে তাঁদের মাঝে এই জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন। তাই এই পুরাণ গ্রন্থটির নামই হয়েছে অগ্নিপুরাণ।

অবতার কাহিনী

ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর স্রষ্টাই হলেন ব্রহ্মা। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পর ব্রহ্মা মানুষের আদিপুরুষ মনুকে সৃষ্টি করেন। মনুই আমাদের আদিপিতা, ব্রহ্মাদের রক্ষাকর্তা—রাজাধিরাজ, মহারাজ। তিনি কঠোর তপস্যা করে মানব দিয়ে ব্রহ্মার সৃষ্টিকে শুধু সমৃদ্ধই করলেন না, বংশবিস্তার করে প্রজায় প্রজায় শুধু পৃথিবী ভরিয়ে দিলেন না, কিভাবে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, তার জন্যও অবিরাম সাধনা করেছেন। যাতে সকলে তাঁর বিধিনিষেধ মেনে ধর্মপথে থাকে, তার জন্য সব সময়ই চেষ্টা করতেন। কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ে সৃষ্টির মধ্যেও ডামাডোল বাধে, বিপর্যয় আসে। মাঝখান থেকে কিছু অসাধু, স্বার্থপর মানুষ পাঁচশিরা ফণিমনসা গাছের হাজার গণ্ডা বিষ-কাঁটা নিয়ে গজিয়ে ওঠে। সাধু ব্যক্তিরা বিব্রত হয়ে পড়েন। এই অবস্থা যখন চরমে ওঠে, মনু মহারাজের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখনই পৃথিবীতে বিপর্যয় নামে। পাপে ষোল কলা পূর্ণ হলে ব্রাহ্মণই তখন তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন। কখনো কখনো সেই ধ্বংসকাজ এমন নিষ্ঠুর ভাবে করেন যে, কারো কোন চিহ্নই রাখেন না। তাকে বলে মহাপ্রলয়। আবার কখনো কখনো কিছু কিছু সাধু ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রেখে বাকিটা ধ্বংস করেন। তাকে বলে খণ্ডপ্রলয়।

অধর্মকে বিনাশ করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রেমাবতার তিনি এক এক সময় এক এক রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তখন তিনি অবতার হিসেবে পরিচিত হন। যখনই এই রকম অবস্থা এসেছে তখনই এক একজন অবতার এসেছেন। ভারতবর্ষেই বিশেষভাবে তাঁরা এসেছেন। আপদ-বিপদ কাটিয়ে পৃথিবীকে শান্ত করেছেন। মনু মহারাজকেও নিশ্চিন্ত করেছেন।

সব গুণতে গেলে অবতারের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মুনি-ঋষিরা এখনও পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণ, যিনি এই পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, তাঁর দশজন অবতারের কথাই ঘোষণা করেছেন। সেই দশজন অবতার হলেন : মৎস্যাবতার, কূর্মাবতার, বরাহ অবতার, নরসিংহ বা নৃসিংহ অবতার, বামনাবতার, পরশুরাম অবতার, শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, সেই সঙ্গে বুদ্ধ অবতার আর কল্কি অবতার।

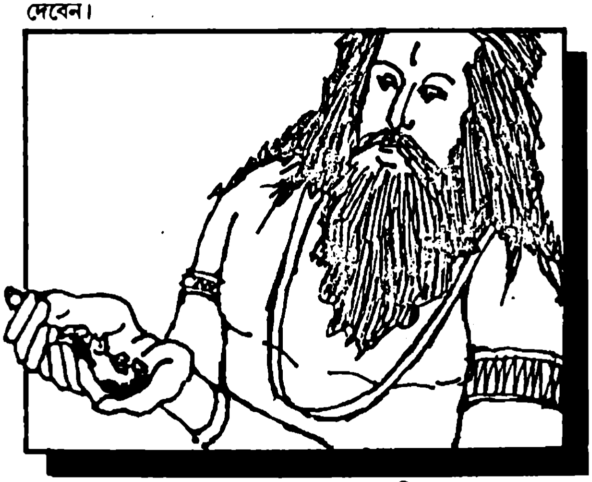
(ক)

মৎস্যাবতার

আমাদের ভূমণ্ডলের অধীশ্বর তখন বৈবস্বত মনু। তিনিই আমাদের মানবকুলের এই মন্বন্তরের আদিপুরুষ।

তাঁরই রাজত্বকালের একটা যুগ শেষ হয়েছে। যুগ শেষ হওয়া মানেই অনাচারে ছেয়ে যাওয়া। কেউ কাউকে আর সহ্য করতে পারে না। কেউ কাউকে আর আপনজন বলে ভাবে না। পৃথিবীর ধন-সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করে না। প্রায় সকলেই মদমত্ত হয়ে ওঠে। ফলে বিবাধ বাধে। রাগে ধৈর্য হারিয়ে একে অপরকে মারতে শুরু করে। স্বাভাবিক ভাবেই যারা একটু দুর্বল তারা প্রথমে মারা পড়ে। তারপর যেসব শক্তিমানরা বেঁচে থাকে, তারা আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধায়। 'জোর যার মুল্লুক তার' নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের শত্রুতা চরমে ওঠে। আর যারা ধর্মভীরু, নিরীহ তারা কোন রকমে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তখনই বুঝতে হবে, যুগ শেষ হয়ে আসছে।

হঠাৎ আমাদের মনু মহারাজ একদিন দেখলেন—প্রজাদের মধ্যে হিংসা চরমে উঠেছে। তিনি বিজ্ঞ। তাই ভালভাবেই জানেন, চরমে উঠলে তার পতন আছে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। জগতের যিনি স্রষ্টা, তিনি তার ব্যবস্থা করেই রেখেছেন। রুদ্র-রূপে তিনি সব ধ্বংস করে দেবেন।



মনু মহারাজের চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। কত কষ্ট, কত পরিশ্রম, কত সাধনা, কত তপস্যা করে তিনি প্রজাদের ছেলের মত পালন করে আসছিলেন। বলতে গেলে, সবাই তো একরকম তাঁরই ছেলে। ছেলেরা অবাধ্য হয়ে উঠলে বাবার মনে কষ্ট হবে বৈকি। আবার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, খুনোখুনি, লুটপাট করে নিজেরা ধ্বংস হোক, সেই সঙ্গে সব কিছু ধ্বংস করে ফেলুক, কোন স্নেহ-পরায়ণ বাবাই তা চান না। আবার এসব করলে প্রকৃতির নিয়মে যা হবার তা হবেই। তাই কিভাবে সৃষ্টিকে বাঁচানো যায়, মনু মহারাজ সেই চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন।

একদিন কৃতমালা নামে নদীতে স্নান সেরে হাতের আঁজলায় জল তুলে তিনি তর্পণ করতে যাবেন কি, জলের সঙ্গে হাতে একটা ছোট্ট মাছ উঠে এসে কিলবিল করে উঠল। মনু মহারাজ চমকে উঠে জলসমেত যেই মাছটাকে ফেলে দিতে যাবেন, মাছ অমনি কথা বলে উঠল—মহারাজ, দোহাই আপনার, আমাকে আর এই নদীতে ফেলে দেবেন না। এখানে হাঙর-কুমীরের বড় উৎপাত। খালি আমাকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। আমাকে আপনি বাঁচান।

একে ছোট্ট একটা মাছ, এর ওপর আবার তার মুখে এই ধরনের কথা শুনে যেমন চমকে উঠলেন, তেমনি মায়াও জাগল। মনু মহারাজ তাকে আর জলে ফেলে না দিয়ে, ছোট একটা কলসীর (কমণ্ডলুর) মধ্যে রাখলেন। তারপর তর্পণ সেরে নিজের প্রাসাদে এনে নিরালা জায়গায় রেখে দিলেন।

পরদিন মনু মহারাজ মাছটিকে দেখতে গিয়েই অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, একদিনেই মাছটি এত বড় হয়ে উঠেছে যে, কমণ্ডলুর মধ্যে তার আর নড়াচড়ার জায়গা নেই বললেই হয়।

মহারাজকে দেখে মাছটি আবার বলে উঠল—রাজা, দেখুন আমি কত বড় হয়ে উঠেছি। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। আমাকে একটু বড় জায়গায় রাখুন।

রাজা তাকে তখন নিজের প্রাসাদেই বড় একটা চৌবাচ্চার মধ্যে ছেড়ে দিলেন। পরদিন গিয়ে দেখেন যে, মাছ চৌবাচ্চা-জুড়ে বড় হয়ে গেছে। রাজাকে দেখে মাছ বলল—রাজা, আমার এই ছোট চৌবাচ্চার ভেতর থাকতে কষ্ট হচ্ছে। আমাকে কোন বড় জায়গায় রাখুন।

রাজা তখন তাকে নিয়ে গিয়ে সযত্নে নিজের বাগানে সরোবরের জলে ছেড়ে দিলেন। মাছও মনের আনন্দে সেই জলে খেলা করে বেড়াতে লাগল।

মনু মহারাজ পরদিন সরোবরের ধারে গিয়ে দেখলেন যে, মাছ আরও বড় হয়ে উঠেছে। আর এত বড় যে, সরোবরের অতখানি জলেও সে যেন আর নড়াচড়া করতে পারছে না।

দেখে রাজা অবাক হয়ে ভাবছেন, ছোট্ট একটা মাছ এক একদিনে এত বড় কিভাবে হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী মহারাজ অবাক হলেও ভাবেন, ভগবান অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এ-ও হয়ত সে রকম একটা কিছু।

রাজাকে দেখে সরোবর থেকে মাছ বলে উঠল—মহারাজ, আপনার এই সরোবরেও যে আমার জায়গা হচ্ছে না। আমাকে আরও বড় জলাশয়ে রাখুন।

মনু মহারাজ তখন লোক-লস্কর নিয়ে সরোবর থেকে অতি যত্নে মাছটিকে তুলে নদীর জলে ছেড়ে দিলেন। নদীর বিপুল জল পেয়ে মাছ মনের আনন্দে ঢেউ তুলে জল তোলপাড় করতে শুরু করে দিল।

দেশ জুড়ে অনাসৃষ্টি তো চলছিলই। মারামারি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক তো লেগেই ছিল, হঠাৎ দেশময় আর এক উৎপাত শুরু হয়ে গেল। আপন গতিপথে নদী বেশ চলছিল, হঠাৎ যেদিকে-সেদিকে গতি বদলে জনপদের পর জনপদের ভেতরে জলের তোড় নিয়ে ঢুকে পড়তে লাগল। অনেক ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ল, ভেসে গেল। চারদিকে হইহই ব্যাপার। হঠাৎ এরকম কেন হল?

মনু মহারাজ নদীর ধারে ছুটলেন। গিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। নদীর আড়াআড়ি ভাবে সেই মাছ এত বিশালকায় হয়ে পড়ে আছে যে, নদীর সাধ্য কি তাকে ডিঙিয়ে যায়!

রাজাকে দেখে মাছ বলল—রাজা, এই নদীও আমায় জায়গা দিতে পারল না। আপনি আমাকে আরো বড় কোন জলাশয়ে রেখে আসুন।

রাজা বহু মানুষজন নিয়ে ধীরে ধীরে সেই মাছকে নদী থেকে তুলে সাগরের জলে রাখলেন। আর সেখানে রাখা মাত্রই নিমেষের মধ্যে মাছটি এত বিশালকায় হয়ে উঠল যে, দেখলেই মনে হবে লক্ষ যোজন নিয়ে একটি মহাদেশ যেন জলে ভাসছে। তা দেখেই তো রাজার চোখ ছানাবড়া। বুঝতে পারলেন, এ কোন সাধারণ মাছ মোটেই নয়। মাছের বেশ ধরে নিশ্চয়ই ভগবান এসে তাঁকে ছলনা করছেন।

মনু মহারাজ তখন হাত জোড় করে কাতরস্বরে মাছকে বললেন—কে আপনি? আপনার পরিচয় দিন।

মাছের মুখের দিকটা দেখতে দেখতে রাজার চোখের সামনে বদলে গেল। মনু মহারাজ দেখলেন, মাছের রূপে জগতের রক্ষাকর্তা নারায়ণ নিজে তাঁর সামনে সমুদ্রের জলে। দেখা মাত্রই রাজা দারুণভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

মাছ বলল—তোমার সংশয় এবার মিটেছে তো রাজা? এবার যা বলি, তা মন দিয়ে শোন : আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে প্রলয় হবে। গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই সমুদ্রের জলের তলায় চলে যাবে। তুমি মানুষ থেকে শুরু করে শস্যর বীজ সংগ্রহ করে রাখবে। প্রলয়ে যখন সব তলিয়ে যেতে থাকবে, তখন একটা সোনার নৌকোয় উঠবে। সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে যখন যাবে তখন তুমি আমার সোনার রঙের শিং দেখতে পাবে। দড়ি দিয়ে তখন আমার সেই শিং-এর সঙ্গে তোমার নৌকো বেঁধে রাখবে। তারপর সমুদ্রের জল সরে গিয়ে যখন মাটি জেগে উঠবে, তখন নতুন করে তুমি এই পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলবে। সপ্তর্ষিরা তোমাকে সাহায্য করবেন। এই বলে মাছ সমুদ্রের জলে হারিয়ে গেল।

এদিকে সত্যি সত্যিই সাত দিনের মধ্যে প্রকৃতিতে কি বিপর্যয়ই না ঘটে গেল। রাজা মৎস্য রূপী নারায়ণের নির্দেশে সব কিছুই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। প্রখর হয়ে উঠল সূর্যের তেজ। সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাতাস গরম হয়ে উঠে ঘূর্ণীঝড় তুলল। সকলেরই তখন নাভিশ্বাস। এভাবে চলতে চলতে ঠিক সাত দিন পর সমুদ্র ফুঁসে উঠল। যেখানে যা ছিল রাক্ষসের মত ছুটে এসে তা গ্রাস করতে লাগল।

ঠিক সময়েই মনু মহারাজের প্রাসাদ-ঘাটে বিরাট এক সোনার নৌকো এল। মহারাজ সব কিছু নিয়ে নৌকোয় উঠতেই সমুদ্রের জোয়ারে জলের তোড়ে নৌকো ভেসে গেল। জল, জল আর জল। মনু মহারাজ যেদিকে তাকান, সেদিকেই জল। তার মাঝে শুধু তাঁর



নৌকোটাই মাত্র ভাসছে, আর জলের ছোটার বেগে ছুটে চলেছে।

এভাবে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ একদিন সেই বিশালাকার মাছের সোনার শিং তাঁর নজরে পড়ল। কোন রকমে নৌকোকে তার কাছে নিয়ে গিয়ে মোটা এক কাছির দড়ি দিয়ে শিঙের সঙ্গে নৌকোটাকে বেঁধে ফেললেন।

নৌকো বাঁধা পড়ল। তার চারপাশ দিয়ে জল ছুটে গেল, কিন্তু নৌকোকে আর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না।

তারপর একদিন প্রলয়কাল শেষ হল। ব্রহ্মার রাত ফুরিয়ে দিন এল। সমুদ্রের জল আবার সমুদ্রে ফিরে গেল। ধীরে ধীরে কাদাগোলা মাটি জেগে উঠল। আস্তে আস্তে মাটি শক্ত হল। মনু মহারাজ নৌকোয় সব কিছুরই বীজ সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তা থেকে আবার গাছপালা, পশুপাখির জন্ম হল। ঋষি-তুল্য নারী-পুরুষ আবার নতুন করে ঘর পাতলেন। নতুন নতুন ছেলেপুলে হল। সপ্তর্ষিরা এলেন, তাদের সকলকে বেদশাস্ত্রের জ্ঞান দিয়ে গেলেন।

আর এক নতুন যুগ শুরু হল। ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করে হয়গ্রীব নামে দানবকে হত্যা করেছিলেন। কেননা, মানুষের জ্ঞান (বেদগ্রন্থ) সেই-ই চুরি করে সমুদ্রের নীচে আত্মগোপন করেছিল।

(খ)

কূর্মাবতার

দেবতারা এক সময় ভোগবিলাসে মেতে উঠলেন। যার যা কাজ তাতে কুঁড়েমি আসতে লাগল। বিলাসের মধ্যে থাকতে থাকতে নিজেদের তপস্যা, সাধনার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়লেন।কে বড়, কে ছোট—প্রায় এই রকম কলহে দিন কাটাতে লাগল।

ওদিকে পাতালে দৈত্যরা শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রের অনুশীলন, দান-ধ্যান, কঠোর পরিশ্রম, সব কিছু মন-প্রাণ দিয়ে করতে লাগল। ফলে দিন দিন তাদের মগজ খুলতে লাগল, বুদ্ধি বাড়তে লাগল। নতুন নতুন শক্তিশালী সব অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করতে লাগল। ফলে দারুণ শক্তিমান হয়ে একদিন তারা দেবতাদের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে বসল।

অসুররা যে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, দেবতারা তার কোন খোঁজখবরই রাখেন নি। ভেবেছিলেন, অসুরদের তাঁরা ফু দিয়েই উড়িয়ে দেবেন। তাঁদের হাতে যেসব দিব্য অস্ত্র আছে, তার কাছে অসুর? কিন্তু যুদ্ধ যখন বাধল, তখন উলটো ফল হল। দেবতারা হেরে গিয়ে যিনি যেখানে পারলেন, সেখানে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। আর অসুররা স্বর্গরাজ্য জয় করে তাদের নিয়ম অনুসারে শাসনকাজ চালাতে লাগল।

পালিয়ে পালিয়ে ছন্নছাড়ার মত আর কতদিন থাকা যায়? অথচ, সবই এখন অসুরদের কব্জায়। কিছু করারও নেই। আর নিজেরা যে উদ্যোগ নিয়ে আবার কিছু করবেন। সে রকম মনোবলও দেবতাদের আর ছিল না।

অনেক ভেবে-চিন্তে দেবতারা দেখলেন, ব্রহ্মাই তো তাঁদের এসব পদে বসিয়েছিলেন। এখন তিনি যদি কোন উপায় বাতলে দিতে পারেন। তাই সকলে মিলে ব্রহ্মার কাছে যেতেই ব্রহ্মা বললেন—দেখ, এখন যে অবস্থায় তোমরা এসে দাঁড়িয়েছ, এতে আমিও কিছু করতে পারব না। একমাত্র ভগবান বিষ্ণু যদি ইচ্ছা করেন, তবেই তোমরা আবার আগের সম্মান ফিরে পেতে পার। চল আমার সঙ্গে। দেখি, তাঁকে সন্তুষ্ট করে কিছু করা যায় কিনা।

দেবতাদের আর কি বলার আছে? এখন উনি যা করবেন, তাই হবে। ভরসা তো তিনিই।

ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে এলেন। অনেক স্তব-স্তুতি করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন।

বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি, ব্যাপার বল তো? তোমরা সবাই মিলে আমার কাছে কেন?



দেবরাজ বলে ইন্দ্র তো লজ্জায় মুখ খুলতেই পারলেন না। মাথা হেঁট করে রইলেন। তখন ব্রহ্মাই আদ্যোপান্ত সব কিছু বিষ্ণুকে শুনিয়ে বললেন—এখন যে পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে, একে সামাল দিতে আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। অসুরদের কবলে পড়ে সৃষ্টিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিষ্ণু সব মন দিয়ে শুনলেন। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, দেবতাদেরই রক্ষা করতে হবে, অসুরদের নয়। অসুররা যতই বিদ্বান, বলবান হয়ে উঠুক, যত ধর্মকর্মই করুক, তাদের প্রকৃতি হল স্বার্থপর। আত্মসুখ ছাড়া তার আর কিছু জানে না। দেবতারা আর যা-ই হোন, স্বার্থপর নন, উদার। ভুল সকলেই করে—দেবতারাও ভুল করেছেন। তার মাশুলও দিচ্ছেন।

বিষ্ণু দেবতাদের বললেন—দেখ, তোমরা যে রকম দুর্বল হয়ে পড়েছ, তাতে একটাই মাত্র উপায় আছে, নিজেদের শক্তি ফিরে পাবার। তাহলে, ক্ষীরসাগর মন্থন করতে হবে। তোমাদের পক্ষে তা মোটেই সম্ভব নয়। তাই যে যুক্তি দিই তা কর। তোমরা গিয়ে অসুরদের সঙ্গে সন্ধি কর। তাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসাগর সমুদ্র মন্থন কর। তা থেকে অমৃত উঠবে। সেই অমৃতই আবার তোমাদের শক্তি ফিরিয়ে দেবে।

স্বয়ং বিষ্ণু যখন এ কথা বলছেন, তখন এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে অসুরদের কাছে যেতেই হবে। কিন্তু, মনে আবার ভয় জাগল, অসুররা যদি সেই অমৃত কেড়ে নেয়? তাই সব শুনেও দেবতারা একটু ইতস্তত করছিলেন।

বিষ্ণু তা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন—কি ভাবছ? অমৃত অসুরেরা কেড়ে নেবে? ক্ষমতায় তারা যখন তোমাদের চেয়ে

বলবান, কেড়ে নিতেই পারে। তবে তোমরাই যাতে অমৃত পাও, সে ভার আমার।

আর কিছু ভাববার নেই দেবতাদের। অসুরদের কাছে গিয়ে দেবরাজ বললেন—দেখ ভাই, তোমরা রাজত্ব চালাচ্ছ, ভালই চলছে। এতে কারো কোন ক্ষোভ নেই। তবে নারায়ণ বলছেন, ক্ষীরসাগর নাকি সব গ্রাস করে বসে আছে। ঐ সাগর মন্থন করে অমৃত তুলে আনতে না পারলে সব যাবে। এটা তো ভাই কেউ চায় না। নিশ্চয় তোমরাও চাও না।

ভোগসুখের শেষ ছিল না অসুরদের। কিন্তু অমৃতের নাম শুনেই ওদের জিভে জল এসে গেল। ওরাও জানে, সব কিছুতেই একদিন অরুচি আসে, কিন্তু অমৃতে অরুচি কখনই আসে না। আর অমৃতের জোরেই দেবতারা সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে চলে। সুতরাং ঐ বস্তুটিকে যদি পাওয়া যায়, তাহলে আর কে পায় তাদের?

অসুররা তাই বলে উঠল—না না। তার জন্য নারায়ণ কি করতে বলেছেন?

—তিনি বলেছেন, তোমাদের নিয়ে ঐ ক্ষীরসাগর মন্থন করতে।

—এই কথা! ঠিক আছে।

অসুররা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। দেবতা-অসুর যে যেখানে ছিল সবাই মিলে এসে ক্ষীরসাগরের তীরে জড়ো হল। সাগরটা তো আর একটু-আধটু নয়। যেমন বিশাল, তেমনি গভীর। মন্থন করতে গেলে দণ্ড চাই, দড়িও চাই। নারায়ণ দেবতাদের সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। মন্দর পর্বত হবে দণ্ড, আর নাগরাজ বাসুকি হবে দড়ি।

মন্দর পর্বতকে তুলে আনার শক্তিও তখন দেবতাদের ছিল না। অসুররাই তুলে নিয়ে এল। বাসুকিও এসে সেই পাহাড় জড়িয়ে একদিকে লেজ, আর একদিকে মুখ বের করে দিল, যাতে দু-দিক থেকে দু-দল বীর পাহাড়টাকে জলের ওপর ঘোরাতে পারে।

এরপর সাপের কোন দিক কে ধরবে, তাই নিয়ে ছোটখাটো একটা বিবাদ হয়ে গেল।

দেবতারা বললেন—আমরা বড়। সুতরাং বাসুকির মাথার দিক আমরাই ধরব।

অসুররা ফোঁস করে উঠল—তোমরা বড়? আমরা রাজা, আমরা বড়। আমরাই মাথার দিক ধরব।

ওরই মধ্যে দেবরাজের বুদ্ধিশুদ্ধি ভালই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অসুরদের দাবি মেনে নিলেন। তাঁর নির্দেশে দেবতারা সবাই মিলে বাসুকির লেজ ধরলেন। অসুররা মহানন্দে বাসুকির মুখের দিকটা গিয়ে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মন্থনের কাজ শুরু হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ টানা-হেঁচড়া চলার পরেই বাসুকির প্রাণ তো ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। তার নাক দিয়ে ঝড়ের মত নিঃশ্বাস বের হতে শুরু করল। প্রশ্বাস তো নয়, যেন আগুনের হল্কা। অসুররা সেদিকেই ছিল। ফলে তারাই জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। কিন্তু কিছু বলার নেই। তাই মুখ বুজেই জ্বালা সইতে লাগল।

এদিকে ঘটল আর এক বিপর্যয়। জলে পাহাড় ঘুরতে ঘুরতে বারবার নীচে পাঁকের ভেতর তলিয়ে যেতে থাকল। দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্মার মত বড় বড় কুশলীরা কোনভাবেই পাহাড়কে ভাসিয়ে রাখতে পারলেন না। বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যেই ছিলেন। তিনি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। দেবতারা নিরুপায় হয়ে আবার তাঁর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু তখন করলেন কি, নিজে দেবতাদের মধ্যে থেকেও, বিশালকায় এক কচ্ছপের রূপ ধরে জলের তলায় গিয়ে, তাঁর পিঠের ওপর মন্দরকে এমনভাবে তুলে ধরে রইলেন যে, পাহাড় আর কোন ভাবেই তলিয়ে গেল না।

সৎ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য ভগবান বিষ্ণু ঐ রূপ ধরে মহৎ কাজে সাহায্য করেছিলেন বলেই কূর্ম হল বিষ্ণুর এক অবতার।

যাই হোক, বিষ্ণু একদিক কূর্মরূপ ধরে পাহাড়কে ভাসিয়ে রাখলেন, আর একদিকে নিজে দেবতাদের মধ্যে থেকে তাঁদের উৎসাহ যোগাতে লাগলেন।

মন্থনে আর কোন বাধা এল না। একদিকে দেবতা আর একদিকে অসুরদের টানা-পোড়েনে পাহাড়-ঘূর্ণিঝড়ের মত কূর্মের পিঠে থেকে ঘুরতে ঘুরতে জল তোলপাড় করে চলল।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর বিষ উঠল। আকাশের মত যেমন নীল তার রং, তেমনি ঝাঁঝালো। সাধ্য কি তার, কাছেপিঠে কেউ থাকে। তার ঝাঁঝে স্বয়ং বিষ্ণুরই গায়ের রং বদলে গিয়ে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। সেখানে এমন কারো সাধ্য ছিল না যে, সেই বিষকে সরায়।

ব্রহ্মার নির্দেশে তখন দেবতারা কৈলাসে গিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করে ধরে নিয়ে এলেন শিবকে। শিব এক চুমুকে সেই বিষ পান করলেন। তাঁর গলা নীল হয়ে গেল। সেই থেকে শিবের নামই হয়ে গেল 'নীলকণ্ঠ'।

তারপর আবার মন্থন চলল সমানে। দেখতে দেখতে অপূর্ব এক গাই গরু 'সুরভি' উঠল। দুধের তার শেষ নেই। বিষ্ণু সেই সুরভিকে ঋষিদের দিলেন। অপরূপ এক ঘোড়া, নাম তার উচ্চৈঃশ্রবা, উঠেই চলে গেল দেবতাদের কাছে। আরো অনেক সুন্দর সুন্দর সব লোভনীয় জিনিস উঠে দেবতাদের দিকে চলে গেল। অসুররা মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হল। এরপর অপরূপা লক্ষ্মীদেবী উঠে এসে যখন বিষ্ণুর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, তখন অসুররা ফেটে পড়ে আর কি। তবুও সামলে নিল নিজেদের। অমৃত তো উঠবেই, আর নারায়ণও সব সময় ওঁদের সঙ্গে থাকবেন না, তখন দেখা যাবে।

সুতরাং চুপচাপ থেকেই মন্থনের কাজ চালাতে লাগল।

প্রায় যখন অসুররা হাঁফিয়ে পড়েছে, আর রক্তবমি করতে করতে বাসুকির প্রাণ যায়, ঠিক সেই সময় অপরূপ এক পুরুষ হাতে অমৃতের কলসী নিয়ে উঠে এল। দেবতারা পুরুষের নাম রাখলেন 'ধন্বন্তরি'।

অসুররা সঙ্গে সঙ্গে সাপের মুখ ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে তার হাত থেকে অমৃতের কলসীটা কেড়ে নিল। দেবতাদের আশঙ্কাই ঠিক হল। প্রথমে তাই দেখে দেবতারা হইচই করে উঠলেন। নারায়ণ তাঁদের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন। দেবতারাও চুপ করে গেলেন।

অসুররা ওদিকে অমৃতের কলসী নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি মারামারি শুরু করে দিল—কে আগে খাবে তাই নিয়ে।

ওদের হট্টগোল যখন চরমে, তখন এক অপরূপা রমণী যেন আকাশ থেকে ওদের মধ্যে নেমে এলেন। মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে যে রমণী উঠে বিষ্ণুর গলায় মালা দিয়েছিলেন, ইনি যেন তার থেকেও সুন্দরী। তাঁকে দেখে অসুরদের মাথা ঘুরে গেল। এখন অমৃতের চেয়ে রমণীই ওদের কাছে দারুণ বড় হয়ে উঠল। রমণীও

দারুণ ছলাকলা করে অসুরদের মন এমনভাবে জয় করে ফেললেন যে রমণীকেই ধরে বসল—তুমিই এই অমৃত ভাগ করে দাও।

রমণী বললেন—বেশ, তাহলে গোলমাল না করে সবাই চুপ করে বস। আমিই সকলকে ভাগ করে দিচ্ছি।

সারি দিয়ে দেবতারা আর অসুররা সবাই বসে পড়ল। আর রমণীও দেবতাদের দিক থেকে অমৃত বিতরণ করতে শুরু করে দিল। ওদের দিকে ভাগ চলছে তো চলছেই, অসুরদের দিকে আর আসেন না। অসুররা অধৈর্য হয়ে উঠলেও রমণীকে দেখে এমন মোহিত হয়ে গিয়েছিল যে, চুপ করে বসেই রইল। অসুরদের মধ্যে একজন ছিল ভারি চতুর। সে রকম দেখে এক ফাঁকে অসুরদের সারি থেকে উঠে সূর্য আর চন্দ্রের মাঝখানে এসে বসে পড়ল। রমণী ওদিকে যিনি যেমন তাঁকে সেইরকম অমৃত ভাগ করে দিতে দিতে এসে রাহুর গলাতেও অল্প একটু ঢেলে দিলেন। সূর্য আর চন্দ্র তা দেখে বিষ্ণুকে ইঙ্গিত করতেই বিষ্ণু খচ করে তার গলাটা কেটে দিলেন। অমৃত রাহুর গলাতেই থেকে গেল, পেটে আর নামল না। তাই তার মুণ্ডুটা গ্রহের মর্যাদা পেয়ে গেল। (রাহুর বাকি শরীরটার নাম হল কেতু।) এদিকে অমৃতও শেষ। অসুররা ছিটে-ফোঁটা পেল না।

আর যায় কোথা? অসুরদের কাছে চালাকি ধরা পড়ে যেতেই তারা রমণীকে ধরতে গেল। রমণীও সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে আকাশে মিলিয়ে গেলেন। দ্বিগুণ আক্রোশে এবার অসুররা ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবতাদের ওপর। কিন্তু আর কি পারে? একে তো এতদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, তার ওপর দেবতারা অমৃত খেয়ে দারুণ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন।

ফলে সহজেই অসুররা হেরে গেল। দেবতারা আবার স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে বসে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

মোহ যে কি সর্বনাশা, ভগবান বিষ্ণু কূর্মাবতার তা চোখে আঙুল দিয়ে দেবতাদের দেখিয়ে দিলেন।

(গ)

বরাহ অবতার

আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু দুই ভাই। দিতির দুই ছেলে। দুজনেই মহাশক্তিধর, মহা বলবান।

হিরণ্যাক্ষের নেশাই ছিল যুদ্ধ করা। যেখানে যাকে পেত তারই সঙ্গে কারণে-অকারণে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাত। তার পরই মারামারি। গায়ে অকূড় শক্তি। স্বাভাবিক ভাবেই জিতে আসত। এমনি করেই লড়াইয়ের নেশা হিরণ্যাক্ষকে পেয়ে বসল। আর হিরণ্যকশিপু ওদিকে না গিয়ে দেশ দখল করে দেবতাদের হটিয়ে দিয়ে রাজা হয়ে রাজত্ব করতে শুরু করে দিয়েছিল।

কোন বীরের নাম কানে এলেই হল। হিরণ্যাক্ষের মাংসপেশী নিশপিশ করে উঠত। গজরাতে গজরাতে তার কাছে ছুটে যেত। যুদ্ধ করে যতক্ষণ না তাকে হারাতে পারত, ততক্ষণ আর বিশ্রাম নেই!

এরকমভাবে দিন কাটাতে কাটাতে হিরণ্যাক্ষের একবার মনে হল, যুদ্ধ তো করছে গায়ের জোরে, কিন্তু যদি কোন অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে তার মৃত্যু হয়—তাহলে? দেবতাদের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আর সংহারকর্তা শিবকে ছাড়া আর কোন দেবতাকেই এরা গ্রাহ্য



করত না। বিশেষ করে শ্রীহরি বা বিষ্ণুকে তো নয়-ই। কেউ যদি শ্রীহরির নাম করত তো এরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠত। তাকে তো পিষে মারতই, এমন কি হুঙ্কার ছেড়ে বলত—কোথায় সে থাকে, বল না! দেখে আসি সে কত বড় বীর।

হিরণ্যাক্ষ অনেক ভেবে ব্রহ্মার তপস্যা করে বর চাইল—ঠাকুর, আমার যেন মৃত্যু না হয়।

ব্রহ্মা বললেন—দেখ, অমর হবার বর দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটুকু বলছি, কোন অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে তোমার মৃত্যু হবে না।

হিরণ্যাক্ষ তাতেই খুশি। অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত ছাড়া তাকে মারবে কে? তেমন কেউ ব্রহ্মাণ্ডে নেই। ব্রহ্মার বরে এখন যদি তার আঘাতে মৃত্যু না হয়, তাহলে ঘুরপথে সে তো অমর হয়েই থাকল।

ব্যস, এরপর হিরণ্যাক্ষকে আর পায় কে? এতদিন দেবতারা ওরই মধ্যে একটু নির্ভয়ে ছিল। হিরণ্যাক্ষ এবার এমন বেপরোয়া হয়ে উঠল যে, দেবতারাও তার ভয়ে যেখানে সেখানে পালাতে আরম্ভ করল।

ঠিক এই সময় পৃথিবীতে একটা বিপর্যয় এল।

সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত থেকেই সূর্য সুমেরু (উত্তর মেরু) প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের এই পরিক্রমায় যাতে অসুবিধে না হয়, তাই পৃথিবী সুমেরুর মাথাটা বরাবরই ডানদিকে একটু হেলিয়ে নিত, ঠিক ঘুরন্ত লাটুর মাথার মত। হঠাৎ সে সময় সুমেরুর মাথাটা একটু বেশি হেলে নুয়ে যেতেই দক্ষিণের সাগর মহাসাগরের জল বানের মত ছুটে এসে উত্তরের দেশ-মহাদেশ প্লাবনে ভরিয়ে দিল। সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। গোটা পৃথিবী জলে জলময় হয়ে গেল। রীতিমত প্রলয়। মানুষ-পশু-পাখি-গাছপালা যেখানে যা ছিল মরে গেল। জেগে রইল শুধু কয়েকটা পাহাড়ের চূড়া। তার মধ্যে একটি হল হিমালয়।

হিরণ্যাক্ষ যুদ্ধ করার মত আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে শেষে হিমালয়ের সঙ্গেই আপন মনে একা একাই লড়াই করে চলল। তার আঘাতে আঘাতে পাহাড়ের চূড়ায় যে জীবেরা আশ্রয় নিয়েছিল, তারা অস্থির হয়ে উঠল। এমন কি, হিমালয়ের পাথরগুলোও আঘাতে আঘাতে জর্জর হয়ে উঠল। তখন হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বেরিয়ে এসে বললেন—মহাবীর তুমি। এই কাঠ-মাটির সঙ্গে লড়াই করা কি তোমার সাজে? তুমি গিয়ে বরুণদেবকে হারাও তো



দেখি।

হিরণ্যাক্ষ গদা কাঁধে গিয়ে সাগরে হাজির হল। সাগরের জল তার গদার আঘাতে তোলপাড় করতে লাগল। মাছ থেকে শুরু করে জলজীবেরা মারা পড়তে লাগল। সাগররাজ বরুণদেব আর থাকতে না পেরে উঠে এসে বললেন—অযথা নিরীহ জীবদের ওপর বীরত্ব দেখিয়ে কি লাভ হচ্ছে তোমার? এতই যদি যুদ্ধের শখ, তবে শ্রীহরির কাছে যাও না।

নামটা শুনেই হিরণ্যাক্ষ জ্বলে উঠল। জিজ্ঞেস করল—কোথায় সে বল, আমি এখনই যাচ্ছি।

বরুণদেব বললেন—পাতালে যাও। তাহলেই দেখতে পাবে।

ঠিকই তাই। বিষ্ণু তখন পাতালে ছিলেন। প্রলয়ে যখন পৃথিবী ডুবে গেল, অনেক চেষ্টা করেও যখন কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারলেন না, তখন ব্রহ্মা গিয়ে দরবার করলেন বিষ্ণুর কাছে। বললেন—আপনি যদি পৃথিবীকে জলের তলা থেকে উদ্ধার করে না আনেন, তাহলে সৃষ্টিও লোপ পেয়ে যাবে। আমারও কাজ ফুরিয়ে যাবে। দয়া করে আমাদের বাঁচান।

ভগবান বিষ্ণু জলের তলা থেকে পৃথিবীকে তুলে আনার জন্য একটাই পথ বেছে নিয়েছিলেন। সাদা রঙের বিরাটকায় এক বরাহের (শূকরের) রূপ ধরে তিনি জলের নীচে ডুব দিয়ে বিশালকায় দাঁত দিয়ে পৃথিবীকে তুলে আনার উদ্যোগ করছিলেন। হিরণ্যাক্ষ পাতালে গিয়ে প্রথমে বরাহকে দেখেই অবাক হয়ে গেল। যেমন চেহারা, তেমনি আগুনের মত লাল দুটো ভাঁটা চোখ, আবার নাকের ওপর তেমনি এক খাড়া দাঁত। তারপরই তার মাংসপেশী নিশপিশ করে উঠল। বলল—বাঃ। শূকর তো বেশ জলে চরছে!

কথা শুনেই বরাহরূপী বিষ্ণু তাকে বললেন, পৃথিবীটাকে আগে তুলে রেখে আসি, তারপর তোর কথার জবাব দিচ্ছি।

এই বলে জল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে আবার পাতালে ফিরে আসতেই হিরণ্যাক্ষ তার বিরাট লোহার গদা তুলে বরাহের মাথায় মারতে গেল। বরাহ কৌশলে মাথটা সরিয়ে নিলে গদা বরাহের খাঁড়ার মত দাঁতে লাগতেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। হাতিয়ার আর নেই। হাতে-পায়ে, মুখোমুখি লড়াই শুরু হল। দুজনেরই দেহ ক্ষত-বিক্ষত হল। হিরণ্যাক্ষ তখনো মনের সাধে যুদ্ধ করে চলেছে। জলে কাদায় বরাহের কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। কিন্তু হিরণ্যাক্ষ মাঝে মাঝেই একটু অসুবিধেয় পড়ে যাচ্ছিল। এভাবে বেশ কিছু সময় যুদ্ধ করার পর হঠাৎ বরাহরূপী বিষ্ণু একটা মজার খেলা খেলে নিলেন। হিরণ্যাক্ষের নাকের ভেতর দিয়ে শুট করে ঢুকে পড়লেন। হিরণ্যাক্ষের তখন যে কি অবস্থা!

অল্পক্ষণ থেকে আবার যেই বরাহ বেরিয়ে এল, হিরণ্যাক্ষ আরো রেগে তাঁকে আক্রমণ করল। বরাহও লড়াই-লড়াই খেলা করে চলল।

এদিকে দিন ফুরিয়ে সন্ধে হয়ে আসছে। রাত হলেই অসুরদের ক্ষমতা ভীষণ হয়ে ওঠে। ব্রহ্মা তাই এক ফাঁকে বরাহরূপী বিষ্ণুকে সজাগ করে দিয়ে এলেন—প্রভু, সন্ধে হয়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

বরাহরূপী বিষ্ণুও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাড়ার মত দাঁত দিয়ে হিরণ্যাক্ষকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে মেরে ফেললেন।

হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধের সাধ চিরকালের জন্য মিটে গেল। দেবতারাও নিশ্চিন্ত হয়ে যে যার কাজে লেগে পড়লেন। প্রলয়ের পরে পৃথিবীকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। কত কাজ!

বর্তমানে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি, এটি বিষ্ণু বরাহরূপ ধরে জলের তলা থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। সেই সঙ্গে হিরণ্যাক্ষকে মেরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীতে মদমত্ততার স্থান নেই। তাই আমাদের এই কল্প-র নামই হয়ে আছে 'শ্বেতবরাহ কল্প'।

(ঘ)

নৃসিংহ অবতার

শ্রীহরির হাতে ভাই হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়েছে শুনে হিরণ্যকশিপু রাগে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে যে কে, তা হিরণ্যকশিপু জানে না। কারণ ব্রহ্মা আর শিব ছাড়া আরও যে একজন আছেন, সে খবর ওরা রাখতই না। তাই শহরের বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ডেকে জিজ্ঞেস করে জানল, তিনি মহা শক্তিশালী। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি আছেন। তিনি হলেন ভক্তের ভগবান আর অত্যাচারীর যম।

পরিচয় পেয়ে হিরণ্যকশিপু বুঝল যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গেলে মন থেকে মৃত্যুভয়কে দূর করতে হবে। তাই সে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা শুরু করে দিল। তপস্যা করতে করতে যখন কঙ্কালসার, তখন ব্রহ্মা এসে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে তাকে আবার স্বাভাবিক করে তুলে বললেন—এমন কঠোর তপস্যা করছ কেন?

হিরণ্যকশিপু বলল—আমি অমরত্ব পাবার জন্য তপস্যা করছি।

ব্রহ্মা বললেন—অমরত্ব দেবার অধিকার আমাদের নেই, তুমি অন্য কিছু চাও।

অনেক ভেবে হিরণ্যকশিপু বলল—তাহলে, আমাকে এই বর দিন, যেন কোন অস্ত্র-শস্ত্রের আঘাতে, আপনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের কারো দ্বারা জলে-স্থলে-শূন্যে-আগুনে, দিনে বা রাতে আমার যেন মৃত্যু না হয়।

ব্রহ্মা আগুপিছু কিছু না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে সেই বর দিয়েই চলে গেলেন। দৈত্য হিরণ্যকশিপু যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একরকম অমর হয়ে থাকার বরই চেয়ে নিল, ব্রহ্মা তা তলিয়ে ভেবে দেখলেনও না।

এবার হিরণ্যকশিপুর রূপই হয়ে গেল আলাদা। বর নিয়ে

রাজধানীতে ফিরেই সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দিল, শ্রীহরি-র নাম কেউ মুখে আনতে পারবে না। যে এই নাম করবে, তাকেই খতম হতে হবে। রাজ্যের প্রজারা তো ভয়ে তটস্থ। দৈত্যরাজের অনুচররা চারদিকে সব সময় ঘুরে বেড়ায়, কেউ রাজাদেশ লঙ্ঘন করছে কিনা দেখার জন্য। সেই সঙ্গে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। দেবতাদের হারিয়ে সে যে শুধু স্বর্গরাজ্যই জয় করল তা নয়, তাঁদের চাকর করে রাখল। সে কি দুর্দশা দেবতাদের। মনে মনে তাঁরা খালি ভগবানকে ডাকেন। এমন অপমান নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাঁদের মৃত্যু হল না কেন?

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের রাজা এখন হিরণ্যকশিপু। বলতে গেলে সে-ই এখন সর্বেশ্বর।

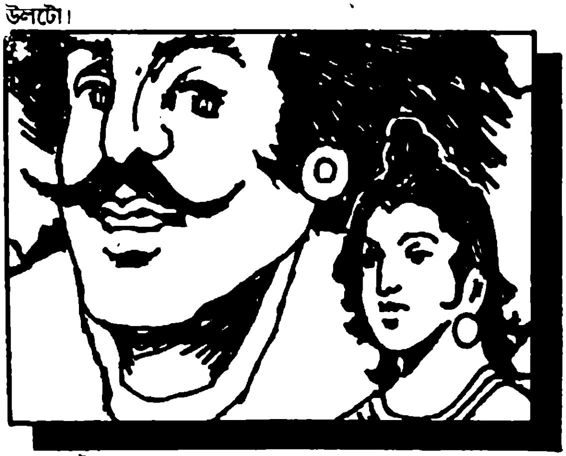
দিন যায়। ভয়ে শ্রীহরির নাম কেউ মুখে আনে না। ইতিমধ্যে দৈত্যরাজের একটি ছেলে হল। তার নাম প্রহ্লাদ । হিরণ্যকশিপু খুবই ভালবাসত তাকে। একটু বড় হতেই দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুই ছেলে ষণ্ড আর অমর্ক-র হাতে তুলে দিল, কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাবার জন্য।

গুরুগৃহে এসে পাঁচ বছরের ছেলে প্রহ্লাদ সমবয়সী ছেলেদের পেয়ে মহাখুশি। গুরু পাঠ দেন। ছেলেরা মন দিয়ে পড়াশুনা করে। প্রহ্লাদও পড়াশুনা করে বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই সমবয়সীদের নিয়ে শ্রীহরির গুণ-কীর্তন করতে থাকে। গুরুরা অনেক করে প্রহ্লাদকে বোঝায়, শ্রীহরি বলে কেউ নেই। ও নাম মুখে এনো না। বোঝালে কি হবে।

রাজার কাছে অভিযোগ এল। রাজা ষণ্ড আর অমর্ক-কে ডেকে পাঠাল। তারা আসতেই খুব একচোট ধমক দিল—কেন এই অভিযোগ শুনতে হবে। প্রহ্লাদকে এ নাম কে শোনাল? কোথা থেকে এত সব শিখল সে। তোমরা যদি তাকে ঠিক মত না দেখ, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না।

রাজার কাছে ধমক খেয়ে গুরুরা প্রহ্লাদকে কড়া শাসন করতে শুরু করে দিলেন।

কিন্তু তাতেও কিছু হল না। বরং প্রহ্লাদের দলবল যেন ক্রমশই বড় হতে লাগল। সুযোগ সুবিধে বুঝে ছেলেরাই তাকে ছেঁকে ধরতে আরম্ভ করল। আর প্রহ্লাদ শ্রীহরির গুণগান তো বটেই, সেই সঙ্গে বিজ্ঞের মত এমন সব কথা শোনাতে লাগল যা অসুর-জীবনের ঠিক উলটো।



গুরুরা রাজার কাছে আবার ধমক খায়। ফিরে এসে প্রহ্লাদকে তাঁরা কখনো মিষ্টি কথায় বলে, কখনো মারধোর করে। কিন্তু কোনমতেই বাগে আনতে পারে না।

গুরুরা প্রহ্লাদকে বাগে আনতে পারলেন না, এদিকে ছোট-বড় অনেকেই আস্তে আস্তে অনুসরণ করতে লাগল দেখে দৈত্যরাজ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ল। ঠিক করল, বংশের কুলাঙ্গার প্রহ্লাদকে বাঁচিয়ে রাখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই ঘাতককে ডেকে বলল—প্রহ্লাদকে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাথাটা কেটে ফেল ওর।

প্রাণিহত্যায় অসুরদের হাত কাঁপে না। বিশেষ করে যখন রাজার আদেশ। ঘাতক প্রহ্লাদকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। হাড়কাঠে মাথা গলিয়ে দিয়ে খাঁড়ার কোপও বসাল। প্রহ্লাদ তখন আপন মনে ভগবান শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন। মাথা কাটা গেল না। অনেক চেষ্টা করেও ঘাতক অকৃতকার্য হয়ে ভয়ে ভয়ে এসে রাজাকে জানাল। দৈত্যরাজ বলল—শূলে চড়াও। সেনারা প্রহ্লাদকে শূলে চড়াতে কত চেষ্টাই না করল। কিন্তু অমন ধারালো ছুঁচমুখ শূল কোন রকমেই প্রহ্লাদের গায়ে বেঁধাতে পর্যন্ত পারল না। এ তো বড় আশ্চর্য! সেনারা দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেল। দৈত্যরাজ হুকুম দিল—আমার সবচেয়ে বড় যে হাতি আছে, তাকে মদ খাইয়ে উত্তেজিত করে, তার পায়ের তলায় ফেলে ওকে পিষে মার। রাজার আদেশে তাই করা হল। মাহুতের অঙ্কুশের ঘায়ে মদমত্ত হাতি ছুটে আসছে। সেনারা প্রহ্লাদকে তুলে ফেলে দিল তার পায়ের তলায়। সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল, অমন যে রাগী হাতি, হট করে থেমে গিয়ে পায়ের তলা থেকে শুঁড়ে জড়িয়ে প্রহ্লাদকে তুলে নিল।

এসব দেখে-শুনে দৈত্যরাজও এবার একটু অবাক হল। সেই সঙ্গে ঠিক করেই ফেলল, এমন শত্রু ছেলেকে যেভাবেই হোক মেরে ফেলতে হবে। একে বাঁচিয়ে রাখা চলতে পারে না। বিষ খাওয়ানো হল, বুকে পাথর বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল। দাউদাউ করে আগুন জ্বেলে চারদিকে সেনা মোতায়েন রেখে তার ভেতর ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু আশ্চর্য! এত কিছু করেও প্রহ্লাদকে মারতে না পেরে হিরণ্যকশিপু দারুণ অধৈর্য হয়ে উঠল। জীবনে যে কারো কাছে হার স্বীকার করে নি, সামান্য একটা ছেলের কাছে তাকে হার মানতে হবে!

প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু এবার কাছে ডাকল। জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁরে, তুই যে এত 'হরি' 'হরি' করিস, সে কোথায় থাকে?

প্রহ্লাদ মিষ্টি-মধুর মুখে বলল—বাবা, তিনি কোথায় নেই? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গাতেই তিনি আছেন।

ধমকে উঠল হিরণ্যকশিপু—আজেবাজে কথা ছেড়ে বল, সে কোথায় আছে? আমি দেখতে চাই কতখানি শক্তি তার।

প্রহ্লাদ বলল—বলছি তো বাবা, আমি যেদিকে তাকাই সেদিকেই তাঁকে দেখতে পাই।

রাগে দাঁত কড়মড় করে হিরণ্যকশিপু সামনের স্ফটিকের থামটা দেখিয়ে বলল—এর ভেতর আছে?

—হ্যাঁ, ঐ তো রয়েছে।

প্রহ্লাদের কথা শেষ হতে না হতেই মহাশক্তিমান হিরণ্যকশিপু সেই থামে সজোরে এক লাথি মারল। থামটা ভেঙে পড়ল। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, সেই থামের ভেতর থেকেই এক অদ্ভুত বিকটাকার প্রাণী বেরিয়ে এল গর্জন করতে করতে। প্রাণীর মুখটা দেখতে ছিল

বিশালাকার এক সিংহের মত। বাকিটা মানুষের আকার। চার হাত। বিরাট আঙুলের মাথায় খুরের মত ধারালো নখ। তার তর্জন গর্জনে দৈত্যপুরী কেঁপে উঠল।

ব্রহ্মার বরে অমর হিরণ্যকশিপুও সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াল। দুজনের মধ্যে বেধে গেল এক দারুণ যুদ্ধ।

দিন শেষ হয়ে আসছে, খানিক পরেই আসবে রাত। তখন ঠিক সন্ধ্যে। সেই বিশালাকার, বিকটদর্শন, নরসিংহ টুপ করে হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুতে তুলে নিয়ে শুইয়ে নখ দিয়ে তার বুক চিরে দু-ফালা করে দিল। হিরণ্যকশিপু মারা গেল।

ব্রহ্মার বরের মর্যাদা রাখার জন্যই ভগবান বিষ্ণুকে এমন এক অদ্ভুত আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, প্রকৃত ভক্তের ওপর অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য।

(৬)

বামন অবতার

নৃসিংহ অবতার রূপে বিষ্ণু প্রহ্লাদকে সিংহাসনে বসিয়ে চলে গেলেন। প্রহ্লাদ বেশ কিছুকাল রাজত্ব করে ছেলে বিরোচনকে রাজ্যভার দিয়ে অবসর নিল। বিরোচন যেমন বীর ও ধার্মিক, তেমনি দাতা ছিল। দেবতারা কৌশলে বিরোচনের আয়ু কেড়ে নিয়ে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। তখন অসুররাজ হয়ে বসল তারই ছেলে বলি।

বিষ্ণুভক্ত ধার্মিক প্রহ্লাদকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত বলি। প্রতি কাজেই তার সঙ্গে পরামর্শ করত। চেষ্টা করত ভালভাবে থাকতে। কিন্তু স্বভাবদোষ কি একেবারে যায়? খুঁটিনাটি নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হতে হতে একবার এক যুদ্ধই হয়ে গেল। সেই যুদ্ধে বলি হেরে গেল, আহতও হল। তখন বংশের গুরু শুক্রাচার্যের পরামর্শে বলি বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করল।

বলির মনোবল যজ্ঞ করার পর অনেক বেশি হয়ে গেছে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে এবার সে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করল। দেবতারা



এবার সহজেই হেরে গিয়ে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগল। ওদিকে বলি একশটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে একেবারে ইন্দ্র হয়ে বসল।

এভাবে যখন বহুদিন কেটে গেল, ছেলেদের দুর্দশা দেখে মা অদিতির প্রাণ কেঁদে উঠল। কশ্যপ আর কি করেন। দানবরাও তাঁর ছেলে, দেবতারাও তাঁরই ছেলে। ওরই মধ্যে দেবছেলেদের ওপর তাঁর একটু দুর্বলতা ছিল। যাই হোক, অদিতি কোন উপায় না দেখে নারায়ণের তপস্যা করতে লাগলেন।

এক সময় নারায়ণ দেখা দিয়ে অদিতিকে বললেন, 'অত ভেবো না। ঠিক সময় হলে আমিই তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। তারপর স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করে দেব। তবে এ কথা কারো কাছে এখন প্রকাশ কোরো না।'

অদিতি চুপ করে দিন গুণতে লাগলেন।

ওদিকে বলি ইন্দ্র হয়েই 'কল্পতরু' হল, অর্থাৎ যে যা চাইবে তার কাছে, সে তাকে তাই দেবে।

খুব বেশি দান করতে করতে 'দানী' হিসেবে সকলের প্রশংসা পাবার একটা লোভ জাগে, লোভ থেকে আসে অহঙ্কার। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বলির মনেও তাই দানবীর হিসেবে অহঙ্কার জাগতে লাগল।

বলি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশেই নর্মদা নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামে এক মনোরম জায়গায় বিশাল যজ্ঞক্ষেত্র বসিয়ে দানযজ্ঞ করছিল।

এদিকে ঠিক সময়ে অদিতির ছেলে হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন নারায়ণ। ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। যাঁরা প্রকৃত ভক্ত তাঁরা লক্ষণ দেখে ঠিক বুঝে নেন। ভক্ত প্রহ্লাদও বুঝে নিয়েছিল, আর বলিকে তা শুনিয়েও রেখেছিল।

অদিতির নবজাত সন্তানটি দেখতে দেখতে পাঁচ বছরের হয়ে উঠল। আর ঐ বয়সের মধ্যেই বেদের স্তোত্রগুলো সে এমনভাবে বলত, যে সবাই তা শুনে অবাক হয়ে যেত। ছোট এক ছেলের মুখে শাস্ত্রের সব দুরূহ কথা শুনলে অবাক তো হবারই কথা।

বেঁটে-খাটো ছোট ছেলে। জ্ঞানে বৃদ্ধ হলেও তার শরীরের বাড় একেবারেই ছিল না। তাই সকলেই তাকে 'বামন'-ই বলত।

বামনরূপী বিষ্ণু এবার দেবগুরু বৃহস্পতিকে নিয়ে ভৃগুকচ্ছে বলির যজ্ঞশালায় গেলেন। সুললিত কণ্ঠে নিখুঁতভাবে বেদের স্তোত্র, তারপর রাজার প্রশস্তি গাইলেন। ঐটুকু ছেলের মুখে এসব শুনে বলিরাজ, সভার সকলেই তো অবাক। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না, এই বামন কে। সঙ্গে সঙ্গে বলিরাজকে হুঁশিয়ার করে দিলেন বামনকে যেন কিছু না দেওয়া হয়।

যে যা চাইবে, তাকে তাই দেবেন,এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'কল্পতরু' হয়ে বলিরাজ বসেছেন। এমন প্রার্থীকে কি তাই তিনি ফেরাতে পারেন, না ফেরানো উচিত।

বামনকে তাই বলিরাজ জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আপনার কি প্রার্থনা?

বামন বলল, আমার নিজের জন্য কোন প্রার্থনা নেই রাজা। আমার এই গুরুদেব যাতে যজ্ঞ করতে পারেন, তার জন্য আমার পায়ের মাপের তিন পা জায়গা চাইতে এসেছি।

বামনের এই আবেদন বলিরাজার খুব ভাল লাগল। সেই সঙ্গে প্রার্থনা শুনে অবাক হলেন। বললেন—আপনি তো নিতান্তই শিশু।

কতটুকুই-বা আপনার পা? এতে কতটুকু জায়গাই-বা আপনার গুরুদেব পাবেন? আপনি আরো বেশি কিছু চান। আমার এই বিশাল রাজত্বের একটা ভূখণ্ড অন্তত চান।

শুক্রাচার্য তখনো বাধা দেবার চেষ্টা করেন বলিকে। কিন্তু বলির ঐ এক জবাব—প্রতিজ্ঞা করে যখন বসেছি, তখন ভাল-মন্দ যাই হোক, অতি বড় শত্রুর প্রার্থনাও আমি পূরণ করব।

দৈত্যগুরু আর কি করেন। তবুও একবার শেষ চেষ্টা নেবার জন্য বলির কমণ্ডলুর মধ্যে আশ্রয় নিলেন। কারণ দান করার সময় দানবরাজকে কমণ্ডলুর জল কুশ দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। সুতরাং সেই জলটা যদি আটকে রাখা যায়, আর সেখানেও যদি সে তাঁকে দেখে থামে।

বামন বলল—না না। আমার পায়ের তিন পা জায়গা হলে যেখানে আমার গুরুদেবের যজ্ঞ করার মত জায়গা হয়ে যাবে, সেখানে তার বেশি জায়গার কি দরকার?

বলি বললেন—বেশ, তাই নাও।

এই বলে হাতে কমণ্ডলু তুলে যেই কুশ কমণ্ডলুর জলে ঢোকাতে গেলেন, অমনি তার খোঁচা শুক্রাচার্যের একটা চোখে গিয়ে লাগল। চোখটা কানা হয়ে গেল। কমণ্ডলুর ভেতর থেকে রাগে গরগর করতে করতে কানা শুক্রাচার্য তখন বেরিয়ে বলিকে বললেন—তুই জাহান্নামে যা।

শাস্ত্রেই আছে, বাবার কথার অবাধ্য হলে বা বাবা রেগে গেলেও রক্ষে আছে, কিন্তু গুরুর কথার অবাধ্য হলে বা গুরু রুষ্ট হলে, তার পতন নিশ্চিত।

বলিরও তাই হল। দেখতে দেখতে বামন বিরাট রূপ নিয়ে এক পা স্বর্গলোকে ফেলে, দ্বিতীয় পা ফেলে ভুবর্লোকে, আর তৃতীয় পা তুলে বলিকে জিজ্ঞেস করলেন—বলি, আমার এই পা কোথায় রাখব, তাড়াতাড়ি বল।

বলি দেখে এমনি থ হয়ে গিয়েছিল যে তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হয় না। মনে মনে দাদু প্রহ্লাদকে স্মরণ করতে লাগল।

বলির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় প্রহ্লাদ তখন অন্য জায়গায় বসে বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন ছিল। নাতির আহ্বান শুনে তাড়াতাড়ি ভৃগুকচ্ছের দিকে পা বাড়াল।

ইতিমধ্যে বামনরূপী বিষ্ণু বলিকে নিরুত্তর দেখে তাঁর অনুচরদের ডেকে বললেন—ওকে বাঁধো। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর অনুচররা বলিকে বেঁধে ফেলল। প্রহ্লাদও এসে হাজির হল। যাঁকে সে ধ্যান করছিল, ভৃগুকচ্ছে এসে সেই বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে দর্শন করে আনন্দে বিভোর হয়ে বলল—প্রভু, দান করতে করতে নাতির মনে অহঙ্কার জন্মেছিল। আপনার তৃতীয় পা ওর মাথার ওপর রেখে ওর মন থেকে অহঙ্কার মুছে দিন।

বামনদেবও সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় পা বলির মাথায় রেখে তাকে পাতালে পাঠিয়ে দিল। নারায়ণের পায়ের ছোঁয়া পেয়ে বলির মন থেকে সব অহঙ্কার মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। বামনদেব বললেন—বলি, তুমি পাতালে ইন্দ্রের মত রাজত্ব কর। আমি তোমার দ্বারে দ্বারী হয়ে থাকব।

স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষ বামনদেব এভাবে উদ্ধার করে আবার দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই সঙ্গে আর এক নতুন যুগের সূচনা হল।

(চ)

পরশুরাম অবতার

তপোবনবাসী ঋষি জমদগ্নির ছোট ছেলে হয়ে জন্মাল যে ছেলেটি, তার নাম হল রাম। মায়ের নাম রেণুকা। ভৃগুবংশের মহাতেজস্বী ঋষি ছিলেন জমদগ্নি।

সেসময় সারা পৃথিবীর শাসনভার চালাবার প্রধান দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের ওপর। শাস্ত্রের নিয়ম-অনুসারে কিভাবে রাজ্য শাসন করতে হবে, তা বলা ছিল। ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা হবেন নির্লোভ এবং ক্ষত্রিয়রা ন্যায়পরায়ণ থেকে বাহুবলে রাজ্য শাসন করবে। ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও বুদ্ধি, আর ক্ষত্রিয়েব বল।

কিন্তু একটা সময় এসেছিল যখন ক্ষত্রিয়রা আর এই নিয়ম বা অনুশাসন মেনে চলছিল না। দম্ভ আর অহঙ্কার নিয়ে নিজেদেরই সর্বেসর্বা বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা ভাবতে আরম্ভ করে দিয়েছিল, তারা যখন রাজা, তখন পৃথিবীর সবাই তাদের প্রজা, হুকুমের দাস।

ঠিক এমন এক সময়ে রামের আবির্ভাব। আর, যেহেতু তিনি সব সময়ই হাতে 'পরশু' (কুঠার—কুড়ুল) নিয়ে থাকতেন, তাই সকলের কাছেই তিনি 'পরশুরাম' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই রাম একটু ডানপিটে ছিল। কোথাও কোন অন্যায় দেখলেই সঙ্গী সাথীদের নিয়ে তার প্রতিকার করতে ছুটত। ধনুর্বিদ্যাতেও তার জুড়ি ছিল না। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, খেলাধুলা, আর শিকার করা তার লেগেই ছিল। তাই বলে লেখাপড়ায় যে অমনোযোগী ছিলেন, তা নয়। ব্রাহ্মণের ছেলে, শাস্ত্রানুশীলন প্রধান কাজ। তা-ও নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। তারপর শিবের তপস্যা করে তাঁর কাছ থেকে দুটি বর চেয়ে নিয়েছিলেন। এক, ইচ্ছামৃত্যু অর্থাৎ নিজের মনে যখন মরবার ইচ্ছে জাগবে, তখন মরবেন। দুই, তাঁর হাতে কুঠার যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তাঁকে কেউ কায়দা করতে পারবে না। রামের তিন দাদা কিন্তু ঠিক অন্য রকম ছিল। শান্ত-শিষ্ট, নিরীহ-নির্বিরোধ। ঘর-সংসার, যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম ছাড়া তারা অন্য কিছু জানত না।

কোন কারণে একবার রেণুকার ওপর ঋষি জমদগ্নি দারুণ রেগে গিয়েছিলেন। বড়, মেজ, সেজ পরপর ছেলেদের ডেকে বললেন—

তোমার মায়ের মাথা কেটে ফেল। সর্বনাশ! তা কি কখনও সম্ভব নাকি? বলতেই তিনজন পিতৃশাপে জ্ঞান হারাল। রাম আসতেই বাবা তাকেও সেই একই আদেশ দিলেন। রাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করলেন। কুঠার দিয়ে মায়ের মাথা নামিয়ে দিলেন। জমদগ্নি খুশি হয়ে বর দিতে চাইলে, তিনি তখন তাঁর কাছ থেকে চারটে বর চেয়ে নিয়েছিলেন। এক, মা বেঁচে উঠুন আর যেন তিনি মৃত্যুর কথা জানতে না পারেন। দুই, দাদারা জ্ঞান ফিরে সুস্থ হয়ে উঠুক। সেই সঙ্গে আগের কোন ঘটনা যেন তাদের মনে না থাকে। তিন, যুদ্ধে কেউ যেন তাঁকে কখনো হারাতে না পারে। চার, তিনি যেন দীর্ঘজীবন পান। বাবা ঋষি জমদগ্নি প্রাণভরে ছেলের সব প্রার্থনা মঞ্জুর করে দিলেন। রামও আবার বেরিয়ে পড়লেন।

সে সময় হৈহয় দেশের রাজা ছিলেন কার্তবীর্যার্জুন, অর্থাৎ

কীর্তিবীর্যের ছেলে অর্জুন। মাহিষ্মতী নামে এক সুরক্ষিত নগরীতে তাঁর রাজধানী ছিল। যেমন বীর, তেমনি পরাক্রমশালী তিনি। তাঁর নাকি ছিল হাজার হাত। তিনি ক্ষমতার জোরে তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন।

বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শিকার করতে করতে একদিন তিনি জমদগ্নির তপোবনে এলেন। মহাযোগী জমদগ্নি ঠিকই, কিন্তু তাঁর কি এমন আছে যে রাজার এত সংখ্যক অনুচরকে তিনি আপ্যায়ন করবেন। অথচ, আপ্যায়ন করা ধর্ম। তাঁর একটা গাই ছিল। গাইটির কাছে যা চাওয়া যেত, তাই পাওয়া যেত। তাই তার নামই ছিল 'কামধেনু'। ঋষি সেই কামধেনুর সাহায্যে নিমেষের মধ্যে রাজা থেকে শুরু করে সকলকে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। ধেনুটিকে দেখে অর্জুনের খুব লোভ হল। ঋষির ঐ একটাই মাত্র ধেনু। ওটি দিলে তিনি দুধ-ঘি ইত্যাদি কোথা থেকে পাবেন? যাগ-যজ্ঞ কিভাবে করবেন।

জমদগ্নি প্রতিবাদ জানালেন দেখে রাজার অহঙ্কারে লাগল। তিনি তখন জোর করে ধেনুটিকে কেড়ে নিতে গেলেন। তিনি ব্রাহ্মণ জমদগ্নি, যুদ্ধ তো তাঁর কাজ নয়। তাই তিনি শুধু ধেনুটিকে বললেন—আমাকে তুমিই রক্ষা কর। বলার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে হাজার সৈন্য এসে অর্জুনকে মেরে তপোবন থেকে তাড়িয়ে দিল।

কথাটা রামের কানে গেল। অর্জুনের অন্যায় অত্যাচার আর ঔদ্ধত্যে তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে গেল। তখনই কুঠার হাতে মাহিষ্মতী নগরীতে ঢুকে নগরী তছনছ করে অত বড় ক্ষত্রিয় বীরকেও খতম করে এলেন। আর সব ক্ষত্রিয় তা দেখে একটু ভয় পেল বটে, কিন্তু পরশুরামকে কিভাবে কায়দা করা যায়, তার কৌশলও ভাঁজতে লাগল।

অর্জুনের ছেলেরা একবার সুযোগ বুঝে তপোবনে এসে জমদগ্নিকে হত্যা করে বসল। আর যায় কোথা? কুঠার হাতে রামও প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, পৃথিবীকে যদি ক্ষত্রিয়শূন্য করতে না পারি, তবে আমি পরশুরামই নই। ওদিকে ক্ষত্রিয়রা জোট বাঁধতে লাগল, যেমন করেই হোক, অর্জুনকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

কাঁধে কুঠার নিয়ে পরশুরাম বেরিয়ে পড়লেন, আর নির্মম ভাবে ক্ষত্রিয় বীররা যেভাবেই তাঁকে ঘিরে ধরুক না কেন, ঐ এক কুঠার নিয়ে তাঁদের কচুকাটা করতে করতে তিনি বেরিয়ে আসতেন।

এভাবে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় বলতে আর কেউ থাকলই না। মাত্র কয়েকজন রমণী প্রাণভয়ে গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে বেঁচে ছিল।

মারামারি একটা নেশার মত। পরশুরামকেও যেন সেই নেশায় পেয়ে বসেছিল। অনেক কষ্টে ব্রাহ্মণরা তাঁকে শান্ত করলে ভারত সাগরে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে তিনি তপস্যায় বসলেন।

ঋষিরা সেই ক্ষত্রিয় রমণীদের উদ্ধার করে তাঁদের ছেলেপুলেদের সুশিক্ষা দিয়ে আবার নতুন করে শাস্ত্রের শাসনব্যবস্থা চালু করলেন।

(পরশুরাম অনেক কাল পরে অবতার শ্রীরামচন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়ে আত্মসংবরণ করেছিলেন।)

(ছ)

বুদ্ধ অবতার

পৃথিবীতে যেদিন থেকে দেবতা আর অসুরের সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন থেকেই পৃথিবীর রাজা কে হবে, কে তার সব সম্পদ ভোগ করবে, তাই নিয়ে দুদলের মধ্যে থেকে লড়াই চলেই আসছিল।

ধর্মের জন্য ধর্ম আচরণ করতেন, সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করতেন বলে কশ্যপ এবং অদিতির ছেলে দেবতাদের ওপরই সর্বেশ্বর ভগবান পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কশ্যপের আর এক স্ত্রী দিতির ছেলে হল দৈত্য বা অসুররা। এরা নিজেদের ভোগসুখটাই খুব বেশি করে দেখত বলে ভগবান এদের সেই ভাবেই রেখেছিলেন। ভোগের স্পৃহা যাদের মনে থাকে, তারা সব সময় চেষ্টা করে, কি করলে আরো সুখে থাকবে। অসুরদের ছিল সেই স্বভাব। আবার সব সময় ভোগের মধ্যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকলে কাজে কুঁড়েমি আসে, মনে অহঙ্কারও জাগে। মাঝে মাঝে সেই অবস্থা যখন দেবতাদের হতো, তখন অসুররা বাহুবলে তাদের হটিয়ে দিত। ধাক্কা খেয়ে যখন তাদের চেতনা ফিরত, ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন, তখন তিনি আবার তাঁদের সাহায্য করতেন। শুরু থেকে এভাবেই চলে আসছে।

আর এভাবেই একবার অসুরদের কাছে হেরে গিয়ে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর কাছে সাহায্যের জন্যে গেলে বিষ্ণু বলেছিলেন—তোমরা এখন কিছুকাল অপেক্ষা কর। দানবেরা বেদ নিয়ে যেভাবে মেতে উঠেছে তাতে, ওদের ও পথ থেকে সরিয়ে, তোমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে একটু সময় লাগবে। আমি শুদ্ধোধনের পুত্র হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করব। আমার নাম হবে 'বুদ্ধ'। আমি এক নতুন ধর্ম প্রচার করব। তার নাম হবে 'বৌদ্ধধর্ম'। এই ধর্মের সঙ্গে বেদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। দানবেরা এই ধর্মের মায়ায় পড়ে যাবে। বেদবিহিত কাজ আর তারা করতে পারবে না। ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অধার্মিক হয়ে উঠবে। তখন তোমাদের একটু সুবিধে হতে পারবে। তবে তারপরেও তোমাদের আরো অপেক্ষা করে করে থাকতে হবে, যতদিন কলি শেষ না হয়।

দেবতারা তাই শুনে চলে এলেন, আর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

যথাসময়ে কপিলাবস্তু নগরে রাজা শুদ্ধোধনের একটি ছেলে হল। বড় বড় জ্যোতিষীরা গুণে-গেঁথে বললেন—এই ছেলে হয় রাজাধিরাজ হবে, নয়ত সন্ন্যাসী হবে। রাজার ছেলে রাজচক্রবর্তী হবে, এ তো বড় আনন্দের কথা। কিন্তু সন্ন্যাসী? শুনে তো রাজার মন খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল 'সিদ্ধার্থ'।

সিদ্ধার্থ একটু বড় হতেই রাজা তাকে খুব নজরে নজরে রাখতে লাগলেন। সব সময় যাতে খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদ নিয়ে সে থাকে, তার ব্যবস্থা করে চললেন। করলে কি হবে, ছেলে কিন্তু আর পাঁচজন ছেলের মত ওসব নিয়ে মেতে উঠল না। বয়স যত বাড়তে লাগল, ছেলের গাম্ভীর্যও তত বাড়তে লাগল। আপন মনে থাকতেন, আপন খেয়ালে চলতেন। আর মানুষ তো দূরের কথা, পশুপাখি এমন কি কীটপতঙ্গের কোন কষ্ট দেখলেও আকুল হয়ে উঠতেন।



সর্বজীবে দয়া ভাল, কিন্তু রাজার ছেলে থাকবেন রাজার মত। তা না হয়ে ছেলের এই উদাস ভাব দেখে শুদ্ধোধন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিলে এ রকমটি আর থাকবে না। তাই অনেক খুঁজে-পেতে, লক্ষ্মীর মত দেখতে একটি মেয়ে, নাম গোপা, তার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়েও দিয়ে দিলেন। আর ছেলের যাতে অন্য কোনদিকে মন না যায়, তারও সব বন্দোবস্ত করলেন।

স্ত্রী গোপাকে নিয়ে সিদ্ধার্থ সংসার করেন বটে, তবুও অনেকখানি যেন না করার মতই। ঘরের বাঁধন ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য মন যেন খালি উড়্ উড়্ করে।

মাঝে মাঝেই সিদ্ধার্থ রথে চেপে নগর ভ্রমণে বের হতেন। একদিন যেতে যেতে দেখলেন, কয়েকজন মিলে একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে দাহ করবার জন্য, আর তার আত্মীয়স্বজনরা কি কান্নাই না কাঁদছে! রোগের যন্ত্রণা, বৃদ্ধের কষ্ট এসব তো দেখেছেন-ই। কিন্তু এই দৃশ্যটি দেখার পর সিদ্ধার্থের মন যেন আরো উদাস হয়ে গেল। রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু—এই জীবন? ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের জন্য আবার এত মায়া? এসব থেকে মুক্তি পাবার কি কোন পথই নেই?

সিদ্ধার্থ এই রকম চিন্তায় যখন ব্যাকুল, তখন একদিন এক সন্ন্যাসীকে দেখলেন। তাঁর মুখচোখ দিয়ে যেন জ্যোতি ছুটছে। কি শান্ত মূর্তি! জগতের এসব ব্যাপারের কোন দাগই সেখানে নেই। সিদ্ধার্থ তাঁকে দেখে মনে মনে ঠিক করলেন, তিনিও সন্ন্যাসী হবেন, তপস্যা করবেন, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে জয় করবেন। শুদ্ধোধনকে নিজের অভিপ্রায়ের কথা এক ফাঁকে বলেও ফেললেন। শুনেই তো শুদ্ধোধনের মাথা ঘুরে গেল। একমাত্র ছেলে! শেষে জ্যোতিষীর কথা কি সত্যি হবে? ছেলে ঘর-সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে? এ কি কোন বাবা চান? শুদ্ধোধন অনুমতি তো দিলেনই না, তার ওপর সিদ্ধার্থ যাতে পালাতে না পারেন, তার জন্য কড়া পাহারা বসালেন।

ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থর একটি ছেলে হয়েছে। তার নাম রাহুল। ছেলের মায়া বড় মায়া। সিদ্ধার্থ দেখলেন, এরপর সংসারে থাকলে আরো মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হবে। তাই তিনি এক গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে নানা যোগীর কাছে যোগ সাধনা করলেন। তাতে সিদ্ধিও লাভ করলেন। মনে আনন্দের অনুভূতিও আসতে লাগল। ভালও লাগছে। তবুও সিদ্ধার্থের মন ভরল না। মানুষকে যদি জরা-ব্যাধির কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে না পারা গেল, তাহলে এই আনন্দ নিয়ে লাভ কি? সিদ্ধার্থকে অশান্তি যেন আরো পেয়ে বসল। তিনি ঠিক করলেন, জরা-মরণের হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় নিজেই তপস্যা করে তার উপায় জানবেন।

গয়ার কাছে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রাম। সেখানে এসে সিদ্ধার্থ কঠোর সংযমের মধ্যে থেকে ধ্যানে মগ্ন হলেন। দিনের পর দিন যায়। কঠোর সংযম। প্রায় না খেয়ে সাধনা করতে থাকার ফলে ক্রমেই তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। দুর্বল শরীরে কি সাধনা হয়? সিদ্ধার্থের নিজের মনেই এই প্রশ্ন জেগে উঠল। আর নিজেই তার সমাধান করলেন—না, এত কঠোর নিয়ম মেনে চললে নিয়ম মানা হবে বটে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌছনো যাবে না। তাই তিনি সাধনার মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিলেন, যেখানে সাধ্যমত কষ্ট করতে হবে আত্মার উন্নতির জন্য, সর্বজীবে সমভাব আনার জন্য, তবে নিদারুণ কষ্ট নয়।

এবার সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে সুস্থ সবল হয়ে উঠলেন। তারপর ধ্যান করতে করতে মুক্তিপথের নির্বাণ লাভের সন্ধান পেয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। সেই থেকে সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

বুদ্ধদেব এরপর সেখান থেকে এলেন কাশীর কাছে সারনাথে। সেখানে তিনি পাঁচজনকে বেছে নিয়ে শিষ্য করে নিজের উপলব্ধ সত্যকে প্রচার করার দায়িত্ব দিলেন। দেখতে দেখতে বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের কথা, তাঁর মতবাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে লাগল। অশান্তির মধ্যে শান্তিপথের সন্ধান পেয়ে দলে দলে মানুষ ছুটে আসতে লাগল তাঁর কাছে।

শুদ্ধোদনের এখন গর্বে বুক ফুলে উঠল। কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেবকে আনিয়ে তিনি নিজে, সেই সঙ্গে গোপা, এমন কি রাহুলও তাঁর পথের অনুগামী হল।

পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, কতকগুলো সাধারণ বিধিবদ্ধ আচার আচরণের মধ্য দিয়ে সহজে কিভাবে নির্বাণ লাভ করা যায়। বুদ্ধ প্রচারিত এই মতের নাম হল বৌদ্ধ মত।

বুদ্ধদেব আশি বছর বয়সে মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন।

(ঞ)

কল্কি অবতার

বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের পর মানুষ আবার স্বার্থপর হয়ে উঠল। সহজপথে ধর্ম অনুশীলনের যে আদর্শ বুদ্ধদেব রেখে গেলেন, মানুষ তা ভুলে গিয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে কলহে মেতে উঠল, ধর্মের নামে ধর্মধ্বজ সাধু-সন্তরা গজিয়ে উঠে, যে যার মত প্রচার করে দলভারি করতে শুরু করল। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে আত্মকলহ, আর অন্তর্যুদ্ধের মেলা চারদিকে বসে যেতে শুরু করল। ন্যায়-নীতি গোল্লায় যেতে লাগল। কলির দাপটে মানুষজন ক্রমশই দিশেহারা হয়ে পড়তে শুরু করল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্রের মধ্যে জীবিকাগত ভেদাভেদ লোপ পেতে আরম্ভ করল। পৃথিবীটাই ক্রমে অরাজকের দেশ হয়ে উঠতে লাগল।

মানুষের এই অসহনীয় অবস্থা দূর করার জন্য কলির শেষে বিষ্ণুর অংশে একজন অবতার পুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। পরে ঠিক সময় এলে জন্মগ্রহণ করবেন, তাই তিনি কল্কি।

এই অবতার-পুরুষ শম্ভল নগরে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার ঘরে জন্ম নেবেন। এঁর মা হবেন সুমতি নামে এক ধর্মপরায়ণা মহিলা।

কল্কিদেব অতি অল্পবয়সেই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তারপর মহাদেবের আরাধনা করে অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ হয়ে উঠলেন।

সিংহল রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে কল্কিদেবের বিয়ে হবে এবং বিশ্বকর্মা এসে শম্ভল নগরে সস্ত্রীক কল্কিদেবের থাকার জন্য মনোরম এক প্রাসাদ নির্মাণ করে দেবেন।

ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে ইচ্ছে জাগবে। রাজচক্রবর্তী না হলে তো আর অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যায় না। তাই পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কল্কিদেব দিগ্বিজয়ে যাবেন। সেসময় গোটা পৃথিবীটাই অনাচারী বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছরা অধিকার করে থাকবে। নতুন নতুন কৌশল তাদের আয়ত্তে থাকবে। তারা কল্কিদেবকে প্রতিহত করার জন্য সেসব কৌশল অবলম্বন করবেন। তবুও কল্কিদেবের গতিকে রুখতে পারবেন না। তিনি সেই সব তথাকথিত বৌদ্ধ আর বিধর্মী ম্লেচ্ছদের নিধন করে পৃথিবীকে তাদের রক্তে স্নান করিয়ে দেবেন। পিতার ইচ্ছাও পূরণ করবেন।

কল্কিদেবের তেজস্বিতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সেই সঙ্গে সনাতন বৈদিক ধর্ম আর বর্ণাশ্রম বিধি যে মেনে না নেবে, তাকেই পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে। এইভাবে যেতে যেতে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষই শেষ পর্যন্ত থাকবেন। সনাতন বৈদিক ধর্ম অনুশীলন করবেন। অধর্ম আচরণের ফলে পৃথিবীতে যে বন্যা-মহামারী-দুর্ভিক্ষ অনবরত লেগেই থাকত, তা নিবারণ করে পৃথিবীকে শস্য-শ্যামল, সুন্দর করে তুলবেন। কলিযুগের অবসান হবে। নতুন করে আবার সত্যযুগ আরম্ভ হবে।

আর তাই দেখে কল্কিদেব স্বর্গধামে ফিরে যাবেন।

(ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ-বলরামের কাহিনী এই পুরাণে বিশেষ অধ্যায় নিয়ে থাকায়, এই দুই চরিত কাহিনী এর মধ্যে না রেখে আলাদা দেওয়া হল।)



রামাবতার কাহিনী

রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবনের চোখে ঘুম ছিল না। দেবতা থেকে সাধারণ মানুষ সব সময়ই ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। শান্তিপ্রিয় মুনিঋষিদের মনেও শান্তি ছিল না। নির্বিঘ্নে যাগ-যজ্ঞ করতে পারত না। মুখে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে সব সময়ই হা-হুতাশ করত আর ভগবানকে ডাকত। বলত—হে ভগবান, কবে এই অত্যাচারের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব। তুমি থাকতেও পৃথিবীতে কি শান্তি আসবে না?

সকলের এই অন্তরের আকুল আহ্বান বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির কানে বাজল। ত্রিভুবনকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দেবার জন্য তিনি পৃথিবীতে এক ধার্মিক রাজার ঘরে চারটি রূপে অবতীর্ণ হলেন।

□ বালকাণ্ড

ইক্ষ্বাকু বংশে দিগ্বিজয়ী রাজা রঘুর পর, ঠিক তেমনি ভাবেই তাঁর নাতি রাজ দশরথ, অযোধ্যায় রাজত্ব করতেন। তাঁর তিন রানী : কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা। বহুকাল অপেক্ষা করেও দশরথের কোন ছেলেপুলে হল না দেখে, গুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে এনে তিনি এক যজ্ঞ করালেন। তার ফলে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন নামে যমজ সন্তানের জন্ম হল। অল্প বয়সেই সবকটি ছেলেই জ্ঞানে-গুণে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুলনীয় হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠল। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রর গুণের সীমা নেই। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন তিন ভাই-ই জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন, যেমন সবাই শ্রদ্ধা করতেন রাজা দশরথকে।

বিশ্বামিত্র তপস্যার জোরে তখন সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু কিছু রাক্ষস সব সময়ই তাঁর আশ্রমে এসে উৎপাত করত। শেষে এমন অশান্তি আরম্ভ করল যে, তাঁর তপস্যা করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছে করলে বিশ্বামিত্র নিজেই তাদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারতেন। কিন্তু দেশে ক্ষত্রিয় রাজা যখন আছেন, আর তিনি দুর্বল নন, তাছাড়া নির্বিঘ্নে তাঁরা যাতে তপস্যা করতে পারেন তার দায়-দায়িত্ব যখন রাজার, তখন তিনি রাজা দশরথের কাছেই সাহায্যের জন্য এলেন। তপস্যার জোরে এর মধ্যে তিনি জানতে পেরেছিলেন, রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করার জন্য দশরথের ঘরে ভগবানের আবির্ভাব ঘটেছে।

বিশ্বামিত্র এসে রাক্ষস বধ করে তাঁকে নিশ্চিন্ত করার জন্য দশরথের কাছে রাম আর লক্ষ্মণকে চাইলেন। ছেলেদের ঐটুকু বয়স মাত্র, তার ওপর ঐসব দুরন্ত রাক্ষস। ইচ্ছে না থাকলেও রাজা বিশ্বামিত্রের ভয়ে দু-ভাইকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। পথে আসতে আসতে বিশ্বামিত্র যুদ্ধের অনেক কলাকৌশল তাঁদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ তাড়কা, সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসদের বধ করে, মারীচকেও মেরে আশ্রমকে রাক্ষস-মুক্ত করার পর বিশ্বামিত্র তাঁদের নিয়ে এলেন গৌতমের আশ্রমে। কোন অপরাধে গৌতম মুনি তাঁর স্ত্রী অহল্যাকে অভিশাপ দিয়ে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্র তাকে শাপমুক্ত করলেন। ঐটুকু দুই ছেলের অসাধারণ সব কাজ কারবার দেখে আর যেসব মুনি-ঋষিরা ছিলেন, তাঁরাও তাদের অবতারের চোখেই দেখতে শুরু করে দিলেন।

পাশেই মিথিলার রাজা জনক। মহা ধার্মিক। সীতা নামে তাঁর এক মেয়ে ছিল। মেয়ে যাতে সুযোগ্য পাত্রের হাতে পড়ে, তার জন্য তিনি এক ধর্মযজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর একটা ধনুক এত ভারী ছিল যে, কেউ সেটা তুলতে পারত না। তা প্রাসাদ মন্দিরের এক কোণে পড়েই থাকত। জনক একদিন বাঁহাতে সীতাকে সেই ধনুকটা তুলে জায়গা পরিষ্কার করতে দেখে, ঘোষণা করলেন, যে ক্ষত্রিয় বীর এই ধনুক তুলে গুণ দিতে পারবে, তারই সঙ্গে তিনি সীতার বিয়ে দেবেন। কত বড় বড় বীর এল গেল। সকলে কত চেষ্টাই না করল,

গুণ দেওয়া তো দূরের কথা, সেই ধনুক (হরধনু) তুলতে পর্যন্ত পারল না। খবরটা রামচন্দ্রের কানে আসতেই তাঁর খুব কৌতূহল জাগল। বিশ্বামিত্র আর মুনিঋষিদের নিয়ে তিনি জনক রাজার সেই যজ্ঞে গিয়ে হাজির হলেন। ধনুকটা দেখে রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে হরধনু তুলে নিয়ে এত জোরে তার ছিলা দিতে গেলেন যে, অমন হরধনু ভেঙে দুখানা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল অযোধ্যায় রাজা দশরথের কাছে। মহানন্দে বশিষ্ঠকে নিয়ে তিনি জনকরাজার কাছে এসে হাজির হলেন। সকলের সামনেই জনকরাজার মেয়ে জানকীর (সীতা) সঙ্গে রামচন্দ্রের, উর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিয়ে হয়ে গেল। দশরথের সঙ্গে তাঁর আর দুই ছেলে ভরত আর শত্রুঘ্ন-ও এসেছিলেন। জনকরাজার ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তির সঙ্গে ভরত এবং শত্রুঘ্নর-ও বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর্ব শেষ হতে ফেরার পথে পরশুরাম পথ আগলে দাঁড়ালেন, রামচন্দ্রের হরধনু ভাঙার জন্য। রামচন্দ্রের কাছে পরশুরাম হেরে গেলেন। এরপর সবাই অযোধ্যায় ফিরে এলেন। ভরত আর শত্রুঘ্ন মামা যুধাজিতের বাড়ি চলে গেলেন।

□ অযোধ্যাকাণ্ড

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। বড় ছেলে রামচন্দ্রকেই রাজ্যভার দেবেন বলে স্থির করেছেন। প্রজারাও ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের দারুণ অনুগত হয়ে পড়েছে। দশরথ তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন গুরুদেব বশিষ্ঠ আর তাঁর আটজন মন্ত্রীকে। সকলেই এক বাক্যে দশরথকে সমর্থন জানালেন। রামচন্দ্রকে ডেকে দশরথ বললেন—'আগামীকাল সকালেই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা হবে। তুমি প্রস্তুত থেকো।' রামচন্দ্রও পিতার আদেশ শিরোধার্য করে চলে গেলেন। আগামীকাল থেকে রাম রাজা হবেন। খবর পেয়েই শহর-নগর আনন্দে মেতে উঠল। চারদিকে তোরণ আর আলোর মালায় অযোধ্যা যেন নতুন হয়ে উঠল।

দশরথ আদেশ দিয়ে কৈকেয়ীর প্রাসাদে বিশ্রাম নিতে যাবেন। দাসী মন্থরা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হল। আড়ালে কৈকেয়ীকে ডেকে বলল—শুনেছ, আগামীকাল থেকে রাম সিংহাসনে বসছে। শুনে কৈকেয়ী মহানন্দে নিজের গা থেকে একগাছা অলঙ্কার খুলে মন্থরাকে উপহার দিলেন। মন্থরা তো রেগে আগুন। বলল—আমি কি গয়না পাবার লোভে তোমাকে একথা বলতে এলুম? তোমার মত বোকা তো দুনিয়ায় কেউ নেই। রাম যদি একবার রাজা হয়, তাহলে তোমার, আমার, ভরতের কি দুর্দশা হবে, সেটা কি একবার ভেবে দেখছ? কৌশল্যা হবে রাজার মা। রামের পর তার ছেলে রাজা হবে। আমার ভরতের আর কোন দিন রাজা হওয়া হবে না। তুমিও কোন দিন রাজার মা হতে পারবে না। সেটা কি একবার ভেবেছ?

মন্থরার পিঠে একটা কুঁজ ছিল, কুঁজো হয়ে চলত। সকলে তাকে তাই কুব্জা বলত। ছোটবেলায় রাম একবার কৌতুক করে তার পা ধরে টেনে দিয়েছিল। তাতে মন্থরা পড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে রামের ওপর তার দারুণ রাগ ছিল।

কুব্জার কুপরামর্শে কৈকেয়ীর মনও ঘুলিয়ে উঠল। মন্থরাও সুযোগ বুঝে মোক্ষম পরামর্শ দিল।

রাজা দশরথ সন্ধ্যার পুজো-অর্চনা সেরে কৈকেয়ীর প্রাসাদে এসে দেখেন, রানী দারুণ মনমরা আর অস্থির। একবার দেবতাদের অনুরোধে রাজা দশরথ শম্বরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। সে সময় কৈকেয়ী তাঁকে জান-প্রাণ দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন। রাজার সেই থেকে কৈকেয়ীর ওপর একটু দুর্বলতা ছিল। কৈকেয়ীর দুটো প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন বলে তখন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

রানীকে খুশি করার জন্য রাজা উদ্যোগ নিতেই কৈকেয়ী রাজাকে সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, এক বরে রামের চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস আর দ্বিতীয় বরে, ভরতকে রাজা করার প্রার্থনা জানিয়ে বসল। শুনে তো রাজার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। এখন সত্য রাখেন, না পুত্র রাখেন? রাজা যখন এই চিন্তায় বড়ই কাতর, রামচন্দ্র নিজেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন : সত্যরক্ষাই ধর্ম। তাই পিতার সত্যরক্ষার জন্য চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে চললেন। রাজ্যের প্রজারা শুনে হাহাকার করে উঠল।

বল্কল পরে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে বনবাসে চললেন। সঙ্গে লক্ষ্মণ। তিনি কোন মতেই দাদার সঙ্গ ছাড়লেন না। সুমন্ত্র তাঁদের রথে চাপিয়ে অযোধ্যার বাইরে নিয়ে আসছিল। পুরবাসীরা রথের অনুগমন করল। রাম অনেক বলেও তাদের ফেরাতে পারলেন না। এক কথা তাদের, রাম যদি বনে যায়, তবে তারাও আর এখানে থাকবে না, বনে যাবে। রথ এল তমসা নদীর তীরে। প্রজারাও এসে জড়ো হল সেখানে। সকলেই পথ হেঁটে শ্রান্ত-ক্লান্ত। রাতে, বিশ্রাম নিতে গিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। রামচন্দ্র সেই সুযোগে ভোর না হতেই সুমন্ত্রকে দিয়ে রথ নিয়ে সোজা শৃঙ্গবের পুরে এসে হাজির হলেন। সকালে প্রজারা উঠে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল।

শৃঙ্গবের পুরে এসে ব্যাধরাজ গুহকের কাছে বাকি রাতটুকু কাটালেন। সকাল হতেই সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়ে রামচন্দ্র জাহ্নবী পেরিয়ে প্রয়াগে এলেন। সেখানে মুনিবর ভরদ্বাজকে প্রণাম করে চিত্রকূট পাহাড়ে এসে বাসা বাঁধলেন।

ওদিকে রাজপ্রাসাদে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। শোক আর সহ্য করতে না পেরে, রামচন্দ্র বনবাসে আসার দিন থেকে ছ-দিনের দিন রাজা দশরথ দেহত্যাগ করলেন। সারা অযোধ্যা যেন শোকের সাগর হয়ে উঠল।

ভরত আর শত্রুঘ্ন এসবের কিছুই জানতেন না। দুজনেই ছিলেন মামার বাড়ি। বশিষ্ঠদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আনার জন্য দূত পাঠালেন। অযোধ্যায় এসেই ভরত সব দেখে-শুনে কৈকেয়ীর ওপর যেমন রেগে উঠলেন, দাদা রামের জন্য তেমনি ভাবেই মন তাঁর কেঁদে উঠল। মুখে যা এল, মাকে তা-ই বলে ভর্ৎসনা করলেন। পিতার মৃতদেহ সরযূর তীরে নিয়ে গিয়ে সৎকার করলেন। বশিষ্ঠদেব যখন তাঁকে সিংহাসনে বসে রাজ্য পালনের কথা বললেন তখন ভরত উত্তর দিলেন, দাদার এই আসনে তার বসার কোন অধিকার নেই। তিনি বনে গিয়ে যেভাবেই হোক দাদাকে ফিরিয়ে আনবেন। ভরতের মনের কথা জেনে সকলেই তাঁকে সাধুবাদ দিল। আর তিনি যখন সেনানী নিয়ে রামের সন্ধানে চললেন, তখন কতজন যে তাঁর সঙ্গী হলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই।

ভরত প্রথমে শৃঙ্গবেরপুরে তারপর সেখান থেকে প্রয়াগে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়ে রামের গমন পথের সন্ধান নিয়ে চিত্রকূট-এ এসে হাজির হলেন। ভাইয়ের মুখে পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে বড় ছেলে হিসেবে তাঁর যে কর্তব্য তা করলেন। ভরত দাদাকে অনেক অনুরোধ জানালেন অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পিতৃ-সিংহাসনে বসতে। পরিবর্তে তিনি নিজে বল্কল পরে চোদ্দ বছর বনবাস করবেন। কিন্তু কোন মতেই তিনি রামচন্দ্রকে রাজি করাতে পারলেন না। শেষে রামচন্দ্রের খড়ম-জোড়া নিয়ে তাকেই রামচন্দ্র-জ্ঞানে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে নন্দীগ্রামে থেকে দাদার আদেশে রাজ কাজ করে চললেন।

□ অরণ্যকাণ্ড

ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে ফিরে যাবার সময় অগস্ত্য মুনি রামচন্দ্রকে একটি দিব্য ধনু আর একটি খড়্গ দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দুটি মাত্র হাতিয়ার সঙ্গে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটী কাননে এসে মনের মত একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। আর ফল-মূল-কন্দ খেয়ে দিন কাটাতে থাকলেন।

একদিন লঙ্কার রাজা রাবণের বোন রাক্ষসী শূর্পণখা ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে রামচন্দ্রকে দেখে মোহিত হয়ে গেল। রামচন্দ্রকে প্রস্তাব দিল তাকে বিয়ে করার জন্য। যদি না করে তাহলে এক্ষুণি সে তাঁরই সামনে লক্ষ্মণ এবং সীতাকে গিলে খাবে। বলেই বিকটাকার রাক্ষসী বিকট হাঁ করে যেই তাদের গিলতে যাবে, অমনি লক্ষ্মণ তার নাক আর কান কেটে দিলেন। রক্তের স্রোত বইতে লাগল, সেই সঙ্গে রাক্ষসীর বিকট আর্তনাদ। কাঁদতে কাঁদতে ভাই খরের কাছে গিয়ে বলল—অযোধ্যার রাম, সীতা আর ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসে রয়েছে। লক্ষ্মণই আমার এই দুরবস্থা করেছে। তোমরা আমার ভাই। যদি ঐ তিনজনের রক্ত আমাকে পান করাতে না পার, তাহলে আমি নিশ্চয়ই মরব।

তাই কখনো হয় নাকি? খর, দূষণ, ত্রিশিরা তিন দুরন্ত ভাই সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ হাজার রাক্ষস নিয়ে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করল। রাম খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের সকলের যুদ্ধসাজ চিরকালের জন্য মিটিয়ে দিলেন। কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারল না। শূর্পণখা তখন লঙ্কায় এসে রাজা রাবণকে উত্তেজিত করে তুলল। সত্যিই তো, তাদের যারা খাদ্যমাত্র, তাদেরই হাতে বোনের এই দুর্গতি? এত আত্মীয়-স্বজন নিহত হল?

রাবণ তখন মারীচকে ডেকে বলল—আমি পঞ্চবটী কানন থেকে সীতাকে হরণ করে আনব। তোমাকে আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। আশ্রমের সামনে গিয়ে এমন কিছু কর, যাতে আমার কোন অসুবিধে না হয়।

মারীচ ছিল খুবই মায়াবী। রামের পরিচয় এর আগে একবার সে পেয়েছিল। তাই রামের ক্ষমতা সে বিলক্ষণ জানত। এদিকে যদি রাবণের আদেশ অগ্রাহ্য করে তাহলেও নিস্তার নেই।

অগত্যা মারীচ আশ্রমের সামনে গিয়ে সোনার হরিণ সেজে বিচরণ করতে লাগল। সীতা হরিণ দেখে খুবই প্রলুব্ধ হলেন। রামকে বললেন হরিণটাকে ধরে দেবার জন্য। সীতার আবদার রাখতে রাম, লক্ষ্মণকে সীতার পাহারায় রেখে তার পিছু নিলেন। হরিণ বেশ কিছু দূরে গেল, তারপর রামের বাণে মারা গেল। মারা যাবার আগে রামচন্দ্রের গলার স্বর নকল করে লক্ষ্মণ আর সীতার নাম ধরে এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠল যে সীতার কানে এসে বাজল। সঙ্গে সঙ্গে সীতা একরকম জোর করেই লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামচন্দ্রের কি হল দেখবার জন্য। রাম নেই, লক্ষ্মণও নেই। সেই সুযোগে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে নিজের রথে তুলে নিয়ে আকাশপথে লঙ্কার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো। অসহায় সীতা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

দশরথের বন্ধু বৃদ্ধ জটায়ুর নজরে তা পড়তে, আকাশপথেই জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করে বসল। জটায়ুর ঠোঁট, নখ, পাখার আর ঝাপটায় রাবণ ক্ষতবিক্ষত হলেও শেষ পর্যন্ত সে রাবণকে আটকাতে পারল না। নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে নীচে পড়ে গেল, আর প্রাণটুকু বের হবার অপেক্ষায় রইল।

এদিকে রামকে নিয়ে লক্ষ্মণ ফিরে এসে সীতাকে দেখতে না পেয়ে আকুল হয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে জটায়ুর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। এই জটায়ুর কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারলেন যে, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। জটায়ু এই খবরটুকু দেবার জন্যই বেঁচে ছিল। রাম-লক্ষ্মণ জটায়ুর সৎকার করতে যেতে গিয়েই এক কবন্ধের মুখোমুখি হলেন। কবন্ধ ছিল শাপগ্রস্ত। রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে তার পাপমুক্তি হল। যাবার সময় রামচন্দ্রকে পরামর্শ দিয়ে গেল যে, সীতা উদ্ধারের জন্য তিনি যেন সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন।



□ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রামচন্দ্র পম্পা সরোবরে এলেন। সেখানে শবরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তারপর তিনি হনুমানের সঙ্গে মিলিত হলেন। হনুমানই রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে গেল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীর ভাই সুগ্রীব। কোন কারণে বালীর সঙ্গে তার বিবাদ হয়েছিল। ফলে স্ত্রী রুমাকে বালীর কাছে রেখে রাজ্য ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সঙ্গে হনুমান প্রভৃতি কিছু বন্ধুও চলে এসে এদিকে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। শর্ত হল : রামচন্দ্র বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে দেবেন। তার বিনিময়ে সুগ্রীব তার বানর-অনুচরদের সীতা উদ্ধারের কাজে রামচন্দ্রকে দেবেন।

রামচন্দ্র সত্যি সত্যিই বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসালেন। আর সুগ্রীবের আদেশে বানর অনুচররা চারদিকে ছুটল সীতার সন্ধানে। সুগ্রীবের কড়া নির্দেশ, এক মাসের মধ্যে সীতার খবর আনতে হবে, নইলে সকলকে মরতে হবে।

বানর অনুচররা ছুটল পূর্বে-পশ্চিমে-উত্তরে। কোথাও সন্ধান পেল না। হনুমান রামচন্দ্রের একটা আংটি নিদর্শন হিসেবে নিয়ে কিছু অনুচর সহ দক্ষিণ দিকে গেল। প্রতিটি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও সীতার সন্ধান পেল না। তখন এক জায়গায় মন-মরা হয়ে বসে বসে ভাবছে, কি করা যায়। খবর না নিয়ে ফিরে গেলে সুগ্রীব তাদের আস্ত রাখবে না। নিজেরাই বলাবলি করতে লাগল যে জটায়ুই ধন্য। সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে প্রাণ দিল। আর আমরা এখনও তার সন্ধান পর্যন্ত পেলাম না।

সেই সময় জটায়ুর ভাই সম্পাতি আকাশপথে উড়ে যেতে যেতে বানরের দল দেখে খাবার জন্য নীচে নেমে আসছিল। হঠাৎ তাদের মুখে জটায়ুর প্রশংসা শুনে শত্রুতা ভুলে নেমে এসে বলল—তোমরা রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে খুঁজছ? এখানে তাকে কোথায় পাবে? আমি খুব উঁচু থেকে তাঁকে দেখেছি। একশ যোজন জুড়ে এই যে সমুদ্র, এর অপর পারে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়ায় রাবণ রাজার লঙ্কাপুরী। সেই পুরীর মধ্যে অশোককাননে রাবণ সীতাকে আটকে রেখেছে। রাম আর সুগ্রীবকে এই খবরটা দাও গে। এই বলে সম্পাতি চলে গেল।

□ সুন্দরকাণ্ড

সম্পাতি খবরটা দিল বটে, কিন্তু নিজের চোখে সীতাকে না দেখে রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবকে গিয়ে বলা ঠিক হবে না। হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি মিলে এই রকম যুক্তি-পরামর্শ করল। কে এই সুবিশাল লবণসাগর ডিঙিয়ে লঙ্কায় যাবে? কেই-বা যেতে পারবে? সকলেই বলশালী সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সাগর পেরিয়ে যেতে যে ক্ষমতার দরকার, তা ওদের মধ্যে একমাত্র হনুমানই ইচ্ছে করলে পারতে পারে। হনুমান রামচন্দ্রের নাম স্মরণ করে দিল লাফ। মাঝপথে মৈনাক-এ একটু বিশ্রাম নিয়ে সিংহিকাকে নিধন করে আর এক লাফে লঙ্কাপুরীতে এসে হাজির হল। পুরীর এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে অশোককাননে এসে দেখল, জানকী মুখ নিচু করে বসে আছেন। চেড়ীরা তাকে নির্যাতন করছে। আর দশানন রাবণ সামনে দাঁড়িয়ে বারবার সীতাকে বলছে তাকে বিয়ে করতে। সীতা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই আছেন। সীতা বসেছিলেন অশোককাননে একটা শিশুগাছের নীচে। হনুমান চুপিচুপি সকলের অলক্ষ্যে সেই গাছে বসে সব দেখল। তারপর দশানন চলে যেতে গাছ থেকেই সীতাকে আত্মপরিচয় দিয়ে সীতা যাতে বিশ্বাস করেন, তার জন্য রামচন্দ্রের দেওয়া আংটিটি তাঁকে দিতেই সীতা দারুণ উতলা হয়ে উঠলেন। হনুমান সীতাকে প্রবোধ দিয়ে বলল—এতদিন রামচন্দ্র তো কোন সন্ধান পান নি। এবার যখন পাবেন, তখন নিশ্চয়ই আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। ইচ্ছে করলে আপনি এখনি আমার পিঠে চেপেও চলে আসতে পারেন। সীতা বললেন—না, রামচন্দ্র নিজে এসে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

অগত্যা হনুমানকে ফিরতে হল। ফেরার পথে সীতার সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে জানকীর কাছ থেকে একটা মণি চেয়ে নিল। যাবার আগে হনুমানের ইচ্ছা জাগল ক্ষমতার ছোট্ট নমুনা রেখে যাবার। ভাবা যেমন, কাজেও তেমন। সীতাকে যে রাক্ষসীরা পাহারা দিচ্ছিল, তাদের সঙ্গে রাবণের সাত মন্ত্রীপুত্র, এমন কি ছেলে অক্ষকেও নিহত করল। মেঘনাদ এসে তাকে প্রতিহত করল। ইচ্ছে করেই মেঘনাদের হাতে সে ধরা দিল। মেঘনাদ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সভায় রাবণের কাছে নিয়ে গিয়ে সব বলতেই রাবণ রেগে আগুন। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি'। হনুমান বলল, 'আমি রামের দূত। নিজের ভাল চাও তো এখুনি সীতাকে ছেড়ে দাও।' সামান্য একটা ভক্ষ্য বানর ত্রিভুবনের রাজা রাবণকে হুঁশিয়ারি দেয়! রেগে রাবণ হনুমানকে বধ করার আদেশ দিল। কিন্তু বিভীষণ সে যাত্রায় তাকে রেহাই করিয়ে দিল। হনুমানকে ছেড়ে দেবার আগে রাবণের আদেশে হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। হনুমান লেজের সেই আগুন নিয়ে লঙ্কাপুরীর এক প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে লাফাতে লাফাতে সারা লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে বহু রাক্ষস মেরে আবার ফিরে এল।

যাক, শেষ পর্যন্ত সীতার সংবাদ পাওয়া গেছে। অঙ্গদ, দধিমুখ নামে হনুমানের সঙ্গীরা আনন্দিত হল। তারপর সকলে মিলে রামচন্দ্রের কাছে গেল। হনুমান রামকে সব কিছু বলে সীতার মণিটা দিতেই, রামচন্দ্র হনুমানের সংবাদকে সঠিক বলে জেনে আকুল হয়ে উঠলেন। সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুবিশাল বানরসেনার সঙ্গে নিজে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সীতা উদ্ধারের জন্য চলল।

সবাই মিলে লবণসাগরের তীরে আসার পর কিভাবে সেনাবাহিনী নিয়ে সাগর পার হওয়া যায়, সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। ঠিক এমন সময়ে রাবণের ভাই বিভীষণ এসে রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাঁর দলে ভিড়ে গেল। বিভীষণ এভাবে চলে এসেছিল তার কারণ, তার দাদা রাবণ সকলের সামনে তাকে যারপরনাই অপমান করেছিল। বিভীষণের অপরাধ, সে শুধু রাবণকে অনুরোধ করেছিল, রামের সঙ্গে বিরোধ না করে জানকীকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিতে।

যাই হোক, সাগর তো পার হতে হবে! নইলে কিভাবেই-বা লঙ্কায় পৌঁছনো যাবে? আর সীতাকেই-বা কিভাবে উদ্ধার করে আনা যাবে?

তখন বানরদের মধ্যে মস্ত বড় কারিগর নল এসে জনমজুর

লাগিয়ে পাথরের পর পাথর আর বাঁশ দিয়ে সমুদ্রের ওপর দারুণ মজবুত এক সেতু নির্মাণ করে দিল।

রামচন্দ্র সসৈন্যে সেই সেতুর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে সাগর পার হয়ে সুবেল পাহাড়ে এসে, সেখান থেকে রাবণের রাজধানী লঙ্কা দেখে তাঁবু গাড়লেন।

□ যুদ্ধকাণ্ড

সুবেল থেকে রামচন্দ্র অঙ্গদকে দূত হিসেবে রাবণের কাছে পাঠালেন। অঙ্গদ রাবণকে গিয়ে বলল—যদি ভাল চাও, তবে জানকীকে মুক্তি দাও। নচেৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। অঙ্গদের কথা শুনে রাবণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। দূতকে যে মারা অনুচিত, একথা ভুলেই গেল। গর্জন করে উঠল রাবণ—আগে তোকে বধ করব। যুদ্ধই হোক। দেখি রামের কত শক্তি। অঙ্গদ কোনক্রমে পালিয়ে রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এল।

রাম-শিবিরে সাজ সাজ রব। হনুমান, জাম্ববান, অঙ্গদ, নল, নীল, গয়, গবয়, গবাক্ষ, সুগ্রীব প্রভৃতি বীররা, যত বানর সেনা ছিল, সব জড়ো করে লঙ্কা ঘিরে আক্রমণ করল। রাম আর লক্ষ্মণ-এর হাতেই একমাত্র তীর-ধনুক-গদা। বানর সৈন্যদের হাতিয়ার বলতে নখ, দাঁত, পাথর আর গাছপালা। তারা তাই নিয়েই নির্মম ভাবে রাক্ষসসেনাদের মারতে শুরু করে দিল। রাক্ষসদের হাতে অগণিত সব শক্তিশালী অস্ত্র, তার ওপর হাতি, ঘোড়া, রথ। বানরসেনারা রাক্ষসদের এত তোড়জোড় দেখে মোটেই ঘাবড়ে গেল না। বরং আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক বীর বীর রাক্ষসরা একদিকে রাম-লক্ষ্মণ আর একদিকে বানরসেনাদের প্রহারে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। তখন মেঘনাদ বিপদ দেখে রাম আর লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে নাগপাশ ছুঁড়তেই অগণিত সাপ এসে দুজনকেই আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে বেঁধে ফেলল যে, তাঁদের আর নড়বার শক্তিটুকুও রইল না। হনুমান বেগতিক দেখে গরুড়কে স্মরণ করতেই আকাশ-বাতাস-পাথর কাঁপিয়ে গরুড় এসে হাজির। গরুড় হল সাপদের বড় শত্রু। তাকে দেখা মাত্রই রাম-লক্ষ্মণকে ছেড়ে সাপরা প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে



পারল পালাল। রাম-লক্ষ্মণ মুক্ত হয়ে বানরসেনাদের নিয়ে আবার তুমুল যুদ্ধ শুরু করে দিলেন।

রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ। দুর্ধর্ষ রাক্ষস। বেশির ভাগ সময়েই সে ঘুমিয়ে কাটাত। জেগে উঠলেই সর্বনাশ! কাঁচা ঘুম ভাঙালে তো রক্ষেই নেই! লঙ্কায় এত কাণ্ড ঘটে চলেছে, কুম্ভকর্ণ তার কিছুই জানত না। সে তখন নিজের প্রাসাদে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। রাবণ বেগতিক দেখে তাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে সব বলল। কুম্ভকর্ণ শুনে বলল, 'সীতাকে চুরি করে এনে কাজটা তুমি ভাল কর নি। যাই হোক, তুমি যখন আমাদের সকলের বড়, আর করেই ফেলেছ, তার ওপর রাম এসে যখন এই কাণ্ড শুরু করেছে, তখন মান তো বাঁচাতেই হবে। ঠিক আছে, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। দেখিয়ে দিয়ে আসি যে,কুম্ভকর্ণের হাতে তাদের রেহাই নেই।'

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙলেই দারুণ খিদে পেত। রাবণ তার ভুরিভোজের বন্দোবস্ত করেই রেখেছিল। আকণ্ঠ মদ-মাংস খেয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে নিষ্ঠুর ভাবে বানরসেনাদের মারতে আরম্ভ করল। সুগ্রীব এক ফাঁকে কুম্ভকর্ণের নাক-কান দু-দাঁতে কেটে দিয়ে গেল। রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তবুও কুম্ভকর্ণ বানরদের ধরে ধরে গোগ্রাসে গিলে চলল দেখে রামচন্দ্র বাণ ছুঁড়ে তার দু-হাত, দু-পা, শেষে মাথাটা কেটে ফেললেন। একটা বড় শত্রু নিপাত হল। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিভীষণ। সে রাক্ষসপুরের অনেক গোপন রহস্যই জানত। রাম-লক্ষ্মণ তার সাহায্যেই কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ, মহোদর, ত্রিশিরা প্রভৃতি রাক্ষসবীর, যাদের ওপর রাবণ প্রচুর আস্থা রাখত, তাদের সকলকে শেষ করলেন।

রাবণের ছেলে মেঘনাদ ছিল মায়াযুদ্ধে ওস্তাদ। সে ইন্দ্রকেও এই মায়াযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল বলে তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'ইন্দ্রজিৎ'। এবার মেঘনাদ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল। মেঘের আড়াল থেকে সে এমন একটা বাণ ছুঁড়ল যে, তার আঘাতে লক্ষ্মণ নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাই দেখে হনুমান ছুটল গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীর সন্ধানে। কিন্তু খুঁজে না পেয়ে গোটা পাহাড়টাকেই উপড়ে তুলে নিয়ে এল। তারপর তা থেকে বিশল্যকরণী বার করে লক্ষ্মণকে ছোঁয়াতেই তিনি আবার চোখ মেলে তাকিয়ে অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন। হনুমানও গন্ধমাদনকে আবার যথাস্থানে রেখে এল। এরপর মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যখন যজ্ঞ করতে ঢুকেছিল, বিভীষণ তখন গোপনে লক্ষ্মণকে সেখানে এনে বলল—মেঘনাদকে যদি যজ্ঞ শেষ করে এখান থেকে বের হতে দাও, তাহলে যুদ্ধজয়ের আর কোন আশাই থাকবে না। তাই শুনে লক্ষ্মণ সেই যজ্ঞাগারেই মেঘনাদকে বধ করলেন।

ছেলেকে এভাবে রাম-লক্ষ্মণ মেরেছেন শুনে রাবণ শোকে যেমন অধীর হল, তেমনি মাথায় তার খুন চেপে গেল। ঠিক করল অশোকবনে গিয়ে সেও এমনিভাবে সীতাকে বধ করবে। কিন্তু রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী বাধা দিল। দশানন এবার নিজে বিশ হাতে নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রথে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রে এল। রথারোহণে রাবণের সঙ্গে নীচে থেকে এঁটে ওঠা কঠিন। তাই দেবরাজ ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সারথি মাতলিকে দিয়ে নিজের রথ রামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র সেই রথে চড়ে রাবণের সঙ্গে ঘোর লড়াই শুরু

করে দিলেন। রাম এক এক বাণে রাক্ষসরাজের রথ, ধ্বজা, ঘোড়া, সারথি, ধনুক-বাণ কেটে যখন এক এক করে মাথা কেটে ফেলতে লাগলেন তখন দেখলেন, কাটা জায়গায় রাবণের আবার নতুন মাথা গজিয়ে উঠছে। রামচন্দ্র তখন আর কোন উপায় না দেখে মোক্ষম ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে রাবণের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিতেই মৃতদেহ নিয়ে রাবণ লুটিয়ে পড়ল।

রাম-রাবণের দশদিনের ঘোর সংগ্রাম শেষ হল। রাক্ষস রাবণ সবংশে নিহত হল। জানকীকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়ে রাবণেরই পুষ্পক রথে চেপে অযোধ্যামুখী হলেন। কেননা, রাবণের মৃত্যুর দিনই তাঁর চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসকাল শেষ হল।

পুষ্পক রথে জানকীকে নিয়ে ফেরার পথে রামচন্দ্র ভরদ্বাজ আশ্রমে এসে মুনিবরকে প্রণাম করে আবার রথারোহণে নন্দীগ্রামে এলেন। সেখানে ভরতের সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন। তারপর মহানন্দে অযোধ্যায় এসে প্রথমে বশিষ্ঠদেব, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সুমিত্রাকে প্রণাম করে তাঁদের অনুমতি নিয়ে রাজসিংহাসনে বসলেন। অযোধ্যায় আনন্দের হাট বসল। পৃথিবীর তাবৎ প্রজা রামচন্দ্রের আপনজন হয়ে গেল। ধনে-শস্যে-সম্পদে রামরাজ্য ঝলমল করে উঠল। পৃথিবী থেকে অকালমৃত্যু পর্যন্ত চলে গেল। চোর-ডাকাতরা কোথায় যে আত্মগোপন করল, কেউ তার হদিসও পেল না।

□ উত্তরাকাণ্ড

রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছেন শুনে অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা রাজসভায় এসে রামচন্দ্রের প্রশংসা করে চলে গেলেন। নির্ঝঞ্ঝাটেই রাজকাজ চলছিল। এমন সময় খবর এল, লবণ নামে এক অসুর খুব উৎপাত আরম্ভ করেছে। রামের আদেশে শত্রুঘ্ন সেখানে গিয়ে সেই অসুরকে বধ করে মথুরা নগরী স্থাপন করে এলেন। তারপরেই এল আর এক খবর—সিন্ধু নদের তীরে, শৈলুষ নামে এক গন্ধর্ব তার তিন কোটি অনুচর নিয়ে বিদ্রোহ করেছে। ভরত দাদার আদেশে সেখানে গেলেন। তাদের সকলকে খতম করে তাঁর দুই ছেলে তক্ষ আর পুষ্করকে রেখে এলেন শান্তি রক্ষার জন্য। তাঁদেরই নাম অনুসারে সেখানে দুটো প্রদেশ গড়ে উঠল—তক্ষশিলা আর পুষ্করাবতী।

দুষ্টের দমন তো হল, কিন্তু রাজ্য মধ্যে হঠাৎ সীতাকে নিয়ে কানাকানি শুরু হল। অপবাদের ভয়ে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দিয়ে সীতাকে দূর বনে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে রেখে এলেন। প্রজাদের কানাকানি বন্ধ হল। নির্বিবাদে আবার রাজত্ব চলতে থাকল।

ওদিকে মুনির আশ্রমে সীতার দুটি ছেলে হল—কুশ আর লব। মুনিবর রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী অবলম্বনে নিজের রচিত রামায়ণ গান তাদের শিখিয়েছিলেন। তারাও যেখানে সেখানে সুমধুর স্বরে সেই গান গেয়ে বেড়াত।

ইতিমধ্যে রাম-রাজত্বের দশ হাজার দশ-শ বছর পেরিয়ে গেছে।

রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে তাদের পরিচয় পেয়ে দুই ছেলেকে সাদরে বুকে টেনে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসালেন।

যে উদ্দেশ্যে শ্রীহরি দশরথের ঘরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর



ভক্তদের নিয়ে, সে কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার যোগবলে দেহত্যাগ করে তিনি তাঁর আপন স্থানে চলে গেলেন। সেই সঙ্গে অনেকেই বিদায় নিলেন।

আমাদের মনু মহারাজের আমলে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল।



কৌরব-পাণ্ডব

যদুর বংশধররা হল যাদব। যাদবদের মধ্যে বসুদেবই খুব নিষ্ঠাবান এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁর ছিল দুই স্ত্রী—দেবকী আর রোহিণী।

দ্বাপর যুগে পৃথিবীতে অসুর শক্তি আর আসুরিক বুদ্ধি নিয়ে রাজারা সব শান্তি নষ্ট করে দিয়েছিল। ধর্ম লোপ পেতে বসেছিল। পৃথিবী এসব অসুররাজদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছিল না। তখন যাদব বংশের এই বসুদেবের ঘরেই স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। নিজে এসেছিলেন দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ রূপে। আর, তার আগে দেবকীর সপ্তম গর্ভে পাঠিয়েছিলেন নিজের আর এক অংশ।

দেবকীর সঙ্গে যখন বসুদেবের বিয়ে হয়েছিল, তখনই কংসের প্রতি দৈববাণী হয়েছিল যে তাঁর ভাগ্নের হাতেই, বিশেষ করে দেবকীর অষ্টম গর্ভের ছেলের হাতেই, তাকে মরতে হবে। তাই কংস দেবকীকে মথুরাতেই নজরবন্দী করে রেখেছিল, আর বসুদেবকেও

মথুরায় থেকে যেতে হয়েছিল। দেবকীর একটা করে ছেলে হতো, আর কংস তাকে মেরে ফেলত। তাই সপ্তম গর্ভে যখন নারায়ণের অংশ এল, ওদিকে গোকুলে বসুদেবের বন্ধু নন্দর স্ত্রী যশোদাও সন্তানসম্ভবা হলেন। কংস দেবকীর সপ্তম সন্তানকেও পাছে মেরে বসে তাই ভগবান বিষ্ণু যোগমায়াকে দিয়ে যশোদার গর্ভের সন্তানটিকে রোহিণীর গর্ভে রেখে এলেন। সবাই জানল, অকালে দেবকীর এই ছেলেটি নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু তিনি রোহিণীর গর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাই তার নাম হল 'রৌহিণেয়'। আবার অসাধারণ বলশালী বলে, হলেন বলরাম। রোহিণীর সেবাযত্নেই তিনি সেখানে বড় হতে থাকলেন।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্বয়ং নারায়ণ 'কৃষ্ণ' নাম নিয়ে দুরন্ত এক ঝড়জলের রাতে আবির্ভূত হলেন। বসুদেব ভগবানের আগে থেকে দেওয়া নির্দেশমত সেই রাতেই সকলের অজ্ঞাতে তাঁকে যশোদার পাশে রেখে এলেন। ঠিক সেই সময় যশোদারও একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়েটিকে এনে দেবকীর পাশে শুইয়ে দিলেন।

কংসের প্রহরীরা সজাগই ছিল। কিছুক্ষণের জন্য ঝিমিয়ে পড়েছিল মাত্র। তারই মধ্যে এই ঘটনা ঘটে গেল।

ছোট্ট মেয়েটি কেঁদে উঠতেই তা প্রহরীদের কানে গেল। কংস খবর পেতেই এসে মেয়েটাকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে যেই পাথরে আছাড় মারল অমনি সেই মেয়েটি শূন্যে মিলিয়ে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'আমাকে মেরে তোমার কোন লাভ হবে না। তোমাকে যে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে।' শুনে তো কংসের মাথা ঘুরে গেল। গোকুলে যত শিশু আছে, খুঁজে খুঁজে তাদের মারার জন্য তার অনুচরদের দিয়ে শিশুহত্যার মহাযজ্ঞ লাগিয়ে দিল।

(কৃষ্ণ দাদা বলরামকে নিয়ে কিভাবে কংসের সব চক্রান্ত নষ্ট করেছিলেন তার পাঠানো রাক্ষস-রাক্ষসীদের মেরে, তারপর মথুরায় গিয়ে কিভাবে তাঁদের অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে কংসকে নিধন করে তাঁর বাবা উগ্রসেনকে আবার মথুরার সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, কিভাবে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধকে জব্দ করেছিলেন, সেসব কাহিনী বিষ্ণুপুরাণ আর ভাগবত খণ্ডের মধ্যে বিশদভাবে দেওয়া আছে বলে আর এখানে তার উল্লেখ করা হল না।)

বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী—অম্বিকা আর অম্বালিকা। দুজনেই কাশীরাজের মেয়ে। দাদা ভীষ্ম স্বয়ংবর সভায় সমবেত ক্ষত্রিয় বীরদের যুদ্ধে হারিয়ে দুই বোনকে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে আদৌ বিয়ে করলেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল, তিনি জীবনে বিয়ে করবেন না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিয়ের কিছুকাল পরেই বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মারোগে মারা গেলেন। তখন ভীষ্মের মা সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব দুজনকে দুটি ছেলে উপহার দিলেন। অম্বিকাকে ধৃতরাষ্ট্র, আর অম্বালিকাকে পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তবুও গান্ধারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। পাণ্ডু দুটো বিয়ে করেছিলেন—একজনের নাম কুন্তী, আর একমা মাদ্রী। গান্ধারীর ছিল দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি একশ ছেলে। আর কুন্তীর বিয়ের পর হয়েছিল তিনটে ছেলে—যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুন। বিয়ের আগে সূর্যের ঔরসে একটা ছেলে হয়েছিল। তার নাম কর্ণ। জন্মাবার পরই কুন্তী কর্ণকে ত্যাগ করেছিলেন। তিনি থাকতেন দুর্যোধনের আশ্রয়ে। মাদ্রীর গর্ভে হয়েছিল যমজ ছেলে : নকুল আর সহদেব। পাণ্ডু অকালে মারা গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র গোটা হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে রাজকাজ করতেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা 'কৌরব' নামে পরিচিত হয়েছিল, আর পাণ্ডুর ছেলেরা 'পাণ্ডব'।

হস্তিনাপুরের সিংহাসনে নিয়ে জ্ঞাতি-বিরোধ শুরু হল।

কৌরবরা ছিল দারুণ খল, পাণ্ডবরা ঠিক উলটো। কৌরবরা বীর, যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ ছিল ঠিকই কিন্তু দারুণ স্বার্থপর আর কুটিল ছিল। অপরদিকে পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই শৌর্যে-বীর্যে অতুলনীয় তো ছিলেনই, মনে কোন প্যাঁচ ছিল না, স্বভাবও মিষ্টি ছিল। কারো ওপর কখনো কোন ঈর্ষা পোষণ করতেন না।



ভগবান অবতাররূপে যাঁদের নিয়ে কাজ করবেন, তাঁদের স্বভাব তো এরকমই হবে।

পাণ্ডবদের একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে নিশ্চিন্তে বসা তো সম্ভব নয়। তাই দুর্যোধন বারণাবতে জতু (গালা) দিয়ে সুন্দর এক প্রাসাদ তৈরি করিয়ে কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডবদের সেখানে থাকার জন্য পাঠাল। ওঁরা গেলে, দুর্যোধন গোপনে সেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। পাণ্ডবরা কোনরকমে মাকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে একচক্রা গ্রামে এলেন। আত্মপরিচয় গোপন করে সাধারণ মুনির বেশে থাকতে থাকতে একদিন বক রাক্ষসকে কৌশলে মেরে একচক্রা গ্রামের মানুষদের নিশ্চিন্ত করলেন।

পাঞ্চাল নগরে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মেয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা। শর্ত—তীর দিয়ে নিদারুণ লক্ষ্যভেদ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ। ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে খবরটা শুনেই তাঁরা স্বয়ম্বর সভায় এলেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে মায়ের কাছে নিয়ে আসতেই, মা কুন্তীর আদেশে পাঁচ ভাই-ই

দ্রৌপদীর স্বামী হলেন। এত বড় লক্ষ্যভেদ একমাত্র অর্জুন ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব, তা কি আর কারো জানতে বাকি থাকে। দুর্যোধন ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাণ্ডবদের আনিয়ে রাজ্যের অর্ধেক ভাগ দিল। দিল বটে, তবে সব সময়ই কিভাবে তাঁদের হটানো যায়, সেই ফিকিরে থাকল।

এইসময় ভাল ভাল জিনিস খেতে খেতে অগ্নিদেবের খুব ইচ্ছে হল খাণ্ডব বন খেয়ে মুখ বদলান। তিনি ব্রাহ্মণের বেশে অর্জুনের কাছে প্রার্থনা রাখলেন। বিনিময়ে অর্জুন এই কাজের জন্য অগ্নির কাছ থেকে 'গাণ্ডীব' নামে দিব্য ধনুক, অক্ষয় তূণীর আর একটা দিব্য রথ পেয়েছিলেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে পাণ্ডবদের মামাতো ভাই বটে, কিন্তু সব সময়ই তাঁদের সাহায্য করতেন। তিনি সেই রথের সারথি হলেন। দুজনে মিলে খাণ্ডব বন দাহ করালেন।

অর্ধেক রাজত্বের রাজা হলেও শৌর্যে-বীর্যে-গুণে পাণ্ডবরা অনেকের কাছেই প্রিয় হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণও ইতিমধ্যে কৌশল করে নিজের বোন সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা আরো পাকাপাকি করে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল রাজত্ব করতে না করতেই সব দিক থেকে খুবই সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন যুধিষ্ঠির। ঠিক করলেন, এবার রাজসূয় যজ্ঞ করবেন।

দুর্যোধন এসব দেখে ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে উঠল। দুঃশাসন আর কর্ণের পরামর্শে সে তার মামা শকুনির সঙ্গে পাশা খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাল যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির আমন্ত্রণ ফেলতে পারলেন না। পাশা খেলতে বসলেন পণ রেখে। পাশা খেলায় শকুনি ছিল দারুণ ওস্তাদ। তার মত কূট চাল কেউ দিতে পারত না। পাশার দানে সে যেন ভেল্কি দেখাত। যুধিষ্ঠির দারুণভাবে হেরে গেলেন। শর্ত অনুযায়ী বারো বছরের জন্য বনবাস আর এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাস মেনে নিয়ে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে চলে গেলেন।

যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে অবধি প্রতিদিন অষ্টাশি হাজার ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বারো বছরের বনবাসকালেও তিনি সেই ব্রাহ্মণ-সেবা করাতেন। বারো বছর পূর্ণ হওয়ার পর এক বছরের অজ্ঞাতবাস। শর্ত ছিল, এই একটা বছর তাঁদের এমনভাবে থাকতে হবে, যাতে কেউ তাঁদের সন্ধান না পায়। যদি তার মধ্যে ধরা পড়ে যান, তাহলে আবার বারো বছরের বনবাস, এক বছরের অজ্ঞাতবাস।

এই সময় যুধিষ্ঠিররা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে নিয়ে একেবারে পরিচয় ও আচার-আচরণ বদলে বিরাটরাজার প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির হলেন কঙ্ক নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভীম হলেন ভাল সুপকার (রাঁধুনী)। অর্জুন নপুংসকের বেশ ধরে নাম নিলেন বৃহন্নলা। নকুল আর সহদেবও ছদ্মনামে রাজার অশ্বশালার হস্তিশালার রক্ষক হলেন। দ্রৌপদী দাসীর রূপ ধরে অন্তঃপুরে ঢুকলেন। সেখানে তার নাম হল সৈরিন্ধ্রী। বিরাটরাজ সকলকেই কাজ দিয়ে রাখলেন। দুর্যোধনরা চরের পর চর সব জায়গায় পাঠিয়েও পাণ্ডবদের সন্ধান পেল না। এই সময়ে কীচক একবার দ্রৌপদীকে অপমান করার চেষ্টা করেছিল। মহাশক্তিশালী আর মহাদুর্বৃত্ত সে। সকলেই তাকে ভয় করে চলত। বৃহন্নলা-বেশী অর্জুন রাতের অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে গিয়ে তাকে বধ করে এলেন। কীচক মারা গেছে সবাই জানল বটে, কিন্তু অমন দুর্বৃত্তকে কে বধ করল, তা কেউ জানতে পারল না।

এভাবে থাকতে থাকতে যখন বছর প্রায় ফুরিয়ে আসছে, অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়ে আসছে, সেই সময় এক ঘটনা ঘটল।

বিরাটরাজার বিশাল এক গোশালা ছিল। গোধনে তাঁর মত সমৃদ্ধ কেউ ছিলেন না। কৌরবরা সেই গোধন চুরি করতে এলে বিরাটরাজ মহাচিন্তায় পড়লেন। তখন বৃহন্নলা-রূপী ধনঞ্জয় তাদের প্রতিরোধ করলেন। আর এমনভাবে যুদ্ধ করে কৌরবদের সেই বিশাল বাহিনীকে হটিয়ে দিলেন যে, বিরাটরাজ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। যুদ্ধকৌশল দেখে কৌরবরা বুঝতে পারল, এই বৃহন্নলা অর্জুন ছাড়া আর কেউ নন। কিন্তু তখন এক বছরের অজ্ঞাতবাসের কাল শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের আর করার কিছু ছিল না। বিরাটরাজ এবং তাঁদের আসল পরিচয় জানতে পেরে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর মেয়ে উত্তরার সঙ্গে অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর বিয়ে দিয়ে শুধু আত্মীয়তাই করলেন না, যুধিষ্ঠির যাতে নিজ রাজ্য ফিরে পান তার জন্য সব রকম সাহায্য দিতেও এগিয়ে এলেন।

সেখান থেকেই কৃষ্ণ এলেন দুর্যোধনের রাজসভায়, যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে। দাবি—দুর্যোধন হয় তাঁর অর্ধেক রাজত্ব যুধিষ্ঠিরকে ফিরিয়ে দিন, নয়তো পাঁচ ভাইয়ের থাকার মত পাঁচখানা গ্রাম দিন।

দুর্বিনীত দুর্যোধন সাফ জানিয়ে দিল যে, বিনা যুদ্ধে সে ওদের এক সূচাগ্র মাটিও দেবে না।

কৃষ্ণ সেই সংবাদ নিয়েই ফিরে এলেন। যুদ্ধ অনিবার্য। যুধিষ্ঠির সাত অক্ষৌহিণী সেনা যোগাড় করলেন। খবর এল দুর্যোধনের পক্ষে সমবেত হয়েছে এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য।

কুরুক্ষেত্র।

একদিকে কৌরব সেনাদের শিবির। আর একদিকে পাণ্ডব সেনাদের। অগণিত সৈন্যের কোলাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল।

অর্জুনের মনে যুদ্ধের আগেই ইচ্ছে জাগল, যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তাঁদের একবার দেখার। ধনঞ্জয়ের রথের সারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে রথে নিয়ে শিবির থেকে কিছুটা এগিয়ে এসে রথ থামালেন। অর্জুন দেখলেন কৌরবপক্ষে তাঁর ঠাকুর্দা ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি গুরুজনরা। তাঁদের দেখেই অর্জুনের যুদ্ধতৃষ্ণা মন থেকে উবে গেল। কৃষ্ণকে বললেন, রথ ফেরাও কৃষ্ণ! যাঁদের কোলে পিঠে চেপে আমি বড় হয়েছি, যাঁদের কাছ থেকে আমি শিক্ষালাভ করেছি, যাঁরা সব সময়েই আমার প্রণামের যোগ্য, তাঁদের গায়ে আমি অস্ত্রাঘাত করতে পারব না। রাজ্য চাই না, রাজত্ব চাই না। এত নির্মম নিষ্ঠুর হতে পারব না। কৃষ্ণ শুনে প্রথমে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন পার্থকে, 'ছি...ছি... তুমি না ক্ষত্রিয় বীর? এই কি তার যোগ্য কথা? ওরা শত্রু। শত্রুর প্রতি আবার মমতা কি? তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ক্ষত্রিয় বীর যুদ্ধ না করে পিছু হটবে! লজ্জা করে না?' তারপর আস্তে আস্তে অর্জুনকে বুঝিয়ে দিলেন, 'ওরা তোমার গুরুজন হলেও মানুষ। মানুষ কখনো অমর হয় না। একসময় তাকে মরতেই হবে। এই যুদ্ধ তার উপলক্ষ মাত্র। তাছাড়া তুমি ভাবছ কি করে যে, তুমি ওদের মারবে। আমি ওদের আগে থেকেই মেরে রেখেছি। তুমি শুধু লোক দেখানো অস্ত্র ছুঁড়ে যুদ্ধ করবে। সুতরাং ওসব দুর্বলতা ছেড়ে মনকে তৈরি করে যুদ্ধে লেগে পড়।'

কৃষ্ণ যে কে, অর্জুন তা বিলক্ষণ জানতেন। সুতরাং অর্জুনের মন থেকে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। ক্ষত্রিয়ের কেশর ফুলে উঠল।

চারদিক থেকে তূরী-ভেরি বেজে উঠল। রথের চাকার শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল। বিকট শব্দে রণবাদ্য বেজে উঠল।

দুর্যোধনের সেনাপতি হয়ে এগিয়ে এলেন দুর্দম বীর ভীষ্ম। যুদ্ধে বরাবরই তিনি অজেয় ছিলেন।

কৃষ্ণ সুচতুর রণ-কুশলী ছিলেন, সেই সঙ্গে প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর তাঁর জানা ছিল। তাই যে যেমন, তাঁর সঙ্গে সেভাবেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিতেন তিনি। আর পাণ্ডবরা তা নির্বিচারে মেনে চলতেন। কিন্তু দাদা হলধর বলরাম ঠিক উলটো। যেমনি হলযুদ্ধে, তেমনি গদাযুদ্ধে। কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার কারো পরোয়া না করে নিজেই তার প্রতিকার করে আসতেন। আবার কৃষ্ণকেও নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

কৃষ্ণ জানতেন, ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখলেই অস্ত্র ত্যাগ করবেন। তাই ভীষ্ম যখন অর্জুনকে আক্রমণ করলেন কৃষ্ণ রথে সামনে শিখণ্ডীকে রেখে, তার পিছনে রাখলেন অর্জুনকে। শিখণ্ডীকে দেখেই ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করলেন আর কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন বাণে বাণে তাঁকে ছেয়ে ফেললেন। ন-দিন ধরে ভীষ্ম যে সংগ্রাম করেছিলেন, তাতে কৌরবপক্ষের চেয়ে পাণ্ডবপক্ষের ক্ষতিই বেশি হয়েছিল। ঠিক দশদিনের দিন ভীষ্মের রণ কৃষ্ণের চাতুরিতে শেষ হল। ভীষ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু। তাই শরশয্যায় থেকে উত্তরায়ণে তিনি দেহত্যাগ করলেন। তার আগে পর্যন্ত মনে মনে কৃষ্ণেরই ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

ভীষ্মের পতন অস্বাভাবিক, অসম্ভব—দুর্যোধন তা বিলক্ষণ জানত। তাই ভীষ্ম মারা গেলে সে যত শোক পেয়েছিল, তার রাগও তত বেড়ে উঠেছিল। প্রিয়তম ঠাকুর্দা ভীষ্মের পতনে পাণ্ডবরাও কম মর্মাহত হন নি। তিনি যেমন অস্ত্রে ভীষণ, তেমনি জ্ঞানে সাগর ছিলেন। তাই কৃষ্ণের নির্দেশেই তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে পাণ্ডবেরা গিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে এসেছিলেন। আত্মীয় বিয়োগে ব্যথা তো আসবেই কিন্তু পাণ্ডবদের মন, বিশেষ করে অর্জুনের মন—কৃষ্ণ এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, পাণ্ডবরা কেউ কাতর হয়ে পড়লেন না।

দুর্যোধন এরপর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে সেনাপতি করে পাণ্ডব নিধনে পাঠালেন। পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতি হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। যেমন ভীষ্ম, তেমনি দ্রোণ। অপূর্ব তাঁর রণকৌশল। চারদিন ধরে শুধু রাতটুকু বাদে সমানে লড়াই চলল দু-পক্ষের। দ্বিতীয় যমের মত দ্রোণাচার্য বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি পাণ্ডবদের বেশ কিছু মহারথীকে গ্রাস করলেন। পরাক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নও কম নন। কৌরবপক্ষের অনেক বীরকেই তাঁর হাতে নিহত হতে হল। অদ্বিতীয় রণকুশলী দ্রোণ প্রতিদিনই নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে পাণ্ডব সেনাদের নিধন করে চললেন। পাণ্ডবরা বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবশিবির থেকে হঠাৎ এক রব উঠল, দ্রোণাচার্যের ছেলে বীর অশ্বত্থামা নিহত হয়েছে। বিশ্বাসের অযোগ্য। দ্রোণাচার্য জানতেন, যুধিষ্ঠির কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। যুধিষ্ঠির নিজে এসে যদি এই কথা তাঁকে জানান, তবেই তিনি বিশ্বাস করবেন। কিন্তু এ তো মিথ্যা। কেমন করে এ কথা যুধিষ্ঠির তাঁকে বলবেন? কৃষ্ণ জানতেন, ছেলে অশ্বত্থামার প্রতি দ্রোণাচার্যের স্নেহ ছিল অপরিসীম। সেখানে আঘাত হানতে না পারলে দ্রোণকে ঠেকানো পাণ্ডবদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাই সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—এরকম একটা পথ তিনি নিলেন। অশ্বত্থামা নামে একটা হাতি যুদ্ধে মারা



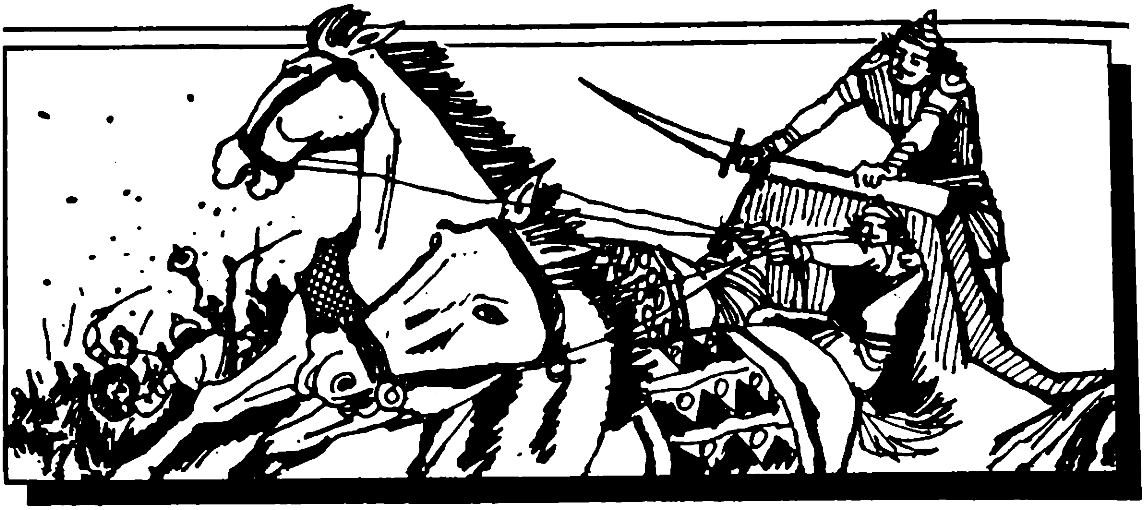
গিয়েছিল। যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্যের কাছে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সেইমত দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে বললেন, 'অশ্বত্থামা হতঃ, ইতি গজঃ।' কিন্তু শেষ দুটি কথা এত আস্তে বললেন যে, দ্রোণাচার্যের কানেই গেল না। যুধিষ্ঠিরের সত্য কথাই বলা হল, অপরদিকে দ্রোণাচার্য ভেঙে পড়লেন। সেই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে নিহত করলেন। দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ পাঁচদিনেই শেষ হয়ে গেল।

এরপর দুর্যোধন কর্ণকেই সেনাপতি করে পাঠালেন। পাণ্ডবপক্ষ থেকে অর্জুন সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলেন। মাত্র দু-দিন। দু-পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়ে গেল। ধনুর্বিদ্যায় কেউই কম যান না। অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব আর অক্ষয় তূণীর থাকলে কি হবে, কর্ণকে সামনা-সামনি জয় করা অসম্ভব ছিল। এখানেও কৃষ্ণ সুকৌশলে অর্জুনকে দিয়ে কর্ণকে বধ করালেন।

এদিকে অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের দ্রোণ-বধের শঠতায় মহাক্রোধে ফুঁসে উঠল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল তার মাথায়। যুদ্ধের শেষে রাতে পাণ্ডবশিবিরে যখন সবাই ঘুমোচ্ছিলেন, অশ্বত্থামা সেই অবকাশে এসে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর সব কটা ঘুমন্ত ছেলেকে মেরে সরে পড়ল। অর্জুন তা জানতে পেরে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে, দিনের সূর্য অস্ত যাবার আগেই অশ্বত্থামাকে তিনি যদি মারতে না পারেন, তবে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। দুর্যোধন তা জানতে পেরে সুবিশাল এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে তার মাঝখানে অশ্বত্থামাকে আটকে রাখলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা, সকাল হতেই অর্জুনের শরবর্ষণ শুরু হল। সারথি কৃষ্ণ। অসম্ভব সেই ব্যূহ ভেদ করে অশ্বত্থামাকে মারা। দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কৃষ্ণ অস্বাভাবিক এক চাতুরি খেললেন। সন্ধ্যা নেমে এসেছে মনে করে অশ্বত্থামা যেই ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এল অমনি সূর্যের আলোয় আবার দিন হয়ে গেল, আর অর্জুনের বাণে অশ্বত্থামা নিহত হল।

শল্য একবেলার যুদ্ধেই যুধিষ্ঠিরের হাতে প্রাণ দিলেন।

কৌরবসেনা প্রায় শেষ। রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র প্রায়



শ্মশানভূমি। যুদ্ধের জন্য আছে তখন একমাত্র দুর্যোধন। গদাযুদ্ধে দুর্যোধন দুর্ধর্ষ, যেমন দুর্ধর্ষ পাণ্ডবদের মধ্যে ভীম। দুর্যোধন গদাযুদ্ধের কূটকৌশল শিখেছিলেন বলরামের কাছ থেকে।

যাই হোক, দুই ভীমকায় বীর গদা হাতে তর্জন গর্জনে কুরুক্ষেত্র কাঁপিয়ে তুলল। গদায় গদায় ঠোকাঠুকিতে আগুনের ঝলক উঠল। দুর্যোধনের প্রহারে প্রহারে অমন বলশালী ভীমও মাঝে মাঝে কাতর হয়ে পড়েন। সেই দ্বৈরথ সমর কৃষ্ণ দূর থেকে দেখেন। ভীমের প্রচণ্ড প্রহার দুর্যোধন হেলায় উড়িয়ে দেয়। একমাত্র কৃষ্ণই জানতেন কিভাবে দুর্যোধন কাৎ হবে। ঠিক সময়টি যখন এল, কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীমের ভীমগদা দুর্যোধনের উরুতে গিয়ে দুরন্ত আঘাত হানল। উরু ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, দুর্যোধন বিশাল দেহ নিয়ে ভাঙা কলাগাছের মত রণক্ষেত্রে পড়ে গেল। দুর্যোধনের ভাইয়েদের সঙ্গে বাকি সেনারাও প্রাণ হারাল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হল। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দিয়ে অনাচারী, অত্যাচারী, অধার্মিক ক্ষত্রিয় রাজাদের বিনাশ করে পৃথিবীর জ্বালাকে শান্ত করলেন। কৌরবপক্ষে শুধু বেঁচে রইলেন কৃপ আর কৃতবর্মা। পাণ্ডবপক্ষের পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি আর কৃষ্ণ। এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু বলরাম একেবারে নিস্পৃহ হয়ে ছিলেন।

ধার্মিক যুধিষ্ঠির রাজা হয়ে পৃথিবীতে আবার ধর্মের অনুশাসন চালু করলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিয়তিকে মেনে নিয়ে গান্ধারী আর কুন্তীর সঙ্গে বন থেকে বনে নির্জনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একসময় দেহ রাখলেন। মহামতি বিদুর তাঁদের সৎকার করলেন।

কাজ শেষ। দ্বারকায় ফিরে এলেন কৃষ্ণ। যদুবংশে ডাল-পালা-লতায়-পাতায় সুবিশাল হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বাড়লে যা হয়, যাদবদের মধ্যে তা জাঁকিয়ে বসেছে। নৈতিকতা হারিয়েছে সবাই। যার যা খুশি তাই করতে শুরু করে দিয়েছে। কৃষ্ণ যাদবকুলকে ধ্বংস করলেন। তারপর প্রভাসতীর্থে গিয়ে সামান্য এক ব্যাধের শরে ইহলীলা সংবরণ করলেন। বলরামও পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। দ্বারকা সমুদ্রের তলায় চলে গেল।

পাণ্ডবরা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন, যখন যুধিষ্ঠির দেখলেন, অপরাজেয় মহাবীর অর্জুন সামান্য এক লড়াই-এ হেরে এলেন। বুদ্ধিমান ধার্মিক যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন, ধনুক, গদা, রথ, শাঁখ সবই আছে, কিন্তু কৃষ্ণ-বলরামের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো নাড়াবার শক্তিও তাঁদের আর নেই। তাই মনস্থ করলেন—আর রাজ-সিংহাসন নয়, রাজ্যশাসন নয়। বিদায় নেবার সময় এসেছে। পরীক্ষিতের ওপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে পাঁচ ভাই মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেলেন।

দ্বাপর যুগ শেষ হল।

গীতার সারকথা

গীতা অর্থাৎ 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বীর অর্জুনের রথের সারথি হয়ে নিজে যে সমস্ত জ্ঞানের কথা বলে অর্জুনের চোখ খুলে দিয়েছিলেন 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' হল সেই জ্ঞানের কথা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়েই সাব্যস্ত হবে রাজ্যের অধিকার। তাই দুই শরিক, দুই দাবিদার—কৌরব আর পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি হয়েছে।

ইন্দ্রের মত শক্তিধর অর্জুনের রথের সারথি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ নিজে। যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের ভালভাবে দেখার খুব ইচ্ছে অর্জুনের মনে জাগল। শ্রীকৃষ্ণ এমন জায়গায় এনে তাঁর রথ দাঁড় করালেন যে, সেখান থেকে শত্রুপক্ষের সবাইকে দেখা যায়। অর্জুন চারদিকে তাকিয়ে যখন দেখলেন যে আত্মীয়-স্বজন, গুরু-গুরুজন, ভাই-বন্ধু—এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, এঁদের মেরে রাজ্য নিতে হবে, মন তাঁর বিষাদে ভরে গেল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে

বললেন—ধনঞ্জয়, চাই না রাজ্য, চাই না সিংহাসন। ইচ্ছে হলে ওরা আমাদের মেরে সব ভোগ করুক, ওদের আমি মারতে পারব না। আমার সারা শরীর কাঁপছে, গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়ছে। আমি দাঁড়াতে পারছি না। তুমি রথ ফেরাও।

শ্রীকৃষ্ণ শুনে প্রথমে খুবই তিরস্কার করে তাঁর ক্ষত্রিয়ের রক্তকে গরম করে দিতে চাইলেন, মনকে উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করলেন। তিনি জানতেন, অর্জুন মূর্খ নন, যথেষ্ট জ্ঞানী। এই দুর্বলতা সাময়িক। তাই সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য বললেন—তোমার এই বিষাদ কেন অর্জুন? তুমি কি সত্যিই ওদের মারতে পারবে? আত্মাকে কি কেউ কখনো মারতে পারে, না তাকে মারা যায়? আত্মা অজর, অমর। সে কাজের জন্য দেহ ধারণ করে। শরীর গ্রহণ করলেই তার ক্ষয় আছে, তার বিনাশ আছে। কোন কিছু উপলক্ষ করে সে জীর্ণ শরীরকে বিনাশ করে অন্য শরীর ধারণ করে। পরতে পরতে ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে মানুষ আবার যেমন নতুন কাপড়-জামা পরে। তোমার এই বিষাদ তো মনের বিভ্রান্তি। চোখ-কান-নাক-মুখের সঙ্গে মন কি এক? দেখে-শুনেও যারা মনকে চঞ্চল হতে দেয় না, তারাই তো জ্ঞানী। আর যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে, তাহলে অভিলাষ থেকে রাগ আসে, রাগ থেকে মোহ, মোহ এলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, স্মৃতিশক্তি গেলে বুদ্ধিও যায়। বুদ্ধি গেলে তার আর কিছুই থাকে না, একমাত্র সর্বনাশ ছাড়া। বাসনাই সর্বনাশের মূল। বাসনাকে কামনাকে ত্যাগ করতে যে পারে, সে-ই তো মুক্ত পুরুষ। তারা সব সময় বিবেক নিয়ে চলে। 'আমি', 'আমার' যারা করে, তারা তো মোহগ্রস্ত। যারা তা করে না তারাই জ্ঞানী, বিবেকবান। পেঁচা দিনকে রাত দেখে, আর রাতকে দিন দেখে। কারণ তার চোখের দোষ। আর মানুষ দিনকে দিন, রাতকে রাতই দেখে। যাদের বিবেক আছে, জ্ঞান আছে, তাদের কাছে জগতের এই সব বিষয়গুলো মূল্যহীন। জ্ঞানী মানুষ থাকবে কাছিমের মত। বাইরের কোন শব্দ পেলেই কাছিম যেমন তার শক্ত খোলার মধ্যে মুখ-পা ঢুকিয়ে নেয়, জ্ঞানী মানুষও ঠিক তাই। কর্মেই তোমার অধিকার। যার যে কাজ, তাকে সে কাজ করে যেতেই হবে।

একটু একটু করে অর্জুনের মন যেন এবার হালকা হতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন—জ্ঞানই যখন সব কিছু দিতে পারে, তখন কর্মের প্রয়োজন কি? তুমি জ্ঞানী-বিবেকী হতে বলছ, আবার কর্মও করতে বলছ। এ দুটির মধ্যে কোনটা শ্রেয়?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ভাল প্রশ্নই রেখেছ পার্থ। দেহ নিয়ে জন্মালে যেমন মরতেই হয়, তেমনি কর্মও করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ-বুদ্ধি থাকবে, তার সঙ্গে রাগ-দ্বেষ এসবও থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে কর্ম করতেই হবে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ কি তাদের কাজ করাবে না? কাজ করতে করতেই জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু কাজের দিকেও নজর রাখতে হবে। কামনা-বাসনা না রেখে, ফলের প্রত্যাশা না রেখে কাজ করবে। সেই কাজ কখনো বেঁধে রাখতে পারবে না। সেইভাবে কাজ করতে গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে পাপকাজও যদি কেউ করে বসে, তাও পদ্মপাতার জলের মত দাগ না রেখেই মুছে যায়। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁদের কাজ করার দরকার পড়ে না। এখনও সেই জ্ঞান যাদের আসে নি, তাদের নিজ নিজ কাজ করে যেতেই হবে। আর তা করতে হবে কোন আকাঙ্ক্ষা না রেখে। গনগনে আগুন যদি ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়, তাতে কি আগুনের উদ্দেশ্য মেটে? আয়নায় যদি ময়লা পড়ে তবে কি নিজের মুখ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়? কামনা হল ঐ ধোঁয়া আর ময়লা, বিবেকবুদ্ধিকে ঢেকে রাখে। মন থেকে ঐ ধোঁয়া, ময়লা সরিয়ে রেখে পার্থ, তোমার কর্তব্য কর্ম তুমি কর। তাহলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করবে। "আত্মা নিষ্ক্রিয়, আমিই সেই উদাসীন আত্মা"—এই জ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান। কর্মযোগ আর সমাধিযোগে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞান যার হয়েছে, তাকে কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না। ঈশ্বরের আরাধনাই হল যোগ। কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণই হল নিষ্কাম কর্ম। শোন পার্থ, আমিই সে ঈশ্বর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, পুরুষোত্তম। ধর্মের আগুন যখন ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলে, অধর্মের কালো প্রেত যখন উল্লাসে নাচতে শুরু করে, তখনই 'আমি' আবির্ভূত হই। অধর্মকে বিনাশ করি, ধর্মকে রক্ষা করি। তুমি আমার উপর নির্ভর করে তোমার কাজ কর। মন থেকে সব সংশয় দূর কর।

খুব কাছ থেকে সর্বশক্তিমানকে কি চেনা যায়? না, তাঁকে ঠিক বুঝতে পারা যায়? অর্জুনের সব সময়ের সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ। তাই স্বাভাবিকভাবেই অর্জুন আচ্ছন্ন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের কথার পিঠে অনেক প্রশ্ন অর্জুনের মনে জাগে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন রেখেও চলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্য, আত্মজ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য উত্তরও দিয়ে যান।

পার্থ, এই বিশ্বজগৎ আমারই মায়ায় আচ্ছন্ন। আমার মায়া থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। চার রকমের মানুষ আমার ভজনা করে : আর্ত (নানাভাবে যারা কষ্ট পাচ্ছে), জিজ্ঞাসু (যারা জানতে চায়), অর্থার্থী (যারা অর্থ লাভ করতে চায়) আর জ্ঞানী। এদের সকলের মধ্যে জ্ঞানীই আমার প্রিয়। জ্ঞানের সঙ্গেই আমি এক। যারা যোগী, তারাই জ্ঞানী। যারা যোগী, তাদের কাছে আপন-পর বলে কিছু নেই। মানুষ তো দূরের কথা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবকিছুর মধ্যেই তারা আমাকে দেখে। তাদের চোখে সবাই সমান, সবাই এক। তারা হল সমদর্শী। আমিই নানারূপে, নানা-দেহে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছি। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে স্তম্ব (ঘাসের গুচ্ছ) পর্যন্ত সবই আমার বিভূতি। আমার এক এক রূপ। আমিই সূর্য, আমিই জল। আমিই দেবতাদের অমৃত, মর্ত্যজীবের মৃত্যু। আমি স্রষ্টা, আমিই সৃষ্টি। আমার এই পরিচয় একমাত্র জিতেন্দ্রিয় মহাত্মারাই জানতে পারে। যাদের জ্ঞানচোখ নেই, তারা তা বুঝতে পারে না। পার্থ, আমি জানি তোমার চোখ আছে। সাময়িক সংশয়, তোমাকে আচ্ছন্ন করেছে। তাই সেই সংশয়কে দূর করার জন্য, আমি কে তা দেখ।—এই বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া দিব্যচোখ দিয়ে তিনি দেখলেন, হাতে মাপা যায় এমন একটি মানুষ, নাম যাঁর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি, এসেছেন অর্জুনের রথের সারথি হয়ে তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে—তাঁর মধ্যে অর্জুন যা দেখলেন, তাতে রীতিমত হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল। অর্জুন দেখলেন, তাঁর মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব-চরাচরের যাবতীয় জীব দেখলেন। দেখলেন হাজার সূর্যের তেজ। এমন কি, যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি এসে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে দেখে বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন, দেখলেন সেই কুরুক্ষেত্রে তাঁরা মরে পড়ে আছেন। অর্জুন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ এরপর তাঁকে তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি

দেখিয়ে আবার স্বাভাবিক হলেন। বললেন—অর্জুন, যাঁদের মারতে তুমি এত দ্বিধা করছ, দেখলে তো, তাঁরা আগে থেকেই মরে আছে। মহাকাল তাদের গ্রাস করেই রেখেছে। তুমি শুধু লোক-দেখানো যুদ্ধ করবে মাত্র আমার নির্দেশে। অনন্য ভক্তি না থাকলে আমার এই রূপ কেউ দেখতে পায় না। সেই হল ভক্তিমান, যার শত্রু-মিত্র, শীত-গরম, সুখ-দুঃখে সমান বোধ; প্রিয়জন মারা গেলে যে শোক করে না, আবার কোন কিছু পেলে আনন্দে উথলে উঠে না, যে ধীর-স্থির-সমদর্শী সে-ই ভক্ত, সে-ই প্রিয়।

প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়েই এই বিশ্ব-চরাচর। যারা এর মায়ায় পড়ে তাদের বারবার ভাল-খারাপ নানাভাবে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু পুরুষকে যে ব্রহ্মভাবে জ্ঞান করে আর প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলে বুঝতে পারে, সে যেভাবেই থাকুক না কেন, তাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনগুণও কাজ করে। গুণাতীত ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানী। যিনি



গুণাতীত, তাঁর কাছে মান-অপমান দু-ই সমান। সর্বত্রই তিনি নারায়ণকে দেখেন, আর নিজের দেহ-ধারণের উপযোগী কাজ করেন। তাঁরা আমাকেই পুরুষোত্তম রূপে জানেন।

এই জগতে দুই স্বভাবের মানুষ আছে : দেবস্বভাব আর অসুর-স্বভাব। তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, কাম-ক্রোধ-লোভহীন, অপরের দোষ যারা দেখে না, ধৈর্যশীল, নিষ্ঠাপরায়ণ, শাস্ত্রের অনুশীলন যারা করে, তারাই দেবস্বভাব। পার্থ, তোমার মধ্যে সেই দেবস্বভাব রয়েছে। আর যারা অসুর স্বভাবের, তারা কখনো অপরের মঙ্গল চায় না, সব সময় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, নিজের ধন-জন-সম্পদ নিয়ে গর্ব করে, দর্পে তাদের মাটিতে পা পড়ে না, সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, শাস্ত্র বা ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা তারা মানে না। বিবেক বলে কোন বস্তুই তাদের নেই। কিন্তু নিজে সুখে থাকবে, তারই চিন্তা করে, তার জন্য কাজ করে। এদের জন্ম পৃথিবীকে লুট করার জন্য, তাকে ধ্বংস করার জন্য। মানুষ জন্মায় তার পূর্বজন্মের কর্মফল নিয়ে। কাম-ক্রোধ-লোভ—এই তিনটি হল নরকের দ্বার। একমাত্র শাস্ত্রধর্ম আচরণ করলেই এ থেকে মুক্তি মেলে।

গুণ আর কর্ম অনুসারে আমার এই সৃষ্টিতে চার বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) আর চার আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস) রয়েছে। যথাযথভাবে অনুসরণ করে, কর্মফলের কোন আকাঙ্ক্ষা না রেখে, যে কাজ করে যায়, সে সবদিক থেকেই মুক্তি পায়। মোক্ষলাভ তারই হয়।

অর্জুন, তুমি আমার প্রিয়, তাই তোমায় বলি : 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।'—সব সংশয় মন থেকে সরিয়ে তুমি আমার শরণাগত হও। নিশ্চিন্ত থাক, যদি তোমার এই নির্লিপ্ত কাজের মধ্যেও কোন পাপ আসে, তার থেকে আমি (পুরুষোত্তম) তোমায় মুক্ত করব।

এরপর...?

অর্জুন এতদিন যাঁর সঙ্গে কেবলমাত্র বন্ধুর মত আচরণ করে এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান লাভ করে বুঝতে পারলেন, তাঁর বন্ধু কি অসাধারণ! অর্জুনের মন থেকে সব সংশয়, সব মোহ দূর হয়ে গেল। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে অর্জুনের পাঞ্চজন্য বেজে উঠেছিল, গাণ্ডীব টঙ্কার তুলেছিল। আর স্বয়ং সারথি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে মহারণে জয়লাভ করেছিলেন।

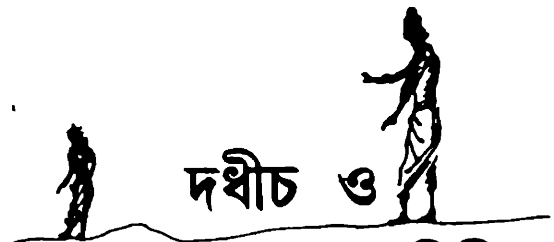


লিঙ্গ পুরাণ

স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বপ্রথম দেবাদিদেব শিবের প্রাধান্য প্রমাণ করার জন্য এই পুরাণ বর্ণনা করেছিলেন। পরে ব্যাসদেব এটি সঙ্কলন করেন। রোমহর্ষণ সূত গুরু ব্যাসদেবের কাছে অধ্যয়ন করে নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রমুখ ঋষিদের বলেন।

লিঙ্গপুরাণের প্রধান বক্তব্যই হল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু তো বটেই, এমন কি স্থাবর-জঙ্গম নিয়ে এই যে বিশ্ব-চরাচর, শিবই এই সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, আবার ধ্বংসও করছেন। তিনিই জীবকুলকে মোক্ষধামে নিয়ে যান। পৃথিবীতে তিনি লিঙ্গ আকারে আছেন—যাকে আমরা শিবলিঙ্গ বলি। কিভাবে তিনি লিঙ্গরূপী হলেন, শিবপুরাণ-সহ অন্যান্য পুরাণের মত এখানেও সেই কাহিনী আছে।দক্ষ-যজ্ঞ নাশ, পার্বতীর বিবাহ, নন্দীর কাহিনী এতেও আছে। অনেকের মতে, লিঙ্গপূজার প্রচলন এই পুরাণ অনুসারেই হয়েছে। এতে তাঁর পূজাবিধিও সুন্দরভাবে দেওয়া আছে।

এই পুরাণ শিবের প্রাধান্য স্বীকার করেও, বিষ্ণুকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। আবার, শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-ইতিহাসের মূল রহস্যটিও এই পুরাণ থেকে পাওয়া যায়।



দধীচ ও ক্ষুপ রাজার কাহিনী

চ্যবন মুনির পুত্র দধীচমুনি থাকেন পর্ণকুটিরে। আর ক্ষত্রিয়বীর ক্ষুপরাজা থাকেন রাজপ্রাসাদে। দধীচ মুনি থাকেন সাধন-ভজন-জ্ঞানার্জন নিয়ে খুব সাধারণভাবে। আর ক্ষুপরাজা! পৃথিবীতে যেন দ্বিতীয় ইন্দ্র। যেমন বিলাস-ব্যসন, তেমনি পরাক্রম। অস্ত্রবিদ্যায় তাঁর মত তখন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। জয়লাভের পর ক্ষুপরাজাকে তিনি তাঁর অমোঘ অস্ত্র বজ্র উপহার দিয়েছিলেন। এমন অমোঘ অস্ত্র যাঁর হাতে থাকে, তাঁকে কি কেউ সমীহ না করে চলতে পারে? সুতরাং ক্ষুপরাজার দম্ভের শেষ নেই।

দধীচ মুনি পর্ণকুটিরে থাকেন বটে, কিন্তু সাধনশক্তিতে তিনিও কিছু কম যেতেন না। আর, তখনকার দিনে মুনি-ঋষিদের মর্যাদাই ছিল আলাদা। রাজারাও তাঁদের সমীহ করে চলতেন। কারো কোনো অসুবিধে দেখা দিলে জান-প্রাণ দিয়ে তা দূর করে দিতেন। যাতে শান্তিপ্রিয় মুনি-ঋষিরা নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজে মেতে থাকতে পারেন। ফলে রাজাদের সঙ্গে মুনিদের, বলতে গেলে, একটা হৃদ্যতাই থাকত। সেই হিসেবে ক্ষুপরাজার সঙ্গেও দধীচ মুনির বেশ একটা অন্তরঙ্গতা বরাবরই ছিল।

একবার হল কি, ক্ষুপরাজার মাথায় যেন ভূত চেপে বসল। মুনি আর রাজার মধ্যে বহুদিন ধরেই অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেদিন হঠাৎ ক্ষুপরাজা দধীচ মুনিকে বলে বসলেন—কিছুদিন ধরেই দেখছি, তুমি যেন আমাকে একটু অবজ্ঞা করেই চলছ। তোমার জানা উচিত, আমি ক্ষত্রিয় এবং পৃথিবীর রাজা। আমার আদেশেই প্রজারা চলে।

মুনি উত্তরে বললেন—তুমি যা বললে, তা কিছুটা ঠিক। তবে সবটা নয়।

—কেন?

—ব্রাহ্মণরা যেভাবে রাজাকে রাজ্য চালাতে বলবে, রাজা সেভাবেই চালাবে। এটাই হল অনুশাসন। কেননা বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই হল শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাদের অনুশাসন মেনে চলা, তাদের মর্যাদা রাখা, আর তাদের ভরণ-পোষণ করা।

—না। কখনো না। ক্ষুপরাজা খুব রেগে ওঠেন—ক্ষত্রিয় রাজা কারো কাছে মাথা বিকিয়ে দেয় না। সামান্য ব্রাহ্মণের কাছ থেকে বুদ্ধি নেবার কোন প্রয়োজনই তার পড়ে না। শোন দধীচ, তোমরা প্রশ্রয় পেয়ে বড় বেশি মাথায় চেপে বসেছ। সাফ কথা শোন। আমার কাছে ব্রাহ্মণরা আমার নীচে। আমি পৃথিবীর রাজা। দেবরাজ ইন্দ্রের সমান আমি। আমিই যম, অগ্নি, বায়ু, কুবের। আমিই পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ণু—শোন, তা-ও আমি। আমি কোন ব্রাহ্মণের অবজ্ঞা সহ্য করি না।

বাগ-বিতণ্ডায় উত্তেজনা এমন চরমে উঠে যায় যে, মুনিও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। হঠাৎ ক্ষুপরাজার মাথায় তিনি বাঁ হাত দিয়ে এক ঘুসি বসিয়ে দেন। ক্ষুপরাজাও সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের দেওয়া অমোঘ বজ্র হেনে মুনিকে একেবারে কুপোকাৎ করে ফেলেন।

বজ্রের প্রহার দারুণ প্রহার। দধীচ মুনির সারা শরীর জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। সেই অবস্থাতেও মনপ্রাণ দিয়ে তিনি ভার্গব শুক্রাচার্যকে ডাকতে লাগলেন।

প্রাণবায়ু প্রায় বেরিয়ে যায় ঠিক সেই সময় যোগবলে শুক্রাচার্য সেখানে এসে হাজির হলেন। তখন অবশ্য ক্ষুপরাজা আর সেখানে ছিলেন না। ক্ষমতা দেখিয়ে বীরদর্পে তিনি চলে গেছেন।

মহাদেবের অনুগ্রহে ভার্গব এক মোক্ষম বিদ্যা আয়ত্ত করে রেখেছিলেন। সেই বিদ্যাবলে আহতকে সুস্থ করে তোলা তো সামান্য কথা, মৃত ব্যক্তিতেও তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। তার নাম হল 'সঞ্জীবনী বিদ্যা'। দধীচের ঐ অবস্থা দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। দধীচ মুনি আবার যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর পূর্বাবস্থা একেবারে পূর্ণ যৌবন নিয়ে দিব্যকান্তি এক পুরুষ যেন উঠে দাঁড়ালেন।

ভার্গবের কাজ শেষ। যাবার আগে তিনি দধীচ মুনিকে পরামর্শ দিয়ে গেলেন, যদি অস্ত্রাঘাতের হাত থেকে বাঁচার ইচ্ছা থাকে, আর যদি অমরত্ব চাও, তবে পশুপতি শিবের আরাধনা কর। আমার যা কিছু বিদ্যা সব তিনিই অনুগ্রহ করে আমায় দিয়েছেন।

—কিন্তু ভার্গব, এই বজ্র?

—বজ্র তো তুচ্ছ দধীচ। তার চেয়েও যে সব মারাত্মক অস্ত্র আছে, তা-ও তোমার কিছু করতে পারবে না। এই বলে শুক্রাচার্য যেমন সবার অলক্ষ্যে এসেছিলেন, তেমনিভাবেই চলে গেলেন।

দধীচের মনে দারুণ ক্ষোভ। সামান্য একজন ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে ব্রাহ্মণের অপমান করে। ব্রাহ্মণরা কি সত্যিই নিস্তেজ হয়ে গেছে? অস্ত্রবলই কি বড় হয়ে উঠল?

ভার্গবের পরামর্শমত স্থানেশ্বরের এক নির্জন স্থানে একটি শিবলিঙ্গ বসিয়ে দধীচ মুনি শিবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। সারাদিন শুধু জল খেয়ে জপ, হোম, মন্ত্রপাঠ করেন। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

শেষে দধীচের নিষ্ঠায় সত্যি সত্যিই শিব একদিন সন্তুষ্ট হলেন। দধীচ মুনির যাবতীয় প্রার্থনাও তিনি পূরণ করলেন।

তপস্যায় শিব-বরে বলীয়ান দধীচ মুনি ফিরে এলেন।

সদম্ভে রাজ-সিংহাসনে বসে রাজা ক্ষুপ। দধীচ মুনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

কোন রাজসভায় মুনি-ঋষিরা এলে সঙ্গে সঙ্গে রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। সব কাজ ফেলে আগে তাঁদের আপ্যায়ন করেন। এটাও রাজধর্মের একটা অঙ্গ। কিন্তু ক্ষুপ তার কিছুই করলেন না। এমন কি, দেখেও যেন মুনিকে দেখতে পেলেন না।

দধীচের ভেতর রুদ্র যেন গর্জন করে উঠল। সদর্পে তিনি

সিংহাসনের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর সরোষে বেদির ওপর উঠে এসে রাজার মাথায় সজোরে এক লাথি বসিয়ে দিয়ে বললেন—নরাধম, এখনও তোর দম্ভ যায় নি!

ক্ষুপরাজা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অমোঘ বজ্র হানলেন দধীচকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বজ্র ব্যর্থ হল। এর আগে যে বজ্র মুনিকে কাবু করে দিয়েছিল সেই বজ্র নিষ্ফল হল দেখে, রাজা খুবই অবাক হলেন।

দধীচ রাজাকে উত্তম শিক্ষা দেওয়ার আনন্দ নিয়ে পর্ণকুটিরে ফিরে গেলেন।

এদিকে ক্ষুপ দারুণ অনুতাপ নিয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তিনি অবশ্য বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। একমনে গরুড়ধ্বজ মুকুন্দের ধ্যান করতে করতে এক সময় তিনি চোখ খুলতেই সামনে বিষ্ণুকে দেখে তাঁর অনেক স্তব-স্তুতি করে বললেন—প্রভু নারায়ণ, দধীচ নামে এক ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আমার বন্ধু ছিলেন। স্বভাবেও বিনীত। বর্তমানে শিবের আরাধনা করে এতই উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন যে, সভায় সকলের সামনে আমার মাথায় লাথি মেরে বলে গেছেন 'আমি কাউকে ভয় করি না।' প্রভু, আপনার পরাভব তাকে পরাস্ত করুক, এই আমার প্রার্থনা।

নারায়ণ শুনে বললেন—ক্ষুপ, তুমি জান না, শিবের শক্তি কতখানি। শিবের যারা ভক্ত তারা অজেয়। বিশেষ করে দধীচ আবার ব্রাহ্মণ। শিবের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ যে কত শক্তি ধরে সে ধারণা তোমার নেই। তুমি আমার ভক্ত হয়ে আমাকে এক কঠিন সমস্যায় ফেললে। দধীচ অপরাজেয়, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।

ক্ষুপ বললেন—প্রভু, আমার প্রার্থনা আপনার কাছে রাখলাম। এখন আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন, যাতে আমি মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে পারি।

নারায়ণ বললেন—আচ্ছা দেখি। এই বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

দিনকয়েক পরে দধীচ নিজের আশ্রমে আপন মনে বসে আছেন। সবে মাত্র পূজা হোম সেরেছেন। কুশের গোছা তখনো বেদির পাশে পড়ে। এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

—মুনিবর, আপনার কাছে আমার কিছু আবেদন আছে। দয়া করে শুনে আমার প্রার্থনা পূরণ করুন। ব্রাহ্মণ বললেন।

দধীচ মুনি সজাগ হয়ে আগন্তুক ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন—প্রভু, ভক্তের মান রাখতে শেষে আপনাকে এই ছদ্মবেশ ধরতে হল। অবশ্য, আপনি ঠিকই করেছেন। ভগবান ভক্তেরই অধীন। আপনি তো জানেন প্রভু, শিবভক্তের অজানা বলে কিছু থাকে না। আর মনে ভয় বলেও কোন বস্তু তাদের থাকে না। তবুও এভাবে কেন এলেন?

সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে নারায়ণ নিজ মূর্তি নিয়ে দধীচ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি সবই জানি। শিবভক্ত যে সর্বশক্তিমান, এ আমার অজানা নয়। শুধু আমার ভক্তের জন্য একটা অনুরোধ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আদেশ করুন। দধীচ বললেন।

—রাজসভায় গিয়ে রাজা ক্ষুপের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একবার বলবেন 'আমি ভয় পাচ্ছি।' এছাড়া আর কোন আবেদন আমার নেই। নারায়ণ বললেন।

—আপনার যখন আমাকে রাজসভায় নিয়ে যাবার এতই ইচ্ছে, তখন চলুন। এই বলে দধীচ নারায়ণের সঙ্গে রাজসভায় এলেন। সঙ্গে কুশের আসন।

রাজসভায় এসেই তিনি কিন্তু সোচ্চারে বলে উঠলেন—আমি পিনাকী, শঙ্কর, শম্ভু, দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে ত্রিভুবনে কাউকে ভয় করি না।

নারায়ণ যখন দেখলেন মুনি তাঁর অনুরোধ রাখলেন না, রেগে গিয়ে সুদর্শন চক্রকে ডেকে দধীচকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য ছুঁড়লেন। কিন্তু, রাজা ক্ষুপও আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মাঝপথেই চক্র যেন আপনা থেকেই থেমে গেল।

দধীচ মুনি একটু ব্যঙ্গ করেই বললেন—যে মহাদেবের অনুগ্রহে আপনি ঐ সুদর্শন পেয়েছেন, সে কি তাঁর ভক্তকে মারতে পারে? যদি ব্রহ্মাস্ত্র বা অন্য কোন অস্ত্র থাকে, তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন।

নারায়ণ এবার সংহার মূর্তিতে নানা রকমের অস্ত্র নিয়ে দধীচকে আক্রমণ করলেন। নারায়ণের সহযোগী হলেন স্বর্গের সব দেবতা। একদিকে দেবগণের সঙ্গে নারায়ণ অনেক রকমের অস্ত্র হানতে লাগলেন দধীচকে লক্ষ্য করে, অপরদিকে দধীচ একা। তিনি কুশাসন ছিঁড়ে মুঠো মুঠো কুশ মহাদেবকে স্মরণ করে দেবতাদের দিকে ছুঁড়তে লাগলেন। দেবতারা দেখলেন, তাঁদের কোন অস্ত্রই দধীচের কাছেও যেতে পারল না, আর দধীচের কুশগুলো জ্বলন্ত ত্রিশূল হয়ে এসে তাঁদের গায়ে যেন জ্বালাপোড়া ধরিয়ে দিতে লাগল। দেবতারা কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। নিরুপায় নারায়ণ তখন নিজের দেহ থেকেই হাজার হাজার নারায়ণ তৈরি করে মুনিবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেও কুশের ত্রিশূলে নিরস্ত্র হলেন।

নারায়ণ দেখলেন, যুদ্ধ করেও দধীচকে পরাস্ত করা গেল না। বিস্ময়ে রাজা ক্ষুপও তা দেখলেন। তবুও নারায়ণ নিরস্ত হলেন না। তিনি তখন বিশ্বরূপ মূর্তি ধরলেন। দধীচকে বললেন—দেখ দধীচ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যে। দধীচ দেখলেন, সত্যিই তাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই তিনি নারায়ণের মধ্যে দেখলেন। তারপর বললেন—প্রভু, আপনার ঐ মায়া-ভেল্কি কেন দেখাচ্ছেন আমাকে। ও দেখিয়েও যে আমাকে আপনি হতোদ্যম করে দেবেন, তা পারবেন না। ঐ মায়া ভেল্কি দেখাতে আমিও জানি। শিবের অনুগ্রহে এখন তা-ও আমার আয়ত্তে। দেখতে চান, এই দেখুন। এই বলে দধীচও মুহূর্তে বিশালকায় হয়ে বিরাট এক হাঁ করলেন। সত্যিই তাই, নারায়ণ এবং ক্ষুপ দুজনেই দেখলেন, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দধীচের উদরে। দধীচ বললেন—দেখলেন তো? এখন ওসব ছাড়ুন। যুদ্ধেই জয়-পরাজয় স্থির হয়ে যাক। নচেৎ আমার অভিশাপ আপনাদের সকলকে লাগবে।

কিন্তু হঠাৎ মাঝখানে ব্রহ্মা এসে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। নারায়ণের জানাই ছিল। দধীচ অভিশাপ দিয়ে বসলেন—দক্ষযজ্ঞে আপনাদের সকলকে হরকোপানলে পড়তে হবে। (দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণু সমেত সব দেবতাকেই রুদ্রদেবের অনুচর বীরভদ্রের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছিল।)

মুনিবরকে প্রণাম জানিয়ে অভিশাপ নিয়ে নারায়ণ চলে গেলেন।

ক্ষুপ রাজার সব দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল। তিনি দধীচ মুনির পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

নৃসিংহের পরিণতি

ভক্ত প্রহ্লাদের আকুল আহ্বানে ভগবান শ্রীহরি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর দম্ভ চূর্ণ করার জন্য স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করে নৃসিংহ মূর্তিতে বেরিয়ে এসেছিলেন। অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ—বিকট সেই মূর্তি। বিরাট বিরাট তার দুই চোখে ধকধক করে যেন আগুন জ্বলছে। হাতের নখে ক্ষুরের ধার। দেখলেই আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর গর্জন। সে কি ভয়ঙ্কর তার শব্দ! মানুষের বুক তো দূরের কথা, দৈত্যপুরের অমন মজবুত বাড়িগুলো পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

দৈত্য হিরণ্যকশিপুও তো কিছু কম ছিল না। স্বর্গ-মর্ত্যের সবাই যার ভয়ে তটস্থ, মনে যার ভয় বলে কোন বস্তু নেই, সে ঐ বিকটাকার নরসিংহকে দেখে ভয় পাবে কেন? বরং ক্ষমতা দেখাবার এমন এক সুযোগ পেয়ে তার পেশীগুলো আনন্দে নেচে উঠেছিল। তাই কোন তোয়াক্কা না করে সরোষে আর তর্জন-গর্জনে নৃসিংহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিরোধ করলে তা ভাঙার জন্য লড়াই করতে হবে। অশুভশক্তি কি লড়াই ছাড়া বিনাশ করা যায়? নারায়ণ তা বিলক্ষণই জানতেন। তাই তো প্রভূত শক্তি নিয়েই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। রুখে দাঁড়ানোর ফলে হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ নৃসিংহকে করতেই হল এবং কৌশলে তাকে দুই জানুর ওপর চিৎ করে ফেলে বুক চিরে মারতে হল। হিরণ্যকশিপুর বুকের রক্ত নৃসিংহের চোখের সামনে দিয়ে দৈত্যপুর ভাসিয়ে নদী হয়ে বয়ে গেল।

রক্ত শুধু মানুষকে কেন, সকলকেই পাগল করে তোলে। একবার রক্তপাত ঘটলে, আরো রক্তপাত ঘটাবার নেশা আপনা থেকেই মাথায় চেপে বসে। নৃসিংহেরও ঠিক তাই হল। রক্ত দেখে তার আসল পরিচয়ই সে ভুলে গেল। হিরণ্যকশিপুকে শেষ করে, সামনে যাকে পারল, তাকেই মারতে লাগল। আরও...আরও...। দৈত্যপুর প্রায় নির্মূল। নেশায় নেশা বাড়ে। নৃসিংহেরও তখন সেই অবস্থা। আরও রক্তের জন্য সে যেন তখন উন্মাদ। আত্মপরিচয় ভুলে, নিজের সংযম হারিয়ে সারা দৈত্যপুরে তর্জন-গর্জনে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু করে দিল। সুর-অসুর-দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ, সবাই তা দেখে ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। তার গর্জনে ত্রিভুবন এমনভাবে কেঁপেও উঠছে, বুঝি-বা সব ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্তরালে থেকে দেবগণ মিলে তাঁর অনেক স্তুতি করলেন। নৃসিংহরূপী বিষ্ণুকে সবাই মিলে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন—আপনি মর্ত্যের রক্তপিপাসু কোন সিংহ নন। দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য আমাদের অনুরোধে আপনি ঐ রূপ ধরেছেন মাত্র। কাজ শেষ হয়েছে। নিজেকে সংবরণ করুন। সৃষ্টি রক্ষা করুন। কিন্তু, রক্ত-নেশায় উন্মাদ নৃসিংহের তখন কেমন করে কানে আসবে দেবতাদের ঐ অনুরোধ।

বেগতিক দেখে ব্রহ্মা দেবগণকে নিয়ে ছুটলেন রুদ্রের সন্ধানে।

রুদ্রদেব মহাদেব তখন মন্দর পর্বতে। উমার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করছেন। তাঁদের ঘিরে অপ্সরাদের নাচ, গন্ধর্বদের গান আর অনুচরদের আমোদ-প্রমোদ চলছে। জোর মজলিশ।

দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা তারই ভেতর দিয়ে পথ করে হর-পার্বতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহাদেব কিন্তু উমাকে নিয়ে রসিকতায় এমন মগ্ন যে, সেদিকে তাঁর কোন নজরই নেই। তাই দেখে ব্রহ্মা তাঁর অনেক স্তব-স্তুতি করলেন। নাচ-গানের মজলিশের ভেতর হঠাৎ স্তব-স্তুতি শুনে মহাদেব মুখ ফেরাতেই সামনে ব্রহ্মার সঙ্গে দেবতাদের দেখতে পেলেন।

—আরে, ব্রহ্মা যে! সঙ্গে আবার সব দেবতাদের দেখছি! ব্যাপার কি?

প্রণাম করে ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুকে বধ করার জন্য বিষ্ণুর নৃসিংহ রূপধারণ, হিরণ্যকশিপু বধ থেকে শুরু করে আদ্যোপান্ত সব নিবেদন করে বললেন—ভগবান, আমরা এখন মহাবিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। এখন একমাত্র আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন।

—কেন, কি হয়েছে? তোমার আবার কি বিপদ এল?

—শ্রীহরি এখন নিজের আসল রূপ ভুলে গিয়ে পুরোপুরি সিংহের আচরণ শুরু করে দিয়েছেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সম্বিত আনতে পারি নি। ব্রহ্মাণ্ড এখন তাঁর দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আমরা আর একটুও ভরসা পাচ্ছি না। একমাত্র আপনিই আমাদের এই সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। ব্রহ্মা শিবকে সবিনয়ে জানালেন।

শিব সব শুনে মৃদু হেসে বললেন—আচ্ছা যাও। আমি দেখছি।

ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত মনে দেবগণকে নিয়ে চলে গেলেন। তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন, ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় হয়ে যাবে, তবু শিবের কথার নড়চড় হবে না।

ঠিক তাই। শিবের কথার কখনো নড়চড় হয় না। শিব যে মহাকাল। ঠিক সময়ে ঠিক ডাক এলে তাঁকে সজাগ হতেই হয়। আর তাঁর সজাগ হওয়া মানেই হল ভূত-প্রেত-পিশাচ নিয়ে তাঁর ভীষণাকার কোটি কোটি অনুচরদের নড়েচড়ে ওঠা। হল-ও তাই। বেশ কয়েক কোটি সাধারণ অনুচর, যাদের 'গণ' বলা হয়, তাদের যে অধিনায়ক, তার নাম বীরভদ্র। রুদ্রদেব সঙ্গে সঙ্গে বীরভদ্রকে ডেকে পাঠালেন। তখুনি বীরভদ্র এসে হাজির। অদ্ভুত আর বিকট আকৃতি তার। যেমন দেখতে বিকট। তেমনি শক্তিতেও বিকট—সাক্ষাৎ যম। এরই দাপটে দক্ষের অত বড় যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল।

বীরভদ্র এসে শিবকে প্রণাম জানিয়ে বলল—আদেশ করুন প্রভু।

—শোন ভৈরব। শিব বললেন—এইমাত্র দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা এসেছিলেন আমার কাছে। তাঁরা ভয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন।

—ঠিক জায়গাতেই তাঁরা এসেছেন। বীরভদ্র বলল—শরণাগতকে ভয় থেকে রক্ষা একমাত্র আপনিই করতে পারেন। কিন্তু কি জন্য তাঁরা ভয় পেয়েছেন, প্রভু?

—বিষ্ণু নরসিংহ-রূপ ধরে দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাজ করা হয়ে গেছে বটে, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব ভুলে তিনি এখন রক্তপিপাসু সিংহ হয়ে খুবই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন।

—আদেশ করুন, দক্ষের মত তারও মুণ্ডু আমি ছিঁড়ে আনি। বীরভদ্র বলল।

—আগে গিয়ে তাঁকে ভালভাবে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করবে। যদি শান্ত না হন, তখন তার মুণ্ডুটাই ছিঁড়ে আনবে, বীরভদ্র। যাও।

আদেশ মাত্রই নৃসিংহরূপী বিষ্ণু যেখানে দাপাদাপি করছিলেন বীরভদ্র সেখানে এল।

অতিকায় বীরভদ্রকে দেখে নৃসিংহ রক্তমাখা হাত-পা-মুখ নিয়ে একটু দাঁড়ালেন।

বীরভদ্র তাঁকে প্রণাম জানিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—এ আপনি কি করছেন? আপনি জগতের রক্ষাকর্তা, পালক। সদাশিব আপনাকে সেই কাজের দায়িত্বই দিয়েছেন। এতদিন ধরে আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজই করে আসছিলেন। শিবের অনুগ্রহে মৎস্যরূপ ধরে প্রাণীদের প্লাবনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। কূর্মরূপ ধরে পৃথিবীকে রক্ষা করে ধর্মপথে পরিচালনা করেছেন। বরাহরূপ ধরে আপনিই জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করে সৃষ্টি রক্ষা করেছেন। আর এখন? নরসিংহ-রূপ ধরে এ কি আরম্ভ করেছেন? পৃথিবীতে যখন কোন বিপদ আসে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি অবতার হয়ে এসে, বিপদমুক্ত করে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনেন। হিরণ্যকশিপু বধ হয়েছে। আপনার অবতারের কাজও শেষ হয়েছে। এবার এই ভীষণ রূপ পরিত্যাগ করে প্রজাকুলকে নির্ভয় করুন। তাদের শান্তি ফিরিয়ে দিন।

নিসৃংহরূপী বিষ্ণু এবার গর্জন করে উঠলেন—বীরভদ্র, সাবধান! যেখান থেকে এসেছ, সেখানে মুখ বুজে ফিরে যাও। যাবার আগে আমার কাছে নতি স্বীকার করে যাও। ভুলে যাচ্ছ, আমি বিষ্ণু, জগতের বিধাতা। ব্রহ্মা আমার পুত্র। শিব! রুদ্র! সে তো তাঁর পুত্র। আমিই স্রষ্টা, আমিই রক্ষক, আমিই সংহার করি। ভাঙখোর শিবের মেজাজ আমার কাছে দেখিও না। আমি এই বিশ্ব-চরাচর ধ্বংস করব। যাও, আমার সামনে থেকে।

বীরভদ্র আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বলল—জিভকে সামলে কথা বল, বিষ্ণু। যাঁর অনুগ্রহে তোমার এই অবতার, তাঁকে নাতি বলে অবজ্ঞা দেখানোর স্পর্ধা তোমার রাখ। বীরভদ্রকে বোধ হয় ভুলে গেছ। তাই অহঙ্কার দেখছি তোমার চরম সীমায় উঠে যাচ্ছে। কূর্মরূপের চিহ্ন এখনও তোমার কপাল থেকে মিলিয়ে যায় নি। বরাহরূপে যখন হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে গিয়েছিলে, শিববরে বলীয়ান হিরণ্যাক্ষ তোমার একটা দাঁত তুলে নিয়েছিল, মনে নেই বোধ হয়। দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে যজ্ঞকর্তা সেজে আমার হাতে যে সাজা পেয়েছিলে, দেখছি, তাও ভুলে গেছ। শিবের নিন্দা করেছিল বলে, তোমার ছেলে ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকটা যে একেবারেই চলে গেছে তা-ও দেখছি তোমার মনে নেই। এই তো কিছুকাল আগে দধীচ মুনির কাছ থেকে অত প্রহার খেলে। এরই মধ্যে তাই-বা ভুলে গেলে কি করে? যে সুদর্শন চক্র নিয়ে তোমার এত খাতির, সে চক্র তোমায় কে দিয়েছিল, মনে নেই বুঝি? এরই মধ্যে তুমি সৃষ্টি, আবার ধ্বংসেরও কর্তা হয়ে বসেছ? একেই বলে বাতুল।—ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে এই কথাগুলো বলেই বীরভদ্র প্রচণ্ড এক হুঙ্কার ছাড়ল—হয় নিজেকে এখনই সংযত কর অবতার, নইলে শিবশক্তির পরিচয় এখনই আবার পাবে।

রুদ্র-ক্রোধে ক্রুদ্ধমূর্তি বীরভদ্র। তার চেয়েও যেন আরো ভীষণ হয়ে উঠলেন নৃসিংহরূপী বিষ্ণু। বিকটাকার মুখে নৃসিংহ প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার তুলে বীরভদ্রকে যেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন, অমনি নীল আকাশ থেকে ঢেকে কোথা থেকে বিশালাকার এক শরভ নেমে এল। মাথার অর্ধেকটা তার একমাথা শিংওয়ালা হরিণের মত, রক্তবর্ণ তিনটে চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। বাকি অর্ধেকটা ডানাওয়ালা পাখির মত। চার পায়ে তার তীক্ষ্ণধার নখ। পাখির মত ঠোঁট অসম্ভব ধারালো। দাঁতের সারি যেন ধারালো ফলার মেলা। তার ওপর কি ভীষণ তার গর্জন!

নৃসিংহরূপী বিষ্ণু বিকটাকার অদ্ভুত সেই শরভকে দেখে আর তার গর্জন শুনে মুহূর্তে যেন দুর্বল হয়ে পড়লেন। শরভের তেজের কাছে নিজেকে তার মনে হতে লাগল এক জোনাকি।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই শরভ পায়ের ফাঁকে নৃসিংহকে বেঁধে ডানার ঝাপটে ঝড় তুলে উটপাখির মত বেশ খানিকটা শূন্যপথে তুলে নিয়ে আবার নীচে নামল। নেমেই আবার খানকিটা প্রায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে শূন্যে উড়ল।

অন্তরীক্ষ থেকে ব্রহ্মার সঙ্গে দেবগণ দেখলেন, দেবাদিদেব কি অপূর্ব কৌশলে বিষ্ণুর অবতার মদমত্ত নৃসিংহকে কব্জা করে নিয়ে তাঁদের ভয়ের হাত থেকে মুক্ত করলেন।

দারুণ বেকায়দায় পড়ে নৃসিংহও এবার শরভরূপী রুদ্রের শরণাপন্ন হলেন। বলতে লাগলেন—হে রুদ্র, আপনি ঠিকই করেছেন। একমাত্র যখন আবার আমরা এভাবে মোহে পড়ব, আপনি আমাদের রক্ষা করবেন।

নৃসিংহের কথা দেবতারাও শুনতে পেলেন।

শরভ এবার নৃসিংহকে ছেড়ে দিলে বীরভদ্র বলল—মোহ-নাশ কথায় হয় না নৃসিংহ। তার জন্য কাঠামো বদলাতে হয়।

এই বলে মুহূর্তে বীরভদ্র নৃসিংহের দেহ থেকে প্রথমে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিল। তারপর শুধুমাত্র কঙ্কালটুকু রেখে তার গা থেকে সব ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মহাদেবকে উপহার দিল।

দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বটে, কিন্তু নৃসিংহ অবতারকে কোন দিনই কেউ ভুলতে পারল না।

জলচক্রে জলন্ধর

জলন্ধর এক দুরন্ত অসুর। জলেই তার বাস, প্রাসাদ, দুর্গ। ডাঙায় উঠত যুদ্ধ করতে। আর যুদ্ধ শেষ হলেই আশ্রয় নিত জলের তলায়।

জলন্ধর নিজে যেমন দুরন্ত, তার হাজার হাজার অসুর অনুচররাও তেমনি দুর্ধর্ষ। অসুরের যত রাগ ছিল দেবতাদের ওপর। আর এমন সব মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত জলন্ধর যে তাকে প্রতিহত করা দেবতাদের সাধ্যের বাইরে ছিল।

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—জলন্ধর এদের ঠিক তার সমকক্ষ নয় ধরেই নিল। ভাবল, ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর শিব এই তিন জনকেই জয় করতে পারলে, বাকিদের জয় করতে কতক্ষণ?

ব্রহ্মা হলেন জগতের বিধাতা। কিভাবে তাঁকে জয় করা যায়?

অনেক ভেবে-চিন্তে জলন্ধর ঠিক করল, ব্রহ্মা যখন তপস্যায় সন্তুষ্ট, তখন তপস্যা করেই ব্রহ্মাকে জয় করবে। আর করলও তাই। জলন্ধরের তপস্যায় ব্রহ্মা এমন ভাবে বাঁধা পড়ে গেলেন যে তাঁর আর কিছু করার থাকল না।

ব্রহ্মার বর পেয়ে গেছে, এবার আর জলন্ধরকে পায় কে?

এবার অসুর-সেনা নিয়ে সে গিয়ে বিষ্ণুকে আক্রমণ করল। বিষ্ণু পৃথিবীর পালক-রক্ষক, মানে রাজা। সুতরাং রাজার সঙ্গে রাজার মতই যুদ্ধ করা উচিত।

অসুর আসবে যুদ্ধ করতে। প্রজাপালক বিষ্ণু কি আর তাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন? কখনোই না। যুদ্ধ বাধল। সে এক ঘোরতর যুদ্ধ—অবিরাম। কয়েক দিন ধরে সেই যুদ্ধ চলল। অসুর-সেনা যা আহত হল, তার দ্বিগুণ অবাহত হল বিষ্ণু-সেনা। জলন্ধরের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। শেষে বিষ্ণু বাধ্য হলেন পরাজয় স্বীকার করে নিতে।

ব্রহ্মা তপস্যায় কাত হলেন। বিষ্ণু যুদ্ধে হেরে গেলেন। স্বর্গ-মর্ত্যের, বলতে গেলে, অনেকটাই এখন জলন্ধরের কব্জায়। বাকি শুধু মহাদেব। শিবকে কাত করতে পারলে আর কি? স্বর্গরাজ্য আর যায় কোথায়?

তাই বীর সেনাদের ডেকে বলল—এখন একমাত্র শঙ্করের সঙ্গেই যুদ্ধটা বাকি আছে। তোমরা জান, ব্রহ্মার বরে কারো কোন অস্ত্রই আমাকে ঘায়েল করতে পারবে না। শঙ্করের ত্রিশূলও। ওর তো কতকগুলো ভূত-প্রেত-হুঙ্কার আর ত্রিশূল। এ ছাড়া ওর আর কোন অস্ত্রই নেই। চল, শঙ্করকে যুদ্ধে হারিয়ে আমরা স্বর্গরাজ্য দখল করে নিই। তারপর, তোমাদের মধ্যে একজন হবে ইন্দ্র, একজন যম, একজন অগ্নি, একজন বায়ু, বরুণ। তারপর—তারপর দেব-সুখে খাও-দাও আর মজা করো।

জলন্ধরের কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠল সেনারা। এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে? সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হইহই করে সবাই এমন-ভাবে বেরিয়ে পড়ল যেন ইতিমধ্যেই ওরা সবাই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ হয়েই গেছে।

ত্রিভুবন কাঁপিয়ে অসুর-সেনা নিয়ে যখন জলন্ধর শিবের সামনে দাঁড়াল, শিব তখন নন্দী আর কয়েক জন অনুচরের সঙ্গে বসে গালগল্প করছিলেন।

জলন্ধর এসেই শিবের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল—রণং দেহি।

সর্বজ্ঞ শিব। তাঁর অজানা কিছু নেই। জলন্ধরের হুঙ্কার শুনে মুখ তুলে একবার তাকালেন মাত্র। তারপর আবার যেমন গল্প করছিলেন, তেমনি গল্পেই মেতে উঠলেন।

আবার জলন্ধর হুঙ্কার ছাড়ল—আমার কথা কি শুনতে পেলে না? অগ্রাহ্য, না দম্ভ? জান, ব্রহ্মা-বিষ্ণু আমার হাতে সবাই পরাজিত? বাকি আছ একমাত্র তুমি। হয় আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, নইলে তোমার গদি ছাড়ো।

সুমেরু পাহাড়ের মত বিশালকায় জলন্ধরের দিকে আবার একবার শিব মুখ তুলে তাকালেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন—জানি, তুমি মস্ত বড় বীর। কিন্তু কেন মিছামিছি আমার সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়ে মরতে আসছ? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। অমন সাহস দেখাতে আমার কাছে এসো না বাপু।

—তুমি দেবাদিদেব শিব বলে কি নিজেকে মনে করেছ একজন মস্ত বীর নাকি? আমার এই তীক্ষ্ণ শরের কাছে তোমার ত্রিশূল টিকবে না। তুমি, তোমার নন্দী, আর যত অনুচরই তোমার থাক না কেন। বীরদর্পে জলন্ধর ঘোষণা করল।



শিব বললেন—মুখে না বলে, আগে কাজে প্রমাণ দাও। দেখি তুমি কত শক্তিধর।

এই বলে শিব নিজের আসন থেকে তড়বড় করে নীচে সমুদ্রে নেমে এলেন। তারপর মুহূর্তে সেই জলের ওপরই, পায়ের বুড়ো আঙুল চাকার মত ঘুরিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বললেন—যাও, ঐ সমুদ্র-জলে সুদর্শন চক্র আছে। যদি পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওটাকে তুলে আনতে পার, তবেই বুঝব তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য।

শিবের কথা শুনে অসুর তো রেগে আগুন—কি? তুমি আমার যোগ্যতা যাচাই করতে চাইছ? জান, এখনই আমি আমার এই তীক্ষ্ণ শর দিয়ে নন্দীর সঙ্গে তোমাকেও যমালয়ে পাঠাতে পারি!

শিব দেখলেন, এত সহজে অসুরকে বাধ্য করা যাবে না। তাই ইচ্ছে করেই এবার একটু রুষ্ট ভাব দেখালেন। সরোষে উঠে দাঁড়ালেন। নন্দীও দাঁড়াল। সেই সঙ্গে প্রমথরাও। অসুররা ভাবল, যেভাবে ওরা উঠে দাঁড়াল, বুঝি-বা এখনই আক্রমণ করে বসবে। তাই নিজেরাও সঙ্গে সঙ্গে যে যার অস্ত্র হাতে তুলে নিল।

সজ্জিত হয়েও অসুররা দেখল শিব যেমন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমন ভাবেই দাঁড়িয়েই রইলেন। হুঙ্কারও ছাড়লেন না। কোন অস্ত্র নিয়ে এগিয়েও এলেন না।

ধৈর্য রাখা ক্রমশ দায় হয়ে পড়ছে অসুর-সেনাদের, সেই সঙ্গে অসুর-রাজেরও।

জলন্ধর গর্জন করে উঠল—রুদ্র, কি ভেবেছ তুমি আমাকে? আমি কি তোমার খেলার পুতুল? গরুড় যেমন সাপের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, আমিও তেমনি তোমাদের গন্ধ সহ্য করতে পারি না। আমি শুধু আমার হাত দিয়ে কৌতুক করে গঙ্গার গতি রোধ করে দিয়েছিলাম। ইন্দ্রকে রথসমেত চার ক্রোশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। শচী-অপ্সরারা সব আমার কারাগারে বন্দী। অনেক অনুনয়-বিনয় করে ইন্দ্র হালে তার শচীকে ফিরে পেয়েছে। তুমি কি এসব জান না?

শুনতে শুনতে রুদ্রদেবের চোখ থেকে মাত্র কয়েকটা আগুনের হল্কা ছুটে গেল। আর অসুর-সেনারা তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

তাই দেখে জলন্ধর বলল—শিব, যুদ্ধ করতে এসেছি আমি তোমার সঙ্গে, ওরা নয়। তোমার ক্ষমতা থাকে, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। কাপুরুষের মত তুমি আগে আমার নিরীহ সেনাদের পুড়িয়ে মারলে কেন?

তারপর প্রচণ্ড আস্ফালন করতে করতে বলল—আমার এই গদাই তোমাকে যমালয়ে পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে ঐ চক্র যখন তুলে আনতে বলছ, তখন দেখ ঐ সুদর্শন দিয়েই আমি তোমাকে খতম করছি।

এই বলে উন্মাদের মত জলন্ধর সমুদ্রে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্র-জল থেকে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সুদর্শন চক্র তুলে যেই নিজের কাঁধে রাখল, অমনি দুরন্ত বেগে তা ঘুরতে শুরু করল। তীক্ষ্ণধার, তার ওপর যেন জ্বলন্ত আগুন। জলন্ধর খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর তার অনুচররা প্রমথ-সেনার হাতে প্রাণ দিল।

উপমন্যুর সাধনা

মুনি-বালক উপমন্যু। নিতান্তই বালক। মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে এসে আছে।

মামাদের অবস্থা খুবই ভাল। অনেক গরু, অনেক দুধ। সেই সঙ্গে ঘি-ও কিছু কম নয়। মামারা, মাসিরা, এমন কি মামাতো ভাইয়েরা, বলতে গেলে, সারা দিন-রাত শুধু দুধ-ঘি খেয়েই থাকে। উপমন্যু মামার বাড়িতে তাদেরই আশ্রয়ে আছে। সুতরাং একেবারে না দিলে নিন্দে রটবে, তাই খাবার জন্য নামমাত্র পায়।

বালক তো আর অত-শত বোঝে না। বায়না ধরে—মা, আমাকে আর একটু দুধ দাও না, মা।

ছেলের বায়না শুনে মায়ের বুক ফাটে, কিন্তু মুখে কি বলবেন। তিনি আছেন ভাই আর ভাই-এর স্ত্রীর আশ্রয়ে। যেটুকু তারা হাতে তুলে দেয়, তার বেশি চাইতেই তাঁর বাধে।

উপমন্যু আর তার মামাতো ভাই—প্রায় একই বয়স। কিন্তু কেন যেন পিসতুতো ভাইকে সে ঠিক সহ্য করতে পারত না। মুনি-পুত্র হলে কি হবে, সেই বয়স থেকেই তার লোভ ছিল ষোল আনা। তাই দৈবাৎ যদি উপমন্যুকে কোনদিন একটু বেশি দুধ খেতে দেখত, অমনি, মায়ের কাছে গিয়ে এঁড়ে ছেলের বায়না ধরত। আর মা-ও ছেলেকে ভোলাবার জন্য দুধের জালা ধরে দিত। এক-একদিন এমন হতো যে, উপমন্যুর ভাগ্যে দুধই জুটত না। আর সেদিনই উপমন্যু বেশি করে বায়না ধরত মায়ের কাছে—মা, আমার দুধ দাও না, মা। আমার যে বড় দুধ খেতে ইচ্ছে করছে।

শুনতে শুনতে মায়ের দু-চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। কোথা থেকে দুধ তিনি পাবেন? অথচ ছেলের বায়না। কোন-রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মা বলেন—একটু অপেক্ষা কর, বাবা। আমি তোকে দুধ এনে দিচ্ছি।

এই বলে ছেলের সামনে থেকে সরে আসেন মা। নির্জনে কপাল চাপড়ান—কি ভাগ্য করে আমি এসেছি যে আমার ছেলেকে একটু দুধ দিতে পারি না। বাইরে বেরিয়ে বন-বাদাড় থেকে সয়াবিনের মত কিছু দানা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। তারপর সকলের চোখের আড়ালে তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঘটি ভরতি করে নিয়ে গিয়ে ছেলেকে বলেন—বাবা, এই নাও দুধ।

এক ঘটি দুধ দেখে উপমন্যুর সে কি আনন্দ! কিন্তু মায়ের বুক অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে ওঠে।

ঘটিতে মুখ দিয়ে এক চুমুক খেয়েই উপমন্যু মুখ সরিয়ে নিল, তারপর ঘটিটা পাশে নামিয়ে রেখে বলল—মা, দুধের মত সাদা বটে, কিন্তু দুধ তো নয়। এ কি দিয়েছ মা?

আঘাতের ওপর এবার চরম আঘাত এসে পড়ল মায়ের বুকে। নিজেকে তিনি আর সংযত রাখতে পারলেন না। দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। ছেলেকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললেন—দুধের ভাগ্য আমরা কেউ করি নি বাবা। কোথা থেকে তোমায় দুধ দেব?

বালক হলেও কথা বোঝার মত শক্তি উপমন্যুর ইতিমধ্যে যথেষ্টই হয়েছিল। জিজ্ঞেস করল—ভাগ্যের কথা কেন বলছ মা?

—বাবা, ভাগ্যই তো সব। পূর্বজন্মে যে যা করে, এ জন্মে তার ফল যে তাকে পেতেই হয় বাবা! মা বললেন—দুধে-মুখে থাকার মত কোন কাজ আমরা পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই করি নি। তা নইলে, এজন্মে এমন করে হা-দুধ হা-দুধ করতে হবে কেন?

—কি কাজ করলে এমন ভিখারির মত হা-দুধ করতে হবে না, মা?

—দেবাদিদেব মহাদেব সন্তুষ্ট হলে জগতে অপ্রাপ্য বলে কিছু থাকে না, বাবা। মা বললেন।

—তাই যদি হয় মা, আমি তাঁরই তপস্যা করব। তুমি আমায় অনুমতি দাও মা। উপমন্যু বলল।

—তুমি নিতান্তই বালক, আমার একমাত্র চোখের মণি তুমি। তবু আমি তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ জানাই বাবা, তুমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ কর।

মাকে প্রণাম করে সেই মুহূর্তেই বালক উপমন্যু মাকে ছেড়ে চলে গেল।

হিমালয়ের একটি নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বালক উপমন্যু শিবের ধ্যানে মগ্ন হল। আহার মাত্র বায়ু, নিদ্রা নেই। উপমন্যুর তপস্যা

চলছে অবিরাম।

ধ্যান বা তপস্যার রহস্যই আলাদা। সংযমের মধ্যে থেকে মন একাগ্র করার ফলে, ভেতরে ভেতরে দুরন্ত এক শক্তি জেগে ওঠে। দূর থেকে সূর্যকে দেখলে তার চারদিকে যেমন ছটা দেখা যায়, একাগ্র ধ্যানের ফলে শরীর থেকেও এমন এক তেজ বের হয়, যা দেখলেই চমক লাগে। এই তেজ এক ধরনের তড়িৎ-প্রবাহ! মহাশূন্যে অবিরাম যে তড়িৎ-প্রবাহ চলছে, তার সঙ্গে এই প্রবাহ মিশে গিয়ে, যে ধ্যান করে, তাকে মহা তেজস্বী করে তোলে।

তপস্যা করতে করতে উপমন্যুও একদিন সেই দশায় এল। তাকে ঘিরে সেই তেজ অহরহ আগুনের মত জ্বলতে লাগল।

দেবতারা দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। মর্ত্যের একজন মুনি-বালক তপস্যার জোরে এত তেজীয়ান হয়ে উঠেছে! দেবতাদের ভয়, না জানি কার পদ যায়। তাই সকলে মিলে ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে।

বিষ্ণু শুনে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হতেই বুঝতে পারলেন উপমন্যু কিসের জন্য এই কঠোর তপস্যা করছে। তারপর দেবতাদের বললেন—তোমরা যাও। নিশ্চিন্তে থাক। তোমাদের কোন ভয় নেই।

দেবতারা চলে যেতেই বিষ্ণু মন্দর পর্বতে শিবের কাছে এলেন। প্রণাম জানিয়ে বললেন—দেব, উপমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণ বালক দুধের জন্য আপনার উদ্দেশে হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করছে। তার তেজে দেবতারাও সন্ত্রস্ত। আপনি দয়া করে ওকে এই কষ্টকর তপস্যা থেকে সরান।

মহাদেবের অজানা কিছুই ছিল না। তিনি বোধ হয় এরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাই বিষ্ণুর কথা শোনামাত্র বললেন—তুমি যাও। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

বিষ্ণু চলে যেতেই সদাশিব উমাকে বললেন—বালক উপমন্যু তপস্যায় যে অনেকখানি এগিয়েছে, এটা ঠিক, তবুও কতখানি তেজীয়ান হয়েছে একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

উমা জিজ্ঞেস করলেন—কিভাবে পরীক্ষা করবেন, দেব?

—ইতিমধ্যে আমি তা ভেবেও নিয়েছি, উমা। আমরা দুজনে ইন্দ্র আর শচীর বেশে যাব। যাতে উপমন্যু কিছুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে।

হিমালয়ে নিজের আশ্রমে তখনো বালক উপমন্যু তপস্যায় মগ্ন সাদা হাতির পিঠে চেপে শচীর সঙ্গে শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র এলেন পেছনে আর এক হাতির পিঠে সূর্যদেব ডান হাত দিয়ে ইন্দ্র আ শচীর মাথায় সাদা ছাতা ধরে আছেন, আর বাঁ হাত দিয়ে বিশালাকা একটা পাখা নিয়ে তাঁদের হাওয়া করে চলেছেন।

হঠাৎ দেবরাজকে দেখে উপমন্যু সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। হা জোড় করে তাঁদের অভিবাদন জানাল—আমার কি সৌভাগ্য সে স্বয়ং দেবরাজ এসেছেন। সত্যিই আমি ধন্য। কি দিয়ে যে আপনাদের আমি আপ্যায়ন জানাব!

ইন্দ্ররূপী শঙ্কর বললেন—অন্য কোন ভাবে আমাকে আর অভ্যর্থনা জানানোর আবশ্যক নেই উপমন্যু। তোমার নিষ্ঠা, তোমার তপস্যাতেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমায় বর দিতে এসেছি। বালক, তোমার যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। আমি তা এখুনি পূরণ করে দেব।

ইন্দ্রের কথা শুনে বালক উপমন্যু বলল—আপনি যদি আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিতেই এসে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে আমার একটাই প্রার্থনা।

—কি তোমার প্রার্থনা উপমন্যু, অসঙ্কোচে বল।

—মহাদেবের প্রতি আমার ভক্তি যেন অটুট থাকে।

ইন্দ্ররূপী শঙ্কর এই কথা শোনামাত্র যেন ক্রোধে ফেটে পড়লেন—কি বললে বালক? মহাদেব? আমি দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের আমি অধিপতি। সবাই আমার আদেশের দাস। আমিই সকলের প্রভু। তুমি আমার ভজনা না করে শ্মশানবাসী নেশাখোর মহাদেবের ভজনা করতে চাও? বাতুল বালক, যদি ভাল চাও, মঙ্গল চাও, তাহলে আমার ভক্ত হও। এই ত্রিভুবনে আমার অদেয় কিছু নেই। যা চাইবে তাই পাবে। ঐ বেয়াদপ শিবের নাম আমার সামনে আর উচ্চারণ কোরো না।

ইন্দ্রের এইরকম কথা শুনে উপমন্যু স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনে মনে নিদারুণ কষ্ট অনুভব করল। তারপর বলল—তুমি কি সত্যিই দেবরাজ ইন্দ্র? না, কোন মায়াবী দানব ইন্দ্রের রূপ ধরে এসে আমার সামনে শিবের নিন্দা করছ। ছি...ছি! দুর্ভাগ্য আমার যে, নিজের



কানে আমাকে শিবনিন্দা শুনতে হল। শোনার পর অবশ্যই এ দেহ আমি আর রাখব না। তবে তার আগে শিবনিন্দুক তুমি যে-ই হও, তোমাকে আমি বিনাশ করব। তোমাকে বিনাশ না করে মরলে, নিন্দা শোনার পাপ থেকে আমি মুক্তি পাব না।

এই বলে তেজস্বী উপমন্যু হোমকুণ্ড থেকে এক মুঠো ছাই তুলে নিয়ে, তাতে অব্যর্থ মারণ-মন্ত্র প্রয়োগ করে ইন্দ্ররূপী শঙ্করের দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিল। ছাই-এর প্রভাবে শঙ্কর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বালক টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে সেই যোগ-সাধনায় (আগ্নেয়ী) রত হল, যাতে অল্পক্ষণের মধ্যে তার দেহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ঠিক এই অবস্থায় অলক্ষ্য থেকে নন্দী তার অনুচর চন্দ্রককে ডেকে বলল—প্রভুর দেহ থেকে ঐ কালাগ্নি ছাই এখুনি সরাও।

চন্দ্রকও সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করতেই শঙ্কর আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। পরীক্ষার পরিণতি যে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। উপমন্যুর প্রতি স্নেহে তাঁর মন-প্রাণ ভরে উঠল।

যাতে আগ্নেয়ী এখনই উপমন্যুকে পোড়াতে না পারে, নন্দী ইতিমধ্যেই তার ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিল। চোখ বুজে উপমন্যু তখনো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

—উপমন্যু, চোখ খোলো।

যেন বহুদূর থেকে একটা সুমধুর ডাক শুনে উপমন্যু চোখ মেলল। চোখ খুলতেই সে যা দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। দেখল, তার আশ্রমের চতুর্দিক ঘিরে দুধের সাগর, দই-এর সাগর, লবণ সাগর, জল সাগর, তাছাড়াও নানা রকমের উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তুর পাহাড়। আর সামনে ষাঁড়ের পিঠে চেপে তারই আরাধ্য দেবতা শঙ্কর দাঁড়িয়ে রয়েছেন শঙ্করীকে নিয়ে।

উপমন্যুর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। মহাদেবের চরণে সে লুটিয়ে পড়ল।

সুস্নিগ্ধ হাসির ছটা ছড়িয়ে মহাদেব তাকে দু-হাত দিয়ে তুলে নিজের বুকে চেপে ধরলেন। বললেন—আজ থেকে তুমি আমার পুত্র হলে। আর এই ভবানী তোমার মা হলেন। এই যাবতীয় সমুদ্র আর খাদ্যের পাহাড়, এতদিন আমারই ছিল। আজ থেকে এগুলো সব তোমার হল। তারপর পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কই গো, ছেলেকে তুমি কোলে নাও।

—তুমি বলবে, তবে? উমা শিবকে একটু কটাক্ষ হেনে উপমন্যুকে কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে পুত্রকে চুম্বন দিয়ে বললেন—বাছা, তোমার মঙ্গল হোক।

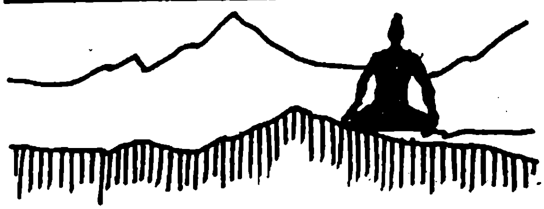
শিব বললেন—পুত্র, তোমার আর কি অভিলাষ বল।

উপমন্যু বলল—শুধু একটাই। আপনার আর আমার মা ভবানীর ওপর আমার যেন ভক্তি অটুট থাকে।

—তথাস্তু। এই বলে হর-পার্বতী অন্তর্ধান করলেন।

জরাকে জয় করে চিরকুমার উপমন্যু কালে কালে শিবতুল্য মহাজ্ঞানী হয়ে উঠেছিল এবং হিমালয়ে নিজের আশ্রমেই থেকে গিয়েছিল।

এর বহুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ শিবসদৃশ এই উপমন্যুর প্রসাদে শৈবধর্মে সম্যক জ্ঞান লাভ করে পুত্র কামনায় হর-পার্বতীর উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করে শাম্বকে পেয়েছিলেন।



নারদ হলেন গায়ক

পৃথিবীতে তখন ত্রেতাযুগ।

কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দারুণ বিষ্ণুভক্ত। চলতে-ফিরতে, খেতে-শুতে সব সময়ই মনে মনে বাসুদেবকে স্মরণ করতেন। তাঁর গলাও খুব মিষ্টি ছিল। সুর-তালের ওপর যথেষ্ট দখলও ছিল। শুধু খাওয়া আর শোবার সময়টুকু ছাড়া সব সময়ই মিষ্টি গলায় হরির গুণগান করতেন।

নিজের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। সংসারও ছিল না। বিষ্ণুমন্দিরে বসে হরির গুণগান গাইতেন, আর তা শুনে যে যা দিয়ে যেত, তাতেই দিন কাটাতেন।

কাছেই পদ্মাখ্য নামে আর একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি কৌশিককে ভাবাবেগে গান গাইতে দেখে খুব মুগ্ধ হলেন। আর বিষ্ণুমন্দিরেই প্রতিদিন তাঁর আহারের বন্দোবস্ত করে দিলেন। আর মাঝে মাঝে এসে নিবিষ্ট চিত্তে তাঁর গান শুনে যেতেন।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর, একদিন পদ্মাখ্য দেখলেন, কৌশিকের সঙ্গে সাতজন এসে বিষ্ণুমন্দিরে হরি-গুণগানে যোগ দিয়েছে। সকলেই যে তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা নয়—ক্ষত্রিয় বৈশ্যও আছেন। পদ্মাখ্য তাঁদেরও বিষ্ণুমন্দিরে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এঁদের মধ্যে যিনি বৈশ্য—তাঁর নাম ছিল মালব। তিনি আবার প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিষ্ণুকে দীপদান করতেন। তাঁর স্ত্রী মালবীও অসাধারণ ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন গোবর-জল দিয়ে বিষ্ণুমন্দির ধুয়ে দিতেন।

হঠাৎ কুশস্থল দেশ থেকে পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্দিরে এসে হাজির হলেন। কৌশিকের গলায় হরিনাম শুনে তাঁরা এমনি মজে গেলেন যে, দেশে আর তাঁদের ফেরা হল না। পদ্মাখ্য তাঁদেরও থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। দেখতে দেখতে কৌশিকের রীতিমত একটা দল হয়ে উঠল। সকলেই কৌশিকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হরিনামে মেতে উঠলেন। তবে, কৌশিকের গলার আমেজও যেমন ছিল, তেমনি আবেগও ছিল গভীর। তাঁর গলায় নাম-গান শোনার জন্য তাই প্রতিদিনই বিষ্ণুমন্দিরে ভিড় বাড়তে লাগল। আর সেই সঙ্গে কৌশিকের নামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কৌশিকের নাম যখন চারদিকে এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সময় একদিন কলিঙ্গ দেশের রাজা দলবল নিয়ে সেখানে এলেন। ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে কৌশিক তখন আপন মনে সুর-তাল মিলিয়ে নাম-গান করছিলেন।

কলিঙ্গরাজ আসতেই কৌশিক তাঁকে সমাদর করে বসালেন।

রাজার অনুচররাও আর এক পাশে বসল।

তারপর কলিঙ্গরাজ বললেন—যা শুনেছি, তা ঠিকই। আপনার গলায় নাম-গান সত্যিই ভাল শোনায়। আমার ইচ্ছে, আপনি একবার আমার নাম-গান গেয়ে শোনান।

কৌশিক বললেন—ক্ষমা করুন রাজা। আমাদের জিভ একমাত্র হরির নাম ছাড়া আর কোন নাম উচ্চারণ করতে পারে না।

কলিঙ্গরাজ একটু রাগ দেখিয়েই বললেন—আমি রাজা। হরির চেয়ে কম কিসে? গায়কের কাজই তো রাজার নাম-গান গাওয়া। তা তোমরা' পারবে না কেন?

কৌশিক চুপ করে রইলেন। শিষ্যদের সঙ্গে কুশস্থলের ব্রাহ্মণরাও রাজার এই কথা শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

তখন কলিঙ্গরাজ বললেন—বেশ, তোমরা যদি গাইতে না পার, তাহলে আমার গায়করা আমার নাম-গান গাইছে, শোন। এই বলে নিজের গায়কদের হুকুম দিলেন।

রাজার গায়করা সঙ্গে সঙ্গে রাজার গুণগান গাইতে শুরু করে দিল। শিষ্য-ভক্তরা তাই দেখে-শুনে কানে আঙুল দিয়ে বসলেন। কৌশিক আর তাঁর ভক্ত শিষ্যরা বুঝতে পারলেন কলিঙ্গরাজের অভিপ্রায় কি। প্রতাপশালী রাজা এরপরেই তাঁদের হয়ত ঐ গান গাইতে বাধ্য করাবেন। এই ভেবে সেখান থেকে উঠে এসে ছুরি দিয়ে যে যার জিভকে দু-ফালা করে দিলেন।

কলিঙ্গরাজ তাই দেখে এবার সত্যি সত্যিই রেগে আগুন হয়ে তাঁদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে কৌশিকের সঙ্গে শিষ্যদের তো বটেই, পদ্মাখ্যকেও রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

কুশস্থলের সেই ব্রাহ্মণরা আর সাত জন শিষ্য নিয়ে কৌশিক তখন আর কি করেন। জিভও গেছে, ওদিকে রাজাও সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছেন। অনাহারে থেকে একে একে তাঁরা মারা গেলেন।

মৃত্যুর পর যমদূতরা এসে সাত জন শিষ্যের সঙ্গে কৌশিককেও যমালয়ে নিয়ে গেল। ওদিকে ব্রহ্মা তাই দেখে হাঁফাতে হাঁফাতে যমরাজের কাছে এসে বললেন—তুমি এ কি করেছ। সশিষ্য কৌশিককে তুমি এখানে এনেছ?

যমরাজ বললেন—কেন প্রভু, আমার যা কাজ আমি তো তাই করেছি।

—তা ঠিক। ব্রহ্মা বললেন—কিন্তু ওরা তোমার এক্তিয়ারের বাইরে যে। জান না, হরির গুণগান গেয়েই ওদের মরতে হয়েছে। ছাড়ো...ছাড়ো। ওদের শিগ্‌গির ছাড়ো।

যমরাজ তখন বুঝলেন, সত্যিই কাজটা ঠিক হয় নি। তাই তখুনি সকলকে মুক্ত করে দিলেন। ব্রহ্মা তাঁদের সমাদর জানিয়ে নিজের লোকে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁদের সে কি আপ্যায়ন! তাই দেখে দেবতারা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি? ঠাকুর্দার কি শেষে মাথা খারাপ হল? তাঁদের ছেড়ে সামান্য কজন মানুষকে নিয়ে এমন হইচই শুরু করে দিলেন। সকলে মিলে ঠাকুর্দার কাছে গিয়ে দরবার করলেন। ব্রহ্মা বললেন—তোমরা যাও তো বাপু। আমার মাথা খারাপ হয় নি। যা করছি, তা ঠিকই করছি। তোমাদের যদি বোঝার ক্ষমতা থাকত তাহলে এ নিয়ে এত হই-হল্লা করতে না, যাও।

এই বলে ব্রহ্মা সবাইকে নিয়ে বিষ্ণুলোকে এলেন। বিষ্ণুলোকের শ্বেতদীপে বিষ্ণু তখন মুনি-ঋষি-গন্ধর্বদের নিয়ে মজলিসে বসে কৌশিকপ্রমুখ হরিভক্ত ব্রাহ্মণদের নিয়ে ব্রহ্মাকে আসতে দেখলেন, পেছনে দেবতারা। কাছাকাছি আসতেই বিষ্ণু দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলেন—এসো, এসো, কৌশিক এসো। তারপর মালব-মালবী, পদ্মাখ্য থেকে ব্রহ্মা যাঁদের সঙ্গে এনেছিলেন একে একে সকলেরই নাম ধরে কাছে ডাকলেন। আর আলিঙ্গন দিয়ে বিষ্ণুলোকেই তাঁদের থাকার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। দেখে দেবতাদের চোখ ছানাবড়া। যে সম্মান পেতে গেলে দেবতা হয়েও তাঁদের অনেক সাধনা করতে হয়, আর সামান্য মানুষ এরা! দেবতাদের মন নয় তো, যেন গঙ্গার জল। ঈর্ষা জাগলেও ঈর্ষা থাকে না, মুহূর্তে ভুলে যান। দেবতারাও সব ভুলে তাঁদের জয়ধ্বনি দিয়ে বিষ্ণুলোক থেকে চলে এলেন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে মুনি-ঋষিদের সঙ্গে নারদ মুনিও তখন সেখানে। এমন সময় হরির গুণগান করতে করতে নারায়ণের কাছে লক্ষ্মীদেবী এলেন।

নারায়ণের কাছে লক্ষ্মীদেবী আসতেই বিষ্ণুর অনুচররা ব্রহ্মার সঙ্গে মুনি-ঋষিদের বের করে দিল। এমন কি দেবতাদের মধ্যেও যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও। নারায়ণের পাশে গিয়ে লক্ষ্মী বসতেই নারায়ণ তুম্বুরুকে ডেকে পাঠালেন। তুম্বুরু হলেন গন্ধর্বদের গুরু। সেই সঙ্গে গানেরও গুরু, আবার হরিভক্তও বটে।

ডাক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তুম্বুরু হাজির। নারায়ণ নিজে হাতে তাঁর গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। তারপর দারুণ সমাদর জানিয়ে বললেন—তুম্বুরু, গান শোনাও।

আদেশ পাওয়া মাত্রই তুম্বুরু হাতে বীণা নিয়ে গলা ছেড়ে সুমধুর সুরে গান ধরলেন। যতক্ষণ গান গাইলেন, ততক্ষণ যেন চারদিক থেকে মধু ঝরতে লাগল। গান শেষ হলে নারায়ণ আর লক্ষ্মীকে প্রণাম জানিয়ে তুম্বুরু বিদায় নিলেন। নারায়ণ-লক্ষ্মী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে গায়ককে আরো উপঢৌকন দিয়ে সম্মান দেখালেন।

ভাবে গদগদ হয়ে সকলের প্রশংসা নিয়ে তুম্বুরু চলে গেলেন বটে, কিন্তু নারদ মুনির মন দারুণ ছটফট করে উঠল।

তুম্বুরু আর নারদ একই সঙ্গে গান শিখেছেন। নারায়ণের তিনি অতি প্রিয়জন। লক্ষ্মীদেবীকে তিনি মা বলেই জানেন। তা সত্ত্বেও নারায়ণ তুম্বুরুকে ডেকে গান শুনলেন, প্রশংসা করলেন, দেব-দুর্লভ সম্মান দেখালেন। আর তাঁকে কোন আমলই দিলেন না। কেন? তবে কি, গান শেখা তাঁর শেষ হয় নি? না হলে, নারায়ণ এভাবে তাঁকে উপেক্ষা করবেন কেন?

মনে মনে নারদের নিজের ওপর খুবই ধিক্কার এল। প্রতিজ্ঞা করলেন, যেভাবেই হোক, প্রভুর কাছ থেকে তুম্বুরুর মত সম্মান তিনি আদায় করবেনই। কিন্তু কিভাবে? দেবর্ষি জানতেন, তপস্যায় সব মেলে। তাই তিনি মনকে সংযত করে কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। বহু কাল কেটে গেল। নারদ ধৈর্য হারালেন না। তপস্যা করেই চললেন।

এমন ভাবে তপস্যা করতে করতে হঠাৎ নারদ মুনি একদিন আকাশবাণী শুনলেন—নারদ, ভাল ভাবে গান শেখার যদি তোমার এতই আগ্রহ, তবে মানস সরোবরের উত্তর পর্বতে যাও। সেখানে উলূক নামে এক পাখি আছে। 'গানবন্ধু' নামেই সে সকলের কাছে পরিচিত।

আকাশবাণী থেমে যেতেই নারদ মুহূর্ত দেরি না করে উত্তর পর্বতে এসে সত্যিই দেখলেন, এক পাখিকে ঘিরে গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, অপ্সরারা বসে গানের তালিম নিচ্ছে। গানবন্ধুর কি মধুর গলা!

নারদকে দেখেই উলূক গান থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রণাম জানিয়ে বলল—আসুন দেবর্ষি। আমি আপনার কি সেবা করতে পারি, বলুন।

নারদ তাঁর মনের অভিপ্রায় জানিয়ে উলূককে বললেন—উলূকরাজ, আমি আপনার কাছে গানবিদ্যা শিখতে চাই। কোন শাস্ত্রেই অধিকার আমার কম নয়। অবশ্য শাস্ত্রাভিমান আমার নেই। আমি হরিভক্ত। গান আমিও জানি। তবু কৌশিক, তুম্বুরুর মত আমি বিষ্ণুর অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারি নি। আমি আপনার কাছ থেকে সেই গানবিদ্যা শিখতে চাই, যাতে আমি তাঁর প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারি।

উলূক বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন। হরির সবচেয়ে প্রিয় হল নামগান, কীর্তন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার আশীর্বাদে আমি দীর্ঘায়ু লাভ করে অনেক কিছুই দেখলাম। ভুবনেশ নামে এক রাজা রাজ্যে হরির গুণগান নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হরিমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ তা উপেক্ষা করে নদীতীরে নারায়ণ-এর মূর্তি গড়ে ফল-মূল দিয়ে পুজো করে গান করছিলেন। রাজার অনুচররা সব সামগ্রী লাথি মেরে ফেলে দিয়ে হরিমিত্রকে রাজার কাছে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। রাজা হরিমিত্রের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে রাজ্য থেকে বের করে দিয়েছিলেন। রাজা ভুবনেশ মারা গেলেন। বহু যুগ আগের কথা। এখনও কিন্তু সে এখানকারই এক কোটরে বাস করছে, আর খিদের জ্বালায় নিজের মাংস নিজে কামড়ে খাচ্ছে। দেবর্ষি হরিমিত্রকেও দেখেছি দিব্য বিমানে চেপে যেতে। তাই দেখে আমার গান শেখার ওপর দারুণ ঝোঁক আসে। সেই থেকে এখানে কিন্নরদের সঙ্গে থেকে আজ একশ কুড়ি হাজার বছর, মানে দশটা মন্বন্তর কেটে গেল আমার গানবিদ্যা শিখতে। দেবর্ষি, আপনাকেও সেই রকম ধৈর্য ধরে শিখতে হবে।

নারদ বললেন—অবশ্যই। আজ থেকে আপনাকেই আমি গুরু বলে মেনে নিলাম। আপনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন, সেভাবেই চলব।

এরপর নারদ মুনি গানবন্ধুর কাছে দিব্য পরিমাণে এক হাজার বছর গানবিদ্যা শিখলেন। গানের যাবতীয় ব্যাকরণ তো বটেই, গলাকেও যাদু করে তুললেন।

উলূকরাজ বললেন—মুনি, গানশিক্ষা আপনার শেষ হয়েছে। আমারও এদিকে পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। দিব্যদর্শী আপনি। বলে যান, মৃত্যুর পর আমার কি গতি হবে।

নারদ বললেন—গানবন্ধু, মৃত্যুর পর আপনি পক্ষীরাজ গরুড় হয়ে নিয়ত বিষ্ণুর সেবা করবেন।

নারদ মুনি সেখান থেকে সোজা শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের কাছে এসে তাঁকে সুমধুর সুরে বীণা নিয়ে গান শোনালেন।

গান শুনে নারায়ণ বললেন—নারদ, পক্ষীরাজের কাছে গীতবিদ্যা শিখেছ ঠিকই, তবুও তুম্বুরুর মত গান তুমি শিখতে পার নি। এখনও তোমায় শিখতে হবে। তবে একটা আশ্বাস তোমায় দিই। বৈবস্বত মনুর কালে আমি যখন কৃষ্ণ নামে অবতীর্ণ হব, তখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেবে। আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেব। তখন তুমি তুম্বুরুর চেয়েও ভাল গায়ক হবে।

এই বলে নারায়ণ চলে গেলেন। আর নারদ মুনিও সেই থেকে বীণা হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যম সভা, বরুণ সভা, এমন কি ব্রহ্মার সভাতেও হরির গুণগান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। আর যেখানে যত সুর-লয়-তাল দেখতে পেলেন, আয়ত্ত করতে লাগলেন।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কত বছর যে কেটে গেছে তার কোন নেই।

একদিন হঠাৎ রৈবত পর্বতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে নারদ মুনির আগের কথা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেখানে এসে প্রণাম করে প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতেই কৃষ্ণ বললেন—নারদ, সত্যভামার কাছে গিয়ে আগে গান শেখ।

নারদ সত্যভামার কাছে বেশ কিছুকাল গান শেখার পর কৃষ্ণের কাছে আসতেই তিনি বললেন—রুক্মিণীর কাছে যাও। ওখান থেকে আগে শিখে এসো। তারপর দেখব।

রুক্মিণীর কাছে গান শিখতে গিয়ে নারদ বেশ কিছুটা ধমক খেলেন। তারপর নিষ্ঠা নিয়ে গান শেখা শেষ করে কৃষ্ণের কাছে এলেন।

এবার কৃষ্ণ মন দিয়ে নারদের গান শুনলেন। যেখানে যেটুকু ভুলত্রুটি ছিল সেটুকু সংশোধন করে দিয়ে বললেন—নারদ, এতদিনে তুমি যথার্থ গায়ক হয়েছ।

বহুকাল পরে কৃষ্ণরূপী নারায়ণের কাছে তুম্বুরুর মত সম্মান পেয়ে নারদ ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন।

শ্রীমতী ও নারদ-পর্বত সংবাদ

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা অম্বরীষ। তিনি শুধু অযোধ্যারই রাজা ছিলেন না, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। পৃথিবীর প্রজারাই তাঁকে যে সম্মান করত, তা নয়। দেবতারাও তাঁর ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। ধার্মিকের কাছে তিনি মুনি-ঋষির মত উদার, মহান, আবার অধার্মিকের কাছে সাক্ষাৎ যম।

এ সবই তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর মায়ের তপস্যায় আর বিষ্ণুর আশীর্বাদে।

বাবা রাজা ত্রিশঙ্কু। মা সত্যবতী। ধর্মানুশীলনে দুজনের কেউই কম ছিলেন না। মা সত্যবতী দারুণ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিষ্ণু নারায়ণ মাধবের সেবার্চনা না করে তিনি জলই খেতেন না। ত্রিশঙ্কুর সঙ্গে বিয়ের পর বিষ্ণুর কাছে তাঁর শুধু মাত্র প্রার্থনা ছিল—মাধব, আমাকে একটি মাত্র পুত্র দাও। আমার আর সে পুত্র যেন তোমার

প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়। যেন এই বংশের মুখ উজ্জ্বল করে।

দীর্ঘদিন ধরে এই প্রার্থনা জানাতে জানাতে একদিন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্বপ্নে দেখলেন, স্বয়ং নারায়ণ তাঁর মাথার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে একটা ফল। বলছেন—সত্যবতী, তুমি এই ফলটি খাও। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

কাকভোর। স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙে গেল রানীর। ধড়মড় করে যেন হাত বাড়িয়েই বিছানায় উঠে বসলেন। কিন্তু কোথায় কে? তবে কি সত্যিই স্বপ্ন! বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মেঝেয় ঠিক মাথার দিকেই দেখলেন, একটা ফল পড়ে রয়েছে। সত্যবতীর গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। এমন জায়গায় এভাবে তো কোন কিছু থাকার সম্ভাবনা নেই। তবে কি, সত্যি সত্যিই তিনি এসেছিলেন! ফলটি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজাকে ডেকে তুললেন। স্বপ্নের কথা শুনিয়ে তাঁকে ফলটি দেখালেন। রাজাও আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

সকাল হতেই স্নান সেরে, যথারীতি বিষ্ণুর সেবা-অর্চনা সেরে রানী সত্যবতী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ফলটি খেলেন।

তারপর...এই অম্বরীষ।

রাজা ত্রিশঙ্কুর পর অম্বরীষ রাজা হলেন। রাজা হয়েই মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বনে চলে গেলেন বিষ্ণুর তপস্যা করতে। সুদীর্ঘকাল এমন সংযম, নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় নিয়ে তপস্যা করলেন যে, সবচেয়ে যা দুর্লভ বস্তু বিষ্ণু তাই তাঁকে দিলেন। বললেন—তুমি রাজ্যে গিয়ে ধর্মানুসারে নির্বিঘ্নে রাজকাজ কর অম্বরীষ। কখনো যদি তোমার রাজ্যে অধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে, অকালমৃত্যু প্রজা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করে, আমার এই সুদর্শন চক্র তোমায় সাহায্য করবে। সব সময়ই আমার এই সুদর্শন তোমার পাহারায় থাকবে।

বর পেয়ে অম্বরীষ আবার রাজ্যভার তুলে নিয়েছিলেন। সসাগরা পৃথিবী তাঁর অধীনতা মেনে নিয়েছিল। শস্যে-সম্পদে পৃথিবীও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

একদিন রাজসভায় অম্বরীষ বসে। নারদ মুনির সঙ্গে পর্বত মুনি হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে এসে তাঁর সভায় হাজির হলেন। দুজনের সঙ্গে দুজনেরই খুব বন্ধুত্ব। দুজনেই আবার সমান বিষ্ণুভক্ত।

দুই মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখে রাজা তাড়াতাড়ি সিংহাসন ছেড়ে উঠে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। পা ধুইয়ে উঁচু আসনে বসালেন। ফল-মূল এনে সেবা করালেন। তারপর বসে বসে কথাবার্তা বলছেন। এমন সময় নারদ রাজাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—রাজা, আপনার পিছনে ঐ মেয়েটি কে?

রাজা চমকে পিছু ফিরে দেখেন, দাঁড়িয়ে তাঁর মেয়ে। কখন সে চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছে, তা রাজা জানতেও পারেন নি।

নারদকে রাজা বললেন—মুনিবর, এটি আমার মেয়ে শ্রীমতী। বিয়ে দেব মনস্থ করে বহুদিন ধরেই একটি সৎ পাত্র খুঁজছি।

নারদ মুনি দেখলেন, মেয়ের রূপের কোন তুলনা নেই। এমন কি চোখ-মুখ, দেহের গড়ন দেখে তাঁর জ্যোতিষী বিদ্যে বলেই দিল, মেয়েটি সুলক্ষণা।

নারদ আচম্বিতে বলে বসলেন—আমি তোমার এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, আপত্তি আছে?

অম্বরীষ বললেন—মুনিবর, সে তো আমার মেয়ের সৌভাগ্য।

এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন পর্বত মুনি। তিনিও বেশ ভালভাবেই মেয়েটিকে দেখছিলেন। কিন্তু নারদ আগেভাগেই প্রস্তাব দিয়ে বসলেন দেখে মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনিও বলে বসলেন—রাজা, তোমার মেয়েকে আমারও খুব ভাল লেগেছে। আমিও ওকে বিয়ে করতে চাই।

নারদ বললেন—রাজা, আমি আগে প্রস্তাব দিয়েছি, ভুলে যেও না। মেয়েকে আমার হাতে তুলে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে পর্বত মুনি বললেন—রাজা, নারদের তুলনায় আমি কোন অংশেই অযোগ্য পাত্র নই, এটা যেন ভুলে যেও না।

রাজা অম্বরীষ মহা ফাঁপরে পড়লেন। দুজনেই সমান জ্ঞানী, সমান ভক্ত। কাকে ফিরিয়ে দেবেন? কার অভিশাপ কুড়োবেন?

অনেক ভেবে রাজা বললেন—আপনারা দুজনেই যেমন সকলের পূজনীয়, তেমনি আমারও পূজনীয়। জ্ঞানে-গুণে আপনারা দুজনেই সমান। আপনাদের দুজনের সঙ্গেই যদি আমার আত্মীয়তা পাতাবার সুযোগ থাকত, তাহলে আমি ধন্য হতাম। কিন্তু বর্তমানে বিয়ে দেবার মত আমার এই একটিই মেয়ে। তারপর একটু থেমে রাজা বললেন—দেখুন, আমার মেয়ে যথেষ্ট বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতী। আমি বরং তাকেই বলি স্বয়ম্বরা হয়ে আপনাদের মধ্যে যাঁকে তার মনে ধরবে, বেছে নিক।

নারদ এবং পর্বতমুনি দুজনে একই সঙ্গে বলে উঠলেন—উত্তম প্রস্তাব। আজ তাহলে আমরা যাই। স্বয়ম্বর সভা কাল হোক।

অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে নারদ মুনি, বন্ধু পর্বতকে বিদায় দিয়ে সোজা বৈকুণ্ঠে এসে নারায়ণের সামনে এসে হাজির হলেন।

—কি ব্যাপার নারদ! এমন হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে আসছ? বসো, বসো।

নারদ বললেন—আমার একটা ব্যক্তিগত কথা আছে। আপনাকে শুনতে হবে।

কেশব বললেন—বেশ তো, বল না।

—বললাম তো কেশব, আমার ব্যক্তিগত কথা। সকলের সামনে নয়।

—ওঃ...হ্যাঁ...হ্যাঁ। বলে যাঁরা সেখানে ছিলেন কেশব তাঁদের ইশারায় চলে যেতে বললেন। সকলে চলে গেলে কেশব বললেন—এবার বল।

নারদ বললেন—প্রভু, অযোধ্যায় গিয়েছিলাম। সঙ্গে আপনার আর এক ভক্ত পর্বতও ছিল। অম্বরীষ রাজার মেয়ে শ্রীমতীকে দেখে আমার খুবই পছন্দ হল। আমি তাকে বিয়ে করতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে পর্বতও দাবি জানিয়ে বসল। অম্বরীষ বলেছে, আগামী কাল স্বয়ম্বর সভায় তাঁর মেয়ে পছন্দ করে যাকে বেছে নিয়ে গলায় মালা দেবে, রাজা তাঁর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। কেশব, পর্বত বন্ধু হয়ে যে এমন কাজ করে বসবে, আমি তা বুঝতে পারি নি। আমি শ্রীমতীকে বিয়ে করতে চাই। তার জন্য একটা উপায় আপনাকে করতেই হবে।

নারায়ণ বললেন—কি উপায় আমি করতে পারি নারদ, বল।

—প্রভু, স্বয়ম্বর সভায় মালা হাতে শ্রীমতী যখন এগিয়ে আসবে, তখন পর্বতের মুখটা যেন মুখপোড়া হনুমানের মত দেখে। নারদ বললেন।

—তোমার যখন এত ইচ্ছে নারদ, তখন তাই হবে। মিটিমিটি হাসতে হাসতে নারায়ণ বললেন।

নারদ আনন্দে নারায়ণকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

নারদ চলে যাবার কিছু পরেই পর্বত মুনি নারায়ণের কাছে এসে হাজির।

—আরে, পর্বত যে? কি ব্যাপার? এসো...এসো।

পর্বত বললেন—প্রভু, মহা বিপদে পড়ে আপনার কাছে লুকিয়ে এসেছি।

নারায়ণ বললেন—তোমার আবার কি বিপদ হল?

—আজ্ঞে, প্রভু, ঐ নারদ। অম্বরীষ রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলুম, নারদ বাধা দিয়ে বসল। ঠিক হয়েছে, আগামীকাল স্বয়ম্বর সভায় মেয়ে নিজে আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেবে। আমাকে যাতে শ্রীমতী প্রথম চোখেই বেছে নিতে পারে, তার একটা উপায় আপনাকে করে দিতেই হবে।

—পর্বত, বল কি উপায় করলে তোমার কাজ হাসিল হবে?—বললেন নারায়ণ।

পর্বত একটু মাথা চুলকে নিয়ে বললেন—প্রভু, স্বয়ম্বর সভায় শ্রীমতী যখন মালা হাতে এগিয়ে আসবে, সে যেন দেখে নারদের মুখখানা লালমুখো বানর হয়ে আছে।

কেশব শুনে হাসতে হাসতে বললেন—তাতে যদি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তা-ই হবে।

পর্বত মুনি আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলেন। প্রণাম জানিয়ে যাবার সময় বললেন—প্রভু, দয়া করে এ কথা যেন আবার নারদকে বলে বসবেন না।

কেশবও অভয় দিলেন।

রাজার আদেশে অযোধ্যা নগরী তোরণে তোরণে রাতারাতি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। চারদিকে ফুলের মালা, আলোর ঝালর। রাজপ্রাসাদ যেন ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠল। সকাল হতে না হতেই দেশদেশান্তর থেকে রাজা-রাজড়ারা আসতে শুরু করলেন। আজ অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের মেয়ে শ্রীমতীর স্বয়ম্বর সভা।

যথাসময়ে নারদ এবং পর্বত মুনি এলেন। সকলেরই জানা, এই দুজনের মধ্যে একজনকেই আজ শ্রীমতী বরণ করে নেবে। তাই তাঁরা আসতেই সভায় সকলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। রাজা অম্বরীষও যথাযোগ্য মর্যাদা দেখিয়ে দুটি সিংহাসনে তাঁদের দুজনকে বসালেন। তারপর অন্তঃপুরে খবর পাঠালেন মেয়েকে আনতে।

অপরূপ সাজে সেজেছে শ্রীমতী। তাকে ঘিরে তার সখীর দল। হাতে মালা নিয়ে স্বয়ম্বর সভায় শ্রীমতী যখন এসে দাঁড়াল, সকলে দেখল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী এসে দাঁড়ালেন।

রাজা অম্বরীষ মেয়েকে বললেন—মা, সামনে যে দুজন মুনিশ্রেষ্ঠ সিংহাসনে বসে আছেন, ওঁদের মধ্যে একজন নারদ মুনি আর একজন পর্বত মুনি। তোমার যাঁকে পছন্দ হবে তাঁরই গলায় মালা দাও মা। তারপর যথাবিধি তাঁরই হাতে তোমাকে সম্প্রদান করব।

রাজার কথামত সখীদের নিয়ে শ্রীমতী মুনিদের দিকে এগিয়ে গেল। কাছাকাছি গিয়ে দুজনের দিকে তাকাতেই শ্রীমতীর বুক কেঁপে উঠল। তারই ফাঁকে শ্রীমতী দেখল অপূর্ব সুন্দর এক কিশোরকে। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, বলিষ্ঠ দেহ, হাতে ধনুক-বাণ। তার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছেন।

শ্রীমতীর বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। হাত থেকে মালা বুঝি খসে পড়ে



যায়। শ্রীমতীর এই অবস্থা দেখে সখীরা তাকে ধরাধরি করে মনে বল যোগাবার চেষ্টা করল। দেরি করছে দেখে রাজা অম্বরীষও মেয়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

—কি হয়েছে মা? তুমি অমন ভাবে আনমনা হয়ে গেলে কেন?

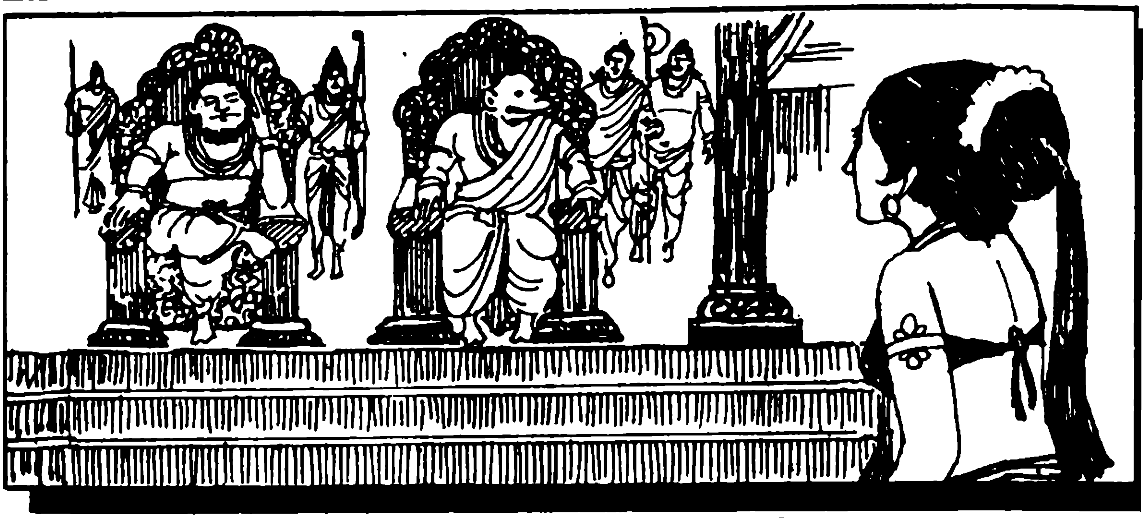
শ্রীমতী বলল—বাবা, আপনি যে বললেন, দুই মুনিশ্রেষ্ঠ বসে আছেন। আমি তো দেখছি দুই নর-বানর বসে আছে, বাবা। তুমি কি ওদেরই একজনকে আমায় বরণ করতে বল?

শুনে অম্বরীষ অবাক—কি বলছ মা? ছি...ছি! ও কথা মুখে এনো না। তুমি এ কি বলছ?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বিশ্বাস কর বাবা, আমি একটুও মিথ্যে বলছি না। আমি একজনকে দেখছি মুখপোড়া হনুমান, আর একজনকে দেখছি লালমুখো বানর। কিভাবে এঁদের তুমি মুনিশ্রেষ্ঠ বলছ বাবা? আরও দেখলাম, দুজনের মাঝে আর একজন। অপরূপ এক কিশোর। হাতে ধনুক-বাণ।—শ্রীমতী বলল।

কথাগুলো শুনে সভার সকলে তো বটেই, রাজাও রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। ওদিকে নারদ আর পর্বতও অবাক। মেয়ে বলে কি? ওঁদের মাঝখানে আবার আর একজন? অম্বরীষ কোন ভেল্কি খেলছেন না তো? এদিকে সকলেই দেখছেন সিংহাসনে বসে দুই মুনিশ্রেষ্ঠ, আর কেউ কোথাও নেই।

অম্বরীষ বললেন—মা, আমি তোমায় বলছি, সামনে দুই সিংহাসনে দুই মুনিই বসে আছেন। তুমি মাথা খারাপ না করে যাঁকে



পছন্দ হয়, তাঁরই গলায় মালা দাও মা। ওঁদের সম্বন্ধে ও কথা আর মুখে এনো না।

বাবার আদেশ। মালা হাতে শ্রীমতী আবার এগিয়ে গেল। কিন্তু কাছে যেতেই আবার সেই একই দৃশ্য—দুই নর-বানর বসে আছে সিংহাসনে। আর মাঝখানে সেই একই কিশোর। মুখে মৃদু হাসি। শ্রীমতীর দিকে চেয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীমতী নিঃসঙ্কোচে এবার এগিয়ে গিয়ে তাঁরই গলায় মালা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখের সামনেই শ্রীমতী অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ আর তাকে দেখতেও পেল না।

স্বয়ম্বর সভা বিস্ময়ে হতবাক।

নারদ আর পর্বত মুনিও পড়লেন দারুণ সংশয়ের মধ্যে। পর্বত মুনির মুখ যে পোড়া হনুমানের মত দেখতে হবে, নারদ মুনি এ কথা জানতেন। কিন্তু মেয়ে তাঁর মুখ লালমুখো বানরের মত দেখল কিভাবে? আর, চোখের সামনে থেকে এভাবে অদৃশ্যই-বা হল কেমন করে? নিজেদের মনে নিদারুণ ধিক্কার নিয়ে সভা থেকে দুজনেই বেরিয়ে এলেন।

পথে আসতে আসতে নারদ বললেন—আচ্ছা পর্বত, শ্রীমতী প্রথমবারে আমাদের দুজনের মাঝে একজনকে দেখল, দ্বিতীয়বারেও তাই। এ আমাদের জনার্দনের কোন কারসাজি নয় তো?

পর্বত বললেন—আমাদের প্রভুকে তো কখনো ধনুক-বাণ ধরতে দেখি নি, তিনি চক্রধারী। শ্রীমতী যাঁকে দেখেছে তার তো হাতে ধনুক-বাণ।

নারদের মন কিন্তু খুঁতখুঁত করতে থাকে। এত বড় মায়ার খেলা একমাত্র তাঁদের শ্রীহরি ছাড়া আর তো কারো করার ক্ষমতা নেই।

সত্যিই কিন্তু তাই। গোপনে নারায়ণই সকলের দৃষ্টির বাইরে থেকে একমাত্র শ্রীমতীকে দেখা দিয়ে স্বয়ম্বর সভা থেকে হরণ করে সোজা বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলে এসেছিলেন। কেননা, পূর্বজন্মে শ্রীমতী নারায়ণকেই স্বামী হিসেবে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

খুঁতখুঁতে মন নারদ বন্ধু পর্বতকে বলল—বন্ধু, চল একবার বৈকুণ্ঠে নারায়ণের কাছে যাই। রহস্যের একটা মীমাংসা করতেই হবে।

পর্বত মুনিও রাজি হলেন।

বৈকুণ্ঠে দুজনে ঢুকতেই নারায়ণ ওঁদের দেখতে পেলেন। তি তখন শ্রীমতীর সঙ্গে বসে রহস্য করছিলেন।

ওঁদের আসতে দেখেই শ্রীমতীকে আড়ালে পাঠিয়ে দিয়ে মুনিকে ডেকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার? তোম দুজনে যে?

নারদ প্রণাম জানিয়ে নারায়ণকে সরাসরি বলে বসলেন—প্র আপনি কেন শ্রীমতীকে ছল করে হরণ করলেন? আমাদের অপদ করলেন? এই কি আমাদের ভক্তির প্রতিদান দেওয়া হল?

শোনামাত্রই নারায়ণ দুহাতে কান চে বললেন—ছি...ছি...নারদ, এ কি কথা বলছ? শ্রীমতীকে আ দেখিও নি, চিনিও না। আমি কেন তাকে চুরি করে আনতে যা তবে যা হয়েছে, তাতে তোমাদের ভালই হয়েছে।

—ভাল-খারাপের প্রশ্ন থাক প্রভু। পর্বত বলেন—আমা মাঝে হাতে ধনুক-বাণ নিয়ে, গলায় মালা পরে কে ছিলে আপনার তো অজানা কিছু নেই?

—মাঝখানে ধনুক-বাণ হাতে! নারায়ণ যেন আকাশ থে পড়লেন—কি জানি বাপু, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আম হাতে যে চক্র ছাড়া আর কিছু থাকে না, তা তো তোমরা জা দেশে তো মায়াবীর অভাব নেই। সেরকম কেউ নিশ্চয়ই ঐ ভে ধরে শ্রীমতীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তবে যা হয়েছে, তা ভা জন্যই হয়েছে। বললেন নারায়ণ।

নারায়ণ কি আর মিথ্যা কথা বলবেন! মুনিরা তো সঙ্গে স অম্বরীষের ওপর মনে মনে ফুঁসে উঠতে লাগলেন।

নারদের মনে আর একটা খটকা ছিল। জিজ্ঞেস করলেন—আ প্রভু, শ্রীমতী আমার মুখ লালমুখো বাঁদরের মত দেখেছিল কে করে?

হাসতে হাসতে নারায়ণ বললেন—সে কি? নারদ লালমু বানর! আর পর্বত?

পর্বত মুনি বললেন—প্রভু, মুখপোড়া হনুমান।

নারায়ণ এবার হাসিতে ফেটে পড়লেন। সে কি? মহা

তোমরা? তোমাদের মুখ অমন দেখাবে কেন? মনটাকে হনুমান আর বানর বানিয়ে নিয়ে যাও নি তো?

তারপর দুজনকে আলাদা আলাদা ডেকে কানে কানে বললেন—ওই মুখ তোমাদের আমিই করে দিয়েছিলাম। তোমাদের ভালর জন্যই।

ভাল...ভাল...ভাল। ঠাকুর কি ছাই ভাল করলেন যে তাঁদের তা মাথায় ঢোকে না। ওদিকে নারায়ণ যে শ্রীমতীকে চুরি করে আনেন নি, তা শোনার পর থেকেই দুজনের মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল।

নারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে নারদ আর পর্বত সোজা অযোধ্যায় রাজা অম্বরীষের কাছে এসে হাজির হলেন। রাজাও যথারীতি তাঁদের আবার অর্ভ্যথনা জানালেন। বসতে আসন দিলেন। কিন্তু বসবেন কি? মাথায় যে তখন আগুন জ্বলছে।

না বসেই দুই মুনিই এক সঙ্গে প্রায় গর্জন করে উঠলেন—রাজা, তুমিই আমাদের আহ্বান জানিয়ে আমাদের অপমান করেছ। আমাদের ঠকিয়েছ। আমরা তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি 'তুমি নিজেকে বিস্মৃত হও'। তুমি কে, তা যেন তুমি নিজেই আর জানতে না পার।

অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অন্ধকারের মত বিস্মৃতি যেই রাজার দিকে নেমে আসতে লাগল, অমনি সদা-সতর্ক সুদর্শন চক্র এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। সুদর্শন দেখে রাক্ষসী বিস্মৃতি নারদ আর পর্বত মুনির দিকে মুখ ফেরাতেই, দুই মুনি সেখানে থেকে দৌড় দিলেন—কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখেন, বিস্মৃতি আর তার পেছনে সুদর্শন চক্র তাঁদের দিকেই ছুটে আসছে। পড়ি কি মরি করে আবার দুই মুনি দৌড় দিলেন। যেখানেই যান, সেখানেই পেছনে ওরা।

শেষে নিরুপায় হয়ে ছুটতে ছুটতে বিষ্ণুলোকে এসে নারায়ণের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লেন—প্রভু, আমাদের বাঁচান।

—ওঠ...ওঠ। কি হল? বলে নারায়ণ ওঁদের ধরে তুলতেই রাক্ষসী বিস্মৃতির পেছনে সুদর্শনকে ছুটে আসতে দেখে ব্যাপারটা বুঝলেন।

তারপর অনুরোধ জানিয়ে বিস্মৃতিকে থামিয়ে সুদর্শনকেও থামালেন।

বিস্মৃতিকে বললেন—অভিশাপ বৃথা যাবে না, তা আমি জানি। সুদর্শনের ভয়ে তুমি অম্বরীষকে গ্রাস করতে না পেরে এঁদেরই গ্রাস করতে এসেছ। এঁরা তিনজনই আমার পরম ভক্ত। তুমি আপাতত এঁদের তিনজনকেই রেহাই দাও।



—কিন্তু, মুনিরা যে আমায় সৃষ্টি করলেন, আমি এখন কোথায় যাব? বিস্মৃতি জিজ্ঞেস করল।

নারায়ণ বললেন—ভক্তের বোঝা চিরকাল ভগবানকেই বইতে হয়, এ-তো তুমি নিশ্চয়ই জানো। শোন, রাজা অম্বরীষের বংশে আমি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র হয়ে জন্ম নেব। আমার ডান হাত হবে মধ্যম পুত্র ভরত, বাঁহাত হবে শত্রুঘ্ন নামে তৃতীয় পুত্র, আর এই যে অনন্তদেব, লক্ষ্মণ নামে চতুর্থ পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তখন তুমি এসে আমায় গ্রাস করবে।

এরপর আর কোন কথা চলতে পারে না। বিস্মৃতি চলে গেল। সুদর্শনও চলে গেল।

নারদ আর পর্বত মুনিও কেশবকে প্রণাম করে বিষ্ণুলোক থেকে বেরিয়ে এলেন।

মুখ বুজে সব কিছু ভাবতে ভাবতে চলতে চলতে একসময় নারদ মুনি বলে উঠলেন—জীবনে আর বিয়েই করব না।

পর্বত মুনিও বলে উঠলেন—আমিও। বিয়ের নামও আর মুখে আনব না।



মৎস্য পুরাণ

ভগবান বিষ্ণু একবার মৎস্য অবতার হয়ে মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে মনু মহারাজ অলৌকিক জলযানে সৃষ্টির যাবতীয় বীজ নিয়ে মৎস্যরূপী তাঁরই শিঙে মহাসমুদ্রে সুদীর্ঘকাল নোঙর করেছিলেন। সেই সময় তিনিই মনুকে আদিপুরুষ, দেব-দেবতা, সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে পুরাতন রাজ-রাজড়ার কথা—নানা কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই পুরাণ-কাহিনীর নাম তাই মৎস্যপুরাণ। বেদব্যাস পরে সেই কাহিনী সঙ্কলন করেন এবং প্রিয় শিষ্য সূতকে শেখান। পরে নৈমিষারণ্যে সূত মুনিদের তা শুনিয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা মেটান।

কচের সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ

জ্ঞাতি-শত্রুর মত শত্রু, আর জ্ঞাতি-বিরোধের মত বিরোধ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। ঈর্ষাই এই বিরোধের একমাত্র মূল। সৃষ্টির শুরু থেকে এই বিরোধ চলে আসছে, আর আজও সমানে চলেছে। তাই একটানা শান্তি কোথাও নেই।

অসুররা জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন দৈহিক বলে বলবান, তেমনি নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই মত্ত। সেই সঙ্গে তাদের একমাত্র চিন্তা, কিভাবে আরও সমৃদ্ধশালী হবে। জ্ঞাতি ভাই সুর অর্থাৎ দেবতারা ঠিক এর উলটো। তাঁদের জন্মই যেন সোনার চামচ মুখে দিয়ে। অভাব যেমন নেই, তেমনি কোন অভিযোগও নেই। মনও সেই সঙ্গে উদার। ভোগ তাঁরা একা করতেন না। সকলকে দিয়ে-থুয়ে সন্তুষ্ট করতেন। তাই সকলে তাঁদেরই ভালবাসত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। অপরদিকে অসুরদের ভয় পেত, মনে মনে ঘৃণা করত। দেবতাদের ওপর অসুরদের রাগ সেই কারণেই। অসুররা তাই সব সময়ই চেষ্টা করতেন, অসুরদের কিভাবে ঠেকানো যায়।

অসুরদের গুরু ছিলেন মহাতেজস্বী ভৃগু মুনির পুত্র ভার্গব বা শুক্রাচার্য। পৃথিবীতে এমন কোন বিদ্যা ছিল না, এমন কি কূটবিদ্যা পর্যন্ত, যা শুক্রাচার্যের জানা ছিল না। তিনি শিবকে সন্তুষ্ট করে সব বিদ্যাই আয়ত্ত করেছিলেন, সেইসঙ্গে অমরত্ব পেয়েছিলেন। ওদিকে অঙ্গিরার পুত্র আঙ্গিরস, সকলে যাঁকে বৃহস্পতি বলে জানে, জ্ঞানে-বিদ্যায় তিনিও কিছু কম ছিলেন না। শিবের অনুগ্রহে বৃহস্পতিও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন। দেবতারা তাঁকেই তাঁদের গুরু বা প্রধান মন্ত্রণাদাতা হিসেব মেনে নেওয়ার ফলে শুক্রাচার্য মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে অসুরদের গুরু হয়ে বৃহস্পতির জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় কতখানি, তা দেখবার জন্য মারাত্মক খেলা খেলতে শুরু করে দিলেন। অসুররা তাঁরই পরামর্শে দেবতাদের বিপাকে ফেলার চেষ্টা করত। আর দেবতাদের অস্ত্রের আঘাতে মারা গেলে তাঁর মোক্ষম মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে দিতেন। তাই অমর দেবতারা কোন মতেই অসুর-বংশ একেবারে শেষ করে দিতে পারতেন না। সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে তারা বেঁচে তো উঠতই, সেই সঙ্গে অফুরন্ত শক্তিও পেত। দেবতাদের তখন আর কোনমতেই অসুরদের ঠেকানো সম্ভব হতো না। অসুরদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে পালাতে বা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হতেন।

এ রকম একবার অসুরদের কাছে গো-হারান হেরে গিয়ে দেবগুরুকে নিয়ে দেবতারা একটা আলোচনা সভা করলেন—কিভাবে অসুরদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, আর শুক্রাচার্যকেই-বা কিভাবে কায়দা করা যায়।

বৃহস্পতিরও সেই একই চিন্তা। ঠিক ঈর্ষা নয়, দুঃখ। জ্ঞানী হয়েও অন্যায়কারী অসুরদের ভার্গব এভাবে মদত দিচ্ছেন কেন? জ্ঞানগর্বে ভার্গব কি শেষে উন্মত্ত হয়ে ভাল-মন্দ বিচার করার শক্তিও হারিয়ে ফেললেন। শিব দুর্লভ মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা একমাত্র ভার্গবকেই দিয়েছেন। ঐ বিদ্যা ভার্গব ছাড়া আর কেউ জানেও না। শিবের কাছে তিনি আবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ যে, এই বিদ্যা তিনি তাঁর কোন শিষ্যকেই শেখাতে পারবেন না।

দেবতারা সবাই মিলে মন্ত্রণা করলেন, যেভাবেই হোক, ভার্গবের কাছ থেকে ঐ বিদ্যা চুরি করে আনতে হবে। আবার, এমন ভাবে আনতে হবে, যাতে শুক্রাচার্য কোন রকম সন্দেহ করতে না পারেন।

সবাই মিলে অনেক আলোচনার পর ঠিক করলেন, আমাদের মধ্যে এ কাজ একমাত্র কচই করতে পারবেন। কিশোর হলে কি হবে, ইতিমধ্যে আচারে-ব্যবহারে, বিনয়ে-শ্রদ্ধার কচ অতুলনীয় হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গে দেখতেও ভারি মিষ্টি। কচ হলেন দেবগুরু বৃহস্পতিরই ছেলে।

সভায় কচকে ডাকা হল। দেবতারা বললেন—কচ, তোমাকে একবার অসুরপুরে যেতে হবে। অসুরপুরের রাজা এখন বৃষপর্বা। ভার্গব এখন তাঁরই কাছে আছেন। তোমাকে আমাদের জন্য তাঁর কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করে আনতে হবে। আমরা অনেক ভেবে দেখলাম, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে একমাত্র তুমিই পারবে। দেবযানী নামে তাঁর একটি মেয়ে আছে। ভার্গব তাকে খুবই স্নেহ করেন।

ভয়ডর কি জিনিস, কচ তা জানতেন না। দেবতারা তাঁকে মনের মত একটা কাজ দিয়েছেন, এতেই তিনি খুশি।

কচ তক্ষুণি অসুরপুরে এসে হাজির হলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই কচ আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন—আমি আঙ্গিরস বৃহস্পতি পুত্র কচ। ভার্গবের কাছে এসেছি।

অসুররা শুনেই একটু নড়েচড়ে উঠল।

শুক্রাচার্য কিন্তু সাদরে কচকে বললেন—বল বৎস, আমার কাছে তোমার আসার কারণ।

কচ বললেন—আমি আপনার শিষ্য হয়ে জ্ঞানার্জন করতে চাই।

ভার্গব বললেন—আমার পথে জ্ঞানার্জন কিন্তু খুবই কঠিন বৎস।

—যত কঠিনই হোক, আমি তা করে যাব, গুরুদেব। আপনি আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন। —কচ বললেন।

খুব খুশি মনে শুক্রাচার্যও অনুমতি দিলেন। বৃহস্পতির পুত্র কচ তাঁর শিষ্য হচ্ছেন, শুক্রাচার্যের কাছে এ কি কম গৌরবের?

অনুমতি পেয়ে কচ শুক্রাচার্যের আশ্রমে এলেন। তারপর জ্ঞানার্জনের জন্য যে সব নিয়ম পালন করা দরকার, সেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতে লাগলেন। কঠোর ব্রহ্মচারী, কঠোর সংযমী। শুক্রাচার্য খুশি তো হলেনই, এমন কি তাঁর একমাত্র মেয়ে দেবযানীও তাকে দেখে মোহিত হয়ে গেল। দেবযানী শুক্রাচার্যের

মেয়ে বটে, কিন্তু তার মা ছিলেন স্বয়ং ইন্দ্রের মেয়ে জয়ন্তী। ফলে দেব-দুর্লভ রূপ-গুণ সব কিছুই দেবযানীর মধ্যে ছিল। কচও দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র। রূপে-গুণে তিনিও কিছু কম ছিলেন না। গুরুর আশ্রমে থাকতে থাকতে দুজনের মধ্যেই ভাব-ভালবাসা জন্মে গেল। গুরু তো বটেই, এমন কি গুরুকন্যা কিসে খুশি থাকবে, কচ সব সময়েই সেদিকে সজাগ ছিলেন। দেবযানী খুব মোহিত হয়ে গেলেও কচ কিন্তু কঠোর ভাবে নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে চলতেন।

বৃহস্পতির ছেলে কচকে এইভাবে প্রশ্রয় দিয়ে রাখা অসুররা কিন্তু পছন্দ করল না। অথচ গুরুদেবের মুখের ওপর তারা কিছুই বলতে পারে না। তাই সব সময়ই তারা সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

এভাবে অপেক্ষায় থাকতে থাকতে অসুরদের হাতে একদিন সুযোগ এসেও গেল।

গুরুদেবের গরু নিয়ে কচ বনে চরাতে গেছেন। তক্কে-তক্কে ছিল অসুররা। হুট করে বনে এসে তারা কচকে আক্রমণ করল। তারপর তাকে মেরে টুকরো টুকরো করে কাটল, আর টুকরো মাংসগুলো তাদের পোষা সিংহকে খাইয়ে দিল। কাজ শেষ। নিশ্চিন্ত মনে অসুররা ফিরে গেল।

সন্ধ্যা হল। চেনা পথ ধরে গরুগুলো আশ্রমে ফিরে এল। কিন্তু কচ ফিরল না। দেবযানী তা দেখেই বাবার কাছে গিয়ে বলল—বাবা, গরু ফিরে এল, কিন্তু কচ ফিরল না কেন? নিশ্চয়ই কেউ তার কোন ক্ষতি করেছে। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, কচকে ফিরিয়ে আন।

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শুক্রাচার্য তাঁর বিদ্যা প্রভাবে কচের নাম ধরে বলতে লাগলেন—কচ, তুমি যেখানেই থাক এখুনি এসো, চলে...এসো।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে কচ এসে হাজির হলেন।

দেবযানী জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছিল কচ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কচ সব কথাই তাঁদের খুলে বললেন। শুনে দেবযানী মনে মনে অসুরদের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হল।

অসুররা দেখল, গুরুদেব আবার কচকে বাঁচিয়ে এনেছেন। কেন গুরুদেব একজন শত্রুর ছেলেকে এভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? সবাই মিলে যুক্তি করল, কচকে এবার এমন ভাবে সরিয়ে দিতে হবে যে গুরুদেব আর কোন ভাবেই তাকে বাঁচাতে পারবেন না।

যুক্তি-পরামর্শ করে বৃষপর্বাকে রাজি করিয়ে অসুররা রাজসভায় একটা বিশাল ভোজের আয়োজন করল। জালা-জালা মদ, তার সঙ্গে ভাল ভাল খাবার। গুরুদেবকেও তাতে তারা আমন্ত্রণ জানাল।

যেদিন ভোজ, সেদিনই কচ দেবযানীর অনুরোধে ফুল-বাগানে তার জন্য ফুল আনতে গিয়েছিল। অসুররা সেই সুযোগে মায়াজাল বিস্তার করে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। তারপর তাকে পুড়িয়ে ছাই করে, সেই ছাই এনে একজালা মদের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে দিল।

ভোজসভায় ভোজ চলেছে পুরোদমে। অসুররা সেই ছাই-মেশানো জালার মদটা তাদের গুরুদেবকে খেতে দিল। ভার্গবও তা এক চুমুকে গিলে ফেললেন। অসুররা নিশ্চিন্ত। গুরুদেব এরপর নিশ্চয়ই আর তাঁকে বাঁচাতে পারবেন না।

ভোজ শেষে শুক্রাচার্য আশ্রমে ফিরে আসতেই দেবযানী বলল—বাবা, কচ আমার জন্য অনেকক্ষণ হল ফুল তুলতে গেছে। এখনও ফিরল না কেন, বাবা? কেউ কি আবার তার কোন অনিষ্ট করল?

শুক্রাচার্য বললেন—একবার তো তাকে বাঁচিয়ে আনলাম, মা। আবার কি করতে পারি বল? অসুররা নিশ্চয় চায় না সে এখানে থাকুক।

দেবযানী বলল—তাদের গুরুদেব আপনি। তারা আপনার দাস। আপনি যাকে আশ্রয়ে দেবেন তার কোন ক্ষতি করা কি আপনার শিষ্যদের উচিত? এতে কি গুরুদেবকেই অপমান, অবমাননা করা হয় না, বাবা? আপনি যদি কচকে ফিরিয়ে আনতে না পারেন, তাহলে জেনে রাখুন, আমিও মরব।

দেবযানী তাঁর একমাত্র মেয়ে। এ কি কথা বলছে? শুক্রাচার্য মেয়ের সব কথা বুঝেও খানিকটা সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন—মা, এত বড় অসুররাজ্যের সব কিছুই আমার, মানে তোমার। তুমি ইচ্ছে করলে কত কি পেতে পার। সামান্য কচের জন্যে এত উতলা হচ্ছ কেন?

—বাবা, বৃহস্পতি দেবগুরু হলেও কচ তাঁরই পুত্র। আপনি কি বৃহস্পতিকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেন না, বাবা? তা যদি না করতেন তাহলে কচকে নিশ্চয়ই আমল দিতেন না।

অকাট্য যুক্তি মেয়ের। শুক্রাচার্য মনে মনে ভাবলেন, সত্যিই তো, অসুররা তাঁর স্তব-স্তুতি করে, তাঁকে সম্মান করে চলে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের এ কি বিরুদ্ধাচরণ? কচ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণহত্যা মহাপাপ। তা জেনেও তাঁর শিষ্যরা কেন এমন কাজ বারবার করছে? তাহলে কি মুখেই তারা তাঁকে শ্রদ্ধা দেখানোর ভান করে? না, এ ভারি অন্যায়।

শুক্রাচার্য তখন মেয়েকে ঠাণ্ডা করে আবার আগের মতই কচের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন—কচ এসো। যেখানেই থাক, এসো।

সকলকে অবাক করে দিয়ে শুক্রাচার্যের পেটের ভেতর থেকে কচের গলার স্বর ভেসে এল—গুরুদেব, আমি যে আপনার পেটের মধ্যে আটকে আছি। কেমন করে বের হব?

শুনে শুক্রাচার্য চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আমার পেটের ভেতর কেমন করে গেলে?

কচ তখন ফুল তুলতে গিয়ে যা যা ঘটেছিল সব কথা ভার্গবকে খুলে বলল। ভার্গবের তো তা শুনে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। ছি...ছি, অসুররা তাঁকে মদ খাওয়াল, আর ব্রাহ্মণ হয়ে মদ খেয়ে তিনি উন্মত্ত হয়ে গেলেন? এখন উপায়?

দেবযানীকে বললেন—মা, তুমি যদি কচকে ফিরে পেতে চাও, তাহলে আমাকে হারাতে হবে। আর যদি আমাকে চাও, তাহলে কচের কথা তোমার আর ভাবা চলবে না। বল, কোনটা চাও।

দেবযানী বলল—মাকে যে কবে হারিয়েছি আমার মনে নেই। তুমিই আমার বাবা, আমার মা। তোমাকে আমি কোনমতেই আমার সামনে মরতে দিতে পারি না বাবা। কিন্তু কচকে যে আমি খুবই ভালবাসি। সে আমার কাছে না থাকলে আমার আর আনন্দ বলে কিছুই থাকবে না। আমি তোমার মরা মেয়ের সামিল হব বাবা।

ভার্গব বললেন—মা, তোমার ইচ্ছে পূরণ করতে হলে আমার একটা মাত্র পথই খোলা আছে। আমি সেই পথই নিচ্ছি।

এই বলে কচকে উদ্দেশ্য করে বললেন—কচ, নিয়মনিষ্ঠা আর ব্রহ্মচর্য নিয়ে থাকার পর আমার উদরে ঢুকে তুমি আমার গুপ্ত সঞ্জীবনী বিদ্যার অধিকারী হয়ে গেছ। আমি মেয়ে দেবযানীর মুখ চেয়ে তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি উদর চিরে বেরিয়ে এসো। তারপর সঞ্জীবনী বিদ্যার বলে আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার কোরো।

পেটের ভেতর থেকে কচ বললেন—তাই হবে গুরুদেব।

শুক্রাচার্যের পেট চিরে কচ বেরিয়ে এসে কথামত বিদ্যার প্রভাবে আবার গুরুদেবকে বাঁচিয়ে তুললেন।

সেই দুর্লভ বিদ্যা এখন কচের আয়ত্তে। শিষ্য হয়ে থাকার কালও শেষ হয়ে গেল।

গুরুদেবের কাছে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে কচ বললেন—গুরুদেব, এবার বিদায় দিন। অনুমতি করুন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই।

ভার্গব সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে অসুর শিষ্যদের ডেকে বললেন—মূর্খের দল, শুনে রাখ, এতদিন যে বিদ্যা আমার একারই ছিল, আজ থেকে বৃহস্পতি-পুত্র কচও সেই বিদ্যার অধিকারী হল। এর একমাত্র কারণ তোমাদের বোকামি।

সঞ্জীবনী বিদ্যার অধিকারী হয়ে কচ দেবলোকে ফিরে আসতে যাবেন অমনি দেবযানী বাধা দিল। বলল—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে যেতে পার না। তুমি জান, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি নি বলেই বারবার তোমাকে বাঁচিয়ে এনেছি। তুমি জ্ঞানবান হয়ে আমাকে কি করে পরিত্যাগ করে যাচ্ছ?

কচ বললেন—আমি তোমাকে আমার বোনের মতই দেখি। তোমার পিতা ভার্গব গুরু হিসেবে আমারও পিতা। তুমি অনুচিত অনুরোধ কোরো না।

দেবযানী শুনে যেমন ক্ষুণ্ণ হল, তেমনি ক্রুদ্ধও হল—কচ, এ তোমার ঔদ্ধত্য। আমারই জন্য তুমি দুর্লভ বিদ্যার অধিকারী হয়েছ। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি যেখানেই এ বিদ্যা প্রয়োগ কর না কেন, ব্যর্থ হবে।

কচ বললেন—ছি...ছি দেবযানী, তুমি না ভার্গবের কন্যা? তোমার পিতা আমায় নিশ্চিন্ত মনে যাবার অনুমতি দিলেন, আর তুমি অভিশাপ দিলে? দাও। তবে একথা জেনে রাখ, আমি প্রয়োগে ব্যর্থ হলেও আমি যাকে এই বিদ্যা শেখাব, তার প্রয়োগ ব্যর্থ হবে না। আর...আর কোন ঋষিপুত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে কোন দিনই হবে না।

এই বলে কচ চলে গেলেন।

দেবসমাজ কচকে ফিরতে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। তারপর তাঁকেই গুরু করে দেবতারাও সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে নিয়ে যেটুকু অভাব ছিল সেটুকু পূরণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

বৃহস্পতির ছলনা ও দানব-পরাভব

দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় দানবেরা সত্যি সত্যিই খুব হীনবল হয়ে পড়ল। দানবকুলের বড় বড় রথীরা মারের পর মার খেতে খেতে শেষে প্রায় সব মরেই গেল। বিরোচন গেল, বলি গেল। প্রহ্লাদ তো যাওয়ার মধ্যেই। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে তার তেমন মতিও নেই।

একটানা বহু বছর রাজত্ব করার পর দানবদের এই পতন দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যও রুখতে পারলেন না। তাই পরামর্শ দিলেন—শোন, আপাতত আর যুদ্ধ নয়। দেবগণের সঙ্গে সন্ধি করে থাক। ওরা যা বলে এখন তা শোন, সেই মত কাজও কর। তবে কিছুদিন। আমি এখন শিবের কাছে যাব। তাঁকে তুষ্ট করে যেভাবেই হোক, আমি এমন সব বিদ্যা নিয়ে আসব যা দেবতারা কখনো দেখে নি। এসে সেগুলো তোমাদের শিখিয়ে দেব। তারপর তোমরা আবার যুদ্ধ কোরো।

গুরুদেবের কথা অসুররা মেনে নিল। না মেনে অবশ্য উপায়ও ছিল না। যার যা হাতিয়ার ছিল, প্রহ্লাদের নির্দেশে সব কিছুই তারা দেবতাদের কাছে পরিত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করল। দিন কাটাতে লাগল তপস্যা করে।

যাবার আগে গুরুদেব তাদের আর একটা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। যতদিন তিনি না ফেরেন, ততদিন রাজ্য পরিত্যাগ করে তারা যেন তাঁর পিতৃদেব ভৃগু মুনির আশ্রমে থাকে।

অসুররাও সেই মত ভৃগু মুনির আশ্রমে থেকে গুরুদেবের ফেরার দিন গুণতে লাগল, আর তপস্যা করে নির্ভয়ে দিন কাটাতে লাগল। যুদ্ধ করবে না বলে অসুররা গুরুদেবের কথায় অস্ত্র পরিত্যাগ করলে দেবতারাও তাদের অভয় দিয়েছিলেন।

শুক্রাচার্য তাঁর কথামত সোজা শিবের কাছে গিয়ে দাবি জানালেন—মহাদেব, দেবগুরু বৃহস্পতির যেসব বিদ্যে জানা নেই, আমাকে আপনি সেসব বিদ্যে দিন।

মহাদেব বললেন—ভার্গব, তার জন্য তোমাকে সুদীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করতে হবে। যদি এক মনে সাধনা করতে পার, তাহলে পাবে।

ভার্গব বললেন—কি সাধনা করতে হবে বলুন।

মহাদেব তাঁকে এমন একটা সাধনার কথা বললেন, যা মোটেই সহজ নয়।

ভার্গব তাতেই রাজি হয়ে মাথা নিচু করে পা ওপরে তুলে সেভাবেই সাধনা শুরু করে দিলেন।

দেবলোকে খবর এল। দেবতারাও ভার্গবের সেই সাধনা দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। এমনিতেই ভৃগু বংশ বড় তেজস্বী। তার ওপর আবার ভার্গব শুক্রাচার্য। শিবের কাছ থেকে বিদ্যা আদায় না করে কি আর ছাড়বেন? তারপর গিয়ে দানবদের শেখালেই তো সর্বনাশ। দেবতারা তাই পরামর্শ করে ঠিক করলেন, আছে তো মুষ্টিমেয় কিছু দানব, তাও নিরস্ত্র। ও-কটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আর কতক্ষণ? ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে দানবকুলের এমন আর কেউ থাকবে না ভার্গব এসে যাকে বিদ্যা শেখাতে পারবেন।

পরামর্শমত দেবতারা কাজও করে বসলেন।

হঠাৎ একদিন সদলবলে দেবতারা চড়াও হলেন অসুরদের ওপর। প্রহ্লাদ বলল—সে কি, আমরা অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করেছি। যুদ্ধ করব না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আপনারাও আমাদের নির্ভাবনায় থাকার জন্যে অভয় দিয়েছিলেন। এখন দেবতা হয়ে নিজেরাই কথার খেলাপ করে আমাদের মারতে এলেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দেবতারা আর কি দেবেন। প্রহ্লাদের কথা অগ্রাহ্য করে অসুরদের মারতে শুরু করে দিলেন দেবতারা।

বেগতিক দেখে অসুররা ভৃগুর পত্নী অর্থাৎ তাদের গুরুমা-র পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল—মাগো, আমাদের বাঁচান।

গুরুমা সব শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠলেন—এ কি অন্যায়! নিরস্ত্র নিরীহদের ওপর দেবতাদের এ কি আচরণ! চল তো, দেখি, কে কেমন দেবতা! কতখানি শক্তিধর?

এই বলে ভৃগুপত্নী বেরিয়ে এসে গর্জন করে উঠলেন—সাবধান দেবগণ! এরা এখন আমার আশ্রয়ে আছে। তোমরা যদি এদের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা কর তাহলে কিন্তু আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

একজন স্ত্রীলোকের হুমকিতে দেবগণ থেমে যাবেন? হইহই করে এগিয়ে আসতেই ভৃগুপত্নী আবার এক হুমকি ছাড়লেন।

ইন্দ্র হাতিয়ার তুলেছিলেন অসুরদের মারবেন বলে। ভৃগুপত্নীর হুঙ্কারে হাতের অস্ত্র হাতেই থেকে গেল, এমন কি যেন নড়বার শক্তিও হারিয়ে ফেললেন। দেবরাজের ঐ অবস্থা দেখে দেবসেনারা সব ত্রাহি ত্রাহি করে পালাল। বিষ্ণু কিন্তু দেবরাজকে ফেলে পালালেন না। পাশে এসে চুপিচুপি বললেন—তুমি আমার শরীরের ভেতর ঢুকে পড়। ইন্দ্র তাই-ই করলেন।

কিন্তু ভৃগুপত্নীর নজর এড়াতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কাপুরুষ, ভেবেছ বিষ্ণুকে আশ্রয় করে পরিত্রাণ পাবে? স্ত্রীলোকের শক্তি কতখানি তাহলে এবার দেখ। তোমার সঙ্গে তোমার আশ্রয়দাতা বিষ্ণুকেও এবার যোগবলে আমি পুড়িয়ে মারব।

শোনামাত্রই ইন্দ্রের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেল। বুঝতেই পেরেছেন, ইনি সামান্য মহিলা নন। তাই বিষ্ণুকে বললেন—প্রভু, ও কাজ শুরু করার আগেই আপনি চক্র দিয়ে ওর মাথাটা কেটে ফেলুন। আমি পুড়ে মরি, দুঃখ নেই। কিন্তু এখন আমার সঙ্গে আপনাকেও যে পুড়ে মরতে হবে।

স্ত্রীলোককে হত্যা করা—এটা কি উচিত হবে? —বললেন বিষ্ণু।

তারপর বিষ্ণু একটু দোনা-মনা করে শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন, এক্ষেত্রে কোন অন্যায় বা পাপ হবে না। ভৃগুপত্নী স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু এখন তিনি, বলতে গেলে হত্যাকারিণী। তাই কালক্ষেপ না করে সুদর্শনকে আহ্বান করতেই চক্র এসে ভৃগুপত্নীর মাথা কেটে বেশ কিছু দূরে ফেলে দিল।

মহামুনি ভৃগু এতক্ষণ কোন মাথা ঘামান নি। এবার বিষ্ণুর এই কাণ্ড দেখে মহা তেজের সঙ্গে এগিয়ে এসে বিষ্ণুকে বললেন—ছি...ছি! এর নাম তুমি বিষ্ণু! আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমাকে পৃথিবীতে বারবার মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে।

এই বলে স্ত্রীর ছিন্ন মুণ্ডুটা কুড়িয়ে এনে আবার যথাস্থানে বসিয়ে বলতে লাগলেন—বিষ্ণু তোমায় মেরেছে। আমি তোমার স্বামী ভৃগু মুনি জীবনে যদি কখনো অন্যায় করে না থাকি, কখনো মিথ্যে কথা না বলে থাকি, তাহলে তুমি বেঁচে উঠবে—বেঁচে উঠবে—বেঁচে উঠবে।

ইন্দ্র আর বিষ্ণুর সঙ্গে বৃহস্পতি আর সব দেবতারাও আড়াল থেকে দেখলেন ভৃগুপত্নী সত্যিই বেঁচে উঠলেন—যেন এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন।

মাথা হেঁট করে ইন্দ্র সুরলোকে ফিরে এলেন। অসুরদের নিকেশ করা গেল না। ওদিকে শুক্রাচার্যও তপস্যায় অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। কি করা যায়? উপায় কি? সারা রাত ছটফট করে কাটিয়ে সকাল হতেই দেবগুরু বৃহস্পতির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করলেন। তারপর নিজের মেয়ে জয়ন্তীকে ডেকে বললেন—মা, দেবকুলের জন্য একটা কঠিন কাজ তোমায় করতে হবে। সে কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করল—কি কাজ বাবা বলুন। যত কঠিন হোক, দেবসমাজের জন্য আমি তা নিশ্চয় করব।

—শোন মা, ভার্গব মহাদেবের কাছে মহাবিদ্যা লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করছেন। তপস্যার পরই তিনি বিদ্যালাভ করে অসুরকুলে ফিরে গিয়ে তাদের এমন শক্তিশালী করে তুলবেন যে, আমাদের আর ঠাই-কুল থাকবে না। যাতে ভার্গব তাড়াতাড়ি ফিরতে না পারেন, তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। ইন্দ্র বললেন।

—বেশ বাবা, তাই হবে। এই বলে শুক্রাচার্য যেখানে তপস্যা করছিলেন সেখানে তপস্বিনীর বেশে গিয়ে হাজির হলেন। তারপর নিষ্ঠার সঙ্গে ভার্গবের সেবা-পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ভার্গব আপন তপস্যায় এমন মগ্ন যে, কোন একটি মেয়ে তাঁর সেবা করছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই ছিল না।

সাধনার কাল শেষ হল। মহাদেব এলেন। বললেন—ভার্গব, সার্থক তোমার সাধনা। এযাবৎকাল একমাত্র তুমি ছাড়া এমন ধৈর্যের পরীক্ষা আর কেউ দিতে পারে নি। আমার যত গোপন বিদ্যা আছে, আমি সবই তোমায় দিলাম। সযত্নে রেখো কিন্তু।

ভার্গব মহাদেবকে প্রণাম জানালেন। মহাদেবও অন্তর্হিত হলেন। শুক্রাচার্যের এবার অসুরপুরে ফেরার পালা।

ওদিকে অসুররাও দিন গুণছিল। তারাও বুঝল, গুরুদেবের সাধনার নির্দিষ্ট দিন শেষ হয়েছে। এবার তিনি ফিরে আসছেন।

কিন্তু ভার্গব মুখ ফিরিয়েই জয়ন্তীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—তপস্বিনীর বেশে তুমি এখানে আমার কাছে কি চাও? কেন তুমি এভাবে আমার সেবা করছ?

জয়ন্তী বললেন—আমার মনের অভিলাষ কি আপনার অজানা?

ভার্গব বললেন—না দেবী। তুমি,তুমি দশ বছর আমার সহধর্মিণী হয়ে আমার ঘর করতে চাও। বেশ, তাই হবে। চল।



এই বলে জয়ন্তীকে নিয়ে ভার্গব ঘরে ফিরলেন। তাঁকে বিয়ে করলেন। কিন্তু এমনভাবে থাকলেন যে, কেউ তাঁর সন্ধানও করতে পারল না। অসুররা এসে ফিরে গেল। ভার্গব জয়ন্তীকে নিয়ে সব ভুলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ইন্দ্রের কাছে খবর পৌঁছতে দেরি হল না।

সঙ্গে সঙ্গে দেবগুরু বৃহস্পতিকে ডেকে ইন্দ্র বললেন—দশ বছর ধরে ভার্গব অসুরকুলে ফিরতে পারছেন না। এই পরম সুযোগ। যেভাবেই হোক অসুরদের আপনি মতিভ্রম ঘটান।

বৃহস্পতি তৈরি হয়েই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুক্রাচার্যের বেশ ধরে অসুরদের মাঝে গিয়ে হাজির হলেন।

দীর্ঘকাল পর গুরুদেব নিজেই এসেছেন। অসুরদের সে কি আনন্দ! দেবতাদের জয় করার মহাবিদ্যা নিয়ে এসেছেন মহাদেবের কাছ থেকে। এবার তাদের শেখাবেন। গুরুসেবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ভার্গবের ছদ্মবেশে বৃহস্পতিও সুকৌশলে দানবদের মন জয় করে একটু একটু করে তার বিদ্যা শেখাতে লাগলেন।

এদিকে শুক্রাচার্যেরও জয়ন্তীর সঙ্গে ঘর করার দশ বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছে। ফুটফুটে একটি মেয়েও হয়েছে তাঁদের। নাম দেবযানী।

ভার্গব বললেন—জয়ন্তী, তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করেছি। এবার আমার শিষ্যদের ইচ্ছা পূরণ করতে যাবার অনুমতি দাও।

জয়ন্তী বললেন—প্রভু, আমার আর বলার কিছু নেই। অবশ্যই যাবেন।

শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে বিদায় দিয়ে দেবযানীকে নিয়ে অসুরপুরে এসেই দেখলেন, অবিকল তাঁরই মত দেখতে একজন বসে আছেন। প্রহ্লাদ থেকে শুরু করে অসুররা সবাই তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে।

দিব্যদ্রষ্টা ভার্গব দেখেই চিনতে পারলেন। শিষ্যদের আহ্বান করে বললেন—এ কার কাছে তোমরা বসে পাঠ নিচ্ছ? ও যে দেবতাদের গুরু অঙ্গিরা। দৈত্যগণ, উনি বৃহস্পতি, ভার্গব নন। আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য, মহাদেবের কাছ থেকে মহাবিদ্যা নিয়ে ফিরছি।

শুক্রাচার্যকে আসতে দেখেই বৃহস্পতি সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—শিষ্যগণ, সাবধান। আমিই তোমাদের গুরু আসল ভার্গব। আগন্তুক হলেন বৃহস্পতি। আমার ছদ্মবেশ ধরে তোমাদের প্রতারণা করতে এসেছেন। ওকে তোমরা এখুন দূর করে দাও।

দুজনকে দেখে অসুররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। নাক-কান-মুখ-চোখ-কান-হাত-পা-গলা, দেহের গঠন, চুলের রাশ—কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই। কে আসল, আর কে নকল? শুক্রাচার্য তো আর দুজন হতে পারেন না!

এদিকে দুজনেই পালা করে অসুরদের বলে চলেছেন—ওকে বিশ্বাস কোরো না।

কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবে তারা এখন?

বৃহস্পতি এবার দারুণ জোরগলায় বলে উঠলেন—শোন তোমরা। আমিই তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য। আর উনি বৃহস্পতি, আমার রূপ ধরে তোমাদের ঠকাতে এসেছেন। যদি এখনও আমার কথা বিশ্বাস না কর, তাহলে আমি চললাম, তোমাদের আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

বৃহস্পতির এই ধরনের কথা শুনে অসুরদের যেন সংশয় দূর হয়ে গেল, তারা তেড়ে গেল ভার্গবের দিকে। বলল—হ্যাঁ, উনিই আমাদের গুরু। দশ বছর ধরে উনিই আমাদের দেখছেন। আপনি যিনিই হোন, ভাল চান তো এখুনি এখান থেকে সরে পড়ুন। নইলে কিন্তু আপনাকে অপদস্থ করতে বাধ্য হব।

আর যায় কোথা! ভৃগু বংশধরের তেজ নিয়ে ভার্গব রেগে আগুন হয়ে উঠলেন।

বললেন—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি এত বছর সাধনা করে এলাম। এতদিন তোমরা আমারই মুখ চেয়ে চলতে। আর আজ আমাকেই তোমরা অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছ? এর ফল তোমাদের পেতেই হবে। তোমাদের রসাতলেই বাস করতে হবে। এই বলে ভার্গব চলে গেলেন।

কাজ হাসিল। গুরুর অভিশাপ কখনো বৃথা যায় না।

সুযোগ বুঝে শুক্রাচার্য-বেশী বৃহস্পতি এবার অসুরদের নিজের ছদ্মবেশ খুলে আসল রূপটা দেখিয়ে দেবলোকে চলে এলেন।

অসুররা হায় হায় করে উঠল।

সাত ভাইয়ের কথা

বহুকাল আগে কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর সাতটি ছেলে ছিল। ছেলেগুলির নাম ছিল : স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কবি, বাগদুষ্ট আর পিতৃবর্তী।

ব্রাহ্মণ সন্তান। বর্ণাশ্রম মেনে চলেন তখন সবাই। ছেলেরা একটু বড় হতেই পৈতে দিয়ে ব্রাহ্মণ লেখাপড়া আর ব্রহ্মচর্য শেখার জন্য গর্গমুনির আশ্রমে রেখে এলেন। সে সময় গর্গমুনির প্রচুর নাম-ডাক। ছেলের মত তিনি যেমন সকলকে স্নেহ করতেন, মনপ্রাণ দিয়ে তেমনি শাস্ত্রও শেখাতেন।

সাত ভাই মুনির দেওয়া পাঠক্রম নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। জ্ঞানও সঞ্চয় করতে থাকে।

মুনির আশ্রমে অনেকগুলো বাছুরসমেত গাই গরু থাকত। ব্রহ্মচারীদের কাজই ছিল, সেই গাইগুলোকে নিয়ে মাঠ থেকে চরিয়ে আনা। সাত ভাইকেও মুনি সেই কাজ দিয়েছিলেন।

ছেলেরা আশ্রমে, কৌশিক ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। তার কিছুদিন পরেই দারুণ অনাবৃষ্টি। সূর্য যেন পৃথিবীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে লাগল। মুনির মাঠে যে ফসল ফলত, তা হল না। গাছের ফল সব অকালে নষ্ট হয়ে গেল। রাক্ষুসীর মত দুর্ভিক্ষ হাঁ করে সবাইকে গিলতে এল। প্রাণ যায়।

খাদ্যাভাব চারদিকে। খিদে তো আর সব সময় চেপে রাখা যায় না। শরীর যখন আছে, তখন খেতে তাকে দিতেই হবে—সে কি ব্রহ্মচারী, কি সন্ন্যাসী, যেই হোক।

সাত ভাইয়ের ওপর গাই চরানোর ভার। তারা, যত কষ্টই হোক, ঠিক সময়েই মাঠে গাই নিয়ে যায়, আবার ঠিক সময়েই ফিরিয়ে আনে। সেদিন কিন্তু তাদের গরু চরাতে চরাতে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে বসল। তার আগে কদিন ধরে যে পেটে ঠিকমত দানাপানি পড়েনি, তার ঠিক নেই। আর সহ্য হয় না। সাত ভাই মিলে যুক্তি করল—যা হয় হবে, আপাতত একটা গাইকে মেরে তার মাংসই খাওয়া যাক। মন থেকে ঠিক সায় না দিলেও খিদে কি আর শোনে।

শেষমেষ সত্যি সত্যিই তারা গর্গমুনির কপিলা নামে গাই গরুটাকে মেরে বসল।

যে সময়ের এই কাহিনী, সেই সময় শ্রাদ্ধকাজে প্রেতের উদ্দেশ্যে মাংস দেওয়ার প্রথা ছিল। এরা করল কি, মৃত বাবার শ্রাদ্ধ মাংস দিয়ে করার আয়োজন করল। মন্ত্র পড়ে মৃত বাবার উদ্দেশে নিয়ম অনুসারে সেই গোমাংস নিবেদন করে, নিজেরা খেল। খিদের জ্বালা মিটল। সন্ধের আগে মুনির গোয়ালে অন্য গরুগুলোর সঙ্গে কপিলা গাই গরুর বাছুরটাকে রেখে গর্গমুনির কাছে এসে বলল—গুরুদেব, কপিলাকে হঠাৎ বাঘে টেনে নিয়ে গেছে। আমরা আটকাতে পারিনি।

গর্গমুনি তো আর যা-তা মুনি ছিলেন না। চোখ বুজলে তিনি সবই দেখতে পেতেন। দেখলেনও সব। বুঝলেনও। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

ব্যাপারটা বেশ ভালভাবেই মিটে গেল দেখে শিষ্যরাও নিশ্চিন্ত হল।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। সাত ভাইয়ের আশ্রমবাস শেষ হয়েছে। দিনও কাটছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সাত ভাই পর পর মারা গেল।

গো-হত্যা মহাপাপ। মৃত্যুর পর সকলকেই সেই পাপের ফল ভোগ করতে হল। ব্রহ্মচারী জীবনে তারা শাস্ত্রবিধি মেনে চলত, ভোগটা তাই কম ছিল। আর অসাধারণ পিতৃভক্তির জন্য জাতিস্মরও হয়েছিল।

মৃত্যুর পর সাত ভাই দাসপুরে এক ব্যাধের ঘরে জন্মাল। ব্যাধের মতন না হলে কি গো-হত্যার মত নিষ্ঠুর কাজ করা যায়? তাই ব্যাধের ঘরেই তাদের জন্মাতে হল। পিতৃভক্তির বলে জাতিস্মরও হওয়ায় জন্ম-মাত্রেই পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ল। দুঃখে না খেয়ে উপবাস করে থাকতে থাকতে এক দিন সবাই মারা গেল।

এরপর সাত ভাই কালঞ্জরে হরিণ শিশু হয়ে জন্মাল। সেখানে নীলকণ্ঠ শিব ছিলেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জন্মান্তরের স্মৃতি তাদের মনে জেগে উঠল। মনে মনে খুব দুঃখ হল—হায়! যোগ সাধনার বলে কি হয়েছিলাম, আর খিদের জ্বালা মেটাতে গো-হত্যা করে এখন কি ফল ভোগ করতে হচ্ছে! এই ভেবে দুঃখে-শোকে শিবের সামনে অনশনে থেকে প্রাণত্যাগ করল।

তবুও সাত ভাই রেহাই পেল না। মানস সরোবরে গিয়ে চক্রবাক হয়ে জন্মাল। আবার জন্মান্তরের কথা তাদের মনে জেগে উঠল। তাই যাতে তাড়াতাড়ি এই দেহ ত্যাগ করতে পারে, সবাই তার চেষ্টা করতে লাগল। বড় চার ভাই স্বসৃপ, ক্রোধন, হিংস্র আর পিশুন তো উঠে পড়ে লেগে পড়ল। কিন্তু কবি, বাগদুষ্ট আর ছোট পিতৃবর্তী, ঠিক যেন বড় ভাইয়েদের মত হয়ে থাকল না।

একদিন পাঞ্চালরাজ বিভ্রাব রানী আর মন্ত্রীদের নিয়ে মানস সরোবরে বেড়াতে এসেছিলেন। রাজার জাঁকজমক, মন্ত্রীদের আধিপত্য, আমোদ-প্রমোদ, বিলাস-ব্যসন দেখতে দেখতে ছোট পিতৃবর্তী, আগে যে কত বড় যোগী ছিল, ভুলে গিয়ে মনে মনে ভাবল, আহা আমি যদি ঐ রকম রাজা হতে পারতাম!

কবি আর বাগদুষ্ট দুই মন্ত্রীর প্রতাপ দেখে ছোট ভাইয়ের মতই সব ভুলে গিয়ে ভাবল—আহা, আমরা যদি ঐরকম মন্ত্রী হতে পারতাম।

বড় চার ভাই কিন্তু নির্বিকার।

এরপর এক সময় চক্রবাক-রূপী সাত ভাই মারা গেল।

প্রথম চার ভাইয়ের সঙ্গে পরের তিন ভাই এবার কিন্তু ভাগাভাগি হয়ে গেল।

বড় চার ভাই জন্ম নিল দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের ঘরে। ব্রাহ্মণের নামও ছিল সুদরিদ্র। কোন রকমে দিন কাটাতেন তিনি। চার ছেলের মুখ চেয়ে ভাবলেন, এবার বোধহয় কষ্টের দিন শেষ হল। ছেলেরা কিন্তু সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হয়ে নির্জনে বসে তপস্যা করতে শুরু করে দিল।

আর এদিকে ছোট ভাই পিতৃবর্তী পাঞ্চালরাজ বিভ্রাবের ছেলে হয়ে রাজকুলে জন্মাল। তার দুই দাদাও মন্ত্রীপুত্র হয়ে জন্মাল। ভোগ-বিলাসের আর শেষ নেই। রাজপুত্রের নাম হল ব্রহ্মদত্ত। আর মন্ত্রীপুত্রদের নাম হল পুণ্ডরীক আর সুবালক।

ব্রহ্মদত্ত সব দিক থেকেই গুণবান হয়ে উঠল। তার বিশেষ গুণ ছিল—পশুপাখি কীট-পতঙ্গের ভাষা সে বুঝতে পারত। দেবল রাজার মেয়ে সন্নতির সঙ্গে তার বিয়ে হল।

একদিন রাজা ব্রহ্মদত্ত রানীকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় বসেছে। সেখানে ঠিক পায়ের কাছেই এক পিপড়ে আর পিপড়েনির মধ্যে কথা হচ্ছিল। ব্রহ্মদত্তর কান খাড়া হয়ে উঠল। শুনল, পিপড়েনির বড় অভিমান হয়েছে, পিপড়ে অনেক খোশামোদ করে তার অভিমান ভাঙাচ্ছে। তাদের রকম-সকম দেখে ব্রহ্মদত্ত খুব একচোট হেসে নিল।

রানী সন্নতি জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ অমন করে হাসলে যে?

ব্রহ্মদত্ত বলল—পিপড়ের কথা শুনে হাসছি রানী।

পিপড়ের কথা শুনে মানুষ হাসতে পারে, এ কি কেউ বিশ্বাস করবে? রানীও বিশ্বাস করল না। তার দৃঢ় ধারণা হল, ব্রহ্মদত্ত নিশ্চয়ই তাকে দেখে হেসেছে। অভিমানে রানী উঠে গেল সেখান থেকে। রাজা এমনভাবে কেন তাকে অপদস্থ করবে, এই বলে সে বিষ্ণুর কাছে ধরণা দিয়ে পড়ল। কয়েকদিন কাটানোর পর বিষ্ণু বললেন—ধৈর্য ধর, দিনকয়েকের মধ্যেই কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসছে। তাদের কাছ থেকেই তোমার সমস্যা মিটে যাবে।

এদিকে ব্রাহ্মণ সুদরিদ্র ছেলেদের কোনমতেই ঘরমুখো করতে পারল না দেখে, মনের দুঃখে একদিন বলল—ভাবলাম, এবার আমার দুঃখ ঘুচবে। আমার সংসার ঝলমল করবে। দেখছি, আমার সব আশাই বৃথা গেল।

ইতিমধ্যে চার ভাই তপস্যায় যথেষ্ট সিদ্ধি অর্জন করেছে। ছেলেরা বলল—আপনি অত ভাবছেন কেন বাবা, আমরা যা

ধলি করুন। আপনার কোন অভাব থাকবে না।

—কি করব, বল।

—পাঞ্চাল রাজ্যে যান। সেখানে রাজার কাছে গিয়ে শুধু বলবেন, 'যারা কুরুজাঙ্গলে ব্রাহ্মণ ছিল, দাসপুরে দাস ছিল, কালঞ্জরে মৃগ আর মানস সরোবরে চক্রবাক ছিল, আজ তারা সিদ্ধিলাভ করেছে।'—এই বলে ছেলেরা বনে চলে গেল।

ব্রাহ্মণ এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না। ছেলেরা যা শিখিয়ে দিল রাজসভায় গিয়ে সকলের সামনে ব্রাহ্মণ সেই কথাই বলল—কুরুজাঙ্গলে যারা ব্রাহ্মণ ছিল, দাসপুরে দাস ছিল, কালঞ্জরে মৃগ আর মানস সরোবরে চক্রবাক ছিল, আজ তারা সিদ্ধিলাভ করেছে।

ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শোনামাত্রই ব্রহ্মদত্তর পূর্বজন্মের সব কথা মনে পড়ে গেল। মন্ত্রীপুত্রদেরও ঠিক সেই অবস্থা।

মনে মনে নিজেদের ধিক্কার দিয়ে উঠল—ছিঃ ছিঃ! কি ছিলাম, আর আজ কামনার বশে কি হয়েছি!

বুদ্ধিমতি রানী সন্নতিরও কিছু আর বুঝতে বাকি রইল না স্বামী কোন একসময় যোগীপুরুষ ছিল। আর তারই বলে কীট-পতঙ্গের ভাষাও তার আয়ত্তে ছিল।

এদিকে আত্মপরিচয় জানতে পেরে ব্রহ্মদত্ত, পুণ্ডরীক আর সুবালক রাজপুত্র বিশ্বকসেনের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে তপস্যার জন্যে বনে চলে গেল।

মিত্রাবরুণ-অগস্ত্য সংবাদ

একসময় মুনি-ঋষিদের ওপর অসুরদের অত্যাচার যখন চরম সীমায় পৌঁছেছে, তখন দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি আর বায়ুকে ডেকে বলল— তোমরা যাও, যেভাবেই হোক, অসুরকুল ধ্বংস করে এসো।

মহানন্দে অগ্নি প্রলয় রূপ ধারণ করলেন। আর পবনদেব তাঁর বিরাট ডানার হাওয়ায় সেই আগুনকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অসুরপুরে ফেললেন। অসুরদের যত বন-উপবন, গ্রাম-গঞ্জ ছিল সব জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। আগুনের হল্কায় অসুররাও দলে দলে পুড়ে মরতে লাগল।

ঝড়ের বেগে আগুন ছুটতে ছুটতে সারা অসুরদেশে রীতিমত লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল। তাই দেখে তারক, কমলাক্ষ, কালদংষ্ট্র, বিরোচন প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসুরবীর পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ভেতরে একটা নগর তৈরি করে সেখানে আশ্রয় নিল।

চোখের সামনে অসুররা আর নেই। দেবতারা নিশ্চিন্ত হলেন। মুনিরাও আশ্বস্ত হলেন।

অসুররা কিন্তু চুপ করে রইল না। সুযোগ-সুবিধে পেলেই সমুদ্র থেকে তারা উঠে আসত। মুনি-ঋষিদের আশ্রম তছনছ করে আবার জলের ভেতর নগরদুর্গে ঢুকে পড়ত। মুনিরা অভিযোগ জানান দেবরাজের কাছে। দেবরাজ চেষ্টাও করেন, কিন্তু ধরতে পারলে তবে তো।

সুদীর্ঘ কাল ধরে অসুররা যখন এভাবে অত্যাচার চালিয়েই চলল, দেবরাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না। অগ্নি আর পবনকে আবার ডাকলেন। হুকুম দিলেন—সামান্য কটা অসুর জলদুর্গে থেকে অত্যাচার চালিয়ে যাবে, আর আমরা কিছু করতে পারব না? তোমরা গিয়ে সমুদ্রের জল একেবারে শুকিয়ে দাও। তারপর দেখি, ওরা কত শক্তি ধরে।

অগ্নি আর বায়ু দেবরাজের আগের হুকুম নির্বিবাদে তামিল করেছেন। এবারে কিন্তু বেঁকে বসলেন।

বললেন—দেবরাজ, আপনি যা বলছেন তা কি ভেবে বলছেন?

ইন্দ্র ভ্রূ কুঁচকে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তার মানে?

—মানে, আপনি কি সত্যিই আমাদের অত বড় সমুদ্র শুকিয়ে ফেলতে বলছেন?

ইন্দ্র বললেন—কেন, আমার অমন স্পষ্ট কথা তোমাদের বুঝতে অসুবিধে হল?

—আজ্ঞে না। দুজনেই বললেন—শুধু জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি ভেবে-চিন্তেই সমুদ্রের জল শুকিয়ে দিতে বলছেন?

—তোমাদের মনে এ সন্দেহ জাগছে কেন?

—দেবরাজ, সমুদ্র বিশাল, জলরাশিও বিপুল। ঐ জলকে শুধু আশ্রয় করে কত প্রাণী বেঁচে আছে। সমুদ্র শুকিয়ে দিলে কত প্রাণিহত্যা হবে। সেই কথাই বলছিলাম।

ইন্দ্র তাঁদের মন্তব্য শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

—তোমরা আমার আদেশের সমালোচনা করছ? জীবের ওপর আমার চেয়ে তোমাদের খুব বেশি দয়া, তাই না?

—দেবরাজ, আমরা সে কথা বলিনি। আপনি আমাদের রাজা। আপনার আদেশ পালন করা আমাদের অবশ্যই উচিত। কিন্তু সামান্য কয়েকজন অসুরের জন্য সমুদ্রের সব জল শুকিয়ে দিয়ে এতগুলো প্রাণিহত্যাকে আমরা অধর্ম বলে মনে করছি। আপনি বরং আমাদের অন্য আদেশ দিন।

এবার সত্যি সত্যিই ইন্দ্র ক্রোধে ফেটে পড়লেন।

—তোমরা দুজনে জোট বেঁধে তাহলে আমাকে অবজ্ঞা করছ। যাও, আমার রাজ্যে তোমাদের আর স্থান নেই। তোমরা মর্ত্যে গিয়ে ঋষি হয়ে থাক গে। রাজ্য শাসন করবে আবার ক্ষেত্র-অক্ষেত্র বিচার না করে অহিংসা ধর্ম পালন করবে—দুটো তো আর একসঙ্গে হয় না। যাও, একই দেহে ঋষি হয়ে অহিংসা ধর্মই পালন কর গে।

দেবরাজের অভিশাপ। অগ্নি আর বায়ু পৃথিবীতে একই দেহ নিয়ে নেমে এলেন। এখানে তাঁরা একটি মাত্র নামে পরিচিত হলেন—মিত্রাবরুণ।

অগস্ত্যদেব অর্থাৎ অগস্ত্য মুনি এই মিত্রাবরুণেরই পুত্র।

কিন্তু অগস্ত্য মুনির জন্ম হয়েছিল ভারি অদ্ভুত ভাবে।

বহুকাল আগে ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ ঋষি রূপে গন্ধমাদন পাহাড়ে দারুণ তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় ইন্দ্র দারুণ ভয় পেয়ে কিভাবে তাঁর তপস্যা ভাঙানো যায়, তার চেষ্টা নিয়েছিলেন। মদনদেব আর অনঙ্গ তাঁর বিশেষ বন্ধু। তিনি স্বর্গের সব সুন্দরী অপ্সরাদের দিয়ে নারায়ণ ঋষির কাছে তাঁদের পাঠিয়েছিলেন তপস্যা ভাঙানোর জন্য। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হলেন। বরং সকলকে বোকা বানিয়ে তিনি একটি অপরূপা রমণীকে উৎপন্ন করে উপহার দিলেন।

[বামন পুরাণের 'নারায়ণ ও উর্বশী' কাহিনীতে এর বিবরণ আছে।]

সেই রমণীর নাম হল উর্বশী।

দেবরাজ যতগুলি অপ্সরাকে পাঠিয়েছিলেন, উর্বশীর কাছে তারা দাঁড়াতেই পারে না। এমন কি, রমণীটিকে দেখে মদনদেবেরও মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছিল।

মিত্রাবরুণ সে সময় সেখানে ছিলেন।

অত বড় সংযমী ঋষিরা, উর্বশীকে দেখে তাঁরাও ঠিক থাকতে পারলেন না। মিত্র তো আগেই গিয়ে উর্বশীকে ধরলেন। নারায়ণ ঋষির আদেশ, উর্বশীকে যে ডাকবে, তার কাছেই তাকে যেতে হবে। তাই উর্বশী মিত্রের সঙ্গে যাচ্ছে দেখে বরুণ স্থির থাকতে পারলেন না। তিনিও পিছন দিক থেকে উর্বশীকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলেন।

তাই দেখে উর্বশী বরুণকে বলল—মিত্রদেব আমায় আগে ডেকেছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করে পরে আপনার কাছে আসব।

বরুণ তাতে ঠিক রাজি হলেন না। বললেন—ঠিক আছে, যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমাকে যেন সব সময় তোমার মনে থাকে।

উর্বশী বলল—আচ্ছা, কথা দিলাম।

যেই না বলা, মিত্রদেব সঙ্গে সঙ্গে উর্বশীকে অপমান করে ছেড়ে দিলেন। উর্বশীও আর কিছু না বলে চলে গেল।

কিন্তু কামনা চরমে উঠলে সাধারণ মুনিরাও যে তার হাত থেকে রেহাই পান না, মিত্রাবরুণই তার প্রমাণ। নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। তার শক্তি (বীর্য) গিয়ে সামনের জলের কলসীতে (কুম্ভ) গিয়ে পড়ল।

মিত্রাবরুণের সেই বীর্য থেকেই কলসীর মধ্যে অগস্ত্যের জন্ম হল। সেই জন্য অগস্ত্যকে অনেকে বলেন 'কুম্ভজ' বা 'কুম্ভ-সম্ভব'।

এই অগস্ত্য মুনিই পরে তপস্যা-বলে প্রভূত শক্তি অর্জন করে সমুদ্রকে শোষণ করেছিলেন—অসুর বা রাক্ষসদের মারার জন্য।

যেদিন অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করলেন, সেদিনই মিত্রাবরুণ শাপমুক্ত হয়ে আবার দেবলোকে ফিরে গিয়ে নিজের নিজের পদে বসবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

রাজা পুষ্পবাহনের কাহিনী

পুষ্কর দ্বীপের রাজা পুষ্পবাহন।

তাঁর আসল নাম কি ছিল, তা আর কারো মনে নেই। পুষ্কর দ্বীপের অধিবাসী থেকে দেব, দানব সকলের কাছেই এখন তাঁর একটাই পরিচয়—পুষ্পবাহন।

কিছুকাল তপস্যা করার পর ব্রহ্মা তাঁকে বিশাল আকারের একটা সোনার পদ্ম দিয়ে বলেছিলেন—এই পদ্মই তোমার আবাস, তোমার বাহন। তুমি এরই মধ্যে থেকে যেখানে খুশি যেতে পারবে। আর এই দ্বীপ তোমারই শাসনে থাকবে।

অল্প দিনের তপস্যায় এমন দুর্লভ বস্তু লাভ প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

সেই থেকে পুষ্কর দ্বীপের তিনি রাজা হলেন আর সেই বিরাটকায় পদ্মফুল তাঁর বাহন বিমান হল। অতীব ধার্মিক সেই রাজা পুষ্পবাহন স্ত্রী লীলাবতীর সঙ্গে আত্মীয়-পরিজনসহ সেই বিমানে চেপে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, এক লোক থেকে আরেক লোকে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল যেখানে প্রাণ চাইত ঘুরে বেড়াতেন। যেমন এই বিমানের কোন তুলনা ছিল না, তেমনি স্ত্রী লীলাবতীরও কোন তুলনা ছিল না। পুষ্প-বিমান নিয়ে যখন স্বর্গপথে যেতেন, মর্ত্যবাসীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত সেদিকে। যেন একটা সোনা-রঙ আলো নীল আকাশের কোল বেয়ে ভেসে চলেছে। আর তা থেকে আলো ছিটকে আসছে।

সামান্য তপস্যায় এমন ঐশ্বর্যলাভ কেমন করে সম্ভব হল, মাঝে মাঝে রাজা পুষ্পবাহন ভেবে অবাক হতেন। তিনি দেখেছেন, কতজন কতদিন ধরে কি কঠোর তপস্যা করছেন। তারপর হয়ত দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে এমন ব্যতিক্রম কিভাবে ঘটল ? কি রহস্য আছে এর মধ্যে ?

সব সময়ই একটা বিস্ময় ভাব নিয়ে পুষ্পবাহন দিন কাটান। আর কৌতূহলী হয়ে থাকেন রহস্য জানার জন্য।

একদিন এমনিভাবে পদ্মের আবাসে পুষ্কর দ্বীপে রাজা বসে আছেন, প্রচেতা মুনি এলেন দেখা করতে।

মুনিকে দেখে পুষ্পবাহন যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে আপ্যায়ন জানালেন। তারপর নিজের কৌতূহল মেটাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ত্রিকালদর্শী। আপনার অজানা কিছুই নেই। দয়া করে বলবেন, সামান্য তপস্যায় এতখানি সৌভাগ্য আমি কিভাবে লাভ করলাম ?

প্রচেতা মৃদু হেসে বললেন—পূর্বজন্মে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন, এ জন্মে তাই আপনাকে বেশি কষ্ট করতে হল না। অল্পেই সব পেয়ে গেলেন।

—কি রকম ? আমার জানতে বড় ইচ্ছে করছে। পুষ্পবাহন বললেন—বিশ্বাস করুন, এতে আমার কিছুমাত্র মোহ নেই। আমি সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে চাই।

প্রচেতা বললেন—সব পেয়েও যে আপনি মোহগ্রস্ত নন, তা আমার অজানা নেই। আপনার পূর্বজন্মের ইতিকথা শোনার যখন এতই আগ্রহ, তখন শুনুন ঃ পূর্বজন্মে আপনি ছিলেন এক ব্যাধ।

—ব্যাধ ! শুনে রাজা চমকে ওঠেন।

—হ্যাঁ, শুধু সামান্য ব্যাধ নয়, অত্যন্ত নির্দয়, নিষ্ঠুর ব্যাধ। এখন চুপ করে সেই ব্যাধের কাহিনী শুনুন। প্রচেতা মুনি বললেন।

পুষ্পবাহন চুপ করে রইলেন। লীলাবতীর মুখেও কোন কথা নেই।

প্রচেতা বললেন—সেই নিষ্ঠুর ব্যাধের হাত এড়িয়ে কোন প্রাণীরই বাঁচার উপায় ছিল না। শুধু হত্যা···হত্যা আর হত্যা। নির্বিচারে প্রাণিহত্যা ছাড়া সে আর কিছুই জানত না। মাথায় এক রাশ ঝাঁকড়া চুল, হাতে শিকারের হাতিয়ার। চোখদুটো তার সব সময়েই থাকত টকটকে লাল। গায়ে পুরু ময়লা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নামও জানত না। গা দিয়ে সব সময়ই এমন বিশ্রি গন্ধ বের হত যে, গন্ধের চোটে ভূত পালাত। ব্যাধিনীকে নিয়ে

এইভাবে সেই ব্যাধ শিকার আর পানাহার নিয়ে থাকত।

সেই সময় একবার সারা দেশ জুড়ে অনাবৃষ্টি এল। বেশ কিছুদিন ধরে গরম হাওয়া বইতে শুরু করল। গাছ-পালা, শস্য, ফল যা কিছু ছিল, সব গরম হাওয়ায় আর জলের অভাবে শুকিয়ে গেল। দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

কদিন ধরে ব্যাধ শিকারের সন্ধানে চারদিক ঘুরল। শিকার মিলল না। মাঠ থেকে ফসলদানা চুরি করে এনে যে খাবে, তাও মিলল না। চারদিক ঘুরতে ঘুরতে যখন কোথাও কোন কূল-কিনারা পেল না, তখন ব্যাধের হঠাৎ নজর পড়ল এক সরোবরের দিকে। সরোবরে অজস্র পদ্ম ফুটে ছিল।

ব্যাধিনীকে নিয়ে ব্যাধ সরোবরে নেমে খেয়ালের বশে অনেকগুলো পদ্মফুল তুলল। ভাবল, দুর্ভিক্ষ হলেও নগরে অবস্থাপন্ন মানুষ তো এখনও কিছু আছে। তাদের মধ্যে কেউ কি আর পদ্ম কিনবে না?

এই বলে ব্যাধ যে বনে থাকত, তার শেষে কিছু দূরে বৈদিশা নগরীতে এল। ফুলগুলো নিয়ে নগরের পথে পথে ফেরি করে বেড়াল। কিন্তু কেউ সেই পদ্মফুল কিনল না। তখন ব্যাধ আর কি করে, ফুলগুলো নিয়ে নিজের ঝুপড়ি ঘরে এল। সারাদিন গেছে, পেটে দানা-পানি পড়ে নি। রাত এল। কোন খাবার নেই। চুপ করে ব্যাধ আর ব্যাধিনী পড়ে রইল।

তখন কিছুটা রাত। দুজনেরই কানে এল, কাঁসার ঘন্টার আওয়াজ।

কি ব্যাপার? কৌতূহলী হয়ে দু-জনেই সেই অন্ধকারের মধ্যে পথ ধরে নগরে এসে দেখল, বিষ্ণুমন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পুজো হচ্ছে।

বৈদিশা নগরেরই এক রমণী, অনঙ্গবতী তার নাম। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ব্রত করে সেই রাতে মন্দিরে এসেছিল বিগ্রহের পুজো দিতে। তার সঙ্গে অজস্র সামগ্রী ছিল। ভাল ভাল বিছানা থেকে ভাল ভাল খাবার পর্যন্ত।

পুজো মণ্ডপের শেষ প্রান্তে বসে পুজো আর সেই বিগ্রহ দেখতে দেখতে কি যেন মনে হল তার, হাতের পদ্মফুলগুলো ভগবান বিষ্ণুকে দিয়ে মনে মনে বলল—আমার তো নিজের কিছুই নেই। এগুলো তুলেছিলাম, বিক্রি করে খাব বলে, তাও হল না। কি আর করব এগুলো নিয়ে। তুমিই নাও।

ফুলগুলো তখনো কিন্তু যেন বেশ টাটকাই ছিল। অনঙ্গবতী খুব খুশি হয়ে ব্যাধকে কিছু খাবার দিয়ে খেতে বলল। ব্যাধ কিন্তু খেল না। ব্যাধিনীও না। সারাটা দিন যখন গেছে, তখন রাতটুকুও যাক। বরং বসে বসে পুজো দেখা যাক।

রাত কাটল। অনঙ্গবতীর ব্রতও শেষ হল। নগরে যত ব্রাহ্মণ ছিল, সকলকে ডেকে শয্যা থেকে শুরু করে ভাল ভাল সামগ্রী সে প্রণামী দিল। তারপর নগরের যে যেখানে ছিল সকলকে ডেকে প্রাণ ভরে খাওয়াল। সেই সঙ্গে সেই ব্যাধ আর ব্যাধিনীকেও সমাদর করে খাইয়ে অনঙ্গবতী চলে গেল।

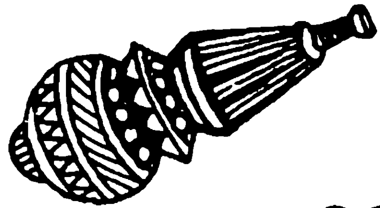
রানী লীলাবতী কৌতূহলী হয়ে মুনিকে জিজ্ঞেস করলে—মুনিবর, সেই অনঙ্গবতী বিষ্ণুর কাছে কি ব্রত পালন করেছিল?

প্রচেতা বললেন—বিভূতি দ্বাদশী ব্রত। বিষ্ণুর প্রিয় এই ব্রত পালন করলে তার ভাগ্যই বদলে যায়।

তারপর বললেন—অনঙ্গবতী ব্রত করেছিল বটে। কিন্তু সেই ব্যাধ দম্পতি ঠিক তেমনভাবে না করলেও, বিষ্ণুকে যে পদ্মফুল দিয়েছিল আর অত খিদে সত্ত্বেও, কোন কিছুতে লোভ না করে সংযমী হয়েছিল, তাতেই তারাও ব্রতের ফল পেয়ে গিয়েছিল।

প্রচেতা ব্যাধের কাহিনী শেষ করে রাজাকে বললেন—রাজা, সেই ব্যাধই এ জন্মে পুষ্কর দ্বীপের রাজা। বিষ্ণুকে পদ্মফুল দিয়ে মন-প্রাণ দিয়ে অর্চনা করেছিল বলে এ জন্মে তিনি পদ্মপুষ্পবাহনই হয়েছেন! আর সেই ব্যাধিনীই আপনার রানী লীলাবতী।

এই বলে প্রচেতা মুনি চলে গেলেন।
রাজারও দুচোখ জলে ভরে এল।



তারকাসুরের কাহিনী

দিতির সবকটি ছেলেই দেবতাদের হাতে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে অনেক তপস্যায় সে একটি বিশ্বজয়ী পুত্রের জননী হতে যাচ্ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তা জানতে পেরে ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তাকে কৌশলে নিধন করলেন। দিতির মনে দুঃখের আর শেষ নেই। স্বামী কশ্যপের কাছে কাঁদতে কাঁদতে দিতি একদিন বলল—আপনি থাকতে কেন আমার এ দশা হবে? আমার কি এমন কোন পুত্র হবে না যে অজেয় হতে পারে?

কশ্যপ তার উত্তরে বলেছিলেন—তার জন্য তোমাকে দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করতে হবে। তা যদি পার, তাহলে তোমার এমন এক পুত্র হবে যার দেহ বজ্রও ভেদ করতে পারবে না।

কশ্যপের কথায় দিতি কঠোর তপস্যায় বসল। দশ হাজার বছর কাটল। সত্যি সত্যিই এর পর তার একটি সেইরকম ছেলেই হল। দারুণ বলিষ্ঠ ছেলে। দিতি তার নাম রাখল বজ্রাঙ্গ।

ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েই দিতিকে জিজ্ঞেস করল—মা, আমায় কি করতে হবে বল।

দিতি বলল—ইন্দ্র আমার অনেক ছেলেকে অকালে মেরেছে। পুত্র, তুমি এর প্রতিশোধ নাও।

মায়ের আদেশে বজ্রাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে গিয়ে বিনা আয়াসেই ইন্দ্রকে পাশ-অস্ত্রে বেঁধে সোজা মায়ের কাছে নিয়ে এল।

ইন্দ্রকে ধরে এনে মায়ের সামনে দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মা আর কশ্যপ সেখানে এসে হাজির হলেন।

ব্রহ্মা বললেন—বজ্রাঙ্গ, ইন্দ্রকে ছেড়ে দাও।

বজ্রাঙ্গ বলল—মায়ের আদেশ ইন্দ্রকে বধ করা। আমি তাঁর

আদেশেই ইন্দ্রকে ধরে এনেছি।

ব্রহ্মা বললেন—ওঁকে তো বধ করাই হয়ে গেছে। ও দেবতাদের রাজা, সকলের পূজনীয়। সকলের কাছে ইন্দ্রের কত সম্মান। তুমি যখন তাঁকে বেঁধে এনেছ, তখন ওঁর সম্মান তো ধুলোয় লুটিয়েই দিয়েছ। মানীর মান যাওয়া মানেই তার মৃত্যু। শুধু প্রাণে মারলেই কি মৃত্যু হয় ? তাই বলছিলাম, ইন্দ্রের মৃত্যু হয়েই গেছে। ওঁকে ছেড়ে দাও, তাতে বরং তোমার মহত্ত্ব বাড়বে।

বজ্রাঙ্গ বলল—মা, ঠাকুর্দা যা বললেন, তা ঠিকই। ঐ মরাটাকে আর মেরে লাভ কি ?

দিতি আর কি বলবে। বিশেষ করে স্বামী আর শ্বশুরের মুখের ওপর।

ইন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে বজ্রাঙ্গ বলল—আমি তপস্যায় যাব।

ব্রহ্মা বললেন—খুব ভাল কথা। তবে একা নয়, দাঁড়াও।

এই বলে তিনি তাঁর শক্তি দিয়ে একটি সুন্দরী মেয়েকে উৎপন্ন করে বললেন—বজ্রাঙ্গ, এই বরাঙ্গীকে তোমায় দিলাম। আজ থেকে এ তোমার স্ত্রী। তুমি একে সঙ্গে নিয়ে তপস্যা কর।

ব্রহ্মা এবং কশ্যপ চলে গেলেন।

বজ্রাঙ্গও বরাঙ্গীকে নিয়ে নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে নানাভাবে কঠোর তপস্যা করতে লাগল।

স্থলভাগে তপস্যা শেষ করে বজ্রাঙ্গ এবার পাহাড়ের কোলে এক নদীর ধারে এসে সেখানে একটা আশ্রম তৈরি করল। স্ত্রী বরাঙ্গীকে বলল—তুমি এই আশ্রমে থেকে তপস্যা কর বরাঙ্গী। আমি নদীজলের ভেতরে থেকে তপস্যা করব।

এই বলে বজ্রাঙ্গ জলমধ্যে চলে গেল। বরাঙ্গী আশ্রমেই একা থেকে গেল।

ওদিকে বজ্রাঙ্গের তপস্যা দেখে ইন্দ্র মনে মনে দারুণ ভয় পেলেন। এরই মধ্যে একটা কিছু বিহিত না করলে সত্যিই একদিন বজ্রাঙ্গের হাতে মরতে হবে।

কিন্তু জলের তলায় বজ্রাঙ্গ। তাকে তো আর পাওয়া যাবে না। তাই ইন্দ্র বরাঙ্গীকে মারবার ফন্দী এঁটে তার ওপর নানা অত্যাচার শুরু করলেন। মেঘ হয়ে আশ্রম জলে ভাসিয়ে দিলেন। আশ্রমের গাছ-পালা তছনছ করে দিলেন। সাপ হয়ে বরাঙ্গীকে পায়ে বেঁধে পাথরের ওপর দিয়ে টানা-হেঁচড়া করলেন, কিন্তু প্রাণে মারতে পারলেন না।

জলের নীচে তপস্যার কাল শেষ হলে ব্রহ্মা এসে বজ্রাঙ্গকে ডাকলেন—বজ্রাঙ্গ, জল থেকে উঠে এসো। তোমার তপস্যার তুলনা নেই। কি চাও, বল।

বজ্রাঙ্গ বলল—ঠাকুর্দা, অসুরদের কুটিল মনোবৃত্তি যেন আমার মধ্যে আর না জাগে।

ব্রহ্মা বললেন—খুব ভাল কথা। তা-ই হবে। বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন।

বজ্রাঙ্গ আশ্রমে ফিরে দেখে, বরাঙ্গী নেই। আশ্রম যেন লণ্ডভণ্ড। কোথায় গেল বরাঙ্গী ? পাহাড়ের কোল ধরে খুঁজতে খুঁজতে একটা গুহামুখের কাছে গিয়ে সে বরাঙ্গীকে দেখতে পেল। আলুথালু চুল, মুখ শুকনো, শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত।

—কি হয়েছে বরাঙ্গী ? তুমি এখানে এভাবে বসে কেন ?

বরাঙ্গী বলল—আপনি জলে তপস্যায় গেলে ইন্দ্র আমার এই দশা করেছে। আশ্রম নষ্ট করেছে। আমাকে হেনস্থার কসুর রাখে নি। এখন শুধু মৃত্যুটুকুই বাকি।

শুনে বজ্রাঙ্গের রক্ত চনমন করে উঠল।

বরাঙ্গী বলল—আমার একটা অনুরোধ রাখ। এমন একটি পুত্র আমায় দাও যে আমাকে অপমান করার যোগ্য জবাব শয়তান ইন্দ্রকে দিতে পারবে।

পুত্রের দরকার হয় না ! ইচ্ছে করলে বজ্রাঙ্গ নিজেই গিয়ে শিক্ষা দিয়ে আসতে পারত। কিন্তু স্ত্রীর যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন তাই হোক।

এই ভেবে ক্ষুব্ধ মনে বজ্রাঙ্গ আবার তপস্যা আরম্ভ করল।

তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ইতিমধ্যেই বজ্রাঙ্গ করেছিল। তাই আর বেশি কষ্ট করার প্রয়োজন হল না। ব্রহ্মা এসে বললেন—বজ্রাঙ্গ, তোমার অত চিন্তার কিছু নেই। আমি বলছি তোমার তারক নামে মহাবলশালী এক পুত্র হবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে যাও।

জগৎ-বিধাতার বর বড়ই অমোঘ।

তারক একদিন জন্মগ্রহণ করল। আর যেদিন সে জন্মাল, সেদিনই যে সে মহাবল নিয়ে জন্মাল, সবাই তার প্রমাণও পেল। সে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে যেন ঝোড়ো বাতাস প্রলয় নাচন নেচে গেল। অসময়ে সমুদ্রের জল উথাল-পাথাল করে দুরন্ত ঢেউ নিয়ে আছড়ে পড়ল। অকস্মাৎ ভূমিকম্পে পাহাড়-পৃথিবী কেঁপে উঠল। বনের হিংস্র জন্তুরা অকারণে হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি শুরু করে দিল। চারদিকে হঠাৎ এই অমঙ্গল দেখে মুনি-ঋষিদের বুক কেঁপে উঠল। তপোবনে বসে তারা কেউ বিষ্ণু, কেউ শিবকে গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করে দিলেন—'ত্রাহি জনার্দন', 'ত্রাহি মধুসূদন', 'ত্রাহি পশুপতি'…।

অসুরপুরে কিন্তু খবর পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মহোল্লাস শুরু হয়ে গেল। দলে দলে ছেলেমেয়ে আর বউদের নিয়ে তারা তারককে দেখবার জন্য আসতে লাগল—যেন অসুর কুলে কোন অবতার জন্মেছে। জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কালনেমি—যে যেখানে এতদিন দেবতাদের ভয়ে লুকিয়ে ছিল, আর রাতের অন্ধকার ছাড়া বাইরেই বের হতো না, হৈ হৈ করে যেন তারা সবাই ছুটে এল। অসুর-রমণীরা হাসি-নাচ-গান ভুলেই গিয়েছিল। তারাও আবার মহা-উৎসাহে নাচ-গান শুরু করে দিল।

বরাঙ্গীর গর্ব তখন দেখে কে ? মনে মনে এই ভেবে তার আরও আনন্দ হল, ইন্দ্রের দম্ভ এবার চূর্ণ হবেই। সেই সঙ্গে দেবতারাও এবার উচিত শিক্ষা পাবে।

ইতিমধ্যে অসুর-নেতারা সবাই এসে জড়ো হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে নিয়ে তারা নবজাতক তারককে বলল—ইন্দ্র আর দেবতাদের অত্যাচারে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছি। আমাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই। আপনি আমাদের রাজা হোন। আপনার সাহায্যে আমরা স্বর্গরাজ্য জয় করব।

অসুরদের আবেদন শুনে তারক বলল—দেবতাদের সঙ্গে আমাদের আজন্ম শত্রুতা। আর ওরা আমাদের বংশকে বংশ নির্মূল করে দিচ্ছে, খুব খাঁটি কথা। ওদের অবশ্যই উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তবে আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। বিশেষ করে আমি কিন্তু এখুনি যুদ্ধে যেতে পারব না। শক্তি সঞ্চয় না করে মহাবলশালী দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না। আগে আমাকে তপস্যা করে শক্তি সঞ্চয় করতে দাও। তারপর শুধু স্বর্গ

কেন, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তোমাদের হাতে ভোগ করার জন্য তুলে দেব।'

অসুর নেতারা তারকের কথায় রাজি হল।

তারকও পারিযাত্র নামে এক পাহাড়ে তপস্যার জন্য চলে গেল।

ফল-মূল থেকে নানা রকম গাছে ভরা পাহাড়। পাহাড়ের কোল বেয়ে ঝর্নার জল গড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে ভাল দেখে একটা গুহা বেছে নিয়ে তপস্যায় বসল। কখনও সামান্য মাত্র ফল-জল খেয়ে, কখনো কিছুমাত্র না খেয়ে, কখনো বা শুধুমাত্র বায়ু খেয়ে, কখনো বা গাছের শুকনো পাতা খেয়ে তারকের সে কি তপস্যা। অমন বিশাল শরীর দেখতে দেখতে শুধু হাড়-মাংসে-সার হল।

কত শ বছর যে এভাবে কেটে গেল, তার ঠিক নেই। তারক তখনও তপস্যার কোন ফল পেল না দেখে আরো কঠোর তপস্যা শুরু করল। কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে এনে আগুন জ্বালল। তারপর ধারালো ছুরি বের করে নিজের দেহ থেকে একটু একটু করে মাংস কেটে সেই আগুনে আহুতি দিতে লাগল। এভাবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত যত মাংস ছিল, কাটতে কাটতে আর আগুনে দিতে দিতে সব শেষ হয়ে গেল। মাত্র হাড় ক খানা রইল।

একজন অসুরের এত বড় তপস্যা কেউ কখনো দেখে নি। দেবতারাও অবাক।

দেবার মধ্যে তারকের যখন আর প্রাণটুকু বাকি আছে, বিধাতা ব্রহ্মা এলেন। বললেন—অদ্ভুত তোমার তপস্যা। আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, কি চাই?

তারক ব্রহ্মার অনুগ্রহে আবার নতুন শরীর ফিরে পেয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলল—জগৎ বিধাতা আপনি। আপনার তো অজানা কিছু নেই। ভাল ভাবেই জানেন, দেবতারা ছলে-বলে-কৌশলে অন্যায়ভাবে আমাদের বংশ নির্মূল করেছে। আমি তাদের সকলকে রক্ষা করতে চাই। কোন প্রাণীর কোন অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু না হয়।

ব্রহ্মা বললেন—তারক, জন্মালে মরতেই হবে। বিধাতা হলেও এ বিধান আমি রদ করে দিতে পারব না। মরতে হবেই। নিঃসন্দেহে তপস্যার বলে তুমি মহাবলবান হয়েছ। ভয়-ডর তোমার শরীরে আর নিশ্চয়ই নেই। সুতরাং তারক, তুমি এমন বর চাও, যার হাতে মরার কোন সম্ভাবনাই নেই বলে মনে হবে।

তারক অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে বলল—মরার বিধান আপনি যখন উল্টে দিতে পারবেন না, তখন আমার প্রার্থনা, সাত বছরের নাবালক শিশুর হাতে যেন আমার মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মা বললেন—তোমার যখন এরকম ইচ্ছে, তখন তাই হবে।

তপস্যা শেষ করে বর নিয়ে তারক অসুরপুরে ফিরে আসতেই দৈত্যরা যে যেখানে ছিল, সবাই এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্রকে ঘিরে যেমন দেবতারা দাঁড়ান ঠিক সেভাবে। সবাই মিলে তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিল।

অসুরপুরের রাজা হল তারকাসুর। সকলেই তাকে সেবা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সকলেই তার কথামত চলতে লাগল। দৈত্যদের আর সেই ভয় রইল না। দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে আবার তারা আগের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিছুকাল এভাবে যাবার পর তারক মন্ত্রীদের ডেকে বলল—স্বর্গে এখনও দেবতারা সুখভোগ করছে, মজা লুটছে। ওরা যে আমাদের শত্রু, আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে, একথা কি ভুলে গেলাম? তবে আমরা যুদ্ধযাত্রা করছি না কেন? এখুনি আমার আট-চাকার রথ সাজাতে বল, সমস্ত দৈত্য-সেনাদের ডাক দাও। এখুনি যুদ্ধযাত্রা করব।

প্রথমেই দৈত্য গ্রসনের ডাক পড়ল।

তারক বলল—গ্রসন, ডাক দৈত্যবীর আর সেনাদের। সেনাপতি হয়ে এখুনি সব সেনা জড়ো কর। দেবকুল নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

এতদিন পরে মনের মত কাজ পেয়ে গ্রসনের খুব আনন্দ। তার আদেশে অসুরপুরে ঘন ঘন ভেরি বেজে উঠল। আওয়াজ শুনেই দৈত্যরা যে যার কাজ ফেলে ছুটে এল। তারপর, রাজা তারকাসুরের আদেশ শুনে যে যার হাঁক-ডাক শুরু করে দিল।

জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কুঞ্জর, মেঘ, কালনেমি, মিমি, মথন, জম্ভক, শুম্ভ এই দশজন, তখন দৈত্যদের মধ্যে মহাবলশালী সব রকম অস্ত্রে পারদর্শী ছিল। বিপুল সেনাবাহিনীর আগে আগে তারা নিজের নিজের রথে ধ্বজা তুলে এগিয়ে চলল। এক শ বাঘে টানা সোনার রথে সেনাপতি গ্রসন চলেছে সকলকে উৎসাহ দিতে দিতে। এক শ সিংহে টানা রথে চলেছে জম্ভ। অগণিত পিশাচ কুজম্ভের রথ টেনে নিয়ে চলেছে। সঙ্গে চলেছে আরো অনেক বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া, উট, মহিষ। সেই সঙ্গে দানব-সেনা। আট-চাকায় টানা তারকাসুরের রথও চলেছে। সেই রথটা ছিল ভারি অদ্ভুত। রথের ভেতরে অস্ত্রাগার, নাচগান করার জন্য জায়গা, বিশ্রাম নেবার জায়গা, আবার মহিষীদের থাকার জায়গাও ছিল।

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তারকাসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণে এসেছে শুনে দেবরাজ দেবগুরু বৃহস্পতিকে ডেকে যুক্তি করলেন, কি করা উচিত। তারপর দেবতাদের ডেকে বললেন—তোমরা সমবেত হও। মূর্খের ওষুধই হল লাঠি। ওদের মার দিয়ে তাড়ানো ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

দেবরাজের আদেশে ষাঁড়ের পিঠে যমরাজ, হাতে দণ্ড আর পেছনে তার অনুচরদের নিয়ে হাজির হলেন। এরপর একে একে সবাই এসে জড়ো হতে লাগলেন নিজ নিজ অনুচরদের নিয়ে। ছাগলের পিঠে বরুণদেব, মানুষের পিঠে যক্ষদেবকে নিয়ে যক্ষরাজ কুবের। চন্দ্র, সূর্য, পবন, অশ্বিনীকুমার এলেন পিশাচ অনুচর নিয়ে। পিশাচরাজ নির্ঋতদেব, নাগ, কিন্নর, রাক্ষস যে যেখানে দেবতাদের অনুচর হয়েছিল, সবাই এসে জড়ো হল। ঐরাবতের পিঠে দেবরাজ ইন্দ্র চেপে বসলেন।

দেখতে দেখতে তেত্রিশ কোটি দেবসেনা জড়ো হয়ে গেল। আর অস্ত্রশস্ত্র? অগুনতি সব শক্তিশালী অস্ত্র। দিকপাল দেবতাদের তো এক-একটা নিজস্ব মারাত্মক অস্ত্র ছিলই। তার ওপরেও আরো যে কত অস্ত্র! নানারকমের ধনুক, নানারকমের বাণ ছাড়া খাঁড়া, গদা, চক্র, শূল, নারাচ, অঙ্কুশ, বজ্রাস্ত্র, ভল্ল, প্রাস, শক্তি, পরশ্বধ, পট্টিশ, তোমর, ভিন্দিপাল—কত আর বাসব। এর ওপরেও আবার দণ্ড, ভিশুণ্ডি, গরুড়াস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র—নামে সব মোক্ষম মোক্ষম অস্ত্র। সেখানে এক-একটা অস্ত্রই প্রলয় ঘটিয়ে ছাড়তে পারে, দেবতাদের সঙ্গে দেবসেনারা সেখানে তারকাসুরকে রুখতে সব অস্ত্র নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর অসুর-সেনাদের মুখোমুখি হতেই দু-পক্ষ গর্জন করে উঠল। তূরী, ভেরি, শাঁখ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে হাতি, ঘোড়া,

উট ডেকে উঠল। দু পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। অসুরপক্ষের সেনাপতি গ্রসন ভীমবেগে প্রথমে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করল যমরাজকে। গ্রসনের সেনাদের হাতে যমের অনেক অনুচর মারা গেল। গ্রসন যমরাজকেও কম মার মারল না। শেষে দণ্ডের আঘাতে রথের বাঘেরা মারা গেলেও যমরাজ কোনমতেই গ্রসনকে কায়দা করতে পারলেন না। তার প্রচণ্ড প্রহারে জর্জরিত হয়ে জ্ঞান হারালেন।

জম্ভাসুর বীর বিক্রমে কুবেরকে ইতিমধ্যে কায়দা করে ফেলেছে। কুজম্ভের হাতে পিশাচ অধিপতি নির্ঋতিরও সেই অবস্থা। মিহিষাসুর সুযোগ বুঝে বিকট হাঁ করে নির্ঋতি আর বরুণকে গিলতে আসছে, চন্দ্র তা দেখতে পেয়েই সজাগ হয়ে উঠলেন। হাতের অস্ত্র সব বিফল হল দেখে তিনি নতুন একটা অস্ত্র আবিষ্কার করে অসুরদের লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। তার নাম সোমাস্ত্র। সেই অস্ত্র অসুরদের ওপর এসে আছড়ে পড়তেই ঠাণ্ডায় অসুরদের হাত-পা অবশ হয়ে গেল, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল। আর সেই সুযোগে দেব-সেনারা তাদের নির্বিচারে মেরে চলল। কালনেমি তা দেখে স্থির থাকতে পারল না। অসুররা এমনিতেই মায়াবী, কালনেমি আবার আরও বড় মায়াবী। চন্দ্রদেবের এই নতুন অস্ত্রকে রুখবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের শরীর দিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। তারপর হাজার হাজার নকল সূর্য তৈরি করে দানব-সেনাদের কাছ থেকে হিমঠাণ্ডাকে সরিয়ে দিয়ে তাদের চাঙা করে তুলল। আবার হইহই করে তারা দেবসৈন্যকে মারতে শুরু করলে সূর্যদেব একটি মোক্ষম বাণ ছুঁড়লেন।

সূর্যদেবের অদ্ভুত সেই বাণ রণস্থলের মাঝখানে পড়তেই ভারি অবাক কাণ্ড ঘটে গেল। দানবসেনারা হয়ে গেল দেব-সেনা। আর দেবসেনারা হয়ে গেল দানবসেনা। এমনভাবে এই বিপর্যয় চোখের পলকে ঘটে গেল যে, কেউ টেরও পেল না। কালনেমি যেমন শত্রু-সৈন্য মারছিল, তেমনিভাবেই মেরে চলল। সে যে নিজের সেনাদের মারছে, তা বুঝতেও পারল না। বেশ কিছু সেনা এভাবে মারা যাবার পর হঠাৎ নেমির সন্দেহ হল। নেমি কালনেমিকে সাবধান করে দিতেই কালনেমি এবার উলটোদিকে মুখ ঘোরাল। তাই দেখে সূর্যদেব আর একটা বাণ ছুঁড়লেন। এটি হল তাঁর মোক্ষম অনল বাণ, যা দিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে সব কিছু শুষে নেন। সেই বাণ এসে আছড়ে পড়তেই দানব-সেনাদের গায়ে যেন জ্বালা-পোড়া ধরে গেল। এমন কি হাতি, ঘোড়া থেকে যত প্রাণী ছিল তারাও তাপদাহে ছটফট করতে শুরু করল। মুহূর্তে কাঠ হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। কালনেমিরও কিছু অস্ত্র জানা ছিল—শরবর্ষণে মেঘ, জল এনে দানব-সেনাদের ঠাণ্ডা করে, দেবতাদেরই সোমাস্ত্রকে আরো উন্নত করে নিয়ে দেবতাদের দিকেই ছুঁড়ল। ফলে, দেবতারা রণক্ষেত্রে আর দাঁড়াতে না পেরে অনুচরদের নিয়ে যখন পালাতে গেলেন, কালনেমি তাঁদের অনেক সেনাকে মেরে ফেলল। অশ্বিনীকুমাররা তাই দেখে কালনেমিকে আক্রমণ করলেন। কালনেমিও ছাড়বার পাত্র নয়। দেব-বৈদ্যরা যখন বাণের পর বাণ ছুঁড়লেন, কালনেমি তখন তার ভীষণ গদা তুলে নিয়ে এত জোরে ছুঁড়ল যে, অশ্বিনীকুমারদের রথ ভেঙে চুরচুর হয়ে মাটিতে পুঁতে গেল। দেব-বৈদ্যদের হাতের সব অস্ত্র বিফল হল দেখে গবেষণা করে তাঁরা একটা বজ্রাস্ত্র তৈরি করলেন। ভাবলেন, কালনেমি এবার নির্ঘাৎ কাৎ হবে, কিন্তু বজ্রাস্ত্র দেখে কালনেমি ঠিক তার পালটা নারায়ণ অস্ত্র ছুঁড়তেই বজ্রাস্ত্রের তেজ কমে গেল। প্রাণ নিয়ে অশ্বিনীকুমাররা এবার মহেন্দ্রর রথের কাছে এসে আশ্রয় নিলেন।

দেবসেনাদের সঙ্গে যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর, যারাই দেবতাদের সাহায্য করতে এসেছিল, সবাই বিপর্যস্ত হল।

কালনেমি এবার সদলবলে এসে মহেন্দ্রকে ঘিরে ধরল। তাই দেখে দেবতাদের সঙ্গে সকলে আকুল হয়ে উঠল। আর বুঝি রক্ষা নেই।

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দৈত্যরা একটু বিস্মিত হল। সোনার রঙে কি যেন একটা সবেগে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে না? কিছুক্ষণের মধ্যে কাছে আসতেই দেখতে পেল, গরুড়ের পিঠে বিষ্ণু কেশব আসছেন। সশস্ত্র।

এদিকে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে বিষ্ণু এতক্ষণ তা জানতেই পারেন নি। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম থেকে উঠে টের পেয়েই দেবকুলকে বাঁচাতে গরুড়কে নিয়ে ছুটে এসেছেন।

কেশবকে দেখে দৈত্যরা হৈ হৈ করে উঠল। নিজেরাই বলাবলি করে উঠল—এতক্ষণে নাটের গুরু আসছেন। দেবতাদের যা কিছু, সবই তো ওঁরই দৌলতে। ওঁকে জয় করতে পারলেই সবাইকে জয় করা হবে। এসো, আমরা এখন এই কাপুরুষটাকে ছেড়ে বিষ্ণুকেই দেখি।

গরুড়কে নিয়ে কেশব নামামাত্রই দৈত্যরা চারদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করল। কেশবও আপন শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন।

একদিকে মহাবল, নানা অস্ত্রধারী দৈত্যরা, আর একদিকে গরুড়বাহন বিষ্ণু। তুমুল সে লড়াই। কালনেমি, নিমি, মহিষ যে যার অস্ত্র নিয়ে মহাতেজা গরুড় আর কেশবের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। কিন্তু বিষ্ণুর কাছে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বারবার তাদের পরাজয় মেনে নিতে হচ্ছিল। এতে দৈত্যদের রাগ গেল আরো বেড়ে।

আকাশ পথ অধিকার করে গরুড়ের পিঠে বিষ্ণু তখন যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ নিমি এমন এক গদা ছুঁড়ল যে, তার আঘাতে গরুড় জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে এসে পড়ল, সেই সঙ্গে কেশবও। সেই সুযোগে জম্ভাসুর কেশবকে পরিঘ দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে তিনিও জ্ঞান হারালেন। দৈত্যসেনাদের তখন সে কি উল্লাস! কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এলে কেশব রণক্ষেত্র ছেড়ে পালালেন।

কেশবকে পালাতে দেখে মহেন্দ্র তো দারুণ ভেঙে পড়লেন। তবে কি আমাদের জয়ের কোন আশাই নেই? মহেন্দ্রর আক্ষেপ শুনে কেশব বললেন—গ্রসনকে আমি মেরেছি। বাকি যারা আছে তারা কেউই আমাদের হাতে মরবে না। একমাত্র জম্ভাসুরকে চেষ্টা করলে তুমি মারতে পারবে। আমি অবশ্য তোমায় সাহায্য করব।

মহেন্দ্র মনোবল ফিরে পেয়ে জম্ভাসুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে লড়াই করলেন। কত অস্ত্রই না ছুঁড়লেন। রুদ্রানুচররাও কত চেষ্টা করল। কিন্তু কোনমতেই তাকে কায়দা করতে পারলেন না। জম্ভাসুর এমন সুকৌশলে লড়াই করে চলল যে, মহেন্দ্র যেন তার কাছে নিতান্তই ছেলেমানুষ।

মহেন্দ্রকে উপেক্ষা করে জম্ভাসুর এবার কেশবকে কায়দায় আনার জন্য যখন চিন্তা করছে একমনে, তখন কেশব মহেন্দ্রকে

ফিসফিস করে বললেন—এই সুযোগ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রর অমোঘ বাণে জম্ভাসুর নিহত হল।

দৈত্যরা গ্রসন আর জম্ভকে হারিয়ে এমন হতোদ্যম হয়ে পড়ল যে, অসুররাজ তারকের কাছে গিয়ে সব বলল।

তারকাসুর শোনামাত্রই দাউ দাউ করে আগুনের মত জ্বলে উঠল। কালনেমি থেকে শুরু করে আর যে সব দৈত্য ছিল, তাদের নিয়ে নিজের আটচাকা রথে চেপে তর্জন-গর্জন করতে করতে এবার নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হল।

আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হল। এবার দৈত্যদলের নেতা স্বয়ং অসুররাজ তারকাসুর, আর দেবগণের পক্ষে ইন্দ্র, মহেন্দ্রর সঙ্গে স্বয়ং ভগবান কেশব।

আকাশ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, রসাতল জুড়ে শুরু হল সেই বিশ্বত্রাস বিশ্বযুদ্ধ। ব্রহ্মবরে বলীয়ান তারকাসুরের কাছে দেবগণের সব অস্ত্রই বিফল হল। নতুন নতুন কত অস্ত্রই না দেবতারা আবিষ্কার করলেন, কিন্তু কোন কিছুই তারকাসুরকে ছুঁতে পর্যন্ত পারল না। অপরদিকে, তাদের হাতে দেবতারা তো বটেই, এমন কি কেশব নিজেও নাস্তানাবুদ হয়ে শেষে পরাজয় মেনে নিলেন।

যুদ্ধ জয় করে তারকাসুর ত্রিলোকের অধিপতি হয়ে নিজের অসুরপুরে ফিরে গিয়ে বসল।

এমন সময় কালনেমি এসে তারকাসুরকে বলল—মহারাজ, বন্দীদের বেঁধে এনেছি। কোথায় রাখব ?

তারকাসুর জিজ্ঞেস করল—কাদের বেঁধে এনেছ কালনেমি ?

—আজ্ঞে, কেশব, মহেন্দ্র থেকে যত দেবতা ছিল সবাইকে।

তারকাসুর শুনে মৃদু হেসে বলল—তিনটে জগতে তো আমার বন্দীশালা। নতুন করে ওদের আর কোথায় রাখবে কালনেমি। ছেড়ে দাও, যেখানে খুশি থাকুক।

কালনেমি তারকাসুরের আদেশে তাঁদের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল—আমাদের মহাপ্রাণ অসুররাজ তোমাদের মুক্তি দিয়ে বলেছেন, যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে।

মহেন্দ্রর সঙ্গে দেবতাদেরও লজ্জায় মাথা হেঁট। কেশবকে মহেন্দ্র বললেন—কেশব, আপনি সঙ্গে থাকতেও কেন এমন হল ?

কেশব বললেন—মহেন্দ্র, ব্রহ্মার বরে তারকাসুরের মৃত্যু হবে মাত্র সাত বছরের এক বালকের হাতে। তোমার আমার সাধ্য কি তারককে মারা ?

মহেন্দ্র শুনে সকলকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। অনেক স্তব-স্তুতির পর সন্তুষ্ট হয়ে দেবগণের সঙ্গে কেশবকেও দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার ? দেখে মনে হচ্ছে যেন দারুণ ঝড়-ঝাপটা খেয়ে আসছে।

কেশব বললেন—ঠিক তাই। তারকাসুর আপনার বরে স্বর্গ জয় করে আমাদের যে হাল করেছে, তা আর আপনাকে কি বলব ? স্বর্গ, দেবতা, অসুর সবই আপনার সৃষ্টি। সেই স্বর্গের দিকে তাকালে চোখ ফেটে জল আসে। দেবতাদের অবস্থা তো নিজেই দেখছেন।

ব্রহ্মা বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারক যেরকম তপস্যা আরম্ভ করেছিল, তাতে ত্রিলোক তখনই পুড়ে যাবার মত হয়েছিল। তাই আমি ওরই ইচ্ছা অনুসারে ঐরকম বর দিয়ে ওকে নিরস্ত করে আসি। সাত বছরের যে ছেলের হাতে তারকের মৃত্যু হবে, সে এখনও জন্মায় নি। তোমাদের কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কে সে ছেলে ?

ব্রহ্মা বললেন—সে হল শিবের ছেলে। উমার গর্ভে তার জন্ম হবে। উমা হিমালয়ের মেয়ে। এখনও জন্মায় নি। দক্ষযজ্ঞে মহাদেবের স্ত্রী সতী প্রাণ দিয়েছে। শিব এখনও আনমনা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হিমালয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যেই তপস্যায় বসবেন। হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে সে-ই সতী পার্বতী নামে জন্ম নিয়ে শিবের আরাধনা করবে। শিবের সঙ্গে তার বিয়েও হবে। তারই গর্ভে কার্তিক নামে একটি ছেলে হবে। তারকের মৃত্যু হবে তারই হাতে।

অগত্যা দেবতাদের অপেক্ষা করতেই হল।

ঠিক সময় যখন এল তখন কার্তিকের জন্ম হল। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কার্তিকের জন্মরহস্য আছে।) যখন তাঁর সাত বছর বয়স হল দেবতারা সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলেন। অমিততেজা বালককে নিজেদের দুর্গতির কথা সব শোনালেন।

কার্তিক বললেন—আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। আমি এখুনি যাচ্ছি।

বালকের মুখ থেকে আশ্বাস পেয়ে দেবতাদের মনোবল অনেক বেড়ে গেল।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তারকের কাছে এক দূত পাঠালেন। দূত এসে বলল—শোন রাজা, ইন্দ্র আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন, ত্রিভুবনে অত্যাচার করে যে পাপ করেছ, তৈরি হও, আজ তার শাস্তি নিতে।

শুনে তারকের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ল—হেরে গিয়ে আমার দয়ায় সে বেঁচে আছে। তার লজ্জা নেই ? আবার স্পর্ধা দেখায় ?

দূত চলে গেলে তারক একটু চিন্তাতেই পড়ল। এতদিন বাদে আজ ইন্দ্র তাকে এই ভাবে শাসিয়ে যায় কোন্ সাহসে ? তাহলে কি ইতিমধ্যে সে কারও সাহায্য আদায় করেছে ?

রাজপ্রাসাদে বসে এভাবে যখন নানা এলোমেলো চিন্তা ঘুরছিল তার মাথায়, হঠাৎ কানে এল দেবসেনাদের গলা। কার যেন তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সিংহাসন থেকে নেমে প্রাসাদের বাইরে এসে দেখল, ময়ূরের পিঠে চেপে হাতে ধনুক-বাণ, গদা নিয়ে প্রায় সাত বছরের এক বালক আসছে। আর দেব-সেনারা তারই জয়ধ্বনি দিয়ে বলছে—'জয় কার্তিকের জয়', 'জয় স্কন্দদেবের জয়'! তাকে দেখেই তারকাসুরের মনে পড়ে গেল ব্রহ্মার কথা। বুঝল, এতদিন বাদে তাহলে সত্যিই তার শমন এল।

সঙ্গে সঙ্গে তারকাসুর কালনেমি প্রমুখ দৈত্যদের বলল—তোমরা দেখছ কি ? তৈরি হও। বোধ হয়, এটাই হবে আমাদের শেষ যুদ্ধ।

দৈত্যসেনারা প্রস্তুত হতে চলে গেল।

কার্তিক কাছে আসতেই তারকাসুর বলল—এখানে শিশুর আগমনের কারণ ?

কার্তিক বললেন—হ্যাঁ, শিশুই বটে। তবে দেখতে। একবার শক্তি যাচাই করে দেখ।

তারক সঙ্গে সঙ্গে কার্তিককে লক্ষ্য করে বিশালকায় এক মুগুর ছুঁড়ল। কার্তিক বজ্রাস্ত্র দিয়ে তার গতি রোধ করলেন। তারক একটা ভিন্দিপাল ছুঁড়ল। কার্তিক সেটা নিতান্ত অবহেলায় হাতে

ধরে নিলেন। এবার নিজে একটা মুগুর তুলে ছুঁড়লেন তারককে লক্ষ্য করে। ভীমবেগে গদা তার গায়ে গিয়ে পড়তেই তারকাসুর বুঝল, বালক সহজ নয়। এ নিশ্চয়ই ব্রহ্মার সেই ছেলে।

মরতে হবেই। তবে কাপুরুষের মত নিশ্চয়ই নয়।

দৈত্যসেনারা ইতিমধ্যে এসে গিয়ে আক্রমণ করেছে কার্তিককে। মারতে শুরু করেছে দেবসেনাদের।

অসহ্য লাগল দেব সেনাপতি কার্তিকের। দুরন্ত যমের মত অস্ত্রের পর অস্ত্র হেনে দৈত্যদের এমনভাবে মারতে শুরু করলেন যে, তারা যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

বীর দৈত্যসেনারা পরাজিত।

তারকাসুর মহাক্রোধে ময়ূরকে লক্ষ্য করে এমন এক বাণ ছুঁড়ল যে, কার্তিককে ফেলে সে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। সেই ফাঁকে তারকের গদা এসে প্রচণ্ড আঘাত হানল কার্তিককে।

আর নয়।

নিজের তূণ থেকে কার্তিক এবার একটি শর তুলে নিলেন। ধনুকের ছিলেয় ধরে তারককে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়লেন। চারদিকে সবার কানে এসে বাজলো যেন এক সঙ্গে অনেকগুলো ময়ূরের ডাক। তীর গিয়ে সোজা তারকের বিশাল বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। তারকের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পৃথিবীতে আর একবার যেন আর একটা ভূমিকম্প হল। রক্তের ধারা অসুরপুরকে শোণিতপুর করে তুলল।

ত্রিভুবন তারকাসুরের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।



ঔর্ব-ঋষির জন্ম রহস্য

জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা। তাঁরই ইচ্ছায় আকাশ-মাটি, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, দেব-অসুর বা মানুষ—সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে। প্রজা বৃদ্ধির জন্য নারী-পুরুষ তাঁরই সৃষ্টি। সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, থেকে শুরু করে অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ প্রজাপতি—সবই তাঁর সৃষ্টি। আবার একই দেহে অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ তিনিই সৃষ্টি করলেন। প্রচুর গবেষণা করে পুরুষদেহ থেকে নারীদেহকে তিনিই আলাদা করলেন। তারই ফলে পৃথিবীতে পুরুষ আর নারী—দুটি দেহ, দুটি রূপ। পুরুষকে তিনিই দিলেন তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে সৃষ্টি করার ক্ষমতা, আর নারীকে দিলেন পুরুষের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে সৃষ্টিকে পালন করার শক্তি। পৃথিবীতে প্রথম সেই নারীর নাম হল শতরূপা। অনেকে আবার তাঁকে রতিও বলেন।

সে যাই হোক, মানুষ—সে মুনিই হোক, আর ঋষিই হোক, সকলেরই আদি জননী হলেন শতরূপা, রতি বা প্রসূতি।

নারী আর পুরুষ দুজনে মিলেমিশে যখন তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে লাগল, ব্রহ্মা তখন ছুটি নিলেন।

ব্রহ্মার নাতি-পুতি বাড়ে, আনন্দও বাড়ে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার সুখের হলে কার না আনন্দ হয়?

কিন্তু সব ছেলেপুলেই যে সমান হবে, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? সব গাছই যে আম বা জাম হবে কিংবা নিমগাছ হবে, তা কি হয়? তাহলে জগৎকে বিচিত্র বলা হয় কেন? প্রত্যেকেই এক একটা গুণ নিয়ে জন্মায়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণটাই বড় হয়ে ওঠে। তাই কেউ হয় সংসারী, কেউ হয় সন্ন্যাসী। কেউ হয় ভোগী, কেউ হয় যোগী।

পৃথিবীতে সৃষ্টির সেই প্রথম যুগেই এমনি একটি ছেলে জন্মেছিল। তার নাম ঊর্ব। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সংসার ছেড়ে বনে চলে গেল। তার ধারণাই জন্মে গেল, সংসার একটা মায়া। এখানে থাকলেই জড়িয়ে পড়তে হবে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকাই ভাল।

ঊর্ব বনে এসে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তপস্যা শুরু করে দিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—ঊর্বর সে কি কঠোর তপস্যা! মনকে নিজের বশে রাখার জন্য, তার সে কি কঠোর পরিশ্রম!

ব্রহ্মচর্যের সাধনা তো আর যা-তা সাধনা নয়। বাইরের সব প্রলোভনকে জয় করতে হবে। এদিকে সৃষ্টির মধ্যে প্রলোভনের বস্তুর শেষ নেই। মনের ভেতর থাকে কামনা আর লোভ। এই দুটোই যত অনর্থের মূল। এরাই মানুষকে সর্বপ্রথম মায়ায় জড়ায়। এ দুটোকে দমন করতে পারলে বাকিগুলো আর মাথা তুলতে পারে না। মোহ জাগে না। রাগও আসে না। তাই ব্রহ্মচর্যের সাধনা হল ও দুটোকে একেবারে দমিয়ে রাখা। এরা প্রত্যেকেই এক একটা আগুন। একটু বাতাস পেলেই এরা মনের ভেতরে দপ করে জ্বলে ওঠে। মানুষ এর তাপে জ্বলে পুড়ে যায়। বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। ভাল-মন্দ আর বুঝতে পারে না। তখন অমানুষ অসুর হয়ে ওঠে।

মন যাতে কোনরকমেই চঞ্চল হয়ে না ওঠে, ঊর্ব তার জন্য নির্জনে গিয়ে কঠোর সাধনা করছিল। একমনে কোন কিছুর সাধনা করলে, সিদ্ধিলাভ তার হবেই। জানবার আগ্রহ যেমন জ্ঞানকে বাড়ায়, তারপর একসময় তাকে জ্ঞানী করে তোলে, এ-ও ঠিক তাই। সাধনা করতে করতে, কামনা-বাসনা লোভকে জয় করতে করতে, ঊর্ব আর সেই বালক ঊর্ব রইল না। এখন ঊর্ব ঋষি। গনগনে আগুনকে কালো লোহার কড়া দিয়ে ঢেকে রাখলে সে কি আর দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে পারে? তার উত্তাপ ঢাকনার রঙকে বদলে দেয়। আগুনের শক্তি ঢাকনার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কালো কড়াকে লাল করে দেয়। ব্রহ্মচর্য-সাধনার ফলে ঊর্ব ঋষিও এখন সেইরকম তেজস্বী হয়ে উঠলেন।

তাই দেখে মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে যেখানে যত জ্ঞানী-গুণী ছিলেন, সবাই একদিন ছুটে এলেন ঊর্বর কাছে। সেই সঙ্গে কিন্তু হিরণ্যকশিপুও এসেছিল। দৈত্য হলে কি হবে, সেও কম তপস্যা করেনি। তপস্যা করেই না তাঁর ত্রিভুবনজয়ী শক্তিলাভ হয়েছিল। তাই কৌতূহল তাঁরও কিছু কম ছিল না।

সবাই এসে ঊর্ব ঋষিকে ঘিরে ধরলেন।

—এ কি ব্যাপার তোমার ? তুমি বাবার একমাত্র ছেলে। বিয়ে-থা না করে, সংসার ধর্ম পালন না করে, চিরকুমার হয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা নিলে কেন ?

ঊর্ব ঋষি বললেন—ব্রহ্মচর্য-সাধনাই ব্রাহ্মণের বড় সাধনা। সেই সাধনাতেই আমি জীবন কাটাব। এতে আমি অধর্ম কি করলাম ?

ঋষিরা বললেন—ব্রহ্মচর্যসাধন সংসারে প্রথম ধাপ। তার ওপরেও তার অনেক কিছু করার আছে। সেগুলোর কথা নিশ্চয়ই তোমাকে বলতে হবে না। তা পালন না করলে সৃষ্টি কি বজায় থাকবে ? তুমি যদি সংসার না কর, ছেলেপুলে না হয়, তাহলে তোমার বংশ লোপ পেয়ে যাবে। তোমার বাবা, ঠাকুর্দা কি তাতে শান্তি পাবেন ? মুক্তি পাবেন ?

ঊর্ব ঋষি বললেন—ব্রহ্মচর্য-সাধনা করলে যে সব কিছু ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়, তা কি আপনাদের অজানা ? তবে কেন আমাকে মিছিমিছি সংসারী হবার কথা বলছেন ?

ঋষি বললেন—সংসারী মানুষের এটাই ধর্ম। বংশরক্ষা করার জন্যই ব্রহ্মা নারীর সৃষ্টি করেছেন। তুমি কি তা অগ্রাহ্য করতে পার ? চষা জমিতে বীজ পুঁতলে তবে ফল হয়। সেই ফলই মানুষের জীবন বাঁচায়। বাবা নিজের মনের মত করে তার ছেলেকে তৈরি করে নেয়। তারপর সেই ছেলের মধ্যেই সে বেঁচে থাকে। তুমি তো দেখছি জীবন কিসে নাশ হয়, তারই ব্রত পালন করছ। তুমি কি নিজেকে ব্রহ্মার সমান মনে করছ নাকি ?

ঋষিদের শেষ মন্তব্যটি ঊর্বর বুকে যেন সূচের মত এসে বিঁধল।

ঊর্ব বললেন—আপনারা সকলেই দিকপাল ঋষি। আমারও প্রণম্য। ব্রহ্মচর্যের সাধনা যে কি অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা আপনাদের অজানা নয়। তবুও আমাকে বংশরক্ষার জন্য কেন যে বিয়ে করতে বলছেন, জানি না। আমি নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, যোগী। আমি যদি আমার সাধনা ঠিকমত করে থাকি, তাহলে সেই শক্তিবলেই স্ত্রী ছাড়াই পুত্রের জনক হব। আপনারা দেখুন।

এই বলে ঊর্ব ঋষি সামনের জ্বলন্ত হোমের আগুনে নিজের উরু রাখলেন। আগুনে যখন উরু ঝলসে এল, তখন একগাছা কুশ নিয়ে সেখানে বিঁধিয়ে দিতেই আগুনের রঙের একটি ছেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। ঊর্ব ঋষির উরু থেকে সেই ছেলেটি জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম হল ঔর্ব।

তা দেখে সকলেই স্তম্ভিত হল।

এদিকে শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষীণ সুরে বলে উঠল—বাবা, আমার বড় ক্ষিদে···বড় ক্ষিদে। এই বলে কিছুমাত্র আর অপেক্ষা না করে আগুনের মত বিশ্ব গ্রাস করতে উদ্যত হল।

ঠিক সেই সময়ই ব্রহ্মা এসে ঔর্বকে থামালেন। ঊর্ব ঋষিকেও সান্ত্বনা দিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ছেলের দায়িত্ব নিলেন দেখে ঊর্বও শান্ত হলেন। মুনি-ঋষিরাও চলে গেলেন।

সবাই চলে গেলেন কিন্তু হিরণ্যকশিপু গেল না। ঊর্ব ঋষির মধ্যে ব্রহ্মচর্যের এই দারুণ শক্তি দেখে দৈত্যরাজ তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলল—আজ থেকে আপনি আমার গুরু। আমি আপনার শিষ্য হলাম।

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ঊর্ব সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর অনুরোধ মেনে নিলেন আর শিষ্যকে সেই গুপ্তবিদ্যা শিখিয়ে দিলেন যা দিয়ে শত্রুপক্ষকে নির্মূল করা যায়। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় হিরণ্যকশিপু সেই শক্তি দিয়ে অনেককে উৎখাত করে দিয়েছিল।

ঊর্ব ঋষির পুত্র ঔর্ব। পরে ইনিও মহাতেজস্বী ঋষি হয়েছিলেন। আজও ভার্গব, চ্যবন, জামদগ্ন্য প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে ঔর্ব ঋষির নামও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে।

বাণাসুরের বরলাভ

তপস্যার প্রভাবে দেখতে দেখতে বাণাসুর দুরন্ত হয়ে উঠল। অপ্রতিহত হল তার গতি। নিজের জন্য নিজের মনের মত করে একটা নগরও সে তৈরি করে নিল। গর্বভরে তার নাম দিল—ত্রিপুর। দুশো যোজন লম্বা আর একশ যোজন চওড়া সেই পুর সব দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে দারুণ সুরক্ষিত। কারো সাধ্য ছিল না তার ভেতর তার বিনা অনুমতিতে ঢোকে। তার অনুচররা সদাই সজাগ।

এই বাণ হল পাতালরাজ বলির ছেলে। কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধকে আটকে রাখার জন্য একবার তাঁর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। সে আর এক কাহিনী।

শিবেরই অনুগ্রহে বাণের সব কিছু। এই ত্রিপুর, সিংহাসন, ধন-দৌলত—এত রমরমা। তাই শিবের এক লিঙ্গ রেখে সে নিত্য তার পুজো করত। শিবলিঙ্গের পুজো যে নিত্য করে, তার অভাব বলে কিছু থাকে না। বাণেরও ছিল না। যে রাজপোশাকটা তার গায়ে থাকত, সেটা মণি-মুক্তোয় ভরা। সিংহাসনে নানা মণির সঙ্গে হীরে ঝলমল করত এমন ভাবে যে, তাকালেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সবই তার শিবের দৌলতে। হলে কি হবে, স্বভাবে তো অসুর। যেমন হাজারবার ধুলেও কয়লার রঙ যায় না, হাজার চেষ্টা করলেও স্বভাব একবারে যায় না। বিশেষ করে যার আবার অসুরকুলে জন্ম। তাই স্বভাবে দোষে হঠাৎ সে মাত্রাছাড়া অত্যাচার শুরু করে দিল। দেবতারাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

যুক্তি-পরামর্শ করে দেবতারা তাই দেবরাজকে নিয়ে একদিন মহাদেবের কাছেই নালিশ জানাতে গেলেন।

স্তব-স্তুতি না করলে তো আর দেবাদিদেব সাড়া দেন না। আপন মনে ব্যোম-ভোলা হয়ে বসে থাকেন। দেবতারা তাই গিয়ে প্রথমে অনেক স্তব-স্তুতি করলেন।

মৃদু হেসে দেবাদিদেব বললেন—কি ব্যাপার, তোমাদের সব সংবাদ ভাল তো ?

—কি করে আর ভাল থাকবে প্রভু ? দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—বাণকে বর দিয়ে এমন করে দিয়েছেন যে সে এখন আমদের মাথার ওপর পা দিয়ে চলেছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ প্রভু। আমরা সবাই এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

—সে কি ! বাণের এ তো ভারি অন্যায়।

—প্রভু, এখন আপনার ছেলেকে আপনি ছাড়া কে শাসন করবে ?

—ঠিক বলেছ ইন্দ্র। মহাদেব বললেন—আচ্ছা, তোমরা যাও।

দেবতারা চলে যেতে মহাদেব কি যেন খানিকটা ভেবে নিলেন। তারপর নারদকে ডেকে পাঠালেন। ডাক পেয়ে ঢেঁকিবাহন নারদও সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলেন। মহাদেবকে প্রণাম জানালেন।

—কি আদেশ প্রভু ?

মহাদেব বললেন—নারদ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—আপনার হুকুম না মানার সাধ্য কি নারদের আছে ? খুব বিনয়ের সঙ্গে নারদ বললেন।

—তুমি ত্রিপুরে যাও। বাণ আমারই অনুগ্রহে ঐ ত্রিপুর তৈরি করেছে। ওখানে থেকে সে এখন দেবতাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। এ তো আর আমি বরদাস্ত করতে পারি না। ঐ ত্রিপুর আমি ধ্বংস করে দেব। বাণকেও খতম করব। তারই জন্য আগে তোমাকে গিয়ে একটু পথ পরিষ্কার করতে হবে।

—কিভাবে করতে হবে বলুন।

—ত্রিপুরে যেসব রমণী আছে, তারা স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানে না। যেখানে রমণীরা সতী সাধ্বী হয়ে থাকে, সেখানে আমরা দেবাদিদেব হলেও ঢুকতে পারি না। তোমাকে আগে গিয়ে যে ভাবেই হোক, নারীদের স্বভাবকে একটু ভণ্ডুল করে দিতে হবে। তারপর যা করবার আমি করব।

—প্রভুর যেমন আদেশ। বলেই নারদ সোজা ত্রিপুরে চলে গেলেন। এমন কোন জায়গা ছিল না যে তাঁর অগম্য।

বাণ তখন তার মহিষী অনৌপম্যাকে নিয়ে রত্ন সিংহাসনে বসে। অনুচররা সবাই সভা জাঁকিয়ে বসে আছে। মেজাজে আমোদ-আহ্লাদ চলছে। এমন সময় নারদকে দেখেই বাণাসুর সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তাই দেখে মহিষী আর অনুচররাও সবাই দাঁড়াল।

—কি সৌভাগ্য আমার। নারদকে সম্ভাষণ জানিয়ে বাণাসুর বলল—আজ কতকাল পর যে এ দিকে এলেন। আসুন, আসুন। বলে মুনিকে নিয়ে গিয়ে একটা সিংহাসনে বসাল।

—বলুন মুনি, আপনার কি সেবা করতে পারি। ইন্দ্রদেবের কথা বাদ দিন, বড় হিংসুটে। আপনি আমাদের আপনজন।

শুনে নারদ মুনি ঘাড় দোলাতে দোলাতে একটু হাসলেন।

বাণ-মহিষী অনৌপম্যা বাণকে থামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—মুনিকে যখন পেয়েছি আর ছাড়ছি না। কতদিন ধরে যে মনে মনে খুঁজছিলাম।

—কেন গো ? নারদ বললেন—কেউ দুঃখ-কষ্টে পড়লেই তো জানি আমায় খোঁজে। তা তোমার আবার কি হল ? এমন সুখে রয়েছ !

—হ্যাঁ, আপনি আমার এই সুখটাই দেখছেন। মহিষী বলল—সত্যি বলছি মুনি, মনে আমার একটুও শান্তি নেই।

—কেন ?

—কি করে থাকবে বলুন। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, সব থাকতেও আমার কেউ নেই। শ্বশুর আমার ওপর সন্তুষ্ট নন। শাশুড়িরও তো আমি যেন দু চোখের বিষ। ননদ কুষ্মীনসী ? তার নিজের তো গুণের তুলনা নেই। আমাকে দেখতে পেলেই যেন চিবিয়ে খায়। এসব আমার ভাল লাগে না, মুনি। বলতে পারেন, কি করলে আমি শান্তি পাব ? এক দমে অনৌপম্যা অভিযোগ রেখে গেল।

নারদ মুনি শুনে-টুনে বললেন—দেখ মহিষী, সবাইকে যদি বশে আনতে চাও, তাহলে ব্রাহ্মণকে দান-ধ্যান কর। কেশবের আরাধনা, বার-ব্রত পালন কর। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কেশবের অনুগ্রহে তোমার যা ইচ্ছা হবে, তাই পাবে। এমনকি, তোমাকে দেখলে যে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, সে-ও তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। কেশবের এত গুণ। যা তোমার শিবের নেই।

মহিষী বলল—আমি আপনাকেই দান করছি। আপনি নিন।



নারদ বললেন—না মহিষী। আমাকে দিলে হবে না। যে ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাল নয়, সে রকম কাউকে দাও।

এই বলে নারদ চলে গেলেন। মহিষী ব্রাহ্মণ খুঁজতে লেগে পড়ল। মহিষীর দেখাদেখি ত্রিপুরে যত রমণী ছিল, সকলেই ব্রাহ্মণকে কিছু দান করবে বলে প্রায় ছুটোছুটি শুরু করে দিল। শিবের পুজো পড়ে রইল।

রমণীরা যেখানে চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেখানে আর শান্তি থাকে না। ত্রিপুরেরও সেই দশা হল।

এই সুযোগে শিব, বিষ্ণু-ব্রহ্মা-কুবের-অগ্নি-বায়ু সকলকে এক জায়গায় জড়ো করে বাণাসুরের ত্রিপুরকে লক্ষ্য করে একটা বাণ ছুঁড়লেন। অগ্নিকে বললেন—তুমি ঐ বাণের মুখে গিয়ে ত্রিপুরে যা কিছু আছে পোড়াতে থাক। আর পবনকে ডেকে বললেন—তুমি অগ্নির সঙ্গে গিয়ে ওকে সাহায্য কর। যেন ত্রিপুর থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে না পারে।

অগ্নি আর পবন ত্রিপুরে গিয়ে এমন প্রলয়কাণ্ড করে দিলেন যে পুকুর-গাছপালা, অমন সুন্দর সুন্দর বাগান তো বটেই, এমনকি অসুররাও ঝাঁকে ঝাঁকে পুড়ে মরতে লাগল। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু কেউই বাদ গেল না।

ত্রিপুরের মধ্যে এই অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে এবার বাণের চৈতন্য হল। বুঝল, এ কাজ একমাত্র শিব ছাড়া আর কেউ করতে পারেন না। শিবই একমাত্র তাকে মারতে পারেন, আর কেউ নয়। দেবতারা নিশ্চয়ই শিবকে রাগিয়ে দিয়েছেন। নইলে তিনি কেনই বা এমন কোপানলে তাদের পুড়িয়ে মারবেন? শিবের হাতে মৃত্যু—এ তো সুখের। কিন্তু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সে রোজ পুজো করত, তাকে কি করে আগুনে পুড়তে দেওয়া যায়।

মন্দির থেকে সেই শিবলিঙ্গকে মাথায় নিয়ে বাণাসুর তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে বেরিয়ে পড়ল। গলা ছেড়ে বারবার মহাদেবকে ডাকতে লাগল। আর বলতে লাগল—প্রভু, তুমি আমার সব নাও। আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সবাইকেই নাও। আমাকেও নাও। কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার এই লিঙ্গটিকে যেন মন-প্রাণ দিয়ে পুজো করি। একে তুমি পুড়তে দিও না। আমরা পাপ করেছি, তার শাস্তি তুমি আমাদের দাও, মাথা পেতে নেব। কিন্তু এই লিঙ্গটিকে রক্ষা কর প্রভু।

এইসব বলে বাণাসুর এমন করুণ সুরে মহাদেবের স্তব-স্তুতি করতে লাগল যে শিবের সব রাগ মুহূর্তে জল হয়ে গেল। অগ্নি-পবনকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বাণাসুরকে দেখা দিলেন। তারপর বললেন—বাণ, অপূর্ব তোমার স্তব। অপূর্ব তোমার ভক্তি। তোমার যে চৈতন্য লাভ হয়েছে এতেই আমি খুশি। তোমার স্ত্রী-পুত্র-নাতি-নাতনি নিয়ে তুমি সুবর্ণপুরে গিয়ে বাস কর। আমার আশীর্বাদে তুমি দেবগণের অবধ্য, অজেয় হবে, যাও।

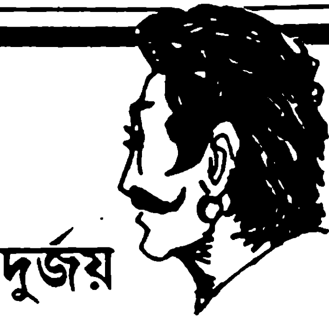
এই বলে দেবাদিদেব অন্তর্হিত হলেন। বাণাসুরও আবার সুবর্ণপুরে গিয়ে নতুন করে ঘর সংসার পাতল।

যদিও তখনকার মত সব মিটমাট হয়ে গেল, তবুও দেবরাজ ইন্দ্র ভোলানাথ আশুতোষের কাণ্ড দেখে অবাকই হলেন।



বরাহ পুরাণ

পৃথিবী প্লাবনে ধ্বংস হয়ে গেলে ভগবান বিষ্ণু বিধাতা ব্রহ্মা আর অমর মুনি-ঋষিদের আকুল আবেদনে বরাহ মূর্তি ধারণ করে জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে আনেন। দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করে পৃথিবীর অশান্তি দূর করেন। তারপর অমরদের সামনে বরাহরূপ ধরেই এই পুরাণ কথা বলে তাঁদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এর নাম 'বরাহ পুরাণ'। মহর্ষি বেদব্যাস পরে এই পুরাণটি সঙ্কলন করে সূতকে শুনিয়েছিলেন। ভগবান বিষ্ণু যে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, এই পুরাণে বিশেষভাবে তাই বলা হয়েছে।



দুর্জয় গৌরমুখ এবং তারপর

প্রতিজ্ঞামত কাজ শেষ হয়ে গেছে। দিকবিদিক এখন হাতের মুঠোয়। পাতাল তো বটেই, মর্ত্য-অন্তরীক্ষ-স্বর্গে এমন আর কেউ নেই যাকে জয় করতে বাকি আছে। সকলেই এখন আজ্ঞাবহ। স্বর্গলোক ছেড়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে বারাণসীতে আত্মগোপন করে আছেন। দুর্জয় এখন সুপ্রতীকের ছেলে রাজা দুর্জয়। সর্বেসর্বা।

যুদ্ধকাজ যখন আর নেই, সবই যখন ঠিকঠাক চলছে, তখন পৃথিবীর চারদিকে একটু ঘুরে বেড়িয়েই আসা যাক—এই ভেবে দুর্জয় তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল।

ঘুরতে ঘুরতে দুর্জয় এসেছে গন্ধমাদন পর্বতে। বেড়াতে বেরিয়েছে রাজা—বিশেষ করে ত্রিভুবনের রাজা। সেনারা কি আর তার সঙ্গে না থেকে পারে? সুতরাং অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক—অনেক সেনাই রাজার পেছনে। প্রায় সারা গন্ধমাদন জুড়েই পড়ে গেল ছাউনি—রাজা এসেছে বেড়াতে।

অপূর্ব গন্ধমাদন। রাজা দুর্জয় ঘুরে ঘুরে দেখে। ভালও লাগে তার।

একদিন দুর্জয় এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ দুজন তাপস-বেশী যুবক এসে তার সামনে দাঁড়াল। বেশ বলিষ্ঠ, সুদর্শন।

রাজা জিজ্ঞেস করল—কি চাই তোমাদের?

যুবক দুটি বলল—যদি অভয় দেন, তো বলি।

খোশ মেজাজেই ছিল রাজা। বলল—ঠিক আছে, নির্ভয়ে বল।

—আজ্ঞে, আপনি রাজা। আপনার শাসনে সব চলছে ঠিকই, তবুও আমদের দু ভাইকে যদি আপনার শাসনকাজে সাহায্য করার জন্য রাখেন। খুবই বিনয়ের সঙ্গে ওরা বলল।

—তার মানে তোমাদের রাজ্যপাল হবার খুব ইচ্ছে? বেশ, ঠিক আছে, যাও। আজ থেকে তাই হলে। দিলদরিয়া মেজাজে সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয় তাদের রাজ্যপাল নিয়োগ করল।

যুবকদুটিও খুশি মনে কাজ হাসিল হতেই চলে গেল। এরা হল বিদ্যুৎ আর সুবিদ্যুৎ নামে দুই অসুর। বহুদিন ধরে এরা এমন এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

গন্ধমাদন ছেড়ে রাজা এবার বেড়াতে এসেছে মন্দর পর্বতে।

আহা, মন্দর পর্বতের কি অপূর্ব শোভা! হাতির পিঠে চেপে রাজা ঘোরে, আর দেখে। যত দেখে, ততই মন আনন্দে ভরে ওঠে। নাম-না-জানা গাছ, আর ফুল—কি বিচিত্র!

দেখতে দেখতে হঠাৎ রাজার চোখে পড়ল সোনা রঙের এক বটগাছ। আর সেই বটগাছের নীচে বসে দুটি সোনা রঙের মেয়ে। এখানে এমন মেয়ে কোথা থেকে এল? বিস্মিত রাজা এগিয়ে যেতেই গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে এল গেরুয়াপরা মাঝবয়সী দুই সাধু।

তাদের দেখেই রাজা সঙ্গে সঙ্গে হাতির পিঠ থেকে নেমে প্রণাম জানাল। সাধু দুজনও রাজাকে আপ্যায়ন জানিয়ে পাশেই বসালেন।

রাজা বিনয়ে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—আপনারা কারা? আর এই মেয়েদুটিই বা এখানে কেন?

তারা বলল—আমরা দু ভাই। আমাদের নাম হেতা আর প্রহেতা। আমরা স্বায়ম্ভুব মনুর দুই ছেলে। দেবতারা আমাদের ওপর খুব অবিচার করেছিল বলে আমরা তার প্রতিশোধ নিতে সুমেরুতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। বাধ্য হয়েই আমাদের এই মেয়ে দুটিকে নিয়ে এখানে এসে আছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের মেয়েদুটিকে নেন, তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হই।

হেতা-প্রহেতার কথা শুনে আর মেয়েদুটিকে দেখে রাজা দুর্জয় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। হেতার মেয়ে সুকেশী আর প্রহেতার মেয়ে মিশ্রকেশীকে বিয়ে করে মহানন্দে দুর্জয়-রাজ ফিরে এল নিজের রাজধানীতে।

বেশ কিছুকাল রাজধানীতে ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে, রাজার আবার ইচ্ছে হল শিকারে যাবার।

রাজা যাবে শিকারে—যা-তা কথা নয়। রাজধানীতে সাড়া পড়ে গেল। হাতি, ঘোড়া, হাতিয়ার নিয়ে সেনা-সেনাপতিরাও তৈরি হয়ে গেল। রাজা চলেছে শিকারে। যেতে যেতে চোখে পড়ল গভীর এক বন। তারই মাঝে মাঝে আবার মুনিদের আশ্রম। দেখল, বনে শিকার প্রচুর। ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে চারদিকে তাঁবু গেড়ে ফেলল। সারাদিন ধরে মহা উৎসাহে শিকার চলতে লাগল।

শিকার করতে করতে রাজা দুর্জয়ের এক সময় দারুণ খিদে আর তেষ্টা পেয়ে গেল। কাছেই এক মুনির আশ্রম ছিল। এখানে গৌরমুখ নামে এক মুনি তপস্যা করতেন। রাজা মুনির আশ্রমে যেতেই মুনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

খিদে-তেষ্টায় তখন রাজা শুধু একাই আকুল নয়, প্রায় সকলেই। অতিথির সেবা মুনির ধর্ম। কিন্তু গৌরমুখ মুনির কি আছে? থাকতেন একটা পর্ণকুটিরে মাত্র! সামান্য একটা জায়গা নিয়ে তাঁর আশ্রম। অত সৈন্য-সামন্ত তো দূরের কথা, রাজাকেই ভালভাবে বসাবার জায়গা নেই। আর খাওয়ানো সবাইকে! অথচ আজ সকলেই তাঁর আশ্রমে অতিথি। সেবা করতে না পারলে মহা পাপ হবে।

বিষ্ণুভক্ত গৌরমুখ মহা চিন্তায় পড়ে রাজাকে বললেন—রাজা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি স্নান সেরে এসেই অতিথি-সেবা করব।

এই বলে গৌরমুখ নদীতে গিয়ে স্নান সারলেন। তারপর আকুলভাবে ভগবান বিষ্ণুকে ডাকতে লাগলেন—প্রভু, পরীক্ষায় যখন ফেলেছ, তখন একমাত্র তুমিই আমাকে উত্তীর্ণ করতে পার। আমি তোমারই ভক্ত। অতিথি-সেবা করতে না পারলে মহাপাপ হবে। প্রভু, তুমি আমাকে এই মহাপাতক থেকে উদ্ধার কর।

গৌরমুখ এভাবে যখন আকুল হয়ে ডাকছেন, তখন হঠাৎ আকাশবাণী শুনলেন—'গৌরমুখ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। তুমি মনে মনে যা চাইবে, তা-ই পাবে।' সেই সঙ্গে গৌরমুখ দেখলেন, তাঁর হাতে এসে উজ্জ্বল এক মণি পড়ল।

বিষ্ণুর আশ্বাস পেয়েছেন, নিশ্চিন্ত গৌরমুখ। মনে মনে ভাবলেন, রাজার সঙ্গে অত সৈন্য-সামন্ত, সেনাপতি, অনুচর। সবাই দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকা জায়গায়—আহা, ওদের থাকার জন্য যদি আলাদা একটা করে প্রাসাদ হতো!

মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক প্রাসাদ যেন চোখের পলকে মাটি ভেদ করে গজিয়ে উঠল। আর প্রতিটি প্রাসাদই যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামে ভরা। এরপর গৌরমুখের মনে হল, ঐ প্রাসাদে তো আর রাজা থাকতে পারেন না। রাজার মতই রাজার যদি একটা রাজপ্রাসাদ হতো! ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই অপরূপ আর এক প্রাসাদ। চারদিক তার ঝলমল করছে মণি-মাণিক্যে।

গৌরমুখ ফিরে এসে রাজাকে বললেন—রাজা, আপনার লোকজনদের ঐসব প্রাসাদে পাঠিয়ে দিন। আর আপনি থাকবেন এই প্রাসাদে।

বনের মাঝে হঠাৎ এভাবে প্রাসাদ গজিয়ে উঠতে দেখে রাজা বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবছিল, একজন মুনির তপস্যার এ কি জোর রে বাবা! এখন গৌরমুখের কথা শুনে সেনাদের ঐসব প্রাসাদে বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দিল। সেনারা গিয়ে দেখল, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে কত দাসদাসী। আর, কত রকমের কত খাবার। সেনারা মনের আনন্দে ভোজপর্বে বসে গেল।

গৌরমুখ রাজাকে নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদে।

দুর্জয় প্রাসাদে ঢুকেই দেখল—এ যে এক ইন্দ্রপুরী!

গৌরমুখ বললেন—রাজা, শিকারে আপনি খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার সেবা-পরিচর্যার জন্য নিশ্চয়ই দাসদাসীর দরকার।

মুনির হাতে মণি, মুখে এই ইচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে দাসদাসীতে রাজপ্রাসাদ ভরে গেল। রাজা দেখল দাসী তো নয়, যেন এক এক অপ্সরা। দেখে তো রাজা খিদে-তেষ্টা প্রায় ভুলতেই বসেছিল।

ইতিমধ্যে ঝলমলে পোশাকে পরিচারিকারা রাজার সামনে খাবার নিয়ে এল। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় তাই দেখে রাজার খিদে দারুণ বেড়ে গেল। মনপ্রাণ ভরে যেন তৃপ্তির সঙ্গে রাজা আহারপর্ব সমাধা করল।

এসব মিটতে মিটতেই সন্ধ্যা নেমে এল। প্রতিটি প্রাসাদ আলোয় ঝলমল করে উঠল।

গৌরমুখ বললেন—বিশ্রাম করুন রাজা। আপনার আদেশ পালনের জন্য এরা রইল। এই বলে মুনিবর চলে গেলেন।

রাজা দুর্জয়ও নরম গদির ওপর দেহ এলিয়ে দিল। দাসীরাও তার সেবা পরিচর্যা করতে লাগল। প্রাসাদ মুখর হয়ে উঠল।

মহানন্দে এই সব উপভোগ করতে করতে এক সময় রাজা দুর্জয় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হতেই যখন রাজার ঘুম ভাঙল, দেখল কোথায় কি? কোথায় প্রাসাদ! কোথায় দাসদাসী! সেই বন। বনের মাঝে সেই আশ্রম। কিন্তু গত রাত্রে যা দেখেছে সে, এখনও তা তার চোখের সামনে ভাসছে। যা খেয়েছে, এখনও তার আস্বাদ যেন মুখে লেগে। স্বপ্ন তো নয়। মুনি এত কিছু করল কিভাবে?

অনেক ভেবে চিন্তে রাজা দুর্জয় নিশ্চিন্ত হল—এসব ঐ মণিরই কাজ।

সঙ্গে সঙ্গে মণিটার ওপর রাজার দারুণ লোভ জেগে উঠল। মণিটা তার চাই।

রাজা দুর্জয় মন্ত্রী বিরোচনকে ডেকে বলল—বিরোচন, তুমি ঐ গৌরমুখ মুনির কাছে গিয়ে আমার জন্য মণিটা চেয়ে আন।

বিরোচন গিয়ে গৌরমুখকে বলল।

মুনিবর বললেন—সে কি কথা? রাজার ধর্ম মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের দান করা। তা না করে তিনি আমার কাছে মণি চাইছেন? ভিখারি হওয়া কি রাজার সাজে?

বিরোচন ফিরে গিয়ে গৌরমুখ যা বলেছিলেন, রাজাকে হুবহু সেই কথা শোনাল। আর শোনামাত্রই রাজা গর্জন করে উঠল রাগে। সামান্য এক মুনির এত বড় স্পর্ধা যে তাকে ভিখারি বলে! রাজা দুর্জয়কে তাহলে মুনি চেনে না।

সেনাপতি নীলকে ডেকে বলল—নীল, যেভাবেই হোক, মুনির কাছ থেকে ঐ মণি কেড়ে নিয়ে এসো। বিরোচন, তুমিও যাও।

রাজার আদেশে সেনাপতি নীল, মন্ত্রী বিরোচন যুদ্ধসাজে সেনাবাহিনী নিয়ে ছুটল মুনির আশ্রমে।

মুনি নেই। যে ঘরে মুনি যাগ-হোম করতেন, নীল দেখল, মণিটা সেই ঘরে রয়েছে। মনে মনে নীল ভাবল—মণিটা নিয়ে যাওয়া এমন কি ব্যাপার। এত লোকজন সঙ্গে আনার কি এমন প্রয়োজন ছিল? কিন্তু মণিটার যে কি ক্ষমতা, তা নীল কেমন করে জানবে?

হাত বাড়িয়ে মণিটার কাছে এগোতে যাবে কি, প্রচণ্ড হুঙ্কারে দশদিক কাঁপিয়ে নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোথা থেকে যে হাজার হাজার সৈন্য তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, নীল তা ঠিক করতে না পেরে প্রথমটায় বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ইতিমধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। নীলও বীর বিক্রমে হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়াল। দুর্জয়ের কাছে খবর পৌছতে মণিটার ওপর তার লোভ আরও বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধে বিরোচন প্রাণ হারাল। শোনামাত্রই রাজা দুর্জয় তর্জন-গর্জন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হল। খবর পৌছে গেল চারদিকে। খবর গেল হেতা-প্রহেতার কাছে। এক এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে ছুটে এল পনের জন প্রধান প্রধান দৈত্য।

মুহূর্তে বন হয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র। দু পক্ষের সে কি দারুণ লড়াই। অসুর সেনারা ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে যেতে লাগল, তবুও যুদ্ধের বিরাম নেই।

এমনিভাবে যখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে, মুনি গৌরমুখ ফিরলেন। দেখেই বুঝতে পারলেন, এ আর কিছু নয়। সবই ঐ মণির জন্য। শান্তিপ্রিয় মুনির মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। নদীতে গিয়ে স্নান সেরে আবার বিষ্ণুকে মনে-প্রাণে ডাকতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন—প্রভু, এই অশান্তি থামাও।

গৌরমুখ শুনলেন আকাশবাণী—এর প্রয়োজন ছিল গৌরমুখ, হতে দাও। দৈত্যদের অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ওদের মরার দিন এসেছে।

গৌরমুখ বললেন—নারায়ণ, তাই যদি হয়, তাহলে যত

তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করুন।

মুনি আবার আকাশবাণী শুনলেন—আমার চক্র যাচ্ছে গৌরমুখ। নিমেষে সব শেষ করে দিয়ে আসছে।

বলতে বলতে সত্যিই চক্র এসে নিমেষে রাজা দুর্জয় বাদে সব অসুরকেই ধ্বংস করে দিল।

এই অরণ্যে নিমেষে এই প্রলয় কাণ্ড ঘটেছিল বলে তাই ভগবান বিষ্ণু এর নাম রেখেছিলেন 'নৈমিষারণ্য'।

নিমেষের মধ্যে নৈমিষারণ্যে এই বিপর্যয় দেখে রাজা দুর্জয় আর স্থির থাকতে পারল না। মনে তার দারুণ নৈরাশ্য এল। মনে প্রশ্ন জাগল—নিজে সে দুর্জয় রাজা, ত্রিভুবনের অধিপতি, দেবরাজ ইন্দ্র থেকে দেবতারা যার ভয়ে ভীত, সামান্য একজন পর্ণকুটিরবাসী মুনির কাছে নিমেষের মধ্যে এমন ভাবে হেরে গেল সে? গৌরমুখ কার কাছ থেকে কিভাবে এত শক্তি পেলেন?

রাজা দুর্জয় সব মান-অভিমান ত্যাগ করে মুনির পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মুনিবর বললেন—সবই বিষ্ণুর কৃপা! বিষ্ণুর অনুগ্রহ থাকলে সব কিছুই পাওয়া যায়।

রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, রানী, ঐশ্বর্য সব পড়ে রইল। দুর্জয় সেখান থেকেই সোজা চিত্রকূট পাহাড়ে চলে গিয়ে বিষ্ণুর তপস্যায় বসল।

মহাসুর দুর্জয়ের সে এক মহা তপস্যা। কোন কষ্টই তার কাছে আর কষ্ট বলে মনে হল না।

সুদীর্ঘকাল তপস্যা করার পর বিষ্ণু তাকে দেখা দিলেন। বললেন—দুর্জয়, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। বর চাও।

দুর্জয় বলল—আমার একটাই প্রার্থনা, আপনাকে ছেড়ে আমাকে যেন কখনো থাকতে না হয়।

বিষ্ণু বললেন—বেশ, তাই হবে।

এরপর থেকে দুর্জয়কে আর কেউ কোথাও খুঁজে পায় নি। ইন্দ্র নেই, দুর্জয়ও আর নেই। কিন্তু সেই যে দুই অসুর যুবক বিদ্যুৎ আর সুবিদ্যুৎ, দুর্জয় যাদের রাজ্যপাল করেছিল, তারা দু ভাই ঠিক করল, ত্রিভুবনের রাজ সিংহাসনে এবার তারাই বসবে। ইতিমধ্যে তার উদ্যোগ আয়োজনও ভালভাবে করা হয়ে গেছে।

দুর্জয় আর নেই শুনে দেবরাজ ইন্দ্র এবার সব দেবতাদের ডেকে আলোচনায় বসলেন, কিভাবে স্বর্গরাজ্যে ফেরা যায়। দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন—শোন দেবরাজ, তুমি গোমেধ যজ্ঞ কর।

দেবগুরুর কথামত দেবরাজ সুন্দর সুন্দর গরু এনে তাদের ছেড়ে দিলেন, আর সারমেয়কে (কুকুর) ডেকে তাদের পাহারায় রাখলেন।

গরুগুলি মনের সুখে চলছে, পেছনে কুকুর। অসুরগুরু শুক্র দেখেই বুঝতে পারলেন, কিছু গোলমাল আছে।

অসুরদের বললেন—ওগুলো দেবতাদের গরু। শুনে অসুররা গরুগুলো চুরি করে আনল, পেছনে সারমেয়ও এল। অসুররা সারমেয়কে দেখে বলল—তুমি যেন দেবরাজকে কিছু বোলো না। তোমাকে পেট পুরে ক্ষীর খাওয়াচ্ছি। রোজ আসবে, রোজ খাওয়াব।

সারমেয়কে ক্ষীর খেতে দেখেই দেবরাজ জিজ্ঞেস করলেন—গরু কোথায়? সারমেয় বলল—জানি না। দেবরাজ রেগে গিয়ে সারমেয়কে মারলেন এক লাথি! কিন্তু গরুর সন্ধান তো চাই। তিনি মরুৎগণকে ডেকে বললেন—গরু কোথায় খুঁজে দেখ।

পরদিন ক্ষীরের লোভে সারমেয় চলেছে অসুর শিবিরের দিকে। মরুৎগণ পিছু নিল। গরুর সন্ধানও মিলল।

দেবরাজ সসৈন্যে গিয়ে গরু তো উদ্ধার করে আনলেনই, সেই সঙ্গে অসুরদেরও নিস্তেজ করে ফিরে এলেন। তারপর স্বর্গরাজ্যে ফিরে গেলেন।

বেত্রাসুরের কথা

সিন্ধুদ্বীপ নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার আরাধনা করতেন বেত্রবতী নদীর ধারে বসে।

পূর্বজন্মে এই সিন্ধুদ্বীপ ছিলেন বিশ্বকর্মার এক ছেলে। ব্রহ্মার বরে সেই ছেলেটি ছিল অবধ্য। কোন অস্ত্রাঘাতেই তার মৃত্যু হবে না। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যখন একবার সংগ্রাম বাধল, দেবরাজ তা জানতে পেরে সমুদ্রের ফেনা দিয়ে তাকে মেরেছিলেন। সেই ছেলেটিই পরে সিন্ধুদ্বীপ হয়েছিলেন।

যাই হোক, সিন্ধুদ্বীপ ব্রহ্মার তপস্যা করেন, থাকেন নির্জনে।

একদিন বেত্রবতী নদী অপরূপা এক নারীর রূপ ধরে তাঁর কাছে এল।

সিন্ধুদ্বীপ জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? কেন এখানে এ সময়?

রমণী বলল—আমি বরুণের স্ত্রী। তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই এ সময় তোমার কাছে এসেছি। আমার একটাই কামনা, তুমি আমাকে এক মহা বলবান পুত্র দাও।

সিন্ধুদ্বীপ গররাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত তার প্রার্থনা পূরণ করলেন। ছেলেটির নাম হল বেত্র।

বেত্র যত বড় হয়, তার মধ্যে দেবতাদের ওপর রাগ তত বেশি বাড়তে থাকে। যত বড় হয়, তত লোভ বাড়ে। দেখতে দেখতে তার স্বভাবটাই হয়ে গেল অসুরের মত। বিরাট একটা দলও করে ফেলল।

আরো একটু বড় হতেই বেত্রাসুর হল প্রাগজ্যোতিষপুর (কামরূপ)-এর রাজা।

রাজা হবার পর পরই তার মনে হল, কি ছাই, ছোট্ট একটা দেশের রাজা। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা যদি সে হতে না পারল, তাহলে আর কি হল।

এই ভেবে অসুরসেনা নিয়ে সে প্রথম ছুটল সুমেরুর দিকে। এই সুমেরু পাহাড়ে তখন দেবরাজ ইন্দ্র থেকে শুরু করে দেবতারা থাকতেন। সুমেরুতে গিয়ে হাতে এক ভীম গদা নিয়ে প্রথমেই আক্রমণ করল ইন্দ্রকে। ইন্দ্র সরে গিয়ে এলেন যমের কাছে। বেত্রাসুরের গদা যমও সহ্য করতে না পেরে এলেন অগ্নির কাছে। অগ্নিও বেত্রাসুরের কাছে হেরে গেলেন। পরপর তাঁরা একে একে বৃহস্পতি, বরুণ, পবন, কুবের যেখানেই এলেন, অসুরকে আর কিছুতেই ঠেকাতে পারলেন না।

সুমেরু ছেড়ে এবার দেবতারা ছুটলেন মহাদেবের কাছে।

মহাদেব দেখলেন পেছনে ছুটে আসেছে বেত্রাসুর, হাতে গদা, লাল চোখ।

সর্বজ্ঞ মহাদেব দেখেই বুঝলেন, একে ঠেকাবার সাধ্য তাঁর নেই। দেবতাদের বললেন—চল, আমরা ব্রহ্মার কাছে যাই। যদি ব্রহ্মা এর কোন উপায় করতে পারেন।

দেবতাদের নিয়ে মহাদেব যখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন তখন তিনি সবেমাত্র স্নান সেরে নিবিষ্টমনে গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করছিলেন। কানে এল আর্তস্বর—'বাঁচান....আমাদের বাঁচান.... ।' ব্রহ্মা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, সামনে শুধু দেবতারা, আর তো কেউ নেই। দেবতারা কার হাত থেকে বাঁচতে চাইছেন ? কারা তাঁরা ? যেহেতু উপাসনার মধ্যে ছিলেন, তাই তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস না করেই মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর কপাল থেকে বেরিয়ে এলেন ভয়ঙ্করী নারী মূর্তি। সিংহের পিঠে বসে আছেন। আট হাত। তাঁর প্রতিটি হাতে এক একটি হাতিয়ার। দেখলেন ভয়ঙ্করী সেই নারী একাই লক্ষ লক্ষ অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন। লহমার মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে যাচ্ছে অসুররা।

মহাদেবের সঙ্গে দেবতারাও নিশ্চিন্ত হলেন। সেই নারীমূর্তি হলেন কাত্যায়নী দেবী।

বেত্রাসুর তার সর্বশক্তি দিয়ে কাত্যায়নী দেবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। যুদ্ধবিদ্যা তার যা জানা ছিল, সবই প্রয়োগ করল ঠিকই, কিন্তু দেবীর কিছুই করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত প্রাণটাই দিল। সপ্তদ্বীপের অধিপতি আর তার হওয়া হল না।

দেবতারা নিশ্চিন্ত হয়ে কাত্যায়নীর স্তব-স্তুতি করতেই তিনি আবার ব্রহ্মার কপালেই মিলিয়ে গেলেন।

কোকক্ষেত্রের মাছ ও পাখি

মনের মত স্বামী পেয়ে কোশলরাজের মেয়ে খুব খুশি হয়েছে। সব সময়ই তার একটাই কামনা ছিল, যে তার স্বামী হবে সে দেখতেও যেমন সুপুরুষ হবে, তেমনি গুণবান এবং বিক্রমশালী হবে। হয়েছেও তাই। অনেক খুঁজে শেষে আনন্দপুরের শকরাজার ছেলে তার স্বামী হল। যেমনটি চেয়েছিল সে, ঠিক তেমনটিই মিলেছে।

মহা ধুমধামের সঙ্গেই শকরাজার ছেলের সঙ্গে কোশলরাজের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। দুজনেই খুব খুশি।

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। মাঝে মাঝেই মাথার যন্ত্রণায় একটু আধটু কাতর হয়ে পড়তেন রাজকুমার। বিশেষ একটা আমল দিতেন না, পাছে তাঁর নতুন স্ত্রী বিব্রত বোধ করে। একদিন কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি হল। অসহ্য যন্ত্রণায় সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যকে খবর পাঠাল। রাজকুমারের মাথার যন্ত্রণা—বৈদ্য ছুটে এলেন। চিকিৎসা শুরু হল। মাঝে মাঝে রাজকুমার ভাল থাকেন, মাঝে মাঝে আবার খুবই কাতর হয়ে পড়েন। বৈদ্যের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু রাজকুমারকে কিছুতেই সারিয়ে তুলতে পারেন না। কোথা থেকে যে এই রোগের উৎপত্তি হচ্ছে, তা-ও ধরতে পারেন না।

একদিন রাত্রে যন্ত্রণায় পরিশ্রান্ত রাজকুমার। সবেমাত্র যন্ত্রণা গেছে। খুবই ক্লান্ত। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল—তোমার এই রোগ কোথা থেকে এল ?

রাজকুমার শুনে সেদিন ম্লান একটু হাসলেন মাত্র। কিন্তু কোন জবাব দিলেন না।

আর একদিন জিজ্ঞেস করল স্ত্রী—বল না, কোথা থেকে তোমার এ রোগ এল ? এ কি সারবার নয় ?

রাজকুমার তখন বললেন—না, এ রোগ সারবার নয়। আর কেন এই রোগ হয়েছে তা জানতে গেলে আমাদের যেতে হবে কোকক্ষেত্রে।

—কোকক্ষেত্রে ? সে তো একটা তীর্থস্থান।

—হ্যাঁ। রাজকুমার বললেন—তুমিও তাহলে কোকক্ষেত্র চেনো ? চল না সেখানে। আমার মনে হয় সেখানে গেলেই আমি ভাল হয়ে যাব।

—তুমি যদি তাই মনে কর, তাহলে আপত্তি কি ? চল।

বলল বটে স্ত্রী, কিন্তু মনটা তারও খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

—চল বললেই তো আর যাওয়া যায় না। মা-বাবার অনুমতি না নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?

—বেশ তো, অনুমতি নিয়ে আসি চল।

দুজনেই এসে দাঁড়াল রাজা-রানীর সামনে।

রাজকন্যা বলল—বাবা, আমরা কোকক্ষেত্রে যেতে চাই। আমাদের অনুমতি দিন।

—কোকক্ষেত্রে? শকরাজ শুনে একটু অবাকই হলেন। বললেন—কেন মা ? এই বয়সে তোমরা তীর্থে যাবে কেন ? আমরা বুড়ো হয়েছি। বরং আমরা যাই, তোমরা থাক।

রাজকুমার বললেন—বাবা, আপনি তো জানেন, মাথার যন্ত্রণায় আমি কেমন কাতর হয়ে পড়ি।

রাজকন্যা বলল—বৈদ্যিরা হার মেনেছে বাবা। আমাদের বিশ্বাস, কোকক্ষেত্রে গেলে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এর ওপর আর কথা চলে না। সত্যি সত্যিই বৈদ্যিরা সারাতে পারেননি। চিকিৎসারও ত্রুটি হয়নি। একমাত্র ছেলে। অগত্যা অনুমতি দিলেন।

স্ত্রীকে নিয়ে রাজকুমার কোকক্ষেত্রে এলেন।

রাত নেমে এল। আহারপর্ব সেরে বিশ্রাম নিতে যাবেন রাজকুমার, স্ত্রী বলল—এই তো কোকক্ষেত্রে এলাম। এবার বল।

রাজকুমার বললেন—রাতটুকু কাটুক। কাল সকালে বলব।

রাজকন্যা কোন আপত্তি জানাল না। কৌতূহল নিয়ে রাতশেষের অপেক্ষা করতে লাগল। তার মন তখন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রাত শেষ হল। সকাল হল। রাজকন্যাকে ডেকে রাজকুমার

বললেন—চল, নদী থেকে আগে স্নানটা সেরে নিই।

স্নান সারা হল। দুজনেই পাটের কাপড়জামা পরলেন।

রাজকুমার বললেন—চল, বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে বিষ্ণুর পুজো করে আসি।

বিষ্ণুপূজাও সারা হল।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে রাজকুমার স্ত্রীকে নিয়ে এলেন পাশের এক সরোবরের ধারে। বললেন—ঐখানে ঐ যে কতকগুলো হাড় পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ?

রাজকন্যা বলল—হ্যাঁ। ঐ তো! তা কি হয়েছে?

রাজকুমার বললেন—তুমি জানতে চেয়েছিলে না, কেন আমার এই রোগ?

—হ্যাঁ, তা তো জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে হাড় দেখাচ্ছ কেন? ঐ হাড় কিসের?

রাজকুমার বললেন—আমার। ও হাড়গুলো আমারই।

—কি রকম?

—তাহলে শোন। ওগুলো আমার পূর্বজন্মের অস্থি। পূর্বজন্মে আমি মাছ হয়েছিলাম ছোট একটা পুকুরে। নিজের মনেই নিজের আনন্দে জলে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন এক শিকারী আমায় দেখে বঁড়শি দিয়ে গেঁথে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। আমিও বেঁকে বসলাম। প্রচণ্ড দাপাদাপি করার ফলে সে আর আমাকে তুলতে পারল না বটে, কিন্তু এক বাজ সুযোগ বুঝে আমাকে পায়ের নখে বিঁধে ছোঁ দিয়ে আকাশে উঠল। উড়লে কি হবে, বেশিক্ষণ আমায় রাখতে পারল না। খানিকটা আসার পরই আমি তার পা থেকে এই মাটিতে এসে পড়লাম। পড়ার সময় মাথায় খুবই চোট পেয়েছিলাম। আধমরা তো হয়েই ছিলাম, পড়ে চোট খেয়ে প্রাণ হারালাম। কিন্তু এই কোকক্ষেত্রের যে কি মাহাত্ম্য! যে মানুষজন্ম পেতে অনেক সাধনা করতে হয় আমি এক জন্মেই মাছ থেকে মানুষ হলাম। তাও আবার রাজকুমার। মানুষ হয়ে জন্মালাম বটে, কিন্তু আঘাতের ফলে মাথার ঐ যাতনা আমার থেকেই গেল। তাই বলছিলাম, কোন বৈদ্যের সাধ্য নেই আমাকে এই যন্ত্রণার হাত থে অব্যাহতি দেয়। একমাত্র এই ক্ষেত্রই আমাকে মুক্তি দিতে পা বলে রাজকুমার আর একবার হাড়গুলির দিকে তাকিয়ে থামলে

শুনতে শুনতে রাজকন্যা কেমন যেন হয়ে যেতে লাগ

তাই দেখে রাজকুমার বললেন—কি হল তোমার? হ তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন?

রাজকন্যা বলল—কুমার, এই মুহূর্তে আমারও পূর্বজন্মের ব মনে পড়ছে।

—কি রকম?

—শোন তাহলে। রাজকন্যা বলতে শুরু করল—ঐ যে গা দেখছ, নিচে সামান্য কয়েকটা হাড় পড়ে আছে, ওগুলো আমারই

—সে আবার কি? রাজকুমার কৌতূহলী হয়ে উঠলেন

হ্যাঁ, পূর্বজন্মে আমি ছিলাম এক চিল। একদিন আকাশপ ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম এক গাছের পাশে এক ব্যাধিনী বসে আ আর এক ব্যাধ প্রচুর শিকার করে এনে তার পাশে নামিয়ে রাখ ঘুরতে ঘুরতে খিদে এমনিতেই পেয়েছিল, ঐ মাংসগুলো দে আমার পেটে যেন আগুন জ্বলে উঠল। নিঃশব্দে গাছের ডালে এ বসে চুপ করে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। দেখলা মাংসের বোঝা নামিয়ে ব্যাধ বনে গেল। সেখান থেকে কাঠকু সংগ্রহ করে নিয়ে এল। আগুন জ্বালাল। দুজনে মিলে মাংসগু সেই আগুনে ঝলসে নিল। তারপর খেতে শুরু করল। দুজ নিচ্ছে, আর মহানন্দে খাচ্ছে। আমি দেখছি আর খিদের জ্বাল ছটফট করে উঠছি। খালি সুযোগ খুঁজছি। দেখলাম খেতে খে ব্যাধিনী উঠে গেল। ব্যাধ একা। চোখ বুজে মাংস খাচ্ছে। সুযোগে ছোঁ দিয়ে খানিকটা মাংস নিয়ে আবার গাছের ডালে এ বসলাম, আর খাবলা খাবলা মাংস মুখে পুরতে লাগলাম। চ খুলেই ব্যাধ সামনে আর মাংস দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদি তাকাতেই গাছের ডালে মাংসসমেত আমাকে দেখতে পেল। স সঙ্গে রাগে ধনুক তুলে নিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল



পালাবার সুযোগ আমি আর পেলাম না। তীর এসে আমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেল। ডাল থেকে ঐখানে পড়ে ছটফট করতে করতে আমি মারা গেলাম।

বলে রাজকন্যা একটু থামল। তারপর বলল—তুমি ঠিকই বলেছ কুমার। মানুষের জীবন পেতে গেলে কত সাধনা করতে হয়। আর আমি? পাখি থেকে একেবারে মানুষের কুলে জন্ম নিলাম। তাও আবার রাজার মেয়ে হয়ে! এটা এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ছাড়া আর কি?

এরপর তারা দুজনেই থেকে গেল কোকক্ষেত্রে। রাজধানীতে আর তাদের ফেরা হল না। রাজা-রানী অনেক চেষ্টা করেও তাদের আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না।

রাজকুমার আর রাজকন্যা বাকি জীবনটা বিষ্ণু মন্দিরেই কাটিয়ে দিলেন।

সত্যতপার কাহিনী

কুল···কুল করে বয়ে চলেছে দেবীকা নদী। তারই তীরে মহাতপা আরুণির আশ্রম। রোজ স্নান আর আশ্রমে তপস্যা।

একদিন নদীতে স্নান সেরে নারায়ণের নাম জপ সেরে উঠতে যাবেন কি, দেখলেন এক ব্যাধ তীর উঁচিয়ে ধরেছে তাঁকে মারবে বলে। ব্যাধের মুখ-চোখ দিয়ে হিংসা যেন ফুটে বের হচ্ছে। কি কদাকারই না দেখাচ্ছে ব্যাধের মুখটা! আরুণি ভাবলেন, এমন তো কখনো হয়নি। কত ব্যাধই তো তিনি এই বনে দেখেছেন। জীবজন্তু শিকার করে চলে গেছে। এ আবার মানুষ হত্যা করতে কোথা থেকে এল? লহমার মধ্যে এই সব ভেবে নিয়ে আবার মুনি নদীতে নেমে গেলেন। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে মনে মনে নারায়ণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে ব্যাধ মুনিকে মারবে বলে ঠিক করেই এসেছিল। ব্রাহ্মণদের ওপর কেন যেন তার আক্রোশ। ধনুকের ছিলা টেনেও ধরেছিল, মুনি উঠে এলেই বুকে তীর মারবে। হঠাৎ তার মনে হল, নদীর জলে মুনিকে ঘিরে তীব্র জ্যোতি যেন কয়েকবার ঝকঝক করে উঠল। কি তেজ তার! ব্যাধের হাত থেকে ধনুক আপনা-আপনি খসে পড়ে গেল। তীর আর ছোঁড়া হল না। নদী থেকে মুনি উঠে আসতেই সে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। করুণ আবেদন রাখতে লাগল—আমি মহাপাপী···মহাপাপী। মুনি, এতই অধম আমি যে এক হাজার ব্রাহ্মণ মেরেছি, আর পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক মেরেছি। আমাকে এই মহাপাতক থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

আরুণি কোন উত্তর দিলেন না। ব্যাধের কবল থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে নিয়ে আশ্রমে চলে গেলেন। ব্যাধও নাছোড়। ধনুক-বাণ গাছের নিচেই পড়ে রইল, সেই সঙ্গে সেও থেকে গেল। মনে আশা, মুনির কি কোনদিন দয়া হবে না?

রোজই মুনি স্নান করেন। উঠে এসে আশ্রমে ঢোকেন। ব্যাধকে যেন দেখেও দেখতে পান না। ব্যাধও হিংসা, শিকার ছেড়ে দিয়ে সেখানেই পড়ে রইল নদীতে স্নান আর নদীর জল খেয়ে।

এর দিনকয়েক পরে আর এক ঘটনা ঘটল।

আরুণি মুনি নিত্যদিনের মত সেদিনও দেবীকাতে স্নান সারলেন। নাম জপ করলেন। তারপর উঠতে যাবেন কি, দেখলেন, ক্ষুধার্ত এক বাঘ বিকট হাঁ করে তাঁর দিকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেয় আর কি। সামনেই গাছের নিচে ব্যাধ। তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে ধনুক তুলে বাঘকে লক্ষ্য করে মোক্ষম এক তীর ছুঁড়ল। তীর ছুটে এসে বাঘকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতেই বাঘ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে আরুণি দ্রুত পায়ে নদীতে নেমে জোরে জোরে বলে উঠলেন—নারায়ণ, নারায়ণ! সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনেই যেন এক ভেল্কি খেলে গেল। মৃত বাঘের শরীর ভেদ করে যেন বেরিয়ে এলেন দীর্ঘকায় এক পুরুষ।

তাই দেখে জল থেকে উঠে এলেন আরুণি। ব্যাধও কাছে এগিয়ে গেল।

আরুণি জিজ্ঞেস করল—কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

মানুষটি মুনিকে প্রণাম করে বললেন—আমি রাজা দীর্ঘবাহু।

—তা আপনার এ দশা কেন হল?

—মুনিবর, সে বড় করুণ কাহিনী। রাজা বললেন—আমি ক্ষত্রিয় রাজা হলেও সব শাস্ত্রে আমার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বেদ থেকে শুরু করে যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে আমার খুবই দখল ছিল। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, ধর্মশাস্ত্রে যখন সবই আমার জানা, তখন ব্রাহ্মণের চেয়ে আমি কম কিসে। তাই ব্রাহ্মণদের আমি অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলাম। আমার রাজসভা থেকে ব্রাহ্মণদের প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাতে তাঁরা খুবই অপমানিত হয়ে আমায় অভিশাপ দিয়ে বসলেন—'এত যখন দম্ভ তোমার, তুমি যখন এত কুটিল, তখন তুমি বাঘ হয়ে জন্মাও গে।' অভিশাপ শুনেই আমার চৈতন্য ফিরল। ছি···ছি···এ কি করলাম? ব্রাহ্মণদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। অনেক পরে ব্রাহ্মণরা বললেন—'বাক্য আমাদের মিথ্যা হবার নয়। বাঘ তোমাকে হতেই হবে। সাতদিনের দিন তোমার সামনে যে পড়বে সেই তোমার খাদ্য হবে। যদি কখনো এমন সময়ে তুমি তীরবিদ্ধ হও আর মুমূর্ষু সময়ে কানে নারায়ণের নাম শোন, তাহলে তুমি মুক্ত হবে।' এতদিন পর ভাগ্যবলে আমার তাই হল। মুনিবর, আজ আপনি আমার খাদ্য হয়ে নারায়ণের নাম শোনালেন। আপনাকে প্রণাম।

তারপর ব্যাধের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন—তুমি তীর মেরে আমার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দিলে। তোমার মঙ্গল হোক।

এরপর চোখের সামনেই রাজা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আরও কিছুকাল কেটে গেল।

একদিন মুনি নিজেই ব্যাধকে ডেকে বললেন—এতদিন তোমায় কিছু বলিনি, কারণ তোমার মনে কুটিলতা ছিল। নিত্য নদীতে স্নান আর নারায়ণের নাম শুনতে শুনতে তুমি পবিত্র হয়েছ। এবার যাও, নির্জনে বসে নারায়ণের ধ্যান কর।

আরুণির আশ্রম থেকে কিছু দূরে নিরালা একটা জায়গা দেখে ব্যাধ তপস্যায় বসল।

আরুণি তাকে শুধু 'নারায়ণ' নাম জপ করতে বলেছেন। সে

তাই করে। গাছের কচি পাতা খায়, আর দিনরাত একমনে নারায়ণকে ডাকে।

একদিন গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খেতে যাবে কি ব্যাধ শুনল, কে যেন বলছেন—গাছের পাতা খেয়ো না।

ব্যাধ গাছ থেকে পাতা টেনে খাওয়া বন্ধ করল। গাছের নিচে যে পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়েছিল, তাই খেয়ে নাম-জপ করতে লাগল।

দিনকয়েক খাবার পর আবার একদিন শুনল, কে যেন বললেন—ও পাতাও তুমি খাবে না।

ব্যাধ খাওয়াই বন্ধ করে দিয়ে এক মনে কঠোর তপস্যা করে চলল।

এভাবে বেশ কিছুদিন গেল। ব্যাধের শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেল।

দুর্বাসা মুনি একদিন ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাকে দেখতে পেলেন। মনে মনে ভাবলেন মুনি, দেখে তো মনে হচ্ছে, তপস্যা করছে। একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক, কতখানি শক্তি সঞ্চয় করেছে।

এই ভেবে দুর্বাসা কাছে আসতেই ব্যাধ তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বসবার আসন দিল। দুর্বাসা বসেই বললেন—দেখ বাপু, ঘুরতে ঘুরতে আমার বড় খিদে পেয়েছে। আমাকে ভাল করে খাওয়াও তো।

ব্যাধ এবার মহা চিন্তায় পড়ল। তাই তো, ক্ষুধার্ত অতিথি। তার ওপর আবার দুর্বাসা মুনি! একমনে ব্যাধ নারায়ণকে ডাকতে লাগল—'ঠাকুর, তুমিই আমার সহায় সম্বল। তোমাকে ছাড়া আর তো কাউকে জানি না। অতিথির সেবা করতে না পারা যে মহাপাপ। তুমি আমাকে এই পাপ থেকে উদ্ধার কর ঠাকুর।' এমনিভাবে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ একটা সোনার থালা এসে তার হাতে পড়ল। ব্যাধ মহানন্দে দুর্বাসাকে বলল—মুনিবর, আপনি এখানে একটু বসুন। আমি এখুনি আসছি।

এই বলে সেই থালা হাতে ব্যাধ ছুটল নগরে ভিক্ষে করতে। সবেমাত্র নগরে ঢুকেছে, কোথা থেকে যেন অভাবিতভাবে কয়েকজন রমণী এসে নানা রকমের উপাদেয় ফল-মূল দিয়ে তার থালা ভর্তি করে দিল। ব্যাধ তাই নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। দুর্বাসা তখনো বসে।

এসে বলল—মুনিবর, নদী থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সেবা করুন।

দুর্বাসা বললেন—দেখ, আমার এমন শক্তি আর নেই যে নদীতে যাব হাত-মুখ ধুতে। অথচ নদীর জল না হলে তো আচমনই করা যাবে না।

জলের অভাবে অতিথি অভুক্ত থেকে যাবেন, তা কি হয়?

ব্যাধ আবার মনে মনে নারায়ণ আর দেবীকা নদীকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল—আমি মূর্খ। মন্ত্র-তন্ত্র জানি না। হে ঠাকুর, হে নদী, আমার অতিথি যেন অভুক্ত হয়ে ফিরে না যায়।

চোখ বুজে এক মনে বিড়বিড় করে ব্যাধ এই আকুল আবেদন করে চলেছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দুর্বাসা দেখলেন, দেবীকা নদী গতিপথ থেকে সরে তাঁরই কাছ দিয়ে হু-হু করে বয়ে চলতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে দুর্বাসা উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাধকে আলিঙ্গন দিয়ে বললেন—সার্থক তোমার তপস্যা। আমি তোমায় পরীক্ষা করতে এসেছিলাম মাত্র। শোন, আজ থেকে তোমার নাম হবে সত্যতপা। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ হবে। বেদশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত হবে।

সত্যতপা দুর্বাসাকে প্রণাম জানিয়ে বলল—আমি অধম শূদ্র বেদশাস্ত্র পড়ার তো অধিকার আমার নেই।

দুর্বাসা বললেন—তোমার যে দেহটা অধম শূদ্র ছিল তপস্যায় তাকে তুমি শুদ্ধ করে নিয়েছ। এখন বেদশাস্ত্র পড়ার অধিকার তুমি অর্জন করেছ।

এরপর মহাজ্ঞানী সত্যতপা আরো কঠোর তপস্যা করার জন্য হিমালয়ের পাদদেশে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে এলেন। ভদ্রবট নামে সেখানে একটা অক্ষয় বটগাছ ছিল। তারই নিচে সত্যতপা বসলেন সাধনা করতে। হোমকুণ্ড তৈরি করে সমিধ দিয়ে হোম করতে আরম্ভ করলেন। সেই বটগাছেই এক কিন্নর তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকত। দেখত সত্যতপার সাধনা।

একদিন দেখল, সত্যতপা সমিধ এনে মেপে মেপে কাটতে গিয়ে একটা আঙুল কেটে ফেললেন। কাটা জায়গা দিয়ে কিন্তু রক্ত বের হল না, খানিকটা ছাই বেরিয়ে এল। তাই দেখে বিস্ময়ে তারা ছুটল রুদ্র সরোবরে। সেখানে বিষ্ণু, ইন্দ্র থেকে সব দেবতা, যক্ষ গন্ধর্বরা থাকেন। গিয়েই হাঁফাতে হাঁফাতে সকলকে সেই আশ্চর্য ঘটনা তারা শোনাল। সবাই শুনল, দেবতারাও শুনলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকে বললেন—চল, একবার সত্যতপাকে দেখেই আসি। পরীক্ষা করে আসি সে কতখানি সত্যতপা।

এই বলে ইন্দ্র ধরলেন ব্যাধের রূপ, আর বিষ্ণু ধরলেন শূকরের রূপ। এই ভাবে তাঁরা ভদ্রবটের কাছাকাছি এসে সত্যতপাকে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলেন।

সত্যতপা দেখলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা শূকর কখনো চোখের সামনে, কখনো ঝোপে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর এক ব্যাধ তীর উঁচিয়ে যেন তারই পিছু নিয়েছে। এভাবে পিছু নিয়ে আসতে আসতে শূকরটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল সামনের ঝোপে।

ব্যাধ এসে দাঁড়াল সত্যতপার সামনে। জিজ্ঞেস করল—কোন শূকরকে এখানে দেখেছ? পিছু নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আসছি। এখানেই যেন কোথায় লুকালো। জানো, শিকার করে না নিয়ে যেতে পারলে আমাদের সপরিবারে আজ না খেয়ে মরতে হবে। সত্যি করে বল না, কোথায় লুকালো?

সব শুনে সত্যতপা ভাবলেন—এ কি সমস্যা? শূকর কোথায় লুকিয়ে আছে যদি বলে দিই তাহলে বেচারি তীরের ঘায়ে মরবে। আবার যদি বলে না দিই, তাহলে ব্যাধ সপরিবারে না খেয়ে মরবে। এখন উপায় কি?

মনে মনে সত্যতপা নারায়ণকে ডাকতে শুরু করে দিলেন—এখন আমি কি করব, তুমিই বলে দাও।

নির্বিকার ভাবে সত্যতপা যখন এভাবে নারায়ণকে ডাকতে লাগলেন, তখন নিমেষের মধ্যে তাঁর চোখের সামনেই অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘটে গেল। সত্যতপা দেখলেন কোথায় ব্যাধ, কোথায় শূকর? সামনে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র, পাশে বিষ্ণু। তাঁদের দেখে সত্যতপা আকুল হয়ে উঠলেন। বিষ্ণু আর ইন্দ্রও সত্যতপাকে বর দিয়ে চলে গেলেন।

এরপর আরো কিছুকাল কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন হিমালয়ে সত্যতপার আশ্রমে এসে হাজির হলেন আরুণি মুনি।

গুরুদেবকে দেখে সত্যতপা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন।

আরুণি সত্যতপাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গুরু-শিষ্যের সে অপূর্ব মিলন!

আরুণি বললেন—সত্যতপা, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। আমার কাজ ফুরিয়েছে, তোমারও। চল আমার সঙ্গে নারায়ণের ধামে।

আশেপাশে সকলেই দেখল আরুণি আর সত্যতপা চলে গেলেন। পড়ে রইল তাঁদের নিস্পন্দ শরীর দুটো।



এক প্রেত ও এক বণিক

এক বণিক বাণিজ্য করতে চলেছে, সঙ্গে সামান্য কিছু মালপত্র নিয়ে। বয়সে যুবক।

এক সময় তাদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। বাণিজ্য করে বেশ কিছু ধনসম্পদও করেছিল। কিন্তু এখন আর কিছুই নেই। চোর এসে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘরে কয়েকটা থালাবাসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বাড়িতে বণিক যুবকের বুড়ো মা-বাবা আর স্ত্রী। চুরি হয়ে যাবার পর দুর্দশা চরমে উঠল—একেবারে হাঁড়ির হাল। সংসার আর চলে না। পরের দয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু দয়ার ওপর কি আর বেঁচে থাকা যায়? বণিকের ছেলে সে। বাণিজ্যই জীবিকা, ভিক্ষা নয়। অগত্যা ঘরে যেসব বাসন-কোসন ছিল বিক্রি করে, প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু অর্থ ধার নিয়ে, জিনিসপত্তর কিনে ভিন্ দেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়ে পড়ল।

মরুভূমির পথ ছেড়ে বণিক যুবক সবেমাত্র এক বনপথ ধরেছে। হঠাৎ গাছ থেকে এক প্রেত এসে দাঁড়াল। কি বিকট দেখতে প্রেতটাকে! ঠিক বেড়ালের মত মুখ, মুলোর মত দাঁত, ছোট্ট দুটো গুলি হাত, আঙুলগুলো লকপক করছে। ভাঁটা ভাঁটা চোখ যেন লাল জবা। ঝপ্ করে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াতেই বণিক যুবক ভয়ে উল্টোদিকে দৌড় দিল। কিন্তু প্রেতের সঙ্গে কি আর সে দৌড়তে পারে।

প্রেত পথ আগলে দাঁড়াল। বলল—যাবে কোথায়? আমার বড় খিদে। তোমায় খাব।

বণিক যুবক শুনে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

—দোহাই তোমার, আমায় ছেড়ে দাও। আমায় খেয়ো না।

প্রেত বলল—তা কি হয়? অনেকক্ষণ ধরে খিদের জ্বালা ভোগ করছি। তোমাকে যখন একা পেয়েছি, তখন ছাড়ি?

বণিক যুবক বলল—দেখ, মা-বাবা-স্ত্রীকে নিয়ে বহুদিন ধরে কষ্টে আছি। চোরে আমাদের সব চুরি করে নিয়ে গেছে। কোনরকমে এটুকু যোগাড় করে বাণিজ্যে বেরিয়েছি। বাড়িতে সবাই আমার পথ চেয়ে আছে। আমাকে তুমি যদি খাও, তাহলে তারা সবাই মারা যাবে। আমি ছাড়া যে তাদের আর কেউ নেই।

প্রেত জিজ্ঞেস করল—কোথা থেকে আসছ তুমি?

বণিক যুবক বলল—মথুরা থেকে।

প্রেত তাই শুনে যেন একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল—তুমি যদি আমার একটা কাজ করতে পার, তাহলে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।

—কি কাজ বল?

—মথুরায় চাতুঃসামুদ্রিক নামে একটা কূপ আছে, জান কি?

বণিক যুবক বলল—হ্যাঁ আছে। কেন?

—তুমি সেখানে গিয়ে আমার নামে পিণ্ড দিয়ে এসো। তাহলে আমি এই প্রেত অবস্থা থেকে মুক্তি পাব। তুমিও ছাড়া পাবে।

প্রেতের কথা শুনে বণিক যুবক খানিকটা অবাক হল। বলল—আমি মথুরা ছেড়ে তো অনেক দূর চলে এসেছি। ফিরে যেতেও তো অনেক সময় লাগবে। তাছাড়া, শ্রাদ্ধ-পিণ্ড দিতে গেলেও তো খরচ আছে। তোমাকে তো বলেছি, আমার কিছুই নেই।

প্রেত বলল—কে বললে তোমার কিছু নেই? যা আছে শ্রাদ্ধকাজ সেরেও তোমাদের ভালভাবে চলে যাবে।

প্রেত বলে কি? বণিক যুবক শুনে অবাকই হয়। প্রায় ভিক্ষে করেই দিন চলছিল তাদের, আর প্রেত বলে কিনা, অনেক আছে।

—কি, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? বাড়ি গিয়ে তোমার ঘরের মেঝের উত্তর-পুব কোণে খুঁড়ে দেখবে। সেখানে কলসীভর্তি সোনা আছে। যাও। নচেৎ আমি কিন্তু তোমায় খাবই।

ইতিমধ্যে বণিক যুবকের সাহস অনেকখানি বেড়ে গেছে। সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল—তোমার পরিচয় কি? কেনই বা এভাবে প্রেত হয়ে আছ?

প্রেত বলল—শোন, আমার বাড়ি ছিল প্রতিষ্ঠা নগরে। তোমার মত আমারও পেশা ছিল বাণিজ্য। অবস্থাও আমার খুব ভাল ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, স্বভাবে আমি খুব স্বার্থপর ছিলাম। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছাড়া সকলেই আমার কাছে পর ছিল। পাড়া প্রতিবেশী, এমন কি আশেপাশের সকলকেই আমি তুচ্ছ জ্ঞান করতুম। কোন গরীব দুঃখীকে বা ব্রাহ্মণকে আমি কখনো কিছু দান করি নি। ভিখারি এলেও বাড়ি থেকে আমি দূর করে দিতাম। মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে আমি তার ফলভোগ করছি। ক্ষুধার্তকে তখন কিছুমাত্র খাবার ভাগ দিইনি, তখন নিজেই পেট পুরে খেয়েছি। আজ প্রেত হয়ে নিজেই খিদের জ্বালায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর মাঝে মাঝে তোমাদের মত এই যে দু-একটা লোক জোটে, এখন বুঝি, সামান্য যা একটু ভাল কাজ করেছিলাম, তারই জন্য।

—সেটা কি রকম?

প্রেত বলল—আমার বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না। গোনা-গুনতি দু-তিনজন ছিল। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কাছেই এক বিষ্ণুমন্দিরে এসে দেখলাম, এক ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করে শোনাচ্ছে। বেশ শ্রোতা জমেছে। বন্ধু আমাকে নিয়ে সেখানে

বসল। আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না, তবুও বন্ধুর জন্য বসতে হল। শুনতেও হল। সেখানেই শুনলাম, মথুরার চাতুঃসামুদ্রিক কূপ তীর্থক্ষেত্র। সেখানে পিণ্ডদান করলে পিশাচেরও মুক্তিলাভ হয়। পুরাণ পাঠ শেষ হল। সবাই প্রণাম সেরে ব্রাহ্মণকে প্রণামী দিয়ে চলে গেল। বন্ধুও প্রণাম করল, অর্থ দিল। আমি দিলাম না। আমার ধারণা, ওটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বন্ধু আমার ওপর খুব তম্বিতম্বা শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে, সঙ্গে এক টুকরো সোনা ছিল, সেটাই ব্রাহ্মণকে দিয়ে এলাম। আমার বিশ্বাস, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐটুকু দিয়েছিলাম বলেই প্রেত হয়েও আমার খাদ্য জুটছে।

নিজের কাহিনী শেষ করে প্রেত বলল—যাও, মথুরায় গিয়ে তোমায় যা বললুম, তাই করে আমায় মুক্ত কর।

বণিক যুবক ভাবল, কথা না শুনে এগোলে প্রেতের পেটে যেতে হবে, আবার ফিরে গেলেও সেই অনাহার। তবুও ফিরে গিয়ে প্রেতের কথামত ঘরের মেঝেটা একবার দেখলে হয়।

এইসব সাত-পাঁচ ভেবে বণিক যুবক বাণিজ্য না করে মথুরায় ফিরে এল।

মা-বাবা-স্ত্রী সকলেই খুশি—না জানি কত কি নিয়ে এসেছে সে! কিন্তু হায় কপাল! বণিক যুবক এদিকে কাউকে কিছু না বলে হাতে শাবল নিয়ে ঘরের উত্তর-পুব কোণের মেঝে খুঁড়তে লেগে গেল।

কাণ্ড দেখে ছেলের মা-বাবা হাউমাউ করে উঠল—ছেলে কি তাদের পাগল হয়ে গেল নাকি? স্ত্রী বাধা দিতে গেল—করছ কি? মেঝেটাকে খুঁড়ে নষ্ট করছ? পাগল হলে নাকি?

বণিক যুবকের তখন কোন দিকে হুঁশ নেই। মেঝে খুঁড়েই চলল। খুঁড়তে খুঁড়তে এক সময় সত্যই সোনাভরা কলসী বেরিয়ে এল। দেখে তো সকলে অবাক। এত সোনা!

মা-বাবা-স্ত্রীকে এবার বণিক যুবক সব কথা বলে ঘটা করে প্রেতের শ্রাদ্ধ কাজ করল।

ভদ্রাশ্ব-অগস্ত্য সংবাদ

পৃথিবীর রাজা তখন মহাধার্মিক ভদ্রাশ্ব। তাঁর রাজত্বে সবাই সুখী। কোথাও কোন অভাব ছিল না। যে যার কাজ নিয়ে মনের আনন্দে কাল কাটাত। রাজাও সব সময় ধর্ম-আলোচনা নিয়েই থাকতেন।

একদিন রাজসভায় ভদ্রাশ্ব বসে আছেন, অগস্ত্য মুনি এসে হাজির হলেন।

মহাতেজস্বী মুনি অগস্ত্য এসেছেন আপন ইচ্ছেয় রাজসভায়। এ কি রাজার কম সৌভাগ্য? সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে উঠে তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। ফল-মূল দিয়ে সেবা করলেন। রাজা ব্যবহারে অগস্ত্য খুবই সন্তুষ্ট হলেন।

অনেক বয়স হয়েছে মুনিবরের। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন, অনেক কিছুই দেখেছেন। রাজার মনে মনে কৌতূহল জাগল।

রাজা বললেন—মুনিবর, আপনি তো পৃথিবী ঘুরেছেন। কত কি দেখেছেন। যা দেখে আপনিও বিস্মিত হয়েছেন, এমন যদি কিছু দেখে থাকেন, বলবেন।

অগস্ত্য বললেন—এই জগৎ সৃষ্টিটাই তো বিস্ময়ের। তার ওপর আবার কি? তবে হ্যাঁ, এক তাপসের তপস্যা আমাকে বড় অবাক করে দিয়েছিল।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কি রকম?

মুনিবর বললেন—ঘুরতে ঘুরতে এক বনের মাঝে সুন্দর এক তপোবন দেখে সেখানে গেলাম। দেখলাম একটা পর্ণকুটির মেঝেয় আসন পেতে বসে আছেন, তপস্যা করছেন। আমি যে এলাম, তাপস যেন তা দেখেও দেখতে পেলেন না। মনে মনে আমার একটু রাগ হল। ভাবলাম, এ কি ধরনের তাপস, আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন না! একবার যাচাই করে দেখতে হয়। এই ভেবে আমি তাঁকে বললাম, 'ওহে তাপস, আমি অগস্ত্য এলাম তোমার কাছে, তুমি অতিথি-সৎকার করলে না যে?' শুনে, তাপস মুখে কোন কথা না বলে হাত নেড়ে ইশারায় একটা আসন দেখিয়ে আমায় বসতে বললেন। আমি বসলাম। তাপস তখন তাঁর ঘরের মেঝের দিকে মুখটা নিচু করে একটা হুঙ্কার ছাড়লেন। দেখলাম মেঝে ভেদ করে পাঁচটা মেয়ে উঠে এল। ঝলমলে পোশাক তাদের গায়ে। হাসি হাসি মুখ। দেখলেই মনে হবে সব দেবকন্যা। একজনের হাতে সোনার পিঁড়ে, একজনের হাতে জলের কলসী, আর বাকি দুজনের হাতে পাখা। যার হাতে পিঁড়ে ছিল, সে আমাকে আহ্বান জানিয়ে পিঁড়েতে বসাল। যার হাতে জলের কলসী ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে বসে আমার পা ধুইয়ে দিতে লাগল। আর বাকি দুটি মেয়ে আমার দুদিকে দাঁড়িয়ে আমায় বাতাস করতে লাগল। আমি তাই দেখে একটু অবাকই হলাম। তারপর যা ঘটেছিল, সে আরো বিস্ময়ের।

বলে, অগস্ত্য মুনি একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—এর একটু পরেই তাপস মেঝে লক্ষ্য করে আবার একটা হুঙ্কার ছাড়ল। দেখলাম, সারা তপোবনের মাটি ভেদ করে উঠে এল সোনার এক বিশাল কমণ্ডলু।

এবার তাপস বললেন—আপনার তো এখনও স্নান হয়নি। ঐ কমণ্ডলুতে ঢুকে আপনি স্নান সেরে নিন।

তাপসের কথায় আমি কমণ্ডলুতে ঢুকলাম। আর এখানেই আমাকে তাপস সবচেয়ে বেশি তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি কমণ্ডলুর ভেতর পরিষ্কার জল। জলে ডুব দিয়ে যখন উঠলাম, দেখলাম কোথায় সেই তপোবন। আমি এসে বসে আছি সুমেরু পাহাড়ে।

রাজা ভদ্রাশ্ব শুনে বললেন—মুনিবর, এ যে রীতিমত ভেল্কিবাজি!

অগস্ত্য বললেন—তাই মনে হয়। তপস্যায় আর ইন্দ্রিয় সংযমে অসাধ্য সাধন করা যায়।

২

একদিন রাজা অনরণ্যের সভায় বসে আছি, নানা আলাপ-আলোচনা চলছে, হঠাৎ বশিষ্ঠদেব এলেন।

রাজা সমাদর করে বশিষ্ঠদেবকে বসিয়ে অভিযোগের সুরে বললেন—এতদিন পরে আমায় মনে পড়ল ? দুর্ভাগ্য না করলে এমন হবে কেন ?

বশিষ্ঠদেব বললেন—হ্যাঁ রাজা, সত্যিই বহুদিন এদিকে আসতে পারিনি। তা তোমার চেহারা এমন শুকিয়ে গেল কিভাবে ? গায়ের রঙ তো টকটকে ছিল, কালো হয়ে গেল কেন ?

শুনে রাজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—দুর্ভাগ্য আমার, তা নইলে এমন হবে কেন ?

—কি হয়েছে ?

—আজ্ঞে কুষ্ঠ। জানি না, কি মহাপাতক আমি করেছি, যার ফলে আমার এই রোগ হল। দুশ্চিন্তায় কতদিন যে ঘুমোতে পারিনি।

—কতদিন হল ?

রাজা বললেন—অনেকদিন। আর এক সে ঘটনা।

বশিষ্ঠদেব বললেন—কি ঘটনা, শুনি।

রাজা বললেন—রথ নিয়ে একদিন মানস সরোবরের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে পাড় থেকে খুব কাছেই সরোবরের জলে অপূর্ব সুন্দর এক গোটা পদ্মফুল দেখলাম ফুটে রয়েছে। আরও দেখলাম, পদ্মফুলের ঠিক মাঝখানে আঙুলের এক পাবের মত যেন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম, মানুষ একটা ঐ আকারের ঐখানে কিভাবে থাকবে। ওটা আমার চোখের ভুল। পদ্মটিকে দেখে আমার খুব লোভ হল। মন যেন বলল, ঐ পদ্ম যার মাথায় থাকবে, ত্রিভুবনে সেই হবে খ্যাতিমান। আমি তাই আর কিছু না ভেবে রথের সারথিকে বললাম পদ্মফুলটা তুলে আনতে। সারথি কাছে গিয়ে যেই পদ্মতে হাত দিয়েছে অমনি কোথা থেকে বিকট এক হুঙ্কার উঠল। হুঙ্কারে বুঝি পৃথিবী কেঁপে উঠল। দেখলাম, সারথি নেই। জলে তলিয়ে গেছে। আর আমার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ।

মন দিয়ে বশিষ্ঠদেব সব শুনলেন। তারপর বললেন—অনরণ্য, তুমি সাধু আবার অসাধু।

বশিষ্ঠদেবের মন্তব্য শুনে রাজা তো বেকুব। এ আবার কি রকম কথা ? সাধু আবার অসাধু—ঠিক বুঝতে পারা গেল না তো !

বশিষ্ঠ বললেন—তুমি খ্যাতিমান হয়েও আরো খ্যাতি পেতে লোলুপ হয়েছিলে, তাই অসাধু। আর পদ্মের মধ্যে এক পাবের মত যে মানুষটিকে দেখে ছিলে, মহাভাগ্য না করলে তাঁকে দেখা যায় না। তিনি ব্রহ্মা, পদ্মের মধ্যেই তাঁর বাস। তাই তুমি সাধু। সাধু হলেও তোমাকে অসাধুতার ফলভোগ করতেই হবে।

—কিন্তু সারথি মারা গেল কেন ?

বশিষ্ঠ বললেন—আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে না ? জগৎ বিধাতা ব্রহ্মা। কত তাঁর তেজ ! বারোটা সূর্যেরও অত তেজ নেই। সারথি তাকে ছুঁয়েছে। মরবে না ?

সৌকর তীর্থ কথা

ত্রেতাযুগের কথা।

ধার্মিক কলিঙ্গরাজের বহুদিন পর একটি ছেলে হয়েছে। রাজ্যে মহা ধুমধাম। ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে ছেলেটিকে। রাজা-রানী তো বটেই, যে দেখে, সেই আদর করে। দেখতে দেখতে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। শিক্ষায়-দীক্ষায়, রূপে-গুণে সকলেরই মন জয় করে নিল। প্রজারাও ভাবী রাজাকে দেখে খুব খুশি।

ওদিকে কাঞ্চীপুরীর রাজার ঘরে প্রায় একই সময়ে একটি মেয়ে জন্মাল। ফুটফুটে চাঁদের মত দেখতে। মেয়েকে দেখে রাজা-রানীর আনন্দের আর শেষ নেই। যতই বড় হয় মেয়েটি, ততই যেন অপরূপা হয়ে উঠতে থাকে। রূপে তো বটেই, গুণেরও তুলনা নেই। আরো কিছুটা বড় হতেই রাজার মাথায় চিন্তা—এমন মেয়ের যোগ্য পাত্র কোথায় পাবেন।

কলিঙ্গরাজের ছেলের সুনাম তখন প্রায় লোকের মুখে মুখে। কাঞ্চীপুরীর রাজা তাই ঠিক করলেন ঐ ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

প্রস্তাব পাঠাতেই কলিঙ্গরাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কলিঙ্গ আর কাঞ্চী—বংশমর্যাদায় কেউই কম যায় না। তাছাড়া মেয়েটির গুণের কথা কলিঙ্গরাজ ইতিমধ্যে শুনেছেন। তাই আর কোন কথা নয়, মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা বিয়ের পর বেশ কিছুকাল আমোদ আহ্লাদ করে কাটাল।

একদিন রাজকন্যা রাজকুমারকে বলল, তোমার কাছে আমার একটা আবেদন আছে, রাখবে ?

রাজকুমার বলল—আবেদন কেন, বল দাবি। তুমি বললে আমি শুনব না, বা কিছু চাইলে অগ্রাহ্য করতে পারি, এমন কথা ভাবছ কেন ? বল, তোমার কি চাই ?

রাজকন্যা বলল—তুমি কথা দাও, আমি যা চাইব, তাই দেবে। তিন সত্যি কর।

রাজকুমার বলল—তিন সত্যি করে বলছি, যা চাইবে, তাই দেব।

রাজকন্যা বলল—আমি একটা ব্রত করব।

—এই কথা ? ব্রত করবে, এ তো ভাল কথা।

রাজকন্যা বলল—না কুমার। তিন সত্যি সেজন্য করাই নি। এই ব্রতটা একটু কঠিন। নাম শয়নব্রত। আমি নিজের ইচ্ছামত যতক্ষণ শুয়ে থাকব, ততক্ষণ আমি কিভাবে শুয়ে আছি, তা কেউ দেখতে পাবে না। সখী পরিচারিকা কেউ কাছে থাকবে না। শ্বশুর,

শাশুড়ী, এমনকি তুমিও দেখতে পাবে না।

রাজকুমার বললেন—বেশ, তাই হবে।

রাজকন্যা ব্রত আরম্ভ করল। নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকন্যা ব্রত পালন করে। রাজকুমারও সত্য ভাঙেনি।

কলিঙ্গরাজ বৃদ্ধ হয়েছেন। মৃত্যুর আগে ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। প্রজাদের আশা মিটল। এখন রাজকুমার হল রাজা, আর রাজকন্যা হল রানী।

দেখতে দেখতে আটাত্তর বছর বয়স হয়ে গেল রাজার। ত্রেতাযুগে আটাত্তর বছর বয়স কিছুই না। সবেমাত্র কিশোর। কারণ তখন মানুষের পরমায়ু ছিল প্রায় হাজার বছর। ইতিমধ্যে পাঁচটি ছেলেও হল রাজার। রানী কিন্তু তখনো নির্দিষ্ট নিয়মে ব্রত পালন করে চলেছে।

একদিন রাজা ভাবল, এ আবার কি রকম ব্রত? খালি নির্জনে শুয়ে থাকা। কোন শাস্ত্রে তো এমন ব্রতর কথা লেখা নেই। তবে রানী এ ব্রত পেল কোথা থেকে? তাছাড়া ব্রতের তো একদিন শেষ আছে? রানীর ব্রত কি আর শেষ হবে না?

ভাবতে ভাবতে রাজার মনে খুব কৌতূহল জাগল। ব্যাপারটা কি একবার লুকিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু তিন সত্যি। লুকিয়ে তো দেখবে, ধরা না পড়লে আর কি সত্য ভঙ্গ হবে?

আরও কিছুকাল কেটে গেল। অমন রাজা পেয়ে প্রজাদের আসা-যাওয়ার শেষ নেই। যে যখনই আসুক, রাজা নিজে তার কথা শোনে। তাই সকলেই খুশি।

একদিন জমজমাট রাজসভা। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রজারা সবাই বসে। হঠাৎ রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বলল—মন্ত্রীমশাই, রাজ্যে সকলকে বলে দিন, আমি আগামীকাল শয়নব্রত পালন করব। আমি এক ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকব। কেউ আমাকে দেখতে যেন না পায়। যে ডাকবে বা দেখতে পাবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।

অমাত্য তো তা শুনে রাজ্যে ঢোল দিয়ে দিল। প্রজারা শুনে ভাবল, এ আবার কি?

যাই হোক রাজার যখন হুকুম, করার কি আছে।

পরদিন আর রাজসভা বসল না।

রাজা অন্দরমহলের এক ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

রাত হল। ঘরের ভেতর রানী আসছে টের পেয়েই রাজা খাটের নীচে আত্মগোপন করে রইল। রানী এসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাজা দেখল, খুব ফেকাসে হয়ে গেছে রানীর মুখ। দু হাতে মাথা চেপে কাঁদছে, বিলাপ করছে—কি অদৃষ্ট। চুপ করে এই মাথার যন্ত্রণা আমায় সহ্য করতে হচ্ছে। অমন স্বামী, তাকেও স্বামী বলতে পারছি না। সৌকর তীর্থে কি আমার আর যাওয়া হবে না? স্বামীর সঙ্গে কপটতা করে আমাকে এই যন্ত্রণা নিয়ে কি এখানেই মরতে হবে?

রানীর বিলাপ শুনে রাজা আর স্থির থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে রাণীকে বলল—সত্য ভেঙেছি, কিছু মনে কোরো না। তোমার এই মাথায় যন্ত্রণার জন্য এত লুকোচুরি খেলে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? আমার রাজ্যে কি বৈদ্যের অভাব?

রানী বলল—রাজা, আমার এই রোগ কোন বৈদ্য সারাতে পারবে না।

রাজা বলল—সৌকর তীর্থের কথা বলছিলে না? হ্যাঁ, মহা তীর্থস্থান। শুনেছি, সেখানে গেলেই মুক্তি। তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়েছিল, লুকিয়ে না রেখে আমায় বলনি কেন?

রানী বলল—ভয়ে। পাছে আপনি মনে কষ্ট পান।

—কষ্ট? কিসের কষ্ট? কষ্ট পাব কেন? তুমি বল।

রানী বলল—সৌকর তীর্থে না গেলে তা বলা যাবে না।

রাজা বলল—বেশ, তাহলে তাই চল।

রানী বলল—গেলে যে রাজা সেখান থেকে আর ফেরা যাবে না।

রাজা বলল—দরকার কি ফেরার? বড় ছেলে যথেষ্ট বড় হয়েছে। ওকেই রাজা করে দিয়ে চল আমরা যাই।

অগত্যা ঠিক হল, তাই হবে।

এরপর আরো কিছুকাল কেটে গেল।

রাজা একদিন অমাত্যদের ডেকে বলল—আমি তীর্থে যাব। তার আগে আমার বড় ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যেতে চাই। আপনারা আয়োজন করুন।

রাজার হুকুমে আয়োজন শেষ হল। বড় ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে রানীকে নিয়ে রাজা সৌকর তীর্থে যাত্রা করল। প্রজাদের মধ্যে যারা রাজাকে খুব ভালবাসত, তারাও রাজার সঙ্গ নিল।

সৌকর তীর্থ জমজমাট হয়ে উঠল। কেটে গেল আরো বেশ কিছুকাল।

একদিন রাজা বলল—রানী, এবার তো আমার পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে। আর আমরা সৌকর তীর্থেই রয়েছি। কই, এখনো তো তুমি তোমার সেই কথা বললেন না?

রানী বলল—বলব। তবে তার আগে আমাদের দুজনকেই তিন দিন উপবাস করে থাকতে হবে।

উপবাস শেষ হলে রানী হাত ধরে রাজাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল—রাজা, গত জন্মে এইখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল। আমি ছিলাম শৃগালী। কাম্পিল্ল নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের ছেলে সোমদত্ত এক সময় এখানে শিকারে এসে কিছু না পেয়ে আমাকেই তীর ছুঁড়ে এই মাথায় মেরেছিল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এখানেই মারা গিয়েছিলাম। তীর্থের গুণে মানুষ হয়ে রাজকুলে জন্মালেও মাথার সেই শূল যন্ত্রণা এতদিন ভোগ করে আসছিলাম। আজ আমার মুক্তি হল।

রাজা তাই শুনে বলল—রানী, তাহলে শোন। আমিও আমার গোপন কথা এতদিন বলতে পারিনি। ঐ যে গাছটা দেখছ, আমি ঐ সোমদত্তের তীরেই গাছের নীচে পড়ে মারা যাই। গত জন্মে আমি ছিলাম শকুন। সোমদত্ত আমার ডানাদুটো কেটে নিয়ে গিয়েছিল তীরের গোড়ায় বাঁধবে বলে। তীর্থের গুণে আমিও গত জন্মে শকুন হলেও এ জন্মে রাজবংশে জন্মেছিলাম। আজ আমরাও মুক্তি ঘটল।

এরপর রাজা-রানী সেখানেই দেহ রাখলেন।

প্রজারা কিন্তু কেউ আর সৌকর তীর্থ ছেড়ে ফিরল না।

জন্মান্তরের খেলা

কুব্জাম্রক নামে একটা জায়গা ছিল। লোকালয় থেকে অনেক দূরে। নির্জন এক স্থানে। আম গাছ ছাড়াও কিছু ফল-ফুলের গাছ আর ঝোপ-ঝাড় ছিল। ভক্তরা আসত। বিষ্ণুর পুজো করত। চলে যেত। সেই মন্দিরেরই এক কোণে গর্তে থাকত এক সাপিনী। ভক্তরা বিষ্ণুর পুজো করে যা ফেলে যেত, সাপিনী তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়ে দিন কাটাত।

একদিন দুপুরে ভক্তরা পুজো করে চলে গেছে, কেউ কোথাও নেই। গর্ত থেকে বেরিয়ে সাপিনী খাবার খুঁটতে খুঁটতে মন্দিরের চাতালটা সবেমাত্র পেরিয়েছে, হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল এক নেউল। সাপিনীকে দেখে নেউল যেই তেড়ে এল, সাপিনীও ফোঁস করে উঠল। দুজনের মধ্যে মুহূর্তে বেধে গেল দারুণ লড়াই। নেউলের আঁচড়ে-কামড়ে সাপিনী টুকরো টুকরো হয়ে মারা গেল। নেউলও কিন্তু পরিত্রাণ পেল না। সাপিনীর বিষে জর্জর হয়ে সেও প্রাণত্যাগ করল। পরদিন ভক্তরা এসে দেখল, একদিকে মরা নেউল, আর একদিকে এক টুকরো টুকরো সাপ।

এ ঘটনা যে কবে ঘটেছে, মানুষ তা ভুলেই গেছে।

কোশলরাজের সুন্দর একটি ছেলে হয়েছে। রূপে-গুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুলনীয়।

প্রাগজ্যোতিষপুরের (আসামের) রাজার একটি মেয়ে হয়েছে। রূপে-গুণে, নাচে-গানে তার আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

কোশলরাজ যখন সেই মেয়েটির রূপ-গুণের কথা শুনলেন তখন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। মেয়েও অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুর-শাশুড়ীর মন জয় করে নিল। এমন একটি মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়ে ছেলেও খুব খুশি। দুজনের মধ্যে দারুণ ভাব-ভালবাসা জমে উঠল। দুজনে সারাদিন মনের আনন্দে বাগান থেকে বাগানে, উপবন থেকে উপবনে ঘুরে বেড়ায়। দেখে রাজা-রানীও খুশি।

একদিন দুজনে এক উপবনে বসে গল্প করছে, এমন সময় দেখল, এক সাপিনী ঘাসের ওপর দিয়ে হিলহিল করতে করতে চলে যাচ্ছে।

দেখেই রাজকুমার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাতে একটা পাথর তুলে নিল। তাই দেখে রাজকন্যা সঙ্গে সঙ্গে উঠে রাজকুমারের হাতটা চেপে ধরল। বলল—ও কি! সাপিনীকে মারতে যাচ্ছ কেন। ও তো কোন ক্ষতি করেনি।

রাজকুমার ঝট করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল সর সর। সাপকে কখনো ছেড়ে দিতে আছে? কামড়ালে আর রক্ষে থাকবে? বলেই সাপিনীর মাথা লক্ষ্য করে সজোরে পাথর ছুঁড়ল। সাপিনীর মাথা চুরচুর হয়ে ছটফট করতে করতে মারা গেল।

রাজকন্যা মুখ ফিরিয়ে এক পাশে বসল। মনে আর তার কোন আনন্দই নেই।

কিছুক্ষণ বাদেই হঠাৎ ঝোপ থেকে একটা নেউল বেরিয়ে এল। রাজকন্যা দেখামাত্র হাতে একটা বড় পাথর তুলে নিল।

দেখে রাজকুমার বাধা দিল—ও কি, নেউলটাকে মারতে যাচ্ছ কেন? ও তো কারো কোন ক্ষতি করে নি।

রাজকন্যা যেন শুনেও শুনতে পেল না। পাথর ছুঁড়ে নেউলটাকে মেরে ফেলল।

রাজকুমার তো রেগে আগুন।

—বারণ করলুম, আমাকে অগ্রাহ্য করে তুমি নেউলটাকে মারলে?

রাজকন্যা বলল—সাপিনীকে মারতে আমিও তোমায় নিষেধ করেছিলাম। তুমি কি আমার কথা শুনেছিলে?

রাজকুমার বলল—আমি ভবিষ্যতে রাজা হব। কাকে সাজা দিতে হবে বা না হবে তা বিচার করার ক্ষমতা আমার যথেষ্টই আছে। তোমার কাছ থেকে কি আমায় তা শিখতে হবে?

কথায় কথা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হল যে, রাজকুমার রাগের মাথায় বলে বসল—যাও, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

রাজকন্যার মনেও দারুণ গোঁসা।

রাজকুমারের সঙ্গে রাজকন্যা আর ঘুরে বেড়ায় না। দুজনে দুদিকে, কেউ কারো মুখ দেখে না। আস্তে আস্তে রাজবাড়ির সকলেরই তা চোখে পড়তে লাগল। কৌতূহল জাগল, ব্যাপার কি জানার জন্য।

এর বেশ কিছুদিন পর ব্যাপারটা কোশলরাজের কানে উঠল। রাজা তো শুনে অবাক। তাঁর ছেলেও খারাপ নয়, মেয়েরও গুণের তুলনা নেই। তাহলে ছেলে এমন ব্যবহার করতে শুরু করল কেন?

মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—রাজকুমার-রাজকন্যা দুজনকেই ডেকে নিয়ে এসো। তাদের কাছ থেকেই শুনতে চাই, কি হয়েছে।

মন্ত্রী দুজনকেই ডেকে নিয়ে এলেন। রাজা দুজনের কাছ থেকেই সভায় বসে সব কথা শুনলেন। তারপর হেসে বললেন—এই সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে তোমাদের মধ্যে এত অভিমান হল কেন? বৌমা তো আমাদের খারাপ নয়। কোনদিনই তার আচার-ব্যবহারে আমরা খারাপ কিছু পাইনি। ওর সঙ্গে তুমি ও রকম কোরো না।

রাজকুমার বলল—আপনি যা বললেন সবই ঠিক। কিন্তু ও আমার নিষেধ শুনল না কেন? স্ত্রী অবাধ্য হলে কি ভাল লাগে?

রাজকন্যা বলল—আমার নিষেধ রাজকুমার শুনল না কেন? আমি যখন তাঁর স্ত্রী, আমাকে অগ্রাহ্য করা কি আমাকে অপমান করা নয়?

দুজনের বক্তব্য শুনে কোশলরাজ কি যেন একটু আপনমনে চিন্তা করে নিলেন। তারপর রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন—কুমার, সত্যি করে বল তো, ব্যাপারটা কি? মনে হচ্ছে,

এর ভেতরে যেন কিছু কথা আরও আছে।

রাজকুমার বললেন—এই সভায় আজ তা বলা যাবে না। কাল বলব।

রাজাও রাজি হয়ে সভা ভেঙে দিলেন।

পরদিন সকাল হতেই দুন্দুভি বেজে উঠল। স্তোত্র পাঠকেরা স্তোত্র পাঠ করল। রাজার ঘুম ভাঙল। রাজা উঠে বসেছেন নিজের খাস ঘরে। এমন সময় প্রহরী এসে প্রণাম জানিয়ে বলল—রাজকুমার এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে কুমারকে দ্বার ছেড়ে দেবার অনুমতি দিলেন।

কুমার এসে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে বলল—কাল যে কথা বলি নি, তা আজ আমি নিভৃতে বলব। তাই এলাম।

রাজা বললেন—হ্যাঁ⋯হ্যাঁ বাবা, বল।

কুমার বলল—সে কথা শুনতে গেলে আপনাকে আমাদের সঙ্গে কুব্জাম্রকে যেতে হবে।

রাজা শুনে একটু বিস্মিত হলেন—কুব্জাম্রক? সে তো শুনেছি এক তীর্থক্ষেত্র। তা সেখানে যেতে হবে কেন?

—না গেলে আপনাকে ঠিকমত বলতে পারব না।

রাজা বললেন—বেশ, তাই হবে। যাব। তুমি আমার বড় ছেলে। তুমিও আমার সঙ্গে গেলে রাজ্য চালাবে কে?

কুমার বলল—ছোট ভাইকে বসিয়ে চলুন বাবা।

—বড় থাকতে ছোট সিংহাসনে বসবে? তা কি কখনো হয়?

—আমি বলছি বাবা, এতে আমার কোন লোভ নেই। কুমার বলল—তাছাড়া সেখানে গেলে আর আমাদের হয়ত ফেরা নাও হতে পারে।

অগত্যা অমাত্যদের ডেকে ছোট ছেলেকেই সিংহাসনে বসালেন। তীর্থযাত্রার সব আয়োজন শেষ করে সকলে মিলে একদিন কুব্জাম্রকে এলেন।

নদীতে স্নান, বিষ্ণুমন্দিরে পুজো, এই নিয়েই বেশ কিছুকাল কেটে গেল।

একদিন সকলেই রয়েছেন বিষ্ণুমন্দিরের চাতালে। রাজকুমার



আর রাজকন্যা এসে প্রথমে বিষ্ণুকে, তারপর মা-বাবাকে প্রণাম করে বলল—শুনুন তাহলে।

এই বলে চাতালের পাশে সাপিনী আর নেউলের কাহিনী শুনিয়ে রাজকুমার বলল—বাবা, আমিই সেই নেউল। জায়গার দৌলতে আপনার ছেলে হয়ে জন্মেছি ঠিকই, কিন্তু পূর্বজন্মের সেই শত্রুতা আমি ভুলতে পারিনি।

রাজকন্যা বলল—রাজা, আমিই সেই সাপিনী ছিলাম। ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে রাজপরিবারে জন্মে আপনারই ঘরে পুত্রবধূ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পূর্বজন্মের সেই আক্রোশ আমি ভুলতে পারি নি।

শুনে রাজা-রানী থেকে শুরু করে আর যারা ছিল সকলেই অবাক।

কুমার বলল—বাবা, আমরা চললাম। এই বলে তারা পৌণ্ডরিক তীর্থে গিয়ে প্রাণত্যাগ করল।

আর রাজা-রানী! সব ভুলে মায়াতীর্থে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

বণিক গোকর্ণ ও শুকপাখি

মথুরায় বসুকর্ণ নামে এক বণিক ছিল। তার স্ত্রীর নাম সুশীলা। বণিকমহলে বসুকর্ণের খুবই খ্যাতি। মর্যাদাও খুব। দেশবিদেশেও খুব নামডাক। বাণিজ্য করে ধন-সম্পদও করেছে প্রচুর। থাকেও রাজার হালে। দাসদাসীর অভাব নেই। তবুও মাঝে মাঝে তার মন খারাপ হয়ে ওঠে। এত বড় বাড়ি, এত ঐশ্বর্য—কিন্তু ভোগ করবে কে? বয়সও হয়ে আসছে। একটা ছেলে বা মেয়ে কিছুই হল না।

সুশীলার মন সব সময়েই খারাপ। একটা ছেলে আজও হল না যে তাকে 'মা' বলে ডাকে।

একদিন নদীতে স্নান করতে গেছে সুশীলা। দেখল, আরো অনেকে এসেছে স্নান করতে। সঙ্গে তাদের সব ছেলেপুলে নিয়ে। ছোট ছোট সব ছেলে, কেমন মনের আনন্দে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। কোন মা ছেলেকে শাসন বারণ করছে, কোন মা নিজের হাতে ছেলেকে ধরে স্নান করাচ্ছে। দেখতে দেখতে সুশীলার মন ডুকরে কেঁদে উঠল। কোন রকমে নদীর ধার থেকে উঠে এক গাছতলায় বসে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এমন সময় গাছতলায় গেরুয়া কাপড় পরা এক তাপস এসে দাঁড়ালেন। সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন—এমন করে কাঁদছিস কেন মা? কি হয়েছে তোর?

সুশীলা মুখ তুলে তাপসের দিকে তাকিয়ে বলতে গিয়েও বলতে পারল না। আবার মুখ নামিয়ে আরো জোরে কেঁদে উঠল।

তাপস বললেন—চুপ কর মা, চুপ কর। বুঝতে পেরেছি।

সামনেই ঐ যে গোকর্ণেশ্বর শিবলিঙ্গ রয়েছে, ওর পুজো কর, তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

বলেই তাপস মুহূর্তের মধ্যে যেন কোথায় চলে গেলেন। সুশীলা মুখ তুলে আর তাঁকে দেখতে পেল না। বাড়িতে এসে স্বামীকে সব কথা বলল।

বসুকর্ণ এমনিতেই একটু ধর্মপ্রাণ। তার ওপর সুশীলার মুখে এই কথা শুনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব মনে না রেখে গোকর্ণদেবের পুজোর আয়োজনে মেতে গেল। দুজনে যখন এক মনে গোকর্ণদেবকে ডাকত, দেখলে মনে হতো, বুঝি-বা আকাশে ফেটে পড়ল। তাদের এই আকুল ডাকে সত্যি সত্যিই একদিন শিব দেখা দিলেন। বরও দিলেন।

এরপর একদিন সকলকে অবাক করে দিয়ে সুশীলার একটি ছেলে হল। গোকর্ণদেবের দয়ায় ছেলেটিকে পেয়েছিল বলে বসুকর্ণ ছেলের নামই রাখল গোকর্ণ। যথাসময়ে ছেলের অন্নপ্রাশন হল। অসময়ের ছেলে, সারা শহরের নেমন্তন্ন।

দেখতে দেখতে ছেলে বড় হল। বিদ্যা-বুদ্ধিও অর্জন করল। ভাল একটি মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দিল বসুকর্ণ। বসুকর্ণের ক্রমশ অবসর নেবার বয়স হয়েছে আসছে। বাণিজ্যকাজ মোটামুটি ইতিমধ্যে শিখিয়েই দিয়েছিল। গোকর্ণ নিজে মাঝে মধ্যে সেই বয়সে বাণিজ্যে যেত। সুতরাং সেদিক থেকে বসুকর্ণ নিশ্চিন্ত। এখন বুড়ো বয়সে নাতি নিয়ে দিন কাটাবার ইচ্ছা। কিন্তু, আশ্চর্য! কোন ছেলেপুলে হল না। বসুকর্ণ তখন আরো চারটে ভাল ভাল মেয়ে দেখে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিল। কিন্তু হায় কপাল! কারুরই ছেলে হল না।

বসুকর্ণ আর গোকর্ণ দুজনেই ছেলের কামনায় দান-ধ্যান করতে শুরু করল। ডেকে ডেকে দান করে। করতে করতে এমন অবস্থা হল যে জমানো যা কিছু ছিল, তা প্রায় সবই শেষ হতে চলল।

তাই দেখে গোকর্ণ ঠিক করল, বাণিজ্যে আর না বেরোলে চলবে না। ইতিমধ্যে সে খুবই দক্ষ বণিক হয়ে উঠেছিল। তাই হিসেব করে ঠিক ঠিক জিনিস নৌকোয় তুলে বাবা-মার অনুমতি নিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়ে পড়ল। বাড়িতে তার পাঁচ স্ত্রী ঠিক যেন পাঁচ বোনের মত থেকে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার ভার নিল।

দেশ-দেশান্তর ঘুরে খুব ভাল বাণিজ্য করল গোকর্ণ। তারপর মথুরার দিকে ফিরতে লাগল। পালতোলা সামগ্রী-ভর্তি নৌকো ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে আসছে। পাটাতনে দাঁড়িয়ে গোকর্ণ দুপাড়ের শোভা দেখছে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে মাঝিদের বলল—পাড়ে নৌকো ভেড়াও। নামব।

নদীর কোল বেয়ে এক পাহাড়। গোকর্ণের কথায় মাঝিরা সেখানে নৌকো বাঁধতেই গোকর্ণ নেমে পড়ল। চমৎকার পাহাড়। চারিদিকে কত সব গাছের বাহার! যেন পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কেউ গাছগুলোকে মনের মত করে বসিয়ে রেখে গেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। যত এগোয়, গোকর্ণের যেন তত ভাল লাগে। শোভা দেখতে দেখতে নদীর কোল থেকে অনেকখানি চলে এসেছে। এক জায়গায় অপূর্ব এক পাহাড়ী সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে গোকর্ণ।

হঠাৎ গোকর্ণের কানে এল—ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন। কি সৌভাগ্য আজ যে দ্বারে অতিথি এসেছে।

গোকর্ণ চমকে পেছন ফিরে তাকাল। কে কথা বলল এমন ভাবে? পেছন ফিরে দেখল, হাত কয়েক দূরেই একটা ঝুপড়ি ঘর। সামনে খাঁচায় একটা শুক পাখি। কিন্তু কোন মানুষজন তো নেই। তাহলে এভাবে তাকে ডাকল কে?

অবাক হয়ে গোকর্ণ যখন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর ভাবছে, তখন আবার শুনল—অতিথি দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকলে যে গেরস্থর অকল্যাণ হবে। আপনি ভেতরে আসুন। আসন পাতাই আছে। খাবারও আছে। আপনি ইচ্ছেমত আহার করুন। তারপর মা-বাবা এসে আপনাকে আবার সেবা করাবে।

গোকর্ণের সংশয় এবার কাটল। দেখল, কথাগুলো বলছে খাঁচার ঐ শুকপাখি। সংশয় কাটল, কিন্তু মনে দারুণ বিস্ময় জাগল। সামান্য একটা শুক পাখি এমনভাবে কি করে কথা বলে? তার ওপর আবার এমনধারা নীতিকথা!

কাছে এগিয়ে এসে গোকর্ণ বলল—পাখি হলেও তুমি তো কোন সাধারণ পাখি নও। কে তুমি? আগে তোমার পরিচয় দাও, তারপর তোমাদের অতিথি হব।

শুক বলল—অতিথি দ্বার থেকে ফিরে গেলে বড় অমঙ্গল হবে। তাহলে আমার আসল পরিচয় তোমায় দিতেই হয়। পূর্বজন্মের সব কথাই আমার মনে আছে। বলছি শোন। পূর্বজন্মে আমি ছিলাম মহর্ষি বামদেবের শিষ্য। আমার নাম ছিল শুকোদয়। গুরুর অভিশাপেই আমি এখন শুকপাখি হয়ে আছি। আবার তাঁরই অনুগ্রহে আমি মানুষের মত কথা বলতে পারি। আর শাস্ত্রজ্ঞান যা অর্জন করেছিলাম, এমনকি পুরাণ পর্যন্ত, তা আমি ভুলিনি।

গোকর্ণ জিজ্ঞেস করল—কেন ঋষি তোমায় অভিশাপ দিলেন, আবার অনুগ্রহও করলেন?

শুক বলল—ছাত্রাবস্থায় আমি খুব বাচাল ছিলাম। তর্ক করতে আমার ভাল লাগত। তাই যখন তখন যার-তার সঙ্গে যে কোন বিষয় নিয়ে খুশিমত তর্ক লাগিয়ে দিতাম। গুরুদেবের কাছে মান্য-গণ্য সব ঋষিরা প্রায়ই আসতেন। যেমন মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, ভৃগু, অঙ্গিরা, রৈভ্য, মেধাতিথি। আমার গুরুদেবের সঙ্গে বসে তাঁরা কত কি আলোচনা করতেন। আমি শুনতাম, আর মাঝে মাঝে তর্কের মেজাজে ফোড়ন কেটে উঠতাম। গুরুদেব আমায় নিষেধ করতেন। বলতেন, তর্কের একটা নিয়ম আছে। সেটা না মেনে অমন বাজে তর্ক কোরো না। আমি তখনকার মত চুপ করে গেলেও আবার শুরু করে দিতাম। একদিন মুনিরা সবাই এসেছেন, আলোচনা চলছে, আমি ফোড়ন কেটে উঠলাম। গুরুদেব দারুণ রেগে গিয়ে আমাকে অভিসম্পাত দিয়ে বসলেন, তুই শুকপাখি হয়ে থাক গে। মুনিরা সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, যাতে আমাকে পাখি জীবনের দুর্গতি ভোগ করতে না হয়। গুরুদেব বললেন—'মুখ থেকে যখন বেরিয়ে গেছে তখন কথা আর ফিরবে না। তবে তোমরা যখন বলছ, তখন পাখি হলেও মানুষের মত কথা বলবে, আর সব জ্ঞানও থাকবে। আর যদি কখনো মথুরায় গিয়ে ওর মৃত্যু হয় তাহলে অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।' তারপর শুকোদয় আমি হলাম শুকপাখি। এক পাহাড়ের ধাপে বসে আপন মনে 'মথুরা·····মথুরা' করছিলাম, এমন সময় এক শবর (ব্যাধ) আর শবরী এসে আমায় ধরে খাঁচায় পুরে ফেলল।

আমাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। যা দেয় তাই খাই।

গোকর্ণ বলল—আমি মথুরারই বণিক। বাণিজ্য সেরে মথুরাতেই ফিরছি। তুমি যাবে ?

শুক শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সে তো আমার সৌভাগ্য। আমি তোমার ছেলের মত হয়ে থাকব। নিয়ে চল না।

ঠিক সেই সময় কুঁড়ে থেকে শবরী বেরিয়ে এল। ঘরেই এতক্ষণ সে ঘুমোচ্ছিল।

শবরী বেরিয়ে আসতেই শুক বলে উঠল—মা, মা। আমাদের সৌভাগ্য যে অতিথি এসেছেন। আপ্যায়ন কর মা।

শবরী সঙ্গে সঙ্গে গোকর্ণকে সসম্ভ্রমে নিয়ে গিয়ে আসনে বসাল। ফল-মূল এনে দিল। গোকর্ণ সবেমাত্র তা খেতে শুরু করেছে, এমন সময় বাইরে থেকে শবর এল। শবর আসতেই শুক তাকেও সেই একই কথা বলল।

শুকের কথায় শবরও অতিথিসেবায় তৎপর হয়ে উঠল। অতিথি সৎকার শেষ হয়ে গেলে শবর জিজ্ঞেস করল—বলুন, আপনার জন্য আমরা আর কি করতে পারি।

গোকর্ণ বলল—তোমাদের সেবায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। শুধু একটাই প্রার্থনা, যদি এই শুক পাখিটিকে আমাকে দাও, তাহলে আমি আরও খুশি হবে।

অতিথির প্রার্থনা। বিমুখ করা যায় না। তারা তাদের সঙ্গী শুকপাখিটি গোকর্ণকে দিয়ে দিল। গোকর্ণও যেন এক অমূল্য সম্পদ পেল এই ভেবে মহানন্দে নৌকোয় এসে আবার পাল তুলে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই মথুরায় পৌঁছে বৃদ্ধ মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে প্রণাম জানিয়ে শুক পাখিটিকে দেখিয়ে বলল—বাবা দেখ, কি সুন্দর আমি এক ছেলে পেয়েছি। আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই। তোমরাও একেই তোমাদের নাতি বলে মনে কোরো।

শুকও মানুষের ভাষায় অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাল। তারপর বলল—হ্যাঁ, আপনার ছেলেই আমার বাবা। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

অঢেল সম্পদ এনেছে গোকর্ণ। আবার দান-ধ্যান শুরু করে মথুরাতে থেকে গেল। শুক পাখি বেশির ভাগ সময় থাকত বসুকর্ণর কাছে। তাঁকে শোনাত নানা শাস্ত্র কথা। শুকের মুখে সেসব কথা শুনতে ভারি ভাল লাগত। কি অপূর্ব কথা বলে শুক। যেন গল্প বলছে।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন।

মথুরায় বেশ কিছু রত্ন-ব্যবসায়ী ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে রত্ন নিয়ে বাণিজ্য করত। আর গোকর্ণ ছিল রত্ন চিনতে ওস্তাদ। দেখামাত্রই বলে দিতে পারত, কোন্‌টা কি রত্ন। কোন্‌টার কি মূল্য। কোন্‌টা খাঁটি, কোনটা খাঁটি নয়। তাই মথুরায় প্রায় সকলেই গোকর্ণকে দিয়ে রত্ন-পরীক্ষা করিয়ে নিত।

সেবার রত্ন-ব্যবসায়ীরা ঠিক করল, এবার রত্ন সংগ্রহে তারা গোকর্ণকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। একেবারে দেখে দেখে আসল রত্নই সংগ্রহ করবে। গোকর্ণকে বলতেই সে রাজি হয়ে গেল।

শুভদিন দেখে রত্ন-ব্যবসায়ীরা পাল-তোলা নৌকোয় উঠল। মা-বাবার অনুমতি নিয়ে গোকর্ণও সঙ্গী হল। সঙ্গে একমাত্র শুকপাখি। এখন আর শুক খাঁচায় থাকে না। গোকর্ণের হাতে, নয়ত কাঁধে ঘুরে বেড়ায়।

অনুকূল বাতাস আসতেই নৌকো সমুদ্রের জলে ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল। দেখতে দেখতে নৌকো এসে লবণ সাগরে পড়ল।

কিছুদিন গেল। নৌকোয় বসে বণিকদের কত জল্পনা-কল্পনা, কত খোশ গল্প। হঠাৎ একদিন শুরু হল এলোমেলো বাতাস। সমুদ্রে তো আর তারা এই প্রথম যাচ্ছে না। এরকম অনেক অভিজ্ঞতাই তাদের আছে। তাই প্রথম দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না। কিন্তু দিন যত যেতে লাগল হাওয়ার গতি তত বাড়তে লাগল। আকাশ ঘোলাটে হয়ে এল। রীতিমত ঝড় শুরু হল। সমুদ্র ফুঁসে উঠতে লাগল। নাবিকরাও দিক হারিয়ে ফেলল। অকূল দরিয়ায় সে এক মহাসঙ্কটে পড়ল সবাই। কেউ কেউ বলল, 'বড় অস্বাভাবিক তো ?' কেউ কেউ আবার বলল, 'হ্যাঁ, তা বটে। তবে মনে হয় শিগগির কেটে যাবে।'

নৌকো ভেসে চলেছে দারুণ এলোমেলো ভাবে। নাবিকেরা হাল ছেড়ে চুপচাপ বসে মধুসূদনকে ডাকছে। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। ঝড় আর থামে না। নাবিক থেকে শুরু করে বণিকরা সবাই বলাবলি করতে শুরু করল, 'এমন তো কখনো ঘটে না। এবারে হঠাৎ এমন বিপর্যয় কেন ?' ডুবতে ডুবতেও ভেসে চলেছে নৌকো। খাদ্য-সামগ্রী যা ছিল, তাও শেষ হয়ে গেল। প্রায় চার মাস হতে চলল। ঝড়ের আর থামার নাম নেই।

নাবিকদের সঙ্গে বণিকরা তখন জীবনের আশা ছেড়েই দিল।

—নিশ্চয়ই এবারে আমাদের সঙ্গে কোন মহাপাপী আছে। নইলে এমন দুর্গতি কখনো হয় না। চিৎকার করে উঠল নাবিকরা—কে সে পাপী ? তাকে সমুদ্রে ফেলে দাও।

শোনামাত্রই গোকর্ণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সকলে কি তাকেই বলছে ? মহাপাপ না করলে আমার ছেলে হল না কেন ? অপুত্রক তো মহাপাপী। ভাবতে গিয়ে গোকর্ণের মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। শুকের গায়ে হাত বুলোতেই শুক বলল—তুমি কিচ্ছু ভেবো না, বাবা। নিশ্চিন্তে থাকো। যা করবার আমিই করছি।

এই বলে শুক গোকর্ণকে ছেড়ে সেই ঝড়ের মধ্যেই আকাশে উঠল। কালো মেঘে দুরন্ত সেই ঝড়ের গতি। ছোট্ট পাখি শুক কোনরকমে টাল সামলাতে সামলাতে উড়ে চলল। খানিকটা যেতেই দেখল এক পাহাড়। পাহাড়ের ওপর এক বিষ্ণু মন্দির। ঝড়ের ঝাপটায় শুক তখন খুবই ক্লান্ত। বিষ্ণুমন্দিরে নেমে এল। একটু জিরিয়ে মন্দিরের চারদিকে এক পাক ঘুরে মন্দিরের ভেতর ঢুকে বিষ্ণু দর্শন করছে, এমন সময় দেখল টাটকা ফুলের মত দেখতে এক কন্যা হাতে ফুলের মালা নিয়ে মন্দিরে এসে বিষ্ণুর সামনে আসন করে বসল। শুক এক পাশে সরে গেল। একটু সময় পরেই দেখল ঠিক একই রকম দেখতে আরো বেশ কিছু কন্যা ফুল নিয়ে মন্দিরে এসে নাচে-গানে বিষ্ণুর অর্চনা শুরু করে দিল। ভারি ভাল লাগছিল শুকের দেখতে। হঠাৎ বড় বড় চোখ মেলে শুক দেখল, কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে জটায়ু পাখি এসে মন্দির তো বটেই, যেন পাহাড়কে ছেয়ে ফেলল।

শুককে দেখে ওদেরই মধ্যে কয়েকজন জিজ্ঞেস করল—ছোট্ট পাখি তুমি, বিশাল এই সমুদ্র পেরিয়ে এখানে এলে কেমন করে ?

শুক তখন তাদের সব কথা বলল। তারপর অনুরোধ জানাল—ঝড়ে সমুদ্রের মাঝে আমার বাবা মহা বিপদে পড়ে

আছে। দয়া করে তোমরা যদি কেউ তাকে উদ্ধার করে আনো।

ওদেরই মধ্যে একজন বলল—আমি তোমার বাবাকে পিঠে করে তুলে আনতে পারি। কিন্তু কে তোমার বাবা, আমি তো চিনি না। সঙ্গে তুমি যদি যাও তো ভাল হয়।

শুক বলল—নিশ্চয়ই।

জটায়ুকে পথ দেখিয়ে শুক নিয়ে এল নৌকোয়। বেসামাল অবস্থায় কে আর তখন কাকে দেখছে। জটায়ু নৌকোর কাছে এসে সমুদ্রের জলে ডানা মেলে ভেসে পড়ল। শুক গিয়ে গোকর্ণকে বলল—বাবা, এখনই জটায়ুর পিঠে চেপে পড়ুন।

শুকের কথায় গোকর্ণও সকলের অলক্ষ্যেই জটায়ুর পিঠে চেপে বসল। জটায়ু খানিকটা সাঁতরে এসে গোকর্ণকে নিয়ে আকাশে উড়ল, পেছনে টাল সামলাতে সামলাতে শুক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আবার সেই পাহাড়ে এসে পৌঁছল।

গোকর্ণ সেই পাহাড়ে এসে দেখল ঝড়ের লেশমাত্র নেই। রত্ন দিয়ে বাঁধানো অপূর্ব এক বিষ্ণুমন্দির। কাছেই এক সরোবর। নীল জল টলমল করছে।

শুকের কথায় গোকর্ণ সেই সরোবরে স্নান করে মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের ভেতরে ঢুকল। দেখল বিষ্ণুর সামনে আসনে বসে যেন এক ফুলপরী। আর ঠিক একই রকম দেখতে অনেক ফুলপরী নাচে-গানে মন্দিরকে যেন মাতিয়ে তুলেছে। দেখেই গোকর্ণের মন প্রাণ ভরে গেল।

হঠাৎ আসনে বসে থাকা রমণীটি ওদেরই একজনকে ডেকে বলল—আহা গোকর্ণ বহুদিন ধরে না খেয়ে আছে। আগে ওকে খেতে দাও।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে গোকর্ণকে ডেকে চাতালে নিয়ে গিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াল।

ওদিকে পুজো, নাচ গান শেষ হল। যে যার চলে গেল। ফাঁকা চারদিক। শুধু শুক আর গোকর্ণ।



যাবার আগে প্রধানা রমণী গোকর্ণকে বলে গেল—তুমি এখানেই থেকে নারায়ণের অর্চনা কর। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

গোকর্ণও তাই নিয়ে থেকে গেল।

পরদিন আবার মেয়েরা এল। সেভাবে নাচে-গানে বিষ্ণুর আরাধনা করে চলে গেল।

এভাবে চলতে লাগল প্রতিদিন।

এদিকে একসময় সামুদ্রিক ঝড় থামল। সমুদ্র শান্ত হল। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে নাবিকেরা প্রায় বিধ্বস্ত। ঝড় থামতেই আবার যেন তারা নতুন প্রাণ পেল। পাল তুলে দাঁড় টেনে, দিক ঠিক করে তারা এমন এক দ্বীপে এল যেখানে অজস্র রত্ন—মণি-মুক্তো। যে যত পারল মণি-রত্ন সংগ্রহ করে নৌকোয় তুলল। তারপর তাদের মনে পড়ল গোকর্ণকে। তাই তো, গোকর্ণ কোথায় গেল? কেউ আর ঠিক করতে পারে না, গোকর্ণকে তারা শেষ কখন দেখেছে। যার যেখানে সন্দেহ জাগল, সবাই মিলে সেসব জায়গা খুঁজেও তার কোন সন্ধান পেল না। মনে আশঙ্কা হল, ঝড়ের মুখে পড়ে যখন পরোক্ষে তাকেই পুত্রহীন মহাপাপী বলে কটু-কাটব্য করছিল, হয়ত তখন সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে! কিছু করার নেই। শুধু, একটাই চিন্তা, গোকর্ণের বুড়ো মা-বাবাকে গিয়ে কি বলবে।

দিনকয়েক বিষ্ণুমন্দিরে কাটাবার পরই মা-বাবার জন্য গোকর্ণের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। শুক বুঝতে পেরে বলল—এই বিশাল সমুদ্র আর আমি ছোট্ট পাখি। নইলে আমার পিঠে চাপিয়ে তোমাকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারতাম। জটায়ুরাও আর আসে না যে তাদের অনুরোধ করব। বরং আমি গিয়ে তোমার খবর তাঁদের দিয়ে আসি।

অগত্যা গোকর্ণ রাজি হল। সে যে বেঁচে আছে, এ খবরটুকু পেয়েও তার মা-বাবা-স্ত্রীরা একটু আশ্বস্ত হবে।

আদিগন্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে শুক উড়তে উড়তে এক সময় মথুরায় এল। বসুকর্ণ আর সুশীলার সঙ্গে দেখা করে সব বলল। শুনে একদিকে যেমন আনন্দ হল, অপর দিকে কিন্তু তাদের মন খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে, ছেলে কি তাহলে আর তাদের কাছে কোনদিন ফিরে আসতে পারবে না? শুক সান্ত্বনা দিতে লাগল। ঠিক সেই সময়ই এল রত্ন ব্যবসায়ীরা। গোকর্ণের কোন খবর কিন্তু তারা দিতে পারল না। শুধু দুঃখ জানিয়ে গেল আর বসুকর্ণকে বেশ কিছু রত্ন দিয়ে চলে গেল। বসুকর্ণ কিন্তু শুককে ছাড়ল না। শুকও তার কাছে থেকে তাকে নানা ধর্মকথা শোনাতে লাগল।

ওদিকে তেরটা দিন গোকর্ণের বিষ্ণুমন্দিরে কেটে গেল। সেই মেয়েরা রোজই আসে। সেইভাবে রোজই পুজো করে যায়। কিন্তু যত দিন যায় গোকর্ণ দেখে প্রথম যখন যেমনটি দেখেছিল তাদের তেমনটি আর যেন নেই। কেমন যেন দিন দিন শুকিয়ে ফেকাসে হয়ে যাচ্ছে। নিজেও অবশ্য অনেক রোগা হয়ে গিয়েছিল। তার কারণও আছে। কিন্তু এদের এমন রোগা হয়ে যাওয়ার কারণ কি?

একদিন থাকতে না পেরে গোকর্ণ জিজ্ঞেস করে বসল—তোমরা অমন ম্লান হয়ে যাচ্ছ কেন?

প্রধানা রমণী কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল—কপাল আমাদের।

গোকর্ণ বলল—বলই না, কি হয়েছে।

সেই মেয়েটি বলল—এখানে আমাদের থাকার দিন ফুরিয়ে



আসছে, তাই ভেবেই আমরা রোগা হয়ে যাচ্ছি। বিষ্ণুর সেবাইতদের নিষেধ সত্ত্বেও রাজার লোকেরা যে এখানকার সব ফুলগাছ কেটে দিচ্ছে। এতে কি আর শান্তি থাকে?

শুনে গোকর্ণেরও মন খারাপ হয়ে গেল। বলল—তোমরা চলে গেলে আমি কিভাবে থাকব?

মেয়েটি বলল—নারায়ণের সেবা তোমারও শেষ হয়ে গেছে। যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও।

—কি করে যাব? সে যে অনেক দূর।

—কোথায়? কোথা থেকে আসছ তুমি? কি তোমার পরিচয়?

—মথুরা থেকে। বলে গোকর্ণ আদ্যোপান্ত যা ঘটেছিল তাদের সব বলল।

—মথুরা? আহা, তুমি মথুরার মানুষ। ওদেরই মধ্যে একজন বলল—আমাদের কি ভাগ্য। মথুরায় যাবার মনে মনে খুব ইচ্ছে ছিল। তুমি যাবে? আমি তোমার যাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

গোকর্ণ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। কতদিন মা-বাবাকে দেখেনি। ওঁরা সব কেমন আছে? শুক কি করছে। মন তার খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

মেয়েরা বলল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আমরাও যাব। তবে সকলের সামনে কিন্তু আমরা বের হব না।

গোকর্ণ তাতেই সম্মত হল।

সঙ্গে-সঙ্গে এক দিব্য-বিমান এল। গোকর্ণ দেখল বিমানে কত সব অপূর্ব সামগ্রী।

একটি মেয়ে বলল—এগুলি তোমাদের মথুরার রাজার উপহার। তাঁকে দেবে। ওঠ, যাওয়া যাক।

বলা-মাত্রই ফুলপরীদের নিয়ে গোকর্ণ সেই দিব্য বিমানে উঠল।

আদিগন্ত শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে দিব্য-বিমান এক সময় মথুরার রাজবাড়িতে এসে নামল। বিমান থেকে বেরিয়ে এল গোকর্ণ। রাজা গোকর্ণকে বিলক্ষণ চিনতেন। হারিয়ে গেছে শুনে তাঁরও মনে একটু দুঃখ হয়েছিল। এখন দেখে সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর গোকর্ণ বিমান থেকে সেই সব অপূর্ব সামগ্রী এনে রাজার হাতে তুলে দিল। রাজার সঙ্গে সভাসুদ্ধ সেসব জিনিস দেখে তো অবাক। সকলেই খুব প্রশংসা করতে লাগল।

খানিক বাদে গোকর্ণ রাজাকে বলল—রাজা, এখান থেকে সবাইকে চলে যেতে বলুন। শুধু আপনি একা থাকবেন। আপনাকে আর একটা অপূর্ব জিনিস দেখাব।

রাজার হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে সভাসদরা সভা ছেড়ে চলে গেল। চারিদিকে কড়া পাহারা পড়ে গেল যাতে কেউ না আসতে পারে।

রাজা সম্পূর্ণ একা আছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে গোকর্ণ তাঁকে দিব্য বিমানের কাছে নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিমানের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সেই ফুলপরীরা। রাজার মঙ্গল কামনা করল, আর মথুরা দেখানোর জন্য গোকর্ণকে সাধুবাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিমান নিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মহানন্দে তিনি বললেন—গোকর্ণ, তুমি ধন্য। তোমাকে আমি কি দেব?

কিছু ভেবে না পেয়ে রাজা তাকে খুশিমত অনেক গ্রাম, নগর, প্রান্তর, আরো অনেক কিছু দিয়ে বসলেন। গোকর্ণ যেন মথুরার দ্বিতীয় রাজা হয়ে গেল।

মা-বাবা বহুদিন পর ছেলেকে পেয়ে মহাখুশি। ওঁদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এল। মথুরায় যেন এক মহোৎসব পড়ে গেল।

গোকর্ণ শুককে বুকে তুলে নিয়ে কত আদর করল তার ঠিক নেই। সকলকে শুনিয়ে বলল—আমার যা কিছু সবই আমার এই ছেলে শুকের জন্য।

শুকের ভালভাবে থাকার জন্য গোকর্ণ সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করে দিল। শুক সেখানে থেকেই একদিন গুরুদেবের কথামত দেহত্যাগ করে মুক্তি পেল।

অপুত্রক গোকর্ণও অনেকগুলি পুত্রসন্তান পেল। বৃদ্ধ বসুকর্ণ আর সুশীলার আনন্দে মন ভরে উঠল।

আজও গোকর্ণের কথা কেউ ভোলেনি।



নারদীয় পুরাণ

দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার অন্যতম ব্রহ্মজ্ঞানী মানসপুত্র সনৎকুমারের এই পুরাণকথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস পরে এই কথা সংগ্রহ করে শিষ্য সূতকে শোনান। সূত পরবর্তীকালে তীর্থ-পর্যটনে বেরিয়ে নৈমিষারণ্যে এসে শৌনক-প্রমুখ ঋষিদের কাছে তা ব্যক্ত করেন। নারদ প্রথম এই কথা বলেছিলেন বলে এর নাম হয়েছে নারদীয় পুরাণ।

ভগবান শ্রীহরি, বিষ্ণু বা নারায়ণের ওপর ভক্তি এবং স্থির বিশ্বাস রেখে চললে শেষে শুভই হয়। সব কিছুর শেষ কথাই হল ভক্তি—ভগবান বিষ্ণুর কাছে মনে কোন দ্বিধা না রেখে আত্ম-সমর্পণ। যে তা করতে পারে, সেও ভক্তির মতই দুর্লভ। এই পুরাণ স্পষ্টাক্ষরে এই কথাই বলেছেন—'ত্যজ দুর্জন সংসর্গম্। ভজ সাধু সমাগমম্।। কুরু পুণ্যং অহোরাত্রম্। স্মর বিষ্ণু সনাতনম্।'—অর্থাৎ দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ করবে। সাধুজন বা সজ্জনের সঙ্গ সব সময় করবে। দিবারাত্র পুণ্যকাজ (যাতে বিশ্বের মঙ্গল হয়) করবে। আর সনাতন বিষ্ণুকে স্মরণ করবে।

মার্কণ্ডেয় মুনির ইতিকথা

বহুকাল আগে শালগ্রামক্ষেত্র নামে একটি স্থান ছিল। সেখানকার বন-জঙ্গল, মাটির এমন গুণ ছিল, যে একবার গিয়ে পড়লেই মনে ধর্মভাব জাগত। মন থেকে অশান্তি দূর হয়ে যেত। সে স্থান ছেড়ে চলে আসার ইচ্ছে জাগত না। মনে হত, এখানে বসেই সারা জীবন ভগবানের নাম-গান করে কাটিয়ে দিই। যে স্থানের গুণ এমন, তাকে বলে তীর্থক্ষেত্র। একেই বলে তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। শালগ্রামক্ষেত্র ছিল এমনি এক তীর্থক্ষেত্র। কত মুনি-ঋষি যে এখানে বসে সাধনা করতেন, তার আর ইয়ত্তা নেই।

মৃকুণ্ড নামে এক মুনি ছিলেন। স্ত্রী নিয়ে সংসারে বাস করতেন। কিন্তু সংসারের মধ্যে থাকলেও তাঁর স্বভাবটি ছিল অন্য ধরনের। মুনি তিনি। অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বেদ থেকে শুরু করে এমন কোন শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল না যা তাঁর আয়ত্তে ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞ হলেই যে সবাই ধর্মপথে থাকবে, এমন তো কোন স্থিরতা নেই। শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে পড়তে নানা প্রশ্ন যখন মাথায় জাগে, উত্তর খুঁজে পান না, তখন অনেকে তার ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যান। মৃকুণ্ড মুনির কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অসীম। তাই তিনি কখনো কোন কারণে বিচলিত হতেন না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে ধর্মপথেই থাকতেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন সতী-সাধ্বী। স্বামী যাতেকোন কারণেই ধর্মচ্যুত হয়ে না পড়েন, তার দিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। গৃহী মানুষের যা ধর্ম, তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। নিত্য ভগবান বিষ্ণুর পুজো, অতিথি সেবা, মানুষ মাত্রেই সকলকে সমান চোখে দেখা, কারো ওপর কোন কারণেই হিংসা, রাগ না করা, সকলেই যাতে সুখে শান্তিতে থাকে তার চেষ্টা করে যাওয়া—এইসব ধর্ম-কর্ম নিয়েই তাঁদের দিন কাটত।

সুপণ্ডিত মৃকুণ্ড। স্বভাবেও ভারি মধুর। মনটিও উদার। এটুকু তিনি ভালভাবেই জেনেছেন যে, সৃষ্টির সবখানেই ভগবান আছেন। তিনিই চোখের সামনে রয়েছেন নানা রূপে। আকাশ-মাটি-গাছ-লতা-পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-মানুষ-অসুর—সব, সব কিছুই তাঁর এক এক রূপ। তাঁর ঐশ্বর্যের শেষ নেই। যাঁর এত ঐশ্বর্য, সেই রাজাধিরাজ দেখতে কেমন ? তাঁকে কি এই চোখে একবার দেখা যায় না ? তিনি কি সব সময় এই সবের আড়ালে থাকেন ?

মুনির মনে এই প্রশ্ন জাগার সঙ্গে সঙ্গেই আসে উত্তর—কে বললে এই চোখে তাঁকে দেখা যায় না ? এক মনে ভক্তিভরে তাঁকে ডাকলে, তিনি কি আর দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন ? আকাশে ঘুড়ি ওড়ে। মানুষের হাতেই তো তার সুতো। লাটাই-এ সুতো গুটিয়ে ঘুড়িকে নিচে নামাতে গেলে বাতাস তাকে এদিক ওদিক এলোমেলো করে দেয় ঠিকই, তবুও এক সময় ঘুড়িকে নিচে নেমে আসতেই হয়। মন হল সেই লাটাই, চিন্তা হল সেই সুতো। মনে যদি তাঁকে ঠিক ঠিকভাবে টেনে আনা যায়, তাহলে তিনি কি আর দূরে থাকতে পারেন ? ভক্তিভরে তাঁকে ডাকলে তিনি অবশ্যই দেখা দেন, কাছে আসেন।

উত্তর যখন পেয়ে গেছেন, মুনিকে তখন পায় কে ? নিরালা, প্রায় নির্জন শালগ্রামক্ষেত্রে এসে তিনি বিষ্ণুর তপস্যায় মনকে একমুখী করলেন। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে একমাত্র বিষ্ণুর চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই তাঁর মধ্যে রইল না। তাঁর একটিই মাত্র আকাঙ্ক্ষা—সেই সর্বশক্তিমান, যাবতীয় কিছুর স্রষ্টা ঐশ্বর্যময় ভগবান বিষ্ণুকে একবার নিজের চোখে দেখে জীবনকে ধন্য করবেন।

এভাবে তপস্যা করতে করতে মৃকুণ্ডমুনির যে কতদিন কেটে গেল, তার কোন হিসেব নেই। বছরের পর বছর ধরে কত বছর যে কেটে গেল। দেখা আর মেলে না। মুনিরও ক্লান্তি নেই, বিরাগ নেই। বরং যত দিন যায়, মুনির মন তত বেশি একাগ্র হয়ে ওঠে। মন যত একাগ্র হয়, তত বেশি তেজ বাড়ে। এটাই স্বাভাবিক। আগুনে যত কাঠ পড়বে, আগুন তত লকলক করে উঠবে, উত্তাপ গনগনে হয়ে উঠবে। চারদিকে তার সেই তাপ ছড়িয়ে পড়বে। মৃকুণ্ড মুনির মনেরও এখন সেই অবস্থা। মনকে সংযত রেখে বিষ্ণুর ধ্যান করতে করতে তার মনও সেই আগুনের চুল্লি হয়ে উঠেছে। চারদিকে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভক্তের আকুতি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে কাঁপিয়ে তুলতে শুরু করেছে। ক্ষীরসমুদ্রে বিষ্ণু কিন্তু তখনো চুপচাপ বসে। আগুনের তাপে দুধটি মরতে মরতে তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে থাকা জলটুকু যতক্ষণ একেবারে শেষ না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ কি আর ক্ষীরের দেখা মেলে ?

দেবলোকে থাকেন দেবতারা—ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন, বরুণ প্রমুখ। অনেক সাধনা করে দেবরাজ্যে তাঁরা এক একজন অধিপতি হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকেন। সকলেই তাঁদের শ্রদ্ধা করেন, পুজো করেন। কারণ ভগবানের করুণায় তাঁরা সব অমর হয়ে গেছেন। নানা সুখভোগের মধ্যে থাকলেও কিন্তু তাঁরা সব সময়ই একটু ভয়ে ভয়ে থাকতেন। বিশেষ করে মর্ত্যের কাউকে কঠোর তপস্যা করতে দেখলে ভয়ে তাঁদের বুক কেঁপে উঠত। ভগবান তপস্যায় তুষ্ট হয়ে হয়ত এমন বর দিয়ে বসবেন যে, তাঁদের কারো সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেবরাজ্যে তাঁরাই তো দেবরাজ হন, যাঁদের সাধনা একেবারে অসাধারণ।

মৃকুণ্ড মুনির তপস্যাও ক্রমশ সেইরকম অসাধারণ হয়ে উঠতে দেখে দেবতারা চমকে উঠলেন। ভয়ও পেয়ে গেলেন। মুনি কেন যে এমন কঠোর তপস্যা করছেন কে জানে ? তাই দেবতারা আর স্থির থাকতে না পেরে ক্ষীরসমুদ্রের ধারে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

দেবতাদের দেখামাত্রই ভগবান বিষ্ণু বললেন—বুঝতে পেরেছি কেন তোমরা এভাবে ছুটে এসেছ। শোন, মৃকুণ্ড কোন পদের অভিলাষ নিয়ে তপস্যা করছে না। তাই তোমাদের কারোর পদচ্যুত হবার কোন ভয়ই নেই। সেদিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার ভক্তরা কারো কোন ক্ষতি করার জন্য তপস্যা করে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন দেবতারা। ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে আবার দেবলোকে ফিরে এলেন।

মৃকুণ্ড মুনির তপস্যা একদিন শেষ হল।

যেদিন ভগবান বিষ্ণু দেখলেন, মৃকুণ্ড এবার দুধটি মরে ক্ষীর হয়েছেন, ভাব আর ভক্তির মধ্যে মিশে গেছেন, সেদিন তিনি ক্ষীরসমুদ্র থেকে এসে শালগ্রামক্ষেত্রে মুনিকে দেখা দিলেন।

—মৃকুণ্ড, চোখ মেলে দেখ, আমি এসেছি। অপূর্ব তোমার সাধনা। অসাধারণ তোমার ভক্তি।

কানের কাছে যেন মিষ্টি সুর বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখ খুলে মুনিবর বিস্ময়ে হতবাক। এ কি দেখছেন তিনি! পদ্মের পাপড়ির মত দুটি চোখ। তা দিয়ে যেন কত স্নেহ ঝরে পড়ছে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতবসন। মুখে মৃদু হাসি। কি অপরূপ! দেখতে দেখতে মৃকুণ্ডর চোখ জলে ভরে উঠে। সত্যিই তাহলে তিনি দেখা দেন! সত্যিই তাহলে তিনি মনের ইচ্ছা পূরণ করেন! সুপণ্ডিত হয়েও এই মুহূর্তে তিনি যে কিভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন, খুঁজে পান না।

বিষ্ণু বললেন—মৃকুণ্ড, আমায় তুমি ডাকছিলে। এই তো আমি এসেছি। বল, কি তোমার কামনা?

মৃকুণ্ড বললেন—ভগবান, অধম আমি কি চাইব আপনার কাছে? আপনার দর্শন পেয়েছি, এই তো আমার সবার সেরা চাওয়া-পাওয়া। আপনার তো অজানা কিছু নেই প্রভু। কৃপা করে এই অধমকে আপনি দেখা দিয়েছেন। আর তো আমার কিছু চাওয়ার নেই।

বিষ্ণু বললেন—মৃকুণ্ড, ভক্তের কাছে আমি বাঁধা। তোমার ভক্তির কাছে আমি কি ধরা না দিয়ে থাকতে পারি? যারা আমার ভক্ত, তারা যে আমার আত্মীয়। আত্মীয়কে ছেড়ে কেউ কি থাকতে পারে? তুমি আমার সেই আত্মীয়। তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? মুনি, ঘরে যাও। আমি তোমারই আত্মজ হয়ে থাকব।

এই বলে ভগবান বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন।

মৃকুণ্ডর সে কি আনন্দ! ভগবান হবেন তাঁর আত্মজ! নারায়ণ হবেন তাঁর সন্তান! তাঁরই পুত্ররূপে তিনি থাকবেন তাঁরই ঘরে। ঠিকই শুনেছেন তিনি। একটুও ভুল শোনেননি।

ঘরে ফিরে স্ত্রীকে সব বললেন। তারপর মনের আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। কবে তিনি আসবেন। তার কথা তো মিথ্যা হবার নয়।

দেখতে দেখতে দিন-মাস-বছর গেল। বছরের পর আরও বছর গেল।

একদিন সত্যি সত্যিই ঘর আলো করা একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হল। ছেলেকে দেখে মৃকুণ্ডর মন দুলে উঠল। পিতৃস্নেহ যেন উত্তাল হয়ে উঠল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন ছেলেকে, আর ভাবেন, তাহলে শেষে তিনি এলেন! ঠিক সেইরকমই টানা টানা দুটি চোখ, মুখের গড়ন। দেখলে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। স্নান-খাওয়া, এমনকি সব কিছু ভুলে সারা দিনরাত আদর করতে ইচ্ছা যায়। সেই তো কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ! মৃকুণ্ড ছেলের নাম রাখেন মার্কণ্ডেয়।

মা-বাবার কোলে কোলে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে শিশু। তারপর হামাগুড়ি, টালমাটাল পায়ে চলা। একটু একটু করে চোখের সামনে যত বড় হয়ে ওঠে মার্কণ্ডেয়, তাঁকে দেখে ততই অবাক হন মা-বাবা। যথাসময়ে ছেলের উপনয়নও তাঁরা দিয়ে দিলেন। তারপরই মা-বাবা আরো অবাক হয়ে দেখলেন, ছেলে চলে গেল তপস্যায়। বাধা দিলেন না কেউই।

কিশোর মার্কণ্ডেয় শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। শুরু করলেন নিদারুণ যোগ-সাধনা। কার সাধ্য সেই সাধনা থেকে তাঁকে বিরত করে। জন্মসূত্রে তিনি যে মহাযোগী, অবাক হয়ে তাই সবাই দেখল। আর মা-বাবা! তাঁরা তো আগে থেকেই জানতেন যে তাঁদের পুত্র, পুত্র হলেও নির্বিকার যোগী সম্রাট, স্বয়ং যোগী।

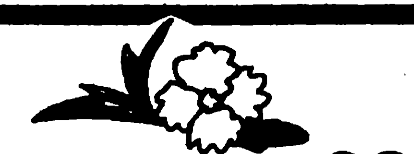
বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে যোগ সাধনায় মার্কণ্ডেয়র যে কতকাল কেটে গেল,,তার খবর তিনিও রাখেন না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ইতিমধ্যে কত যে পরিবর্তন হয়ে গেছে, তাও তিনি জানেন না। জানতেও পারেননি, কবে তাঁর মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন তাঁকে রেখে চলে গেছেন। ইতিমধ্যে জগৎ-বিধাতা ব্রহ্মারও যে দিন ফুরিয়ে রাত এসেছে, তাও তিনি জানতে পারেন নি।

ব্রহ্মার রাত মানে প্রলয়। তখন সমগ্র বিশ্বকে জল গ্রাস করে। মাটি, গাছপালা, জীবজন্তুর কোন চিহ্ন থাকে না। সর্বত্র জল, জল আর জল। গোটা পৃথিবীটা যেন দারুণ মহাসমুদ্র। সেই জলের ওপর ঘুমঘোরে ভেসে বেড়ান একমাত্র নারায়ণ। এই ঘুমঘোরকে বলে যোগনিদ্রা। রাত ফুরিয়ে আবার যখন ভোরের আলো ফুটে ওঠে, ব্রহ্মা তখন আবার সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

মার্কণ্ডেয় যখন যোগের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন, তখনই ব্রহ্মার রাত্রি জল হয়ে বিশ্বকে গ্রাস করেছে। বিশ্বের সব কিছু প্রলয়ে তলিয়ে গেছে। যোগনিদ্রায় একমাত্র ভেসে আছেন নারায়ণ। আর ঠিক সেভাবেই শুকনো কুটোর মত ভেসে ছিলেন মার্কণ্ডেয়। নারায়ণ যতদিন সেভাবে ছিলেন, মার্কণ্ডেয়ও ততদিন সেভাবে কাটিয়েছিলেন। দিনের আলোয় ব্রহ্মা যখন আবার সৃষ্টির কাজ শুরু করেছিলেন, মার্কণ্ডেয় তখন ধ্যান ভেঙে সেই আশ্চর্য সৃষ্টি কাজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। সেই মাটি, গাছপালা, জীবজন্তুতে আবার সব আস্তে আস্তে বিশ্বে ভরে গেল।

মার্কণ্ডেয়ও হলেন মহামুনি, মহাজ্ঞানী। বিধাতার ইচ্ছাতেই তিনি সংহিতা, পুরাণ রচনা করেছিলেন, যার সঙ্গে তুলনা চলে এমন কোন গ্রন্থ আর নেই।

মার্কণ্ডেয়কে তাই অনেক বলেন দ্বিতীয় নারায়ণ।



বাহু রাজার কাহিনী

অহঙ্কার।

অহঙ্কারের মত শত্রু মানুষের আর দ্বিতীয় নেই। সে যে মানুষকে কত নিচে নামিয়ে আনে, তা ভাবতেও পারা যায় না। যৌবন, ধন, প্রভুত্ব কিছুই চিরকাল স্থায়ী থাকে না। জোয়ার এলে নদী যেমন কানায় কানায় ভরে ওঠে, আবার ভাঁটা এলে তার কিছুই থাকে না,

এমনকি নিজের যেটুকু থাকে, সেটুকুও টেনে নিয়ে যায়, এগুলোও ঠিক তাই। যখন আসে তখন আসতেই থাকে—প্রচুর থেকে সুপ্রচুর। তখন যদি নিজেকে কেউ সংযমের মধ্যে না রাখতে পারে, নিজের চরিত্র এবং বিবেককে ধরে রাখতে না পারে, সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে তো ফেলেই, পশুরও অধম হয়ে যায়। সব হারিয়ে তখন সে ভিখারি হয়ে যায়—যত বড় পণ্ডিতই সে হোক না কেন। তা যদি না হত তাহলে অমন ধর্মজ্ঞ, বীর, বাহু-রাজার কি আর অমন দুর্গতি হত?

বাহু—সূর্যবংশের একজন সুবিখ্যাত রাজা—অসামান্য প্রতাপশালী বৃকরাজার আত্মীয়। বাহুবলের তুলনা তো বাহুরাজার ছিলই না, সেই সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য, পৌরুষ, ধন-সম্পত্তির তুলনাও ছিল না। প্রচুর পড়াশুনা তাঁর ছিল—সব শাস্ত্রই তিনি ভালভাবে জানতেন। নিজে বিদ্বান, জ্ঞানী। তাই তাঁর রাজ্যে জ্ঞানী-গুণীর যথেষ্ট সমাদর ছিল। রাগী হলেও ন্যায়-অন্যায় বোধ তাঁর খুব ভালই ছিল। তাই অন্যায়কারীরা রাজাকে বেশ ভয় করে চলত। বলতে গেলে তাঁর রাজ্যে অন্যায় একরকম ছিলই না।

সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি রাজা বাহু। সাতটি দ্বীপেই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি কত বড় রাজা। ফলে তাঁর রাজত্বে অনাহারে কাউকে মরতে হত না, দুর্ভিক্ষ ছিল না, অসাধু জনের উৎপাত ছিল না। সবাই মান মর্যাদা নিয়ে থাকত—বসবাস, চাষআবাদ করত। সকলেই তাঁকে ভালবাসত, সমীহ করে চলত। আর তিনিও চলতেন ঠিক তেমনি ভাবেই। লক্ষ্য রাখতেন সবসময় যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়। সকলকেই স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন।

এমন যে রাজা, দুর্ভাগ্য, একবার তাঁর পতনও শুরু হল। যৌবন, ধন, প্রভুত্ব হঠাৎ তাঁকে দারুণভাবে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলল।

যৌবন মানুষকে সাধারণত উদ্দাম করে তোলে। রাজা আর ধীর স্থির থাকতে না পেরে উদ্দাম হয়ে উঠলেন। এমনি উদ্দাম হলেন যে, ভাল মন্দ বিচারের শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেললেন।

ধন প্রচুর হয়ে উঠলে সংযমী, ধার্মিক মানুষরা তা সৎ কাজে লাগায়। লোভকে দমন করে নির্লোভ হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। রাজা বাহুও প্রথম প্রথম ধনসম্পদ যা ব্যয় করতেন নিঃস্বার্থভাবে তা প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, মুনি ঋষিদের ধর্মপথে এগিয়ে যাবার জন্য। সেই রাজাই হঠাৎ একদিন বেমালুম বদলে গেলেন। নিজে ভোগ বিলাসে মেতে উঠলেন। লোভী হয়ে উঠলেন। সৎ কাজে যা ব্যয় করতেন, তা বন্ধ করে দিলেন। আরো কিসে ধনসম্পদ বাড়ে, সেদিকে সচেষ্ট হলেন। প্রজাদের ওপর চাপ পড়ল। করের বোঝা চাপল, বোঝা বাড়ল। প্রজারা 'হায়....হায়' করে উঠল, তবু পরিত্রাণ নেই। রাজা প্রজাদের ধনসম্পদ কেড়ে নিতে লাগলেন আর নিজের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করতে লাগলেন। ফলে অসৎ বন্ধু-বান্ধব অনেক জুটে গেল। আমোদ-আহ্লাদ-ফূর্তির মাত্রা বেড়ে গেল। শাস্ত্রবুদ্ধি মাথায় উঠল। প্রজারা নিজের ঘর সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। পৃথিবীর রাজা বলে কথা। সুতরাং সেরকম মেজাজে, সেরকম ঠাটে-বাটে কি না থাকলে চলে; বিশেষ করে ধনবল, জনবল, বাহুবল—সব বলই যখন আছে। তিনি রাজা। তিনি কেন সকলকে সমীহ করে চলবেন? বরং উল্টোটাই ঠিক। ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষি, পণ্ডিত—যিনিই হোন, তাঁরা তাঁকে সমীহ করবেন, সম্মান দেখাবেন। ফলে রাজ্যে ব্রাহ্মণদের যে মর্যাদা ছিল, মুনি-ঋষিরা যে সম্মান পেতেন, তাও আস্তে আস্তে যেতে বসল। বাহুরাজা দারুণ অহঙ্কারী হয়ে উঠলেন। মদমত্ত হাতির মত গর্ব-দম্ভে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলেন। প্রজারা মনে খুবই কষ্ট পেতে লাগল। মুনি-ঋষিরা বুঝলেন, রাজার এবার পতন আসন্ন।

রাজার অত্যাচার যেদিন চরমে উঠল, সত্যিই সেদিন তাঁর পতন ঘটল।

যাদবদের মধ্যে হৈহয় আর তালজঙ্ঘ বংশের রাজারা কোনদিনই বাহুরাজাকে সুনজরে দেখত না। তাঁর শক্তির কাছে এঁটে উঠতে না পেরে বাধ্য হয়ে তাঁর সামন্ত রাজা হয়ে ছিল। কিন্তু সব সময়ই তারা সুযোগের সন্ধানে থাকত।

সুযোগ তাদের হাতের মুঠোয় চলে এল। দেখল, বাহু রাজার রাজ্যে প্রজারা আর আদৌ রাজার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বরং তার হাত থেকে যেন পরিত্রাণ পেতে পারলে বাঁচে। এর চেয়ে বড় সুযোগ শত্রুপক্ষের কাছে আর কিছু হতে পারে না। রাজার ওপর যখন একবার তারা বিরক্ত হয়েছে, বিশ্বাস হারিয়েছে, তখন, রাজা আক্রমণ করলে, কোনমতেই তারা রাজাকে সাহায্য করবে না।

হৈহয় আর তালজঙ্ঘের রাজারা গোপনে শক, যবনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একদিন সুবিপুল শক্তি নিয়ে হঠাৎ বাহুরাজার রাজ্য আক্রমণ করে বসল।

ইতিমধ্যে রাজার অনেক শক্তিই অপচয় হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, তবুও তিনি তাঁর সৈন্যবল নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। একমাস ধরে দু পক্ষে দুরন্ত লড়াই হল। বাহুরাজার যত ক্ষমতা ছিল, সব নিয়ে তিনি যুদ্ধ করলেন। কিন্তু পারলেন না। একদিন হেলায় যিনি সপ্তদ্বীপের রাজা হয়েছিলেন, এখন শত্রুপক্ষের কাছে কুটোর মত ভেসে গেলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা তাঁর সেনাদের মারল, আত্মীয়পরিজনদের ধ্বংস করল। রাজ্য ছারখার করে দিল। এমনকি অমন যে রাজপ্রাসাদ, তাতেও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। সব হারিয়ে একমাত্র রানীকে নিয়ে রাজা গোপনে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। বাহুরাজার এতদিন যারা প্রজা ছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রাজার দুঃখে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না।

একদিন যিনি ঘাসে বিছানো কোমল পথ ছাড়া হাঁটেন নি, ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছাড়া কোথাও যাননি, নরম বিছানা ছাড়া কোথাও শোননি, আজ সেই বাহুরাজার কি দুর্দশা! কাঁটা ঘেরা বনজঙ্গল, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে গা-হাত-পা। কাঁকর আর ধুলো তাঁর বিছানা। বুনো ফল খাদ্য। মাথায় রোদ, পেটে খিদে, খাদ্যাভাবে দুর্বল শরীর—বনজঙ্গল ভেঙে রাজা রানী হেঁটে চলেছেন, যদি কোথাও একটু আশ্রয় মেলে। তার ওপর রানী আবার ছিলেন সন্তানসম্ভবা। তাঁর যে আরো কষ্ট!

আঘাত না এলে মানুষের চৈতন্য আসে না। প্রচণ্ড এই আঘাত পেয়ে বাহুরাজারও আস্তে আস্তে চৈতন্য ফিরতে লাগল। কেন এমন হল? জ্ঞান-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধি—সবেতেই তো তিনি অপরাজেয় ছিলেন। তবে এমন নির্মম পরাজয় তাঁর ঘটল কেন? বনপথে একমাত্র তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই যে, আলাপ-আলোচনা করবেন। মন্ত্রণাদাতা এমন কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে

মন্ত্রণা করবেন। কিন্তু তিনি তো আর মূর্খ ছিলেন না। তাই নিজের মনেই আলোচনা করতে করতে বুঝতে পারলেন তাঁর এই পতনের কারণ। ক্ষমতা তাঁকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিল। ন্যায়পথ ছেড়ে সেই মোহের বশে তিনি অন্যায় পথ ধরেছিলেন। তাই এই বিপর্যয়। ভাগ্যের হাতে তাই এত বিপর্যয়। ভাগ্যের হাতে তাই এই নিদারুণ প্রহার। সর্বহারা ভিখারি। এখন এই জীবনকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

চলতে চলতে ক্রমশই শরীর অবসন্ন হয়ে আসে। খিদেয়-তেষ্টায় কাতর হয়ে ওঠেন। মনে ধিক্কার জাগে—কি হবে ছাই এই জীবন রেখে? এটাকে শেষ করে দেওয়াই ভাল। বুনো বিষ, গাছ-গাছড়ার তো আর অভাব নেই। কিন্তু পরক্ষণেই রাজার মন যেন বলে ওঠে—মোহ-পাপের ফল ভোগ করছ। আত্মহত্যা করলে যে নরকে ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। রাজা নিরস্ত হন। কিন্তু রানী? তিনি সহ্য করতে না পেরে স্বামীর অসাক্ষাতেই এক গর (বিষ) ফল খেয়ে বসলেন। কিন্তু আশ্চর্য। অমন বিষফলেও তাঁর প্রাণ গেল না। মনে মনে রানী ভগবানকে ডেকে বলেন—আর কত কষ্ট দেবে, প্রভু? আমাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে কি দেখবে?

ঘুরতে-ঘুরতে রাজা রানীকে নিয়ে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় উপবনের মত বেশ পরিচ্ছন্ন এক জায়গায় এলেন। বনজঙ্গল কেটে গাছপালাগুলোকে এখানে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। মাঝে বিশাল এক সরোবরে নীল জল টলমল করছে। ফুটে আছে লাল শালুক। ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস সাঁতার দিচ্ছে জলে। কি শান্ত আর মনোরম! নিশ্চয়ই কোন ঋষির তপোবন হবে।

অন্য কিছু তখন আর ভাববার অবকাশ ছিল না রাজার। সরোবর আর তার জল দেখে মন চনমন করে উঠল। তেষ্টা যেন আকণ্ঠ পেয়ে বসল।

রাজা আর রানীকে সরোবরে নামতে দেখে ক্যাঁচ-ম্যাচ, কিচির-মিচির করতে করতে বালিহাঁসরা উড়ে গেল। সরোবরের ওপরই নিজেদের মধ্যে কত কথা বলতে বলতে তারা কয়েকটা পাক দিল। রাজা যদি পাখিদের ভাষা বুঝতে পারতেন, তাহলে হয়ত সেখানেই তিনি মর্মাঘাতে তখনই মারা যেতেন।

রানীকে নিয়ে রাজা সরোবরে নামলেন। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন। আঃ, কি আরাম! সব ক্লান্তি যে দূর হয়ে গেল। পেট ভর্তি করে জল খেলেন। তেষ্টা মিটল। উঠে এসে গাছের ফলমূল খেলেন। খিদে মিটল। সব দিক থেকেই শান্ত হলেন। তারপর তারই তীরে বাসা বাঁধলেন—ছোট্ট এক পর্ণকুটির।

দিন যায়, মাস যায়—রাজার মনে বাড়তে থাকে অনুশোচনা। হায়, কি ছিলাম, আর আজ মোহের বশে কি হলাম? কেন, কেন এমন ফাঁদে পা দিলাম? এ কি দুর্দৈব! আস্তে-আস্তে সেই স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। ভেতরে দিনরাত অনুশোচনার জ্বালা।

একদিন সেই অবস্থাতেই শীর্ণদেহ বাহুরাজা প্রাণত্যাগ করলেন।

একা রানী। রাজাকে হারিয়ে অকূল সমুদ্রে পড়লেন। প্রিয়জনকে এভাবে হারিয়ে এক দফা খুব কাঁদলেন। তাপর মনস্থ করলেন—রাজা যখন গেলেন, তখন তাঁরই বা আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি? স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেবেন।

কাঠ-কুটো যোগাড় করে চিতা সাজালেন রানী। কোন রকমে স্বামীর মৃতদেহটা চিতায় তুললেন। আগুন ধরালেন। চিতা জ্বলে উঠল। এবার ঐ আগুনে আত্মাহুতি দেবেন রানী।

ঠিক সেই সময়েই সেখানে ঔর্ব ঋষি এসে হাজির হলেন। মহাযোগী ঔর্ব ঋষি। ঐ তপোবনটা ছিল ঐ ঋষিরই। সব সময়ই তিনি যোগে থাকতেন। সেই অবস্থাতেই এখানে ঐ কাণ্ড দেখে তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসে বাধা দিলেন রানীকে।

রানী ঋষিকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—এ ছাড়া সতীর আর কি পথ আছে, বলুন?

ঋষি বললেন—রাজা তাঁর কাজের প্রায়শ্চিত্ত করে স্বর্গে গেছেন। অনুশোচনার মত প্রায়শ্চিত্ত আর নেই। কিন্তু মা, তোমার ভাবী সন্তান তো কোন অন্যায় করেনি। তোমার জীবন গেলে তোমার সন্তানেরও যে জীবন যাবে। তাতে যে তোমার মহাপাপ হবে, মা।

রানী বুঝলেন। সত্যিই তো, তাঁর ভাবী সন্তান কি অপরাধ করেছে?

ঋষি বললেন—মা, দুঃখ কোরো না। জগৎসংসারের এটাই নিয়ম। তোমার সন্তানের জন্য তোমায় বেঁচে থাকতে হবে। আর তুমি আমার আশ্রমেই থাকবে।

এর ওপর আর কথা চলে না। স্বামীর সৎকার সেরে রানী ঋষির আশ্রমেই থেকে গেলেন।

তারপর যথাসময়ে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হল। ঔর্বঋষি বললেন—মা, গরফল খেয়েও এই শিশুকে নষ্ট করতে পারেনি। বরং সেই গরই (বিষই) একে পুষ্ট করে তুলেছে। তাই আমি এর নাম রাখলাম—সগর। দেখো, একদিন এই ছেলেই তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবে।

ঔর্ব ঋষির কথাই সত্য হয়েছিল। একদিন এই সগরই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

(ব্রহ্মপুরাণে 'সগর রাজার কাহিনী ও ভগীরথের তপস্যা'র কাহিনী আছে।)

সুমতি রাজার কাহিনী

সত্যযুগের কথা।

সুবিখ্যাত সোমবংশে সুমতি নামে এক রাজা ছিলেন। নামেও যেমন, কাজেও তেমনি। মতিভ্রম তাঁর কখনো ঘটেনি। আর মতিচ্ছন্ন বুদ্ধিও কোনদিন মুহূর্তের জন্যও তাঁর মাথায় আসেনি। অথচ তিনি ছিলেন সসাগরা সপ্তদ্বীপের রাজা। কি করলে সকলের মঙ্গল হবে, তারই জন্য তিনি দিবারাত্র সজাগ থাকতেন। অত বড় একজন রাজা, যাকে বলে সম্রাট, হয়েও তিনি এমনি নির্লোভ আর নিরহঙ্কার ছিলেন যে, তার তুলনা চলে না। নারায়ণের পুজো না করে, অতিথির সেবা না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। রানী সত্যমতিও ঠিক তাই। যেমন রাজা, তেমনি রানী। প্রতিদিন সকালে উঠে রাজকাজে যাবার আগে তিনি নারায়ণের মন্দিরে যেতেন। তাঁর হাতে থাকত চারটি ছোট ধ্বজা। নারায়ণের মন্দিরের

চারদিকে আগে তিনি সেই চারটি ধ্বজা পুঁততেন। তারপর সেগুলো সমেত মন্দির প্রদক্ষিণ করে নিবিষ্ট মনে নারায়ণের পুজো করতেন। আর রানী! তিনি যে অত বড় এক রাজার রানী, সে সময় তাঁর সে খেয়ালই থাকত না। নারায়ণের উদ্দেশ্যে সুরে-সুরে, তালে-তালে তিনি নৃত্য করতেন। নৃত্য করতে করতে বিভোর হয়ে যেতেন। সব কিছু ভুলে যেতেন। যতক্ষণ রাজার পুজো চলত, ততক্ষণ চলত তাঁর নৃত্য। যাঁরা দেখতেন, তাঁরাও আবেগে ভেসে যেতেন। নিজের মনেই নিজেরা নেচে উঠতেন। এভাবে নারায়ণের পুজো সেরে, অতিথিকে খাইয়ে তারপর নিজেরা খেতেন। স্বভাবটিও ছিল তাঁদের এমনি মিষ্টি, কেউ কোনদিন কোন কারণেই তাঁদের উপর বিরক্ত হতো না। তাই বিশাল রাজ্যে কোথাও কোন অশান্তিও ছিল না।

রাজা-রানীর এই অসাধারণ নারায়ণ ভক্তির কথা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সকলেই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

সে সময় বিভাণ্ডক নামে এক মুনি ছিলেন। মস্ত বড় মুনি। যেমন ভক্ত, তেমনি জ্ঞানী। তাই তাঁর শিষ্যও ছিল প্রচুর।

রাজা-রানীর এই ব্যাপার তাঁরও কানে পৌঁছল। নিজের চোখে দেখবার জন্য একদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একদিন তিনি রাজা সুমতির কাছে এসে হাজির হলেন।

মুনিবরকে দেখেই রাজা সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। অতি বড় সৌভাগ্য না থাকলে কি এমন মুনির আগমন ঘটে, দর্শন মেলে? কি সৌভাগ্য আজ তাঁদের! মুনির সঙ্গে শিষ্যদেরও অভ্যর্থনা জানালেন রাজা। আসামাত্রই তিনি নিজ হাতে সকলের পা ধুইয়ে দিলেন। বিভাণ্ডক মুনিকে একটি সুন্দর সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে সেই জলটা মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—আজ আমার জীবন ধন্য হল। তারপর প্রচুর পরিমাণ ফল-মূল দিয়ে তাঁদের সেবা করলেন। বিশ্রামের জন্য সুন্দর আয়োজন করে দিলেন।

একজন সম্রাটের এই রকম আচরণ দেখে মুনির সঙ্গে শিষ্যরাও বেশ বিস্মিত হলেন। বিনয় এক দুর্লভ রত্ন। সহজে তা পাওয়া যায় না। রাজা সেই অপরূপ বিনয় কিভাবে পেলেন? একমাত্র নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত ছাড়া তো এমন বিনয় কেউ পেতে পারে না।

যাই হোক, সশিষ্য মুনিবর সেদিন রাজা সুমতির অতিথি হয়েই থেকে গেলেন।

পরদিন সকাল হতেই বিভাণ্ডক মুনি রাজা-রানীর সেই অপূর্ব নারায়ণ পুজো দেখলেন। রাজা ঠিক সেভাবেই মন্দিরের চারদিকে ধ্বজা পুঁতলেন, প্রদক্ষিণ করে নিবিষ্ট মনে পুজোয় বসলেন। রানীও সেইরকম সব কিছু ভুলে ভাবাবেগে নৃত্য করলেন। সে এক অপূর্ব পরিবেশ।

পুজোর শেষে রাজার আতিথ্য গ্রহণ করে মুনিবর রাজসভায় এলেন। রাজা তাঁকে একটি সোনার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বসলেন নিচে, তাঁর পায়ের কাছে।

তারপর বললেন—মুনিবর, বলুন, আমি আপনার কি সেবা করতে পারি? বলুন, আপনার কি কাজ আমায় করতে হবে?

বিভাণ্ডক বললেন—রাজা, তোমার ভক্তির তুলনা নেই। তোমার বিনয় আমায় মুগ্ধ করেছে। শুধু একটাই প্রশ্ন তোমার কাছে, নারায়ণের পুজো করতে গিয়ে তুমি এভাবে ধ্বজাই বা পোঁত কেন, আর রানী ঐভাবে নৃত্যই বা করেন কেন?

বিভাণ্ডক মুনির প্রশ্ন শুনে রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন—মুনিবর, আপনাকে একটা সত্য ঘটনা বলব, শুনুন। এখনও সেই ঘটনা যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

নিস্তব্ধ সভা। থমথম করছে। রাজা সুমতি বলতে শুরু করলেন:

বহুকাল আগে শূদ্রকুলে মাল নামে একটি ছেলের জন্ম হয়েছিল। মা-বাবার একমাত্র ছেলে। খুবই ভালবাসতেন তাকে। দেখতে দেখতে ছেলেটি যখন বড় হয়ে উঠল, মা-বাবার চোখের ঘুম নষ্ট হয়ে গেল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যে শান্তিটুকু পেতেন, তাও নষ্ট হয়ে গেল। কুসংসর্গে পড়ল মাল। মদ-ভাঙ খেতে শুরু করল, চুরি করতে আরম্ভ করল। অপকর্ম ছাড়া সে এক মুহূর্তও থাকত না। মা-বাবা কিছু বলতে এলে তাদেরই তিরস্কার করত। লাঞ্ছনা করত। মানুষ হিসেবে তাঁরা খুবই ভাল ছিলেন। সকলেই তাঁদের ভালবাসতেন। কেউ ভাবতেও পারেনি যে, তাঁদের ছেলে এমন কুলাঙ্গার হবে, লম্পট হবে। অনেক বন্ধু-বান্ধব তার তখন। বাড়ি থেকে কিছু না পাক, চুরি করে যা রোজগার হতো, তাতে মহাফূর্তিতে তাদের দিন চলে যেত। দেখতে দেখতে ছেলেটা এমনি বেপরোয়া হয়ে উঠল যে, কাউকে গ্রাহ্যও করত না। আশেপাশের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। গ্রাম-গঞ্জের মানুষজন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তার মা-বাবার কাছে আসতে লাগল। অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েও মা-বাবা কিন্তু ছেলেকে শোধরাবার কম চেষ্টা করলেন না। কিন্তু সবই যখন বিফল হল, ছেলেকে তাঁরা বাড়ি থেকে দূর করে দিলেন। মালী ভাবল, মা-বাবা থাকতে না দিল তো বয়েই গেল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তার কি কিছু কম আছে। থাকবার জায়গা ঠিকই মিলবে। আর ফূর্তি যেমন চলছে, তেমনই চলবে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা তাকে ঠাঁই দিল না। সবচেয়ে আশ্চর্য হল মালী, যখন সে দেখল, তার সেই সব বন্ধুবান্ধবরাও তাকে পাত্তাই দিল না।

মা-বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, বাড়ি ফেরার পথও বন্ধ। এখন কোথায় সে যায়? থাকবার মত একটা আশ্রয় তো চাই। আর পেটের জন্য খাদ্যও চাই। ক্ষোভে-দুঃখে মালী শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢুকল এক বনে। দুরন্ত খিদে। কি খায়? শেষে একটা মৃগ শিকার করে কোনরকমে তারই মাংস খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাল। কাছেই একটা জলাশয় দেখে সেখান থেকে জল খেয়ে তেষ্টা মেটাল। শরীর সুস্থ হল। তারপর ভাবতে বসল। ভাবতে গিয়েই মালীর মাথা গেল ঘুরে। ছি···ছি··। কেন সে মা-বাবার কথা শোনেনি? কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। লোকালয়ে ফিরে মুখ দেখানো আর সম্ভব নয়। ঠিক করল, জীবনটা এই বনেই শিকার করে কাটিয়ে দেবে। এই ভেবে সে আরও বনের ভেতর ঢুকতে লাগল। ঢুকতে ঢুকতে এল গভীর বনে। যেখানে এল মালী, দেখল সেখানে একটা বিষ্ণুমন্দির রয়েছে। মন্দিরটা জীর্ণ হয়ে গেছে। চাতালে ধুলোবালির পাহাড়। একসময় নিশ্চয় এখানে কেউ ছিল। চলে গেছে। তারপর এখানে অনেক কাল নিশ্চয়ই কেউ আসেনি। তা নইলে মন্দিরটার এ দশা হবে কেন?

মালী ঠিক করল, এখানেই আস্তানা করে থেকে যাবে। ভাবাও

ষা, কাজেও তাই। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পাশেই ছোট্ট একটা চালাঘর তৈরি করে ফেলল। তারপর সেখানেই থাকতে শুরু করল। মানুষ মাত্রেই কাজ চাই। বিষ্ণুমন্দিরের চাতালে যত ধুলো-বালি জমেছিল, আস্তে আস্তে সেগুলো সাফ করার কাজে লেগে গেল। আর সকালে তীর-ধনুক নিয়ে বের হতো শিকারে, সন্ধ্যায় ফিরত। নেশার অভ্যাস তো তার ছিলই। তাই খুঁজে খুঁজে সে গাছ বের করল, যার রস খেলে তার নেশা হয়। নেশা, শিকার আর মন্দির পরিষ্কার এই নিয়েই সেই মহাবনে মালী একাই থেকে গেল। কোন মানুষের মুখ আর সে দেখতে পেল না।

এভাবে কেটে গেল বিশটা বছর।

একদিন নিত্যদিনের মত মন্দির পরিষ্কার করছে মালী। হঠাৎ কোথা থেকে একটা মেয়ে সেখানে এসে হাজির হল। তাকে দেখেই মালী প্রথমে দারুণ চমকে উঠল, এ কি কোন মানুষ না পেত্নী। এক মাথা রুক্ষ এলোমেলো চুল। শুকনো ফ্যাকাসে মুখ, লিকলিকে হাত, শিরা দেখা যায়, চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে। পরনে ময়লা ট্যানা, তাও শতছিন্ন। দেখলেই মনে হবে, বহুকাল খায় নি। এখন যাকে পাবে বুঝি তাকেই খাবে।

বনে একা থাকতে থাকতে মালীর সাহসও তো কম বেড়ে যায়নি। তাই সে একটুও ভয় না পেয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল—কে তুমি? কোথা থেকে এখানে এলে?

কোনরকমে মেয়েটি জবাব দিল—আমার নাম কোকিলিনী। আমার জন্ম ব্যাধকুলে। সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কোথাও ঠাই-কুল না পেয়ে বনে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি।

মালী নিশ্চিন্ত হল, তাহলে কোন পেত্নী নয়, খাঁটি মানুষ। বহুদিন পর মানুষের মুখ দেখে, দুটো কথা বলতে পেরে মনে মনে খুব তার আনন্দ হল।

আগে কোকিলিনীকে নিজের চালাঘরে নিয়ে মাংস-রস-জল ভালভাবে খাইয়ে তাকে চাঙা করে তুলল। তারপর জিজ্ঞেস করল—বল তো, কেন তোমাকে সবাই তাড়িয়ে দিয়েছে?

কোকিলিনী বলল—সে আর কি বলব। এখন বুঝতে পারছি, আমার ভাগ্যের দোষ। ছোটবেলা থেকেই আমি খুব মুখরা ছিলাম। যাকে যা বলা উচিত নয়, তাই বলতাম। তাই সকলের কাছে আমি ক্রমশই অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। আমার মা-বাবা এক ভাল ব্যাধ ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। কিন্তু স্বভাবের দোষ যাবে কোথায়? খুঁটিনাটি নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া আমার লেগেই থাকত। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে রাগের মাথায় নিজের স্বামীকেই খুন করে বসলাম। তারপর গ্রামের সবাই এই এক কাপড়ে আমাকে গ্রাম থেকে বের করে দিল। সেই থেকে এই বনে বনেই ঘুরছি।

শুনতে শুনতে মালী ভাবল, আগে সে যা ছিল, মেয়েটিও ঠিক তাই। ফলে সে যেমন তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব হারিয়েছে, মেয়েটিরও এখন সেই দশা।

বলল—তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না। তুমি এখানেই থাক। বলে মালী তাকে বিয়ে করে নিজের স্ত্রীর মতই রেখে দিল।

দেখতে দেখতে মেয়েটিও সুস্থ, চাঙা হয়ে উঠল। মাংস আর রসের তো অভাব নেই।

একদিন মারাত্মক এক ঘটনা ঘটল। তারা দুজনেই প্রচুর রস খেয়ে দারুণ মাতাল হয়ে পড়েছে। বাহ্যজ্ঞান এক রকম প্রায় নেই-ই। নেশার আনন্দ তাদের প্রায় উন্মত্ত করে তুলল। মালী করল কি, পরনের টেনা ছিঁড়ে ধ্বজা তৈরি করে বিষ্ণু মন্দিরে আপন খেয়ালে নাচতে শুরু করল। কোকিলিনীও চুপ করে বুঁদ হয়ে বসে থাকল না। সেও নাচতে শুরু করল। নাচতে-নাচতে তার টেনা যে কখন খসে পড়ে গেছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। একে প্রচণ্ড নেশা, তার ওপর ঐ উদ্দাম নাচ। দুজনেই এক সময় দম হারিয়ে পড়ে মরে গেল।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যমদূতরা এসে পাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাদের নিয়ে গেল যমরাজের কাছে। যমরাজ ডাকলেন চিত্রগুপ্তকে। খতিয়ে দেখতে বললেন, এদের পাপের পরিমাণ কত। তারপর শাস্তির বিধান। চিত্রগুপ্ত অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন—দুজনেই মহাপাপী। তবু যেভাবে তাদের প্রাণ গেছে, সেটাও ভাববার বিষয়। যমরাজের কাছে গিয়ে চিত্রগুপ্ত সব কথা খুলে বললেন। মহাপাপী হলেও একটা কাজ মৃত্যুর আগে তারা করেছে। বিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজা নিয়ে নৃত্য করেছে। শুনেই যমরাজ বললেন—চিত্রগুপ্ত, দিব্য বিমানে এদের বিষ্ণুলোকে পাঠিয়ে দাও। শেষ জীবনে যে কাজ না জেনেও এরা করেছে, তাতে এদের আমার অধিকারে রাখার কোন ক্ষমতাই নেই।

মালী আর কোকিলিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দিব্যবিমানে বিষ্ণুলোকে চলে গেল। সেখানে সুদীর্ঘকাল সুখভোগ করে তারা এল ব্রহ্মলোকে। সেখানেও বেশ কিছুদিন কাটাবার পর মালী এল ইন্দ্রলোকে। সেখানে কিছুকাল দেবরাজের সম্মানভোগ করে সম্প্রতি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছে। কিন্তু পূর্ব সংস্কার আর যমরাজের কথা তারা ভুলতে পারেনি।

কাহিনী শেষ করে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে রাজা সুমতি বললেন—মুনিবর, সেই মালীই এখন আমি রাজা সুমতি। আর কোকিলিনী এখন রানী সত্যমতি। দেবতার অনুগ্রহে পূর্ব জীবনের স্মৃতি আমরা ভুলিনি।

অপূর্ব এই কাহিনী শুনে বিভাণ্ডকের সব সংশয় দূর হয়ে গেল। রাজাকে ধন্যবাদ আর আশীর্বাদ জানিয়ে আবার শিষ্যদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ভদ্রশীলের কাহিনী

আমাদের জীবনের সঙ্গে তিথির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে এক একটি তিথি। প্রতিপদ থেকে শুরু করে একেবারে তা শেষ হয় অমাবস্যায়, যখন ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে যায়। আর একবার সেই প্রতিপদ থেকেই শুরু করে শেষ হয় পূর্ণিমায়, যখন আর কোথাও রাতের অন্ধকার থাকে না। পূর্ণচন্দ্র দিনের আলো নিয়ে আকাশে জ্বলজ্বল করে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা—তিথি। তেমনি একটি তিথি হল একাদশী। হিন্দুরা এই তিথিটিকে সাধারণভাবে মেনে চলে। শরীরকে কোন খাদ্য না দিয়ে

শুকিয়ে রাখে। পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকে। মন-প্রাণকে নির্মল রাখার চেষ্টা করে। তিথিটি চলে গেলে স্নান পুজো সেরে আবার আহার গ্রহণ করে। শাস্ত্রে বলে, এই ব্রত যারা পালন করে, তারা মহাভাগ্যবান হয়। একজন্মে না হোক, পরজন্মে ভগবানের করুণা লাভ করে জীবনকে ধন্য করে।

নর্মদা নদী, যার আর এক নাম রেবা, খুব পবিত্র নদী। গঙ্গার মত এর তীরেও ছিল মুনি-ঋষিদের তপোবন, সাধু-সন্তদের বসবাস। গালব নামে এক মুনি সপরিবারে এই নদীর তীরেই থাকতেন। শাস্ত্রজ্ঞানী, সুপণ্ডিত—তার ওপর নিষ্ঠাবান বিষ্ণুভক্ত। নদীতে স্নান, পূজার্চনা না করে তিনি জল পর্যন্ত খেতেন না। ধার্মিক জীবন যাপন করতেন। সব সময় সদাচারে থাকতেন।

এক সময় তাঁদের ঘর আলো করে একটি ছেলে হল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা-বাবার মনে আনন্দের আর শেষ নেই। কি মিষ্টি দেখতে।

দেখতে দেখতে ছেলেটি বড় হয়ে উঠতে লাগল। কোল ছেড়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। চলতে চলতে চলা সহজ হয়ে গেল। মা-বাবা দেখেন আর আনন্দে ফুলে ফুলে ওঠেন। মা-বাবা তার নাম রাখলেন ভদ্রশীল।

আরো একটু বড় হল ছেলে। সমবয়সী বন্ধুরা এসে জুটল। শৈশব থেকে সবেমাত্র তখন কৈশোরে পা দিয়েছে ভদ্রশীল, মা-বাবা দেখলেন, তাঁদের ছেলে যেন আর পাঁচজনের মত নয়। বেশ একটু ব্যতিক্রম। খেলাধুলো, হৈ-হট্টগোল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। বন্ধুদের নিয়ে মাটি দিয়ে বিষ্ণুর মূর্তি গড়ে বন থেকে ফুল তুলে এনে তার পুজো করে। মা-বাবা দেখে অবাক হন। এতটুকু ছেলে, এরই মধ্যে এমন সুন্দর মূর্তি গড়া শিখল কোথা থেকে। আর পুজো! কি করে মন্ত্র বলে পুজো করে, তা তাঁরা জানেন না, কিন্তু দেখলেই মনে হয়, স্বয়ং বিষ্ণু যেন তাঁদের ছেলেটির ওপর ভর করেছেন, চোখের জল দিয়ে তিনিই যেন তাকে দিয়ে তাঁর পুজো করিয়ে নিচ্ছেন।

নদীতে স্নান সেরে ভদ্রশীল ফিরতেই মা ডাকলেন—বাবা, কত বেলা হয়ে গেল, খাবি না? কখন থেকে তোর জন্য খাবার নিয়ে বসে আছি। এত বেলা করে খেলে পিত্তি পড়বে যে!

ভদ্রশীল মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—মা, তুমি যেন কি? আজ যে একাদশী, তা কি তোমাদের মনে নেই?

মা শুনে অবাক হলেন। তাঁর স্বামী একাদশী করেন, নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত পালন করেন, তিনি জানবেন না, আজ একাদশী? কিন্তু এতটুকু ছেলে একাদশীর মর্ম কি বুঝবে যে ব্রত পালন করবে?

বললেন—জানি বাবা। কিন্তু এখন থেকে কি তোমার এই সব বার-ব্রত করা উচিত? আর একটু বড় হও।

ভদ্রশীল বলল—বড় তো আমি হয়েই গেছি মা। এখন আমি একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ। একাদশী ব্রত না করলে যে মহা পাপ হবে মা।

ছেলেকে মা আর কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেন না। ছেড়ে দেন।

পাশেই ছিলেন গালব মুনি। সবই শুনেছেন। শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ তো দূরের কথা, এখনও তিনি তার রীতিমত পাঠাভ্যাসও শুরু করেননি। অথচ এই শাস্ত্র তাঁর ঐটুকু ছেলে শিখল কোথা থেকে, জানল কেমন করে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে তিনি ভদ্রশীলকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—বাবা, তুমি এত কথা জানলে কোথা থেকে?

ভদ্রশীল বলল—সবই ভগবান বিষ্ণুর কৃপায়, বাবা। যদি আপনার একান্তই জানতে ইচ্ছা জাগে; আমি বলতে পারি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে দিতে হবে। আপনি আর কোনদিনই কোন বিষয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে পারবেন না।

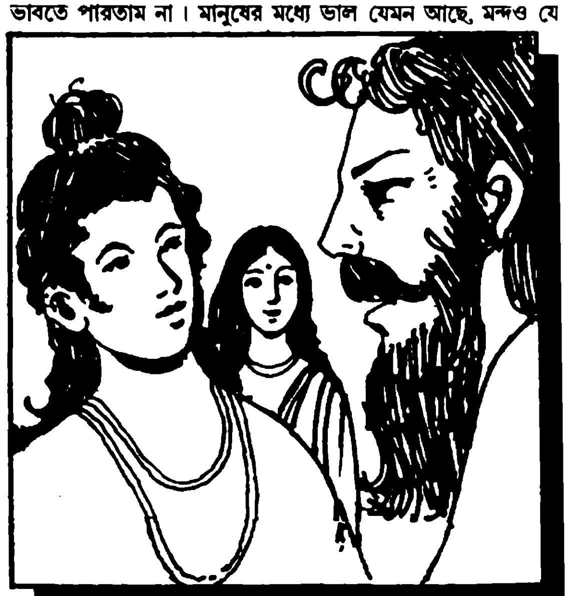
—আমি কথা দিলাম। বললেন গালব।

—ভগবানের অনুগ্রহে আমি জাতিস্মর হয়েই জন্মগ্রহণ করেছি বাবা। আমার পূর্বজন্মের সব কথাই আমার মনে আছে। আমি আপনাকে আমার সেই জন্মের কথাই বলছি, শুনুন।

সোমবংশের রাজা বর্ষকীর্তির নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন। আমিই সেই বর্ষকীর্তি। মহা ভাগ্যবলে পৃথিবীতে আপনার মত মহামুনির পুত্র হয়ে তাঁরই নির্দেশে জন্মগ্রহণ করেছি। তখন আমার গুরুদেব ছিলেন দ্বিতীয় নারায়ণ মহর্ষি দত্তাত্রেয় (শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর এক অবতার)। আমি তাঁরই অনুশাসন মেনে জীবন এবং রাজ্য দুই-ই পরিচালনা করতাম। গুরুদেবের অনুগ্রহে আমি তখন এতই শক্তিমান যে ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ কেউই আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করার সাহস পেতেন না। অভাবের মুখ আমার প্রজারা কখনো দেখেনি। বসুন্ধরা ছিল সব দিক থেকে সমৃদ্ধ। আমিও খুশি। চলতাম মনের আনন্দে। স্বয়ং ঈশ্বর যার সহায় হন তার আবার ভাবনা কি? সকলেই যেমন এ কথা ভাবে, আমিও তাই ভাবতাম। তিনি যে মাঝে মাঝে আবার পরীক্ষা করেন, এ কথা কোনদিনই ভাবিনি।

বেশ কিছুকাল রাজত্ব করার পর একদিন সেই পরীক্ষা আমার শুরু হল।

আমায় সবাই ভালবাসত। আমিও কোনদিন কাউকে খারাপ ভাবতে পারতাম না। মানুষের মধ্যে ভাল যেমন আছে, মন্দও যে



ঠিক সেই ভাবে আছে, তা বোধ হয় তখন আমি জানতাম না। মন্দর স্বভাব যে ভালর চেয়েও মধুর, তাও আমি জানতাম না। পরিজন-পার্ষদ যেমন ছিল, বন্ধু বান্ধবও ছিল সেই রকম।

মহা সুখে রাজত্ব চলেছে। সুতরাং অন্য কিছু ভাববার নেই। বেশির ভাগ সময় তাই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নানা আলোচনাতেই কাটাতাম। কিন্তু তারাই একটু একটু করে কখন যে আমার মহা সর্বনাশ ঘটিয়ে বসল, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক থাকা সত্ত্বেও তা আমি বুঝতে পারলাম না। আস্তে আস্তে নানা নেশায় মেতে উঠলাম। প্রজারা, মন্ত্রীরা দেখে হয়ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারত না। যদিও বা কেউ কিছু বলতে আসত, তাকে আমি তুড়ি দিয়ে এমনভাবে উড়িয়ে দিতাম যে, আর সে মুখ খুলতে পারত না। মূর্খ তো আর ছিলাম না। বেদশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে যেভাবে জীবন যাপন করলে পরিণামে সুখ হয়, আমি সেদিক থেকে দেখতে দেখতে অনেক দূরে সরে এলাম। লোভ পেয়ে বসল, কাম আমাকে গ্রাস করল। আপাত সুখকেই তখন আমি মহা সুখ মনে করে তাতে গা ভাসিয়ে দিলাম। রাজা যা করবেন, প্রজারাও তারই অনুকরণ করবে। রাজ্য জুড়ে প্রজারাও আমার মত সমস্ত কাজকর্ম শুরু করে দিল। অন্যায় কাজ শুরু করে দিল। ধর্মকর্ম লোপ পেয়ে গেল। পৃথিবীর অত শস্যসম্পদ যেন কোথায় তলিয়ে গেল। লুট-তরাজ অবাধে বেড়ে উঠতে লাগল। মুনি-ঋষিদের শান্তি গেল। আমি তখন কিন্তু এসব আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না। একেই বলে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। আমি তখন মেতে উঠেছিলাম শিকারের নেশায়।

রাজা-রাজড়ারা মাঝে-মধ্যে মৃগয়ায় যান। এটা তাঁদের ছিল খানিকটা আমোদ আর রাজকাজের বাইরে কিছুটা সময় কাটানোর ব্যাপার। সামান্য কিছু শিকার করে আবার তাঁরা রাজ্যে ফিরে আসতেন। আগে আমিও তাই করতাম।

এবারে কিন্তু মৃগয়ায় গিয়ে আমার মনে হল, নিরীহ বন্য পশুগুলোকে হত্যা করায় আমার যেন দারুণ আনন্দ হচ্ছে। আমার এক এক শরে তারা কেমন পড়ে যাচ্ছে, ছটফট করছে, গোঙাচ্ছে—তারপর এক সময় মরে যাচ্ছে। দেখে কি যে ভাল তখন লাগত, সে আর কি বলব! মেতে উঠলাম শিকারের নেশায়। অন্যদিকে তখন আর তাকাবার সময় নেই। কত মৃগ যে মারলাম, তার আর ইয়ত্তা নেই। তবু আশা মিটল না। খিদে-তেষ্টা ভুলে, বন থেকে বনে মৃগের পিছু ধাওয়া করতে লাগলাম। রাজ্যজয়ের পর শত্রুসেনাদের মারার জন্য সৈন্যরা যেভাবে পিছু নেয়, ঠিক সেই রকম। প্রাণভয়ে বাচ্চাদের নিয়ে মৃগ ছুটছে, পিছনে শর নিয়ে আমি। দলবল, বন্ধু-বান্ধব থেকে সরে এসে আমি তখন একা।

চোখের সামনে আর কোন মৃগ নেই। আড়ালে-আবডালেও লুকিয়ে নেই যে পিছু নেব। ঠিক সেই সময় মনে হল, আমি যেন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সকাল থেকে পেটে দানা-পানি নেই, খাবার কথা মনেও ছিল না। এখন খিদেয়-তেষ্টায় বেশ কষ্ট বোধ করতে লাগলাম। সঙ্গে খাবার নেই যে খাব, জল নেই যে তেষ্টা মেটাব। হাঁফাতে হাঁফাতে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। ফুরফুরে বাতাস, গাছের ছায়া, খানিকটা ক্লান্তি দূর হল। কিন্তু খিদে-তেষ্টা?

এদিক ওদিক তাকাতে দেখলাম, আমি প্রায় বনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। একটু দূরেই একটা সরোবর। তার তীরে বেশ কিছু নারী-পুরুষ জড়ো হয়ে কি যেন করছে।

কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আমি যে এই দেশের রাজা, তখন আমাকে দেখে কেউ বুঝতেও পারল না, চিনতেও পারল না। দেখলাম, ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি গড়া, পুজোর যোগাড় নিয়েই সবাই ব্যস্ত।

খুব ক্লান্ত লাগছিল। সরোবর দেখে স্নান করার ইচ্ছেটা খুব প্রবল হয়ে উঠল। তাই আগে বেশ ভালভাবে অনেকক্ষণ ধরে স্নান সারলাম। আমার সব অবসাদ যেন কেটে গেল। বেশ কিছুটা সুস্থির হলাম। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। দেখলাম সকলে এক একটা প্রদীপ জ্বালাল। তারপর কেউ বসল পুজোয়, কেউ যোগাড় নিয়ে রইল, কেউ বা বসে বসে দেখতে লাগল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি এগিয়ে গিয়ে ওদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—এখানে এসব আপনারা কি করছেন?

সে বলল—আপনি কোথাকার মানুষ?

—কেন? এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি বললাম।

—আজ একাদশী। ভগবান বিষ্ণুর বড় প্রিয় দিন। সারাদিন উপবাসে থেকে সারা রাত জেগে তাঁর পুজো-অর্চনা করলে যে তিনি কৃপা করেন, আপনি জানেন না?

শোনামাত্রই মনের কোণে কোথায় যেন আমি একটু ধাক্কা খেলাম। ঠিকই তো। পেটে তখন আমার খিদের দাবানল। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সব খাক করে দিচ্ছে। তবু আমি চুপ করে তাদেরই এক পাশে বসে রইলাম। সব সহ্য করে, রাত জেগে তাঁদের ব্রত উদ্‌যাপন দেখলাম। আহা, কি নিষ্ঠা!

রাত ফুরোল। সকাল হল। ব্রত শেষ হল। কেউ আমাকে প্রসাদ দিতে এসেছিল কিনা জানি না। আমার প্রাণবায়ু তখন বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি মারা গিয়েছিলাম।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আসে যমরাজের অনুচর। মিশমিশে কালো বিকটাকার অনুচররা এসে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে যমরাজার কাছে নিয়ে গেল। যমরাজা তখনি তাঁর খাজাঞ্চি চিত্রগুপ্তকে ডেকে বললেন—বর্ষকীর্তির সব কিছু বেশ ভালভাবে খতিয়ে দেখ, একে কোন্ নরকে পাঠানো যাবে।

চিত্রগুপ্ত আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর সামনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর আবার যমরাজের কাছে এনে বললেন—প্রভু, বর্ষকীর্তি নিজে জ্ঞানবান হয়েও যে অনাচার করেছে, একটা মূর্খ পাষণ্ডও তা করে না। মহাঘোর নরকই ওর যোগ্য জায়গা। তবে, একটা কথা প্রভু, ওর মৃত্যু একরকম একাদশী ব্রত করেই হয়েছে। সারাদিন অভুক্ত থেকে, রাত জেগে বিষ্ণুর পুজো দেখতে দেখতেই সে মরেছে। এখন আপনিই বলুন, একে কোন্ নরকে পাঠাবেন।

যমরাজ শুনে বললেন—চিত্রগুপ্ত, বর্ষকীর্তির ওপর আমাদের আর কোন অধিকার নেই। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ভগবান বিষ্ণুর অতি প্রিয় একাদশী ব্রত যারা পালন করে, জেনে রাখো, তাদের কখনো আমার পুরীতে এনো না। তাদের স্থান বিষ্ণুলোকে।

এই বলে যমরাজ আদেশ করা মাত্রই এক দিব্য বিমান এল। যমরাজ সসম্মানে আমাকে তাতে তুলে দিলেন। আমিও চলে গেলাম বিষ্ণুলোকে। বহুকাল সেখানে থেকে মহাসুখভোগ করে এলাম ইন্দ্রলোকে।

তারপর তাঁরই ইচ্ছায় এই ভারতভূমিতে আপনার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলাম।

নিজের এই পূর্বজন্মের কাহিনী শেষ করে ভদ্রশীল বলল—বাবা, পূর্বজন্মের এই স্মৃতি তাঁরই অনুগ্রহে আমি ভুলতে পারি নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের সেই একাদশী ব্রত, বিষ্ণুপুজো, মৃত্যুর পর যমরাজ ধর্মরাজের কথা, সব কিছু এখনো যেন আমার চোখের সামনে ভাসছে।

এমন পুত্র যার ঘরে জন্মায় সে কি ধন্য না হয়ে পারে।

মুনিবর গালব নিজেকে মহা ভাগ্যবান মনে করে ভদ্রশীলকে পুত্ররূপে পেয়ে যেন ঈশ্বরেরই কৃপা অনুভব করলেন।

দেবমালির উপাখ্যান

কোটি····কোটি বছর আগের কথা।

এখনকার বৈবস্বত মনুর মত, তখন পৃথিবীর মহারাজাধিরাজ ছিলেন রৈবত। এই কাহিনী তখনকার।

দেবমালি নামে সে সময় এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। যথেষ্ট জ্ঞানী গুণী। ব্রাহ্মণ এবং সুপণ্ডিত হয়েও কাউকে ঘৃণা করতেন না, অবহেলা করতেন না। সকলকেই ভালবাসতেন, সমাদর করতেন। কেউ কোন দুঃখে কষ্টে পড়লে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, প্রাণ দিয়ে সাহায্য করতেন। সেই কারণে সকলের কাছেই তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। সকলে ভালও বাসতেন তাঁকে।

এত বড় শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত হয়েও, তাঁর কিন্তু ধন দৌলতের ওপর লোভ ছিল প্রচুর। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যে যা দান করত, তিনি তা নির্বিবাদে নিতেন। এমন কি, যাদের কাছ থেকে দান নেওয়া শাস্ত্রের নির্দেশে ব্রাহ্মণদের কখনই উচিত নয়, সেই চণ্ডালদের কাছ থেকেও হাত পেতে তিনি দান নিতেন। তাতেও তাঁর ধনের ওপর আকাঙ্ক্ষা মিটত না। তাই ব্রাহ্মণের যে কাজ করা একেবারেই উচিত নয়, গোপনে সেই মাদক রসও তিনি বিক্রি করতেন।

কালক্রমে তাঁর দুটি ছেলে হল। বড় যজ্ঞমালি, আর ছোটর নাম সুমালি। ধীরে ধীরে ছেলেদুটিও বড় হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণের ছেলে, যথাসময়ে তাদের পৈতেও দিলেন। কিছু শাস্ত্রও তাদের পড়ালেন। তারপর তাদের দিয়েও দান-গ্রহণ করিয়ে নিজে জমাতে লাগলেন। কিন্তু কত জমল, তা তিনি বড় একটা দেখতেন না। শুধু অর্থের পেছনে ছুটেই বেড়াতেন, আর অর্থ এনে জমাতেন।

ছেলেদের বিয়ে দেবার বয়স হল দেখে খুঁজে-খুঁজে ভাল মেয়ে যোগাড় করে বিয়েও দিলেন তাদের।

আরো কিছুকাল এভাবে গেল।

হঠাৎ একদিন মনে হল তাঁর, বয়স হয়েছে। সত্যিই বয়স হয়েছিল। চুলে পাক ধরতে শুরু করেছিল, গায়ের চামড়া আলগা হয়ে এসেছিল। তবুও ধনের ওপর মোহ তাঁর কোনমতে যাচ্ছিল না।

সেই প্রথম তিনি তাঁর জমানো অর্থ নিয়ে গুণে গেঁথে দেখতে বসলেন। দেখলেন, সারাজীবনে একটা মানুষ সাধারণভাবে যা রোজগার করতে পারে না, তিনি তার অনেক বেশি রোজগার করেছেন, খরচ করেন নি কিছুই।

ভাবলেন, আর কেন? সারাজীবন ধরে শুধু তো এরই পিছনে ঘুরলাম। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের কাজ কি করলাম? ছেলেরা যথেষ্ট সাবালক হয়ে উঠেছে। তাদের সংসার তারা ঠিকই চালিয়ে নেবে। এই সর্বনাশা মোহ থেকে যেভাবেই হোক মুখ ফেরাতে হবে। মনে মনে শপথও যেমন নিলেন, কাজেও তাই শুরু করে দিলেন। কেউ দান দিতে এলে তার দান গ্রহণ করতেন না। মাদক রস বিক্রিও বন্ধ করে দিলেন। লোভ যত এগিয়ে আসে ব্রাহ্মণ তত পিছিয়ে যান। বারবার নিজের মনে নিজেকে শুধু বলতে থাকেন—আর নয়···আর নয়। জীবনটা লোভের পেছনে ছুটে বৃথাই গেল। শাস্ত্রের কথা সব ভুলেই গেলেন। এমন জীবনে ধিক্।

এভাবে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একদিন একবারেই কি করবেন, সে বিষয়ে মন স্থির করে ফেললেন। গোপনে ভাঁড়ার থেকে সব অর্থ বের করলেন। দুই ছেলেকে কাছে ডাকলেন। জমানো অর্থকে চার ভাগ করলেন। দু ছেলেকে দু ভাগ দিয়ে নিজের জন্য দু ভাগ রাখলেন। তারপর সেই অর্থ দিয়ে যেখানে সেখানে জলাশয় কাটিয়ে দিতে লাগলেন। দেবমন্দির তৈরি করিয়ে দিতে লাগলেন। এভাবে যখন তাঁর সব টাকা শেষ হয়ে গেল, তখন ছেলেদের হাতে সংসার দিয়ে বনে চলে গেলেন শান্তির জন্য।

সত্যিই সে সময় বনই ছিল শান্তির জায়গা। মহা মহা মুনি-ঋষিরা সেখানে তপোবন করে থাকতেন। সব সময় ধর্মকথা হতো। নানারকম আলোচনা হতো। সে সব শুনতে শুনতে মনও শান্ত হতো।

শান্তি চান দেবমালি। কি করলে এই লোভের, মোহের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার জন্য তখন ছটফট করছে দেবমালির মন। বনে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলেন এক তপস্বীকে। কি শান্ত, সৌম্য মূর্তি! করুণা যেন চোখ-মুখ দিয়ে ঝরনার মত ঝরে পড়ছে। বেশ কিছু শিষ্য তাঁকে ঘিরে, বোধ হয় পাঠ নিচ্ছেন। সকলেই কেমন সুন্দর। তপস্বীকে দেবমালির খুব ভাল লাগল। তপস্বীর নাম হল জানন্তি।

পা-পা করে কাছে এগিয়ে যেতেই জানন্তি মুখ তুলে তাকালেন। শিষ্যরা চুপ করে রইলেন। দেবমালি আরো কাছে গিয়ে প্রণাম জানাতেই তিনিই উঠে আলিঙ্গন দিলেন। দেবমালির মনে হল, তাঁর ভেতরের সব জ্বালা সামান্য এই আলিঙ্গনেই যেন কোথায় দূর হয়ে গেল।

কিছু বলার আগেই জানন্তি বললেন—মুখটা দেখেই বুঝতে পারছি অনেকক্ষণ খাওয়া হয় নি। আগে কিছু সেবা হোক, তারপর কথা হবে।

শিষ্যরাও সঙ্গে সঙ্গে আসন দিয়ে জল-ফল-মূল এনে দেবমালিকে সেবা করল।

সত্যিই দুরন্ত খিদে পেয়েছিল। পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার শেষ করে দেবমালি বললেন—আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম। আমাকে মুক্তির পথ দেখান। সংসারের মোহ-লোভ-বাসনায় এতদিন ধরে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। এবার একটু শান্তি চাই।

জানন্তি মৃদু হেসে বললেন—সংসারে আসলও আছে, নকলও

আছে। সব সময়ই তারা লুকোচুরি খেলছে। একবার আসলকে জাপটে ধরতে পারলে আর কষ্ট ? সংসার তো তখন স্বর্গ। শান্তি দেবার, মুক্তি দেবার মালিক নারায়ণ। তাঁর শরণাপন্ন হও। তাঁরই করুণায় সব জ্বালা দূর হয়ে যাবে।

নারায়ণ—হ্যাঁ নারায়ণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সব কিছুতেই যিনি আছেন, আবার থেকেও নেই। ঠিকই বলেছেন মুনিবর, একমাত্র তিনিই পারেন শান্তি দিতে, মুক্তি দিতে।

দেবমালি নিবিষ্ট মনে তপোবনের এক প্রান্তে বসে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন।

কেটে গেল বেশ কিছুকাল। মন এখন অনেক শান্ত। সেই জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, মোহ নেই, বরং মন যেন তাঁকে পাবার জন্য আরো আকুল হয়ে ওঠে।

একদিন নিবিষ্ট মনে নারায়ণকে স্মরণ করতে করতে হঠাৎ দেবমালির মনে কতকগুলো প্রশ্ন জেগে উঠল : কে আমি ? কোথা থেকে আমি এখানে এলাম ? কেন মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে আমি জন্মালাম ? কি কাজ আমার ? আমি একা, না বহু ?

প্রশ্ন যেমন জাগে নিজের মনে, উত্তরও খোঁজেন দেবমালি নিজের মনেই। শেষে নিরুপায় হয়ে প্রশ্নগুলি নিয়ে হাজির হলেন জানস্তির কাছে।

সব শুনে জানস্তি বললেন—এই তো ! এই আত্মজিজ্ঞাসাই হল শান্তির সিঁড়ি। দেবমালি, সংসারে আমরা আসি আমাদের নিজেদের স্বার্থে নয়, ঈশ্বরের এই সৃষ্টির স্বার্থে। সকলকে ভালবেসে আপন করে নেওয়ার মত সুখ আর নেই। সকলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়াই আমাদের কাজ। আমাদের জন্ম সেই কাজ করার জন্য। আর দেবমালি 'আমি কে' বিরাট এই প্রশ্নের উত্তর তোমায় দেব। অনেক সাধনা করে তা জানতে হয়। আর যেদিন মানুষ তা জানতে পারে, সেদিন তার সব জানা শেষ হয়ে যায়। তার কাছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একাকার হয়ে যায়। সে তখন দেখে, আমিই সেই পুরুষ, আমিই সেই অজর, অমর, শাশ্বত সনাতন। সাধনা কর দেবমালি। সাধনাই 'আমাকে' জানার একমাত্র পথ।

দেবমালি আবার সাধনায় বসলেন—কে আমি ...কে আমি...কে আমি ? জগৎ সংসার ভুলে নিবিষ্ট সাধনা। যেদিন উত্তর পেলেন, মহা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। আমিই ব্রহ্মা, আমিই ঈশ্বর। আমিই আনন্দময় অমৃত।

বিভোর হয়ে দেবমালি শেষ দিন পর্যন্ত তপোবনেই থেকে গেলেন। আর ঘরে ফিরলেন না।

এদিকে তাঁর দুই ছেলে যজ্ঞমালি আর সুমালি যে যার আপন পথে চলতে শুরু করেছিল।

বড় ছেলে যজ্ঞমালি প্রথম থেকেই বেশ একটু ধর্মভীরু। বাবা দেবমালির মত যার-তার কাছ থেকে সে দান নিত না। শাস্ত্র অধ্যয়ন, অনুশীলন, সৎভাবে জীবন যাপন, সকলকে সমান চোখে দেখা, ভালবাসা—এই নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল। বাবা যে অর্থ তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়েই সে সন্তুষ্ট ছিল। ভাল কাজে ব্যয় করত। সঞ্চয় করার কোন প্রবৃত্তিই তার মধ্যে ছিল না।

কিন্তু ছোট ভাই সুমালি ঠিক বিপরীত। আশেপাশের মানুষজন দেখে আর ভাবে—একই বাবার দুই ছেলের মধ্যে এত তফাৎ কিভাবে হয়। একজন চাঁদ, অপরজন বাঁদর। আশ্চর্য !

সত্যিই তাই। সুমালি অল্প বয়স থেকেই উচ্ছন্নের পথে হাঁটতে শুরু করেছিল। বাবার কাছ থেকে ভাগের টাকা পাওয়ার পর তার হাঁটার গতি দুরন্ত বেড়ে গেল। নেশা করা, চুরি করা থেকে বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে যত রাজ্যের অপকর্ম মনের আনন্দে সে করে যেত। এতদিন এসব চলত চুরি করা অর্থে। এবার শুরু হল নিজের অর্থে। মনের মত আরো অনেক বন্ধু জুটে গেল। দাদা বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমল পেল না। স্ত্রী কত কান্নাকাটি করল। তাও বিফলে গেল। বরং মাত্রা আরও বেড়ে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সব অর্থ শেষ। আবার বেপরোয়াভাবে চুরি করে স্বভাবের খোরাক যোগাতে লাগল। গ্রাম-নগরের মানুষের কাছ থেকে এমন সব নালিশ আসতে লাগল যজ্ঞমালির কাছে যে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

একদিন রাতে সুমালি ফিরলে, যজ্ঞমালি তার কাছে গিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই কথায় আছে না—'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী', সুমালিরও তখন সেই অবস্থা। শুনতে শুনতে সুমালি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। দাদাকে তো যার-পর-নাই অপমান করলই, এমন কি কাটারি তুলে এমনভাবে ছুটে এল যে, স্ত্রীর বাধা না পেলে যজ্ঞমালিকে খুনই করে বসত।

নিরুপায় হয়ে যজ্ঞমালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দারুণ মন খারাপ।

রাত কাটল। সকাল হতেই শহরের বেশ কিছু মানুষজন চড়াও হল যজ্ঞমালির বাড়িতে—শয়তান সুমালি কোথায় ? কোথায় সে ? বলতে বলতে আর অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকে সুমালিকে বেঁধে উত্তম মধ্যম প্রহার দিতে শুরু করল। মারের চোটে সুমালির প্রাণ যায় দেখে যজ্ঞমালি আর থাকতে পারল না। ছুটে এসে ভাই-এর অপকর্মের জন্য সকলের হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল। শহরের মানুষ যজ্ঞমালিকে ভালবাসত। তাই সে যাত্রায় সুমালি রেহাই পেয়ে গেল।

গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে যজ্ঞমালি বলল—ভাই, আর কেন ? আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান। অভাব কি আমাদের ? জানি তোমার আর কিছুই নেই। তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তুমি এবার থেকে ভালভাবে থাক।

এই বলে যজ্ঞমালি বাবার দিয়ে যাওয়া টাকার অর্ধেক তাকে দিল।

কিছুদিন সুমালি বাড়িতে সুবোধ হয়ে রইল। তারপর আবার যা ছিল তাই হয়ে গেল। সেই জন্যেই বোধ হয় বলে 'স্বভাব যায় না মলে'। দেখতে দেখতে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নেশা আর অপকর্মে সে টাকাও শেষ হয়ে গেল। শুরু করল এবার রীতিমত ডাকাতি। এখন সে সব শাসনের বাইরে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা ডেকে তাকে দেশ থেকে দূর করে দিলেন। রাজার ওপর তো আর জারিজুরি চলবে না। বাধ্য হয়েই সুমালিকে দেশ ছাড়তে হল। বন্ধু-বান্ধবরা কেউ আশ্রয় দিল না। মনের দুঃখে সুমালি বনে চলে গেল। বনে গিয়ে বুনো জীবন যাপন করতে লাগল। যজ্ঞমালির অন্তর কেঁদে উঠল। কিন্তু আর কিছু করার নেই।

কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। যজ্ঞমালির বার্ধক্য এল।

তারপর একদিন মারাও গেল। বাড়িতে যেদিন যজ্ঞমালি মরল, ঠিক সেই দিনই সুমালিও বনে মারা গেল অকালেই।

মৃত্যুর পর বিষ্ণুর দূতরা দিব্য বিমান এনে যজ্ঞমালিকে শূন্যপথে নিয়ে চলেছে বিষ্ণুলোকে। যেতে যেতে যজ্ঞমালির কানে এল এক করুণ আর্তনাদ। মাঝে মাঝে আর্তচিৎকার। যেন কেউ কাউকে অসহ্য কষ্ট দিচ্ছে, আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠছে। সেই আর্তনাদ কানে আসতেই যজ্ঞমালির মন দুলে ওঠে। আহা, কে এমন ভাবে কাঁদছে? কেন কাঁদছে।

সঙ্গী বিষ্ণুদূতদের জিজ্ঞেস করল যজ্ঞমালি—করুণ স্বরে এমন ভাবে বিলাপ করছে কে?

বিষ্ণুদূতরা বললেন—তোমার ভাই সুমালি। যমদূতদের হাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে করতে নরকে যাচ্ছে।

শুনে যজ্ঞমালি যেমন চমকে ওঠে, তেমনি যেন বুক ফেটে তার কান্না বেরিয়ে আসে। বলে—ভগবান! আমার ভাইকে কি ঐ নরক যন্ত্রণার হাত থেকে কোন রকমেই মুক্ত করা যায় না?

বিষ্ণুদূতরা বললেন—যজ্ঞমালি, তুমি তোমার যোগ্য কথাই বলেছ। তোমার পুণ্যকর্মের শেষ নেই। কিন্তু সুমালি জীবনভর পাপাচার ছাড়া কিছুই করেনি। এতটুকু ভাল কাজ সে কোন দিনই করেনি। নরক যন্ত্রণা যে তাকে ভোগ করতেই হবে। প্রতিটি অপকর্মের যে কি জ্বালা, তা কি তুমি তাকে বুঝতে দেবে না?

যজ্ঞমালি বলল—ভগবান! আমি জানি, অপকর্ম ছাড়া ও জীবনে কিছুই করেনি। তবুও তো সুমালি আমার ভাই। আমি বিষ্ণুলোকে সুখভোগ করব, আর আমার ভাই এখানে কষ্ট পাবে, এতে যে আমি একটুও শান্তি পাব না। যদি ওকে মুক্ত করার উপায় না থাকে, তাহলে আমাকে ওর কাছে যেতে দিন। আমাকে দেখে ও হয়ত একটু শান্তি পেতে পারে।

—তা তো হয় না যজ্ঞমালি। ধর্মরাজ তোমাকে ওখানে ঢুকতেই দেবেন না। সম্মান দেখিয়ে তোমায় সরিয়ে দেবেন, কারণ তুমি বিষ্ণুভক্ত। তবে একটা উপায় আছে। তুমি পূর্বজন্ম থেকে এ জন্ম পর্যন্ত অঢেল পুণ্য সঞ্চয় করেছ। তার এক কণা যদি তুমি তোমার ভাইকে দিতে পার, তাহলে ওর মুক্তি হতে পারে। বলল বিষ্ণুদূত।

যজ্ঞমালি মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাই দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই করুণ আর্তনাদ থেমে গেল। যমদূতরা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। বিষ্ণুদূতরা একই বিমানে সুমালিকেও তুলে নিলেন।

দু ভাই মহানন্দে বিষ্ণুলোকে চলে গেল।



দণ্ডকেতুর কথা

বীতহোত্র একজন হরিভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নর্মদার তীরে অপরূপ এক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে রাজা যজ্ঞধ্বজ তাঁকেই রেখেছেন রাজপুরোহিত করে। নিষ্ঠাভক্তির শেষ নেই ব্রাহ্মণের, পুজোও করেন সেই রকম। বিগ্রহের মধ্যে শ্রীহরি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠেন।

সসাগরা পৃথিবীর রাজা যজ্ঞধ্বজ। তিনি যেন নামেই সম্রাট। রাজ্য তাঁরই নির্দেশে পরিচালনা করেন মন্ত্রীরা। রাজা দিনরাত পড়ে থাকেন মন্দিরে। যেন সেটাই তাঁর সাম্রাজ্য, তাঁর ধনদৌলত, ঐশ্বর্য—সব কিছু। রাজা হয়েও নিজে হাতে নিত্যদিন তিনি মন্দির পরিষ্কার করেন। এই কাজটা তিনি আর কাউকে করতে দেন না। মন্দিরের চাতাল পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে, বিগ্রহের সামনে একটি করে প্রদীপ জ্বেলে দেন। এ ছাড়া আর তিনি কিছু করেন না। এটুকু করার মধ্যেই তাঁর মুখে চোখে ফুটে ওঠে এক অসামান্য তৃপ্তি। এটাই যেন তাঁর রাজকাজ।

রোজই রাজাকে ঐ এক কাজ করতে দেখে, আর মন্দিরে পড়ে থাকতে দেখে বীতহোত্রের মনে খুব কৌতূহল জাগল—ব্যাপার কি? রাজা পুজো করছেন ঠিকই, কিন্তু এ কি ধরনের পুজো? মন্ত্র পড়েন না, বসে বসে তাঁর মত ধ্যান করেন না, আরতি করেন না। শুধু মন্দির মোছা, আর একটা করে প্রদীপ জ্বালা!

কৌতূহল দমন করতে না পেরে একদিন সরাসরি রাজাকে জিজ্ঞাসাই করে বসলেন।

রাজা বললেন—ব্রাহ্মণ, এ রহস্য জানতে হলে একটা বহু পুরানো কাহিনী আপনাকে বলতে হয়। বল্লি, শুনুন ঃ

সময়টা ছিল দ্বিতীয় মনুর কাল। অর্থাৎ তখন আমাদের মনু মহারাজ ছিলেন স্বারোচিষ। সে সময় রৈবত নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী বন্ধুমতীকে নিয়ে এক জায়গায় বাস করতেন। ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে সুপণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। তাই তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ভক্তও ছিল অনেক। অত বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও রৈবত নিজের স্বভাবকে ঠিক রাখতে পারলেন না। অর্থের লোভে পড়লেন। লোভের ফাঁদে পা দিলে যা হয়, তিনিও ক্রমেই তাই হতে লাগলেন। জেনেশুনেও শাস্ত্র-বিরোধী কাজ করতে শুরু করলেন। এমনকি, মাদক রসও বিক্রী করতে

লাগলেন। স্বামী যদি নড়বড়ে হয়ে পড়ে, সংসার কি আর ঠিক থাকে ? বিশেষ করে অর্থ, ধন-সম্পদের লোভ যদি বেশি মাত্রায় পেয়ে বসে, তখন কি আর ধর্ম-অধর্ম জ্ঞান থাকে ? ব্রাহ্মণী বন্ধুমতীরও হল সেই অবস্থা। তিনিও স্বভাব চরিত্র হারালেন। হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেক ভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের সুপথে ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন তাঁদের একটি ছেলেও হয়েছিল। তার নাম ছিল দণ্ডকেতু। মা বাবার দেখাদেখি, সেও ছোট বয়স থেকে দারুণ বখাটে হয়ে উঠেছিল। নেশা তো ধরেছিলই। তার ওপর চুরিবিদ্যে বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিল। আরো একটু যেই বড় হয়ে উঠল, পাড়ার মেয়েদের বাইরে বের হওয়া দায় হয়ে দাঁড়াল।

এসব দেখে শুনে গ্রামের মানুষেরা আর সহ্য করতে না পেরে সপরিবারে রৈবতকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।

কোথায় যাবেন এখন রৈবত। আত্মীয়-স্বজনরাও স্থান দিল না। পত্নী বন্ধুমতী আর পুত্র দণ্ডকেতুকে নিয়ে নর্মদারই তীরে এসে একটা চালাঘর তৈরি করে থাকতে লাগলেন। আর জমানো যা ছিল, তাই দিয়েই কোন রকমে সংসার চালাতে লাগলেন। কলসীর জল কি আর চিরকাল থাকে ? এক সময় সব শেষ হল। রৈবতের শরীর ভেঙে গেল। ব্রাহ্মণী বন্ধুমতীরও সেই অবস্থা। দণ্ডকেতু আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল।

এমন অবস্থায় রৈবতকে ধরল ক্ষয়রোগ। আর তাতেই তিনি মারা গেলেন। প্রচলিত কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। বন্ধুমতীরও অবস্থা সঙ্গীন।

দণ্ডকেতু তখন সবেমাত্র যুবক। জীবনের তার এখনও অনেকখানি বাকি। সে কেন এত কষ্ট করতে যাবে ? চুরি বিদ্যেয় তার ভালই জ্ঞান ছিল। কৌশলে অপকর্ম করার মত বুদ্ধি তার যা ছিল, অন্য কারো তা ছিল না। এর ওপর বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পশু-পাখি শিকার করে তার মাংস খেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্টও হয়ে উঠেছিল।

ঘুরতে ঘুরতে দণ্ডকেতু একদিন নির্জন এক জায়গায় একটা বিষ্ণুমন্দির দেখতে পেল। কয়েক দিন ধরে মন্দিরটার ওপর লক্ষ্যও রাখল সে। দেখল, নদীতে স্নান করে রমণীরা মন্দিরে এসে বিষ্ণুর পুজো করে চলে যায়। রমণীদের দেখে আর দণ্ডকেতুর মন চনমন করে ওঠে। সুকৌশলে বেশ কয়েক জনের সঙ্গে সে আলাপও করে নিল। ভাল মানুষের মত এমন ভাবে আলাপ-সালাপ জমাতে লাগল যে, তার মনের অভিপ্রায় বোঝে সাধ্য কার ?

একদিন আর স্থির থাকতে না পেরে বাড়ি থেকে এক রমণীকে ফুসলে নিয়ে রাতের বেলা এল সেই বিষ্ণুমন্দিরে। মনে তখন তার দিগ্বিজয়ের আনন্দ। মন্দিরের ভেতরটা ছিল কিছু অপরিষ্কার। নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাপড়ের খুঁট খানিকটা ছিঁড়ে সলতের মত করে জ্বেলে একটু আলো করে নিল। তারপর বিনা সঙ্কোচে রমণীকে নিয়ে রাত কাটাল। তারপর শেষ রাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজনেই তা টেরও পায় নি।

পরদিন সকালে হঠাৎ মন্দিরে হৈ-চৈ হতেই দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। দেখল মন্দির আগলে বেশ কিছু মানুষ—হাতে লাঠি সোটা। পালাবার পথ বন্ধ। তাদের লাঠির ঘায়ে দুজনেরই প্রাণ গেল।

বলে, রাজা একটু থামলেন।

ব্রাহ্মণ বীতহোত্র এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন—ছি⋯ছি! মহা পাষণ্ড না হলে মন্দিরের ভেতর এমন অপকর্ম কেউ করে। পাপের উচিত সাজাই হয়েছে। এবার নরকে গিয়ে আরো ভোগ করবে।

রাজা যজ্ঞধ্বজ মৃদু হেসে বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন ব্রাহ্মণ। অমন লম্পট যারা হয়, ঘোর নরকই তাদের যোগ্য জায়গা। কিন্তু কি মজা হল, জানেন ব্রাহ্মণ ? যমদূতরা নিতে এসেও ফিরে গেল। বিষ্ণুদূতরা দিব্য বিমান নিয়ে এসে বলল—এরা জীবনভর যে পাপ করেছে, এখন আর সে পাপ ওদের একটুও নেই। না জেনেও ঐ যে বিষ্ণু মন্দির পরিষ্কার করেছে আর প্রদীপ জ্বেলেছে, এতেই ওদের সব পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে।

এই বলে দণ্ডকেতু আর সেই রমণীকে নিয়ে বিষ্ণুদূতরা বিষ্ণুলোকে চলে গেল। সেখানে বহুকাল মহা সুখ ভোগ করল দুজনে। তারপর এল ব্রহ্মলোকে। সেখানেও বেশ কিছুকাল কাটিয়ে এখন তারা রাজা-রানী হয়ে জন্ম নিয়েছে। এই কথা শুনেই ব্রাহ্মণ চমকে উঠলেন—আপনি কি সেই ?

রাজা যজ্ঞধ্বজ বললেন—হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমিই সেই দণ্ডকেতু। তাঁর কৃপায় আমি জাতিস্মর। আর মন্দির মোছা আর দীপদান আমার পূর্বজন্মের সংস্কার।

ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত বীতহোত্র এরপর আর কিছু বলতে পারেন না। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে থাকেন।





কনিক ব্যাধের কথা

ভক্তি বড়ই দুর্লভ। শুধু তাই নয়, ভক্তিলাভও মহা ভাগ্যের কথা। যে একবার ভক্তিমান হয়ে উঠতে পারে জগৎসংসারে তার সব কিছুই পাওয়া হয়ে যায়। তখন সে কোন কারণেই কারো ওপর রাগ, হিংসা করতে পারে না, কাউকে পর ভাবতে পারে না। সবাই তার কাছে আপন হয়ে যায়। সকলকে সে তখন সমান চোখে দেখে, সমান ভাবে ভালবাসে। মানুষ তো দূরের কথা, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গও তখন তার কাছে আপনজন হয়ে যায়।

ভক্তি হল বিশ্বাস। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরির ওপর বিশ্বাস। আকাশ-বাতাস, তরুলতা, মানুষ-পশু, মাটি-জল—সব কিছুর মধ্যেই তিনি আছেন। তাই কেউ ছোট নয়, অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার পাত্র নয়। এই বোধ যখন কারো জাগে, তখন তার সব কিছু শেখা হয়ে যায়। আর শিক্ষার যে গুণ, সেই গুণ লাভ করে সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। সেইজন্যই কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'।

কিন্তু এই ভক্তি বা বিশ্বাস কি আর চাইলেই মেলে ? সে যে দুর্লভ। তাই অনেক সাধনা করতে হয়। সবার ওপরে চাই তাঁর কৃপা। সেই কৃপাও আবার অর্জন করতে হয়।

যাই হোক, শ্রীহরির প্রতি ভক্তি আর তার পাদোদক (পা ধোওয়ানো জল) মুহূর্তে একটা মানুষের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে। সে মানুষ যত পাপাচার আর অনাচারই করুক না কেন।

এক ব্যাধের জীবনে এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল।

তখন পৃথিবীতে সত্যযুগ চলছে।

সে সময় সব মানুষই সত্য পথে থাকলেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছিল বৈকি।

কনিক নামে এক ব্যাধ ছিল। বনে জঙ্গলে শিকার করেই সে জীবন ধারণ করত। কিন্তু একটু একটু করে সে দারুণ লোভী হয়ে উঠল। শিকার করে আর তার মন ভরে না। মনে মনে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগল। শিকার করত বটে, কিন্তু পশু যদি যন্ত্রণায় ছটফট না করত, তেমন আনন্দ সে পেত না। নগরে ঢুকে এবাড়ি-ওবাড়ি সে চুরি করতে শুরু করল। চুরি করেও যেন ঠিক মন ভরে না। তাই সুযোগ পেলেই নারী-হরণ, নারী-নির্যাতন করতে লাগল। যত দিন যায়, অপকর্মের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। তত বেশি লোভ তাকে পেয়ে বসে।

একদিন তার কানে এল, সৌবীর রাজার রাজ্য নাকি দ্বিতীয় অমরাবতী। যত সব ধনী মানুষের বাস সেখানে। সকলেই বেশ সম্পদশালী।

শোনামাত্রই ব্যাধের মন লোভে লকলক করে উঠল। কেন মিছিমিছি এখানে ছুটছাট চুরি করে জীবন কাটাই। সেখানে গেলে ভাণ্ডার লুট করা যাবে—সুতরাং সেখানেই যাওয়া যাক।

ব্যাধ এসে হাজির হল সৌবীর রাজ্যে। রাজপথ ধরে হাঁটার সাহস ছিল না। তাই এল বনপথ ধরে।

রাজ্যের প্রান্তে এসেই ব্যাধ দেখল, বনটা পাতলা হয়ে এসেছে। আর সেখানে একটা বিষ্ণু মন্দির। নগরের দিকে তাকানো তো দূরের কথা, মন্দিরটা দেখেই ব্যাধের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সর্বাঙ্গ তার সোনার পাতে মোড়া। ভেতরে না জানি তাহলে কত সোনা আছে ! দরকার কি এখন নগরে গিয়ে হামলা করার। এই মন্দিরেই যা সোনা আছে, তা দিয়েই হয়ত গোটা জীবনটা তার মহা সুখে কেটে যাবে।

এই ভেবে বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে থেকে বসে রইল। কেউ আসা-যাওয়া করে কিনা দেখবার জন্য। একটা গোটা দিন-রাত গেল। না—কেউ এল না, গেলও না। এমন কি মন্দির থেকে কেউ বেরও হল না।

কনিক ব্যাধ নিশ্চিত হল যে মন্দিরটা পরিত্যক্ত। যা কিছু সোনা-দানা আছে, নির্বিবাদে সে খুলে তুলে নিয়ে যেতে পারবে। বাধা দিতে কেউ আসবে না। বেপরোয়া এখন কনিক। মন্দিরের ভেতরে ঢুকল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই—অঢেল সোনা দানা। আরো একটু ভেতরে ঢুকতেই চমকে কয়েক পা পিছিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল। দেখল, সোনা দিয়ে গড়া সুন্দর একটি বিষ্ণুমূর্তি। আর তার সামনে জটাজুটধারী এক মানুষ যেন মরার মত বসে আছে। নড়েও না, চড়েও না। অনেকক্ষণ আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে তাকে সেই অবস্থায় দেখে কনিক ভাবল—ব্যাপারটা কি ? মরে বসে আছে, না আর কিছু করছে ? এবার থামের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পা-পা করে এগিয়ে এসে দেখল—না, মানুষটা মরা নয়, জীবন্ত। তবে চোখ বুজে বসে আছে।

সেদিন ব্যাধের আর চুরি করা হল না। যদি মানুষটা বাধা দেয়, চেঁচামেচি করে ওঠে, তাহলে আর রেহাই থাকবে না। মানুষটাকে দেখেও বেশ বলশালী বলে মনে হচ্ছে। তার ওপর সৌবীর রাজের যা কড়া শাসন, বনে ঢুকে গেলেও পরিত্রাণ পাবে না। কোথা থেকে যে এই ভণ্ড এখানে এসে জুটল ? রাগে ব্যাধের দাঁত কড়মড় করে উঠল। যেমন ধীরে ধীরে মন্দিরে ঢুকেছিল, তেমনভাবেই বেরিয়ে এল। ঠিক করল, আগে ঐ ভণ্ডটাকে খুন করে পথের বাধা সরিয়ে দিতে হবে। আর তা করতে হবে গভীর অন্ধকার রাতে।

চাঁদনী রাত শেষ হল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত গাঢ় হতে হতে অমাবস্যা এল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই হল গোপনে কাজ করার সবচেয়ে ভাল সময়। কনিক ব্যাধ আকণ্ঠ মদ খেলো, হাতে দা নিয়ে উন্মত্তের মত গিয়ে মন্দিরে ঢুকল। বাঘের মত তখন জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। মুখটা কি ভয়ঙ্কর ! বিষ্ণুর সামনে টিম

টিম করে জ্বলছে একটি প্রদীপ। পুজো-ধ্যান শেষ করে তপস্বী তখন আপন মনে বসে আছেন নিজের আসনে। এমন সময় কাটারি হাতে উন্মত্ত ব্যাধ গিয়ে হাজির হল সেখানে।

ব্যাধ মাতাল হয়েছিল ঠিকই, তবুও চোখ তার সজাগ ছিল, জ্ঞানও টনটনে ছিল। দেখল, তাকে দেখে তপস্বী একটুও ভয় পেল না। বরং আসন ছেড়ে উঠে মধুর স্বরে বলল—এসো ভাই, এসো।

তপস্বীর আপ্যায়নের বহর দেখে প্রথমেই মনে মনে একটু ধাক্কা খেল ব্যাধ। কিন্তু দমে গেলে তো চলবে না। সে গর্জন করে উঠল—ভণ্ডামির আর জায়গা পেলে না ? ভেবেছ বুঝি তোমার ঐ মিষ্টি কথায় আমি ভুলে যাব ? দেখতে পাচ্ছ, আমার হাতে এটা কি ? এক কোপে তোমাকে নিকেশ করে, এখানে যা আছে আমি নিয়ে যাব।

তপস্বী বললেন—ভগবান যদি তোমার হাতে আমার খুন হওয়ার বিধান দিয়ে থাকেন, তাহলে আমার কি করার আছে ভাই ? আমি নিরস্ত্র, তাপস। সংসার ছেড়ে এই নির্জন মন্দিরে এসে আমি ভগবানের ধ্যান করে চলেছি। ইচ্ছে করলে তুমি আমাকে এখনই মেরে ফেলতে পার। এখানে কেউ তোমায় বাধা দিতে আসবে না। তবে ভাই, এভাবে মারার আগে আমার দুটো কথা শুনবে ?

ব্যাধ দেখল, তপস্বী তেমন রোখালো নয়। তাছাড়া রাত এখনও অনেক বাকি। এদিকে এখন কেউ আসবেও না। শোনাই থাক, কি বলে।

ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল—কি বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বল।

তপস্বী বললেন—তুমি এই সোনাদানাগুলো নিয়ে যাবার জন্য আমাকে খুন করতে এসেছ ? তার কি কোন দরকার ছিল ভাই। এসব আমার নয়। এতে আমার লোভও নেই। আমি এমন কিছু করিনি, যাতে আমাকে এইরকম অপঘাতে মরতে হবে। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, এখানে যা কিছু আছে, সবই তুমি নিয়ে যাও। আমি কিছুই বলব না। শুধু একটা কথা ভাই, তোমায় জিজ্ঞেস করব, কেন তুমি এসব করছ ?

ব্যাধ বলল—কেন আবার ? আমার পেট নেই ? আমার বউ-ছেলেপুলে নেই ? গায়ে ক্ষমতা থাকতে ভিক্ষে করে খাওয়াব নাকি ? সে বান্দা আমি নই।

—খুবই সত্যি কথা বলেছ ভাই, ভিক্ষে করবে কেন ? আর এই পাপ-পথেই বা যাবে কেন ? ভগবান শ্রীহরি যখন তোমাদের জীবন দিয়েছেন, তখন তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখে চললে তোমাদের কোন অভাবই থাকত না। তোমাকেও এমন ধারা হতে হতো না। বনের ভেতর এই নির্জন মন্দিরে আমিও তো একা রয়েছি ভাই। সব সময় তাঁকে নিয়েই আছি। আমার পেট তো কাঁদে না। আর তুমি যে কাজ করছ, এ তো মহাপাপের কাজ। তুমি যা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছ সকলেই তার ভাগ নিচ্ছে। কিন্তু তোমার পাপের ভাগ কি কেউ নেবে ? না ভাই, কেউ নেবে না। মানুষের শরীর নিয়ে যখন জন্মেছি আমরা, তখন একদিন আমাদের মরতে হবেই। তখন ? তখন তোমার দশা কি হবে, একবারও কি ভেবে দেখেছ ভাই ? তুমি যেমন এখন সকলকে নির্যাতন করে বেড়াচ্ছ, যমদূতরা এসে তখন তোমাকেও ঠিক ঐভাবে নির্যাতন করবে। কেউ তোমাকে সাহায্য করতে যাবে না—তোমার স্ত্রী-পুত্রও না। তোমার ধন-সম্পদ সব এখানেই পড়ে থাকবে। আর যে অধর্ম করে তুমি ঐসব অর্জন করেছ, তার নিদারুণ ফল ভোগ করতে করতে তোমায় যেতে হবে। সেদিনের কথা কি একবারও ভেবেছ ভাই ?

তপস্বীর কথাগুলো শুনতে শুনতে ব্যাধের নেশা পাতলা হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। অমন বাঘের মত জ্বলজ্বলে চোখ মিটমিট করতে শুরু করল। মুখটা যেন ক্রমশ ফেকাসে হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা তার যেন ভয়ে গুড়গুড় করে উঠল। হাত থেকে কাটারি খসে পড়ে গেল। এতদিন ধরে যেসব মানুষের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করে এসেছে, কনিকের মনে হল, তারা যেন মূর্তি নিয়ে বিকটভাবে ছুটে আসছে তার দিকে। এ কি হল তার ! চকিতে দু হাতে চোখ ঢেকে সে তপস্বীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল—ঠাকুর, আমাকে বাঁচান···বাঁচান ! কিন্তু তপস্বী তাকে তুলতে গিয়ে দেখলেন, পড়েই সে মারা গেছে।

আর কিছু বলার নেই তপস্বীর। শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে ব্যাধের জন্য মনে মনে প্রার্থনা জানালেন। তারপর শ্রীহরির পাদোদক তার মাথায় ছিটিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীর চোখের সামনে অভূতপূর্ব এক ব্যাপার ঘটে গেল।

দেখলেন আকাশ থেকে নেমে এল এক দিব্য বিমান—ফুলে-ফুলে ভরা। বিমানে বারজন চতুর্ভুজ বিষ্ণুদূত।



কনিক ব্যাধকে তারা মহা সমারোহে সেই বিমানে তুলে নিয়ে চলে গেল।

তাই দেখে তপস্বীর দু চোখ জলে ভরে গেল। সামান্য হরিপাদোদকে যদি ব্যাধ মুক্তি পায়, তাহলে স্বয়ং শ্রীহরির কৃপা কি না দিতে পারে?

তপস্বী এরপর ধ্যানে আরো নিবিষ্ট হলেন—প্রভু, দেখা দাও, কৃপা কর!

অঝোরে তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে।

সত্যিই স্বয়ং শ্রীহরি ভক্তের আকুল আহ্বানে একদিন দেখা দিলেন তাঁকে। সুমধুর স্বরে বললেন—উত্তঙ্ক, বল কি তোমার অভিলাষ?

তপস্বী উত্তঙ্ক ঠিক সেই ভাবেই চোখের জলে প্রার্থনা জানালেন—প্রভু, আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, আমার যেন সব সময়ই আপনার প্রতি ভক্তি থাকে। জন্ম-জন্মান্তরেও আমার সেই ভক্তি যেন অচলা হয়। কীট-পতঙ্গ বা যেভাবেই পরে আমার জন্ম হোক না কেন, আমি আপনার কাছ থেকে দূরে না থাকি।

শ্রীহরি উত্তঙ্কের অভিলাষ পূর্ণ করে অন্তর্হিত হলেন।

শ্রীহরির কৃপায় উত্তঙ্কের জীবনও ধন্য হল।



ভবিষ্য পুরাণ

মহাপুরাণের মধ্যে অন্যতম। এই পুরাণে অন্যান্য পুরাণের মত সৃষ্টি, সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশের রাজা-রাজড়ার কাহিনী খুবই কম। ভবিষ্যতে এই পৃথিবীর চেহারা কেমন হবে, এই পুরাণে তা বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে। ম্লেচ্ছরা কিভাবে এই ভারতবর্ষ তথা আর্যাবর্ত অধিকার করল, আর্যধর্ম কিভাবে বিনষ্ট হয়ে গেল, কোন্ কোন্ ম্লেচ্ছরাজা এ দেশে রাজত্ব করেছেন, এই পুরাণ তারই কথা বলেছে। ধর্মের মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সঙ্ঘাত, ম্লেচ্ছধর্ম এবং ভাষার প্রাদুর্ভাব-এর কথা এই পুরণে বলা হয়েছে। এ ছাড়া রাজা শালিবাহন, পৃথ্বীরাজ-জয়চন্দ্রের কাহিনী, সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভা, শক-হূণদের কথা, দিল্লিতে মোগল বাদশাহের আধিপত্য প্রসঙ্গে বাবর-হুমায়ুন-আকবরের কাহিনী, যা আমরা আমাদের পাঠ্য ইতিহাসে পাই, সেসব কাহিনীও এই পুরাণে পাওয়া যায়। এর মধ্যে অভিনব হল, দেখানো হয়েছে ইতিহাসে যেসব নায়কেরা একটু ধর্মপরায়ণ এবং প্রজাবৎসল, পূর্বজন্মে তাঁরা ধর্মাত্মা ছিলেন। যেমন—আকবর বাদশাহকে দেখানো হয়েছে, তিনি শঙ্করাচার্যের অনুগামী ব্রহ্মবাদী মুকুন্দ ছিলেন ইত্যাদি। আর পূর্বে যাঁরা দৈত্য বা অসুর ছিলেন তাঁরা অত্যাচারী হয়ে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আবার বারব্রতর সঙ্গে সত্যনারায়ণ পূজার কথা এই পুরাণেই প্রথম পাওয়া যায়। এইপুরাণে শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, কবীর, নানক প্রভৃতির জন্মকথা এবং ধর্মপ্রচারের কথাও যেমন আছে, তেমনি ব্রাহ্মধর্মের উল্লেখ আছে।

আবার রাজধানী কলকাতা এবং ইংরাজ আধিপত্যের সূচনা প্রসঙ্গে কিছু ঐতিহাসিক নামেরও উল্লেখ আছে। কোন গোটা কাহিনী নয়, কে কার পর রাজত্ব করেছে, তারই কতকটা ধারাবিবরণী এই পুরাণে আছে যা আমরা মধ্যযুগের ইতিহাসে পাই। তাই অনেক পণ্ডিতের মতে, আমরা 'ভবিষ্য পুরাণ' নামে যে পুরাণটি পড়ি, এটি ঠিক আসল পুরাণ নয়।

ম্লেচ্ছহন্তা রাজা প্রদ্যোত

ভবিষ্যতের ভাবনা কে না ভাবে ? ভবিষ্যতে কি ঘটবে, কি ঘটতে পারে, এসব জানার আগ্রহ কার না আছে? মানুষ মাত্রেরই এসব ব্যাপারে কৌতূহল সব সময়ই ছিল।

নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রমুখ মুনিরা রোমহর্ষণ সূতের মুখে এই পৃথিবীর আদি বৃত্তান্ত, পুরাণ ইতিহাস অনেক কিছু শুনলেন, জানলেন। জানতে জানতে কৌতূহল বাড়ে। আরও জানার ইচ্ছে জাগে। শৌনক প্রমুখ মুনিদেরও তাই স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানার প্রবল বাসনা জাগল। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের অনেক রাজ-রাজড়ার কাহিনী, অনেক দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনী তাঁরা শুনলেন। দ্বাপরের শেষে সামান্য ব্যাধের হাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণত্যাগের সঙ্গে পাণ্ডবদের মধ্যেও যে কত বিপর্যয় ঘটে গেল, তাঁরা সবই শুনলেন। পরীক্ষিতকে পৃথিবী পালনের দায়িত্ব দিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সপরিবারে মহাপ্রস্থানে চলে গেছেন। পরীক্ষিতের পর রাজা জনমেজয়। তাঁর পিতার শত্রু সর্পকুলকে ধ্বংস করার জন্য কি বিরাট যজ্ঞই না করেছিলেন! নাগদের সে এক শোচনীয় অবস্থা।

কিন্তু তারপর···তারপর কি হল ?

কি হল নয়। পৃথিবীতে কি হবে ? ঈশ্বরের এই সৃষ্টিতে কি ঘটবে ? কেমন ভাবে এই সৃষ্টি চলবে ?

মহামুনি বেদব্যাস। অসীম, অনন্ত তাঁর জ্ঞান। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী হন, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানদৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছুই এমনভাবে দেখতে পান, যা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। যাঁরা এইভাবে দেখতে পারেন, তাঁরা হলেন দিব্যদ্রষ্টা। ব্যাসদেব ছিলেন তেমনি এক দিব্যদর্শী। সূত তো তাঁরই শিষ্য। তাই তিনিও তাঁরই কাছ থেকে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার অনেক কথাই জেনে নিয়েছিলেন। আর শৌনক প্রমুখ মুনিদের কৌতূহল মেটাবার জন্য তা বলেছিলেন।

দ্বাপর যুগের শেষে প্রতাপশালী যাদবরা সারা দেশকে অনাচারে ছেয়ে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণ তাই যাদবকুলকে ধ্বংস করলেন বটে, কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী, তাকে কি কেউ ঠেকাতে পারেন ?

শ্রীকৃষ্ণ ঠেকাতে পারেননি। পাণ্ডবরা চলে যাওয়ার পর তো আর কথাই নেই। বর্ণ আর আশ্রমের যা ধর্ম ছিল সব শেষ হয়ে গেল। শুধু ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য-শূদ্র যে সুযোগ পাচ্ছে সে-ই রাজা হয়ে বসতে শুরু করল। যে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে লাগল। খাঁটি ব্রাহ্মণ, খাঁটি ক্ষত্রিয় মেলা ভার হয়ে দাঁড়াল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ পেতে শুরু করল। সপ্তদ্বীপ নিয়ে একদিন যে পৃথিবী ছিল, তা টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হয়ে গেল। এক এক রাজ্যের এক এক রাজা—যেন সর্বেসর্বা। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের শত্রুতা। অনাচারে দেশ ছেয়ে গেল। অনাচার মানেই ম্লেচ্ছ।

পৃথিবী যখন এভাবে ম্লেচ্ছরা গ্রাস করতে শুরু করল, তখন হস্তিনগরের রাজা ছিলেন ক্ষেমক। মহারাজা জনমেজয়েরই তিনি বংশধর। রাজা হয়েও রাজকার্য তাঁর কিন্তু একটুও ভাল লাগল না। পুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি কলাপ গ্রামে গিয়ে সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে লাগলেন।

হস্তিনগরের রাজা প্রদ্যোত সাধ্যমত রাজ্যশাসন করে চলেছেন। কোথাও বড় একটা অশান্তি নেই। এদিকে হার, হূণ, বর্বর, গুরুণ্ড (ইংরেজ), শক, যবন, পল্লব, রোমজ, চীন—যত সব ম্লেচ্ছতে পৃথিবী ভরে গেছে। এক একটা দেশ দখল করে শুধু রাজত্বই করছে না, পাহাড় ডিঙিয়ে, সাগর পেরিয়ে মাঝে মাঝে অন্য দেশে গিয়ে হামলাও করে আসছে। তাই প্রদ্যোত যে খুব একটা নিশ্চিন্ত ছিলেন, তা নয়। তবুও যতদূর সম্ভব, হস্তিনগরকে সুখ-শান্তির মধ্যেই রেখেছিলেন।

ইতিমধ্যে কলাপ গ্রামে মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটে গেল। ম্লেচ্ছরা গুপ্তচর মারফৎ ক্ষেমকের সন্ধান পেয়ে, গোপনে এসে তাঁকে হত্যা করে চলে গেল। রাজা প্রদ্যোত তা জানতেও পারে নি।

রাজসভায় একদিন সভাসদদের নিয়ে রাজা প্রদ্যোৎ বসে আছেন। নানা আলাপ-আলোচনা চলছে হঠাৎ দেবর্ষি নারদ সেখানে এসে হাজির। অমর নারদমুনিকে দেখে রাজা শশব্যস্তে সিংহাসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। যথোচিত সম্বর্ধনা জানিয়ে বসালেন। কুশলাদি প্রশ্ন করলেন।

নারদ বললেন—আমার কথা ছাড়। আমরা ভালই থাকি। বিশেষ করে তোমরা ভাল থাকলে, আমরা আরও ভাল থাকি। সে কথা থাক। বড় একটা দুঃখের কথা তোমায় জানাতে আসতে বাধ্য হলাম প্রদ্যোত।

—কি কথা মুনিবর ?

—বুঝতে পারছি তুমি এখনও জান না। নারদ মুনি বললেন—তোমার বাবা ভক্ত ক্ষেমককে ম্লেচ্ছরা গোপনে হত্যা করে গেছে।

—এ কি কথা বলছেন মুনিবর ? প্রদ্যোত শুনে চমকে উঠলেন। সেই সঙ্গে সভাসদরাও।

—তোমার মত ধার্মিক রাজা এখনও থাকতে ম্লেচ্ছরা এই অপকর্ম করে বেড়াবে, এটা আমার ঠিক ভাল লাগল না। তাই ভাবলাম, তোমাকে একবার শোনান দরকার।

প্রদ্যোতের মনে দুঃখ তো জাগলই, সেই সঙ্গে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

নারদ বললেন—অপঘাতে মরে তোমার বাবা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তাঁর যদি মুক্তি চাও, তাহলে তুমি এখন ম্লেচ্ছ-নিধন যজ্ঞ কর। এই বলে নারদ চলে গেলেন।

—হ্যাঁ, তাই করব। ম্লেচ্ছকুল ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমার এই যজ্ঞ থামবে না।

তারপর সভাসদদের মধ্যে পণ্ডিতদের ডেকে বললেন—শুনুন পণ্ডিতগণ, আমি যজ্ঞ করব। ম্লেচ্ছ নিধনই হবে আমার এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। যেখানে যত বেদবিদ ব্রাহ্মণ আছেন, সকলকে আনান।

কুরুক্ষেত্র—যেখানে তাঁর পূর্বতন পিতৃপুরুষরা মহারণ করেছিলেন, সেখানে ষোল যোজন (চৌষট্টি ক্রোশ) জুড়ে বিশাল এক কুণ্ড তৈরি হল। যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা বসলেন।

কাঠের ওপর ঘি, ঘি-এর ওপর কাঠ—দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ব্রাহ্মণরা সমবেত সুরে মন্ত্রপাঠ আহুতি দিতে শুরু করলেন। কাচপোকা যেভাবে অন্য সব পোকাকে টেনে আনে, মন্ত্রশক্তি সেভাবে যেখানে যত ম্লেচ্ছ ছিল, সবাইকে টেনে আনতে লাগল। আর অসহায়ের মত সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। শক, হূণ, গুর্জর, পল্লব, গুরণ্ড, যবন, রোমজ, এমন কি চীন, সবাই যেন যাদুর মত ছুটে এসে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আগুনও যেন মহানন্দে লাখ লাখ শিখার দাঁত দিয়ে মনের আনন্দে তাদের মাংস-মজ্জা-হাড় চড়বড়িয়ে খেতে লাগল।

দেখতে দেখতে ম্লেচ্ছকুল নির্মূল হল। যজ্ঞও শেষ হল।

সেই থেকে রাজা প্রদ্যোতের আর এক নামই হয়ে গেল ম্লেচ্ছহন্তা। এরপর, দশ হাজার বছর কেটে গিয়েছিল। ম্লেচ্ছদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও ছিল না। রাজা প্রদ্যোতও নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তাকে কি রোধ করা যায়? বিশেষ করে যখন যুগের পরিবর্তন ঘটে। দ্বাপর যুগের পর কলিযুগ। দ্বাপর শেষ হয়ে গেছে। কলিকে তো আসতেই হবে। প্রতিষ্ঠা নিতে হবে। তাকে তো আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। জগৎ-বিধাতার নিয়মে পৃথিবীতে যে ম্লেচ্ছ-আচার, ম্লেচ্ছ-ধর্ম, ম্লেচ্ছ-কর্ম আসতেই হবে, যাতে বেদগ্রন্থ অপমানিত হবে। তবেই না স্রষ্টার বিধানে প্রলয় আসবে বেদধর্মের সম্মানকে রক্ষা করার জন্য!

কলি তাই মহা চিন্তায় পড়লেন। পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন।

সে আর এক কাহিনী।

কলির সাধনা

রাজা প্রদ্যোতের পর বেশ কয়েক হাজার বছর কেটে গেল। ম্লেচ্ছ যজ্ঞের পর আর্যদেশের আধিপত্য সুবিপুল হয়ে উঠল। ম্লেচ্ছ তো নির্মূল হয়েই ছিল, মুষ্টিমেয় যে কটি এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তাদের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। প্রদ্যোতের পর বেদবান, বেদবানের পর তাঁর পুত্র সুনন্দ। আর্যদেশ এমনি ভাবে সুরক্ষিত যে, কার সাধ্য সেখানে প্রবেশ করে।

এদিকে দ্বাপর যুগের পর কলিকে বিধির বিধানে আসতেই হবে। সৃষ্টির প্রথম কাল থেকে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—এই চার যুগ এসেছে। নিজের নিজের কাজ করেছে, আবার চলেও গেছে। বৈবস্বত মন্বন্তরের এই বরাহকল্পে এসে কলি পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। আসতে যে তাকে হবেই। সারা দেশকে যে তাঁকে ম্লেচ্ছ করে তুলতেই হবে। নইলে, বিধির কাছে কি জবাব দেবেন?

অনেক ভেবে-চিন্তে কলি শেষে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নির্জনে বসে নারায়ণের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। কলির সে কি আকুল প্রার্থনা!

স্তব-স্তুতিতে দেবদেবীরা খুবই সন্তুষ্ট হন। নারায়ণও সন্তুষ্ট হলেন। কলিকে দেখা দিয়ে বললেন—একটু ধৈর্য ধর। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হয়েছ, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যে বহুরূপী, তা তো তোমার অজানা নেই। তোমার মনোবাসনা যাতে পূর্ণ হয়, তার সব বন্দোবস্ত আমি করে দেব।

শ্রীহরি নারায়ণের আশ্বাস পাওয়া কি মুখের কথা! মহানন্দে কলি নীলাচল পাহাড়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে আর্যদেশে সুনন্দর রাজ্যকাল শেষ হল। এমনি দুর্ভাগ্য রাজার যে, তাঁর কোন ছেলেপুলেই হল না। দেশে নিশ্চয়ই দুর্দিন আসছে। তা নইলে অমন আচারনিষ্ঠ রাজার বংশ কিভাবে লোপ পায়? মুনি-ঋষিরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। নৈমিষারণ্যের অমন সুন্দর বসবাস ছেড়ে প্রায় আশী হাজার মুনি-ঋষি তুহিনাচলের বিশালায় (হিমালয়ে) চলে এলেন। এসে ভগবান বিষ্ণুকে ডাকতে লাগলেন।

কিন্তু ডাকলে কি হবে? বান এলে বাঁধ কি আর থাকে?

প্রদান নগরের পূর্বে চার ক্রোশ জুড়ে এক মহাবন। বন বটে, তবে জঙ্গল নয়। নানা ফল-ফুলের গাছে সাজানো যেন কোন এক স্বর্গীয় উদ্যান। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক পুরুষ আর এক নারীর সৃষ্টি হল। পুরুষটির নাম আদম। আর নারীটির নাম হব্যবতী। স্বামী-স্ত্রী। আকাশের মত উদার তাদের চোখ, ঝরনার জলের মত পরিষ্কার তাদের মন। লোভ-লালসা-হিংসার লেশমাত্র তাদের মধ্যে ছিল না। থাকত মহাবনে। আপন মনে ঘুরে বেড়াত। গাছের ফল খেত। নিষেধ শুধু একটা গাছের ফল খাওয়া। সে গাছটার নাম ছিল পাপগাছ। তার ফল খুবই মিষ্টি। কিন্তু খেলেই সর্বনাশ। আর নিষেধ ছিল যজ্ঞডুমুরের পাতার বাতাস খাওয়া। কলির ওপরও বিষ্ণুর নির্দেশ ছিল, যেন কোনরকমে ওদের প্রলুব্ধ না করে। কিন্তু বিষ্ণুর কথা ম্লেচ্ছরূপী কলি রাখল না। কুটিল মন নিয়ে যেই সে সেই মহাবনে ঢুকল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার হাড়-গোড় ভেঙে চুড়চুড় হয়ে সাপের আকার হল। ওদিকে আদম আর হব্যবতীরও মতিভ্রম ঘটল। যজ্ঞডুমুরের পাতার বাতাস তো খেলই। এমন কি, সেই পাপগাছের ফলও খেল। খাওয়ামাত্রই তাদের সবকিছু বদলে গেল। উদারতা গেল, পরিষ্কার মন গেল। অনাচার গ্রাস করল। তারা ম্লেচ্ছ হল। তারপর তাদের বংশধরে সারা দেশ আবার নতুন করে ম্লেচ্ছ হয়ে উঠল।

বেদ গেল। বেদের ক্রিয়াকলাপ, যাগ-যজ্ঞ গেল। সারা পৃথিবী তো বটেই, আর্যাবর্ত-ও টুকরো টুকরো হয়ে ম্লেচ্ছদের রাজ্য হল। 'সংস্কৃত-বর্ণমালা' গেল। 'ব্রাহ্মী-লিপি' এল। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা আচারে পৃথিবী ভরে গেল। মগধ, শক, হূণ, যবন, গুরণ্ড আবার নানা ধর্ম নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

কলির মনোবাসনা পূর্ণ হল।

ম্লেচ্ছরাজা ন্যূহর কাহিনী

আদমেরই বংশধর লোমকের এক ছেলে ছিল। তার নাম ছিল ন্যূহ। কলির প্রভাবে ন্যূহ ম্লেচ্ছ ছিলেন। বৈদিক ভাষা তিনি উচ্চারণ করতে পারতেন না। না পারলেও মনে মনে বিষ্ণুর দারুণ ভক্ত ছিলেন।

কিছুকাল রাজত্ব করার পর ভগবান বিষ্ণু একবার ভক্ত ন্যূহকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—বৎস ন্যূহ, আমি যা বলি শোন। আজ থেকে সাতদিনের দিন প্রলয় হবে। তুমি আমার ভক্ত, তাই তোমায় বলছি, তোমার আত্মীয়-পরিজন, নিয়ে তুমি নৌকোয় উঠে জীবন বাঁচাও। প্রলয়ের পর নতুন পৃথিবীর তুমিই হবে সর্বেসর্বা।

স্বপ্ন দেখেই ন্যূহ-র ঘুম ভেঙে গেল।

সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর নির্দেশ। ন্যূহ সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ডেকে নৌকো তৈরি করাতে লেগে পড়লেন। আত্মীয়-পরিজনদের সব এক জায়গায় জড়ো করতে শুরু করে দিলেন। যেখানে যত রকমের শস্য দানা ছিল, সেই সঙ্গে তাও সংগ্রহ করাতে শুরু করে দিলেন।

তাঁর কাণ্ড দেখে সবাই ভাবতে শুরু করে দিল, রাজার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? নৌকো তৈরি...আত্মীয়স্বজন...শস্য দানা—এসব দিয়ে কি হবে?

জিজ্ঞেস করলে ন্যূহ একটাই জবাব দেন—সময় এলেই দেখতে পাবে।

দিন-রাত পরিশ্রম করে নৌকো তৈরি হয়ে গেল। তিনশো হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া আর তিরিশ হাত উঁচু নৌকো। এমন বিশালকার নৌকো দেখে সকলে আরো অবাক হল।

—এত বড় নৌকো দিয়ে কি হবে? সকলেরই এক প্রশ্ন।

ন্যূহর সেই এক জবাব—সময় এলেই দেখতে পাবে।

সময় যখন খুব কাছাকাছি এসে গেল, ন্যূহ সকলকে সেই নৌকোর ভেতর চলে যেতে বললেন। যত শস্য দানা, সেই সঙ্গে পশু, পাখি জড়ো হয়েছিল সকলকেই নৌকোর ভেতর তুলে দিলেন।

ঠিক সাত দিনের দিন।

রাত পোহাতে না পোহাতেই ভোরের আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। ভোরের সূর্য দিনের আলো নিয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারল না। কালো মেঘের আড়ালে চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে রইল। মেঘের ওপর মেঘ, তার ওপর মেঘ। সূর্যের সাধ্য কি যে, তা ভেদ করে আলো পাঠায়!

দেখতে দেখতে নামল বৃষ্টি! কি প্রবল তার ধারা। বর্ষাকালেও বুঝি এমন বৃষ্টি মানুষজন কখনো দেখেনি! নালা-ডোবা-খাল-বিল মুহূর্তে ভরে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে জলের বেগ গিয়ে মিশল নদীতে। তারপর দু কূল উপচে, শহর-গঞ্জ ভাসিয়ে দুর্বার গতিতে জল ছুটতে ছুটতে গিয়ে মিশল সাগরে। যেখানে যা ছিল দেখতে দেখতে সব জলের তলায় চলে যেতে লাগল। আর মানুষজন, শস্য-সামগ্রী নিয়ে ন্যূহ রাজার নৌকো একটু একটু করে ভেসে উঠতে লাগল। তারপর জলের টানে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল।

চল্লিশ দিন ধরে চলল সেই একটানা সমান বৃষ্টি। গোটা ভারতবর্ষটাই জলের তলায় চলে গেল। ভারতবর্ষ সাগর হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চার সমুদ্র মিলে-মিশে তুফান তুলল। রাজা ন্যূহর নৌকো সেই তুফানে ভেসে চলল।

ন্যূহ রাজা দেখলেন, বিষ্ণু স্বপ্নে যে কথা বলেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা কেমন ফলে গেল। কোথাও কোন ঠাই-কূল নেই। সবই জল গ্রাস করে নিয়েছে, কেবল 'বিশালা' নামে জায়গাটা গ্রাস করতে পারে নি।

নৈমিষারণ্য থেকে যে মুনিরা চলে এসে তুহিনাচলের এই জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই বিশালা বাদে আর সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ন্যূহ দেখলেন, মুনিরা সেখানে বসে বিষ্ণুর শক্তি মহামায়ার স্তব করছেন। ভাসতে ভাসতে সপরিবারে ন্যূহর নৌকো এসে সেখানে ঠেকে গেল। আর ভেসে বেড়াতে হল না। সেই স্তব শুনে ন্যূহও মুগ্ধ হলেন। কিন্তু নামতে না পেরে নৌকোতেই থেকে গেলেন।

মহামায়াও মুনিদের স্তবে একদিন তুষ্ট হলেন। মেঘ কেটে গেল। বর্ষা থেমে গেল, আকাশ পরিষ্কার হল। আবার সূর্যদেব দেখা দিলেন। তারপর জলরাশি কমতে শুরু করল। হিমালয়ের তটভূমি—নাম 'শিষিণা', ন্যূহ রাজার প্রথম দৃষ্টিগোচর হল। তারপর আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে সমস্ত জলরাশি সরে গেল, মাটি জেগে উঠল।

নতুন মাটি, নতুন দেশ। ন্যূহ নৌকো থেকে সব কিছু নিয়ে নামলেন। নতুন করে, নিজের মনের মত করে সারা দেশকে তিনি আবার গড়ে তুললেন।। দিকে দিকে তাঁরই বংশধররা আবার নতুন করে ম্লেচ্ছ দেশ গড়ে তুলল।

(আমরা ইতিহাসে যে 'নোয়ার কাহিনী' পড়ি, এই কাহিনীটি ঠিক সেই রকম।)

রাজা বিক্রমাদিত্য প্রসঙ্গ

শকদের অত্যাচারে ভারতবর্ষের যখন সঙ্গীন অবস্থা, তখন তাদের দমন করে আর্যধর্মকে বজায় রাখার জন্য বিক্রমাদিত্য নামে একজন রাজা হয়েছিলেন। জন্ম থেকেই বিক্রমাদিত্যের মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। যেমন তেজস্বী, তেমন বুদ্ধিমান। আবার সূক্ষ্ম বিচারে নিপুণ।

শঙ্খ তখন রাজা। শকরা খুবই প্রবল। শঙ্খর মনে তাই খুব

একটা শান্তি ছিল না। তাঁর রাজত্বকাল ছিল মাত্র তিরিশ বছর। সেই সময় গন্ধর্ব সেনের একটি ছেলে হল। ছেলেটির মা ছিল বীরমতী। কেউ জানত না যে, এই বীরমতী একজন অপ্সরা ছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মর্ত্যে এসে গান্ধর্ব সেনের সঙ্গে ঘর-সংসার পেতেছিল। কিছুকাল পরে যখন তাদের ছেলে হল, তখন স্বর্গ থেকে নাকি পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। তাই ছেলেটির নামই হয়ে গিয়েছিল শিববৃষ্টি। ছেলেটি ঘর-সংসার না করে বনে তপস্যা করতে চলে গিয়েছিল। সেখানে শিবের আরাধনা করতে করতে নিজেই শিব হয়ে গিয়েছিল।

সেই মহাযোগী শিববৃষ্টিই পরে শিবের আদেশে পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্য নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের যখন পাঁচ বছর বয়স, তপস্যা করতে বনে চলে গিয়েছিলেন। বারো বছর পর্যন্ত তাঁর সে কি কঠোর তপস্যা! শিব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন-প্রাণ খুলে বর দান করেছিলেন। শিববরে বলীয়ান হয়ে, মহাজ্ঞানী হয়ে, তিনি এরপর এসে রাজ্যভার যখন গ্রহণ করলেন, তখন স্বয়ং শিবই তাঁর বসার জন্য বত্রিশটি পুতুল দেওয়া একটি দিব্য সিংহাসন তাঁকে দিয়েছিলেন। আর বিক্রমাদিত্যের যাতে কেউ কোন ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য পার্বতীর আদেশে বেতালরা অলক্ষ্যে সব সময়ই তাঁকে ঘিরে থাকত।

একবার রাজা বিক্রমাদিত্য পার্বতীর সঙ্গে মহাকালেশ্বর শিবের পুজো করতে গিয়ে সেখানে একটা মনোরম প্রাসাদ তৈরি করালেন। যেখানে যত মণিরত্ন ছিল, তা এনে প্রাসাদের দেওয়ালে গাঁথলেন। যেখানে যত ভাল ভাল ফুল-ফলের গাছ ছিল, এনে উদ্যান তৈরি করালেন। দিব্য সেই পুরীতে দিব্য সেই সিংহাসন আনিয়ে বসালেন। তারপর নিজেও সেখানে বসে দিনরাত ধর্মালোচনায় মেতে উঠলেন। বিক্রমাদিত্যকে ঘিরে দেশের ধার্মিক মানুষরা জড়ো হতে লাগলেন। প্রতিদিনই তাঁদের নিয়ে সভা বসত। দেখতে দেখতে বিক্রমাদিত্যের ধর্মসভার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন এইভাবে ধর্মসভা চলছে, হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ সভায় এসে হাজির। রাজার কাছে ব্রাহ্মণের খুবই সমাদর ছিল। আসামাত্রই তিনি তাঁকে সমাদর করে বসালেন। বুঝতেও পারলেন না যে, ঐ ব্রাহ্মণ আসলে কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এক বেতাল। মহাকালেশ্বরেই থাকতেন। রাজার ধর্মবুদ্ধি কতখানি প্রখর হয়েছে তা দেখবার জন্যই ব্রাহ্মণের বেশে তিনি ঐ সভায় এসেছিলেন।

ব্রাহ্মণরূপী বেতাল বললেন—রাজা, আমি পুরানো একটা কাহিনী বলব, শুনুন।

শিবের ধাম বারাণসী। মহা পবিত্র ধাম। সেখানকার রাজা তখন প্রতাপমুকুট। রানী মহাদেবী। তাঁদের একটি ছেলে ছিল। তার নাম বজ্রমুকুট। রাজপুত্রকে মন্ত্রীরা সকলে খুব ভালবাসতেন। বজ্রমুকুটের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিদক্ষর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

বজ্রমুকুটের বয়স যখন ষোল বছর তখন একদিন বন্ধু বুদ্ধিদক্ষর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে শিকারে বের হল। দুজনেই ভাল শিকারী। বনে গিয়ে অনেক শিকার করল। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তিও এসেছে। একটু বিশ্রাম না নিলে নয়। কোথায় বিশ্রাম নেওয়া যায়? দেখতে দেখতে বনের মাঝে একটা শিবালয় চোখে পড়ল। খুব ভাল জায়গা দেখে মনের আনন্দে দুজনেই সেখানে এল। সেই শিবালয়ের পাশেই ছিল এক সরোবর। সরোবর জুড়ে পদ্মফুল আর বালি হাঁসের কলতান। ফুরফুরে বাতাস। বজ্রমুকুট বন্ধুকে নিয়ে সেই সরোবরের ধারে আসতেই একটি মেয়েকে দেখেত পেল। অপরূপা, সঙ্গে আবার অনেক সখী। বজ্রমুকুট মেয়েটিকে দেখে খুবই মোহিত হয়ে গেল। ওদিকে মেয়েটিও। মেয়েটির মাথায় ছিল একটা পদ্মফুল। খোঁপা থেকে সেটা তুলে নিয়ে কানে দিল, পায়ে ঠেকালো, দাঁত দিয়ে একটু কাটলো, তারপর ফুলের গোড়াটা যেন নিজের বুকের ভেতর ঢুকিয়ে নিল। এমনি ভাব দেখিয়ে চলে গেল।

বজ্রমুকুটও রাজপ্রাসাদে ফিরে এল। কিন্তু মেয়েটিকে দেখার পর থেকে তার মন খুবই অশান্ত আর চঞ্চল হয়ে উঠল। হাসি গেল। খেলা গেল। এমন কি খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত গেল। সকলেই খুবই চিন্তায় পড়লেন। এমনকি রাজা প্রতাপমুকুটও। কারণ কি? এভাবে তিনদিন কেটে যাবার পর মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিদক্ষ একদিন খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বজ্রমুকুটের কাছ থেকে সব শুনে বলল—এবার তোমার মন খারাপের কারণ বুঝতে পেরেছি রাজপুত্র। যে মেয়েটিকে দেখে তোমার মন এত চঞ্চল হয়েছে, সে হল কর্ণাটকের রাজা দন্তবক্রের মেয়ে, নাম পদ্মাবতী। তবে তোমার সঙ্গে তার মিলন খুবই কষ্টকর হবে। বজ্রমুকুট জিজ্ঞেস করল—কি করে বুঝলে? মন্ত্রিপুত্র বলল—হাতে ফুল নিয়ে যেভাবে নাড়াচাড়া করেছে, তা থেকেই বুঝতে পারছি। তবে তোমার যখন এতই ইচ্ছে, চল তার সঙ্গে তোমার মিলন আমি ঘটিয়ে দিচ্ছি।

মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিদক্ষর কথা শুনে বজ্রমুকুট মনে মনে অনেকটা হাল্কা হল। কিন্তু কিভাবে কর্ণাটকে যাওয়া যায়? মন্ত্রিপুত্রই বুদ্ধি খাটিয়ে রাজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাজপুত্রের চিকিৎসার জন্য তাকে কর্ণাটকে নিয়ে গেল। ঘোড়ায় চেপে প্রায় সন্ধের মুখোমুখি সেখানে পৌঁছে এক বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে আস্তানা নিল। সেই বৃদ্ধা ছিল রাজবাড়ির দাসী। পাছে বৃদ্ধা ঠিক আমল না দেয়, তাই মন্ত্রিপুত্র আগেই প্রচুর ধন দিয়ে তার মন জয় করল। এমন ভাব দেখাল যেন তারা বৃদ্ধারই ছেলে। অন্ধকার রাতটুকু বৃদ্ধার ঘরেই কেটে গেল।

পরদিন সকালে বৃদ্ধা প্রস্তুত হয়ে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছে। এমন সময় মন্ত্রিপুত্র তাকে ডেকে বলল—মা, আমাদের জন্য একটা কাজ তোমায় করতে হবে। রাজকন্যা পদ্মাবতীকে গোপনে গিয়ে বলতে হবে, সরোবরের ধারে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে এসেছে।

অত ধন-দৌলত পাওয়ার পর কি আর বৃদ্ধা না করতে পারে। আড়ালে রাজকন্যাকে বলতেই, রাজকন্যা নিজের উরু থাবড়ে যেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল—যা···যা। তারপর নিজের আঙুল কপালে ঠেকিয়ে প্রায় দূর করে দিল। বৃদ্ধা ফিরে রাজকন্যা যা-যা করেছিল, যা বলেছিল, সবই বলল। শুনে রাজপুত্রের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মন্ত্রিপুত্রের মুখে হাসি। বলল—বন্ধু, আর তিন দিন অপেক্ষা কর।

তিন দিন কেটে যাবার পর চতুর্থ দিন। বৃদ্ধা রাজপ্রাসাদে যাচ্ছে দেখে মন্ত্রিপুত্র তাকে বলল—মা, রাজকন্যাকে গিয়ে গোপনে বলবে, রাজকুমার তাকে দেখার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়েছে।

রাজবাড়ি থেকে বৃদ্ধা ফিরে এল। তার মারফৎ পদ্মাবতীর সঙ্কেত এল। সে সংকেত বোঝার সাধ্য রাজপুত্রের ছিল না। কিন্তু

মন্ত্রিপুত্র ঠিক বুঝতে পারল। আর রাজপুত্রকে কি করতে হবে, তার নির্দেশও দিয়ে দিল। রাতের অন্ধকারে রাজপুত্র সেই মত রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিকে যেতেই, সোজা অন্দরমহলে। পদ্মাবতীর সঙ্গে তার নির্বিঘ্নে মিলন ঘটে গেল। মন্ত্রিপুত্র যেখানে ছিল, সেখানেই অপেক্ষা করে রইল।

একমাস কেটে গেল। একদিন বজ্রমুকুট পদ্মাবতীকে বলল—আমি একবার আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি। সে না থাকলে কি আমি কখনো এখানে আসতে পারতাম?

পদ্মাবতী শুনে বলল—তোমার বন্ধুর কথা তো আমায় এতদিন বলনি। ছি···ছি···। এতবড় এক উপকারী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তা শুধু হাতে? দাঁড়াও, আমি কিছু মিষ্টি তৈরি করে দিই। তাকে দেবে।

দাসীকে দিয়ে বন্ধুর জন্য ভাল ভাল মিষ্টি পাঠিয়ে দিল পদ্মাবতী। রাজপুত্র এল। বহুদিন পর দুই বন্ধুতে মিলে অনেক কথাই হল। মিষ্টি যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে রইল।

পদ্মাবতীর দেওয়া মিষ্টি বন্ধু খাচ্ছে না দেখে রাজপুত্র মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হল। বলল—বুদ্ধিদক্ষ, এ তোমার ভারী অন্যায়। বন্ধু হলেও আমি রাজপুত্র, তোমার সম্মানের যোগ্য। আমি যাকে ভালবাসি, যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, সেও তেমনি তোমার কাছে সম্মানের যোগ্য। তার দেওয়া মিষ্টি না খাওয়া মানে তাকে, সেই সঙ্গে আমাকেও অপমান করা।

শুনে বুদ্ধিদক্ষ মৃদু হেসে, মিষ্টিটা হাতে নিয়ে একটা কুকুরকে ডেকে খেতে দিল। তা দেখে বজ্রমুকুট তো রেগে আগুন। বুদ্ধিদক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। ঠিক সেই সময় তাদেরই চোখের সামনে ছটফট করতে করতে কুকুরটা মারা গেল। তাই দেখে ভয়ে রাজপুত্রের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মন্ত্রিপুত্র বলল—দেখলে তো বন্ধু, মিষ্টির সঙ্গে কেমন সুন্দরভাবে বিষ মেশানো ছিল!

ধিক্কারে, লজ্জায় বজ্রমুকুটের মাথা হেঁট হয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্রকে বলল—বন্ধু, খুব শিক্ষা হয়েছে। এখনি চল এখান থেকে পালাই। নইলে ঐ পিশাচীর হাতে আমাদের সকলকেই একদিন মরতে হবে।

মন্ত্রীপুত্র কিন্তু রাজপুত্রের সঙ্গে একমত হল না। রাজপুত্রকে বলল—বন্ধু, তুমি ফিরে যাও। গিয়ে কৌশলে একটা কাজ করে আসতে হবে। পদ্মাবতীর একটা অলঙ্কার তোমায় নিয়ে আসতে হবে। আর পদ্মাবতী যেন কোন রকমেই তা জানতে না পারে, এভাবে তার জানুতে ছোট্ট একটা ত্রিশূল ছাপ দিয়ে আসতে হবে।

বুদ্ধিদক্ষর পরামর্শ মত রাজপুত্র তাই করে এল। এরপর দুজনেই দু রকমের ভেক ধরল। মন্ত্রীপুত্র হল যোগী। ত্রিশূল হাতে রুদ্রমণ্ডল শ্মশানে এসে যেন যোগ-সাধনায় বসল, আর বজ্রমুকুট হল তার শিষ্য। যে অলঙ্কারটা বজ্র মুকুট নিয়ে এসেছিল, বুদ্ধিদক্ষের কথা অনুযায়ী ছদ্মবেশী বজ্রমুকুট সেটি নিয়ে বাজারে বেচতে গেল। রাজার বাড়ির গহনা আর কে না চেনে। চোর বলে সিপাহীরা তাকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে।

—এ অলঙ্কার তুমি কোথা থেকে পেলে?

বজ্রমুকুট বলল—আমার গুরুদেব আমাকে বিক্রি করার জন্য দিয়েছেন। আমি তো বলতে পারব না।

—কোথায় তোমার গুরু?

—আজ্ঞে রুদ্রমণ্ডল শ্মশানে। উনি মস্ত বড় একজন যোগী।

রাজা দন্তবক্র দাঁত কড়মড় করতে করতে যোগীর কাছে এলেন—এ অলঙ্কার কোথা থেকে পেলে?

—এক পিশাচীর কাছ থেকে। কাল রাতে সে এসেছিল এই অলঙ্কার দিয়ে আমায় বশ করতে। দিয়েছি তার জানুতে ত্রিশূলের দাগ এঁকে। পালাতে আর পথ পায়?

শুনে দন্তবক্র তো মহা চিন্তায় পড়লেন। তাঁর রাজ্যে পিশাচী, সর্বনাশ! কোন রকমেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। পিশাচীকে বের করার জন্য চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল—জানুতে ত্রিশূলের চিহ্ন। অনেক খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেষে রাজা দন্তবক্র সন্ধান পেলেন, তার মেয়ে হয়ে জন্মেছে যে পদ্মাবতী—সে-ই হল পিশাচী।

এসব ব্যাপারে দন্তবক্র ছিলেন খুবই নির্মম। কোন মায়া-মমতা না করে পদ্মাবতীকে রাজ্য থেকে বের করে দিলেন।

পদ্মাবতীর এই কাহিনী শেষ করে ব্রাহ্মণরূপী বেতাল বললেন—রাজা, কাহিনী তো শুনলেন। বলুন তো, ধর্মত সবচেয়ে বেশি পাপ কার হয়েছে?

বিক্রমাদিত্য বললেন—ধর্মের বিচারে সবচেয়ে বেশি পাপ রাজারই হয়েছে। বজ্রমুকুটের কোন অপরাধ নেই। বুদ্ধিদক্ষ যথার্থ বন্ধুর কাজ করেছে। কিন্তু রাজা! বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে তার ঘরে। সেদিকে তার খেয়াল নেই। বিয়ের সময়কাল এলে যে মেয়ের বিয়ে না দেয়, তাকে দারুণ নরক ভোগ করতে হয়। রাজা দন্তবক্রকেও সেই নরক ভোগ করতে হবে।

বেতাল রাজার জবাব শুনে খুব খুশি হলেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বেতাল বললেন—রাজা, আর একটা কাহিনী বলি। শুনুন:

কোন এক সময় যমুনার তীরে ধর্মস্থল নামে সমৃদ্ধ এক নগর ছিল। এর রাজা ছিলেন ধার্মিক গুণাধিপ। হরিশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রী সুশীলকে নিয়ে এই রাজ্যে বসবাস করতেন। দুজনেই খুব ধার্মিক। তাঁদের একটি ছেলে আর এক মেয়ে ছিল। ছেলেটির নাম ছিল সত্যশীল, আর মেয়েটির নাম ছিল মধুমতী। সত্যশীল খুবই গুণী ছিল। তার বন্ধু ছিল কাশীরাজার ছেলে কেশব। সত্যশীলের সে বন্ধুও বটে, আবার অপরদিকে গুরুপুত্র। মেয়ে মধুমতীর রূপ-গুণের তুলনা নেই।

মেয়ের বারো বছর বয়স হল। নিয়ম অনুসারে এবার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। যার-তার হাতে তো আর অমন মেয়ে দেওয়া যায় না। ভাল পাত্র চাই। চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল।

সত্যশীলের খুব ইচ্ছে, কাশীরাজার ছেলে বন্ধু কেশবের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হোক। সুখী হবে। বাবা হরিশর্মার অনুমতি নিয়ে তাই সে তার বন্ধুকে আনতে কাশী চলে গেল। বিয়ের একটা দিনও ঠিক হয়ে গেছে। তারই মধ্যে তাকে আনতে হবে।

এদিকে খবর ছড়িয়ে পড়তে, দুটি ব্রাহ্মণ যুবক মধুমতীকে বিয়ে করার জন্য এসে হাজির। রূপে-গুণে দুজনেই সমান। একজনের নাম বামন। আর এক জনের নাম ত্রিবিক্রম।

এবার হরিশর্মা পড়লেন মহা মুস্কিলে। একদিকে এই দুই ব্রাহ্মণ যুবক। আর একদিকে ছেলের বন্ধু কাশীরাজ-এর ছেলে কেশব!

কিন্তু বিয়ের দিন মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটে গেল।

হঠাৎ কোথা থেকে এক বিষধর সাপ এসে মধুমতীকে ছোবল দিয়ে সরে পড়ল। দেখতে দেখতে মধুমতীর সর্বাঙ্গ বিষে নীল হয়ে গেল। মারা গেল। হরিশর্মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ আর কি করবেন। মৃতদেহ তো আর ফেলে রাখা যায় না। যথারীতি দাহ করলেন। তাই দেখে বামন আর ত্রিবিক্রমের মন দারুণ খারাপ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কেশবও এসে হাজির হয়ে গেছে। মধুমতীকে যেন সে মনে মনে আগে থেকেই বিয়ে করে রেখেছিল। এসে মধুমতীর যখন এই অবস্থা দেখল, তখন সে শোকে-দুঃখে খুবই কাতর হয়ে পড়ল।

কাতর তিনজনেই। খবর পেয়ে রাজা গুণাধিপেরও মন খারাপ। বামন কি আর করে। যেখানে মধুমতীকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছিল, সেখান থেকে ছাই সংগ্রহ করে সর্বাঙ্গে মেখে বিবাগী হয়ে গিয়ে এক জায়গায় চুপ করে বসে খালি মধুমতীকেই চিন্তা করতে লাগল। ত্রিবিক্রম মনের দুঃখে লোটা-কম্বল নিয়ে একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। আর কেশব, মধুমতীর অস্থি সংগ্রহ করে তাই নিয়ে তীর্থযাত্রা করল।

সন্ন্যাসী ত্রিবিক্রম লোটা-কম্বল নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষা করে দিন কাটায়। ঘুরতে ঘুরতে সরযূ নদীর ধারে লক্ষ্মণ নামে এক নগরে সেদিন ভিক্ষে করতে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি এল। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন শিবভক্ত রামশর্মা। হঠাৎ অমন একজন সন্ন্যাসী অতিথিকে পেয়ে সেদিন ব্রাহ্মণের খুব আনন্দ। সমাদরে তার সেবা করবার আয়োজন করে মন্দিরে গেলেন শিবের পুজো করতে। ব্রাহ্মণীও ভাল ভাল খাবার তৈরি করল অতিথিকে সেবা করবার জন্য।

সব আয়োজন যখন শেষ, হঠাৎ তাঁদের একমাত্র ছেলে, খুবই ছোট, হঠাৎ মারা গেল। ব্রাহ্মণীর তখন সে কি কান্না! এমন সময় মন্দির থেকে রামশর্মা ফিরে এলেন। শিবের অনুগ্রহে তাঁর সঞ্জীবনী বিদ্যা জানা ছিল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি সেই বিদ্যাবলে ছেলেকে বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর পরমানন্দে অতিথির সেবা করালেন।

তাই দেখে, ত্রিবিক্রম রামশর্মার কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে নিল। সরযূর তীরে বসে মনে মনে সেই মন্ত্র অনেক, অনেকবার জপ করে আবার হরিশর্মার কাছে ফিরে এসে বলল—আমি মধুমতীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। তবে তার অস্থি চাই।

কিন্তু অস্থি পাবে কোথায়? কেশব তো ইতিমধ্যে অস্থি নিয়ে তীর্থে চলে গেছে।

রাজা গুণাধিপের কানে খবর গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা দূত পাঠিয়ে অস্থি-সমেত কেশবকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

ত্রিবিক্রম সঞ্জীবনী বিদ্যার জোরে মধুমতীকে শুধু বাঁচিয়ে তুলল না, আবার আগের মতই করে দিল।

খবর পেয়ে বামনও সেখানে এসে হাজির।

এবার তিনজনেই মধুমতীকে দাবি করে বসল।

কাহিনীটি শেষ করে বেতাল বলল—রাজা বলুন তো, এই তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে ঠিক মধুমতীর বিয়ে হওয়া উচিত?

রাজা বিক্রমাদিত্য মৃদু হেসে বললেন—ধর্মত মধুমতীর সঙ্গে একমাত্র বামনেরই বিয়ে হওয়া উচিত। যে প্রাণ দেয় সে তো প্রাণদাতা পিতা। ত্রিবিক্রম মধুমতীকে প্রাণ দান করেছে। সে কি করে তার স্বামী হতে পারে? আর অস্থিদান! সে তো ভাই বা ছেলের কাজ। কেশব সেই কাজই করেছে।

বিক্রমাদিত্যের ধর্মবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ব্রাহ্মণরূপী বেতাল খুবই সন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ভারতবর্ষ থেকে শকদের বিতাড়ন করে বিক্রমাদিত্য মহা বিক্রমের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন।

তীর্থপ্রসঙ্গে পাণিনি

শৌনক প্রমুখ ঋষিরা কথাপ্রসঙ্গে রোমহর্ষণ সূতকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার তো অজানা কিছুই নেই। আপনি ত্রিকালদর্শী ব্যাসদেবের শিষ্য মহাজ্ঞানী। আমাদের মনে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন জাগে, সবচেয়ে সেরা তীর্থ কোন্‌টি?

সূত বললেন—আপনারা উত্তম কথাই জিজ্ঞেস করেছেন। সত্যিই এখানে তীর্থক্ষেত্রের অভাব নেই। এর মধ্যে কোন তীর্থ সেরা বেছে নেওয়া খুবই কঠিন। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনী বলছি শুনুন:

সমান ঋষির এক ছেলে ছিল। খুবই বিদ্বান। সকলে তাকে পাণিনি নামেই জানে। খুব অল্প বয়সেই সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল।

একবার কানভুগ্বর এক শিষ্য দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। সব শাস্ত্রে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ঘুরতে ঘুরতে এসে পাণিনিকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করল। অমন যে পণ্ডিত পাণিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাছে হেরে গেল। কম লজ্জার কথা নয়। পাণিনি লজ্জায় দেশ ত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সব তীর্থেই ঘুরে ঘুরে তীর্থজলে স্নান, দেবতার পুজো, পিতৃপুরুষকে জলদান করতে করতে কেদারে এল। এখানে এসে পাণিনি মনস্থ করল, আর কোথাও না গিয়ে এখানে বসেই রুদ্রদেবের আরাধনা করবে।

কেদারের জল পান করে পাণিনি ধ্যানে বসল। সাতদিন শুধু গাছের শুকনো পাতা খেয়ে, তারপর কয়েকদিন শুধু জল, তারপর আরও দশদিন শুধু জল খেয়ে পাণিনি কঠোর তপস্যা করল। এভাবে যখন আটাশ দিন কেটে গেল, রুদ্রদেব তখন আর ভক্তকে দর্শন না দিয়ে থাকতে পারলেন না। পাণিনির সামনে আবির্ভূত হয়ে বললেন—পাণিনি, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট। তুমি বর চাও।

রুদ্রদেবের সেই অপরূপ রূপ দেখে পাণিনি গদগদ স্বরে তাঁর স্তব করে বলল—দেব, আমার ওপর যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, আর যদি বর দিতেই চান, তাহলে আমাকে এই বর দিন যেন আমি মহান তীর্থ লাভ করি।

মহাদেব পাণিনির আবেদন শুনে বললেন—তুমি সেই তীর্থ পাবে। সে তীর্থ হল মানস-তীর্থ। সেই মানস-তীর্থের জল হল জ্ঞান। নির্মল জ্ঞানই মন থেকে হিংসা, রাগ, ভয়, সব দূর করে দেয়! ওগুলো হল মনের ময়লা। যতক্ষণ ঐ ময়লা থাকবে, হাজার তীর্থ ঘুরলেও কোন ফললাভ হবে না। যাও পাণিনি, আমার অনুগ্রহে তুমি সেই মানস-তীর্থ লাভ করবে। কৃতকৃত্য হবে। এই

বলে মহাদেব অন্তর্হিত হলেন।

পাণিনিও বর পেয়ে মহানন্দে ঘরে ফিরে এল।

এরপর পাণিনি শিবের অনুগ্রহে নিয়ত সেই মানসতীর্থে স্নান করতে করতে অন্য এক পাণিনি হয়ে গেল। মন থেকে ভয়, সঙ্কোচ, কোথায় যে চলে গেল! জ্ঞানের আলো মনকে ভরিয়ে দিল। জ্ঞানের আলোয় এরপর থেকে তিনি একের পর এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা শুরু করে দিলেন। সূত্রপাঠ, ধাতুপাঠ, গণপাঠ, লিঙ্গসূত্র—আরো কত কি!

পাণিনি এর মধ্য দিয়েই অমর হয়ে গেলেন।

ভবিষ্যতের ইতিহাস

কুরুক্ষেত্রে মহাসমর প্রায় শেষ হয়ে এল। কৌরবকুল প্রায় নির্মূল। মহা মহা রথীরা তখনো কয়েকজন আছেন। কিভাবে পাণ্ডবদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়, সব সময় তাঁরা সেই সুযোগ খুঁজছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে পেরে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। তাঁর প্রার্থনায় শিব পাণ্ডব শিবির রক্ষা করার দায়িত্ব নিলেন। নিশ্চিন্ত কৃষ্ণ হস্তিনাপুর গেছেন। পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই শিবির থেকে বেরিয়ে এসে সরস্বতীর নদীর ধারে রাত কাটাচ্ছেন। রাতে তো আর যুদ্ধ হতো না। ঐ সময়টুকু দু পক্ষেরই বিশ্রামের ছিল।

কিন্তু দ্রোণ, কৃপ আর অশ্বত্থামা কোন মতেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। মাঝ রাতে তাঁরা পাণ্ডব শিবিরে গোপনে চড়াও হলেন। উদ্দেশ্য, গোপনে সকলকে হত্যা করে যাবেন।

শিবিরদ্বারে এসে তাঁরা ত্রিশূল হাতে শিবকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। দ্রোণ আর কৃপ শিবের ভক্ত ছিলেন। তাঁরা মহাদেবের অনেক স্তব-স্তুতি করতে শিব পথ ছেড়ে দিলেন। অশ্বত্থামা ছিলেন মহাবলবান। শিবকে সন্তুষ্ট করে তিনি আবার একটা তলোয়ারও তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন। এবার আর তিন জনকে পায় কে? তারা তো শিবিরের ভেতর ঢুকে যথেচ্ছভাবে পাণ্ডব বংশধরদের খতম করল।

পাণ্ডবদের কানে খবর পৌঁছতেই তাঁরা তো রেগে আগুন। শিব নিজে শিবির পাহারায় থেকে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করলেন! আর ভাবতে না পেরে ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব তো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শিবের ওপর। শিবকে লক্ষ্য করে পাণ্ডবরা যে অস্ত্রই ছোঁড়েন শিব তা আত্মসাৎ করে নেন। দেখে সকলেই বিস্মিত হয়ে অস্ত্র ফেলে শিবের বুকে, পেটে যেভাবে ইচ্ছা মারতে শুরু করল।

শিব তখন তাঁদের অভিশাপ দিয়ে বসলেন। বললেন—তোমরা কৃষ্ণের ভক্ত, সুতরাং আমার ভক্ত। কিন্তু এখন যে আচরণ করলে, কলিযুগে এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে। এই বলে শিব অন্তর্হিত হন।

পাণ্ডবদের মনে খুব দুঃখ হল। শ্রীহরিকে স্মরণ করতেই কৃষ্ণ এলেন। সব শুনে তিনি আবার শিবের ধ্যান করতেই শিব এলেন।

কৃষ্ণ বললেন—শিব, পাণ্ডবদের যেসব অস্ত্র আত্মসাৎ করেছ তা ফিরিয়ে দাও। আর ওদের অভিশাপমুক্ত কর।

শিব বললেন—কৃষ্ণ, সবই তোমার মায়ার খেলা। মুখ থেকে যখন অভিশাপ-বাক্য বেরিয়ে গেছে, তা আর কিভাবে রোধ করা যাবে। তা তো বিফল হবে না, কিছুটা ফলবেই। কলিকালে যুধিষ্ঠিরকে বৎসরাজের পুত্র হয়ে জন্মাতে হবে। শিরীষপুরের রাজা হয়ে তার নাম হবে বলখানি। ভীম দারুণ দুর্বাক্য ব্যবহার করেছে। দুষ্ট ম্লেচ্ছ বংশে ওর জন্ম হবে। আর নাম হবে বীরণ। অর্জুন পরিমলের পুত্র হয়ে ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত হবে। নকুল কান্যকুব্জে রত্নভানুর ছেলে লক্ষ্মণ নামে প্রসিদ্ধ হবে। সহদেব মহা বলশালী। রাজা ভীষ্মসিংহের পুত্র দেবসিংহ নামে খ্যাত হবে। শুধু তাই নয়, কলিকালে ধৃতরাষ্ট্রকেও আজমীর-এ জন্মগ্রহণ করতে হবে। তখন নাম হবে পৃথ্বীরাজ, আর দ্রৌপদী হবে তারই মেয়ে।

তাই শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বটে। কলির জন্য সব কিছুর প্রয়োজন আছে। আমাকেও চুপ করে থাকলে চলবে না। আমার শক্তিই তখন এই পাণ্ডবদের রক্ষা করবে। আমারই মায়ায় মায়াদেবী মহাবতী নামে একটা রমণীয় পুরী তৈরি করবে। সেখানে দেবরাজের পুত্র আমারই অংশে উদয়সিংহ নামে জন্মগ্রহণ করবে।

ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যা হবার নয়।

ছত্রিশ বছর রাজত্ব করে পাণ্ডবরা সপরিবারে মহাপ্রস্থানে চলে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কলিকাল এলে শিব-বাক্যে তাঁদের আবার পৃথিবীতে এইভাবেই আসতে হয়েছিল।

ভোজরাজের কথা

রাজা শালিবাহনের বংশের শেষ রাজা ছিলেন ভোজরাজ। যে দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে শালিবাহনের রাজত্ব শুরু হয়েছিল, ভোজরাজের আমলে সে প্রতাপ অনেক কমে গিয়েছিল। এতে ভোজরাজের মনে খুব দুঃখ হয়েছিল। কিভাবে লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়? কোন অভাব তো ভোজরাজের ছিল না। শাস্ত্রবল, লোকবল, অস্ত্রবল সবই ছিল। ভোজরাজের সভা আলো করে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও ছিলেন। সুতরাং অভাব কোথায়?

অনেক ভেবেচিন্তে ভোজরাজ ঠিক করলেন, দিগ্বিজয়ে বের হবেন।

বিক্রমাদিত্য মারা যাবার পর ভারতবর্ষে আবার ম্লেচ্ছ আধিপত্য প্রবল হয়ে উঠেছিল। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ভোজরাজ দিগ্বিজয়ে বের হলেন। সঙ্গে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ, এমনকি কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসও ছিলেন। গান্ধার, কাশ্মীর, নারব, শঠ—বিভিন্ন দেশ জয় করতে করতে এক সময় তিনি সিন্ধুতীরে এলেন। এখানে মহমদ নামে এক আচার্য শিষ্যদের নিয়ে বসবাস করতেন আর ধর্মোপদেশ দিতেন।

রাজা এসে মরুস্থলে মহাদেবের আরাধনায় বসলেন।

আরাধনা করতে করতে একদিন আকাশবাণী শুনলেন—ভোজরাজ, তুমি কালেশ্বরে যাও। বাহিক দেশ ম্লেচ্ছরা নষ্ট করে দিয়েছে। আর্যধর্ম ওখানে আর নেই। পুরাকালে যে ত্রিপুর দৈত্যকে আমি বিনাশ করেছিলাম, আমারই বরে বাহিক দেশকে তাদেরই একজন মোহগ্রস্ত করেছে। তার নাম মহমদ। পিশাচ ধর্মে সে অসম্ভব দক্ষ। তবে, আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

আকাশবাণী শুনে ভোজরাজ ফিরে এলেন।

এদিকে একদিন মায়াবী মহমদ রাজার সঙ্গে দেখা করে বললেন—রাজা, তোমাদের দেবতারা এখন আমাদের দাস, তারা এখন আমাদের এঁটো খায়।

শুনে কালিদাস দারুণ রেগে গিয়ে বললেন—বাহিকাধম, তোমার মুখে এত বড় কথা। তবে দেখ, আমাদের ক্ষমতা কতখানি।

এই বলে ব্রাহ্মণ নিষ্ঠার সঙ্গে দশ হাজার নবার্ণ মন্ত্র জপ করে এমন এক যজ্ঞ করলেন যে, ম্লেচ্ছ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তাই দেখে তো তার শিষ্যরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। গুরুর ছাই সংগ্রহ করে কোনরকমে বাহিক দেশে পালিয়ে এল। তারপর মহদীনপুর নামে একটা জায়গায় এসে তারা সযত্নে তাদের গুরুর ছাই রেখে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে। এই মহদীনপুর এদের কাছে তীর্থস্থান।

একদিন রাতে সেই মায়াবী বিকটাকার মূর্তি নিয়ে ভোজরাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলল—রাজা, তোমাদের আর্যধর্ম শক্তিশালী সন্দেহ নেই। তবে তুমি নিশ্চিত থেকে, আমিও তোমাদের প্রতিপক্ষ ধর্ম পৃথিবীতে স্থাপন করব। তোমাদের ধর্মে অনেক বিধি-বিধান আছে—শিখা রাখতে হবে, খাদ্য বিচার করে খেতে হবে। আমার ধর্মে ওসব থাকবে না। আমার অনুগামীরা দাড়ি রাখবে। তোমাদের প্রতিটি কাজে কুশ লাগে। আমার হবে মুষল।

যাই হোক, আর্যাবর্ত থেকে যে আর্যধর্ম প্রায় লোপ পেয়ে যেতে বসেছিল, ভোজরাজ আবার তা পুনরুদ্ধার করলেন। মুসলমানরা সিন্ধুর অপর পাড়েই থেকে গেল তাদের আচার আচরণ নিয়ে। আর আর্যাবর্তে যারা থেকে গেল তারা ক্রমশ আর্যধর্মের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে বাধ্য হয়ে চলতে শুরু করল।

ভোজরাজ চলে গেলেও কিন্তু এই প্রবাহ থেকেই গেল। দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে আবার ধর্মালোচনা চলতে শুরু করল। ম্লেচ্ছরা আর কোন রকমেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

তাই দেখে কলি 'হায়-হায়' করে উঠল। এ কি হল? শেষে কি তার অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যাবে। সহায় তার একমাত্র বিষ্ণু। একমনে তাই নির্জনে কলি বিষ্ণুকে স্তব-স্তুতি করতে লাগল। বিষ্ণুও কলিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তোমার ভয় নেই কলি, পৃথিবীতে তোমার জন্য ম্লেচ্ছ রাজা আমি স্থাপন করে দেব।

শ্রীচৈতন্যের জন্মরহস্য

কোন এক সময় বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মিষ্টভাষী, সদাচারী এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন ঠিক স্বামীর মতই খুবই পতিব্রতা।

নির্লোভ, নিরহঙ্কার, সুপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা জীবিকা নির্বাহ করতেন ভিক্ষে করে। যেদিন যেমন জুটত, তাতেই সন্তুষ্ট। তাঁর স্ত্রীও তাই। মনে কোন ক্ষোভ নেই, লালসাও নেই। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর এভাবেই দিন যায়।

সকাল হতেই বিষ্ণুশর্মা বেরিয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণী ঘরে একা।

এমন সময় ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির। ব্রাহ্মণীর ঘরে কি-ই বা আছে যে সন্ন্যাসীকে আপ্যায়ন করেন তবুও সাধ্যমত তাঁকে আহ্বান জানালেন।

ব্রাহ্মণীকে দেখে সন্ন্যাসীর মনে খুব কষ্ট হল। একখানা ভাল কাপড়ও নেই যে ভালভাবে পরে থাকে।

সন্ন্যাসী বলল—আমি নদীতে স্নান করতে যাব। আমার কাছে একটা স্পর্শমণি আছে, তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। দেখছি, তোমার ঘরে অনেক লোহার টুকরো পড়ে আছে। আমার এই স্পর্শমণি ঐ লোহাগুলোতে ঠেকিয়ে তুমি সোনা করে নাও। তোমার অভাব দূর হয়ে যাবে।

এই বলে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর কাছে স্পর্শমণি রেখে নদীতে স্নান করতে চলে গেল।

এক টুকরো একটা পাথর, লোহায় ঠেকালেই সোনা—এ কি কম কথা! ব্রাহ্মণী লোভ সামলাতে না পেরে ঘরে যেখানে যত লোহা ছিল, এই সুযোগে সব সোনা করে নিল। ভাবল, যাক এবার দুঃখ ঘুচবে। স্বামীকে আর তার ভিক্ষেয় যেতে হবে না।

ঠিক সময়েই বিষ্ণুশর্মা বাড়ি ফিরে এলেন। ঘরে ঢুকেই তো অবাক। এত সোনা? এত সোনা কোথা থেকে এল? সর্বনাশ!

ব্রাহ্মণীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্রাহ্মণী, সত্যি করে বল, আমার ঘরে এত সোনা কোথা থেকে এল?

ব্রাহ্মণী কোন কিছু গোপন না রেখে সবই বলল।

বিষ্ণুশর্মা শুনে বললেন—খুব অন্যায় করেছ। এত লোভ তোমার মধ্যে কেমন করে এল? স্বয়ং বিষ্ণুর উপাসক আমরা। আমাদের অভাব কিসের? কোথায় সেই স্পর্শমণি রেখেছ, দাও।

ব্রাহ্মণী স্পর্শমণি বার করে দিল।

বিষ্ণুশর্মা সেই স্পর্শমণির সঙ্গে ঘরে যত সোনা ছিল, সব নিয়ে গিয়ে ঘর্ঘরা নদীর জলে ফেলে দিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরেই সন্ন্যাসী স্নান সেরে ফিরে এলেন। ব্রাহ্মণীকে বললেন—কই, আমার স্পর্শমণিটা দাও। সোনা কর নি?

ব্রাহ্মণী কিছু বলার আগেই বিষ্ণুশর্মা বললেন—যাও, তোমার স্পর্শমণি ঘর্ঘরার তটে পাবে।

—কি ফেলে দিয়ে এসেছ ? সন্ন্যাসী তো শুনে রেগে আগুন। জান, সুদীর্ঘকাল সাধনা করার পর শিব সন্তুষ্ট হয়ে ওটা আমায় দিয়েছেন। আমি তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে কিছু ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার জন্য দিলাম। আর তুমি কিনা নিজে ভিক্ষুক হয়ে সেটা ফেলে দিয়ে এলে ? তার মর্যাদা দিলে না ?

বিষ্ণুশর্মা বললেন—অত কথার কি আছে ? মণি তোমার পেলেই তো হল। আমাদের দুঃখ-কষ্ট ইচ্ছে করলে বিষ্ণু ঘোচাবেন। তুমি তার কতটুকু পার ? চল আমার সঙ্গে—তোমার মণি তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে নিয়ে ঘর্ঘরা নদীতে এলেন। তারপর অতি কষ্টে সেই মণি উদ্ধার করে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসীর মনে সন্দেহ। সেই মণিটাই তো ? ব্রাহ্মণের ঘরে এমন আর লোহা নেই, যার সাহায্যে একটু পরীক্ষা করে নেবেন।

বিষ্ণুশর্মা সন্ন্যাসীর মনের কথা বুঝতে পারলেন।

নদীর ধারেই ছিল কাঁটাবনের ঝোপ। তিনি সেই মণি দিয়ে কাঁটাগাছগুলোতে ঠেকাতেই সেগুলো চোখের সামনেই সোনা হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী তো দেখে অবাক। মণি শুধু লোহাকেই সোনা করতে পারে। এছাড়া আর কোন বস্তুকে নয়। তাহলে কাঁটাগাছ সোনা হয়ে যায় কিভাবে ? কে এই ব্রাহ্মণ—ইচ্ছে করলে যিনি প্রভূত ধনের অধীশ্বর হতে পারেন ! নিশ্চয়ই কোন সাধারণ ব্রাহ্মণ নন !

তপস্যা করে সন্ন্যাসী পেয়েছেন স্পর্শমণি। আর এই ব্রাহ্মণ।

মণি ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী এবার বিষ্ণুশর্মার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণের কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন—ব্রাহ্মণ, আপনিই প্রকৃত ধনী। তাই এই ধনকে এমনভাবে অবহেলা করতে পারলেন। দয়া করে আপনার ধন থেকে আমায় কিছু দিন, যাতে আমি মুক্ত হতে পারি।

বিষ্ণুশর্মা বিষ্ণুর উপাসক। বললেন—বিষ্ণু····বিষ্ণু ছাড়া বড় ধন কি আছে ? যে তাঁকে আশ্রয় করে নির্বিকারচিত্তে থাকতে পারে, তার আবার অভাব কি ?

সন্ন্যাসী স্পর্শমণি ফেলে দিয়ে চলে গেলেন।

বিষ্ণুশর্মাও সূর্যতপস্যায় রত হলেন। তাঁর সুদারুণ তপস্যায় সূর্যমণ্ডল তপ্ত হয়ে উঠল। দেবলোক চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ কি চান ? তা জানতেও তাঁদের অসুবিধে হল না। মনে মনে বিষ্ণুশর্মার যেন একটাই কথা—হে বিষ্ণু ! হে সূর্য ! মানুষকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখো না। তাদের মধ্যে চৈতন্য জাগাও। তারা যেন তোমায় জানতে পারে। কলির মোহ কাটাতে পারে।

দেবসভায় দেবগুরু বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—শোন দেবরাজ, ব্রাহ্মণের তপস্যায় সূর্যের তেজ যেভাবে বেড়ে গেছে, তার শক্তিকে একমাত্র তুমি আর শচীই ধারণ করতে পার। সূর্যতেজে বিষ্ণু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তোমরাও ঐ সূর্যের তেজ ধারণ করে মর্ত্যে যাও।

গুরুদেবের আদেশ। অমান্য করার উপায় নেই।

মর্ত্যে এলেন এক ব্রাহ্মণ। সূর্যের মত তেজস্বী। ইন্দ্রপত্নী শচীও এলেন সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে। দেখতে ঠিক যেন জগৎ-জননী।

ঠিক এক বছর পর, এঁদেরই ঘর আলো করে এক নবজাতক এলেন। অপূর্ব গৌরবর্ণ তাঁর দেহকান্তি। চোখ দুটি যেন টানা টানা পদ্মের পাপড়ি। মুখে মৃদু-মৃদু হাসি। সেই শিশু জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বাতাস যেন আনন্দে নেচে উঠল। অন্তরীক্ষ থেকে যেন দেবতাদের স্তবগান ভেসে এল : 'শচীনন্দন ! যুগে-যুগে তুমিই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে, কখনো হংস, কখনো মৎস্য, কখনো কূর্ম, কখনো বরাহ হয়ে। পৃথিবীকে তুমিই উদ্ধার করেছ সমূহ বিপদ থেকে। কলির প্রতাপে মানুষ আত্মজ্ঞান হারিয়েছে। তার স্রষ্টাকে তারা অস্বীকার করে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে। মায়া-মোহ তাদের গ্রাস করেছে। হিংসা-দ্বেষে জর্জর হয়ে নিজেদের সত্তাকে তারা হারাচ্ছে। পৃথিবীর এই ঘোর দুর্দিনে তোমার আবার আবির্ভাব হল। শচীর পুত্র হয়ে তুমি মানুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে, তাদের চৈতন্যকে ফেরাবার জন্য। পৃথিবীতে তুমি অবতার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। উদ্ধার কর···কলিহত মানুষকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার কর'।

[ইতিহাস বলে, একদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য, আর একদিকে যবন-শক্তি যখন ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তখন নদীয়ায় 'শ্রীচৈতন্যের' আবির্ভাব। সুপণ্ডিত। সর্বশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং খুব অল্প বয়সেই তিনি পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গৃহী হয়েও তিনি ঘর-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। যেখানে যত বিভেদ ছিল, প্রেমের বন্যায় তিনি তা সব ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গতি এমনি অপ্রতিহত ছিল যে, বৌদ্ধ এবং যবন দুজনকেই থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল।]

শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব

ব্রাহ্মণ ঘরের অতি বখাটে এক ছেলে। মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজনের কোন শাসনই সে মানত না। ব্রাহ্মণের যে কাজ তা তো সে করতই না। বরং ঠিক তার বিপরীত কাজ করত।

পরিবারের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। বড় ছেলে, স্বাভাবিকভাবেই সংসার প্রতিপালনের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের ভার তার ওপর এসে পড়ল। লেখাপড়া হল না। মূর্খ হয়েই রইল। সেই সঙ্গে তার ভেতর যত বদগুণ গজিয়ে উঠল। ভিক্ষে করে, লোকের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে তো আর সংসার চালানো যায় না। তাই শিকার আর দস্যুবৃত্তিকেই নিজের জীবিকা হিসেবে সে বেছে নিল। মনটাও সেই সঙ্গে খুবই কুটিল হয়ে উঠল। যত রাগ গিয়ে পড়ল তার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যদের ওপর। ধন-সম্পত্তির মালিক সাধারণত এঁরাই। আবার এঁদের ওপর গুরুগিরি করে ব্রাহ্মণরা বেশ বহাল তবিয়তে থাকেন।

ব্রাহ্মণ যুবক তীর-ধনুক নিয়ে বনের পথে ওৎ পেতে থাকে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য গেলে তো ধন-সম্পত্তি লুট করে নেয়ই। ব্রাহ্মণকে পেলে তার আর হেনস্থার শেষ রাখে না। গলা থেকে পৈতে কেড়ে

নিয়ে ছিঁড়ে দেয়। বিদ্রূপবাণে জর্জর করে। সঙ্গে যা থাকে তা তো কেড়ে-কুড়ে নেয়ই। শুধু যা, প্রাণে মারে না। একেবারে খাঁটি যেন এক নিষ্ঠুর ব্যাধ। তার ভয়ে সবাই তটস্থ। চট্ করে ওপথ কেউ আর মাড়াতে চায় না। সকলের মুখে একই কথা—ব্রাহ্মণ বংশে এ কি কুলাঙ্গার।

এইভাবে যখন বেশ কিছুদিন কেটে গেল, ব্রাহ্মণদের দুর্দশা যখন চরম সীমায়, সবাই তখন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হল। ব্রহ্মা গেলেন সপ্তর্ষির কাছে। মরীচি, অত্রি, বশিষ্ঠ প্রমুখ সপ্তঋষি—তাঁরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মারই মানসপুত্র। ব্রহ্মা ভেবে দেখলেন—কুলাঙ্গার ঐ ব্রাহ্মণ যুবককে যদি কেউ বাগে আনতে পারে তা এঁরাই পারবেন।

ব্রহ্মাকে আসতে দেখেই সপ্তঋষি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—বলুন, কি আদেশ?

ব্রহ্মা তখন তাঁদের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন—দেখ তো, এর কোন বিহিত করতে পার কি না?

ব্রহ্মা চলে গেলেন। মরীচি-আদি, সাত ঋষিও সাধারণ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেই বনপথে এলেন।

সেই বনটার নাম ছিল উৎপলারণ্য।

প্রতিদিনের মত ব্যাধ-ব্রাহ্মণ ধনুক-বাণ নিয়ে সেখানে বনের আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে। কখন শিকার আসবে।

এমন সময় দেখল সাত ব্রাহ্মণ আসছে। সঙ্গে বেশ কিছু পোঁটলা-পুঁটলি। ব্যাধ যুবকের মন আনন্দে নেচে উঠল। বড় জবর শিকার আজ তার ভাগ্যে জুটে গেছে।

কাছাকাছি আসতেই আড়াল থেকে ব্যাধ-ব্রাহ্মণ ঝপ করে বেরিয়ে এসে তাঁদের পথ আগলে দাঁড়াল। বেশ বলিষ্ঠ যুবক। মাথায় পাগড়ি। কানে কুণ্ডল। হাতে ধনুক-বাণ। মুখটি সুন্দর হলে কি হবে, চোখ-দুটি জবাফুলের মত লাল।

ব্রাহ্মণদের হুমকি দিয়ে উঠল সে—দাঁড়াও। সঙ্গে কি আছে?

ঋষিরা থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই মরীচি। সবাই যে খুব একটা ভয় পেয়ে গেছেন, তা দেখে মনে হয় না।

মরীচি বললেন—আমরা ব্রাহ্মণ। তুমি দেখতেই পাচ্ছ গলায় আমাদের পৈতে। ভিন্ গাঁয়ে ভিক্ষেয় গিয়েছিলাম। এখন ফিরছি।

ব্যাধ-যুবক খুব একটা কটু মন্তব্য করে বসল—ব্রাহ্মণ! সব ভণ্ডের দল। আমি ব্রাহ্মণও বুঝি না, আর সব কি আছে তাও বুঝি না। আমি বুঝি, তোমাদের সঙ্গে যা থাকবে তা লুট করে নিয়ে যেতে হবে। স্বেচ্ছায় না দাও, তাহলে হাতের এই ধনুক-বাণ দেখতেই পাচ্ছ! আগে পৈতে ছিঁড়বো, শিখা কাটব। তারপর…।

মরীচি বললেন—বুঝতে পারছি, তোমার হাত থেকে নিস্তার নেই। ঠিক আছে, তোমাকে সবই দিয়ে যাব। তার আগে, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। করবে?

ব্যাধ-যুবক দেখল, শিকার হাতের মুঠোয়। বলল—আলাপ আবার কি? আমার অত সময়-টময় নেই। কি বলবার আছে চটপট বল।

মরীচি বললেন—দেখে তো মনে হচ্ছে, তুমিও কোন ব্রাহ্মণ ঘরেরই ছেলে। তা, এমন সব অপকর্ম করছ কেন? কার জন্য করছ?

—অপকর্ম! ব্যাধ-যুবক খিঁচিয়ে ওঠে। জান, আমার একটা সংসার আছে। বৃদ্ধ অথর্ব মা-বাবা, স্ত্রী। লেখাপড়া শিখতে পারিনি যে, তোমাদের মত যাগ-যজ্ঞ করে খাব বা সংসার চালাব।

—তাই বলে আর একজনের কেড়ে নিতে হবে? তারও তো সংসার আছে। তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের অপমান করছ। এটা কত বড় পাপ কাজ করছ জান?

—পাপ?

—নিশ্চয়ই পাপ। এর জন্য তোমাকে কিন্তু দারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

—দেখ, ওসব ছেঁদো কথায় আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরো না। শক্ত-সামর্থবান হয়েও যে ছেলে মা-বাবাকে খাওয়াতে পারে না, সে-ই পাপী। বিয়ের পর স্ত্রীকে যে খাওয়াতে পারে না, সে-ই পাপী। আমি কোন পাপ কাজ করিনি। ওসব ছাড়ো তো। সঙ্গে যা আছে, দিয়ে সরে পড়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।

মরীচি বললেন—বলেছি তো, তোমায় সবই দিয়ে যাব। তবু বলব, তুমি যেভাবে তাদের প্রতিপালন করছ, তাতে পাপই হচ্ছে। আমাদের কথা বিশ্বাস না হয়, তাদেরই জিজ্ঞেস করে এস, তারা তোমার পাপের ভাগ নেবে কি না?

—তুমি তো খুব ফন্দিবাজ, দেখছি হে। খিঁচিয়ে ওঠে ব্যাধ যুবক —আমি জিজ্ঞেস করতে যাই, আর সেই ফাঁকে তোমরা কেটে পড়। বাঃ…।

—আমরা ব্রাহ্মণ, কথা দিচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস করে তুমি নিশ্চিন্তে জিজ্ঞেস করে আসতে পার।

ব্যাধ-যুবকের কেন যেন মনে হল—না, এরা পালাবে না। এ যাবৎ অনেককেই তো দেখেছে সে। তাকে দেখলেই ভয়ে তাদের যেন বুক শুকিয়ে যেত। আর চেষ্টা করত কখন পালাবে। এরা যেন একেবারে উল্টো।

—ঠিক আছে। আমি কিন্তু যাব আর আসব। বলছ যখন, না হয় জিজ্ঞাসাই করে আসছি। যদি পালাবার চেষ্টা কর, তাঁহলে কিন্তু জেনে রেখো, এ-শর্মার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

এই বলে, ব্যাধ যুবক ঘরের দিকে ছুটল। ঘর বেশি দূরে নয়।

সামনেই মা-বাবাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—আমি যে লুটপাট করে এনে তোমাদের খাওয়াই, এটা কি আমার পাপ কাজ? ব্রাহ্মণ হত্যা কি পাপ? এর ফলভোগী কি তোমরাও?

—পাপকাজ তো বটেই, বাবা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই অপকর্ম করে আমাদের তোমাকে খাওয়াতে হচ্ছে। মা-বাবা জবাব দিলেন।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে, স্ত্রীও সেই একই কথা বলল।

শুনে ব্যাধ যুবকের মন এবার দারুণ খারাপ হয়ে গেল। কেউ বলল না যে, আমি ঠিক কাজ করছি! আমি কোন অন্যায় করছি না! সকলেরই মুখে এই কথা যে, দুর্ভাগ্য তাদের যে আমি এইভাবে রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছি! তারাই বলছে, আমি পাপ কাজ করছি আর এর ফল আমাকেই ভুগতে হবে? কেউ তার ভাগ নেবে না? আশ্চর্য!

এবার সে প্রায় উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে এসে তীর-ধনুক ছুঁড়ে ফেলে ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল— আমি পাপী...পাপী...মহাপাপী। আমাকে উদ্ধার করুন। বলুন কি করলে আমি এই পাপ থেকে মুক্তি পাব?

মরীচি বললেন—ওঠ...ওঠ। শোন, এক 'রাম'-নামে সব পাপ দূর হয়ে যায়। তুমি এইখানে বসে 'রাম' নাম জপ কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণদের ছেড়ে দিয়ে ব্যাধ যুবক মা-বাবা-স্ত্রী সবার কথা ভুলে 'রাম' নাম জপ শুরু করে দিল। তাই দেখে ঋষিরাও চলে গেলেন। বনপথ নির্ভয় হল! ব্রাহ্মণরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ব্যাধ যুবক মূর্খ, নিরক্ষর। জিভের জড়তাও তার ভাঙে নি। 'রাম' নাম সে কিন্তু উচ্চারণ করতে না পেরে 'মরা' 'মরা' বলেই জপ করতে গিয়ে এবার সে সব কিছু ভুলে গেল। সে যে মানুষ, তার একটা শরীর আছে, সে-কথাও তার মনে রইল না। না-খাওয়া, না-ঘুম। কত বছর যে তার এইভাবে কেটে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সারা শরীরটা তার উইপোকা খেতে খেতে কখন যে শুধুমাত্র মাটির ঢিবি করে দিয়েছে তা সে জানতেও পারে নি।

বহুকাল পর মরীচি এসে যুবকের ঐ অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। বললেন—ওঠ, তোমার সব পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে। আজ থেকে রামের অনুগ্রহে পৃথিবীতে তুমি বাল্মীকি মুনি নামে প্রসিদ্ধ হবে। বাল্মীকি এরপর অমর মহাকাব্য 'রামায়ণ' রচনা শেষ করে সেখানেই শিব-ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। শেষে এমন হল যেন নিজেই শিব হয়ে উৎপলারণ্যে থেকে গেলেন। আজও তিনি সেখানেই আছেন।

আমাদের এই বৈবস্বত মনু মহারাজের আমলে যখন প্রথম সত্যযুগ এসেছিল, সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মা এই উৎপলারণ্যেই যজ্ঞ করেছিলেন। অনেক, অনেক কিছুই ব্রহ্মা এই সময় সৃষ্টিও করেছিলেন। প্রজাপতিদের মধ্যে এই সময় তিনি দক্ষকেও সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ আবার স্রষ্টা হিসেবে অদ্বিতীয়। তাই সব দেবতারাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে চলত, প্রণাম জানাত। কিন্তু মহাদেব তাঁকে গ্রাহ্য করতেন না। তাই দক্ষ মনে মনে মহাদেবের ওপর খুব চটে ছিলেন।

একবার দক্ষ বিরাট এক যজ্ঞ করলেন। সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন, শুধু মহাদেবকে বাদ দিলেন। তাই দেখে সেই অমর মৃগ-ব্যাধ দারুণ রেগে গিয়ে বীরভদ্র হলেন। তিন মাথা, তিন চোখ, তিন পা। বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ তো লণ্ডভণ্ড করলেনই, এমন কি শিবহীন সেই যজ্ঞে যেসব মুনি দেবতারা ছিলেন তাঁদেরও কম হেনস্থা করলেন না। যারা শিবের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তারাও শিবের শরণাপন্ন হল দেখে বীরভদ্র শান্ত হয়ে আবার শিবরূপ ধারণ করলেন, শান্ত হলেন। এরপর দক্ষের যজ্ঞ নির্বিঘ্নেই হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, কলিযুগে যাতে মানুষজন শিবকে ভুলে না যায়, সর্বদা শিবের আরাধনা করে, তার জন্য বীরভদ্র নামে সেই অমর মৃগ-ব্যাধ(বাল্মীকি) নিজের কিছুটা অংশ দিয়ে পৃথিবীতে একজন ব্রাহ্মণকে পাঠালেন। তাঁর নাম হল ভৈরবদত্ত। এই ব্রাহ্মণ ভৈরবদত্তের ঘরে তিনি নিজে আর এক বিশাল অংশ নিয়ে আবির্ভূত হলেন, পৃথিবীর মানুষকে শিব এবং শৈব ধর্ম কি, তা ভাল করে জানাবার জন্য, যাতে কলির হাতে বেশি মার না খেয়ে সহজে মুক্তি পেতে পারে। তার নাম হল শঙ্কর—'শঙ্করাচার্য'।

(শ্রীচৈতন্যদেবের মত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যকেও হিন্দুরা একজন অবতার পুরুষ বলে মনে করেন। বর্তমানে ধর্মজগতে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এঁরা প্রণম্য।)



কল্কি পুরাণ

উপ-পুরাণগুলির মধ্যে কল্কি পুরাণ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রোমহর্ষণ সূতের পুত্র উগ্রশ্রবা এই পুরাণের বক্তা এবং শৌনকাদি ঋষিরা এর শ্রোতা। কল্কি পুরাণ কে প্রথম সঙ্কলন করেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কিন্তু অনেকের মতে, বৎসমুনির পুত্র কাত্যায়ন-শিষ্য মহামুনি বাৎস্যায়ন।

এই পুরাণে কলিযুগের শেষে কল্কিদেবের আবির্ভাব, অলৌকিক শক্তিবলে দিগ্বিজয় এবং ম্লেচ্ছ নিধনের পর কিভাবে আবার সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা হল, তারই বিবরণ আছে।

দশাবতারের মধ্যে সর্বশেষ এই কল্কি অবতারকে অনেকেই প্রশস্তি জানিয়েছেন। তার মধ্যে ভক্তকবি জয়দেবের প্রশস্তিটি হল—

'ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশবধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।।'

কল্কি পুরাণকে ভাগবতের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটিকে বলা হয়েছে 'অনু ভাগবত'।

কল্কির আবির্ভাব

কলির কি অপ্রতিহত প্রভাব!

স্রষ্টার এই সৃষ্টি সুন্দর একটা নিয়মে বাঁধা ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—যার জন্য যে কাজ নির্দিষ্ট ছিল, কলির প্রভাবে তা সব গেল। বেদশাস্ত্রকে মেনে যে আর্যধর্ম গোটা পৃথিবীকে একটা সুতোয় বেঁধে রেখেছিল, কলি এসে সে সুতো ছিঁড়ে দিল। স্লেচ্ছ ধর্ম, স্লেচ্ছ ভাষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নিজ নিজ আচার, বিচার,ধর্ম নিয়ে এক একটা গোষ্ঠী স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠল। কেউ আর কাউকে মানতে চায় না, সহ্য করতে পারে না। মন থেকে উদারতা উধাও হয়ে গেল। কপটতায় সবার মন ভরে গেল। হিংসা, রাগ, কুটিলতা ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল। মানুষ এত বেশি স্বার্থপর হয়ে গেল যে, অন্যের দিকে তাকাবার আর তাদের সময় নেই। নিজে কিভাবে সুখে, ভোগে থাকবে, সব সময় সেই চেষ্টাতেই তারা তৎপর হয়ে উঠল। প্রকৃত ধর্মকর্ম লোপ পেতে লাগল। ফলে আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় এমনভাবে পেয়ে বসতে শুরু করল যে, জীবনের পরমায়ুও কমে যেতে লাগল।

কলির প্রভাবে ব্রাহ্মণ শুধু পৈতেধারী নামে ব্রাহ্মণ হয়ে রইল। তার চরিত্র বদলে গেল। ঠিক তেমনি ভাবেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররাও বদলে গেল। ধনীরা হতে থাকল সাধু। আর সাধুরা চোর। মদ, মাংস, সুদের কারবার ঘরে ঘরে যেন মা-বাবার চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র হতে থাকল। মুখে ধর্মের বুলি, ভেতরে শয়তানি। যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে, তেমন মেয়েদের ক্ষেত্রেও। স্রষ্টার নিয়মে পুরুষের ধর্মকাজে স্ত্রী হয়ে তারা সাহায্য করত, তাই তাদের বলা হত সহধর্মিণী। তারাও কলির প্রভাবে পড়ে এমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, স্বামীকেই অবহেলা করতে শুরু করে দিল। বলতে গেলে এমন স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে উঠতে লাগল যে, রীতিমত বিস্ময়ের। কুমারী-সধবা-বিধবা—এ যেন আর চিনবার উপায় থাকল না।

স্বভাব যখন মানুষের মধ্যে বদলায় তখন প্রকৃতির মধ্যেও তার রূপ ফোটে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কখনো খরা, কখনো বন্যা। যে পরিমাণ শস্য আগে ফলত, এর ফলে তাও কমতে শুরু করল। বিদেশ হল তীর্থ। প্রজারা করভারে প্রায় মারা যাবার অবস্থায়। হতভাগ্য প্রজার দল যে কোথায় যাবে, তার কোন কূল-কিনারা নেই।

কলি দেখে আর হাসে। যুগের ধর্ম কি সুন্দরভাবেই না সে পালন করে চলেছে।

বসুমতীর চোখে জল। এত অত্যাচার তাঁর সইবে কেন? স্বর্গবাসী দেবতারাও দেখে হতচকিত। প্রজারা বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত ভুলে গেল। কৃষ্ণের নিন্দা শুরু করল।

তাঁরা তখন নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। গিয়ে তাঁকে পৃথিবীর কথা জানাতে তিনি বললেন—চল, বিষ্ণুর কাছে যাই। তিনিই এর একমাত্র বিহিত করতে পারবেন।

বিষ্ণু তখন গোলোকে। দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা এসে বিষ্ণুর স্তব-স্তুতি করে তাঁকে সব কথা বললেন। বিষ্ণু শুনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন—ব্রহ্মা, তুমি যখন বলছ, তখন দেখছি পৃথিবীতে আমাকে আবার একবার যেতেই হয়। ঠিক আছে, যাব। শম্ভল গ্রামে (মোরাদাবাদ জেলায়) সুমতি নামে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের বাড়িতে কল্কি নামে জন্মগ্রহণ করব। ব্রহ্মা, দেবগণ, তোমাদেরও কিন্তু পৃথিবীতে গিয়ে আমার কাজে আমায় সাহায্য করতে হবে। অধর্ম যখন মাথা চাড়া দিয়ে সৃষ্টিকে বিপর্যস্ত করবে, তখন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা আর ধার্মিকদের রক্ষা করার জন্য আমাকে পৃথিবীতে যে যেতেই হবে। এ যে আমার প্রতিশ্রুতি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। কলির বিনাশ আমি অবশ্যই করব।

নিশ্চিন্ত মনে সবাই চলে গেলেন।

শম্ভল নগরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বিষ্ণুযশা আর সুমতি। তাঁদের নিষ্ঠা আর ধর্মপরায়ণতার জন্য সকলের কাছেই তাঁরা শ্রদ্ধেয়। ইতিমধ্যে তাঁদের ঘরে এসেছে তিনটি সন্তান। তাদের নাম—কবি, প্রাজ্ঞ আর সুমন্তক। রাজা বিশাখযূপ এঁদের খুবই অনুরাগী। এরপর শুভদিনে, শুভক্ষণে ভগবান বিষ্ণু কথামত বিষ্ণুযশার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন।

চতুর্থ এই পুত্রটি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভল নগরের আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক। কি অপরূপ মুখকান্তি, দেহের গড়ন! কি অপরূপ চোখের চাউনি!

পুত্রকে দেখে যখন মা-বাবা বিহ্বল, দেখলেন পরশুরাম, কৃপ, ব্যাস, অশ্বত্থামা (এঁরা অমর) অল্পবয়সী সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির। ব্রাহ্মণ তাঁদের যথোচিত সৎকার করলেন। নবজাতক পুত্রকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন—বিষ্ণুযশা, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কলিকে প্রতিহত করার জন্য তোমার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁর নাম কল্কি। তুমি এঁকে যত্ন কোরো।

যত্নের কথা এরপর কি আর বলার দরকার করে? স্বয়ং বিষ্ণু এসেছেন তাঁদের ছেলে হয়ে, বার্তা চারদিকে রটে গেল। শম্ভল নগর উত্তাল হয়ে উঠল। এমনকি করাজা বিশাখযূপ পর্যন্ত স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এসে নবজাতককে প্রণাম জানিয়ে গেলেন। এই বিশাখযূপ ছিলেন মাহিষ্মতী নগরীর (বর্তমান নর্মদা তীরে চূলীমহেশ্বর) রাজা। খুবই ধর্মপরায়ণ।

ঠিক বয়সেই বিষ্ণুযশা তাঁর উপনয়ন দিলেন। গুরুকুলে পাঠালেন বেদ অধ্যয়ন করার জন্য।

কল্কি চলেছেন গুরুর সন্ধানে। পথে মহেন্দ্র পর্বত (ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে গোন্দবন পর্যন্ত প্রসারিত)। অমর পরশুরাম এখানেই থাকতেন। তিনিই কল্কিকে ডেকে বেদ থেকে শুরু করে সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করালেন। শুধু তাই নয়, অস্ত্রবিদ্যা এবং ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী করে তুললেন। তারপর বললেন—কল্কি, তুমি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেছ কলিকে দমন করার জন্য। যাও, পৃথিবীকে ভারমুক্ত কর। সেটাই হবে তোমার গুরু দক্ষিণা।

এরপর কল্কি শিবের আরাধনায় বসলেন। একমনে শিবের

স্তব-স্তুতি করতে. একদিন পার্বতীর সঙ্গে তিনি ষাঁড়ের পিঠে চেপে কল্কিকে দেখা দিলেন। বললেন—কল্কি, তোমার স্তবে আমি তুষ্ট। আমি তোমাকে এই ঘোড়া দিচ্ছি। দ্রুতগামী তো বটেই, এমনকি মুখে কিছু না বললেও, তোমার মনের অভিপ্রায় বুঝে এই ঘোড়া তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। এই শুক পাখিকে তোমায় দিচ্ছি। জানবে, মহাপণ্ডিত এই শুক তোমাকে সব কাজে সাহায্য করবে। আর এই রত্নতসরু (হাতল রত্নখচিত) তলোয়ার তোমায় দিচ্ছি। অতি বড় শত্রুও তোমার এই তলোয়ারের আঘাত সহ্য করতে পারবে না।

মহেশ্বরের দেওয়া উপহারগুলি নিয়ে কল্কি বহুদিন পর আবার রাজার মত ফিরে এলেন শম্ভল গ্রামে। মা-বাবাকে প্রণাম করে সব কথা খুলে বললেন। বিষ্ণুযশা-সুমতির বুক আনন্দে, ভক্তিতে, গর্বে ফুলে উঠল। কল্কির যেসব বন্ধুবান্ধব ছিল সেই গর্গ, ভর্গ, বিশাল প্রভৃতি যে-যেখানে ছিল, বন্ধুকে দেখার জন্য ছুটে এল। এমনকি রাজা বিশাখযূপও এসে প্রণাম করে তাঁর অনুগামী হলেন।

রাজার সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর কল্কি বললেন—রাজা, তুমি অশ্বমেধ আর রাজসূয় যজ্ঞ কর। আমি তোমাকে সাহায্য করব। সুপ্রাচীন চন্দ্র আর সূর্য রাজবংশের দুই ধার্মিক রাজপুরুষ দেবাপি আর মরু এখনো হিমালয়ে রয়েছেন। কলিকে দূর করে তাঁদের সিংহাসনে বসিয়ে, চল আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব।

রাজা বিশাখযূপও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কারণ, কল্কি তাঁর কাছে আর কোন সাধারণ বীরপুরুষ নন, স্বয়ং বিষ্ণু। বিষ্ণুর আদেশ অমান্য করার সাধ্য কি ? তাছাড়া বিষ্ণু নিজে যখন সহায়, তখন অশ্বমেধ আর রাজসূয় যজ্ঞ কি আর এমন ব্যাপার ?

কল্কি-পদ্মাবতী সংবাদ

সিংহলের রাজা বৃহদ্রথ আর রানী কৌমুদী।

একদিন সারা সিংহল আলো করে রাজপ্রাসাদে একটি ফুটফুটে মেয়ের জন্ম হল। ঠিক যেন একটা গোটা পদ্মফুল। মেয়ের মুখ দেখে রাজা-রানীর মন আনন্দে ভরে গেল। মেয়েটির নাম রাখলেন পদ্মাবতী।

মেয়েটি যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, সকলেই অবাক হয়ে দেখতেন, আর পাঁচটা মেয়ের মত সাধারণ কোন খেলনা নিয়ে সে খেলত না। মাটি দিয়ে নিজের মনে শিবলিঙ্গ তৈরি করত, বাগান থেকে ফুল তুলে এনে তাঁর পুজো করত। আর তা নিয়ে এমনি মেতে থাকত, সে স্নান-খাওয়াও ভুলে যেত। রানী কিন্তু সবই দেখতেন আর ভাবতেন, এইটুকু বয়সেই কে ওকে অমন করে শিবের পুজো শেখাল ?

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। পদ্মাবতী যত বড় হয়ে ওঠে, তত বেশি তার সময় কাটতে থাকে। আর রূপ-লাবণ্যও তত বেশি ঝলমল করে উঠতে থাকে।

একদিন এভাবে শিবের পুজো করছে পদ্মাবতী, হঠাৎ শিব আবির্ভূত হলেন। বললেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক পদ্মাবতী। স্বয়ং বিষ্ণুই তোমার স্বামী হবেন। তিনি ছাড়া আর কেউ নন। তোমাকে দেখে যে পুরুষের মন চঞ্চল হয়ে উঠবে, সে কিন্তু তক্ষুণি নারী হয়ে যাবে।

শিব তো বর দিয়ে চলে গেলেন। পদ্মাবতীর মাথায় তো যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সামান্য একজন রাজকন্যা সে। আর কোথায় ভগবান বিষ্ণু। মায়ের কাছে কিন্তু শিবের বরদানের কথা গোপন করল না।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। পদ্মাবতীর বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। রাজা বৃহদ্রথ বেশ চিন্তায় পড়লেন। রাজপুত্রের অভাব নেই। কিন্তু এমন মেয়েকে প্রাণ ভরে কার হাতে দেওয়া যায় ? রানীকে একদিন মনের কথা বললেন। রানী এবার রাজাকে শোনালেন, শিবের কাছ থেকে তাঁদের মেয়ে কি বর পেয়েছে, তার কথা। শুনে রাজা যতটা বিস্মিত, ততখানি অবাক। বিষ্ণু, মানে স্বয়ং ভগবান, হবেন তাঁদের জামাই ! এ কি ভাবা যায় ? কিন্তু শিবের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তাহলে, নিশ্চয়ই তিনি কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন। কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে রাজার মনে আর একটা প্রশ্ন খেলে গেল। পদ্মাবতী নামে যে মেয়েটি তাদের ঘরে জন্মেছে তাহলে সে কে ? স্বয়ং লক্ষ্মী ! ভাবতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে যায় রাজার।

অনেক ভেবে চিন্তে রাজা বৃহদ্রথ মেয়ের বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন বলে ঠিক করলেন। শিবের বরে ভগবান বিষ্ণুই যদি এর স্বামী হন, তাহলে এই সভায় নিশ্চয় তিনি আসবেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, রাজা বৃহদ্রথের মেয়ে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভা। কুলে-শীলে-মর্যাদায় রাজার যথেষ্ট সুনাম। পদ্মাবতীর নামও প্রায় অজানা নেই কারো কাছে। অমন মেয়েকে বিয়ে করা, অমন রাজার সঙ্গে আত্মীয়তা করা, কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

সারা সিংহল যেন উৎসবে মেতে উঠল। পথে পথে অপূর্ব সব তোরণ। ফুলে আর আলোয় সিংহল যেন স্বর্গপুরী হয়ে উঠল। আর স্বয়ম্বর সভা ? তার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা চলে না। ইন্দ্রপুরীও হার মেনে যায়।

নির্দিষ্ট দিনে একের পর এক রাজপুত্ররা আসতে শুরু করলেন। সকলেই সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র। কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ার পিঠে। প্রত্যেকের পরনে ঝলমলে পোশাক। নানা অলঙ্কার। দেখতে দেখতে স্বয়ম্বরসভা রাজপুত্রে ভরে গেল। প্রত্যেককেই রাজা-রাজপুরুষরা মর্যাদা দেখিয়ে এক একটা আসনে বসালেন।

এরপর রাজা বৃহদ্রথ অন্দরমহলে খবর পাঠালেন পদ্মাবতীকে আনতে।

অল্পক্ষণের মধ্যে পদ্মাবতী এল সভায়—যেন কোন অপ্সরা। সঙ্গে সখীর দল। হাতে ফুলের মালা। একটা একটা করে পা ফেলে সভার মাঝখানে এল পদ্মাবতী। তাকে দেখামাত্রই রাজপুত্ররা দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল বিপর্যয়। রাজা বৃহদ্রথ মেয়েকে নিয়ে পতি-নির্বাচনের জন্য একের পর এক রাজপুত্রের পরিচয় দিতে যাবেন কি, অবাক হয়ে দেখলেন, আসনে যারা বসেছিল, তাদের

মধ্যে একজনও আর পুরুষ নেই। সকলেই মেয়ে হয়ে গেছে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মেয়ের সখীদের দলে ভিড়ে গেছে।

হতাশ হলেন রাজা বৃহদ্রথ। হতাশ হল পদ্মাবতীও। তার হাতের মালা হাতেই থেকে গেল। সারা সিংহল মূহ্যমান হয়ে পড়ল।

পদ্মাবতী নিজের মনেই কেঁদে উঠল—হা শিব, এ কি বর তুমি আমায় দিলে? এতগুলো রাজপুত্র নারী হয়ে গেল? কোথায় নারায়ণ?

কল্কি তখন শম্ভল নগরে রাজা বিশাখযূপ আর নগরবাসীর সঙ্গে সবেমাত্র ধর্মালোচনা শেষ করেছেন। বিদায় নিয়েছেন সবাই। এমন সময় শুকপাখি কল্কির কাছে এসে হাজির হল।

কল্কি বললেন—শুক, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? বহুক্ষণ তোমায় দেখিনি। মনটা বড় ছটফট করছিল।

শুক বলল—প্রভু, সিংহলে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে শুনলাম, রাজা বৃহদ্রথের মেয়ে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভা। আড়াল থেকে সেই সভা দেখছিলাম।

এরপর সেখানে যা যা ঘটেছিল আদ্যোপান্ত সব বলে বলল—প্রভু, আমি জেনে এসেছি, আপনিই তাঁর স্বামী। কেন অযথা আমার মাকে কষ্ট দিচ্ছেন?

শুনে কল্কিদেব মুচকি একটু হেসে বললেন—তাই নাকি শুক? তুমি ঠিক জেনে এসেছ তো?

—না জেনে কি আর এতদূর দৌড়ে এলাম। আহা, পদ্মাবতী বড় বিলাপ করছেন।

কল্কিদেব বললেন—শোন শুক, তোমাকে আর একবার সিংহল যেতে হবে।

শুক বলল—আদেশ করুন।

—পদ্মাবতীকে গিয়ে শুধু বলে আসবে, আমি খুব শিগ্‌গির আসছি।

শুক সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে এসে হাজির হল। কিন্তু কিভাবে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করা যায়? দেখল, যে ঘরে পদ্মাবতী আছে, তারই জানলার পাশে একটা নাগকেশরের গাছ। শুক জানলার কাছাকাছি তারই ডালে বসে বলে উঠল—রাজকুমারী, রাজকুমারী, তোমার স্বামী বিষ্ণু শীগ্‌গির আসছেন।

কথা শুনে পদ্মাবতী চমকে উঠে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল, নাগকেশরের ডালে এক শুক পাখি। শুক ঐ একই কথা আবার বলে উড়ে শম্ভল নগরে চলে এল।

এর কিছুদিন পর কল্কিদেব শিবের দেওয়া সেই দিব্য ঘোড়ায় চেপে সঙ্গে শুককে নিয়ে মুহূর্তে সিংহলে পৌঁছে গেলেন। তারপর সেখানে একটা সরোবর দেখে তারই সোপানে বসলেন।

শুক পাখি আবার উড়ে গেল সেই নাগকেশরের ডালে। জানলা দিয়ে দেখল, খাটে শুয়ে পদ্মাবতী, চারপাশে সখীরা।

ডাকল—রাজকুমারী, ও রাজকুমারী, বিষ্ণু যে তোমার জন্য শম্ভল নগর থেকে এসে সরোবরের সোপানে বসে আছেন।

শোনামাত্রই বিছানা থেকে পদ্মাবতী ধড়মড় করে উঠে বসল। ততক্ষণে শুক নাগকেশরের ডাল ছেড়ে চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সখীদের ডেকে বলল—চল, সরোবরে স্নান করে আসি।

রাজকন্যা যাবে সরোবরে রাজপথ দিয়ে। পাল্কি এসে হাজির হল। পদ্মাবতী পাল্কিতে উঠে বসল। সঙ্গে সখীর দল। রাজপথ দিয়ে রাজকন্যাকে আসতে দেখে শহরের মেয়েরা ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পুরুষরা যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল, পাছে দেখামাত্রই নারী হয়ে যায়!

সরোবরে এসে রাজকন্যা দেখল, সত্যিই অপরূপ এক যুবাপুরুষ চোখ বুজে শুয়ে আছেন সোপানে। একটু তফাতেই সেই শুক।

শুক বলল—তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাজকন্যা, ডেকে তোলো।

পদ্মাবতীর বুক কেঁপে ওঠে। শুককে বলল—শুক, আমার বড় ভয়। চোখ চেয়ে আমাকে দেখামাত্রই যদি উনি নারী হয়ে যান?

সবেমাত্র পদ্মাবতীর কথা শেষ হয়েছে। কল্কিদেব চোখ মেলে তাকালেন। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—না পদ্মাবতী, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। বৈকুণ্ঠে তুমিই ছিলে আমার পাশে। এখানেও তুমি আমার পাশেই থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল রাজপ্রাসাদে। রাজা-রানী-রাজপুরুষ যিনি যেখানে ছিলেন সকলেই সেখানে ছুটে এলেন। কল্কিদেবকে সমাদরের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাজা মহাসমারোহে তাঁর সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

রাজা আর রানীর মনে কোন সংশয় নেই। শিবের বর অব্যর্থ। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই এই কল্কিদেব। আর তাঁদের মেয়ে—লক্ষ্মীই বটে। তা নইলে এমনটি হবে কেন?

বিয়ে সেরে শম্ভল নগরে কল্কিদেব ফিরে এলেন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে। আর সকলের অনুরোধে যে রাজপুত্ররা নারী হয়ে ছিলেন, তাঁদের আবার পুরুষ করে দিয়ে এলেন।

সকলেই সেই অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা নিচু করল।



অনন্ত মুনির কথা

পদ্মাবতীর সঙ্গে কল্কিদেবের মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেছে। যে রাজা আর রাজপুত্ররা সিংহলে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় এসে নারী হয়ে গিয়েছিলেন, কল্কিদেবের অনুগ্রহে আবার তাঁরা পুরুষ হয়ে যেমনটি ছিলেন, তেমনটি হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অনুগামী হলেন। শুধু তাই নয়, অবতারজ্ঞানে তাঁর কাছ থেকে অনেক উপদেশও নিলেন।

কল্কিদেব এবার ফিরে আসবেন নিজের নগরে। আয়োজন

চলছে। বৃহদ্রথের রাজপ্রাসাদে সবাই ব্যস্ত। হঠাৎ অনন্ত মুনি এসে হাজির হলেন রাজসভায় কল্কিদেবের কাছে। অনন্ত মুনিকে সিংহলের অনেকেই চেনেন। বয়স যে তাঁর কত হয়েছে, কেউ জানে না। সুদীর্ঘকাল এখানে নির্জনে একটা আশ্রমে থাকেন, সাধনা করেন।

অনন্ত মুনি এসেই কল্কিদেবকে প্রণাম জানালেন। বললেন—আপনি আমায় স্মরণ করেছেন?

কল্কিদেব তাঁকে সমাদর করে বললেন—হ্যাঁ, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল।

তারপর মৃদু হেসে বললেন—সব জানা, বোঝা হয়ে গেছে তো?

অনন্ত মুনি বললেন—হ্যাঁ, দেব।

কল্কিদেব বললেন—যাও।

এই বলে কল্কিদেব সভা ছেড়ে চলে গেলেন। অনন্ত মুনিও বেরিয়ে এলেন।

রাজা আর রাজপুত্রদের বিস্ময়ের সীমা নেই। কি ব্যাপার? অনন্ত মুনি এলেন। কল্কির সঙ্গে ঠারে-ঠারে কি কথা কথা হল? রহস্য জানার জন্য তাঁদের মনে খুব কৌতূহল জাগল।

বাইরে বেরিয়ে এসে সবাই ঘিরে ধরল মুনিবরকে।

মুনি বললেন—সে এক কাহিনী। আপনাদের যখন এতই শোনার ইচ্ছে হয়েছে, তাহলে শুনুন ঃ

আজ আমি অনন্ত মুনি বটে, কিন্তু এক সময় আমি অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ ঘরে এক ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলাম। বাড়ি ছিল পুরিকায় (ওড়িশার এক নগর)। আমার বাবা বিদ্রুস খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। মা সোমাও ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবতী। আমি তাঁদেরই ঘরে জন্মেছিলাম। আমাকে দেখে মা-বাবার মনে খুব দুঃখ হয়েছিল। কারণ আমি হিজড়ে হয়ে জন্মেছিলাম—না পুরুষ, না নারী।

মনের দুঃখে আমার মা-বাবা শিববনে (হরিদ্বারে) গিয়ে একমনে শিবের তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিবের অনুগ্রহে শেষে আমি পুরুষ হয়ে যাই।

যখন আমার বারো বছর বয়স হল, মা-বাবা তখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। যজ্ঞরাত নাম এক ব্রাহ্মণের মেয়ে মানিনীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেল। মানিনীকে নিয়ে আমার সংসারও সুখের হয়ে উঠল। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন মা-বাবা মারা গেলেন।

স্ত্রী মানিনীকে খুবই ভালবাসতাম ঠিকই, কিন্তু মা-বাবাকে দারুণ শ্রদ্ধা করতাম। তাই তাঁরা যখন মারা গেলেন, মনে খুব দুঃখ পেলাম। যথাসময়ে শ্রাদ্ধাদি কাজ করলাম। আর সেই থেকেই আমার মন বিষ্ণুপরায়ণ হয়ে উঠল। বিষ্ণুর ধ্যান, বিষ্ণুর নামজপ নিয়েই বেশির ভাগ সময় থাকতাম।

একদিন পুজো, নামজপ সেরে ঘুমোচ্ছি, স্বপ্ন দেখলাম।

দেখলাম, স্বয়ং বিষ্ণু আমার সামনে এসে বলছেন—মা বাবা, স্ত্রী-পুত্র, এদের জন্য মন এত চঞ্চল কর কেন? শোন, এ সবই আমার মায়ার খেলা।

আমি কিন্তু বিষ্ণুর এ কথা মানতে রাজি হলাম না। আমি দেখছি আমার মা-বাবা, আমার স্ত্রী। আর বিষ্ণু বললেন সবই মায়া? আবার বললেন, এই মায়াতে যে জড়াবে, তাকেই কষ্টভোগ করতে হবে। প্রতিবাদ জানাতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে তিনি আর নেই।

মনে আমার দারুণ সংশয়। তা কি করে হয়?

জগন্নাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণে একটা আশ্রমের মত করে সেখানে স্ত্রীকে নিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করতাম বটে, কিন্তু মন থেকে কিছুতেই ঐ সংশয় আর যেত না।

নাম-গান আর জপ নিয়ে এভাবে বারো বছর কেটে গেল।

এরপর একদিন সমুদ্রে স্নান করতে গেছি।

বিষ্ণু মন্দিরে থাকি, নাম-গান করি, রোজই সমুদ্রে স্নান করে আসি। অনেকের কাছেই আমি পরিচিত।

স্নানে নেমেছি। মনের আনন্দে ঢেউ-এর দোলায় স্নান করছি। করতে করতে কি যে হল, আমি আর কোনমতেই উঠে আসতে পারলাম না। ঢেউ যেন আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল। যতই ওঠার চেষ্টা করি, নোনা জলে হাবুডুবু খাই। শেষে দেখি, হাঙর, বড় বড় মাছ আমাকে খাবলাতে শুরু করল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আমি বালির ওপর পড়ে আছি। তখন প্রায় আধমরা অবস্থায়। মাথার কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তখন সন্ধ্যা।

বৃদ্ধের নাম বৃদ্ধশর্মা। সমুদ্রের কাছেই তাঁর বাড়ি। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন। তিনি আমাকে সেখান থেকে নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন। খুব সেবা-যত্ন করে আমায় সুস্থ করে তুললেন। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী দুজনেই আমাকে ছেলের মত স্নেহ করতে লাগলেন। পুরী থেকে যে কত দূরে আমি এসে এভাবে উঠেছি, জানি না। কিভাবে ফিরব তাও জানি না। অনেকদিন হয়ে গেল, মানিনীই বা এখন কোথায়, তাও জানি না। বাধ্য হয়ে সেখানেই থেকে গেলাম।

তখনও আমি যুবক। বৃদ্ধশর্মা আমাকে ব্রাহ্মণ আর আমার সব কিছু জানা আছে দেখে আরও খুশি হয়ে আমাকে তাঁর আর এক ছেলে করে নিলেন। তাঁর এক মেয়ে ছিল, নাম চারুমতী। তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতেই রেখে দিলেন। মানিনীকে ভুলে আমিও সেখানে থেকে গেলাম।

ঘর-সংসার করি। জ্ঞানগম্যিও আছে। ব্রাহ্মণ অভাবী ছিলেন না। ফলে খাওয়া-পরার চিন্তাও ছিল না। বন্ধু-বান্ধব অনেক জুটে গেল। আমার নিজেরও জয়, বিজয়, কমল, বিমল আর বুধ নামে পাঁচটা ছেলে হল। চারুমতীর সেবার ত্রুটি নেই। ইতিমধ্যে আমার পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ীও দেহ রেখেছেন। আমারও যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে।

আমার বড় ছেলের নাম ছিল বুধ। তার বিয়ে দেবার বয়স হয়েছিল। চারুমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে ধর্মসার নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে চাইতে তিনি তো কৃতার্থ হয়ে উঠলেন।

বিয়ের দিন সকালে সমুদ্রে এসেছি। শুভকাজ করার আগে পিতৃপুরুষকে শাস্ত্রমতে জল দিয়ে তুষ্ট করতে হয়। সেই সঙ্গে আরো কিছু কাজ করতে হয়—যাকে বলে আভ্যুদয়িক নান্দীমুখ। বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেছে। চারদিকে যেন উৎসব চলছে। মনের আনন্দে সমুদ্রে এসে জলে ডুব দিলাম। বেশ করে ডুবে স্নান করলাম। তারপর জল থেকে উঠতে গিয়ে দেখলাম—এ কি! এ যে সেই পুরীর ঘাট, সেই পরিচিত জন। কেউ স্নান করছে, কেউ

সাঁতার দিচ্ছে, কেউ বা তীরে গা মুছছে।

আমি তো রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। হাঁ করে এদিক ওদিক ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলাম। জল থেকে যেন আর উঠে আসতে পারছি না। মনে দারুণ ভয় হয়ে গেল। আমি কি পাগল হয়ে গেলাম!

আমার রকম-সকম দেখে আমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত মানুষেরা আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে এল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল—কি হয়েছে? অমন করে কি দেখছ? কোন জবাবই আমি দিতে পারি না। খবর পেয়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মানিনী এসে হাজির হল। মানিনীকেও দেখলাম। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারলাম না।

সকলেই ধরে নিল, নিশ্চয়ই আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছি।

ঠিক সেই সময়ই একজন গেরুয়াবসন সন্ন্যাসী ঘাটে এসে হাজির। সকলে মিলে তো আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল—বাবা, বড় ভাল ছেলে। হঠাৎ পাগলা হয়ে গেছে। দয়া করে একে ভাল করে দাও।

সেই সন্ন্যাসী আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন—তোমার নাম অনন্ত না? আজই তো তোমার বড় ছেলের বিয়ের দিন? বাড়িতে তোমার আত্মীয়-স্বজন-কুটুমে ভর্তি, আর তুমি এখানে? তুমি এখানে কেমন করে এলে? তাছাড়া তোমার বয়সই বা এত কমে গেল কি করে? ওখানে তোমাকে দেখেছিলাম সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আর এখানে তুমি তিরিশ বছরের যুবক হলে কি করে?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলের তো আর বিস্ময়ের শেষ নেই। মানিনী তো কেঁদে আকুল—সন্ন্যাসী এসব কি বলছেন? দেখে তো ওঁকে কোন পাগল বলে মনে হয় না। একজন সিদ্ধপুরুষ।

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বললেন—তোমার ছেলের বিয়েতে আমারও নেমন্তন্ন ছিল। তা আমিই বা আজ এই পুরীর ঘাটে কিভাবে এলাম?

তারপর চোখ বুজে স্থির হয়ে একটু বসে বললেন—বুঝেছি, এ সবই সেই বিষ্ণুর মায়া। তাছাড়া আর কিছুই নয়।

সন্ন্যাসী এসব কথা বলার পর আমি বললাম—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিষ্ণুর মায়া। এই মায়ার ওপর আমার একটু সংশয় ছিল। শুনে সন্ন্যাসী বললেন—বিষ্ণু মায়া দিয়েই তো জগতকে বেঁধে রেখেছেন। ঐ খেলনা দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন। ব্রহ্মা-শিবেরও এর হাত থেকে নিস্তার নেই, তুমি-আমি তো কোন্ ছার।

অনন্ত মুনির জীবনের এই অদ্ভুত ঘটনা শুনতে শুনতে রাজা-রাজপুত্রেরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুনিবর একটু থামতেই সমস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল —তারপর?

—তারপর সন্ন্যাসীর পরামর্শে এখানে এসে নির্জন স্থান দেখে বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্যায় বসলাম। অনন্ত মুনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন—সন্ন্যাসী আরও বলেছিলেন, তপস্যার শেষে কল্কিরূপী স্বয়ং বিষ্ণুকে যখন তুমি দেখবে, জানবে, তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

কত বছর যে আমার তপস্যায় কেটে গেল, জানি না। আজ মুক্ত হলাম।

কল্কিদেবের কীকট জয়

বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছদের আধিপত্য চরমে। বৌদ্ধরা সনাতন বেদগ্রন্থকে স্বীকার করে না। যাগ-যজ্ঞ-পশুবলি, দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে পুজো করায় এরা বিশ্বাসী ছিল না। তারা মায়াবাদী। ম্লেচ্ছরা আবার এদের ওপরে যেত। আচার-বিচার তো ছিলই না, গো-মাংস খেত। আর বেদগ্রন্থকে অপমান করত। এরা বেশির ভাগই হয় অনার্য, নয় অহিন্দু।

শম্ভল নগরে যখন কল্কিদেবের আবির্ভাব ঘটেছে, তার আগে থেকেই কীকট দেশ (প্রাচীন মগধ রাজ্য) বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছদের অধিকারে। তারপর থেকে তাদের প্রতাপ এমন বাড়তে শুরু করল যে, আশেপাশের দেশও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল।

সিংহল থেকে পদ্মাবতীকে বিয়ে করে নিয়ে ফেরার পর কল্কিদেব বেশ কিছুকাল আর মাথা ঘামাননি। ঘর-সংসার আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই মেতে ছিলেন। কল্কিদেবের তিন দাদা কবি, প্রাজ্ঞ আর সুমন্ত্রকের প্রত্যেকেরই দুটি করে ছেলে হয়ে গেছে। কল্কিরও জয় আর বিজয় নামে দুটি ছেলে হয়েছে।

কল্কির উৎসাহে অশ্বমেধ যজ্ঞেরও আয়োজন চলছিল।

ইতিমধ্যে খবর এল, বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছতে কীকট দেশ নাকি দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে। আর বৌদ্ধসেনারা এমন বিক্রমশালী হয়ে উঠেছে, যে কোন মুহূর্তে তারা মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।

খবর আসা মাত্রই কল্কিদেবের নির্দেশে শম্ভল নগরে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কল্কিরা চার ভাই দারুণ বড় যোদ্ধা তো বটেই, গর্গ-ভর্গ-বিশাল-এর মত বন্ধু বান্ধবরাও কম যান না। রাজা বিশাখযূপ তো আছেনই। কীকট দেশে কল্কিদেব যুদ্ধে যাবেন শুনে সবাই যে যার সেনাদল নিয়ে হাজির। রথ, হাতি, ঘোড়া, ধ্বজ-পতাকায় মাটি যেন আর দেখা যায় না।

কল্কিদেব নিজে ঘোড়ার পিঠে চেপে, কোমরে শিবের দেওয়া তলোয়ার নিয়ে সেনানায়ক হলেন। দুই অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে কীকটদেশে এসে এমনভাবে বৌদ্ধসেনাদের আক্রমণ করলেন যে তারা যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

তাই দেখে কল্কিদেব বিদ্রূপ করে বললেন—ভয়ে সব পালাচ্ছে? এর নাম তোমরা বীরপুরুষ! যদি পুরুষ হও তো যুদ্ধ কর।

কল্কির এই বিদ্রূপ শুনে জিন রেগে আগুন হয়ে উঠল। মস্ত বড় যোদ্ধা তো বটেই জিন, তার ওপর যত রকমের অস্ত্রশস্ত্র আছে সবেতেই পারদর্শী। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে বর্ম এঁটে ঘোড়া, শূল নিয়ে ষাঁড়ের মুখ ঘুরিয়ে সরোষে এসে কল্কিদেবকে আক্রমণ করল।

জিনের সেই আক্রমণ এমনি ভীষণ ছিল যে কল্কিদেব সামলাতে পারলেন না। একটা শূল এসে তাঁকে এমন আঘাত হানল যে, ঘোড়ার পিঠে থেকে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালেন। জিনের ক্রুদ্ধ মূর্তির সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে কল্কিদেব একা। তীরবেগে জিন ছুটে এসে চেষ্টা করল কল্কিকে তুলে চুরি করে নিয়ে পালাতে, কিন্তু তুলতে পারল না। বিশাখযূপ তাই দেখে পড়ি-কি-মরি করে সেখানে রথ নিয়ে ছুটে এসে কল্কিদেবকে নিজের রথে তুলে নিলেন, আর লাথি মেরে জিনকে অজ্ঞান করে ফেলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুজনেরই জ্ঞান ফিরে এল। কল্কিদেবের শরীরে তখনো শূলের ব্যথা। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই। জিন অজ্ঞান করে সেগুলো সব কেড়ে নিয়েছিল। তাই দেখে শূলের ব্যথা ভুলে কল্কিদেব শুধু হাতেই রথ থেকে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিল-ঘুসি-চড়-লাথি—হাজার হাজার বৌদ্ধসেনাকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দেন যমদূতের মত বৌদ্ধসেনাদের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। ওদিকে, তাঁর দুই ছেলে জয়-বিজয়, বন্ধু গর্গ, ভর্গ, বিশাল হাজার হাজার বৌদ্ধসেনা বিনাশ করল।

তারপর কল্কিদেব জিনকে বললেন—আমার হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, এটা জেনে রেখো।

জিন বলল—তুমি কি আমাকে ভাগ্য দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? আমরা ভাগ্য মানি না। দেখতে চাই তুমি কত বলবান যে তোমার হাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। এই আমি অস্ত্র হানছি, তোমার ক্ষমতা থাকে, নিজেকে সামলাও।

এই বলে জিন একের পর এক মারাত্মক অস্ত্র কল্কিদেবকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। এক সময় জিনের সব অস্ত্র শেষ হয়ে গেল, কিন্তু দেখল কল্কির গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি।

কল্কিদেব এবার সরোষে জিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এক লাফে চুলের মুঠি ধরে ষাঁড়ের পিঠ থেকে টেনে নামাতেই দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শেষে কল্কিদেব গদার এক আঘাতে জিনকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

জিন পড়ে গেল দেখে মহাবলশালী শুদ্ধোধন আর স্থির থাকতে পারল না। গদা হাতে খালি পায়ে বিদ্যুতের মত সে এসে আক্রমণ করল কল্কিদেবকে। কল্কিদেবও সমানে তা প্রতিহত করে চললেন। সেই অবকাশে কল্কির বড় দাদা কবি আচমকা এসে শুদ্ধোধনকে গদা দিয়ে এমন মারলেন যে সে জ্ঞান হারাল। কিন্তু কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর উঠে কবিকে গদা দিয়ে এমন প্রহার করল যে কবি জ্ঞান হারালেন না বটে, তবে কেমন যেন অবশ হয়ে গেলেন।

কবিকে প্রতিহত করে শুদ্ধোদন মুখ ফেরাতেই দেখে, বিরাট কল্কিসেনা তাকে ঘিরে ধরেছে। বাধ্য হয়ে শুদ্ধোধন মায়াদেবীকে স্মরণ করে মায়াযুদ্ধ শুরু করে দিল। সিংহ, বাঘ, সাপ, আগুন, জল, বিদ্যুৎ যেন রণক্ষেত্রে আছড়ে পড়তে লাগল।

কল্কিদেব দেখলেন শুদ্ধোধন তাঁরই মায়ার আশ্রয় নিয়েছে। সুকৌশলে তিনি সেই মায়াকে কাটিয়ে দিতেই বৌদ্ধরা হীনবল হয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে ম্লেচ্ছরাও। তাই দেখে কল্কিসেনারা সোল্লাসে বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছ সৈন্যদের যখন প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় দেখল হাজার হাজার বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছ রমণী রথ, ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়ের পিঠে চেপে, হাতে নানা হাতিয়ার নিয়ে রণক্ষেত্রে এসে হাজির হল। কল্কিসেনারা দেখে বিস্ময়ে পিছিয়ে এল।

কল্কিদেব বললেন—তোমরা রমণী, আমরা পুরুষ। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি আমাদের উচিত? তাছাড়া তোমরাই বা রণক্ষেত্রে এলে কেন?

রমণীরা বলল—তোমরা নির্বিচারে আমাদের স্বামীদের হত্যা করলে। দেখ, আমরা অবলা নেই। তার প্রতিশোধ আমরাও নিতে জানি।

এই বলে রমণীরা বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। কিন্তু একটা বাণ বা অস্ত্র কল্কিদেবের গায়ে লাগল না।

বিস্ময়ে রমণীরা হতবাক। তাদের মনে হল, অস্ত্রগুলো যেন কথা বলে উঠল। রমণীরা শুনল, অস্ত্রগুলো যেন বলছে—আমরা কাকে গিয়ে আঘাত হানব? যিনি আমাদের মন্ত্রশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে? তাহলে তো নৃসিংহরূপে ভগবান বিষ্ণু যখন হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, তখনো আমরা নৃসিংহকে মারতে পারতাম।

একদিকে অস্ত্র বিফল, আর একদিকে এসব কথা শুনে রমণীরা এমনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে শেষে কল্কিদেবেরই শরণাপন্ন হল।

কীকট দেশের প্রতাপ নিশ্চিহ্ন করলেন কল্কিদেব।

রাক্ষসী কুথোদরী ও কল্কিদেব

কীকট দেশ জয় করে কল্কিদেব সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে চক্রতীর্থে (বিহারের নিমসার-এ) এসেছেন কিছুটা তীর্থ করার জন্য। হঠাৎ বেশ কিছু মুনি সেখানে কল্কিদেবের কাছে এসে হাজির হলেন।

কল্কিদেব দেখেই বুঝলেন, দারুণ ভয় পেয়ে মুনিরা প্রায় দৌড়েই এসেছেন। তাই আগে তাঁদের আপ্যায়ন করে বসালেন।

তারপর বললেন—দেখে মনে হচ্ছে আপনারা খুবই সন্ত্রস্ত। কি এমন হয়েছে যে আপনারা এত ভীত হয়ে পড়েছেন? কে আপনাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

মুনিরা বললেন—দেব, আমরা অনেকদিনই ধরেই ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি শুধু আপনারাই অপেক্ষায়।

কল্কিদেব বললেন—আপনারা নির্ভয়ে বলুন, কে সে আপনাদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। যদি সে দেবরাজ ইন্দ্র হয়, জেনে রাখুন, আমার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না।

—না দেব। এ এক বিকটাকার রাক্ষসী। কালকঞ্জ রাক্ষসের স্ত্রী কুথোদরী। কুম্ভকর্ণের নাতনি, নিকুম্ভের মেয়ে। এর একটা ছেলে আছে। পাঁচ বছর বয়স হবে—নাম বিকুঞ্জ। এই রাক্ষসী হিমালয়ে মাথা আর নিষধ পর্বতে পা রেখে ছেলেকে একটা স্তনে দুধ খাওয়ায়। এর নিঃশ্বাসে সব সময় যেন ঝড় বইছে। আমরা কোনমতেই স্থির হয়ে বসতে পারছি না। হিমালয়ে আমাদের তপোবনের হাল যা হয়েছে, তা আর বলার নয়। দেব, আপনি আমাদের ঐ রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচান।

মুনিদের প্রার্থনায় কল্কিদেব সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সেনারাও প্রস্তুত হয়ে কল্কিদেবকে অনুসরণ করল। মুনিরা আগে আগে চললেন।

রাত নেমে এল দেখে কল্কিদেব সেনাবাহিনী নিয়ে হিমালয়ের একটা উপত্যকায় রাতটুকু কাটালেন। পরদিন সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরু হল।

কিছুটা যেতেই কল্কিদেবের সঙ্গে সেনারা সবিস্ময়ে দেখল, পাহাড়ের ঢল বেয়ে একটা দুধের নদী নেমে আসছে। এত জোরে নেমে আসছে যে তার থেকে ফেণা ছিটকে পড়ছে চারদিকে।

কল্কিদেব মুনিদের জিজ্ঞেস করলেন—দুধের নদী এখানে কোথা থেকে এল ?

মুনিরা বললেন—দেব, এই সেই রাক্ষসী কুথোদরীর একটা স্তনের দুধ। বিকুঞ্জ খায় একটা স্তনের দুধ। আর একটার দুধ এভাবেই নদী হয়ে নেমে যায়। সাত ঘন্টা বাদে আবার এরকম দুধের নদী বইবে।

সেনারা শুনে তো অবাক। সামান্য একটা স্তনের দুধে যার এমন নদী বয়ে যায়, তাহলে তার শরীরটা কত বড় ! আর শক্তিই বা কতখানি !

যাই হোক, স্বয়ং কল্কিদেব যখন সঙ্গে আছেন, তখন অত ভাবনার কি ?

মুনিরা পথ দেখিয়ে আর কিছুটা আনতেই চোখে পড়ল রাক্ষসীকে। কালো মেঘের মত গায়ের রঙ। পাহাড় জুড়ে যেন বসে আছে। দেখল ছেলে বিকুঞ্জ তার স্তন-দুধ খাচ্ছে।

দেখামাত্রই সেনারা তীর-ধনুক, শূল-ত্রিশূল তুলে রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাবে কি, কল্কিদেব বাধা দিলেন। বললেন—না, না। ও কাজ কোরো না। আমি নিজে যাব। আমার সঙ্গে সামান্য গজারোহী আর অশ্বারোহী যাবে। বাকি তোমরা এই গুহার চারদিকে আগুন জ্বেলে থাক।

সামান্য সৈন্য নিয়ে কল্কিদেব এগোলেন। খানিকটা দূর থেকে রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে একটা বাণ ছুঁড়লেন। সজোরে তীরটা গিয়ে রাক্ষসীর বুকে আচমকা বিঁধতেই সে এমন ভীষণ গর্জন করে উঠল যে, গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠল, আর সেনাপতিরা প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তারপর পাহাড়প্রমাণ হাঁ করে এত জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগল যে, হাতি, ঘোড়া থেকে সেনা-সমেত কল্কিদেবও সেই টান সামলাতে না পেরে একেবারে রাক্ষসীর পেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

দেখে তো সকলে 'হায়-হায়' করে উঠলেন। শেষে এ কি হল ! মুনিরা তো রাক্ষসীকে শাপ-শাপান্ত করতে শুরু করলেন। ঋষিরা যে যেখানে ছিলেন, সকলে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। সেনারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

গজারোহী অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে কল্কিদেব রাক্ষসীর পেটের ভেতর ঢুকে দেখলেন, কি ঘোর অন্ধকার ! তাছাড়া এখানে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তো চলবে না। মুনিদের প্রার্থনা যে তাঁকে পূরণ করতেই হবে।

রাক্ষসীর মুখ তাকানো বন্ধ হয় নি। তখনো সমানে নিঃশ্বাস টেনে চলেছে। কল্কিদেব একটা বাণ দিয়ে আগুন তৈরি করে, সঙ্গে যা কিছু ছিল তাই দিয়ে আগুনকে জ্বালালেন। তারপর তাঁর সেই মোক্ষম খাঁড়া দিয়ে ভেতর থেকেই সজোরে রাক্ষসীর বিশাল পেট চিরে দু ফালা করে দিলেন। আর একবার বিকট আর্তনাদ করে উঠল কুথোদরী। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগেই সকলকে নিয়ে কল্কিদেব তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কুথোদরীও মারা গেল। সেনারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

মায়ের এই অবস্থা দেখে পাঁচ বছরের ছেলে বিকুঞ্জ মহাক্রোধে সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হাতের চাপে, মুঠোর ঘায়ে কল্কিদেবের বেশ কিছু সেনা মারা গেল।

কল্কিদেব আর কালবিলম্ব না করে গুরুদেব পরশুরামের দেওয়া ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে শেষে তার মাথা কেটে দিতে বাধ্য হলেন।

হিমালয় শান্ত হল। মুনিরাও নিশ্চিন্ত হলেন।

আকাশ থেকে দেব-গন্ধর্ব যাঁরা এই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরাও কল্কিদেবকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন।

কোক-বিকোক সংবাদ

কোক আর বিকোক দুই ভাই—কলির দুই বিশ্বস্ত রাক্ষস অনুচর। কলির রাজধানী বিশসন নগরেই তারা থাকত আর যথেচ্ছ অত্যাচার করে বেড়াত।

এরা ছিল শকুনির নাতি, বৃকাসুরের ছেলে। তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এমন কেউ ছিল না, যে ওদের বধ করতে পারে। অসুর তো নয়, যেন মহাসুর। দুই ভাইয়ের গায়ে যেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, অস্ত্রশাস্ত্রেও তেমনি পারদর্শী

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে এই দুই ভাই এমন দাবিয়ে চলত যে, কার সাধ্য তাদের সামনে দাঁড়ায় ? সাধারণ মানুষ, পর্বতগুহাবাসী মুনি-ঋষিরা তো দূরের কথা, দেব-গন্ধর্বরাও ভয়ে ভয়ে চলতেন। ফলে কলির বিরোধিতা করে, এমন সাহস কারোরই ছিল না। সকলেই তাই দিন গুণত, কবে এই দুই ভাই-এর হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে।

কোন কিছুই চিরকাল চলতে পারে না। সব কিছুরই একটা শেষ আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউই অমর নয়। জীবন-ধারণ করলে এক সময় তাকে মরতেই হবে। কোক-বিকোকেরও বোধ হয় সেই সময় ঘনিয়ে এসেছিল।

কল্কিদেবের সঙ্গে যখন কলির বিরোধ শুরু হল, তাঁর অন্যান্য সেনাপতিরা যখন কলির অনুগামীদের সঙ্গে লড়াই করছিল, তখন কল্কিদেব নিজে গদা হাতে রুখে দাঁড়ালেন কোক আর বিকোকের বিরুদ্ধে।

কল্কিদেবকে গদা হাতে তাদের দিকে তেড়ে আসতে দেখে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দু ভাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর।

একদিকে গদা হাতে একই সঙ্গে দুই মহাসুর, আর একদিকে একা কল্কিদেব। গদার সঙ্গে গদার ঘর্ষণে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। তর্জনে-গর্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠতে লাগল। সে কি দারুণ গদাযুদ্ধ চলল, তা বর্ণনা করা যায় না। হঠাৎ এক সময় কোক-বিকোকের আঘাতে কল্কিদেবের হাত থেকে গদা খসে পড়ে গেল।

সোল্লাসে দুই অসুর কল্কিকে মারার জন্য এগিয়ে আসছে দেখে কল্কিদেব চকিতে ধনুক তুলে নিয়ে তাতে ভল্ল (একজাতীয় তীর) লাগালেন। ফলাটা (দেবদারু পাতার মত) তুলে নিয়ে বিকোককে লক্ষ্য করে এত জোরে ছুঁড়লেন যে, তার মাথাটা কেটে পড়ে গেল। কোক সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডটা তুলে ঘাড়ের ওপর বসিয়ে তাকাতেই বিকোক বেঁচে উঠে আবার তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল। দেখে, কল্কিদেব অবাকই হলেন।

কল্কিদেব এবার কোকের মাথা নামিয়ে দিলেন। দেখলেন, ঠিক একইভাবে বিকোক তাকে বাঁচিয়ে তুলে কল্কিদেবের সঙ্গে মরণ-পণ লড়াই শুরু করে দিল। খাঁড়া এসে বারবার আঘাত হানছে দেখে কল্কিদেব এবার একই বাণে একই সঙ্গে দুই ভায়ের মাথা নামিয়ে দিলেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলেন, মাথা যেখানে থাকার সেখানেই আছে। মরেও ওরা মরল না। দেবতারাও যেমন হতাশ হলেন, কল্কিদেবও তেমনি বেশ চিন্তায় পড়লেন। কিভাবে এই দানবদুটোকে মারা যায়?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন কল্কিদেব, কোক-বিকোক লাল চোখে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল। কল্কিবাহন শিবের দেওয়া সেই ঘোড়া দুজনকে এত জোরে আঘাত করল যে দুজন দুদিকে ছিটকে পড়ল।

সামান্য একটা ঘোড়ার এত তেজ! রেগে আগুন দু ভাই। উঠে তাঁর দিকে তীর ছুঁড়তে যাবে কি, ঘোড়াও তেড়ে এসে দুজনের বাহু সজোরে কামড়ে ধরল। প্রচণ্ড সে কামড়ে দু ভাই-এর বাহুর হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল, ধনুক-তীর গুঁড়িয়ে গেল। হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনায় সেসব ভুলে গিয়ে মহাবলেরা ঠিক করল, লেজ ধরে ঘোড়াকে শূন্যে ছুঁড়ে দেবে। এই ভেবে যেই তারা তার লেজ ধরতে গেল অমনি ঘোড়া জোড় পায়ে দু ভাইয়ের বুকে এত জোরে চাট বসাল যে বেশ কিছু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে তারা জ্ঞান হারাল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়াল।

সামনে কল্কিদেবকে দেখে দাঁত কড়মড় করে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল।

ঠিক সেই ফাঁকেই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ব্রহ্মা কল্কিদেবের কাছে এসে কানে কানে বলে গেলেন—ওরা আমার কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়েছিল যে, কোন অস্ত্রে ওদের মৃত্যু হবে না, একজন মরলে অপরজন তার দিকে তাকালেই বেঁচে উঠবে। ওদের মৃত্যুর একটাই মাত্র পথ—একই সঙ্গে দুজনের মাথায় আপনাকে ঘুসি মারতে হবে।

কল্কিদেবের চিন্তা দূর হয়ে গেল। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে খালি হাতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন কোক-বিকোকের দিকে।

দেখে কোক-বিকোক তো হেসেই খুন। তাদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করবে এমন সামান্য একটা মানুষ! নিজেরাও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে এল। শুরু হল সে এক দারুণ মল্লযুদ্ধ। বাহুযুদ্ধের মধ্যে কল্কিদেব সব সময়ই রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়, কোন রকমে দু ভাইকে নিজের দু পাশে আনতে পারলে হয়।

বেশ কিছুক্ষণ কসরৎ করার পর হঠাৎ এক সময় যেই সে সুযোগ এল, কল্কিদেব মুহূর্ত অপেক্ষা না করে একই সঙ্গে দুই হাতে দু ভাইয়ের মাথায় এমন জোরে ঘুসি বসিয়ে দিলেন, যেন দুটো পাহাড় একই সঙ্গে তাদের মাথায় পড়ে মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। প্রাণশূন্য হয়ে তাদের বিশাল দেহ লুটিয়ে পড়ল।

কোক-বিকোকের নিধন দেখে দেবসমাজ যেন উৎসবে মেতে উঠল।

কল্কিদেবের কলি অভিযান

দেবত্রাস কুথোদরীকে হত্যা করে সসৈন্যে কল্কিদেব এসেছেন হরিদ্বারে। গঙ্গাতীরে শিবির পড়েছে।

রাত শেষ হয়ে সবে উষার আলো দেখা দিয়েছে। কল্কিদেব স্নানে নেমে গঙ্গার জলে ভালভাবে স্নান সারলেন। তারপর উঠে আসতেই বেশ কিছু মুনি-ঋষি তাঁকে প্রণাম জানালেন। তাঁদের সামনে দুই প্রবীণ অথচ নবীন পুরুষ। মুনিদের মধ্যে ছিলেন বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ত্রিত, দুর্বাসা, দেবল, কণ্ব—সব প্রাচীন অমর মুনি-ঋষিরা। কল্কিদেব সকলকেই প্রতি-নমস্কার করে বললেন—সামনের এই দুই প্রবীণ অথচ নবীন পুরুষকে তো ঠিক অনুমান করতে পারছি না।

দীর্ঘদেহী দৃপ্তশালী তাঁদের মধ্যে প্রথমজন আত্মবংশের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমিই সেই সূর্যবংশের রাজা রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা শীঘ্রগের পুত্র মরু। ব্যাসদেবের মুখেই শুনেছিলাম, কলিকে

খর্ব করার জন্য কল্কিদেবরূপে আপনি আসছেন কলাপ গ্রামে (হিমালয়ের দক্ষিণে। যদুকুল ধ্বংস হলে সত্যভামা এখানে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন।) আপনারই অপেক্ষায় এতদিন তপস্যারত ছিলাম।

এবার প্রায় একই রকমের দীর্ঘদেহী দ্বিতীয়জন বললেন—আমি চন্দ্রবংশের রাজা প্রতীপকের পুত্র দেবাপি। ভাই শান্তনুকে সিংহাসনে বসিয়ে কলাপ গ্রামে আমিও আপনারই অপেক্ষায় এতদিন তপস্যারত ছিলাম। আজ আপনাকে দেখে আমরা কৃতার্থ হলাম।

কল্কিদেব বললেন—যাক, তোমাদের পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। মরু, দেবাপি—আর তপস্যা নয়। বিখ্যাত দুই বংশের মহাবীর তোমরা। এই পৃথিবী শাসনের ভার আমি তোমাদের হাতেই দিয়ে যাব। তোমরাও আমাদের সঙ্গী হও।

রাজা বিশাখযূপ আর রাজা রুচিরাশ্ব কল্কিদেবের নির্দেশে তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে মরু আর দেবাপির বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এমন সময় আকাশপথ থেকে দুটি দুরন্ত অপূর্ব গতিশীল রথ নেমে এল। নানারকম রত্ন দিয়ে তৈরি যেন সেই রথ। ঝলমল করছে। রথে ধনুক-তীর থেকে নানা আকারের নানা শক্তিশালী সব হাতিয়ার।

রথদুটোকে হঠাৎ ঐভাবে আসতে দেখে সকলেই চমকে উঠলেন।

কল্কিদেব বললেন—বিশ্বকর্মার তৈরি এই রথ দুটি এতদিন তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। এই রথের কোন সারথি নেই। তোমাদের মনই এর সারথি। মনে মনে যেখানে যাবার ইচ্ছে করবে, এই রথ তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাবে। তোমরা দুজন এই রথ নিয়ে দিগ্বিজয়ে যাবে, তাই ইন্দ্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সবেমাত্র এইসব কথা শেষ হয়েছে, ভিক্ষুকের মত দেখতে এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল। রোগা শরীর। ম্লান হয়ে গেলেও কাঁচা সোনার রঙ গায়ে। হাতে লাঠি। দেখলেই মনে হয়, উঁচুদরের কোন সাধু।

কল্কিদেব তাঁকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে বসতে আহ্বান জানালেন। অতিথিকে যেভাবে অভ্যর্থনা করে, সেভাবে সমাদর জানালেন। তারপর বললেন—বলুন, কি আপনার পরিচয়? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

সাধু বললেন—আমি কৃতযুগ (সত্যযুগ)। আপনি এসেছেন জানতে পেরে আপনার কাছেই এলাম। আপনার বিধানে সত্যরক্ষাই তো আমার কাজ।

কল্কিদেব এবার শিবিরের সকলকে শুনিয়ে বললেন—আর কি? এই দেখ, স্বয়ং সত্যযুগ এসে গেছে। আর বিলম্ব নয়। সকলে তৈরি হয়ে নাও।

সবাই বুঝি এই আদেশটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল।

দিব্য দুই রথে চেপে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন মহাবীর মরু আর দেবাপি। তাদের সঙ্গে মাথায় কালো রঙের শিরস্ত্রাণ পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী রাজা বিশাখযূপ অগণিত গজ, অশ্ব, পদাতিক সেনা নিয়ে—প্রায় ছয় অক্ষৌহিণী। দেখতে দেখতে হরিদ্বারের গঙ্গাতীর যেন প্রলয় নাচনে নেচে উঠল।

মাঝে স্বয়ং কল্কিদেব তাঁর পুত্র, ভাইপো আর বন্ধুদের নিয়ে—যেন দেবরাজ।

এমন সময় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর বেশ কিছু অনুচর নিয়ে মলিন বেশে আর এক ব্রাহ্মণ এসে কল্কিদেবকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

কল্কিদেবও যথারীতি তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আপনার পরিচয়? সঙ্গেই বা আপনার এঁরা কারা? কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক বললেন—আমি ধর্ম। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর পরিজনদের নিয়ে আমি কলির অনুচরদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে আপনারই আশ্রয়ে এসেছি। শক, কম্বোজ (সিথিয়া), শবর (গোদাবরী নদীর দুই তীরে জঙ্গলের বাসিন্দা), খশ (কাশ্মীরের পার্বত্য উপজাতি, নাম মশিয়াদ) কলির আশ্রয়ে থেকে এতই দুরন্ত হয়ে উঠেছে, এমন ম্লেচ্ছ আর বর্বর হয়ে উঠেছে যে আমরা আর থাকতে পারলাম না।

কল্কিদেব শুনে যেন মহানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সকলকে শুনিয়ে তিনি ধর্মকেই বললেন—চমৎকার! চমৎকার যোগাযোগ। সত্যযুগ এসে গেছে, ধর্মও এল। নিশ্চিন্ত হও ধর্ম। কলির দিন শেষ হয়ে এসেছে। মন থেকে সব বিষাদ সরিয়ে রেখে অনুচরদের নিয়ে ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর। আমিও কলিকে প্রতিহত করার জন্য যাচ্ছি। এই দেখ আমার সঙ্গে মরু, অযোধ্যার ভাবী রাজা। এই দেখ দেবাপি, হস্তিনাপুরের ভাবী অধীশ্বর।

শোনামাত্রই ধর্মের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্ত্রী আর অনুচরদের সিদ্ধাশ্রমে (হরিদ্বারে) রেখে ধর্ম যুদ্ধসাজে সাজলেন। অপূর্ব সে যুদ্ধসাজ। বেদ আর ব্রহ্ম হল তার রথ। সাতটি স্বর (ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ) হল সেই রথের সাত ঘোড়া। ব্রাহ্মণ হল তাঁর সারথি। ধর্মের শরাসন (তীর-ধনুক) হল নানা শস্ত্র।

সমরের আয়োজন শেষ। কল্কিদেব এবার কলির যুদ্ধের জন্য চললেন তার বিশসন নগরের দিকে। সারা নগর গোমাংসের দুর্গন্ধে ভরা। তার চারদিকে কাক, শকুন আর মাংসাশী বিকটাকার হিংস্র কুকুরের মেলা।

কল্কি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে এসেছে শুনে কলি আক্রোশে ফুঁসে উঠল। ছেলে-নাতি, অনুচর যে যেখানে ছিল সকলকে ডেকে বলল—কল্কির দম্ভ চূর্ণ কর। দেখে যাক কল্কি আমার শক্তি কতখানি।

বিশসন নগরে সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব উঠল। নানা রকমের রথ এল। নানা পোশাকে যোদ্ধারা নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধসাজে সাজল। কলির রথের ধ্বজায় ছিল কুকুরের ছবি আঁকা পতাকা। আর ছুঁচোর ছবি আঁকা পতাকা ছিল ধর্মের। সঙ্গে সব ম্লেচ্ছ অনুচর।

দানবের মত হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ওরা নগর থেকে বেরিয়ে আসতেই কল্কিদেবের নির্দেশে ধর্ম ঋষিদের নিয়ে কলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। রাজা বিশাখযূপ পুলিন্দ আর শ্বপচদের (চণ্ডাল) সঙ্গে, মরু শক আর কম্বোজদের সঙ্গে, দেবাপি শবর আর চোলদের সঙ্গে মহারণে মেতে উঠল।

কল্কিদেব কিন্তু নিজে গেলেন কলির দুই বিশ্বস্ত অনুচর দানব কোক আর বিকোককে বধ করতে।

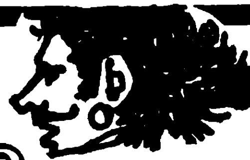
দেখতে দেখতে হাতির বৃংহতি, ঘোড়ার হ্রেষা, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, ধনুক-বাণের টঙ্কার, কিল-ঘুসি-চড়-এর শব্দে দিক্‌বিদিক ছেয়ে গেল। রক্তের নদী বইতে শুরু করল।

ধর্ম সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগকে নিয়ে বাণে বাণে কলির রথ ছিন্নভিন্ন করে দিল। কলি তখন গাধার পিঠে চেপে যুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু দুর্ভাগ্য কলির। ক্ষতবিক্ষত ও পর্যুদস্ত হয়ে নগরে ঢুকে মেয়েমহলে গিয়ে আত্মগোপন করল। তার অনুচররাও একে একে ধর্মের অনুচরদের হাতে পরাজিত হয়ে নগরে ঢুকে পড়ল। ওদিকে বিশাখযূপ, মরু, দেবাপির হাতে অনেক ম্লেচ্ছ মারা গেল। বাকিরা প্রাণভয়ে নগরে ঢুকে প্রাণ বাঁচালে। দুর্ভেদ্য নগর। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

ধর্ম কিন্তু নাছোড়। সত্যযুগকে নিয়ে বিশসন নগরে ঢুকে এমন বাণ ছুঁড়ল যে নগরীতে আগুন লেগে গেল। পালাতে আর কেউ পারল না। কলির যত পরিজন ছিল সবাই পুড়ে মরল। কলিরও সারা গায়ে আগুনের দাহ। তাই নিয়ে তারই মধ্যে সে যে কোথায় কি ভাবে পালাল, তা কেউ জানতেও পারল না।

ওদিকে কল্কিদেবও কোক-বিকোককে বধ করে একসঙ্গে এসে মিললেন।

কলির দম্ভ শেষ হল। কালও ফুরোল।



রাজা শশীধ্বজের কাহিনী

ম্লেচ্ছকুল নির্মূল করে কলিকে পর্যুদস্ত করে কল্কিদেব সসৈন্যে এসে শিবির ফেললেন ভল্লাট নগরে (এই নগরটি সম্ভবত সহ্য পর্বতের উত্তর-পূর্ব কোণে বর্তমান ষট্পুরা)।

এখানকার রাজা শশীধ্বজ। সকলেই জানে, সপরিবারে রাজা পরম বৈষ্ণব। রানী সুশান্তা, দুই বীর ছেলে সূর্যকেতু ও বৃহৎকেতু, এমনকি মেয়ে রমা—সকলেই অসম্ভব বিষ্ণুভক্ত। ভগবান বিষ্ণুর পুজো, হরি গুণগান ছাড়া তাঁরা প্রায় থাকেনই না। দুর্ধর্ষ তাঁর শয্যাকর্ণ সেনারা। সকলেই রাজা শশীধ্বজের দারুণ অনুগত। এই রাজ্য সম্বন্ধে কারো মনে কোন অভিযোগই ছিল না। তবু যে কল্কিদেব কেন সৈন্য নিয়ে এ রাজ্য আক্রমণ করতে এলেন, কেউ বুঝতেও পারল না। অবতারের কাজকর্ম কি সহজে বোঝা যায়? নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। হয়ত বা রাজা শশীধ্বজ ইতিমধ্যে কোন মহাপাতকের কাজ করে থাকবেন। রাজা বিশাখযূপ, মরু, দেবাপি, ধর্ম, সত্যযুগ ও সৈন্যসামন্ত কল্কিদেবের ইচ্ছাতেই রণসাজে সঙ্গে এসেছে। শুধু আদেশের অপেক্ষায়।

সসৈন্যে কল্কিদেবের আসার সংবাদ কানে যেতেই রাজা শশীধ্বজের মন আনন্দে নেচে উঠল। মনে মনে ভাবলেন স্বয়ং ভগবান তাহলে তাঁকে ভুলে যাননি। শেষে নিজেই এসেছেন। এ যে তাঁর কত বড় সৌভাগ্য! ছেলেদের ডেকে বললেন—সৈন্য সাজাও। নগরে দিগ্বিজয়ী মহাবীর এসেছেন। মহারণ হবে। দেখিয়ে দিতে হবে, আমরাও ইচ্ছে করলে দিগ্বিজয় করতে পারি।

নগর সরগরম হয়ে উঠতে লাগল। দলে দলে সামন্ত রাজারা আসতে লাগলেন সৈন্য নিয়ে। শয্যাকর্ণ বীররা তো প্রস্তুত হয়েই আছে।

শুনে রানী সুশান্তা রাজা শশীধ্বজকে বললেন—এ কি করছ তুমি, রাজা। স্বয়ং ভগবান কল্কিরূপী বিষ্ণু এসেছেন তোমার দ্বারে। আর তুমি সকলকে হুকুম দিলে রণসাজে সাজতে? পারবে তুমি ভগবানের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে?

রাজা বললেন—জানতাম, তুমি এ কথা আমায় বলবে। স্বয়ং ভগবান হরি এসেছেন। রণক্ষেত্র ছাড়া যে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। উপায় কি? আর অস্ত্রাঘাত কোন অপরাধের নয়, রানী। আমি চললাম। দেখি, ভক্ত হারে, না ভগবান হারে। যতক্ষণ না ফিরি রানী, তুমি মন্দিরে শ্রীহরির পুজো কর, হরি গুণগান কর।

সমরায়োজন শেষ। দুই বীর পুত্রও প্রস্তুত। সমুদ্রপ্রমাণ সেনাবাহিনী, নানা অস্ত্রে সজ্জিত। মনে মনে একবার মৃদু হেসে ভগবান বিষ্ণুর নাম নিয়ে রাজা শশীধ্বজ এলেন রণক্ষেত্রে।

রণক্ষেত্রে এসেই দেখলেন, বিপুল কল্কিদেবের বাহিনী। মরু, দেবাপির মত মহারথীরা সামনে। শশীধ্বজ কালবিলম্ব না করে নিজের সেনাবাহিনীকে সবেগে চালিয়ে দিলেন। আর সেনারাও মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কল্কিসেনার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেঙে তছনছ করে দিল। কল্কিসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে রাজা বিশাখযূপ হাতির পিঠের হস্তিবাহিনী নিয়ে রাজা শশীধ্বজের মুখোমুখি হলেন। একই ভাবে কল্কিবন্ধু ধনুর্ধারী গার্গবীর শান্তকের, রাজা মরু শশীধ্বজের বড় ছেলে মহাবল সূর্যকেতুর, দেবাপি শশীধ্বজের, ষোল বছরের ছোট ছেলে গদাবিদ্ বৃহৎকেতুর মুখোমুখি হলেন। হস্তীবাহিনীর সঙ্গে হস্তীবাহিনীর, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তুরী, ভেরী, শাঁখের আওয়াজে রণভূমির আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। শূল, পাশ, গদা, বাণ, ভল্ল, তোমর, ভুশুণ্ডি নামে সব অস্ত্রের আনাগোনায় আকাশ ঢেকে যেতে লাগল। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠতে লাগল। খণ্ড-ছিন্ন সেনাদের দেহ থেকে রক্ত যেন প্লাবন বইয়ে দিল।

মরু রাজার প্রখর বাণে সূর্যকেতু আহত হয়ে যেন কালানলের মত জ্বলে উঠলেন। ভীম বিক্রমে গদা হাতে এগিয়ে এসে রাজা মরুর রথের ঘোড়াগুলোকে মেরে, লাথি দিয়ে রথকে চুড়চুড় করে মরুকে নামিয়ে এনে গদা দিয়ে এমন মারলেন যে, মরু জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাই দেখে সারথি তাড়াতাড়ি মরুকে অন্য এক রথে তুলে সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

শরের পর শরেও বৃহৎকেতু যখন দেবাপিকে কায়দা করতে পারলেন না, বরং নিজের শূলাস্ত্র, শরাসন ভেঙে গেল, তখন মহাক্রোধে তিনি খাঁড়া তুলে ছুটে এলেন দেবাপির দিকে। ঘোড়া-রথ বিনষ্ট করে দিলেন। মহাক্রোধে দেবাপি বৃহৎকেতুকে প্রথমে একটা ভীষণ চড় মেরে নিজের দুই বাহুর মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, তিনি জ্ঞান হারালেন। তাই দেখে মহাবল সূর্যকেতু ছুটে এসে দেবাপির মাথায় এমন এক ঘুসি বসালেন যে, দেবাপিও সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। অনেক সেনা

হারিয়ে, সেনাপতি হারিয়ে রাজা বিশাখযূপ পিছু হটে দাঁড়িয়েছেন কল্কিদেবের কাছে।

রাজা শশীধ্বজ এবার মুখোমুখি কল্কিদেবকে দেখলেন। মনে মনে ভাবলেন—আহা, কি অপরূপ! পরনে পীত বসন, অশ্বের পিঠে বসে আছেন। গায়ের শ্যামবর্ণ ভেদ করে যেন হাজার সূর্যের জ্যোতি। টানা টানা দুই চোখ কি মনোরম! হাতের খাঁড়া যেন ঝকমক করছে।

কিন্তু মনের এই ভাব গোপন রেখে বললেন—সবাই বলে, আপনি নাকি বিষ্ণুর অবতার। কল্কিরূপে এসেছেন অধর্মকে নাশ করতে। তা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কই, অস্ত্র হানুন। সবাই দেখুক, শশীধ্বজের ক্ষমতা কতখানি।

শশীধ্বজের কথা শেষ হতে-না-হতেই মনে হল কল্কিদেব যেন খুব রেগে গেলেন। আর নির্বিচারে একের পর এক অস্ত্র তাঁকে হানতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য! সেগুলো শশীধ্বজের গায়ে যেন একটা আঁচড়ও কাটতে পারল না। অপরদিকে শশীধ্বজের ছোঁড়া কয়েকটা বাণ এসে কল্কিদেবের শরীরে আঘাত হানল। এদিকে ওদিকে তাঁর কিছুটা কেটেকুটেও গেল।

এবারে যেন মহা আক্রোশে কল্কিদেব ফুঁসে উঠলেন। মনে মনে হেসে শশীধ্বজও প্রস্তুত হয়ে নিলেন। সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে এবার মহা শক্তিশালী অস্ত্র তুলে নিলেন দুজনেই। কল্কিদেব ব্রহ্মাস্ত্র হানলেন। শশীধ্বজ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই তা প্রতিরোধ করলেন। কল্কিদেব এরপর এমন এক বাণ ছুঁড়লেন যেন মনে হল কোথা থেকে হাজার হাজার পাথরের চাঁই তাঁর দিকে ছুটে আসছে। শশীধ্বজ মুহূর্তে তা লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন বায়ব্য অস্ত্র। নিমেষে কোথা থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝড় এল। কি দুরন্ত সে ঝড়! সৈন্য-সামন্ত যে যেখানে ছিল, তাদের মধ্যে কতজন যে ঝড়ের মুখে কোথায় উড়ে গেল, তার ঠিক নেই। অত বড় বড় পাথরের চাঁই থেকে কাটিয়ে আর একটুও এগোতে পারল না। বায়ব্য অস্ত্র বিফল হল দেখে কল্কিদেব এবার মোক্ষম পন্নগাস্ত্র ছুঁড়লেন। শূন্যপথে কোটি কোটি বিছে আর সাপ রাজার দিকে ছুটে আসছে। শশীধ্বজের অনুচররা ভয়ে আঁতকে উঠল। রাজা কিন্তু মৃদু হেসে শরাসন থেকে মুহূর্তে গরুড়াস্ত্র তুলে ছুঁড়লেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সাপ-বিছের মহাশত্রু গরুড় পাখিতে আকাশ ছেয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সব। অমন মোক্ষম পন্নগাস্ত্রও বিফল হল।

কল্কিদেব হানলেন আগ্নেয়াস্ত্র। লকলকে করে যেন সারা রণক্ষেত্রে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের তাপে জ্বালায় অনেকে মারা পড়তে লাগল। আগুন বিশ্বগ্রাসী হয়ে এগিয়ে আসছে। সকলেই ভাবল, কল্কিদেব এবার বুঝি সব ধ্বংস করে দিলেন। শশীধ্বজ কিন্তু নির্বিকার। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর শরাসন থেকে পর্জন্য নামে এক অস্ত্র তুলে নিয়ে যেই ছুঁড়লেন অমনি কোথা থেকে রণক্ষেত্রের আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামল। আগুন নিভে গেল।

দিব্য অস্ত্র যা ছিল, তা সব শেষ হয়ে গেল। কল্কিদেব এবার ঘোড়া থেকে নেমে যেন সরোষে এগিয়ে এলেন লম্বা দুই হাত বাড়িয়ে শশীধ্বজের দিকে। রাজা বুঝতে পারলেন, এবার তিনি আসছেন বাহুযুদ্ধে। মনে মনে বললেন—এতক্ষণ তো এরই অপেক্ষায় ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর বাহন থেকে নেমে আস্ফালন করতে করতে যেই কাছে এগিয়ে এলেন, অমনি কল্কিদেবের এক চড়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সে চড়ের কি বিকট আওয়াজ—যেন আকাশের বুকও কেঁপে উঠল।

একটু পরেই শশীধ্বজ আবার উঠে দাঁড়ালেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর সব শক্তি নিয়ে কল্কিদেবের ওপর। কিলের ওপর কিল, ঘুসির ওপর ঘুসি বসাতে লাগলেন। কল্কিদেব আর সহ্য করতে পারলেন না। সকলেই দেখল, কল্কিদেব জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

মনে মনে হাসলেন শশীধ্বজ। মনে মনে বললেন, 'সত্যিই তুমি খেলা দেখাতে জানো।' কল্কিদেব লুটিয়ে পড়েছেন দেখে ধর্ম আর সত্যযুগ ছুটে এসেছিলেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাবেন বলে। শশীধ্বজ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়লেন—খবরদার! ও আমার বন্দী। আর তোমাদেরও রেহাই নেই। এই বলে ধর্ম আর সত্যযুগকে খপ্‌খপ্ করে দুই বগলে পুরে ফেললেন। হাতে তুলে নিলেন অচৈতন্য কল্কিদেবকে। তারপর মহানন্দে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। মরু, দেবাপি, বিশাখযূপ, গার্গ, কেউ আর কোন বাধা দিতে পারলেন না। হত-আহতে রণক্ষেত্র মহাশ্মশান করে যুদ্ধ শেষ হল।

রানী সুশান্তা এসবের কোন খবরই জানতেন না। তখনো তিনি বিষ্ণু মন্দিরে, প্রায় ধ্যানমগ্না। তাঁর সখীরা মহানন্দে আপন মনে সুমধুর স্বরে হরি গুণ গান গেয়ে চলেছে। রাজা শশীধ্বজ তিনজনকে সেভাবে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

রানীকে ডেকে বললেন—রানী, রানী, সার্থক তোমার পুজো, সার্থক তোমাদের নাম গান। চেয়ে দেখ, কাকে ধরে এনেছি। এই বলে ধর্ম আর সত্যযুগকে ছেড়ে দিয়ে কল্কিদেবকে তিনি মন্দির সভায় শুইয়ে দিলেন।

রানী সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এলেন। কল্কিদেবকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর তখন সে কি কান্না! বিলাপ করে উঠলেন—হায়! তুমি এ কি করেছ? ভগবান, তোমাকে কি আমায় শেষে এইভাবে দেখতে হল?

শশীধ্বজ বললেন—শুধু শুধু বিলাপ করছ রানী। যদি উনি স্বেচ্ছায় ধরা না দিতেন আমার সাধ্য কি যে বিশ্বজয়ী ভুবনস্রষ্টা ভগবানকে আমি ধরে আনতে পারি! শুধু তাই নয়, রানী। ঐ দেখ, ধর্ম আর সত্যযুগকেও ধরে এসেছি। মহানন্দে হরি গুণগান কর রানী। বুঝতে পেরেছি, ভগবান ছল করে প্রাসাদে এসেছেন গান শুনতে।

ধর্ম আর সত্যযুগ ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্তম্ভিত। এত ভক্তি! সত্যযুগের মনে হল, সত্যিই তিনি যেন সত্যযুগের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ধর্মের সে কি অপার আনন্দ!

শশীধ্বজের নির্দেশে রণাঙ্গন থেকে তাঁর দুই ছেলেও ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন।

দোর্দণ্ড নাম-গান চলেছে কল্কিদেবকে ঘিরে। মূর্ছিত কল্কিদেবের সামনে বসে রানী সুশান্তা তাঁর সেবা করে চলেছেন।

একসময় চোখ মেলে তাকালেন কল্কিদেব। দেখলেন, সামনে এক রমণী। দু পাশে দাঁড়িয়ে ধর্ম আর সত্যযুগ। পেছনে রাজা শশীধ্বজ, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে।

উঠে বসলেন কল্কিদেব। চারদিক আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ধর্ম আর সত্যযুগকে বললেন—এ কি, আমরা রণভূমি ছেড়ে শত্রুপুরীতে কেন? কে এই রমণী আমার সেবা করছে? শত্রু

শশীধ্বজই বা ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

সুশান্তা ধীরে ধীরে বললেন—ভগবানের সেবা কে না করে? তাঁর সঙ্গে কেউ শত্রুতা করে বাঁচতে পারে?

শশীধ্বজ বললেন—আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, আপনাকে আঘাত হেনেছি ঠিকই। কিন্তু কতখানি শত্রুতা করেছি, তা কি আপনার অজানা?

ধর্ম আর সত্যযুগ বললেন—আপনার মত এমন ভক্ত আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের যে কি আনন্দ হচ্ছে!

কল্কিদেব এবার হেসে বললেন—রাজা, সত্যিই তুমি ধন্য। একমাত্র ভক্তিবলেই তুমি আমায় জয় করতে পেরেছ।

শশীধ্বজ এবার মহা সমাদরে কল্কিদেবকে রাজসভায় এনে সিংহাসনে বসালেন। মরু, দেবাপি, বিশাখযূপ, গার্গ থেকে শুরু করে কল্কিদেবের যত মহাবল ছিলেন, সেই সঙ্গে নিজ পক্ষের রাজাদেরও ডেকে আনালেন রাজসভায়।

তারপর রানীর অনুমতি নিয়ে রাজা শশীধ্বজ তাঁর অপরূপা মেয়ে রমাকে অনেক হাতি, ঘোড়া, রত্ন সেবিকা সমেত কল্কিদেবের হাতে তুলে দিয়ে সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়ন করে বললেন—যাক, আমার কাজ শেষ হল। এবার আমার ছুটি। এতদিন এই ভল্লাট নগরে আমরা এরই অপেক্ষায় ছিলাম, এখন আমরা মুক্ত হলাম।

কল্কিদেব এ কথা শোনার পরও চুপ করে রমাকে পাশে নিয়ে কিছু সময় বসে রইলেন। কিন্তু রাজারা বেশ অবাক হলেন। শশীধ্বজ এসব কি বলছেন? রাজা কল্কিদেবের সঙ্গে যুদ্ধই বা করতে গেলেন কেন? এত প্রাণই বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট হতে দিলেন কেন? আবার তাঁকে জামাই করে নিজেরা 'মুক্ত হলাম' এ কথাই বা বলছেন কেন?

রাজাদের চোখে-মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

শশীধ্বজ রাজাদের নিঃসংশয় করার জন্য বললেন—সে এক বিচিত্র কাহিনী। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জন্মান্তরের ইতিহাস। আপনাদের যখন জানার ইচ্ছে হয়েছে, তখন অবশ্যই আপনাদের আমি তা বলে যাব।

হাজার যুগ আগের কথা।

মহাবনে এক শকুন আর শকুনি থাকত। পচাগলা দুর্গন্ধ মাংস খেয়ে দিন কাটাত আর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত।

সেই বনে এক ব্যাধ থাকত। তার একটা পোষা শকুন ছিল। সেটাকে নিয়ে সে-ও সেই বনে শিকার করে বেড়াত।

শকুন আর শকুনি একদিন ব্যাধের হাব-ভাব দেখে বুঝল, সে তাদের ধরবার চেষ্টায় আছে। তাই তাকে দেখলেই তারা পালিয়ে যেত। যেখানেই যেত, ব্যাধ কিন্তু তাদের পিছু ছাড়ত না।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে শকুন-শকুনি খিদেয় খুব কাতর হয়ে পড়েছে। কদিন ধরে তাদের আর খাওয়া জোটে নি। পচা-গলা মাংসও চোখে পড়ে না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন তারা দেখল, এক শকুন এসে নামল। তাকে দেখে শকুন-শকুনি ভাবল, নিশ্চয়ই কোন খাদ্য এসেছে, তা নইলে ঐ শকুন আসবে কেন। এই ভেবে তারাও সেই শকুনের পিছু পিছু যেই নামল অমনি ব্যাধের ফাঁদে পড়ল। তখন বুঝতে পারেনি যে, ওটা ব্যাধের সেই পোষা শকুন। ফাঁদে পড়ে আর পালাবার পথ নেই। ব্যাধ তাদের ধরে গণ্ডকী নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বেশ করে জলে চুবিয়ে নিয়ে একটা শিলার ওপর আছাড় দিয়ে মারল। সেই শিলাটা ছিল আবার চক্র-আঁকা শালগ্রাম শিলা। ব্যাধ শিকারের আনন্দে খুশি। সে জানতেও পারল না শকুন-শকুনির কি মহা উপকার সে করল। নদীর জলে চোবানো আর শালগ্রাম শিলায় মারার ফলে তারা ঐ জঘন্য পক্ষী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুণ্ঠধামে, যেখানে স্বয়ং নারায়ণ থাকেন।

মুক্ত জীবন নিয়ে মহাসুখে শকুন-শকুনি সেখানে একশ বছর থেকে এল ব্রহ্মলোকে। পাঁচশ বছর সেখানে মহানন্দে কাটিয়ে এল দেবলোকে। চারশ বছর দেবলোকে কাটাল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য কি তা ইতিমধ্যে তাদের জানা হয়ে গেছে। মহাজ্ঞানী হয়ে উঠেছে তারা। জেনে নিয়েছে সার কথা, কৃষ্ণ আর ভক্তি সব কিছুর মূলে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবই ঐ কৃষ্ণ। আর ভক্তি দিয়ে পাওয়া যায় না এমন কোন দুর্লভ জিনিস ব্রহ্মাণ্ডে নেই। কোন্ কোন্ রূপে ভগবান পৃথিবীতে যাবেন অত্যাচারী-অধার্মিকদের হাত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে পৃথিবীকে রক্ষা করতে, তাও তাদের জনা হয়ে গিয়েছিল।

ত্রেতা যুগের রাম আর লক্ষ্মণ দ্বাপর যুগে এলেন শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম হয়ে। তখন সেই শকুন আর শকুনিও মর্ত্যে এসে জন্ম নিল যাদব বংশে—রাজা সত্রাজিৎ আর তাঁর মহিষী হয়ে।

এই সময় এই দুই অবতারের হাতে অনেক অনুচরই মারা গিয়েছিল বটে, কিন্তু দ্বিবিদ নামে এক বানর আর জাম্ববানের মৃত্যুটা ছিল একটু অন্য ধরনের।

ত্রেতাযুগে লঙ্কাযুদ্ধে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায় ঢুকে ইন্দ্রজিৎকে বধ করার পর লক্ষ্মণ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোন রকমেই তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের বংশে দ্বিবিদের জন্ম হয়েছিল। কোন কারণে বানর হয়ে জন্মালেও সে কিন্তু চিকিৎসা ভোলেনি। কাতর লক্ষ্মণকে দেখে সে রামচন্দ্রের সামনেই তাঁকে সুস্থ করে দিলে লক্ষ্মণ খুশি মনে বলেছিলেন—দ্বিবিদ, আমি তোমার কি উপকার করতে পারি বল। দ্বিবিদ তখন বলেছিল, 'আমি এই বানর জন্ম থেকে মুক্ত হতে চাই।' লক্ষ্মণ বলেছিলেন, 'অপেক্ষা কর, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।' দ্বাপর যুগে সেই লক্ষ্মণই বলরামরূপে তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন।

আর জাম্ববান? সত্যযুগে বিষ্ণু যখন বামন রূপে বালির দর্প ভাঙতে তিন পায়ে ত্রিলোক জয় করেছেন, জাম্ববান তখন ক্ষিপ্রবেগে তাঁর প্রথম চরণ এক পাক ঘুরে নিয়েছিল। তাই দেখে বানরদের বলছিলেন, 'তোমার দ্রুততা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। বল, কি চাও?' জাম্ববান প্রার্থনা জানিয়েছিল, 'আমি এই পশুজন্ম থেকে মুক্তি পেতে চাই।' বামনদেব তাকে আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। দ্বাপরযুগে সেই জাম্ববান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্ত হয়েছিল একটা স্যমন্তক মণির ব্যাপার নিয়ে। আর তার পিছনে ছিল সেই রাজা সত্রাজিৎ।

সূর্যদেব সত্রাজিতকে দিয়েছিলেন সেই স্যমন্তক মণি। মণিটি সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে রেখেছিল তার ভাই প্রসেনের কাছে। শিকারে গিয়ে প্রসেন প্রাণ হারায়। মণিটাও খোয়া যায়। সত্রাজিতের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সবই কৃষ্ণের কারসাজি। লোভী কৃষ্ণই তার ভাইকে মেরে মণিটা নিয়েছে। কৃষ্ণ কিন্তু

সত্রাজিতের ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। জাম্ববানকে মেরে সেই মণি উদ্ধার করে এনে সত্রাজিতকে ফেরত দিয়েছিলেন। ভগবান কৃষ্ণের নামে কলঙ্ক রটানোর ফলে সত্রাজিৎ তখন মনে মনে খুব আপসোস করেছিল। আর ব্যাপারটা সহজ করে নেবার জন্য তার মেয়ে সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়েছিল।

(ভাগবত পুরাণ : স্যমন্তক মণির রহস্য কাহিনী)।

ভগবানের নামে অপবাদ, ভগবানে মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাসের পাপ কিন্তু সত্রাজিতকে ছাড়েনি। মুক্ত জীবন নিয়ে লোক-লোকান্তর ঘুরতে ঘুরতে সেই শকুন-শকুনির জানা হয়ে গিয়েছিল কলিযুগে ভগবান কল্কিদেবরূপে আবির্ভূত হবেন।

তাই প্রাচীন সেই শকুন-শকুনিকে, দ্বাপর যুগের কৃষ্ণভক্ত সত্রাজিৎ আর সত্রাজিৎ মহিষীকেও পাপমোচন করার জন্য, মুক্ত হওয়ার জন্য কলিযুগে জন্মাতে হল।

এরপর একটু থেমে শশীধ্বজ বলেন—রাজাগণ, আমিই সেই শকুন বা সত্রাজিৎ, আর রানী সুশান্তাই হলেন সেই শকুনি সত্রাজিৎ-মহিষী। গত জন্মের সন্দেহ ভগবান কল্কিদেবের ওপর এ জন্মে আমাদের আর নেই। তখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য সত্যভামাকে দিয়েছিল সত্রাজিৎ। সেই সত্যভামা এ জন্মে আমার মেয়ে রমা। এ জন্মে তাঁকে আজ ভগবানের হাতে সমর্পণ করে মুক্ত হলাম। আর লোকক্ষয়! যারা মরছে, তারা সবাই ছিল অধার্মিক।

শশীধ্বজের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে সকলে হতবাক হয়ে গেলেন।

—ভগবানের কৃপাতেই আমি জাতিস্মর হয়েছিলাম। তাই সব বলতে পারলাম। এবার আমার ছুটি। এই বলে কল্কিদেবের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে শশীধ্বজ হরিদ্বারে চলে গেলেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচী